সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

...শ বর্ষ] শনিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 21st April, 1951. [২৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

...র মহারা...র গদিচ্যুতি

...রাদার মহা...জা প্রতাপ সিং গাইকোয়াড় ...্যুত হই...ছেন। গত ১৪ই এপ্রিল ...ীয় পার্লা...েন্টে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত ...হরলাল নে... এই গদিচ্যুতির কারণ ...ত করেন। ...ন্ত নৃপতিদের মধ্যে এক ... বরোদার ...একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ...। অবশ্য ...তন্ত্রসুলভ আভিজাত্য- ... তাঁহার স... অনেকখানি জড়িত ...ত। সর্দার ...টেলের পরিকল্পনানুযায়ী ...দা রাজ্যকে ...বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ...বার জন্য ...ইয়া আসিয়া বরোদা ... সেই ...ঐতিহ্যের অনুসরণ ...য়াছিলেন, ...তু পরে দেখা গেল, ...দার মহারা... স্বৈরাচারের নেশা ...ইয়া উঠিতে...ারেন নাই। সর্দার ...লের পরলো...মনের পর হইতেই ...তিন স্বৈরাচা...ম্ভোগের দুষ্প্রবৃত্তি ...র রক্তে ...ি... থাকে এবং প্রজাদের ...পাগিরির মোহ...াহাকে পাইয়া বসে। ...র সম্মতি না ...য়া বরোদা রাজ্য ...াইয়ের অন্তর্ভু... করা হইয়াছে, তিনি ...জুহাত তোলে... বলা বাহুল্য, তাঁহার ...গত অ...ার ভারত সরকার উপেক্ষি... হয়। কিন্তু ...হজে দ...ত হইবার নহে। ... ...মন্ত নৃ...তবৃন্দকে সঙ্ঘবন্ধ ...চার পু...ঃ প্রতিষ্ঠা করিবার তাঁ... চেষ্... চলিতে থাকে। ...ন্য়ারী মাসে তাঁহাকে ...তর্ক ...রিয়াও দেওয়া

হয়। কিন্তু নিজেকে সংশোধন করিবার মত শুভবুদ্ধি তাহাতেও মহারাজার জাগে নাই। তিনি তলাইয়া বুঝিতে পারেন নাই যে, সর্দার প্যাটেলের বিধানানুযায়ী ব্যবস্থাতে তাঁহারা যাহা পাইয়াছেন, তাহাও বড় ভাগ্যের জোর বলিয়া। দেশের বর্তমান অবস্থায় সেগুলিও তাঁহাদের পাওয়া উচিত ছিল না। ফলত ভারতের বুক হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের সযত্নপ্রোথিত মধ্যযুগীয় বর্বরতার এই ধ্বজা একেবারে উৎখাত করাই দরকার ছিল। তাঁহাদের খেতাব, মান-মর্যাদা বজায় আছে, ইহার উপর লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য এখনও পাইতেছেন। গণতান্ত্রিক নীতিকে ব্যাহত করিয়াও তাঁহাদিগকে এই সব সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং ভারত গভর্নমেণ্টকে এজন্য জনপ্রিয়তা হারাইবার ঝুঁকিও লইতে হইয়াছে। একান্ত অবিমৃষ্যকারিতার বশে বরোদার মহারাজা এই বিচার বিস্মৃত হইয়া ভারতের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধতা করিতে দাঁড়ান। ফল তাঁহাকে এখন ভোগ করিতে হইল। ভারতের প্রধান মন্ত্রী মহারাজাকে গদিচ্যুত করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবার সময় দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন, রাজন্যবর্গের জাতীয় সংহতিবিরোধী, এই ধরণের আন্দোলন তাঁহারা কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না। ভারতের শাসনতন্ত্রের মর্যাদা লইয়া তাঁহারা ছেলেখেলা করিতে দিবেন না। সুখের বিষয়, সেদিন ভারতীয় পার্লা-মেণ্টে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিবর্গ বরোদার গাইকোয়াড়ের সম্পর্কে ভারত সরকারের বর্তমান ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া-ছেন। কিন্তু আশঙ্কার কারণ এখনও যে একেবারে না আছে, একথা বলা যায় না। প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ... বরোদার মহারাজার মতো আরও ... সম্পন্ন জনকয়েক নৃপতি আছেন। ই... সাবেকী রাজাগিরির মজা লুটিবার মোহ... স্বপ্ন এখনও দেখিতেছেন। ... করি, ইঁহাদের সম্বন্ধেও, সমু... অবলম্বিত হইবে। ফলত ভার... অখণ্ড জাতীয়তাবোধের যে ভি... এ... পরে গঠিত হইতে চলিয়াছে, কো... মধ্যে ভাঙ্গন ধরিলে দেশের সব... এবং সর্দার প্যাটেলের উজ্জ্বল ... ম্লান হইয়া পড়িবে। এ বিষয়ে ... নায়কদের সাবধান হওয়া প্রয়োজ... মহারাজার সম্বন্ধে ভারত সর... যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে... মাত্রেই তাহাতে আশ্বস্ত হইবে ... রাজ্যের প্রজাগণ ... স্বৈরাচারের দ্বারা পুনরায় অ... আশঙ্কা হইতে মুক্ত থাকিয়া ... তন্ত্রের সর্বজনীন অধিকার ... সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা উপলব্ধি ... হইবে।

...স্তুর অধিকার

...মবঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদে 'উদ্বাস্তু ...ন এবং অনধিকারী উচ্ছেদ বিল'টি ...নে আইনে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর ...র্ববঙ্গের উদ্বাস্তু...কে পূর্ববঙ্গের ...বাসী বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিবার প্রশ্ন ...র নাই। তাঁহারা ভারতের নাগরিক ...ধিকার এবং দায়িত্ব লইয়াই পশ্চিমবঙ্গের ...াজ-জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে ...শিয়া গেলেন। এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রের একটি ...রুতর সমস্যার সমাধান হইল বলিয়া ...মরা মনে করি। প্রকৃতপক্ষে, এতদিন ...র্যন্ত উদ্বাস্তুদের অধিকার বলিতে কিছু ...ল না। কোন জমিতে একখানা ঘর ...িধলেই উদ্বাস্তুদের মনে নিশ্চিন্ত ভাব ... নিরাপত্তা বোধ আসিতে পারে না। বস্তুত ...খানে তাঁহারা বসতি বিধান করিয়াছেন, ...াহার অধিকার আইনগত না হওয়া পর্যন্ত ...স্তুহারা-জীবনের অসহায়ত্ব সম্বন্ধে চেতনা ...াঁহাদের অন্তর হইতে দূর হওয়া সম্ভব ...হে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের মূল নীতি এই ...দেশ্যেই পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। ...কথা আমরা বারংবার বলিয়াছি। বর্তমান ...বস্থা যাহাতে এই দিক হইতে কার্যকর ...য়, তজ্জন্য সকলেরই দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ... বিলটির বর্তমান রূপান্তর সাধনে ...মেন্ট ও বিরোধী পক্ষ যেমন ...যোগিতামূলক দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, ...মরা সমাজ-জীবনের সর্বত্রও সেইরূপ ...যোগিতা-বোধ জাগ্রত দেখিতে চাই। ...ক্তপক্ষে উদ্বাস্তুগণ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ...রস্বরূপ নহেন। এখানকার সমাজ-জীবনে ...াঁহারা সুসংবদ্ধ হইবার ফলে সকল দিক ...তে পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধিই বৃদ্ধি পাইবে ... আমরা অনেকবার বলিয়াছি। ...তে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনের ইঁহারা ...অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ... অধিবাসীদের স্বার্থহানি ঘটিবার ... আশঙ্কাই নাই। পরন্তু তেমন ... যাঁহারা অন্তরে পোষণ করেন, ... নিতান্ত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং ... বৃহত্তর স্বার্থে সম্যক্ অবহিত ...হেন। ঐ ধরণের অনিষ্টকর ধারণা যদি ...ারো অন্তরে থাকে, সমগ্র বঙ্গের সভ্যতা ...তি এবং রাজনীতিক সাধনার গৌরব- ... ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়া সে ধারণা ... তাঁহাদের দূর করা দরকার। আমরা ...হই বলিয়াছি এবং এখনও সেই কথাই বলিব যে, পশ্চিমবঙ্গের যেসব মুসলমান উদ্বাস্তুস্বরূপে পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, যদি কেহ তাঁহাদের জমি বা গৃহ বেদখল করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের পুনরধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী সব সময়ই রহিয়াছে এবং বর্তমান ব্যবস্থায় তাঁহাদের সে অধিকার কোনক্রমেই ক্ষুন্ন হইবে বলিয়া মনে করি না। সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তুলিয়া যাঁহারা এই ধরণের কথা এই সম্পর্কে উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিযোগের অসত্যতা প্রতিপন্ন হইতে বেশি বিলম্ব হইবে না। পাকিস্থানী ভেদ-নীতি পশ্চিমবঙ্গে চলিবে না, ইহা তাঁহারা জানিয়া রাখুন। সাম্প্রদায়িকতাবোধ বাঙলার সংস্কৃতির বিরোধী, জাতীয়তার বিরোধী। অতীতে এই সত্য পর্যাপ্তরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যাঁহারা প্রকৃত উদ্বাস্তু, তাঁহাদেরই পুনর্বাসনের প্রয়োজন। প্রকৃত উদ্বাস্তু বলিয়া কাহাদের দাবী গণ্য করা উচিত, বিলে সে সংজ্ঞা সুস্পষ্টরূপেই নির্দেশিত হইয়াছে। কার্যোপলক্ষে যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করিতেন, অথচ যাঁহাদের পরিজনবর্গ পূর্ববঙ্গে থাকিতেন, কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামা ও নিরাপত্তার অভাব-বোধে তাঁহারা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উদ্বাস্তুস্বরূপে গণ্য করা হইয়াছে। উদ্বাস্তু না হইয়াও এক-শ্রেণীর লোক উদ্বাস্তুদের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা ইহা জানি। বলা বাহুল্য, তথাকথিত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবী উদ্বাস্তুগণও করেন না। ইঁহাদের অসঙ্গত আবদার এখন আর চলিবে না। এই বিষয়ে উদ্বাস্তুগণ সরকারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া দলগত রাজনীতিক স্বার্থ-সিদ্ধি করিবার যে একটা দুষ্প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছিল, অতঃপর তাহার অবসান ঘটিবে, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতি, তাহার সমাজ-জীবনের সংস্থিতি, সর্বোপরি মানবতার দাবীই এক্ষেত্রে বড়, এই কথা স্মরণ রাখিয়া উদ্বাস্তু-দের পুনর্বাসন ব্যবস্থা কার্যকর করিবার জন্য আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

সমাজ সেবার আদর্শ

১৬ই এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল—এই একপক্ষকাল পশ্চিমবঙ্গে সমাজ-সেবার আদর্শ প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণকে এই কর্তব্যে প্রণোদিত করিবার জন্য সমাজের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আবেদনও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের লোকের মধ্যে সাড়া কিছুই জাগে নাই। জাতীয় সপ্তাহ... বিশেষভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস প্রতিপালনের মধ্যেও সমাজ-জীবনের তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বাস্তবিকপক্ষে স্বাধীনতা লাভ করিবার পর হইতে বৃহৎ আদর্শের প্রেরণা আমাদের মধ্যে যেন এলাইয়া পড়িয়াছে। অথচ এই প্রেরণা বাঙলায় একদিন ঐন্দ্রজালিক শক্তি বিস্তার করিয়াছে, অঘটন ঘটাইয়াছে। রাজনীতিক আদর্শ সাধনের ক্ষেত্রে বাঙলার ধমনীতে যেন নূতন শক্তি সঞ্চার হইয়াছে। সেজন্য বাঙালী অকুণ্ঠে প্রাণ দিয়াছে। সমাজ-সেবার ব্রতেও সে পিছু পড়িয়া থাকে নাই। দুর্গত নরনারীর সাহায্য-কল্পে বাঙলার যুবক সহৃদয় শক্তিশালী নেতাদের অনুপ্রেরণায় জলে-জঙ্গলে... ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বাঙলার সমাজ-জীবনে বলিষ্ঠ আদর্শের এই যে উদ্দীপনা, এই যে আলোড়ন বর্তমানে তাহা আর পরি-লক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে সমাজ-বিরোধীরাই এখানে আজ মাথা উঁচু করিয়া ফিরিতেছে এবং দুর্গত দেশবাসীকে শোষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে মান, যশ ও প্রতিষ্ঠার মজা লুটিতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় কি? প্রকৃতপক্ষে এমন অবস্থা যদি দীর্ঘ কাল চলে, ভয় হয় বাঙলার গৌরবময় ঐতিহ্য একেবারে বিলুপ্ত হইবে এবং বাঙালী জাতি বলিয়া কিছু থাকিবে না। আমাদের অভিমত এই যে, জনসাধারণের অপেক্ষা যাঁহারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁহাদের উপরই এই অবস্থার দায়িত্ব সমধিক। তাঁহারা বর্তমানে রাজনীতির বাহ্য আড়ম্বর ও প্রতিষ্ঠার দিকটাই বড় করিয়া দেখিতেছেন এবং সেবানিষ্ঠ জীবনের আদর্শের কোন উদ্দীপনা তাঁহাদের নিকট হইতে জন-সাধারণ পাইতেছে না। গান্ধীজীর সমগ্র জীবন সমাজ-সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। কংগ্রেসকে সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল এবং মৃত্যুর ... দিন পূর্বেও তিনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সে আদর্শ

মাথা নীচু করে জগদীশ আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে এলো।

সদানন্দদার ইস্কুলেই প্রথম পলিটিক্যাল পাঠ সে আজ থেকে কতদিন আগে? এক যুগ, না দেড়? হিসেব নেই। মহামায়া ইনস্টিটিউশনের ফার্সী পড়ানোর পরিত্যক্ত কামরায় নির্দিষ্ট সময়ে যারা এসে জুটত, তার মধ্যে সকলের নামও এখন মনে পড়ে না। দীনেশ ছিল, এখন যে স্কুল-মাস্টারি করছে। অবিনাশ তো মারাই পড়ল পুলিসের গুলীতে। সমীর বরাবরই দুর্বল প্রকৃতির, একটু মেয়েলি, এ্যাপ্রুভার হ'ল, সরকারী সাজা পেল না, কিন্তু বাঁচাতে পারল না নিজেকেও। ছ'মাস পরে ওকে গুলী করে প্রভাস ফেরারী হল, পরে কিন্তু সেই প্রভাসই আবার ইনফর্মার হয়েছিল। এস-ডি-ও'র ভাইপো পুর্ণেন্দুও এসেছিল, ওকে প্রথমে কেউ বিশ্বাস করত না, সদানন্দদা তো দলে নিতেই রাজি হন নি, শেষ পর্যন্ত সেই ছেলেটি ফাঁসি গেল অনায়াসে। আর সদানন্দদার ডান হাত ছিল যে অবনী, সে তো ভিড়ে গেল সন্যাসাশ্রমে, আজকাল নাকি যোগতপ নিয়েই থাকে, জন্ম-জন্মান্তরের পরম্পরা নিয়ে ওর নাকি নিজস্ব কী একটা অলৌকিক থিওরিও আছে। সবচেয়ে তড়পাতো যে শিবব্রত, সে নাকি এখন কোন্ একটা স্টেটে মাইনিং ওভারশীয়ার।

দলে তো সদানন্দদা প্রথমে হৈমন্তীকেও নিতে চান নি। অনেক কান্নাকাটি করে তবে হৈমন্তী অনুমতি পেয়েছিল। গভর্নমেণ্ট প্লীডার সর্বেশবাবুর ভাইঝি, সদানন্দদার দূর সম্পর্কে কেমন আত্মীয়। পোনেরো ষোল বছর বয়স, রঙ বরাবরই এম্নি, তখন বুঝি তাতে আবার এক রতি সিঁদুরও মেশানো ছিল। সদানন্দদা যেসব বই দিতেন, একদিনে পড়ে ফেরৎ দিতো। সদানন্দদা উপদেশ-নির্দেশ দিতেন যখন, নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকতো।

বিমলেন্দুর মুখ বরাবরই আলগা, সেই ফিস ফিস কথা, চাপা আলোচনার আসরেও গম্ভীর মুখে থাকতে পারতো না। একদিন জগদীশকে আড়ালে ডেকে বলেছিল, আমরা এখানে আসি হৈমন্তীর টানে। হৈমন্তী কেন আসে জানিস?

কেন?

সদানন্দদার টানে।

প্রথমে কথাটা [illegible] গুরুত্ব দেয় নি জগদীশ, বিমলেন্দুকে [illegible] নাই বোধ হয় একটা চড় মেরে বসেছিল। বিমলেন্দু মাথা নীচু করে সরে গেল, কিন্তু কথাটা সরল না জগদীশের মন থেকে। সেদিন থেকে ভালো করে লক্ষ্য করতে শুরু করল। ঐ যে মেয়েটি পায়ের আঙুল [illegible] ঢেকে যটি, মুড়ে এক কোণে বসে আছে, মুখের একটি রেখার বদল নেই, তন্ময় দৃষ্টি, এর টানেই কি ওরা সবাই এখানে ছুটে আসে। ডুবুরী প্রশ্নটাকে নামিয়ে দিল সত্তার গভীরে, যে জবাব উঠে এলো, তা প্রবালের মতো আরক্ত; জগদীশ শিউরে উঠল।

আর ওই যে মানুষটি, সদানন্দদা, একটু দূরে বসে আছেন একাসনে, কায়েমী ডিসপেপ্সিয়া, শরীরে মাংস নেই কোথাও, চোখের মণি দুটিতে শুধু অস্বাভাবিক তীব্রতা, যত কাঠিনতা সব শিরাওঠা হাতের মুঠিতে, যে হাতের গুলির নিরিখ একচুল বেঠিক হয় না, ওঁর আকর্ষণেই হৈমন্তী এখানে আসে? বারবার জগদীশ তাকালো হৈমন্তীর দিকে, যতবার দেখল সেই তন্ময় বিহ্বল দৃষ্টি, ততবার ভেতরটা যেন পুড়ে পুড়ে যেতে লাগল।

কী-নেশা হয়েছিল ক'দিন, পড়ায় মন নেই, খাওয়া-না, [illegible]ওয়া-না, জগদীশ ছায়ার মতো ফিরেছে হৈ[illegible]র পিছনে। স্টাডি ক্লাশ থেকে [illegible] পথ কামরাঙা গাছটার নিচে হৈ[illegible] খানা চেপে ধরার পাগলামিও মনে আ[illegible]ক। সরু নরম লিকলিকে দু'খানা হাত, [illegible] ন্ধের বেড় আড়াই ইঞ্চির বেশি না, [illegible] ন্য প্রয়াসেই হৈমন্তী কিন্তু নিজেকে ছা[illegible] নিয়েছিল। অদ্ভুত ঠাণ্ডা স্ব[illegible] বলেছিল. তোমার হাত দুটো বড় গরম জগদীশ, বোধহয় জ্বর হয়েছে। বাড়ি যাও।

বেত্রাহত কুকুরও কেঁউ করে, সব সময়ে ফিরেও যায় না, জগদীশ কিন্তু গেল। আর একটি কথাও মুখে যোগালোনা সেদিন। স্টাডি ক্লাশ কামাই করল পর পর তিনদিন। চতুর্থদিন সদানন্দদা ডেকে পাঠালেন। তাঁর অসুখ, জগদীশ যেন দেখা করে।

দেখা করতে গিয়ে দেখল হৈমন্তীকে। সদানন্দদার শিয়রে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কী অসুখ সদানন্দদার। বেশি কিছু না, সামান্য সর্দিকাশি। জিজ্ঞাসা করলেন, তুই ক'দিন আসিস নি যে?

জবাব দিতে গিয়ে হৈমন্তীর সংগে চোখা-চোখি হ'ল, মাথা নীচু করল জগদীশ। মিনমিন করে কী জবাব দিল বোঝা গেলনা।

সদানন্দদা বললেন, 'দেশোদ্ধারের নেশা ছুটলো?'

অস্পষ্ট এলোমেলো দু' একটা কী [illegible] কৈফিয়ৎ দিল জগদীশ, মনে নেই। একটু পরে ছুটে পালালো সেখান থেকে। সদানন্দদার পাঁজরাওঠা বুকের কোথায় কাশি জমেছে সেখানে হৈমন্তী ওর শুভ্র-রক্তাভ আঙুলগুলো বুলিয়ে দিচ্ছে। পাকা ফোঁড়ার পুঁজ যেন চিন চিন করে উঠল। সহ্য হ'লনা। কোনো একটা ছুতো করে জগদীশ চলে এলো।

এলো বটে, বেশি দূর যেতে পারলো না কিন্তু একটু এগিয়ে উকিলপাড়ার মুখটাতে দাঁড়িয়ে রইল হৈমন্তীর আশায়।

হৈমন্তীর আসতে অবশ্য কিছু দেরিই হ'ল। তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। শুক্লপক্ষ, তাই শড়কে মিউনিসিপ্যাল আলো জ্বলেনি। বরদাবাবুর বৈঠকখানায় দাবার আসর জমেছে।

'এখানে দাঁড়িয়ে?'

হৈমন্তীর সোজাসুজি প্রশ্নে জগদীশ একটু থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'তোমারই জন্যে। তুমি সদানন্দদাকে সব কথা বলে দিয়েছ হৈমন্তী?'

'কোন্ কথা? তোমার সেদিনকার সেই পাগলামি? খেপেছ, ও কথা আমার মনে নেই।'

মনেই নেই? মুহূর্তে পাংশু হয়ে [illegible] জগদীশ। হৈমন্তী হয়ত সদানন্দদাকে [illegible] দুর্বলচিত্ততার কথা জানিয়ে দিয়েছে, [illegible] এতক্ষণ অস্বস্তির পরিসীমা ছিল না, এর চেয়ে বলে দেওয়াও বুঝি ভালো [illegible] হৈমন্তীর কাছে ওর সামান্যতম গু[illegible] নেই, কথাটা নির্ভুলভাবে জেনে জগদী[illegible] মুখ কালো হয়ে গেল।

হৈমন্তী বলল, 'পথ ছাড়ো জগদী[illegible] বাড়ি যাও।'

'যাই।' জগদীশ বলল, 'কিন্তু [illegible] আগে আরেকবার সদানন্দদার বাসাটা [illegible] যাবো হৈমন্তী। ওঁকে সব কথা অকপ[illegible] আমার চাই।'

...মন্তী দু-এক পা এগিয়েছিল, ... দ্রুত পায়ে ফিরে আসার ভঙ্গি এখনো জগদীশের মনে আছে। মফঃস্বল শহরের জনবিরল রাস্তা, তবু দু'একজন লোক চলাফেরা করছে। হৈমন্তীর ভ্রূক্ষেপ নেই, জগদীশের জামার আস্তিন চেপে ধরে বলল, তা হয় না। সদানন্দদার কাছে কিছুতেই এখন যেতে পাবেনা তুমি।'

'কেন?'

'ওঁর অসুখ, এসব কথা বলে ওঁকে ডিসটার্ব করা ঠিক হবে না। বুকে কাশি বসেছে, ডাক্তার বলেছেন বড় রকমের একটা অসুখ হতে পারে।'

গভীর ক্ষোভেও মুখ দিয়ে একটা কঠিন ঠাট্টা বেরিয়ে গেল: 'সদানন্দদার বুকে শুধু কাশিই জমেনি হৈমন্তী। আরো একটা জিনিস জমেছে।'

'কী।'

'মোহ।'

বলে আর অপেক্ষা করেনি জগদীশ, দ্রুত পায়ে ফিরে এসেছে।

দু'দিন পরে হৈমন্তীর একখানা চিঠি পেয়েছিল, মনে পড়ে। সে চিঠি হারিয়ে গেছে কবে—বোধহয় খানাতল্লাশির সময় পুলিশই নিয়ে গিয়েছিল।

জগদীশকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিল হৈমন্তী। কোন ছত্রে এতটুকু মায়ামমতার লেশমাত্র ছিল না। অতোটুকু মেয়ে, গুছিয়ে গুছিয়ে সব কথা লিখেছিল কিন্তু। ...তো উপদেশ। যে দেহমোহে জগদীশের দৃষ্টি ভ্রান্ত হয়েছে, সে দেহের একটি মাত্র সার্থকতা আছে, দেশের প্রয়োজনে বলিতে। আর কোন কামনা নেই, কি কোন সুখ। সব কথা তো সদানন্দদা বারবার ...ঝয়েছেন সবাইকে, তবু জগদীশের ...ম হ'ল, আশ্চর্য। সদানন্দদা কি ...থা বলেননি যে এ-দলে মেয়ে-পুরুষের ...ন্ত্র সত্তা নেই? সব কথা জগদীশ ভুলে ? কতদূর নৈতিক অবনতি ঘটলে ...ব সদানন্দদার নামে সন্দেহের কালি ...ত সাহস করে, যে-সদানন্দদা ...মুক্ত আত্মার মতই অকলঙ্ক?

...হাতের মুঠোর চিঠিখানার মতোই ...গদীশের মনটা তীব্রতিক্ত একটা ...ভূতিতে দুমড়ে মুচড়ে গেল, ...কি, চিঠিটা নষ্ট করবার কথাও মনে ...না।

...চিঠি পুলিশ পেলো ...উনিশ দিন ...টেবিলের টানায়, খানাতল্লাশ করতে

এসে। ঠিক তিনদিন আগে ছোট্ট শহরটির ইতিহাসে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে গেছে। এ্যানুয়েল স্পোর্টসের মাঠে পুরস্কার দিতে দিতে এ্যাডিশন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট উইলসন সাহেব ঢলে পড়লেন। রিভলভারহাতে হৈমন্তী ধরা পড়ল হার্ডল রেসের শেষ পোস্টটার ঠিক পাশে।

দীনেশ, প্রভাস, অবিনাশ, সমীর,—সব ধরা পড়ল একে একে—এসডিও'র ভাইপো পূর্ণেন্দুও। অবনী বারো ঘণ্টা পুণ্যিগাঁয়ের পুকুরে গলা ডুবিয়ে থাকল, পুলিশের হাত দীর্ঘতর হয়ে পৌঁছল সেখানেও। পরিত্যক্ত ফার্শিক্লাশের ভিৎ খুঁড়ে আবিষ্কৃত হ'ল গুলী বারুদ, আরো কি কি যন্ত্রপাতি, পুলিশের খাতায় সে সবের লিষ্টি হয়ত এখনো আছে। শহরের চারধারে পাহারা চৌকি। রেল ইস্টিশনে ফৌজ ওঠানামা করছে রোজ, বিনা অনুমতিতে কেউ গাড়িতে ওঠার টিকিট পায় না।

তবু কিন্তু সদানন্দদা পালালেন। ওই তো শরীর, ক'দিন আগেও ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে উঠেছেন, তবু কী করে পুলিশের চোখে ধুলো দিলেন, তা নিয়ে পরে অনেক কিম্বদন্তী হয়েছে।

জগদীশ আগেই দল ছেড়েছিল। তবু পুলিশ শুঁকে শুঁকে তার বাসাতেও হানা দিল। খানাতল্লাশি চলছে, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রাক্‌সকাল, বাবা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন, ওঁর এতদিনের জড়ো করা সংস্কৃত পুঁথির সংগ্রহ তচনচ, মার লক্ষ্মীর পট পর্যন্ত সরিয়ে পেছনের দেয়ালটা পরীক্ষা করা হ'ল, জেরা চলল কত রকমের, শেষ পর্যন্ত জগদীশ হাজতে গেল।

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনের মামলাটা জমেছিল কিন্তু বেশ। সমীর রাজসাক্ষী হ'ল, তার কাছ থেকেই সরকারপক্ষ সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করে কেস সাজালে। আসল ব্যাপারের কাঠামোর ওপর নাটকীয়তার রঙ চড়িয়ে জিনিসটা বেশ রোমহর্ষক হয়ে দাঁড়ালো কিন্তু। এপক্ষেও ছিলেন কলকাতার নামী স্বদেশী ব্যারিস্টার। ফী নিলেন না এক পয়সা, পরপর সাতদিন সওয়াল চালালেন। না চালালেও কিছু ক্ষতি হ'তনা। হাকিমের হুকুম কোন দিকে যাবে সকলে আগে থেকেই অনুমান করে নিয়েছিল।

হৈমন্তীর ফাঁসির হুকুম হল। দু'নম্বর আসামী সদানন্দ (সেই আসল, হুজুর,—সরকারি প্রসিকিউটর বলেছিলেন—সব কিছুর মূলে সেই; এই মেয়েটি নিমিত্ত মাত্র) ফেরার, তার হল যাবজ্জীবন। দশ থেকে সাত বছরের সশ্রম সাজা হ'ল বাকি সকলের—রাজসাক্ষী সমীর বাদে—কেউ ছাড়া পেল না।

হৈমন্তীর ফাঁসি কিন্তু হয়নি। সে হুকুম রদ হয়েছিল। সে ইতিহাসটুকুও বিচিত্র।

সেন্ট্রাল জেল, উঁচু পাঁচীল, কড়াপাহারা। মাছি ঢুকতেও পাশ চাই। তবু সব নজর এড়িয়ে জগদীশের হাতে চিরকুটখানা পৌঁছে গেল।

সদানন্দদার চিঠি। থরথর হাতে সে-চিঠি পড়ল জগদীশ, মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, আবার পড়ল, আবার। সাঙ্কেতিক চিঠি নয়, তবু সব কথার অর্থোদ্ধার হয় না এমন সংক্ষিপ্ত।

দল ভেঙে গেছে, সদানন্দদা ভাঙেননি, গড়ে তুলবেন আবার। ক্রান্তির উদ্যমের বিনষ্টি এত সহজ নয়। এ কাজে হৈমন্তীকে তাঁর পাশে চাই। তিনি জেলের বাইরে অপেক্ষা করে আছেন, সবাইকে ফিরে পাবেন একে একে, কিন্তু হৈমন্তী? নির্ভীক একটি অগ্নিপ্রাণ কি নিঃশব্দ হয়ে যাবে মোমমাখানো একগাছি দড়িতে? আপীল চলছে বটে, কিন্তু জয়ের আশা কম। হৈমন্তীকে বাঁচাতে হবে অন্য কৌশলে। ইংরাজের আইনকে ফাঁকি দিতে হবে আইনের পথে।

সেই পথেরও একটা নির্দেশ দিয়েছেন সদানন্দদা, চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে। এ চিঠির অনুলিপি এতক্ষণে পৌঁছে গেছে সলিটারি সেলে, হৈমন্তীর কাছেও। সদানন্দদা সহায়তা চেয়েছেন জগদীশের। সে অংশটি বারবার পড়ল জগদীশ, যদি কোথাও বুঝতে ভুল হয়ে থাকে, মনের গহনতম ইচ্ছাটি যদি বীভৎসতম রূপ নিয়ে প্রতারণা করে থাকে। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হ'ল, আবার থেমে গেল বুঝি। একজন মানুষ অনায়াসে যে কথা লিখতে পেরেছে, সে-কথা পড়তে গিয়ে আরেকজন কেন-যে বারবার পালাক্রমে আরক্ত আর বিবর্ণ হয়, এটাই আশ্চর্য।

হৈমন্তীও এ-চিঠি পড়ে ফেলেছে এতক্ষণে। কী ভাবছে সে। নিজেকে হৈমন্তীর আসনে বসিয়ে প্রস্তাবটা অনুভব করতে চেষ্টা করল জগদীশ। হৈমন্তী কি রাজি হবে।

সদানন্দদার চিঠি যে-পথে এসেছে, সেই পথেই হৈমন্তীর সঙ্গে দেখা করা অসম্ভব। হ'ল না।

কতো রাত কে-জানে। পৃথিবীর স্পন্দন থেকে অনেক—অনেক যোজন দূরে এই সলিটারি সেল। ক্ষীণতম আলো নেই, ঈষত্তম শব্দও আসেনা কানে। রুদ্ধশ্বাস, স্বেদাক্ত, নীরন্ধ্র সেই অন্ধকারে হৈমন্তীকে চোখে দেখা গেল না, চাপাগলায় একটি প্রশ্নে অস্তিত্বের অনুভব হ'ল শুধু।

'সদানন্দদার চিঠি পেয়েছ।'

'পেয়েছি।'

'তোমার আপত্তি নেই তো।'

'আপত্তি? আমার আপত্তি হৈমন্তী?' জগদীশের গলা কেঁপে গেল, হাত বাড়িয়ে আন্দাজে স্পর্শ করতে চেষ্টা করল সেই অশরীরী, অস্পন্দকণ্ঠ প্রশ্নকারিণীকে। হৈমন্তী ধরা দিল না। জগদীশ বলল, 'আমি শুধু ভাবছি, তুমি কী না জানি মনে করছ।'

'আমি?' হৈমন্তী ধীরস্বরে বলল, 'তুমি জানোনা জগদীশ, দলে যোগ দিয়েছিলাম তখন, তখনি আমার আমি ঘুচে গেছে। তোমার আমার, সকলের। সদানন্দদার হুকুম যখন, পালন করতেই হবে। নইলে আমার এই তুচ্ছ প্রাণটাকে, বাঁচানোর জন্যে এত আয়োজনের কোন মানে হয় না।'

একটু অপেক্ষা করে হৈমন্তী বলল 'আচ্ছা, তুমি আজ যাও। কাল ঠিক এই সময়ে আসবে। আমার এদিককার বন্দোবস্ত আমি করব। তোমার ওদিককার ভার তোমার।'

সেই মুহূর্তে জগদীশের মনে হয়েছিল বজ্রপাত হোক না ঐ কুঠুরিটায়, বিদ্যুতে ঝলসে যাক সব, এক নিমেষের জন্যে তবু তো এই নিষ্ঠুরনিষ্কম্প মেয়েটিকে দে[illegible] নিতে পারবে।

লোহার দরজা বন্ধ হ'ল পেছনে। [illegible] ইয়ার্ডে নেমে জগদীশ প্রাণভরে [illegible] নিলে।

শুধু পরদিন নয়, পরপর [illegible] সেই বিচ্ছিন্ন নিভৃত সেলে [illegible] যেতে হয়েছিল।

অব্যর্থ নিশানায় উইলসন সাহেবকে গুলি করে যে মেয়েটি একদিন দেশশুদ্ধ লোককে হতভম্ব করেছিল, তার আপীলের শুনানীর সময় বিচারক পর্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।

আপীলকারিণীর কৌশুলি তার বক্তৃতা-শেষে বললেন, 'আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, এই ঘটনার পেছনে কোন ষড়যন্ত্র নেই। এ মেয়েটি যা করেছে, অল্পবয়সের উত্তেজনার বশে, ভাবাবেগে। তার জন্যে সে মার্জনা চায়না। যে-শাস্তি তার আইনত প্রাপ্য তা সে মেনে নেবে; প্রাণদণ্ডই যদি এক্ষেত্রে একমাত্র বিধান হয়ে থাকে, তাই হোক। কিন্তু একের অপরাধে অপরের প্রাণহরণের ব্যবস্থা ন্যায়ে নেই, ধর্মে নেই, আইনে নেই, এ কথাটা বিচক্ষণ বিচারকদের ভেবে দেখতে বলি।'

স্পেশাল বেঞ্চের উচ্চমঞ্চে বিচারপতিরা নড়ে বসলেন। আর কে? কার কথা বলছেন কৌশুলি?

কৌশুলি চশমার কাচ পরিষ্কার করে, স্তব্ধ উৎকণ্ঠ কামরার চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর দৃঢ় কিন্তু ধীর কণ্ঠে বললেন, 'আপীলকারিণীর গর্ভস্থ সন্তানের।'

চঞ্চল একটা গুঞ্জন সঞ্চারিত হয়ে গেল মুখ থেকে মুখে, এজলাস থেকে এজলাসে, অলিন্দে সিঁড়িতে, নিচের প্রাঙ্গণে।

বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলছেন আপনি।'

'ঠিকই বলছি।' কৌশুলি উত্তর দিলেন, 'আপীলকারিণী অন্তঃস্বত্ত্বা।'

বিচারপতি সরকারপক্ষের কৌশুলির দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন। কৌশুলি ইতস্তত করলেন একবার, তারপর গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু, আপীলকারিণী তো কুমারী।'

'কুন্তীও কর্ণকে ধারণ করবার সময় তাই ছিলেন। ঈশ্বরপুত্রের মাতা মেরিও।'

সেদিনের মত মামলা মুলতুবী রইল। আদালত ডাক্তারের রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন। রিপোর্ট আসতে আর সন্দেহের অনুমাত্র রইল না।

আপীলের রায় বেরুলো। ফাঁসি মকুব হয়েছে, এবার যাবজ্জীবন। ওর বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছেন, সতর্ক পাহারায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হোক। অথবা জেলখানার রুদ্ধ আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যহানি হতে পারে।

সেই হাসপাতালে হৈমন্তী তিনদিন মাত্র ছিল। চতুর্থদিনে দেখা গেল বেড খালি, আবার খোঁজ-খোঁজ, বরখাস্ত হ'ল দুজন নার্স, একজন সিপাই, কিন্তু হৈমন্তীর নাগাল পাওয়া গেল না। দেশশুদ্ধ লোক তৃতীয়বার চমৎকৃত হ'ল।

জেলে থাকতেই জগদীশ খবর পেয়েছিল হৈমন্তী স্বাবলম্বী একটি প্রতিষ্ঠান গড়েছে, শিল্পশিবির নাম দিয়ে। বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ও ব্যর্থ হয়েছে। ভাঙা দল আর জোড়া লাগেনি। সদানন্দদা নিজেই গ্রেপ্তার হয়েছেন ডিগবয় থেকে গৌহাটি আসবার পথে।

শহর থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে ঢিমে-তেতলা হালকা রেলওয়ের ছোট ইস্টিশন থেকেও দেড় ক্রোশ দূরে শিল্পশিবির। খুঁজে পেতে আসতে জগদীশকে কম বেগ পেতে হ'লনা।

হৈমন্তী খুব খুশি হ'ল ওকে দেখে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল পুরণো সহকর্মীদের খবর। জেল থেকে জগদীশ বেরিয়ে এলো কবে। 'শিল্পশিবির দেখতে এসেছ? কী আছে দেখবার। ঘটি ডোবেনা তালপুকুর। কাজ এখনো ভালো করেই শুরুই করতে পারলুম না। সবে তো এই দুখানা টিনের আটচালা। আর কটি মাত্র সহায়সম্বলহীন মেয়ে। তবু এদের নিয়েই আমি অসম্ভবকে সম্ভব করব জগদীশ। মনের জোর আছে আমার।'

জগদীশ দেখছিল কত বদলেছে হৈমন্তী। সেই শীর্ণশিখা রূপ নেই, বয়স তাকে কমনীয় করেছে। চোখের দৃষ্টিতে এখনো নির্ভীক প্রাণের ঝলক, কিন্তু একটু মেঘমাখাও। একদিন সব কিছু ভাঙতে চেয়েছিল, গড়ে তোলার ব্রতী এবার।

জগদীশ বলল, 'আমি অবাক হয়ে গেছি হৈমন্তী—'

মুক্ত ঠোঁটে আঙুল রেখে হৈমন্তী বলল, 'চুপ। হৈমন্তী নয়। শরৎকুমারী। আমার নামে এখনো পুলিশের পরোয়ানা আছে ভুলো না।'

ছোট এখনো, কিন্তু শিল্পশিবির বড়ো হবে। এই দুটি মাত্র আট চালার ভ্রূণ পুষ্ট হবে, বিস্তৃত হবে; আশে পাশের আরো দশখানা গ্রাম নিয়ে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ কর্মকেন্দ্র গড়ে উঠবে।

আরো নানা কথা হ'ল, কিন্তু যে-কথা জিজ্ঞাসা করতে জগদীশের এতদূর ছুটে আসা, সে-কথা সন্ধ্যার আগে জিজ্ঞাসা করাই হ'ল না।

হৈমন্তী জগদীশকে সঙ্গে নিয়ে ওদের ফার্ম দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, ফিরতে বেলা পড়ে গেল। প্রথম সন্ধ্যাতারার আলোয় শেষ চিলটি তখনো বাসা খুঁজছে, জগদীশ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার ছেলে কই হৈমন্তী।'

হৈমন্তী চমকে উঠল, পাংশু মুখে বলল, 'কিসের?'

ইচ্ছা ছিল না, তবু কণ্ঠ কঠিন হয়ে গেল জগদীশের। বলল, 'মনেও নেই? কাকে নিয়ে তুমি হাসপাতাল ছেড়েছিলে হৈমন্তী?'

সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল জগদীশ, হৈমন্তী মুখ ফিরিয়ে নিল। আস্তে আস্তে আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'সে তো আসেনি জগদীশ।'

'আসেনি?'

'না। পুলিশের ভয়ে তখন পালিয়ে পালিয়ে ফিরছি। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না কেউ, পাশাপাশি পথ চলতে লাগল। শিবিরের ফটকে পৌঁছে হৈমন্তী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ক'দিন থাকছ তো জগদীশ?'

'না। আমি কাল সকালেই ফিরবো।'

'কাল সকালেই?' বিস্মিত সন্ধানী চোখ জগদীশের চোখে রাখল হৈমন্তী: 'কাল' সকালেই কেন। তুমি কি শুধু তোমার ছেলেকেই ফিরে পেতে এসেছিলে জগদীশ।'

জগদীশের জবাব না পেয়ে হৈমন্তী বলল, 'এতকাল ঘানি টানলে, তবু তুমি তেমনি ছেলেমানুষ রয়ে গেছ জগদীশ। ছোট সুখ চাও, ছোট দুঃখে কাতর হও। আমার দিকে তাকিয়ে দেখতো; অপটু হাতে গড়ে তুলছি এই শিল্প-শিবির, এর মধ্যেই সব কিছু পেতে চেষ্টা করেছি। তুমিও কাজে লেগে যাও; এই শিবির তোমার নিজের বলে নাও।'

'তা হয় না' জগদীশ বলল আস্তে আস্তে। 'আমি কাল সকালেই ফিরে যাবো।'

পরদিন সকালে জগদীশের যাওয়া হয়নি। তার পর দিনও না। সপ্তাহ ঘুরে গেল মাস, ঋতু, আকাশঢালা রোদে গা শুকিয়ে শাদা হল বর্ষার মেঘ, সেই মেঘও মিলিয়ে গিয়ে এলো শিশির আশ্বিন, কুয়াসাপৌষ, অভ্রচৈত্র। আশ্চর্য, জগদীশ তখনো রয়ে গেছে।

এতদিন পরে সেসব কথা ভাবতে গেলে অবাক লাগে বৈকি। কি আশা ছিল, কি কামনা, লালন করেছে গোপন মনে। দেহের নিবিড়তম সাহচর্যে যাকে পায়নি, দেহবিযুক্ত মনের কৃশ তপস্যায় তাকে নমনীয় করবে?

শিল্পশিবিরে আটচালা এখন ডজন-খানেক, পাকা বাড়িতে অফিস। কো-অপারেটিভ, ওয়ার্কশপ, শো-রুম। বাঁধানো রাস্তা ইস্টিশান থেকে, সেই রাস্তার পাড় বুনে বুনে এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছে বিদ্যুতী তার। গাড়ি থেকে আর পথের কথা জিজ্ঞাসা করে করে এগোতে হয় না, রেনট্রি গাছের ছায়ায় সাইকেল-রিক্সার ছোকরারা তারস্বরে চেঁচায়: শিল্পশিবিরে যাবেন বাবু? বাঁধা রেট আট আনা।

এত বড় প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জগদীশ। প্রতিষ্ঠাত্রী হৈমন্তী দেবী। শরৎকুমারী নামের আর প্রয়োজন নেই। স্বাধীন দেশে মুক্তিসংগ্রামিকার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহৃত।

ভোর বেলা থেকে জগদীশের কাজ শুরু। হৈমন্তী মেয়েদের ক্লাশ নিচ্ছে, সেই ফাঁকে সাইকেল নিয়ে জগদীশ চক্কর দিয়ে আসে। উঁচু ডাঙ্গার জমিটা রিক্লেইম করা হচ্ছে, সারও দেওয়া হয়েছে, সেচ-ব্যবস্থায় মাটিও সরস, এবারে বীজ পড়লেই ফেটে পড়বে সবুজে সবুজে। শিল্পশিবিরের নিজের প্রয়োজন মিটিয়েও বাইরে ফসল চালান যেতে পারবে।

দশটার সময় ফিরে এসে স্নানাহার, অফিস। ফাইলে মুখ ডুবিয়ে সময় কাটে। পানীয় জলের ব্যবস্থা এখনো ইঁদারা, টিউবওয়েলের সঙ্গে পাম্প বসালে সুবিধে হয় বটে, কিন্তু খরচও ঢের। ট্র্যাক্টর চালানের প্রস্তাব দিয়েছে বিলিতি এক ফার্ম।

হৈমন্তীর সঙ্গেও দেখা হয় বৈকি। শেষ বেলায় হৈমন্তী নিজেই একবার অফিসে আসে, ডাকের চিঠি পড়ে, কি জবাব যাবে নির্দেশ দেয়। পরামর্শও হয়, গত মাসে তাঁতগুলোতে শুধু থানথান কাপড়ই হয়েছে, ধুতি শাড়ি একেবারে না। এ মাসে যে কাপড় তৈরি হবে, তার পাড়ের ডিজাইন হবে কেমন। শিবিরের কর্মীরা শুধু কাজ নিয়েই আছে, কিন্তু শুধু কাজ যন্ত্র করে মানুষকে, ললিতকলাও চাই। মাঝে মাঝে অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়,—গান? থিয়েটার? হয় ভালোই, কিন্তু মঞ্চ কই তেমন। মঞ্চ গড়ার টাকা কই।

কথা থামিয়ে হৈমন্তী বলে, 'তুমি যে কিছুই বলছ না। কি ভাবছ জগদীশ।'

দেয়ালফোকরে একটি চড়ুই পাখীর বাসা বাঁধার আয়োজন দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক জগদীশ বলে, 'কিছু না।'

'তোমার কিছু বলার নেই?'

আছে বৈকি। নিজস্ব পাওয়ার হাউসের একটা ইকনমিক স্কীম কোন ইঞ্জিনিয়রই দিতে পারছে না, ভালো তত্ত্বাবধানের অভাবে কলকাতার সেলস ব্যুরো কেবল লোকসানই দিচ্ছে—এসব কথা বলা হয়ে যাবার পরও আরো অনেক কথা বাকি থাকে। সে-কথা মনে পড়ে নিঃসঙ্গ বিছানায় শুয়ে শুয়ে খোলা জানালায় চাঁদের অস্ত যাওয়া দেখতে দেখতে; ভিজে ভোরে প্রথম আলোর সাড়ায়। বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অছিলায় একটি বিপ্লবী মেয়ের হাত চেপে ধরে পাগলামি করছিল যে, সে একেবারে মরে যায়নি, এ কথাটাই হৈমন্তীকে বলার মাহেন্দ্রক্ষণ আসে না।

কলকাতা থেকে ফিরে এসে হৈমন্তী বলল, 'সদানন্দদাকে দেখে এলাম জগদীশ।'

জগদীশ কলম থামিয়ে মুখ তুলে তাকালো।

'কি চেহারা হয়েছে, চেনা যায় না। উনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না।'

জগদীশ মাথা নীচু করে আবার লিখতে লাগল।

'সেই মানুষ, কি তেজ ছিল একদিন, কোন কিছু পরোয়া করতেন না, এখন যেন অসহায় শিশু। আমার হাত ধরে—'

জগদীশ আবার মাথা তুলে তাকালো।

'আমার হাত ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। সদানন্দদার চোখে জল, ভাবতে পারো।'

'আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলে বুঝি?'

হৈমন্তী মুহূর্তের জন্যে স্থির দৃষ্টি রাখল জগদীশের চোখে।

'এখানে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। এলেন না। নড়া-চড়া ডাক্তারের বারণ। কিন্তু সেইটেই কারণ নয়। আসল কথা এসব গঠনমূলক কাজে ও'র আস্থা এখনো নেই। এসব কাজ ও'র মতে ছেলেখেলা, আসল কাজ ফাঁকি দেওয়া।'

জগদীশ তিক্তস্বরে বলল, 'আসল কাজটা তবে কি।'

'সেইটেই তো বুঝতে পারছেন না। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আলোচনা করতে। কোনো মীমাংসা হল না। একটু সেরে উঠে আবার ডাকবেন।'

'আর তুমি অমনি যাবে ছুটতে ছুটতে?'

'যেতেই হবে। সদানন্দদার চোখ দিয়েই একদিন পৃথিবী চিনেছিলাম, ভুলো না জগদীশ।'

•

শুশ্রূষা-কেন্দ্র খোলা হয়েছে, কিন্তু আবশ্যক সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি নেই। ইনডোরটা একটা তামাসামাত্র। আউট-ডোরের ওষুধও ফুরিয়ে এসেছে। কলকাতা যাওয়া চাই।

এ কাজের জন্যে জগদীশ গেলেও চলত। কিন্তু যাবে হৈমন্তী নিজেই। সন্ধ্যা-বেলা গাড়ি, সকাল থেকে হৈমন্তী সারা শিবির ঘুরলো। ডেয়রী, ফার্মিং, উইভিং, সব বিভাগের প্রতিটি কর্মীর সঙ্গে দেখা করল। তার অনুপস্থিতিতে কাজ কিভাবে চলবে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ দিল।

পৌঁছে দিতে জগদীশ স্টেশনে গেল। ইঞ্জিন জল বদলাবে। মিনিট দশেক সময়। পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসল দুজনে।

'ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমটা কতদূর এগোলো জগদীশ?'

জগদীশ উত্তর দিলে না।

'আর ট্র্যাক্টর? বিলিতি সেই কোম্পানীর জবাব এসেছে? পাওয়ার হাউস প্ল্যানটা এনজিনিয়রদের দিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি করে নাও জগদীশ, আসছে বছরের গোড়া থেকেই যাতে কাজ শুরু হয়। ডেয়রীটা দেখো—ওখানে বড় বেশি চুরি হচ্ছে। আর ফার্মিং, এবারের ফসল ভালো হলে কিষাণদের নতুন কোন ইনসেনটিভ দেওয়া যায় কিনা, সে কথাটা একটু ভেবে দেখো—'

অসহিষ্ণু হয়ে জগদীশ বলে উঠল, 'এত্ত কথা বলছ কেন হৈমন্তী। তোমার ফিরে আসতে তো বড়ো জোর দুদিন কি তিন দিন। তারপর নিজেই তো সব দেখা-শোনা করতে পারবে।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, হৈমন্তী একটু অপেক্ষা করল।

'তোমাকে বলা হয়নি জগদীশ, আমি বোধ হয় আর ফিরব না।'

সেই মুহূর্তে ইঞ্জিন এসে লাগল, ঠোকা খেতে খেতে কামরাগুলি পিছিয়ে গেল কয়েক গজ। সেই শব্দে, জগদীশের মনে হল, ঠিকমত শুনতে পায়নি হৈমন্তীর কথাটা।

'আর ফিরবে না?'

'না। সদানন্দদার চিঠি পেয়েছি কাল। অসুখ আরো বেশি। কাঁপাকাঁপা অক্ষর-গুলো যদি দেখতে। অস্থির হয়ে ডেকেছেন আমাকে। ভাবছি ও'কে নিয়ে আপাতত কোথাও হাওয়া বদলাতে যাবো। সুস্থ করে তুলতেই হবে—এ দায়িত্ব আমার।'

'তারপর?'

'তারপর, কি জানি, অতো পরের হিসাব করিনি। উনি যদি ফিরতে চান, ফিরবো। কিন্তু আমি জানি উনি রাজি হবেন না। ও'র মনটা এখনো অতীতকেই আঁকড়ে ধরে আছে, গুপ্ত রাজনীতিক কাজের মোহ এখনো ঘোচেনি। ও'র কেমন একটা বিশ্বাস, দেশের প্রকৃত মুক্তি এখনো হয়নি।'

'তুমিও অন্ধের মতো ও'র সঙ্গে—'

'কি করি বলো। ও'কে সবাই ছেড়ে গেছে, আমি ছাড়া ও'র আর কে আছে।'

হৈমন্তী ছাড়া আরো একজনের কেউ নেই, কিছু নেই, তার কথা একবারো মনে হল না কেন, জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও চুপ করে গেল জগদীশ। এতদিন বলা হয়নি আজও থাক। উত্তেজিত সুরে শুধু বলল, 'যুক্তি বুদ্ধি সব ভাসিয়ে দেবে?'

হৈমন্তী হাসল। 'যুক্তি-বুদ্ধির ওপরেও একটা জিনিস আছে।'

'কিন্তু এতো ক্ষয়ের পথ।'

'না হয় ক্ষয়ই হবো। ক্ষয়ে তো যাচ্ছি-লামই। ভরেও তো উঠতে পারি।'

মৃদুকণ্ঠে জগদীশ বলল, 'কি করে।'

আরক্তিম শাড়ি পরনে, ঈষৎ অবিন্যস্ত ঘোমটা। এত যত্ন করে হৈমন্তী কোন দিন বুঝি নিজেকে সাজায়নি। মধুর হেসে বলল, 'সব কথা বুঝিয়ে বলা যায় না জগদীশ। তবু একটা কথা স্বীকার করে যাই। শুধু সদানন্দদাকেই বাঁচিয়ে তুলতে যাচ্ছি না, আমার নিজেরও বাঁচবার লোভ আছে, শিল্পশিবির আমাকে সব কিছু দিতে পারেনি।'

সবুজ আলো জ্বলেছিল। জগদীশ তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'শিবির তবে ভেঙে যাবে?'

'কেন তুমি তো রইলে। আমার জন্যে এ ভারটুকু নিতে পারবে না?' হৈমন্তী গলা বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'একদিন একদিন তো আমাকে তুমি ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচিয়েছিলে। মনে নেই?'

ইঞ্জিনে সিটি বাজলো। চলন্ত চাকার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে গেল জগদীশ, ক্লিষ্টস্বরে বলল, 'আছে।' 'কিন্তু আমার গলার ফাঁসি হৈমন্তী?'

গাড়ির গতি বেড়ে গেছে। ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়োয় প্ল্যাটফর্ম কানা। কী জবাব দিল হৈমন্তী, জগদীশ শুনতে পেল না। আদৌ দিল কি না, তাও না।

একটি অনুরোধ

নলিনীকান্ত রায়

নিস্তব্ধ ঝিমানো কোন অলস দুপুরে
ভ্রমরের গুঞ্জনের সুরে
আমার কবিতাখানি পড়ো,
কর্মের মালিন্য যবে তোমার শরীরে হবে জড়ো।

নরম ঘাসের মতো তনুখানি এলাইয়া শীতল পাটিতে,
সময় গড়ায়ে যাবে হাঁটিতে হাঁটিতে
আকাশের শূন্য-নীল বুকে,
আবির মুছিয়ে দেবে বিকেলের আলোর ঝলকে।
কবিতা পড়ার ফাঁকে একবার শুধু মনে করো,
তোমারই কথায় গাঁথা
এ কবিতা,
তোমারই ব্যথায় ধরো ধরো।

তোমারই জীবন দেখি,
তোমারই তো ছবি আঁকি,
আমি কবি ছিঁড়ে ফেলি ভবিষ্যের মায়াবী গুণ্ঠন,
যার নয়নে কাঁপে অনাগত প্রাণের স্পন্দন;
[illegible]দের ভ্রূণেরা ওঠে নড়ে
যার স্পর্শের মধু ঝড়ে।

হয়তো দেখনি মোরে,
আপনার মত কোরে
হয়তো চেন না,
আমার কবিতা পড়ে তবু কি গো ভালো লাগিবে না?
তবু কি গো মনের গভীরে
ভীরু আর ছোট ছোট সুরে
বারেক উঠিবে বলি,—
"তোমার কাব্যের কাছে আপনারে দিব আজ বলি,
দিব আজ প্রাণ আর মন,
আমার যা কিছু আছে করিলাম সব নিবেদন।"

শুধু একবার বলা,
অনন্ত যাত্রার পথে একটুকু শুধু থেমে চলা।
কাজল নয়ন হতে ঝরে-পড়া এক ফোঁটা জল
আমার কাব্যের গায়ে পড়ে যেন করে টলমল।

আর কিছু চাহে না তো কবি,
মুছে যাক দুঃস্বপ্নের আর সব ছবি।

রবীন্দ্র তত্ত্বনাট্যের ভূমিকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

এই পর্যায়ে আলোচিত নাটকগুলিকে তত্ত্ব নাট্য বলা হইয়াছে। যতদূর জানি আগে এ নাম ব্যবহৃত হয় নাই; এখন এ নাম কেন ব্যবহার করিলাম সে বিষয়ে কিছু বলিয়া লওয়া আবশ্যক। এই পর্যায়ের নাটকগুলিকে নানা জনে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। রূপক, সাঙ্কেতিক, প্রতীকী, সমস্যামূলক প্রভৃতি বিচিত্র নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিলেই দেখা যাইবে ইহাদের কোন একটি নামের দ্বারা সমগ্র পর্যায়টির প্রকৃতি বর্ণনা সম্ভব নয়। ইহাদের কোন কোন নাটক রূপক (আংশিক রূপক), কোন কোন নাটক প্রতীকী বা সাঙ্কেতিক এবং কোন নাটককে সমস্যামূলক বলা চলে সত্য, কিন্তু তাহাতে নাটক বিশেষের প্রকৃতিমাত্র প্রকাশ পায় সমগ্র পর্যায়ের প্রকৃতি প্রকাশ পায় না। এই অসুবিধার জন্যেই সমগ্র পর্যায়টির প্রকৃতি প্রকাশ করিতে পারে এমন একটি সামান্য বা সাধারণ নামের অভাব অনুভব করিতে থাকি। 'তত্ত্ব নাট্য' সেই অভাব দূর করিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কোন নাটক রূপক, প্রতীকী বা সমস্যামূলক যেমনি হোক তাহা যে তত্ত্ব প্রধান সন্দেহ নাই। ইহাই এই শ্রেণীর নাটকের সামান্য বা সাধারণ লক্ষণ। প্রকৃতির প্রতিশোধ বা মুক্তধারাতে পার্থক্য যতই হোক দুটির মধ্যেই তত্ত্বের প্রাধান্য অবিসম্বাদী। আবার ফাল্গুনী ও কবির দীক্ষায় পার্থক্য যতই প্রকট হোক—দুয়ের ঘনিষ্ঠতা তত্ত্বের প্রাচুর্যে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বের প্রকটতা ও প্রাচুর্য এইসব নাটকের শ্রেণী লক্ষণ।

আরও একদিক হইতে বিচার চলিতে পারে। মুক্তধারা ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে গল্পসূত্রের মিল আছে, কোন কোন চরিত্রও দুই নাটকে অভিন্ন, তৎসত্ত্বেও নাটক দুটি যে ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ প্রায়শ্চিত্তে কাহিনীর প্রাধান্য আর মুক্তধারায় প্রাধান্য তত্ত্বের। রাজা ও রাণীর রূপান্তর তপতী। কিন্তু তপতীকে তত্ত্ব নাট্য পর্যায়ের মনে করা চলে না, তত্ত্ব ওখানে কাহিনীকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই, যদিচ কাছ ঘেঁষিয়াই গিয়াছে।

এই শ্রেণীর নাটকগুলি পড়িলেই বা অভিনয়-কালে দেখিলেই পাঠক বা দর্শকের মনে এই বোধ জন্মিবে যে কাহিনী এখানে পুরোভাগে স্থাপিত হইলেও প্রাধান্য তাহার নয়, কাহিনীর পশ্চাতে তত্ত্বটি বিরাজ করিতেছে তাহাই মুখ্য, তাহাই প্রধান, শিখণ্ডীর অন্তরালস্থিত অর্জুনের মতো তাহারই নিশিততম বাণটি পাঠকের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এখন তত্ত্বরূপই যদি ইহাদের প্রধান রূপ হয়, তবে সেই প্রাধান্যের দ্বারাই ইহাদের পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে আবার নূতন নামের আমদানী কেন—পুরাতন একটা দিয়া কি কাজ চলিতে পারে না? কেন চলিতে পারে না অংশত আগেই বলিয়াছি। রূপক, সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী কোন নামের দ্বারাই সমগ্রের রূপ প্রকাশ পায় না। সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী বলিতে মুক্তধারা, রক্ত করবী ও রক্তের রাশিকে বুঝায় এমনকি অচলায়তনকে বুঝাইতে পারে—কিন্তু আর কোনটির বেলায় কি ঐ নাম খাটিবে? রূপক বলিতে রাজা ও ডাকঘরকে বুঝাইতে পারে (আমার মতে আংশিক রূপক মাত্র); কিন্তু শারদোৎসব ও প্রকৃতির প্রতিশোধের বেলায় কি হইবে? সমস্যা নাটক ব্যবহারেও ঐরূপ অসম্পূর্ণতা দোষ দেখা দিবে। এইসব বিষয়ে বিচার করিয়াই আমাকে একটি সামান্য নাম অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে—তত্ত্ব নাট্যের চেয়ে যোগ্যতর নাম খুঁজিয়া পাই নাই, নামটি গদ্য গন্ধী হইতে পারে, অতিরিক্ত পরিমাণে বাস্তবঘেঁষা হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র শ্রেণীটির রূপটিকেও প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। 'তত্ত্ব নাট্য' বলিতে তত্ত্বপ্রধান এক শ্রেণীর নাটককে বুঝি, আরও বুঝি যে ইহা কাহিনী প্রধান নাটক হইতে ভিন্ন গোত্রের রচনা, সেই সঙ্গে আরও বুঝি যে এক শ্রেণীর মধ্যে উপশ্রেণীগত প্রভেদ যতই থাকুক না কেন তত্ত্ব নাট্যের বেড়াজালে সমস্ত সূক্ষ্ম প্রভেদই ধরা পড়িবে। কি এবং কি নয় এবং কোন্ কোন্ সূক্ষ্ম প্রভেদ ইহার অন্তর্গত প্রভৃতি অনেক রহস্যই নামটিতে প্রকাশ পায়। এইসব কার্যকারিতাই এই নামটির যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

(২)

পর্ব বিভাগ—

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাট্যগুলিকে তিন পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম পর্বে প্রকৃতির প্রতিশোধ

দ্বিতীয় পর্বে শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা ও ডাকঘর

এবং তৃতীয় পর্বে ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ ও কবির দীক্ষা

প্রথম পর্ব। প্রকৃতির প্রতিশোধের প্রকাশ-কাল ১৮৮৪ সাল, তখন কবির বয়স তেইশ বৎসর।

প্রকৃতির প্রতিশোধ ছাড়া এই পর্বে রচিত আর কোন নাটককে কিম্বা আর কোন রচনাকে তত্ত্ব প্রধান বলা চলে না। বরঞ্চ বিসর্জন, রাজা ও রাণী এবং কাব্য নাট্যগুলি আকৃতি ও প্রকৃতির বিচারে ঠিক তত্ত্ব নাট্যের বিপরীত। এই যুগটাতে রবীন্দ্রনাথ ট্রাজেডিতে, প্রহসনে, ছোট গল্পে ও উপন্যাসে কাহিনী বিন্যাস ও সজীব বাস্তব চরিত্র সৃষ্টিকেই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধে নাটকের যে আকৃতি ও প্রকৃতি দৃষ্ট হয় তাহা নিঃসঙ্গ, তাহার কোন দোসর এ পর্বে মেলে না। এরকম ক্ষেত্রে এই সময়টাকে তত্ত্ব নাট্যের প্রথম পর্ব বলা যায় কিনা সন্দেহ। প্রকৃতির প্রতিশোধ পরবর্তীকালের তত্ত্ব নাট্যসমূহের পূর্বাভাস, নিঃসঙ্গ এই নাটকখানি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা তারকার মতোই আসন্ন তারকারাজির অগ্রদূত। তবু ইহার গুরুত্ব সমধিক এই কারণে যে কবির মতে এই নাটকখানার মধ্যেই তাঁহার জীবনতত্ত্বের বীজ নিহিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতির প্রতিশোধ কবির জীবনতত্ত্ব বীজের চেয়ে অধিক প্রকট নয়। ইহা নাট্যাকারে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছে অনেক পরে—যে সময়টাকে তত্ত্ব নাট্যের দ্বিতীয় পর্ব বলিয়াছি।

দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ১৯০৮ সালে যখন শারদোৎসব নাটক প্রকাশিত হয়, তখন কবির বয়স সাতচল্লিশ বৎসর। এই সময়টা রবীন্দ্র-জীবনে নানা কারণে বিশেষ অর্থপূর্ণ। কবির জীবন ও প্রতিভা তখন মোড় ঘুরিবার মুখে। এটাকে তাঁহার পূর্ণতর বিকাশের প্রস্তুতির সময় বলা যাইতে পারে। নাটকের ক্ষেত্রে দেখি যে তিনি প্রচলিত ধরণের ট্রাজেডি ও প্রহসন লেখা ত্যাগ করিয়াছেন—অথচ তখন তিনি নাট্য রচনার স্বকীয় রীতিটি পুরাপুরি সন্ধান করিয়া পান নাই। যেমন নাট্য বিষয়ে তেমনি রচনার অন্য শাখা সম্বন্ধেও বটে—একই সত্য প্রযোজ্য। ক্ষণিকা ও কল্পনার পালা অনেককাল শেষ হইয়া গিয়াছে—অথচ গীতাঞ্জলি তখনো রচিত হয় নাই, মাঝখানে আছে খেয়া। খেয়ার সঙ্গে নৈবেদ্যকে জড়িত করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় নৈবেদ্যে যে পরিবর্তনের সূচনা খেয়ায় তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—যদিচ এখনো আমরা গীতাঞ্জলি পর্বের দেখা পাই না। নৈবেদ্য কাব্যের আকৃতিটা পূর্বতন রীতির সাক্ষ্য দেয়—প্রকৃতিতে তাহা পরবর্তীকালের সূচক। খেয়া কাব্যের স্বল্পভার, ভূষণ বিরল, সন্ধান্ত ছন্দে ও শিল্পে আসন্ন পরিবর্তনকে অত্যাসন্ন বলিয়া জানাইয়া দেয়। খেয়া কাব্য পূর্বতন ও পরতন আত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্যে খেয়া পারাপার করিতেছে। ঠিক এই সময়টাতে তিনি পুনরায় তত্ত্ব নাট্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

গঠন রীতির বিচারে এগুলি প্রকৃতির প্রতি-শোধের চেয়ে অনেক ঘন পিনদ্ধ, প্রকৃতির প্রতি-শোধে যে তত্ত্ব নীহারিকারূপে অস্পষ্ট ও অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছিল, এখানে তাহা অনেক প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল, আর বিশ্বপ্রকৃতি মানব প্রকৃতির প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বিসর্জন এবং রাজা ও রাণীর মানব প্রকৃতি ও বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার বক্তব্য বুঝিতে পারা যাইবে। শিল্প হিসাবে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি যে লক্ষণ ও ধ[illegible] রাজা, ডাকঘর ও শারদোৎসবেরও প্রায় সেই লক্ষণ ও ধর্ম—এমনকি অচলায়তন নাট্য বিষয় [illegible] স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও তাহাকেও অন্যগুলির সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত করিতে আদৌ বেগ পাইতে

না। সেকালে রবীন্দ্রনাথের যাঁরা বিরূপ সমালোচনা করিতেন, রূপান্তর তাঁহারাও এই সত্যটি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছে খেয়া, গীতাঞ্জলি আর ডাকঘর, রাজা সমান দুর্বোধ্য ঠেকিয়াছিল। কবির জীবনে সহজবোধ্য শিল্পের যুগ চলিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পর্বে পাই অনেক কয়খানি নাটক। ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ ও কবির দীক্ষা। ফাল্গুনীর রচনা কাল ১৯১৬, তখন কবির বয়স পঞ্চান্ন বৎসর।

এই পর্ব সম্বন্ধে তিনটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথম, বলাকা যেমন কবির প্রতিভার মোড় ঘুরিবার আর একটা সময়, ফাল্গুনীও তাহাই। বলাকা ও ফাল্গুনীকে একত্র বিচার করিতে হইবে। যথা স্থানে তাহা করিয়াছি এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাট্যগুলি এই পর্বে লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাট্য কোন্‌খানা সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে মতভেদ হইবে। আমার নিজের ধারণা নাট্য হিসাবে এবং তত্ত্ব নাট্য হিসাবে মুক্তধারাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু এ লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া লাভ নাই।

আর এই পর্ব সম্বন্ধে তৃতীয় সাধারণ লক্ষণ এই যে, এ সময়কার নাটকগুলি মাত্র নয়, কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি প্রায় সমুদায় শ্রেণীর রচনাই তত্ত্ব ভারাক্রান্ত এবং সেই কারণেই অনেক পরিমাণে সূক্ষ্ম শরীরী হইয়া উঠিয়াছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, নাটকে ব্যতিক্রম নটীর পূজা, উপন্যাসে ব্যতিক্রম যোগাযোগ। সচেতন তত্ত্ব শিল্পের স্পর্শ ইহাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারে নাই, পরবর্তী রবীন্দ্র সাহিত্যে এ দুটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। কিন্তু এই জাতীয় ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে যে, এই পর্বের প্রায় সমস্ত রচনাই কেবল নাটক নয়—তত্ত্ব প্রকাশকেই স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কবির তেইশ বৎসর বয়সে প্রকৃতির প্রতিশোধে যাহার সূচনা দেখিয়াছিলাম কবির শেষ জীবনে আসিয়া তাহা যেন সর্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। মাঝখানে অনেক ব্যতিক্রম, অনেক বিপরীত স্বভাবকে তাঁহার অতিক্রম করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতেও সক্ষম হইয়াছে—তাহাও তেমনি সত্য।

৩

এবারে তত্ত্ব নাট্যগুলিতে আলোচিত বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। তাহাতে তত্ত্ব নাট্যের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা, তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মনীষার ব্যাপকতা সম্বন্ধেও একটি ধারণা জন্মিবে—সেই সূত্রে দেখিতে পাইব রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন পর্বে নূতন নূতন সমস্যাকে কিভাবে শিল্পবস্তুতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্বভাবত দুরন্বয় তত্ত্ব ও শিল্পের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টার সার্থকতা বিচারের ফলে তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ দুজনারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তত্ত্ব নাট্যগুলিতে আলোচিত সমস্যাসমূহকে নির্গলিত করিয়া লইলে তিনটি মূল সমস্যায় গিয়া দাঁড়ায়। সে তিনটি বিষয় এই—

(১) মানুষের সহিত ভগবানের সম্পর্ক

(২) মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক

এবং (৩) মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক।

এইসব সমস্যা সবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিষয়ে সকলে একমত হইবেন এমন আশা করা অন্যায়, দৃষ্টির গভীরতা সম্পর্কেও দ্বিমত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান, যেসব ক্ষেত্রে সমাধানের ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন তাহাও কাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে বলি না—কিন্তু একটি প্রসঙ্গে সকলকেই বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় একমত হইতে হইবে, সেটি তাঁহার চিন্তাক্ষেত্রের সর্বময় ব্যাপকতা। প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিনটি সত্তা লইয়াই জগৎ গঠিত, দেখিতেছি যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎও তাহার সমব্যাপক। এই ব্যাপ্তির অসীমতাই, কেবল এ ক্ষেত্রে নয়, সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্র মনীষার প্রধান লক্ষণ। অনেকে বলিতে পারেন যে, ব্যাপ্তিতে ন্যূনতা ঘটিয়া গভীরতায় বাড়িলে আরও ভালো হইত। কিন্তু 'আরও ভালোর' মরীচিকা শিকারে আমাদের আসক্তি নাই, তাহাতে কদাচিৎ সুফল পাওয়া যায়।

তত্ত্ব নাট্যের প্রথম পর্বে একটি মাত্র রচনা আছে—প্রকৃতির প্রতিশোধ। এই রচনাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ সচেতন, তাঁহার এই সচেতনতার উপরে আমরাও জোর দিয়াছি—এবারে তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই অপরিণত রচনাটির মধ্যে, বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতি থাকে সেইভাবে তিনটি তত্ত্বই নিহিত। সমস্তই অপরিণত, সমস্তই অস্পষ্ট এবং খুব সম্ভব সমস্তই কবির অজ্ঞাত, কিন্তু সমস্তই যে বিদ্যমান সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী তত্ত্ব জালের চতুষ্পথের মোড়ে দণ্ডায়মান। সে নিজেকে ভগবানের সহিত, প্রকৃতির সহিত এবং মানুষের সহিত সমসূত্রে রাখিয়া বিচার করিয়াছে। সিদ্ধি-জনিত অহঙ্কারে সে এমনি মত্ত, এমনি অন্ধ যে সে নিজেকে তিনটি সত্তার চেয়েই প্রবলতর কল্পনা করিয়াছে। ভগবদুল্লেখ বিশেষ নাই, করিবার সে আবশ্যকবোধ করে নাই, সে যখন সিদ্ধপুরুষ, তখন সে তো ভগবানের সমকক্ষ, সমকক্ষের উল্লেখ কে কবে করিয়া থাকে। আর প্রকৃতি ও মানব তাহার দ্বারা নির্জিত, নির্জিতের উল্লেখে গৌরব আছে, তাই বারংবার তাহাদের উল্লেখ সে করিয়াছে।

'যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ,
পেয়েছি, পেয়েছি সেই আনন্দ আভাস।'

অর্থাৎ এখন সে মহাদেবের সমকক্ষ।

আর

কি কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসি প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে!

অর্থাৎ এক সময়ে সে প্রকৃতির অধীন ছিল এখন সে স্বাধীন, বুঝি শুধু স্বাধীন নয়, প্রকৃতিই যেন তাহার অধীন।

আর মানুষ সম্বন্ধে—

এ কি ক্ষুদ্র ধরা! এ কি বদ্ধ চারিদিকে,.........
এই কি নগর! এই মহারাজধানী!
চারিদিকে ছোট ছোট গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা'।
কি অসীম অবজ্ঞায়, কি বিবিক্ত অনুকম্পা।

এই তিন তত্ত্বসূত্রের টানাপোড়েনের পরিণা[ম] প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটক। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্বক্ষেত্রে আছে—এখানে শুধু এইটু[কু] বলিবার ইচ্ছা যে, তাহার পরবর্তী সমস্ত তত্ত্ব নাট্যের মূল তত্ত্বগুলি প্রথম তত্ত্ব নাট্য খানিতেই বীজাকারে বর্তমান।

দ্বিতীয় পর্বে চারখানি নাটক পাই, শারদোৎসব রাজা, ডাকঘর ও অচলায়তন। নাটক চারখানাকে যদি তিনভাগে সাজাই তবে দেখিতে পাইব যে ইহাদের মধ্যে মূলতত্ত্বগুলি সবই দেখা দিয়াছে।

শারদোৎসবে মানুষের সহিত প্রকৃতির ও ডাকঘরে মানুষের সহিত ভগবানের এবং অচলায়তনে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের বিচার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

প্রকৃতি মানুষের উদ্দেশ্যে অসীম ঐশ্বর্য অবাধ সম্পদ ঢালিয়া দিতেছে, মানুষকে তাহ[া] কেবল গ্রহণ করিলেই চলিবে না, ত্যাগস্বীকারের দ্বারা, দুঃখ সহনের দ্বারা প্রকৃতির সাপে[র] প্রতিদান দিতে হইবে—এ ঋণশোধের পাল[া] এমনি আনন্দময় যে তাহাতেই শারদোৎসবের প্রাণ। আর এই দান প্রতিদানের সমবায়ে মানু[ষ] ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতর হইয়া একাত্মতর ও পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। ইহাই শারদোৎসব তত্ত্ব নাট্যের নির্গলিত মর্ম।

রাজা ও ডাকঘরে মানবহৃদয়ের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ বিচার। নাটক দুখানিতে যাঁহাকে রাজা বলা হইয়াছে তিনি ভগবান ছাড়া আর কেহ নহেন, আর সুদর্শনা ও অমল স্ব স্ব ক্ষেত্রে মানব হৃদয়ের প্রতিনিধি।

অচলায়তনে আসিয়া রবীন্দ্রনাথকে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এখানে আ[র] মানুষে ভগবানে কিম্বা মানুষে প্রকৃতিতে সম্বন্ধ বিচার নয়—এখানে বিচার মানুষে মানুষে সম্বন্ধের—বিভিন্ন শ্রেণীর জনসঙ্ঘের মধ্যে সঙ্ঘাত এখানে বিচার্য বিষয়। অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সভ্যতার সঙ্কট রচনায় বেদনার যে Last Testament প্রকাশিত হইয়াছে—অচলায়তন নাটকে তাহারই পূর্বসূত্র। আরও আগের কোন রচনাতে এ সূত্রের সন্ধান মিলিলেও মিলিতে পারে—কিন্তু অচলায়তনে তাহা প্রথম স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রথম শিল্পমূর্তি লাভ করিয়াছে। প্রথম বলিলাম এই জন্যে যে পরে এই সমস্যাটিকে আরও ব্যাপকভাবে আরও গভীরভাবে তিনি একাধিক নাট্যরূপ দিয়াছেন। বস্তুত তাহার তৃতীয় পর্বের প্রায় সমস্ত নাটকের এই তত্ত্বটিই মূল উপজীব্য। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বর্তমান যুগে মানুষে মানুষে সঙ্ঘাতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সভ্যতায় সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যাটি বা এই সমস্যাটির বিশেষ এই রূপটি কবিকে তাঁহার শেষ জীবনে সব চেয়ে ব্যথিত সব চেয়ে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। কবিতায় প্রবন্ধে এবং নাট্যাকারে এই বেদনা ও সম্বেদন তিনি বারংবার প্রকাশ করিয়াছেন। মুক্তধারা রক্তকরবী, কালের যাত্রা, কবির দীক্ষা, তাসের দেশ সমস্তই এই তত্ত্বের বাণী বেদনামূর্তি। ফাল্গু

নাটকখানাতেও অংশত এই তত্ত্ব—কিন্তু আরও কিছু আছে—সেই আরও কিছুর জন্যই তাহার স্থান একটু বিচিত্র।

ফাল্গুনীতে কবির ব্যক্তিগত যৌবন, (ভূমিকায় কথিত ইক্ষাকু বংশীয় রাজার যৌবন) প্রকৃতির যৌবন (গীতি ভূমিকায় কথিত) এবং মানব সমাজের যৌবন (মূল নাটকে কথিত)—এই তিন যৌবনের সমস্যা জড়িত। অর্থাৎ এই নাটকে কবি ব্যক্তি, প্রকৃতি ও মানব সমাজ এক সমস্যার গ্রন্থিতে যুক্ত। কালে কালে লোকে লোকান্তরে যৌবনের জয়—ফাল্গুনী গীতি নাট্যের বিষয়। রূপান্তরে ইহাই অচলায়তন ও তাসের দেশেরও ভাব উপজীব্য। অচলায়তনে অন্য দেশাগত শোণ পাংশু বা যূণক (যুবক) জাতির আঘাতে অচলায়তনে ধ্বংস হইয়াছে। তাসের দেশে অন্য দ্বীপাগত যুবক রাজপুত্রের প্রভাবে তাসের দেশের জড়বৎ নরনারী মানবীয় যৌবনে জাগিয়া উঠিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। ফাল্গুনীতে যাহা সাধারণভাবে কথিত অচলায়তনে ও তাসের দেশে তাহা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—ফাল্গুনীতে জয় যৌবনের—আর অন্য দুইখানি নাটকে জয় যুবক জাতির, যুবক রাজপুত্রের। ইহা ঠিক সভ্যতার সঙ্কট নয়, কিন্তু তাহারই প্রায় ধার-ঘেঁষা, মানুষের যৌবনের সংকট, তিনখানিতেই মানুষের যৌবনের জয় ঘোষিত হইয়াছে।

মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা সভ্যতার সংঘর্ষ বা সভ্যতার সঙ্কট বিষয়ক নাটক। শেষের দু'খানা নাটক হিসাবে অকিঞ্চিৎকর হইলেও মূলভাবের বাহন হিসাবে বিশেষভাবে বিচার্য। ইহাদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ করা চলে। মুক্তধারা ও রক্তকরবী একত্র বিচার্য, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা সগোত্র। প্রথম দু'খানিতে সভ্যতার সংকটের বিশেষ একটা দিক চিত্রিত, শেষের দু'খানিতে সভ্যতার সংকটের সাধারণ চিত্র।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে সভ্যতার সংকট দৃষ্ট হইতেছে তাহার মূলগত কারণ যন্ত্রবাদের অতিচার ও অতিপ্রসার। যন্ত্রজাত সভ্যতা মানব জীবনের মুক্তধারাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, মানবের স্বরূপকে জটিল জালের আড়ালে ফেলিয়া তাহাকে খণ্ডিত ও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এখন মুক্তধারাকে নির্বাধ করিবার উপায় কি? খণ্ডিত ও বিকৃত মানুষকে জালের রাহুকবল হইতে উদ্ধারের উপায় কি? অভিজিৎ ও রঞ্জন সেই উপায় দেখাইয়া দিয়াছে। যন্ত্রকে প্রাণের দ্বারা আঘাত করিয়া প্রাণের বিনিময়ে মুক্তধারাকে ও মানুষকে মুক্তিদান করিতে হইবে। যন্ত্রকে বৃহত্তর যন্ত্রের দ্বারা আঘাত করিলে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রেরই জয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপ এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাই যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যন্ত্র ধ্বংস না হইয়া কেবলি আপন শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, অস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অস্ত্রের ধ্বংসকারিতা কেবলি বাড়িয়াই চলিয়াছে, মানুষের মুক্তির উপায় আর চোখে পড়িতেছে না। ইহা মুক্তির পথ নহে।

রবীন্দ্রনাথ যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র। রাবণের প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন রাম, যন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী তেমনি প্রাণ। তাহাতে প্রাণের আপাত বিনাশ হইলেও যন্ত্রের যে সমূলে বিনাশ তাহাতে সন্দেহ নাই। অভিজিৎ মরিয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তধারাও তেমনি মুক্তিলাভ করিয়াছে। রঞ্জন মরিয়াছে বটে কিন্তু রাজাও তেমনি জালায়ন হইতে উদ্ধার পাইয়াছে বটে। যন্ত্র বনাম প্রাণ—ইহাই রবীন্দ্রনাথের সমাধান। এখানে গান্ধীজীর আদর্শের সহিত রবীন্দ্রনাথের আদর্শের সাম্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যাহা রক্তকরবী, গান্ধীজীর ক্ষেত্রে তাহাই চরখা—দুই-ই Symbol বা প্রতীক, দুর্জয় যন্ত্রের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অজেয় মানব শক্তির প্রতীক। ইঁহারা আপাত প্রচণ্ড শক্তিমানের বিরুদ্ধে দৃশ্যত দুর্বলকে উপস্থাপিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, যেমন করেন নাই আদি কবি বাল্মীকি রাবণের সম্মুখে রামকে উপস্থিত করিতে।

মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে সভ্যতার বর্তমান সংকটের সমাধান আছে এমন মনে করিবার কারণ নাই, সভ্যতার যন্ত্রজাত সংকটই প্রদর্শিত হইয়াছে—আর প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার মুক্তির পথটা। কবি বলিতে চাহিয়াছেন মুক্তি যখনই আসুক, যেভাবেই আসুক—ঐ প্রাণের পথেই আসিবে, বৃহত্তর যন্ত্রের পথে নয়, প্রচণ্ডতর অস্ত্রের পথে নয়। তাঁহার মতে শেষ পর্যন্ত প্রাণেরই জয় ঘোষিত হইবে, অচলায়তনে, ফাল্গুনীতে ও তাসের দেশে যেমন যৌবনের জয় ঘোষিত হইয়াছে। এসব স্থানে যৌবন ও প্রাণ মূলত সমার্থক। যাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া প্রাণের জয় ঘোষিত হইয়াছে তাহারা সকলেই যুবক, পঞ্চক (অচলায়তন) রাজপুত্র (তাসের দেশ) জীবন সর্দার (ফাল্গুনী) অভিজিৎ (মুক্তধারা) এবং রঞ্জন (রক্তকরবী) সকলেই যুবক। জলের সঙ্গে জলের ফেনার যে সম্পর্ক, প্রাণের সঙ্গে যৌবনের সেই সম্পর্ক—যৌবন প্রাণবন্যার ফেনা।

কালের যাত্রার রথ ইতিহাস আর যে রজ্জুর টানে ইতিহাস চলে তাহা রথের দড়িটা। এতদিন ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও ধনিকদের টানে রথ চলিয়াছে—কিন্তু এখন আর সে টান যথেষ্ট নয়—রথ আর চলিতেছে না—এবারে শ্রমিকের টান আবশ্যক। এ তো স্পষ্টত যুগসমস্যা। কিন্তু শ্রমিক যদি ভাবিয়া বসে যে রথ চালাইবার ভার একমাত্র তাহারই উপরে—তবে রথ আবার অচল হইয়া পড়িবে। এই শেষেরটুকুই কবির সতর্ক বাণী, যদিচ কেহ শুনিবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

কবির দীক্ষায় ইউরোপ ও ভারতের অবস্থা বৈষম্যে তাহাদের ভাববৈষম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ইউরোপ অর্জন করিতেই জানে ত্যাগ করিতে জানে না, ভারত ত্যাগ করিতে চায় বটে; কিন্তু যে উপার্জন করে নাই সে ত্যাগ করিবে কি? এখন এই ঐতিহাসিক হেরফের ঘুচাইবার উপায়, কবির মতে—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' : এই বাণী। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে যদি হয়, তবে ভারতকে প্রথমে ঐশ্বর্য উৎপাদনের দীক্ষা লইতে হইবে, দরিদ্রের আবার ত্যাগ কোথায়—আর ইউরোপকে ত্যাগের দীক্ষা লইতে হইবে, কেন না, তাহার সঞ্চিত ধন মুক্তির পথ পাইতেছে না বলিয়া—ক্রমেই অধিকতর গুরুভার হইয়া তাহার অস্তিত্বকে নিষ্পেষিত করিতেছে—ইউরোপের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত সেই আর্তনাদ মানুষের ইতিহাসকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। কবির দীক্ষা এই যে, ইউরোপ ও ভারত ভোগ ও ত্যাগের হেরফের ঘুচাইয়া—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' —এই ব্রতবাণী গ্রহণ করুক।

৪

এখানে একটা বিষয়ের আলোচনা সারিয়া লওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এডওয়ার্ড টমসন লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থের শেষাংশে একজন বাঙালী সমালোচকের একখানি পত্র উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। ১

এই অজ্ঞাত সমালোচক তাঁহার সমগোত্রীয় রসবোদ্ধাদের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি সাজিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্র সাহিত্যের সহিত ভারতীয় সাহিত্যের নাড়ির যোগ নাই, এমনকি ভাষাটাও বাঙালীর দুর্বোধ্য—তাঁহার মতে রবীন্দ্র সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়। ২

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে এই অভিযোগ কতদূর সত্য?

রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে একটা সময় ছিল যখন এই শ্রেণীর রসবোদ্ধাগণ কবি বা সাহিত্যিক কিছুই নয় বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। এ পর্ব কিছুকাল চলিয়াছিল। তারপর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ফলে রবীন্দ্রনাথের যখন জগৎজোড়া খ্যাতি—তখন তাহারা সুর বদল করিল। কবি বা সাহিত্যিক নয় একথা বলিতে তখন তাহাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বাধিত—কাজেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির দল নূতন যুক্তির অবতারণা করিল—রবীন্দ্র-সাহিত্য অভারতীয়, দেশের প্রাণবস্তুর (?

---

1 Appendix A. P 315-316, Rabindrana[illegible] Poet and Dramatist by Edward Thom[illegible]son, 2nd Ed. 1948.

এই প্রসঙ্গে একটা ঋণ স্বীকার করা কর্তব্[illegible] মনে করি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভারতীয় [illegible] বিদেশীয় ভাষায় যতগুলি বই লিখিত হইয়াছে[illegible] তন্মধ্যে বর্তমান বইখানাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ম[illegible] করিলে অন্যায় হইবে না। একথা এখানে [illegible] বলিলেও চলিত—কিন্তু টমসনের বই প্রথ[illegible] প্রকাশের সময়ে বাঙালী পাঠক সমাজ ইহাকে[illegible] সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা করে নাই, [illegible] বিপরী[illegible] মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছিল। কেন, জানি না[illegible] আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী, স্বভাষাভা[illegible] হইয়াও যাহা পারিলাম না, একজন বিদে[illegible] তাহাই করিল—এই সূক্ষ্ম ঈর্ষাবোধবশতঃই কি[illegible] প্রথম অভিনন্দনের কাল বহুদিন গত, স[illegible] কিন্তু বিলম্বিত অভিনন্দনের কাল কখনো [illegible] না। এতদিন পরে, প্রথম সুযোগে সেই বিলম্বি[illegible] অভিনন্দন সারিয়া লইলাম।

২ ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সংস্কারের দ্বা[illegible] সমালোচনা যে কতদূর রঞ্জিত হইতে পারে[illegible] পত্রখানা তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লেখকে[illegible] নামটি জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করা যায় [illegible]

সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাড়ির যোগ নাই—এই হইল রবীন্দ্রবিদ্বেষণার পরবর্তী স্তর। টমসন উল্লিখিত পত্রখানি সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি।

রবীন্দ্রসাহিত্য কি সত্যই অভারতীয়, সত্যই দেশের শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে তাহার নাড়ির যোগ নাই? বিচারে নামিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মতোই রবীন্দ্রসাহিত্য একান্তভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে ভারতীয় জীবন হইতে উদ্ভূত, ভারতের সভ্যতার সঙ্গে জড়িত—এবং ঠিক সেই কারণেই বিশ্বের আদরণীয় বস্তু। বর্তমান ক্ষেত্রে সম্যক্ রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারের অবকাশ নাই, কেবল তত্ত্বনাট্য-গুলিরই বিচার চলিতে পারে। তাহাই করিব, আর দেখাইতে চেষ্টা করিব যে আপাতঃ অভারতীয়ত্ব সত্তেও রবীন্দ্র তত্ত্বনাট্যগুলির মূল তত্ত্বসমূহ অভারতীয় তো নয়ই বরঞ্চ একান্তভাবে ভারতীয়। দেশের মর্মবাণী মহাকাব-গণকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়—ক্ষুদ্র গোষ্ঠী-চারী সমালোচক তাহা মানিবে কি প্রকারে?

৫

প্রথমে নাটকগুলির আকৃতি ও প্রকৃতির বিচারে নামা যাইতে পারে, পরে প্রয়োজন হইলে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যাইতে পারিবে। প্রথমে প্রকৃতির কথাই ধরা যাক।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে বলিয়াছেন যে, 'সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালাই' তাঁহার সমস্ত রচনার মূল কথা। একথা প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এখন এই পালাটি কেবল রবীন্দ্র-সাহিত্যের নয়—ভারতীয় সাধনারও মূল কথা। ভারতের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে এই বাণীটি জড়িত, ঋগ্বেদ হইতে শুরু করিয়া উপনিষদের ধারা বাহিয়া এই বাণী গীতা, চণ্ডী এবং মধ্য-যুগের সাধকগণের রচনা পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদ তন্মধ্যে আবার ঈশোপনিষদ রবীন্দ্র-নাথের সবচেয়ে প্রিয়। ঈশোপনিষদের যে-কোন পাতা উল্টাইলেই এই বাণীবহ শ্লোক পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতেই ইঙ্গিতটি পাইয়াছেন এবং নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা, প্রতিভার দ্বারা, তাহাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছেন—পুরাণী প্রজ্ঞাকে আধুনিক জীবনের গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ এই বাণীরই শিল্প-রূপ। ইহার রহস্য সন্ধানের জন্য ভারতের বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর ভ্রমটা কি? সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে ব্রহ্ম সংসারাতীত নহেন, তিনি দূরেও আছেন, নিকটেও আছেন, তিনি অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন—তিনি সর্বত্রব্যাপী, সর্বত্রকে অতিক্রম করিয়া কোথাও দূরাহিত হইয়া নাই।৩

"যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে, আর যাহারা কেবল দেবতা চিন্তায় নিরত থাকে তাহারা তদপেক্ষাও অধিক অন্ধতমে প্রবেশ করে।"৪ সন্ন্যাসী কি তাই করে নাই? রবীন্দ্রনাথের মতে উক্ত নাটকের প্রাকৃত নরনারীর চেয়ে সন্ন্যাসীর ভ্রম অধিক মারাত্মক। বিদ্যা ও অবিদ্যা (ব্রহ্ম ও জগৎ), সম্ভূতি ও অসম্ভূতির (প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভাদি) উপাসনা একত্র করিবার বুদ্ধি সন্ন্যাসীর হয় নাই বলিয়াই প্রকৃতি অবশেষে তাহার উপরে প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইয়াছিল।৫ যে হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত, সাধনার দ্বারা সন্ন্যাসী তাহা খুলিবার চেষ্টা করে নাই। বেচারা ঐ হিরণ্ময় মুখাবরণে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিয়াছিল যে তাহার সত্যদর্শন ঘটিয়াছে।৬ এই মৌলিক ভ্রম হইতেই সন্ন্যাসীর সাধনার ব্যর্থতা। ইহার মধ্যে কোথায় অভারতীয়ত্ব? ইহা তো ভারতীয় সাধনার মূল কথা।

এবারে শারদোৎসবে আসা যাক। শারদোৎ-সবের মূল কথা প্রেমের দ্বারা প্রকৃতির ঋণ শোধের চেষ্টা। এই কারণেই শারদোৎসবের পরবর্তী সংস্করণের নাম ঋণ শোধ। আমাদের শাস্ত্রে দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ শোধের উল্লেখ আছে। প্রকৃতির ঋণ শোধের উল্লেখ অবশ্য নাই। কিন্তু স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ কল্পিত প্রকৃতির ঋণ শোধের মূলে ঐ পুরাতন ঋণ শোধের ভাবটাই সক্রিয়। প্রকৃতিকে মানুষের জীবনধারণের জন উপকরণ-রূপে ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু উপকরণরূপে ব্যবহার করিবার সময়েও যদি আমরা সচেতনভাবে করি, কৃতজ্ঞতার ভাব অনুভব করি—তাহা হইলেই ঋণ শোধ হয়। এই ভাবটি আমাদের লোকজীবনে প্রবেশ করিয়া গিয়াছে। এখনো দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাঠুরিয়াগণ কোন গাছ কাটিবার আগে কুড়াল তুলিবার পূর্বে বৃক্ষটির উদ্দেশে তিনবার সেলাম করিয়া লয়। সে ঐ ঋণ শোধের অঙ্গ। তাহারা যেন বলিতে চায়—তোমার কাষ্ঠ ব্যতীত আমার জীবনধারণ অসম্ভব, কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ নহি, তুমি যে কাষ্ঠ দান করিতেছ, আমি তজ্জন্য তোমাকে অভিবাদন জানাইতেছি। কাজেই কি শাস্ত্র, কি লোকব্যবহার সর্বত্র—ঋণ শোধের ভাবটি পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবটিকেই অপরূপ কলা কবিত্বময়, আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে পূর্ণ শিল্পবস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। ইহার রহস্যের মূল এই দেশেই আছে—অনত্র যাইবার প্রয়োজন নাই।

এবারে রাজা। ইহাতে দাস্য, সখ্য ও মধুর-ভাবে রাজাকে ভজনার যে ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কি বিশেষভাবেই এদেশের কথা নহে? রাজা যিনি অরূপরতন (রাজার পরবর্তী সংস্করণের নাম অরূপরতন), যিনি একাধারে বীতরূপ ও সর্বরূপ—তিনি তো বিশেষভাবেই ভারতীয় ধর্মসাধনার লক্ষ্য। প্রকৃতির প্রতি শোধের সন্ন্যাসী যে ভুল করিয়াছিল, রা সুদর্শনাও সেই রকম ভুলই করিয়াছিল। এ দুজনের ভুল দুই ভিন্ন পথে আসিয়াছে সন্ন্যাসী জগৎকে বাদ দিয়া ব্রহ্মকে নির্বিশে রূপে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল আর সুদর্শ নির্বিশেষকে বাদ দিয়া রাজাকে বিশিষ্ট মা মূর্তিতে দেখিতে চাহিয়াছিল। রাণী কেবল অবিদ্যার বা অসম্ভূতির সাধনা করিয়াছিল এ সন্ন্যাসী কেবলমাত্র বিদ্যার বা সম্ভূতির সা করিয়াছিল। এ দুই ভুলের মধ্যে সন্ন্যাস ভুলটাই বেশি মারাত্মক। সেই জন্যই দেখি পাই যে, সন্ন্যাসীর জীবন ট্রাজেডিতে প সমাপ্ত হইল আর রাণী দুঃখ সাধনার অ লক্ষ্যে পৌঁছিতে সিদ্ধকাম হইয়াছিল।

অতঃপর ডাকঘর। ডাকঘরে অমল ও মা দত্তের সম্পর্কটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হ হইবে। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক, কি একজনের মুখ বিশ্বের দিকে আর একজ মুখ গৃহের দিকে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনা 'দুই পাখী' শীর্ষক কবিতাটি স্মরণযো বনের পাখী ও খাঁচার পাখীর মধ্যে সম্প প্রেমের—কিন্তু কেহ কাহাকেও বুঝিতে প না। অমল ও মাধব দত্তের মধ্যেও কি সেই সম্প নয়? পাখী দুটি এবং অমল ও মাধব দ বিচিত্র সম্পর্কের মূলে একটি প্রাচীন শাস্ ইঙ্গিত আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

"দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবল করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহারা সর্বত্র থাকেন উভয় পরস্পরের সখা। তন্মধ্যে এ সুখেতে ফল ভোজন করেন এবং অন্য নি থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।"৭

অবশ্য এ দুটি পাখীর একটি জী অপরটি পরমাত্মা। অমল ও মাধব দত্ত সম্প সে কথা প্রযোজ্য নয়। সে সম্বন্ধ আলো প্রয়োজনও নাই। আমার বক্তব্য এই যে শ যে অর্থেই এ শ্লোকটি কথিত হইয়া থাক পরস্পর সখাভাবে বদ্ধ পাখী দুটির চিত্র এ ও মাধব দত্তের চিত্র অঙ্কনে খুব সম্ভব রব নাথকে সাহায্য করিয়াছিল। দুজনে একই অবস্থিত, দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক, একজন উদাসীন, অপরজন আসক্ত—এসব মনে রাখিলে আমার এই কল্পনাকে অলী একেবারে অবাস্তব বলিয়া মনে হইবে না। এই সম্পর্কটির চিত্র বিশ্লেষণই তো ডাক নাটকীয় রস। অতএব দেখা যাইতেছে, এখ আমরা দেশের সাধন পন্থার উপরেই আছি— যাইবার প্রয়োজন হয় নাই।

এবারে অচলায়তন নাটকে আসা যাইতে প এই নাটকখানাতেও দেখিতে পাইব যে, ভার সাধন পন্থার কথাই উক্ত হইয়াছে। অচলায়ত দের পন্থা জ্ঞানমার্গ, শোণ পাংশুদের কর্মমার্গ আর দর্ভক পল্লীবাসীদের পন্থা মার্গ। এই তিন ভিন্ন মার্গের মধ্যে সম চেষ্টা হইয়াছে অচলায়তন নাটকে। আর

---

৩ ঈশোপনিষদে শ্লোক সংখ্যা ১॥৫॥

মূল নির্দেশের জন্য লেখক শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর নিকট ঋণী।

৪ তদেব শ্লোক সংখ্যা ৯॥

৫ তদেব শ্লোক সংখ্যা ১১॥১২॥১৪॥

৬ তদেব শ্লোক সংখ্যা ১৫॥

৭ ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০; মুণ্ড ৩। শ্বেতা ৪।৬

তিনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা কি ভারতীয় সাধনারও চরম কথা নয়? তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, শাস্ত্রে যাহা সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেখানে কবি ও মনীষী হিসাবে তাহার কৃতিত্ব। কিন্তু মূল ভাবটি তিনি প্রাচীন শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। এখন এসব কথা চিন্তা না করিয়া রবীন্দ্র সাহিত্যের সহিত ভারতীয় সাধনার বা ভারতীয় জীবনের যোগ নাই, এসব অশ্রদ্ধেয় প্রলাপ উচ্চারণ চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।

সত্য বটে ফাল্গুনী নাটকের মূলে কোন প্রাচীন শাস্ত্রীয় নজির নাই। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক নাটকটি কবির ব্যক্তিগত জীবনবেদনা হইতে উদ্ভূত। একদিকে এই বেদনার সাক্ষ্য—অন্যদিকে প্রকৃতির সাক্ষ্য। ঋতু পরম্পরার মধ্য দিয়া অনন্ত যৌবনের যে লীলা বিশ্বে নিত্য প্রত্যক্ষ, যে লীলার নজিরে মানবের সমষ্টিগত যৌবনকেও কবি নিত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন তাহাই ফাল্গুনী নাটকের উপজীব্যের মূলে। ভারতীয় শাস্ত্রের পরিবর্তে বিশ্ব প্রকৃতির শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কবি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। যৌবনবেদনাজাত আরও একটি নাটক আছে—তাসের দেশ। ইহার মূলে শাস্ত্রের ইঙ্গিত নাই বটে. তবে জীবনের ইঙ্গিত আছে। তাহা ছাড়া অচলায়তনে যেমন যৌবনের দূত বিদেশী শোণ পাংশুগণ, এখানে তেমনি যৌবনের দূত দ্বীপান্তর হইতে আগত রাজপুত্র। এ দুটি ঘটনার মূলেই ঐতিহাসিক একটি ঘটনার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। বিদেশী ইংরেজ আমাদের স্থবির দেশে আসিয়া যে বিরাট বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়াছে খুব সম্ভব প্রত্যক্ষভাবে সে ভাবটি কবির মনে কাজ করিতেছিল। তাহা যদি হয় তবে বুঝিতে হইবে অচলায়তন ও তাসের দেশের পরিবর্তন বুঝিবার জন্য কবিকে অন্যত্র যাইতে হয় নাই—দেশে বসিয়াই লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন।

যে নাটকগুলিকে সভ্যতার সঙ্কট সম্পর্কিত বলিয়াছি তাহাদের বিষয়ে বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতীয়, তেমনি তিনি স্বকালীয়ও বটেন। ভারতের প্রাচীন বাণী তাঁহার প্রতিভায় যেমন নূতন জীবন পাইয়াছে, তেমনি তাঁহার স্বকালের অনেক জীবন সমস্যাও তাঁহার প্রতিভায় আশ্রয় খুঁজিয়াছে। বর্তমানে সভ্যতায় যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে ঠিক এমনটি এভাবে প্রাচীনকালে দেখা দেয় নাই। এ সমস্যা বিশেষভাবে এ কালেরই, আর যেহেতু তিনি বিশেষভাবে এই কালের লোক—তাঁহাকে এ সমস্যা সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইয়াছে, চিন্তার ফলকে একদিকে যেমন প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন—আর একদিকে তাহাকে তেমনি বাণীমূর্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই বাণীমূর্তিগুলিই এক্ষেত্রে সভ্যতার সঙ্কট সম্পর্কিত নাটক, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা।

মহাকবি মাত্রকেই স্বকাল সম্বন্ধে, স্বকালের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়, আর স্বকালের উপাদানে তাঁহারা চিরকালের মূর্তি গড়িয়া রাখিয়া যান। হোমার হইতে সেক্সপীয়র্ গেটে পর্যন্ত, ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেহই এ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতের প্রাচীন বাণীকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন, তেমনি বর্তমান জীবনের নূতন বাণীকেও চিরকালীন ছাঁচে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। তাঁহার উপরে স্বকালের যে দাবী আছে তাহাকে স্বীকার করিয়াছেন মাত্র। এই শ্রেণীর নাটকগুলিতে যদি বিরুদ্ধ সমালোচকগণ প্রাচীন বাণী খুঁজিয়া না পান, তবে তাহা দোষ নহে, গুণ, বরঞ্চ ইহার বিপরীত ঘটিলেই দোষ হইতে পারিত, স্বকালের দাবীকে অবহেলায় মহৎ দোষ। তবু ভারতীয় বাণীর যে একেবারে অভাব আছে এমন নয়। কবির দীক্ষায় ইউরোপ ও ভারতের স্বভাবের হেরফের ঘুচাইবার নিমিত্ত প্রতিকারের যে উপায়ের কবি নির্দেশ করিয়াছেন —'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—তাহা একান্তভাবেই ভারতীয়, বোধকরি এই বাণীটি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়।

প্রাচীন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে এমন কোন সমালোচক উদ্যত হইলে রবীন্দ্রসাহিত্য ও প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের মধ্যে আরও গভীর, আরও নিবিড় যোগ আবিষ্কার করিতে পারিবেন। কিন্তু এখানে যতটুকু বলা হইল তাহাতেই নিশ্চয় প্রমাণ হইয়াছে যে, রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয়তার নাড়ির যোগ নাই—এই দায়িত্বহীন উক্তি যেমন অবাস্তব, তেমনি অশ্রদ্ধেয়।

৬

এবারে নাটকগুলির আকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে, তাহাতেও দেখা যাইবে যে, তাঁহার নাটকগুলির, অন্তত তত্ত্বনাট্যগুলির টেকনিকের মূলে কোন বিদেশীয় নাটকের আদর্শ নাই, আছে দেশীয় লোকজীবনের Pattern বা কাঠামোর আদর্শ। গোড়া হইতেই সেই আদর্শকে তিনি অনুসরণ করিতে ও আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—আর অপ্রত্যাশিতরূপে সাফল্যলাভও করিয়াছেন।

প্রকৃতির প্রতিশোধ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম যে, এই নাটকখানিতেই কবির নিজস্ব নাটকীয় টেকনিক প্রথমে নিঃসংশয়রূপে দেখা দিয়াছে। সেটি কি? নাটকখানির অধিকাংশ দৃশ্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—এগুলি একটি পথ ও বিচিত্র জনসমাবেশের সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নহে। তাঁহার পরবর্তী তত্ত্বনাট্যসমূহ এই দুটি বস্তুকেই ক্রমে অধিকতর বাস্তব, অধিকতর সুষ্ঠু ও শিল্পসম্মত রূপে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত যে Pattern বা কাঠামোয় তিনি উপনীত হইয়াছেন তাহা একটি মেলা ও মেলাটির নিকটবর্তী একটি পথ। এটাই তাঁহার আদর্শ। তবে প্রয়োজন ও অবস্থা ভেদে ইহার সামান্য তারতম্য ঘটিয়াছে।[৮]

প্রকৃতির প্রতিশোধের পরে অনেক দিন তিনি তত্ত্বনাট্য লেখেন নাই। এই সময়টায় বি[...] রাজা রাণী এবং গান্ধারীর আ[...] চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি কাব্যনাট্য লিখিত হয়। এ[...] সেক্সপীরীয় ধরণের ট্রাজেডি নয়, কাব্য[...] নাটক, কাজেই এখানে পূর্বোক্ত টেকনিক প্রক[...] স্বাধীনতা তাঁহার ছিল না। শারদোৎসব ন[...] পুনরায় তত্ত্বনাট্যের ধারা দেখা দেয় এবং পূর্বোক্ত টেকনিকও দেখা দিতে থাকে।

শারদোৎসব নাটকের ঘটনাস্থান বেত[...] নদীর তীর ও নদীর তীরবর্তী পথ।

রাজা নাটকের অনেকটা জায়গা জুড়িয়াই এবং সেই পথ গিয়াছে বসন্তোৎসবের [...] দিকে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে অন্ধকার [...] আর শেষ দৃশ্যে একটি পথ, যে পথে [...] সুদর্শনাকে বাহির করিয়াছেন। শুধু রাণ[...] কবি নিজেও ঐ পথে বাহির হইয়াছেন; [...] বরণ করিয়াছে পথিকে রাজার সহিত মিত্র[...] সূত্ররূপে, কবি বরণ করিয়াছেন পথকে ত[...] চরম টেকনিকরূপে।

ডাকঘরে দেখি অমলের রোগশয্যা [...] বাতায়নের ধারে তাহার সম্মুখে একটি প[...] ঐ পথেই নাটকের অধিকাংশ ঘটনা ঘটিয়া[...]

অচলায়তনেও এই পথের প্রাধান্য। [...] দৃশ্যটি পথের দৃশ্য, পঞ্চকের মুখের [...] গানটি 'এ পথ গেছে কোন্‌খানে?'

ফাল্গুনীর নাট্যদৃশ্য 'পথে প্রান্তরে [...] বাদাড়ে' ঘটিয়াছে এবং যে চরম পথকে অনু[...] করিয়া নবযৌবনের দল যাত্রা করিয়াছে—ত[...] চূড়ান্ত পরিণাম পরম রহস্যময় গুহামুখে [...]

মুক্তধারাকে তত্ত্বনাট্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি[...] সেটি এই কারণেও বটে। পথ ও মেলার দ[...] এখানে প্রায় পূর্ণরূপে দেখা দিয়াছে। দৃশ্য সমস্তটাই একটানা পথের উপরে ঘটি[...] ঘটনায় কোথাও ছেদ নাই এবং এই [...] জনতার লক্ষ্য ভৈরবমন্দির, সেখানে পূজোপ[...] সমস্ত রাজ্যের অধিবাসীর সমবেত হইবার [...]

রক্তকরবী নাটকেরও একটি মাত্র দৃশ্য, [...] জালায়নের বাহিরের পথ। এই পথকে অব[...] করিয়াই ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

কালের যাত্রা তো পথেরই নাটক, যে প[...] অচল আর জনতা চলমান।

বাঙলা দেশের লোকজীবনের একটি অঙ্গ পথ পার্শ্ববর্তী মেলা। এইসব বিচিত্র ধরণের, বিচিত্র স্বভাবের এবং উদ্দেশ্যের লোক সমবেত হইয়া থাকে। Pattern-এ একদিকে যেমন বৈচিত্র্য, একদিকে তেমনি সরস[...] লোকজীব[...] অতি সাধারণ, অথচ মনোরম ও বিচিত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তত্ত্বনাট্যের ছাঁচ বা [...] রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গেই যাইতে পারে যে, তাঁহার অধিকাংশ ন[...] জনতা দৃষ্ট হয়, তাহা এই প্যাটার্নেরই যে গানের দল ও ঠাকুর্দা দৃষ্ট হয় ত[...] অনুরূপ মেলাগুলিতে দেখিতে যায়, ফকির ও বাউলের দল নাই, এ[...] বাঙলা দেশে বিরল। যাত্রা গানে যে [...] গানের দল দেখা যাইত, (এখনকার [...] ঘেঁষা যাত্রায় ওসব আর থাকে না) [...]

---

৮ টমসন তাঁহার গ্রন্থে এটি প্রথম লক্ষ্য করিয়াছেন।

মেলার গায়কদলের আদর্শেই গঠিত। রবীন্দ্রনাথের গানের দল ও ঠাকুর্দার মূলে মেলার প্রভাব ও যাত্রার প্রভাব দুই-ই আছে বলিয়া বিশ্বাস।

আমার এইসব উক্তি ও অনুমান যদি সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যেসব "খাঁটি বাঙালী" নাট্যকার শেক্সপীরীয় ধরণের ট্রাজেডি বা মোলিয়ার ভাবা কমেডি লিখিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের নাটক, এখানে তত্ত্ব-নাট্যগুলি, কি আকৃতির বিচারে, কি প্রকৃতির বিচারে তাঁহাদের নাটকের চেয়ে অনেক বেশি "খাঁটি দেশী" এবং সেইজন্যই অনেক বেশি বাস্তব। লোকজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া যাঁহারা খেদ করিয়া থাকেন তাঁহারাও অবহিত ও আশ্বস্ত হইতে পারেন। তাঁহাদের খেদের কারণ নাই, কেননা, এমনভাবে লোকজীবন ও দেশের গভীরতর জীবনোপলব্ধির উপরে আর কাহারও রচনা প্রতিষ্ঠিত নহে।

৭

রবীন্দ্রসাহিত্য যে অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ও অভারতীয় বোধ হয় তাহার একটা কারণ অপঠিত পাণ্ডিত্য। অনেকেই রবীন্দ্রসাহিত্য আংশিকমাত্র পড়িয়া বা একেবারেই না পড়িয়া, কিংবা জনশ্রুতিযোগে মাত্র শুনিয়া সমালোচনা করিতে বসেন—এমনস্থলে সুবিচার যে হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। এই ধরণের সমালোচনা-রীতি আগে খুব প্রচলিত ছিল এখন যে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে এমন বলা চলে না। তারপর সমালোচকগণের ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব কথা কথিত হয়, বা যেসব চিন্তা চিন্তিত হয়, তাহাকেই তাঁহারা দেশের তথা ভারতীয় বাণী বলিয়া মনে করেন, আর রবীন্দ্রসাহিত্যে তাহার প্রতিধ্বনি না পাইলে তাহাকে সরাসরি অভারতীয় বলিয়া মনে করেন। এখন ইহার প্রতিকার কি? আর যাই হোক কবিকে এজন্য দায়ী করা চলে না।

রবীন্দ্রসাহিত্য দুর্বোধ্য লাগিবার আরও একটি কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের বাক্‌ভঙ্গী অনেকাংশে নূতন। প্রত্যেক মহাকবির বাক্‌-ভঙ্গীই নূতন, ইহা তাঁহার মহাকবিত্বেরই বিভূতি। তিনি যে ঈশ্বর গুপ্ত বা অন্য প্রাচীনতর, বাঙালী কবির প্রতিধ্বনি করিবেন না—ইহাই তো স্বাভাবিক। তারপরে তিনি এমন অনেক উপমা ও অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা বাঙলার সাহিত্য কেন সংস্কৃত সাহিত্যেও নূতন—ইহাও তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক বিভূতি। এসব তাঁহার গুণ, দোষ নয়। আর এজন্য তাঁহাকে অভারতীয় বলিব কেন? ভারতীয় সাহিত্যের বাক্‌ভঙ্গী চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে এমন হইতেই পারে না। লৌকিক কবিগণ যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহার অনুসরণ করেন, মহাকবিগণ নূতন বাণীমার্গ রচনা করিয়া সেই পথে চলেন। কালিদাসের কাব্য প্রথম রচনাকালে এই জাতীয় সমালোচকের কাছে নিশ্চয় তাহা "অভারতীয়" বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাছে ইংরাজি সাহিত্য সুপরিচিত কাজেই তাহার প্রভাবও তাঁহার কাব্যে অর্থাৎ চিন্তায় ও বাক্‌ভঙ্গীতে পড়িয়াছে—ইহাও স্বাভাবিক, নিন্দার নয়। একটি মহৎ সাহিত্য পড়িলাম অথচ তাহা দ্বারা প্রভাবিত হইলাম না—ইহা প্রশংসার নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব আত্মস্থ হইয়া রবীন্দ্রনাথীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে কাজেই তাহাকে আর বিদেশীয় বলা উচিত নয়। টমসন কর্তৃক উধৃত সমালোচক বলিয়াছেন যে ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠকই কেবল রবীন্দ্রসাহিত্য বুঝিতে সক্ষম। তাহা যদি হয় তবে উক্ত সমালোচকের বাধিল কেন? কারণ তিনি পূর্ব সংস্কার লইয়া রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় নামিয়াছিলেন। আসল কথা এই যে রসবোধের প্রসারের উপরে রবীন্দ্রসাহিত্য বা যে-কোন মহৎ সাহিত্যের রসোপলব্ধির নির্ভর। একালে ইংরাজি সাহিত্য আমাদের রসবোধকে প্রসারিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তির অপেক্ষা ইংরাজি সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে কালিদাসের কবিবিভূতি অধিকতর প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ তিনি কালিদাসকে পৃথিবীর মহাকবিগণের পরি-প্রেক্ষিতে স্থাপিত করিতে পারিবেন। রবীন্দ্র বিচারের পটভূমি কেবল ঈশ্বরগুপ্ত বা বৈষ্ণব-গণ নহেন, এমনকি শুধু ব্যাস, বাল্মীকি বা কালিদাসের পটভূমিতে তাঁহাকে স্থাপন করাও যথেষ্ট নহে। ভারতীয় ও বিদেশীয় মহাকবি-গণের সান্নিধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিলে তবেই তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার কবিবিভূতি সম্যক উপলব্ধ হইবে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের দোষত্রুটিরও স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করুন বা না করুন, তিনি নিজেকে বিশ্ব-সাহিত্যিকগণের সান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বা ইটালীর অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত লোকে সেক্সপীয়র বা দান্তের কাব্য কেনে কি না জানি না (বোঝে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস), কিন্তু তজ্জন্য যেন তাহাদের অ-ইংলণ্ডীয় বা অ-ইটালীয় বলে না, তবে আমরাই অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিতের নজিরে রবীন্দ্রনাথ অভারতীয় বলিব কেন? মহৎ সাহিত্যের রসবোধ সুশিক্ষার ফল। পাঠকের সে ত্রুটির দায় লেখক বহন করিতে যাইবেন কেন? ন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিলে তবেই বিচারাসনে বসা উচিত। রসবোধের ক্ষমতায় যিনি বঞ্চিত কাব্য সমালোচনার ক্ষমতা তাঁহার সুপ্রচুর একথা কে মানিবে? ফলকথা উক্ত লেখকের উক্তি কাব্য সমালোচনা নয়, আপন ক্ষুদ্র মনের পূর্ব সংস্কারের ছায়াপাত মাত্র। উক্ত সমালোচনার দ্বারা কেবল নিজেকেই তিনি অরসিক প্রতিপন্ন করেন নাই, যাঁহাদের প্রতি-নিধিত্ব প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহাদেরও অরসিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রসবোধের প্রবলতম অন্তরায় পূর্ব সংস্কার।

মধ্যবিত্ত

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুন্সী

পিছনে অরণ্য এক
　　　　গভীর ভয়াল,
শ্বাপদ-সংকুল আর ঘন অন্ধকার;
সম্মুখে অপার সিন্ধু
　　　　উদ্দাম উত্তাল,
দানবীর ঢেউগুলি নাচে অনিবার।
　　বালুচরে বসে থাকি নিত্য—
　　সর্বদা সশঙ্ক চিত্ত।

সৌন্দর্যের দেশ সিকিম

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

সিকিম ভারতের উত্তর অঞ্চলে হিমালয় পর্বতে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য। সমগ্র হিমালয় প্রদেশে এর চেয়ে ক্ষুদ্র রাজ্য আর নেই। শুধু হিমালয় প্রদেশে কেন য়ুরোপেও এত ক্ষুদ্র রাজ্যের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। এর আয়তন হচ্ছে মাত্র ২,৮১৮ বর্গমাইল অর্থাৎ লুকসেমবার্গ রাজ্যের তিন গুণ আর নদীয়া জেলার সমান। এই আয়তনের বেশীর ভাগ অংশই আবার পাহাড়-পর্বত আর বনজঙ্গলে ভরা। তাই আয়তনের দিক থেকে এর কোন গুরুত্ব নেই, যেমন রয়েছে ভৌগলিক অবস্থিতির দিক থেকে। তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যে বাণিজ্য চলে তার একমাত্র পথ এই সিকিমের বুকের উপর দিয়েই চলে গেছে। তা ছাড়া পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঐ অবস্থিতির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সময় ভারতের উত্তর সীমান্তকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করা হত। কিন্তু আজ আর তা করবার যো নেই। আসাম-চীন সীমান্তে লাল-চীনা ফৌজের ঘাঁটি, খাস তিব্বতে লাল চীনা বাহিনীর উপস্থিতি, সর্বোপরি নেপালের সাম্প্রতিক বিপ্লব—সব কিছু মিলিয়ে ভারতের উত্তর সীমান্তকে আজ বিপদসঙ্কুলই বলা যায়। অবশ্য নেপালে সম্প্রতি যে মীমাংসা হল তা যদি বজায় থাকে তবে নেপাল থেকে হঠাৎ বিপদের কোন আশঙ্কা নেই সত্য, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে হাওয়া যে কোন দিকে বইবে আজই তা জোর করে বলা যায় না, যেমন বলা যায় না, তিব্বতে লাল চীনা সৈন্যের উপস্থিতির ফলে কি অবস্থা দাঁড়াবে। তবে একথাটা জোর করেই বলা যায়, হিমালয় আজ আর ভারতের দুর্ভেদ্য সীমান্ত নয়। এই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বুকে আসতে যে সব দেশ পেরুতে হবে সিকিম তারই অন্যতম। তাই তার এত গুরুত্ব। সিকিমের এই গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেই ভারত সরকার সিকিম সরকারের সঙ্গে সম্প্রতি এক চুক্তি করেছেন। তাতে সিকিমের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। এই চুক্তির কথা আমরা পরে উল্লেখ করছি।

সিকিমের ভৌগোলিক অবস্থিতির আরও একটু পরিচয় জেনে নি। সিকিমের উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে ভূটান এবং পশ্চিমে নেপাল। প্রথম থেকেই যে সিকিমের এই সীমা ছিল তা নয়। অনেক আগে সিকিমের পশ্চিম সীমান্ত সম্ভবত নেপালের অরুণ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; আর দক্ষিণে শিলিগুড়ী মহকুমা, পূর্বে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা এবং কালিম্পং মহকুমার অধিকাংশই ছিল সিকিমের অন্তর্ভুক্ত। যাহোক, সিকিমের বর্তমান আয়তন নিলে দেখা যায় উত্তর থেকে দক্ষিণে এর বিস্তৃতি প্রায় ৮০ মাইল, আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃতি ৪০ মাইল। সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী সিকিমের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত রেখা সৃষ্টি করেছে। সিকিমের পশ্চিম সীমাতেই কাঞ্চনজঙ্ঘা অবস্থিত। উচ্চতা এর প্রায় ২৮ হাজার ফিটের মত। দক্ষিণ সিকিমের উচ্চতা ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭ শত ফিটের মত। কিন্তু এই অঞ্চলেই বৃষ্টিপাত হয় সবচেয়ে বেশী। এখানে কেরপোনাং বলে একটা জায়গা আছে। বৎসরে সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২ শত ইঞ্চি। তাই এ জায়গাটাকে বলা হয় 'সিকিমের চেরাপুঞ্জী।'

পাহাড় আর নদীর রাজ্য সিকিম। তবে পাহাড় যত আছে সেখানে ঠিক ততটা নদী
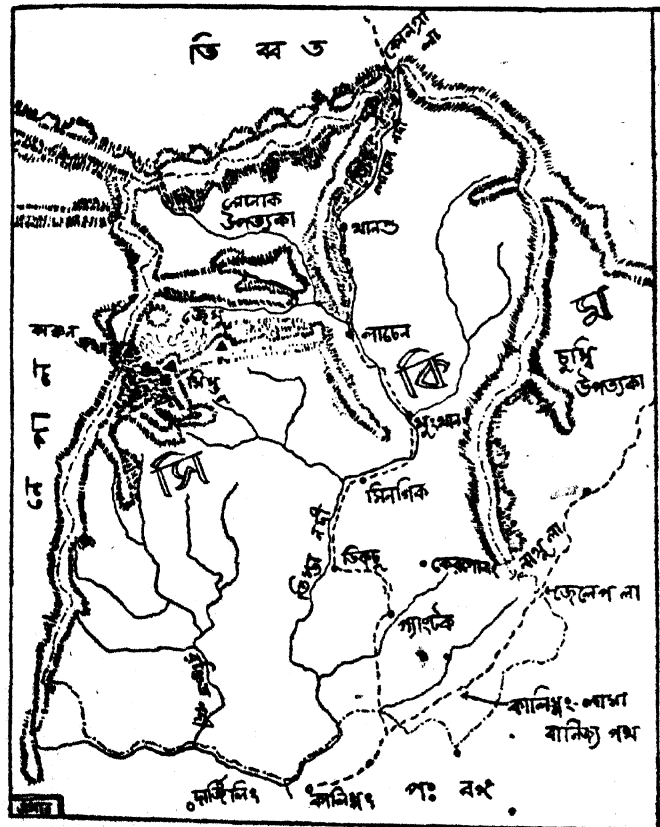
নেই। যা আছে তার মধ্যে তিস্তা প্রধান। তা ছাড়া আছে রঙ্গিত, লাচেন আর লাচুঙ্গ। পাহাড়ে-নদী বলে সবগুলোই খরস্রোতা। এখানে ওখানে ছোটবড় বহু সুন্দর সুন্দর জলপ্রপাতও দেখা যায়। সিকিমের আবহাওয়ায় গ্রীষ্ম-মণ্ডলের প্রভাব খুব সামান্যই পরিদৃষ্ট হয়।

সিকিমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলনাহীন। বিচিত্র রঙের লতাগুল্ম, রঙবেরঙের পুষ্প, বিশেষ করে রডোডেনড্রন এর সৌন্দর্যকে সহস্র গুণে বর্ধিত করেছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আর ওর রহস্যময় পরিবেশের আকর্ষণে বহু অভি-

সিকিমের মহারাজা স্যর তাসি নামগ্যাল

যাত্রী সিকিমকে সম্যকভাবে জানতে চেষ্টা করেছে। তাঁদের ইবিবরণ থেকে জানতে পারা যায় জেমু হিমবাহের কথা, সিম্ভু আর কাঞ্চনজঙ্ঘার কথা। ওর অপরূপ সৌন্দর্যের খনিও আবিষ্কার করেছেন ও'রা। তাদের বিবরণে পাই যে, সিকিমে প্রায় দুশ রকমের প্রজাপতি আছে। এদের কতকগুলির রঙ এত বিচিত্র যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিভিন্ন রকমের পতঙ্গের সংখ্যা হবে প্রায় দ্বিসহস্রাধিক আর পাখীর সংখ্যা হবে ছ' শতাধিক।

১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী সিকিমের জনসংখ্যা হল ১২১,৫২০। এর মধ্যে পুরুষ হচ্ছে ৬৩,২৮৯ আর স্ত্রী-লোকের সংখ্যা হচ্ছে ৫৮,২৩১ জন। অধিবাসীদের মধ্যে নেপালী, লেপচা, আর ভুটিয়া। এই পার্বত্য রাজ্যে আদিম জাতি বলতে কিছু নেই। সিকিমের পুরাতন জাতি বলতে একমাত্র লেপচাদেরই বোঝায়। ওরাই সে-দেশের আদিম মানুষ। আর যারা তারা সবাই বহিরাগত। অথচ মজা এই সংখ্যায় তারা অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক কম। ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় সিকিমে নেপালীদের সংখ্যা হচ্ছে ৮২,৫০০ অর্থাৎ শতকরা ৬৭ জন। অথচ লেপচারা সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী। এদের সংখ্যা কম হলেও এরা যে হ্রাস পাচ্ছে তা নয়। ১৮৯১ থেকে ১৯৪১ সালে এদের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ভুটিয়া ও তিব্বতীদের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নেপালীদের সংখ্যা এত বেশী হওয়ার কারণ বোধহয় যে, তারা লেপচাদের চেয়ে অধিক পরিশ্রমী। নূতন কাজে ঝাঁপিয়ে পরার আগ্রহও তাদের বেশী। চাষীও তারা ভাল। তাই চাষ আবাদের জন্য নেপালীরা দলে দলে এসে এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করছে। অবশ্য বাইরে থেকে আসা এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

লেপচারা প্রধানতই অরণ্যচারী। সেই শ্রেণীর লোকদের সব দোষ গুণই এদের মধ্যে দেখা যায়। এরা ভদ্র, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়। ব্যবসাবাণিজ্য বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে এদের কোন ধারণাই ছিল না। এদের আদি বাসস্থান লাচেন-এ তাই আদিম কাল থেকেই চলে এসেছে কতকটা আরণ্যক সাম্যবাদ। যাহোক, লেপচারা মাথায় পাখীর পালক গোঁজা টুপি পরিধান করে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেই ভালবাসে।

সিকিম রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সম্বন্ধে ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায়, প্রতি ১ হাজার অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ হচ্ছে ৩৭৭৬, মুসলমান ৭, খৃষ্টান ৩, জৈন ১ এবং অন্যান্য ৬২১৩। বৌদ্ধ-ধর্ম এখানকার রাজধর্ম। তবে জনগণের অধিকাংশই হিন্দু কারণ নেপালীরা হিন্দু-ধর্মাবলম্বী। সিকিমে বৌদ্ধধর্ম পালিত হয় জীবন চক্র অনুসারে। বিভিন্ন মন্দির গাত্রে ও পাথরে এদের পুজোমন্ত্র 'ওম্ মণি পদ্মে হুম্' খোদিত দেখা যায়।

সিকিম শিক্ষা ব্যাপারে অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে। এখানে শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক কম। এদেরকে প্রায় নিরক্ষরই বলা চলে। কারণ সে রাজ্যে কোন কলেজ নেই, মাত্র দুটি স্কুল রয়েছে সেখানে সুতরাং নিরক্ষরের সংখ্যা অধিক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যে দুটি বিদ্যালয় রয়েছে তার মধ্যে একটি উচ্চ ইংরাজী। এখানে প্রচলিত ভাষার নাম গুর্খালি। প্রচলিত ধর্মগ্রন্থগুলির নাম হচ্ছে, বুম (১৬ খণ্ড), কানজুর (১০৮ খণ্ড) ও দমা।

পূর্বেই বলেছি, তিব্বতের সংগে

সিকিমের প্রধান লামা

ভারতের যে বাণিজ্য হয় তা প্রধানত সিকিমের উপর দিয়েই চলে। সে হিসেবে সিকিমের গুরুত্ব কম নয়। তাছাড়া এখানে ধান, গম, জোয়ার, দারুচিনি, কমলালেবু, আপেল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, পশম ও পশমী বস্ত্র এখানকার প্রধান শিল্প। সিকিম থেকে ভারতে গম, ডাল, ধান, চর্ম, চমরী পুচ্ছ, পশম, তামাক, সরিষা, তিসি প্রভৃতি আমদানী হয় আর ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানী হয় সুতো, বস্ত্র, রঙ, গম, ধান, লৌহ, যন্ত্রপাতি, পেট্রোল, লবণ চিনি, সুপারি ইত্যাদি।

সিকিমের প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কারণ কোন লিখিত দলিলপত্র নেই বা পাওয়া যায় না। রাজবংশের লোকদের মুখে মুখে যেটুকু ইতিহাস বেঁচে আছে তাই এর

ইতিবৃত্ত। তিব্বতীরা সিকিমকে বলত 'চালের দেশ'। অতীতে সিকিম তিব্বতেরই শাসনাধীনে ছিল। পরে তিব্বতের রাজ-পরিবারের বংশধরেরা চুম্বি ও ভুটানের 'হা' নামক স্থান হয়ে সিকিমে প্রবেশ করে। সিকিমের বর্তমান রাজারা তাঁদেরই বংশধর। জানা যায়, সিকিমের প্রথম রাজার নাম হচ্ছে পেনচু নামগ্যাল। ইনি ১৬০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনজন লামা তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। অরুণ নদীর পূর্ব দিকস্থ উপজাতীয় সর্দারদের দমন করতে বা বশে আনতেই তাঁর অধিক সময় কেটে যায়। তাঁর সময়ে এবং তাঁর বংশধরদের সময়ে কুলহাইত উপত্যকাকে কেন্দ্র করে উত্তর-পূর্ব দিকে রাজ্য বিস্তার চলতে থাকে। এই উপত্যকাতেই গুরুত্বপূর্ণ মঠাদি নির্মিত হয়। এ গুলোর মধ্যে কতকগুলোতে কেবলমাত্র তিব্বতীদেরই প্রবেশাধিকার রয়েছে।

এর পরে পারিবারিক কোন্দলের ফলে ভুটানীরা সিকিম দখল করে নেয়। রাজা নেপালের পথে তিব্বতে পালিয়ে যান। পাঁচ ছ' বছর পরে ভুটানীরা চলে যাবার পর তিনি ফিরে এসে সিকিম দখল করেন, কিন্তু কালিম্পং আর তিনি ফিরে পান না। এই সময় থেকে কালিম্পং সিকিম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সিকিমের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন কয়েকটি প্রধান তিব্বতীয় পরিবার। অবশ্য ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে লেপচা ও লিম্বারা একবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৭৭০ সালের পরবর্তী কয়েকটি বছর নেপাল ও ভুটানের শাসনকর্তারা ছিলেন অতীব ক্ষমতাশালী আর আক্রমণপ্রিয়। ভুটানীরা প্রথম সিকিম আক্রমণ করে। তারা বিতাড়িত হবার পর নেপাল কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। একবার নেপালীদের আক্রমণ প্রতিরোধও করে তিব্বতীরা। পরে তরাই অঞ্চলে দুই পক্ষে যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৭৮৭ সালে সিকিমীরা এ অঞ্চলে পরাজিত হয়। ১৭৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে গুর্খা বাহিনী সমগ্র সিকিম দখল করে নেয়। পরে তিব্বত ও চীনের সমবেত বাহিনীর নিকট কাঠমাণ্ডুতে নেপালের পরাজয় ঘটে। নেপালীরা তিস্তা নদীর অপর পারে চলে আসে। ১৮১৫ সালে নেপালীরা বৃটিশ সরকার কর্তৃক পরাজিত হয়। ১৮১৭ সালে সে সন্ধি হয় তার শর্ত অনুসারে পাল্লুত গিরিমালার পূর্ব দিকস্থ সমগ্র সিকিম পরিত্যাগ করে নেপালীরা চলে যায়। এ' যুদ্ধের ফলে সিকিমের পশ্চিম সীমারেখা কিছু বৃদ্ধি পায়।

নেপাল-সিকিম সীমান্তে গণ্ডগোল সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে দুজন বৃটিশ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় দার্জিলিং-এর উপর। ১৮৩৪ সালে মহারাজা দার্জিলিং ইংরেজকে দিয়ে দেন পরিবর্তে তাঁকে একটা এলাওয়েন্স দেওয়া হয়। ইংরেজের অধীনে দার্জিলিং-এর উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে। এতে সিকিমের সঙ্গে একটা হাঙ্গামা বেঁধে ওঠে। এর কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, দেওয়ান হচ্ছেন সিকিমের ব্যবসাবাণিজ্যের একচ্ছত্র অধিকারী। তাঁর অধিকার ক্ষেত্রে ইংরেজকে হাত বাড়াতে দেখে তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। তারপর সিকিমে প্রথম থেকেই দাসত্ব প্রথা চালু ছিল। এই সব দাসের অনেকেই পালিয়ে ইংরেজ এলাকা দার্জিলিংএ চলে যেত। এ ব্যাপারেও দেওয়ান ও লামারা রুষ্ট হয়ে উঠলেন। তাঁরা ইংরেজ এলাকা থেকে পলায়িত দাসদের চুরি করে নিয়ে আসতেন। ডাঃ ক্যাম্পবেলকে বন্দী করায় অবস্থা চরমে উঠল। তাঁকে অবশ্য শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হল কিন্তু ইংরেজ আরও খানিকটা জায়গা যুক্ত করে নিলেন দার্জিলিং জেলার সঙ্গে।

ওদিকে তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজ সরাসরি ব্যবসা করার জন্য চেষ্টা করায়ও তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে লাগল। এই বাণিজ্য করার জন্য রাস্তাঘাট তৈরী করতে দেওয়া হবে বলে সিকিমের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। ব্যবসায়ে নিজেদের একচেটে অধিকার ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কায় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করে তিব্বতের কর্তৃপক্ষ সতর্ক হয়ে উঠলেন। সিকিম সরকারের মনেও সেই আশঙ্কা দেখা দিল। এ ব্যাপারে তাঁরা তিব্বত সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে লাগলেন। উত্তম বাণিজ্য সর্ত সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে একটি ব্রিটিশ মিশন তিব্বত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু পরে সেই মিশন পরিত্যক্ত হয়। ইত্যবসরে তিব্বতীয় বাহিনী সিকিমের লিংটু নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে। ১৮৮৮ সালে ঐ দুর্গ দখল করার জন্য ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হয়। উহারা তিব্বতী বাহিনীকে জেলেপ লা-র পথে চুম্বিতে হটিয়ে দেয়। পরে অনেক আলাপ আলোচনার পর ১৮৯০ সালে এক চুক্তি হয়, তাতে সিকিম ও তিব্বতের সীমান্ত স্থায়ীরূপে নির্ধারিত হয়।

তারপর সিকিমের শাসন সংস্কার চলতে থাকে। পলিটিক্যাল অফিসার এই সংস্কার সাধন করতে থাকেন। রাজা নেপালের

সিকিমের পার্বত্য পথে ভেড়ার পাল।

সিকিমের পার্বত্য-শোভা

পথে তিব্বতে পলায়নের চেষ্টা করেন। নেপালীরা তাঁকে ধরে গভর্ণমেণ্টের হাতে দিয়ে দেন। ১৮৯৬ পর্যন্ত তিনি কার্সিয়াং-এ বন্দী জীবন যাপন করেন।

তিব্বতীরা ১৮৯০ সালের আবার চুক্তি ভঙ্গ করে। তাছাড়া তিব্বতী বাহিনী গিয়াগাং-এর উত্তরস্থ ভূভাগ দখল করে নেয়। এতে প্রমাণিত হয় যে তারা সীমান্ত চুক্তিও মানতে রাজী নয়। অবশ্য ঐ ভূখণ্ডের জন্য ভারত সরকারের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। তাঁরা চাইলেন এ সুযোগে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে। আলোচনা চলতে লাগল কিন্তু বড় মন্থর গতিতে। কারণ স্থানীয় তিব্বতী কর্তৃপক্ষ লাসাতে কোন লিখিত দলিলাদি পাঠাতে অস্বীকৃত ছিলেন, অথচ ভারত-সরকার চাইছিলেন যে সমস্ত আলোচনাই পিকিং-এর মারফৎ হোক। কারণ, তাঁরা জানতেন, তিব্বতের উপর চীনেরই রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা। পরে যখন জানা গেল যে, তিব্বত থেকে রুশিয়াতে রাষ্ট্রদূত গিয়েছে তখনই অবস্থার গতি ফিরল। ১৯০২ সালে পলিটিক্যাল অফিসার সৈন্য নিয়ে তিব্বত বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত ক্ষুদ্র ভূখণ্ড দখল করার জন্য রওনা হলেন এবং ঐ অনুর্বর স্থানটুকু দখল করে নিলেন।

এই হল সিকিমের মোটামুটি পুরানো রাজনৈতিক ইতিহাস। তারপর সিকিম ভারত সরকারের আশ্রিত স্বাধপ্রীন রাজ্যে পরিণত হয়। এই সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তিও সম্পাদিত হয়। চীনও তার এই অবস্থা মেনে নেয়। এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে, পূর্বে সিকিম ছিল তিব্বতেরই অংশ বিশেষ, সে হিসাবে চীনের অধীন। যাহোক, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একজন পলিটিক্যাল অফিসার এখানে থেকে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ইংরেজ আমলে পলিটিক্যাল অফিসার ছিলেন মিঃ এ জে হপকিন্‌সন, এখন হচ্ছেন শ্রীহরীশ্বর দয়াল।

সিকিমের নূতন ইতিহাসের সূচনা দেখি আমরা বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে। কারণ তখন থেকেই দেশে কিছু কিছু রাজনৈতিক চেতনা দেখা দেয় যার চরম পরিণতি দেখি ১৯৪৯ সালে। ভারত স্বাধীন হবার পর স্টেট কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা চায় রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্রের অবসান করে দায়িত্বশীল প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মত সিকিম সরকারও প্রজার দাবী মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। ফলে রাংপোতে অনুষ্ঠিত স্টেট কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্টেট কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে গিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যেই স্বাধীন ভারত সরকারের সংগে সিকিমের স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। যাহোক, আন্দোলনের ফলে কয়েকজন কর্মী ধৃত হয় কিন্তু পরে পলিটিক্যাল অফিসারের অনুরোধে মুক্তিলাভ করে।

মহারাজাকে শাসন ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে সিকিমে একটি উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। আন্দোলনের ফলে ঐ পরিষদকে প্রসারিত করা হয় এবং স্টেট কংগ্রেসের নেতাকে প্রধান মন্ত্রীরূপে ও অন্যান্য কয়েকজনকে স্টেট কংগ্রেসের সদস্যকেও মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এতেও শান্তি দেখা দেয় না।। অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। জনগণের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার ফলে শোচনীয় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা দেখা দেয়। ভারত সরকার জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে সিকিমে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং একজন দেওয়ান ভারতের পক্ষে সিকিমের শাসনভার গ্রহণ করেন। এটা ১৯৪৯ সালের জুন মাসের ঘটনা। সে থেকে গত বৎসরের ডিসেম্বর মাস অবধি বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি। সম্প্রতি (৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০) ভারত সরকারের সংগে সিকিম সরকারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির সর্ত হচ্ছে ১০টি। এই চুক্তি অনুসারে, সিকিম ভারতের আশ্রিত রাজ্যরূপে থাকবে, আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে সিকিম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে, সিকিমের দেশরক্ষা ও ভৌগলিক নিরাপত্তার জন্য ভারত সরকার দায়ী হবেন, বৈদেশিক ব্যাপার কেবলমাত্র ভারত সরকারই পরিচালনা করবেন ইত্যাদি অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের সংগে সিকিম নূতন মর্যাদায় যুক্ত হল।

দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই চুক্তিতে সিকিমেরও লাভ হবে কম নয়। বিশ্বসভায় স্থান লাভে ভারতের মত এমন একজন বন্ধুর সাহায্য, সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থন থাকা কম কথা নয়। যাহোক, ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে পলিটিক্যাল অফিসার শ্রীহরিশ্বর দয়াল এবং সিকিমের পক্ষে মহারাজ এই চুক্তি সাক্ষর করেন। সিকিমের বর্তমান মহারাজার নাম হচ্ছে স্যর তাসি নামগাল। তিনি ১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে তিনি সিংহাসন আরোহন করেন।

দেহ লক্ষণা

যকৃতের কাজ

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

যকৃত বা লিভারকে আমরা চলিত কথায় মেটুলি বলে থাকি। হজমতন্ত্রের মধ্যে এটি যে একটি বিশিষ্ট যন্ত্র এ কথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু কি কি এর কাজ তা ভালোরকম না জানায় অনেক সময় যত কিছু পেটের দোষ আমরা এরই উপরে আরোপ ক'রে থাকি। এর ক্রিয়াবৈচিত্র্য ঠিকভাবে জানা থাকলে সে ভুল আমরা সহজে করবো না, কিন্তু তার আগে এর গঠনবৈচিত্র্য সম্বন্ধে কিছু খবর রাখা দরকার।

আসলে এটি এক গ্রন্থি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। বলতে গেলে এত বড়ো গ্রন্থি শরীরের মধ্যে আর দ্বিতীয় নেই। গ্রন্থিমাত্রেরই যা কাজ এরও তাই কাজ, অর্থাৎ রসক্ষরণ করা। এর সেই রসকেই আমরা বলি পিত্ত।

উদর গহ্বরের উপরের দিকে এবং ডান দিক ঘেঁষে এই সুবৃহৎ এবং ঘোর লাল রং-এর গ্রন্থিযন্ত্রটি অবস্থিত। সাধারণত এটি থাকে পাঁজরার আড়ালে, তাই উপর থেকে হাত দিয়ে সন্ধান করলে সহজে টের পাওয়া যায় না, তবে কোনো কারণে লিভার বড়ো হয়ে গেলে তখন বেশ জানতে পারা যায়। ছাগল প্রভৃতি অন্যান্য জন্তুর মেটুলি দেখে লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, এর উপরের দিকটা কুব্জ এবং গোলাকৃতি, আর নিচের দিকটা প্রশস্ত এবং চেপ্টা। এই নিচের দিকের প্রশস্ত অংশটায় লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, ওর মাঝখানে খাঁজ কাটা আছে, যেখান দিয়ে তিনটি তিন রকমের মোটা মোটা নল যকৃতের ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে। ওর মধ্যে একটি হোলো যকৃতের ধমনী, যেখান দিয়ে ওর মধ্যে তাজা রক্ত সরবরাহ হয়। অপরটি হোলো এক মোটা রকমের শিরা, তার নাম পোর্টাল শিরা এবং সেইটির ভিতর দিয়েই অন্ত্রাদির ভিতরকার সব কিছু রক্ত পূর্ববর্ণিত খাদ্যসারগুলিকে নিয়ে যকৃতের মধ্যে ঢোকে। তৃতীয়টি হোলো সবুজ রংএর পিত্ত-নল, যার ভিতর দিয়ে যকৃৎ থেকে পিত্ত নির্গত হয়। এ ছাড়াও আরো একটি চতুর্থ নল খাঁজের পিছন দিকে দেখা যায়, তার নাম যকৃতের শিরা, অর্থাৎ ওর ভিতর দিয়ে যকৃতের ভিতরকার সমস্ত রক্ত বেরিয়ে এসে সাধারণ রক্তস্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

এর থেকেই যকৃতের ভিতরকার কার্য-প্রণালী খানিকটা আন্দাজ করা যাবে। প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যকৃতের মধ্যে দুই রকমের রক্ত গিয়ে ঢুকছে। একটা হোলো শুধুই তাজা রক্ত যা ধমনীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আর একটা হজম করা খাদ্যসার মিশ্রিত অন্ত্রাদির রক্ত, যা ডুওডিনম, জেজুনম, ইলিয়ম প্রভৃতি হজমস্থান থেকে সঞ্চিত হয়ে এসে যকৃতের মধ্যে জমা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ওর ভিতরে প্রবেশ করবার পরে সব রক্তই এক সঙ্গে মিশছে। সেখানে ঐ রক্তকে একপ্রস্ত ছেঁকে ফেলা হয়। এটা আমাদের ঘরোয়া ছাঁকার মতো ব্যাপার নয়, এ ছাঁকনিটি হয় জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়াতে। যকৃতের ভিতরকার কোষগুলি দিয়ে তৈরি ছাঁকনি অনেকটা স্পঞ্জের মতো কাজ করে, অর্থাৎ সেই মিশ্রিত রক্তের মধ্যে যা কিছু আবর্জনা ও বীজাণু প্রভৃতি রয়ে গেছে সেগুলিকে আলাদা ক'রে নিয়ে যকৃৎ আপন পিত্তরসের মধ্যে নিক্ষেপ করে, আর খাদ্য-সার সমেত ছাঁকা রক্তটাকে ওর শিরাগুলির মারফতে সাধারণ রক্তস্রোতে চালান ক'রে দেয়। এই কাজটির জন্যেই খাদ্যসার সমেত সমস্ত রক্তটা একবার ক'রে যকৃতের মধ্যে ঢুকে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে তবে রক্তস্রোতের মধ্যে সেটা যেতে পার। এই তিন রকমের নল সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে সমস্ত যকৃৎটার মধ্যেই পাশাপাশিভাবে ছড়িয়ে আছে।

আরো এক রকমের সরু নল ওর মধ্যে সর্বত্রই ছড়ানো আছে, সেগুলি ওরই নিজের পিত্তবাহী নল। প্রতি কোষ থেকে বিন্দু বিন্দু পিত্তরস ক্ষরিত হয়ে তারই মধ্যে গিয়ে পড়ছে। তারপরে সেই সরু নলগুলি একত্রিত হয়ে মোটা একটি পিত্তবাহী নলে পরিণত হয়ে সেটি বাইরে বেরিয়ে আসছে। বেরিয়ে এসে এই নলটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আসল নলটি বরাবর চলে গেছে ডুওডিনমের মধ্যে, আর তার শাখা নলটি গিয়ে ঢুকেছে এক পিত্ত থলির মধ্যে। এই পীতবর্ণ পিত্তথলিটি আমরা মেটুলির নিচের দিকে বরাবর দেখতে পাই এবং এটিকে সযত্নে পৃথক ক'রে ফেলে দিই। জন্তুর মেটুলি আমাদের পক্ষে সুখাদ্য, পিত্ত থলিটা অখাদ্য, ওর মধ্যে তিক্ত পিত্ত সঞ্চিত থাকে।

পিত্ত ক্ষরিত হয় যকৃতের নিজস্ব বহু-কোণবিশিষ্ট কোষগুলির দ্বারা। সেই কোষগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তশিরা ও পিত্ত-নালীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে গুচ্ছে গুচ্ছে এক একটা'ল্লোবিউল বা ক্ষুদ্রাকার যকৃৎখণ্ড প্রস্তুত করে, এবং ঐ খণ্ডগুলির দ্বারাই সমস্ত যকৃৎটা আগাগোড়া পরিপূর্ণ। প্রত্যেক'লোবিউল থেকেই পিত্ত ক্ষরিত হয়। এই পীতবর্ণ তিক্তস্বাদ পিচ্ছিল ধরণের পিত্তের মধ্যে জারক রস বলতে কিছুই নেই, কিন্তু আছে এমন অতি প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী যার দ্বারা খাদ্য হজমে যথেষ্টই সাহায্য হয়। পিত্ত দেখতে হয় কখনো পীত-বর্ণ আবার কখনো হয় সবুজ, তার কারণ এর মধ্যে দুই রকমের রঞ্জক পদার্থ আছে, তার নাম বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন, তারই ইতরবিশেষে ওর বর্ণের তারতম্য ঘটে থাকে। রক্তকণিকা ভেঙে গিয়ে এই দুই রঞ্জক পদার্থের সৃষ্টি হয়, এবং এগুলিকে আবর্জনা পদার্থ বলেই ধরা হয়। এ ছাড়া ওর মধ্যে আছে সোডা কার্বনেট প্রমুখ ক্ষারগুণী পদার্থ, এবং এগুলির কাজ খুবই জরুরী। আমরা পূর্বে বলেছি যে, পাক-স্থলী থেকে খাদ্যমণ্ডগুলি অম্লগুণাত্মক হয়ে ডুওডিনমের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা বদলে গিয়ে সমস্ত জিনিসটা ক্ষারগুণযুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্ত্রের স্থানীয় জারকরস তার উপর কোনো ক্রিয়া করতে পারে না। হজমের পূর্বেকার সেই কাজটা সম্পন্ন করে পিত্তের এই ক্ষার পদার্থগুলি। এ ছাড়া ওর মধ্যে থাকে কয়েক রকমের পিত্তাশ্রিত লবণ, তার ক্রিয়া বিশেষ ক'রে তেল-ঘি-চর্বি জাতীয় স্নেহপদার্থের উপর। স্নেহপদার্থ যা কিছুই আমরা খাই, এবং অন্ত্রস্থ জারকরসের

স্টিয়েপসিন প্রভৃতির দ্বারা যতই তা বিশ্লিষ্ট হয়ে যাক, ঐ লবণগুলির অভাবে তা দ্রবণীয় হয় না, সুতরাং রক্তের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হয় না। ফ্যাটি-অ্যাসিড জলে দ্রবণীয় নয়, কিন্তু পিত্তাশ্রিত লবণাদির সঙ্গে মিশলেই তখন তা দ্রবণীয় হয়ে যায়। সেইজন্যেই পিত্তের ক্রিয়া খাদ্যের উপরে না হলে আমাদের স্বাভাবিক খাদ্যগুলি আদৌ হজম হতে পারে না, এবং তার সঙ্গে যদি স্নেহপদার্থ মিশ্রিত থাকে তাহ'লে তো নয়ই। পিত্তদোষ ঘটলে আমরা যে তেল এবং ঘি খাওয়া নিষেধ ক'রে থাকি সেটা ঠিক এই কারণেই।

এ ছাড়াও পিত্তের নিজেরই মধ্যে একরকম স্নেহজাতীয় পদার্থ আছে, তার নাম কোলেস্টেরল। হজম করাবার পক্ষে এর কোনোই গুণ নেই, বরং গুণের চেয়ে এর অগুণটাই বেশি। শরীরের ভিতরকার কোনো জিনিসের সঙ্গেই এটা মিশ খেতে পারে না। পিত্তের সঙ্গে যখন বেরিয়ে চলে যায় তখন কোনোই হাঙ্গামা নেই, কিন্তু কখনো কখনো এটা পিত্ত থেকে পৃথক্ হয়ে জমা হয় গিয়ে পিত্তথলির মধ্যে, এবং সেখানে ক্রমশ শুকিয়ে গিয়ে পাথরে পরিণত হয়। একেই আমরা বলে থাকি পিত্তের পাথুরী। সেই পাথর যতক্ষণ পর্যন্ত থলির মধ্যেই রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো গণ্ডগোল নেই, কিন্তু যেমনি তা সেখান থেকে বেরিয়ে পিত্তের সরু নলের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে তার কোনোখানে আটকে যায়, তখনই তীব্র যন্ত্রণার আক্ষেপ হতে থাকে। একে আমরা বলি পাথুরীর ব্যথা বা গলস্টোন কলিক। অনেক সময় এ-ব্যথা এতই দারুণ হয় যে, অস্ত্রোপচারের দ্বারা গোটা পিত্ত থলিটাকেই বাদ দিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না।

পিত্ত থলি না থাকলেও যে বেঁচে থাকার কোনো হানিগ্রহ তা নয়। ওর কাজটা হচ্ছে অতিরিক্ত পিত্তকে ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় ক'রে রাখা, এবং কোনো সময় সদ্যনিঃসৃত পিত্তের অপ্রতুল ঘটলে তখন সেটা সরবরাহ করা। সাধারণত যকৃৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ে পিত্তনিঃসৃত করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, সেই সময়ে যদি খাদ্য গিয়ে অন্ত্রে হাজির না হয় তাহ'লে পিত্তটা বৃথা নষ্ট হয়, আর একেই আমরা চলিত কথায় বলে থাকি "পিত্ত পড়া"। পিত্ত থলিটা থাকলে তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ অসময়েও সে পিত্ত সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু থলিটা না থাকলে খাদ্যের বিষয়ে অনিয়ম করলে তাতে অনিষ্ট হতে পারে।

পিত্তের আরো অনেক গুণ আছে। পিত্ত হোলো বীজাণুনাশক, সুতরাং অন্ত্রের মধ্যে পচনক্রিয়া নিবারক। উপযুক্ত পিত্তের অভাবে অন্ত্রমধ্যস্থ খাদ্যবস্তু গেঁজে ওঠে, তার থেকে পেটে বায়ু প্রভৃতি জন্মায় এবং উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্যের সৃষ্টি হয়। আবার ওর ভিতরকার পিচ্ছিল পদার্থের দরুণ পিত্ত সারগুণী, ওর দ্বারা নিত্য কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং অন্ত্রগাত্র মসৃণ থাকার কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য ঘটতে পারে না।

হজমাদির দিক দিয়ে এই সব নানারকম সাহায্য করা ছাড়াও পিত্তের অপর একটি কাজ হোলো বিশেষ কতকগুলি আবর্জনা দূরীকরণ। বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন যে রক্তসম্পর্কিত আবর্জনা এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তদ্ভিন্ন বীজাণু এবং অন্যান্য যা কিছু বিষাক্ত পদার্থ পেটের ভিতর থেকে পোর্টাল শিরার ভিতর দিয়ে যকৃতে গিয়ে প্রবেশ করে, সেগুলিকেও এই পিত্ত যথাসাধ্য নষ্ট ক'রে বাইরে বের ক'রে দেয়। কোনোরকম বিষপান করলে সেটা পেট থেকে প্রথমে যকৃতে গিয়েই ঢোকে, এবং পিত্ত তাকে সাধ্যমত নষ্ট করতে চেষ্টা করে। না পারলেই তখন যকৃৎ যন্ত্র বিগড়ে যায় এবং মৃত্যুর পরে পরীক্ষার দ্বারা যকৃতের ভিতর থেকে সে জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়। অতিরিক্ত মদ্যপান করলেও এই অবস্থা ঘটে, তখন সেটাকে হজম করতে বা নষ্ট করতে না পেরে পিত্ত যখন হাল ছেড়ে দেয় তখন যকৃতের কোষগুলিও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন সিরোসিস নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। যকৃতের কোষগুলি এইভাবে একবার নষ্ট হয়ে গেলে তখন আবার তাকে স্বাভাবিক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা একরূপ অসম্ভব।

তারপরে যকৃতের কাজ ঐ বহুগুণযুক্ত পিত্ত ক্ষরণেই সমাপ্ত নয়, পিত্তের কাজ ছাড়াও তার অন্যান্য ধরণের নিজস্ব কাজ আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হোলো চিনিকে রূপান্তরিত আকারে গ্লাইকোজেনরূপে ওর কোষগুলির মধ্যে সংরক্ষণ করার কাজ। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। আমরা যখন যা-কিছু মিষ্ট সামগ্রী খাই কিংবা যা-কিছু কার্বোহাইড্রেট খাই, সমস্তই হজমের দ্বারা গ্লুকোজে বা চিনিতে পরিণত হয়ে প্রথমে সেটা কোথায় যায়? প্রথমে সবই চলে যায় পূর্বোক্ত পোর্টাল রক্তশিরার মারফতে যকৃতের মধ্যে। সুতরাং প্রত্যেক বারেই ভূরিভোজনের কিছুক্ষণ পরে যদি ঐ পোর্টাল শিরার একটু রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করা যায় তাহ'লেই দেখা যাবে যে, সেই রক্তের মধ্যে খুবই বেশি পরিমাণে গ্লুকোজ বা চিনি রয়েছে। কিন্তু শরীরের অন্য যে-কোনো জায়গা থেকেই রক্ত নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখুন, তাতে দেখবেন যে, সাধারণ রক্তস্রোতের মধ্যে চিনির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক কম, এবং খাওয়া বা না-খাওয়ার সঙ্গে তার তেমন কিছু ইতরবিশেষ নেই, অর্থাৎ ভূরিভোজনের পরেও সাধারণ রক্তস্রোতে যে পরিমাণ চিনি রয়েছে, উপবাসের পরেও তাতে ঠিক সেই পরিমাণই আছে। এইভাবে সাধারণ রক্তের মধ্যে চিনির সম্বন্ধে সব সময়েই একটা সমতা থাকবার কারণ কি? কারণ হোলো এই যে, যখন যা-কিছু কার্বোহাইড্রেট বর্গীয় খাদ্য খাওয়া হচ্ছে, তার থেকে তৈরি চিনিটাকে যকৃৎ আপন কোষগুলির মধ্যে সঞ্চয় ক'রে রাখছে এবং সব সময়ে সমানভাবে তাকে সাধারণ রক্তের মধ্যে ছাড়ছে। কিন্তু আবার আরো এক কথা, চিনিটাকে সে ঠিক চিনিরূপেই সঞ্চয় করে রাখে না, গ্লুকোজকে সে নিজের কারখানার মধ্যে গ্লাইকোজেন নামক একরকম কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত ক'রে নেয়, আবার রক্তের মধ্যে ছাড়বার সময় তাকে আগেকার সেই গ্লুকোজ বানিয়ে তবে ছেড়ে দেয়। এইভাবে চিনি সংরক্ষণ যকৃতের এক মস্ত কাজ, কিন্তু এ কাজটি সে করে নিজের প্রেরণাতে নয়, এর প্রেরণা আসে মস্তিষ্কের সুষুম্না নামক একটি বিশেষ অংশ থেকে। ঐ অংশটা কোনোক্রমে বিগড়ে গেলেই যকৃতের এই কাজটিও বিগড়ে যায়, এবং তখন এর আর কোনো সংযম থাকে না। তখন দেখা যায়, সাধারণ রক্তের মধ্যে ভূরি ভূরি চিনির আমদানি হচ্ছে, যকৃতে তার কোনো সঞ্চয়ই নেই। সুষুম্নাতে একবার একটি পিন ফুটিয়ে দিলেই এই বিপর্যয়টা এসে পড়বে, তখন তার থেকে মূত্রমধ্যেও চিনি নির্গত হতে থাকবে, যাকে বলে ডায়েবেটিস রোগ।

এই তো গেল যকৃতের দ্বারা এক বিশেষ রকমের কাজ। আবার ওর দ্বারা কার্বোহাইড্রেট খাদ্য ছাড়া প্রোটিন খাদ্য সম্বন্ধেও অন্য একরকমের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। প্রোটিন বা নাইট্রোজেনযুক্ত যা-কিছু জিনিস শরীরের

মধ্যে কাজে লেগে যাবার পরে তার কিছু অংগার পড়ে থাকে, সেটা অবশেষে ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিডরূপে মূত্র দিয়ে নির্গত হয়ে যায়। যকৃতের কাজ হোলো সেগুলিকে রক্ত থেকে সংগ্রহ ক'রে মূত্রের মধ্যে চালান ক'রে দেওয়া। আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে, অতিরিক্ত মাংসাদি খেলেই মূত্রের মধ্যে ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। আবার অতিরিক্ত কোনো শারীরিক পরিশ্রম করলেও তাই হয়, অর্থাৎ তাতে শরীরস্থ পেশীগুলির প্রোটিন বস্তু ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়েই সেটা হয়ে থাকে। তখন যকৃতের মধ্যে এগুলিকে সংগ্রহ ক'রে নির্গত ক'রে দেবার কাজটা বেড়ে যায়।

তারপরে রক্ত সংবহনের ব্যাপারেও যকৃৎ বিশেষ একটা অংশ গ্রহণ করে। পোর্টাল শিরাটি হোলো খুবই মোটা আকারের রক্তবাহী শিরা, পেটের অন্ত্রাদির ভিতরকার যত কিছু রক্ত সমস্তই এই শিরাটির ভিতর দিয়ে আগে যকৃতের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। তারপরে সেখান থেকে যায় সাধারণ রক্ত-স্রোতে। সুতরাং এককালীন অনেকটাই রক্ত যকৃতের মধ্যে জমে থাকতে পারে, এবং সময়ে সময়ে তার পরিমাণ খুব সামান্য হয় না। হৃৎপিণ্ড বা হার্টের ব্যারামে এর এই ক্ষমতাটা খুব কাজে লাগে। হৃৎপিণ্ড যখন যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত নিয়ে ঠিক সামলাতে পারছে না অর্থাৎ তার উচিত-মতো ব্যবস্থা করতে পারছে না, তখন যকৃতের কাজ হোলো অনেকটা পরিমাণ রক্ত ধরে রেখে হৃৎপিণ্ডের ভারলাঘব করা। এই আমরা দেখতে পাই যে, হার্টের রোগ হলেই তাতে অনেক সময় যকৃৎটা অনকখানি বড়ো হয়ে যায়। রক্ত জমে থাকার দরুণই সেটা আকারে বেড়ে যায়, কিন্তু তাতে হৃৎপিণ্ডকে সেরে ওঠবার অনেকটা সুযোগ দেওয়া হয়।

এ তো হোলো ওর একটা দিক, কিন্তু এর চেয়েও জরুরী কাজ রক্ত সৃষ্টি করার দিকটা। শরীরের মধ্যে নতুন নতুন রক্ত সমৃদ্ধি করার পক্ষে যকৃতের যথেষ্টই হাত আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ কথা জানা যায় না। কিন্তু রক্তহীনতা ঘটলেই এটা আমরা আজকাল স্পষ্টরূপে দেখতে পাই। কোনো কারণে যার রক্তহানি হয়ে পাণ্ডুরোগ এসে গেছে তাকে লিভার এক্সট্রাক্ট বা জান্তব যকৃতের নির্যাস ইনজেকশন দিতে থাকলেই তাড়াতাড়ি সে আরোগ্য হয়ে যায়। যকৃতের নির্যাস রক্তসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্টই সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, বিশিষ্ট রকমের পাণ্ডুরোগে যখন রক্তকণিকাগুলি ভেঙে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে তখন যকৃৎ তার হিমো-গ্লোবিনের লৌহগুলিকে নষ্ট হতে দেয় না, সমস্তই নিজের মধ্যে সঞ্চয় ক'রে থাকে। আরোগ্যের সময় সেটাকে আবার সে কাজে লাগাল।

যকৃতের আরো একটি বিশেষ কাজ হোলো শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি করা। অক্সিজেন দাহনের দ্বারা যেমন উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তেমনি নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেও উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। যকৃতের মধ্যে নানারকম রাসায়নিক সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ চলতে থাকে, তারই ফলে শরীরের উত্তাপ অনেকটা বাড়ে। যকৃৎ বিগড়ে গেলে শরীরের উত্তাপ অনেক কমে যায় এটা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। কিন্তু এখানে একটা কথা বিশেষ ক'রে বলে রাখা উচিত যে, যকৃৎ যন্ত্র সহজে বিগড়ায় না। লোকে যখন বলে যে, লিভারের দোষ হয়েছে তখন অনেক সময়েই সেটা ভুল কথা বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে সেটা পিত্তরোধের দোষ, পিত্ত-নালীর প্রদাহের দোষ, পিত্তথলির ভিতরে পাথুরীর দোষ, ইত্যাদি পিত্ত নিঃসরণের বিঘ্নের ব্যাপার। আর শিশুদের বেলাতেও যে প্রায়ই লোকে বলে, লিভারের দোষ হয়েছে সেটাও ভুল কথা। ইনফ্যানটাইল লিভার ছাড়া শিশুদের যকৃতের দোষ সহজে ঘটতে পারে না। যা হয় সেটা পেটের দোষ, গরহজমের দোষ ইত্যাদি। অবশ্য ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কয়েকপ্রকার রোগে লিভার বিগড়ে যায় কিন্তু সেটা হয় রোগের বিষের দ্বারা।

অগ্ন্যাশয়ের কাজ

অগ্ন্যাশয়ের বা প্যাংক্রিয়স নামক গ্রন্থিটিও হজম কার্যে সাহায্য করবার পক্ষে এক বিশিষ্ট যন্ত্র। এর সম্বন্ধে আমরা সাধারণভাবে বিশেষ কিছু জানি না, তার কারণ এটি পাকস্থলীর আড়ালে থাকে বলে সহসা নজরে পড়ে না। কিন্তু এর জারক রস তিন রকমের খাদ্যকেই হজম করাবার পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী। অগ্নি কথাটার মানে পরিপাক শক্তি, সেই হিসেবে এর নাম দেওয়া হয়েছে অগ্ন্যাশয়, এবং এর জারক রসকে অগ্ন্যাশয় রস বা অগ্নিরস বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থিটি দেখতে অনেকটা চ্যাপ্টা ধরণের লম্বা ছাতার বাঁটের মতো, লম্বায় প্রায় ছয় ইঞ্চি, চওড়াতে দেড় ইঞ্চি। এর একটি বিশেষ রসবাহী নল আছে, সেটি বেরিয়ে এসে পিত্তনালীর সংগে মিলে এক হয়ে গিয়ে ডুওডিনমের মধ্যে গিয়ে পড়ে। অগ্ন্যাশয়ের দ্বারা এই দুই স্বতন্ত্র রকমের রস ক্ষরিত হয়, তার মধ্যে একটি বহিস্রোতা জারক রস, যেটা ঐ নলের দ্বারা ডুওডিনমের মধ্যে গড়িয়ে যায়,—আর একটি অন্তঃস্রোতা, সেটি গ্রন্থিকোষের ভিতর থেকেই সরাসরি রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। বহিঃস্রোতা জারক রসটির মধ্যে তিন রকমের জারক পদার্থ আছে। তার মধ্যে একটির নাম ট্রিপসিন, সেটির কাজ প্রোটিন মাত্রকেই অ্যামিনো-অ্যাসিডে পরিণত ক'রে সম্পূর্ণ-রূপে হজম করানো, এবং পাকস্থলী রসের পেপসিনের দ্বারা যে কাজ অসম্পূর্ণ ছিল তাকে সম্পূর্ণ করা। দ্বিতীয়টির নাম অ্যামাইলপ্সিন, যার কাজ মুখের লালা-রসের মতো কার্বোহাইড্রেট খাদ্যকে চিনিতে বা গ্লুকোজে পরিণত করা, অর্থাৎ পাক-স্থলীতে ঐ জাতীয় খাদ্য এসে তার হজমের যে কাজটা বাকি ছিল তাকে সম্পূর্ণ করা। তৃতীয়টির নাম স্টিয়াপ্সিন, তার কাজ স্নেহ জাতীয় খাদ্য মাত্রকেই সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট ক'রে রক্তের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ক'রে দেওয়া। সুতরাং আমাদের তিন রকমের প্রধান খাদ্যগুলোই এর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে হজম হয়ে যায়। তারপরে এর অভ্যন্তরীণ রসটির কথা। এরই নাম ইনসুলিন যা আমরা ডায়েবিটিস রোগে ব্যবহার ক'রে থাকি। এর কাজ হোলো শরীরের মধ্যে চিনির সামঞ্জস্য বিধান করা এবং যথাস্থানে তাকে কাজে লাগানো। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, কোনো জন্তুর শরীর থেকে অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিটি কেটে বাদ দিলেই তার রক্তের মধ্যে চিনির পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যাবে এবং চিনি জাতীয় খাদ্য কিছুমাত্র খেতে না দিলেও শরীরের নিজস্ব মাংসাদি ভেঙে ভেঙেই তার থেকে চিনি প্রস্তুত হয়ে রক্তের মধ্যে এসে মূত্রের দ্বারা নির্গত হয়ে যেতে থাকবে, এবং সেই জন্তুটি দেখতে দেখতে শীর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু আবার খানিকটা অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি যদি তার শরীরের কোনো স্থানে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে আবার সে সুস্থ হয়ে উঠবে। এর থেকেই আবিষ্কার হালো ডায়েবিটিস রোগে ইনসুলিন প্রয়োগের কথা। এই ইনসুলিন জন্তুর শরীরের অগ্ন্যাশয় থেকেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। দেখা গেছে যে, ওর জারক রস নির্গমনের নলটি বন্ধ ক'রে দিলেই তখন অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে প্রচুর ইনসুলিন নির্গত হতে থাকে, অর্থাৎ একটা

রস বন্ধ ক'রে দিলেই অন্য রসটা বেড়ে যায়।

বৃহদান্ত্রের কাজ

হজমতন্ত্র সম্পর্কীয় সব কথা শেষ হয়ে যাবার পরেই আসে মলাদির কথা। আমরা যা-কিছুই খাই তার সমস্ত জিনিসটাই হজম হয়ে যায় না, সার বস্তুগুলি হজম হয়ে যাবার পরে তার খানিকটা জিনিস আবর্জনারূপে অবশিষ্ট থাকে। সেই জিনিসটা ক্ষুদ্রান্ত্রের কুড়ি একুশ ফুট লম্বা রাস্তাটা পার হয়ে শেষে বৃহদান্ত্রের মধ্যে গিয়ে পড়ে। যে জায়গাটাতে গিয়ে পড়ে সেই প্রথম অংশটার নাম সিকাম। এর মুখে একটি পাইলোরাস ধরণের কবাট আছে আবর্জনার অংশটা গ্রহণের উপযুক্ত হলেই সেটা খুলে যায়। ঐ সিকামের প্রান্তদেশেই লেগে আছে ওর লেজের মতো দেখতে একটি অন্ত্রাবশিষ্ট সরু নালিপথ, তার নাম অ্যাপেন্ডিক্স, এবং তারই প্রদাহ ঘটলে অ্যাপেনডিসাইটিস নামক রোগ জন্মায়। এই অ্যাপেনডিক্স অংশটার এখন কোনোই কাজ নেই, এর প্রয়োজন ছিল বহু প্রাচীন যুগে, যখন আমরা মনুষ্যপদবাচ্যই ছিলুম না, এবং বহু ঘাসপাতা ইত্যাদি খাবার দরুণ অন্ত্রে বহু মল ধারণ করতে হোতো। তারই স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এখনও ঐটুকু রয়ে গেছে এবং ওর মধ্যে খাদ্য বা বীজাণু ঢুকে প্রদাহ ঘটিয়ে আমাদের বিপদে ফেলে।

বৃহদান্ত্রের কাজ দুইরকম। একটি হোলো তরল খাদ্যাবশিষ্টের জলীয় অংশটা যথাসাধ্য শোষণ ক'রে নিয়ে বাকি জিনিসটাকে অর্ধতরল ও অর্ধকঠিন মলে পরিণত করা। দ্বিতীয় কাজ সেই মলকে নিষ্কাশিত ক'রে দেওয়া। গোটা বৃহদান্ত্রটি উদর গহ্বরকে বেড় দিয়ে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে এবং দুইদিকে দুটি বাঁক নিয়ে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম অংশটা আরোহী, দ্বিতীয় অংশটা আড়াআড়ি, এবং তৃতীয় অংশটা অবরোহী কোলন নামে অভিহিত হয়। এই কোলনের মধ্যে জোয়ার-ভাঁটার মতো উল্টো স্রোতজনক পেশী সংকোচনের ক্রিয়া হয়ে থাকে। উপরমুখী স্রোত হবার কারণ ওর ভিতরকার মলের অবস্থা তখনও যথেষ্ট তরল আছে, জলের শোষণ হতে তখনও বিলম্ব আছে, অতএব এই স্রোতের বাধা পেয়ে উপরকার ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ প্রান্তের দ্বারটি যাতে রুদ্ধ থাকে এবং সেখানকার খাদ্যাবশিষ্ট নিচে নেমে আসা নিবারিত হয়। এই স্রোতের দ্বারা অনেক সময় পেটের ভিতর ডাকের মতো একটা শব্দ হয় যেটা আমরা নিজেদের কানে শুনতে পাই। আর নিম্নমুখী স্রোত হয় পরিণত মলকে নিচে নামিয়ে দেবার জন্য। মল পরিণত হতে যথেষ্ট সময় লাগে, কারণ কোলনের ভিতরকার ঝিল্লীতে ক্ষুদ্রান্ত্রের মতো ভাঁজ করে বাড়ানো নেই সুতরাং পরিমিত ঝিল্লীর দ্বারা জল শোষিত হতে কিছু সময় লাগে। এই জল শোষণ করা ছাড়া বৃহদান্ত্রের ঝিল্লীর খাদ্যসার শোষণের বা মোক্ষণের কোনোই ক্ষমতা নেই।

কোলনের মধ্য মল বলে যে জিনিসটা প্রস্তুত হয় সেটা কেবলই যে আমাদের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যের আবর্জনা তা নয়। কোলনের মধ্যে বহুপ্রকার বীজাণুর বাস এবং সাধারণত তারা নিরীহ। এইগুলিকে বলে ফ্লোরা। এরা সেখানে উপযুক্ত খাদ্য পেয়ে অনবরতই নতুন নতুন জন্মাচ্ছে এবং অনবরতই মরছে। সেই মৃত বীজাণুগুলি মলের সঙ্গে মিশে মলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং যতটা খাদ্য খাওয়া হবে সেই অনুপাতেই যে মলত্যাগ হবে এমন কোনো কথা নেই। অল্প খেলেও বেশি মল জন্মাতে পারে, আবার বেশি খেলেও অল্প মল হতে পারে। আর সেটা খাদ্যের পরিমাণ ছাড়াও তার প্রকারের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আবার কখনকার খাদ্য কতক্ষণ পরে মলরূপে নির্গত হওয়া উচিত, কিংবা দিনের মধ্যে স্বভাবত কতবার মলত্যাগ হওয়া উচিত তাও নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায় না। মল অপেক্ষাকৃত তরল হওয়া ভালো বা কঠিন হওয়া ভালো তাও নির্ধারিত ক'রে বলা যায় না। সবই নির্ভর করে ব্যক্তিগত ধাত বা প্রকৃতির উপর, এবং ব্যক্তিগত খাদ্য নির্বাচনের উপর। কারো কারো পক্ষে যা-কিছু খাওয়া হয় তার অধিকাংশ আবর্জনাই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মলরূপে নিষ্কাশিত হয়ে যায়, আবার কারো কারো পক্ষে প্রত্যহ দুই তিন দিন আগেকার খাদ্যই মলরূপে নির্গত হতে থাকে। এতে স্বাস্থ্যের কোনো ইতরবিশেষ হয় না, কারণ এটা তার ব্যক্তিগত প্রকৃতি। তবে খাদ্য তাড়াতাড়ি হজম হয়ে তাড়াতাড়ি মলরূপে নির্গত হয়ে যাওয়া প্রত্যেকের পক্ষেই অনেকটাই নির্ভর করে তার খাদ্য নির্বাচনের উপর, ভিতরকার মসৃণতা বা পিচ্ছিলতার উপর, এবং শারীরিক পরিশ্রমের উপর। খাদ্য যদি হয় যথেষ্ট সারযুক্ত (যেমন চোকড় মিশ্রিত আটা ইত্যাদি) এবং যথেষ্ট শাকসব্জি ও ফলমূল খাওয়া যদি অভ্যাস থাকে, তাহ'লে সেটা শীঘ্রই মলে পরিণত হবে, তার পরিমাণও হবে বেশি, এবং দিনের মধ্যে দুই তিনবারও মলত্যাগের প্রয়োজন হবে। আর খাদ্যে যদি অধিকাংশই থাকে মাছমাংস এবং দুগ্ধজাতীয় জিনিস, তাহ'লে মলের সম্বন্ধে বিলম্ব হবে, তার পরিমাণও হবে কম, এবং দিনের মধ্যে একবারের বেশি মলত্যাগের প্রয়োজন হবে না। আজকাল এমনি খাদ্যই অনেকে খায় বলে তাদের কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে থাকে। তা ছাড়া শহরের লোকদের মধ্যে কোষ্ঠ-কাঠিন্য হবার প্রধান কারণ শারীরিক পরিশ্রমের অভাব। শহরে থাকলে তেমন হাঁটাহাঁটিও করতে হয় না, বেশি মেহনতের কাজও করতে হয় না। বাইরে গিয়ে বাস করলেই এগুলি করতে বাধ্য হতে হয়, কাজেই তখন কোষ্ঠকাঠিন্যও ঘুচে যায়। পেটের মাংসপেশীগুলি যদি নিত্য সক্রিয় থাকে তাহ'লে মলত্যাগ সহজ হয়।

সময়ে সময়ে আমাদের উদরাময়ও হয়ে থাকে, এবং তাই নিয়ে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি। এর কারণ ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরকার জিনিসগুলি সম্পূর্ণভাবে হজম হবার আগেই তাড়াতাড়ি বৃহদান্ত্রের মধ্যে নেমে যাওয়া এবং তার জলীয় অংশ উত্তমরূপে শোষিত না হয়ে তাড়াতাড়ি মলরূপে নির্গত হয়ে যাওয়া। অনেক কারণেই এটা হতে পারে। খাদ্য যদি দুষ্পাচ্য হয় এবং প্রচুর পরিমাণে যদি তা খাওয়া হয় (যেমন কাঁচা জিনিস বা পচা জিনিস খাওয়া), অন্ত্রের মধ্যে যদি কোনো রোগবীজাণু প্রবেশ করে (যেমন কলেরা ইত্যাদিতে), কিংবা অন্ত্রের মধ্যে যদি ঘা থাকে (যেমন আমাশা ও টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে), তা'হলে তার দ্বারা উদরাময়ের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কোনো রোগ না থাকলেও উদরাময়কে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কারণ নিত্য নিত্য খাদ্য হজম না হতে থাকলে ওতে পুষ্টির হানি হয়। অনেক সময় লঙ্ঘন দিলেই উদরাময় আরোগ্য হয়ে যায়।

বৃহদান্ত্র পার হয়ে খাদ্যের মল অবশেষে পড়ে গিয়ে মলভাণ্ডে, যাকে ইংরাজীতে বলা হয় রেক্টাম্। কেউ কেউ ভাবে যে, রেক্টাম্ মানে বুঝি মলদ্বার, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। মলদ্বারের নাম এনাস্, আমাদের ভাবাতে পায়ু। মলভাণ্ডটি প্রায়

পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, ওর পরে প্রায় এক ইঞ্চি স্ফিংটার নাম পায়ু। মলভাণ্ডের মধ্যে যখন খানিকটা মল গিয়ে জমা হয় তখন সেখানে তাকে নিষ্কাশিত ক'রে দেবার জন্যে একটা "বেগ" আসে। মূত্রবেগ আসার মতো এও নার্ভের প্রতিক্ষেপ ক্রিয়ার ফল। এই বেগের ফলে ওখানকার সংকোচন ক্রিয়া ঘন ঘন হতে থাকে এবং পায়ু কর্তৃক কুন্থনের দ্বারা মল নির্গত হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মলভাণ্ডের মল অধিকাংশ পরিমাণে না বেরিয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এই কুন্থন ক্রিয়া থামে না। অভ্যাসের ফলে প্রত্যেকেরই এই মলবেগ আসবার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। যার যেমন সময়ে মলত্যাগ করা অভ্যাস তার সেই সময়েই মলবেগ আসে। এই বেগকে ইচ্ছাপূর্বক রোধ করা যায়, তখন আবার পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে সেই বেগ আসতে পারে। কিন্তু তাতে মল অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়, এই কারণে প্রত্যহই নির্দিষ্ট সময়ে মলত্যাগ করবার অভ্যাস বজায় রাখা উচিত।

অজেয় গোয়েন্দা

জি কে চেস্টরটন

অনুবাদকঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চিঠিখানা মেজর ব্রাউন আমাদের নিজেই পড়ে শোনালেন। রুপার্ট গ্র্যান্টের চোখদুটি যেন শিকরে বাজের চোখের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠ্‌ছিলো আস্তে আস্তে। পত্রপাঠ শেষ হলে সে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"চিঠিখানার ওপরে কি কোনও ঠিকানা দেওয়া আছে?"

"কই, নাতো। ওহো, এই যে দেখছি ঠিকানা রয়েছে।" ঠিকানাটা পড়ে শোনালেন মেজর ব্রাউন, "১৪নং ট্যানার্স কোর্ট, উত্তর—"

উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠ্‌লো রুপার্ট, "তবে আর এখানে সময় নষ্ট করছি কেন? চলুন, যাওয়া যাক্‌। বেসিল, তোমার রিভলবারটা আমাকে দাও তো—।"

আগুনের চুল্লীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বেসিল, যেন মন্ত্রমুগ্ধ। কিছুক্ষণ পরে সে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লো, "রিভলবারের দরকার হবেনা তোমার।"

"হয়তো হবেনা, হয়তো হবে।" ফার-কোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে রুপার্ট বললো, "কিছুতো বলা যায় না। গুণ্ডাদের আস্তানায় যাচ্ছি যখন, সঙ্গে একটা—"

"তোমার কি ধারণা এরা গুণ্ডা?"

হা হা করে রুপার্ট হেসে উঠ্‌লো, "গুণ্ডা নয়তো কি সাধুপুরুষ? নির্দোষ একজন ভদ্রলোককে যারা কয়লাকুঠুরির মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে চায় তুমি হয়তো তাদের সাধুপ্রকৃতির লোক বলে মনে করতে পার, কিন্তু—"

"তোমার কি মনে হয় মেজরকে তারা হত্যা করতে চেয়েছিল?" আগের মতোই নির্লিপ্ত বেসিলের কণ্ঠস্বর।

"তুমি তা হলে কিছুই শোননি দেখছি? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি? নাও, এই চিঠিটা দেখ।"

পাগ্‌লা জজ্‌ বেসিল গ্র্যান্ট শান্তস্বরেই বললো, "না, ঘুমোইনি। চিঠিটাকেও তো আমি দেখ্‌তেই পাচ্ছি—।" আসলে কিন্তু বেসিল সেই চুল্লীটাকেই দেখছিল। সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই সে বললো, "গুণ্ডারা কখনো এ-ধরণের চিঠি লেখে না।"

ফিরে দাঁড়ালো রুপার্ট গ্র্যান্ট, দু চোখে তার ঠাট্টা উপছে পড়ছে। ব্যঙ্গের গলায় সে বললো, "বেসিল, তুমি অবাক্‌ করলে! এ-ই সেই চিঠি। কেউ না কেউ এ-চিঠি লিখেওছে, এবং এতে আক্রমণেরও নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। তবু তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? লণ্ডন শহরটা যে ইংল্যাণ্ডেরই মধ্যে—তাতেও কি তোমার অবিশ্বাস?"

বেসিলকে দেখে বুঝলাম, নিঃশব্দ হাসির অদম্য বেগে সারা শরীর তার কেঁপে কেঁপে উঠছে। তবে, মুখে তার প্রকাশ নেই। সে শুধু বললো, "রুপার্ট, ব্যাপারটা ঠিক ওভাবে দেখলে চলবে না। ওধরণের যুক্তি দিয়ে বিচার চলবে না এর। চিঠিটার মেজাজটা কি তুমি ঠিক্‌ বুঝতে পেরেছো? এ কখনোই খুনীর চিঠি নয়।"

"আলবৎ খুনীর চিঠি।" রুপার্ট তার সেই অকাট্য যুক্তির জের টেনে বললো, "একবার নয়, একশোবার। এবং চিঠির ভাষার মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে।"

"প্রমাণ!" মন্ত্রোচ্চারণের মতো বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগলো বেসিল, "এই প্রমাণ জিনিসটাই যে কতো সময় প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে ফেলে কে তার খবর রাখে! কে জানে, আমারই হয়তো ভুল; আমিই হয়তো পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু হ্যাঁ, সেই লোকটারও তো প্রমাণেরই ওপর সর্বকিছু ছেড়ে দেবার অভ্যাস; তা সত্ত্বেও জেনে রাখো, তার বিচারবুদ্ধির ওপর আমার এতটুকু আস্থা নেই। কি যেন তার নাম, ওই যে সেই দারুণ দারুণ সব গল্পের নায়ক? হ্যাঁ, মনে পড়েছে,—শার্লক্‌ হোম্‌স্‌। যা বলছিলাম; খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাই আমাদের এক একটা সিদ্ধান্তে নিয়ে গিয়ে হাজির করে সত্যি, তব প্রায়ই দেখা যায়—সেগুলি ভুল সিদ্ধান্ত। প্রমাণতো আর নির্দিষ্টপথ নয়, ডালপালার মতো নানান দিকে তার বিস্তার। তথ্য বহুমুখী, কিন্তু সত্য এক। সত্য হলো গাছের প্রাণশক্তির মতো, সবসময়েই সে ঊর্ধমুখে সূর্যপ্রয়াসী।"

"ওসব বড়ো বড়ো কথা ছেড়ে দাও, কাজের কথায় এসো। এ চিঠিতেও যদি অপরাধের ইঙ্গিত না থাকে তো কী আছে এর মধ্যে বুঝিয়ে দাও।"

বেসিল বললো, "অনেক কিছুই থাক্‌তে পারে, আমি নিজেই কি তা বুঝতে পেরেছি? আমি শুধু এই চিঠিটাকেই এখানে দেখছি মাত্র। তাতে আপাতত এই কথাই মনে হচ্ছে যে, এর মধ্যে কোনও অপরাধের ইঙ্গিত নেই।"

"এ চিঠি লিখবার অর্থ?"

"জানি না। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।"

"না-ই যদি বোঝো, আমাদের ব্যাখ্যা-টাকেই কেন মেনে নিচ্ছ না?"

বেসিল সেই আত্মসমাহিতভাবেই আগুনের চুল্লীর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ; মনো হলো ধীরে ধীরে সে তার চিন্তাকে সুশৃঙ্খল করে নিচ্ছে। তারপর সে বললো, "মনে করো, এক জ্যোৎস্নাঢালা রাত। সেই রাতে তুমি বেড়াতে বেরিয়েছো। মনে করো, জ্যোৎস্নার সেই নির্জন আলোতে তুমি পথ হাঁটছো। হাঁটতে হাঁটতে অনেক রাস্তা, অনেক গলিঘুঁজি পার হয়ে শেষে এক ফাঁকা ময়দানের মধ্যে এসে পৌঁছুলে। চারিদিকে তার গোটাকতক স্তম্ভ শুধু। আর ঝলমলে পোষাক-পরা এক নর্তকী সেই ম্লান জ্যোৎস্নায় নেচে চলেছে। তুমি তাকে দেখলে। দেখার পর মনে হলো, আরে এতো মেয়ে নয়—ছদ্মবেশী পুরুষ। আবার তাকে দেখলে তুমি, আবার। তারপর বুঝলে যে, এই ছদ্মবেশী পুরুষ আর অন্য কেউই নয়, স্বয়ং লর্ড কিচেনার। কী তখন তোমার মনে হবে?"

একমুহূর্ত থেমে রইলো বেসিল, তারপর আবার বললো, "এ-যা বললাম এরও একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে বটে, তবে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। ঝলমলে পোষাক পরার সহজ ব্যাখ্যা হলো এই যে, মানুষকে তাতে সুন্দর দেখায়। তবে কি সুন্দর দেখাবার জন্যেই লর্ড কিচেনার ওই নর্তকীর ঝলমলে পোষাক পরে নেচে বেড়াচ্ছেন? পাগলেও তা ভাববে না। তার চাইতে বরং একথা ভাবা যায় যে, তাঁর প্রপিতামহীর হয়তো নাচের ঝোঁক ছিল, বংশানুক্রমে লর্ড কিচেনার এখন সেই নৃত্যোন্মাদনার অধিকারী হয়েছেন। কিংবা হয়তো হিপনোটাইজ করে তাকে নাচিয়ে নিচ্ছে কেউ; কিংবা কোনও গুপ্ত-সমিতি হয়তো তাঁকে শাসিয়েছে, না-নাচলে তাকে খুন করা হবে। এ-নাচ তাহলে স্বাভাবিক নাচ নয়। স্বাভাবিক হলেই অবশ্য মনে করা যায়, লর্ড কিচেনার না-হয়ে ব্যক্তিটি যদি লর্ড ব্যাডনপাওয়েল হন। জজ-এর চাকরি করার সময় তাঁকে আমি বেশ ভালভাবেই জানতাম কিনা, তাই একথা বলতে ভরসা পাচ্ছি। সে যাই হোক, লর্ড কিচেনার আর লর্ড ব্যাডনপাওয়েলের মধ্যে যে-পরিমাণ প্রকৃতিগত পার্থক্য, এ-চিঠি আর একটা খুনীর চিঠির মধ্যেও ঠিক ততখানিই পার্থক্য বর্তমান। জেনে রেখো, এ-চিঠি যে লিখেছে—আর যাই হোক সে গুণ্ডাবদমাস নয়। আসল কথা পরিবেশ বড়ো বিচিত্র জিনিস।" বক্তৃতা থামালো বেসিল, কপালের ওপর হাত রেখে চুপ করে রইলো।

রুপার্ট এবং মেজর ব্রাউন, শুধু একবার তাকালো তার দিকে। সে দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা এবং কৌতুক দুইই মেশানো রয়েছে।

রুপার্ট বললো, "অতোশতো বুঝি না, আমি চললাম। আমার যা ধারণা সে তোমাকে বলেছি। এখনো তার পরিবর্তন হয়নি। অপরাধের ইঙ্গিত দিয়ে যে চিঠি লেখে, তার ইঙ্গিতে সে অপরাধ যখন সংঘটিতও হয়, তখন আর যাই হোক তাকে একটা সাধুপুরুষ ভাবা চলে না। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তোমার রিভলবারটা কি পাওয়া যাবে?"

"নিশ্চয়ই," দাঁড়িয়ে উঠে বেসিল বললো, "রিভলবার তুমি নিশ্চয়ই পাবে, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।" বলে সে একটা জামা গায়ে দিয়ে নিল, ঘরের কোণ থেকে একটা গুপ্তীলাঠিও সঙ্গে নিতে ভুললো না।

"তুমি আবার কোথায় যাবে!" বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো রুপার্ট, "তুমি তো আজকাল বাইরের হাওয়া বড়ো একটা গায়ে লাগাওনা, তোমার আবার এ-শখ কেন?"

বেসিল ততক্ষণে একটা পুরোনো শাদা টুপিও তার মাথায় পরে নিয়েছে। সে বললো, "বাইরের হাওয়া গায়ে লাগাইনা সত্যি, তবে সে-হাওয়া যখন একটু গোল-মেলে হয়ে ওঠে তখন তার অর্থ না বুঝেও আমি তৃপ্ত হইনা।"

বলে সে বাইরে বেরিয়ে পড়লো। ল্যাম্বেথের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। নিঃশব্দে আমরা পথ হাঁটছি,—মেজর ব্রাউন, রুপার্ট, আমি এবং বেসিল। ওয়েস্ট্-মিনস্টার ব্রীজ ছাড়িয়ে, এমব্যাঙ্কমেণ্টের পাশ কাটিয়ে, আমরা হাঁটছি। গন্তব্যস্থল ফ্লীট স্ট্রীট, ট্যানার্স কোর্ট। সর্বাগ্রে মেজর ব্রাউনের ঋজু অস্পষ্ট চেহারা, তার পেছনে রুপার্ট গ্র্যাণ্ট। তীব্র হাওয়ায় তার ওভার-কোট দুলছে। গল্পের বইয়ের ডিটেকটিভের মতোই তার হাবভাব। মেজরের ঠিক উল্টো। মেজাজে সে এখনো সেই ছোকরা-ছেলেটিই রয়ে গেছে। ইংল্যাণ্ডের কাব্য, তার বর্ণ-বৈচিত্র্যের সে একনিষ্ঠ ভক্ত। ওদিকে বেসিল হাঁটছে সবার থেকে পিছনে; দৃষ্টি তার পথের দিকে নয়, আকাশের দিকে নিবন্ধ। কেমন যেন নিশিতে-পাওয়া তার দৃষ্টি, তার এই শ্লথসঞ্চার।

ট্যানার্স কোর্টে এসে পৌঁছেচি। রুপার্ট থেমে দাঁড়ালো। মনে হলো, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সে বেশ উৎসাহিত হয়েছে। ওভারকাটের পকেটে সেই রিভলবার, দৃঢ়-মুষ্ঠিতে সে তাকে অনুভব করে নিলো।

রুপার্ট বললো, "তাহলে এবার ঢোকা যাক?"

"তার আগে পুলিশ ডাকবো না, পুলিশ?" জিজ্ঞেস করলেন মেজর ব্রাউন; হাতের কাছে যদি পুলিশ পাওয়া যায়, সেই আশাতেই চট করে একবার রাস্তার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

"ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।" ভ্রূ কুঁচকে রুপার্ট বললো, "ব্যাপারটা যে একটা শয়তানী কারসাজী, তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। তবে পুলিশ না হলেও বোধ হয় চলবে। আমরাও তো দলে ভারী আছি, ভয় কি? তাছাড়া—"

"না, পুলিশের কোনও দরকার নেই।" বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই প্রথম বেসিল কথা কইলো। কেমন যেন অদ্ভুত শোনালো তার কণ্ঠস্বর। রুপার্ট তার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো।

তারপরেই যেন সে চমকে উঠলো, "বেসিল! বেসিল! তুমি এত কাঁপছো কেন? কী হয়েছে তোমার? ভয় পেয়েছো?"

মেজর বললেন, "বোধ হয় শীত লেগেছে।" বেসিল যে থরথর করে কাঁপছে, তাতে আর এতটুকুও সন্দেহ নেই।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রুপার্ট তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো, বেসিল তবু কথা কয় না। হঠাৎ যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো রুপার্ট, রাগে খেঁকিয়ে উঠলো, "ও, তোমার হাসা হচ্ছে বুঝি? লুকিয়োনা, তোমার ওই নিঃশব্দ ঠাট্টার হাসিকে আমি চিনি। হাসবার আর তুমি সময় পেলে না? একদল গুণ্ডার আড্ডায় এসে কোথায় এখন—"

বেসিল শুধু বললো, "কেন হাসছি, সেকথা এখন থাক। আপাতত জেনে রাখো, পুলিশ ডাকবার দরকার নেই। দলে আমরা চারজন আছি, চারজনেই মস্ত বীর, দরকার পড়লে চারশো লোকের মহড়া নিতে পারবো।" বলে সে আবার তার সেই রহস্যময় হাসিতে ভেঙে পড়লো।

অধৈর্য হয়ে ফিরে দাঁড়ালো রুপার্ট, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে সেই ফ্ল্যাট বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। আমরা যে তার অনুসরণ করলাম, সেকথা বলাই বাহুল্য।

১৪নং কামরার সামনে এসে সে থামলো, দেখলাম—হাতের মধ্যে তার সেই রিভলবারটা ঝকমক করছে।

"লাইন বেঁধে দাঁড়াও", ফৌজী কায়দায় হুকুম দিল রুপার্ট। বললো, "শয়তানগুলো হয়তো এখন পালাবার ফিকিরে আছে। চট করে আমাদের ঢুকে পড়তে হবে।"

চারজনে আমরা সার বেঁধে দাঁড়ালাম। বুক আমাদের ভয়ে দুরদুর করছে; কী হয়, কী হয়! বেসিলের মুখে কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, তখনো সে হাসছে। রুপার্টের দিকে তাকালাম। মুখের চেহারা ফ্যাকাশে, চোখের চেহারা অস্বাভাবিক। নীচু ফ্যাসফেসে গলায় সে বললো, "তৈরি থাকো; যে মুহূর্তে আমি 'চার' বলবো, সংগে সংগে তোমরা আমার পিছন পিছন ঢুকে পড়বে। যদি বলি 'পাকড়াও', তো যে-ই সামনে পড়ুক না কেন, তাকে একেবারে মাটির ওপর পেড়ে ফেলবে। যদি বলি 'থামো' তো থামবে। গুণ্ডারা যদি দলে ভারী হয়, একমাত্র তাহলেই আমি 'থামো' বলবো। যদি তারা আমাদের ওপর চড়াও হয়, বেপরোয়া গুলী চালাবো। বেসিল, তুমিও তোমার গুপ্তিখানাকে তৈরি রেখো। রেডি! এক, দুই, তিন, চার!"

'চার' বলার সংগে সংগেই সে দড়াম করে দরজাটা খুলে ফেললো, আর আমরাও গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ঘরের মধ্যে। তারপরেই এক বিস্ময়ের ধাক্কা।

ঘরখানা, দেখে মনে হলো, সাধারণ একটি অফিস-কামরা। ঠিক সেই রকমেরই সাজানো-গোছানো, আর—আর সেই ঘরের মধ্যে জনপ্রাণী নেই। ভালো করে আবার তাকিয়ে দেখলাম চারদিকে, তখন দেখি ঘরের এক কোণে অজস্র ড্রয়ারওয়ালা বিরাট একটা টেবিলের আড়ালে কে-একজন বসে রয়েছেন। ছোটখাটো মানুষটি, মোমে মাজা সূক্ষ্ম গোঁফ। কাছে আসতে তিনি চোখ তুলে চাইলেন।

"অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছিলেন বুঝি?" বিনয়-নম্র কণ্ঠে তিনি বললেন, "বড়োই দুঃখিত, আমি শুনতে পাইনি; তা কী দরকার আপনাদের?"

কিছুক্ষণ চুপচাপ, কারুর মুখেই কথা নেই। সকলেই আমরা মেজরের গা টিপছি; তাঁর ব্যাপার, তাঁরই তো কথা বলা উচিত। গম্ভীরভাবে মেজর ব্রাউন সেই চিঠি-খানাকেই সামনে এগিয়ে দিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "আপনার নামই কি পি জি নর্টহোভার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

"তাহলে—" দৃষ্টিকে আরও কঠিন করে আরও গভীর গলায় মেজর বললেন, "এ-চিঠি আপনারই লেখা?" বলেই তিনি চিঠি-খানাকে টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন। নর্টহোভারের আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না।

টেবিলের ওপরেই একটা ঘুষি মারলেন মেজর ব্রাউন; তারপর বললেন, "কী, কথা বলছেন না যে? ব্যাপারটা কি?"

সূক্ষ্ম গোঁফওয়ালা সেই ভদ্রলোক তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কোন্ ব্যাপার?"

কড়া সুরে মেজর ব্রাউন বললেন, "কিছুই যে বুঝতে পারছেন না দেখছি? আমিই মেজর ব্রাউন।"

"ও, আপনিই?" নর্টহোভার মাথা নুইয়ে বললেন, "বড়োই আনন্দিত হলাম। তা, আপনি কিছু বলবেন?"

মেজর ব্রাউনের ধৈর্যের তখন বাঁধ ভেঙে গেছে। গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে তিনি বললেন, "আমি! আমার আর বলবার কী আছে? এবার মশাই আপনার বলবার পালা। এসবের মানে কি, এই চিঠির? চালাকি করবার আর—"

"ও, ওই চিঠি? চেয়ার ছেড়ে নর্টহোভার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "আপনারা সব বসুন, এক্ষুণি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।" বলে তিনি ইলেকট্রিক বেলের বোতাম টিপলেন। পাশের ঘরেই ঘণ্টা বেজে উঠলো। নর্টহোভার বসতে বললেন বটে, তবে মেজর বসলেন না। চেয়ারের হাতলের ওপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, মেঝের ওপর পা ঠুকতে লাগলেন।

পরক্ষণেই ভিতরের দিকের দরজা ঠেলে সুন্দর মতন একটি ছোকরা-কেরানী ভেতরে এসে ঢুকলেন, পরণে ফ্রক-কোট।

নর্টহোভার তাঁকে বললেন, "মিঃ হপসন, ইনিই হচ্ছেন মেজর ব্রাউন। এঁর সম্পর্কে যেটা আপনাকে আজ সকালে তৈরি করে রাখতে বলেছিলাম, এক্ষুণি সেটা শেষ করে নিয়ে আসুন।"

"এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।" বলে মিঃ হপসন চকিতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

মিঃ নর্টহোভার তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা কিছু মনে করবেন না, হাতের কাজগুলো ততক্ষণে আমি শেষ করে ফেলি। কাল থেকে আমি ছুটি নিয়ে বাইরে যাচ্ছি, কাজগুলো তার আগে চুকিয়ে যাওয়া দরকার। হ্যাঁ, কাল থেকেই ছুটি নিচ্ছি, খুব খানিকটা ঘুরে আসবো এবার। হাঃ-হাঃ।"

শিশুর মতন দিলখোলা হাসি হেসে তিনি তাঁর কলম তুলে নিলেন, নিস্তব্ধতা নেমে এল। সেই নীরবতার মধ্যেই খসখস করে কলম চলতে লাগলো তাঁর, আর আমরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসতে লাগলাম।

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটতো জানি না, ভেতর দিকের দরজা খুলে আবার মিঃ হপসন এসে ঘরে ঢুকলেন। নর্টহোভারের সামনে একশিট্ কাগজ রাখলেন তিনি, তারপর ফের বেরিয়ে গেলেন।

কাগজখানা মিঃ নর্টহোভার টেবিল থেকে তুলে নিলেন। তার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে অন্যমনস্কভাবে গোঁফে তা দিতে লাগলেন। কলম নিয়ে এখানে-ওখানে এক-আধটু অদলবদল করলেন, ভ্রু কুঁচকে দু-একটা আত্মগত মন্তব্যও করলেন বুঝি, তারপর সেটা গোড়ার থেকে পড়লেন একবার, অতঃপর কাগজখানাকে তিনি মেজর ব্রাউনের দিকে এগিয়ে দিলেন। ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন মেজর ব্রাউন, যেভাবে তিনি চেয়ারের হাতলের ওপর হাত ঠুকছিলেন, তার থেকেই তা বোঝা যাচ্ছিল।

নর্টহোভার বললেন, "পড়ে দেখুন মেজর ব্রাউন; আশা করি, এতে আপনার আপত্তি হবে না।" মেজর পড়লেন। আপত্তি হলো কিনা যথাসময়েই তা জানা যাবে। কাগজ-খানাতে যা লেখা ছিল, হুবহু তা এখানে তুলে দেওয়া হলো।

মেজর ব্রাউন-এর খাতে পি জি নর্টহোভারের পাওনা

		পাউন্ড	শিলিং	পেন্স
১লা জানুয়ারী, অফিস্ হইতে জমা	...	৫	৬	০
৯ই মে, প্যান্‌সির টব ও ২শত প্যানসি গাছ খরিদ	...	২	০	০
ট্রলী ভাড়া	...	০	১৫	০
ট্রলীর জন্য লোকভাড়া	...	০	৫	০
একদিনের জন্য বাড়ী ও বাগান ভাড়া	...	১	০	০
ঘরের আসবাবপত্র ভাড়া	...	৩	০	০
মিস্ জেমসনের মাহিয়ানা	...	১	০	০
মিঃ প্লোভারের মাহিয়ানা	...	১	০	০
একুনে		১৪	৬	০

পাওনা টাকা অবিলম্বে মিটাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(ক্রমশ)

সমুদ্রমন্থন শেষে

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

ক্যাপা সমুদ্রঃ ঘোলাটে চোখের ক্রোধ
ফুঁসে ফুঁসে ওঠে ঃ নিঃসীম তোলপাড়,
ফেনায় ফেনায় পৃথিবীর অনুরোধ
পাক্ খেয়ে ডোবে ঃ দুঃসহ হাহাকার।
আসন্ন ঝড়, দিগন্ত জোড়া কালো প্রচ্ছদপট,
রোমাঞ্চ-কাঁপা সহস্র বিদ্যুৎ,
দুঃস্বপ্নের পাহাড়-ডানায় অস্থির ঝট্‌পট্,
শকুনের মতো আকাশে আকাশে ওড়ে মৃত্যুর দূত,
ফিস্‌ফাস্ করে বাতাসের কানে কানে—
আসন্ন ঝড় সহস্র বিদ্যুতে
ক্ষুব্ধ ভ্রূকুটি হানে।
ক্যাপা সমুদ্র ঃ মৃত্তিকা কাঁপে ত্রাসে
ঘূর্ণি-ঘনানো ঢেউএর অট্টহাসে,
জনপদরেখা ঘোলাটে ধোঁয়ায় অন্ধ মূর্ছাতুর,
আসন্ন মৃত্যুর
বিবর্ণ তুলি-বুলানো নগর গ্রাম ঃ
দিগন্ত জোড়া কালো প্রচ্ছদপট
রোমাঞ্চ-কাঁপা বিদ্যুৎ উদ্দাম।

ঝড়ের কঠিন হাতে অবিরাম সমুদ্র-মন্থন,
রাশি রাশি অশান্ত বুদ্বুদে
ঘূর্ণি নামে ঃ পাক্ খেয়ে ডোবে ক্ষুব্ধক্ষণ,
হাওয়ার ভ্রূকুটি
নিকষ পাহাড়-মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে করে কুটি কুটি।

মূর্ছিত মাটির বুকে আশ্চর্য বেদনা কম্পমান,
প্রতি ধূলিকণিকায় প্রতীক্ষায় রোমাঞ্চিত প্রাণ,
স্বপ্নের প্রবল বন্যা দিগ্‌দিগন্তে ধূলির গৈরিকে,
অবসন্ন পৃথিবীর কানে কানে অস্থির গুঞ্জন—
ভাঙাচোরা তটপ্রান্তে কী কাহিনী রেখে গেল লিখে
আশ্চর্য জীবন-ক্ষুব্ধ ক্ষণ!

সমুদ্র-মন্থন শেষ, আনত সহস্র অজগর;
একটি সোনালি ডিম জন্ম দেয় সমুদ্র-জঠর,
পৃথিবীর কচি ঘাসে আলো-ছোঁয়া প্রসন্ন উৎসব,
নগরে বন্দরে গ্রামে জনপদে ব্যগ্র কলরব।

জল জঙ্গল

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

ঘুমোনো হবে না, কিছুতে না, ঘুমোলে বিষম মুশকিল হবে—এমনি বলাবলি করতে করতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে কেতু দেখল, বেলা একেবারে পড়ে গেছে। আরে সর্বনাশ! উমেশের মা কলা কুটে হয়তো বসে আছে তাদের অপেক্ষায়, লোভী মান্যধর ঘর-বার করছে। ছি-ছি! নিতান্ত স্বার্থপরের মতো কাজ হয়েছে। কি কৈফিয়ৎ দেবে ফিরে গিয়ে?

উমেশকে ডেকে তুলে তাড়াতাড়ি ঘাটে গিয়ে দেখে আর এক বিপদ। বোঠে নেই—জোয়ারের তোড়ে ডিঙিটা দুলছে শুধু।

বিনা বোঠেয় যাবে কি করে, কে নিয়ে নিল বোঠে? খোঁজ—খোঁজ—।

বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হল না। গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে চোর উঠে এল পশুর-তলার দিক থেকে। হি-হি-হি—হেসে একেবারে শতখান হয়ে পড়ে।

সত্যি, এমন হাসি হাসে এই বাদারাজ্যের মেয়েগুলো! হাসির তোড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে জোয়ার-লাগা দেহের যৌবন।

উমেশের দিকে চেয়ে পদ্ম বলে, গান না শুনিয়ে পালাচ্ছিলে। যাও—চলে যাও না! আমি কিছু জানি নে।

বিপন্ন উমেশ বলে, দিয়ে দাও মাইরি। তাড়া আছে।

কেতুচরণ কিছু গরম হয়ে বলে, কাজের সময় কি রকম মস্করা তোমাদের? দিয়ে দাও।

পদ্ম বাগ মানবার মেয়ে নয়। উদাসীন কণ্ঠে বলে, তোমাদের বোঠে জলে পড়ে ভেসে গেছে বোধ হয়। আমি কি জানি?

তারপর কিঞ্চিৎ করুণার্দ্র হয়ে বলে, আচ্ছা—গান তো আরম্ভ হোক। দেখি খুঁজে-পেতে—পাড়ের কোনখানে যদি আটকে থাকে।

উমেশ বলে, এ কি একটা গান গাওয়ার জায়গা? যখন যেখানে হোক, গাইলেই হল?

পদ্ম আবার হেসে ওঠে।

কি রকম জায়গা চাই? সামিয়ানা-ঝাড়লণ্ঠন লাগবে, আসর বসাতে হবে?

অতএব নিরুপায় উমেশ একবার গলা খাঁকারি দিয়ে ডিঙির উপর জুত করে বসল।

পদ্ম বলে, রোসো—ভিজে কাপড় ছেড়ে আসি। আর তোমাদের বোঠে এনে দিই। আসছি এখুনি।

দোয়েল পাখীর মতো যেন নাচের ভঙ্গিতে সে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোঠে নিয়ে ফিরে এল অনতি পরেই। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে পান-খাওয়া তেল-জবজবে এক ছোকরা।

ছোকরাটাকে উমেশ ইতিপূর্বে দেখেছে। হাঁ—দেখেছে বই কি! বেজার মুখে উমেশ সম্ভাষণ করে, কখন আসা হল? এতক্ষণ দেখতে পাইনি তো!

পদ্মই জবাব দেয়, তোমরা ঘুমুচ্ছিলে—সেই সময় এসেছে। দাদা দোকান দিয়েছে—নুন-তেল-চাল-ডাল সমস্ত পাওয়া যায়। খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে—আমাদের দোকানে থাকবে।

উমেশ বলল, গান কিন্তু হবে না। গলা ভেঙে গেছে।

কে ভেঙে দিল গো?

বহু-প্রচলিত এদের এই স্থূলে রসিকতা। কিন্তু পাল্টা জবাব দিতে উমেশের মন হল না। বলে, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল খেয়েছিলাম কিনা!

হলই না হয় গলাখান আছে ভালো। কত খোশামুদি করাবে আমায় দিয়ে?

বোঠে মাটিতে ফেলে তার উপর পাশা-পাশি চেপে বসল পদ্ম আর সেই লোকটা। অর্থাৎ বোঠে হাতে তুলে নিয়ে যে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বে, সে উপায় নেই।

উমেশ অগত্যা গান ধরল—রাবণ-ব পালার গান—'কও দেখি হে লঙ্কাপতি, রা কি বস্তু সাধারণ? চলো রামের সীতে রামকে দিয়ে হইগে গিয়ে শরণাপন।'

অতি পুরনো গান—তবু কথাগুলে কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। গলা-ভাঙার কথা মিথ্যে করে বলেছিল, কিন্তু সত্যি যে ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরুচ্ছে হাসে মতো।

শেষ হয়ে গেলে উমেশ কিছু জিজ্ঞাস করতে ভরসা পায় না। পদ্ম বলে, মন্দ নয় কিন্তু যা-ই বলো—সেবারের মতো হল না।

উমেশ নিজেও জানে সেটা। যাত্রা শুনতে সে এসেছিল এখানে। রাবণ-বধ পালা—অনেক বার শোনা। গান শুনে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। পালা শেষ হবার পর আসরের লোকজন বিদায় হয়ে গেল, উমেশ তখন অধিকারীকে ধরে বসল।

পালা গাওয়া নয়—এ তোমাদের লাঠি বাজি করে বেড়ানো।

অধিকারী বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে লাঠিবাজি বলছ কাকে?

হাঁ, গানের মাথায় লাঠি মারা—

সে নিজে গেয়ে শুনাল। অনেকদিন ধ অনেক যত্ন করে শেখা গানটা। ভাল হয়ে ছিল—পদ্ম এই যে গান শোনানোর বায় ধরল—এই তার একটা প্রমাণ। পদ্ম সেদি ঘুরঘুর করছিল তাদের আশেপাশে। কথ বার্তায় রাত হয়ে গেল বলে উমেশও দলে সঙ্গে খেতে বসেছিল। পদ্ম দেওয় থোওয়া করছিল পরমোৎসাহে।

পদ্ম বলছে, কি হয়েছে আজ বলো তো বড় মুখ করে আমি পদাকে টেনে নি এলাম।

কথা না বলে উমেশ বোঠে তুলে নি নৌকোয় উঠল। বিদেশি মানুষটা— হল বুঝি তার নাম—হেসে ও পদ্মও তো হাসে, কিন্তু ও-লোকা ঝকমকে দাঁতের এ বস্তু হাসি নয়—শা ছুরি দিয়ে খোঁচা-মারা। হাসতে হাস সে হিতোপদেশ দেয়, বোঠে বাইতে জানে তাই কোরো। গান গাইতে যেও না, হবে না।

ছপছপ ছপছপ বোঠে বেয়ে চলেছে। কেতুচরণ বলে, বাড়ি গিয়ে বলা যাবে—ভেবে বের করো দিকি এ কিছু—

উমেশ অন্যমনস্ক ছিল। চমকে উঠে বলল, ও সে হবে। কিন্তু শুনলে তো? গান নাকি হবে না আমায় দিয়ে! গানই গাইব আমি—গান গেয়ে কাঁদিয়ে যাবো, এই আমার পণ।

(৪)

মৌভোগ নাম দিয়েছেন মধুসূদনই। নিজ নামের সঙ্গে একটু মিলও আছে। গ্রাম বসে গেছে—নমঃশূদ্র ও নবশাখে পঁচিশ-ত্রিশ ঘর এসে বসত করছে। আরও আসবে। মধুসূদনের প্রখর দৃষ্টি—যারা আসছে, সর্বরকম সুবিধা দিচ্ছেন তাদের তিনি।

মতিরাম সাধু মাস চারেক আগে এসে ঘর তুলেছেন। সাধু তাঁর কৌলিক উপাধি—অথবা রক্তাম্বর ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন বলে লোকে সাধু নামে অভিহিত করে, সেটা জানা যায় না। সাধু—অথচ কারো কাছে সিকি পয়সার প্রত্যাশী নন। বরং দান-ধ্যান তাঁরই অনেক। এ হেন ব্যক্তি কোন আশায় বাদা অঞ্চলে এলেন কে জানে? এলোকেশী আর ছোট ভাই শ্রীপতিরামকে নিয়ে সংসার। উঁহু—সংসার তাঁর বিষম ভারি। কত জনে যে নিয়মিত পাত পাড়ে এবং রাত্রিবেলা এক একটা মাদুর বিছিয়ে বাইরের দাওয়া ও ঘরগুলোয় শুয়ে পড়ে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। ঘরের পর ঘর তুলে উঠান গোলকধাঁধা করে তুলেছেন, তবু জায়গার অকুলান পড়ে কখনো কখনো। শ্রীপতিরাম সোনা-রুপোর কাজ করে—সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—রাস্তার ধারে চালাঘরে তার দোকান। দেখতে পাওয়া যায়, সারাদিন প্রদীপের সামনে ঘাড় নিচু করে ঠুকঠুক করে সে কাজ করছে। এত বড় সংসারের সমস্ত দায়ঝক্কি—মতিরামেরও ঠিক বলা যায় না—ঐ এলোকেশী মেয়েটার। কেতুর কাছে সে মিথ্যে বড়াই করে নি।

বিকাল বেলা নিদ্রোত্থিত মতিরাম রক্তবর্ণ জলচৌকির পর পা ছড়িয়ে বসে কুলকুচা করছেন। কাঁধে কলসি—কলসির মুখে বাঁধা গামছার পুঁটুলি—কেতুচরণ এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। ভক্তিযুক্তভাবে সে সাধুর পদধূলি মুখে মাথায় দিল।

কোত্থেকে আসছ বাপু? চিনি-চিনি লাগছে—ও-হ্যাঁ—

মতিরাম বারকয়েক তার আপাদমস্তক চেয়ে দেখলেন। এক গাল হেসে কেতুচরণ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমায় না চিনলেও কলসিটা ঠিক চিনবেন।

এই কলসি তো সেদিন জিতে নিলে? বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও।

কেতুও খোশামুদি করে একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে মতিরাম চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, দৃষ্টি অন্দরের চৌকি-ঘরের দিকে।

চশমা চোখে এক শৌখিন ব্যক্তি কানাচের দিক দিয়ে বেরুচ্ছে টিপিটিপি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। মতিরাম মধুকণ্ঠে আহ্বান করলেন, আসুন—আসতে আজ্ঞা হয় ম্যানেজার মশায়। ওদিকে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

থতমত খেয়ে লোকটি বলে, আপনার খোঁজে—

আমি বাইরের ঘরে ঘুমোই। জানা নেই বুঝি?

দেখতে পেলাম না। তাই মনে করলাম—

লোকটি দুর্লভচন্দ্র—মধুসূদন রায়ের কর্মচারী। দুর্লভ নিজে বলে ম্যানেজার। ম্যানেজার জঙ্গলের মধ্যে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে গাছগাছালি কাটায়, নিজেও কুড়াল ধরে কখনো কখনো। বাঁধবন্দির মাটি কাটা হচ্ছে—নিজেই গজকাঠি নিয়ে কুয়ো মাপতে লেগে যায়—

আড়ে চার দীঘে সাড়ে-পাঁচ। চার ইন্টু সাড়ে-পাঁচ কত হবে, হিসেব কর্ না রে পুঁটে। আঠারো। খাড়াই দুই, তা হলে মোট কালি হল গিয়ে আঠারো দুনো বত্রিশ। পুঁটে, তোর পাওনা তা হলে দাঁড়াচ্ছে—

আবার কাজকর্ম অন্তে কে বলবে, এ সেই দুর্লভ? চোখে চশমা, পরনে ধোপদস্ত জামা-কাপড়, পায়ে বার্নিশ করা চিনাবাড়ির জুতো। ফুরফুরে গন্ধ বেরোয় সর্বাঙ্গে, মস-মস করে হাঁটে, কারণে অকারণে পকেটের রঙিন রুমাল বের করে মুখ মোছে।

মতিরামের ডাকে দুর্লভ কাছে এসে দাঁড়ায় অগত্যা।

তারপর—কি বৃত্তান্ত? বাদাবনে সোনা ছড়ানো আছে...সেই তো?
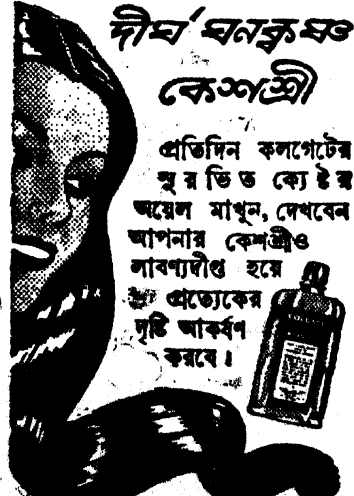
দুর্লভ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, ঠাট্টা করেন কেন? সত্যি কথা, সোনাই বটে। সুঁদুরি-কাঠের ভরা সাজিয়ে কলকাতায় চালান দেবো। মুনোফায় টাকায় যত খুশি গিনি গেঁথে নেবেন। তাহলে সোনা কুড়ানো হল কিনা, বিবেচনা করুন। আর বনকরের বাবুদের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে—জলের দামে কাঠ আনব। লেখা যা থাকবে, তার দেড়া মাল নৌকো বোঝাই হবে।

পুঁজি মিলবে কোথা? আমার টাকাকড়ি নেই। গরজও নেই টাকার। ধনে সারবস্তু কি আছে, সমস্ত মনে। মায়ের নাম জপ করে কোন রকমে দিন কেটে গেলে হল!

কিন্তু একথা দুর্লভ বিশ্বাস করে না। এ অঞ্চলের কেউই করবে না। খরচপত্রের বহর দেখে ইতোমধ্যে রটনা হয়ে গেছে, মতিরাম সাধু মন্ত্রবলে সোনা তৈরি করতে পারেন। মধুসূদনের কাজ করে দুর্লভ খুশি নয়—সে জীবনে উন্নতি করবে। যার নেই মূলধন, সেই যায় বাদাবন। সেই বাদাবনে এসে পড়েছে সমাজ-পরিজন ছেড়ে। কিন্তু সে কি এই জন্যে? ক' পয়সা আয় করা যায় মাটি-কাটার তদারকে? লোক-জনও সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে। আঠারো দুনো বত্রিশ নয়, ছত্রিশ—শিখে যাচ্ছে ধারাপাতের মহিমায়। সামান্য দশ-পাঁচ টাকার জন্য লোনা জল, শুলোর আঘাত ও পিশুর কামড় খাওয়ার মানে হয় না।

নানা সুখ-দুঃখের কথাবার্তা বলে এবং কাঠের ব্যবসায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে দুর্লভ চলে গেল। তার গমনপথের দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে অনুচ্চ কণ্ঠে মতিরাম বললেন, হারামজাদা!

এবং সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরঙ্গ সুরে কেতুচরণের সঙ্গে মুলতুবি আলাপন শুরু করলেন।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে, কিছু বললে না তো বাবা—

কেতুচরণ বলে, দূরে বেশি নয়। আপনাদের ঐ সাঁইতলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম—

দ্বিধান্বিত কণ্ঠে মতিরাম বলেন, সাঁইতলা মানে—

ঘাড় নেড়ে কেতু বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, শুকদাঁড়া সাঁইতলা। বাড়ি সেখানে নয়, নামডাক শুনে এসেছিলাম। তা ঘেন্না ধরে গেল সাধু মশায়। এখন একেবারে কিছু নেই, যত ছ্যাঁচোড়ের বসতি।

মতিরাম প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিলেন।

বেলা তো একেবারে গেছে। এখন আবার চান-টান করবে নাকি?

চান খুব ভালো রকম হয়ে গেছে। গেরো কেমন! ধর্মখেয়া বন্ধ—মাঝি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। অত বড় ফলুইমারি সাঁতরে পার হয়ে এলাম। কুমীর-কামটে গন্ধ পায়নি, তাই বাঁচোয়া।

আহা-হা, বড় কষ্ট পেয়েছ—

কেতু হাসছে, কিন্তু মতিরাম শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কে আছিস? সন্ধ্যে হয়ে যায়, বাবার খাওয়া-দাওয়া হয়নি—এলোকেশীকে বল, তাড়াতাড়ি পাক-শাকের জোগাড় করে দিতে।

কেতু বলে, পাক করতে যাব কোন্ দুঃখে? আপনার নাম শুনে এসেছি সাধু মশায়, মনে মনে আপনাকে গুরুবরণ করেছি।

মতিরাম জিভ কেটে বলেন, গুরু? কি বলছ—কীটস্য কীট আমি—

কেতু একগাল হেসে বলে, বড়রা বলে থাকেন ঐরকম। খবরাখবর না নিয়ে কি এসেছি? মন্তোর দিতে হবে, অমনি দুটো দুটো পাতের প্রসাদও দিতে হবে। স্বজাত ই আমি আজ্ঞে।

মতিরাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর একবার তাকালেন তার দিকে। আর কিছু বললেন না, খড়ম খটখট করে ভিতরে চলে গেলেন।

অতএব কেতুচরণও আর সকলের সঙ্গে দুপুরে ও রাত্রিবেলা যথারীতি দাওয়ায় পাত পেতে বসে, খাওয়ার পর বাইরের ঘরে মাদুর পেতে গড়ায়। এই রকম প্রতিপাল্য সাকুল্যে কত জন—কেতু চেষ্টা করেছে, কিন্তু গুণে ঠিক করতে পারল না। কখন কে আসছে, চলে যাচ্ছে—কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। অতিথি-বাৎসল্য নিয়ে কেউ প্রশংসা করলে মতিরাম জিভ কেটে বলেন, ছি-ছি—কেন তোমরা লজ্জা দাও বলো দিকি? কার কে-বা খায়? সবাই মায়ের সন্তান—মা যা জুটিয়ে দেন, সকলে মিলে ভাগযোগ করে খাই।

কখনো বা বলেন, আগের জন্মে ধেরে খেয়েছিলাম—এ-জন্মে ধার শোধ দিয়ে যাচ্ছি। ওঁরা উত্তমর্ণ—ওঁরাই মান্য। ও'রা ঋণমুক্ত করছেন আমায়।

পতিরাম সারাদিন কাজ করে—স্নান ও খাওয়ার সময় একবার মাত্র বাড়ির মধ্যে ঢোকে। বড় ভাল কারিগর। আশ্চর্য লাগে, এহেন লোক শহরে-বাজারে না গিয়ে বাদাবনের প্রান্তে দোকান সাজিয়ে রেখেছে কি জন্যে? কারুকর্মের কদর বোঝবার লোক এ অঞ্চলে কোথায়? গয়নাই বা পরে থাকে ক'জন?

মতিরাম মাঝে মাঝে হঠাৎ খুলনা চলে যান। দু-পাঁচ দিন কাটিয়ে ফিরে আসেন। যেসব নৌকায় যান, মাঝিরা বলে, ঘাটে নেমে সোজা গিয়ে ওঠেন পুরানো কালিবাড়ি। ঘর-সংসার থাকলেও আসলে তো সাধক মানুষ—অন্তরে আহ্বান আসে, আর ছুটে মায়ের পদতলে গিয়ে পড়েন।

একটা জিনিস কেতুচরণ লক্ষ্য করছে, মতিরাম চলে যাবার পরই দুর্লভ হালদার ব্যবসায়ের কথাবার্তা বলতে এসে পড়ে, বিফলমনোরথ হয়ে কুসুমের হাতের দু-একটা সাজা পান খেয়ে পরম দুঃখে ফিরে চলে যায়।

একবার অমনি রওনা হয়েছেন মতিরাম। ক্রোশ দুই আন্দাজ চলে গেছেন, পিছন থেকে ডাক শুনে নৌকা থামাতে বললেন। ঝোপঝাড় জল-কাদা ভেঙে কেতুচরণ ছুটে আসছে, প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

কাছে এলে মতিরাম বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, ভাল জায়গায় যাচ্ছি, পিছু ডেকে ভণ্ডুল দিলি কেন? কি হয়েছে?

কেতু বলে, ফিটের ব্যামো হয়েছে এলোকেশীর।

অতিমাত্রায় ব্যস্ত হলেন মতিরাম।

বলিস কিরে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। অজ্ঞান হয়ে হাত-পা কষছে ঘরের মধ্যে। তাই দেখেই ছুটে এলাম।

নৌকা উজান নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। মতিরাম নামলেন। দ্রুত পায়ে চলেছেন—দৌড়বার মতো। কেতুই পিছিয়ে পড়েছে। আসবার সময় এত ছুটে এসেছে, এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সেই জন্যেই কি?

তা এলোকেশী রোগিই বটে! দুর্লভ তার হাত চেপে ধরেছে। এলোকেশী বলছে, না-না—এ সমস্ত কি?

ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল তো দুর্লভ দুই কাঁধে দু-হাত রেখে আকর্ষণ করে।

বাবাকে বলে দেবো সমস্ত।

নির্ভীক দুর্লভ বলে, বোলো। না বলো তো অতি-বড় দিব্যি রইল। বলবে, ম্যানেজারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। পারবে না বলতে—লজ্জা করবে?

এলোকেশীর সর্বদেহ কাঁপছে। পানের ডাবর সরিয়ে দিয়ে দুর্লভ মেজের চেপে বসল। কোলের উপর টানছে তাকে।

উঁহু—একি কাণ্ড তোমার বলো তো...

আপনি থেকে ভূমিতে এসে পোঁচেছে এক মুহূর্তে। এমনি সময়ে ভেজানো দরজা খুলে মতিরাম ঢুকলেন। খড়মের আওয়াজে ফিটের যাবতীয় লক্ষণ আরোগ্য হয়ে রোগি মুহূর্তে সামলে উঠেছে। দুর্লভ তক্তাপোশে পা ঝুলিয়ে বসে। কুসুম মেজের উপর পানের ডাবর নিয়ে যথারীতি জাঁতি দিয়ে সুপারি কুচোচ্ছে।

ম্যানেজার মহাশয়ের আগমন হল কখন?

দুর্লভ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল প্রথমটা। সামলে নিয়ে বলল, এই তো—এই এখনই। ভারি এক সুখবর আছে। বনকরে ঢুকবার চেষ্টায় আছি, আশা পেয়েছি। যতই হোক সরকারি চাকরি—সব দিক দিয়ে সুবিধে। কি বলেন? মূলধন নিয়ে আমরা কাইকুঁই করছিলাম—এ যদি লেগে যায়, বিনি পয়সায় কাঠের ব্যবসা ফাঁদব।

এত কথার পরও মতিরামের কিছুমাত্র উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায় না। চুপচাপ—যেন একটু বাঁকা দৃষ্টিতেই চেয়ে আছেন তিনি। মন্মথ পুনরায় বলে, ঈশ্বরজানিত লোক আপনি—দেবীস্থানে বলবেন, যাতে কার্যসিদ্ধি হয়।

কিন্তু বলতাম কি করে দেবীর কাছে?

আমি রওনা হয়ে যাবার পর তবে তো আপনি এসেছেন।

দুর্লভ বলে, তা ঠিক। আপনি ফিরে এলেন—তবে তো দেখা হয়ে গেল। বরাত-জোর আমার।

মতিরাম কঠিন স্বরে বললেন, আজকে একদিনের ব্যাপার নয়—প্রায়ই আসেন এমনি। কত অসুবিধা হয়, বিবেচনা করুন। রায়বাবুর লোক আপনি—উপযুক্ত আদর-অভ্যর্থনা হয় না।

দুর্লভ উদারভাবে বলে, আমি তাতে কিছু মনে করিনে।

কিন্তু আমি যে করি। লোকে মনে করে। আর শুধু মনে মনে রাখে না—মুখেও বলছে অনেক-কিছু আমার অবর্তমানে যখন-তখন ঢুকে পড়েন বলে। আপনারা বড়দরের মানুষ—উঁচু কান অবধি হয়তো সেসব পেঁছয় না।

দুর্লভ বলে, যখন-তখন আসি, কে বলল?

মতিরাম বলেন, জিজ্ঞাসা করলে সবাই বলবে। বলতে হবে কেন, আমি টের পাই। এরকম আসবেন না আর। আসবার দরকার হলে একটা লোক পাঠিয়ে খবর নেবেন, আমি বাড়ি আছি কিনা। অনর্থক এসে হয়রান হয়ে চলে যান, আমার কষ্ট হয়।

দুর্লভ মুখ কালো করে বলে, ভালো মনে করে আসি—তা বেশ, আসবই না আর কখনো।

ভেবেছিল, একটু-কিছু প্রতিবাদ আসবে। কিন্তু মতিরাম সেদিক দিয়ে গেলেন না। সহজভাবে বললেন, চলুন তাহলে—এক-সঙ্গে যাওয়া যাক। কি খবর আছে, শুনতে শুনতে যাই। দেরি করলে গোন মারা যাবে, নৌকো বে'ধে বসে থাকতে হবে তখন।

দুর্লভকে সঙ্গে নিয়ে তবে বেরুলেন। এক রকম গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সামিল। দুয়োরের সামনে কেতুচরণ দাঁত বের করে হাসছে। ও-ব্যাটা এদিকে কি করতে এসেছিল। মতিরামের অনুপস্থিতিতে পাহারা দিয়ে বেড়ায় নাকি—সেইজন্যে দুশমনটাকে রেখেছে?

রোদ চড়চড় করছে। দুর্লভের ছাতির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে মতিরাম চললেন। দুজনে যেন কত সম্প্রীতি!

(৫)

সাইতলা অনেকগুলো—শুধু সাইতলা বললে ধরা যায় না। শুকেদাঁড়া-সাইতলা জুড়ে বলতে হবে। পুরানো এবং বিখ্যাত জায়গা। কেতুচরণ আশায় আশায় গিয়েছিল সেখানে। কিন্তু সেকালের খ্যাতিটাই আছে, সেসব কর্মীপুরুষ নেই।

সাইতলার মোড়লদের লোকে এক ডাকে চেনে। চোর-চক্কোত্তি মশায় ঐ বংশের। চক্রবর্তী বটে, কিন্তু জাতে ব্রাহ্মণ নন। অসাধারণ কর্মকুশলতার জন্য লোকের মুখে মুখে উপাধিটা চলেছিল। সেসব অনেক কালের ব্যাপার—লোকে এখন গল্প বলে উড়িয়ে দেয়।

এক মাদার উপর পঞ্চাশ ঘরের বসতি, জোয়ান ছেলেই অন্তত পক্ষে শ' দেড়েক। সে আমলে কেউ কখনো লাঙলের মুঠো ধরে নি, ব্যাপার-বাণিজ্য করে নি। সমস্তটা দিন দেখতে পাবে, টেরি কেটে, গন্ধ-তেলের বাস্ ছড়িয়ে, তাস-দাবা খেলে অথবা ঘুড়ি উড়িয়ে কাটাচ্ছে। কি সুখের দিন ছিল—অভাব বা ভাবনা-চিন্তা ছিল না কোনরকম।

তা বলে নিষ্কর্মা নয়—তারা বসে খায় না। রাত্রিবেলা—বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে, কাজের চাপাচাপি। নৌকোর কাজে যেত জনকতক—কতক ঘরের কাজে, কতক বা ক্ষেত-খামারের কাজে। খাল বা খাঁড়ির মধ্যে নৌকো বে'ধে আছে, মোড়লদের ডিঙি নিঃশব্দে লাগল গিয়ে তার পাশে। ঘুম ভেঙে উঠে মাঝিরা দেখবে কোমরের গাঁজিয়া কেটে টাকা-পয়সা সমস্ত নিয়ে গেছে। গাঁজিয়া কাটার সময় কাঁচির পে'াচে চামড়ার এক পর্দা যদি কেটে যেত, তাতেও বোধ হয় সাড় হত না। এই হল নৌকোর কাজ। আবার দেখ, আগুন জ্বালিয়ে আগুনের আলোয় চারিদিক দিনমানের মতো করে সতর্ক চাষীরা রাত্রি জেগে পাহারা দিচ্ছে—তারই মধ্য থেকে যেন ভানুমতীর খেলায় খামারের ধান এমন কি, হালের বলদ পর্যন্ত কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক চলে যাচ্ছে; সাইতলার মোড়লদের পক্ষেই সম্ভব শুধু এ ধরনের সাফাই ক্ষেতের কাজ। চেষ্টা করে দেখ—আর কেউ এমনটি পেরে উঠবে না। ঘরের কাজকর্ম হামেশাই অবশ্য দেখে থাকে দশজনা। কিন্তু সাইতলার সঙ্গে সাধারণ ছিঁচকে ও সিঁধেলদের কোন তুলনা হতে পারে না। মান্যধর মোড়ল এবং অন্য বুড়ো মুরুব্বিরা তাদের আমলের গল্প করে, শুনে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়।

মন্তোর-তন্তোর, গুণ-জ্ঞানই বা কত রকমের জানা ছিল! মাড়ি-আটার মন্তোর—ধুলো পড়ে ছুড়ে মারে কুকুরের গায়ে, মাড়ি এ'টে গি[...] কুকুরের মুখ থেকে আওয়াজ বেরুবে না ঘেউ-ঘেউ করে গৃহস্থকে জাগাতে পার[...] না, কামড়াতেও আসবে না। আবা[...] এমনও আছে—দশ-বিশটা কুকুর ডে[...] ডেকে মরে গেলেই বা কি, গৃহস্থে[...] সাড় হবে না নিদালি মন্তোরের গুণে। চাবি খোলার মন্তোর ছিল একরকম—মন্ত্রপ[...] ধুলোর কণিকা মাত্র তালার গায়ে ঠেকি[...] দাও, যত শক্ত তালা হোক—আপনি খু[...] পড়বে। সেকালের যেসব ধুরন্ধরেরা গ[...] হয়েছেন—মন্তোর-তন্তোর শিখে রাখে [...] কেউ। আর দিনকাল বদলেছে, লোকে[...] নিষ্ঠা নেই, মন্তোর তেমন খাটেও না একা[...]

প্রবীণেরা ছোকরাদের রীতিমতো পরী[...] করতেন কে কতদূর বিদ্যা আয়ত্ত করেছে[...] এ-বাড়ির ঘটিবাটি, জিনিসপত্র, ও-বা[...] নিয়ে যাচ্ছে প্রায় চোখের উপর দিয়ে, অ[...] তিলমাত্র টের পাবে না। টের পেলে পরী[...] হার হয়ে গেল, তাতে হেয় হতে হ[...] সাঁইতলার মেয়ে-পুরুষ সকলের চোখে। [...] পরীক্ষাটা বিষম কড়া। পাখি ডিমের উ[...] বসে তা দিচ্ছে—সেই ডিম সরিয়ে আ[...] হবে পেটের তলা থেকে। মগডালের উ[...] বাসা—গাছে উঠবে, বাসার ভিতর হ[...] ঢুকিয়ে ডিম চুরি করবে, নেমে আ[...] গাছ থেকে। এত কাণ্ডের মধ্যেও প[...] টের পাবে না, উড়ে পালাবে না। এই [...] পারো, মোড়লেরা তোমায় অবাধ ছাড়[...] দিয়ে দেবেন। শহরে বাজারে তখন নিঃশ[...] রুজি-রোজগারে লেগে যেও, বড়-বি[...] সবচেয়ে বড় ওস্তাদ স্বর্গীয় চো[...] চক্কোত্তির আশীর্বাদে কখন কোনর[...] বিপত্তি ঘটবে না।

কিন্তু এখন এ সমস্ত নিতান্তই গ[...] কথা। একটু রাত হলে দেখবে, সাইত[...] ঘরে ঘরে দরজায় খিল এ'টে সবাই [...] ডেকে ঘুমুচ্ছে। সাইতলার জোয়ান ছে[...] রাত্রিবেলা দুয়োরে খিল দেয় এবং [...] পড়ে ঘুমোয়! মান্যধর হেন মাতব্বর ব[...] ছেলে উমেশ কুলকর্ম ছেড়ে পিতৃ-পুরু[...] নাম ডুবিয়ে বড়দলে তারক বাড়ুজ্যের ক[...] রাগ-রাগিনী ও তবলার তাল রপ্ত ক[...] যায়। বোঝ তাহলে অবস্থা! কম দু[...] কেতুচরণ সাইতলা ছেড়েছে!

সত্যি ভ্রমণকাহিনী

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

[পূর্বানুবৃত্তি]

৫

টা মজুরদের পাড়া। সকলেই খুব আলাপী। বহুলোকের সঙ্গে আস্তে আস্তে চেনাশুনা হয়ে যায়। ফ্রান্সে থাকবার আইডেন্টিটি-কার্ড আর ইটালি যাবার ভিসার জন্য ফটো তোলাতে গিয়ে আলাপ হয় প্রৌঢ়া ফটোগ্রাফারের সঙ্গে। এখানকার দোকনদাররা ব্যবসায়িক কর্মনিষ্ঠার ভিত্তিতে দোকানে খদ্দের আকর্ষণ করে না; তারা খরিদ্দারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় বন্ধুত্ব করে। বাধ্যবাধকতায় ফেলে তাদের ধরে রাখতে চায়, ঠিক ভারতবর্ষের সিয়রেন্স্ দালালদের কর্মপ্রণালীতে। সেইজন্য ফটোগ্রাফারের মেয়ের সঙ্গে ফরাসী ও ইংরাজি কথাবার্তার 'পাঠবিনিময়'এর ব্যবস্থা হয় লেখকের। এরা ইংরাজিকে বলে মনের ভাষা; কিন্তু না শিখে আজকালকার দিনে উপায় নেই। ইস্কুলে একটা বিদেশী ভাষা সকলকে পড়তে হয়। শতকরা আশিজন ছাত্রছাত্রী ইংরাজি নেয়। যে ইংরাজিটুকু ইস্কুলে শেখে তাতে ভুল উচ্চারণে মাত্র গুড-মর্ণিং, ভেরিগুড গোছের কথা বলা চলে। অথচ ইংরাজীতে চলনসই কথা বলতে পারলেই এই টুরিস্ট আমদানী আর হাল-ফ্যাসন রপ্তানির দেশের চাকরির বাজারে বেশ সুবিধা হয়—বিশেষ করে মেয়েদের। এমন কি আমেরিকার ধনী পরিবারে ছেলে-পিলেদের গভর্নেসের চাকরিও জুটে যেতে পারে। তাই প্রতি ছুটিতে ফ্রান্সের অনেক গরীব মাবাপরা তাদের মেয়েকে ইংলণ্ডে কোন পরিবারের মধ্যে থাকবার জন্য পাঠায়; আর তার পরিবর্তে তাদের মেয়েকে নিজের পরিবারের মধ্যে রাখে। ইংরাজ বাপ-মাও নিজেদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা হীনতাভাবরোগে ভোগে। তা'রা ভাবে যে যে-কোন চাষা-ভুষো ফরাসী পরিবারের মধ্যে কিছুদিন থাকতে পারলেই, মেয়ে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী শিষ্টাচার শিখে যাবে। সেই সঙ্গে ফরাসী ভাষায় একটা দুটো কথা বলতে শিখলেই বিয়ের পাত্রী হিসাবে মেয়ের যোগ্যতা অনেকখানি বাড়বে।

চৌমাথার উপরের শামুকগুলির দোকান-দার মুসিয়ো হিন্দুকে, ইংলণ্ডের একজন মুরুব্বি লোক ঠাউরেছে। একটা অয়েস্টার ফাউ দিয়ে অনুরোধ জানায় তার মেয়ের কোন ইংরাজ পরিবারের মধ্যে থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে—ইংলণ্ডের অনেক পরিবারের সঙ্গে তো আপনার জানাশোনা—মুসিয়োর চেহারা দেখেই একথা বোঝা যায়—সে নিজেও খুব খারাপ পরিবারের ছেলে নয়—'মিদি'তে বাড়ি—ঐ যারা, মেত্রোতে আর বাসে ঠেলাঠেলি করে, কিম্বা 'কাস্কেট' টুপি প্রায় চোখের উপর টেনে দেয়, সে রকম অমার্জিত লোক সে নয়।...... একে এড়িয়ে পথ চলা শক্ত। লেখকের অক্ষমতার কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।

তরকারিওয়ালীর সঙ্গে আলাপ হয়, সমুখে স্তূপাকার করে রাখা, সিদ্ধ বীটের কথা থেকে। লেখকের ধারণা সেগুলো চিনির কারখানা থেকে আনা। এগুলো কি করে খায় জিজ্ঞাসা করায়, তরকারিওয়ালী একটি বীট হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে ছুরি দিয়ে কাটে। তারপর—এই এমনি করে মুখে ফেলে, এমনি এমনি করে চিবুবেন। বুঝেছেন মুসিয়ো?

দুইজনেই হো হো করে হেসে উঠেছিল। সেই থেকে দেখা হলেই দুটো গালগল্প না করে সে ছাড়ে না।

লেখকের হোটেলের সাইনবোর্ডে লেখা আছে যে হোটেলে স্নানের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আসবার পরই জানতে পারে যে মাটির নীচের তলার একটা ঘরে, একটা স্নানের টব আছে বটে; কিন্তু সেই ঘরটা ব্যবহার হয়, হোটেলের তোয়ালে, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি কাচবার লণ্ড্রি হিসাবে। তথাকথিত স্নানের টবটার মধ্যে কাচা হয়; ঐ ঘরেই শুকতে দেওয়া হয়। ভাড়াটেদের সে ঘরে যাওয়া নিষেধ। কাজেই লেখককে স্নানের জন্য যেতে হয় স্নানের দোকানে। ইংলণ্ডে সে যেখানে ছিল সে বাড়িতে স্নান করবার ব্যবস্থা থাকায়, নিয়মিত স্নান করবার অভ্যাসটাকে সে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই সূত্রে তার আলাপ হয় স্নানের দোকানের মার্গটের সঙ্গে। মার্গট কাজ করে, স্নানের দোকানের 'সাওয়ার' বিভাগে। সস্তা বলে এই বিভাগে স্নানার্থীদের লম্বা কিউ; টবের বিভাগে লোক হয় না। লেখক প্রথম দিন কয়েক টবের ঘরে ভিড়ের ভয়ে গিয়েছিল। পরে বেশী খরচের ভয়ে মার্গটের বিভাগেরই টিকিট নেওয়া আরম্ভ করে। মার্গটের বোধ-হয় ধারণা যে এই হিন্দুটা তার সঙ্গে দুটো কথা বলবার লোভেই 'সাওয়ার' এ আসা আরম্ভ করেছে। এই ধরণের প্রশংসাঞ্জলিতে এদেশের মেয়েদের রুচি খুব; দোকানের মালিকের চোখেও এ রকম মেয়ে-দের কদর আছে। টিকিট কিনবার পর যতক্ষণ টিকিটের নম্বরের ঘর খালি না হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। এরই মধ্যে মার্গট এসে গল্প করে যায়, তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে। এই গল্প করবার সুযোগ দেবার জন্য, ইচ্ছা করেও অনেক সময় লেখককে দেরী করিয়ে দেয়—তার পরের লোকের নম্বর আগে ডেকে। সে জানে যে এতে বকশিশের পরিমাণ বাড়ে। সে লেখককে বুঝোয়, টবে আবার বুদ্ধিমান লোকে স্নান করে নাকি; স্নানের শেষে সাবানে ধোয়া সব ময়লাটুকু আবার গায়ে লেগে যায়। টবের ঘরের মহিলা কর্মচারীদের ঠ্যাকার কত তার খদ্দেররা বড়লোক বলে! খদ্দের বড়লোক হল ত তোর কি? বকশিশ কে বেশী পায় তোরা না আমরা? রাই কুড়ায়ে বেল।

'হিন্দুরা খুব স্নান করে'—এই বলে একদিন মার্গট আর একজন ভারতবাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এঁর কথা সে আগেও কয়েক দিন বলেছিল। লেখক কোন ঔৎসুক্য দেখায় নি। 'গান্ধীর ব্যাপারের পর—আর সে ওপথ মাড়ায় না। তবু একদিন দেখা হয়েই গেল।

ভদ্রলোকটি বাঙালী—মুসিয়ো দেবরায়। প্রৌঢ়। চেহারাটি ভাল; লেখকের মত নয়। অনেক বছর থেকে ইউরোপে আছেন। বললেন, আমি 'সাওয়ার'এ স্নান করি কেন জানো? টবে স্নান করতে ঘেন্না করে বলে। কত রকমের লোক স্নান করে; কত রোগ-ভোগ হতে পারে।

লেখক সসংকোচে বলে—গরম জল ত আছেই—ডেটল দিয়ে ধুয়ে নিলেই পারেন। তিনি ডেটল ব্যবহার করে দেখেন নি কখনও। ঐ ওষুধটার গুণাগুণের বিশদ বিবরণ সম্বন্ধে লেখককে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করেন। শেষকালে লেখকের ঠিকানা নেন। একটা কাফেতে এই সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য সময় ঠিক করা হয়। লেখকের সন্দেহ হয় যে ভদ্রলোকের হয়ত ওষুধের এজেন্সি আছে। এই সূত্রেই তিনি হয়ত দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ান।—মার্গট মুখে হাসি নিয়ে সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দেওয়ালের সাইনবোর্ডটাতে লেখা 'যাহারা কাজ করিতেছে তাহাদের ভুলিবেন না'। ভুলবার কি জো আছে! এই বকশিশ দেবার যন্ত্র হিসাবেই বোধহয় মার্গট তাকে দেখে।

বার্নিস আর রঙের যে দোকানটির উপর লেখা আছে 'রিপাবলিকগুলি আসে ও যায়, কিন্তু এই পেণ্ট থাকিয়া যায়'—সেই দোকানের ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল অন্য সূত্রে। তার বিভিন্ন দেশের মুদ্রা জমাবার সখ। লেখকের কাছ থেকে ভারতবর্ষের সিকিদুয়ানি পেয়ে ভারি খুশী। বাড়িতে নেমতন্ন করে খাওয়ায়। ফরাসীরা সাধারণত নিমন্ত্রণ করে রেস্তোরাঁতে। তবে সব জিনিসেরই ব্যতিক্রম আছে। ছেলেটির মা খাওয়ার টেবিলে বলেন যে, তাঁর ছোটমেয়ের ডাকটিকিট জমাবার সখ—সে লজ্জায় আপনাকে বলতে পারছে না—আপনার দেশ থেকে ত চিঠি আসেই।......

কেবল এই ডাকটিকিটের প্রোগ্রামটাই ভারতবর্ষে পরিকল্পনানুযায়ী কেন, তার চাইতেও তাড়াতাড়ি চলছে। এতদিন মনে হত যে, ভাল স্যুট যার যত কম, নিত্য নূতন চটকদার 'টাই'এর, তার তারু তত বাহার। এখন মেয়েটির মুখে সলজ্জ হাসি দেখে মনে হয় যে না, এই ডাকটিকিটগুলোরও সার্থকতা আছে।......

মেয়েটির বাবা জিজ্ঞাসা করেন—আপনার ইংলণ্ড ভাল লেগেছে না ফ্রান্স?

লেখক জবাব দেয়—ফ্রান্স।

—এখানকার মেয়েরা খুব সুন্দর, সেই-জন্য, না? লেখক বুঝতে চেষ্টা করে যে এটা একটা সময়োপযোগী ঠাট্টা কি না। রসিকতা হলে একবার হাসা উচিত। সে দেখে গৃহকর্ত্রী পর্যন্ত অধীর আগ্রহে তার উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন। তার মুখে 'হাঁ' শুনে, সকলে নিশ্চিন্ত হয়। সকলেই জানত যে এই উত্তরই পাবে। ফ্রান্সের মেয়েদের ভাল লাগে না বলে এমন পুরুষের কথা তারা ভাবতে পারে না।......

যে ছেলেটি 'লুমানিতে' বিক্রি করে, সেও তাদের দলের অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এদের অধিকাংশই সর্বহারা শ্রেণীর নয়। যারা সত্য সত্যই মজুর, তাদের মধ্যে কয়েকজনের খুব 'রেস' খেলবার বাতিক। বিনা দ্বিধায় রাত দশটার সময় দরজা ধাক্কা দিয়ে ঢুকে, ঘোড়দৌড়ের কাগজে প্রকাশিত 'টিপ্‌স্‌' লেখককে শোনায়।

এই রকম একটা না একটা সূত্রে পাড়ার লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় বেশ জমে ওঠে। পথে বেরুলেই 'বঁজুর' (সুপ্রভাত)-এর ছড়াছড়ি, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গল্প, কাফেতে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ। এসব থেকে ছুটি পেলে তবেই সে যায় ক্লাসে। ইউনিভার্সিটিতে হিন্দিজানা মুসিয়ো ফিলিকারকে সে খুঁজে বার করেছে। বিভিন্ন জায়গায় লেখকের ক্লাস, ফরাসী সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় জানবার জন্য। তবে ফরাসী সংস্কৃতির ছাত্ররা সকলেই অফরাসী; আর তাদের পাঠ্যবিষয়ে মনোযোগ লেখকেরই মত। কেবল এক রুশ ভাষা পড়বার ক্লাসটাতে লেখক ইচ্ছা করে ফাঁকি দেয় না। ফ্রান্স-রুশ-বান্ধব সমিতির এই ক্লাসটা হয় অনেক রাতে—মজুর পাড়ার মধ্যে। নিজেকে চিমটি কেটে এখানে ঢুলুনি বন্ধ করতে হয়। ভাষাটা না শিখলে রুশে গিয়ে, সেখানকার লোকের সঙ্গে মিশবে কি করে।

মধ্যে মধ্যে সে বেড়িয়ে আসে প্যারিসের বাইরে। গ্রামাঞ্চলেই যায় বেশী। সে চায় সাধারণ মানুষকে জানতে। দেশের নামজাদা লোকদের সঙ্গে দেখা করবার স্পৃহা তার নেই। ফরাসীদের কথা ভাবতে গেলেই, কেবলই মনে পড়ে একরাশ দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী আর গণনায়কের নাম। কিন্তু যুগ যুগ ধরে যে লক্ষ লক্ষ ফরাসী নিজেদের নাম মুছে দিয়ে, এই বড় কয়জনের নাম বড় হরফে লিখবার জায়গা করে দিয়েছে, সে বুঝতে চায় তাদের। কতকগুলো অহংসর্বস্ব মনে প্রেরণার খোরাক জোগানোর অপরাধে, এরা সাজা পেল যাবচ্চন্দ্রসূর্য বিস্মৃতির; কিন্তু এদের কৃতিত্বের কথা লেখক তো ভুলতো পারবে না। যে যত বেশী নামজাদা তার চিন্তাটা তত বেশী বাঁকা-চোরা। লেখক নিজে নামজাদা না হয়েও এই বড়মানুষী-রোগটায় ভুগছে। সাধারণ লোকের অনায়াস সরল মনের গতি সে পেতে চায়। সাধারণ হওয়াটাই মানুষের চরম বিকাশ; অসাধারণত্ব তারই একটা নাকলম্বা কার্টুন। আসল মনটা মরে যাবার পর যেটা থাকে, তাকেই, মুখস্ত বুলিতে বলে চিন্তাশীল মন। মরা ব্যাঙের ঠ্যাংও বাইরের বিজলীতে নেচে সকলকে তাক লাগায়......।

এদেশে পরিচয়গুলো সাধারণতঃ হয়ে থাকে সাময়িক। লেখক সেগুলোকে জীইয়ে রাখতে চেষ্টা করে। এর জন্য চেষ্টা ও পরি-শ্রমের চাইতে প্রয়োজন বেশী অর্থের। তাদের কাফেতে নিয়ে যেতে হয়। সব সময় কাপ্তেনী করবার জন্য তৈরী থাকতে হয়। কারও সখ সাইকেল রেস দেখবার, কারও বা ঘোড়দৌড়ের; সকলের প্রস্তাবেই উৎসাহ দেখাতে হয়। যার গরজ তার খরচ, এ নিয়ম এদেশে নেই। একপক্ষ খরচ করলে অপর-পক্ষ সেটাকে সুদশুদ্ধ শোধ দেবার সুযোগ খোঁজে—অবশ্য মেয়েরা ছাড়া।

সে হিসাব করে মনে মনে—এই রেটে খরচ করলে আট মাসের বেশী তার ফ্রান্সে থাকা হবে না। সরকারী নিয়মের কল্যাণে, ইচ্ছা থাকলেও দেশ থেকে টাকা আনান যাবে না। পরিচয়ের পরিধি বাড়িয়ে কম দিন এদেশে থাকা ভাল, না এ খরচ বন্ধ করে দিয়ে বেশী দিন এদেশে থাকলে ফরাসীজাতটাকে ভাল জানা যাবে? বিনা বিচারে খরচ, তার হিসাবী মন পছন্দ করে না। উপর তলায় ঘর এখনও পাওয়া যায় নি। পেলে ঘরভাড়া কিছু সস্তা হত। চা'টা ঘরে করে নিতে পারলে খরচটা একটু কমানো যেতে পারে। কফির তুলনায় এখানে চা এত আক্রা কেন তা সে বুঝতে পারে না। খুব কম লোকে এদেশে চা খায় বলে বোধহয়। সে চা খাওয়ার যা ছিরি! পাতলা বিনা দুধের চা—সঙ্গে একটুকরো লেবু, আর এক মগ গরম জল! এ চা কস্মিন-কালেও শেষ হতে জানে না—যতবার ইচ্ছে মগের জল ঢেলে ঢেলে, চাপাতা কাচা জল নিতে থাও। কালো কফিটা খেয়েও আজ-

কাল খারাপ লাগে না। তবে মুশকিল হচ্ছে যে কফি খেলেও চা-টা খেতেই হবে—সে যত বিদঘুটে স্বাদেরই হ'ক না কেন। মাঝ থেকে শুধু একটা নেশার জায়গায়, দুটো নেশার বদভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

এই প্রাত্যহিক রেটের ঘরের আসবাবপত্র কার্পেট, দেওয়ালের কাগজ সবই অপেক্ষাকৃত ভাল। সেইজন্য এই ঘরে স্টোভ জ্বালান বারণ। কাগজ কলমে অবশ্য সব তলাতেই স্টোভ জ্বালানো মানা। এক হোটেলওয়ালার ঘর ছাড়া আর কোন ঘরেই গ্যাসের উননের ব্যবস্থা নেই। তবে উপরের তলার ঘর-গুলোতে রেঁধেবেড়ে খেলে হোটেলওয়ালা দেখেও দেখে না। দোতলার ঘরে স্টোভ জ্বালতে দিলে নাকি দু একদিনের যাত্রী-দের চোখে হোটেলের আভিজাত্য কমে যায়। দেওয়ালের কাগজের জেল্লাও নাকি তাতে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। পাটীগণিতে অঙ্ক ছাড়া ওয়ালপেপার সমস্যা যে তার জীবনে কোন দিন চিন্তার বিষয় হতে পারে, একথা সে কখন কল্পনাও করতে পারে নি।

কম্বলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে বেশ লাগে। বাইরে বৃষ্টির ছিপ ছিপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। মোটর হর্নের আর ট্রাফিক পুলিশের বাঁশির শব্দ কানে আসছে। তবু ভাবতে ইচ্ছে করে যে এখনও বেলা হয় নি। আর কিছুক্ষণ পরে উঠলেও, অন্তত দ্বিতীয় ঘণ্টার ফরাসী ভাস্কর্যের ক্লাসটা পাবে, এই প্রবোধ দিয়ে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে ইচ্ছা করে।......ভাগ্যে কাচের জানলাটার উপর বোনালেসের পর্দাটা আছে! তাই ঘরের ভিতরটাতে প্রত্যুষের ঘোরঘোর ভাবটা বজায় আছে। মনে পড়ে বহুকাল আগেকার ট্রেনের ভিতরের একটি ঘটনা। উপরের বাঙ্কে মালপত্তর সঙ্গে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন একজন মুসলমান ভদ্রলোক। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারেন যে ভোর হয়ে গিয়েছে। উপর থেকে লেখককে নির্বন্ধ অনুরোধ করলেন কামরার জানলা দরজার কপাটগুলো বন্ধ করে দিতে। তার-পর হন্তদন্ত হয়ে টিফিনকেরিয়ার খুলে বসলেন। তখন রমজান চলছে। সেই লোকটির মনোভাবের সঙ্গে নিজের বর্তমান মনো-ভাবের তুলনা করে হাসি আসে।......হঠাৎ দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে ওঠে। আবার পুলিসটুলিস নয়ত!

—'আন্ত্রে' (ভিতরে আসুন)।

একমুখ হাসি, আর একগোছা ঝরা চেস্টনাটের পাতা নিয়ে ঘরে ঢোকে অ্যানি।

—"সুপ্রভাত মুসিয়ো! আজকে আপনার মোটা সকাল নাকি?"

ফরাসী ভাষায় 'মোটা সকাল করা,' মানে দেরী করে ওঠা। সাধারণত ছুটির দিনে সকলেই মোটাসকাল করে।

—"যার সকাল সকাল উঠবার সুনাম আছে, সে অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে পারে।"

অ্যানি হাসতে হাসতে চেস্টনাটের পাতা-গুলো একটা প্রকাণ্ড মগের মধ্যে রাখে। শুকনো ঝরাপাতা থেকে সৌন্দর্য নিংড়ে নিতে ফরাসীরা ছাড়া আর কোন জাত পারবে না।

অ্যানি বলে,—আপনাদের কিন্তু বেশ! যেদিন ইচ্ছা 'মোটা সকাল' করলেন। ইউনি-ভার্সিটিতে গেলেন গেলেন, না গেলেন না গেলেন। একদিন লাইব্রেরীতে না গিয়ে, টেবিলের বইয়ের আণ্ডিল না হয় বাড়িতে বসেই পড়লেন। মন গেল তো বাড়িতেই কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলেন। না মালিকের বালাই, না মালিকানীর বালাই!

—"বালাই পয়সার। আর বালাই চায়ের।"

—"চায়ের?"

—হাঁ চায়ের কথাই ভাবছিলাম শুয়ে শুয়ে।

অ্যানি সব জানে। ভারতবর্ষে চা হয়। কালকুত্তার লোকে খুব চা খায়। চা খেলে খুব ছেলেপিলে হয় নাকি? কফি জিনিসটা ভাল; চায়ের মত শরীরের ক্ষতি করে না। বেশী চা খেলে গাল দুটো বসে জুতোর সোলের মত দেখতে হয়ে যায়। ইংরাজরা দুধ দিয়ে চা খায় তাও সে জানে।

—"আপনার বয়স কত হল মুসিয়ো?"

লেখক প্রথমটা হকচকিয়ে যায়—নিজের বয়সটা যেন হাতড়ে [illegible] না। আবছাভাবে মনে হয় যে বয়সটা একটু কমিয়ে বলা উচিত। অথচ বেশী কমাতে বিবেকে বাধে। এক বছর কমিয়ে সে নিজের [illegible] বলে।

—"দেখে কিন্তু আরও দু তিন বছরের ছোট মনে হয়।" বেশ লাগে অ্যানির এই কথাটা।

লেখকের এর আগেকার মুহূর্তের মুখ-চোখের ভাবটাকে, অ্যানি চায়ের সমস্যাজনিত উদ্বেগের লক্ষণ বলে ভুল করে।

বলে "অসুবিধা কিসের? এই ঘরেই চা তৈরীর ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। মালিকানী জানতেও পারবে না। ঘর পরিষ্কার করি আমি অন্যলোকে জানবে কি করে? কিছু ভাববেন না মুসিয়ো। আমার উপর ছেড়ে দিন এর ব্যবস্থা। দিতে দেরী করছে কেন উপরতলাতে ঘর, হোটেলওয়ালা! পণ্ডিত মানুষ আপনি মুসিয়ো আপনার জন্য এটুকু করব না? নইলে চেস্টনাটের পাতা আপনার ঘরে আনা কি আমার ডিউটির মধ্যে নাকি? আচ্ছা, আবার কাল দেখা হবে..."

বড় ভাল মেয়ে অ্যানি।

লেখক স্থিরভাবে বুঝতে চেষ্টা করে, যে চা খেয়ে শরীর খারাপের কথাটা অ্যানি তাকে লক্ষ্য করেই বলছিল কিনা। কখনই নয়। নইলে তাকে দেখতে বিয়াল্লিশ বছর থেকে দু তিন বছর ছোট একথা বলবে কেন? হিন্দি কবি কেশব তাঁর প্রথম পাকা-চুল দেখে চোখের জল ফেলেছিলেন; কিন্তু এদেশে চল্লিশ বছর বয়সটা এমন একটি কি বেশী বয়স। তার কপালের দুই পাশে অল্প অল্প টাক পড়েছে, মাত্র। "হাঁটুর মত টেকো" মাথাটা হলে অবশ্য ভাববার কথা ছিল। এক পাশ দিয়ে টেরি কাটলে তার মাথার সামান্য টাকটুকু, লোকের নজরেও পড়ে না বোধহয়।......বয়সটা আর দু তিন বছর কম করে বললেই হ'ত। বছর দিয়ে বয়স গোণাটাই একটা নিরর্থক সংস্কার।—বৎসরান্তে সময়ের প্রবাহে কি কোন বিরতি পড়ে?

(ক্রমশ)

ইন্দ্রজিতের আসর
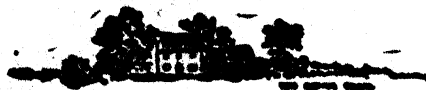
কাজকে ঝোঁকের মাথায় আমি প্রায় স্থির করে ফেলেছিলুম যে শিগগীরই কর্মজীবন থেকে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করব। কাজেই ইন্দ্রজিতের আসর থেকেও অবসর নেবার কথা ভাবছি। আসরে বসে বসে কথা বলাটা এমন কিছু একটা কাজ নয়; কিন্তু লিখে লিখে কথা বলা রীতিমতো শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। এই শ্রমজীবীর কাজ আমার দ্বারা আর হয়ে উঠছে না। গতকাল সারাদিন আমাকে অসম্ভব খাটতে হয়েছিল, তাই থেকে কাজের উপরে আমার বিষম বিরাগ জন্মেছে। তার উপরে আরো কি হয়েছে জানেন? আমাদের ডাক্তারবাবুকে বলেছিলাম, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, কিছু ওষুদ-বিষুদের ব্যবস্থা করুন। উনি একটা টনিকের নাম বাৎলে দিলেন। সে ওষুধ ঘরে এনে দেখি তাতে যে সব রোগারোগ্যের ফিরিস্তি আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে pre-mature Senility. বুঝতেই পারছেন এর পরে আর কোনো কাজের মধ্যে থাকা বিধেয় নয়।

কাজ করার চাইতে কাজ না করা যে অনেক আরামের একথা বলাই বাহুল্য। আর, কোনো কোনো মানুষ থাকেন, যাঁদের বেলায় কাজ জিনিসটা একেবারে মানায় না। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন—সু— এমন মানুষ, ও যদি জীবনে কিছু নাও করে তাহলেও তাকে দিব্যি মানিয়ে যাবে। এই সু—কে আমি ঠিক জানিনে। তবে বন্ধুর মনে হচ্ছে ইনি খুব সম্ভব সুরেন ঠাকুর মশাই। যিনিই হোন এঁকে আমি বরাবর মনে মনে হিংসে করে এসেছি। কারণ কাজ না করলেও মানিয়ে যাবে এর চাইতে বড় সার্টিফিকেট আর কিছু হতে পারে না, বিশেষ করে সমাজের চোখে কাজ না করাটা যখন একটা মস্ত বড় অপরাধ। রবীন্দ্রনাথ এর চাইতে বড় সার্টিফিকেট আর কাউকে দিয়েছেন বলে আমার মনে পড়ছে না। আমার কেবলি মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাগ্যক্রমে আমার যদি সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটত তো অনুরূপ সার্টিফিকেট তিনি আমাকেও দিতেন। কারণ নিতান্ত আত্মপ্রশংসার মতো শোনালেও বলতে বাধা নেই যে কাজ না করার জন্য যে প্রতিভার প্রয়োজন হয় সেটি প্রচুর পরিমাণে আমার আছে। কি করে কাজ এড়াতে হয় তার হাজার রকম অজুহাত আমি অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারি। প্রতিভাবানের একটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে বেকায়দায় পড়লে তিনিই সবার চাইতে বেশী অপ্রতিভ হন। কোন কাজ নিতান্ত ঘাড়ে এসে চাপলে আমার যা অবস্থা হয় সে দেখবার মতো। এজন্য কেউ সজ্ঞানে আমাকে কোনো কাজের ভার দেন না। আর যিনি একবার দিয়েছেন তিনি দ্বিতীয়বার দিতে আর সাহস করেন নি। আমাদের বন্ধু মহলে একটি অতি পুরাতন রসিকতা আছে—কাজ পণ্ড করতে চান তো এঁকে ভার দিন। এঁকে অর্থাৎ আমাকে।

কেজো মানুষের বুদ্ধি আর অকেজো মানুষের বুদ্ধিতে কি তফাৎ সেটা আমি এঁদের বোঝাতে পারিনে। আমি বলে থাকি যে শেষোক্ত শ্রেণীর বুদ্ধি অতি উঁচু দরের, বুদ্ধি ওটা প্রতিভার স্তরে। এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে প্রতিভাবানরা বুদ্ধির ব্যবহারিক প্রয়োগে অত্যন্ত অপটু। এঁদের বুদ্ধি আকাশ বিহারী—। সে বুদ্ধি সংসারের শুকনো জমিতে নামলে আপনিই অবশ হয়ে আসে। সংসারের প্রয়োজনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিশয় ক্ষুদ্র। আর প্রতিভাবানদের বুদ্ধি বৃহৎ এবং ব্যাপক। প্রয়োজনের সময় সে বুদ্ধিটাকে কেটে-ছেটে দরকার মাফিক মাপসই করে নিতে বেগ পেতে হয়। এঁরা বুদ্ধির শর্ট-কাট্ জানেন না। কেজো মানুষদের বুদ্ধি পরিমাণে এবং পরিসরে স্বল্প। ওঁদের বুদ্ধির মধ্যে বেশ একটু গৃহস্থালি আছে। বুদ্ধির গৃহস্থালি বলতে আমি বুঝি সেই বুদ্ধি যা মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতে পায়ের যোগ রক্ষা করে। অর্থাৎ মাথায় যা ভাবে হাতে নাতে সেইটুকু করে দিতে পারে। একে বলতে পারেন applied intelligence. ইংরেজী common sense কথাটার সংজ্ঞা নির্দেশ আজো পর্যন্ত হয় নি। আমার মতে সাধারণ বুদ্ধি হচ্ছে সাধারণ লোকের বুদ্ধি। অসাধারণ ব্যক্তির সাধারণ বুদ্ধি নেই। থাকলে তাঁরাও সাধারণ হতেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে একদল আছেন, যাঁরা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী, আরেক দল আছেন যাঁদের বিদ্যে নেই কিন্তু পারদর্শিতা কিঞ্চিৎ আছে। এঁদের সংখ্যাই বেশী। এঁদের বলি হাতুড়ে। অনেক দেখে শুনে বহু দর্শিতার গুণে যে জ্ঞানটুকু অর্জন করেছেন সেইটুকুর ব্যবহারিক প্রয়োগ এরা জানেন এবং প্রয়োজনের সময় গুছিয়ে ব্যবহার করতেও পারেন। সংসারে যাঁদের আমরা বলি সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁদের বুদ্ধিটা হচ্ছে এই হাতুড়ে বুদ্ধি। একে আমি কখনো উঁচু দরের জিনিস বলব না। তবে সংসারে করে খেতে হলে এই বুদ্ধিটা কাজে লাগে বই কি! প্রতিভাবানরা প্রায়ই করে খেতে পারেন না। এটা সাধারণের যুগ। সাধারণের ক্ষমতা যত বাড়ছে অসাধারণের পক্ষে বেঁচে থাকা তত কঠিন হয়ে উঠছে।

আমি যে হাতুড়ে বুদ্ধির কথা বলেছি তার সব চাইতে ভালো দৃষ্টান্ত হচ্ছে— রবিন্সন ক্রুশো। ও লোকটার প্রতিভা ছিল না, কিন্তু হাতুড়ে বুদ্ধি প্রচুর পরিমাণে ছিল। কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তি অমন বেকায়দায় পড়লে সেই জনমানবহীন দ্বীপে তিনদিনও বেঁচে থাকতে পারতেন না। আর বেঁচে থাকা তো পরের কথা। জাহাজডুবির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিরও ভরাডুবি হত। ভদ্রলোক হাবুডুবু খেয়ে, খাবি খেয়ে সলিলসমাধি লাভ করতেন। কিন্তু তা হলেও সেটা প্রতিভাবানের যোগ্য মৃত্যু হ'ত। দেখতেই পাচ্ছেন সংসার সমুদ্রে প্রতিভাবানরা নিত্যই নাকানি-চুবুনি খাচ্ছেন। আর রবিন্সন ক্রুশোর কাণ্ড দেখুন। কোথায় ডুবে মরবে না কোমর বেঁধে ঘরকরনা করতে লেগে গেল। যেখানে জনমানব নেই সেখানে সংসার নেই, যেখানে সংসার নেই সেখানে কর্তব্যও নেই। লোকটা প্রাণেই যদি বাঁচল তো সকল কর্তব্যের দায় এড়িয়ে দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে পরম আরামে থাকতে পারত। কিন্তু হাতুড়ে বুদ্ধি যাবে কোথায় ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ওর সেই দশা। তার কারণ লোকটা বুদ্ধির ঢেঁকি। কাজ না করলেও যাকে মানাত সে যদি কাজ করতে থাকে তবে তার মতো বেমানান আর কিছু হতে পারে না।

তোতা কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলী

পাশ্চাত্য দেশের গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, আল্লা যদি আরবী ভাষায় কোরান প্রকাশ না করে ফার্সীতে করতেন, তবে মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর 'মসনবি' কেতাবখানাকেই কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন। এ ধরণের তারিফ আর কোন দেশের লোক তাদের কবির জন্য করেছে বলে তো আমার জানা নেই।

মৌলানা রুমী ছিলেন ভক্ত। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন কদম্ববনবিহারিণী শ্রীরাধা যেরকম করে গোপীজনবল্লভ শ্রীহরিকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রেম দিয়ে। রুমী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মসনবিতে বর্ণনা করেছেন। বেশির ভাগ গল্পচ্ছলে। তারই একটি 'তোতা কাহিনী'।

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডলফ ভেলেন্টিনো, পাণ্ডিত্যে ম্যাক্সমুলার। সদাগর তাই ফুরসৎ পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন, ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারত যাবেন কার্পেট বেচতে। জোগাড়-যন্ত্র তদ্দণ্ডেই হয়ে গেল। সর্বশেষে গোষ্ঠি-কুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্তান থেকে কি সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না—তাকেও শুধালেন সে কি সওগাত চায়। তোতা বললে, হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না কোন্ চিড়িয়া? হিন্দুস্তানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয়, তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ-সওগাতটা চাওয়া তো কিছু অন্যায়ও নয়।'

সদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সব সওগাতও কেনা হল, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন 'বেবাক ভুল। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তোতা পাখী দেখে। তখখুনি তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো।' কোন পাখীই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখীর বুকে এমনি বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সদাগর বিস্তর আপশোষ করলেন নিরীহ একটি পাখীকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্যে। স্থির করলেন, এ মুর্খামি দুবার করবেন না। মনে মনে নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে মারলেন গণ্ডা দুই চড়।

বাড়ি ফিরে সদাগর সওগাত বিলোলেন দরাজ হাতে। সবাই খুশ, নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দ' বলেছিল ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি— সদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহু, সেটি হচ্ছে না, ও-খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে।

কিন্তু হলে কি হয়—গোঁপ কামানোর পরও হাত ওঠে অজানাতে চাড়া দেবার জন্য, (পরশুরাম উবাচ) বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়—'অস্-সালাম আলাই কুম, ও রহমৎ উল্লাহি, ও বরকত ওহু, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক ইত্যাদি ইত্যাদি', তোতা চেঁচালে।

সদাগর 'হেঁ-হেঁ' করে গেলেন। মনে মনে বললেন, খেয়েছে।

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে 'হুজুর সওগাত?'

সদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। বলতেও পারেন না, চাপতেও পারেন না। তোতা এমনভাবে সদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান। সওগাতের ওয়াদা দিয়ে গড্ ড্যাম্ ফক্কিকারি! মানুষ জানোয়ারটা এই রকমই হয় বটে। তওবা, তওবা!

কি আর করেন সদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন।

যেই না বলা তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্তানে তার দুরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এরকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায়?

দিলের দোস্ত তোতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'হায়, হায়, কী বেকুব, কী বে-আক্কেল আমি। একই ভুল দুবার করলুম।' পাগলের মত মাথা থাবড়ান সদাগর। কিন্তু তখন আর আফশোসে ফায়দা নেই—ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কি লভ্য! সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তোতাকে বের করে আঙ্গিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ফুরুৎ করে তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সদাগর তাজ্জব—হা করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিতে ফিরে শুধালেন, 'মানে।'

তোতা এবারে প্যাঁচার মত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'হিন্দুস্তানে যে তোতা আমার বদ-নসিবের খবর পেয়ে মরে যায়, সে কিন্তু আসলে মরে নি। মরার ভাণ করে আমাকে খবর পাঠালো, আমিও যদি মরার ভাণ করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাবো।'

সদাগর মাথা নীচু করে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু, যাবার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও। আর তো তোমাকে পাব না।'

তোতা বললে, 'মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষ লাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই। সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে। মরার আগে মরবার চেষ্টা করো।'

* * * * *

এই গল্প ভারতবর্ষে বহু পূর্বে এসেছিল। কবীর বলেছেন,

'তজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা
সতগুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহৈ কবীর কোই বিরলা হংসা
জীবতহী জো মরতা হৈ।।'

(অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎ-গুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যু লাভ করেছেন সেরকম হংসসাধক বিরল'।)

আর বাঙলা দেশের লালন ফকিরও বলেছেন,

'মরার আগে মলে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে
জানতে হয়।'

মানুষের একটা গতির নেশা আছে। ফাঁকা রাস্তা পেলেই দেখা যায় যে, মোটর-চালক তার গতি বাড়িয়ে চলেছে। অনেক সময় চালক তার সামনে গতি নির্ধারণ যন্ত্রের দিকে লক্ষ্য না করেই গতি বাড়িয়ে যায়। খুব জোরে মোটর চালাবার সময় চালকের এই যন্ত্রের দিকে তাকাবার সময়ও থাকে না—কারণ তখন মুহূর্তের জন্য তার
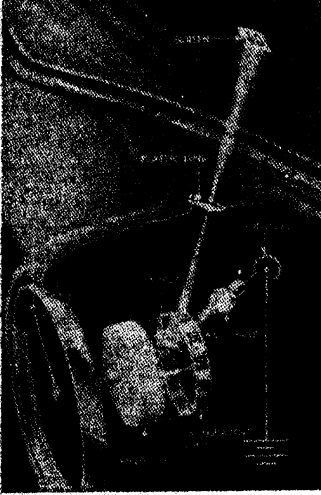
মোটরের গতি নির্ধারণের যন্ত্র থেকে গতি প্রতিফলিত হয়ে চালকের সামনের কাচের ওপর পড়ছে।

চোখ সামনে থেকে সরাবার সময় থাকে না। —যাতে করে চালক সব সময় তার গতির দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে বিশেষতঃ রাত্রি-বেলা সেই কারণে এক নতুন উপায় বের হয়েছে। এতে গতি নির্ধারণ যন্ত্রে কত মাইল গতিতে মোটর যাচ্ছে সেটা চালকের সামনের কাঁচের ওপর সব সময় প্রতিফলিত হবে। এতে করে এই সুবিধা হয় যে, চালক সামনের দিকে তাকিয়ে মোটর চালাতে চালাতে গতির সম্বন্ধে সজাগ হতে পারে।

*

“পোলিও মাইলাটিস” রোগের আর একটা নাম “ইনফ্যানটাইল প্যারালিসিস্” বা শিশু পক্ষাঘাত। চলতি কথায় ডাক্তাররা এই রোগকে পোলিও বলেন। এই রোগের উৎপত্তি বা কারণ এখনও ডাক্তাররা সঠিক নির্ণয় করতে পারেননি। তবে এটি যে একটি

ভয়াবহ মারাত্মক রোগ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই রোগে প্রিস্কোলিন নামক ওষুধ ব্যবহার করা হয়; অবশ্য এটি খুব কার্যকরী হয় না। আজও চিকিৎসকগণ এই ব্যাধির আক্রমণের ক্ষেত্রে নিরস্ত্র ও অসহায়।

এক গ্রীক রসায়নবিদ্ বলেন যে, খাদ্য সম্বন্ধে সতর্ক হলে এই রোগের হাত এড়ান সম্ভব হতে পারে। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মানুষের রক্তের ক্যাল্‌সিয়ম আর পটাসিয়মের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারলে এ রোগ হয় না। তিনি এই সমতা কথাটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ·০১ ক্যাল্‌সিয়মের সঙ্গে ·০২৯ পটাসিয়ম থাকা মানেই সমতা রক্ষিত হওয়া। তিনি আরও বলেন যে, এ রোগের জীবাণু রক্তেই থাকে আর ঐখানেই বাড়ে। এইজন্যই মানুষের রক্তের ক্যাল্‌সিয়ম ও পটাসিয়মের সমতা রক্ষা করা খুবই দরকার। বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে। শিশুদের খাদ্যে সাধারণতঃ ক্যাল্‌সিয়ম এবং ভিটামিন ‘ডি’র প্রাচুর্য ঘটে আর সেইজন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, শিশুরাই এই রোগের কবলে পড়ে। এ রোগ যে ক্যাল্‌সিয়মের প্রাচুর্যে ঘটে তার প্রমাণ হিসাবে গ্রীক রসায়নবিদ্ বলেন, ধনীর দুলালদেরই এ রোগ বেশী হয়। গরীবের ঘরে এ রোগ বড় একটা দেখা যায় না। এইজন্য তার মতে শিশুদের খাদ্যে ফল, ভিটামিন ‘ডি’ ও এভাপোরেটেড মিল্কের পরিমাণ কম থাকা ভাল। তার বদলে কাঁচা সব্জী ও আলু বেশী খাওয়ান দরকার।

*

বর্তমান যুগ প্লাস্টিকের যুগ। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুই এখন প্লাস্টিকে তৈরী হচ্ছে। এসব ছাড়া এই প্লাস্টিকের নৌকা এবং ছোটখাট জাহাজও তৈরী হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে, এভাবে প্লাস্টিকের জাহাজ করতে একদিনের বেশী সময় লাগে না। অথচ এইরকম একটা কাঠের জাহাজ তৈরী করতে খুব কম করে ৬ সপ্তাহ সময় লাগে। লোমিনাক আর আঁশের মত কাঁচ এই দুটি জিনিষ দিয়ে এগুলো তৈরী হচ্ছে। জাহাজ তৈরী হবার পর এগুলোকে আর কাঠের জাহাজের মত ‘কাকিং’ অর্থাৎ রং করতে হয় না। কাঠের তৈরী জাহাজ রাখবার প্রায় পাঁচ ভাগের একভাগ খরচে এই প্লাস্টিকের তৈরী জাহাজকে রাখা যায়। যে কোম্পানী এই ধরণের জাহাজ তৈরী করছেন তারা অনেক-দিন ধরে রোদ, বৃষ্টি বালির চড়া আর বরফের ভেতর রেখে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এই সব কারণে এর কোনই ক্ষতি হয় না। যদি কোনও কারণে এর তলা ফুটো হয়ে যায় অল্পায়াসে এটা তালি দিয়েও নেওয়া যায়। একটা কাঠের জাহাজ তৈরী করবার যা খরচ প্লাস্টিকের জাহাজ তৈরীর খরচও তাই।

*

মানুষের যে কত অদ্ভুত ধরণের খেয়াল থাকে তা বলে শেষ করা যায় না। আমরা এতদিন দেখে এসেছি যে, মানুষ ছবি আঁকে তুলি আর রং দিয়ে। Woeriee ব‌লে একজন ভদ্রলোক কিন্তু ছবি আঁকেন মানুষের মাথার চুল সাজিয়ে সাজিয়ে। তিনি বিভিন্ন রংয়ের চুলে আঠা মাখিয়ে এক কাঁচের ওপর আটকে হরেক রকমের ছ আঁকছেন। তুলির আঁচড় যেমনভাবে ছবি ভাব ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে; তিনি একটা চুলের সাহায্যে তুলির আঁচড়ের মত ছবির ভাব ফুটিয়ে তোলেন। তিনি প্র ৩০ বৎসর ধরে এইভাবে ছবি আঁকছেন প্রথমদিকে তার ব্যবসা ছিল পরচুলা তৈ করা। একদিন এক ভদ্রলোক Woeriee-এ কাছে এসে তাকে একটা চুল দিয়ে বলেন এটা তার বাবার মাথার চুল। এটা তি একটা লকেটের মধ্যে যত্ন করে রাখতে চা Woeriee সেই চুলটা দিয়ে লকেটের ম ভদ্রলোক যেমনভাবে সই করেন তার এ নকল করে দেন। আর এর পর থেকেই ত মাথায় চুলের সাহায্যে ছবি আঁকবার খেয় জাগে। তিনি ঐ চুলগুলির স্বাভাবিক রং রেখে দেন। আর মানুষের মাথার চুল ঘন কালো রং থেকে আরম্ভ করে লাল পর্যন্ত পাওয়ার দরুণ তার ছবি আঁক কোন রংএরই অভাব হয় না বলা যায়।

*

১৯৪৯ সালে আমেরিকার যত সিগা তৈরী হয়েছিল তার তুলনায় ১৯৫০ স শতকরা ২ ভাগ বেশী সিগারেট তৈ হয়েছে।
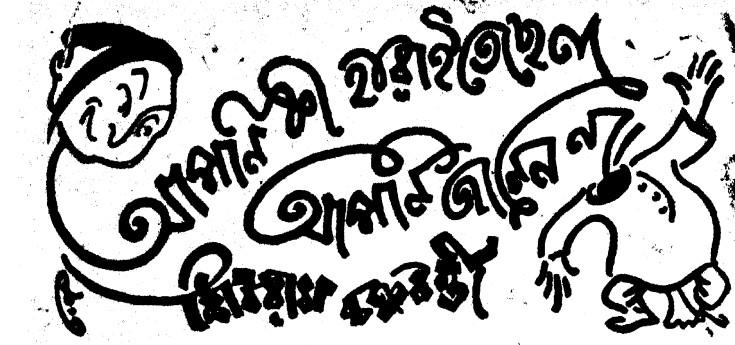
প্রৌঢ় লোকরাও কখনো কখনো প্রেমে পড়ে। পড়ো পড়ো হয়......

উনপঞ্চাশ পেরুবার পর যখন আর চার আসে না জীবনে, ৫০ আসে, ৬০ আসে (শত্তুর-মুখে ছাই দিয়ে সত্তরও আসতে পারে) কিন্তু হায়, চার-ইয়ারি চলে যায় তারপর—জীবনের মতই। গোড়ার সে-চার আর থাকে না। তারপরে সাত পাঁচ যাই আসুক না,—শূন্যই খালি চোখে ভাসে। অবশ্যি চল্লিশ পার হবার পর—তেতাল্লিশ পেরিয়ে—চারাহীন জীবনে ডবোল্ চার দেখা দেয় বটে—শেষবারের মতই—নেভার আগে প্রদীপ যেমন দ্বিগুণ জ্বলে। বাঁচার নতুন একটা চার দেখা যায় তখন—চুয়াল্লিশে পেঁৗছে......

কিন্তু ৪৪ নয়, পঞ্চাশ পেরিয়ে হৃষীকেশবাবু প্রেমে পড়লেন......

যে বয়সে মানুষ বার পঞ্চাশেক প্রেমে পড়ে'—এতদিন ধরে' উঠে পড়ে প্রেম করার পর সবার কাছে পরাস্ত হয় শেষ অব্দি ধুত্তোর বলে' প্রেম থেকে উঠে পড়ে—তখনই হৃষীকেশবাবুর প্রেমপর্ব এলো। প্রথম প্রেমে পড়লেন। যখন নাকি হৃদয়ে চড়া পড়ে তখনি তাঁর প্রেমের চারা গজালো সব প্রথম। তিতাবিরক্তিতে জীবনতরুর শাখা প্রশাখা যখন নাকি শুকিয়ে যাবার কথা, তখনি তাঁর শুকনো নিমডালে নতুন পাতা দেখা দিলো—নবপল্লবের।

ঋষিতুল্য আমাদের হৃষীকেশবাবু! এতদিন তিনি পরলোকের কাজেই কাল কাটিয়েছেন, ইহলোকের দিকে তাকাননি। ফুরসৎ পাননি তাকাবার। তাছাড়া, ধর্ম-কর্মেও তাঁর মতি ছিল, পরলোকের ভয়ও ছিলো মনে (পরন্তু প্রেমিক বেপাড়ায় পেলে পরে বেপরোয়া ধরে ঠ্যাঙায়, পরলোকদের এই বড় দোষ!) এইসব কারণেই ভুল করেও পরিলোকের দিকে নজর দেননি কোনোদিন।

এখন, পঞ্চাশের কূল পেরিয়ে—প্রায় ষাটের কোলে এসে অনঙ্গের সাথে তাঁর কোলাকুলি হোলো। খোঁচা খেলেন তিনি পঞ্চশরের। বুকের কাছটা খচ্ খচ্ করে উঠতেই তিনি ফিরে তাকালেন—ইহলোকের দিকে। অভাবনীয়ভাবের এই হঠকারিতা—অতি হঠাৎ! ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলেন ফের......

আবার—আবার তাঁদের চার চক্ষের মিলন হোলো! আর, চার চক্ষের মিলনে নাচার হয় না এমন নাবালক নাবৃন্ধ বসুন্ধরায় কে আছে? ব্যস্, আর দেখতে হোলো না, প্রেমে পড়লেন হৃষীকেশবাবু।

ইহলোক-পরলোক সব ভুলে প্রেমে পড়ে গেলেন। পরিণামের কথা বিলকুল বিস্মৃত হয়েই অকূলের দিকে পাড়ি দিলেন!

এগিয়ে গেলেন তিনি মেয়েটির কাছে...

এঁড়ে বাছুরটিকে কলতলায় এনে গা ধোয়াচ্ছিল মেয়েটি। আহা,, কী হাসিখুসি মেয়ে আর কেমন পুরুষ্টু বাছুর! পরিষ্কার বাচ্ছাটা—মেয়েটির মতই ধব্ধবে। আর বৎসটি যেমন পুষ্ট তেমনি হৃষ্ট সেই মেয়েটি। দুজনে মিলে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট।

অবশ্য, মেয়েটি নেহাৎ বাচ্চা নয়, বছর বিশেক হবে। বিশ-দশ সুন্দরীর কাছে এক আধবুড়োর প্রেমনিবেদন—একটু কেমন বিসদৃশই না? কিন্তু বয়সের বিশ সাপের বিষের চেয়ে বেশি মারাত্মক। তার ছোবল যার লাগে তার কি কোনো জ্ঞান থাকে? তাকে বিশ্বাস নেই, সে সবকিছু করতে পারে। বনে যাবার সময়ে সে যৌবনে ফিরে যেতে চায়।

'শ্রীবৎস চিন্তা'

আলসাই জিনিসটাই এমনি। আশা নাই একথা সে ভাবতেই দেয় না। সানাইয়ের বাজনা শোনায় অত্যন্ত অসময়েও......

জীবনের ষষ্ঠীতে এসে অকালবোধন হোলো হৃষীকেশবাবুর। ষষ্ঠীতৎপুরুষ হবার সাধ জাগলো বুঝি......

মেয়েটির কাছে তিনি এগিয়ে গেলেন...

"আহা, কী মধুর—কী মিষ্টি—!" কথা পাড়লেন গিয়েঃ "এমন অপরূপ আমি জীবনে দেখি নি......"

'পণ'-নির্ণয়

মেয়েটি এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলো। মাধুর্যের ভারেই, মনে হয়।

"মানে, তোমার এই গয়নাটার কথাই বলছিলাম," আমতা আমতা করেন হৃষীকেশ। কি জানি যদি কিছু মনে করে সে মেয়েটি, তাই কথাটা গোরুতর কিছু না বলে তিনি উড়িয়ে দিতে চান। গোড়ার আলাপেই বেশি আগানো ঠিক কি?

"হ্যাঁ, বুধনের ভরী বুদ্ধি।" ঘাড় নাড়ে মেয়েটি। ঘাড়ের সাথে সাথে চুলগুলি তার নড়ে। আর, এমন চমৎকার দেখায়। আন্দোলন তোলে বুঝি হৃষিকেশের মনেও।

না, বুধন নয়—তুমি! তুমিই আমার উদ্বুদ্ধ করেচো। এই কথাটাই বলতে চায় হৃষীকেশ। তুমিই আমার নব-উদ্বোধন। খোলসা করেই সে বলতে যায়, কিন্তু কথা-গুলি যখন গলার খোলস ছাড়ে—"সত্যি, এত সুন্দর—এমন সুন্দর কখনো দেখি নি আমার জীবনে। কী মিষ্টি—কী সুমধুর!" হয়ে ওঠে।

মেয়েটি মুখ নীচু করে থাকে। ভাববাচ্যে বলা কথাগুলির বাচ্য ভাব হজম করার চেষ্টা করে বোধ হয়।

"এই—এই একটি জিনিসই পাই নি আমার জীবনে—" বলতে গিয়ে নিশ্বাস পড়ে হৃষীকেশের—"হায়, জীবনটা আমার ব্যর্থই গেল।"

তিনি হায় হায় করেন।

"পেতে চান্ নি হয়তো—সেইজন্যেই।" মেয়েটি একটু মৃদুহেসে বলে। কথাগুলি যেন তার গুঞ্জনের মতই।

কথাটায় হৃষীকেশের খট্‌কা লাগে, খট্ করে লাগে ওর মনে। মেয়েটি.....মেয়েটি কি তবে......? য়্যাঁ, মেয়েটিও? হাতুড়ি পিট্‌তে থাকে ওর বুকে।

"আর এখন......এই বয়সে......এখন কি আমার কোনো আশা আছে? পাবার আশা কি রয়েছে আর?" হৃষীকেশ একটু কেশে নেয়।

"চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?" মেয়েটি বলে হেসে হেসেই।—"বেয়ে চেয়ে দেখতে পারেন।"

"চেষ্টা করতে বলো তুমি?"

"আপনি আমার বাবাকে বলুন।" এই কথা বলে মুচ্‌কি হেসে বাছুর নিয়ে চলে যায় সে।

কয়েকটা গাই নিয়ে ওদের খাটাল্—পাশের বস্তিতেই। খাটাল্ বলে তা কিছু খাটো নয়, বস্তি হলেও তা এখন প্রাবস্তিই—হৃষীকেশের কাছে অন্তত। স্বর্গের আভা ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গাটাই কেমন সুষমাময় হয়ে উঠেছে। গোবরের গন্ধে সুরভিত এক গন্ধর্বলোক।

দুধে জল মিশিয়ে পয়সা বনমালীর। চারেকে চার—চারের কারবার তারও। দুয়ে দুয়েই চার। গরু দুয়ে যে দুধ, তার এক সেরে তিন সের জল মিশিয়েই তার চার ফেলা—আর সেই চারে খদ্দের আসে। ধরা পড়ে তার খাটালে।

পরদিন সকালে হৃষীকেশ এলো। এসে কথা পাড়তেই—

"হ্যাঁ, আমার মেয়ে বলেছে।" বল্ল বনমালী—"কিন্তু দুশো টাকা দিতে হবে

পণরক্ষা

আপনাকে। তার কমে হবে না।"

না, খাঁই তার বেশি নয়, সে অল্পকথার মানুষ।

"রাজি আমি।" জানালেন হৃষীকেশ-বাবু।—"তাহলে পাকা কথা হয়ে গেল তো?"

"কথা আমার পাক্কা।" নোটগুলি গুণে গুণে নিলো বনমালী—উল্‌টে পাল্‌টে দেখে নিলো—তারপরে বল্লে—"বেশ, এবার নিয়ে যান আপনার জিনিস।"

কথার পাকে জড়িয়ে যখন মালিক হয়েছে, তখন আর ছাড়ান্ কী? পরি না হলেও—পরিত্রাণ কোথায়? দুশো টাকা দিয়ে এঁড়ে বাছুরটিকে নিয়ে ফিরতে হোলো হৃষিকেশকে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৩৭

আমাদের বার-লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান ছিলেন তিনকড়ি সোম। তিনি আমার দাদাদের সহপাঠী এবং সমবয়স্ক ছিলেন; তাই তিনি 'তুমি' বলে আমাকে সম্বোধন করতেন, আর আমি তাঁকে বলতাম তিনকড়িবাবু। শুধু আমাকে কেন, জুনিয়ার দলের অধিকাংশ উকিলকে তিনি তুমি বলে সম্বোধন করতেন। সিনিয়ার দলেরও পাঁচ-সাতজনকে তুমি বলতেন, তা মনে পড়ে।

মাথায়-খাটো প্রসন্নবদন তিনকড়িবাবু স্বাস্থ্যবান মানুষ ছিলেন। বারো বৎসরকাল আমি ওকালতি করেছিলাম, তার মধ্যে বোধ করি, বারো দিনও তাঁকে কামাই করতে দেখিনি। আর কামাই করলে তাঁর চলতও না; কারণ উকিল মেরে বেশ দু-পয়সা তাঁর উপার্জন ছিল, যেটা আদালতে হাজির না থাকলে হবার উপায় ছিল না। কবে কোন্ সময়ে সহসা সে সুযোগ উপস্থিত হয়, অদৃষ্টের মতই অধিকাংশ স্থলে তা অগোচর থাকত।

মকর্দমার নথিপত্রে কোন উকিলের দস্তখত প্রমাণ করবার প্রয়োজন হলে সাধারণত তার দুটি উপায় ছিল। এক, সেই উকিলকে সাক্ষী মেনে এজাহার করিয়ে প্রমাণ করা; দ্বিতীয়ত, সকল উকিলের হস্তাক্ষরের সহিত কার্যগতিকে বিশেষভাবে পরিচিত তিনকড়িবাবুকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নেওয়া। উকিলের এজাহার করাতে হলে উকিলকে ফিস্ দিতে হোত ষোল টাকা; কিন্তু সেই কাজ তিনকড়িবাবুকে দিয়ে করিয়ে নিলে চার টাকা খরচ করলেই চলত। উকিলের মারা যেত ষোল টাকা, কিন্তু তিনকড়িবাবু সুবিধা করতেন চার টাকায়। ছোটখাটো মামলার মক্কেলরা প্রায়ই সুলভে কাজ সারত তিনকড়িবাবুকে দিয়ে এজাহার করিয়ে। সুতরাং এজলাসে এজলাসে হাকিম-দের কাছে তিনকড়িবাবু সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

আমি যখন ওকালতি আরম্ভ করলাম, তখন তিনকড়িবাবুর বয়ঃ-পর্যায়ে একটা সঙ্কটের কাল উপস্থিত হয়েছে। জনশ্রুতি, পঞ্চাশ বৎসর বয়সের প্রতি দুর্জয় ভীতি অথবা বৈরপ্যবশত, গত দু-তিন বৎসর যাবৎ তিনি উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এমন কি, এজলাসে সাক্ষীর কাঠগরায় পর্যন্ত। তিনকড়িবাবু হয়ত মনে মনে ভাবছেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মানুষ প্রবেশ করলে তার দু' পা না হোক, অন্তত একটা পা ইহজন্মের কঠিন ভূমিখণ্ড হতে তুলে নেওয়া হয়, পরলোকের যাত্রা-পথের প্রথম পর্বের ঘণ্টা হয়ত পঞ্চাশ বৎসর বয়সেই বাজে। তিনকড়িবাবুর দুই-একজন বয়স্য উকিল বলেন, গৃহ-সংসারে প্রতিপত্তি হানির আশঙ্কায় তিনকড়িবাবু এইরূপে পঞ্চাশ বৎসর বয়সকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করে চলেছেন।

বয়সের এই প্রসঙ্গটা বিশেষ হয়ে উঠত আদালতের সাক্ষীর কাঠরায়। এজাহার দিতে তিনকড়িবাবু কাঠগরায় প্রবেশ করে দাঁড়িয়েছেন। একটা পরিচিত কৌতুক-রসের আসন্ন প্রত্যাশায় হাকিম থেকে আরদালি পর্যন্ত সকলের মন উৎসুক হয়ে উঠেছে।

পেস্কার যথারীতি এজাহার-শীটে সাক্ষীর নামধাম লিখতে উদ্যত হন। সাক্ষীর নাম বিশেষভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও অভিনয়টা সরস এবং সম্পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপ্‌কা নাম?' (আপনার নাম?)

ব্যাপারটা কোথায় উপনীত হবার উপক্রম করেছে, বুঝতে পেরে স্মিতমুখে তিনকড়ি-বাবু বলেন, 'তিনকড়ি সোম।'

'ওয়ল্দ্?' (কার পুত্র?)

তিনকড়িবাবু পিতার নাম বলেন।

'পেশা?'

'লাইব্রেরিয়ান।'

'সকুনৎ?' (বাসস্থান?)

'ভাগলপুর।'

এইবার বদ্ধ হাসির তাড়নায় পেস্কারের মুখ লাল হয়ে ওঠে; 'উমর?' (বয়স?)

হাকিমের মুখে হাসি, উকিলদের মুখে হাসি, চাপরাশির মুখে হাসি।

তিনকড়িবাবু যে পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সে পক্ষের উকিল দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'হুজুর, তিনকড়িবাবু শপথ নিয়ে সত্য কথা বলেন, আশা করি, সে বিশ্বাস আমাদের সকলেরই আছে?

সহাস্যমুখে মাথা নেড়ে হাকিম বলেন, 'নিশ্চয়ই আছে।'

উকিল বলেন 'দুই বছর পূর্বে শপথ নিয়ে তিনকড়িবাবু নিজের বয়স লিখিয়েছিলেন উনপঞ্চাশ বৎসর; আজ শপথ নিয়ে কি করে আবার কথার খিলাপ (ব্যতিক্রম) করেন?

সুতরাং আজও উনপঞ্চাশ বছরই লিখে নেওয়া হোক। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে ভদ্রলোকের কথা ত আর বদলে যেতে পারে না?'

একটা উচ্চ হাস্যরবে আদালত-কক্ষ উচ্ছল হয়ে ওঠে; এবং সেই অবসরে বাকি যা লেখবার লিখে নিয়ে পেস্কার এজাহার-শীট হাকিমের সম্মুখে স্থাপন করেন।

ওকালতি ব্যবসায় চালাতে গেলে যে দু-চারটি সারগর্ভ নীতিবাক্য অনুসরণ করে চলতে হয় তন্মধ্যে একটি হচ্ছে Cheat and be cheated; অর্থাৎ ঠকাও এবং ঠকো। আমাদের ভাগলপুরের বার-লাইব্রেরীর অন্তর্গত Busy body Society নামে একটি যে পরচ্ছিদ্রামোদী বিচিত্র সঙ্ঘ ছিল, 'cheat, and be cheated' বাক্যটি তারই একটি সূক্তি, অর্থাৎ slogan। সূক্তিটির সদুপদেশ হচ্ছে, বাগে পেলেই মক্কেলকে ঠকিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় কর, কারণ মক্কেলও সুবিধা পেলেই তোমার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবে। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে মক্কেল মথুরাপ্রসাদ যখন তোমাকে নিশ্চয়ই ঠকাবে, পূর্বাহ্নে দোয়ারকাপ্রসাদ মক্কেলকে ঠকিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করে রাখ।

এই নীতিটি যে একান্ত মূল্যবান, সুতরাং সর্বথা পালনীয়, ভবিষ্যৎ কালের অভিজ্ঞতা থেকে তা মর্মে মর্মে (স্থূলভাবে, হাড়ে হাড়ে) অনুভব করেছিলাম। অদৃষ্ট-ক্রমে ঠকানোর কার্যটা প্রথমে আরম্ভ হবার সুযোগ পেয়েছিল আমার দিক থেকেই। আর, সেই পাপকার্যের দণ্ডস্বরূপ

ভবিষ্যতের মধুরাপ্রসাদের হাতে যে টাকাটা আমাকে বারংবার গচ্চা দিতে হয়েছিল, তার সঙ্গে আমার দ্বারা ঠকানো টাকার মোট তায়দাদের সামঞ্জস্য মেলাতে গেলে মনের মধ্যে কোনো সান্ত্বনাই পাওয়া যায় না। প্রথম ঠকানোর কৌতুকপ্রদ কাহিনী বলবার পূর্বে Busy-body Society সম্বন্ধে সামান্য একটা কথা বলে তার ক্রিয়াশীলতার একটু আন্দাজ দিই।

Busy-body Society-র একটি দপ্তর ছিল। দপ্তর অর্থে একখানি বাঁধানো খাতা ভিন্ন তার আর কোনো স্বতন্ত্র উপকরণ অথবা সজ্জা-সরঞ্জাম ছিল না। বাদামের কঠিন খোলের মধ্যে সুস্বাদু শাঁসের মতো উকিলখানার রসহীন আবেষ্টনের মধ্যে Busy-body Society-র এই খাতাখানি ছিল সরস বস্তু। আদালতের চতুঃসীমার মধ্যে যেখানে বা কৌতুকরসাশ্রিত বিচিত্র ব্যাপার ঘট্‌ত, এই দপ্তরের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে তা রসিকজনের উপভোগের বস্তু রূপে অবস্থান করত। হাকিম-হোমরা পর্যন্ত তার এলাকা থেকে বাদ পড়ত না। নমুনাস্বরূপ হাকিম সংক্রান্ত একটা ব্যাপারের কথাই বলি।

একজন সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট একটা ফৌজদারি মামলার রায় লিখতে গিয়ে রায়ের মধ্যে 'ভাগাড়' শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শব্দটি ব্যবহার করে মনে হল, তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, এবং ঘটনাক্রমে বিচারের জন্য আপীলটি যদি কোনও ইংরাজ হাকিমের নিকট উপস্থিত হয়, তা হলে বিদেশী ভদ্রলোক 'ভাগাড়' কথাটা নিয়ে একটু বিব্রত হতে পারেন; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে কথাটার ব্যাখ্যা করে দেওয়া ভাল। ইতি চিন্তা করে তিনি লিখ্‌লেন, "Bhagar is a Place inhabited by dead cows" অর্থাৎ, ভাগাড় হচ্ছে সেই স্থান যেখানে মৃত গরুরা বাস করে।

নকল নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রায়টি Busy-body Society-র সম্পাদকের হাতে এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সদ্য-লব্ধ অমূল্য রত্নটি খাতার মধ্যে অন্যান্য রত্নের সহিত একসূত্রে গেঁথে নিলেন। উক্তিটির মধ্যে এমন এক সূক্ষ্ম কৌতুকরসের ব্যবস্থা আছে, সচরাচর সত্যই যা দুর্লভ। কিন্তু dead cows-এর সহিত inhabited শব্দটি গরুদের পক্ষে এমন উত্তেজকভাবে বিদ্রূপাত্মক যে, ইংরাজি ভাষা জানা থাকলে ভাগাড়ের মৃত গরুরা হয়ত শিং নেড়ে হাকিমকে গুঁতোবার জন্যেই দৌড়তো।

এবার মক্কেল ঠকানোর কাহিনীটা বলি। মাত্র মাস চার-পাঁচ ওকালতি করছি। কাজ শেখবার জন্যে সেজদাদার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি; সুযোগ মত কোনো কোনো মামলায় ওকালতনামায় সই করে সাক্ষীর এজাহার লিখি,—তাতে টাকা দুয়েক করে ফিজ্ পাই। আমার মতো নতুন উকিলের পক্ষে দু টাকা ঊর্ধ্বদিকের একরকম শেষ কথা। তিন টাকা ফিজ্ সাধারণত হয় না; চার টাকা নাগালের বাইরে। নিম্নদিকে তাই বলে দু-টাকা শেষ কথা নয়। ভাগাভাগি দেড় টাকার মধ্যে একটা হীনতার প্রকাশ আছে; কিন্তু পুরোপুরি একটা অখণ্ড রৌপ্যানির্মিত টাকার মধ্যে আমার গ্লানি নেই। সুতরাং দু টাকার ব্যবস্থা না হলে এক টাকাও চলে, মক্কেলের ত স্বচ্ছন্দেই, উকিলেরও অগত্যা।

অবস্থা যখন এই রকম, একদল মক্কেল একটা মার্ডার কেসের বক্তৃতায় সেজদাদাকে নিযুক্ত করার অভিপ্রায়ে আসা-যাওয়া লাগিয়ে দিলে। সেজদাদার ফিজ্ অনেক, বিশেষত ফৌজদারি খুনের মামলায়। কিছু কমাবার জন্য মক্কেলদের পক্ষ থেকে চেষ্টা-চরিত্র চলতে লাগল।

সেজদাদার মুহুরী বৈকুণ্ঠনাথ পাঁড়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি পাঁড়েজী, এ মকর্দমায় আমি থাকব ত?"

পাঁড়েজি বললেন, "নিশ্চয় থাকবেন। বাবুর ফিস্‌টা তয় (স্থির) হয়ে গেলে আপনার কথা ঠিক করে নোবো।"

উৎফুল্ল হয়ে বললাম, "মার্ডার কেস,—ফিজ্‌টা একটু উঁচিয়ে করবার চেষ্টা করবেন। প্রথমে পাঁচ টাকা হাঁকবেন; রাজি না হলে চার টাকার জন্যে চেষ্টা করবেন; তাতেও যদি অস্বীকার যায়, তা হলে সনাতন দু টাকা ত' আছেই।"

পাঁড়েজী বললেন, "আজ বৈকালে ওরা এসে বাবুর ফিজ্ স্থির করে সগুণ দিয়ে যাবে। আপনি সে সময়ে বাবুর কাছে ঘরের ভিতর না বসে বারান্দায় বসবেন।"

সগুণ অর্থে নিয়োগ-দক্ষিণা (Engagement fee),—আদত ফিজের অতিরিক্ত অর্থ।

সে সময়ে গ্রীষ্মকাল, যথারীতি মর্নিং কাছারি চল্‌ছে। বেলা চারটা আন্দাজ বাড়িতে এসে বারান্দায় জমিয়ে বসলাম। জমিয়ে, অর্থাৎ দু-চারটে মোটা মোটা আইনের বই আর ফিতে-বাঁধা গোটা দুই অবান্তর মকর্দমার নথি সংগ্রহ করে। দীর্ঘ প্রশস্ত বারান্দা; তার পশ্চিম প্রান্তের খানিকটা স্থান জুড়ে পাঁড়েজীর দপ্তরখানা, পূর্বপ্রান্তে চেয়ারটেবিল পাতা। আমি বসলাম সেই চেয়ার টেবিল অধিকার করে।

ক্ষণকাল পরে মক্কেলের দল এসে উপস্থিত হল। দলে তারা সেদিন বেশ ভারি,—আট-নয়জনের কম নয়। দু-চার মিনিট প্রাথমিক কথোপকথনের পর মক্কেলদের মধ্যে জন তিনেককে সঙ্গে নিয়ে পাঁড়েজী ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন। কিছু পূর্বে সেজদাদা বাইরে এসে বসেছেন। দু-চার মিনিট কথাবার্তার ভন্-ভনানি শোনা গেল, তারপরেই রূপালি টাকার ঝন্‌ঝনানি। বঁড়শিতে মাছ গেঁথে ক্লান্ত হয়ে ডাঙায় উঠেছে, সেকথা সুস্পষ্ট হোল।

ক্ষণকাল পরে পাঁড়েজী মক্কেলদের নিয়ে নিজের দরবারে এসে সমাসীন হ'লেন। এবার আমার পালা। বুঝলাম, সে পালার সুর ভাজা আরম্ভ হয়ে গেছে।

পূর্বপ্রান্তে অকস্মাৎ আমি কাগজ-পত্র এবং আইনের বইগুলির মধ্যে গভীরভাবে নিমগ্ন হ'য়ে পড়ি। এ বই খুলি, ও বই খুলি; তারপর হঠাৎ এক সময়ে মকর্দমার নথির ভিতর থেকে একটা কাগজ টেনে বার ক'রে নিবিষ্ট চিত্তে খানিকটা কিছু প'ড়ে দেখে মোটা আকারের একটা বই খুলি; পরমুহূর্তে সশব্দে সেটা টেবিলের উপর স্থাপন ক'রে অন্য একটা বই তুলি।

জীবনটা আমাদের অভিনয় ক'রে ক'রেই কাটে। আমিও এ পর্যন্ত অনেক অভিনয় করেছি, এখনও ক'রে চলেছি;—কিন্তু সেদিন যেমন গভীর নিষ্ঠা এবং আগ্রহের সহিত করেছিলাম, তেমন বোধকরি আর কোনোদিনই করিনি। নিরবসর অভিনয়ের তন্ময়তার মধ্যে কানটি কিন্তু নিযুক্ত ক'রে রাখি বারান্দার পশ্চিম দিকে। আমার টেবিল-চেয়ার থেকে পাঁড়েজীর ফরাসের ব্যবধান অন্তত বিশ-বাইশ ফুট হবে, কিন্তু তারই ভিতর থেকে মাঝে মাঝে শুনতে পাই 'আইনে ভারি পাকা!', 'কলকাতা থেকে বাবু অনুরোধ ক'রে আনিয়েছেন', 'বাবুর দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেছেন' ইত্যাদি বাক্যাংশ।

এদিকে আমি উৎসাহিত হয়ে অভিনয়ের চাকার গতি বাড়িয়ে দিই।

একটা অত্যন্ত মোটা নজিরের বইয়ের মধ্যে অহেতুক মনোযোগী হ'য়ে অবস্থান করছি, এমন সময়ে পূর্বোক্ত তিনজন মক্কেলকে সংগে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ান পাঁড়েজী। বই থেকে, বোধহয় একটু বিরক্ত হ'য়েই মুখ তুলে বলি, "কি পাঁড়েজী?"

পাঁড়েজী বলেন, "এ'দের একটা মকর্দমা আছে।"

কাজের মধ্যে বিঘ্নিত হওয়া একজন আইনে-পাকা উকিলের পছন্দ করা উচিত নয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দেখিয়ে বলি, "এক মিনিট।" তারপর ক্ষণকাল নজিরের বইয়ের মধ্যে অকারণ মগ্ন হ'য়ে থেকে একটা কাগজের টুকরা দিয়ে পাতাটাকে চিহ্নিত ক'রে রেখে বই বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করি, "কি মকর্দমা?"

পাঁড়েজী বলেন, "ফৌজদারী মার্ডার কেসের বহস (বক্তৃতা)। এ'রা বাবুর সংগে আপনাকে বাহাল করতে চান।"

বলি, "বেশ,—আপত্তি নেই।"

কয়েকটা টাকা, আন্দাজে মনে হয় গোটা পাঁচেক, আমার সম্মুখে স্থাপন ক'রে পাঁড়েজী বলেন, "ফি সম্বন্ধে বাবু এদের প্রতি বেশ একটু মেহেরবানি (দয়া) করেছেন। আপনার যা মামুলি ফি তা আমি এ'দের বলেছিলাম, কিন্তু ততটা এ'রা দিতে পারছেন না। আপনাকেও কিছু মেহেরবানি করতে হবে।" ব'লে পাঁড়েজী যেন মক্কেলদের পক্ষ হয়েই, যাচ্ঞার করুণ হাসি হাসতে থাকেন।

যুক্তকরে ঈষৎ অবনত দেহে মক্কেল তিনজন পাঁড়েজীর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল; তার মধ্যে একজন এগিয়ে এসে আরও একটু ঝুঁকে পড়ে বলে, "জি হুজুর, মেহেরবানি করনেহি পড়েগা। তবা হো গ'য়ে। (আজ্ঞে হুজুর, দয়া করতেই হবে! জেরবার হ'য়ে গেছি।)

তা না-হয় মেহেরবানি করাই যাবে, কিন্তু ব্যাপারখানা কি! দেখে ত' মনে হয় পাঁচ টাকাই বটে। শুনেছি কেসটা দিন তিনেক চলবার সম্ভাবনা। তা হলে পাঁচ টাকা সমস্ত কেসটার দরুণ ফিজ্ না-কি? পাঁড়েজী ত' বললেন, আমার মামুলি ফিজ্ চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমার মামুলি ফিজ ত দু' টাকাই। তা হ'লে তিন দুগুণে ছ টাকা থেকে মেহেরবানির এক টাকা বাদ দিয়ে পাঁচ টাকা না-কি? সবদিক থেকে হিসেবে পাঁচ টাকা অবশ্য মিলে যাচ্ছে। তাই যদি হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? এ কেসে ত' আর এজাহার লেখবার হাড়ভাংগা পরিশ্রম করতে হবে না। কথায় বলে, প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। এ ত পাঁচ টাকা। তবু জিজ্ঞাসু নেত্রে পাঁড়েজীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

পাঁড়েজী বলেন, "আমি আপনার পঁচিশ টাকা দৈনিক ফি-ই চেয়েছিলাম, এ'রা পনের টাকা দিতে চান। অনেক খরচ-পত্র ক'রে এ'রা বিব্রত হয়ে পড়েছেন। পনের টাকাতেই রাজি হোন্।"

পুনরায় যুক্তকরে পূর্বোক্ত মক্কেলটি ব'লে ওঠে, "জি হুজুর, রাজি হুয়া যায়!" (আজ্ঞে হুজুর, রাজি হওয়া হোক্।)

কি সর্বনাশ! এ ত' রাজি হওয়া নয়,—এ যে রীতিমত পকেট মারা! পনেরো টাকা দৈনিক ফিজ্ একজন দশ বৎসরের উকিলের পক্ষেও সৌভাগ্যের কথা! এত বড় অবৈধ অর্জন পরিপাক করি বিবেকের নিকট কোন্ কৈফিয়ত পেশ্ ক'রে? অন্তরের অন্তরতম 'আমি' বাইরের আমাকে ছি ছি করতে লাগল।

কিন্তু নাচতে উঠে ঘোমটা টানাওত চলে না। অভিনয় যখন করতে আরম্ভ করেছি, তখন যবনিকাপাত পর্যন্ত করে যেতেই হবে। আইনে পাকা উকিল হয়ে পঁচিশ টাকা থেকে পনের টাকায় অবতরণে যদি নির্বিবাদে রাজি হয়ে যাই তা হলে ব্যাপারটার মধ্যে খোলতাইয়ের একটু লাঘব হয়, পড়েজীর ফিজ্ কমিয়ে দেবার গৌরব তেমন সুস্পষ্ট হয় না, আর, মক্কেলের দশ টাকা সাশ্রয়জনিত আনন্দের মূল তেমন সবল হয়ে উঠতে পারে না। বলি, "পনের টাকা বড্ড কম হয়ে গেল, টাকা কুড়িক হ'লে ভাল হ'ত।" তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পুনরায় বলি, "আচ্ছা,—তাই হবে।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মক্কেল প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। আমার সামনে একটা ওকালত-নামা রেখে টাকা কয়েকটার দিকে ইঙ্গিত ক'রে পাঁড়েজী বলেন, "ওতে সগুণের পাঁচ টাকা আছে।"

ক্ষণকাল পূর্বে যে পাঁচ টাকাকে তিন দিনের ফিজ্ মনে ক'রেও কতকটা আনন্দিত হয়েছিলাম, এখন তা সংগুণের টাকা জেনেও খুশি হতে পারছিনে। যে টাকার সহিত সগুণের এই পাঁচ টাকা অংগাংগিভাবে জড়িত সে টাকা ঠকিয়ে নেওয়া টাকা; বৃন্ত তিক্ত বলে ফলও তিক্ত হয়ে গেছে।

কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে মক্কেলরা প্রস্থান করার পর পাঁড়েজীকে বললাম, "পাঁড়েজী এ পনেরো টাকা আমার ভাল লাগছে না পাঁচ টাকাই ভাল ছিল।"

বিস্মিতকণ্ঠে পাঁড়েজী বললেন, "কেন?

বললাম, "এ টাকা ঠকিয়ে নেওয়া টাকা।
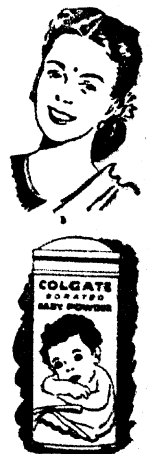
পাঁড়েজী বললেন, "কিন্তু পাঁচ টাকা ঠকিয়ে দেওয়া টাকা নয়, তাই বা আপনি

মনে করছেন কেন? তা ছাড়া, এ যদি ঠকিয়ে নেওয়া টাকাই হয় তার জন্যে দুঃখ করবার দরকার নেই; ভবিষ্যতে অনেক মক্কেল আপনাকে ঠকাবে, তা নিশ্চয় জেনে রাখুন।"

পাঁড়েজী "Cheat and be cheated' সূক্তিটা জানতেন কি না জানিনে, কিন্তু যা বললেন তাঁর অর্থ হচ্ছে Cheat and be cheated।

পরবর্তীকালে এক লছমীপুর কেসেই তিন হাজার টাকা ঠকেছিলাম। সে কাহিনী পরে বলব।

ক্রমশঃ

নেতাজীর পত্নী ও কন্যা

গত ১০ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমাপ্তিশ অধিবেশনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবার ও তাঁহাদের ভরণপোষণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। স্বর্গত সর্দার প্যাটেল কর্তৃক 'কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে' রক্ষিত তহবিল সম্পর্কে আলোচনা চালাবার সময় একথা নাকি বলা হয় যে, সর্দার প্যাটেল যে তহবিল রাখিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আড়াই লক্ষ টাকার একটি বিশেষ তহবিল আছে। নেতাজী সম্পর্কিত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীলব্ধ অর্থ দ্বারাই এই তহবিল গঠিত হইয়াছে। কমিটির সদস্যগণকে আরও বলা হয় যে, ১৯৪২ সালের কাছাকাছি সময় নেতাজী একজন অস্ট্রিয়ান মহিলাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের একটি কন্যা আছে।

নেতাজীর স্বহস্ত লিখিত পত্র

এই সংবাদ কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার পর নেতাজীর স্ত্রী ও কন্যা সম্পর্কে সঠিক সংবাদ সংগ্রহার্থে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসুর সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি এই সংবাদ সমর্থন করিয়া নেতাজীর পত্নীর ছবি ও এই সম্পর্কে শরৎচন্দ্রকে লিখিত নেতাজীর পত্রের মূল পাণ্ডুলিপি সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে দেন। গত ১২ই এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকায় ঐ পত্রের মূল পাণ্ডুলিপি ব্লক করিয়া ছাপা হইয়াছিল—আমরা সেই চিঠি এখানে উদ্ধৃত করিলাম:—

পরম পূজনীয় মেজদা:

আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে। হয়তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইহজীবনে আর কোনও সংবাদ দিতে পারিব না। তাই আজ আমি আমার সংবাদ এখানে রাখিয়া যাইতেছি—যথাসময়ে এ সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছিবে। আমি এখানে বিবাহ করিয়াছি এবং আমার একটি কন্যা হইয়াছে। আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিণী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে—যেমন সারাজীবন আমার প্রতি করিয়াছ। আমার স্ত্রী ও কন্যা

নেতাজীর সহধর্মিণী এমিলি শেঙ্কল

আমার অসমাপ্ত কার্য শেষ করুক—সফল ও পূর্ণ করুক—ইহাই ভগবানের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবে—মা, মেজবৌদিদি এবং অন্যান্য গুরুজনকে দিবে।

ইতি বার্লিন, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩
তোমার স্নেহের ভ্রাতা
সুভাষ

১৯৪৮ সালে পরলোকগত শরৎচন্দ্র বসু যখন চিকিৎসার্থ শেষবার ভিয়েনায় যান, তখন এই চিঠিখানা তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু নেতাজীর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বসু এবং তাঁহার কন্যার সহিত ভিয়েনায় সাক্ষাৎ করেন। রোগমুক্তির পর তিনি তাঁহাদের সহিত তথায় কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন।

নেতাজীর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বসুর (এমিলি শেঙ্কল) বয়স বর্তমানে ৪২ বৎসর। তাঁহার কন্যার নাম দেওয়া হইয়াছে অনীতা। তাঁহার বয়স আট বৎসর। তাঁহারা বর্তমানে ভিয়েনার ফেরোগাসে বাস করিতেছেন। অনীতা তথায় একটি স্কুলে পড়িতেছে।

নেতাজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পর সুইজারল্যাণ্ডস্থ ভারতীয় দূত স্বর্গীয় শ্রীধীরুভাই দেশাই সুইজারল্যাণ্ডে নেতাজীর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া এক্ষণে নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রীর পত্রে আবেদন

আরও জানা গিয়াছে যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ইতোমধ্যে শ্রীযুক্তা বসুর নিকট এক পত্র দিয়াছেন এবং উহাতে তিনি শ্রীযুক্তা বসুকে তাঁহার কন্যা-সহ ভারতে আগমন করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে নেতাজীর একজন গুণগ্রাহী বন্ধুরূপে শ্রীযুক্তা বসুর নিকট ঐ পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

নেতাজীর বিবাহ কাহিনী সম্বন্ধে এক্ষণে যতদূর জানা যায়, তাহাতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা বসু (মিসেস এমিলি বসু) অস্ট্রিয়ার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা।

শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবীর বিবৃতি

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিবাহ সম্পর্কিত সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু বলেন—

"আমাদের ভিয়েনায় অবস্থানকালে আমার স্বামী সুভাষের স্ত্রীকে তাঁহার কন্যাসহ ভারতে আসিবার জন্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু সুভাষের স্ত্রী যতদিন না তিনি নেতাজীর সঙ্গে একত্রে ভারতে আসিতে পারিতেছেন অথবা ভারতে নেতাজীর সহিত সম্মিলিত হইতে পারিতেছেন, ততদিন ভারতাগমনের বাসনা স্থগিত রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।"

বিভাবতী দেবীর বিবৃতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় সুভাষের পত্নীর ইচ্ছানুসারে ঐ পত্র কাহাকেও দেন নাই বা প্রকাশ করেন নাই। কেননা, সুভাষের স্ত্রী নেতাজীর অনুপস্থিতকালে সাধারণ্যে তাঁহাকে লইয়া কোন আলোচনা হয়, ইহা চাহেন নাই। অবশ্য শরৎচন্দ্র বসু যদি কোন সময়ে প্রয়োজন বুঝিয়া উহা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবে তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই বলিয়া জানাইয়া দেন।

শ্রীযুক্তা বসু বলেন—"আমার স্বামীর অবর্তমানে এই পত্র প্রকাশ করিয়া আমি আমার বিচারবুদ্ধিমত কাজ করিয়াছি। আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সুভাষের পক্ষে তাঁহার বিবাহের সংবাদ চাপিয়া যাইবার কি কারণ থাকিতে পারে? আমার স্বামী আমাকে বলেন যে, জার্মানীতে যেসব ভারতীয় নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন, তাঁহারা এই বিবাহ সম্বন্ধে সকল কিছুই জানিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সুভাষের পরিবারের নিরাপত্তার খাতিরে এই সংবাদ চাপিয়া যাইতে হয়। সুভাষকে তাঁহার পরিবারকে অস্ট্রিয়ায় রাখিয়া যাইতে হয়; এই অস্ট্রিয়া প্রত্যক্ষ রণাঙ্গন ছিল বলিয়া উহা মিত্রবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থা বিবেচনায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন বলিয়া স্থির হয়।"

আজাদ হিন্দ ফৌজের উপদেষ্টা সমিতির বিবৃতি

শ্রীযুক্তা বসুর এই বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে একদল অবিশ্বাসী নেতাজীর বিবাহ সংবাদটি অভিসন্ধিমূলক মিথ্যা রটনা বলিয়া সংবাদপত্রে পাল্টা বিবৃতি দেন। ইহার প্রতিবাদের জন্য গত ১৪ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে মেজর-জেনারেল ভোঁসলের সভাপতিত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের উপদেষ্টা কমিটির এক বৈঠক বসে। এই কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—

"সম্প্রতি ভারতের সংবাদপত্রসমূহে নেতাজীর বিবাহ সম্পর্কে নানারূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এতাবৎকাল ইচ্ছা করিয়াই এ সম্বন্ধে প্রাকশ্যভাবে কোন কথা বলিতে বিরত ছিলাম। কারণ এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত এবং এ সম্বন্ধে জনসাধারণ্যে কোন আলোচনা অশোভন বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু ইহা লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাই আমরা যাহা জানি, তাহা দেশবাসীকে জানানো কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াই জানাইতেছি।

"নেতাজী ১৯৪২ সালে জার্মানীতে অবস্থানের সময় ফ্রাউ শেঙ্কলকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী শেঙ্কল বহু বৎসর ধরিয়া ইউরোপে তাঁহার সহিত একযোগে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি কন্যা জন্মে; বর্তমানে তাহার বয়স প্রায় আট বৎসর হইবে। মাতা ও কন্যা উভয়েই ভিয়েনায় বাস করিতেছেন।

"এই দৃঢ়চেতা ও প্রীতিময়ী মহিলাকে নেতাজী তাঁহার জীবনসঙ্গিনীরূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন, ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। বহু বৎসর ধরিয়া এই মহিলা ভারতকে তাঁহার স্বদেশ বলিয়া বরণ করিয়াছেন। তিনিই নেতাজীর শক্তি ও প্রেরণার উৎস ছিলেন।

"বিবাহের মাত্র এক বৎসর পর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় অধিবাসীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নেতাজী যখন জার্মানী হইতে বিপদের মধ্য দিয়া দূরপ্রাচ্য অভিমুখে যাত্রা করেন, প্রাচীন ভারতীয় বীর নারীর ন্যায় নেতাজীর পত্নী তাঁহাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন। নেতাজীর পত্নীর কোলে তখন একটি দুই মাসের শিশু। ইহার জন্য আমরা এই মহিলাকে শ্রদ্ধা করি।

"এই সুযোগে আমরা নেতাজীর পত্নী ও কন্যাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহাদিগকে আমাদের মধ্যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের অপেক্ষায় আমরা দিন গণিতেছি।"

পুস্তক পরিচয়

আজব নগরের কাহিনী—শ্রীনবেন্দু ঘোষ। উর্মি লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম ছয় টাকা।

স্বেচ্ছায় ভ্রষ্ট-স্বর্গে একটি পুতুলের অভিজ্ঞতার রূপকে লেখক মরজীবনের ত্রিতাপ-জ্বালার মূলে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। চিত্রের পটভূমি আজবনগর, যা পৃথিবীর কোথাও নেই, অথচ যার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীই আছে। কাহিনীর চরিত্রগুলি মানবজাতির প্রতিনিধি-স্থানীয়। কেউ অত্যাচারী, কেউ অত্যাচারিত, শেষোক্তদের অনেকেই আবার কমবেশি বিদ্রোহী। দুঃখ-দৈন্যের কারণ সন্ধান এই প্রথম নয়। ইতিহাসে ব্যাপারটা অনেকবার ঘটেছে। একের অন্বেষার ফল অপরের সঙ্গে মেশেনি, অসম মত বিষম হয়ে কখনো, কখনো আবার নতুনতর দুঃখের সৃষ্টি করেছে।

পূর্বতর প্রয়াসের সঙ্গে নবেন্দুবাবুর পার্থক্য প্রধানত দৃষ্টিভঙ্গীতে। এই দৃষ্টিভঙ্গী, সর্বাংশে তাঁর নিজস্ব না হলেও বৈজ্ঞানিক, বিচারাগ্রহী। অর্থ-রাজনীতির ব্যাকরণের যে সূত্রগুলিতে লেখক বিশ্বাসী তা বহুলত সমাজ-সমাসের। এই সমাস অবশ্য দ্বন্দ্ব, যার ব্যাসবাক্য হ'ল শ্রেণীনিচয়। শ্রেণী-বিভাগের ফলে এই সিদ্ধান্ত করা সহজ হয়েছে যে, সমাজের যাবতীয় আধিব্যাধির জন্যে একদল মানুষ ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। "আজবনগরের" কাহিনীর মূলে উপপাদ্যও তাই সরল : অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই যুদ্ধেই অন্যায়ের অবসান হবে।

প্রথমেই বলেছি উপন্যাসখানি রূপক। লেখকের প্রয়োজন ছিল। কেননা মানুষের মনে এমন কোন সীমান্ত নেই যার দুধারে সু ও কু প্রবৃত্তিগুলো বাস করে; যদি করেও, তাদের মধ্যে এমন কোন চুক্তি নেই যে, কখনো একে অপরের এলাকাতে ভুলেও পা দেবে না। বিশ্বব্যাপারের যাবতীয় জটিলতা এবং মনের অসংখ্য দুর্গম নরলোক গুহাকন্দর যদি পরিহার করা না যায়, পাপ-পুণ্যের ধারণা যদি রসায়ননীতিতে অক্সিজান-হাইড্রজান বিশ্লেষের মতো সরল করে না আনা যায়, তবে পৃথিবীকে সমগ্রভাবে বোঝা, তার বিচার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সত্যের যথার্থ নিরীক্ষার জন্যে দূরত্বও প্রয়োজন, রূপক সেই প্রয়োজন সিদ্ধি, উপরন্তু এ কাহিনীকে মাঝে মাঝে কাব্যগুণেও মণ্ডিত করেছে। মর্ত্য-বাসী অরিন্দম যেখানে অমর্ত্য-অমৃতলোকের স্বপ্ন দেখেছে, সেখানে তার আকাঙ্ক্ষায় কখনো কখনো যে তীব্রতা সঞ্চারিত হয়েছে, তা কাব্য-ধর্মী। বস্তুজগতের রৌদ্র সুষম স্বর্গের মেঘ-ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়েছে। কথাকুশল নবেন্দু ঘোষ এখানে অসামান্য শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

একটিমাত্র উপন্যাসে জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপকে সমগ্রভাবে বিধৃত করার প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত এই প্রথম। সে হিসেবে লেখক এক দুরূহ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নিজের ভূয়োদর্শনকে অধ্যয়ন ও চিন্তায় অগ্নিশুদ্ধ করে স্বরূপ দেওয়া সহজ নয়, নবেন্দুবাবু যে সর্বথা সফল হয়েছেন এমনও বলি না। কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিনতার বর্ণনা সংবাদবিবরণীর ধার ঘেঁষে গেছে। তবু নীচের মানুষের সংগ্রাম, ওপরের মানুষের লব্ধ, স্বার্থবুদ্ধ নৃশংসতার পাশাপাশি মনোলোকের আলেখ্য যেখানে ঈশ্বরধর্ম ইহলোক পরলোক সম্পর্কে অযুত জিজ্ঞাসার শরশয্যা চিত্রিত করার দুঃসাহস নবেন্দুবাবুই প্রথম দেখালেন, এজন্যে অকুণ্ঠ সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য।

'আজবনগরের কাহিনী' পড়তে পড়তে বিস্মিত হয়ে ভেবেছি, এর পরিণতি কোথায়। মরলোকে এসে অরিন্দম নরজন্মের সব সুখ-দুঃখের শরিক হ'ল, প্রবৃত্ত হ'ল সংগ্রামে। খেয়াল চরিতার্থ করে সে যদি ফের ফিরে যেতো মৃণালভুঞ্জনের অশোক লোকে, তা হলেও এ কথার নটে গাছটি মুড়োতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি; অরিন্দম শেষ পর্যন্ত থাকতে চেয়েছে, এই ধূলিলোকেই; কেননা, আরব্ধ সংগ্রামের এখনো ইতি হয়নি। কেননা, এই পৃথিবীতে ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি আশা আছে, বাসনা আছে। স্বেদস্বাদের মতোই এ অভিজ্ঞতা লবণাক্ত, কিন্তু বিচিত্র। ঈশ্বর আমাকে আবার মানুষ করে দাও, অরিন্দমের এই অন্তিম প্রার্থনায় জরাশোক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি মানুষের তীব্র আসক্তি প্রতিধ্বনিত।

ভারতীয় অর্থনীতি—লেখক—অধ্যাপক হিমাংশু রায়। প্রকাশক—এইচ চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৯নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭০; মূল্য ৩৷৷০ টাকা।

ভারতীয় অর্থনীতি বলিতে কি বুঝায় বা সেই সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করিতে উপরোক্ত পুস্তকটি পাঠককে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। সাধারণের কাছে অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনা স্বভাবতই জটিল ও নীরস—কিন্তু শ্রীহিমাংশু রায়ের কলম সেই নীরস বিষয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছে। কেবল ছাত্রছাত্রীদের নিকট নহে, উপরন্তু শিক্ষিত সমাজের নিকট আলোচ্য পুস্তকটি সাদরে গৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয়। বক্তব্য বিষয়ের সরলতা ও ভাষার সাবলীলতাই বইখানির বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে লেখক ধন্যবাদার্হ। আলোচ্য পুস্তকটির মধ্যে ভারতের বিভিন্ন বাঁধ পরিকল্পনা, জনসংখ্যা, কৃষি, ভূমির স্বত্ব ও রাজস্ব, শ্রমিক আইন ও আন্দোলন, যানবাহন ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা বিশেষ-প্রণিধানযোগ্য। ৮২।৫৯

ভজন গীতিকা—শ্রীহৃদয়রঞ্জন রায় প্রণীত। ১৬২, লিন্টন স্ট্রীট, কলিকাতা ১৪। মূল্য ১৲০।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা ভক্ত সাধকদের কণ্ঠে প্রচলিত ভজন গানের মধ্যে চয়ন করিয়া মীরাবাঈ ও তুলসীদাসের কিছু হিন্দী ভজন আর বাঙলা দেশের কিছু শ্যামা সঙ্গীত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে গানের স্বরলিপিও দেওয়া হইয়াছে। ৭৫।৫৯

নিউ এম্পায়ারে 'তাসের দেশ' ও 'চিত্রাঙ্গদা'

এ সপ্তাহে কলকাতার প্রমোদ আসরের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ নিউ এম্পায়ারে ২০শে থেকে "তাসের দেশ" এবং "চিত্রাঙ্গদা"। অবশ্য প্রমোদের চেয়েও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসাবেই এ দুটির আকর্ষণ বেশী। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হ'চ্ছেন বিশ্বভারতী এবং সমস্ততেই অংশ গ্রহণ ক'রছেন শান্তিনিকেতনেরই ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। প্রথম দুদিন, ২০শে ও ২১শে "তাসের দেশ" মঞ্চস্থ হয় এবং আগামীকাল রবিবার ও পরশু সোমবার সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হবে "চিত্রাঙ্গদা"। গীতিনাট্য দুটিই ইতিপূর্বে ক'লকাতায় বার কয়েক মঞ্চস্থ হ'লেও এদের অন্তঃস্থিত রসমাধুর্য প্রতিবারই নূতনের ও বৈচিত্র্যের আস্বাদ এনে দেয়। সংগীত ও নৃত্যের ছন্দে, ভাবধারায়, সাজপোষাকের বৈচিত্র্যের রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্য এমন এক মধুর অভিজ্ঞতার সঞ্চার ক'রে যা রসপিপাসুদের মনকে ভরিয়ে রেখে দেয় আজীবন আর কোন প্রমোদ উপাদানই সে তৃপ্তি ও সে আনন্দ এনে দিতে পারে না।

বাঙলা কার্টুন "মিচকে পটাশ"

ভারতে কার্টুন নির্মাণ প্রচেষ্টায় নিউ থিয়েটার্সের আর একটি অবদান "মিচকে পটাশ"। কার্টুন ছবি তোলা আমাদের দেশে এই প্রথম নয়, এর আগে নিউ থিয়েটার্সই তুলেছিলেন এবং তার আগে মন্দার মল্লিকই, যতদূর মনে পড়ে, প্রথম ব্রতী হন। বিদেশী কার্টুনের সঙ্গে তুলনা ক'রতে গেলে "মিচকে পটাশ"কে আদর জানাতে দ্বিধা লাগতে পারে, কিন্তু যদি বিবেচনা করা যায় যে, কার্টুন তোলার জন্যে বিদেশে যে সমস্ত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির উদ্ভব হ'য়েছে, কার্টুন তোলার জন্যে বিদেশী চলচ্চিত্র শিল্পের যে সুদ, উৎসাহ এবং সহায়তা, সে সবের একটুও আমাদের এখানে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও একখানা হাজার ফুটের সরস কার্টুন তোলা হ'য়েছে এবং তা দেখাবার মত হ'তে পেরেছে, তাহ'লে তার উদ্যোক্তা ও নির্মাতাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না।

"মিচকে পটাশ"-এর উদ্যোক্তা নিউ থিয়েটার্স এবং নির্মাতা ভক্তরাম মিত্র। ছবির পটের অংশ এ'কেছেন শৈল চক্রবর্তী এবং ছবিগুলিকে সঞ্জীবিত করেছেন রেবতী-ভূষণ ঘোষ; সুর সংযোজনা ক'রেছেন রঞ্জিৎ রায় এবং কাহিনী গ্রহণ করা হ'য়েছে

রঙ্গজগৎ

সুনির্মল বসুর রচনা থেকে। উৎকর্ষে বিদেশী কার্টুনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে আমাদের অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে এবং তা অসম্ভব হবে না যদি আমাদের দেশের চলচ্চিত্র শিল্প এবং দর্শক সাধারণ নির্মাতাদের উৎসাহ দান করেন।

এস বি পিকচার্সের আগামী ছবি

গত ১লা বৈশাখ এস বি পিকচার্সের আগামী ছবি "আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ"-এর মহরৎ হোটেল মেট্রোপলে আনুষ্ঠানিক-ভাবে সুসম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সুখ্যাত পরিচালক প্রফুল্ল রায়। উপস্থিত বিশিষ্ট শিল্পী, পরিচালক, কলাকুশলীদের কৌতুক পরিবেশনে পরিতৃপ্ত করেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট) এবং জলযোগে আপ্যায়িত করেন প্রযোজক

প্রাইমা ফিল্মসের সৌজন্যে প্রদর্শিত

বিঃ দ্রঃ—২০শে এপ্রিল থেকে রূপবাণী ও অরুণার প্রদর্শনী সময় ৩, ৬, ৯টা হইল।

...বিনকৃষ্ণ দত্ত। ছবিখানি পরিচালনা ...রবেন বিজন সেন।

শিশুদের জন্য রঙীন ছবি

স্টুডিও সিক্সটীন নামক একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি "বর্ণমালা" নামে শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক রঙীন ছবি নির্মাণের প্রাথমিক কাজ সুরু ক'রেছে। ছবিটি ইংরাজী, বাঙলা, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষায় এবং ১৬ এম।এম ও ৩৫ এম।এম মাপে গৃহীত হবে। "বর্ণমালার" রচনা ও পরিকল্পনা করেছেন রমাপতি বসু এবং নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছেন কল্যাণ গুপ্ত। শিশুদের উপযোগী রঙীন ছবি তোলার প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে এই প্রথম।

হকি

কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতায় প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ান নির্ধারণকল্পে পরিচালকদের আরও একটি অতিরিক্ত খেলার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ভবানীপুর ক্লাব প্রতিযোগিতার অবশিষ্ট তিনটি খেলাতেই উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। ফলে মোহনবাগান ও ভবানীপুর দলের পয়েণ্ট সংখ্যা সমান হইয়াছে। ভবানীপুর দলের এই সাফল্য লাভ সত্য সত্যই কৃতিত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত খেলার ফলাফল কি হইবে বলা কঠিন, তবে ঐ খেলায় ভবানীপুর দল বিজয়ী না হইলেও অসম্মানের কিছুই হইবে না। ভবানীপুরের কোন দিনই হকি খেলায় খুব বেশী খ্যাতি ছিল না, সুতরাং এই বৎসরে তাহারা যেরূপ কলাফল প্রদর্শন করিয়াছে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

পূর্বে বহুবার দুইটি দল সমান সংখ্যক পয়েণ্ট লাভ করিয়াছে, কিন্তু এইরূপ অতিরিক্ত খেলার ব্যবস্থা করিতে হয় নাই। তখন গোলের গড়পড়তাই জয়পরাজয় নির্ধারণ করিত। ১৯৪৬ সাল হইতে পরিচালকগণ ঐ নীতি ত্যাগ করেন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ভবিষ্যতে এইরূপ অবস্থা হইলে উভয় দলকে পুনরায় এক খেলায় মিলিত হইতে হইবে এবং অতিরিক্ত খেলার ফলাফলই চ্যাম্পিয়ান নির্ধারণ করিবে। ১৯৪৬ সালে রেঞ্জার্স ও পোর্ট কমিশনার্স উভয়ে সমান সংখ্যক পয়েণ্ট সংগ্রহ করিয়া পরিচালকগণকে বিব্রত করেন ও নিশ্চিত ফলাফলের জন্য অতিরিক্ত খেলার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৬ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ান নির্ধারণকল্পে অতিরিক্ত খেলার আইন প্রবর্তিত হইলেও এই পর্যন্ত কোন বৎসরই পরিচালকদের অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হয় নাই। ভবানীপুর দলের অপ্রত্যাশিত সাফল্যই পুনরায় প্রবর্তিত আইনের প্রয়োগ করিতে পরিচালকদের বাধ্য করিয়াছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ নির্ধারণকল্পের অতিরিক্ত খেলাটি নিশ্চয়ই চ্যারিটির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে এই খেলায় যে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহার সদ্ব্যবহার হইবে কি না? বাঙলার হকি পরিচালকগণ গত বৎসরের বিভিন্ন চ্যারিটি খেলার হিসাব নিকাশ ঠিক মত দিতে না পারায় অডিটার বা হিসাব পরীক্ষকগণ উল্লেখ করেন "টিকিটের কোন কাউণ্টার পার্ট হিসাবের সহিত যুক্ত করা হয় নাই। ঐ উক্তির দ্বারা তাঁহারা কি ইঙ্গিত করিতে চাহিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে আলোচনা করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। তবে ইঙ্গিতটা যে খুবই মারাত্মক ইহা বলাই বাহুল্য। মোহনবাগান ও ভবানীপুরের অতিরিক্ত খেলা চ্যারিটির হিসাবে অনুষ্ঠিত হইলে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইবে এবং ঐ সংগৃহীত অর্থ ঠিকমত সদ্ব্যবহার হয় ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। বিভিন্ন বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি স্থানের অধিকারীদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

প্রথম ডিভিসন

মোহনবাগান	... ২০	১৬	৩	১	৫৭	১০	৩৫
ভবানীপুর	... ২০	১৬	৩	১	৪৫	১০	৩৫
কাষ্টমস	... ২০	১৫	৩	২	৪৩	৮	৩৩

দ্বিতীয় ডিভিসন "বি"

ক্যালঃ

গ্যারিসন	... ১৭	১৩	৩	১	৪১	১১	২৯
ভবানীপুর,	... ১৫	১৩	০	২	৩৭	৯	২৬
ইষ্টবেঙ্গল	... ১৯	১১	৪	৪	২১	১৪	২৬

দ্বিতীয় ডিভিসন

বি জি প্রেস	... ১৮	১৩	৪	১	২৮	৩	৩০
আর্ম পুলিশ	... ১৭	১৩	১	৩	৩৫	১০	২৭
জ্যাভেরিয়ান্স	... ১৮	১০	৫	৩	২২	৮	২৫

তৃতীয় ডিভিসন "এ"

ওয়ারী	... ১২	১১	১	০	১৮	০	২৩
গ্রেল ক্লাব	... ১১	৮	৩	০	১৯	০	১৯
বেনিয়াটোলা	... ১১	৪	৬	১,১০		৬	১৪

তৃতীয় ডিভিসন "বি"

দঃ কলিকাতা	... ১০	৯	১	০	২০	০	১৯
আদিবাসী	... ১১	৭	৩	১	১৩	২	১৭
আরিয়াদহ	... ১১	৬	৪	১	১১	৪	১৬

আগা খাঁ হকি কাপ প্রতিযোগিতা

আগা খাঁ হকি কাপ প্রতিযোগিতার খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ১৯৪৯ সালের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাব পুলিশ দল ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছে। ১৯৫০ সালের চ্যাম্পিয়ান টাটা স্পোর্টস ক্লাবও সেমিফাইন্যালে গ্রেটার বোম্বাই পুলিশ দলের সহিত খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। ফাইন্যালে টাটা স্পোর্টস ও পাঞ্জাব পুলিশ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে বলিয়াই সকলে আশা করিতেছেন। কলিকাতার কাস্টমস দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া প্রথম খেলায় ১১-০ গোলে বিজয়ী হইয়া কোয়ার্টার ফাইন্যালে গ্রেটার বোম্বাই পুলিশ দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। বোম্বাইর হকি স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান বাঙলা হইতে যে উন্নততর স্তরের তাহা ইহা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে।

টেবিল টেনিস

ভারতের টেনিস পরিচালকগণ গত কয়েক বৎসর ঘন ঘন বৈদেশিক খেলোয়াড়দের ভারতে আনাইয়া খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড যেরূপ স্তরে উপনীত করাইয়াছেন তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে ভারতীয় টেবিল টেনিস পরিচালকগণও না সেইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করেন। টেবিল টেনিস খেলায় ভারত যে এখনও বিশ্বের বহু দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বৈদেশিক ভ্রমণ ব্যবস্থা যখন চলিয়াছেই তখন বৈদেশিক খেলোয়াড়দের প্রচুর অর্থব্যয়ে ভারতে পুনরায় আনাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে হয় না। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জনী লীচ ও ফরাসী চ্যাম্পিয়ান মিচেল হগনেয়ার ভারতে শীঘ্রই আসিবেন ইহা শুনিবার পর হইতেই যে চিন্তা আমাদের মনে হইয়াছে তাহা ব্যক্ত না করিয়া পারিলাম না। উক্ত দুইজন খেলোয়াড়ের সমকক্ষতা করিবার মত ভারতে কোন খেলোয়াড়ই নাই। কেবল দর্শনধারী হিসাবে বহু অর্থব্যয়ে ইহাদের ভারতে না আনিয়া যদি কোন বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে শিক্ষক হিসাবে আনা হইত তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ উপকার হইত।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১০ই এপ্রিল—ভারত সরকারের এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, কতক ক্ষেত্রে ডাক মাশুলের হার পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং তম্মধ্যে মণি অর্ডার কমিশন বৃদ্ধি, স্থানীয় খামের চিঠির কন্‌সেশন বাতিল ও ২৫্ টাকার ঊর্ধ্ব মূল্যের ভি পি পার্শ্বেল বাধ্যতামূলকভাবে ইন্সিওর করা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫১ সালের ১লা মে এই নূতন ব্যবস্থা বলবৎ হইবে।

অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে অর্থ দপ্তরে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ বলেন যে, ভারতের স্বার্থের প্রয়োজনে বর্তমানে মুদ্রার মূল্য পুনঃ নির্ধারণ সমীচীন হইবে না।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাকাল বিতর্কের পর অনধিকারী ব্যক্তি উচ্ছেদ বিলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চারি নম্বর ধারাটি গৃহীত হয়। সরকার পক্ষের প্রস্তাব ক্রমে মূল বিলের ঐ ধারাটি পরিষদে সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। উক্ত সংশোধিত ধারায় এরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট 'প্রকৃত উদ্বাস্তুদের' জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট বিকল্প জমি ও গৃহের ব্যবস্থা না করিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদের উচ্ছেদ করা হইবে না।

অদ্য নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমাপ্তি অধিবেশনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবার এবং তাঁহাদের ভরণ পোষণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটিকে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের কাছাকাছি সময় নেতাজী জনৈকা অস্ট্রিয়ান মহিলাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের একটি কন্যা আছে। স্বর্গত সর্দার প্যাটেল বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত উক্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করিতেন। নেতাজীর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সর্দার প্যাটেল একটি বিশেষ তহবিল রাখিয়া গিয়াছেন।

১১ই এপ্রিল—১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী বার্লিন হইতে জাপানের পথে দুর্গম যাত্রা সুরু করার পূর্বে নেতাজী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত শরৎচন্দ্র বসুর উদ্দেশে একখানি চিঠি রাখিয়া যান। উক্ত পত্রে নেতাজী বলেন,—"আমি এখানে বিবাহ করিয়াছি এবং আমার একটি কন্যা হইয়াছে। আমার অবর্তমানে, আমার সহধর্মিণী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে, যেমন সারা জীবন আমার প্রতি করিয়াছ। আমার স্ত্রী ও কন্যা আমার অসমাপ্ত কার্য শেষ করুক, সফল ও পূর্ণ করুক, ইহাই ভগবানের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা।"

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রায় ছয়ঘণ্টাকাল প্রবল বিতর্কের পর "উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং অনধিকারী ব্যক্তি উচ্ছেদ বিলটি" গৃহীত হয়।

১২ই এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে ১৯৫০ সালের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট লইয়া প্রায় ৪॥ ঘণ্টাকাল তুমুল বিতর্ককালে বিরোধী পক্ষ উক্ত কমিশনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতায় রাজ্য সরকার কর্তৃক অসঙ্গতভাবে হস্তক্ষেপের তীব্র অভিযোগ করেন।

মেসার্স প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বোম্বাইর বিশিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ী। অবৈধভাবে স্বর্ণ আমদানীর অভিযোগে কলেক্টর অফ এক্সাইজ কর্তৃক এই ফার্মের ৪০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

দেশের যুব-সমাজের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি এবং যুবকগণকে কার্যে নিয়োগের জন্য একটি বিভাগ খোলার উদ্দেশ্যে ডাঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখ অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক বে-সরকারী বিল আনয়ন করেন। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ডাঃ দেশমুখ বলেন যে, দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার অবসান ঘটাইবার জন্য গভর্নমেণ্ট যদি সাহসিকতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে যুবকেরা কম্যুনিজমকেই সাদরে গ্রহণ করিবে। এই দিন পার্লামেণ্টে এই বিল সম্পর্কে আলোচনা হয়।

১৩ই এপ্রিল—ভারত সরকার মহারাজা প্রতাপ সিং গাইকোয়াড়কে আর বরোদার মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহারাজাকে এই সংবাদ জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত অদ্য হইতে কার্যকরী হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে মহারাজা তাঁহার খেতাব, সুযোগ-সুবিধা ও তাঁহার ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রদত্ত বার্ষিক ২৬॥ লক্ষ টাকা হইতে বঞ্চিত হইলেন। ভারত সরকার মহারাজার ২১ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার ফতে সিংকে বরোদার মহারাজা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অদ্য কলিকাতায় উডবার্ণ পার্কে 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার-কালে পরলোকগত শরৎচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিবাহের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

১৪ই এপ্রিল—ভারতীয় পার্লামেণ্টে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীরাজগোপালাচারী ঘোষণা করেন যে, ১৯৫১ সালের লোক গণনার প্রাথমিক হিসাবে প্রকাশ, ১৯৫১ সালের ১লা মার্চ ভারতের লোক-সংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৬২৪ জন; ইহার মধ্যে ১৮ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮০৭ পুরুষ এবং ১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬ হাজার ৮১৭ জন নারী। জম্মু ও কাশ্মীরের আনুমানিক লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ ৩৭ হাজার এবং স্ব এলাকাভুক্ত ও উপজাতি অধ্যুষিত প্র এলাকার আনুমানিক ৫৬ লক্ষ অধিবাসী সমেত ভারতের মোট জনসংখ্যা ৩৬ কোটি ১৮ লক্ষ ২০ হাজার হইবে।

১৫ই এপ্রিল—নেপালের শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অদ্য ঘোষণা করিয়াছেন। অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার ১৫ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। শ্রী বি পি কৈরালার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হওয়ায় মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া-ছেন। নেপালাধীশ রাজা ত্রিভুবন নেপালী বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। নেপালী বাহিনীর বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ উপদেষ্টা সমিতি এব বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, "নেতাজী ১৯৪২ সালে জার্মানীতে অবস্থানের সময় ফ্রাউ শেঙ্কলবে বিবাহ করেন। শ্রীমতী শেঙ্কল বহু বৎসর ধরিয় ইউরোপে তাঁহার সহিত একযোগে কাজ করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের একটি কন্যা জন্মে; বর্তমানে এই কন্যার বয়স প্রায় ৮ বৎসর হইবে। এক্ষণে মাতা ও কন্যা ভিয়েনায় বাস করিতেছে।

বিদেশী সংবাদ

৯ই এপ্রিল—উত্তর কোরিয়ায় অগ্রসর রাষ্ট্রপু বাহিনীর গতিরোধের জন্য অদ্য চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্যদল পুখান নদী বাঁধ খুলিয়া প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছে।

১০ই এপ্রিল—বৃটিশ অর্থমন্ত্রী মিঃ হিউ গেটস্কেল অদ্য ১৯৫১-৫২ সালের বাজে পেশ করিয়া দেশের পুনরস্ত্রসজ্জার প্রয়োজ মিটাইবার জন্য ব্যাপকভাবে নূতন ব নির্ধারণের প্রস্তাব করিয়াছেন। ১৯৫১—৫ সালে দেশরক্ষা বাবদ মোট ব্যয় হইবে ১৫ কোটী ষ্টার্লিং। উহা গত বৎসরের তুলনায় ৫ কোটী ষ্টার্লিং বেশী।

১১ই এপ্রিল—প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান জেনারে ম্যাকআর্থারকে কোরিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিন সর্বাধিনায়কের পদ হইতে পদচ্যুত করিয়াছে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান জেনারেল এম বি রিজওয়ে জেনারেল ম্যাকআর্থরের স্থলাভিষি করিয়াছেন।

১২ই এপ্রিল—অদ্য কোরিয়ার মধ্য রণাঙ্গ রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী কম্যুনিস্টদের স্বয়ং আগ্নেয়াস্ত্র ও কামানের গোলাবর্ষণের সম্মুখ হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল রিজওয়ের সৈন্যবাহিনী দুই সপ্ত ব্যাপী অভিযানে এই সর্বপ্রথম প্রবলতম বাধার সম্মুখীন হইল।

১৪ই এপ্রিল—বৃটেনের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ আর্নেস্ট বেভিন অদ্য রাত্রিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—৶৹ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক) ৶৹ আনা, বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক—১০ (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 19th May, 1951. [২৯শ সংখ্যা

ভিক্ষার দান

কিছুদিন পূর্বে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অভ্রান্ত ভাষায় এই কথা ঘোষণা করেন যে, ভারত বিদেশের কোন রাষ্ট্রের কাছে কোনরূপ বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করিয়া খাদ্যশস্য লইবে না। পণ্ডিতজীর এই উক্তিতে ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদাবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। তাঁহার মুখে এমন স্পষ্টকথা শুনিয়া আমরা সুখীও হইয়াছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের যে মান, তাহা প্রাণের চেয়েও বড়। বলা বাহুল্য, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর উক্তি হইতে সাধারণের মনে এই ধারণাই জন্মিয়াছিল যে, আমেরিকা ভারতকে খাদ্যশস্য দিয়া সাহায্য করার সম্বন্ধে যেরূপ দর-দস্তুর আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, পণ্ডিতজী তৎসম্পর্কেই ঐরূপ মর্যাদাপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং মার্কিন রাষ্ট্রের কাছে মাথা হেঁট করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। ভারতের খাদ্যসংকট সমাধানের সুবিধার জন্যও নয়। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই, ভারতের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার কথা ঘুরাইয়া লইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। কড়ি হইতে সুর হঠাৎ একেবারে কোমলে নামানো পণ্ডিতজীর এ রীতি আছে, এক্ষেত্রে সেই পরিচয়ই পাওয়া গিয়াছে। সেদিন ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর প্রসংগে তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে, ভারতে খাদ্যশস্য প্রেরণ সম্পর্কে মার্কিন সেনেটে এবং প্রতিনিধি-সংসদে যে দুইটি আইনের খসড়া উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতের পক্ষে অবমাননাকর কিংবা বৈষম্যমূলক কোন সর্ত নাই; অর্থাৎ আমেরিকা একান্ত উদারতা-পরবশ হইয়াই ভারতের দুর্দিনে তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। পেটের দায়ে মানুষ অবশ্য সব কাজই করিতে পারে; বিশেষত ভিক্ষার চাউলের কাঁড়া, আকাঁড়া বিচার করা চলে না। আমরা ইহা বুঝিতে পারি; কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী মার্কিন আইন-সভাদ্বয়ে উপস্থাপিত আইনের খসড়া দুইটি যেমন নির্দোষ এবং মানবতা-প্রণোদিত বলিয়া বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, আমরা ততটা সহজভাবে সে দুইটির তাৎপর্য স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছি না। আমাদের মতে বিশ্বমানবতা বা রাষ্ট্রস্বার্থ হইতে মুক্ত, অহেতুক যে উদারতা সে বস্তু অতটা সস্তা নয়। ফলতঃ আমেরিকার অন্তরে আজ ভারতের বিপদে সে প্রেরণা উদ্বেলিত হইয়াও উঠে নাই। আমাদের মতে এ সম্বন্ধে মার্কিন রাষ্ট্র ভারতের উপর যেসব সর্ত আরোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেগুলি প্রত্যক্ষভাবেই ভারতের পক্ষে অবমাননাজনক। মার্কিন সেনেটে উপস্থাপিত বিলটিতে এই বিধান রহিয়াছে যে,—আমেরিকা হইতে ভারতে যে খাদ্যশস্য যাইবে, সেগুলি জাতি, বর্ণ এবং রাজনৈতিক মতনির্বিশেষে অভাবগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে। আমেরিকা ভারতকে খাদ্যশস্য দিয়া এইভাবে সাহায্য করিয়াছে, ইহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে; অধিকন্তু উক্ত খাদ্যশস্য সম্পর্কে তদারক করিবার জন্য মার্কিন কর্মচারীদিগকে অবাধ অধিকার দিতে হইবে। ইহা ছাড়া এই খাদ্যশস্য বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ অনুযায়ী সে অর্থ খরচ করিতে হইবে। সর্তগুলির তাৎপর্য বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে ভারতের অবমাননার দৌড় কতখানি গিয়া দাঁড়ায়, আমরা ভাঙ্গিয়া বলিতে চাহি না। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকারের উপর যদি ইহাতেও হস্তক্ষেপ করা না হয়, তবে আর কিসে হইতে পারে, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাহার উপর ৩৫ বৎসরের মেয়াদে ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট দাসখৎও লিখিয়া দিতে হইবে। তাহাদের ফরমাইস মত মাল পাঠাইতে হইবে। এটম বোমা প্রস্তুতের উপাদান সরবরাহের দাবী হইতে মার্কিনী মহাজনগণ ভারতকে দয়া করিয়া যদি রেহাই দেন ভাগ্যের কথা; কিন্তু সে বিষয়ে এখনও সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের দুর্দিনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সিদ্ধ করিবার সুযোগ-স্বরূপে গ্রহণ করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। পরমুখাপেক্ষীর এই কূটচক্র ভেদ করিতে না পারিলে ভারতের ভাগ্যাকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিবে, সন্দেহ নাই।

পুণ্যভূমি কামারপুকুর

গত ১১ই মে হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইয়াছে। ১১৫ বৎসর পূর্বে এই নিভৃততম পল্লী-কুটীরের ঢেঁকিশালায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মপরিগ্রহ করেন। ঐ সময় বৈদেশিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং আদর্শের প্রভাবে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অধ্যাত্ম-সাধনা জনচিত্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল; কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে অবতীর্ণ হইয়া ঠাকুর তাঁহার দিব্যজীবনের প্রভাবে জাতিকে সেই দৈন্য হইতে মুক্ত করেন। এ দেশের শিক্ষা-দীক্ষা এবং সমাজ-জীবনে জাতির নরনারীর অন্তর মহিমাকে তিনি উদ্দীপ্ত করিয়া তোলেন। এদেশের দরিদ্রদের মধ্যে নরনারায়ণের নিত্য-লীলাকে তিনি সমগ্র জাতির দৃষ্টিতে মুক্ত করিয়া ধরেন। পরানুকরণের ঘৃণ্য মোহে জাতি ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঠাকুরের কৃপায় বাঙালী পুনরায় আত্মস্থ হইবার সুযোগ লাভ করে। পল্লী-কেন্দ্রে ঠাকুরের মন্দিরের এই প্রতিষ্ঠা এদেশের জনচিত্তে তাঁহার জীবনাদর্শকে উপলব্ধি করিবার পথ প্রশস্ততর করিবে এবং দেশের অন্তর ধর্মের প্রতি আমাদের চিত্তকে সমধিক শ্রদ্ধিত করিয়া তুলিবে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা গ্রামকে ভুলিয়াছি এবং নাগরিক জীবনের মোহ আমাদিগকে উন্মুখ করিয়া তুলিতেছে। ইহার ফলে আমাদের রাজনীতিক সাধনার ধারাও অনেকটা বাহ্য বস্তু হইয়া পড়িতেছে; প্রত্যুত জাতির চিত্ত তাহা স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। এদেশের রাজনীতি অনেকটা পোষাকী-ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সমাজ-জীবনে দুর্নীতির পাক দুরন্ত আকারে জমিয়া উঠিতেছে। সেই দুর্নীতির প্রভাব শাসন বিভাগকে পর্যন্ত অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে; বস্তুতঃ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা এবং তাহার নিয়ন্ত্রণে বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তনই কার্যত ঘটে নাই। শাসন বিভাগে সাহেবী চাল ষোল আনাই আছে। জাতির প্রতি বেদনা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। মানুষকে মানুষের মত দেখিবার মত চেতনা হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। এভাবে কোন জাতি বাঁচিতে পারে না এবং তাহার উন্নতি সাধিত হওয়াও সম্ভব নয়। কামারপুকুরের পবিত্র অনুষ্ঠান এই ভ্রান্তি নিরসন করিতে অনেকটা সাহায্য করিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

সমাজ-জীবনের গ্লানি

চারিদিকের বাতাস যেন বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সমাজে যে পরিবেশের মধ্যে আমাদিগকে বাস করিতে হইতেছে, তাহা উপযুক্ত মানুষ গঠনের অনুকূল নয়, এ ধারণা প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। তরুণ দলই দেশের ও সমাজের আশা ও ভরসার স্থল। বাঙলার বর্তমান সমাজ-প্রতিবেশ তরুণদের জীবনকে বলিষ্ঠ কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। বিশেষ সঙ্কটের বিষয় এই যে, একদল বিকৃত রুচির সাহিত্যের রচয়িতা এবং প্রকাশক সমাজ-জীবনের এই দুর্গতিকে নিজেদের পাপ-ব্যবসা চালাইবার সুযোগ-রূপে গ্রহণ করিতেছে। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া এই ধরণের বুজরুকী বাড়িয়া চলিয়াছে। কলিকাতা শহরে এমন অনাচার অবশ্য, একেবারে নূতন কিছু নয়। এক শ্রেণীর লেখক এবং প্রকাশক এই পাপ-ব্যবসার পথে অর্থ সংগ্রহে দীর্ঘদিন হইতেই এখানে প্রবৃত্ত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই উপদ্রব অসম্ভব মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে এবং কলিকাতার বাজার অশ্লীল সাহিত্যে ছাইয়া ফেলিতেছে। বলা বাহুল্য, এই ব্যবসা যাহারা চালায় এবং যাহাদের মাথা হইতে সমাজ-জীবনে দুর্নীতির বিষ সম্প্রসারিত করিবার কৌশল বাহির হয়, তাহারা তরুণ নহে, তাহারা প্রবীণ। নিছক অর্থের লোভে তাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত হয়। চোরা-বাজারী, মুনাফাশিকারীদের মত ইহারাও রক্তপিপাসু জীব। প্রত্যুত ইহাদের দংশন-রীতি অধিকতর ভয়াবহ এবং শোষণের নীতির গতি সমধিক সূক্ষ্ম ও মারাত্মক। জাতির সমষ্টি মন যদি সুস্থ থাকে, বিশেষভাবে ছাত্র এবং তরুণ দলের মধ্যে বৃহৎ আদর্শের প্রেরণা যদি জাগ্রত হয়, তবে চোরাবাজারী এবং মুনাফাশিকারীদের পাপ প্রবৃত্তি অন্তত একদিন সংযত হইবে, এমন আশা থাকে; কিন্তু অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের ফলে সমাজ-মন যদি বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং তরুণেরা নৈতিক আদর্শ হইতে বঞ্চিত হয়, তবে জাতির ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। প্রতিকার ইহার কোথায়? যাহারা এইভাবে সমাজ-জীবনের সর্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহাদিগকে সংযত করিবার দায়িত্ব শাসকদের। সেই দায়িত্ব তাঁহারা কিভাবে পালন করিতেছেন, আমরা জানি না। এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেই পুলিশের অসহায়ত্বের কথা বলা হইয়া থাকে। অথচ এই অসহায়ত্বের কারণ কি আমরা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। যদি প্রচলিত আইন এই অনাচার প্রতিরোধের পক্ষে সত্যই অনুপ-যুক্ত হয়, তবে এজন্য অতিরিক্ত ক্ষমতার আশ্রয় গ্রহণ করা সরকারের কর্তব্য—উপযুক্ত আইন প্রবর্তন করা তাঁহাদের পক্ষে দরকার। চোরাবাজার এবং মুনাফা-শিকারীরা আইনের ছিদ্রপথে শরীরের রক্ত শোষণ করিবে, যৌন-বিজ্ঞানের আড়ালে থাকিয়া যাহার যেমন খুসী, অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের দ্বারা তরুণ এবং ছাত্রসমাজের চিত্তকে কলুষিত করিয়া তুলিবে, আর শাসকেরা উপযুক্ত ক্ষমতার অভাবের অজুহাতে সেই দৃশ্য নির্লিপ্ত চিত্তে উপভোগ করিবেন, এমন যুক্তি আমরা শুনিতে চাই না এবং মানিয়া লইতেও প্রস্তুত নহি। এই পাপকে কঠোরহস্তে দমন করিতে হইবে এবং বাঙলার তরুণদের মন ও বুদ্ধিকে এই বিষের স্পর্শ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ বিষয়ে উদ্যোগী হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের তেমন উদ্যমে দেশবাসী সকলের সমর্থন তাঁহারা লাভ করিবেন।

ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতীয় পার্লামেণ্টে স্বয়ং ভারতীয় শাসন-তন্ত্রের সংশোধক একটি বিল উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিলে প্রধানত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কতকগুলি ধারা সংশোধন করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। সেই-গুলির মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতৎসম্পর্কিত সংশোধন প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার ভূমিকাস্বরূপে পণ্ডিত নেহরু এই কথা বলিয়াছেন যে, বক্তৃতার স্বাধীনতার অধিকার বলিতে কোন দেশেই ইহা স্বীকৃত হয় না যে, সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার ঘটিলেও রাষ্ট্র কোনরূপ সাজা দিতে পারিবে না। এক হিসাবে ইহা অবশ্য সত্য; কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, স্বাধীনতার অপব্যবহার কোন ক্ষেত্রে ঘটে, ইহা স্থির

করিবে কে? শাসকরা না দেশের জনসাধারণ বা তাহাদের প্রতিনিধিবৃন্দ? সংশোধক ধারায় এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে,"রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পররাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক এবং দেশের শান্তি ও খ্যাতি রক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা চলিবে। ফলত এই যে সব অজুহাতে ব্যাপকার্থে আইনের অপপ্রয়োগ ঘটা আদৌ বিচিত্র নয়। কোন বক্তৃতা বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ সরকারের অনভিপ্রেত হইলে আইন ও শান্তি রক্ষার ব্যাঘাত বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, এহেন আশঙ্কার কারণ এক্ষেত্রে থাকে। সেইরূপ কোন সংবাদপত্রে পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা প্রকাশিত হইলে তাহা পররাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুতার বিরোধী বলিয়া কর্তৃপক্ষের মতে বিবেচিত হইতে পারে। এই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্ররোচনা প্রভৃতি অভিযোগও জড়াইয়া আসিয়া পড়া সম্ভব। বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধনের যে প্রস্তাবটি উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব অনেক দিক হইতেই রহিয়াছে। আমাদের মতে এরূপ ব্যাপারে এমন তাড়াহুড়া করা উচিত হয় নাই। দেশের লোক এবং জনসাধারণের যাহারা প্রতিনিধি তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে ধীরভাবে বিবেচনা করিবার জন্য অন্তত কিছুদিন সময় দেওয়া দরকার ছিল। ১৫ মাস হইল ভারতে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত সংশোধন না করা স্বত্ত্বেও এক বৎসরের অধিককাল শাসন-ব্যবস্থা যখন বিপর্যস্ত হয় নাই, তখন আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিলেও অনর্থপাত ঘটিবার আশঙ্কা বিশেষ কিছু ছিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, শোনা যাইতেছে, প্রস্তাবিত সংশোধন সাধনের ভার দেশের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের থাকিলেই সঙ্গত এবং শোভন হইত। আমরা আপাতত এই সংশোধন-প্রচেষ্টা স্থগিত রাখাই বিধেয় মনে করি।

উদ্বাস্তুদের পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন

সম্প্রতি পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর কেশকার জানাইয়াছেন যে, মার্চ ও এপ্রিল মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে নূতন উদ্বাস্তু সমাগমের কোন সংবাদ তাঁহারা পান নাই। তবে সংবাদপত্রে নূতন উদ্বাস্তু সমাগমের সংবাদ তিনি দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সংবাদ অতিরঞ্জিত। ডক্টর কেশকারের উক্তি হইতে আশঙ্কা হয় যে, পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে এখনও যে উদ্বাস্তুদের সমাগম হইতেছে, একথা ভারত সরকার বিশ্বাস করিতে চাহেন না এবং তাহার উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে দিল্লী চুক্তির মহিমা এমনই যে, ইহার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ৩৪ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে ২২ লক্ষই পুনরায় ঘর-বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারত সরকারের এই অভিমত আমরা সমর্থন করি না এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে এখনও উদ্বাস্তুদের সমাগম ঘটিতেছে। ফলতঃ উদ্বাস্তুদের মধ্যে যাঁহারা স্থায়ীভাবে পূর্ববঙ্গে বসবাস করিতে ফিরিয়া গিয়াছেন বা যাইতেছেন, তাহাদের সংখ্যা খুবই সামান্য। অবশ্য পূর্ববঙ্গের অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। হিন্দুদের সম্বন্ধে সেখানকার মুসলমান জনসাধারণের মতিগতি আর পূর্বের মত নাই; পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনসাধারণ প্রতিবেশীরূপে হিন্দুদিগকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেছেন ইহাও ঠিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ববঙ্গ সরকারের নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। রাষ্ট্রনীতি এবং শাসন-ব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার ভাব বিশেষভাবে বৈষম্য-বিচার অদ্যাপি প্রশ্রয় লাভ করিতেছে এবং ইহার ফলে সেখানে হিন্দুসমাজের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সুদৃঢ় হইতে পারিতেছে না। তাঁহারা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে রহিয়াছেন এবং সেজন্য উদ্বেগ বোধ করিতেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পূর্ববঙ্গ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর নানাভাবে আর্থিক চাপ পড়িয়াছে। পাকিস্থান ইসলাম রাষ্ট্র এই ধারণায় প্রধানতঃ এইরূপ একটা জটিল সমস্যাত্মিকতা চলিতেছে। এদিকে পূর্ববঙ্গের শিক্ষা-নীতি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে, ইহার ফলে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ইসলাম প্রতিষ্ঠানগুলিতে উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। পূর্ববঙ্গ সরকার হিন্দুদের ধর্মকার্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছেন, এ কথা আমরা বলি না; কিন্তু হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যাহারা বাধা দিতেছে তাহাদিগকে তাঁহারা যথোচিত ভাবে দণ্ডিত করিতেছেন না একথা আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি। চন্দ্রনাথ হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ। সমস্ত ভারতের মধ্যে হিন্দুর পক্ষে ইহা একটি পরম পুণ্য স্থান। চন্দ্রনাথের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মন্দির হইতে দুর্বৃত্তেরা পাথর তুলিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সেজন্য তাহাদের এপর্যন্ত সাজা হয় নাই। মুসলমান-সমাজ যে এই শ্রেণীর কাজ সমর্থন করেন, আমরা এ কথাও বলিব না; পক্ষান্তরে বর্তমানে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে হিন্দুর ধর্মকার্য সাধনে সহায়তা করিতে আগাইয়া আসিতেছেন, এইরূপ কথাই আমরা শুনিতে পাইতেছি। মোটামুটিভাবে পূর্ববঙ্গ সরকারের নীতি সম্বন্ধেই আমাদের অভিযোগের কারণ আছে। যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদের শাসনব্যবস্থা সাম্প্রদায়িকতার ভাব হইতে মুক্ত না হইবে এবং ইসলাম রাষ্ট্রের মোহ তাহাদের দূর না হইবে, ততদিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সমাগম বন্ধ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গ কিম্বা পশ্চিমবঙ্গ—কোন বঙ্গের সরকারী হিসাবই নির্ভুল নয়।

ঐক্য প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। ওয়ার্কিং কমিটিতে পর পর কয়েকদিন-ব্যাপিয়া আলোচনা, পরিশেষে রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে প্রচুর বিবেচনা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনীতিক দলকে কংগ্রেসের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং মৌলানা আজাদের বিশেষ চেষ্টার ফলে ডেমোক্রাটিক দলের নেতা আচার্য কৃপালনী তাঁহার দল ভাঙ্গিয়া দিতে সম্মত হন, ইহাতে একটু আশার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু আচার্য কৃপালনীর বিবৃতির বিচার-বিশ্লেষণের ফলে সে

আশাও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অবশেষে দেখা যাইতেছে, ডেমোক্র্যাটিক দল কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া স্বতন্ত্রভাবে দল গঠন করিবেন, ইহাই স্থির করিয়াছেন। ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতারা কংগ্রেস নির্বাচন বোর্ডে যোগদান করিতে যখন অস্বীকৃত হন, তখনই ব্যাপারটা যে এইরূপ দাঁড়াইবে, ইহা অনুমান করা গিয়াছিল। আচার্য কৃপালনী কংগ্রেসের সদস্য-পদ ত্যাগ করিবেন কি না বিবেচনার মধ্যে পড়িয়াছেন। মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই ইহার মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিবার জন্য আবেদন দাখিল করিয়াছেন, ইহাও জানা যাইতেছে। সুতরাং ডেমোক্র্যাটিক দলকে অন্তত কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত রাখা যাইবে, পরে সেই দলের সহযোগিতাকে ভিত্তি করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্রভাবে যে কয়েকটি দল গঠিত হইয়াছে, সেগুলিকেও ক্রমে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইবে বলিয়া যাঁহারা আশা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাঁহাদের সে আশা সফল হয় নাই। সুতরাং আগামী নির্বাচন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন দল-গুলিকে পুনরায় কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যবন্ধ করা যে কার্যত ঘটিয়া উঠিবে, ইহা মনে হয় না। বলা বাহুল্য স্বতন্ত্রভাবে গঠিত এই কয়েকটি নূতন দলের প্রত্যেকটিই কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি নিজেদের নিষ্ঠার উপরই জোর দিতেছেন। তাঁহাদের কথা এই যে, কংগ্রেস বর্তমানে গান্ধীজী নির্দেশিত আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছে, তাঁহারা সে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবুদ্ধি বজায় রাখিয়া দেশের সেবা করিতে চেষ্টা করিবেন। বস্তুত কংগ্রেস যে তাহার পূর্বতন আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছে, ইহা বর্তমানে আর বিতর্কের বিষয় নহে। কংগ্রেসের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অবস্থাটা স্বীকৃত হইলেও কার্যত প্রতিকার কিছুই ঘটিতেছে না এবং আদর্শচ্যুতির কুটচক্রের মধ্যে পড়িয়াই কংগ্রেস ক্রমাগত পাক খাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসকে যদি তাহার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে নৈতিক এই দুর্গতি হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে এবং জনগণের সেবাকে কংগ্রেস-সাধনায় মুখ্য করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই আমরা প্রথম প্রয়োজন বলিয়া মনে করি; ফলত ঐক্যের প্রয়োজনও অপেক্ষাকৃত গৌণ। কারণ, উদার আদর্শের ভিত্তির উপরই সংহতি শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে। বৃহত্তর আদর্শের তেমন প্রেরণা যে প্রতিষ্ঠানের মূলে নাই, উপদলীয় স্বার্থের সংঘাত কিছুদিনের মধ্যেই তাহাকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে, ইহা স্বাভাবিক। বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমস্যা যদি নেতৃবর্গকে এ সম্বন্ধে সচেতন করে এবং তাহারা দেশ ও জাতির সেবাকেই মুখ্য ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করেন, তবে আদর্শের ভিতর দিয়া কংগ্রেস পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

বিবেককে বঞ্চনা

গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য ট্যাক্স ফাঁকি দিয়াও যাঁহারা ধরা পড়েন নাই, তাঁহাদের মগজের শক্তি যথার্থই আছে, ভারত গভর্নমেণ্টও উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই সব ভাগ্যবান ব্যক্তি ফাঁকি দেওয়া ট্যাক্সের টাকাটা যাহাতে সরকারী তহবিলে জমা দেন, সেজন্য সরকার হইতে সবিনয় নিবেদন করা হইয়াছিল। এই নিবেদন একেবারে বিফল হয় নাই। পার্লামেণ্টের প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে যে, অন্তত তিনজন ফাঁকিবাজ যথাক্রমে ১০১, ৮০০০, ও ২২০০০, টাকা অর্থ মন্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া আবেদনে সাড়া দিয়াছেন। সেদিন সহকারী অর্থ মন্ত্রী শ্রীযুত মহাবীর ত্যাগী উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকার ইঁহাদের আচরণে মুগ্ধ হইয়াছেন। মুগ্ধ হইবার কারণ যথার্থই থাকিত, যদি দেশের লোকের স্বার্থের হানি না করিয়া এই টাকাটা তাঁহারা অর্জন করিতেন এবং সরকারকে দিতেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়, সকলেই বোঝেন। এই তিনজন লোকও যে, ফাঁকি দেওয়া টাকার সবটা সরকারের হাতে উদারতাবশে সমর্পণ করিয়াছেন, ইহাও বলা যায় না। মোটা টাকার কিছু অংশ খয়রাত করিয়া যদি সরকারকে মুগ্ধ এবং বশংবদ করিয়া তোলা যায় তবে, সে সুবিধা নিশ্চয়ই কম নয়। ২২ হাজার টাকা সরকারী তহবিলে যিনি পাঠাইয়াছেন, তিনি সেই সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, গভর্নমেণ্টের কোন অনিষ্ট না করিয়াই তিনি তাঁহার সম্পদ কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন। গভর্নমেণ্টের ক্ষতি করা বলিতে মহাজনপ্রবর এক্ষেত্রে কি বুঝিয়াছেন, আমরা জানি না; কিন্তু ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়াতে গভর্নমেণ্টের আয় কম হইয়াছে এবং তাঁহাদের ক্ষতি করা হইয়াছে। এ ক্ষতি সমগ্র দেশেরই ক্ষতি। সমগ্র দেশের ক্ষতি করিয়া যাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে চায়, তাহারা নিশ্চয়ই সাধু ব্যক্তি নয় এবং কিছু টাকা অর্জন করিয়াছে বলিয়াই তাহাদের দোষ গুণ হইয়াও যায় না। প্রকৃত-পক্ষে ইহারা সমাজদ্রোহী এবং রাষ্ট্রদ্রোহী। অন্যায়ের দ্বারা অর্জিত কিঞ্চিৎ অর্থ সর-কারী তহবিলে দিলেই যে ইহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, আমরা এইরূপ মনে করি না। বস্তুত সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি এই ক্ষেত্রেও তাহাদের আচরণের মূলে কাজ করিতেছে; সুতরাং ইহাদের আচরণ সম্বন্ধে সরকার পক্ষের সচেতন থাকা কর্তব্য। প্রবঞ্চনাকে যেন তাঁহারা বিবেকের চেতনা বলিয়া ভুল না বুঝেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্র-দ্রোহীদের পাপ লঘু করিয়া দেখিতে উন্মুখ হইয়া না পড়েন।

ইন্দ্রজিতের আসর

আমি হঠাৎ আবিষ্কার করেছি যে, ইন্দ্রজিতের খাতার ইন্দ্রজিৎ আর এই আসরের ইন্দ্রজিৎ ঠিক এক ব্যক্তি নয়। খানিকটা পার্থক্য তো শাদা চোখেই ধরা পড়বার কথা। খাতার ইন্দ্রজিৎ ছিল লেখক, আসরের ইন্দ্রজিৎ হচ্ছে কথক। অবশ্য লোকটা কথায় আর লেখায় সমান বেপরোয়া। তা হলেও লেখার ধর্ম অনুসারেই ওর মধ্যে খানিকটা ডিসপিলন আসতে বাধ্য। যে কথা জিবের ডগায় অতি সহজে আসে তাকে কলমের ডগায় বাগিয়ে আনতে বেশ একটু কসরৎ করতে হয়। সেই প্রক্রিয়ায় পরিশ্রুত হয়ে কথার ঝাঁঝ অমনিতেই কমে আসে। তাছাড়া যখন ইন্দ্রজিতের খাতা লিখেছি তখনও পর্যন্ত নিজের উপরে আমার পুরোপুরি আস্থা জন্মায়নি। ভয়ে ভয়ে লিখতুম কি জানি কোথায় আবার বিদ্যে ফাঁস হয়ে যায়—চারদিকে পণ্ডিতের যা ভিড়। আরেক ভয় ছিল কথার মারপ্যাঁচে পাছে কারো আঁতে ঘা লাগে। এখন আমার নিজের উপরে আস্থা অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। ভাবটা যেন যা বলছি তাই আপ্তবাক্য। এমন কি পণ্ডিতেরা যদি ভুলও ধরেন তাহলেও আমি কেয়ার করিনে। ভুল হয়েছে তো হয়েছে। এই তো দেখুন না, কিছুদিন আগে একজন পাঠক আমার মুখের উপরেই জিগগেস করে বসলেন মশাই, আপনি যে বলেছেন, ময়দানব স্বর্ণলঙ্কা তৈরি করেছিল সে তো ঠিক কথা নয়। আমি হেসে বললুম, তাই হবে, বোধহয় ঠিক কথা নয়। উনি অবাক হয়ে বললেন, তবে লিখলেন কেন? আমি বললুম, জানতুম না বলে। ব্যস্ আর তো তর্কের অবকাশ নেই। বেকায়দায় পড়লে আমি একেবারে বিনয়ের অবতার। ডাঃ জনসনের অভিধান যখন প্রথম প্রকাশিত হল তখন এক ভদ্রমহিলা তাঁকে জিগ্গেস করেছিলেন, অমুক শব্দের মানে এই লিখেছেন কেন? মানেটা সত্যিই ভুল ছিল। জনসন জবাব দিয়েছিলেন Ignorance, Madam, ignorance. ডক্টর জনসনকে কেউ বিনয়ী ব্যক্তি বলবেন না। আসল কথা, আমাদের মতো তিনিও শব্দের ভক্ত ছিলেন। আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় অনেক রকম ভুল ত্রুটি থেকে যায়। তার জবাব আমি গোড়াতেই দিয়ে রাখছি, Ignorance, gentle reader pure ignorance.

আমাকে যাঁরা খাতার আমল থেকে দেখে আসছেন তাঁরা জানেন যে আমি একটু অত্যধিক পরিমাণে খ্যাতির কাঙাল। সত্যি সত্যি লেখা সম্বন্ধে গোড়ার দিকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলুম। কেউ যদি প্রশংসা করে একটি কথা বলত তো মনে হোতো হাতে স্বর্গ পেলাম। আর নিন্দে করে কিছু বললেই তো আহারে রুচি নেই, চোখে নিদ্রা নেই। তখন পাঠকরা আমাকে চিঠি লিখতেন, আর পত্রপাঠ মাত্র আমি তার জবাব লিখতে বসতুম অবশ্য খাতার মারফতে। অনেক ক্ষেত্রে কড়া চিঠির কড়া জবাব দিয়েছি। ইদানীং আমার মধ্যে একটি আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে। এবারে আমাকে যাঁরা চিঠি লিখছেন, আমি প্রায় তার জবাব দিচ্ছি নে। নিন্দা প্রশংসা সম্বন্ধে আমার মন ক্রমেই নিরাসক্ত হয়ে উঠছে। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে পত্রিকার আলোচনা বিভাগে আমার লেখা নিয়ে মাঝে মাঝে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা প্রতিবারেই আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। আত্মীয় বান্ধবরা তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে লেখাগুলি আমার চোখেই পড়ত না। একটি লেখা তো প্রায় মাসখানেক পরে আমি দেখেছি। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যে সে সব আলোচনা পড়ে আমার মনে হর্ষ কিম্বা বিষাদ কোনো রকম মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। আমার মতো লোকের পক্ষে এটা সত্যি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। অবশ্য এ'রা বেশির ভাগ আমার মতের সমর্থনকারী। তবে ও'রা আমাকে সমর্থন না করে আমার মতের কঠোর সমালোচনা করলেও আমি তেমন বিচলিত হতাম বলে মনে হচ্ছে না।

আপনাদের মনে থাকতে পারে কিছুদিন আগে আমি যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলাম। তাতে আমি বলেছিলাম যে আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে বহু সহস্র যুদ্ধের ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে তথাপি এই বিংশ শতাব্দীতে দেখছি পৃথিবীর লোক সংখ্যাও বেড়েছে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনৈক পাঠক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। তাঁর মতে আমি একজন War-monger এবং আমি নাকি বলতে চেয়েছি যে যুদ্ধের দরুণই পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। আমি যে কথা বলেছি সেটি একটি fact—তবে কিনা আমার factগুলি প্রায়ই fictionএর মতো শোনায়। পণ্ডিতেরা যে fact নিয়ে কারবার করেন সেটা এমন ঠাসবুনানি যে তাতে এতটুকু ফাঁকির রাস্তা থাকে না। আমার মতে ঐ ফাঁকির রাস্তাটুকুই হচ্ছে রসের রাস্তা। রস জিনিসটা তরল পদার্থ; ঢালু পথে ওর গতি। পাণ্ডিত্যের চড়াই উৎরাই বেয়ে ও উপরে উঠতে পারে না। আমার পত্রপ্রেরক বন্ধুটির পাণ্ডিত্য আছে, তা আমি তাঁর চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছি। দুঃখের বিষয় তিনি আমার কথার শব্দগত অর্থটুকুই দেখেছেন, রসের দিকটা গ্রাহ্য করেন নি।

এ ছাড়া আমার একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বলেছিলেন, আপনি ইদানীং বড় বেশি পলিটিক্সের আলোচনা শুরু করেছেন। আপনি বরাবর বাজে কথা বলে এসেছেন সে আমাদের বেশ লাগত। এখন কাজের কথা বলতে গিয়ে মুশকিলে ফেলেছেন। ইনি সত্যিকারের রসিক লোক। বাজে কথার মধ্যেই বেশি রস পান। তবে আমি বলি কি পলিটিক্সও নীরস নয়, বিশেষ করে সেটা যদি গালাগালির পলিটিক্স হয়। এই তো দেখুন না আমি যখনই সরকারী কর্তাদের গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়েছি তখনই পাঠকরা আমাকে সব চেয়ে বেশি তারিফ করেছেন। আর এ'দের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের জানি তাঁরা তেমন অরসিক ব্যক্তিও নন। অর্থাৎ সত্যিকারের রসিক ব্যক্তিরাও পলিটিক্স ভালোবাসেন। রাজনীতির মধ্যে যাঁরা রস পান তাঁরাই রসরাজ।

চীনের সম্বন্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ইউনো'র স্যাংশনস্ কমিটির সুপারিশ হচ্ছে এই যে যুদ্ধের কাজে লাগতে পারে এমন মালপত্র কোনো দেশ চীনে পাঠাবে না বা চীনের কাছে বেচবে না। বলা বাহুল্য, ইউনোর অন্তর্ভুক্ত সকল দেশ এ সুপারিশ মানবে না। ইউনো'র আইন অনুসারেও এরূপ সুপারিশে সকলকে বাধ্য করতে হলে সিকিউরিটি কাউন্সিলের মঞ্জুরী চাই। রাশিয়ার অমতে তা অসম্ভব। অবিশ্যি স্যাংশনস্ কমিটির সুপারিশ ইউনো'র জেনারেল এ্যাসেমব্লীতে ভোটাধিক্যে নিশ্চয়ই গৃহীত হবে। আসল কথা হোল এই যে, আমেরিকার প্রভাব যে যে দেশের উপর যতখানি কার্যকরী হবে সেই সেই সেই দেশ ততখানি উপরোক্ত সুপারিশ অনুসারে কাজ করবে। এই নিয়ে বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেন্টের মধ্যে মতানৈক্য চলে আসছিল। ইংরেজেরা কিছুতেই চীনের সংগে ব্যবসা করার সুযোগ ত্যাগ করতে রাজী হচ্ছিল না। অবশ্য বৃটিশ গভর্নমেন্ট চীনের কাছে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ বেচা পূর্বেই বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু অন্যান্য মালপত্রের ব্যবসা পুরোদমেই চলছিল, তার মধ্যে অতি-প্রয়োজনীয় "Strategic" মালও ছিল —যথা রবার। আমেরিকার চাপে বৃটেনের নীতি পরিবর্তন করতে হয়েছে। সম্প্রতি বৃটিশ গভর্নমেন্টের নির্দেশ অনুসারে মালয় থেকে চীনে রবার চালান দেয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। এতে বৃটিশ বণিককুল মোটেই সুখী নয়। তারা বলছে এর দ্বারা কেবল মার্কিন ব্যবসায়ীদেরই সুবিধা করে দেয়া হোল। আমেরিকা যেখান থেকে পারে কাঁচামাল শুষে নিচ্ছিল। মালয়ের রবার ব্যবসায়ীরা অসম্ভব চড়া দামে রবার বেচ্ছিল। মার্কিন ক্রেতারা অনেক চেষ্টা করেও রবারের দাম কমাতে পাচ্ছিল না। মালয় থেকে চীনে রবার চালান দেয়া বন্ধ হলে ধারের দাম পড়তে বাধ্য। কারণ, যে রবারটা চীনে যেতো সেটা অন্যত্র বেচতে হবে। সুতরাং আমেরিকা এক ঢিলে দুই পাখী মারার চেষ্টা করছে। মালয়ের রবার ব্যবসায়ীরা তো চটে যাবেই। তারা বলছে যে, এতে চীনের বেশী কিছু ক্ষতি হবে না। কারণ, মালয় থেকে না পেলেও ইন্দোনেশিয়া থেকে চীনে রবার চালান দেয়া বন্ধ হবে না, কারণ ইন্দোনেশিয়া চীনে রবার চালান দেয়া বন্ধ করতে রাজী নয়। কিন্তু মার্কিন গভর্নমেন্টের চাপ বৃটিশ গভর্নমেন্টের অগ্রাহ্য করে চলাও অসম্ভব, কারণ তাহলে আবার আতলান্তিক চুক্তির বন্ধন আলগা হয়ে যায়। "য়ুরোপ রক্ষা" ব্যবস্থা ভেস্তে যায়। তাছাড়া কাঁচা মালের বাজার আমেরিকা যে রকম শুষে নিচ্ছে তাতে আমেরিকার সংগে একটা বোঝাপড়া করে নিতে না পারলে কাঁচা মালের অভাবে বৃটিশ শিল্পসমূহকে অনাহার বা অর্ধাহারে শুকিয়ে যেতে হবে। সুতরাং মালয়ের রবার ব্যবসায়ীর স্বার্থ কিছুটা জলাঞ্জলি দিয়েও বৃটিশ গভর্নমেন্টকে আমেরিকার ইচ্ছা মেনে নিতে হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ নীতি ও মার্কিন নীতির মধ্যে একটা মূলগত সঙ্ঘর্ষ গোড়া থেকেই রয়েছে। সেটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই। আমেরিকা জাপানী শিল্পকে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিয়েছে ও দিচ্ছে, এটা বৃটেন মোটেই পছন্দ করছে না। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে আবার প্রচুর পরিমাণে জাপানী মাল দেখা দিয়েছে এবং তার সংগে প্রতিযোগিতায় বৃটিশ মাল যে ক্রমশ হটে যাচ্ছে এবং যাবে সেটা বৃটেনের পক্ষে একটা বিশেষ দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। ম্যাকআর্থারের অনুমোদন ও সমর্থন না পেলে জাপানী শিল্পের পুনরভ্যুদয় এবং জাপানী রপ্তানি বাণিজ্যের পুনঃপ্রসার সম্ভব হোত না। এজন্য ম্যাকআর্থারের উপর ইংরেজদের একটা বিশেষ রাগ ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে ম্যাকআর্থার ও মার্কিন গভর্নমেন্টের মধ্যে কোনো মতানৈক্য ছিল না।

সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে হংকং-এর বাণিজ্য এবং বৃটিশ উপনিবেশ হিসাবে উহার অস্তিত্ব রক্ষা। হংকং-এর দিকে চেয়েই যে বৃটিশ গভর্নমেন্ট পিকিং সরকারকে স্বীকার করে নেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকায় এটা ইংরেজদের ব্যবসাদারী বুদ্ধির নমুনা বলে ধিক্কৃত। আংশিকভাবে চীনের সংগে ব্যবসা সঙ্কোচ করে হয়ত হংকং কিছুকাল বাঁচতে পারে কিন্তু চীনের সংগে যদি সম্পূর্ণভাবে বা বেশিরভাগ ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয় তবে হংকং কিসের ওপর বাঁচবে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে যদি পিকিং গভর্নমেন্ট [illegible] [illegible] চীন থেকে হংকং-এ খাদ্য-দ্রব্য চালান দেয়া বন্ধ করে দেন তাহলেই তো হংকং বৃটেনের পক্ষে একটা বোঝা হয়ে উঠবে। তাছাড়া আমেরিকা যে চীনে কেবল "strategic" মালপত্র পাঠানো নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব পাশ করিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে তা নয়। কারণ, অতি শীঘ্রই দেখা যাবে যে, এর দ্বারা চীন বিশেষ কিছুই কাবু হয়নি। রাশিয়ার দিকের পথ তো খোলা থাকবেই, তাছাড়া অন্যভাবেও চীনে "নিষিদ্ধ" দ্রব্যাদির প্রবেশ বন্ধ হবে না। অর্থাৎ পরিকল্পিত নিষেধ কার্যকরী করতে হলে আরও জবরদস্ত ব্যবস্থার আবশ্যক হবে—যেমন চীনের সমগ্র উপকূলের অবরোধ। তার অর্থ হবে চীনকে সামগ্রিক সংগ্রামে আহ্বান করা।

ফরমোজাকে কোনো রকমেই চীনকে প্রত্যর্পণ করা হবে না এবং পিকিং সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য ফরমোজায় চিয়াং কাইশেক বাহিনীকে জীইয়ে রাখতে হবে—এটা মার্কিন নীতি। আমেরিকা কিছুতেই তাই পিকিং সরকারকে চীনের প্রকৃত গভর্নমেন্ট বলে স্বীকার করে তাকে ইউনোতে স্থান দিতে রাজী হতে পারে না। সুতরাং চীনের সংগে আপোষ-মীমাংসার পথে কোরিয়ায় যুদ্ধাবসান মার্কিন নীতি অনুসারে আদৌ সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, মার্কিন নীতির বর্তমান ধারা অনুসারে চীনের সহিত সঙ্ঘর্ষ না ক'মে ক্রমশ বাড়তে বাধ্য। বৃটিশ নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো অবস্থায়ই পিকিং সরকারের সংগে পুরো সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়ে না পড়া যাতে হংকং বিপন্ন হতে পারে। হংকং-এর গুরুত্ব অর্থনৈতিক, সামরিক নয়। আমেরিকা সামরিক কারণে ফরমোজাকে নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে রাখতে চায়। কিন্তু ব্যবসা বাদ দিয়ে হংকং-এর মূল্য ইংরেজের কাছে থাকে না এবং চীনের সংগে লড়াই করেও হংকং-এর ব্যবসা চালানো যায় না। সুতরাং চীনের সংগে অন্তত একটা চলনসই গোছের সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। সেজন্যই বৃটিশ গভর্নমেন্ট মাও সেতুং-এর গভর্নমেন্টকে স্বীকার করে নেন এবং পিকিং সরকারের প্রতিনিধিকে ইউনো'তে স্থান দিতে আগ্রহশীল হন। সুতরাং দেখা যায় যে, সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ ও মার্কিন নীতির মধ্যে একটা মৌলিক বিরোধ রয়েছে। শেষ পর্যন্ত হয়ত মার্কিন নীতির নিকট বৃটিশ নীতির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে সেই বিরোধের অবসান ঘটবে। ১৬-৫-৫১

গুল্‌মোরের কুঞ্জে কোকিল

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

গুল্‌মোরের পুঞ্জ মাঝে জ্বলন্ত শিখার
যুগল কোকিল নাচে চঞ্চল অঙ্গার।

সকাল থেকে দেখ্‌ছি
কোকিল দুটো
চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে
শাখা থেকে শাখান্তরে,
কালো তুলির পোঁচ লাগছে
ইতস্ততঃ।
ভাবছি এমন বর্ণের আড়ম্বরে
ওরা নীরব কেন?
যতদূর দেখা যায় গাছের সার জ্বলে' উঠেছে
রঙের দাবানলে,
বাতাসে কাঁপছে ফুলন্ত শিখা,
দেবতাদের অট্টহাসি,
বৃষমূল কে বেষ্টন ক'রে রয়েছে
ঝরা ফুলের পূর্ণচন্দ্র
ছায়াটাও রঙীন,
বাতাস ভাসিয়ে আনছে লোকান্তরের প্রলাপ!
এমন সমারোহে
ওরাই কেবল নীরব।

হঠাৎ বিস্ময়ভরে চমকিল কান
কোকিলের গান।
গাণ্ডীবীর শরে দীর্ণ পৃথ্বীতল হ'তে
অনর্গল স্রোতে
উৎসারিল ঊর্ধ্বপানে সঙ্গীত অম্লান
কোকিলের গান।
ফুলের মশাল ছুঁয়ে জ্বলে উঠ্‌ল
গানের দীপ
আবার
সুরের ফুঁ দিয়ে উস্কে দিল
ফুলের আভা

ফুল জ্বল্‌ল বনে
ফুল জ্বল্‌ল মনে
ভিতরে বাইরে লাগ্‌ল আগুন
খাণ্ডবের অখণ্ড পালা।
কে বলে কোকিল কালো?
কে বলে কুহু রাত্রির নির্যাস জমিয়ে
গড়া ওদের দেহ?
কে বলে সঙ্গীত শিখার কালো ধোঁয়ার
ওরা কুণ্ডলী?
কে বলে ওরা সুরসুধাকরের কলঙ্ক?
কোকিল সুরের অঙ্গার।
কালো বটে।
কিন্তু কালোর কুঁড়িটিতে
জমিয়ে রেখেছে কত লক্ষ বৎসরের জ্যোতির পাঁপড়ি
তবু তো কালো আপনি জ্বলে না
তাকে জ্বালাতে চাই শিখা;
সেই শিখা ওই গুলমোরের কুঞ্জে
স্পর্শে জ্বলে উঠ্‌ল
কোকিলের অঙ্গার!

যে গানে জাগাতো তারা আদি দম্পতিরে
নন্দনের ছায়ার নিবিড়ে
সেই গান সেই সুর
আজো আছে সুমধুর
তাই তারা গায় ফিরে ফিরে।
এ নহে শ্যামার শিষ
কামনার পাথরে পাথরে
মদনের বাণ শানে ঘষা
পাপিয়ার গান নহে
থরে থরে
বিরহের উৎসমুখে খসা।
যে-পাখী বাঁধে না বাসা
সন্ততিরে না করে লালন
সুরের সন্ন্যাসী,

এলো ভাসি
ক্রন্দসীর মধুর ক্রন্দন;
যে-পাখী বাঁধে না বাসা,
আকাশের সীমাহীন নীলে
থাকে সদা মিলে,
দক্ষিণ হাওয়ার গ্রন্থি খুলিয়া যে-পাখী
বেঁধে দেয় রাখী
ছুঁতে নাহি ছুঁতে,
অকস্মাৎ নেমে আসে সুরের বিদ্যুতে;
অমর্ত্যের সখা সে যে, অলক্ষ্যের সাকী
বাণীর কাজল লতা,
চঞ্চল সে পাখী।

৩

পাখী তো অনেক আছে।
আছে শুক
নীলাদ্রের স্বপ্ন,
আছে হংস
মানসের ফেনা,
আছে চকোর
পূর্ণচন্দ্রের স্বর্ণপিঞ্জরে ধরা দেবার জন্য উন্মুখ,
আছে ময়ূর
গহন অরণ্যের ঘনচ্ছায়ার সঙ্গে বিদ্যুৎ স্ফুরণ মিলিয়ে
যার দেহ তৈরি।
কিন্তু কোকিল কালো কেন?
কালো মাটির গর্ভে জল কেন?
কালো মেঘের বক্ষে কেন বিদ্যুৎ?
মহাশূন্য, মহাসমুদ্র কেন কালো?
কালো যে রঙের সন্ন্যাস।
থেকেও নেই,
ওযে নেই, ওযে সব চেয়ে বেশি করে আছে,
নাই আর থাকা
যুগল কারিগর হাত মিলিয়ে তৈরি করছে ওকে
—ওই কালো কোকিল।

৪

যে পাখী বাঁধে না বাসা,
সুরের সুরায়
শূন্যেরে চোলাই করি
আকাশে উড়ায়
রাগিণীর চীনাংশুক,
অনন্তের মিতা সে যে
তাই না ফুরায়
অন্তরের সুর সমুৎসুক,
গানের দাবাগ্নি ওর কভু না জুড়ায়,

বৈকুণ্ঠের প্রাসাদ চূড়ায়
শব্দ যেথা নিস্তরঙ্গ মূক,
লক্ষ্মী যেথা আদরে কুড়ায়
জীবনের সর্ব দুঃখ সুখ,
সেথা ওর যাতায়াত
সেথা অধিবাসী
মর্ত্যের কোকিল সে যে বৈকুণ্ঠের অকুণ্ঠিত বাঁশী।

সুখ আছে, দুঃখ আছে, রহিয়াছে ব্যথা,
তারো চেয়ে আছে কিছু বড়ো,
হে কোকিল তারি গান করো;
মর্ত্য আছে, স্বর্গ আছে, আছে কল্পলতা,
তারো চেয়ে আছে উচ্চতর
হে কোকিল তারি গান ধরো।
গাহুক সুধার গান অবোধ চকোর,
শিখীরে ছাড়িয়া দাও বিরহের রাগ,
পাপিয়া ছড়াক উচ্চে মিলনের ফাগ,
টানিয়া মরুক শামা যামিনীর ডোর,
ও সব তোমার নয়!
ঘনকুঞ্জবনে
বিস্মৃতির মেঘচ্ছায়ে গাহ শান্ত মনে
সুরের বিলয়।

কঠিন কঠিন ধরা
খুলিয়া পিনদ্ধ গ্রন্থি হোক নীহারিকা,
তরল তরল জল
হোক বাষ্পলিখা,
দেহ প্রাণ মন মোর
উন্মথিয়া সব ডোর
ছুটে যাক্ ঊর্ধ্বপানে অতীন্দ্রিয় বিদ্যুতের শিখ
ধূর্জটির ভালে
মুছে যাক ছায়াপথ টীকা,
নক্ষত্রের রত্ন ললাটিকা
কালীর ললাট হ'তে খসুক অমনি
নিঃশেষে থামিয়া যাক কালের ধমনী।

আরবার ফিরে যাই সৃষ্টি পরপারে
আদিম আঁধারে,
স্রষ্টা যবে জানিত না নিজে আপনারে।
বজ্রে যথা বিদ্ধ মণি
হে কোকিল তব ধ্বনি
বিদীর্ণ করিয়া বিশ্ব
বিশ্লেষিল মূল উপচারে
নিয়ে গেল প্রত্যন্তের পারে,
প্রকাশিল আচম্বিতে সকল সীমান্তহারা আত্মার নিদান,
গুলমোরের পুঞ্জতলে কোকিলের গান।

শোনা গল্প হলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এ গল্প আমার চাক্ষুষ দেখা।

অনেকদিন আগের কথা। আমি সেবার ম্যাট্রিক দেব। পরীক্ষার মাস দুই আগে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কোদরমায়। সেখানে বন্ধুবান্ধব থাকবে না, সুতরাং পড়াশুনা মনোযোগ দিয়ে করায় বাধা হবে না,—অভিভাবকদের অভিপ্রায় ছিল হয়তো এমনি। কিন্তু আমার অভিপ্রায় কি ছিল, সেকথা কেউ জানতে চাইল না। পরীক্ষার অজুহাতে আমার একটা নতুন জায়গা দেখে আসার ইচ্ছে ছিল পুরোদস্তুর। কিন্তু সে ইচ্ছেটা ছিল চাপা। প্রকাশ করলেই কোদরমা যাওয়া নিশ্চয় ভেস্তে যেত।

নতুন জায়গা দেখার উৎসাহ নিয়ে এই নতুন দেশে পৌঁছে গেলাম। বাঙলা ছেড়ে বিহারে। এখানে এসে অবশ্য কোনো-কিছুই তেমন চমকপ্রদ ঠেকল না। কিন্তু দুপুর বেলা হাওয়া উঠলে ফাঁকা মাঠের দিকে তাকাতে ভালো লাগত খুব। মনে হত, রোদ যেন গুঁড়ো হয়ে গেছে। চিকচিক করে রোদের গুঁড়ো উড়ে বেড়াত। পরে শুনেছি, ওগুলো অভ্রের গুঁড়ো।

একেবারে নিরিবিলি নিস্তব্ধ জায়গা। কোদরমা স্টেশন থেকে কোদরমা জায়গাটা কয়েক মাইল দূরে। স্টেশনের গায়ে যে লোকালয়, তার নামটা জায়গার তুলনায় বড় —ঝুমরিতেলাইয়া। একে অবশ্য সংক্ষেপে সকলে তেলাইয়া বলে। আমি ছিলাম এই তেলাইয়াতেই।

জায়গাটা নিস্তব্ধ হলেও আমার ভালো লেগেছিল। চারদিক ফাঁকা। কাছে দূরে উঁচু

উঁচু পাহাড় বসানো। ওগুলো দেখতে লাগত ঠিক নৈবেদ্যের মত। পাথুরে কাঁকরের ঝরঝরে রাস্তা কিলবিল করে এঁকে বেঁকে কোথায় চলে গেছে জানতে ইচ্ছে হত খুব। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করিনি কোনো দিন।

পাথরের ছোট ছোট নুড়ি দিয়ে রেল-প্লাটফর্ম তৈরি। স্টেশনের কামরার সামনে লম্বা বেঞ্চ পাতা। সকাল দুপুর আর বিকেলের অনেকটা সময় আমার কেটে যেত এই বেঞ্চে বসে। হুশহুশ শব্দ করে চলে মালগাড়ি, স্টেশনে না দাঁড়িয়ে তীব্র বেগে ধুলো উড়িয়ে চলে যেত মেলট্রেন।

নতুন জায়গায় এসে এসব ছাড়া আর নতুন কিছু দেখলাম না। কলকাতার সহপাঠী বন্ধুদের কথা তাই মাঝে মাঝে মনে হত। অচেনা একটা জায়গার আকর্ষণে চেনা বন্ধুদের ছেড়ে আসায় মন খারাপও হত মাঝে মাঝে।

বিকেল চারটের বোম্বাই-মেল হুইসিল বাজিয়ে কোদরমা-স্টেশন পেরিয়ে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটে বেরিয়ে যেত। এই সময়টা আমার স্টেশনে হাজিরা দেওয়া চাইই। রেল-গাড়ির ওই তীব্র গতি দেখে রোমাঞ্চ বোধ করতাম।

সেদিন বোম্বাই মেল বেরিয়ে যাবার পরেও কিছুক্ষণ বসেছিলাম। মাথা তুলে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। ওভারব্রিজের ওপর একটা অদ্ভুত মানুষ দাঁড়িয়ে। মানুষ অত লম্বা হতে পারে কোনো দিন কল্পনাও করিনি।

মালগাড়ির এঞ্জিনের ধোঁয়ায় আর আকাশের নীলে মিশে ওভারব্রিজের উপরের ফাঁকাটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। এই লোকটার আবির্ভাবে আকাশের সেই শূন্য জায়গাটা আরো অলৌকিক হয়ে উঠল যেন। আমি একদৃষ্টে ওই দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। দেখতে লাগলাম, ওই শূন্য ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে লোকটা ধীরে ধীরে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখছে। একবার দেখে নিল সারা আকাশটা, তার পর দেখে নিল রেল-লাইনের স্তব্ধতাটা, তার পর সে দেখল মালগাড়ির এঞ্জিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী। অবশেষে যেন আমাকেও দেখল। ওর তাকানোর ঐ ভঙ্গি দেখে আমার শিরদাঁড়া দিয়ে শিরশির করে শীত নেমে গেল যেন। উঠে পালিয়ে যেতে পারলাম না, আমি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম।

এভাবে ভয় পাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না অবশ্য। লোকটা বীভৎসও নয়, বিকৃতও নয়। অস্বাভাবিকতার মধ্যে এই যে অতিরিক্ত লম্বা। হয়তো এ-ও মানিয়ে যেত, যদি তার গায়ে একটু মেদ-মাংস থাকত, যদি পরনে থাকত সামান্য একটু জামা-কাপড়।

ওভারব্রিজ থেকে সে-ও নেমে এল না, আমিও আর বসে থাকতে পারলাম না।

এর পরে তাকে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু আর ভয় পাই নি কখনো। স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়ালে ভিখারীর দল গিয়ে হানা দেয় জানালায়-জানালায়। স্টেশনের কোলাহলে ও তাদের চীৎকারে মিশে কয়েক মিনিট প্লাটফরমটা হাট-বাজারের মত মনে হয়। ওই লম্বা লোকটাও নাকি ভিখারী। কিন্তু ও কোনো দিন ভিক্ষে চায় না। স্টেশনের ভিড়ের একপাশে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সবার মাথার উপর দিয়ে দেখা যায় তারই মাথাটা। ভিক্ষে সে চায় না, কিন্তু সে পায়। উঁকি দিয়ে দেখেছি তার হাত-ভরতি পয়সা।

অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন-মাস্টার হীরালাল-বাবু আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে ইশারায় ডাকলেন। তাঁর কাছে যেতেই তিনি বললেন, কি দেখছিলে?

বললাম, পয়সা।

তিনি বললেন, পয়সা দেখনি কোনোদিন?

এটা তাঁর তিরস্কার কি না বুঝতে পারলাম না, তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকাতে লজ্জা হল। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হীরালালবাবু বললেন, তোমাকে তো স্টেশনেই দেখি সারাদিন। পড়াশুনা কর কখন? তোমার কাকা কিছু বলেন না?

লোকটার ওপর রাগ হল। উত্তর দিলাম না। রোজ স্টেশনে আসি, একটু-আধটু আলাপ-পরিচয় হয়েছে, সেই সুযোগ নিয়ে তিনি শাসন করা শুরু করে দিয়েছেন।

চলে যাচ্ছিলাম, হীরালালবাবু বাধা দিয়ে বললেন, জবাব দিয়ে গেলে না?

বললাম, কিসের জবাব?

হীরালালবাবু বললেন, পয়সা দেখনি কোনো দিন?

বললাম, না দেখিনি।

আমাকে চটে যেতে দেখে এ-এস-এম হীরালালবাবু হোহো করে হেসে উঠলেন, বললেন, তাই বুঝি অমন উঁকি দিচ্ছিলে?

বললাম, সে জন্যে না। দেখছিলাম, কতগুলো ও পেয়েছে, কারো কাছে ও একবারও চাইল না।

হীরালালবাবু আবার হাসলেন, বললেন, বুঝেছি। তোমার মতো অনেকেই উঁকি দেয়। লোকটার বরাত। ও চায় না, কিন্তু ও পায়।

বললাম, কেন? কেন পায় ও। কেন দেয় ওকে।

ভেবেছিলাম, হীরালালবাবু বুঝি আমার সব প্রশ্নের জবাব দেবেন। কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তার পর বললেন, কি জানি।

কোটের বুক পকেট থেকে রুপোর মোটা চেন সমেত ঘড়ি বা'র করে হীরালালবাবু সময় দেখতে লাগলেন, আমি চলে এলাম।

নতুন জায়গায় এসে এই নতুন মানুষটাকে পেয়ে গেলাম। স্টেশনে আগে যেতাম বোম্বাই মেল-এর টানে। এখন যাই এর টানে। আগে তবু সময় ছিল বাঁধা, এখন আর সময়ের কোনো বাঁধন নেই। এখন যখন-তখন যাওয়া যেতে পারে। যে ট্রেন স্টেশনে থামবে, সেই ট্রেনের সময়ে গেলে লোকটাকে দেখা যাবে নির্ঘাৎ। যখন লোক-জনের ভিড় হয়, তখনই তো ভিক্ষে পাওয়ার সময়।

মাথা ভরতি রুক্ষ চুল, পরনে হাঁটু অবধি এক টুকরো কাপড়, গায়ে একটা কোট। কিন্তু মাথায় সবচেয়ে লম্বা। রোগা লিকলিকে, মাথার ওই চুলের ভারেই হয়তো একটু বেঁকে গেছে সামনের দিকে। সব ভিড় এড়িয়ে এক পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে সন্তর্পণে। আশ্চর্য, ওর পাশ কাটিয়ে যাবার সময় প্রায় প্রত্যেকেই একবার তার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে, আর তার হাতে কিছু না কিছু অন্তত দিয়ে যাচ্ছে।

লোকটা নাকি স্টেশনে এসেছে মাসকয়েক হল। কোথা থেকে এসেছে, সে কথা অবশ্য কেউ জানে না। এখানকার ভিখারীরা নাকি লোকটার ওপর বেজায় খাপ্পা। তারা রেল-গাড়ির কামরায় কামরায় ছুটোছুটি করে, কাকুতি মিনতি করেও তেমন কিছু পায় না, আর এই লোকটা এক পাশে চুপচাপ লাট-সাহেবের মত দাঁড়িয়ে থেকে কামায় তাদের চার ডবল।

এত কামায় ও, তবু ওর চেহারার কোনো বদল নেই, ওর পোষাকের কোনো উন্নতি নেই। পয়সা দিয়ে লোকটা করে কি তাহলে। চুলোর দুয়োরে নাকি কেউ বলতে কেউ নেই

ওর; ওর নাকি চালও নেই, চুলোও নেই। তবে ভিক্ষেই-বা করে কেন?

হীরালালবাবু বললেন, স্বভাব।

বললাম, কিন্তু রোজ যে এত পয়সা পায়, এগুলো সে রাখে কোথায়? ওই কোটের পকেটে?

দাঁড়িয়ে ছিলেন, হীরালালবাবু বসলেন, বললেন, টুয়েণ্টি-টু ডাউনের দেরি আছে। একটু বসা যাক। কোটের পকেট হাটকানো হয়ে গেছে, পাওয়া যায়নি। রাত্রে ও যখন ওভারব্রিজের ওপর শুয়ে ঘুম দেয়, তখন রোজ ওর পকেট সার্চ করা হয়।

হীরালালবাবুর দিকে চেয়ে বলে উঠলাম, আপনি রোজ সার্চ করেন?

হীরালালবাবু বললেন, আমি করিনে। কিন্তু জানি। করে ওরা—ওই ভিখারীরাই। ওদের পাণ্ডা মদন। সে রোজ ওকে ফলো করে, রোজ ওর পকেট হাতড়ায়। কিন্তু আশ্চর্য। কিছু পায় না।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবি এর কথা। লোকটা এমন অদ্ভুত লম্বা বলেই যে তার ওপর সকলের চোখ, এমন নয়। তার আরো গুণ আছে নিশ্চয়। না চাইতেই সে পায়। চাইতে তাহলে জানে ও। আবার এমনও হতে পারে, তার খুব দরকার। দরকারটা আছে বলেই হয়তো তাকে পেতে হয়। কিন্তু ওর নাকি কেউ নেইও। চেহারা যদি ও বদলে নেয়, হীরালালবাবুর কথামত যদি পোষাকটা পালটে নেয়, তাহলে হয়তো কেউ ভিক্ষেই দেবে না ওকে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নার রাত। রাত কাবার হবার আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাইরের প্রান্তর জ্যোৎস্নায় ভরা, তার এক পাশ দিয়ে রেললাইন চলে গেছে উধাও হয়ে। শুয়ে শুয়েই দেখা যায়। কিন্তু কেন যেন উঠে বসলাম। জ্যোৎস্নার আলোকে ভোরের আলো মনে করে কয়েকটা পাখী অসময়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে। জানলায় বসে দেখছিলাম, এই আলোতে পাখীদের দেখা যায় কি না। পাখী দেখতে পেলাম না বটে, কিন্তু দেখতে পেলাম অস্বাভাবিক লম্বা একটা ছায়ার মত মানুষ। রেল লাইনের কিনার ধরে ধরে সে সোজা হেঁটে চলেছে। চোখ রগড়ে নিয়ে ভালো করে তাকালাম। দেখলাম, ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে ছায়া। কিছুক্ষণ বাদে আর দেখা গেল না।

কখন ভোর হবে কখন গিয়ে এই খবরটা হীরালালবাবুকে দিতে পারব, এই উত্তেজনায় আর ঘুম হল না।

সকালবেলা স্টেশনে গিয়ে দেখি, হীরালালবাবু নেই। তার ডিউটি রাত দুটোয় শেষ হয়েছে। ছুটে তাঁর বাসায় গেলাম। তাঁকে এই খবরটা দিতেই তিনি হেসে উঠলেন, বললেন, এই কথা বলার জন্যে এত লাফালাফি?

দমে গেলাম, চলে আসছিলাম। হীরালালবাবু ডাকলেন, বললেন, সন্ধ্যে ছয়টায় আমার ডিউটি শুরু, স্টেশনে এস।

বিকেল চারটেয় বোম্বাই-মেল্ দেখে আমি বাসায় চলে এলাম। সন্ধ্যে ছটায় মন একবার চঞ্চল হয়েছিল বটে, কিন্তু স্টেশনে গেলাম না। বই খুলে মনোযোগ দিয়ে পড়ায় বসে গেলাম। কিন্তু বইয়ের অক্ষরগুলোর ওপর অনবরতই যেন ছায়া ভেসে উঠতে লাগল সেই লম্বা লোকটার। না চাইতেই ও পায় কেন, যা সে পায় তা দিয়ে ও করে কি?

রাত দশটা নাগাদ সকলে শুয়ে পড়ল। আমিও চোখ বন্ধ করলাম। কিন্তু চোখ বন্ধ হল না কিছুতে।

সন্তর্পণে উঠে দরজা খুলে আমি বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা অন্ধকার। তখনো চাঁদ ওঠেনি। বাস্-স্ট্যাণ্ডের মোড়ে ঝুমন কুলীর সঙ্গে দেখা। হীরালালবাবু নাকি একে পাঠাচ্ছিলেন আমার কাছে। দুজনে স্টেশনে গেলাম।

হীরালালবাবু টরে-টক্কা করে তখন কোন্ স্টেশনে যেন কিসের মেসেজ পাঠাচ্ছেন, ইশারা করে বসতে বললেন।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম, লোকটা চোর হতে পারে, ডাকাতের দলের চর হতে পারে, আরও কত কি হতে পারে হয়তো। তা না হলে ওর গতিবিধি এমন হবে কেন।

হীরালালবাবু উঠে এসে বললেন, বাড়িতে বলে এসেছো তো? আজ রাত্রে থাকতে হবে।

বলে এলে হয়তো থাকা যেত না, বলে আসিনি বলেই থাকতে পারব। কিন্তু সেসব কথা না বলে ঘাড় নাড়লাম।

হীরালালবাবু অফ হলেন রাত দুটোয়। তারপর এসে আমার পাশে বসে বললেন, তোমার উৎসাহ দেখে উৎসাহ পেয়ে গেলাম। আজ ফলো করব ওকে।

মনে মনে শিউরে উঠলাম, কিন্তু ঢোক গিলে বললাম, করব।

দরজার পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ওভারব্রিজের ওপর টান হয়ে সে শুয়ে আছে। জ্যোৎস্নার আলোয় আর ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় স্পষ্টই দেখা গেল। একটু বাদে দেখি, দু তিনটে লোক ব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে চোরের মত। তারা গিয়ে লোকটার পাশে বসল।

হীরালালবাবুকে ডাকলাম, তিনি বললেন, ও কিছু না। ওরা মদনের লোক। এই সময় রোজ সার্চ করে।

এর পর আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। হীরালালবাবু ওপাশে বসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বিড়ি খাচ্ছেন আর এ-এস-এম বিপিনবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন জড়িয়ে জড়িয়ে—মালবাবুর সঙ্গে কিসের হিসেব নিয়ে কী-একটা গোলমালের গল্প।

আমি উঠে গিয়ে তাঁর কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বললাম, নেই।

হীরালালবাবু বেরিয়ে এলেন প্লাটফরমে। চারদিকে তাকালেন, বললেন, এস।

অনেকদূরে দেখা গেছে নাকি ছায়াটা। আমি দেখতে পাচ্ছিনে, হীরালালবাবু আমার চেয়ে লম্বা তো নিশ্চয়ই, তিনি নাকি দেখতে পাচ্ছেন, রেল সীমানার রেলিংএর উঁচু দিয়ে।

আমরা রেল-লাইন ধরে চললাম। থার্টি-সিক্স ডাউন, নাইন আপ, গয়া প্যাসেঞ্জার, বেনারস এক্সপ্রেস—সবই নাকি বেরিয়ে গেছে, রেললাইন দিয়ে যাওয়াতে তাই নাকি ভয় নেই।

লম্বা লোকটা আমাদের দেখতে পাবে না, আমরা তার ছায়া অস্পষ্ট দেখতে দেখতে হেঁটে চললাম। দুটো মাইল-পোস্ট পেরিয়ে গেলাম আমরা। ওই মাঠের ওপারের গ্রামের নাম নাকি কমলা। আমরা রেল-লাইন ছেড়ে নেমে পড়লাম মাঠে। দূরে ছোট ছোট কুঁড়েঘর।

বললাম, ও যদি ডাকাত হয়।

হীরালালবাবু আমার হাত টেনে নিয়ে তাঁর কোমড়ে ঠেকালেন। বললাম, কি ওটা?

তিনি বললেন, ভোজালি।

একটা কুঁড়ের আড়ালে লোকটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই আমরা পা চালিয়ে দিলাম। অনেকটা ছুটতেই লাগলাম বলা চলে।

হীরালালবাবু বললেন, ধরব ঠিকই। এতটা তকলিবের পর এমনি ফিরছিনে।

কয়েকটা কুঁড়ের এপাশ ওপাশ হীরালালবাবুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে চলতে লাগলাম।

জ্যোৎস্না আছে বটে, কিন্তু কুঁড়ে ঘরগুলির ছায়ায় এ জায়গাটা প্রায় অন্ধকার।

হীরালালবাবু বললেন, খান-কুড়ি তো ঘর। এর একটাতে তো নিশ্চয় হবে। বসা যাক।

আমরা একটা দাওয়ায় বসলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ একটা হাসির শব্দ শুনে আমরা সোজা হয়ে বসলাম।

হীরালালবাবু বললেন, এস।

আমরা হাসির শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে উঠলাম আর একটা দাওয়ায়। বাতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা গেল। হীরালালবাবু গিয়ে ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলেন, আমার হাতে চাপ দিয়ে বললেন, পেয়েছি।

'আমিও পা উঁচু করে উঁকি দিয়ে দেখলাম।' ছোট একটা মাচা, দোলনার মত করে দড়ি দিয়ে ঝোলানো, লম্বা লোকটা সেটায় দোল দিচ্ছে। ডিবের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। দোলনাটায় ছোট্ট একটা শরীর শুয়ে আছে, এটুকু বোঝা যাচ্ছিল অবশ্য। কিন্তু তার হাসির শব্দটা শরীরের অনুপাতে মানানসই নয়। হাসির শব্দটা অবিকল অথর্ব বুড়োর মত।

আমরা সরে এলাম। কমলা গ্রামের মাঠ পার হয়ে একটা ক্যালভার্টের গা ঘেঁষে বসে রইলাম। তখনও সকাল হতে বাকি আছে। কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম, লম্বা একটা ছায়া মাঠ ডিঙিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল কোদরমা স্টেশনের দিকে।

সকাল হলে হীরালালবাবু বললেন, চল।

কোনো কথা না বলে তাঁর সংগে সংগে চললাম, তিনি চলেছেন ওই কুঁড়ে ঘরগুলির দিকেই।

দিনের আলোতে স্পষ্ট দেখলাম। দেখলাম, ঝুলন্ত মাচায় শুয়ে আছে একটা বুড়ি—বুড়ির হাত নেই, পা নেই; আছে কেবল ধড়টুকু। চোখ-মুখ কোটরে ঢোকা, গালদুটো শুকিয়ে গেছে—মুখ দেখে মনে হয় বয়স সত্তর—আশি।

আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। হীরালালবাবু কোনো কথা বললেন না। নুলো বুড়িটা কোটরগত দুই চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন চমকে গেছে। আমাদেরও চমক কম নয়, ওই ধড়-সর্বস্ব বুড়িটা প্রাণ খুলে অমন হাসতেও পারে তাহলে?

দাওয়া থেকে নামতে নামতে হীরালালবাবু বললেন, বুড়িটা ঠুঁটো জগন্নাথ হলে হবে কি, অসহায় ও নয়। কি বল?

আমি বললাম, এরই জন্যে লোকটা বুঝি না চাইতেই পায়, কি বলেন?

দুইজনেই দু'জনকে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু কেউই কারো প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না।

বলা বাহুল্য, সেবার ম্যাট্রিক পাশ করতে পারিনি। তার পর পড়াও ইস্তফা হয়ে গেছে। কিন্তু লাভ হয়েছে এই অভিজ্ঞতাটা।

অথচ এই অভিজ্ঞতার কথা যখনই যাকে বলেছি, কেউই বিশ্বাস করেনি। এ গল্প কারো কাছে শুনলে আমিও হয়তো বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এ তো আমার শোনা গল্প নয়, আমার চাক্ষুষ দেখা।

আমাদের আপিসের নিতাই বাপুলী প্রবীণ আর ঝানু লোক। কারো কোনো কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। এ কথা জেনেও সেদিন কথায়-কথায় তাঁকে এই গল্পটা বলেছিলাম।

শোনা মাত্র তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন, বললেন, স্রেফ গাঁজা।

তারপর একটু থেমে বললেন, সেই লম্বা লোকটার বয়স কত ছিল তখন?

বললাম, চল্লিশের কাছাকাছি আন্দাজ।

নিতাইবাবু কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর সন-তারিখ নিয়ে কি সব হিসেব করলেন। বললেন, যে সময়ের কথা বলছ, তার পঁনর-বিশ বছর আগে আমি অন্ডাল স্টেশনে দেখেছিলাম বটে এমনি একটা লম্বা লোক, অস্বাভাবিক লম্বা, আর বোবা। তখন তার বয়স বিশ-বাইশ হবে। কেরোসিন কাঠের একটা বাক্সে চারটে কাঠের চাকা লাগিয়ে একটা গাড়ি বানিয়ে সেই লোকটা একটা নুলো বুড়িকে টেনে টেনে ভিক্ষে করত। তার বছর দুই আগে রেলে কাটা পড়ে বুড়িটার নাকি ওই দশা হয়।

নিতাইবাবুর মুখের দিকে আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম। তিনি আর কোনো মন্তব্য করলেন না। সশব্দে বড় এক টিপ নস্যি টেনে কাসতে লাগলেন।

হয়রান

শ্রীতারক সেন

নীড় খুঁজে খুঁজে হয়রান-দিন।
মৃত্তিকা নীড় পেয়ে শেষ এক কোণে—
তাই জুড়ে থাকি—পাখীর মতোই
যথা অবকাশ ভীরু রাত গুণে গুণে।

তবু নীড় খুঁজে ফের হয়রান দিন—
হেথা হোথা আর মানুষের অতো ভীড়ে।
সন্ধানী মন খুঁজে মরে রাতদিন
নীড়ের শান্তি আঁকা কার আঁখি পরে'?

মৃত্তিকা নীড় পেয়ে তবু হার মানি—
হৃদয়ের নীড় খুঁজে ফের হয়রানি।

জল জঙ্গল

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

(১১)

পাগল! পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসে বাদা রাজ্যে ঢুকেছে।

মধুসূদনের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে দুর্লভ মন্তব্য করছে। টিকে মোড়লকে ডেকে চুপিচুপি শোনায়, চেয়ে দেখ টিকে—পাঁচসিকের মাটির তদারকে এসে বিশ টাকার গরদের পাঞ্জাবির কি হাল করেছে! ও কাদা-মাটির দাগ তোলা এদিগরে হবে না। আর তুলবেও না দেখিস। কালকে হয়তো জিতু বুনো বা আর কাউকে দিয়ে দেবে। অমন কত দিয়েছে!

টিকে থেমে দাঁড়িয়ে শুধু শুনল, হাঁ-না কিছু বলল না। তারপর যথাপূর্ব মাটি এনে ফেলছে। বাঁধেরই এখান-ওখান থেকে মাটি কেটে যে জায়গায় গর্ত হয়েছে সেইখানে চাপাচ্ছে। মধুসূদন খানিক দূরে পশুরগাছের শিকড়ের উপর বসে বিড়ি খাচ্ছেন আর নিবিষ্ট হয়ে টোকচা খাতায় একটা হিসাব দেখছেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবু ছেড়ে দেবেন না তিনি। যেন পণ করে বেরিয়েছেন, বাঁধের যেখানে যা-কিছু টুটা-ফুটা—সমস্ত মেরামত করে ফেলবেন এই এক যাত্রাতেই। কাছারি বাড়ি থেকে পেট্রোম্যাক্স এনে ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, সেই আলোয় কাজ হচ্ছে। এত খাটতেও পারে মানুষটা! খেটে ক্লান্ত হয় না। আরে বাপু, চোখ বুজলে ফক্কিকার, মুখাগ্নি করবারও একজন কেউ নেই—তোমার এত খাটনির সম্পত্তি খাবে তো বারোভূতে!

দুর্লভ গজর-গজর করছে। রাগে পড়ে দু-এক কথা বলছে টিকে মোড়লের কাছে। টিকে পুরোপুরি মধুসূদনের লোক—একান্ত আজ্ঞাবহ। তার সামনে কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু সামলাতে পারে না। দেয় বলে দিকগে। ক'টা দিনই বা আছে এই মনিবের এখানে!

প্রহর দেড়েক রাত্রে কাজকর্ম সমাধা হল। খাতা থেকে মুখ তুলে মধুসূদন সহাস্যে বলেন, দেখ—নিরিখ করে দেখ তোমরা—আর কোন জায়গায় কিছু পাওয়া যায় কিনা।

দুর্লভ বলে, আজ্ঞে না। সব ঠিক হয়ে গেছে।

কাজ কতটা হল, বলো এবার—

তা হয়েছে, যথেষ্টই হয়েছে। গুণতিতে নিতান্ত কম হবে না।

আমি গুণেছি। আঠাশটা—এইটুকু সময়ের মধ্যে হয়ে গেল। আর পাঁচ দিন ধরে তুমি ঘোগ মেরেছ সাকুল্যে—

দুর্লভ তাড়াতাড়ি বলে, চোদ্দ-পনেরটা হবে।

উঁহু, ন'টা। তা-ও আমার গোণা।

মুখস্থের মতো মধুসূদন বলতে লাগলেন, ছাব্বিশটা রোজ লাগিয়েছ, তার দরুণ তেরো টাকা। দৈনিক দশ পয়সা হিসাবে পাঁচ দিনে তামাক পুড়িয়েছ সাড়ে বারো আনার—

দুর্লভ বলে, আজ্ঞে—তণ্ডক পাবেন না। আমি যথাধর্ম লিখেছি—

মধুসূদন বললেন, হ্যাঁ দুর্লভচন্দ্র, তোমার লোকজন কি মাপজোপ করে তামাক খায়? দশ পয়সা হিসাবে খেয়েছে—কোনও দিন ন'পয়সা কি এগারো পয়সা হল না?

দুর্লভ স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেলে, তা খেলে আমি কি করতে পারি? যা ভাবছেন, তা নয়। দুর্লভের কপালখানা ছোট, কিন্তু নজর ছোট নয়। টাকার কমে ছুঁই নে—এই একটা কথা বলে দিলাম।

যা লাগিয়েছ, ঘোগের ছেঁদা দিয়ে আমার গোটা মৌভোগ আবাদ যে পুরন্দর গাঙে গিয়ে নামবে।

এই রাত দুপুরে অবধি পরিশ্রম, তার উপর লোকজনের সামনে বারম্বার বক্রোক্তিতে দুর্লভের মেজাজ বিগড়ে গেল। বলে, তবে আপনি লোক দেখুন রায়বাবু। আমায় দিয়ে এর বেশি হবে না।

বনকরের চাকরি ঠিকঠাক হয়ে গেছে তা'হলে?

এই আর এক জ্বালাতন। মানুষটার সকল দিকে নজর। দুর্লভ চাকরির জন্য তদ্বির-তাগাদা করছে এবং অনেকটা সুরাহাও হয়েছে—মধুসূদনের সমস্ত জানা।

দুর্লভ বলল, আজ্ঞে, বিশ্বাসই হল আর কি রইল বলুন?

মধুসূদন হেসে উঠলেন।

তোমায় বিশ্বাস করতাম—এ বড় আজব কথা শোনালে দুর্লভ। করিৎকর্মা চালাক লোক বলে ভালবাসি, এটা ঠিক। বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে তুমিও কখনো মাথা ঘামাতে না। তা চাকরি ছাড়ো আর যা-ই করো—ভোরবেলা বাদায় বেরুচ্ছি, তাতে যেন বাগড়া না পড়ে।

রাত দুপুর অবধি খাটিয়ে বাঁধের কাজ শেষ করবার অর্থ এতক্ষণে বোঝা গেল। জঙ্গলে যাচ্ছেন। প্রায়ই যান এইরকম—অনেক কালের অভ্যাস। উদ্দেশ্য বুঝা মুশকিল। পাগল মানুষ তো—কখনো উচ্চহাসি হেসে বলেন, জঙ্গল-রাজ্য বিজয় করে ফেলবেন তিনি। আগে-আগে হতও তাই—লাট জরিপ করে হাসিলের ব্যবস্থা করতে যেতেন। সেসব বন্ধ আপাতত। শিকারের খুব তোড়জোড় দেখতে পাওয়া যায় যাত্রার সময়। কিন্তু ফিরে আসেন নিরামিষ হাতে। একবার কেবল গোটা চারেক কাঁকপাখী নিয়ে এসেছিলেন। সেবারে দুর্লভ যায়নি। মুখ টিপে হেসে টিকে মোড়লকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কত নিল রে?

সে কি?

কিনে এনেছিস নিশ্চয় কোন শিকারির কাছ থেকে।

ঘাড় নেড়ে টিকে বলে, উঁহু, হুজুর নিজে মেরেছেন। গুলিতে ছিদ্দির হয়ে রক্ত পড়েছে, দেখতে পাও না?

দুর্লভ বলে, গুলি বুঝি একলা তোর হুজুরেরই আছে? যার গুলিই লাগুক, ছিদ্দির হবে—রক্ত পড়বে।

গাঙের লোনা জল সকালের রোদে ঝিকমিক করছে। তরঙ্গে দোলা দেয় নৌকোয়—মানুষগুলো দুলছে, মানুষের অন্তরাত্মাগুলোও দোলে এক এক সময়। উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা তৃণহীন দুই কূলের মধ্য দিয়ে জলধারা ছুটেছে। গেঁয়োবন—ঝুপসি ঝুপসি বন চলেছে শ্রেণীবদ্ধভাবে। ভিজে চরের উপর তিতির পাখী লম্বা ঠোঁটে খুঁটে খুঁটে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট পাখী—পাঁচ-সাতটা এক এক জায়গায়। যেন সারি বেঁধে ঘুরঘুর করে নাচছে সখীর দল।

বোগড়ো গাছের জঙ্গল এবার—মাইলের পর মাইল। খেজুর গাছের মতন দেখতে। ফলও খেজুরের মতো—বিষাক্ত,

খাওয়া যায় না। ওপার ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল...নৌকো ভেসে যাচ্ছে দু-একখানা—লাল পালের নৌকো, সাদা পালের নৌকো...

মাটির উনুনে মেটে হাঁড়িতে চা তৈরি হল, চা ও টিন-কাটা বিস্কুট খেয়ে মধুসূদন বাদায় নামলেন। সংগে টিকে যাচ্ছে এবং আরও দুজন। মাঠালে যাচ্ছেন, অর্থাৎ জংগলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে শিকার হবে। অত্যন্ত বিপজ্জনক এটা। দুর্লভ অত কষ্ট করবার মানুষ নয়, তারা একদল নৌকায় রইল।

টিকে বলে, রাঁধাবাড়া তাহলে সেরে রেখো ম্যানেজার। চাঁদের আড়ায় গিয়ে নৌকো বেঁধো। আমরা ঐদিকপানে চললাম।

সরু খাল অরণ্যে সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলে গেছে। নৌকা কোথাও দাঁড় বেয়ে কোথাও বা ধুনজি মেরে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। বন্দুক হাতে মধুসূদন সকলের আগে, টিকে সকলের পিছনে। জোয়ারের জল উঠেছিল—সেই জল জমে জমে আছে, কাদায় পা বসে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ কাটল। একটুখানি বসবে সে উপায় নেই। বড় কষ্ট হলে কোন একটা ডাল বা ঝুলে-পড়া লতা ধরে ঐ কাদারই মধ্যে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিতে পারো। তবে মধুসূদনের ক্লান্তি নেই—বনে এসে আরও যেন তাঁর বল বাড়ে। দৈত্যের মতো দেহ টিকে মোড়ল অবধি হাঁপিয়ে পড়েছে—মধুসূদন জলকাদা ছিটকে ডালের নিচে দিয়ে গুড়ি মেরে চলেছেন তো চলেছেনই।

যাই হোক, পরিচ্ছন্ন উঁচু মতো একটা যায়গা পেয়ে মধুসূদন বসে পড়লেন। কাবান বলে এমনি জায়গাকে। কাঠুরেরা কাঠ কেটে এখানে ফেলে, তারপর টুকরো করে নৌকোয় বোঝাই দেয়।

আর তিনজনও একদিকে একটু আলাদা হয়ে বসল। গলায় ঝোলানো থলিটা নামিয়ে টিকে সসম্ভ্রমে এগিয়ে দিল। বোতল-গ্লাস বের করে গ্লাসে একটু ব্রাণ্ডি ঢেলে মধুসূদন জল মিশিয়ে নিলেন।

কি রে, লোভ হচ্ছে?

বলে মুখ বিকৃত করে আবার বললেন, ম্যালেরিয়া মিকশ্চার—বিষম তেতো—হ্যাক্ থুঃ—

আজ্ঞে না ছি ছি—

বলে টিকে সলজ্জে ঘাড় ফেরাল। আরও একটু দূরে সরে সকলে বসল।

মৃদু হেসে মধুসূদন গ্লাসে চুমুক দিলেন। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন তারপর।

এগুতে লাগি। তোরা জিরো বসে বসে—

টিকে ব্যস্ত হয়ে বলে, একলা যাবেন কেন হুজুর? জায়গাটা গরম। সবাই উঠছি আমরা।

মধুসূদন তাড়া দিয়ে ওঠেন।

উঠলেই হল? থলি সুদ্ধ রেখে যাচ্ছি—শেষ করে তবে উঠবি। টাকার মাল—এক ফোঁটা পড়ে থাকে তো গুলি করব ধরে ধরে।

সামনে থাবে না, মধুসূদন জানেন। বন্দুক নিয়ে হাসতে হাসতে তিনি চললেন।

খুঁজে পাবি তো রে আমায়?

আজ্ঞে, তা পাবো না কেন? পায়ের গর্ত ধরে গিয়ে পৌঁছবো। কিন্তু খাল পার হয়ে যাবেন না হুজুর। বিষম খারাপ ওদিকটা।

মধুসূদনের বিচার-বিবেচনার জন্যে লোকগুলো ভালবাসে তাঁকে। রায়বাবুর সংগে নরকে বেড়িয়েও সুখ। বেশি দেরি করেনি তারা—কয়েক রশি গিয়েই মধুসূদনকে পাওয়া গেল। দুটো খাল এক-জায়গায় মিশেছে—সেই মোহানায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন তিনি। ওদের শব্দ-সাড়ায় মুখ ফেরালেন।

এই দুটো খালের কিনারা ধরে দু-দিক দিয়ে বাঁধ এসে এখানে মিশবে, বাক্স বসানো হবে এই এদিকটায়। কেমন হয় বল্। এক বাক্সের মুখেই তাহলে সমস্ত আবাদের জল মরবে। কি বলিস?

টিকে হাসে।

সমস্ত বাদাবন আবাদ করে ফেলতে চান। এক ছিটে জংগল থাকতে দেবেন না। এ ছাড়া হুজুরের অন্য চিন্তা নেই।

অনেক দিন সে সংগে সংগে ঘুরছে। কথা পড়তে না পড়তে মধুসূদনের মনোভাব বুঝতে পারে। বাদার লাটগুলো একের পর এক বাঁধবন্দী হয়ে মানুষের অন্ন জোগাবে, জানোয়ার তাড়িয়ে দিয়ে মানুষ ঘরবসত করবে—এটা শুধু মনের অভিলাষ মাত্র নয়, বন কাটতে কাটতে সত্যিই বহুদূর এগিয়ে গেছেন তিনি। বনরাজ্য জয় করতে করতে এগোচ্ছেন। ইদানীং এই কয়েকটা বছরই যা-কিছু মন্থরতা দেখা যাচ্ছে।

চাঁদের আড়া খালের নাম। বাওয়ালিরা বলে চাঁদ সদাগর নৌকোর পথ সংক্ষেপ করতে এই খাল কেটেছিলেন। পৌঁছুতে দুপুর হয়ে গেল। ক্ষিধেয় সকলের কণ্ঠাগত প্রাণ। তার উপরে মুশকিল—নৌকোর নিশানা নেই কোনদিকে। এতক্ষণেও পৌঁছল না—কি ব্যাপার?

কু—উ—উ—

দু-হাত একত্র মুখের উপর বসিয়ে টিকে কু দিচ্ছে। বাদাবনে কদাপি নাম ধরে ডাকাডাকি কোরো না। মানুষের গলা বুঝতে পারলে বাঘ যেখানে থাক চলে আসবে। দ্বিপদ খাদ্য অত্যন্ত দুর্লভ কিনা! এসে অলক্ষ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে সুলুক-সন্ধান খুঁজে। বাঘের উপরেও অনেক রকম আছেন—তাঁরা আরও ভয়াবহ। যাক ওসব ঠিক-দুপুরে ভয় দেখানো উচিত হবে না। মোটের উপর ঐ যা বললাম—দরকার পড়লে কু দিয়ে সংকেত কোরো, কথা বোলো না।

কু—উ—উ—

টিকের সংগে সকলে যোগ দিয়েছে। কল-কল করে ভাঁটার জল নামছে। জোরে হাওয়া বইছে, আওয়াজ বেরুতে না বেরুতে ভেসে চলে যায়। বনের এই মজা, একটু আওয়াজ করলেই সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। এক ক্রোশ দূরে লোক কথা বলল, মনে হবে ঠিক কানের কাছে দাঁড়িয়ে বলছে। কেন হয় বলো দিকি? বিপন্ন মানুষের ডাক বনবিবি কানে শুনে নেন, তারপর নিজেই জংগলে জংগলে বাতাসের সংগে সেই ডাক শুনিয়ে বেড়ান।

এত কু দিচ্ছে--যেখানে থাকুক, তাদেরও কু দয়ে জবাব দেবার কথা। কিন্তু কান খাড়া করে কিছুই তো শোনা যায় না। উপায় কি তবে? ক্লান্তিতে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। গোল-ঝাড় অজস্র। টিকে কয়েকটা গোলের শীষ নুইয়ে নরম পাতা বাঁধল পরস্পরের সংগে। গদি-পাতা বেঞ্চির মতো হল।

হুজুর, বসুন—

তোরা?

আমাদেরও হচ্ছে—

আরো কয়েকটা বসবার জায়গা করল ঐ রকম। উল্টোপাল্টা হয়ে চারিদিকে মুখ করে সকলে বসে—বিপদ যে-কোন দিক দিয়ে উদয় হতে পারে। কু চলছে মাঝে মাঝে। বিরক্ত হয়ে টিকে একটা গাছে চড়ল। খানিক ওঠে, এদিক-ওদিক তাকায়। আরও উপরে বেয়ে ওঠে।

কু—উ—উ—উ—

খুব জোরে কু দিয়ে ওঠে। ঝন-ঝন করে

তারপর অতি দ্রুত নেমে এল। সোল্লাসে বলে, আসছে ওরা। দেখতে পেয়েছি। ধুন্দি ঠেলে ঠেলে বেগোনে আসছে।

বিরক্ত মধুসূদন বলেন, সাড়া দেয় না কেন?

বাতাস উল্টো দিকে—শুনতে পাচ্ছে না। এখন বুঝতে পারলাম। ভারি কষ্ট করছে বেচারারা। চারখানা ধুন্দি মেরেও না এগোচ্ছে না—

বসে কালহরণ নিরর্থক। কূলে কূলে তারা নৌকোর উদ্দেশে চলল। হাঁটা নয়—প্রায় দৌড়নো। দুর্লভরা দেখতে পেয়ে একটু পছন্দ মতো জায়গায় গেঁয়োর শিকড়ের সঙ্গে নৌকো কাছি করল।

ও হরি—রান্না বসেনি এখন পর্যন্ত। চেষ্টা করেছিল নাকি—বাতাসে উনুন ধরাতে পারে নি। উনুন এবার ডাঙার উপর নামিয়ে আনা হল, শুকনো কাঠ ভেঙে গাদা করল চারিদিক থেকে। ঘিরে বসেছে সকলে—হাওয়ার দাপটে আর বিঘ্ন না ঘটে। জন্তু-জানোয়ারের তত আশঙ্কা নেই—আগুনের কাছাকাছি তারা বড় একটা আসে না। ভাত না রাঁধুক—বুদ্ধি করে খেপলা জালে মাছ ধরে এনেছে। মাছের ঝোল ভাত নামতে কতক্ষণ লাগবে।

খেয়ে তখনই আবার মধুসূদন বেরুলেন। সঙ্গে শুধু টিকে। তিলার্ধ বিশ্রামের সময় নেই। একটা বেলা জঙ্গলে জঙ্গলে হয়রান হয়ে এলেন। মাঠালে এ অঞ্চলে সুবিধা হবে না—হরিণগুলো ভারি শয়তান, হাওয়ায় গন্ধ পায়, পাতা নড়লে ছুটে পালায়। গাছালের ব্যবস্থা করতে হবে। মাঠালে শিকার করতে হয় তো অনেক দক্ষিণে চলে গিয়ে সাগরের কাছাকাছি। এমনও বন আছে যেখানে মানুষের পা পড়েনি কখনো, বন্দুকের আওয়াজ হয়নি। মধুসূদন পরের মুখে বর্ণনা শুনেছেন, একবার নিজের যাবার ইচ্ছা আছে। যাবেনই। গিয়ে শুধুই যা পশুপাখী হাতে ঝুলিয়ে ফিরে আসবেন সে লোক তিনি নন—দুর্ভেদ্য জঙ্গল কেটে আর একটা মৌভোগ বসাবেন। সবুজ বনে-ঘেরা সমৃদ্ধিবান গ্রামের পর গ্রাম থেকে উঠবে—বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি অবধি এক ছিটে জঙ্গল থাকবে না এই তাঁর পণ।

কিন্তু সে সব একদিনের ব্যাপার নয়। আপাতত গাছালের ব্যবস্থাটা শেষ করতে হবে বেলা ডুববার আগেই। উঁচু গাছের চূড়ায় ডালপালা দিয়ে মাচা তৈরি হবে তাঁর ও টিকের বসবার মতো। বন্দুক বাগিয়ে গাছের উপর থেকে দুজনে সারারাত্রি জন্তুর চলাচলের নজর রাখবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে দ্রুত পায়ে দুজনে ফিরলেন। এত শীঘ্র ফিরবার কথা নয়, কি-একটা ঘটেছে! নৌকোয় উঠে মধুসূদন চুপি চুপি বলেন, খুব সামাল। একটা বাঁশি আমাদের দাও, আর একটা তোমরা রাখো। ফু দেওয়া এ অবস্থায় ঠিক হবে না, এমন-তেমন বুঝলে সিটি মারবে।

অবস্থাটা বললেন তিনি। সকালবেলা সেই যে তাঁরা হেঁটে হেঁটে এসেছিলেন—কাদার উপর পায়ের দাগ পড়েছিল—এবার গিয়ে দেখলেন, সেই পদচিহ্নের উপরই বাঘের থাবার দাগ পড়েছে। অর্থাৎ বড়মিঞা পিছু নিয়েছেন। মধুসূদনরা আসছিলেন—প্রভুও বরাবর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছেন, দুটো বন্দুক দেখে বাড়াবাড়ি করতে ভরসা পান নি। গোলঝাড়ে এঁরা বিশ্রাম করছিলেন। তিনিও থাবা পেতে বসেছিলেন অনতিদূরে। সে থাবা আকারে এত প্রকাণ্ড—

টিকে বলে, যেন এক জোড়া বগিথালা ম্যানেজার মশায়। বাদায় এতকালের আসা-যাওয়া, তা এমন তাজ্জব কখনো নজরে আসেনি।

এটা বোঝা গেল, গাছাল বৃথা যাবে না। এ তল্লাটে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ও'দের। আরও একটা অকাট্য প্রমাণ, মাচা বাঁধতে হয় নি—একটা তৈরি মাচা গাছের উপর রয়েছে। বেশ বড়-সড় মাচা—দুজনে সেখানে বসা কেন, গড়িয়েও নিতে পারবেন মাঝে মাঝে। অর্থাৎ অন্য শিকারি সদলে ঐ মাচায় গাছাল দিয়ে গেছে দু-পাঁচ দিনের মধ্যে।

সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে তাঁরা জঙ্গলে ঢুকলেন। বিকালবেলা, কিন্তু ইতিমধ্যেই আঁধার হয়ে আসছে। সূর্য নিচু আকাশে নামলেই বাদাবনে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

(১২)

দুজনে গিয়ে তো গাছে উঠলেন। গাছের উপর দিব্যি পা দোলাচ্ছেন। ভাল যে দুটো বন্দুক ছিল, কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গেলেন। নৌকোর এতগুলো প্রায়-নিরস্ত্র প্রাণী—যা তোরা বাঘের পেটে এখন। লোভাতুর বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে—শুনে অবধি দুর্লভ ক্ষেপে গিয়েছে। সোয়ারিখোপের মাঝামাঝি সরে গিয়ে বসল। একটা গাদা-বন্দুক সম্বল—একবার দেওড় করেই বারুদ ঠাসতে বসে যেতে হয়। উঃ—আক্কেল-বিবেচনা আছে লোকটার!

কি বিড়-বিড় করো ম্যানেজার মশায়?

দুর্লভ চাপা গলায় তর্জন করে। তোদের হুজুরের চৌদ্দপুরুষান্ত করছি—

সকলে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছে। দুর্লভ বলতে লাগল, এখানে গলা ছাড়বার জো নেই। মা-বাপের আশীর্বাদে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারি তো দশের মুকাবেলা হাঁকডাক করে বলব। পাগল-ছাগলের তাঁবেদারি করা আমার দ্বারা আর পোষাবে না।

ভাঁটা সরে গেছে। সকাল বেলাকার উচ্ছল খাল এখন বিঘতখানেক চওড়া আঙুল চারেক গভীর নালা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু-কূলের বেঁটে গেঁয়ো গাছগুলো মোটা গোড়া এবং অজস্র শিকড়ে অক্টোপাসের মতো মাটি কামড়ে আছে। ভরা জোয়ারের সময় আধেক-ডোবা এদেরই প্রসন্ন-স্নানরত হাজার হাজার আরণ্য শিশুর মতো মনে হচ্ছিল।

নৌকো একেবারে ডাঙার উপর। দুধারে খালের গর্ভে লোনা-কাদা পড়ন্ত ক্ষীণ আলোয় চিকচিক করছে। কাত হয়ে পড়েছে নৌকো। ছোট ছোট গর্ত থেকে এক রকম আণবিক কাঁকড়া বেরিয়ে আসছে, মেটে রঙের অতি-ছোট উড়ুক্কু মাছ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাদের। হাতে কাজ না থাকলে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে তাকিয়ে তুচ্ছ এই জীবলীলা দেখা চলে। নৌকো কাত হয়ে পড়েছে। নিচু খুঁটির উপর ছই—একদিকে গোলপাতার বেড়া, বাকি তিনদিক একেবারে ফাঁকা। দুর্লভ গুটিসুটি হয়ে আছে। বিপদ বুঝলে শজারু যেমন কাঁটা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে থাকে, তেমনি অবস্থা।

মাথায় এক বুদ্ধি এল দুর্লভের। ছাতা মেলে এক ধারে আড়াল দিল। গায়ের গলা-বন্ধ কালো কোটটা খুলে টাঙাল অন্যপাশে। কোট দেখে অস্পষ্ট আলোয় মনে হতে পারে মানুষই বসে আছে একজন। শিকারি বাঘ দুটো লাফ দেয়—এক লাফে শিকারের ঘাড়ে পড়ে, আর এক লাফে শিকার নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে পড়ে। বাজপাখীর ছোঁ দেওয়ার মতো—চক্ষের পলকে ঘটে যায়। দূর থেকে ঝাঁপ দেয়, অতএব কোটটাই মানুষ বলে ভাববে। কোট মুখে করে সরে পড়বে দুর্লভের এই ভরসা।

(ক্রমশ)

সৈয়দ মুজতবা আলী

আড্ডা

২

(বহু বাঙালী সন্তানের মারাত্মক ভুল ধারণা, আড্ডা মারতে জানে শুধু তাদেরই জাত ভাই। এ-ধারণা দেশের দশের গুরুতর ক্ষতি করতে পারে ভেবে গেল সংখ্যায় নিবেদন করেছিলুম কাইরোবাসী এ-ব্যসনে কিঞ্চিন্মাত্র পশ্চাৎপদ নয়। তবে কাইরোতে আড্ডা কারো বাড়িতে বসে না, বসে কোনো কাফেতে এবং আড্ডার সদস্য হয় সাতান্ন জাতের। ভাষা সাধারণতঃ আরবী, কখনো ফরাসী কখনো অর্বাচীন গ্রীক)

আমার বাড়ির নিতান্ত গা ঘেঁষে বলে নিছক কফি পানার্থে ঐ কাফেতে আমি রোজ সকাল সন্ধ্যা যেতুম। বিদেশ বিভূঁই, কাউকে বড় একটা চিনিনে, ছন্নের মত হেথা হোথা ঘুরে বেড়াই আর দেশ ভ্রমণ যে কি রকম পীড়াদায়ক প্রতিষ্ঠান সে সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক কেতাব লিখব বলে মনে মনে পাঁয়তারা কষি। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল গেল কাফের কোণের আড্ডাটির দিকে। গোড়ার দিকে লক্ষ্য করিনি যে কফি-পানটা ওদের নিতান্ত গৌণকর্ম, ওরা আসলে আড্ডাবাজ।

আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা ওদেরও মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রাহ্ম মুহূর্তে। সে "মহালগনের" বর্ণনা আমি আর কি দেব? সুরসিক পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো শ্রীহরি শ্রীরাধাতে, ইউসুফ জোলেখাতে, লায়লী-মজনুতে, ত্রিস্তান ইজোল্দেতে কি করে প্রথম চারি চক্ষু বিনিময় হয়েছিল। কী ব্যাকুলতা, কী গভীর তৃষা, কী মহা ভবিষ্যতের প্রগাঢ় সুখস্বপ্ন কী মরুতীর পার হয়ে সুধাশ্যামলিম নীলাম্বুজে অবগাহনানন্দ সে দৃষ্টি বিনিময়ে ছিল! এক ফরাসী কবি বলেছেন, 'প্রেমের সবচেয়ে মহান দিবস সেদিন যেদিন প্রথম বলেছিলুম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম হল সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে।

তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে আসুন, স্পর্শ করে বলব তিন লহমাও লাগেনি, এই ব্রাত্যের উপনয়ন হয়ে গেল, বেদ, শাখা, ঋষি স্থির হয়ে গেল—সোজা বাঙলায় বলে, জাতে উঠে গেলুম। অমিয়-ছানিয়া, নয়ন হানিয়া বললুম, 'এক রোঁদ কফি?'

আড্ডার মেম্বররা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরিতোষের স্মিতহাস্য বিকশিত করলেন। ভাবখানা ভুল লোককে বাছা হয়নি।

কাফের ছোকরাটা পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। আমার ছন্নছাড়া ভাবটা তার চোখে বহু পূর্বেই ধরা পড়েছিল। রোঁদ পরিবেশন করার সময় নীলনদ-ডেল্টার মত মুখ হা করে হেসে আমি যে অতিশয় ভদ্রলোক—অর্থাৎ জোর টিপ্স্ দিই—সে কথাটা বলে আড্ডার সামনে আমার কেস্ রেকমেণ্ড করলো।

জুর্নো তাড়া লাগিয়ে বললো, 'যা, যা, ছোঁড়া মেলা জ্যাঠামো করিসনে।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাসা আরবী বলেন আপনি।'

রবিঠাকুর বলেছেন—

'এত বলি সিক্ত-পক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে—'

ঠিক সেই ধরণে আমার দিকে তাকিয়ে জুর্নো যেন আমার প্রবাস-লাঞ্ছনা এক থাবড়ায় মেড়ে ফেললেন আমার অঙ্গ থেকে।

আমি কিন্তু মনে মনে বললুম, 'ইয়া আল্লা, তের দিনের আরবীকে যদি এরা বলে খাসা তবে এরা নিশ্চয়ই খানদানী মনিষ্যি।' করজোড়ে বললুম ',ভারতবর্ষের নীতি, সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না; আপনাদের নীতি দেখছি আরো এক কদম এগিয়ে গিয়েছে, প্রিয় অসত্যও বলবে।'

আড্ডাতো—পার্লিমেণ্ট নয়—তাই হরবকৎ কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসম-দিব্যি নেই। দুম করে রমজানকে বললে. 'আমার মামা (আমি মনে মনে বললুম, 'বগ্যিদাসের মামা') হজ করতে গিয়েছিলেন আর বছর। সেখানে জনকয়েক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারা নাকি পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ত আর বাদবাকি তামাম দিনরাত এক চায়ের দোকানে বসে কিচিরমিচির করত। তবে তারা নাকি কোন্ এক প্রদেশের বঙ্গালা, বাঙালা—কি যেন—'আমার ঠিক মনে নেই—'

উৎসাহে উত্তেজনায় ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে আমি শুধালুম, 'বাঙালা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ'

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম বাঙালী কিন্তু কই, কখনো তো এত গর্ব অনুভব করিনি যে, আমি বাঙালী। এই যে নমস্য মহাজনরা মক্কা শহরে আড্ডাবাজ হিসেবে নাম করতে পেরেছে—নিশ্চয়ই বিস্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—তাঁরা আলবৎ শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চাঁটগা, কাছাড়ের বাঙালী খালাসী, পশ্চিম-বঙ্গের কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে খিদিরপুরে আড্ডা মারতে শিখে 'হেলায় মক্কা করিলা জয়'।

আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ডান হাত বুকের উপর রেখে মাথা নিচু করে অতিশয় সবিনয় কণ্ঠে বললুম, 'আমি বাঙালী।'

গ্রীক সদস্য মার্কোস প্রথম পরিচয়ের সময় একবার মাত্র 'সালাম আলাইক' করে খবরের কাগজের পিছনে ডুব মেরেছিলেন। তাঁর কানে কিছু যাচ্ছিল কি না জানিনে। আমি ভাবলুম, রাসভারী লোক, হয়ত ভাবছেন নুতন মেম্বার হলেই তাকে নুতন জামাইয়ের মত কাঁধে তুলে ধেই ধেই করেই নাচতে হবে একথা আড্ডার কন্স্ট্যিট্যুশানে লেখে না। মুখের উপর থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'দাঁও মেরেছি। একটা শ্যাম্পেন হবে? আমাদের নুতন মেম্বর—'

কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল মালিক। তার দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত গোল করে বোতল ধরার মুদ্রা দেখিয়ে ডান হাত দিয়ে দেখালেন ফোয়ারার জল লাফানোর মুদ্রা। ম্যানেজার কুল্লে দুই ডিগ্রী কাৎ করে ঘাড় নাড়ল।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এ দোকানে তো মদ বেচার লাইসেন্স নেই।'

মার্কোস বললেন, 'কাফের পিছনে, ও ড্রইং রুমে। ব্যাটা সব বেচে;—আফিং ককেইন, হেরোইন, হসীস যা চাও।'

ছোকরাকে বললেন, 'আর একটা তামাক সাজিস।'

বলে কি? কাইরোতে তামাক! স্বপ্ন না মায়া নু মতিভ্রম নু?

(ক্রমশ)

দেবতাত্মা হিমালয়

এই ভারতের মাটির ইতিহাস বস্তুতঃ হিমালয়ের ইতিহাস। আর হিমালয়ের ইতিহাস খ‍ুঁজতে গেলে সেই বিস্মরণেরও সীমার বাইরে, প্রায় বোধাতীত নীহারিকাময় অস্তিত্বের যুগে কল্পনাকে টেনে নিয়ে যেতে হয়। কাল্পনিকেরা তাকে প্রলয় পয়োধি বলে বর্ণনা করে গিয়েছেন। কবে সেই বাষ্পীয় বিশ্বের কায়া, পরমাণুপুঞ্জের এক বিরাট যজ্ঞের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে পঞ্চপদার্থের বিশ্বরূপে কঠিন কায়া লাভ করল, সে কাহিনী বস্তুতঃ সৃষ্টিতত্ত্বেরই কথা। কুতো ইয়ং বিসৃষ্টিঃ? এই প্রশ্ন মানুষের মনে চিরন্তন জিজ্ঞাসারূপে আজও রয়ে গেছে।

ভূধর হিমালয় সুব্যাপ্ত, বিরাট ও মহান। কঠিন পাষাণের বাহু দিকে দিকে প্রসারিত করে দেশ ও মহাদেশের হাত ধরে রয়েছেন। কিন্তু কোলে করে রেখেছেন একটি দেশকে, সেই দেশই আমাদের মাতৃভূমি।

এই হিমালয়ের রূপদর্শনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ—

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কী জানি কী বাণীর সন্ধানে।
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষ প্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর,—সামগ্রীর শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণী ধারা।

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ।
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমা বিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া॥

গ্যাংটক হইতে ২৭ মাইল দূরবর্তী ১২,৪০০ ফুট উচ্চে নাথু-লা গিরি

গ্যাংটক হইতে ২১ মাইল দূরের সূর্যাস্তকালীন চাংগু হ্রদ
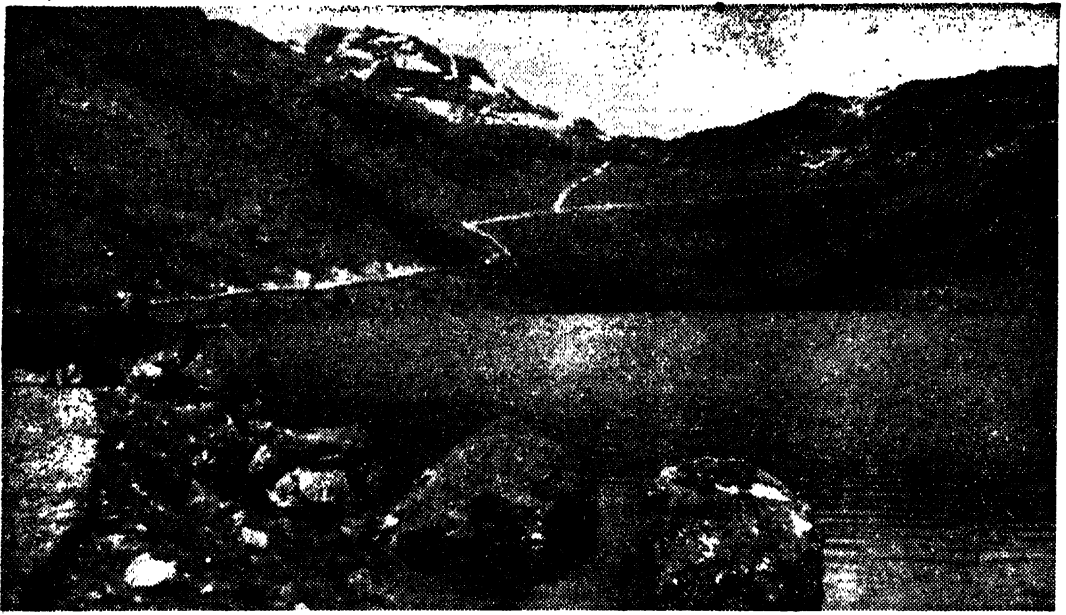
হিমালয়ের কোলে চাংগু হ্রদের মনোরম দৃশ্য, পশ্চাতে নাথু-লা গিরিবর্ত্ম।

"উদ্ধত উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেণ্ড্রন গুচ্ছ"
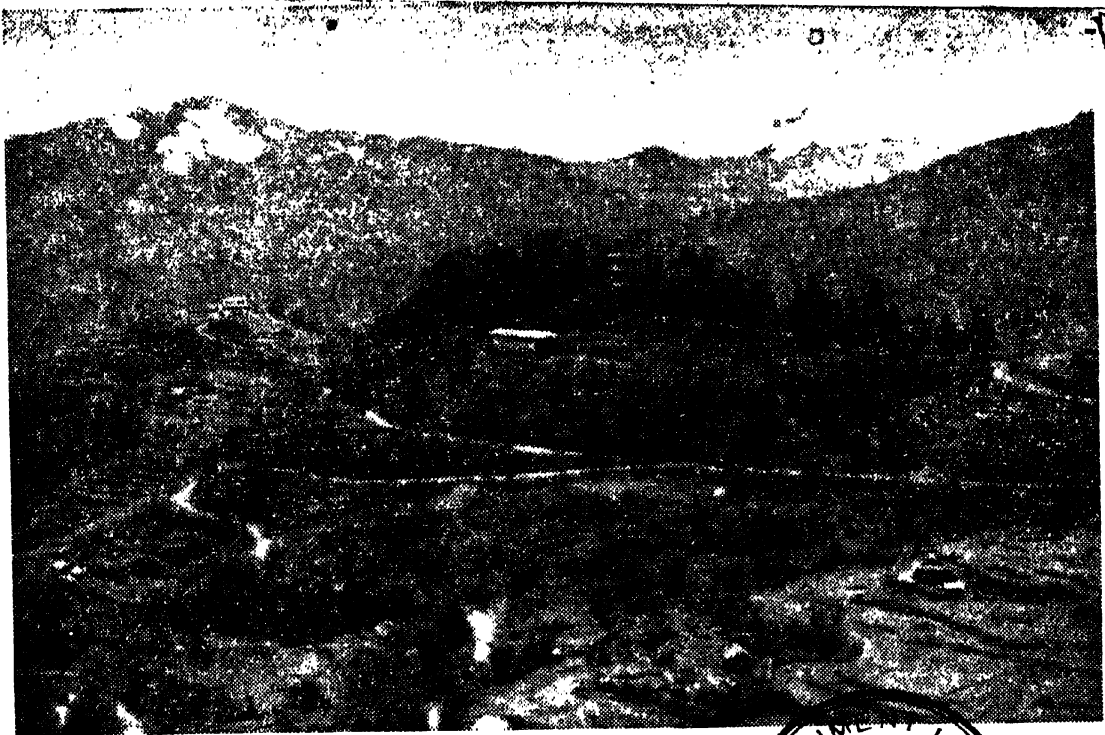
প্‌সম-এর কারপোনাঙ যাইবার পথে দ্বিতীয় মাইল হইতে গ্যাংটক [illegible] দৃশ্য

হিমালয়ের বসন্তকালীন পুষ্পসম্ভার লইয়া পার্বত্য রমণীগণ

গিরিরাজ হিমালয়ের কোলে ভুটিয়াদের প্রার্থনা মন্দির (গুম্ফা)

শান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হের আজি
তোমার সর্বাঙ্গ ঘেরি পুলকিছে শ্যাম শস্পরাজি
প্রস্ফুটিত পুষ্পজালে; বনস্পতি শত বরষার
আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার
বল্কলে শৈবালে জটে; সুদুর্গম তোমার শিখর
নির্ভয় বিহঙ্গ যত কলোল্লাসে করিছে মুখর।
আসি নরনারী দল তোমার বিপুল বক্ষপটে
নিঃশঙ্ক কুটিরগুলি বাঁধিয়াছে নির্ঝরিণীতটে।
যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পর্ধিতে আকাশ,
কম্পমান ভূমন্ডলে, চন্দ্রসূর্য করিবারে গ্রাস,—
সেদিন, হে গিরি, তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয়;
যখনি থেমেছে তুমি বলিয়াছ, "আর নয় নয়",
চারিদিক হতে এলো তোমা পরে আনন্দ-নিশ্বাস,
তোমার সমাপ্তি ঘেরি বিস্তারিল বিশ্বের
বিশ্বাস॥

—রবীন্দ্রনাথ

অস্তগামী সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত চাংগু সরোবরের জলধারা

আজব গোয়েন্দা

জি কে চেস্টারটন

অনুবাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় গল্প ঃ পাদ্রীর আবির্ভাব

আমার বিশ্বাস, মনুষ্যসমাজ এবং বস্তু-জগতের মধ্যে একটা তীব্র বিরোধ বর্তমান। বিরোধটার ইদানীং ভোল পাল্টেছে। একমাত্র বড়ো বড়ো বস্তুগুলিই আগে আমাদের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতো, আজকাল আর করে না। সে-দায়িত্ব ক্ষুদ্রাকার বস্তুগুলি গ্রহণ করেছে। অনবরত আমাদের সঙ্গে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, আমাদের নাজেহাল করে ছাড়ছে। এই ধরুন ঝড়ঝঞ্ঝা। এই বিরাট দৈত্যটি আর আজকাল আমাদের জ্বালায় না. আজকাল সে শান্ত হয়েছে। আগে আগে সামুদ্রিক ঝড়ঝঞ্ঝায় আখছার আমাদের জাহাজডুবি হতো, আজকাল আর বড়ো একটা হয় না। কিংবা ধরুন, আগ্নেয়গিরি। আগেকার কালে অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে অস্টপ্রহর সকলে তটস্থ থাকতো; তারও আজকাল দাপট কমেছে। বৃহদাকার এই বস্তুরূপী দৈত্য-গুলি আজকাল শান্ত হয়ে এসেছে বটে, তবে তাতে কিছু লাভ হয়নি। বড়োর দাপট কমেছে. ছোটর দাপট বেড়েছে। ক্ষুদ্রাকার সব শত্রুর সঙ্গে, দৃষ্টান্তস্বরূপ জীবাণু কিংবা জামার বোতামের উল্লেখ করা যায়, অহোরাত্র যুদ্ধ চালাতে হচ্ছে আমাদের।

শার্টের গায়ে কলার-বোতামটিকে প্রবিষ্ট করাতে করাতে গলদঘর্ম অবস্থায় এই মহান সত্যটি আমি আবিষ্কার করলাম। এ নিয়ে নিবিষ্টমনে আরও কিছুক্ষণ হয়তো চিন্তা করতাম আমি, আর তার ফলে মহত্তর কোনও সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছনও হয়তো অসম্ভব ছিল না আমার পক্ষে; তার আর অবসর হলো না। সজোরে কে যেন আমার দরজার কড়া নাড়লো।

কে আবার জ্বালাতে এলো? একটু বিরক্ত হলাম আমি; পরক্ষণেই মনে হলো, হয়তো বা বেসিল গ্র্যাণ্ট নিজেই আমাকে ডেকে নিতে এসেছে। আমাদের দুজনের আজ ডিনারের নেমন্তন্ন আছে এক জায়গায়; সেইজন্যেই আমি জামা-কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিচ্ছিলাম। কথা ছিল আমরা আলাদা-আলাদা যাবো। কে জানে, শেষ মুহূর্তে কী তার মাথায় ঢুকেছে। হয়তো ভেবেছে, একা যেতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারি; তাই হয়তো ডেকে নিতে এসেছে। যে ভদ্র-মহিলার বাড়িতে নেমন্তন্ন, সমাজে তিনি সহৃদয়া এবং আতিথিবৎসলা বলে সুপরিচিতা। বেসিলেরই তিনি বান্ধবী, ইদানীং রাজনীতি নিয়ে মত্ত আছেন। কে এক ক্যাপ্টেন ফ্রেজার আজ তাঁর ওখানে আসবেন, বাঁদর সম্পর্কে তিনি নাকি একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁরই সম্মানার্থে ভদ্রমহিলা এই ডিনার-পার্টির আয়োজন করেছেন। আমাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে বেসিলেরই সুবাদে, নিমন্ত্রণকারিণীকে আমি আগে কখনো দেখিওনি। তাই একলা যেতে আমার সংকোচ হতে পারে—এই আশংকাতে বেসিল নিজেই হয়তো আমাকে ডেকে নিতে এসেছে। কড়া-নাড়া শুনে তাই অন্তত আমার মনে হয়েছিল। পরে দেখলাম, না—বেসিল নয়।

দরজা খুলতেই বেয়ারা আমার হাতে একটি ভিজিটিং-কার্ড তুলে দিল। নাম লেখা রয়েছে 'রেভারেণ্ড্ এলিস্ শর্টার'। তার নীচে লেখা, 'অত্যন্তই গুরুতর বিষয়ে কিছুক্ষণের জন্যে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি'। কথাকটি খুব দ্রুতহাতে লেখা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তার পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করবার মতো।

ততক্ষণে আমি আপ্রাণ চেষ্টায় কলার-বোতামটিকে ঠিকমতো পরিয়ে নিতে পেরেছি। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তুর চাইতে মানুষের ক্ষমতাই বেশী। তবে, এ নিয়ে আর চিন্তা করবার সময় পাওয়া গেল না। চটপট্ ওয়েস্ট্-কোট আর ড্রেস্-কোটটাকে গায়ের ওপর চাপিয়ে আমি ড্রইং-রুমের দিকে ছুটলাম। আগন্তুক আমাকে দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মনে হলো, একটা সিলমাছ যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে। কি বলবো, অন্য কোনও উপমা আমার মনে এল না। ভদ্র-লোকের গায়ে একটা শাল জড়ানো, জড়ো-সড়ো হয়ে সেইটেকেই তিনি বারকয়েক ঝেড়েঝুড়ে নিলেন। কালো দস্তানা-জোড়াটিকেও নাড়াচাড়া করলেন কয়েকবার; জামাকাপড়ের থেকে ধুলো ঝাড়লেন। এ-সবই তার স্নায়ুদৌর্বল্যের লক্ষণ। মনে হলো, উঠে দাঁড়াবার সময় নয়নপল্লব-দুটিকেও যেন ঝাপটে নিলেন বারংবার। আগন্তুককে বেশ ভাল করে একবার দেখে নিলাম। বেশভূষার থেকে বুঝলাম, ইনি একজন পাদ্রী। চক্ষুদুটি ভ্রূহীন, চুল আর গোঁফ ধপধপে শাদা। বেশ বয়েস হয়েছে। চেহারায় একটা অপ্রস্তুত কাচুমাচু ভাব।

"ভারী দুঃখিত আমি, খুব দুঃখিত। অত্যন্তই দুঃখিত," হাত কচলাতে কচলাতে আগন্তুক মিঃ এলিস্ শর্টার বললেন, "এই এসেছি, মানে আসতেই হলো, মানে ইয়ে কী বলবো—অত্যন্তই জরুরী দরকার। তাই মানে এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। তা, আপনি কিছু মনে করেননি তো—"

বললাম যে কিছুই আমি মনে করিনি।

"কেন যে আমি এসেছি, মানে কী বলবো ভয়ংকর একটা ব্যাপার;" ভয়ত্রস্ত ভাঙা ভাঙা গলায় তিনি ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করতে লাগলেন "অত্যন্তই ভয়ংকর, বীভৎস কাণ্ড। কারু সাতেপাঁচে কখনো আমি মাথা গলাইনি আসলে কি জানেন, ভারী শান্তিপ্রিয় লো[ক] আমি। তা সত্ত্বেও যে—"

এ কী দীর্ঘ ভূমিকা! আমি একেবা[রে] অধৈর্য হয়ে উঠলাম। এতক্ষণে আম[ার] ডিনারে পৌঁছুবার কথা। এরপর যদি আ[র] সময় নষ্ট করি তো অত্যন্তই দেরী হ[য়ে] যাবে। এদিকে, নড়তেও পারছি না; ভ[দ্র]লোকের কথায়বার্তায় এমন একটা ক[রুণ] আকুতি ফুটে উঠেছে যে তাঁকে থামি[য়ে] দেওয়াও অসম্ভব। কে জানে, কী এঁর বিপ[দ;] সে তুলনায় আমার এই নেমন্তন্নের তা[গিদ] হয়তো নিতান্তই একটা তুচ্ছ ব্যাপার।

ব্যস্ততা গোপন করে বললাম, "থামলেন কেন, বলে যান।"

মিঃ শর্টার অতিশয় ভদ্রলোক, চেষ্টা সত্ত্বেও আমার ব্যস্ততা তার কাছে গোপন রইলো না। ফলে তিনি আরও অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

কাচুমাচু গলায় বললেন, "অত্যন্তই দুঃখিত আমি; অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে, তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তবে আপনার বন্ধু মেজর ব্রাউনকে আমি চিনি। তিনিই আমাকে এখানে আসতে বললেন।"

শুনে আমি বিস্মিত হলাম। মেজর ব্রাউন!

রেভারেণ্ড্ মিঃ শর্টার বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মেজর ব্রাউন। তাঁর কী-এক বিপদে আপনারা তাকে সাহায্য করেছিলেন, তাই না? আমারও আজ মহা বিপদ। সেই জন্যেই আমি এখানে ছুটে এসেছি। এর ওপরে একজনের বাঁচামরা নির্ভর করছে।"

ওদিকে ডিনারের বেলা বয়ে যায়। কী করি এখন? দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "মিঃ শর্টার, আর আমার বসবার উপায় নেই। ডিনারের নেমন্তন্ন আছে এক জায়গায়, এক্ষুণি আমায় বেরিয়ে পড়তে হবে।"

মিঃ শর্টারও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন; দেখি তিনি থরথর করে কাঁপছেন। তা সত্ত্বেও, এই চরম বিপদেও, তাঁর কণ্ঠস্বরে আত্মমর্যাদা ফুটে উঠ্‌লো। কাঁপা-কাঁপা গলায় তিনি বললেন, "মিঃ সুইনবার্ন, আপনার সময় নষ্ট করবার কোনও অধিকারই আমার নেই। বিপদ আমার, তাতে আপনার কী। যান, আপনি ডিনারেই যান। কিছুক্ষণের জন্যে যে আপনাকে বিরক্ত করলাম, তারজন্যে আমি নিজেই লজ্জিত। এইটুকু শুধু আপনি মনে রাখুন, অচেনা একজন অসহায় ব্যক্তিকে হয়তো আপনি ইচ্ছে করলেই বাঁচাতে পারতেন। যতোক্ষণে আপনি ডিনার থেকে ফিরে আসবেন ততোক্ষণে সে খুন হয়ে যাবে।"

কাঁপতে কাঁপতেই তিনি বসে পড়লেন আবার।

আমি তো থ। ভদ্রলোক বলেন কী। খুন হয়ে যাবে! আর আমি কিনা ডিনারের আনন্দে মশগুল। ছিঃ ভারী তো ডিনার! এক বাঁদর-বিশারদ ক্যাপ্টেন, তাঁর আবার সম্বর্ধনা! তার জন্যে আবার ডিনার-পার্টি! রাজনীতি-পাগলা এক বিধবা ভদ্রমহিলার প্রাণে শখ জেগেছে, রাজ্যের লোককে তিনি ডিনার খাইয়ে বেড়াচ্ছেন। এদিকে এক অসহায় নিরপরাধের যে প্রাণ যায়। তাকে ফেলে আমি ডিনারে যাবো? শেষকালে নেমন্তন্নটাই কি বড়ো হলো? নৈব নৈব চ। নেমন্তন্নের চিন্তাকে আমি মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দিলাম, প্রস্তুত হলাম এই বিপদাপন্ন বৃদ্ধের কাহিনী শোনবার জন্য।

তাঁকে সাহস দেবার জন্যে বললাম, "একটা চুরুট খাবেন?"

"না, ধন্যবাদ।" অপ্রস্তুতভাবে তিনি মাথা নাড়লেন; যেন চুরুট না-খাওয়াটা তাঁর অপরাধ।

"এক পাত্তর বার্গাণ্ডি খান বরং?"

"না না, এখন আর ওসব ঝামেলার দরকার নেই; ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পরে বরং—"

আদপেই যাঁরা মদ ছোঁননা, ঠিক এমনি-ভাবেই বোধ হয় তাঁরা প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন; বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ঠিক এক্ষুনি তাঁদের তৃষ্ণা নেই—তাই খেলেন না; পরে আরেকদিন বরং সারারাত জেগে হৈ হৈ করে মদ টানা যাবে।

"কিছুই খাবেন না তাহলে?" অপদার্থ বুড়োর জন্যে আমার করুণা হলো, "এক কাপ চা দিই বরং; না-কি তাও না?"

আমারই জয় হলো এবার। চা এলো; ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢক্ ঢক্ করে তিনি তাকে গলাধঃকরণ করলেন। তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, "মিঃ সুইনবার্ন, কী যে বিপদ গেছে আমার উপর দিয়ে তা আর আপনাকে কী বলবো? আমি শান্তিপ্রিয় লোক, এ-সব ঝড়ঝাপ্টায় আমি অভ্যস্ত নই। ওঃ কত বচ্ছর ধরেই তো চান্সী-তে আমি ধর্মযাজকের কাজ করছি,—কী বলবো কক্ষণো আর এসব বীভৎস ব্যাপারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি।"

"কিসের বীভৎস ব্যাপার?" উৎসুক কণ্ঠে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সেই কথাতেই আসছি। ওঃ, মনে করতেও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। ভাবতে পারেন, চান্সীর এই নিরীহ ধর্মযাজককে জোর করে একটা বুড়ী সাজানো হয়েছিল?

বুড়ী-সাজিয়ে আমাকে দিয়ে মারাত্মক রকমের একটা অপরাধ করিয়ে নেবার চেষ্টা হয়েছিল, ভাবতে পারেন এ-কথা? আমি নিজেই কি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি?"

"পারাটা একটু কণ্টকর বটে", আমি সায় দিয়ে বললাম, "তবে কি জানেন, আপনাদের ধর্মযাজকদের যে কী করতে হয়-না-হয়—আমি ঠিক জানি না। যতদূর মনে হচ্ছে, ও-কাজটা বোধ হয় আপনাদের কর্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। হ্যাঁ, কি বলছিলেন যেন, কী সাজতে হয়েছিল আপনাকে?"

"বুড়ী সাজতে হয়েছিল। হ্যাঁ, একটা বুড়ী।"

সত্যি বলতে কি, মিঃ শর্টারকে বুড়ী সাজাতে যে খুব বেগ পেতে হয়েছিল তা আমার মনে হয় না; ভদ্রলোকের চেহারাটা খানিকটা মাসি-পিসি গোছেরই বটে। তবে কি না এটা রসিকতার সময় নয়, তাই আমি হাস্যসংবরণ করে বললাম. "ব্যাপারটা ঘটলো কি করে, খুলে বলুন।"

মিঃ শর্টার বললেন, "গোড়ার থেকেই তাহলে শুরু করি। ভয় নেই, খুব সংক্ষেপেই সারবো। আজ সকালে এগারোটা বেজে সতেরো মিনিটে আমি গীর্জের থেকে বেরোই। কয়েকটা জায়গায় দেখা করতে যাবার কথা ছিল। সেই সংগে গ্রামটাও একবার ঘুরে আসবো ভাবলাম। প্রথমে গেলাম মিঃ জার্ভিসের বাড়ী। ইনি হচ্ছেন আমাদের 'খৃষ্টীয় উৎসব সমিতি'র কোষাধ্যক্ষ। টেনিস-লনটাতে রোলার টানার দরুণ আমাদের মালী পার্কারের কিছু টাকা পাওনা ছিল; সেই সম্পর্কেই মিঃ জার্ভিসের সংগে কথাবার্তা হলো আমার। তারপর গেলাম মিসেস আর্নেটের ওখানে। ধর্মপ্রাণা মহিলা, তবে চিররুগ্না। ধর্মের ওপর খানকতক বইও লিখেছেন মিসেস আর্নেট; একখানা কবিতার বইও আছে। কী যেন বইখানার নাম? ও হ্যাঁ—মনে পড়েছে, 'ইগল্যানটাইন'।"

সবিস্তার ভূমিকা। মিঃ শর্টার বেশ ধীরে-সুস্থে এইসব খুঁটিনাটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলেছেন, আর বেশ আগ্রহের সংগে। ভদ্রলোকের বোধ হয় গোয়েন্দা-কাহিনী পড়া আছে; সেই যে সেই সব বই—গোয়েন্দারা যেখানে এইসব আপাত-অপ্রাসংগিক খুঁটিনাটি ঘটনার ওপরেই সব থেকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন!

মিঃ শর্টার তাঁর সেই একটানা ভংগীতেই বলে চললেন, "অতঃপর গেলাম মিঃ কার্-এর বাড়ী (না না, ইনি মিঃ জেম্‌স্ কার্ নন, ইনি হলেন মিঃ রবার্ট কার্)। আমাদের গীর্জেতে যিনি অর্গ্যান বাজান, মিঃ কার্ই আপাতত তাঁকে সাহায্য করছেন। তাঁর ওখানেও কিছুক্ষণ আলাপ হলো (আলাপের বিষয়বস্তুটাও তাহলে শুনুন; গীর্জের অর্গ্যানটায় যেন কে ছ্যাঁদা করে দিয়েছে। সকলে সন্দেহ করছে, সংগতদার ছোকরা-দেরই এই কীর্তি। তা, তাই নিয়েই আলোচনা হলো)। সেখান থেকে গেলাম মিস ব্রেট্-এর বাড়ী। আপনি হয়তো জানেন, গরীবদের সাহায্য করবার জন্যে কুমারী-ধর্মযাজিকারা সস্তায় জামা-কাপড় তৈরী করে' বিলিয়ে থাকেন। এই সম্পর্কে সেখানে একটা সভা হবার কথা ছিল। এসব মেয়েদের সভা সাধারণতঃ আমাদের বাড়ীতেই হয়। আমার স্ত্রী এবার অসুস্থ থাকায় স্থির হয়েছিল যে, এবারকার সভা মিস্ ব্রেট-এর বাড়ীতে বসবে। মিস ব্রেটও তাতে সাগ্রহেই রাজী হয়েছিলেন। আমাদের গ্রামে তিনি নবাগতা, তা সত্ত্বেও ধর্মকর্মের ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছেন। গীর্জের নিয়ম অনুসারে, কুমারী-ধর্মযাজি-কাদের এইসব সভা সমিতির ব্যাপারে

আমার স্ত্রী-ই হচ্ছেন সর্বময়ী কর্ত্রী। তিনিই এসব ব্যাপারের দেখাশোনা করেন; আমিতো প্রায় কাউকেই চিনি না, এক শুধু মিস্ ব্রেটকেই চিনি। যা হোক, তা সত্ত্বেও এবারকার সভায় আমি গেলাম। আগে থাকতেই কথা দিয়ে ফেলেছিলাম, না গেলে খুব খারাপ দেখাত।

"পেঁৗছে দেখি মিস্ ব্রেট্ ছাড়া আর মাত্র চারজন কুমারী সেখানে হাজির হয়েছেন। আপন মনে তাঁরা সেলাই-ফোড়াই করছেন। কখনো বা মৃদুস্বরে কথা বলছেন নিজেদের মধ্যে। সে-কথাবার্তার একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যে আপনাকে দেওয়া দরকার তা আমি জানি; আর তা আমি দিতামও। তবে মুশকিল হয়েছে এই যে, ভালো করে সব কথা আমার নিজেরই মনে নেই। থাকা সম্ভবও নয়। এটুকুমাত্র মনে আছে যে, মোজা-সেলাই-এর কায়দাকানুন নিয়েই তাঁদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আর হ্যাঁ, আরও একটা কথা মনে আছে; তাঁদের মধ্যে একজন একবার শুধু বলেছিলেন যে, আবহাওয়াটা বড্ডো তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে (কৃশাঙ্গী এক ভদ্রমহিলা এ-কথা বলেছিলেন; গায়ে তাঁর শাল-জড়ানো, একটু যেন শীতকাতুরে বলে' মনে হলো আমার; প্রথম আলাপের সময় জেনেছিলাম তাঁর নাম মিস জেমস্। মিস ব্রেট্ অতঃপর আমাকে এক কাপ চা এগিয়ে দিলেন। ঠিক কী বলে' যে চা-টা আমি নিয়েছিলাম এখন আর আমার মনে নেই। ও হ্যাঁ, মিস্ ব্রেট-এর চেহারাটারও একটা বর্ণনা দেওয়া দরকার। বেঁটে-খাটো চেহারা, স্থূলাঙ্গিনীই বলা যায়; চুল শাদা। আরেক জনের কথা আমার মনে আছে, নাম মিস্ মোরে। ইনি কৃশাঙ্গিনী, মাথায় একরাশ রুপোলি চুল। কণ্ঠস্বর একটু বা উঁচু, গায়ের রং পরিষ্কার। প্রতিটি কথাই তিনি বেশ জোর দিয়ে বলছিলেন, বেশ আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে। গান্নাবাস সম্পর্কে কি-যেন একটা মন্তব্য করলেন; মন্তব্যটা আমার ভালো লেগেছিল। যে-কটি মহিলাকে সেখানে দেখলাম তাঁদের সকলেরই পরণে শাদাসিদে কালো পোষাক। তার মধ্যে, এক মিস্ মোরে বাদে, কারুর পোষাকই তেমন পরিপাটি নয়।

"মিনিটদশেক কথাবার্তার পর আমি উঠে দাঁড়ালাম, এবার বিদায় নেব। কিন্তু সেই বিদায়-মুহূর্তে এমন একটা কথা আমার কানে এল, ওঃ—সে যে কী ভীষণ কথা কেমন করে আপনাকে তা বোঝাই? কথাটার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে—নাঃ, কোনও মতেই আপনাকে ঠিক্ বোঝাতে পারবো না।"

আমি একটু অধৈর্য হয়ে উঠলাম; বললাম, "বলেই ফেলুন না, কী আপনি শুনলেন?"

"শুনলাম—" গম্ভীর গলায় মিঃ শর্টার বললেন, "শুনলাম, মিস্ মোরে (অর্থাৎ যাঁর রুপোলি চুল) মিস্ জেম্স্‌কে (অর্থাৎ সেই শাল-জড়ানো ভদ্র মহিলাকে) এই অদ্ভুত কথাকটি বললেন। কথাগুলি আপনাকে বলছি দাঁড়ান। সেই ভয়াবহ বাক্যসমষ্টিকে আমি সেখানে দাঁড়িয়েই মুখস্থ করে ফেলেছি; তারপর বিপন্মুক্ত হয়েই, পাছে কথাকটি আমি ভুলে যাই, চট্‌পট্ একটা কাগজে টুকে রেখেছি। কাগজটা আমার সঙ্গেই আছে, বার করছি দাঁড়ান—" ভদ্রলোক তাঁর পকেট হাতড়াতে লাগলেন। টুকিটাকি নানাবিধ দ্রব্যাদি বেরুতে লাগলো সেখান থেকে; নোট-বই, সার্কুলার, কনসার্টের প্রোগ্রাম ইত্যাদি। তারপর সেই কাগজের টুকরোও বেরুলো। সেখানাকে সামনে রেখে মিঃ শর্টার বললেন, "এই যে, পাওয়া গেছে। মিস্ মোরেকে আমি মিস্ জেম্স্-এর উদ্দেশ্যে বলতে শুনলাম, 'বিল, হুঁসিয়ার'।"

একাগ্র দৃষ্টিতে মিঃ শর্টার আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেশ কয়েক মুহূর্ত। ভাব দেখে মনে হলো, যা তিনি শুনেছেন সে-সম্পর্কে তাঁর এতটুকুও সন্দেহ নেই। তারপর আগুনের চুল্লীর দিকে আরো একটু ঝুঁকে পড়ে তিনি বলতে শুরু করলেন, —"শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সব যেন আমার তালগোল পাকিয়ে গেল। একজন মহিলা যে আরেকজন মহিলাকে 'বিল' নামে সম্বোধন করছেন শুধুমাত্র এইটুকুই অবশ্য অবাক হবার পক্ষে যথেষ্ট। তবে এক্ষেত্রে আমার বিস্ময়ের আরো একটু হেতু ছিল। আগেই বলেছি, অভিজ্ঞতার পরিধি আমার খুব বিস্তীর্ণ নয়। কে জানে, কুমারী-মেয়েদের মধ্যে কী-সব সৃষ্টিছাড়া সম্বোধন-রীতি থাকে! 'বিল' সম্বোধনে তাই আমি খুব অবাক হইনি; অবাক হলাম মিস্ মোরের কণ্ঠস্বর শুনে। মিস মোরের কথাবার্তায় যে একটা আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য করেছিলাম, সেকথা আপনাকে বলেছি। কিন্তু যে-রকম হেঁড়ে গলায় তিনি 'বিল, হুঁসিয়ার'—বললেন তার মধ্যে সেই আভিজাত্যের নাম-গন্ধও ছিল না। এ আমি একেবারে শপথ করে বলতে পারি (যদিও শপথ করাটাকে আমি পাপ বলেই গণ্য করে থাকি)। আসলে 'বিল্, হুঁসিয়ার'—এই কথাটির মধ্যেই এমন একটা অকাট্য অশ্লীলতার ছাপ রয়েছে যে, অভিজাত-কণ্ঠে তা বরং বেখাপ্পাই শোনাত।

"ছাতা আর টুপি হাতে নিয়ে আমি দরজার দিকে পা বাড়িয়েছি, ঠিক এমন সময়েই মিস্ মোরে উপরোক্ত কথাদুটি উচ্চারণ করলেন। শুনে আমি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আরো চমকে গেলাম এই দেখে যে মিস্ জেম্স্‌ও (অর্থাৎ শাল-গায়ে সেই কৃশাঙ্গ কুমারীটি) নিঃশব্দে গিয়ে দুয়ার আগলে দাঁড়ালেন। তখনও তিনি একমনে সেলাই করে যাচ্ছেন। ভাবখানা এই যেন কিছুই হয়নি। ব্যাপারটাকে প্রথমে কুমারী-মেয়েদের একটা উদ্ভট খেয়াল বলেই আমার মনে হয়েছিল। সেইসঙ্গে এও বুঝেছিলাম যে, সহজে এরা আমাকে যেতে দেবে না।

"তবু বেশ ভদ্রভাবেই আমি মিনতি জানালাম, 'মিস্ জেমস্, অনুগ্রহ করে দরজাটা একটু ছেড়ে দিন। আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি অত্যন্তই দুঃখিত। কিন্তু আমার আর সময় নেই; এক্ষুণি আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে। দরজাটা একটু—। আমার কথা তখনও শেষ হয়নি; উত্তরে মিস্ জেম্স্ চাঁছাছোলা ভাষায় যা-একখানা উক্তি করলেন, শুনে আমি থ হয়ে গেলাম। পাছে আবার ভুলে যাই, তাই এ-উক্তিটিকেও আমি কাগজে টুকে রেখেছি। এই যে, দেখুন—মিস্ জেম্স্ আমাকে বললেন, 'চোপরাও বেল্লিক'। এছাড়াও কী-যেন তিনি বলেছিলেন, আমার ঠিক স্মরণ নেই। তারপর যা শুনলাম, এখনো তা মনে পড়লে আমার প্রাণ উড়ে যায়। একমাত্র মিস্ ব্রেট্‌কেই আমি আগের থেকে চিনতাম; ম্যান্টল্‌পীসের পাশেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন; শুনলাম তিনি বলছেন, 'ওহে স্যাম্, বুড়োটাকে একটা বস্তার পুরে ফ্যালো, তারপরে আচ্ছাসে মার লাগাও'।"

ক্রমশঃ

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে। রাষ্ট্র-ভাষা সর্বভারতীয় ভাষা। যাহাতে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারে তাহার জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ভাবের আদান প্রদানের চারিটি অঙ্গ,—বলা, শোনা, লেখা ও পড়া। বলা ও শোনার মধ্যে ধ্বনি এবং লেখা ও পড়ার মধ্যে প্রতীকের প্রাধান্য থাকে। ভাব প্রকাশই ভাষার একমাত্র উদ্দেশ্য। ধ্বনি ও প্রতীক এমনভাবে ব্যবহৃত হইবে যাহাতে উদ্দিষ্ট ভাব শ্রোতা ও পাঠক উপলব্ধি করিতে পারে। হিন্দী অধিক সংখ্যক লোক বলিতে ও বুঝিতে পারে এই যুক্তিতে হিন্দীকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। ভারতের শতকরা সাত আটজন অধিবাসী লিখিতে পড়িতে জানে। মৌখিক হিন্দী ও লিখিত হিন্দী এক নহে। যে অধিক সংখ্যক লোক হিন্দী বলিয়া বুঝাইতে ও শুনিয়া বুঝিতে পারে তাহাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকেই হিন্দীর লিখিত রূপের সহিত পরিচিত। লিখিয়া বুঝাইতে বা পড়িয়া বুঝিতে হইলে লিখিত ভাষার নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করিতে হয়। মৌখিক ভাষার একটা সুবিধা হইতেছে এই যে, ধ্বনি সাদৃশ্যের দ্বারা আমরা উদ্দিষ্ট ভাব বুঝিতে এবং বুঝাইতে পারি। যেখানে ধ্বনি সাদৃশ্য নাই সেখানে ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায় না। মৌখিক হিন্দীর একটা অতি সহজ অলিখিত ব্যাকরণ আছে। সে ব্যাকরণে ক্রিয়া-পদ কর্তা বা কর্মের শিকলে আবদ্ধ নহে। হাম খাতা হৈ, তুম খাতা হৈ, ওয়ে খাতা হৈ, —এই ধরণের বাক্য মৌখিক ভাষায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়াপদ ব্যবহারের এই অনায়াসসাধ্য রীতিই মৌখিক হিন্দীকে অধিক সংখ্যক লোকের সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। যে সব অহিন্দী ভাষাভাষী লোক হিন্দী বলিতে ও বুঝিতে পারে তাহারা যাহা বলে ও বুঝে তাহা তাহাদের স্ব স্ব মাতৃ-ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ও ক্রিয়াপদের ধ্বনির সদৃশ ধ্বনির মাত্রা সাহায্যে বুঝিয়া থাকে। এক মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আকৃতিগত ও ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃত ভাষা অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার জননী। সেইজন্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দের আকৃতি-গত ও ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে। তাহা ছাড়া বহু বিদেশী ভাষার শব্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। সেইসব শব্দকেও সর্ব-ভারতীয় শব্দ বলা যাইতে পারে। হিন্দী ভাষায় যখন সেইসব শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন অপর ভাষাভাষীরাও তাহা বুঝিতে পারে। ওয়ু চেয়ারমে ব্যঠ্‌কর্‌ এক কাপ চায় পীতা হৈ—এই বাক্যে যে বিদেশী শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে সে সব শব্দ ভারতের সব ভাষারই নিজস্ব সম্পদ হইয়া গিয়াছে। যখন বলা হয় হিন্দী ভাষা ভারতের অধিকাংশ লোক বলিতে ও বুঝিতে পারে তখন এইসব সর্বজনবোধ্য শব্দসমূহের প্রতি এবং ক্রিয়া-পদের জটিলতাহীন প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হয়। কিন্তু যে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে তাহা এই মৌখিক হিন্দী নয়। যাহারা হিন্দী ভাষা বলিতে ও বুঝিতে পারে লিখিতে পড়িতে শিখিতে হইলে তাহাদিগকেও লিখিত হিন্দী নূতন করিয়া শিখিতে হইবে। আর যাহারা হিন্দী মোটেই জানে না তাহাদের তো কথাই নাই। অর্থাৎ লিখিত হিন্দী যাহারা শিখিবে তাহাদের তুলনায় লিখন পঠনক্ষম হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা অতি নগণ্য। তাই একটা প্রাদেশিক ভাষার যুক্তিহীন রীতিনীতি মুদ্রাদোষ প্রভৃতি সংখ্যাধিক্যদের ঘাড়ে চাপানো চলে না।

সংস্কৃতিগত কোনো প্রাদেশিক ভাষাই শব্দ-সম্পদের দিক দিয়া মৌলিকত্বের দাবী করিতে পারে না। অর্থাৎ হিন্দী বাংলা প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের কোনোটিকেই খাঁটি হিন্দী বা খাঁটি বাংলা শব্দ বলা চলে না। একই শব্দ স্থান ও পাত্র ভেদে বিভিন্নরূপে উচ্চারিত ও লিখিত হয়। সংস্কৃত মৃত্তিকাকে বিহারীরা বলে মিট্টী, বাঙালীরা বলে মাটি। কৃষ্ণকে কেহ বলে কাল, কেহ বলে কানু, কেহ বলে কানাই, কেহ বলে কান্নাই, কেহ বলে কেষ্ট বা কিষ্ট। কলি-কাতাকে ইংরাজরা বলে ক্যালকাটা, বিহারীরা বলে কলকাত্তা।

প্রতি প্রাদেশিক ভাষায় এমন কতকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয় যাহার মূল অজ্ঞাত! এই অজ্ঞাত-মূল শব্দসমূহের মধ্যে আবার এমন কতগুলো শব্দ আছে যেগুলো সব প্রাদেশিক ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে সেই সব শব্দই ব্যবহৃত হওয়া উচিত যে সব শব্দ যে কোনো আকারেই হোক অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়। সেই হিসাবে তৎসম ও তদ্ভব শব্দ, যে-সব বিদেশী শব্দ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সেই সব শব্দ এবং অজ্ঞাত-মূল সাধারণ শব্দ ছাড়া অপর শব্দ যতদূর সম্ভব কম ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

বিদেশী ভাষা শিখিবার জন্য আমাদের যে আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে হিন্দী ভাষা শিখিবার জন্য আমাদিগকে সে আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না যদি আমরা ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি তৎসম্বন্ধে সচেতন থাকি। একটা উদাহরণ দি:—

জাপানী লোগোঁ কী সচাঈ কী কই কহানিয়াঁ মশহূর হৈঁ। সচাঈ ঔর ঈমান-দারী সে হী উন লোগোঁ নে ইতনী তরক্কী কী হৈ।

এই অনুচ্ছেদটিতে সচাঈ স্থানে সত্য-বাদিতা, মশহূর স্থানে বিখ্যাত, ঈমানদারী স্থানে সততা এবং তরক্কী স্থানে উন্নতি ব্যবহার করিলে নিশ্চয় ভাষার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হইবে না। অবশ্য তৎসম শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে কেহ আপত্তি করিবেন না। যত আপত্তি তদ্ভব ও অজ্ঞাত মূল শব্দের ব্যবহার লইয়া। বাঙালীর ছেলে হিন্দী শিখিবার সময় মাটী লিখিবে, না মিট্টী লিখিবে? হাত লিখিবে, না হাথ লিখিবে? এইরূপ দোকান লিখিবে,

না দুকান লিখিবে? পছন্দ লিখিবে, না পসন্দ লিখিবে? রুটি লিখিবে, না রোটী লিখিবে? বাসন লিখিবে, না বরতন লিখিবে? বাংলা দেশের বিদ্যালয়সমূহে হিন্দী পড়ানো আরম্ভ হইতেছে এবং নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তকও রচিত হইতেছে। সেইজন্য শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথম হইতেই সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

আমার বিবেচনায় প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য যেসব হিন্দী পুস্তক রচিত হইবে সেগুলিতে যতদূর সম্ভব তৎসম শব্দ ব্যবহার করা উচিত। তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করিতে গেলে বাংলায় যেভাবে শব্দ 'ব্যবহৃত হয় সেই-ভাবেই সেই শব্দ হিন্দীতেও ব্যবহার করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা গল্পের মিনী হাতীকে হাঁথী ও কাককে কৌয়া বলিতে শুনিয়া পিতার নিকট অনুযোগ করিয়াছিল। আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি রাষ্ট্রভাষা বিদ্যালয়ে শিখিয়া আসিয়া ঘরে ও মাতৃভাষা লেখায় অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে থাকে তাহা হইলে আমরা অনুযোগ করিব কাহার নিকট?

এই ত গেলো শব্দের কথা। তাহার পর ব্যাকরণ। হিন্দীতে আবার ক্রিয়ারও লিঙ্গ ভেদ আছে। রাম রুটি খাইল, ইহার হিন্দী অনুবাদ করিতে গেলে আপনাকে সর্বপ্রথম রুটি 'রোটী' কোন লিঙ্গ তাহা জানিতে হইবে। কি করিয়া জানিবেন? না, সুধী-জনের প্রয়োগ দেখিয়া। সুধীজন রোটীকে স্ত্রীলিংগ করিয়াছেন, অতএব রোটী স্ত্রী-লিংগ, কিন্তু ভাত পুংলিংগ। তাই আপনাকে অনুবাদ করিবার সময় লিখিতে হইবে রামনে রোটী খাঈ, অথবা রামনে রোটিকো খায়া। গাড়ী চলিতেছে—ইহার হিন্দী গাড়ী চলতীরহী হৈ হইবে, কারণ গাড়ী স্ত্রী-লিংগ। যে যত বড়ই বিজ্ঞ ব্যক্তি হউক বিশুদ্ধ হিন্দী লিখিতে ও বলিতে গেলে তাহাকে'লিংগ বিভ্রাটের জন্য অসুবিধা বোধ করিতেই হইবে। অথচ এই বিভ্রাটটা ইচ্ছা-কৃত। ভাব প্রকাশের ব্যাপারে ইহার কোনো সার্থকতা নাই। রাম রোটী খায়া, রামনে রোটী খায়া, সীতা রোটী খায়া ইত্যাদি লিখিলে কোনোই ক্ষতি হয় না। কর্তায় 'নে' বিভক্তি প্রয়োগেরও কোনো সার্থকতা নাই। স্ত্রীবাচক শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ এবং অপরাপর শব্দকে পুংলিংগ ধরিলেই কাজ চলে। তাহা ছাড়া কর্তা বা কর্ম যে লিংগেরই হোক ক্রিয়া সব সময় পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইবে, মাত্র এই একটি নিয়ম প্রণয়ন করিলে হিন্দী ভাষা ব্যবহার সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। বালক রোটী খাতা হৈ। বালক রোটী খাতে হৈঁ। বালিকা রোটী খাতে হৈ। বালিকাএঁ রোটী খাতে হৈঁ। বালক রোটী খায়া। বালক রোটী খাএ—এই ধরণের প্রয়োগ করিলে কি ক্ষতি হইবে? পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ বিষয়ে কিছু অসুবিধা হইবে সত্য, কিন্তু যাহারা শিখিবে তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে।

সম্বন্ধ পদ ও বিশেষণের সঙ্গেও লিঙ্গের সম্পর্ক আছে। রাম কা পিতা; কিন্তু রাম কী মাতা। ছোটা বালক, কিন্তু ছোটী বালিকা। এরূপ প্রয়োগও নিরর্থক। সম্বন্ধ পদের চিহ্ন একমাত্র 'কা' রাখিলেই কাজ চলিবে। সংস্কৃত শব্দের বিশেষণ সংস্কৃতানুযায়ী করাটাও ইচ্ছাধীন করিলেই চলে। কা-কে-কী এই তিনটির স্থলে মাত্র 'কা' এবং আকারান্ত বিশেষণ পদ সর্বত্র আকারান্ত থাকিবে, এই নিয়ম করিলে ভাষাটা অনেক সহজ হইবে। ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় এই সংস্কারে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন আসিবে শব্দের ব্যবহার লইয়া। তাহা ছাড়া হিন্দীর বিভক্তি প্রয়োগ ব্যাপারেও অপর ভাষা হইতে কিছু পার্থক্য আছে।

যদি বিভিন্ন ভাষাভাষীরা নিজ নিজ ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ হিন্দী ভাষায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ভাষাটা হিন্দী হইলেও একে অপরের কথা বুঝিবে না। ইহাতে ভাষার সার্বজনীনতা ক্ষুন্ন হইবে ও রাষ্ট্রভাষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আশঙ্কাটা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার শব্দাবলীর মধ্যে যে ধ্বনিগত ও আকারগত সাদৃশ্য আছে, তাহাই বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিবে। ইংরাজী ভাষা বিদেশী ভাষা বলিয়াই ইংরাজী শব্দসমূহ অবিকৃতভাবে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিলেও তাহা ইংরাজীর স্থান গ্রহণ করিতে পারিত। কারণ সংস্কৃত ভাষা মৌলিক ভাষা। কিন্তু যে ভাষা মৌলিক নয় সেই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে গেলে তাহার শুচিতা ক্ষুন্ন হইতে বাধ্য।

অন্য ভাষাভাষী সাহিত্যিকদের কথা জানি না; কিন্তু যেদিন বাঙালী সাহিত্যিকেরা হিন্দী ভাষায় সাহিত্য রচনা করিবেন সেদিন যে বাংলা ভাষা হিন্দী ভাষাকে সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া দিবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

হিন্দী ভাষা আরবী পার্শী প্রভৃতি ভাষার শব্দসমূহ উদারভাবে গ্রহণ করিয়াছে, ইংরাজী ভাষার প্রকাশভঙ্গী সে আয়ত্ত করিয়াছে। বাংলা বা অপর প্রাদেশিক ভাষার শব্দ বা প্রকাশভঙ্গী আত্মসাৎ করিতেও সে আপত্তি করিবে না, যদি ভাষার মাধ্যমে ভাবের ঐশ্বর্য পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলার চলিত ভাষা লেখায় এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বাঙ্গালী সাহিত্যিকরা যদি প্রথম হইতে সতর্ক না হন তাহা হইলে অদূর-ভবিষ্যতে বাংলা ভাষাকে হিন্দী ভাষা প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিবে। বাঙালী সাহিত্যিকেরা যদি হিন্দী ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেন, অথবা স্বরচিত রচনা হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে হয়ত একদিন বাঙালীর লিখিত হিন্দীই হিন্দী ভাষার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে। নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশের ভয়ে হয়ত অনেকে হিন্দী লিখিতে সাহসী হইবেন না। কিন্তু তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই হিন্দী ভাষার গঠনপ্রণালী আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিবেন।

আমি যাহা বলিতে চাই তাহা যদি বলিতে পারিলাম এবং আমার বক্তব্য যদি অপরে বুঝিতে পারিল তাহা হইলেই আমার রচনা সার্থক হইল। কর্তায় 'নে' বিভক্তির প্রয়োগ যদি নাই করিলাম, মাত্র স্ত্রীবাচক শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে এবং অপর সব শব্দকে যদি পুংলিঙ্গে ব্যবহার করিলাম তাহা হইলে ভাব প্রকাশের কোনো ক্ষতিই হইবে না। বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহারেও কোনো দোষ দেখি না,—বাংলার রচনাশৈলী ও কারকাদির ব্যবহার হিন্দীতে করিলেও ভাব বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না। যাঁহারা হিন্দী ভাষায় বিশেষজ্ঞ মাত্র তাঁহারাই একটু অসুবিধাবোধ করিবেন। কিন্তু যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন তাঁহাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না। আর যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী।

একটা উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

নরেশের যাইবার আধ ঘণ্টা বাদ করুণার স্বামী জগৎপ্রসাদ ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার

চক্ষু লাল, মুখে মদের গন্ধ। জ্বলন্ত সিগারেটটা এক পাশে ফেলিয়া দিয়া সে একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। স্বামীর দিকে সন্ত্রস্ত হরিণীর মত তাকাইয়া করুণা। জিজ্ঞাসা করিল, "দুদিন থেকে ঘর আস নাই। শরীর কি খারাপ ছিল? যদি আসতে না পার অন্তত খবরটা দিও। আমি তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।"

বাংলা ভাষার রীতি অনুসারে ইহার হিন্দী অনুবাদঃ—

নরেশকা জানেকা আধ ঘণ্টা বাদ করুণা কা স্বামী জগৎ প্রসাদ ঘরমেং প্রবেশ কিয়া। উসকা চক্ষু লাল থে, মুখ সে মদকা বদগন্ধ আ রহা থা। জ্বলন্ত সিগারেটকো এক ওর ফেংককর ওয়্হ চৈয়ার খিংচকর বৈঠা। সন্ত্রস্ত হরিণী কা ওয়হ স্বামী কা ওর দেখকর করুণা পুছা, "দো দিন ঘর নংহী আয়া, ক্যা শরীর খারাপ থা? যদি ন আনে সকো তো খবর ভিজউয়া। ম্যায় প্রতীক্ষা মেং বৈঠ রহতা হুং।"

প্রচলিত হিন্দতে ইহার অনুবাদঃ—

নরেশকে জানেকে আধ ঘণ্টে বাদ করুণাকে স্বামী জগৎ প্রসাদ নে ঘরমেং প্রবেশ কিয়া। উনকা আঁখেং লাল থীং। মুংহসে শরাব কী বু আ রহী থী। জলতী হুঈ সিগারেটকো এক ওর ফেংকতে হুএ ওয়ে কুরসী খংীচকর বৈঠ গয়ে। সন্ত্রস্ত হরিণী কী তরহ পতি কী ওর দেখতে হুএ করুণা নে পুছা, "দো দিন তক ঘর নংহী আএ, ক্যা তবিয়ৎ খরাব থী? যদি ন আয়া করো তো খবর ভিজওয়া দিয়া করো। ম্যায় প্রতীক্ষা মেং হী বৈঠী রহতী হুং।"

যাঁহারা হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন তাঁহাদের নিকট প্রথম অনুচ্ছেদটি বুঝিতে বা লিখিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি লিখিতে গেলে তাঁহাদিগকে 'নে' বিভক্তির প্রয়োগ জানিতে হইবে, প্রবেশ, আঁখ, বু, সিগারেট তরহ ওর, তবিয়ৎ শব্দগুলি যে স্ত্রীলিংগ তাহা জানিতে হইবে। অথচ লিংগের এই কৃত্রিমতার জন্য ভাষা জটিল হইয়া উঠিয়াছে তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। সংস্কারমুক্ত শক্তিশালী সাহিত্যিক ভিন্ন রাষ্ট্রভাষার এই মুদ্রাদোষ কেহ দূর করিতে পারিবে না।

সত্যি ভ্রমণকাহিনী

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

[পূর্বানুবৃত্তি]

৯

আসল মুসিয়ো দুবরায়েক চিনতে বিশেষ দেরী লাগে না। জমিদার বাড়ীর ছেলে। বেশ দিলদরিয়া মেজাজ। সাতে পাঁচে থাকেন না। ছাপার অক্ষরের উপর বিরাগ; খবরের কাগজখানা পর্যন্ত পড়েন না। নিজেই কথায় কথায় বললেন যে ভাল নাচতে পারেন তিনি। "তবে বুঝলেন, ও পর্ব শেষ করে দিয়েছি ভিয়েনা ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। চুলে পাক ধরবার পর আবারও! সে সর্বদিন আর আসবে না। দেহ আর মনের মধ্যে, ঐ যে আপনাদের কি বলে না—অসহযোগ আন্দোলন—তাই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আর এখন নাচ!"

তবে তিনি এখনও ঘোড়দৌড়ের খবর রাখেন। তাঁর সঙ্গে দুদিন গল্প করলেই যে কোন লোক বুঝতে পারে, যে তিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয় করেন রোগকে; আর সব চাইতে ভালবাসেন রোগের গল্প করতে। নিজে ভ্যাগাবণ্ড বলেই বোধহয় লেখকের ভবঘুরে লোকদের উপর একটা স্বাভাবিক অনুরাগ আছে। তেমনি তার কপালে জুটেও যায় একজন না একজন। এখানে ভারতবর্ষের লোকদের এড়িয়ে চলবার সংকল্প কোথায় ভেসে যায়; বিদেশে অসুখ আছে, বিসুখ আছে; হাজার হলেও নিজের দেশের লোক; তার সঙ্গে যেমন প্রাণ খুলে দুটো বাংলাতে কথা বলা যায়, তেমন করে কি বিদেশীদের সঙ্গে বলা চলে।

তাই প্যারিসে ফিরবার দিন থেকে মুসিয়ো দেবরায়কে আগেকার চেয়ে আপন মনে করবার চেষ্টা করে লেখক।

খুব নিয়মিতভাবে ভোরে উঠেই সে ক্লাসে যাওয়া আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যাবেলা অ্যানি কাজ সেরে চলে যাবার পর সে ফেরে—চায় না সে আর এইসব যার তার সঙ্গে আলাপ করতে—হোটেলের বাইরে তার বহু আলাপী লোক আছে। কাফেতে গিয়ে শুধু একবার বসতে পারলে হল। তাছাড়া নিয়মিত রুটিনের ক্লাসগুলো করলে, বাজে নষ্ট করবার মত সময় কই তার হাতে?

প্রথম দুই তিন দিন মুসিয়ো দেবরায়কে মন্দ লাগেনি। মুসিয়ো দেবরায় অনবরত বলেছেন যে লেখকের মত ভাল লোক তিনি এর আগে দেখেননি—সারা জীবন ধরে এত দেশের, এত জাতের লোক তো তিনি দেখেছেন। অর্থাৎ তাঁর রোগের গল্পের এমন সংবেদনশীল শ্রোতা তিনি এর আগে পাননি। দুই রাত্রি রেস্তোরাঁতে এক টেবিলে খাওয়ার অন্তরঙ্গতায় তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সব খুঁটিনাটি লেখককে জানিয়ে দিলেন। তিনি ঘুম থেকে ওঠেন বেলা এগারটায়। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একবার যান টমাস কুকের ওখানে, চিঠির খোঁজে। তারপর তাঁর নিয়মিত কাজ থাকে ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে, স্নানাগারে—তবে রেসকোর্সে কখনও সপ্তাহে দুই দিনের বেশী নয়—কখনও না—এই একটা পয়েণ্টে তাঁর স্থির মত আছে—ওসব যত বাড়াবে তত বাড়ে।

তিন দিনের মধ্যে লেখক জেনে গেল, তাঁর গল্প কোন কথা দিয়ে আরম্ভ হয়, আর কোথায় তার পরিণতি। ইউরোপের যে কোন একটা বড় শহরের রাস্তাঘাট, হোটেলের নাম ও ভাল খানার বিবরণ দিয়ে গল্প হয় শুরু। তারপর তিনি বলেন তাঁর স্থির বিশ্বাসের কথা—যে ভারতবর্ষের চেয়ে এইসব শীতপ্রধান দেশগুলিতে রোগের দৌরাত্ম্য কম। তাই যদিও তিনি বছর কয়েক পর পর একবার করে ইণ্ডিয়াতে যান; কিন্তু শীতকাল ছাড়া অন্য সময়ে? নমস্কার মশাই! লক্ষ টাকা দিলেও নয়। তবু কি ইউরোপে বিপদ কম?

এরপর চলবে কতবার তিনি আসন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। লোকের চেহারা দেখে রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা তাঁর অসী
রবিবাবুকে তিনি নাকি একবার ইউরো
দেখেছিলেন—দেখেই তাঁর ধারণা হয়েছি
যে রবিবাবু ফাইলেরিয়াতে ভোগেন—সতি
মিথ্যে ভগবান জানেন। এই রুগী চিনবা
ব্যাপারে তিনি ঠকেছিলেন এক কেব
মোজার্টের দেশ সালজ্‌বুর্গে—একটা হোটেলের ওয়েটারের কাছে—সে মশাই, লম্বা গপ্‌পো—

এসব গল্পের একঘেয়েমি অসহ্য। না শুনিয়ে ছাড়বেন না। রেস্তোরাঁ থেকে উঠেও নিস্তার নেই। হোটেলের দরজার সমুখে শীতের রাতে আধ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে গল্প শুনেও তাঁর রোগের গল্প ফুরনো যায় না অবশিষ্টাংশ শেষ পর্যন্ত পরের দিনের জন্য স্থগিত করতে হয়।

কে বলে মুসিয়ো দেবরায় বেকার লোক? চব্বিশ ঘণ্টা তিনি রোগ তাড়ানোর কাজে ব্যস্ত! তাঁর সঙ্গে কয়েক দিন বেশী মাখামাখি করাটা ভুলই হয়ে গিয়েছে। যাক তবু রক্ষে যে তিনি ঘরে আসেন না। "ভোজন-বিলাসী রেস্তোরাঁতে কয়েকদিন না গেলেই এঁর হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে......রামং রামং প্রতিরামং......

এমনিই মনটা দিন কয়েক থেকে একটু অস্থির অস্থির যাচ্ছে। রেস্তোরাঁর বিলটা প্রত্যহ মুসিয়ো দেবরায় দিয়ে দিচ্ছেন। কিছুতেই লেখককে দিতে দেবেন না। এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়াটা কি ঠিক হচ্ছে? যে জিনিস সে পছন্দ করে না, তাকে কি সেই জিনিসেরই মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে! এবার দিনকয়েক সে রাত্রিবেলা রুটি মাখন পনীর কিনে এনে ঘরেই খাবে। দেখা যাক মুসিয়ো দেবরায়ের হাত এড়ানো যায় কিনা।

তার যত আক্রোশ গিয়ে পড়ে মুসিয়ো দেবরায়ের উপর।

রুটি কিনবার জন্য নীচে নামতেই হোটেলের সদর দরজার কাছে দেখা দেবরায়ের সঙ্গে। যেখানে বাঘের ভয়......

"এই আপনার কাছেই আসছিলাম। চলুন আপনার ঘরে যাওয়া যাক। কোন অসুবিধা করলাম না তো?"

"না না অসুবিধা কিসের?"

ভারি খুশি ভদ্দরলোক, সেই সুইজারল্যাণ্ড থেকে আনা বীজাণুনাশক ওষুধটা ব্যবহার করে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সেই গল্পই আরম্ভ করলেন।

"বড় উপকার করেছেন মশাই ঐ ওষুধটার খোঁজ দিয়ে। কিন্তু শিশিটা ত প্রায় ফুরিয়ে এল। এ পাড়ার সব ডিসপেনসারিতে খোঁজ করেছি। কোথাও পেলাম না মশাই। দেখব কাল ওদিককার দোকানটোকানগুলোতো বড় স্নিগ্ধ গন্ধটা। সুইট্জারল্যান্ড থেকে আনাতে গেলে আবার কোন এক্সচেঞ্জের গোলমাল আছে নাকি?"

"না, মনে ত হয় না সে রকম কিছু আছে বলে", মুসিয়েয়ো দেবরায় আশ্বস্ত হন। এই এক্সচেঞ্জের ব্যাপারটা তাঁকেও বড় বিব্রত করে তুলেছে কিছুদিন থেকে। অসুস্থতার অজুহাতে তিনি এতদিন ভারত সরকারের কাছ থেকে এক্সচেঞ্জ পাচ্ছিলেন।

এতক্ষণে মুসিয়েয়ো দেবরায় আসল কাজের কথা পাড়েন। লেখকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলেন "দয়া করে বার করুন তো মশাই বাঁ পকেট থেকে এই কাগজের প্যাকেটটা।"

টমাস কুক কোম্পানির ভ্রমণের বিজ্ঞাপনের কাগজে জড়ানো মোড়কটা লেখক তাঁর পকেট থেকে বার করে। বিজ্ঞাপনটা লেখকের নজরে পড়ে—"সারস পাখীর বাসার দেশ আলজাস। আসুন, এখানে এসে আলজাসের বিখ্যাত রান্না শুয়োরের মাংস দেওয়া বাঁধা-কপির ঘন্টর স্বাদ নেন।" তার নীচে একখানা ছবি, টালির ছাতওয়ালা বাড়ীর চিমনিতে বকে বাসা বেঁধেছে। এই বকের বাসা দেখবার জন্য টুরিস্টরা ছোটে আলজাসে; আর বহু চেষ্টা করেও এই বকের বাসা দেখতে পাওয়া যায় না; এ অভিজ্ঞতা লেখকের আছে। ছবির নীচে লাল কালি দিয়ে লেখা—প্রথম শ্রেণীর হোটেল—জোড়া বিছানা বারোশ' ফ্রাঙ্ক প্রত্যহ। একটা বিছানা হাজার ফ্রাঙ্ক।

লেখক জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় তাঁর দিকে।

"খুলুন, খুলুন! খুলে ফেলুন কাগজ-খান! ভিতরে চিঠি আছে, ইন্ডিয়ার চিঠি। টমাস কুকের লোকটাই মুড়ে দিয়েছে কাগজ-খানাকে দিয়ে। ইন্ডিয়ার চিঠি এলেই আমি বাঁ পকেটে রাখি—দুটো পকেটকেই খারাপ করতে যাই কেন। দেখুন ত দেখি কোন পোস্ট অফিসের ছাপ"।

"ছাপটা ভাল পড়া যাচ্ছে না—কি একটা বাজার যেন......"

"ইন্ডিয়ার ছাপই অমনি মশাই! আর দেখতে হবে না—নির্ঘাত শ্যামবাজারের চিঠি। আমার মেজদার। তিনি শ্যামবাজার সাইডে থাকেন কিনা। শিয়ালদার উত্তরের জায়গা-গুলো বেশী dangerous। দক্ষিণ কলকাতার চিঠিগুলো পড়ে তবু ভালভাবে বীজাণু-নাশক দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললে কাজ চলে যায়; কিন্তু উত্তর কলকাতার চিঠি পড়বার পর স্নান না করলে মন খুঁতখুঁত করে। কি বলেন"

"তাতো বটেই"।

"Kindly চিঠিখান খুলে পড়ুন ত। মেজদার চিঠি—ওতে কিছু প্রাইভেট নেই।"

পড়ে শোনাতে হল। তাঁর দাদা লিখেছেন গভর্নমেন্ট বলেছে যে, এইবার যে এক্সচেঞ্জ মঞ্জুর হয়েছে তার পরও আবার যদি পেতে হয়, তাহলে একটি মেডিকাল সার্টিফিকেট চাই এবং সেই ডাক্তার ভারতের রাজদূত দ্বারা মনোনীত হওয়া চাই।

"দেখুন আবার কি বিপদে ফেললে! নতুন রাজদূত এখানে কে এসেছে মনে আছে? নেই? যাকগে, পরের কথা পরে ভাবা যাবে। ফেলে দেন চিঠিখানা আপনার বাজে কাগজ ফেলবার ঝুড়িটায়। ঐ বিজ্ঞাপনের কাগজখান দেন দেখি মুড়ে! ওখানার দরকার আছে। আহাঁ-হা ও কি করলেন!"

লেখক অজ্ঞাতে অপরাধ করে ফেলেছিল। বিজ্ঞাপনখানার যে পিঠটা চিঠির সঙ্গে লাগা ছিল, সেই দিকটা উপরে রেখে কাগজখান মুড়েছে।

"যাকগে, ওটা আর আমার পকেটে দিতে হবে না। শুধু একবার ওখানা খুলে ধরুন ত।"

লেখক লক্ষ্য করে যে তিনি লাল কালি দিয়ে অংশটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ডান পকেট থেকে সুইজার-ল্যান্ড থেকে আনা ওষুধের শিশিটা বার করলেন।

"খাওয়া হয়নি ত? চলুন একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।" বেসিনে ওষুধটা দিয়ে হাত ধোয়া হলে, তিনি লেখককে কলটা বন্ধ করে দিতে বললেন;—ওটাকে ছুঁয়ে আর তিনি ধোয়া হাতটাকে নতুন করে বীজাণু লাগাতে চান না। ভাগ্যে সেদিন ধোপদস্ত তোয়ালে ছিল আলনায়।

"প্যারিসে, নিজের ঘরের বাইরে হাতমুখ ধোবার জায়গার বড় অসুবিধে। বের্লিনে এর ব্যবস্থা বেশ। লন্ডনেও কেমন তিন পেনি দিয়ে, সাবান, ঠান্ডাগরম জল, ধোপদস্ত তোয়ালে, সব রেডি পাওয়া যায়! নোংরার হদ্দ মশাই এরা!"

"যা বলেছেন।"

অনুমোদনের আন্তরিকতাটা বাতিকগ্রস্ত দেবরায়ের পর্যন্ত নজর এড়ায় না। তিনি নূতন উৎসাহের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করেন।

তাঁর সঙ্গে খেতে যাওয়ার মানে যে কি তা লেখক জানে। কাছাকাছি প্রতি রেস্তোরাঁতে বাইরে টাঙানো 'মেনু'টি পড়া চাই;—তারপর ভিতরে ঢুকে বিক্রেতাকে ডিশগুলো সম্বন্ধে জেরা করা চাই; অনেক ক্ষেত্রে জিনিসটি তাজা কিনা পরীক্ষা করা চাই। চার পাঁচ জায়গা ঘুরবার পর ফিরে এসে সেই "ভোজনবিলাসী" রেস্তোরাঁতেই বসতে হবে। কারণটা এক একদিন এক একরকম। কোনদিন বলবেন আজ মিষ্টির ডিশে লবঙ্গলতিকা খাওয়া যাক। এইটাই প্যারিসের একমাত্র রেস্তোরাঁ যেখানে আমাদের খিলি লবঙ্গলতিকার ধরণের জিনিস তয়ের করে। কোনদিন হয়ত অন্য একটা কারণ। আসলে তাঁর ধারণা, এখানে খেলে রোগভোগের সম্ভাবনটা একটু কম।

খেতে বসবার পরও কি নিশ্চিন্দি আছে! লেখকের জন্য একটা 'সোল' মাছ ভাজার অর্ডার দিয়ে তিনি বসে থাকেন। লেখক মাছটা খেয়ে তাজা বলে মঞ্জুর করলে তবে তিনি নিজের জন্য অর্ডার দেবেন।

লজ্জায় মাথা কাটা যায় লেখকের, এঁর সঙ্গে এলে। তার উপর আবার কিছুতেই বিলের পয়সা দিতে দেবেন না লেখককে—কয়েক দিনের অভিজ্ঞতায় লেখক তা' জানে। কিন্তু কোন উপায় নেই। এ এক আচ্ছা আপদ তার স্কন্ধে ভর করেছে। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে বীজাণুভীতিটা এঁর একটা সত্যি মানসিক ব্যাধি, তাহলেও সেই বীজাণু-ভরা চিঠিখানা লেখককে দিয়ে খোলাতে বা তার ঘরে ফেলতে তো তাঁর বিবেকে বাধেনি। নিজে কল বন্ধ করলে ধোয়া হাতে বীজাণু লাগবে, আর অপরে করলে তার হাতে লাগবে না নাকি? তারই আনা বীজাণুপ্রনাশক ওষুধটা দিয়ে নিজে হাত ধুলেন, অথচ লেখককে হাত ধুতে অনুরোধ করলেন না। লেখক ধুতো কিনা, সে হচ্ছে আলাদা কথা। আরও তেতো হয়ে ওঠে মনটা।

ডায়েরী

অতীত কতকগুলি স্মৃতির সমষ্টি। ভবিষ্যৎ কতকগুলো আশা নিরাশার একটা সামঞ্জস্য মাত্র। একটু নড়া লাগলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। বর্তমানের সঙ্গে ঝগড়া

না করে উপায় নেই। তাই রূঢ় বাস্তব থেকে লোকে পালাতে চায় অতীতে না হয় ভবিষ্যতে, নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী। ফ্রান্স শান্তি পায় অতীতে পালিয়ে।

বিরাট জাঁকজমক করে সিন নামের এক বিশ্ববিশ্রুত নালার মধ্যে ফরাসী জঙ্গী নাবিকের দল ক্ষিপ্রগতিতে মোটর লঞ্চ চালাবার বাহাদুরি দেখায়। কারুকার্যখচিত সেতুর উপর থেকে প্যারিসিয়ানরা La Marseillaise গেয়ে হাততালি দেয়। সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পারে আরও অনেকগুলো ফ্রান্স আছে, একথা এরা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছে। সেই ফ্রান্সগুলোর প্রদর্শনীতে ইন্দোচীন আর ক্যামেরুনে নিজেদের শৌর্যের নিদর্শনগুলো সাতরঙা আলোর নীচে দেখানো হয়। নেপোলিয়নের যুগের বিশাল জয়তোরণগুলো দেখতে ফরাসীরা অভ্যস্ত। Clemenceauর সময়ের, কবেকার খাওয়া ঘিয়ের গন্ধ হাতে। তাইতেই ভরপুর। গত যুদ্ধে অত দম্ভের ম্যাজিনো লাইনের পতনের পরও সাধারণ ফরাসীর বৃথা আস্ফালন কমেছিল কিনা জানি না। ইতিহাসের সেই অধ্যায়ের কথাটা ফরাসীরা সুনিপুণভাবে চেপে যায়। কথা প্রসঙ্গে সেই সময়ের কোন ঘটনা এসে গেলেই, তারা জার্মানদের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম আন্দোলনের কথাটা পাড়ে। আমেরিকার দৌলতে মুক্তিসংগ্রাম বাহিনী নিয়ে, যে সেনানায়করা প্যারিসে প্রথম ঢুকেছিলেন, তাঁদের নামে প্রত্যহ একটা করে রাস্তার নামকরণ করা হচ্ছে। নিজেদের অপকর্ষজনিত আক্রোশ মিটোবার সবচেয়ে সস্তা উপায়, রাস্তার নাম বদলানো। এ পথ আমাদের জানা। এই 'লিবেরাসিয়' আন্দোলন-এর মর্মর ফলকের ঠেলায় অস্থির ফ্রান্সে। যে মোটর কারখানা জার্মানদের মাল সরবরাহ করেছিল, তার এক এঞ্জিনিয়রের গৃহিণী পর্যন্ত গর্ব করেন যে সেদিন তিনি সাত মাইল হেঁটে প্যারিসে এসেছিলেন। অথচ এরা মার্শাল পেতাঁকে প্রশংসা করে চাপা গলায়। তাঁকে ছাড়ানোর জন্য খোলাখুলি আন্দোলনও আছে। গত মুক্তি আন্দোলনে কে কি কাজ করেছিল, তারই জোরে এখানেও লোকে চাকরি বাকরিতে সুবিধার দাবি করে। এ নিয়ে নীচতা, শঠতা, স্বার্থপরতার কেচ্ছা প্রায়ই কানে আসে। সেই সময়ের কাজের নাম করে অনেক ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা খুলেছে। অনেকগুলোর মেকিপনা পুলিস ধরেও ফেলেছে। যাক্! তবু সান্ত্বনা যে, এ জিনিস আমাদের একচেটিয়া নয়! নিজের তথাকথিত স্বার্থত্যাগ ভাঙিয়ে খাওয়াটা মানবমনের একটি সনাতন বৃত্তি। মা বাপ স্বামী স্ত্রী কেউ এ দুর্বলতা থেকে রেহাই পান না।

আমাদেরই দশা ফ্রান্সের। ভবিষ্যতে চেয়ে অতীতের দিকে বেশী চেয়ে থাকে অতীতের গৌরব নিয়ে এর আস্ফালনের সীমা নেই; হৃত মর্যাদা নিয়ে অনুশোচনার শেষ নেই। নিজের দেশের আগেকার কালের কীর্তিমান পুরুষদের পুজো চলছে

এদেশে বারোমাস—আদিম জাতিদের পিতৃ-পুরুষদের পুজোর মনোভাব নিয়ে। ফরাসীরা র বলতে পারে না। র উচ্চারণ করতে গেলে বেরোয় গলা খাঁকারের খ। রাম নাম নিতে গেলে বলে ফেলবে খাম। তাই বোধহয় এদের স্কন্ধ থেকে এই পুরাণোর ভূত কোনদিন নামবে না।

ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে ফ্রান্সের ধারণা যে মানবসভ্যতার নেতৃত্বের ঠিকা সেই পেয়েছে। ইতিহাস তারপর তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, যে একটা পরিবেশে এ জিনিস সব দেশেই আসতে বাধ্য। কিন্তু এই সাদা কথাটা ফরাসীরা বুঝেও বুঝবে না। তার মানসিক অশান্তির সবচেয়ে বড় কারণ হল, মানব সভ্যতার নেতৃত্বের সিংহাসনে আজ দাবিদার জন্মেছে। ফরাসীরা ইংরাজকে বলে 'বেনে', জার্মানকে' বলে 'বর্বর'। পণ্য উৎপাদনে এদের উৎকর্ষকে তারা কোনদিনই আমল দেয়নি। আমেরিকার বিশাল অর্থসম্পদ ও উৎপাদনশক্তি, ফরাসীর নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে কেন্দ্রচ্যুত করাতে পারেনি। কারণ ফরাসীমনের গর্ব ছিল এর চাইতে উচ্চতর স্তরের জিনিসের। সে নিজেকে মনে করত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার নেতা। মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে সে বুঝছে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে একটা অর্ধ-সভ্য, অর্ধএসিয়াটিক দেশ তাকে হটিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর জনসাধারণের মনের থেকে। ফ্রান্স বলে যে, একটা মরমী আবেদনের নেশায় পড়ে লোকে ভুল করছে; কিন্তু লোকের মন থেকে যে সে সরছে তাতে আর সন্দেহ নেই। তার 'মানবের অধিকার' এর আদর্শে কোথায় যেন একটু ভেজাল মেশানো আছে; এ বিষয়ে তার বিবেকই তাকে খোঁচা মারে অষ্টপ্রহর। তাই এর প্রত্যেক রাজনীতিক দলের প্রোগ্রামে ভবিষ্যতের প্রাচুর্যের আশ্বাস, এবং ফ্রান্সকে বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের মিশনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য কথার কসরৎ।

ফ্রান্স বোঝে যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার ওজনটা আজ ধার করা; আজকের দেশের প্রাচুর্য ভিক্ষালব্ধ। সে মনে মনে বোঝে যে, আজকের বাস্তব জগতে ফ্রান্সের গুরুত্ব তার সংস্কৃতির জন্য নয়। তার দাম সে 'ইউরোপের সিংহদ্বার' বলে; আর তার আফ্রিকা ও সুদূর প্রাচ্যের কলোনিগুলো পরের বিশ্বযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হতে পারে বলে। সকলেই জানে যে, যতই মিটিং করে শান্তিদূতের প্রতীক পায়রা ওড়াও, গর্কি ও রোমাঁ রোলাঁর একসঙ্গে তোলা ফটো বিক্রি কর ফ্রান্সকেই আগামী যুদ্ধের প্রধান আখড়া হতে হবে। কিন্তু ডিমগুলো আস্ত রাখবে আবার ওমলেৎও খাবে তাতো হতে পারে না। সেই জন্য সাময়িকভাবে মনকে প্রবোধ দিতে হয় যে, পশ্চিম ইউরোপের মালপত্র আমেরিকা থেকে আসবার সময় ফরাসী রেলওয়ের প্রচুর লাভ হবে এই কথা বলে।

রাজনীতিক দাবার ছকে নিজেদের স্থানের চেয়েও বড় মান আছে পৃথিবীতে, একথা ফরাসী চিরকাল জানে। মুশকিল হয়েছে যে আজকাল টান পড়েছে সেখানেও। ১৯১৪ সালের পর থেকে ফ্রান্স বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ছয়বার—পোল্যান্ডের লোক মাদাম কুরিকে ধরে। ১৯৩৫ সালের পর থেকে ফ্রান্স মোটেই পায়নি। জর্মানী

পেয়েছে উনচাল্লিশবার আজপর্যন্ত। গত যুদ্ধের পরের এই দুর্দিনেও ইংলণ্ডের চারজন নোবেল প্রাইজ পেয়েছে বিজ্ঞানে। আমেরিকার বর্তমানের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উন্নতির কথা তুললে ফরাসীরা বলে যে টাকার জোর থাকলে সবই করা যায়। কিন্তু ইংলণ্ড জার্মানীর বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের কোন জবাব আছে কি তাদের কাছে? শ্রেষ্ঠত্বের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি হিসাবে, শান্তির ও সাহিত্যের নোবেল প্রাইজের নিরিখ হয়ত খুব নিশ্চিত নয়, কিন্তু বিজ্ঞানের পুরস্কারটার দাবি অস্বীকার করা যায় না।

জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাদের এই আপেক্ষিক অবনতির কথাটা অষ্টপ্রহর ফরাসীদের মনে খোঁচা দেয়। মনের ধরণটা পড়তি বনেদী পরিবারের। হজম করবার ক্ষমতা কমেছে, অথচ খিদে কমেনি। শাল দোশালা বেচে, পুরণো লক্ষ্মীর কাঠার সিঁদুর মাখানো মোহর ভাঙিয়ে, এখন যে-কদিন চলে। লোক দেখানোর জন্য শেষ সম্বল কানাকড়িটা দিয়েও আতশবাজি কিনে পুড়োয়। দেশের বাজেট দেউলে হলেও জাতীয়-নাট্যশালা ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অযথা জাঁকজমকে টাকা খরচ করতে ফ্রান্সের বাধে না। দূর সাগরপারের ফ্রান্সগুলোর প্রদর্শনী হয় ঘটা করে বারোমাস। সেখানে দেখানো হয়, যে রেলগাড়ী প্রথম গিয়েছিল সাহারা মরুভূমির মধ্যে, সেখানাকে। সেখানকার আকাশে দেখানো হয় এরোপ্লেনের কসরত—অবশ্য এরোপ্লেনগুলি বিদেশী। আরও কত জিনিস দেখানো হয়, বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয় সেখানে। কেবল জানানো হয় না, আইভরি-কোস্ট, মাদাগাস্কার ও ভিয়েতনামে কত লোককে নেপোলিয়নের বীর বংশধররা রোজ গুলি করে মারছেন, সেই খবরটা। আর জানানো হয় না যে, Keita Fodeba নামের যে নিগ্রোটির নাচগানে প্যারিস পাগল, তার গানের গ্রামোফোন রেকর্ডখানা কেন সেনিগালে বে-আইনী ঘোষিত করেছে ফরাসী সরকার। অথচ এই গানটিই এতকাল ফরাসী সরকারের দাকর রেডিও থেকে প্রত্যহ বাজানো হত। 'মানবের অধিকার' খোদাই করা শিলালিপিখানাকে এখন লুভ্র মিউজিয়মে তুলে রেখে দিলেই হয়।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরাজয়ের ব্যর্থতার মধ্যে ফ্রান্স শান্তি খুঁজছে একটা ফিকে বিশ্বমানবতার আবরণে। নইলে মানবতার বুলি আর উপনিবেশের মাহাত্ম্য বর্ণন এ দুটো কি এক নিশ্বাসে বলা চলে? লেখায় আর বক্তৃতায় ফরাসীরা মানবসভ্যতার মান ছাড়া, অন্য কোন মাপকাঠির কথা বলে না। এটা পৃথিবীর লোকঠকানোর জন্য নয়, নিজেদের মনকে স্তোক দেবার জন্য। যে মন চুলচেরা বিশ্লেষণ করে, তার শেষপর্যন্ত দরকার হয় কতকগুলো গালভরা কথার ঠেকনার।

বাস্তব থেকে পালানোর রাস্তা খোঁজে ফরাসীরা সব সময়। তাই মলেয়ারের বহু অভিনীত একখান নাটকের নূতন অভিনেতারা কেমন করবেন, তা নিয়ে চিন্তা সমালোচনা, বাদানুবাদের অন্ত নেই। হাল-ফ্যাশনের যজ্ঞশালায় জামার দরজিদের সঙ্গে টুপীর দরজীদের যে নূতন সংঘর্ষটা লেগেছে, তার ফলাফলের জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। সকালে কাগজ খুলবার আগে বুক দুর দুর করে। জামার দল বলছেন যে এ শীতে কালো কাপড় চলবে; 'মিলিনার'রা বলছেন যে, এবার টুপি কালো রঙের চলবে না—অন্য রঙের হবে। কি কাণ্ড বল! বড়দিন চলে গেল, নতুন বছর পড়ে গেল, এখনও একটা নিশ্চিন্ত খবর পাওয়া গেল না। কোন ওয়াকিবহাল কাগজ যতক্ষণ না লিখছেন যে, একটা আপোষের সূচনা দেখা গিয়েছে, ততক্ষণ আর কারও স্বস্তি নেই। এই দুশ্চিন্তা ভুলবার জন্য কাল যেতে হয়েছিল মাদাম দ্যু বারির ব্যবহৃত হাতপাখাগুলির প্রদর্শনীতে, আজ যেতে হবে মাদাম নেকারের নিজের হাতে লেখা নিমন্ত্রণপত্রগুলির এক্‌জিবিশনে।

কিন্তু বাস্তব থেকে পালানো কি এত সোজা?

সব দেশের ছেলেমেয়েদেরই পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে নিজেদের দেশের সম্বন্ধে অনেকগুলো অতিরঞ্জিত কথাকে সত্যি বলে মুখস্ত করতে হয়। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি" এ কথা সবাই শেখে। কিন্তু ফ্রান্সে এ জিনিসটির ধরণ একটু আলাদা। তারা ঈশ্বরকে দেখে আর্টিস্ট হিসাবে—সখা, পতি, বা প্রভু ভাবে নয়। তাই এরা প্রশ্ন করে এমন কলাজ্ঞান, আর কোন দেশের রূপে কলাবিদ ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন কি? দেশের এমন সমবাহু চতুর্ভুজের আকৃতিটা বিধাতার জ্যামিতির জ্ঞানের চরম প্রকাশ। সত্যিই ত! ইউক্লিডের দেশ নীলনদের ব-দ্বীপটা পর্যন্ত মাত্র তিন-কোণা! এমন চৌকো করে, এমন সুন্দরভাবে উঁচুর জায়গায় উঁচু, নীচুর জায়গায় নীচু করে ভগবান আর কোন দেশ সৃষ্টি করেননি। এই সৌন্দর্যের নেশায় তাদের আত্মবিভোর হয়ে থাকতে শেখানো হয় ছেলেবেলা থেকেই। মানব সভ্যতার নেতৃত্ব করবার জন্যই নিশ্চয় ভগবান এ দেশকে এত সুন্দরভাবে গড়েছেন। এই আত্মবিভোর মনোভাব সৃষ্টি করাটা বোধহয় একটা ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার আত্মরক্ষার কৌশল। কিন্তু পচধরা ফলকে এয়ারটাইট টিনে বন্ধ করে লাভ কি? বিশ্বকর্মার পুত্র চামচিকের ফরাসী প্রতিশব্দ 'টেকো ইঁদুর (Chauve Souris)।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞানের কথা

শিশু না বিজ্ঞানী

অমরেন্দ্রকুমার সেন

শিশু না বিজ্ঞানী?

"জনসাধারণ মনে করে পৃথিবীর সার্কাসে আমি নতুন এক অদ্ভুত জীব", হাসতে হাসতে কত সময়ে একথা বলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। কিন্তু জনসাধারণের সকলে আইনস্টাইনকে চেনেই না; নইলে একদিন যখন নিউ ইয়র্কের সিক্সথ অ্যাভিনিউয়ে ভীড় ঠেলে আইনস্টাইনকে যেতে দেখা গেল, কেউ তাকে চিনতেই পারল না। অত ভীড়ের মধ্যে মাত্র একজন লোক তাঁর কাছে এসে যখন বলল, "দেখছেন ত' কেউ আপনাকে চিনতেই পারছে না, কেউ একবার সন্দেহও করে আপনার নামটা পর্যন্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে না।"

কোনো উত্তর না দিয়ে আইনস্টাইন ভীড় ঠেলে আরও একটু এগিয়ে চললেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটিও, বোধ হয় খবরের কাগজের রিপোর্টার, আবার বলল, "কিন্তু যদি হত ল্যানা টার্ণার তাহলে দেখতেন কি রকম ভীড় জমে যেত!"

এবার জবাব দিলেন আইনস্টাইন, "হতে পারে, ল্যানা টার্ণারের হয়ত অনেক কিছু দেখাবার আছে।"

যশ এবং অর্থ, দুটোকেই আইনস্টাইন ঘৃণা করেন এবং এই দুটি জিনিস অর্জন করবার জন্য পাগল হয়ে ওঠেন কত লোক। অথচ এই যশ তাঁর কাছে এসেছে না চাইতেই। যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বৎসর হ'ল তখন তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে দুর্লভ সম্মানে সম্মানিত করলেন; পটস্‌ডামে তাঁর আবক্ষ মূর্তিও স্থাপিত হ'ল এবং দেশের লোকেরা তাঁর প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ একটি সুন্দর গৃহ ও পাল তোলা নৌকা উপহার দিলেন। কিন্তু তারপর আবার তাঁর দেশের ঐ লোকেরাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ও গ্রন্থাগার সব কিছুই বাজেয়াপ্ত করে নিলে, বহু মূল্যবান গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিলে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশ ছাড়া করে ছাড়ল। কারণ তিনি ইহুদি। কিছু বইপত্র এবং তাঁর শখের বেহালাটি নিয়ে আইনস্টাইন বেলজিয়মে আশ্রয় নিলেন এবং সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রে যাবার সময় জাহাজের কাপ্তেন সবচেয়ে ভাল ঘরখানিতে তাঁকে থাকতে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আইনস্টাইন বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা নিতে রাজি হননি।
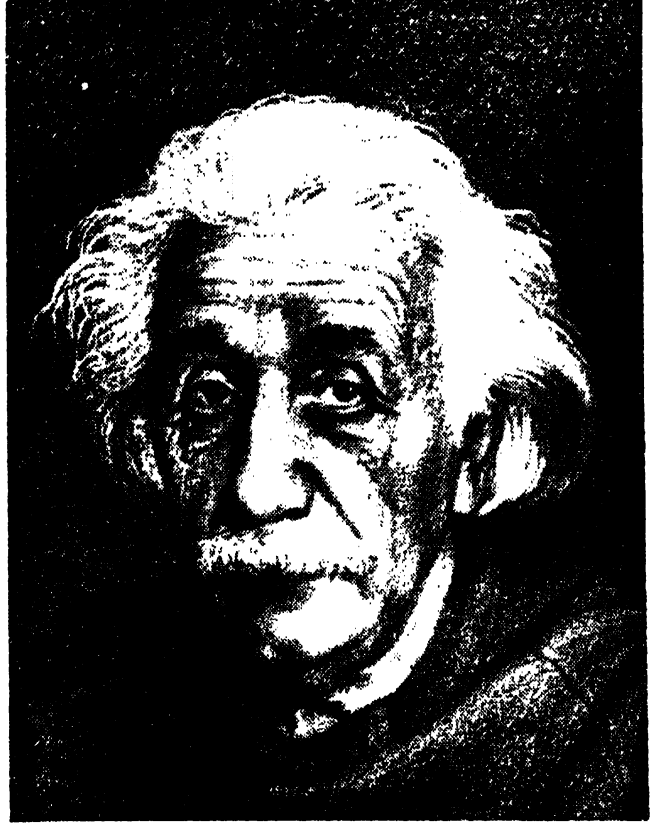
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ পেলেন যারা কেবল তাঁর নামটুকুর সঙ্গেই পরিচিত। তারা চায় তাঁর অটোগ্রাফ, তারা জানতে চায় মার্কিন নারী-সমাজ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কি? হয়ত কেউ তাঁর বেহালা দেখে বেহালায় সিনেমার হাল্কা কোনো সুর বাজাতে অনুরোধ করছিল। একজন যখন বলল, "গ্র্যান্ড হোটেলে বর্ণিত ক্রিংগেলিনের সঙ্গে আপনার সাদৃশ্য আছে" তখন আইনস্টাইন জবাব দিলেন, "আমি ত কখনও ঐ হোটেলে বাস করিনি।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজে তিনি অধ্যাপনা করেন।

অধ্যাপক আইনস্টাইন যখন তাঁর নতুন মতবাদ থিওরি অফ রিলেটিভিটি ঘোষণা করেন তখন তা বুঝেছিল পৃথিবীতে মাত্র বারোজন। অবশ্য তাঁর মতবাদকে বোঝাবার জন্য সেই সময়ে বারোখানিরও বেশী বই লেখা হয়ে গিয়েছিল। একবার একজন সংবাদপত্রের রিপোর্টার, থিওরি অফ রিলেটিভিটিটা কি, দু'চারটি সহজ কথায় জানতে চান। আইনস্টাইন উত্তরে বলেন যে, "একজন সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে বসে যদি একঘণ্টা কথা বলা যায় তাহলে মনে হবে বুঝি মাত্র পাঁচ মিনিট কথা বললুম অথচ একটা গরম চুল্লীর ওপর যদি পাঁচ মিনিট বসে থাকা যায় তাহলে মনে হবে একঘণ্টা বসে আছি। আমার মতবাদে যদি বিশ্বাস না হয় বেশ তাহলে একবার না হয় গরম চুল্লীর ওপর বসেই দেখ।" আমাদেরও আইনস্টাইনের কথা সত্য বলেই বিশ্বাস হচ্ছে কেননা দাঁত তোল্লাতে গেলে ডেণ্টিস্টের চেয়ারে যেন সময় আর কাটতেই চায় না।

আইনস্টাইন ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। বলা বাহুল্য যে সেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী যতদূর সম্ভব ভীড় এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের সম্বন্ধে একটা গল্প শোনা যায়। নিউ-ইয়র্কের বিখ্যাত হোটেল ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়াতে তাঁদের সম্মানার্থে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে এবং টেবলে প্রত্যেক মহিলার সামনে ডিশের ওপর একটি করে আর্কিড ফুল দেওয়া হয়েছে। মিসেস আইনস্টাইন ধরে নিলেন এটা কোনো খাবার জিনিস, এই মনে করে কাঁটা দিয়ে গেঁথে যেই সেটা খেতে গেছেন ভাগ্যিস ঠিক সময়ে পাশের মহিলাটি তাঁর হাত ধরে ফেলেছিলেন।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁদের উইলসন পাহাড়ের ওপর বিখ্যাত মানমন্দির দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বৃহৎ দূরবীণটি মিসেস আইনস্টাইনকে বিশেষ-রূপে আকৃষ্ট করে। তিনি প্রশ্ন করেন যে এত বড় যন্ত্রটা কি কাজে লাগে? তাতে একজন উত্তর দেন যে বিশ্বজগতের আকৃতির একটা হিসেব নেবার জন্যই এই যন্ত্রটি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। উত্তর শুনে মিসেস আইনস্টাইন ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "আমার স্বামী ও কাজটা পুরাতন খামের উল্টো পিঠেই করেন। বস্তুতঃ আইনস্টাইনও বলেন যে, থিওরি অফ রিলেটিভিটি সম্বন্ধে মূল যা কিছু তিনি তা তিনটি পৃষ্ঠার মধ্যে লিখতে পারেন।

শ্রীমতী আইনস্টাইন বলেন যে, "থিওরি অফ রিলেটিভিটি" অবশ্য তিনি বোঝেন না, কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু তিনি বোঝেন, তিনি ঐ থিওরির স্রষ্টা তাঁর স্বামীকে বোঝেন। কোনোদিন হয়ত শ্রীমতী আইন-স্টাইন তাঁর বন্ধুদের চায়ে নিমন্ত্রণ করেছেন, বন্ধুরা সব এসে গেছেন, কিন্তু আইন-স্টাইন তখনও ওপরে বিরাট বিরাট পুস্তক-রাশির মধ্যে গভীর চিন্তায় মগ্ন। বিরক্ত হয়ে উঠলেন আইনস্টাইন তাঁর স্ত্রীর ডাকাডাকিতে, "না, না, নীচে নামব না, আমার এখন কিছুমাত্র সময় নেই। তোমরা বড় গোলমাল কর", কিন্তু স্ত্রী এমন কৌশল অবলম্বন করেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি শিশুর মত নীচে নেমে এসে চায়ের আসরে যোগদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত আড্ডায় এমন জমে ওঠেন যে তাঁর জরুরী কাজের কথা মনে করিয়ে দিতে হয়। তাঁর স্ত্রী জানেন যে, আইনস্টাইনের এই বিশ্রামটুকু অথবা এই চিত্ত বিনোদনটুকু একান্ত আবশ্যক।

শ্রীমতী আইনস্টাইনের মতে তাঁর স্বামী দুটি নিয়ম মেনে চলেন, প্রথমটি হলো কোনো নিয়মই প্রতিপালন কোরো না আর দ্বিতীয়টি হলো কারও মতামতের ওপর নির্ভর কোরো না।

আইনস্টাইনের একটি শোফা আছে, সেটি তাঁর মতে খুব আরামদায়ক কিন্তু একজন সংবাদপত্রের রিপোর্টারের মতে ভারতীয় সন্ন্যাসীদের পেরেকের খাট নাকি আরও আরামদায়ক। কিন্তু কতদিন আইনস্টাইন কতদিন হ্যামলেটকে কোলের কাছে নিয়ে গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। হ্যামলেট হলো তাঁর আদরের কালো বেরালটির নাম। কিন্তু পাড়ার লোকেরা বেরালটির নামকরণ করেছে ক্যাসানোভা। কোথায় হ্যামলেট আর কোথায় হ্যামলেট আর কোথায় ক্যাসানোভা।

এই গল্পটা বোধ হয় আপনার জানা আছে। আইনস্টাইনের পাড়ার একটি ছোট মেয়ে, বোধহয় দশ বারো বৎসর বয়স হবে, কিছুদিন হলো স্কুল থেকে ফিরতে দেরী করে। একদিন তার মা মেয়ের খোঁজ করতে যেয়ে দেখেন যে, মেয়ে আইনস্টাইনের বাড়ীর দরজার সিঁড়িতে তাঁরই পাশে পা ঝুলিয়ে বসে লজেন্স চুষছে আর নির্বিকারচিত্তে দিব্যি গল্প করছে। মা ত' শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, তবুও সাহস সঞ্চয় করে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা প্রফেসর, আপনারা কি গল্প করছেন?' একগাল হেসে আইনস্টাইন জবাব দিলেন এমন কিছু নয় "ও আমার জন্য লজেন্স আনে পরিবর্তে আমি ওর অঙ্কগুলি কষে দি।"

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার একটি মিটিং হয়। সেই মিটিংএ অল্প কয়েকটি কথায় থিওরি অফ রিলেটিভিটি বুঝিয়ে দেবার জন্য আইনস্টাইনকে অনুরোধ করা হয়। আইনস্টাইন তাঁর অক্ষমতা জানান, বলেন অল্প কথায় থিওরি অফ রিলেটিভিটি বোঝানো যায় না। কিন্তু তাঁর পরিবর্তে একজন উৎসাহী নবীন বিজ্ঞানী তাড়াতাড়ি বোঝাতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হলেন, টিকা চেষ্টা করেছিল মূলকে অতিক্রম করতে, তখন আইনস্টাইন বললেন জার্মানিতে একশত জন নাৎসী মতাবলম্বী অধ্যাপক একটি পুস্তকে থিওরি অফ রিলেটিভিটিকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। সত্যই যদি মতবাদটিতে ভুল থাকত তাহলে একশত জন কেন, একজনই ত যথেষ্ট। অধ্যাপক আইনস্টাইনের প্রচ্ছন্ন অথচ সূক্ষ্ম রসজ্ঞান উপভোগ্য।

আইনস্টাইন নাকি অঙ্কে কাঁচা। ইনকম ট্যাক্স অথবা ব্যাঙ্কের হিসেব তিনি বুঝতে পারেন না। একদা বইয়ের দোকানে ইনকম ট্যাক্স গাইড নামে একখানা বই তাঁকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে দেখা গিয়েছিল। দোকানের একজন কর্মচারী যখন প্রশ্ন করলেন যে, ঐ রকম একখানি বই তিনি কিনবেন কিনা তখন আইনস্টাইন জবাব দিলেন, "সর্বনাশ! না, না, ট্যাক্সের পরিমাণ জানতে হলে পুরো একখানা বই পড়তে হবে?"

একবার তিনি বাসে করে কোথায় যেন যাচ্ছেন। কণ্ডাক্টার এসে টিকিট চাইতে তিনি একটি মুদ্রা দেন, কণ্ডাক্টার টিকিটও দিলে এবং সেই সঙ্গে বাকি পয়সা। আইনস্টাইন পয়সাগুলি বার কয়েক গুণে কণ্ডাক্টারকে ডেকে বললেন যে, সে ঠিক পয়সা দেয়নি। কণ্ডাক্টার তখন আইনস্টাইনের হাত থেকে পয়সা নিয়ে নিজে ভাল করে গুণে দেখে আইনস্টাইনকে ফেরৎ দিয়ে বলল, "পয়সা

ঠিকই ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনি সম্ভবত ঠিকমতো গুণতে জানেন না।"

আইনস্টাইন কচিৎ কখনও নতুন জামা-কাপড় পরেন, যদিও বা পরেন তার ইস্ত্রি ঠিক থাকে না; আর টুপি অথবা নেকটাই পরতে তাঁকে কখনও দেখা যায় না। দাড়ি বড় একটা দোকানে যেয়ে কামান না, স্নান করবার সময় বাথটবে বসেই গায়েমাখা সাবান গালে ঘসে দাড়ি কামিয়ে নেন। তিনি বলেন গায়েমাখা ও দাড়ি কামানোর জন্য দু'রকম সাবান ব্যবহার করা মানে দৈনন্দিন জীবনকে অহেতুক ভারাক্রান্ত করে তোলা।

বেলজিয়মের রাণী একবার আইনস্টাইনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন; কিন্তু স্টেসনে তাঁর জন্য যে বহুমূল্য গাড়ী থাকবে এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ যে তাঁকে আনতে স্টেসনে হাজির থাকবে এ কল্পনাও তাঁর মনে স্থান পায়নি। তিনি ট্রেন থেকে নেমে এক-হাতে সুটকেস আর অপর হাতে বেহালার বাক্স নিয়ে সকলের অগোচরে রাণীর প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে অভ্যর্থনা সমিতির মহামাত্যগণ ফিরে এসেছেন, আইন-স্টাইনকে কেউ খুঁজে পাননি। রাণী এবং সকলে মনে করল বুঝি-বা তিনি আসতে ভুলে গেছেন; কিন্তু এমন সময় দেখা গেল যে দু'হাতে দুই বাক্স নিয়ে ধূলি মলিন বেশে অধ্যাপক গেট দিয়ে প্রবেশ করছেন।

রাণী এবং আর সকলে ছুটে গেল, আইন-স্টাইন যেন অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। "একি, আপনি স্টেসনে গাড়ী দেখতে পাননি" রাণী বললেন। মুখ কাঁচুমাচু করে আইনস্টাইন জবাব দিলেন "কৈ না তো? তাতে কি হয়েছে, আমি ত হাঁটতেই ভালবাসি।"

একবার এক মার্কিন পত্রিকা আইন-স্টাইনকে যে কোনো বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে দিতে অনুরোধ করে এবং বলে টাকার জন্য চিন্তা নেই, তারা যে কোনো পরিমাণ টাকা দিতে প্রস্তুত। আইনস্টাইন অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং বলেন যে "আমাকে কি মুভি স্টার পেয়েছ?"

মার্কিন মুল্লুক ও সিনেমা স্টার বলতে আর একটা গল্প মনে পড়ে গেল। আইন-স্টাইন একবার পাম স্প্রিং নামে একটি জায়গায় বেড়াতে গেছেন। তিনি যে হোটেলে ছিলেন সেই হোটেলে জিমি ডুরাণ্টি নামে জনপ্রিয় মুভি স্টারও ছিলেন। একদিন হোটেলের ম্যানেজার জিমিকে বললেন "দেখ, প্রফেসর আইনস্টাইনও এই হোটেলে আছেন এবং সঙ্গে তাঁর নিত্যসহচর তাঁর বেহালাটিও আছে, কিন্তু পিয়ানোর অভাবে তিনি বেহালা বাজাতে পারছেন না, তুমি যদি একটু পিয়ানো বাজাও তাহলে প্রফেসর আইনস্টাইন অত্যন্ত আনন্দিত হবেন।" ডুরাণ্টিও তৎক্ষণাৎ রাজি। সেদিন সঙ্গীতের ইতিহাসে পিয়ানোর এবং বেহালার যে অদ্ভুত সঙ্গতের সৃষ্টি হয়েছিল তার বোধহয় তুলনা পাওয়া যায় না।

পরে জিমি বলেছিল আমি অবশ্য ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতে পারদর্শী নই, সেইজন্য যখনি ভুল হচ্ছিল তখনি অধ্যাপক আমার দিকে এমনভাবে চাইছিলেন যেন ভুলটা ইচ্ছে করেই করেছি। তারপর একটু থেমে একগাল হেসে বললেন, "তবে প্রফেসর আইনস্টাইনও অনেক ভুল করেছেন।"

গত মার্চ মাসে অধ্যাপক আইনস্টাইন ৭২ বৎসর বয়স অতিক্রম করেছেন।

নামে যদি বাদল গুরু গুরু

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জানি জানি যাবে আমায় ছেড়ে
এমন করেঃ কেন শুধুই তবে,
একটি কথা শোনাও বারেবার
সকাল-সন্ধ্যা বেলা—
ভিড় করে হায় আছে যখন
নানা কাজের মেলা।

ছেড়ে যাবে, এতো আমার জানা
বাঁধতে পারি শক্তি কোথায়!
তাই করিনা মানাঃ
—আপন দীনতায়
মোর কবরের স্বপ্ন রচি রাত্রি তমিস্রায়।
অজানা সেই অন্ধকারের ভয়
কখনো হায় চমক লাগায়
কখনো বিস্ময়।

নিবিড় করে পাওয়ার অনুরাগে
যে গান আমার মর্মে আজি জাগে,
সুরের খেলায় যে তার বাঁধা হলোঃ
বলো আমায় বলো—
ছিন্ন তারে খেলবে সে সুর আর?

তবে কেন একটি কথাই শুধু
আজ অবেলায় শোনাও বারেবার।
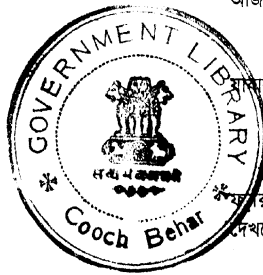
যাবার লগ্ন আসবে যখন—যাবে,
আনন্দ গান নাইবা তখন গা'বে,
তখন আমার যুগল দীপ্ত আঁখি
অন্ধ হবে অশ্রুধারা মাখি—
ফুরিয়ে যাবে যখন আমার পাওয়া
দেখবোনাকো তোমার চলে যাওয়া।

তাইতো বলি কেন শোনাও আর;
যাবার সময় আসেই যদি—আসেই অনিবার,
ভাঙ্গে যদি আমার আকাশ
নামে যদি বাদল গুরু গুরু,
আমার পরাজয়ের গানে
দীপ্ত থেকো সহাস প্রাণে।
আলোর রথে যাত্রা করো সুরু।

নামে যদি বাদল গুরু গুরু।

শ্রীআশুতোষ মিত্র

কালীঘাটের গিরিন হালদার মঠের ভক্ত। তিনি একবার মহারাজকে কয়েকটি সাধুসংগে কালীঘাটে মায়ের দর্শন করিতে এবং তাঁহার বাটীতে মায়ের প্রসাদ পাইতে আহ্বান করে, কারণ সে সময় মায়ের পূজার পালা তাঁহাদের।

যথাসময়ে মহারাজের সংগে আমরা গেলাম। কালীঘাটে পৌঁছিবামাত্র গিরিন হালদারের বন্দোবস্তে আমাদের ধুলাপায়ে মায়ের দর্শনের সকল বন্দোবস্ত পূর্ব হইতেই হইয়াছিল—শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তর একেবারে খালি করিয়া রাখা হইয়াছিল। মহারাজ মায়ের পূজা করিলেন। পূজা করিতে করিতে তাঁহার ভাবান্তর হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু সে ঘোর কাটিয়া গেল। কেবল মন্দির হইতে বাহির হইলে চলিবার সময় তাঁহার পদক্ষেপের তারতম্য ঘটিতে দেখা গেল আর গিরিন হালদারের বাটীতে আসিয়া খানিকক্ষণ নিরবে রহিলেন।

গিরিন হালদারের বাটীতে মধ্যাহ্নে মায়ের প্রসাদ পাইবার পর বিশ্রামান্তে মঠে ফিরিবার উপক্রম করিলে কলিকাতা সংগীত সমাজের মণি বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজা, বিপিন লাহা আদি আসিয়া পৌঁছিলেন। মণি একটি যুবতীকে লইয়া আসিয়া মহারাজের পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া কহিলেন, মহারাজ আশীর্বাদ করুন, যাতে এঁর মতিগতি ভাল হয়।" আমরা যুবতীটিকে না দেখিলেও উঁহার স্বামীর নিকট উঁহার বিষয় কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে মহারাজকে নীরব দেখিয়া আমরা যুবতীটিকে যাইতে বলায় তিনি চলিয়া গেলেন। গিরিন হালদার এবং বাটীর অপরাপর সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় দিলে আমরা সকলে মঠে ফিরিয়া আসিলাম।

হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষ মহাশয় শ্রীঠাকুরের একজন প্রাচীন ভক্ত এবং নিজ বাটীতে প্রতি বৎসর ঠাকুরের উৎসব করেন। ঐ উৎসবে একবার মহারাজের সংগে আমরা গিয়াছিলাম। মঠ হইতে কৃষ্ণলাল গিয়া ঐ উৎসবে শ্রীঠাকুরের পূজা করেন।

নবগোপাল বাবুর পরিবার একটি ভক্ত পরিবার। সবকয়টি পুত্রই ভক্ত—একজন ত পরে মঠে সাধু হইয়া যান। নবগোপাল বাবু রামকৃষ্ণপুরকে একটি ভক্তস্থান করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বাটী হইতে বাহির হইবামাত্র গ্রামস্থ বালক বালিকারা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া করতালি দিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ', 'জয় রামকৃষ্ণ' রবে নাচিত আর তিনি অফিসই যান বা যেথায়ই যান, তাঁহার পথরোধ করিয়া এতটা আয়ত্ত করিয়া ফেলিত যে, অবশেষে তাঁহাকে তাহাদের সংগে শ্রীঠাকুরের নামে নাচিতেই হইত এবং কিছু পয়সা তাহাদিগকে দিতেই হইত। কখন বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া তাহারা নাচিত ও পয়সা আদায় করিয়া ছাড়িত। তাঁহার বাটীতে উৎসবাদি হইলে ঐ বালক বালিকারা আহূত হইত এবং তাহাদিগের মধ্যে শ্রীঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করিতে হইত।

এই উৎসবের দিন ঐ সব বালক-বালিকারা বাটী ঘিরিয়া ঠাকুরের নাম গাহিতে গাহিতে নাচিতে থাকিল। কলিকাতা এবং পার্শ্বস্থিত স্থানাদি হইতে ভদ্রলোকেরাও আহূত হইয়া বৈঠকখানায় উপবেশন করিলেন। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রেরও আবির্ভাব হইল। তাঁহাতে ও মহারাজে আলাপ হইবার পর বৈঠকখানায় গীত-বাদ্য হইতে থাকিল। যাঁহারা গাহিতে ও বাজাইতে থাকিলেন, তাঁহারা আমাদের পরিচিত নহেন। গীত-বাদ্য হইতেছে, এমন সময় মহারাজ, গিরিশচন্দ্র ও আমাদের প্রসাদ পাইবার জন্য আহ্বান আসিল। যখন আহ্বান আসিল, তখন গায়ক গিরিশচন্দ্রের একখানি গান—

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে;
যেখানে যাই, সে যায় পাছে,
আমায় বলতে হয় না জোর করে।
মুখখানি সে যত্নে মুছায়,
আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁ
কত রাখে আদরে।
আমি জানতে এলেম তাই,
কে বলে রে আপন রতন নাই,
সত্যি মিছে দেখ না কাছে,
কচ্চে কথা সোহাগ ভরে॥"

গাহিতেছিলেন। আমরা একটু অপেক্ষা করিয়া গানখানি শুনিয়া গেলাম। আবার প্রসাদ পাইয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখনও সেই গায়ককে গিরিশচন্দ্রের অপর একখানি গান গাহিতে শুনিলাম—

আমায় বড় দেয় দাগা।
সারা রাত কি পাগলা নিয়ে
যায় গো মা, জাগা;
সারা রাত্রি সিদ্ধি বাটি,
ভুতে খায় মা বাটি বাটি,
বলব কি বল, বোঝে না মা,
তার ওপর মিছে রাগা।
কাছে এসে ছাই মেখে বসে,
মরিগো মা ফণীর তরাসে।
কেমন ক'রে ঘর করি মা,
নিয়ে এই ন্যাংটা নাগা?

খানিকক্ষণ পরে নবগোপালবাবু আসিলে গায়ক উঠিয়া মহারাজকে এবং গিরিশচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা বিদায়সূচক বাণী দিলে আমরা সকলে উঠিলাম। নবগোপাল বাবু গাড়িগুলির দ্বারে আসিয়া বিদায় দিলেন। মহারাজ গিরিশচন্দ্রের গাড়িতে উঠিলেন। আমরা পরের গাড়িতে উঠিলাম। মহারাজ ও আমরা গিরিশচন্দ্রের বাটীতে আসিলাম। সেখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া বাগবাজার অন্নপূর্ণা ঘাটে আসিয়া একখানি নৌকাযোগে মঠে ফিরিলাম।

গিরিশচন্দ্রের বাটীতে মহারাজের এবং গিরিশচন্দ্রের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয় তন্মধ্যে যেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহা এখানে দিতেছি। কথাগুলি স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) বিষয়ে। গিরিশচন্দ্র বলেন—"ও (স্বামীজী) যে আমেরিকা জয় করে ফিরবে—এ আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু ঠাকুর ওকে দিয়ে যে কাজ করিয়েছেন, তা দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি। ও যে কতকগুলো সাহেব-মেমকে চেলা করে দেশে

য়ে আসবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি— দেখে ঠাকুর যে আমার বিশ্বাসের কত শংসা করতেন, তাও হার মেনেছে। ামীজী দেশে ফিরে এলে আমি তার ায়ের ধুলো জোর করে নিয়ে বলেছি যে, মি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছ! সত্যি-তিাই ঠাকুর তোমায় আমাদের সকলের াতা করেছেন!" এ প্রকারের কথা পরে ামাদের মধ্যেও কয়েকবার বলিয়াছেন।

লেখক কনখলে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার র কতকগুলি স্থানীয় ভদ্রলোকের উৎসাহে চেষ্টায় একটি পাঠশালা খুলিলে মহারাজ ারদীয়া পূজার প্রারম্ভে সেখানে যান এবং একদিন পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়া লেখককে পূজার কয়দিন সেবাশ্রমে চণ্ডী-পাঠ করিতে আদেশ করেন, কিন্তু উহার পূর্বে একদিন তাঁহার সম্মুখে কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনাইতে বলেন। তাঁহার আদেশানুসারে একদিন তাঁহার সম্মুখে একটি স্তব পাঠ করিয়া শুনাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ পাঠের একখানি চণ্ডী দান করিয়া 'পূজার সময় উহা হইতে পাঠ করিতে বলেন।

চণ্ডী পাঠের বিষয় যখন উঠিয়াছে, তখন ঐ বিষয়ে কিছু বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। মঠে পূর্বে চণ্ডীপাঠ হইত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীমা উহা বন্ধ করাইয়া দেন। তাঁহার আজ্ঞায় কিছুকাল বন্ধই থাকে। তাহার পর শ্রীমা পুনরায় আসিয়া শ্রীঠাকুরের দ্বাদশটি অন্তরঙ্গের অন্যতম হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দের) পাঠ শুনিয়া 'হরি পাঠ করতে পারে' বলিয়া পুনরায় পাঠের অনুমতি দেন। তদবধি পাঠ হইতেছে। আবার শ্রীমার পৈত্রিক ভিটায় জয়রামবাটীতে প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। এক বৎসর ঐ পূজার সময় তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হয়। সে বৎসরে লেখককে পূজার জিনিস-পত্রসহ পাঠান এবং পূজার সময় চণ্ডীপাঠ করিতে বলিয়া দেন। সে তাঁহার আদেশ মত তথায় পাঠ করিয়াছিল।

যথাসময়ে কনখল সেবাশ্রমে কলিকাতা হইতে ভক্তেরা শ্রীদুর্গা প্রতিমা লইয়া আসেন এবং কয়দিন ধুমধামের সহিত মহারাজের উপস্থিতিতে পূজা হয়। মহারাজ উত্তরীয়-রূপে নিজ পরিধানের একখানি মান্দ্রাজী চাদর আশীর্বাদস্বরূপে লেখককে দান করেন। সে সেই উত্তরীয়খানি গায়ে দিয়া চণ্ডীপাঠ করে।

বিসর্জনের দিন মহারাজকে কেন্দ্রস্বরূপে লইয়া আমরা নিম্নোদ্ধৃত গানটি গাহিতে গাহিতে দেবীর নিরঞ্জন করি—

"শ্রীদুর্গা নাম ভুল না
শ্রীদুর্গা স্মরণে, সমুদ্র মন্থনে,
বিষ পানে বিশ্বনাথ ম'ল না॥
যদ্যপি কখন বিপদ ঘটে
শ্রীদুর্গা স্মরণ করগো সংকটে,
তারায় দিয়ে ভার, সুরথ রাজার
লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেল না।
বিশু[illegible] এক রাজার ছেলে,
যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে,
আসিবার কালে সমুদ্রের জলে,
ডুবেছিল, তাতে (তার) মরণ হলো না॥"

মহারাজ ভাবে মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন—সে দৃশ্য আজও মনে আছে।

মহারাজের সঙ্গে একবার মাহেশের রথ দেখিতে যাই। ঐ রথের মালিক, শুনিয়াছি, শ্যামবাজারের কৃষ্ণচন্দ্রবাবুরা। ইঁহারা শ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের আত্মীয়। মাহেশে কৃষ্ণবাবুদের বাটী আছে। আমরা তাহাতে গিয়াই উঠি। কৃষ্ণবাবুও আসিয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহার এবং অপরাপরের সঙ্গে বেশ স্ফূর্তিতে কাটাইতে থাকেন। এই স্ফূর্তির ভিতর তাঁহার ভাবের উদ্রেক হয়। তখন তিনি তাঁহার সেই কোমল কণ্ঠে ভাবে মত্ত হইয়া গাহিতে থাকেন—

"জগন্নাথ দরশনে চল চিতরে
আসিতে হবে না তোরে আর ফিরে।
মন চল তথা, যথা পরম পিতা,
প্রাণ ব্যাকুল সদা হেরিতে তাঁরে॥"
ইত্যাদি।

মহারাজের গাহিতেই শ্রীজগন্নাথের রথোপরি আগমন হইল। সকলে আনন্দিত হইয়া রথরজ্জু টানিতে গেলেন। মহারাজ সর্বপ্রথম টান দিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরাও টানিলাম। তখন সকলের শ্রীপ্রভুর সমীপে কি আনন্দ! সে-আনন্দ ব্যক্ত করা যায় না। অবশেষে এমন হইল যে, মহারাজের শরীর রক্ষার্থে তাঁহাকে ধরিয়া বাটীতে আনিতে হইল এবং ঠাকুরের নাম করিতে করিতে কিছুক্ষণ বাদে ভাবের উপশম হইল। স্বাভাবিক অবস্থায় আসিবার পূর্বক্ষণে জলপান করিতে চাহেন। তাঁহাকে পান করাইয়া বাতাস করিতে থাকিলে তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহেন।

মহারাজের একবার অসুখ হওয়ায় মঠ হইতে বলরাম মন্দিরে (৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে) ডাক্তার সণ্ডার্স সাহেবের চিকিৎসাধীনে আনিয়া রাখা হয়। অসুখটা মস্তিষ্কের বলিতে পারা যায়—একমাত্র ভগবদ্বিষয় ব্যতীত কোন সাংসারিক বিষয় ভুল হইয়া যাইত—কি বলিতে কি বলিতেন, তাহার ঠিক থাকিত না। আমাদের সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইত—কি জানি, কখন শরীর ছাড়েন? কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় এ-যাত্রায় টাল সামলাইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে একদিনের কথা বেশ মনে আছে। সেদিন 'বসুমতী' স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশ আদি ভক্তদিগকে লইয়া মহারাজ কৌতুক করিতেছিলেন। কৌতুক করিতে করিতে অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গাহিতে থাকেন—

"যাইব সাগরে (আমি) আশা নাইরে
তোমারে আশীষ করিয়ে" ইত্যাদি।

গান শুনিয়া আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইল। সে-টালও কাটিয়া গেল। •বালকের ন্যায় তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতে হইল।

চক্রদত্ত

আমরা এতদিন পৃথিবীর বড় উড়ো-জাহাজের কথাই শুনে এসেছি—কিন্তু উড়ো-জাহাজ যে কত ছোট আকারের হতে পারে তার খবর আমরা খুব বেশী রাখি না। বর্তমানে রেমণ্ড স্টিট্স্ বলে এক ভদ্রলোক পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র উড়ো-জাহাজ তরী করেছেন। এটার ডানার একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত মাপ ৯ ফিট ৫ ইঞ্চি; আর লম্বায় ১১ ফিট ৪ ইঞ্চি, ওজন হচ্ছে

রেমণ্ড সাহেব তার ক্ষুদে উড়ো জাহাজের চালকের আসনে দাঁড়িয়ে আছেন।

৩৯৮ পাউণ্ড। এতে ৭৫ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন লাগান আছে। ঘণ্টায় এর গতি ১৫০ মাইল পর্যন্ত। মাটি থেকে আকাশে উঠতে এর মাত্র ৪০০ ফিট্ জায়গার দরকার হয়। আকাশে ১৮০০ ফিট ঊর্ধ্বে যেতে পারে।

*

ব্লাডপ্রেশার যন্ত্র দিয়ে ডাক্তারা আমাদের শরীরের ব্লাডপ্রেসার বা রক্তের চাপ মাপেন। ডান হাত কিম্বা বাঁ হাতের ওপরের অংশে এই যন্ত্রটা লাগিয়ে রক্তের চাপ মাপা হয়। কিন্তু সবচেয়ে মজা হচ্ছে যে রক্তের চাপ কিন্তু দু হাতে দু রকম হতে দেখা যায়। দেখা গেছে যে প্রত্যেক তিন জনের মধ্যে দু'জনের রক্তের চাপ দুহাতে দুরকম। আর এই চাপ বাঁ হাতের চেয়ে ডান হাতে বেশী। ডাক্তাররা বলেন যে, মানুষের দু'হাতে ধমনী, শিরা আকৃতিতে কিছু কিছু তফাৎ থাকার দরুণ রক্ত চালাচলেরও পার্থক্য হয় বলেই রক্তের চাপ দু'রকম হয়।

*

আলু চাষের জন্য আলুর বীজ সব সময় আলাদা করে রেখে দিতে হয়। চেকো-শ্লাভোকিয়ার এক কৃষি গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই আলুর বীজকে যদি কোল গ্যাস দিয়ে শোধন করে রাখা যায় তা হলে ঐ আলুর বীজ থেকে বড় জাতের আলু এবং বেশী ভিটামিনযুক্ত আলু পাওয়া যায়।

*

প্রাণীর মধ্যে আকৃতিতে তিমিই হচ্ছে সবচেয়ে বড়। অনেক সময় তিমি লম্বায় ১০৮ ফিট আর ওজনে ১১৫ টন পর্যন্ত হয়। দশজন লোক এর মুখের ভেতর স্বচ্ছন্দে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সব চেয়ে মজা হচ্ছে যে, এত বড় একটা প্রাণী কিন্তু তার গলার নলী মাত্র ৯ ইঞ্চি চওড়া। আর এই কারণেই তিমি ছোট জাতের চিংড়ি খেয়ে জীবনধারণ করে।

*

একজন সাধারণ মানুষের ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৩,০০০ গ্যালন হাওয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য দরকার হয়। এর ওজন প্রায় ৩০ পাউণ্ড।

*

দেখা গেছে যে শিশু অথবা ছোট ছোট ছেলেদের 'একজিমা' হয় বাপ মায়ের মাথার খুস্‌কি থেকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মানুষের মাথার খুস্‌কি থেকে যদি এদের সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা যায় তাহলে এদের একজিমা একবারে সেরে যায়।

*

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঠাণ্ডা জায়গা হচ্ছে সাইবেরিয়ার Verkh—oyansk। এখানে প্রায় শূন্য ডিগ্রীর ৮০ ডিগ্রী নীচে পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়। এখানকার লোকেরা যখন নিশ্বাস ফেলে তখন মনে হয় যেন এদের নাক থেকে কোন রকম সাদা গুঁড়ো ঝড়ে পড়ছে।

*

যুদ্ধের সময় গ্যাস মুখোসের প্রয়োজন হয় খুব বেশী। কারণ যুদ্ধের সময় গ্যাসের সাহায্যে যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। প্রত্যেক জাতই চেষ্টা করে যে কি প্রকার উন্নত ধরণের হালকা গ্যাস মুখোস তৈরী করা যায়। বর্তমানে আমেরিকায় এই

ডানদিকে পুরোন আর বাঁ দিকে নতুন গ্যাস মুখোস দেখা যাচ্ছে

গ্যাস মুখোসকে যথেষ্ট সহজ করা হয়েছে। ছবিতে ডানদিকে আগেকার গ্যাস মুখোস আর বাঁদিকে বর্তমানের উন্নত ধরণের গ্যাস-মুখোস দেখা যাচ্ছে। নতুন ধরণের মুখোসের সুবিধা হচ্ছে যে, শ্বাসপ্রশ্বাসের থলি মুখের মুখোসের সঙ্গে লাগান থাকে। আগের মুখোসের মত বুকের সামনে লাগান থলি থেকে নল দিয়ে নেবার দরকার হয় না।

*

জুন থেকে আরম্ভ করে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী গরম জায়গা হচ্ছে লোহিত সাগর। এইসময় এখানে জলের তাপ থাকে প্রায় ৯৪ ডিগ্রী।

*

বর্তমানে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু প্রাণী হচ্ছে গ্যালাপেগো দ্বীপের কচ্ছপ। এদের অনেকেরই বয়স হচ্ছে ৩০০ থেকে ৪০০ বৎসর পর্যন্ত। কচ্ছপগুলো লম্বায় প্রায় ৪ ফিট এবং ওজনে হচ্ছে প্রায় ৫ মণ ৫ মণ।

প্রাচীন ভারতের বিচারালয়ে দিব্য ও শপথবিধান

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ ঋষিগণের স্মৃতি-সংহিতার ব্যবহারকাণ্ডে প্রাচীন ভারতের ধর্মাধিকরণের বিচারপ্রণালীর যে নমুনা দেখিতে পাই, আজকালকার আদালতেও প্রায় সেইভাবেই বিচার চলে। কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও অনেকাংশেই সাম্য আছে।

আমাদের দেশে পাঁচশত বৎসর পূর্বেও বিচারালয়ে দিব্যবিধানের প্রচলন ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সেই সকল প্রথা নাই বলিলেও চলে। উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি না থাকিলে প্রাচীন কালের বিচারকগণ প্রতিবাদীকে নানাভাবে পরীক্ষা করিতেন। সেইগুলি একপ্রকার ধর্ম-পরীক্ষার মধ্যে গণ্য। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে প্রতিবাদী জয়লাভ করিতেন, আর অনুত্তীর্ণ হইলে পরাজিত হইতেন।

বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ ঋষিগণ এই শ্রেণীর নানাবিধ পরীক্ষার কথা বলিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের দিব্যতত্ত্বে এই আলোচনা বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে। এইপ্রকার পরীক্ষার নামই দিব্যবিধান। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে বিচার করিতে হইলে সাক্ষী, লেখ্য (দলিলপত্র) প্রভৃতির অভাব ঘটিলে দিব্যবিধানের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধেও দিব্যবিধান চলিতে পারে। সাক্ষ্য প্রমাণাদি থাকিলেও যদি কোন ব্যক্তি দিব্যবিধানে অভিযোগ খণ্ডন করিতে চান, তবে তাহাকে সেই সুযোগ দিতে হইবে।

তুলা, অগ্নি, জল, বিষ ও কোষ—এই পাঁচ প্রকার দিব্যের ব্যবস্থা ছিল। তদ্‌ব্যতীত তণ্ডুল, তপ্তমাষ, ফাল এবং ধর্মদিব্য নামে আরও চারিপ্রকার দিব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পূর্বাহ্নে এই পরীক্ষার বিধান। শনিবার, মঙ্গলবার, অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথি দিব্য-পরীক্ষায় নিষিদ্ধ। শুক্রাস্ত, অষ্টমস্থ রবি, অশুদ্ধ বৃহস্পতি, জন্মতারা প্রভৃতিতেও নিষেধ করা হইয়াছে। চৈত্র, বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ মাস দিব্যপরীক্ষার প্রশস্ত সময়। তুলা পরীক্ষা সকল ঋতুতেই হইতে পারে, শুধু ঝড় বা দ্রুত বায়ুপ্রবাহকালে নিষিদ্ধ। বর্ষা, হেমন্ত ও শীত ঋতু অগ্নিপরীক্ষার প্রশস্ত কাল। শরৎ ও গ্রীষ্মে জলদিব্য, হেমন্ত ও শীতে বিষদিব্য পরীক্ষা করিতে হয়। কোষদিব্যে কালের কোন নিয়ম নাই।

স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, ব্রাহ্মণ ও রোগীর পক্ষে তুলাদিব্য; ক্ষত্রিয়ের অগ্নিদিব্য, বৈশ্যের জলদিব্য এবং শূদ্রের বিষদিব্যের ব্যবস্থা দেখা যায় যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদের স্মৃতিগ্রন্থে।

অতিপাতক, মহাপাতক প্রভৃতি পাপে যাহারা লিপ্ত তাহাদের দিব্যপরীক্ষায় অধিকার নাই। মধ্যস্থ নির্দোষ কোনও পবিত্র ব্যক্তির দ্বারা তাহাদের দিব্যপরীক্ষা হইবে।

লৌহশিল্পী কর্মকারের অগ্নিপরীক্ষা চলিবে না। জলজীবী ধীবরাদির জলদিব্য, মুখরোগীর তণ্ডুলদিব্য এবং শ্বিত্ররোগী অন্ধ ও কুনখীর অগ্নিদিব্য নিষিদ্ধ।

অর্থ সম্বন্ধে বিবাদ ঘটিলে আড়াইশত টাকার কম হইলে দিব্যপরীক্ষা করিবার নিয়ম নাই। রাজদ্রোহের অপরাধে সকল অবস্থাতেই দিব্যবিধান চলিতে পারে।

তুলাবিধি

দিব্যপরীক্ষার্থী বিচারের পূর্বদিবস সংযম পালন করিবেন। প্রাড়্‌বিবাক্ বা প্রধান বিচারক যথাশাস্ত্র নবগ্রহ হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমাপনান্তে ইন্দ্র বরুণ প্রমুখ দেবতার পূজা করিবেন। অতঃপর তুলা-যন্ত্রকে মন্ত্রপূত করিতে হইবে। মন্ত্রটির অর্থ এই—'হে তুলে, তুমি দুরাত্মগণের পরীক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মার দ্বারা নির্মিত হইয়াছ। তুমি স্বয়ং ধর্মস্বরূপ, সকল প্রাণীর সুকৃত ও ও দুষ্কৃতবিষয়ে অভিজ্ঞ। এই ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তোমার পরীক্ষায় আপন নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চান। তুমি অনুগ্রহ করিয়া ইহার দোষগুণ সম্বন্ধে আমাদের সংশয় অপনোদন কর'। অভিযুক্ত ব্যক্তিও তুলার নিকট এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া তুলাদণ্ডের একদিকে আরোহণ করিবেন। অপর দিকে সমমান পাষাণখণ্ড দিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ওজন করার পর তাহাকে নামান হইবে। অতঃপর প্রাড়্‌বিবাক্ একখানি পত্রে অভিযোগের বিষয় লিখিয়া অভিযুক্তব্যক্তিকে শোনাইবেন। এবং তাহার মাথায় সেই পত্র-খানি স্থাপন করিবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিবেন—'হে তুলে, তুমি সত্যের আবাস, তুমি দেবনির্মিত যন্ত্র। হে কল্যাণি, সত্য প্রকাশ করিয়া আমার প্রতি লোকের সন্দেহ দূর কর। আমি যদি যথার্থই অপরাধ করিয়া থাকি তবে আমাকে প্রতিমান পাষাণাদি অপেক্ষা নিম্নগামী কর, আর নিষ্পাপ হইলে আমাকে উর্ধ্বগামী কর'।

এই মন্ত্র পাঠের পর প্রাড়্‌বিবাক্ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্বমুখী করিয়া তুলাযন্ত্রে আরোহণ করাইবেন। পাঁচ পল সময় তাহাকে যন্ত্রোপরি রাখা হইবে। প্রতিমান অপেক্ষা ঊর্ধ্বগামী হইলে অভিযুক্তকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিতে হয় এবং সমমান হইলে অপরাধের স্বল্পতা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। প্রতিমান অপেক্ষা অধোগত হইলে অথবা তুলাযন্ত্রের কোন অঙ্গের বিনাশ ঘটিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

অগ্নিবিধি

আপনার বেদবিহিত গৃহোক্ত বিধানে প্রাড়্‌বিবাক্ পরীক্ষাভূমির দক্ষিণদেশে অগ্নি-স্থাপন করিয়া সমন্ত্রক অষ্টোত্তর শত আহুতি প্রদান করিবেন। অতঃপর পরীক্ষার্থ আহৃত সমতল একটি লৌহপিণ্ডকে সেই মন্ত্র-সংস্কৃত অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া পরে জলে নিমজ্জিত করিতে হইবে। দুইবার এইরূপ করার পর পুনরায় লৌহপিণ্ডটিকে অগ্নি-তপ্ত করিয়া অভিমন্ত্রণ করিতে হয়। মন্ত্রার্থ—'হে অগ্নে, তুমি চতুর্বেদস্বরূপ,

তোমাদের মুখেই আহুতি প্রদত্ত হয়। তুমি দেবতা ও ব্রহ্মবাদিগণের প্রতিনিধি, তুমি সকল প্রাণীর জঠরেও অবস্থান করিতেছ। তুমি পাপপুণ্যের সাক্ষী। হে পাবক, এই ব্যক্তি ব্যবহারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তুমি ইহার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি নির্ণয় করিয়া সর্বসমক্ষে প্রকাশ কর'।

তারপর অভিযুক্ত ব্যক্তি দুই হাতে ব্রীহি (ধান) মর্দন করিবেন। করতলে তিল বা সেইরূপ কোন চিহ্ন থাকিলে প্রাড়্বিবাক্ সেই স্থানে আলতা বা অপর কোন রঞ্জক দ্রব্য লাগাইয়া দিবেন। অভিযুক্তের অঞ্জলিতে সাতটি অশ্বত্থপত্র স্থাপন করিয়া সাতগাছি সুতার দ্বারা সেই পাতাগুলি বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। প্রাড়্বিবাক্ সাঁড়াশী দ্বারা লৌহ-পিণ্ডটিকে অভিযুক্তের কাছে আনিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহাকে অভিমন্ত্রণ করিবেন। মন্ত্রার্থ—'হে অগ্নে, তুমি সর্বভূতের অন্তর-চর। আমার পাপপুণ্যের পরীক্ষায় সত্য প্রকাশ কর'। এই বলিয়া অঞ্জলিতে তপ্ত-লৌহপিণ্ডটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। নৃপতি স্বয়ং অথবা প্রাড়্বিবাক্ সেই পিণ্ডটি অঞ্জলিতে তুলিয়া দিবেন।

পূর্বেই ষোল অঙ্গুলি পরিমিত নয়টি মণ্ডল প্রস্তুত রাখিতে হইবে। এক মণ্ডল হইতে অপর মণ্ডলের দূরত্বও ষোল অঙ্গুলি পরিমিত স্থান। অভিযুক্ত ব্যক্তি পিণ্ডহস্তে সাতটি মণ্ডল অতিক্রম করিবেন। মণ্ডলের বাহিরে পদক্ষেপ করিতে পারিবেন না। অষ্টম মণ্ডলে দাঁড়াইয়া নবম মণ্ডলের উপর লৌহ পিণ্ডটিকে ফেলিয়া দিবেন। অশ্বত্থপত্র সরাইয়া পুনরায় ব্রীহির দ্বারা দুই হাত মর্দন করিলে যদি পোড়ার কোন চিহ্ন দেখা না যায় তবে অভিযুক্ত নির্দোষ বিবেচিত হইবেন, আর বিপরীত হইলে অপরাধী বলিয়া স্থিরীকৃত হইবেন। সপ্তম মণ্ডল অতিক্রমের পূর্বেই যদি হাত হইতে পিণ্ড পড়িয়া যায়, অথবা দহন সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে পুনরায় পরীক্ষা করিতে হইবে। হাত হইতে পিণ্ড ফেলিবার সময় যদি শরীরের অপর কোন স্থান পুড়িয়া যায়, তবে ক্ষতি নাই। পরীক্ষায় নির্দোষিতা সপ্রমাণ হইলে গুরু-পুরোহিতগণকে কিঞ্চিৎ দানদক্ষিণা করিতে হয়।

জলবিধি

পবিত্র জলাশয়ের নিকটেই একটি তোরণ নির্মাণ করিতে হয়। তোরণের ভিতরে প্রাড়্বিবাকের আসন হইতে দেড়শত হাত দূরে একটি শরবেধ্য লক্ষ্য স্থাপন করিবার নিয়ম। তোরণের সমীপে শর ও ধনু স্থাপন করিয়া উহাকে পূজা করিতে হইবে। অতঃপর জলাশয়ে বরুণ দেবতার পূজা করিয়া জলাশয়ের তীরে ধর্মপ্রমুখ দেবতা-গণের অর্চনা ও তদুদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির মস্তকে অভিযোগপত্র বাঁধিয়া দিয়া প্রাড়্বিবাক জলকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। মন্ত্রার্থ—'হে জল, তুমি প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, সৃষ্টির আদিতে তোমার উদ্ভব, তুমি দ্রব্যাদি ও দেহের শুদ্ধি বিধানে সমর্থ। এই পাপ-পুণ্যের পরীক্ষায় তুমি সত্য প্রকাশ কর'। অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিবেন—'হে বরুণ, এই সত্য পরীক্ষায় আমাকে রক্ষা কর'। এই বাক্যে জলাভিমন্ত্রণ করিয়া নাভিমাত্র জলে অবস্থিত অপর পুরুষের উরু অবলম্বনপূর্বক অব-স্থান করিবেন। সেই সময় অপর এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট বেধ্য বস্তুটিতে বাণক্ষেপ করিলে অভিযুক্ত পুরুষ প্রাড়্বিবাকের আদেশে ডুব দিবেন। অপর এক ব্যক্তি তখন সেই পতিত শরটিকে আনিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে ধাবিত হইবেন এবং শরটিকে লইয়া পুনরায় দ্রুত-পদে তোরণমূলে প্রাড়্বিবাকের সমীপে উপস্থিত হইবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্ত পুরুষ যদি জলে নিমজ্জিত থাকিতে পারেন তবেই নিরপরাধ বলিয়া গণ্য হইবেন। নাক এবং কান জলে নিমজ্জিত থাকিলেই চলিবে। কেবল মাথার শিখার দিক্ ভাসিয়া উঠিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। পরীক্ষার পরে ব্রাহ্মণকে যথাশাস্ত্র দক্ষিণা দান করিতে হইবে।

বিষবিধি

পূর্বাহ্নে ঠাণ্ডা জায়গায় বিষপরীক্ষা করিবার নিয়ম। হিমালয়শৃঙ্গে উৎপন্ন সাতটি যবের সমান ওজনের বিষকে প্রথমত ঘৃতাক্ত করিতে হইবে। প্রাড়্বিবাক্ বিষকে অভি-মন্ত্রিত করিবেন। মন্ত্রার্থ—'হে বিষ, তুমি ব্রহ্মার পুত্র, দুরাত্মগণের পরীক্ষার নিমিত্ত তোমার সৃষ্টি। তুমি এই অভিযুক্ত ব্যক্তির পাপপুণ্য প্রকাশ কর। এই ব্যক্তির কোন অপরাধ না থাকিলে তুমি অমৃতের সমান হও'। অতঃপর প্রাড়্বিবাক্ প্রদত্ত বিষ হাতে লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি পুনরায় বিষের নিকট প্রার্থনা করিবেন—'হে বিষ, তুমি সত্যধর্মে ব্যবস্থিত, সত্য প্রকাশ করিয়া আমার নিকট অমৃততুল্য হও'। এই মন্ত্রপাঠের পর তিনি বিষপান করিবেন। যদি অপরাহ্ন বেলা পর্যন্ত মূর্চ্ছা, বমন প্রভৃতি বিষক্রিয়া প্রকাশ না পায় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ গণ্য হইবেন।

কোষবিধি

মহাপাতকী, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, ব্রাত্য প্রভৃতির কোষপরীক্ষা নিষিদ্ধ। দুর্গা, সূর্য প্রমুখ উগ্র দেবতার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া অপরাধ অস্বীকার পূর্বক সেই দেবতার স্নানীয় জল তিন প্রসৃতি (কোষ) পরিমিত পান করিবার নিয়ম। কোষপরিমিত স্নানীয়োদক পানের জন্য এই পরীক্ষার নাম কোষপরীক্ষা। প্রাড়্বিবাক্ গোময়লিপ্ত মণ্ডলে ধর্মের আবাহন করিয়া তাঁহার পূজা করিবেন এবং অতঃপর দুর্গাপ্রমুখ দেবতা-গণের অর্চনা ও হোমপ্রভৃতি সমাপনান্তে অভিযুক্ত ব্যক্তির মাথায় প্রতিজ্ঞাপত্রখানি স্থাপন করিবেন। তারপর দেবতার স্নানীয়ো-দক বা চরণামৃত অভিমন্ত্রিত করিবেন। মন্ত্রার্থ—'হে জল, তোমার সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ব্রহ্মা। তোমা হইতে দ্রব্যাদি ও দেহ পরি-শুদ্ধ হইয়া থাকে। তুমি এই পরীক্ষায় সত্যাসত্য নির্ণয় কর।' অভিযুক্ত ব্যক্তি আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া উপবাসী থাকিবেন এবং আদিত্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্রার্থ—'হে বরুণ, আমাকে সত্য দ্বারা রক্ষা কর।' তারপর প্রাড়্বিবাক্ প্রদত্ত সেই তিন প্রসৃতি জল পূজিত দেবতার সম্মুখে পান করিবেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি রাজকৃত বা দৈবকৃত শারীরিক অথবা মানসিক ঘোর কষ্ট উপস্থিত না হয় তবে অভিযুক্তের বিশুদ্ধি স্থিরীকৃত হইবে। আর কোনপ্রকার শক্ত বিপদ উপস্থিত হইলে দোষ সপ্রমাণ হইবে।

তণ্ডুলবিধি

একমাত্র চুরির অভিযোগ ব্যতীত আর কোনও অভিযোগে তণ্ডুল পরীক্ষা চলিবে না। শালিধান্যের শুভ্র তণ্ডুলের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। মাটির পাত্রে চাউল রাখিয়া রৌদ্রে স্থাপন করিতে হয়। পরে দেবতার চরণামৃত সিক্ত করিয়া এক রাত্রি রাখিয়া দিতে হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব-দিনে সংযত থাকিয়া পরদিবস স্নানের পর পবিত্রভাবে পূর্বাভিমুখ হইয়া মাথায় প্রতিজ্ঞাপত্র ধারণপূর্বক প্রাড়্বিবাক্ প্রদত্ত সেই তণ্ডুল ভক্ষণ করিবেন। অতঃপর

ভূর্জপত্রে, তদভাবে অশ্বত্থপত্রে তিনবার থু থু ফেলিবেন। সেই থুথুর মধ্যে রক্ত দেখা গেলে অভিযুক্তকে অপরাধী স্থির করা হইবে। হস্তধৃত মৃৎপাত্রের কম্পন এবং তালু হইতে রক্ত ক্ষরিত হইলেও অপরাধ সপ্রমাণ হইবে।

তপ্তমাষবিধি

লোহা, তামা বা মাটির ষোল অঙ্গুলি পরিমিত প্রশস্ত পাত্রে বিশ পল তৈল বা ঘৃতকে ফুটাইতে হইবে। তাহাতে পাঁচ রতি ওজনের একখণ্ড সোণা বা রূপা প্রক্ষেপ করিতে হয়। প্রাড়্‌বিবাক্‌ ধর্মের অবাহনাদি হোমান্ত অর্চনা শেষ করিয়া ঘৃতকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। মন্ত্রার্থ—'হে ঘৃত, তুমি পরম পবিত্র, অমৃতস্বরূপ, শুচি পুরুষের নিকট শীতল হও।' সংযত, স্নাত, আর্দ্রবস্ত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির মাথায় প্রতিজ্ঞা-পত্র স্থাপন করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিও অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিবেন। মন্ত্রার্থ—'হে অগ্নে, তুমি সর্বভূতের অন্তরে বিরাজিত, তুমি মানুষের পাপপুণ্যের সাক্ষী। আমার সম্বন্ধে সত্য প্রকাশ কর।' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাড়্‌বিবাক্‌প্রদত্ত সেই সোণা বা রূপার টুকরাখানি তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তুলিয়া লইবেন। অঙ্গুলি দগ্ধ না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ সাব্যস্ত হইবেন।

ফালবিধি

একমাত্র গরুচুরি বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরই ফাল পরীক্ষা চলে। বার পল লোহার দ্বারা ফাল প্রস্তুত করিতে হইবে। ফালের দৈর্ঘ্য হইবে আট অঙ্গুলি এবং প্রস্থ হইবে চারি অঙ্গুলি। প্রাড়্‌বিবাক্‌ ধর্মের আবাহনাদি হোমান্ত কর্ম সমাপন করিয়া ফালখানিকে অগ্নিতপ্ত করিবেন। পূর্ববৎ অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত করিয়া অভিযুক্তের মস্তকে প্রতিজ্ঞাপত্র স্থাপন করিয়া প্রাড়্‌বিবাক্‌ তপ্ত ফালখানিকে লেহন করিবার আদেশ দিবেন। জিহ্বা দগ্ধ না হইলেই অভিযুক্তের নির্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে ।

ধর্মাধর্মবিধি

রূপার দ্বারা ছোট একটি ধর্মের মূর্তি এবং সীসামিশ্রিত লোহার দ্বারা অধর্মের মূর্তি প্রস্তুত করিতে হয়। অথবা ভূর্জপত্রের বা কাপড়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ খণ্ডে শ্বেতবর্ণ ধর্ম এবং কৃষ্ণবর্ণ অধর্মমূর্তি আঁকিয়া পঞ্চগব্যে অভ্যুক্ষণের পর গন্ধ-পুষ্পাদিদ্বারা উভয় মূর্তিতে সেই সেই দেবতার পূজা করিতে হয়। অতঃপর শুক্ল পুষ্পযুক্ত ধর্মপ্রতিমাকে একটি মৃৎপিণ্ডে এবং কৃষ্ণপুষ্পযুক্ত অধর্মপ্রতিমাকে অপর মৃৎপিণ্ডে পুরিয়া নূতন একটি কুণ্ডে স্থাপন করিতে হইবে। প্রাড়্‌বিবাক্‌ পূর্ববৎ হোমান্ত কর্ম সমাপ্ত করিয়া অভিযুক্তের মস্তকে সমন্ত্রক প্রতিজ্ঞাপত্রখানি স্থাপন করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিবেন —'আমি যদি নিরপরাধ হই তবে ধর্ম আমাকে রক্ষা করুন'। এই বলিয়া কুম্ভস্থ মৃৎপিণ্ড হইতে একটি পিণ্ড গ্রহণ করিবেন। ধর্মের মূর্তি গৃহীত হইলে বিশুদ্ধি সপ্রমাণ হইবে।

শপথবিধি

অপরাধ যদি তেমন গুরুতর না হয় এবং সাক্ষ্যপ্রমাণাদির অভাব ঘটে তবে শপথ-বিধিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সংযম, স্নান, উপবাস প্রভৃতির কোন নিয়ম নাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে 'সত্য' শপথেই চলিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সর্বসমক্ষে বলিবেন, 'আমি সত্যই এই কাজ করিয়াছি, অথবা এই কাজ করি নাই'। ক্ষত্রিয় তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র বা বাহন স্পর্শ করিয়া এইপ্রকার সত্য শপথ করিবেন। গরু, বীজ অথবা সোণা স্পর্শ করিয়া বৈশ্য সত্য শপথ করিবেন এবং শূদ্র কতকগুলি পাতকের উল্লেখ করিয়া শপথ করিবেন। তিনি বলিবেন—'আমি যদি অমুক কাজ করিয়া থাকি তবে যেন ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাতকে লিপ্ত হই'। শপথের পর দুই সপ্তাহ মধ্যে যদি রাজকৃত বা দৈবকৃত কোন বিপদ না ঘটে তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ সাব্যস্ত হইবেন।

'আমি এই কাজ করিয়াছি বা করি নাই' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া পুত্রের বা পত্নীর শিরঃস্পর্শ করাও একপ্রকার শপথ।

দিব্য এবং শপথ বিধানের নিয়মাবলী ও প্রয়োগপদ্ধতি হইতে সুস্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, সাধারণ লোকের ধর্মবিশ্বাস অতিশয় প্রবল না হইলে এই শ্রেণীর পরীক্ষা বিচারালয়ে চলিতে পারিত না। অগ্নির দাহিকা শক্তি, বিষের ক্রিয়া প্রভৃতিও কি মানুষের বিশ্বাসের কাছে হার মানে? আজকাল আমরা সর্বান্তঃকরণে এইসকল ব্যবস্থা মানিয়া লইতে না পারিলেও যে সময়ে সমাজে প্রযুক্ত হইত, সেই সময়কার দিনে আমাদের পূর্ব পুরুষ অনেকেই এইসকল পরীক্ষায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন—সন্দেহ নাই। স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের সময়েও (সাড়ে চারি-শত বৎসর আগে) ভারতের বিচারালয়ে দিব্য পরীক্ষার বিশেষ আদর ছিল। সমাজে অধিকসংখ্যক ব্যক্তির সমর্থন না থাকিলে পরীক্ষাপদ্ধতি চলিতে পারিত না। তামা, তুলসী, গঙ্গাজল, গীতা, কোরাণ প্রভৃতি পবিত্র বস্তু ও গ্রন্থ হাতে দিয়া আজকালও কোন কোন স্থলে আদালতে শপথ করান হয়। কিন্তু কোনপ্রকার দিব্যবিধানই এখন চলে না।

পরিমল রায়
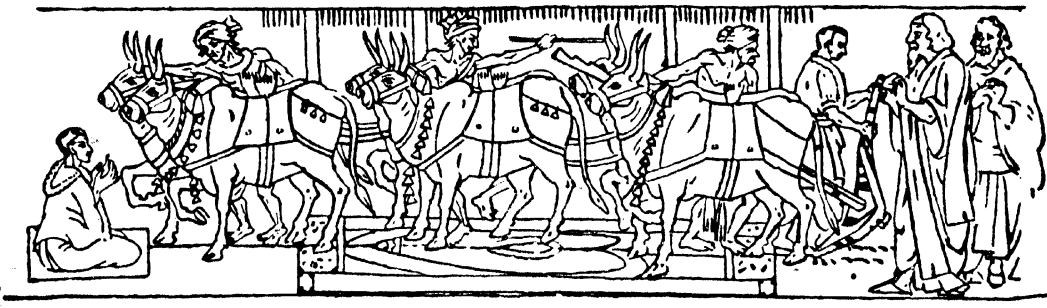
আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়া কিছুদিন পূর্বে আবিষ্কার করিয়াছিলাম, আমি মোটামুটি পরশ্রীসহিষ্ণু। অর্থাৎ অপরের শ্রীবৃদ্ধি হইলে যে-মানসিক জ্বালাটা উপস্থিত হয় তাহা খুব একটা দীর্ঘকাল থাকে না। কাহারো কর্মপ্রাপ্তি কিংবা পদোন্নতি ঘটিলে শুনিয়া প্রথমটায় ভালো লাগে না। কিন্তু দেখিয়াছি, দিন সাতেকের মধ্যে মনোবেদনা যথেষ্ট প্রশমিত হইয়া যায়; এমন কি, দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে ব্যক্তিবিশেষটির সঙ্গে বেশ সহজভাবেই কথাবার্তা বলিতে পারি। কাহারো সুখ্যাতি শুনিলে গাত্রদাহ ইদানীং একেবারেই হয় না। বরং দু'একটি অত্যুক্তি আমি নিজেই জুড়িয়া দিতে প্রস্তুত, এবং বিশ্বাস করুন—তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র মনোবিকার বোধ নাই।

এই সদ্‌গুণটি সম্ভবতঃ পরিণত বয়সের ধর্ম। তরুণ বয়সে এতখানি উদারতা অবশ্যই ছিল না। তখন, ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার মতো সমবয়স্ক সকলেই প্রাণপণে দৌড়াইতেছি। কে কাহাকে কিঞ্চিৎ পিছনে ফেলিয়া যাইতে পারিল, কে একটু বেশী বাহবা পাইল, তাহা লইয়া মনের মধ্যে সর্বক্ষণ দৌরাত্ম্য লাগিয়া থাকিত। অপরে যাহা পারিল আমাকেও ঠিক তাহাই পারিতে হইবে, এই অহেতুক প্রতিযোগিতায় আয়ুক্ষয় ও কালক্ষেপের অবধি ছিল না। কোথাও কোনো বিষয়ে অক্ষমতা প্রমাণিত হইলে গ্লানি ও লজ্জায় বিভ্রান্ত হইতাম। ইদানীং এই মূঢ়তা কাটিয়াছে; বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্ষমতার ও যোগ্যতার হদিশ পাইয়াছি; কোথায় সত্যি জিতিয়াছি, এবং কোথায় জিতিবার আবশ্যক নাই, এ বোধ হইয়াছে। তাই অপরের উত্থান-পতন এখন নিজের কাছে অনেক বেশি অবান্তর বলিয়া বুঝিতে পারি,—অপরের ভাগ্যের সহিত নিজের ভাগ্যের তুলনা অসার্থক বলিয়া বোধ হয়।

মনে করিবেন না, একেবারে নির্বাণ কিংবা মোক্ষলাভের ইঙ্গিত করিতেছি। না, অতখানি কিছু নয়। তবে, তরুণ বয়সের চিত্ত-বিক্ষোভ আজকাল সত্যসত্যই কমিয়া গিয়াছে। অপরকে এখন অনেক সহজে ও সাদরে গ্রহণ করিবার শক্তি হইয়াছে। কাহারো সম্বন্ধে কদর্থে ঈর্ষ্যা বোধ করি না, এমন কি সদর্থে ও নয়।

নিজের সম্বন্ধে এই মহৎ আবিষ্কারটি করিয়া অবধি বেশ ভালোই লাগিতেছিল, খানিকটা আত্ম-গৌরবও যেন বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু, সেদিন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, রবীন্দ্রনাথের দুর্যোধন বলিয়াছেন, ঈর্ষ্যা সুমহতী। অর্থাৎ, একটু আধটু ঈর্ষ্যাবোধ করা মন্দ নয়। দুর্যোধন অবশ্যই ভালো লোক ছিলেন না। কিন্তু, দুর্য্যোধন বলিয়া থাকিলেও কথাটা নেহাৎ খারাপ নয়। সেকালের পাপিষ্ঠগুলিরও জ্ঞান-বুদ্ধি মন্দ ছিল না। অতএব পুনর্বার কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর আত্ম-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইল, এবং এই নতুন অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছি আমি, পরশ্রীকাতর না হইলেও, একেবারে ঈর্ষ্যাহীন নই। অর্থাৎ, এইমাত্র নিজের সম্বন্ধে যে সকল উচ্চাঙ্গের কথাগুলি উচ্চারণ করিলাম তাহা আংশিক খন্ডন করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে আমি কিঞ্চিৎ ঈর্ষ্যাপরায়ণ। আরেকটু পরিস্কারভাবে বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হয়, আমি মনে মনে আমার জনৈক বন্ধুকে একটু বিশেষভাবেই ঈর্ষ্যা করি।

এই ঈর্ষ্যা তাঁহার অর্থকে নয়, পান্ডিত্যকেও নয়, এমন কি খ্যাতিকেও নয়। তাঁহার অর্থাগম প্রচুর, জ্ঞানের পরিধি সীমাহীন, অধ্যাপনার খ্যাতি বহুবিস্তৃত। কিন্তু ইহার কোনোটিতেই আমার মনোবৈকল্যবোধ নাই। বরং বন্ধুর গৌরবে আমার আনন্দ অপরিমিত। আমার ঈর্ষ্যা তাঁহার স্বাস্থ্যটিকে এবং শুনিয়া খানিকটা অবাক হইবেন, স্বাস্থ্যটি ভালো বলিয়া নয়, নিতান্ত দুর্বল বলিয়া। আমার এই বিশিষ্ট বন্ধুটিকে মাসে অন্ততঃ দুইবার অসুস্থ হইয়া শয্যা-গ্রহণ করিতে হয়। অসুখটি তাঁহার একটি নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। বহুদিনের ঘনিষ্ঠতায় উহাকে তিনি পরিবারেব আরেকটি সভ্য হিসাবেই মানিয়া লইয়াছেন। রোগটিও গৃহস্বামীর দেহ আশ্রয় করিয়া সংসারে বেশ কায়েমি স্থান করিয়া লইয়াছে। প্রায়ই বন্ধু-গৃহে আড্ডা দিতে গিয়া দেখি, ভদ্রলোক মাথায় পট্টি বাঁধিয়া গায়ে কম্বল চাপাইয়া জ্বরে ধুঁকিতেছেন। ঘরে ঢুকিয়া বন্ধু-পত্নীকে বলি, আবার? তিনি বলেন, এই তো দেখুন না, আবার!

কিন্তু বন্ধুটির যেখানে আবার, পুনর্বার এবং বারম্বার, আমার সেখানে একটিবারও নয়, এবং আমার ঈর্ষ্যার কারণটি এখানেই। একটা ভদ্রগোছের ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কিছুকাল বিছানায় পড়িয়া থাকিব, এ সৌভাগ্য আমার আর হইল না,—হাজার চেষ্টা করিয়াও হইল না। যে দু'একটি শারীরিক উৎপাত ক্বচিৎ কখনো দেখা দেয় সেগুলি এত সামান্য এবং ক্ষণস্থায়ী যে শয্যা-গ্রহণের মর্য্যাদা তাহাদের কখনোই দেয়া চলে না, উহাদের লইয়া বাড়ীর বাহির হইতেও বাধা নাই। কখনো হয়তো একটু মাথা-ধরা, কোনোদিন সামান্য সর্দি-কাশি, কখনো বা একটু গা-ব্যথা। সূচনা মাত্র অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া বিছানার দিকে অগ্রসর হই। কিন্তু শয্যা-গ্রহণের উপক্রম করিতেই উহারা কী করিয়া যেন টের পায়, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে উধাও, আর টিকিটি দেখিবার জো নাই। আমার আশঙ্কা, আমার মৃত্যুটাও হয়তো একদিন হঠাৎ ঘটিবে। দীর্ঘদিন মহা আরামে পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া ভুগিয়া ভুগিয়া মরিবার মতো বাবুগিরি আমার কপালে লেখা নাই।

আমি বলি যাহার অসুখ নাই, তাহার মতো অসুখী কে আছে? কথাটা বাড়াবাড়ি মনে হইতেছে। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে যদি কিঞ্চিৎ অনুধাবনের প্রয়াস করেন তাহা হইলে আর দ্বিরুক্তি করিবেন না। মাঝেমাঝে শয্যাশায়ী হইবার সুবিধাগুলি কখনো ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষার কথাটা না-ই তুলিলাম। উহাতে লুব্ধ হইয়া কেহ হয়তো রোগের কামনা

করে না। তবে, অসুখে পড়িলে অসুস্থ ব্যক্তিটির যে খানিকটা প্রতাপ বৃদ্ধি হয়, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। শিশুগণ অসুখে পড়িলে সারাক্ষণ তাহাদের এটাওটা আবদার লাগিয়াই থাকে। ওষুধ-পথ্যের ব্যবহারটা সহজ করিয়া আনিবার জন্য নানা জাতীয় পুরস্কার, প্রশ্রয় ও প্রতিশ্রুতি উহাদের উপর অকাতরে বর্ষিত হইতে থাকে, উহারাও সুযোগ বুঝিয়া আবদারের চড়া বাজারে বেশ খানিকটা ব্ল্যাকমার্কেটিং করিয়া লয়। রোগ-শয্যার এই প্রভুত্বটি কেবল শৈশবে সীমাবদ্ধ নয়। বয়স্কেরও এই একই সুবিধা। রোগীর বিছানা রাজ-সিংহাসন। তাহার প্রতিটি ইচ্ছা সম্রাটের আদেশ। আপনি বিছানায় পড়িয়া পরোয়ানা জারি করিলেন, পারিবারিক শিশুগণের ক্রন্দন নিষেধ। হুকুমজারী মাত্র পারিবারিক জননী সম্প্রদায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, এবং বহু শিশুর উদ্গত কণ্ঠ-ধ্বনি মাতার তর্জনী নির্দেশে, তিরস্কারে কিংবা অঞ্চলের চাপে মন্দীভূত হইতে লাগিল। আপনি ইচ্ছা করিলেন, কমলানেবু খাইবেন। তন্মুহূর্তে অকালের ফল সংগ্রহে পারিবারিক তরুণবৃন্দ সাইকেলে, বাস-এ কিম্বা ট্রামে শহরময় টহল দিয়া ফিরিতে লাগিল। আপনার বোধ হইল, গরম লাগিতেছে। তৎক্ষণাৎ শতহস্ত তালপত্র ধারণে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য মন্দ কি? সুযোগটির চতুর ব্যবহার জানলে, এই সময়ে অনেক অতৃপ্ত বাসনাও চরিতার্থ করা যায়। যে মহার্ঘ্য পুস্তকটি সুস্থ অবস্থায় বাজেটে ধরাইতে স্ত্রীর নিকট কোনোদিন সাহস পান নাই, অথবা অ-প্রশ্রয়ী পিতার নিকট উত্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন, রোগের রাজ-শয্যায় অনায়াসে তাহা কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা যায়, এবং নিতান্ত অসম্ভব না হইলে, উহা হয়তো সংগৃহীতও হয়। কলেজ পড়ুয়া তরুণগণ এই অবস্থায় মাতার নিকট হইতে কিছু হাতখরচ হাতাইবার ফিকিরে থাকেন। তরুণীগণ কী করেন, তাহা অবশ্য জানি না।

কিন্তু এই সকল ছোটখাটো সুবিধার কথাগুলি ছাড়িয়া অসুখের যে অন্য একটি মহা উপকারিতা আছে, সে প্রসঙ্গটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য কত লোকে কত ওষুধ বাৎলাইয়াছে। কিন্তু একথাটি এযাবৎ কেহ বলে নাই যে, চারিত্রিক উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে অসুস্থ হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। অথচ কথাটি কিন্তু নিতান্ত খাঁটি। অহমিকা, ধৃষ্টতা, অশিষ্টতা ইত্যাদি কুৎসিত মনোবৃত্তিগুলি পৌনঃপুনিক পীড়ায় যতখানি প্রশমিত হয়, আর কিছুতে তেমন নয়। আপনি যদি স্বভাব-নম্র ব্যক্তি হন, তাহা হইলে অবশ্য অসুখের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু উদ্ধত কিংবা অহং-সর্বস্ব ব্যক্তির মাঝে মাঝে অসুস্থ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। 'য়্যাসা করেঙ্গা ত্যাসা করেঙ্গা'র ইহা অপেক্ষা অব্যর্থ ওষুধ বাজারে নাই। দশ বিশটি দিন বিছানায় লম্বা হইলেই বাছাধন বুঝিবেন, এ দেহ নিতান্তই মৃৎপাত্র, কখন্ কোন্ দিক ফুটা হইয়া অন্তঃসার বহির্গত হইয়া যায়, বলা যায় না। মৃত্যু শরীরের পিছনে সর্বক্ষণ যে লাগিয়াই আছে, এই পরম বোধ যাহার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সুবুদ্ধি জন্মিতে বিলম্ব হয় না। যে বুঝিয়াছে, এ জীবন মধুস্বর্বর্তিকা, সে-ই জানে, এই নিবু নিবু মোমবাতির আলোর একটা বড় রকমের সমারোহ কিংবা তাণ্ডব নিতান্ত অর্থহীন, খানিকটা হাস্যকরও বটে। অর্থাৎ জীবনটাকে দেহবদ্ধ জানিতে হইলে দেহের মাঝে মাঝে বিকার প্রয়োজন। যে দাম্ভিকের সে-বিকার নাই, সে-ই দেহকে অতিক্রম করিয়া সর্বত্র আস্ফালন করিয়া বেড়ায়।

আপনারা হয়তো বলিবেন, তুমি যে তত্ত্ব-কথা শুনাইতেছো, ইহা আর নতুন কী? দেহটা যে নশ্বর, সে তো বাপু সকলেই জানে। আমি বলিতেছিলাম, জ্ঞান সঞ্চয় এবং বোধোদয় এক কথা নয়। জানে সকলেই, কিন্তু বোঝে না এমন লোকও আছে, এ না বুঝিবার অন্যতম কারণ দেহের রোগশূন্যতা। এ সকল ক্ষেত্রে চেতনা সঞ্চারের জন্য একটা ছোটখাটো ডোজের টাইফয়েড কিংবা নিউমোনিয়া অথবা কলেরা অতিশয় ফলপ্রসু। কেবল একটু জানান্ দিয়া যাওয়া মাত্র। তারপর সজুত হইতে আর বেশিদিন লাগে না। রোগমুক্তির পর পদ্মপত্রের উপমাটা আপনা হইতেই মনে আসে, মেজাজ শান্ত হয়, ব্যবহার ভদ্র হয়, অপরের উপর দৌরাত্ম্য কমিয়া আসে। ফন্দীফিকির, ছলচাতুরী, জোরজবরদস্তি ইত্যাদি যাবতীয় অসৎ ও অশিষ্ট প্রবৃত্তির উপশম ঘটে। উপশম, কারণ সকল ক্ষেত্রে একবারের শিক্ষায় হয়তো ইহাদের অবসান ঘটে না। অর্থাৎ ক্রনিক হইয়া পড়িলে, হৃদয় দৌর্বল্যের কিংবা আন্ত্রিক বিপর্যয়ের একটি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কোর্স-এর প্রয়োজন হইতে পারে। দুই তিন বার চিৎ হইলেই পুরাপুরি ঠাণ্ডা, উদ্ধত অবিনয়ী উজবকটি রীতিমত ভদ্রলোক হইয়া গিয়াছেন। কথাবার্তায় বেশ একটা পারলৌকিক সুর, ইহকালের আস্ফালনগুলি সম্পূর্ণ মন্দীভূত।

আমার অনতিসুস্থ যে বন্ধুটির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি আমার এই থিওরিটির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যৌবনে তাঁহার এক রূপ দেখিয়াছি,—তার্কিক, দাম্ভিক, অধার্মিক এবং অবিশ্বাসী। ইদানীং একেবারে আমূল রূপান্তর লক্ষ্য করিতেছি। অসুখের পোড় খাইয়া খাইয়া তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে।

স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য তর্কযুদ্ধের প্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে আর দেখি না, দম্ভ নিশ্চিহ্ন, দৈবানুগ্রহের লালসা অপরিমিত, ঠাকুর-দর্শন করিয়া প্রণামের ঘটা অবিশ্বাস্য। পূর্বে মনুষ্য সঙ্গে পরিহাসের খোরাক পাইতেন, অধুনা কাহারো সহিত পরিচয় হইলে, তাহাকে জানিবার চেষ্টা করেন, বুঝিতে চান—সকলের সঙ্গে একটা অদৃশ্য মানবিক অন্তরঙ্গতা বোধ করেন। যদি ইঁহার দেহটি অতখানি অপটু না হইয়া পড়িত, তাহা হইলে দম্ভের ও অধর্মের কাঁটাগুলি তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিত, এবং কে জানে, ইনি হয়তো সমাজের একটি বিভীষিকায় পরিণত হইতেন।

স্বভাবের পরিবর্তন অবশ্য জীবনযুদ্ধের পরাজয়ের ফলেও সম্ভব। অনেক অমানুষ সংসারের নির্দয় প্রহারে মানুষ হইয়া যায়। অনেক উদ্ধত মন অভাব-অনটনে প্রকৃতিস্থ হয়। কিন্তু জীবন-যুদ্ধের শিক্ষা দীর্ঘ-দিনের চিকিৎসা। তেমন একটি লাগসই ব্যাধি কিছুকালের জন্য ধরাইতে পারিলে, একই ফল অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে গবেষণার অবকাশ বহু বিস্তৃত। কোন্ ধরণের দম্ভ কোন্ রোগে প্রশমিত হইতে পারে, এক এক দফায় কতদিন শয্যাশায়ী রাখিতে হইবে, এবং বছরে কতবার সে-রোগটি আক্রমণ বাঞ্ছনীয়, ইত্যাদি সমস্ত তথ্যই উপযুক্ত গবেষণা দ্বারা বাহির করা যাইতে পারে।

কিন্তু আমি গোড়ায় বলিতেছিলাম, আমি আমার বন্ধুটিকে তাঁহার দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে ঈর্ষা করি। সে-কথাটির আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই। আমার মতো স্বভাবনম্র দর্পহীন ব্যক্তির অবশ্য প্রতিষেধক হিসাবে অসুখের কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু অসুখের আরেকটি অপরূপ মাহাত্ম্য আছে, এবং সে-কথা ভাবিয়াই আমি বন্ধুটির প্রতি ঈর্ষান্বিত।

রোগমুক্তির অব্যবহিত পরের কয়েকটি দিনের কথা কল্পনা করুন। মাসখানেক বিছানায় পড়িয়াছিলেন, বাহিরের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পীড়ায় জর্জরিত অবস্থায় আচ্ছন্ন ছিলেন। বলিতে গেলে, দীর্ঘকাল সত্যকারের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সমস্ত ইন্দ্রিয় লুপ্ত হইয়া এমটি জ্বরক্লিষ্ট জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়াছিলেন। সেই জড়পিণ্ডে পুনরায় ধীরে ধীরে প্রাণসঞ্চার হইতেছে, চক্ষুকর্ণ আবার সজাগ হইয়া উঠিতেছে, লুপ্ত পৃথিবী পুনরায় চোখের সম্মুখে একটু একটু করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে। এ আনন্দের তুলনা কোথায়? এখনো বাড়ির বাহির হইবার মতো সবল হন নাই। বৈকালের দিকে বারান্ডায় ডেক চেয়ার পাতিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকেন। বাড়ির সম্মুখের পরিচিত রাস্তাটির সঙ্গে কত-দিন পর আবার প্রথম সাক্ষাৎ। রাস্তাটির হয়তো রাজপথের মর্যাদা নাই, কিন্তু উহার অনতি-উচ্ছল জন প্রবাহটিকে দেখিয়াই দু' চোখ সার্থক,—মনে হয়, বসিয়া বসিয়া কী অপূর্ব মিছিল দেখিতেছি। মাঝে মাঝে দু'একটি চেনা লোক চোখে পড়ে। দেখিয়া উহাদের সঙ্গে কী অদ্ভুত অন্তরঙ্গতায় মন ভরিয়া ওঠে। পাড়ার ধোপাটিকে বহুদিন পর আবার দেখিলেন। বিশাল কাপড়ের বোঁচকা পিঠে ফেলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়াছে। সেই কালো বিড়ালটি ঠিক সেই দক্ষিণের পাঁচিলের উপর বসিয়া আছে। রাস্তার কলের ধারে জলপ্রার্থীদের সেই প্রতিদিনের বৈকালিক ভিড় এবং প্রাত্যহিক কলহ। আর কিছুক্ষণ পরই আবার পাড়ার ছেলের দল হৈ হৈ করিতে করিতে ইস্কুল হইতে বাড়ি ফিরিবে। উহাদের প্রত্যেকটি আপনার পরিচিত, বহুদিন পর আবার সেই চেনামুখগুলি চোখে পড়িবে। পৃথিবী ধ্বনিময়, বর্ণময়, গন্ধময়, চক্ষু কর্ণ নাসিকা আনন্দে ভরপুর। প্রতিটি জিনিস নতুন, অভ্যস্ত পারিপার্শ্বিক বহুদিনের অদর্শনের পর রামধনুর মতো ঝলমল করিতেছে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতিটাই যেন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গাছের পাতাগুলি যে সবুজ, কিংবা আকাশটা যে নীল, তাহাও যেন নতুন করিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে।

এমন অপূর্ব নবজন্ম, এমন নতুন স্বাদ আর কিসে সম্ভব? রোগমুক্তি যেন সমস্ত পুরাতন হইতে মুক্তি। পীত পত্র ঝরাইয়া দেহময় আবার নতুন প্রাণসঞ্চার, নতুন আলো বাতাসে, পত্র পুষ্পের সৌগন্ধে নতুন নেশাধরা আমন্ত্রণ।

আরোগ্য যদি এত অপরূপ, রোগের কামনা কে না করিবে? আমার কাছে পুরাতন পৃথিবী ক্রমশই পুরাতন হইয়া যাইতেছে। এমন সৌভাগ্য নয় যে, কিছুদিন রোগশয্যায় লুকাইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ একদিন উন্মুক্ত গবাক্ষপথে পৃথিবীর বিচিত্র শোভা নতুন করিয়া নিরীক্ষণ করিব।

বন্ধুটির কিন্তু এখানেই জিত।

কয়েকটি মুহূর্ত

শ্রীদীপক পাল

অলস দিন। বিরস প্রহর। আকাশ ছোঁয়া দায়।
ভাঁটার টান নদীর স্রোতে। সময় কেটে যায়।
পাখীর গানে ক্লান্ত সুর। রৌদ্র ঝিলিমিলি।
আকাশ যেন মেঘের মত। বাতাসের অঙ্গুলি
ঝরাপাতার গোপন কোষে বেদন ছলো ছলো
জাগায় করুণ। হৃদয় অরুণ আশায় টলোমলো;
কোন্ অজানার ভয়ের দোলায়। পুবন হাওয়ার বেগ
ক্রমেই বাড়ে ঝড়ের মত। ঈষাণ কোণে মেঘ
ঘনায় দ্রুত কালবোশেখী ব্যাকুল প্রতীক্ষায়।

হু হু করে বাতাস ছোটে। দিনের আঙিনায়
কপোত-মায়ায় কাঁপে ভীরু কল্পলোকের গান।
ত্রস্ত পথিক। বনের শাখায় হঠাৎ জাগে বান।
মনের পটে রঙের বাহার—রূপের ইন্দ্রজাল—
এক নিমেষে শূন্যে মিলায়। সংক্রমণের কাল
গোঙায় বিকট ক্ষুব্ধ রোষে। শিউরে-ওঠা মন
উদাস দিনের ব্যথায় বিলীন। উধাও প্রাণের আশা
চন্দ্রলোকের তারার গানের পায়না খুঁজে ভাষা।
প্রলয় হাঁকে। হৃদয় কাঁপে। আকাশ ছোঁয়া দায়।
বজ্র-শিখায় মাণিক জ্বলে। সময় কেটে যায়।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৪২

১৯১৫ সালের জুলাই মাসে ভাগলপুরের প্রথম সবজজের এজলাসে লছমীপুর কেস আরম্ভ হয়। কেসটির সমাপ্তি ঘটে ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এজলাসে কেস আরম্ভ হবার পূর্বে বছর দুই-আড়াই ধ'রে কমিশনের সাহায্যে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষে বহু সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া হয়েছিল।

মকর্দমায় বাদীপক্ষে সমগ্র লছমীপুর স্টেট দাবী করেছেন; এবং মকর্দমার কোর্ট-ফিস ও জুরিসডিক্‌শনের জন্য মকর্দমার মূল্য, অর্থাৎ সমগ্র লছমীপুর স্টেটের মূল্য, নির্ধারিত করেছেন চল্লিশ লক্ষ টাকা। এ মূল্য নির্ধারণ কিন্তু মকর্দমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিতান্তই মোটামুটি একটা নির্ধারণ; বহু মূল্যবান খাদ-খনি পাহাড়-পর্বত অরণ্যানী সমাকীর্ণ সুবিস্তৃত জমিদারির প্রকৃত মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকার অনেক বেশি। মকর্দমায় নিষ্পন্ন হওয়ার জন্য চল্লিশটি বিভিন্ন ইসু ধার্য হয়েছে। সুতরাং আকারে এবং প্রকারে সর্বতোভাবে, লছমীপুর মামলা যে একটি বৃহৎ গোত্রের মকর্দমা, সে কথা না বললেও চলে।

ইসু ধার্য হবার সময়ে প্রতিবাদিনী রাণী কুসুমকুমারীর পক্ষে এসেছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিশ্ববিশ্রুত অ্যাডভোকেট ডক্টার (পরে স্যার) রাসবিহারী ঘোষ। মামলার শুনানির (Hearing-এর) সময়ে এসেছেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। বাদীপক্ষের আইনবাজগণের শীর্ষস্থানে আছেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার প্রফুল্লরঞ্জন দাস (পরে পাটনা হাইকোর্টের জজ মিঃ পি আর দাশ) এবং স্যার (পরে লর্ড) এস্ পি সিংহ। এ ছাড়া উভয় পক্ষে দশ-বার জন ক'রে বড় ছোট ও মাঝারি শ্রেণীর উকিল ব্যারিস্টার ও এটর্নি আছেন। বাদিনী পক্ষের যে আকাশে চিত্তরঞ্জন পূর্ণচন্দ্র, আড়াই বৎসরের জুনিয়ার উকিল আমি সে আকাশের এক কোণে নিতান্তই এক ক্ষীণপ্রভ তারকা।

উভয় পক্ষে কলিকাতা হাইকোর্টের দুই দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার আগমন করায় ভাগলপুর শহরে, বিশেষত আদালত মহলে, রীতিমত সোরগোল প'ড়ে গেছে। স্থানীয় বিহারী উকিল এবং বিহারী জনসাধারণ লছমীপুর মকর্দমার নামকরণ করেছেন 'সিংহ ঔর শিয়ারকা লড়াই'; অর্থাৎ, সিংহ এবং শৃগালের যুদ্ধ। সিংহ অর্থে বাদীপক্ষের ব্যারিস্টার স্যার এস পি সিং এবং শিয়ার অর্থে প্রতিবাদিনী পক্ষের ব্যারিস্টার সি আর (শিয়ার) দাশ। এই সিংহ এবং শৃগালের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত শৃগালের নিকট সিংহকেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

ভাগলপুরের বাঙালীরা কিন্তু লছমীপুর কেসের নাম দিয়েছিলেন নাতি-মাতামহর মামলা। সিংহ-শিয়ালের ন্যায় এই নাতি-মাতামহ নামও রচিত হয়েছিল উভয় পক্ষের সর্দার ব্যারিস্টারদ্বয়ের নাম অবলম্বন ক'রে। নাতি অর্থে স্যার এস পি সিংহ এবং মাতমহ অর্থে সি আর দাশ। অবশ্য উভয়ের মধ্যে বস্তুত এমন কোনো সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল না; কিন্তু অকাট্য এক যুক্তির সাহায্যে এই সম্পর্ক আবিষ্কৃত হ'তে পেরেছিল। চিত্তরঞ্জনের পুত্র চিররঞ্জনের ডাক নাম ছিল ভোম্বল, তার সঙ্গে উপাধিও ছিল দাশ। আর ভোম্বল দাশ যে সিংহের মামা, এ কথা বাঙালীদের মধ্যে কার না জানা আছে? সুতরাং চিররঞ্জন যদি এস পি সিংহের মামা হ'লেন, তা হ'লে পিতা চিত্তরঞ্জনের পক্ষে মাতামহ না হ'য়ে উপায় ছিল না। এই অকাট্য যুক্তির বলে লছমীপুর মামলার নাম হ'য়েছিল নাতি-মাতামহর মামলা।

চিত্তরঞ্জন ভাগলপুরে এসে বিহারের জনপ্রিয় নেতা পরলোকগত দীপনারায়ণ সিংহের বৈঠকখানা বাড়িতে উঠেছেন। সেখানে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর মক্কেল লছমীপুর-রাজ। শহরের মধ্যস্থলে ক্লীভল্যান্ড রোডের উপর এই প্রশস্ত এবং মনোরম বৈঠকখানা বাড়ি অবস্থিত। নগরের মেরুদণ্ডস্বরূপ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ক্লীভল্যান্ড রোড ভাগলপুরের দীর্ঘতম এবং প্রধানতম রাজপথ। সেই পথ থেকে তোরণ অতিক্রম ক'রে ভিতরে প্রবেশ করলেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; তার দিকে দিকে সুবিন্যস্ত কেয়ারিকরা ফুলের গাছ। প্রাঙ্গণ শেষে বেশ-খানিকটা জায়গা জুড়ে বৈঠকখানা বাড়ি; তার অব্যবহিত উত্তরে একটানা খরস্রোতা ভাগীরথী নদী। নদীর পর পারে সুদূরবিস্তৃত তৃষ্ণার্ত চরভূমি উত্তর জলপ্রান্ত লেহন করছে; এবং তারও বহু উত্তরে আকাশ ও ধরিত্রীর অস্পষ্ট মিলন রেখা। এই সুন্দর মনোরম পরিবেশ শুধু ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের পক্ষেই নয়, কবি চিত্তরঞ্জনের পক্ষেও অনুপযুক্ত হয়নি।

চিত্তরঞ্জন ভাগলপুরে পৌঁচেছেন। প্রত্যুষে আমরা উকিল, মোক্তার ও রাজ-কর্মচারী মিলে দশ-বারো জন ব্যক্তি তাঁর বাসগৃহে প্রথম মন্ত্রণা সভায় সমবেত হয়েছি। আমাদের দলপতি ভাগলপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল চন্দ্রশেখর সরকার। দক্ষিণ দিকের বিস্তীর্ণ বারান্দায় বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছে। পাশাপাশি খান তিনেক টেবিল পড়েছে, তার ধারে ধারে গোটা পনের-ষোল চেয়ার; টেবিলের অপরদিকে চিত্তরঞ্জনের বসবার আসন। আসন গ্রহণ ক'রে উকিলেরা মৃদুস্বরে কথোপকথন করছেন। আমি কিন্তু চিত্তরঞ্জনের আগমনের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হ'য়ে ব'সে আছি,—ব্যারিস্টার অথবা কবি, কোন্ চিত্তরঞ্জনের প্রতীক্ষায় বেশি, সে কথা বলা কঠিন।

ক্ষণকাল পরে ড্রেসিং গাউন পরিহিত দীর্ঘকায় সৌম্যমূর্তি চিত্তরঞ্জন সবেগে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। আমরা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মাথা নেড়ে নেড়ে সকলকে অভিবাদন ক'রে বসতে ব'লে নিজের চেয়ারে তিনি ব'সে পড়লেন। দেখে দেখে খুশি হ'য়ে মনে মনে বললাম, হ্যাঁ, অধিনায়ক হবার উপযুক্ত আকৃতি বটে! বলিষ্ঠ অবয়ব—দুই চক্ষুর মধ্যে প্রতিভা এবং বুদ্ধির সুস্পষ্ট দীপ্তি, এবং সমস্ত অঙ্গ জুড়ে অপরাজেয়

পৌরুষের এমন এক উচ্ছল প্রকাশ, যার মধ্যে আশ্বাস বাসা বাঁধতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা-বোধ করেনা।

প্রথমে সাধারণভাবে দু-চারটা কথাবার্তার পর চিত্তরঞ্জন মকর্দমার প্রসঙ্গে প্রবেশ করলেন। মকর্দমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, বাদী এবং প্রতিবাদিনীর বংশে ও জাতিতে হিন্দু আইন অনুযায়ী দত্তক-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে অথবা নেই। বাদীগণের মতে নেই; সুতরাং প্রতিবাদিনী রাণী কুসুমকুমারীর তথাকথিত পুত্রের একান্তই যদি দত্তক গ্রহণ হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তা অবৈধ হয়েছে,' অতএব রাণী কুসুমকুমারীর পরলোকগত স্বামীর অবর্তমানে বাদীগণ সমগ্র লছমীপুর স্টেটের অধিকার পাবার উপযুক্ত। এ বিষয়ে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, যদিও তাঁরা নিজেদের বংশকে সুরযবংশী রাজপুত বংশ নামে অভিহিত করে থাকেন, কিন্তু মূলত তাঁরা আদিবাসী অহিন্দু। হিন্দু আইনের যে কয়েকটি বিধি তাঁরা বহুব্যবহারের ফলে জাতির সুস্পষ্ট সম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন তদ্ব্যতীত অপর সকল বিধিই তাঁদের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। হিন্দুদের আচরিত দত্তক গ্রহণ প্রথা এ পর্যন্ত তাঁদের বাইশি-চুরাশি গাদিতে অবলম্বিত হয়নি; সুতরাং হিন্দু আইন অনুযায়ী দত্তক গ্রহণ প্রথা তাঁদের জাতিতে প্রযোজ্য নয়।

এ উক্তির উত্তরে প্রতিবাদিনী বলেন, মূলত তাঁরা হিন্দু, সুতরাং হিন্দু আইনের সকল সূত্রই তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বহু দীর্ঘকাল অনার্য ভূখণ্ডে ঘাটোয়ালি বৃত্তি অবলম্বনের সূত্রে বাস করার ফলে অনার্য জাতির কোনো কোনো প্রথা যদি তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে, তার জন্য তাঁরা হিন্দুত্ব থেকে স্খলিত হন নি। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, স্খলিত হয়েছেন, তা হ'লেও হিন্দু আইনসম্মত দত্তক গ্রহণ প্রথা তাঁদের বাইশি-চুরাশি গাদির মধ্যে প্রবর্তিত আছে তার বহু বহু দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে।

পাঠকগণ প্রতিবাদিনীর যুক্তির মধ্যে এই পারস্পরিক বিরোধ লক্ষ্য করে বিস্মিত হবেন না। বিধাতা আমাদিগকে দুটি করে চর্মচক্ষু দিয়ে তার সঙ্গে অল্প-বিস্তর চক্ষুলজ্জাও দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস চক্ষুলজ্জার জন্য দুটি চক্ষুর একান্ত প্রয়োজন। Binoculai vision ব্যতীত

চক্ষুলজ্জার খোলতাই হয় না। লক্ষ্য করে দেখবেন একচক্ষু মানুষের সাধারণ মানুষের চেয়ে চক্ষুলজ্জা একটু কম হয়ে থাকে। আইনের প্রাণ হয়ত নেই, কিন্তু চক্ষু আছে। তাই আইন-বিষয়ক অনেক গ্রন্থে 'in the eye of law' বাক্যটির প্রয়োগ দেখা যায়। আইনের এই অচর্ম অদ্বিতীয় চক্ষুতে চক্ষুলজ্জার কিন্তু কোনো বালাই নেই। সেই জন্য আইনের প্রসঙ্গে পরস্পরবিরোধী যুক্তি প্রদর্শন করবার পক্ষে তেমন কোনো বাধা দেখা যায় না। হাঁড়ি বিক্রয়ের মামলায় প্রতিবাদীর পক্ষ থেকে এমন উত্তরও অনেক সময়ে শুনতে পাওয়া যায় যে, প্রথমত, বাদী প্রতিবাদীকে আদৌ কোনো হাঁড়ি বিক্রয় করেন নি, সুতরাং বাদীর মামলা মায় খরচা ডিসমিস হবার উপযুক্ত; দ্বিতীয়ত, বাদী যদি প্রতিবাদীকে একান্তই হাঁড়ি বিক্রয় করে থাকেন, তা হলে ফুটো হাঁড়ি বিক্রয় করেছেন, সুতরাং বাদীর মামলা মায় খরচা ডিসমিস হবার উপযুক্ত। ঠিক এতটা চক্ষুলজ্জার অভাব না দেখা গেলেও, আইন-আদালতের জগতে এর কাছাকাছি চক্ষুলজ্জার অভাব হামেসাই দেখা যায়।

কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে চিত্তরঞ্জন হাঁক দিলেন, "বদরী!"

বদরী যে, কোনো-এক ভৃত্যের নাম, সে অনুমান করতে ভুল হ'ল না। পর মুহূর্তেই ধুতি-চাপকান পরা গোলগাল চেহারা বদরী এসে উপস্থিত হল। মুখে অখণ্ড পরিতৃপ্তির অনাবিল প্রশান্তি। বোঝা গেল খায়-দায় ভাল,—খোস মেজাজে আছে।

বদরীকে দেখে চিত্তরঞ্জন বল্লেন, "ডাঁটা নিয়ে আয়!"

ডাঁটা নিয়ে আয়! আইনের এ পরামর্শ সভায় ডাঁটা কি হবে? আর, কিসেরই বা ডাঁটা! ভুল শুনলাম না ত?

কিন্তু না,—ঠিকই ত শুনেছি। এক গোছা, দশ-বারোটার কম হবে না, সরু সরু ছোট ছোট কিসের ডাঁটা নিয়ে এসে বদরী চিত্তরঞ্জনের ডানদিকে টেবিলের উপর রেখে গেল।

কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠল! ডাঁটায় কি হয় দেখতে হবে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। ডান হাতে একটা ডাঁটা তুলে নিয়ে ডান কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক খরখর করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চিত্তরঞ্জন নির্মমভাবে কান চুলকোতে লাগলেন;—এমন নির্মমভাবে যে, সে যেন নিজের কানই নয়, যেন বাদীপক্ষের ব্যারিস্টারের কান! সে ডাঁটাটা ফেলে দিয়ে আবার একটা ডাঁটা নিয়ে বাঁ কানে ঢুকিয়ে ঠিক একই ব্যাপার করলেন।

সেদিন জানতে পারিনি, কিন্তু কয়েক দিন পরে জেনেছিলাম যে, ডাঁটাগুলি সাধারণ কচু গাছের ডাঁটা। চিত্তরঞ্জনের অতি সামান্য একটু বধিরতা ছিল। কোনো-এক প্রবীণ কবিরাজের পরামর্শে, কান চুলকোলে তিনি কচুর ডাঁটা দিয়ে চুলকোতেন। তাতে ক্ষতি ত কিছুই হোতই না, অধিকন্তু কচুর রসের ভেষজ-গুণে বধিরতার কিছু উপকার সাধনই করত। দেখতে দেখতে কয়েকটা ডাঁটা খরচ হয়ে গেল।

একটা জটিল প্রশ্ন উঠেছিল। প্রশ্নটা ঠিক মনে নেই, কিন্তু সব দিক বাঁচিয়ে তার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে উঠছিল না। চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে চন্দ্রশেখরবাবু থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য কয়েকজন প্রধান উকিল তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু কেহই ঠিক পথটি নির্দেশ করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না।

"আচ্ছা, আমার মনে হয়, ও case-lawটা (নজিরটা) ওদের পক্ষে অব্যবহার্য করে দেবার জন্যে—"

যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ের সহিত উপলব্ধি করি। আমি কথা কইতে আরম্ভ করেছি, আমি,—অর্থাৎ বছর আড়াইয়ের দু টাকায় এজাহার-লেখা একজন অর্বাচীন উকিল! হাতী ঘোড়া যেখানে গেল তল, সেখানে আমি বলছি কত জল? ইংরিজিতে একটা কথা আছে, Fools rush in where

angels fear to tread। যে ভূমিতে পদার্পণ করতে পণ্ডিত ব্যক্তিরা ভয় পায়, নির্বোধেরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সত্যের প্রমাণ পূর্বে আরও এক-আধবার দিয়েছি; এই বারই প্রথম নয়। ঝাঁপিয়ে পড়ার অভ্যাস খানিকটা আছে। ঔৎসুক্যের সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে চিত্তরঞ্জন বললেন, "কি আপনার মনে হয়, বলুন।"

তখন আর না বলে উপায় ছিল না। যথাসাধ্য গুছিয়ে-গাছিয়ে আমার অভিমত ব্যক্ত করলাম।

মনোযোগ সহকারে সমস্ত কথা শুনে মৃদুভাবে মাথা নেড়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "না, এটা আপনার Wrong View (ভুল অভিমত) হচ্ছে; ও পথে গেলে আমাদের অন্য অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে।"

মনে মনে নিজের কান ম'লে দিয়ে চেয়ারে কুঁকড়ে বসলাম। ধৃষ্টতার দম্ভ হাতে হাতে পাওয়া গেছে।

মিনিট দশেক পরে সেদিনকার মতো বৈঠক শেষ হ'ল। সমস্যাটার বিশেষ কোনো সমাধান হ'ল না; প্রশ্ন প্রশ্নই রয়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন উঠে দাঁড়াতেই সকলে হুড়মুড় করে উঠে পড়ে নিজ নিজ ব্রীফ গোছাতে প্রবৃত্ত হলেন। অন্দরের দিকে খানিকটা এগিয়ে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন আমার প্রতি ইঙ্গিত করলেন, "শুনুন।"

তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে যেতে রেলিং-এর ধারে একটু সরে গিয়ে চিত্তরঞ্জন বল্লেন, "দেখুন, আপনার Suggestionটা ভুল হ'লেও ভারি intelligent suggestion হয়েছিল। গ্রহণ করতে না পারলেও আমি মনে-মনে খুসি হয়েছিলাম।"

কানটা তখনো জ্বলছিল, মনে মনে একটু হাত বুলিয়ে দিলাম।

চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এ কেসে কি করবেন? কি duty আপনার?"

বললাম, "Deposition (এজাহার) লেখাই প্রধান duty।"

মাথা নেড়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "না, Deposition লিখতে হবে না। আপনাকে অন্য একটা কাজ করতে হবে।"

মনে মনে অত্যন্ত খুসি হয়ে বল্লাম, "কি কাজ বলুন।"

চিত্তরঞ্জন বল্লেন, "Adoption (দত্তক গ্রহণ) বিষয়ে শিবগঙ্গা প্রিভিকাউন্সিল কেসটা আপনার জানা আছে?"

বললাম, "আছে। সম্প্রতি ভাল করে ও কেসটা পড়ে রেখেছি।"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "ও কেসটা একটা অতি পুরাতন বটগাছের মতো;—হাজারটা ঝুরি নেমেছে, কিন্তু আসল গুঁড়ি এখনো তাজা আছে, শুকিয়ে যায়নি। আমাদের ভারতবর্ষের গোটা পাঁচ-ছয় হাইকোর্টে, আর বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে ও কেস হাজারবার আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোথাও over-ruled (বাতিল) হয়নি। ঐ কেসের মধ্যে আমাদের উভয় পক্ষের জীবন-কাঠি আর মরণ-কাঠি রাখা আছে। জীবন-কাঠির সন্ধান প্রথম যারা পাবে তারাই হবে জয়ী। ঐ কেসের একটি ভাল রকম Synopsis (সারসংগ্রহ) আপনাকে তৈরি করতে হবে।"

সাগ্রহে বললাম, "আজ থেকেই আরম্ভ করব।"

চিত্তরঞ্জন বল্লেন, "কিন্তু সাধারণ Synopsis হলে চলবে না, যত হাইকোর্ট আর প্রিভিকাউন্সিল কেসে শিবগঙ্গা কেস আলোচিত হয়েছে, সবগুলিকে জড়িয়ে Synopsis করতে হবে।"

হাসিমুখে বললাম, "তাই করব।"

দাস সাহেব বললেন, "এ কাজে আপনার অন্তত মাস দুই আড়াই সময় লাগবে। ও সময়টা আপনাকে কোর্টে আসতে হবে না, বাড়ি ব'সে কাজ করবেন। আমি অনন্তকে বলে দেব।"

অনন্ত, অর্থাৎ অনন্ত প্রসাদ, আমাদের বারেরই একজন উকিল; উপস্থিত সে লছমীপুর স্টেটের ম্যানেজার।

চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাবের প্রতিবাদে ব্যগ্রকণ্ঠে বললাম, "অনুগ্রহ করে সে রকম ব্যবস্থা করবেন না। আপনি কোর্টে মামলা চালাবেন আর তা দেখা থেকে বঞ্চিত হয়ে বাড়ি বসে আমি কাজ করব, সে আমার পক্ষে একটা দণ্ড হবে। আমি রাত জেগে আপনার কাজ করে দেবো। রাত জাগা আমার অভ্যাস আছে।"

স্মিতমুখে চিত্তরঞ্জন বললেন, "আচ্ছা, তাই হবে।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাকে ফিস্ কত দিচ্ছে এরা?"

মৃদু হেসে বললাম, "বোধ হয় গোটা পাঁচেক করে দেবে।"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বল্লেন, "মোটে! আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি অনন্তর সঙ্গে কথা কইব।"

আমার নাম জেনে নিয়ে চিত্তরঞ্জন ভিতরে প্রবেশ করলেন।

দিন দুই পরে অনন্ত আমাকে বললে, "দাস সাহেব তোমার ফি কত ঠিক করেছেন জান উপেন?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কত?"

"বিশ রুপৈয়া।"

"তুমি রাজি হয়েছ?"

অনন্ত বললে, "দাস সাহেবকা হুকুম,—ইসমে রাজি ঔর গৈররাজিকা কোন্ বাত হ্যায়।" (দাস সাহেবের হুকুম,—এতে রাজি আর গররাজির কোন্ কথা থাকতে পারে।)

বল্লাম, "তুমি দুঃখিত হয়ো না। তোমার কাজের জন্যে পাঁচ টাকাই আমি পাব; আর পনেরো টাকা পাব দাস সাহেবের কাজের জন্যে।"

"বড়া চালাক হো।" ব'লে পিঠে একটা চড় বসিয়ে হাস্তে হাসতে অনন্ত প্রস্থান করলে।

(ক্রমশঃ)
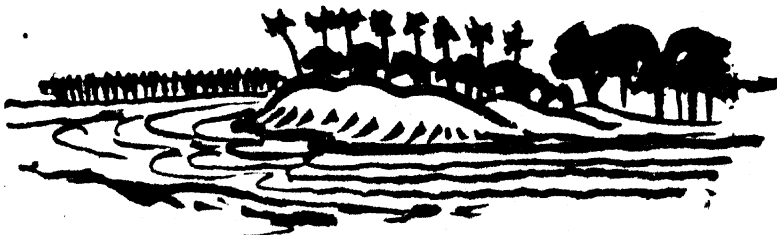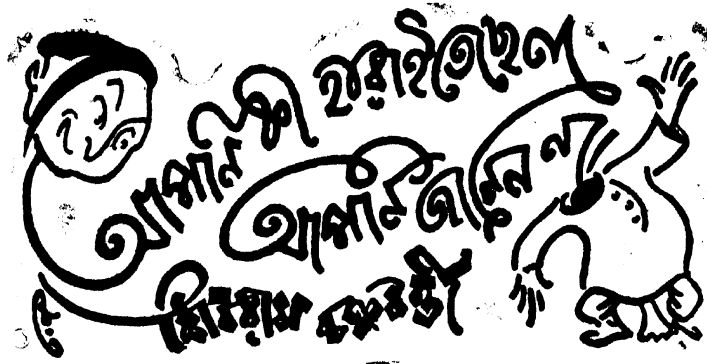
গালে হাত দিয়ে বসে আছি......ভাবছি বসে বসে.........

প্রিসিলা এসে ঢেউয়ের মতন ভেঙে পড়লো......আমার অচল শিলাস্তূপের সামনে.........

"গালে হাত দিয়ে কী ভাবছ মেজ-মামা?"

"কতো কী-ই তো ভাবা যায়। হাতের এই যে বাজে খর্চা—গালে খাবার না দিয়ে শুধু শুধু হাত দিয়ে থাকা—এই সব অপ-ব্যয়ের হাত থেকে কি করে বাঁচা যায়—তাও তো ভাবতে পারি?"

"নাও, আর ভাবতে হবে না। এই চকোলেট খাও।" প্রিসিলা আমার গালে তুলে দেয়।

আমি ওর চকোলেটকে গাল দিই—অম্লানবদনে। তারপরে আমার খালি হাত-খানাই ওর গালে তুলি—আদরের নরম গালিচায়। ওর চকোলেটের বিনিময়ে। (এর নাম ফেয়ার এক্সচেঞ্জ।)

"আচ্ছা মেজ-মামা, বলো তো, যখন তোমার শরীর ভালো নয়—গা ম্যাজ ম্যাজ করছে—চোখ ছলো-ছলো—মাথা ভার ভার—গা হাত পা ভারী—এক একটা যেন এক মণ—"

"দু মণ।" আমার ভ্রম-সংশোধন—"এক মণ হতে পারলে তো হোতোই রে! জীবনে অনেক কিছুই করতে পারতাম। দু-মনা হয়েই গেলাম।"

"আহা, তোমার নয় গো। আমার নিজের কথা বলছি, তুমি যে এক মণ চল্লিশ সের, তা আমার জানা আছে। তোমার হয়নি—হয়েছে আমার। কেবল মন ভার নয়, গা গলা হাত পা সব ভার ভার। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়েছে—সর্দি হয়ে জবরো জবরো ভাব—নাক শুড় শুড় করছে——"

"গান গাইবার জন্যে।" আবার আমার বাধাদান—"নাক থেকেই তো সুর বেরোয়। গাইয়ে আর হাতী দুজনকারই। গেয়ে ফ্যাল

'গাল' গল্পের মুখবন্ধ

কিম্বা হেঁচে ফ্যাল। যা খুশি।"

"হ্যাঁ, হাঁচিও আসছে। নাক ফ্যাচর ফ্যাচর করলে—"

"তার হ্যাঁচকা টানে হাঁচিরা আসবেই। বলে, আমাকেই নাকাল করছে কতোবার!"

"চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে—নাক দিয়েও। গা জড়াচ্ছে। ইচ্ছে করছে বিছানায় গিয়ে কাত হই—আর কেউ এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিক! এমনি অবস্থা, আর মনে করো, এমন সময়ে কেউ যদি এসে তোমার আদিখ্যেতা করে বলে—বাঃ, বেড়ে দেখছি তোমাকে আজ—তাহলে তোমার কী ইচ্ছে করে? বলো তো?"

"মরতে ইচ্ছে করে।"

"মারতে ইচ্ছে করে আমার। ইচ্ছে করে যে চটাস্ করে তার গালে একটা চড় মারি।"

"তুই চটে যাস। বুঝলাম।" আমি গাল নাড়ি—চকোলেটটাকে ভালো করে গালাই—"কিন্তু অমন চট্ করে কি চট্তে আছে? মেয়েদের?"

"চটবো না? কাল আমার কী হয়েছিলো জানো তুমি? এত খারাপ লাগছিলো যে কী বলবো। তবু আমায় বেরুতে হোলো বাইরে। কেনাকাটার কাজ ছিলো দু' একটা। তাছাড়া, আমার নতুন শাড়িটা কালকেই পরে বেরুবো ঠিক করে রেখেছিলাম——"

"অসুখের ওপর শাড়ি কেন? শুক-সারি, কথায় বলে। শাড়ির সঙ্গে সুখ জড়ানো। গায়-গায় ওতপ্রোত হয়ে। অসুখ সারিয়ে তারপরেই পরতে পারতিস!"

"আগের থেকেই ঠিক করা ছিলো যে! কোন্ শাড়িটা কবে পরবো—কার সঙ্গে ম্যাচ করে—আমার আগের থেকেই ঠিক করা থাকে।"

"একেবারে তারিখ দিয়ে? ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচের মতন? বলিস কিরে?"

"নিশ্চয়। আপ্-টু-ডেট মেয়ে হওয়া কি চারটিখানি?......যাক্, যে কথা বলছিলাম ......নতুন শাড়িটা পরে বেরিয়েছি।। এঁচে রেখেছি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে আসবো। বাড়ি ফিরেই সটান্ শুয়ে পড়বো বিছানায়। কিন্তু বরাতে থাকলে তো!"

"কেন, কী হোলো?" আমি টান হয়ে বসলাম। কোনো মেয়ের বরপক্ষ বা বরাত-পক্ষে গোলোযোগ ঘটা .আমি ভালো বোধ করি না।

"পথে দেখা হোলো রেবার সঙ্গে। তার সেই কালো কুচকুচে ভাইটা—শ্যামলকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে বেরিয়েছেন! একই ফুটপাথে মুখোমুখি হয়ে গেল।"

"হোলোই বা! রেবার সঙ্গে মুখোমুখি হলে কারো তো খারাপ লাগবার কথা নয়।" আমি বলি—"দেখেছি তোর রেবাকে। মুখের দিক দিয়ে—মন্দ না নেহাৎ।"

"একখানা কালো মেঘের মতই সে ভেসে এলো যেন। এসেই সুরু করলো বর্ষণ। ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে চললো তার গজালি। নামটি নেই থামবার। নিজের নানান্ অসুখ বিসুখের খোস-খবর শুনিয়ে—সমস্ত খুঁটিনাটি জানিয়ে অবশেষে বললো—

আহা ভাই, তোর মতন যদি দিব্যি শরীর পেতাম—অমন স্বাস্থ্য যদি থাকতো আমার—

আমি বাধা দিয়ে বলতে গেলাম—আমার শরীরটাও ভাই আজ—

শ্যামল বলে উঠলো মাঝখান থেকে—শীলাদিকে দিব্যি দেখাচ্ছে আজকে। না মেজদি?

শুনেই আমার গা যেন জবলে উঠলো। ইচ্ছে হোলো—কী ইচ্ছে হোলো বলবো তোমায় মেজমামা? ইচ্ছে হলো যে দিই কসে এক বাড়ি শ্যামলটার মাথায়।"

শ্যামলের দিবা-দর্শন!

"দিলি না কেন? মাথাটা খুলতো ছোঁড়াটার।" বলে আমি গুণগুণ করলাম।—

"রেবা নদীর তীরে। এমনি বারি ঝরেছিলো—শ্যামল-শৈল-শিরে॥"

"যাক্ কোনোরকমে তো ভাইবোনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। কিন্তু যাই না একটু এগিয়েছি অমনি ফের মণিকার সংগে দেখা। সেও বেরিয়েছে রাস্তায়।

"কেমন আছিস ভাই প্রিসি?" বলে এসেই সে সুরু করলো। ওর কথার জবাবে ভালো নেই বলতে যাচ্ছি—কিন্তু আমি হাঁ করার আগেই নিজেই সে ওগরালো। জোর-গলায় বল্লো—"বাঃ, ভালোই আছিস তো। ভালোই দেখাচ্ছে তোকে। বেশ দিব্যিটি।"

"দিব্যিই আছি, হ্যাঁ।.....হ্যাঁচ্চো" সায় দিয়ে বল্লাম আমি—ওর কথায়।

মণিকাকে ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়েছে, আরেকজনা এসে হাজির। কোনদিক থেকে এলো কে জানে!......"

"দিগঙ্গনা কি না! যে কোনো দিক থেকেই আসতে পারে।" আমি জানালাম।

এসেই সে কথা পাড়লে—"ইস্ প্রিসি, হয়েছিস্ কী রে! এমন সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে যে......আহা, তাজা রক্তে টক্‌টকে গাল। ঠিক আপেলের মতই লাল। বেশ ভালোই আছিস বোঝা যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, ভালোই।" বলে' আমি নাক ঝাড়লাম। নিজের বোঝা নামালাম।

কিন্তু ন্যাকা মেয়ে আমার নাকের ভাষা বুঝলে তো! বাধ্য হয়ে, ঝাড়বার পর, ওর শাড়িতে নাক মুছতে গেলাম আমি।

বল্লাম—ভাই, আমার নতুন শাড়িটা, সবে আজকেই পরেছি—এটা আর নষ্ট করতে চাই নে। তোর শাড়িতেই আমার নাকটা—

তখন সে পালালো—আমার নাকের বিপাকের থেকে বাঁচতেই।"

মৈনাক, সৈনিক হও—বলে' একটা কথা যেন কোথায় শুনেছিলাম! আমার মনে পড়ে। কিন্তু সে কি—ঐ নাক লক্ষ্য করেই? কে জানে!

"মেয়েটাকে অমন করে নাকাল করলি? ছিঃ!" আমি ধিক্কার দিই।

"তারপর চার নম্বরীকে আসতে দেখা গেল। অদূরে শ্রীমতীর আবির্ভাব হতে দেখেই ভাবলাম আগের থেকেই পাশ কাটাই —সময় থাকতে কেটে পড়ি—কিন্তু হায়, সে-চেষ্টা করার আগেই—নিজেই আমি কাটা পড়লাম।"

"হায় হায়!" আমারো।

"হায় হায় বলতে! মুখপুড়ি যেন মানোয়ারি জাহাজের মতই ঘাড়ে এসে পড়লো। ফুটপাথ বদ্‌লাবার ফুরসৎ-টুকুও দিলো না!"

"দিলো না তো? দেবেই না। জানা কথা। কথার জাহাজ বয়ে আনছে যে! আগে কেবা কান করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি—" আমি কবিতা দিয়ে বুঝিয়ে দিই। কার কবিতা কে জানে!

"আর, এসেই যা ফরফরানি সুরু করলো —তার কী বলবো যে—"

"করবেই তো! সফরে বেরিয়েছে কিনা।" আমি বিস্তারিত করি—"করবেই, জানা কথা। কেননা, শাস্ত্রেই বলেছে—সফরী ফরফরায়তে।"

"ফরফর বলে ফরফর? সে আর থামে না। আর সেই এক কথা, বেশ খাসাই আছিস দেখছি! সেই একঘেয়ে খবর!......

"বাঁধা ফরমুলা।" অবাধে সায় দিই—আমিও।

তখন কি করি, প্রতিশোধ নিতে হোলো আমায়—বাধ্য হয়েই। বল্লাম আমিও—'তুমিই বা কম কি খাসা বাপু? খাসীর মতন ফুলছে—দিনকের দিন!"

শুনে সে বললো, না ভাই বলিস্‌নে, তেমন আর ভালো নেই। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়েছে বেজায়। বলেই সে নিজের দৈহিক নানানখানার যতো দুঃসংবাদ

মীরার MIRROR-এ নিজেকে দেখার পর

জানাতে লাগলো আমায়। দাঁত কন্‌কন্, চোখ টন্ টন্, মাথা ঝন্ ঝন্—ইত্যাদির তালিকা একে একে শুনিয়ে দিলো সব। শুনতে হলো আমায় মুখ বুজে। সমস্ত ফিরিস্তি শুনে......শুনে টুনে আমি বল্লাম সর্দি হওয়া তো ভালোই। সর্দি হলে শরীর তাজা হয়। গায়ের রক্ত বাড়ে। সব গালে এসে জমে। গাল টক্‌টকে হয়, ঠোঁট টুক্‌-টুকে হয়। সারা মুখ আপেলের মত পেল্লাই হয়ে ওঠে।"

"বল্লি তুই? ওর মুখের ওপর বল্লি?"

"বলে দিলুম দাঁত মুখ খিঁচিয়ে। শুনে ও বল্লে, তুই আমায় খুঁড়ছিস্? আজ শনিবার দিন খুঁড়লি আমায়? বলে আঙুল কামড়ে দিলো।"

"আহাহা, দেখি দেখি।" আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি—"দেখি তোর আঙুল? জাম্‌বাক্ লাগিয়ে দিই জায়গাটায়।"

"আমার না গো, তার নিজের আঙুল কামড়ালো।" বাৎলালো প্রিসিলা: "আমারটা

কখনো আমি কামড়াতে দিই? আমি খুঁড়লাম কিনা ওকে, তাই। আমার কথায় নিজের আঙুল গুটিয়ে চলে গেল সে।"

"তারপর মিটলো তো গোল? কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরলি তো তারপর?

"তার অনেক—অনেক পর। তারপরেও আরেকজনকে আসতে দেখা গেল। আরেক সহপাঠিনী—তবে এ মেয়েটা ইস্কুলের থেকে —আমার বন্ধু। সে এসে হাঁ করতেই—করতে না করতেই আমি হাঁকড়েছি—

"তুমি কী বলতে চাও শুনি মীরা? আমাকে খুব আজ ভালো দেখাচ্ছে, এই তো? কিন্তু জেনে রাখো, এ কথা বলেছো কি আর তক্ষুণি আমি তোমায় খুন করে বসেছি। হ্যাঁ, ভালো চাও তো আর একটি কথাও নয়, মুখ বুজে চুপটি করে চলে যাও, হ্যাঁ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁচ্চো—"

"না, সেকথা আমি বলিনি—" বল্লে সে, "আমি বলছিলাম কি—তোকে খুব ভালো দেখাচ্ছে এই শাড়িটা পরে। আজকের শাড়িটায় তোকে মানিয়েছে এমন! চমৎকার!"

শুনে—শুনতে না শুনতে—সেই দণ্ডেই যেন আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। শাড়িটাকে ভালো বলে মীরা যেন এক মিনিটে আমায় সারিয়ে দিলে—এক কথায়। মিরাকলের মতই। সব সর্দিটর্দি সরে গেল—ভালো হয়ে গেল সব। মাথা হাল্কা হোলো, শরীর ঝরঝরে হয়ে গেল দেখতে না দেখতে। সেই ম্যাজম্যাজানি গেল, ফের আমার মেজাজ ফিরে এলো। গা হাত পা যা টনটন্ করছিলো তা যেন চোখের পলকে পালকের মতন তুলতুল করতে লাগলো। এক টনের থেকে একেবারে এক ছটাকে নেমে এলাম আমি......!"

"ইস্, বেজায় বলছিস্। ভারী তোর কথার ছটা দেখছি।" শুনে শুনে এমন ঈর্ষা হয় আমার।

—বুঝেছিরে বুঝেছি। শারীর প্রশস্তি শুনে এমন স্বস্তি পেলি যে, সব উপসর্গ দূর হয়ে তোর সমস্ত জ্বালা আরাম হয়ে গেল। এই তো বলছিস?

"হ্যাঁ, এমন আরাম পেলাম মেজমামা, কী বলবো! আমার চোখ চক্ চক্ করতে লাগলো, গাল টক্‌টক্ করতে লাগলো। একেবারে তাজা আপেল—যা শুধু শেখ আবদুল্লাই দেখতে পান—পেলাম যেন আমার গালে।......" বলেই শুধরে নেয়—"মানে, আমার গালের ভেতরে নয়, ওপরেই।"

"মানে, তোর ঐ পেলব গাল আপেলব হয়ে উঠলো। এই তো?" আমি বলি—"এইতো বলছিস্? শুনি তারপর?"

"তারপর? মীরাকে আমি আদর না করে পারলাম না। ওর নরম গালে আমার গাল দিয়ে একটুখানি, তোমার ভাষায় বলতে গেলে কী বলবো? কিছুক্ষণ —গালাগালির পর, আমি বল্লাম—"চ ভাই মীরা, তোকে কিছু খাওয়াই চ।" বলে ওকে ধরে তক্ষুণি কফি হাউসে নিয়ে গেলাম টেনে। ওর কোনো ওজোর না শুনে—জোর করেই একরকম।"

পরিক্রমা

আব্দুর রসিদ খান

একটি পাত্রে সঞ্চিত জ্ঞান-সুরাঃ
এখনো তাহার অনেক রয়েছে খালি।
মিনারের নীচে দাঁড়ায়ে দেখ্‌ছি চূড়া।
সাগর-প্রান্তে কেবল জমেছে বালি॥

অজান্তে মন পথের সঙ্গী হলো।
হৃদয়ের দ্বারে মুক্ত হাওয়ার পথ
বাঁকা হ'য়ে বলেঃ শপথ-নিবাসে চলো।
দিগন্তে দৃঢ় দৃষ্টি-জড়ানো মত॥

একদা চক্ষে পড়েছে বালির কণা—
দিনকে পেলাম রাত্রির মতো কালো।
ঘোলাটে দৃষ্টি দেখে উদ্ধত ফণা—
অথচ সেখানে জাগে বলিষ্ঠ আলো॥

দ্বৈত পথের সীমানায় দ্বিধা মন,
বিভক্ত মন সজ্জিত দুই ধারেঃ
জ্বললো আগুন, প্রলয়ের কম্পন;
প্রাণের মৃত্যু রুদ্ধ মনের পারে॥

কী পেলাম আর কী পাই, কী-ই বা পাবো—
দেখিনি সে সব হিসাবের পাতা খুলে।
শ্মশানের বুকে বিজয়-গর্বে যাবোঃ
শৃগাল শকুন মত্ত আসরে ঢুলে॥

মানুষের হাড়ে রাজ্যের পাটাতন।
শান্তির বাণী পরাজিত আশ্বাসে॥
জ্ঞানের সুরায় স্বার্থ-ঘোলাটে মন।
মনের কিনারে আদিম রক্ত হাসে॥

জ্ঞানের পাত্রে প্রতিবিম্বিত চূড়া
তারার রাজ্যে সহসা উধাও, তাই
কুটিল হস্তে রক্তলোলুপ সুরা
জ্বালে মনে এক মৃত্যুর রোশ্‌নাই॥

অসবর্ণ বিবাহ

শ্রীচুণীলাল রায় চৌধুরী

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণ (বিপ্র, ক্ষত্রিয় বৈশ্য) পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির আদর্শ ভুলিয়া আজ শতধাবিভক্ত। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, গণ্ডীর স্বার্থ ও অপরের প্রতি ঔদাসীন্য এই সমাজকে এতই দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে যে, গোটা হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব আজ বিপদাপন্ন। অন্যায়কে প্রতিরোধ করিবার এবং সমাজকে শক্তিশালী করিবার দায় বা দায়িত্ব কাহারও নাই। গড্ডলিকা স্রোতে নিশ্চিন্ত আলস্যে গা ঢালিয়া দিয়াছি, আত্মরক্ষার যে সহজাত সংস্কার প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে অনুস্যূত সেই সংস্কারও আজ স্তিমিতপ্রায়। একবার ভাবিয়া দেখিতেছি না এই ঔদাসীন্য আমাদের কোন্ মরণের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত বর্ণগুলিকে ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া দিবার চেষ্টা এক সময়ে সমাজ সংস্কারকগণ কর্তৃক খুব জোরের সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল, হরিজন আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, অসবর্ণ প্রতিলোম যৌন সম্বন্ধ স্থাপন ইত্যাদি নানা প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল কিন্তু হিন্দু সমাজের ভিৎ তাহাতে নড়ে নাই। বৌদ্ধ প্লাবনের মুখেও একবার অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সুফল ঘটে নাই, শুধু কিছু বর্ণ সঙ্করের উদ্ভব হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তথাকথিত বৈষ্ণবগণও একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য হন নাই—হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগ অব্যাহতই রহিয়া গেল। ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ণ বিভাগের আদর্শ এমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কখনও কখনও ইহা আদর্শভ্রষ্ট হইলেও মূল কাঠামো একেবারে ভাঙিয়া পড়ে নাই, মূল বৈজ্ঞানিক সত্যকেও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কারণ সমাজ বলিতে কতগুলি ব্যক্তির স্থূল বহির্মিলন ও সমাবেশ মাত্র নয়, বংশানুক্রমিক গুণ ও জাতির উপর প্রতিষ্ঠিত দৃঢ়ভাবে গঠিত স্ফটিকবৎ সমাজ-সংহতি। বংশানুক্রমিক গুণানুমত শ্রেণী বিভাগে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয় অধিক পরিমাণে। এক ইষ্ট বা আদর্শে গ্রথিত হইয়া সমস্ত সমাজ বহুবিচিত্র গুণখচিত স্ফটিকের মত বিবর্তিত হইয়া ওঠে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ইহাতেই সমাজ-কল্যাণের আদর্শে বিধৃত হইয়া সার্থক হইয়া ওঠে, মানবসমাজে শ্রেষ্ঠ মানবের অভ্যুদয় হইতে থাকে। শ্রেষ্ঠ মানবের অভাব এই বিধানেই দূর হইতে পারে।"

"I think that in future we may find in another guise, the caste system which held sway for so many centuries in India.

"The original idea was, of course, this breeding of men particularly suited to our task. Lacking our scientific knowledge, early philosophers were yet wise enough to see if group of families engaged, for example in gardening, did not mingle with other families who were money-lenders, the children to come would probably be better and better gardeners. In essence these philosophers were right."

J. S. Crowther.

বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য আজ পাশ্চাত্য দেশের লোকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একাকার যাঁহারা করিতে চান তাঁহারা প্রায়ই জীববিদ্যার দোহাই দিয়া বলেন, জীবজগতে সকলেই সমান। কিন্তু জীব-বিবর্তনের প্রধান জিনিস হইল স্বাভাবিক মনোনয়ন, জীবন-সংগ্রাম এবং প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় সকলেই যাহাতে শ্রেষ্ঠত্বের বা ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছাইতে পারে, কিন্তু হিন্দু-সমাজে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা ও সুযোগ ছিল। "বেশ্যা পুত্র বশিষ্ট ও নারদ, দাসীর পুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাত পিতা কৃপ, দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইয়াছিলেন।" (বর্তমান ভারত—স্বামী বিবেকানন্দ)

কাজেই যাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণগণ নিজেদের সুযোগ সুবিধার জন্য বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহাদের উক্তি যে সর্বৈব মিথ্যা উপরোক্ত তথ্য দ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত।

কাজেই প্রচলিত বিধিব্যবস্থাকে ভাঙিয়া না দিয়া এই বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করিয়া ইহার মূল আদর্শ বিচ্যুতির সংস্কার সাধন করিয়া কেমন করিয়া সমাজকে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তোলা যায়, কেমন করিয়া প্রত্যেকটি বর্ণের সহিত পারস্পরিক বন্ধনী সৃষ্টি করা যায় সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য দিতে হইবে। তার জন্য প্রথমে চাই একাদর্শে বিধৃত করিয়া আর্যাচারের প্রবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার। কাজেই সামাজিক সংস্কার সাধন করিতে হইলে সর্বাগ্রে বিবাহ ব্যবস্থার কথাই আসিয়া পড়ে—সবর্ণ বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ আবার দুই প্রকার—অনুলোম ও প্রতিলোম। উচ্চবর্ণের নারীর নিম্ন বর্ণের পুরুষ গ্রহণের নাম প্রতিলোম বিবাহ এবং নিম্নবর্ণের নারীর উচ্চবর্ণের পুরুষ গ্রহণের নাম অনুলোম বিবাহ। বিভিন্ন বর্ণের সংহতির জন্য যে অসবর্ণ বিবাহের আবশ্যকতা, উহার আদর্শ এবং তদ্বিষয়ে বিভিন্ন জনের মতামত বিদ্যমান বর্তমান প্রবন্ধে শুধু সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করিব। কারণ অসবর্ণ বিবাহের গতিরোধ করিয়াই আমাদের জাতীয় উন্নয়নের পথ বিশেষভাবে রুদ্ধ করা হইয়াছে। "ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাহ দিতে থাকিলে জাতি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়, পক্ষান্তরে প্রশস্ততর ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হলে জাতি নূতন রক্ত ও নব বল পায়। আমরাও দেখিতেছি সকল স্থলেই পিতা অপেক্ষা পুত্র ক্ষীণকায়, হ্রস্ব দেহ ও দুর্বল হইতেছে। (মহাভারত মঞ্জরী)

"Society seems to have become almost stagnant, there was very little circulation, very little rising from one class into another, when there is neither a constant struggle between small groups nor a constant movement of individuals from class to class, vigorous life is at an end."

এবার সংহিতাকারগণ কি বলেন তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

মনুসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতে বিধি আছে যে, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা, শূদ্রাণীকে বিবাহ করিতে পারে। চারিবর্ণের মধ্যে উচ্চবর্ণের পুরুষ সেই বর্ণের কন্যা বা নীচবর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত মহর্ষি বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, আপস্তম্ব কাত্যায়ন, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, দক্ষ, গৌতম ও বশিষ্ট অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ধার্য করিয়াছেন।

বিষ্ণু সংহিতায় অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে—

অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেন চতস্রো ভার্যা ভবন্তি। ১
তিস্র ক্ষত্রিয়স্য॥ ২
দ্বৈ বৈশ্যস্য॥ ৩
একা শূদ্রস্য॥ ৪ (চতুর্বিংশোহধ্যায়)

ব্যাস স্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

"উদ্বহেত্ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয় বিশাম।
স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব বর্ণজাম।"

বিপ্র ক্ষত্রিয়াকে ও বৈশ্যাকে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে এবং বৈশ্য শূদ্রাকে বিবাহ করে। তবে প্রতিলোমভাবে নিম্নবর্ণীয় পুরুষ কখনও উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

As a matter of fact in the crosses between unequal human race, the father in the vast majority of instances belongs to the superior race.
—Edward Wester Mark. Ph.D.
Prof. of Sociology, University of London.

এইখানেও অনুলোম মিশ্রণের কথাই উক্ত হইয়াছে।

নিম্নবর্ণের নারীর উচ্চবর্ণের পুরুষের প্রতি স্বাভাবিক একটা শ্রদ্ধার ভাব বজায় থাকে এবং এই শ্রদ্ধাই তাহাকে সুসন্তানের জননী হইবার গৌরব দান করে। নারী পুরুষকে যেইভাবে উদ্দীপিত করে তেমনতর ভাব লইয়াই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এইজন্যই সংহিতাকারগণ সমাজকে পুষ্ট ও শক্তিশালী রাখিবার জন্য অনুলোম বিবাহের প্রচলন আবশ্যক বলিয়া বিধান দিয়া গিয়াছেন। আবার ঠিক তাহার বিপরীত প্রতিলোম বিবাহকে পরিহার্য বলিয়া নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে—

অসৎ সন্তস্তু বিজ্ঞেয় প্রতিলোমানুল মজাঃ।

মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

অনুলোম্যেন বর্ণানং যজ্জন্ম সবিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রতিলোমেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসংকরঃ॥

মনু সংহিতায়ও রহিয়াছে—

ব্যাভিচারেন বর্ণানাম বেদ্যাবেদনেন চ।
সকর্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসংকরাঃ ৭।

অর্থাৎ বর্ণের ব্যাভিচার বা বিপরীতাচার, শাস্ত্রানুসারে অবিবাহ্য যে তাহাকে বিবাহ এবং সকর্ম ত্যাগের দ্বারা বর্ণ সংকরত্ব প্রাপ্ত হয়।

"প্রতিলোমাস্বার্য বিগর্হিতাঃ।" বিষ্ণু সংহিতা

"প্রতিলোম পথে অবাধ্য বিকৃত, অসংযত বৃত্তির আধিক্যবশতঃ মানুষ কুপ্রবৃত্তি-পরায়ণ হইয়া থাকে। তাই উহাদের বৃত্তিও সংহিতায় নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং নামাকরণও অনুপাতিকই করা হইয়াছে। যেমন চণ্ডত্ব আছে যার সেই চণ্ডাল—তাই তাহাদের বৃত্তি ও জহ্লাদের কাজ নির্ধারিত রহিয়াছে। এই বংশানুক্রমিকতার বিকৃতি প্রতিলোম সংস্পর্শে কিছু না কিছু ঘটিবেই—তাই প্রতিলোম সংস্পর্শ এতখানি গর্হিত বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার কুফল এতখানি—ইহা জনসাধারণের সম্যক জানা নাই বলিয়া সেই অজ্ঞতার জন্যই আজ হয়ত দেশে নানা স্থানে প্রতিলোম সংস্পর্শ ঘটিতেছে। কিন্তু বিকৃত চণ্ডাল জাতীয় সন্তান কেহ চাহেন না। সুপুত্র চাহেন না এমন পিতামাতা বিরল। তাই ব্যাপার এইরূপ ঘটিয়া থাকে জানিলে কোন পিতামাতাই কুপ্রজননের প্রশ্রয় তো দিবেনই না বরং ঐরূপ বিরুদ্ধ যৌনসম্বন্ধ ও বিবাহাদি আর যাহাতে কিছুতে না ঘটিতে পারে তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন—ঐরূপে বংশের, পরিবারের ও জাতির মহান অকল্যাণ আনয়ন করিবেন না।"
(শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য)

তাই মনু বলেন—

যত্রত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রীকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥

জাতির পরিধ্বংসকারী বর্ণদূষকের সৃষ্টি হইলে প্রজাকুলসহ সেই রাষ্ট্র অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

"যোনিসংকর হইতে অতিগোপনেও যাহার জন্ম হয় সেও অল্প বা অধিকই হউক জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্য নীচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্যের ন্যায় আচার নিরত হইলেও তাহার জাতিস্বভাব নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।"
—বিবাহ রহস্য শ্রীরাধানাথ দত্ত চৌধুরী

"মনুষ্য নীচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্যের ন্যায় আচার নিরত হইলেও তাহার জাতিস্বভাব নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়।"
—ভীষ্মদেব, অনুশাসন পর্ব।

অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহের প্রচলনে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সহজ প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব বজায় থাকে—সমগ্র হিন্দু সমাজ এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। আজ যেমন গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মনেতর বর্ণের অন্নপানীয় গ্রহণ করে না কিন্তু এক সময়ে পরস্পরের মধ্যে অন্ন জলাদি গ্রহণীয় ছিল এবং নৈকট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিত। আর্য দ্বিজগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং এই দ্বিজগণের মধ্যে যে সকল জাতি অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ হইতে উৎপন্ন উহারা সকলেই শ্রদ্ধায় দান করিলে পরস্পর অন্ন গ্রহণ করিতে পারিত—ইহাই আর্যশাস্ত্র-বিধি।

মহাভারত বলেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে।" (অনুশাসন পর্ব)

এই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহজাত সন্তানগণ যেমন তেজস্বী, শক্তিমান এবং জাতীয় কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না এবং এই বিবাহ যে এক সময়ে ব্যাপকভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল তাহা বর্তমান হিন্দু সমাজের বৈদ্য, মাহিষ্য ক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, পারশর (নমঃশূদ্র) আরও বহু শাখা প্রশাখা সমন্বিত অনুলোম অসবর্ণ বিবাহজাত সন্তানদের দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায়।

ভারত যখন স্বাধীন ছিল তখন অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের বিশেষ প্রচলন ছিল। আর আজও ভারতের যে সব রাজ্যে হিন্দুগণ তাঁহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে সে সব প্রদেশেই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ এখনও চলিতেছে। নেপাল, ত্রিবাঙ্কুর ও মহারাষ্ট্রে এই অনুলোম বিবাহ

আজও তাদের আর্য সমাজকে অটুটভাবে পরস্পর সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

"গ্রীক দূত মেগেস্থিনিশ ভারতে আসিয়া পাটালিপুত্রে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বহু বৎসর বাস করিয়া গিয়াছেন। তাহার রিপোর্টে প্রকাশ যে, তখন ভারতে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশ যে বহিঃশত্রু কর্তৃক চির অপরাজিত এবং অজেয় তাহা তিনি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।"

(Magesthenes Report—শ্রীরজনীকান্ত গুহ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ)।

"বাংলার পূর্বাংশে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বারুই ও সাহার মধ্যে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের ন্যায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। এই প্রকার অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকায় এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণাদি পরস্পর বিবাহকারী জাতিসমূহের মধ্যে যেমন সদ্ভাব ও সম্প্রীতি দৃষ্ট হয়, বাংলার অন্যান্য বিভাগে তাহা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।"

নব্যভারত ১৩২৫ পৃ: ৩২২

এক সময়ে আপদ্ধর্মের মতন এই অনুলোম বিবাহকে তখনকার মনীষীরা স্থগিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, বহিঃশত্রুগণ যাহাতে তাহাদের কন্যা দান করিয়া অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে তাহারই জন্য এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু এই স্থগিতি সমাজের অগ্রগতি রোধ করিয়া ক্রমশঃ মন্থরতা আনিয়া দিল। তারপর বাংলার স্মার্ত রঘুনন্দন অসবর্ণ বিবাহ—আদিত্য পুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া বাংলায় এই বিবাহ প্রথা স্থগিত রাখিয়াছিলেন। অথচ পরাশর সংহিতা কলিকালের ধর্মশাস্ত্র, তাহার একাদশ অধ্যায়ের ২১।২৩ শ্লোকে ও বৈশ্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের পুত্রের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, কলিকালে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। মেধাতিথি, মিতাক্ষরা, স্মৃতিচন্দ্রিকা, বিবাদরত্নাকর, মাধবীয়, সরস্বতী বিলাস, মদন পারিজাত, কুল্লুক-ভট্ট এমন কি দায়ভাগ পর্যন্ত কোন ভাষ্য বা ভাষ্যকারই অসবর্ণ বিবাহ অসিদ্ধ বলেন নাই। শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধান যে, "যেখানে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ দেখা যাইবে সেখানে বেদের বিধিই প্রামাণ্য। আর যেখানে স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ থাকিবে সেখানে স্মৃতির বিধিই প্রামাণ্য।" এই শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমাদের উদ্ধৃত বহু বেদ, মনু ও পরাশর সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্রের বিধির বিরুদ্ধে আদিত্য পুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন অগ্রাহ্য।

এই অসবর্ণ বিবাহের অপলাপে আর্য সমাজ পরস্পর অসংবদ্ধ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, নূতন রক্তের সংমিশ্রণ অভাবে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে, জাতির আয়ু বল, বুদ্ধি, বর্ণ ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইতে চলিয়াছে। এই উন্নত-মুখী অভিযান রুদ্ধ হইবার ফলে মানুষের সর্বনাশকারী প্রতিলোম আকাঙ্ক্ষা হীনত্ব-প্রসূত যৌন-আবেদনে দিকে দিকে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। হয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে অন্যথা অবনতির পথে পশ্চাৎ অপসারণ করিতে হইবে—স্থির নিশ্চল হইয়া থাকিবার উপায় নাই, ইহাই প্রাকৃতিক বেদ। এই কঠিন সত্যকে উপলব্ধি করিয়া আজও কি আমরা আমাদের গন্তব্য পথ বাছিয়া লইব না?

বাঁশী

শ্রীরেবা সিংহ

ওগো বাঁশী
অতীতের ঝরে পড়া স্মৃতি নিয়েই কি
শুধু তোমার কারবার—
বর্তমানের সুর কৈ?
অনেক শুনেছি পৌরাণিক কাহিনী
পড়েছি রূপকথার গল্প
দেখেছি ঝরে পড়া ফুলের করুণ দৃশ্য
শুনেছি প্রান্তরের আহ্বানে
গৃহস্থকে ঘর ছাড়াবার ইঙ্গিত
আরো কত—
শুধু তাদের কথাই শাশ্বতকাল ঘোষণা করে এসেছো,
যমুনা কুঞ্জে সেই দুটি প্রণয়ী হৃদয়ের
না বলা কত কথাই প্রকাশ করেছো,
তোমার ব্যথার সুরে।
কুঞ্জছায়ে অপেক্ষমান শ্রীকৃষ্ণের কাছে
তুমিই তো এনে দিতে তার প্রণয়িনী রাধাকে।

কত হৃদয়ের গোপন কথা জানো তুমি
কে আছে তোমার মতো মনস্তাত্ত্বিক!
তবু এই দীর্ঘশ্বাস
কেন বন্ধু!
নিবিড় করে কাউকে পাওনি
তাই বুঝি?
শুধু একটিমাত্র যোগসূত্র
যা' তোমাকে অনন্তকালের সাথে জড়িয়ে রেখেছে
তা এই ব্যথাভরা করুণ সুর।
তাই বুঝি বর্তমানের বিভীষিকা
যান্ত্রিক যুগের উষ্ণ নিশ্বাস
তোমার বিরহভারাক্রান্ত কোমল মনকে
স্থানচ্যুত করতে পারে না—
এঁকে দিতে পারে না কোনো চিহ্ন।
তাই তুমি বর্তমানের মুখোস পরা
অতীতের জীবন্ত প্রকাশ।

যাত্রী—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভিযান পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৪৮ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। মূল্য—৪্।

বনেদি পরিবারে যাঁর জন্ম, তিনি কি করিয়া ধীরে ধীরে আটপৌরে জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন, আলোচ্য বইকে বলা চলে তাহার ধারাবাহিক কাহিনী। এই বইতে ঠাকুর-পরিবারের সম্বন্ধে অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং লেখকের জীবনে কিভাবে পরিবর্তন আসিল, কিভাবে তিনি স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হইলেন, তাহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুলেখক ও সুবক্তা বলিয়া সৌম্যেন্দ্রনাথ খ্যাত; তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে একমত না হইলেও তাঁহার সাহিত্যিক পারদর্শিতার কথা স্বীকার করিতে হয়। এই বইয়ে ঠাকুর-পরিবারের কাহিনী যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি জাতীয় আন্দোলনের কথাও আলোচনা করা হইয়াছে। জীবনের প্রথম যাত্রারম্ভ হইতে কিভাবে লেখক বর্তমানের এই সীমানায় আসিয়া পৌঁছিলেন, এই বই তাহার বৃত্তান্ত মাত্র নহে, ইহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে লেখকের মন্তব্য আমাদের ভালো লাগে নাই, বিশেষ করিয়া 'শেষ বর্ষণ' অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া অভিনয়ে অংশ গ্রহণ না করিবার কথা। মনে হইল, স্বাদেশিকতায় রবীন্দ্রনাথের উপরে টেক্কা দিবার দুর্বল প্রয়াস করা হইয়াছে যেন। ২০।৫১

নতুন চাঁদ—কাজী নজরুল ইসলাম। নূর লাইব্রেরী, ১২।১, সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা—১৪। মূল্য—২৷৷৹।

কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই নিজের সম্বন্ধে একথা বলিয়াছিলেন—"যুগের না হোক হুজুগের কবি।" সে কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা বিচার করিবার সময় এখনো হয় নাই। তাঁহার যে কলমে 'অগ্নিবীণা' 'চিত্তনামা' 'বুলবুল' ইত্যাদি বাহির হইয়াছে, 'নতুন চাঁদ' যে কলমের যোগ্য যে নয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবুও বইটির যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, ইহাতেই বোঝা যায় যে, বাঙলা দেশ নজরুল ইসলামকে এখনো ভোলে নাই।

আলোচ্য বইতে মোট কুড়িটি কবিতা আছে। 'ঈদের চাঁদ' ইহার অন্যতম কবিতা। এই কবিতাটি যখন নবযুগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন ইহা বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হইয়াছিল। আর একটি কবিতা হইতেছে 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি'—রবীন্দ্রনাথের অশীতি বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত। নজরুলের ক্ষমতা যখন নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে এবং রবীন্দ্রনাথের আয়ু যখন নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে, এই কবিতা তখন রচিত হয়—এই কারণে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বইয়ে অজস্র ছাপা ভুল আছে। প্রকাশকের এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। বিশেষ করিয়া কবিতার বইয়ে যদি ছাপার ভুল হয়, তখন তাহা বিশেষভাবে মারাত্মক হইয়া উঠে।

১০২।৫১

পুস্তক পরিচয়

যাঁদের দেখেছি—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২২ ক্যানিং স্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য—৩্।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় বাঙলাদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক, মঞ্চ ও মঞ্চাভিনেতা ইত্যাদির সঙ্গে বহুদিন হইতে পরিচিত। ১৯২৪ সাল নাগাদ যখন 'নাচঘর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তখন এই পত্রিকায় তিনি সম্পাদকতা করেন। অনেকটা ইহারই দরুণ সাহিত্যিক ও মঞ্চাভিনেতা প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ঘটে। এখন ইনি প্রাচীন হইয়াছেন, জীবনের এই প্রান্ত-প্রদেশে পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার পিছনের জীবনের স্মৃতির কথা বলিয়াছেন। ইহাতে অনেক ঔৎসুক্য-নিবারক কাহিনী আছে এবং অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও আছে। হেমেন্দ্রকুমার শিশু-সাহিত্য রচনা করিয়া রচনার সরলতা অর্জনও করিয়াছেন। সেই সরল রচনারীতির দ্বারা তিনি অনেক সাধারণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙলাদেশের পাঠকদের কাছে বইটির [illegible] কারণে আদর হওয়া স্বাভাবিক।

বইটি বাইশটি অধ্যায় অর্থাৎ বাইশ জনের সঙ্গে লেখকের পরিচয়ের বৃত্তান্ত আছে। অধ্যায়গুলি যদি 'দেখা ব্যক্তিদের' নাম দিয়া চিহ্নিত করা হইত, তাহা হইলে ভালো হইত।

স্বর্ণকুমারী দেবীর বিষয় লিখিতে গিয়া হেমেন্দ্রকুমার স্বর্ণকুমারীর ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে যেভাবে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা শিল্পীজনোচিত হয় নাই। ১০৬।৫১

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ; উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা চারি আনা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ-শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত অন্তরঙ্গ স্বামী তুরীয়ানন্দ বা হরি মহারাজের পরিচয় বাঙলাদেশের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অশেষ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য, কঠোর তপস্যা এবং সর্বোপরি ভগবদ্ভক্তির পরম মহিমায় শ্রীরামকৃষ্ণ সাধকমণ্ডলীতে এই প্রেমের সন্ন্যাসী জ্যোতির্ময় স্থান অধিকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে বিশেষভাবে আমেরিকায় ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনাকে সম্প্রসারিত করিবার কাজে হরি মহারাজ স্বামীজীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। হরি মহারাজের স্বদেশপ্রেম ছিল জ্বলন্ত এবং দুর্নিবার। এমন মহাপুরুষের পত্রাবলীর আলোচ্য সঙ্কলন পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। ইতঃপূর্বে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর পত্রাবলীর অধিকাংশ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণে পূর্বে প্রকাশিত পত্রগুলির সঙ্গে আরও ৮০খানি পত্র সংযোজিত করা হইয়াছে। স্বামীজীর

তপঃনিষ্ঠ সাধনার প্রজ্ঞানময় আলোকে পত্রগুলি সমুজ্জ্বল। অধ্যাত্ম-রাজ্যের অনেক দুর্জ্ঞের এবং গূঢ় রহস্য এই পত্রাবলীতে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। জীবনের কর্তব্য নির্ধারণের পক্ষে এগুলি বিশেষভাবে সহায়ক। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পথে ভগবৎ-উপলব্ধির অন্তর্নিহিত সারতত্ত্বসমূহ তত্ত্বদর্শী সাধকের প্রত্যক্ষানুভূতির প্রভাবে সর্বজনবোধ্য সহজ এবং সরল ভাষায় পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীভগবানে শরণাগতি এবং মানব-প্রীতির মরকত-দ্যুতি হরি মহারাজের পত্রাবলীর এই সংগ্রহ এবং সংকলনের সর্বত্র পরিস্ফুট। পত্রগুলি পাঠে মন শ্রদ্ধিত এবং উন্নত হয়। এ সংগ্রহ গ্রন্থ চিন্তাশীল এবং ভাবুক ও ভক্তসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। ছাপা এবং কাগজ সুন্দর।

১৮।৫১

ছোটদের গল্প ঃ শ্রীমা—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য—১৷৷০ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকটি ফরাসী ভাষায় লিখিত শ্রীমার Belles Historiesএর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। খুব সম্ভব আশ্রমবাসী কিশোর-কিশোরীদের গল্পের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষাদান ও চিত্তশুদ্ধি করাই পুস্তকটির উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। আশ্রম-বহির্ভূত কিশোর-কিশোরীরাও গল্প-গ্রন্থটি পাঠে অশেষ আনন্দ লাভ করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পচ্ছলে উপদেশাবলীর ন্যায় এই পুস্তকটিও কিশোর-কিশোরী সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অনুবাদের কাজ করিয়াছেন শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত। কাজটি যথেষ্ট দুরূহ, কিন্তু সেই দুরূহ পরীক্ষায় তিনি সসম্মানেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৬৫।৫১

মৌচাক (বৈশাখ, ১৩৫৮)—সম্পাদক ঃ সুধীরচন্দ্র সরকার। কার্যালয় ঃ ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—।৵০।

শিশুজগতে 'মৌচাকের' স্থান কোথায় তাহা আর নূতন করিয়া বলার অবকাশ নাই। তাহাদের শিক্ষাদানে, তাহাদের মনোহরণে মৌচাক একটি বিশিষ্ট জায়গা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আলোচ্য সংখ্যাটিও তাহাদের নিশ্চয়ই জ্ঞান ও আনন্দদান করিবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

New Bengal (February, 1951)—Editor: S. Mukherjee office: 44, Badur Bagan Street, Calcutta Price Rs. 8.

'নিউ বেঙ্গলে'র আলোচ্য সংখ্যাটি গোরক্ষণ ও গবাদি প্রস্তুতকরণ বিষয়ক প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। তথ্যানুসন্ধানী এই সংখ্যাটি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

আলোচনা

"ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার"

'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত সংখ্যা (১২ মে তারিখের) দেশ পত্রিকায় শ্রীযুত রাজশেখর বসুর 'ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার' প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করার জন্য ধন্যবাদ জানবেন। বিষয়টির সত্যিই অধিকতর প্রচার দরকার। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই মুদ্রাদোষ ও বিকার হয়তো আছে, কিন্তু মুদ্রাদোষের নামে যদি ভাষার অনাচার বেশি প্রশ্রয় পায় তাহলে তা রোধ করা দরকার। পৃথিবীর সব ভাষা আমরা জানি নে, কিন্তু পৃথিবীর সেরা ভাষা ইংরেজির সঙ্গে আমাদের সকলের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। কিন্তু সে ভাষায় এত বিকার ও মুদ্রাদোষ কেউ বরদাস্তও করে না, আস্কারাও দেয় না।—এটুকু আমরা লক্ষ্য করে থাকব। এর কারণ হয়তো এই যে, এ ভাষার রাজপথ নির্মিত হয়ে গেছে।

কিন্তু বাংলা ভাষা এখনো যেন চলেছে কাঁচা রাস্তা ধ'রে, বেওয়ারিশ প্রান্তর ডিঙিয়ে। তাই যখনি কেউ কোথাও সামান্য সুবিধে খোঁজেন, তখনই নিজের খুসিমত শর্টকাট করে পাঠ পাড়ি দেন। এই কারণে বাংলা ভাষার ওপর এত পায়ে-হাঁটা-পথের চিহ্ন। কিন্তু ভাষার রাস্তা যদি এভাবে ব্যক্তিগত খুসির ওপর ছেড়ে দিতে রাখা হয় তাহলে কস্মিনকালেও এর রাজপথ যে তৈরি হবে না—এ বিষয় নিশ্চিত। অথচ রাজপথ আবশ্যক—এবং এই পথ নির্মাণের জন্য আবশ্যক জনকয়েক সুর্জন-মিস্ত্রীর। তা না হলে দুর্জনদের হাত থেকে এ ভাষাকে রক্ষা করা দুরূহ হয়েই থাকবে।

ঐ একই সংখ্যার দেশ পত্রিকাতে 'বেতার-প্রসঙ্গ' আলোচনায় আপনারা বাংলা বানানের ব্যাভিচার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। এইসব দেখে মনে হচ্ছে আপনারা বাংলা ভাষার একটা রাজ-পথের পক্ষপাতী।

রাজশেখরবাবু বলেছেন, শব্দবাহুল্য বাঙালীর একটি রোগ। কথাটা সত্যি। আমরা যখন স্কুলের ছাত্র তখন আমাদের এক সহপাঠী ছিল, তার নাম সুখসিন্ধু প্রচণ্ড সরস্বতী। সে না ছিল সুখের আকর (কেন না অত্যন্ত নোংরামিই ছিল তার স্বভাব), না ছিল প্রচণ্ড (তার স্বভাব ছিল নিরীহ ও ভীরু), না ছিল সে সরস্বতী (অর্থাৎ লেখা পড়ায় মন ছিল না); কিন্তু তবু তার নাম ছিল এমনি ভয়ংকর। আর-একজনের নাম শুনেছি, তাকে কখনো দেখিনি অবশ্য, তার নাম ছিল—গোবিন্দ-গোপীনাথ-গোপীজনবল্লভ-পদরেণু-পংকজ-রঞ্জন বাগচী।

শব্দবাহুল্য বাঙালির যে রোগ তার প্রমাণ তো পথে-ঘাটে নিত্যই দেখা যায়। রাজশেখর-বাবু শহরের রাস্তা হাসপাতাল ইত্যাদির নামকরণ সম্বন্ধে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ নাকি ভাগ্যবান, তাঁর নামের সঙ্গে সুকবি, কবিবর, মহাকবি, কবিসম্রাট ইত্যাদি তুচ্ছ বিশেষণ নাকি যোগ হচ্ছে না। সম্প্রতি একটি নিমন্ত্রণলিপি পেয়েছি তাতে বড় বড় হরফে লেখা আছে—

মহামানব রবীন্দ্রনাথের

একনবতিতম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব

সুতরাং দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথও ভাগ্যবানের কোঠায় পুরোপুরি উঠতে পারেন নি।

আসানসোলে একটি মেয়েদের ইস্কুলের নাম —**উমারাণী গড়াই মহিলা কল্যাণ বালিকা বিদ্যালয়।** কল্যাণসাধনের জন্যেই যে এ বিদ্যালয়, এবং তা বালিকাদের জন্যে তা বোঝা গেল; সেই সঙ্গে জানা গেল যে উমারাণী গড়াই নামে কেউ হয়তো অর্থসাহায্য করেছেন।

শব্দবাহুল্য ঘটে কেন জানি নে; বাঙালী স্বভাবত কিছুটা emotional, হয়তো এর দরুণ প্রাণের আবেগ রুখতে না পেরে অধিক শব্দ ব্যয় করে। এটা দোষ বটে, কিন্তু এ দোষ থেকে বাঙালীকে ও বাংলা ভাষাকে না হয় মুক্ত করা গেল কাট-ছাঁট ক'রে; কিন্তু বিকার ও ব্যাভিচার থেকে মুক্ত করাটাই যে কঠিন কাজ।

কেউ লেখেন জো, কেউ লেখেন যো; কেউ জায়গা, কেউ যায়গা; কেউ জোগাড়, কেউ যোগাড়, ইত্যাদি; শ ষ স নিয়ে গণ্ডগোল কম নয় ঃ জিনিস চলে, জিনিষও চলে; আবার পোশাক, পোষাক; চশমা চষমা; শহর সহর গবর্নমেন্ট গবর্মেন্ট, গভর্নমেন্ট গভর্মেন্ট কোন কোনও কোনো—এ সবের কোন্টা ঠিক কোন্টা বেঠিক তার কোনো নিয়ম কেউ জানে না মানেও না। হ্রস্ব ই-কার, দীর্ঘ ঈকার, হ্রস্ব উ-কার, দীর্ঘ উ-কার নিয়েও এলোমেলো ব্যবহার চলেছে।

ভাষার বিকার আছে, বানানের ব্যাভিচার চলছে এবং মুদ্রাদোষ আছে, বাংলা ভাষা এই ত্র্যহস্পর্শে অচিরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে কিনা সেজন্যই এই প্রশ্ন মনে জাগে।

মোটামুটি ভাবে যে কয়টি কথা মনে পড়ল আপাতত তার উল্লেখ করলাম। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়ে যা-হোক একটা কিছু নিষ্পত্তি হয়ে যাক—এই প্রস্তাব করি।

ভবদীয়

সুশীল রায়, কলিকাতা

গাঁয়ের মেয়ে (শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স)—

কাহিনী ও সংলাপ : বিধায়ক ভট্টাচার্য; পরিচালনা : গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়; আলোকচিত্র : বীরেন দে; শব্দযোজনা : মাম্না লাডিয়া; শিল্পনির্দেশ : সতোন রায় চৌধুরী; সুরযোজনা : শৈলেশ দত্তগুপ্ত। ভূমিকায় : দেবী মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্টধন, ডি-জি, তুলসী লাহিড়ী, ফণী রায়, সন্তোষ সিংহ, বিভূতি গাঙ্গুলী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, পদ্মা, সন্ধ্যারাণী, রেবা, রাজলক্ষ্মী (বড়), রাজলক্ষ্মী (ছোট), বেলারাণী, উমা, অজন্তা কর, বন্দনা প্রভৃতি।
ভারতলক্ষ্মী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনে ২৭শে এপ্রিল উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলায় মুক্তিলাভ ক'রেছে।

বছর প'চিশেক আগেকার ধরণে রচিত ল্পের বছর পাঁচেক আগেকার তোলা ছবি য়ে এখন আলোচনার অবতারণা করার নে হয় না কোন, তবে ছবিখানির সার্থকতা চ্ছে যে এখানি দেখে এখনকার ছবির গতি-গতির একটা সঠিক মান নির্ধারণ করার যোগ পাওয়া যায় এই যা। এ ছাড়া সবই বোল-তাবোল, যেমনি অসংলগ্ন এর ঘটনা বক্তব্য, তেমনি এলোমেলো এর পরিবেশন ঃ। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে চড় লাথি মারতে য়ে তাকে 'শালার বৌ', শালী ইত্যাদি ম্বোধন করিয়ে বোধহয় বাস্তবতার স্পর্শ ংযোগের চেষ্টা করা হয়েছে। তা না লে সেকাল বা একাল, কোন কালের রুচির ক্ষে এমন দৃশ্য কল্পনাতেও কি করে াসতে পারে!

গল্পতে এক গৃহস্থ বধূকে ঘরছাড়া রানো হয়েছে। এ মেয়েটি সুন্দরী, াক্ষিতা এবং সর্বোপরি তার পিতার খ্যাতি লো পণ্ডিত ও দেবতুল্য ব্রাহ্মণ বলে এবং মনি মর্যাদাসম্পন্ন যে তার উঠানে পা তেও লোকের সংকোচ হতো। এহেন ক্তির কন্যারও মূর্খ, জানাশুনো বদমায়েস বং দোজবরে ছাড়া ঘর জুটলো না—এই াপার থেকেই কাহিনীটা কোন্ যুগের তা ঝে নিতে অসুবিধে হয় না। এদিকে কিন্তু য়েটিকে গ্রামের বললেও কথাবার্তায়, চাল-নে, সাজপোষাকে একেবারে শহুরে মেয়ের কে আলাদা কিছু নয় তার। এমনকি লকাতায় এসে তার পরিত্রাতা বাল্যসখা ও মিদার পুত্রের ওপর সন্দেহ পরিবেশে সে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে যে রকম সঙ্কোচহীন ভাবে চলচ্চিত্রে গিয়ে ভর্তি হলো তেমন সরাসরিয়ানা কোন শহুরে মেয়ের পক্ষেও দেখানো সহজ নয়। এর মধ্যে গ্রামীন ভাবের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু তবুও তাকে বলা হয়েছে গ্রাম্য মেয়ে এবং তারই নামে এই ছবি। নায়িকারই যখন এই রূপ তখন আগাগোড়া ছবিখানিরই ওজন বুঝতে অসুবিধে হবে না, কাজেই ছবিখানি বিশদ করে আলোচনা করারও প্রয়োজন রাখেনি।
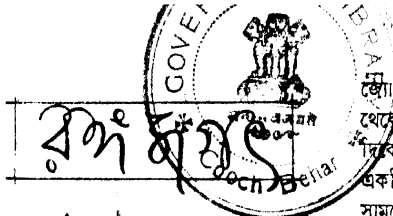
এতে প্রায় সবাই-ই সারাবাঙলাখ্যাত অভিনয় শিল্পী। এদের মধ্যে তিন জন—দেবী মুখোপাধ্যায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নি[illegible] গাঙ্গুলী বছর কয়েক হলো পর-লোকগমন করেছেন। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি, কিন্তু তাঁরা সত্যিই যেদরের শিল্পী বলে পরিচিত ছিলেন সে গুণপনার কোন আভাস এতে দিয়ে যাননি। অন্যান্য যারা আছেন তাঁদেরও অভিনয়ে কেমন যেন সঙ্গতির অভাব। ছবিখানির একমাত্র আকর্ষণ ছিলো অভিনয়শিল্পী সমাবেশ; কিন্তু কার্যত তার কোন সার্থকতা দাঁড়াতে পারেনি। আর কোন দিকেরও কোন কাজই উল্লেখ করার মতোও হয়নি।

শঙ্খবাণী (লোকবাণী চিত্র—ইন্দ্রপুরী

স্টুডিও)—কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : জ্যোতির্ময় রায়; আলোকচিত্র : দেওজীভাই; শব্দযোজনা : গৌর দাস; শিল্পনির্দেশ : বটু সেন; সুরযোজনা : সত্যজিৎ মজুমদার। ভূমিকায় : রাধা-মোহন, কালী সরকার, সতেন বসু, চিত্ররথ, লেতো, মৃণাল রায়, বিনতা রায়, নিবেদিতা দাস, বেলারাণী প্রভৃতি।
ছায়াবাণীর পরিবেশনে ১১ই মে বসুশ্রী ও বীণাতে মুক্তিলাভ ক'রেছে।

"শঙ্খবাণী" অর্থাৎ শকুনের বুকের ধ্বনি। এটা আমাদের বানানো কথা নয়, ছবিখানির এই হলো প্রতীক—বিস্তারিত পক্ষ এক শকুন, আর তার গলা থেকে বুকের ওপর ঝোলানো একটি শাঁখ, তবে রক্ষে এই যে এর থেকে ভাগাড়ের রবটা আর বের হয়নি। বস্তুত, এই প্রথমবার বলা যেতে পারে যে, জ্যোতির্ময় রায় একটা বিষয়বস্তুতে স্থির থেকে তাই নিয়ে সুসংবদ্ধ কাহিনী গঠনের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। বেশ সময়োপযোগী একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বস্তুকেই তিনি সামনে এনে হাজির করেছেন—"বিজ্ঞানের মঙ্গলকর আবিষ্কার নিয়ে তাকে বিকৃত উপায়ে দেশে দেশে আজকের স্বার্থান্বেষী দল যে অমঙ্গলের বীজ বপন করছেন" তাই নিয়েই হচ্ছে কাহিনী, কিন্তু বিন্যাসদোষে লোকের মনে এতটুকুও উদ্দীপনা সঞ্চারে কাহিনীটি একেবারেই ব্যর্থ। বলবার এবং দেখাবার মতো বিষয় ভেবেও শেষ পর্যন্ত বেশ গুছিয়ে সামনে হাজির করার বেলায় জ্যোতির্ময় রায় আর ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠতে পারেননি—কাহিনীকার জ্যোতির্ময় রায়কে পরিচালক জ্যোতির্ময় রায়, সোজা কথায়, একেবারেই ডুবিয়ে দিয়েছেন।

গল্প ভেজাল তেল ও ঘিয়ের কারবারি ভবানীচরণকে নিয়ে। ছবির আরম্ভ ভবানী-চরণের কল থেকে ভবানীচরণের সুরম্য অট্টালিকায়। দেখা গেলো পীড়িত ভবানী-চরণকে। একমাত্র সন্তান শান্তার জন্য চিন্তাগ্রস্ত ভবানীচরণকে এবং দাতা ভবানী-চরণকে। একমাত্র সন্তান শান্তার জন্য দের কাছে এক পরিকল্পনা পেশ করলেন—সবিতৃ নামে এক বৈজ্ঞানিক ভেজাল তেল ঘিয়ের দরুণ সৃষ্ট রোগের প্রতিষেধক নিয়ে গবেষণা করছে—ভবানীচরণ তাকে তার ল্যাবরেটরীতে নিযুক্ত করতে চাইলেন। সবিতৃকে তিনি জানালেন যে তেল ঘিয়ের উঁচু দামের জন্যে সাধারণের পক্ষে তা ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না, সবিতৃ যেনো এমন একটা তেল আবিষ্কার করে দেয় যা সবায়ের পক্ষে কেনা সহজ হবে। সবিতৃর পারিশ্রমিক ব্যাপারে ভবানীচরণ যথেষ্ট উদারতা দেখালেন। সবিতৃ গবেষণায় নিযুক্ত হওয়া থেকেই ভবানীচরণের কন্যা শান্তা তার দিকে ঝুঁকলো। শান্তা তার পিতার সঙ্গে সায় দিয়ে চলতে পারে না, বরং তাকে সে ঘৃণাই করতো। তাদের ল্যাবরেটরীতে আগে থেকেই অশোক নামে এক রাসায়নিক কাজ করছিলো, কিন্তু সে তার পিতার হাতের পুতুল বলে তার প্রতি শান্তার কোন আকর্ষণ ছিলো না।

শান্ত, কর্মনিবিষ্ট ও সরল গম্ভীর প্রকৃতির সবিতৃ শান্তার মন জয় করলো। কিছুদিন পর

ভবানীচরণ সবিতৃর গবেষণার ফলাফল জানতে এলেন। সবিতৃ জানালে যে সে একটা গন্ধক থেকে একরকম তেল আবিষ্কারে সফল হয়েছে বটে তবে সেটা সম্পূর্ণ শোধন করে না নিলে ক্ষতিকর হবে, আর শোধন করতে গেলে যে খরচ পড়বে তাতে সস্তা দামে বিক্রী করা চলবে না। ভবানীচরণ শোধন না করেই চালাবার কথা বললেন। আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিক সবিতৃ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। ভবানীচরণ তার গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে তাকে দারোয়ান ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন এবং সবিতৃর গবেষণার কাজটা অশোকের হাতে ন্যস্ত করলেন। লাঞ্ছিত সবিতৃ পুলিসের কাছে গেলো, কিন্তু পুলিস এ ব্যাপারে কিছু করায় তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করলে। সবিতৃ গেলো অশোকের বোন মণিকার কাছে যদি অশোককে নিরস্ত করা যায়, কিন্তু তার কাছ থেকেও সবিতৃকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হলো—মণিকা জাতীয় কল্যাণ সমিতির নিষ্ঠাবতী কর্মী এবং ভবানীচরণ তাদের মোটা চাঁদা দিয়ে থাকেন, সুতরাং তার পক্ষে ভবানীচরণের বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব নয়। সবিতৃ তখন শান্তার শরণাপন্ন হলো, শান্তার পক্ষেও সবিতৃর কথামতো চলা সম্ভব হলো না। সবিতৃ তখন নিজেই বিহিতের ভার নিলে। বোমা দিয়ে ল্যাবরেটরী ধ্বংস করে দেবার জন্যে সে ভবানীচরণের গৃহে উপস্থিত হলো। সেই মুহূর্তেই ভিতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। সবিতৃ ছুটে গিয়ে আহত অশোককে বাইরে এনে ফেললে। সবাই এসে জমা হলো সেখানে। ভবানীচরণ এসে সবিতৃর কাছ থেকে বোমা আবিষ্কার করলেন। সবিতৃকে পুলিসের হাতে দেওয়া হলো। শান্তা গোপনে স্বদেশী মামলায় নামকরা ব্যারিস্টার অবনীবাবুকে ধরলে এই মামলা চালাবার জন্যে। অবনীবাবুর জেরায় প্রকাশ পেল যে, ভবানীচরণ দীর্ঘকাল ধরে অসৎভাবে অর্থোর্জন করে আসছেন; জোচ্চোর বলে একবার তাঁর জেলও হয়েছে, রসদের যোগানদারী পাবার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি দানধ্যান করেন। সবিতৃর বিরুদ্ধে ভবানীচরণের মিথ্যা সাক্ষ্য টিকলো না, তখন নির্ভর কেবল অশোকের সাক্ষ্যের ওপর। শান্তা গিয়ে অশোকের কাছে মনুষ্যত্বের আবেদন জানালে, তার পৌরুষকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলে। অশোক শেষ পর্যন্ত ভবানীচরণের শেখানো সাক্ষ্য ব্যক্ত না করে সত্যি কথাই জানালে যে, কাজ করার সময় একটা টিউব ফেটে গিয়ে সে আহত হয়। ভবানীচরণ সবিতৃকে অশোকের প্রতি আক্রোশবশতঃ হত্যার উদ্যোগের যে নালিশ তৈরী করেছিলেন, সবিতৃ সে দায় থেকে রেহাই পেলো, তবে বিস্ফোরক আইনে, বোমা রাখার জন্যে, তার তিন বছরের জেল হলো এবং হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের জেল হলো। ব্যারিস্টার অবনীবাবু জরিমানার টাকা দিতে চাইলেন, কিন্তু সবিতৃ তা প্রত্যাখ্যান করলে। অবনীবাবু আদর্শ সত্যনিষ্ঠা ও মানবহিতৈষণতার জন্যে সবিতৃকে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন; শান্তা আলোকের আশায় পথ চেয়ে রইলো।

কাহিনীতে যা প্রকাশ করা হয়েছে, তা এখনকার পৃথিবীর একদিকের একটা সত্যি রূপ। মুখবন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছে—

"খাদ্য থেকে শুরু করে জীবনের নানাক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী স্বাভাবিকধর্মী অপরাধীদের হাতে বিজ্ঞান আজ উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়ে—হয়ে উঠেছে মানুষের মহা অমঙ্গলের হাতিয়ার। এই দুর্বিপাকে সর্বসাধারণের অধিকার আছে, বিশ্বের বিশুদ্ধ আর ফলিত বিজ্ঞানের প্রতিটি বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করবার—বিজ্ঞানাদর্শ স্মরণ করে কেবলমাত্র তাঁরা যদি রুখে দাঁড়াতেন, তাহলে ভেজাল থেকে শুরু করে আণবিক বোমার অমানুষিক উদ্দেশ্য সম্ভব হত কি?"

কথাটা শুনতে অনেকটা স্টকহল্ম শান্তি অভিযানের ম্যানিফেস্টোর একটা অনুচ্ছেদের মতো—এইটেকেই ছবির বাণী করে তুলতে যাওয়া হয়েছে। ফলে ছবিখানি হয়ে উঠেছে পুরোমাত্রায় প্রচারধর্মী।

ভবানীচরণদের শায়েস্তা করতে চায় সকলেই; তাদের মতো মানুষের শত্রুকে পৃথিবীতে চায় না কেহই; কিন্তু প্রযোজক

কাহিনীকার পরিচালক জ্যোতির্ময় রায় শেষ পর্যন্ত তাদের সমাজের অবিসম্ভাবী অঙ্গ করেই রেখে দিয়েছেন। প্রথমেই তিনি ভবানীচরণকে দেখাচ্ছেন সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক বিজড়িত সন্তানবৎসল সাধারণ মানুষ হিসেবেই; নিয়মিতভাবে প্রভূত অর্থ দান করে তিনি বিবিধ জনকল্যাণকর সংঘকে বাঁচিয়ে রাখছেন; তাঁর পথে চললে তিনি উদারভাবে সহায়তা করে যান; তাঁকে দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, অর্থ ও প্রতিষ্ঠার এমনি মহিমা যে, প্রকাশ্য আদালতে সমাজশত্রু বলে প্রমাণিত হলেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়; কৃত দুষ্কৃতির জন্যে ভবানীচরণদের কোন প্রতি-ফল ভুগতে হয় না এবং মানুষের ক্ষতি করেও সমাজে থাকা যায়—এক কথায় ভবানীচরণও সমাজগ্রাহ্য এবং স্বাভাবিক। অপরদিকে ভবানীচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে সবিতৃর শাস্তিভোগটাও ঠিক ঐ রকমই সমাজের একটা চলতি রীতির মতোই দেখানো হয়েছে। সবিতৃর প্রতি লোকের সহানুভূতি যদিও বা জাগে, কিন্তু তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার মতো কোন জোরই পাওয়া যায় না। কন্যা শান্তাকেও ভবানীচরণের বিরোধীপক্ষেরই একজন করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও কোন সুস্পষ্ট প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের তেজ ফুটিয়ে তোলা হয়নি; ওর দিক থেকে ধরলেও ভবানীচরণদের প্রতাপ ও আধিপত্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

ভবানীচরণকেই সার বলে মেনে নেওয়ার পক্ষে রাধামোহনের চরিত্র-চিত্রণ অনেকখানি সহায়তা করেছে। আগের ছবিগুলোতে শ্রদ্ধেয় নায়কের ভূমিকাকে তিনি যেভাবে রূপায়িত করে এসেছেন, এ ছবিতে দুর্বৃত্ত ভবানীচরণকেও রেখে দিয়েছেন প্রায় সেই ছাঁচেই। ফলে কাহিনীর বিন্যাসে ও তার চরিত্র রূপায়ণে ভবানীচরণকে মানুষের অহিতকামী ব্যক্তি বলে ধরাই মুশকিল হয়। ভবানীচরণদের মতো লোক কিভাবে হিত-কামীর রূপে ধারণ করে মানুষের অহিত করে চলে, তেমনি একটি চরিত্র ফুটিয়ে তোলাই উদ্দেশ্য ছিলো—কিন্তু চরিত্রের প্রভাবকে নাটকীয়ভাবে প্রকট করে তোলার জন্যে ওর দুর্বৃত্তপনার প্রকৃতিটা আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিলো।

শান্তার চরিত্রচিত্রণও দুর্বল। ভবানী-চরণের সঙ্গে তার অসহযোগিতার ভাবও দৃঢ় হয়ে ওঠেনি, ভবানীচরণের দুষ্কীর্তির সাক্ষাৎ প্রতিবাদ বলেও তাকে ধরা যায় না। উলটে বরং ভবানীচরণের সন্তানবাৎসল্য দেখিয়ে তাঁকে মনুষ্যত্বের আসনে অধিরূঢ় রাখাতেই শান্তার প্রয়োজন মেটানো হয়েছে। ছবিতে চরিত্রটি যদি ঐই রকমই পরিকল্পিত হয়ে থাকে, তাহলে আলাদা কথা, তা না হলে বিনতা রায়ের অভিনয় নেহাৎই নিষ্প্রভ লাগে।
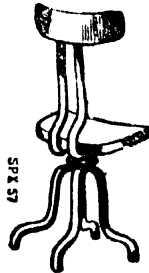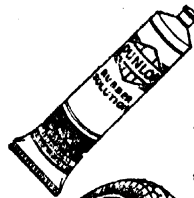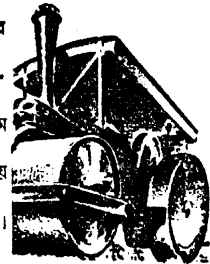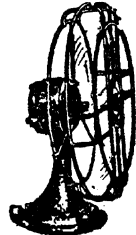
ছবির মধ্যে অভিনয়ের জন্যে সম্মানটা প্রাপ্য হচ্ছে ব্যারিস্টার অবনীবাবুর ভূমিকায় কালিপদ সরকারের। সাধারণের হয়ে তিনি সত্যনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এবং সত্যপ্রতিষ্ঠায় সংগ্রামের জন্য একাধারে আকুলতা ও দৃঢ়তা তাঁর অভিনয়ে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী এখনকার মধ্যবিত্ত যুবক সবিতুর চরিত্রটিতে সত্যেন বসু বেশ বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর দিক থেকে তিনি লোকের সহানুভূতি টেনে নিতে পেরেছেন, কিন্তু চরিত্রটিকে বিন্যাসে যেভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাতে লোকের মধ্যে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলায় সার্থক সৃষ্টি হতে পারেনি। অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় চলে যাবার মতো হয়েছে।

গোড়া থেকেই ছবিখানি এগিয়ে গিয়েছে অত্যন্ত ঝিমিয়েপড়া তালে। বিন্যাসের দুর্বলতা প্রত্যেক দৃশ্যেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যায়। কোথাও কোনভাবেই নাটকীয়তা সৃষ্টি হতে পারেনি। পরিবেশ যথাযথই সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু রসসঞ্চারের অক্ষমতা ছবিখানিকে একটা প্রবন্ধে পরিণত করে দিয়েছে। কোথাও গতি বলতে নেই, আবেগ সৃষ্টি করে তোলার জোরও নেই কোনোখানে। এর ওপর কথার ঝিলমিল গুমোটের ভারকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর গুরুত্বে এবং রুচি-বিকাশে ছবিখানি বাংলা ছবির অমর্যাদার বিষয় হয়নি, একথা বলা যায়।

সংকেত (এ এল প্রডাকসন্স—রূপশ্রী স্টুডিও)—কাহিনী : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, আলোক-চিত্র : সন্তোষ গুহ রায়; শব্দ যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; সুর যোজনা : কালোবরণ; শিল্প নির্দেশ : ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের (ভি সি) তত্ত্বাবধানে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ভূমিকায় : নীতীশ, দীপক, জীবেন বসু, কেষ্টধন জীবেন গাঙ্গুলী, নরেশ বসু, আদল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, প্রীতিধারা, রেবা প্রভৃতি। এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনে ৪ঠা মে থেকে মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ ক'রেছে।

"অমানুষিক জঙ্গল"-এর মতোই একটা অমানুষিক কাহিনী—চেহারায়, চরিত্রে, বিন্যাসে, অভিনয়ে নির্ভেজাল অমানুষিকতা—এই নিয়েই তোলা 'সংকেত' বাঙলা ছবির ওপরে বিভীষিকা জাগিয়ে তোলার একটি সফল অবদান।

সাহিত্য ও শিল্পবোধে কাহিনী ও বিন্যাসের যে দীনতা ছবিখানিতে প্রকাশ পেয়েছে তা বাঙলা ছবির ওপরে সবায়ের শঙ্কা বাড়িয়ে তুলতেই সাহায্য করবে, বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে যে, ছবির কাহিনীকার হচ্ছেন এখনকার সময়ের আশ্বাসপ্রদ একজন সাহিত্যিক এবং চিত্র-নাট্যকার—পরিচালক হচ্ছেন এমন একজন যার ওপরেও চিত্রামোদীদের ভরসা ন্যস্ত করে ছিলো অনেকখানি।

ভৌতিক চরিত্র এবং ভৌতিক কাণ্ড নিয়ে কাহিনী রচিত হয়েছে এর আগেও এবং তাকে সাহিত্যপদেও বসানো সম্ভব হয়েছে—কিন্তু এমন উৎকট কল্পনা এর আগে সাহিত্যিকদলভুক্ত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, এমন কি ছবির জন্যে বিশেষ করে অবজ্ঞাভরে লেখা হয়ে থাকলেও। আর ঠিক তার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে যাবার মতোই শিল্প ও নাট্যবোধহীন পরিচালনা। ছবিখানাকে কদর্য করে তোলার জন্যে এরা দুজনে পরস্পরের সঙ্গে যেনো প্রতিযোগিতা করে গিয়েছেন।

কাহিনীটি হচ্ছে আট শ' বছর আগে থেকে আসামের কোন এক 'অমানুষিক জঙ্গলে' ঘেরা অঞ্চলে এক প্রেতগুহায় সুসংরক্ষিত একটি নাগমুকুট উদ্ধার করা নিয়ে। এই অভিযানের সূচনা হয় কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে যেখানে একটি ভূত আবির্ভূত হয়ে সহকারী লাইব্রেরীয়ান শশাঙ্ককে দার্জিলিঙে টেনে নিয়ে গিয়ে জয়ন্তী নামক এক তরুণীর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলে। শশাঙ্কর সঙ্গে জয়ন্তীর প্রণয় হতেই শশাঙ্ক জয়ন্তীর হাতে একটা নাগ-অঙ্গুরী দেখে জয়ন্তীর মার কাছে থেকে তার ইতিহাস শুনে জানতে পারলে যে, আংটিটা জয়ন্তীর জ্যেঠামশায়, চন্দনপুরের জমিদার মৃত্যুকালে জয়ন্তীকে দিয়ে গিয়েছেন। ঐ আংটির অধিকারীই হবে প্রেতগুহায় রক্ষিত মুকুটের অধিকারী। কিন্তু চন্দনপুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বিজয়নারায়ণ ঐ মুকুটের পিছনে ধাওয়া করে। শশাঙ্কও মুকুটের কাহিনী শুনে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। কাজেই বিজয়নারায়ণের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধলো এবং শশাঙ্ক বিজয়নারায়ণ নিযুক্ত ঘাতকের হাতে আহত হয়ে হাসপাতালে পৌঁছলো। আর ওদিকে বিজয়নারায়ণ গিয়ে হাজির হলো আসামের সেই অমানুষিক জঙ্গলে এবং সেখানে মুক্তকেশী মন্দিরের পুরোহিতের পালিত কন্যার সহায়তায় প্রেত-গুহায় পৌঁছে তাকে হত্যা করে মুকুট উদ্ধার করে। কিন্তু সেই থেকেই অহরহ ভূতের উৎপাতে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বিজয়নারায়ণ শেষে মুকুট নিয়ে এসে জয়ন্তীর হাতে স'পে দিলে। কিন্তু তাতেও বিজয়নারায়ণ রেহাই পেলে না, ভূত জয়ন্তীর বেশে হাতছানি দিয়ে বিজয়নারায়ণকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেললে।

ছবির প্রায় প্রতি পঞ্চাশ ফিট অন্তর উৎকট কর্কশ আওয়াজ করে ধোঁয়া ভেদ করে ভূতের আবির্ভাব এবং আবির্ভূত হয়ে সে এমন সব কাণ্ড করে বসে যা ভৌতিক বলে চালিয়ে দিয়ে কাহিনীকার ও পরিচালক নিজেদের দোষ ঢেকে নিতে চেয়েছেন। নেহাৎই উদ্দেশ্যহীন কাহিনী আর ততোধিক অসার ছবি। দুদিকেরই যুক্তিহীনতার তো সীমাই নেই।

মোটামুটিভাবে আসামের জঙ্গলে মুক্তকেশীর মন্দির আর প্রেতগুহার সেট, শব্দগ্রহণ আর খানিক অংশের আলোকচিত্র গ্রহণ ছাড়া সমস্ত ছবিখানির মধ্যে সহ্য করে বসে থাকার মতও কিছু নেই।

ফুটবল

কলিকাতার তথা বাঙলার ফুটবল মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। কাল বৈশাখীর প্রবল ঝড় বা বৃষ্টির কোনই লক্ষণ এই পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। জীবন অতিষ্টকারী প্রবল তাপ সাধারণ জীবনযাত্রা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ফুটবল খেলোয়াড়দের স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রদর্শনে ইহা বিরাট বাধা সৃষ্টি করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি! সেইজন্য কোন দলের খেলায় বা খেলোয়াড়ের ক্রীড়া কৌশলের মান নির্ণয় অথবা প্রকৃত শক্তির আলোচনা করিবার এখনও সময় হয় নাই। তবে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ফুটবল মরসুম কলিকাতার মহানগরীর জনগণের সহিত ময়দানের এক অপূর্ব যোগসূত্র রচনায় অন্যান্য বৎসরের ন্যায়ই সফলতা লাভ করিয়াছে। সদাব্যস্ত সহরবাসীর বিশেষ করিয়া ক্রীড়ামোদিগণ সকলেই বিভিন্ন দলের শক্তি ও ভবিষ্যৎ লইয়া বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত করিতেছেন। খেলার মাঠেও প্রতিদিন বেশ ভীড় হইতেছে। জনপ্রিয় ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের খেলা থাকিলে পূর্বের ন্যায়ই প্রবল জনস্রোতকে মাঠের দিকে ছুটিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ফুটবল খেলা যে জনপ্রিয় খেলা ইহা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাগণও সাম্প্রতিক অধিবেশনে উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙলা দেশে ইহা একরূপ জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আমরা প্রতি বৎসরই এই প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়া থাকি এইবারেও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না—"বাঙলার মাঠে এত অবাঙালী খেলোয়াড়ের ভীড় কেন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।" ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, এই বৎসরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিশিষ্ট দলে যতগুলি বাহিরের ফুটবল খেলোয়াড় আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ইতিপূর্বে এমন কি গত বৎসরেও তাহা পরিলক্ষিত হয় নাই। এই সকল খেলোয়াড় কিসের আশায় ও সুযোগে প্রতি বৎসর বাঙলার ফুটবল মাঠের সকল কিছু গৌরবের অধিকারী হইবার জন্য আসিয়া থাকেন ইহা একরূপ সকলেরই জানা আছে; সুতরাং ঐ সকল অপ্রীতিকর বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। আমরা কেবলই ভাবি খেলোয়াড় আমদানী রোধের আইনের কথা। উহার অকার্যকারিতা যখন বিশেষ প্রকট হইয়াই দেখা দিয়াছে তখন উহা তুলিয়া দিলেই হয়। দর্শনধারী হিসাবে আইনকে খাড়া রাখিয়া সকল কিছু বে-আইনী কার্য যখন অবাধে চলিয়াছে তখন আইনের প্রয়োজন কি আছে। বাঙলা দেশের ফুটবল পরিচালকগণ যখন বাঙালী খেলোয়াড়দের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন তখন অবশিষ্ট সকল প্রথম শ্রেণীর দলই বা কেন অবাঙালী খেলোয়াড়দের দ্বারা দল পূরণের সুযোগ পাইবে না? অর্থশালী ক্লাবসমূহ অধিক অর্থের জোরে বাহিরের খেলোয়াড় দলে দলে

আমদানী করিবে, দল শক্তিশালী করিবে ও বৎসরের পর বৎসর ক্লাবের সুনাম প্রতিষ্ঠা করিবে অপরদিকে অর্থের জোর না থাকায় স্থানীয় খেয়োয়াড়দের উপর নির্ভর করিয়া দল গঠন করিয়া বৎসরের পর বৎসর সকল অপমান ও অপযশ নতমস্তকে সহ্য করিবে ইহা আর অধিক দিন চলিতে দেওয়া উচিত কি? সকল দলকেই বেপরোয়া বাহিরের খেলোয়াড় আমদানী করিবার সুযোগ দিলে বোধ হয় এই বিরাট পার্থক্য চিরস্থায়ী হইয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে বর্তমান থাকিতে পারে না। জানি না এই সকল বিষয়ে কোনদিন কোন ব্যবস্থা হইবে কি না। আমরা ভবিষ্যৎ বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড়দের কথা স্মরণ করিয়াই উপরোক্ত সকল কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। খেলাধূলার যে প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাহা ঐ সকল বিশিষ্ট ক্লাবের পরিচালকগণ সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হওয়ার ফলেই এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যদি ঠিক থাকিত, সাধ্য ছিল না বাহিরের খেলোয়াড়দের বাঙলার মাঠে সকল গৌরবের অধিকারী হওয়া। খেলার উন্নতি ও খেলোয়াড় তৈয়ারীর তখন ব্যবস্থা হইতে পারিত; কিন্তু বর্তমানে হওয়া অসম্ভব। প্লেয়ার্স এসোসিয়েশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে এবং ইহার কয়েকজন পরিচালক তরুণ খেলোয়াড়দের উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী করিবার জন্য নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিতেছেন। প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সাফল্যলাভ করা অসম্ভব—যত দিন বাহিরের খেলোয়াড় আমদানী প্রথা বন্ধ না করা হইতেছে। তাঁহাদের শিক্ষিত খেলোয়াড়গণ খেলিবার সুযোগ পাইলে তবে তো উত্তরোত্তর উন্নতির পথ রচনা করিবে।

সন্তরণ

বাঙলার সন্তরণ মরসুম আরম্ভ হইয়াছে সত্য; কিন্তু সন্তরণ শিক্ষার সেইরূপ ব্যবস্থা এখনও কোন স্থানে হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। তবে সন্তরণ পরিচালকগণ কতকগুলি খ্যাতনামা সাঁতারুদের আচরণ ও আলোচনায় একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। শোনা যাইতেছে তাঁহারা নাকি শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করিবেন। কি যে অপরাধ, কেন সে অপরাধী ইহা যদিও এখনও পরিচালকগণ প্রচার করেন নাই। নিয়মানুবর্তিতার দিক হইতে অন্যায়ের জন্য শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা বলিব পরিচালকগণ ঐ সকল ছোটখাট ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষার দিকে একটু বিশেষ মনোযোগী হউন। ইহাতে ভবিষ্যতই মঙ্গলময় হইবে। বাঙলার সাঁতারুগণ যে স্তরে নামিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষা উন্নততর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও সম্ভব হইবে। শিক্ষা ও সাধনা এই দুইটি অঙ্গাঙ্গীভাবে না চলিলে কখনও কোন অভাবনীয় সাফল্যলাভ করা যায় না। জাপানের দিকে একবার দৃষ্টি দিলে আমরা কি দেখিতে পাই—দেশটি যুদ্ধের কবলে পড়িয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। জাতির প্রত্যেকটি ঘরে ঘরেই অনাহার, দারিদ্র; কিন্তু তথাপি সেই দেশের পুরুষ ও মহিলা সাঁতারুগণ এখনও বিশ্বখ্যাতি লাভে সক্ষম। দেশের সম্মান, জাতির সম্মান তাঁহাদের প্রত্যেকটি সাঁতারু ও সন্তরণ পরিচালকের নিকট সর্বাপেক্ষা চিন্তার ও লক্ষ্যের বিষয়। দেশের সকল কিছু বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা চলিয়াছেন জাতির অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে। হীন দলাদলি, অহেতুক আতঙ্ক বা ভীতি তাঁহাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না। শিক্ষা ও সাধনায় একনিষ্ঠভাবেই তাঁহারা লিপ্ত সেইজন্যই তাঁহাদের পক্ষে সাফল্যলাভ করা এত সহজ হইয়াছে। এই আদর্শ চক্ষের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও সামান্য ঘটনা বা আলোচনা লইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া সন্তরণ পরিচালকদের কি উচিত হইতেছে?

টেবিল টেনিস

ভারতীয় টেবিল টেনিস ফেডারেশনের পরিচালকগণের নিষ্ঠা ও একাগ্রতার জন্য ভারত বিশ্ব টেবিল টেনিস জগতে সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। মাত্র তিন বৎসর পূর্বেও যাহা ছিল কল্পনাতীত, বর্তমানে তাহা বাস্তবরূপ ধারণ করিয়াছে। বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার পরবর্তী অনুষ্ঠান ভারতে আগামী বৎসরে হইবে ইহা একরূপ নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি পর্যন্ত ইতোমধ্যে ইউরোপের সকল দেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের ভারতের অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিবৃতিতে ইহা একরূপ জোর করিয়াই বলিয়াছেন যে, এই যোগদানের ফলে সকল দেশের খেলোয়াড়গণ এক বন্ধুত্বসূত্রে গাঁথা প্রমাণিত হইবে। বিশ্বের বহু খ্যাতনামা টেবিল টেনিস খেলোয়াড় যে ভারতে আসিবেন ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ইতোমধ্যেই বিশ্বের চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় জনী লিচ কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব ভারত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছেন। অদূরে ভবিষ্যতে ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড়গণও যে একদিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হইবেন ইহা হইতেই আশা করা যায়। কারণ ভারতের খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড যদি খুবই নিম্নস্তরের হইত, তাহা হইলে কখনই আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন বিশ্ব প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের সুযোগ ভারতকে দিতেন না।

দেশী সংবাদ

৭ই মে—সুপ্রীম কোর্ট নবসংশোধিত নিবারক নিরোধ আইন বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মাদ্রাজ এবং আসামের কয়েকজন কম্যুনিস্ট হেবিয়াস কর্পাস অনুযায়ী আবেদন দাখিল করিলে তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট এই রায় দেন।

নয়াদিল্লীতে আচার্য কৃপালনীর বাসভবনে সদ্যোবিলুপ্ত ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের সদস্যদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রন্টের অধিকাংশ সদস্য কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বরোদার ভূতপূর্ব নৃপতি শ্রীপ্রতাপ সিং-এর পুনর্বহালের আবেদনপত্র রাষ্ট্রপতি অগ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরকালে সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কেশকার বলেন যে, পূর্ববঙ্গ সরকার হিন্দুদের জমি ও বাসভবনাদি রিকুইজিশন করিয়া লইতেছেন এরূপ অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ কেশকার আরও জানান যে, পূর্ববঙ্গে উপজাতীয় লোকদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ ও বিবাহের কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

৮ই মে—কোচবিহার কর্ম-পরিষদ তাঁহাদের অভিযোগ দূর করার দাবী জানাইয়া ৪ দিন ধরিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের এক সুদীর্ঘ কার্য-সূচী ঘোষণা করিয়াছেন।

৯ই মে—অদ্য পঁচিশে বৈশাখের স্মরণীয় দিবসে কলিকাতা নগরী শ্রদ্ধাভক্তিবিনম্রচিত্তে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একনবতিতম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে।

কলিকাতায় ১০৬·৩ ডিগ্রী তাপে গণপৎ কুর্মী নামে ৫০ বৎসর বয়স্ক এক রিক্সাওয়ালা সর্দি-গর্মি হইয়া মারা গিয়াছে।

নেপালের অন্তবর্তী মন্ত্রিসভার সংকট সম্পর্কে আলোচনার জন্য নেপালের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ অদ্য কাঠমাণ্ডু হইতে দিল্লী যাত্রা করেন।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে জন-প্রতিনিধিত্ব বিল (২নং) সম্বন্ধে বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে। এই বিলের বিধান অনুযায়ী আগামী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

শালকিয়ায় মালীপাঁচঘরায় হাওড়া পৌর-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংক্রামক ব্যাধির হাস-

সাপ্তাহিক সংবাদ

পাতালে ৫৬টি শয্যা সম্বলিত 'সত্যবালা দেবী আরোগ্য ভবনের' উদ্বোধন হয়।

১০ই মে—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু পার্লামেণ্টে বলেন যে, ভারতকে খাদ্য সাহায্যদান সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে যে দুইটি বিল উত্থাপিত হইয়াছে তাহাতে কোনও রাজনৈতিক বা বৈষম্যমূলক সর্ত নাই। অতএব মার্কিনের এই খাদ্য সাহায্য গ্রহণে ভারতের পক্ষে আপত্তির কোন কারণ নাই।

পার্লামেণ্টের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী নেহরু বলেন, ভারতবর্ষে রুশিয়ার গম আমদানী করা সম্পর্কে কেবল আলোচনাই চলিতেছে না—পরন্তু ইতোমধ্যেই গম লইয়া কয়েকখানি রুশ জাহাজ ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট আজ যুক্তপ্রদেশ জমিদারী বিলোপ এবং ভূমি সংস্কার আইন (১৯৫১) বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

১১ই মে—অপূর্ব গাম্ভীর্যময় পরিবেশের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অদ্য শুভ-মুহূর্তে প্রাতঃ ৯টা ৪৭ মিনিটের সময় প্রভাস-পত্তনে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সোমনাথের নব-নির্মিত মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অদ্য কামারপুকুরে (হুগলী) যুগাবতার রামকৃষ্ণদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১২ই মে—অদ্য পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৯৫১ সালের শাসনতন্ত্র (প্রথম সংশোধন) বিল উত্থাপন করেন।

আচার্য কৃপালনী অদ্য বোম্বাইয়ে এইরূপ আভাস দেন যে, তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৩ই মে—সদ্যো বিলুপ্ত ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের নেতা আচার্য কৃপালনী এবং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের মধ্যে কংগ্রেসে ঐক্য বিধানের জন্য যে নিষ্ফল আলাপ-আলোচনা হয়, অদ্য তদসম্পর্কিত পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য কৃপালনী তাঁহার পত্রে কংগ্রেসের বিগত নির্বাচনে গণ-তন্ত্র বিরোধী ও দুর্নীতিমূলক কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটি দ্বারা পুঙ্খানু-পুঙ্খ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। অপরপক্ষে কংগ্রেস সভাপতি জানাইয়াছেন যে, দুর্নীতি প্রভৃতি অস্পষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে কোন তদন্ত করা যাইতে পারে না বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৭ই মে—গতকল্য মধ্য আমেরিকার এল সাল-ভেডারে এক ভূমিকম্পের ফলে ২ শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

৯ই মে—পারস্যের তৈলখনিসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত-করণ বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে বৃটেনের সর্বশেষ প্রস্তাব পারস্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

১০ই মে—রাষ্ট্রপুঞ্জের সেনাপতিমণ্ডলীর অস্থায়ী অধ্যক্ষ বেনেট দ্য রাইডার সিরিয়া ও ইসরাইলের নিকট সীমান্তবর্তী অসামরিক এলাকা হইতে সৈন্যাপসরণের যে প্রস্তাব করিয়া-ছিলেন, সিরিয়া ও ইসরাইল উভয় রাষ্ট্রই তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

নিউইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য লইয়া ৩১টি মার্কিন জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে অথবা মার্কিন গম বোঝাই করিতেছে।

১২ই মে—অদ্য ওয়াশিংটনে ভারত গভর্ণ-মেণ্টের জনৈক কর্মচারী বলেন যে, বর্তমান বৎসরে ভারতের অন্ততঃ ১০টি দেশের নিকট হইতে ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ক্রয় করিবার অভিপ্রায় আছে এবং ইতোমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রায় ৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ক্রয় করা হইয়াছে।

১৩ই মে—চীনের সমগ্র উপকূল বরাবর কম্যুনিস্টরা ৫ শত বিমান ও তিন লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। ইংরাজী সংবাদপত্র "ডেলি চায়না নিউজ" বলেন যে, মূল ভূভাগে জাতীয়তাবাদী চীনাদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ করাই এই সৈন্য সমাবেশের উদ্দেশ্য।

জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেকের কুয়োমিণ্টাং দলের সরকারী সংবাদপত্র 'সেণ্ট্রাল নিউজ" অদ্য সংবাদ দিয়াছেন যে, হংকং-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে কম্যুনিস্ট সামরিক ঘাঁটি হাইনান দ্বীপে দুই শত রুশ সাবমেরিন সমবেত হইয়াছে।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০্ ষাণ্মাসিক—১০্ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ]   শনিবার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ সাল।   Saturday, 26th May, 1951.   [৩০শ সংখ্যা

নীতি ও তাহার প্রয়োগ

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাব ভারতীয় সংসদে গৃহীত হইয়াছে। পরে শাসনতন্ত্র সংশোধন বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। কমিটির রিপোর্টও স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। সিলেক্ট কমিটিতে বিলটির ধারাগুলির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটিবে না ইহা ধরিয়াই লওয়া গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তেমন পরিবর্তনের ক্ষেত্রও রাখা হয় নাই। এই সংশোধনের প্রতিবাদ অনেকেই হইয়াছিল; কিন্তু দেশবাসীর সমস্ত বক্তব্য অরণ্য রোদনে পর্যবসিত হইয়াছে। প্রধান-মন্ত্রীর ইচ্ছাই জয়যুক্ত হইয়াছে। কে তাঁহার গতি রোধ করিবে? ভারতীয় সংসদের কংগ্রেসীদল তাঁহারই অংগুলী সংকেতে পরিচালিত। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী এক্ষেত্রে যুক্তির জোর অপেক্ষা শক্তির জোরকেই সম্বল স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত শাসনতন্ত্র সংশোধন বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাইবার অনুকূলে সংসদে তিনি যে বক্তৃতা দেন, আমরা তাহাতে যুক্তির বিশেষ কিছুই দেখিতে পাই নাই। নীতির বাস্তব প্রয়োগের দিক হইতে তিনি বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিংবা পররাষ্ট্র-নীতির বিচার প্রকৃতপক্ষে এড়াইয়া গিয়াছেন এবং স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের ফাঁকা দার্শনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থিত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। পণ্ডিতজীর অভিমত এই যে, কোন সমাজেই ব্যক্তি বিশেষের যথেচ্ছ কাজ করার পুরাপুরি স্বাধীনতা নাই। গণতান্ত্রিক সমাজেও সামাজিক স্বাধীনতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যক্তির সম্পর্ক কার্যকরী করা উচিত। বলা বাহুল্য এ সবই তত্ত্ব কথা এবং রাষ্ট্র-নীতিতে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহাদের সকলেরই এ সব তত্ত্ব জানা আছে। কিন্তু স্বাধীনতার এই যে, নিয়ন্ত্রণ এবং সংযমন-রীতি জনগণের সমর্থনেই তাহার সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। ভারতের জনসাধারণকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় কি? পণ্ডিতজীর আরও অভিমত এই যে, এদেশে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা নাই। তিনি বলিয়াছেন, "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলিতে সরকার কর্তৃক নিয়মিত বিধি-নিষেধ বা বিধি-নিষেধের অভাবকে অনেকে বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু যখন একই মালিকানার অধীনে বহু সংখ্যক সংবাদপত্র পরিচালিত হয়, তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কতটুকু থাকে? ভারতের সংবাদপত্রসমূহ তিন বা চারটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কতটুকু আছে?" বলা বাহুল্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষে এমন যুক্তি একান্তই অবান্তর। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র জনমতেরই অভিব্যক্তি করিয়া থাকে এবং জনসাধারণের সমর্থন ব্যতীত সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা বজায় থাকে না। স্বাধীনভাবে জনগণের সেবার অধিকার সংবাদপত্র-সেবার ক্ষেত্রে মুক্ত রাখাই গণতন্ত্রমূলক প্রগতিশীল রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য। জনগণের সেবার মর্যাদা অব্যাহত রাখার দায়িত্ব সংবাদপত্রসেবীদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। সকল দিক হইতে আমাদের নৈতিক অধোগতি সত্ত্বেও সংবাদ-পত্রসেবার আদর্শকে অর্থদাসত্বের গ্লানি হইতে ঊর্ধ্বে রাখিবার মত শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বিবেক-বুদ্ধি সংবাদপত্র-সম্পাদকদের লোপ পায় নাই, এ সত্যটুকু স্বীকার করিয়া লওয়াই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সমীচীন হইত। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য-জ্ঞানকে তুচ্ছ করা গণতন্ত্র-সম্মত রাষ্ট্রের নেতার পক্ষে নিশ্চয়ই শোভা পায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের পক্ষে সংগত কোন যুক্তির অভাবেই ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে যে এ সব কথা বলিতে হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কথায় কথায় শাসনতন্ত্রের সংশোধনের এমন ঝোঁক সংযত রাখাই তাঁহার পক্ষে উচিত ছিল। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এ সম্বন্ধে তাঁহার পদোচিত কর্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অবশ্য পূর্ণ হইল। এতটা লঘু-চিত্ততার সঙ্গে কোন রাষ্ট্রের সুনির্ধারিত শাসনতন্ত্রের সংশোধন বা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। ইহার পর যে দলই ভারতের শাসন ক্ষেত্রে ক্ষমতা

লাভ করিবে তাহারাই স্ব স্ব প্রয়োজনে শাসনতন্ত্র লইয়া ছিনিমিনি খেলিবে, আমাদের ইহাই আশঙ্কা।

আচার্য কৃপালনীর পদত্যাগ

আচার্য কৃপালনী কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এ সিদ্ধান্ত নাকি অপরিবর্তনীয়। বহুদিন হইতেই এমনটা যে ঘটিবে ইহা অনুমান করা গিয়াছিল। সেই অনুমান বাস্তবে পরিণত হইবার ফলে এতৎসম্পর্কিত আলোচনা গবেষণার অবসান ঘটিল, সাধারণের পক্ষে ইহাও একটা আশ্বস্তির বিষয় বলিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে ঐক্য বা সংহতির মূল্য সেইখানেই যেখানে আদর্শের প্রাণবত্তা মৌলিক ভিত্তি স্বরূপে কাজ করে, প্রত্যুত সেই প্রাণবস্তুরই অভাব, সেখানে জোড়াতালি দেওয়া ঐক্যের কোন মূল্যই থাকে না; পরন্তু বুদ্ধিভেদের ফলে জনচিত্ত বিভ্রান্ত হয়। আচার্য কৃপালনীর এই পদত্যাগ সম্পর্কে কংগ্রেস-সভাপতি এবং তাঁহার মধ্যে যে পত্রাবলীর আদান-প্রদান ঘটে সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে এগুলির কোন মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। সুতরাং সেগুলির বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা নিরর্থক। প্রত্যুত অনেকাংশেই অনর্থকও বটে এবং তেমন আলোচনার সম্বন্ধে জনসাধারণের কোনরূপ যে আগ্রহ আছে, ইহাও মনে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে আচার্য কৃপালনীর পত্রাবলী পাঠে কংগ্রেস-সভাপতির সহিত ব্যক্তিগত মতভেদই তাঁহার পদত্যাগের প্রধান কারণ বলিয়া ধারণা জন্মে। কংগ্রেসের মূলগত আদর্শের সঙ্গে আচার্যের কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই, এ কথা তিনি তাঁহার পত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মতের পার্থক্য আদর্শ অনুযায়ী কাজের ধারা এবং রীতি লইয়া। ফলতঃ ডেমোক্রাটিক দলের এই কংগ্রেস পরিত্যাগে জাতির দিক হইতে সেটা বিশেষ দুঃখের ব্যাপার বলিয়া আমরা মনে করি না। বস্তুত কংগ্রেসের আদর্শে যাঁহারা প্রকৃতভাবে নিষ্ঠাসম্পন্ন তাঁহারাও তাহা মনে করিবেন না। কারণ, কংগ্রেসের আদর্শের যে পতন ঘটিয়াছে, ইহা অবিসংবাদিত এবং এ সত্য সকলেই, কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডজীও পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। জনসেবার আদর্শ বর্তমানে মলিন হইয়া পড়িয়াছে, মান, যশ, প্রতিপত্তি সূত্রে সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধনের প্রবৃত্তি কংগ্রেসের অধোগতিকে একান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা অবিসংবাদিত সত্য। কংগ্রেসকে আজ যদি সত্যই শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে দৃঢ়তার সঙ্গে এই নৈতিক অধঃপতনের গতিকে রুদ্ধ করিতে হইবে। কোন অঙ্গ যদি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে, তবে তাহা লইয়া বড়াই করিবার কিছু নাই এবং ব্যাধি চাপা দিয়া রাখাও সেক্ষেত্রে বিপজ্জনক; পক্ষান্তরে এরূপ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের মত প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বনই প্রয়োজন। কংগ্রেসের আদর্শের ক্রমিক বর্তমান অধোগতিকে রোধ করার জন্য বর্তমানে তেমন দৃঢ়তারই দরকার হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। গড্ডলিকার গতি নিরীক্ষণ করিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনার অবসর আর নাই, এই কথাই আমরা বলিব। অন্ততঃ কংগ্রেসের বাহিরে যদি কোন নেতৃত্ব-শক্তি কংগ্রেসের মৌলিক আদর্শের বলিষ্ঠ প্রেরণা লইয়া বিকশিত হয়, তবে স্থূলভাবে দেখিলে কংগ্রেসে ক্ষতি ঘটিয়াছে, মনে হইলেও কার্যত তাহার শক্তিই বাড়িবে এবং সেই পথে কংগ্রেসই পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে। এইভাবে জাতির মর্ম মূল মন্থন করিয়া নূতন শক্তি সমুত্থিত হইবে এবং সেই শক্তি কংগ্রেসকে নব বলে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কংগ্রেস মরিতে পারে না—মরিবেও না। জাতির জনক মহাত্মাজী মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও একথা বলিয়া গিয়াছেন। মহামানবের বাণী মিথ্যা হইবার নয়।

উৎকট সত্যাগ্রহ

সব দেশেই বৃহৎ আদর্শের প্রেরণা ছাত্র এবং তরুণ সমাজের অন্তরকে প্রবলভাবে স্পর্শ করে। ইহার ফলে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার, দুর্নীতিমূলক দেশাচার ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্বৈরচারিতা এবং বৈদেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে তরুণদিগকে বিদ্রোহ অবলম্বন করিতে দেখা যায়। এদেশেও এমন ব্যাপার ঘটিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ছাত্র ও তরুণদের দান সামান্য নয়। বাঙলা দেশের সমাজ-ব্যবস্থাকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য তরুণদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার হইয়াছিল; ইহাও উল্লেখযোগ্য। বৃহৎ আদর্শের জন্য তরুণ এবং ছাত্রসমাজের মধ্যে এই প্রেরণা এবং উদ্দীপনাকে আমরা অকুণ্ঠভাবেই সমর্থন করিয়াছি। এক্ষেত্রে অচলায়তনের পক্ষ হইতে আর্তনাদকে আমরা গ্রাহ্য করি নাই। ভীরুর যুক্তি আমরা মানি নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীর অশ্রদ্ধা এবং তজ্জনিত উচ্ছৃঙ্খলতার একটা মনোভাব বর্তমানে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে আমরা কোনক্রমেই তাহার সমর্থন করিতে পারি না। বস্তুত ছাত্রদের ঐরূপ মনোভাবের মূলে কোন বৃহৎ কিম্বা বলিষ্ঠ আদর্শের প্রেরণা নাই। পরন্তু ইহাকে দস্তুরমত স্বেচ্ছাচারমূলক জবরদস্তি বলা যাইতে পারে। গত ১লা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্তর জন মেডিকেল ছাত্র ফাইন্যাল পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দিতে হইবে এই দাবী তুলিয়া ভাইস-চ্যান্সেলারসহ সিণ্ডিকেটের সদস্য-দিগকে সমস্ত রাত্রি আটক করিয়া রাখেন। ছাত্রেরা বহির্গমনের দ্বার জুড়িয়া বসিয়া থাকেন, ফলে সদস্যগণ বাহির হইতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে অনাহারে এবং অনিদ্রায় অনভ্যস্ত রাত্রি যাপন করিতে হয়। অধ্যয়ন ছাত্রদের তপস্যা। শ্রদ্ধাবান এবং বিনয়শীল ছাত্রেরাই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। দেশের ইঁহারাই আশা এবং ভরসাস্থল। জাতি ইঁহাদিগকে লইয়াই গৌরব করিবে। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যুত ইহাদের মধ্যে যদি এইরূপ অবিনয় এবং অশ্রদ্ধার ভাব দেখা দেয়, তবে তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিয়াই আমরা মনে করি। আমাদের আশঙ্কা এই যে, এক শ্রেণীর রাজনৈতিক মতবাদ পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজের মধ্যে ঔদ্ধত্য এবং অশ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া তুলিতেছে। যে কোন রকম উচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি করাকে এই মতবাদীরা বীরত্ব এবং গৌরবের বিষয় বলিয়া বুঝাইয়া থাকে। ছাত্র-সমাজের যাহারা মুখপাত্র তাহাদের মুখে কথায় কথায় এই দলের রাজনীতিক মতবাদ-মূলক বাধা বুলিও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রগতি, বিপ্লব এই সব বড় বড় সংজ্ঞা দিয়া অনাচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া এই দলের নীতি। ছাত্রদিগের প্রতি আমরা মঙ্গলকামী সুহৃদের মনোভাব লইয়া এই

অনুরোধ করিতেছি যে, এই প্রকার মতবাদের মোহে তাঁহারা পড়িবেন না। অশ্রদ্ধা এবং অবিনয়ের ভাব তাঁহারা পরিত্যাগ করুন। তাঁহাদের অভিযোগের কারণ থাকে, যথোচিতভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহারা তাহা উপস্থিত করিতে পারেন। ১লা জ্যৈষ্ঠের ব্যাপারের পরও আমরা তাঁহাদিগকে এই পরামর্শই দিব। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ঐ দিনের কাজের সমর্থনে তাঁহাদের পক্ষ হইতে যেসব যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছে, আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহার সঙ্গতি উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহাদের উক্তি স্পষ্টতঃই অযৌক্তিক এবং অধিকন্তু অবিশ্বাস্য। শিক্ষক, অধ্যাপক এবং শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ—ইঁহাদের নীতি ও নির্দেশ অগ্রাহ্য করিবার জন্য সত্যাগ্রহের নামে উৎকট উৎপীড়নমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা অন্তত তাঁহাদের পক্ষে সাজে না, আমরা এই কথাই বলিব। অনুরোধ কোন ক্ষেত্রে উপদ্রব হইয়া দাঁড়ায়, ইহা তাঁহারা বুঝিতে না পারেন, এমন নয়। দুই দিন পরে দেশ ও সমাজের পরিচালনার ভার তাঁহাদের উপরই আসিয়া পড়িবে, একথা তাঁহারা যেন বিস্মৃত না হন এবং জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি মর্যাদাবোধ তাঁহাদের থাকে।

পূর্ববঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্দৈব

আসামের ভূমিকম্পের প্রতিক্রিয়া এখনও চলিতেছে। জন-জীবন এখনও সেখানে সর্বত্র সুসংস্থিত হয় নাই। সম্প্রতি ফরিদপুরের ভাটিয়াপাড়া ও তাহার নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামের উপর দিয়া প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইবার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহার কিছুদিন পূর্বে যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত লোহাগড়া থানার উপর দিয়াও একটা ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া যায়। তাহার ফলে সামান্য ক্ষতি ঘটে নাই। লোকের প্রাণহানিও কিছু কিছু হইয়াছিল। কিন্তু ভাটিয়াপাড়া অঞ্চলের এই ঘূর্ণিবাত্যা বোটমারী, মধুখালি ও বালিয়াকান্দী থানার ২৫ মাইলের অধিক স্থান একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া গিয়াছে। সংবাদে দেখা যায় যে, প্রচণ্ড ঝড়ে ৫ শত লোক হত এবং ১৫ শত ব্যক্তি আহত হইয়াছে। অনেক লোকের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। পাকিস্থান গণপরিষদের সদস্য [illegible] ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বিধ্বস্ত অঞ্চল [illegible] করিয়া আসিয়া সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই দুর্দৈবের ভীষণতায় স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহার বর্ণনায় দেখা যায়, এক বেরাদী গ্রামেরই আড়াই হাজার অধিবাসীর মধ্যে এ পর্যন্ত দেড়শত মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। আহতের সংখ্যাও সাড়ে তিন শতের অধিক। আঘাতের ধরণ যেরূপ অদ্ভুত, তেমনই ভয়াবহ। একটি স্ত্রীলোকের মাথার খুলি তিন টুকরা হইয়া এক টুকরা উড়িয়া গিয়াছে এবং পশ্চাতের অংশ একটি বৃক্ষকাণ্ডে গাঁথিয়া থাকে। একটি বালকের সমস্ত চামড়া যেন ছাড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল। নরনারীর দেহ হইতে মাংসপিণ্ড ছিন্ন হইয়া যায়। বহু মানুষের ছিন্ন দেহ, হাত, পা দেখা গিয়াছে। পূর্ববঙ্গ সরকার দুর্গতদের রক্ষা ব্যবস্থা তৎপরতার সহিতই অবলম্বন করিয়াছেন এবং আহতদের শুশ্রূষারও যথোচিত ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা সুখের বিষয়। জনসাধারণের এই বিপদে সরকারী এবং বেসরকারী উভয়-ভাবেই চেষ্টা হওয়া আমরা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বিপন্ন নরনারীকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ববঙ্গের তরুণদের আগাইয়া যাওয়া উচিত। মানব-সেবার ঐতিহ্য তাঁহাদের আছে। প্রকৃতপক্ষে এই সেবা-বোধের প্রেরণার উপরই সব রাষ্ট্র এবং সমাজের উন্নতি নির্ভর করে। বর্তমান দুর্দৈবের ভিতর দিয়া পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনে মানবতার প্রেরণা সত্য এবং দীপ্ত হইয়া উঠুক, আমরা এই কামনা অন্তরে লইয়া ফরিদপুরের বাত্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গত নরনারীর প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শাসন বিভাগে দুর্নীতি

সম্প্রতি কলিকাতার মিউনিসিপাল ম্যাজিস্ট্রেট শহরের কোন সরিষার তেলের গুদামের ম্যানেজার এবং বিক্রেতাকে ভেজাল চালাইবার অপরাধে ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে ৩০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অপরাধে অবশ্য অসাধারণত্ব কিছুই নাই, বরং এই শ্রেণীর অপরাধ বর্তমানে সাধারণ হইয়া [illegible] বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। [illegible] এই মামলার রায়ে ম্যাজিস্ট্রেট যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষত্ব কিছু আছে। প্রথমত এদেশে গণেশ মার্কা তেল বিশুদ্ধ বলিয়া একটা সুনাম আছে এবং এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ভারতের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। বিচারের ফলে দেখা যাইতেছে, যাঁহাদের এমন সুনাম আছে, তাঁহারাও লোভকে সংযত রাখিতে পারেন না এবং সেজন্য অনিষ্টকর বস্তু খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিতেও তাঁহাদের সংকোচ বোধ নাই। দেশের নৈতিক অধোগতি কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, ইহাতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত এই মামলায় নিজদিগকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য আসামীপক্ষ উত্তরপ্রদেশের একজন রাসায়নিকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিশেষজ্ঞ পুরুষটি যে সে ব্যক্তি নহেন। তিনি উক্ত প্রদেশের সরকারের একজন তৈল-পরীক্ষক এবং ভারত সরকারের মার্কেটিং ও ইন্সপেকসন ডাইরেক্টরের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত অফিসার; সুতরাং উঁচুদরের সরকারী কর্মচারী। ম্যাজিস্ট্রেট ইহার সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, কর্পোরেশন কর্তৃক অভিযুক্ত আরও কয়েকটি বড় বড় তৈল-ব্যবসায়ীর মামলায়ও ইহাকে সাক্ষী মান্য করা হইয়াছে। প্রত্যেকবার এই বিশেষজ্ঞপ্রবর আসামীদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই মামলায় তেল পরীক্ষা না করিয়াই তিনি আসামীদের পক্ষে সাফাই দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ম্যাজিস্ট্রেটের এই মন্তব্য অত্যন্তই গুরুতর। যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই যদি ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়, টাকার জোর থাকিলেই যদি পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সার্টিফিকেট মিলে তবে আর চিন্তা কি? প্রকৃতপক্ষে সরকারী দায়িত্বসম্পন্ন পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাঁহারা এই শ্রেণীর পাপকে প্রশ্রয় দেয়, সাধারণ অপরাধীদের চেয়েও তাঁহারা বেশি দণ্ডার্হ। এরূপ ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মর্যাদাবোধ যে নষ্ট হইবে, ইহাও স্বাভাবিক। যুক্তপ্রদেশের সরকার এবং ভারত সরকার তাঁহাদের এই রাসায়নিক পণ্ডিত কর্মচারীটির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, ইহাই দ্রষ্টব্য।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান জেনারেল ম্যাক-আর্থারকে পদচ্যুত করেছেন বটে, কিন্তু কার্যত মার্কিন সরকারী নীতি ক্রমশ ম্যাক-আর্থারী রূপেই ধারণ করছে। এ রকম যে হবে তা আমরা পূর্বেই অনেকটা অনুমান করেছিলাম। তবে ট্রুম্যান সরকার যে এত তাড়াতাড়ি এত খোলাখুলি ভাবে ম্যাক-আর্থারী মতবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করবেন তা অনেকে ভাবতে পারেনি। ট্রুম্যান সরকার বরাবরই পিকিং গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিকে ইউনোতে স্থান দেবার বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু কোনোদিনই আমেরিকা ও চীনের পিওপলস্ গভর্মেণ্টের ঝগড়া মিটবে না বা আমেরিকা কোনোদিনই পিওপলস্ গভর্নমেণ্টকে চীনের গভর্নমেণ্ট বলে স্বীকার করে নেবে না—এই হোল ট্রুম্যান সরকারের নীতি, এ রকম ঠিক ভাবা যায়নি। সাধারণত এই মনে হয়েছে যে, চীনের পিওপলস্ গভর্নমেণ্টের ব্যবহার কোনো কোনো বিষয়ে না বদলানো পর্যন্ত আমেরিকা কিছুতেই তাকে চীনের ন্যায়-সঙ্গত গভর্নমেণ্ট বলে স্বীকার করে নেবে না ও তার সংগে আপোষও করবে না, তবে চিয়াং-কাই-শেককে জীইয়ে রাখা সত্বেও এটা মনে হয়নি যে, ট্রুম্যান-এ্যাচিসন কোনো দিন চিয়াং-কাইশেককে দিয়ে মাও সি-তুঙকে চীনের কর্তৃত্ব থেকে সরাবার কল্পনা করেন। কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময়ে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ফরমোজার "নিরপেক্ষী-করণ" নীতি ঘোষণা করেন, তার অর্থ ছিল এই যে, এক পক্ষে চীনের কম্যুনিস্ট সরকারকে ফরমোজার দিকে হাত বাড়াতে দেয়া হবে না, অপর পক্ষে ফরমোজা থেকে চিয়াং-কাইশেককেও চীনের ভূভাগের উপর কোনো রকম হামলা করার চেষ্টা করতে দেয়া হবে না। যদিও এই "নিরপেক্ষী-করণে"র প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ফরমোজাকে মার্কিন এক্তিয়ারের মধ্যে রাখা, তাহলেও বাহ্যত এর পক্ষে এই যুক্তি দেখানো যেত যে, এর দ্বারা সংঘর্ষের ব্যাপ্তির সম্ভাবনা কিছুটা কমল। তখনও কিন্তু মুখে বলা হোত যে কোরিয়ার গোলমাল মিটলে ফরমোজার ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হবে। "নিরপেক্ষীকরণ" যদি খাঁটি হোত তাহলে ফরমোজায় চিয়াং-কাই-শেক বাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক শিক্ষক ইত্যাদি পাঠিয়ে তাকে পুষ্ট করার প্রশ্নই উঠত না। যখন জানা গেল যে, মার্কিন সরকার ফরমোজায় চিয়াং-কাইশেক বাহিনীকে মজবুত করার ব্যবস্থা করেছেন তখন এই কৈফিয়ৎ দেয়া হোল যে, চীনের কম্যুনিস্ট গর্ভমেণ্টের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে মাত্র আত্মরক্ষার প্রস্তুতির জন্যই চিয়াং-কাইশেককে সাহায্য করা হচ্ছে। এখন আর মার্কিন সরকার কোনো রকম ভাঁওতা দেবার প্রয়োজন বোধ করছেন না।

সম্প্রতি মার্কিন সরকারের এ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ ডীন রাস্ক এক বক্তৃতায় বলে দিয়েছেন যে, যদি কোনো সময়ে বুঝা যায় যে চিয়াং-কাইশেক চীনা ভূভাগ আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারবেন তবে মার্কিন সরকার তাতে সাহায্য করতে রাজী আছেন। সেনেট কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আমেরিকার জয়েণ্ট চিফস্ অব স্টাফ'এর চেয়ারম্যান জেনারেল ব্রাডলিও বলেছেন যে, আমেরিকান সৈন্যদের না জড়িয়ে চিয়াং-কাইশেক বাহিনীকে চীনের ভূভাগ আক্রমণ করতে দিতে কোনো আপত্তি নেই। বলা বাহুল্য, মিঃ রাস্ক ও জেনারেল ব্রাডলি বর্তমান মার্কিন সরকারী নীতির যে আভাস দিয়েছেন তা ফরমোজার 'নিরপেক্ষীকরণের' সম্পূর্ণ বিরপীত। শুধু তাই নয়, ট্রুম্যান-এ্যাচিসনের চৈনিক নীতি বলে অনেকের মনে যে ধারণাটা ছিল, সেটা আর বজায় থাকে না। যদিও ট্রুম্যান সরকারের পক্ষে চিয়াং-কাইশেককে একেবারে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না, তাহলেও একথা কেউ ভাবে নি যে, ট্রুম্যান সরকার চিয়াং-কাইশেককে দিয়ে চীনের পুনরাধিকারের কল্পনা কখনো করবেন। মিঃ রাস্ক বলেছেন, আমেরিকা কখনও চীনের কম্যুনিস্ট গভর্ন-মেণ্টকে স্বীকার করবে না। এই উক্তির সংগে তিনি চিয়াং-কাইশেককে দিয়ে চীন আক্রমণ করানোর সম্ভাবনার কথা জুড়ে দিয়েছেন। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, চীনের বর্তমান কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্টকে আমেরিকা তো স্বীকার করবেই না, ঐ গভর্নমেণ্টকে যেন-তেন-প্রকারেণ নষ্ট করাই আমেরিকান নীতির লক্ষ্য।

বৃটিশ ও আমেরিকান নীতির পার্থক্য এখন পূর্বের চেয়েও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। বৃটেন চীনের পিওপলস্ গভর্নমেণ্টকে স্বীকার করে নিয়েছে। আজ হোক, কাল হোক, মাও-সে-তুং গভর্নমেণ্টের সংগে কাজ কারবার করা সম্ভব হবে, এই ধারণার উপর বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নীতি প্রতিষ্ঠিত। সেই-জন্যই বৃটেন ইউনোতে পিকিং গভর্নমেণ্টকে স্থান দেবার পক্ষপাতী। মার্কিন নীতি ঠিক ইহার উল্টোমুখী। মার্কিন নীতি চীন থেকে কম্যুনিস্ট কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করতে চায় এবং তার জন্য চীনে আবার গৃহযুদ্ধ লাগাতেও প্রস্তুত। মাও-সে-তুং সরকারের প্রতি কোন রকম দরদ আছে বলে যে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাকে স্বীকার করে নিয়েছে, তা নয়, বৃটিশ স্বার্থের খাতিরেই করেছেন এবং বৃটিশ স্বার্থের খাতিরেই বৃটিশ গভর্ন-মেণ্ট চীনের সংগে একটা মিটমাট করে ফেলতে পারলে বাঁচেন, কিন্তু আমেরিকাকে বাদ দিয়ে চলবার সাধ্য তাঁর নেই। আমেরিকার চাপে চীনের সংগে বাণিজ্য সংকোচ করতে বৃটেন বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বাণিজ্য সংকোচ কি এখানেই থামবে? অচিরেই আমেরিকা চীনের উপকূল অবরোধের প্রস্তাব করবে বলে মনে হয়। তারপরেই হয়ত চিয়াং-কাইশেকের খেল শুরু করার তাগিদ উঠবে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মিঃ রাস্ক ও জেনারেল ব্রাডলীর কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু উপায় কি? সুদূর প্রাচ্যে আমেরিকার পিছন পিছন না গেলে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা যদি কাঁধ না দেয়? ইরানের তেল নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে আমেরিকার সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কিছু করবার জো নেই।

২৩।৫।৫১

ইন্দ্রজিতের আসর

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে ক্রমাগত বক্তৃতা আর সভার বিবরণ পড়ে পড়ে পাঠকদের মাথা নিশ্চয় ঝিম ঝিম করছে। একই কথার অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি হলে মাথা অমনিতেই ঠিক থাকে না। তার উপরে আমি যদি আবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলতে বসি সেটা বক্তৃতার বোঝার উপরে শাকের আঁটি না হয়ে যায়। তাছাড়া আমি যা বলব সে কথাও যে পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি হবে না তাই বা কে জানে? বক্তারা না বললেও বুদ্ধিমান শ্রোতারা নিশ্চয় এসব কথা ভেবে দেখেছেন।

আমাদের আসরে কয়েকজন বন্ধু আছেন যাঁরা ভিন্ন প্রদেশবাসী। এঁদের কেউ হিন্দী-ভাষী, কেউ উর্দুভাষী, কেউ উৎকলের অধিবাসী, কেউ কেরালার। এঁরা সেদিন আমাকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন তাইতেই রবীন্দ্রনাথের কথা এসে গেল। নইলে আপাততঃ কিছুকাল রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়াই উচিত ছিল। ওঁরা আমাকে জিগগেস করেছিলেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় বাঙলা সাহিত্য যে বেশি উৎকর্ষ লাভ করেছে তার মূল কারণ কি? দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছুই জানা নেই। তাহলেও মোটা-মুটি দুটো কথা বলতে কোনো দোষ নেই। কারণ সব কথা জেনে নিয়ে বলতে গেলে আর কথা বলা হয় না। এইজন্য আমি আগে কথা বলে নিই, পরে ইচ্ছে হয় তো সে বিষয়ে কিছু জানবার চেষ্টা করি। ওঁদের প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছিলাম যে, অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য যে বাঙলার সমকক্ষ নয় তার কারণ অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য প্রাদেশিক আর বাঙলা দেশের সাহিত্য দেশ প্রদেশের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাঙলা সাহিত্য যদি হয় নদী, অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য উপনদী। উপনদীর সঙ্গে সাগরের প্রত্যক্ষ যোগ নেই, নদীর সঙ্গে আছে। সাগরের লবণাক্ত স্বাদটি বাঙলা সাহিত্যে এসে গেছে। Salt of the earth বলতে আমরা বুঝি ভূমির প্রাণ-পদার্থ। এখানে সাহিত্যের লবণাক্ত স্বাদ বলতে আমি সাহিত্যের প্রাণীন পদার্থের কথাই বলছি।

উৎকৃষ্ট সাহিত্যের স্বভাবেই আছে—বসুধৈব কুটুম্বকম্। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তার কুটুম্বিতা। মনের যোগ যেখানে স্থাপিত হয়েছে ভাষার ব্যবধান সেখানে দূর হয়ে যায়। অপর দেশের মানুষ তার বাক্য না বুঝতে পারলেও বক্তব্য বুঝতে পারে। মূলতঃ সব সাহিত্যই দেশজ। ক্রমে বহির্জগতের সঙ্গে যখন তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় তখন সেই দেশজ মূর্তি পরিহার করে সে সার্বভৌম মূর্তি ধারণ করে। সার্বভৌম কথাটিকে খুব সহজ অর্থে গ্রহণ করুন। কোনো বিশেষ দেশের ভূমিতে যা জন্মগ্রহণ করেছিল, সকল দেশের ভূমির সঙ্গে যখন তার সখ্য জন্মাল তখন সে হল সার্বভৌম। উদ্ভিদ জগতে দেখুন কোনো কোনো ফুল লতাপাতা কেবলমাত্র গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে কিম্বা শীতপ্রধান দেশেই জন্মায়, কোনটির বা জন্ম নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলে। কিন্তু ঘাস জন্মায় না এমন দেশ নেই। সব দেশেতে চলতে গেলেই দলতে হয় রে দূর্বা কোমল। উদ্ভিদ জগতে দূর্বা ঘাসের হল সার্বভৌম অধিকার। ইয়েটস্ গীতাঞ্জলির ভূমিকায় রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে যে কথাটি বলেছিলেন তাতেই বাঙলা সাহিত্যের সার্বভৌম রূপটিকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন—

The work of a supreme culture they yet appear as much the growth of the common soil as the grass and the rushes.

গায়টে বলেছিলেন জার্মান কাব্যকে কেবলমাত্র জার্মান হলে চলবে না, তাকে ইয়ুরোপীয় হতে হবে। অর্থাৎ দেশজ মূর্তি ত্যাগ করে তাকে সার্বজনীন মূর্তি গ্রহণ করতে হবে। ইয়ুরোপীয় বলতে তিনি নিশ্চয় বৃহত্তর জগতের কথাই ভেবেছিলেন। গায়টের এই কথা সকল উৎকৃষ্ট সাহিত্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পৃথিবীময় সাহিত্যের যে মূল ধারাটি প্রবাহিত তার সঙ্গে যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ যোগ হচ্ছে ততক্ষণ প্রত্যেক সাহিত্যই প্রাদেশিক, ততক্ষণ সে কেবলমাত্র ভাষাগত প্রাণ। কোনো কোনো দেশের ভাগ্য ভালো। শুভক্ষণে কোনো অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি সেই পরিচয়ের সূত্রটি ধরিয়ে দেন। রেনেসাঁসের যুগে যেই না ইংলণ্ডের সঙ্গে বহির্জগতের শুভ-দৃষ্টি হল ঠিক সেই মুহূর্তে সেক্সপীয়র এসে দোঁহার হাত মিলিয়ে দিলেন। কেবল-মাত্র সেক্সপীয়র নয়, আরো অনেকে সেই মিলনযজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছেন। এই দিক থেকে বাঙলাদেশকেও মহাভাগ্যবান বলতে হবে। বৃহত্তর সাহিত্যের সুর প্রথম বাজল মাইকেল-কাব্যে। গ্রীক, লাটিন, ইংরেজি, ফরাসী সাহিত্য-সঞ্চারী তাঁর মন। মাইকেলের আগে পর্যন্ত বাঙলা কাব্যের গতিভঙ্গিটি ছিল গ্রাম্য-বধূর সলজ্জ কুণ্ঠিত পদক্ষেপের মতো। হঠাৎ একটি দৃপ্ত ভঙ্গী এল। এটি একেবারে নতুন। আগে যে লবণাম্বু-স্বাদের কথা বলেছি খুব মৃদু হলেও মাইকেলের কাব্যে তার আভাস আছে। এর পরে এসেছেন বঙ্কিম। মিল বেন্থাম তাঁর অধিগত, ইয়ুরোপীয় Humanism-এর দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত। বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ আরো ঘনিষ্ঠ হ'ল। এরও পরে রবীন্দ্র-নাথের আবির্ভাব এক অভাবনীয় সৌভাগ্য। বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো—এই হল বঙ্গ-সরস্বতীর কথা বিশ্বের সাহিত্যকে উদ্দেশ করে। দুই-এর মিলন সম্পূর্ণ হ'ল।

সাহিত্য যখন দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে তখন সে বিদেশী হয়ে যায় না, যখন জাতিকে অতিক্রম করে তখন বিজাতীয় হয় না। তখন সে সকল দেশের, সকল জাতির সামগ্রী হয়।

সাহিত্যের মূল সুরটি রবীন্দ্রনাথ ধরিয়ে দিয়েছেন, সত্যিকারের সাহিত্য-বোধকে জাগ্রত করেছেন, যার ফলে রবীন্দ্র-পরবর্তীদের পক্ষে খাঁটি সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এইটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় দান। নইলে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বাদ দিলে বাঙলা সাহিত্য অন্তঃসারশূন্য হ'ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বাদ দেবার পরেও আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে প্রাণশক্তি থেকে যায় তাই দিয়েই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ—। রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, তিনি সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছেন।

চক্রদত্ত

কথায় বলে 'বয়সের যেন গাছ পাথর নেই' অর্থাৎ গাছ আর পাথরের কোন বয়সের হিসাব করা যায় না। শিবপুর বাট্যানিক্যাল গার্ডেন-এর বড় বট গাছটা আমরা অনেকেই দেখেছি। গাছটা খুবই প্রাচীন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে পৃথিবীতে এর চেয়েও অনেক প্রাচীন গাছের সন্ধান আমরা জানি। ক্যালিফোর-নিয়ার 'রেড উড' (Sequoia gigantea) এর চেয়ে বয়সে প্রাচীন গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি হচ্ছে দক্ষিণ মেক্সিকোর স্যান্টা মেরিয়াতে একটা Tub cypress গাছ। এটি কত হাজার বছরের পুরান গাছ তার কোন হিসাব নেই। অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, এই গাছটির ৩০০০—৬০০০ বছর বয়স। কিন্তু এখনও গাছটি বেশ সজীব ও সতেজ আছে। ২৮জন লোক হাত ধরাধরি করে এর গুঁড়িকে বেড় দিতে পারে না। মাটি থেকে পাঁচ ফুট ওপরে গুঁড়ির মাপ ১১২ ফুট এবং ব্যাস ৩৬ ফুট। অবশ্য গাছটির বয়স এবং পরিধির অনুপাতে গাছটি লম্বায় খুব বেশি নয়—মাত্র ১৪০ ফুট আর ডাল ১৫০ ফুট পর্যন্ত ছড়ান। এখানকার আদিম অধিবাসীরা গাছটিকে খুবই সম্মানের চোখে দেখে। এরা বাইরের কোন লোককে গাছের গায়ে আঁচড় কাটতে দেখলেই তাদের আক্রমণ করে।

*

আমরা সোনাদানা মূল্যবান দলিল ইত্যাদি চোর ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ব্যাঙ্ক অথবা সেফ্ ডিপোজিট ভল্টে গচ্ছিত রেখে দিই। আমেরিকার এক খনির মালিক তার পরিত্যক্ত খনিটিকে একটি ভাল ভল্টে পরিণত করেছেন। তিনি তার ভল্টের নাম দিয়েছেন, 'আইরন মাউন্টেন ভল্ট স্টোরেজ কম্পানী'। খনিটার গভীরতা হচ্ছে ২০০ ফিট। খনিটার ভেতরে তিনি আগা গোড়া ৫০ ফুট ঘন সীসের দেওয়াল দিয়ে তৈরি করেছেন। তার মত হচ্ছে যে ২০০ ফুট লোহার ঘন পাত দিয়ে তৈরি দেওয়ালের চেয়ে এটা বেশি কার্যকরী হবে। খনিটা নিউ ইয়র্ক শহরের ১২৪ মাইল উত্তরে হাড্সন নদীর কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। খনির মালিক এর পেছনে লাখ, লাখ টাকা খরচ করেছেন। তিনি এই ভল্টটিকে আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় এবং সুরক্ষিত ভল্ট তৈরি করতে চান। তিনি এর মধ্যেই তার এই নতুন ভল্টে মূল্যবান দলিলপত্র রাখবার জন্য যথেষ্ট গ্রাহক পাচ্ছেন।

*

কলকারখানার আগুনের কাছে যারা কাজ করে তাদের পক্ষে কাপড়ে আগুন ধরবার ভয়টা একটা বড় সমস্যা। আমেরিকায় এক নতুন ধরণের কাপড় তৈরি করা হচ্ছে। এ কাপড় কোন রকম আগুনে পুড়বে না। এই কাপড় তৈরির সুতা geon tatex এর যৌগিক পদার্থের মধ্যে ডুবিয়ে নেওয়া হয় আর এই পদার্থের আগুন নেভাবার ক্ষমতা থাকার দরুণ কাপড় সোজাসুজি আগুনের ওপর ধরলেও এতে আগুন লাগে না। এই ধরণের কাপড় কলকারখানার লোকদের জন্য এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধারণ কাপড়ের মত এই কাপড় কাচা সম্ভব।

*

ইংলণ্ডে আর্মামেণ্ট রিসার্চ এস্টেব্লিস-মেণ্ট দ্রুত ছবি তোলবার এক নতুন ক্যামেরা তৈরি করেছে। এই ক্যামেরাকেই এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুত ছবি তোলার ক্যামেরা বলা যায়। এটা এক সেকেণ্ডের ৫০০০ ভাগ সময়ের মধ্যে ৮০ খানা ছবি অর্থাৎ এক মিনিটে ২৪,০০০,০০০ খানা ছবি তুলতে পারে। এই ক্যামেরার নাম দেওয়া হয়েছে 'কার সেল্ সাইন ক্যামেরা'। এই ক্যামেরার সাহায্যে কোন রকম বিস্ফোরণের ছবি তোলা খুব সহজ হয়ে গেছে। ক্যামেরাটা তৈরির মধ্যে একটু নতুনত্ব আছে। যে কোন সাধারণ ক্যামেরার মত এটাতে লেন্সের ভেতর দিয়ে বস্তুর প্রতিচ্ছবি সোজাসুজি ফিল্মে গিয়ে পড়ে না। এটা প্রথমে একটা ইস্পাতের তৈরি চকচকে আয়নার ওপর গিয়ে পড়ে। এই ইস্পাতের আয়নাটি এক মিনিটে ১৫০,০০০ বার করে ঘুরছে। এই আয়না থেকে প্রতিচ্ছবি একটা ছোট লেন্সের ভেতর দিয়ে ফিল্মে পড়ছে।

*

প্ল্যাসটিক আজকাল সব কাজেই লাগছে। প্ল্যাসটিক থেকে আজকাল সৈন্য-দের থাকবার জন্য সুন্দর বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। প্ল্যাসটিকের কতকগুলি চাদর এমন ভাবে তৈরি করা হচ্ছে যে দরকারের সময় এগুলো দিয়ে আট ঘণ্টার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে একটি বাড়ি তৈরি করা যায়। চাদরগুলি খুবই হাল্কা হয়। এগুলো ½ ইঞ্চির মত পুরু। ঘরটায় প্রায় ২০ ফুটের মত জায়গা থাকে—দরকার হলে ১২জন লোক বেশ ভালভাবে এটার মধ্যে বাস করতে পারে। জলঝড় বৃষ্টি এর কোনই ক্ষতি করতে পারে না।

প্ল্যাসটিকের তৈরী বাড়ি

দাদন

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়
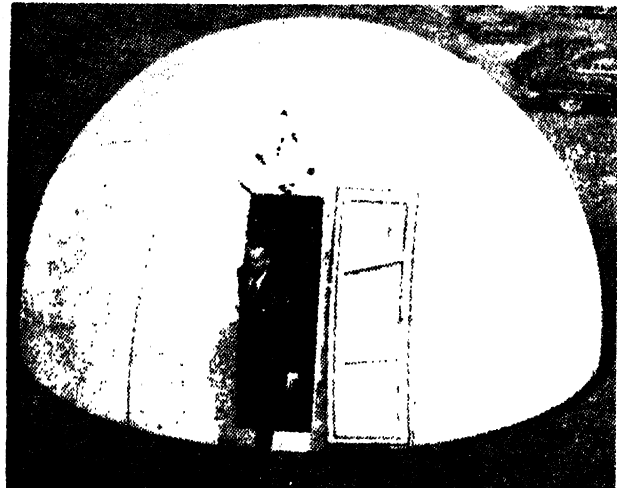
পূর্বপুরুষদের মধ্যে হয়তো কেউ হলদী-ঘাটে রাণা প্রতাপের পাশাপাশি লড়াই করে থাকবে; কিন্তু ছেদীলাল লড়াই করে না, ঝগড়াঝাটির ধার দিয়েও যায় না, উঠানে স্তূপাকার করে রাখা পাট বাছাই করে বসে বসে। ঠাওর করে করে আলাদা করে রাখে হাফ-বেল পাটের গাঁট। খুদে চোখ হলে কি হয় পাটের গোছার মধ্যে মেস্তা ভেজাল দিয়ে কেউ পার পেয়ে যাক তো। দু'হাত কোমরে রেখে ছেদীলাল তারস্বরে চেঁচাবে, 'জোচ্চুরীর আর জায়গা পাওনি। দামের বেলা করকরে নোটের গোছা ট্যাঁকে গুঁজে আর জিনিসের বেলায় ভূষি মাল। সদরে গিয়ে নালিশ ঠুকে দেবো এক নম্বর। ছেদীলাল যে সে লোক নয়। তা'হলে আর বিকানীর থেকে কাটিহারে এসে পাটের ব্যবসায় নামতাম না।'

বলে বটে কিন্তু ছেদীলাল বিকানীর থেকে কাটিহার আসেনি, তিন পুরুষ আগে এসে-ছিলো পূণামচাঁদ সুন্দরমল। বাজারের এক কোণে বসে নিমের দাঁতন বিক্রী করতো। শুরু অবশ্য দাঁতনে, শেষ কিন্তু বাজারেরই আর এক কোণে প্রকাণ্ড কাপড়ের কারবারে। পাগড়ী পাশে রেখে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে থাকতো সুন্দরমল, সামনে ছড়ানো থাকতো দাঁতন নয়, হরেক রকমের ছিট আর শাড়ীর বাহার।

সৌভাগ্যের সূচনাতেই জরুকে নিয়ে এলো, দেখা শোনা তদারক করতে ভাই ব্রাদারের দল এসে জুটলো। এখন কাপড়ের দোকান আর নেই, কিছুই নেই সুন্দরমলের, কেবল নামটা ছাড়া—তাও কাটিহারের লোকেদের মনে নয়, তামার পাতে নামটা খোদাই করা আছে চৌরাস্তার টেপাকলের গায়ে।

কাপড়ের কারবার গোটালো ছেদিলালের বাপ শিউপ্রসাদ। গোটাতে অবশ্য সে চায়নি, খুব ফলাও করে দেশবিদেশে ছড়াতে চেয়েছিলো বাপের ব্যবসা। পূর্ণিয়াতে ব্রাঞ্চ খুললো, আর একটা ছোট অফিস দিনহাটায়। তারপর পরামর্শদাতা জুটলো রায়েদের বাড়ির তিনকড়ি রায়। কলকাতায় একটা অফিস না খুললে মানায় কখনো, না কারবারীর ইজ্জৎ থাকে।

বড়বাজারে ঘর নেওয়া হলো। প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড লটকানো হলো দরজার মাথায়। সুন্দরমল কিন্তু বারণ করেছিলো। বয়সের সংগে সংগে পংগু হয়ে পড়েছিলো। কথা বলতে পারেনি কিন্তু হাত নেড়ে নিষেধ করেছিলো। উহুঁ, ও শহরে নয়। বড় পাপের জায়গা কলকাতা, জোয়ান মদ্দ ছোকরার পক্ষে এমন লোভের স্থান আর দুটি নেই। ওখানে কারবার খুলে দরকার নেই শিউপ্রসাদের।

শুনে তিনকড়ি রায় মুচকি হেসেছিলো, 'ওসব বুড়ো হাবড়াদের মতে চলতে গেলেই হয়েছে।' শহরই তো প্রাণ, কিম্বা মস্তিষ্ক বলাই বোধ হয় সমীচীন। সেখানে ব্যবসা জমজমাট করে তুলতে পারলে আর দেখতে হবে না। পায়ের ওপর পা তুলে তিন পুরুষ বসে খাওয়া যাবে।

ঠিক মত চললে হয়তো সাত্যিই চলে যেতো পায়ের ওপর পা তুলে কিন্তু তিনকড়ির পরামর্শে বেশীর ভাগ মুনাফা ঘোড়ার পায়ের ঠোক্করে ছিটকে পড়লো। উধাও হয়ে গেলো বেমালুম। ঘোড়ার পায়ের লোকসান বাঁচাতে গিয়ে শিউপ্রসাদ হুমড়ি খেয়ে পড়লা ফাটকা বাজারে। মুনাফা তো দূরের কথা কারবারের মূলধনে টান পড়লো। নগদ ফুরোতেই হুণ্ডির চল শুরু হলো। আগে ইজ্জৎ, তারপরে আর সব।

তিনকড়ি রায় এবার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লো, মোক্ষম পরামর্শ। পূর্ণিয়া আর দিনহাটার অফিসগুলো শোভা বই তো নয়, ও রেখে আর লাভ কি। বরং ও দুটো দোকান তুলে দিয়ে সেই টাকায় কলকাতার কারবারটাকে খাড়া করা হোক। বড় বড় কারবারীদের আনাগোনা এ দোকানে, রইস আদমীদের যাতায়াত—এ ঠাট বজায় রাখতে হবে বৈকি।

সময় বুঝে সুন্দরমল লীলাসাঙ্গ করলেন। রাশ টেনে ধরবার লোকটা শেষ নিশ্বাস নেওয়ার সংগেই শিউপ্রসাদ তালঠুকে মুখোমুখি দাঁড়ালো নিজের ভাগ্যের সংগে। এসপার নয় ওসপার। বুকির গোপনতম বার্তা, মালিক আর জকীর ষড়যন্ত্রের নিভৃত কাহিনী, তিনকড়ি রায়ের বহুকষ্টে জোগাড় করা সংবাদ। সমস্ত 'আপসেট' হয়ে যাবে, ময়দানের ইতিহাস তো বটেই, হয়তো শিউপ্রসাদের ঢালুপথে গড়িয়ে আসা দুর্ভাগ্যের গতিটাও। লোহার সেফের কোণে ছড়ানো অবশিষ্ট স্বর্ণরেণু কুড়িয়ে নলো শিউপ্রসাদ তারপর দুহাতে অঞ্জলিবদ্ধ করে শেষ সঞ্চয় ছুঁড়ে দিলো "ব্ল্যাক প্রেন্সের" পায়ের তলায়। সে কি উৎকণ্ঠা, ক অধীর আগ্রহ। মনে হলো মাথা ঘুরে শিউপ্রসাদ বুঝি মাঠের ওপরই পড়ে যাবে বেহুঁস হয়ে। আশ্চর্য, প্রত্যেকটি ঘোড়া তীরবেগে ব্ল্যাক প্রিন্সের পাশকাটিয়ে গেলো। একটু চেতনা নেই ওর, একটু গা গরমও নয়, দৌড়তে নয়, টার্ফক্লাবে বেড়াতে এসেছে এমনি একটা ভঙ্গী করে ব্ল্যাকপ্রিন্স দুলকী চালে কলের শেষে এসে হাঁফাতে লাগলো।

শেষ অবধি আর দেখেনি শিউপ্রসাদ। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলো। কিন্তু তাতেই ক আর রেহাই আছে রাশি রাশি হুণ্ডির তাড়া পাক খেয়ে ঘুরতে লাগলো চোখের সামনে আর পাওনাদারদের কঠিন শিরাবহুল হাতের ইশারা।

তিনকড়ি রায় সময় থাকতেই সরে পড়েছিলো, কাজেই নক্ষত্রগতিতে নিচে পড়বার সময় শিউপ্রসাদ আঁকড়ে ধরার মতনও কাউকে পেলো না হাতের কাছে।

অবশ্য আমাদের কাহিনী ছেদীলালকে নিয়ে। ছেদীলাল ঠাকুর্দার সম্পদের একটা কাণাকড়িও পায়নি বটে, কিন্তু তার ব্যবসায়ী বুদ্ধিটা উত্তরাধিকার সূত্রে কেমন করে করায়ত্ত করেছিলো

বেশ মনে আছে ছেদীলালের ওর মা ঝাঁপতোলা ছোট দোকানে ঘোমটা দিয়ে বসে ছাতু, লঙ্কা আর বড়া বিক্রী করতো। প্রকাণ্ড একটা টিনের ওপর ডালের বড়া সার সার সাজিয়ে রাখতো। সেই টিনটা বুঝি ওদের দোকানের সাইনবোর্ডেরই ভাঙা অংশ। কাজেই পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে ছেদীলাল কিছুই পায়নি, একথা সত্যি নয়

বিক্রী ভালোই। চালকলের সাইরেন বাজতেই দলে দলে ছেলে বুড়ো কাতার দিয়ে দাঁড়াতো দোকান ঘিরে। সেই সময় স্কুল ফেরৎ ছেদীলালের ডাক পড়তো। ইঁদারা থেকে জল তুলে ঘটি ভরতে হতো, হাত ধোবার আর পান করার জল।

শেষ দিকটা অবশ্য আশে পাশে আরো গোটা কয়েক দোকান খাড়া হয়ে উঠেছিলো। ভীড় কিছুটা ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছিলো। কিন্তু তা হলে কি হয়! মরবার আগে ছেদীলালের মা ওর হাতে টাকার যে তোড়াটা তুলে দিয়েছিলো, মাকে পুড়িয়ে এসে টাকাগুলো গুণতে গুণতে ছেদীলাল বার বার নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখেছিলো—খোয়াব দেখছে না তো।

টাকার তোড়াটা বেশ করে বেঁধে ছেদীলাল কোমরের গেঁজেয় আটকে নিলো। ব্যবসা নয় চাকরী। তিন পুরুষে কেউ করে নি, কিন্তু পিছন দিকে চাইতে আর রাজী নয় ছেদীলাল। পাথর কুঁদে মূর্তি গড়ার মতন, চেঁছে-ছুলে নিজের ভাগ্য নিজের মতন করে সে গড়বে।

খালের জল দেখা যায় না, পাট বোঝাই নৌকার সার, বাকীটা কচুরীপানায় ঠাসা। দশটা নৌকার মধ্যেই নটাই হরেরাম সাহার। বিরাট আড়ৎ পাটের। টিনের দেওয়াল আর টিনের চাল, জারুল কাঠের পোস্ট। ঘরে ঢুকলে দম যেন বন্ধ হয়ে যায়। সেই আড়তেই ছেদীলালের কাজ জুটে গেলো। হরেরাম সাহার মেজছেলে নবীনকিশোর নিজে ডেকে ছেদীলালকে টুলের ওপর বসিয়ে দিলো, 'পাটের হিসাব রাখবে। কত নম্বর নৌকায় কত গাঁট এসে পেঁাছোলো, লাল পেন্সিলের টোক্কর মেরে মেরে টোটাল দেবে বুঝলে?' বোঝার আগেই ছেদীলাল ঘাড় নাড়লো। এ আর এমন কি। দোকানে মার পাশে বসে কম হিসেব রাখতে হয়েছে তাকে। একটু এদিক ওদিক হলেই চট করে ছাতুর তাল সরে যেতো কাপড়ের তলায়, কিংবা মুঠো মুঠো বড়া লোপাট হয়ে যেতো।

শুধু পাটের গাঁটই নয়, পাটের রকমফেরও চিনলো ছেদীলাল। রেশমের মত চিকচিক করছে পাট, সোনাগোলা রং, হবে না মৈমনসিং নারানগঞ্জের চালানী পাট যে। যেমনি জেল্লা, তেমনি সুরৎ। এ পাট নেবার জন্য খদ্দেররা হাঁ করে থাকে। আবার থুথুরে বুড়ীর মাথায় শণের মত কটা পাটের গোছা। হাত দিয়ে ছুঁলেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে। নৌকায় আসতেই খড়ের বর্ণ হয়ে যায়—আসামের পাট,—গৌরীপুর আর তেজপুরের আমদানী।

বেশী নয় মাস ছয়েক। তারপর একদিন ছেদীলাল টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। হাঁ হাঁ করে উঠলো কর্মচারীর দল। মেজবাবু নাক থেকে চশমাটা কপালে তুলে বললো, 'কি হলো বাবা ছিদু ও টুলটায় ছারপোকা হয়ে থাকে, তুমি মাদুরের ওপর এসে বসো।'

হাত দিয়ে কোমরের গেঁজেটা একবার অনুভব করে ছেদীলাল এক পা এগিয়ে মনিবের কাছাকাছি দাঁড়ালো, 'চাকরী আর করবো না সা মশাই।'

মেজবাবু এবার রীতিমত ঘাবড়ালো। সে কি এই ছ মাসেই ছিদু ব্যবসা করার মূলধন জমিয়ে নিয়েছে নাকি! না, পাটতো এদিক ওদিক হয়নি, খদ্দেররাও হৈ হল্লা করে নি কিছু। তবে, বলা যায় না, তুখোড় ছেলে। কোন ফাঁকে হয়তো মৈমনসিং আর তেজপুর বেমালুম মিশিয়ে দিয়েছে, কিংবা বেল খুলে দু এক গাছা করে সরিয়েছে প্রতি গাঁট থেকে। এত হাজার মণ থেকে দু একগাছা সরালেও তো কম কথা নয়। বাহাদুর ছেলে বলতে হবে।

বাইরে কিন্তু মেজবাবু কিছু প্রকাশ করলো না। ভুরুটি কোঁচকানো পর্যন্ত নয়। কোঁচার খুঁট খুলে চশমার কাচদুটো মুছতে মুছতে বললো, বেশ তো ইচ্ছে না হ'লে, জোর ক'রে কেউ কি আর চাকরি

করাতে পারবে তোমাকে। হিসেব টিসেব-গুলো মিলিয়ে দিয়ে যাও হেমাঙ্গবাবুর কাছে দিন তিনেকের ব্যাপার। তারপর যেতে হয়, যেয়ো না হয়।

দিন তিনেক লাগলো না, দিন দুয়েকের মধ্যেই ছেদীলাল কড়ায় গণ্ডায় হিসেব মিলিয়ে দিলো। একটি গাঁট এদিক ওদিক নয়, এমন কি পাট ঢাকা তেরপলগুলোর পর্যন্ত সঠিক ঠিকানা বাতলে দিলো। তারপর সন্ধ্যের অন্ধকারে মেজবাবু বাড়ি ফেরার সময় তার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালো।

'কে ওখানে' দিনকাল বেশ খারাপ। নবীনকিশোর কাঁঠালগাছের আবছা অন্ধকার থেকে সরে এসে দাঁড়ালো।

'আজ্ঞে আমি, মেজকর্তা।'

'কে ছিদু কি খবর?'

'একটু নিবেদন ছিলো' ছেদীলাল বিনয়ে বৈষ্ণব হ'য়ে উঠলো। এই খানে ছেদীলাল ওর পূর্বপুরুষদের ওপর টেক্কা মেরেছে। চোস্ত বাঙলা বলে, পূর্ববঙ্গের ঢঙটি পর্যন্ত বেমালুম গায়েব করেছে। পাটের কারবারীদের সঙ্গে দহরম-মহরমের ফল হয়তো। কিন্তু ছেদীলালের চেহারাটও যেন বাঙালীঘেষা। মেটে মেটে তৈলাক্তভাব। হঠাৎ দেখলে আখড়া ফেরৎ মনে হয়। গুণ গুণ ক'রে বাঙলা গানের কলি ভাঁজে আবার।

নিবেদন করলো ছেদীলাল। মারাত্মক-রকম কিছু নয়। ব্যবসা সংক্রান্ত পরামর্শ। পাটের বাজারে বরাত ঠুকতে চায় একবার। 'কিন্তু এতো অনেক টাকার খেলা ছেদীলাল। ছ মাস চাকরী ক'রে আর কত টাকা জমিয়েছো তুমি? দেখছোতো শুধু আমার এই দু নম্বর গুদামেই দেড়লাখ টাকার মাল ঠাসা।'

'চাকরীর মাইনে তো পেটে খেতেই শেষ হ'য়ে গেছে মেজবাবু। সে টাকার আর কিছু নেই। আগের জমানো টাকা কিছু আছে ভাবছি তাই নিয়ে একবার বরাত ঠুকবো।'

আগের জমানো টাকা! নবীনকিশোর মনে মনে চট ক'রে একবার হিসেবটা করে নিলো। তা হলে শিউপ্রসাদ যে সর্বস্বান্ত হ'য়েছে সে কথাটা সত্যি নয়, দেনার দায়ে দেউলিয়া হওয়ার খবরও নিছক ধাপ্পা। তাইতো বলি, অমন কুবেরের ঐশ্বর্য এক পুরুষে ওড়ানো অমনি সহজ কথা। লোহার সেফটাই না হয় খালি হ'য়ে গেছে, কিন্তু আনাচে কানাচে, তাকে তক্তপোষের তলায় লুকিয়ে রাখার সংখ্যাটাও কম নাকি। বেশ তো থোক কিছু টাকা নিয়ে ওর সঙ্গেই নামুক না ছেদীলাল। ফরবেশগঞ্জের আড়তটা বেশ জমকালো ক'রে তোলা যাবে। ছোকরা চালাক চতুর আছে, ব্যবসার মাথা আর চোখ দুই-ই যেন আছে বলে মনে হচ্ছে।

কথাটা পাড়তেই ছেদীলাল দু'কানে আঙুল দিয়ে জিভ কামড়ে ফেল্লো, 'ছি, ছি, ছি, কি যে বলেন তার নেই ঠিক। আপনার মতন রাজালোকের পার্টনার। আমার সম্বল ব্যাঙের আধুলী, তাই নেড়ে চেড়ে দু' বেলা দু' মুঠো খাবার ইচ্ছে। অল্প টাকায় কিভাবে পাটের ব্যবসায় নামা যায় সেই বুদ্ধিটুকু শুধু 'বাতলে দিন।'

'যাক' নবীনকিশোর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সে সব কিছু নয়। অল্প মূল-ধনে কারবার ফাঁদতে চায়, তাও আবার পাটের কারবার।

ছেদীলাল আবার হাত দুটো কচলাতে শুরু করলো, মানে কিছু একটা বলবে তারই ভণিতা।

'কি?'

'আজ্ঞে একটা মতলব মাথায় এসেছে, আপনার সঙ্গে একটা যুক্তি করতে চাই। নবীনকিশোরের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ছেদীলাল মতলবের গিঁট খুলতে আরম্ভ করলো। ভাবছিলাম আজ্ঞে, এই যে সমস্ত পাট ডুবে যায় কিংবা পুড়ে অর্ধেক পুড়ে নষ্ট হ'য়ে যায়, সেগুলো অল্প দামে কিনে নিয়ে রোদ্দুরে শুকিয়ে, বেছে টেছে চলনসৈ ক'রে আবার গাঁট বেঁধে বাজারে ছাড়া যায় না? অবশ্য আনকোরা পাটের মতন কি আর দাম হবে তার, তবু একেবারে লোকসান হবে না বোধ হয় কি বলেন?'

নবীনকিশোরের বলার কিছু নেই। সে শুধু ভাবছিলো আবছা অন্ধকার এ দিকটা, চট ক'রে কেউ এসে পড়বে এ সম্ভাবনা কম, এই বেলা নিচু হ'য়ে ছেদীলালের পা থেকে এক খামচা ধুলো তুলে নিয়ে কপালে ঠেকালে কেমন হয়? ছেদীলাল বামুন কি না কে জানে, কিন্তু ব্যবসা সম্বন্ধে অমন টনটনে জ্ঞান যার, সে বামুনের বাবা। প্রণামে কোন দোষ নেই।

ছেদীলালের কারবারের পত্তন হ'লো। টিনের সাইনবোর্ড নয়, বার্নিশ করা কাঠের ওপর সাদা রং দিয়ে লেখা হ'লো "ছেদী-লাল এণ্ড সন্স।" মাথাই নেই তার আবার মাথা ব্যথা, সাদীই হ'লো না আবার "সন্স"-এর বহর। তা হোক, বেশ ভর্তি ভর্তি মনে হয় কাঠের বোর্ড। তা ছাড়া রাম না হ'তে রামায়ণের কাহিনীও তো হ'য়েছিলো লেখা।

পোড়া, আধপোড়া পাট কেনা ছাড়া আর একটা ব্যাপারেও ছেদীলালের ডাক পড়তে লাগলো। পাট চেনার ব্যাপারে। কর্তারা মোকামে পাঠাতে লাগলো তাকে, 'তুমি একবার যাও বাবা ছিদু। নতুন যোগাযোগ, কি দিতে কি দেবে, নৌকা বোঝাই ক'রে তুমি দাঁড়িয়ে থেকে দেখে দেবে একবার।'

ছেদীলাল মোটেই গররাজী নয়।' মন্দ কি। খাওয়া দাওয়াটা মিলবে, যাওয়া আসার রাহা খরচ, তার ওপর পাটের কারবারীর সঙ্গে চেনা পরিচয় হবে। এতো ভালো কথাই।

মাঝখানে বুঝি একটা শীত কাটলো। আর একটা শীত ঘুরে আসবার আগেই ছেদীলাল খালের ধার ঘেঁষে খড়ের ছাউনি তুলে ফেললো একটা। সাহাবাবুদের জমি, সুবিধা দরে পাওয়া গেল। উঠানে স্তূপাকার পাট—নানা রংয়ের পোড়া, আধপোড়া আর জলে ডোবা। গাঁট খুলে খুলে টান টান ক'রে মেলে দেওয়া হ'তো উঠানের ওপর। ছেদীলাল নিজে বেছে বেছে পোড়া পাঁশুটে রংয়ের পাটগুলো টেনে টেনে সরিয়ে রাখতো এক পাশে। খেয়াল রাখতো এক জাতের পাটের সঙ্গে আর এক জাতের পাট মিশে না যায়। তারপর কাজ শেষ হ'লে দাওয়ায় চেপে ব'সে চালের বাতা থেকে বিড়ি টেনে নিয়ে আগুন ধরিয়ে গুণ গুণ ক'রে সুর ভাঁজতো, হিন্দী গান নয়, রীতিমত বৈষ্ণব পদাবলী, 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।'

ছেদীলালের জীবনটা এইভাবে কেটে গেলে বলবার কিছু ছিলো না, ছেদীলালও ভেবেছিলো এইভাবেই কেটে যাবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় এক।

সকাল থেকে গুমোট করে রয়েছে। খালের ধারে পর্যন্ত বাতাসের ছিঁটে ফোঁটা নেই। কিন্তু ছেদীলালের বেশ খুশী খুশী ভাব। একটু আগে হেণ্ডারসন কোম্পানীর চর এসেছিলো। ভালো খবর। কোম্পানীর ইয়ার্ডে পোড়া পাট নামানো হ'য়েছে। নীলামে চড়বে দর। একটু আগে ভাগে

গিয়ে পৌঁছতে হবে। ওসব নীলামের কারসাজি খুব ভালো জানা আছে ছেদী-লালের। রাধারমণবাবু ইয়ার্ডের দেখাশোনা করেন। হাতে কিছু ছোঁয়ালেই হবে। ভীড় নয়, লোকজনের চেঁচামেচি নয়, ইয়ার্ডের পাট ছেদীলালের উঠানে এসে উঠবে। অথচ খাতায় পত্তরে দেখো, নীলামের হাঁকডাকের আওয়াজটা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

যাওয়ার তেমন কষ্ট নেই। টানা বাস হ'য়েছে আজকাল। খরচও কম পড়ে তবে গায়ের ব্যথা মরতে দিন দুয়েক লাগে এই যা। হঠাৎ ছেদীলালের চমক ভাঙলো। 'আরে ওকি, পথ দেখে চলো। বুকে ব'সে দাড়ি ওপড়াবে নাকি?' 'দাড়ি থাকলে তো ওপড়াবো'। মেয়েটি মিষ্টি করে হাসলো, 'যাই কোথা দিয়ে বলো, সারা উঠানে তো যত রাজ্যের জঞ্জাল ছড়িয়ে রেখেছো।'

'বাঃ' ছেদীলাল কোমরে দুটো হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, 'আমার উঠানে আমার নিজের জিনিস রাখবার এক্তিয়ার নেই বুঝি! এখান দিয়ে না গেলেই তো হয় বাছা, সরকারী রাস্তা তো আর নয় এটা।'

মেয়েটি প্রায় পাটের গোছার ওপর গিয়ে পড়েছিলো, কষ্টে সামলে নিয়ে ছেদীলালের দিকে ফিরে দাঁড়ালো, 'কি আমার কথা রে? ভিজে চুল আর ভিজে শাড়ী নিয়ে ওই অতটা রাস্তা ঘুরে যেতে দায় পড়েছে আমার। বলে চিরটা কাল ছেলেবেলা থেকে চান ক'রে এই বকুলতলা দিয়ে ফিরেছি, উনি অমনি দুদিন জমি কিনে রাস্তা বন্ধ করতে চান।' ভুরু তুলে দুটো চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে মেয়েটি উঠান পার হ'য়ে গেলো।

মেয়েটি চোখের আড়াল হতে ছেদীলালের হুঁশ হলো, আর একটু হলে বিঁড়ির আগুন আঙুলে এসে পোঁছাতো। পা দিয়ে বিঁড়িটা চেপে নিভিয়ে দিয়ে ছেদীলাল চালের বাতা থেকে গামছাটা টেনে মাথায় জড়ালো। চটপট চানটা সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।

মেয়েটি অচেনা নয়। হাড়ে হাড়ে চেনে ছেদীলাল। স্কুলমাস্টার অনুকূল বসাকের মা-মরা মেয়ে। সময়ে অসময়ে এসে হাত পাতে। লজ্জা সরমের বালাই নেই। তেল, নুন, নিদেন পক্ষে গাছের কলাপাতা যা হোক কিছু একটা। ওর মা বেঁচে থাকতে ছেদীলাল মাঝে মাঝে যেতো ওদের বাড়ি। সন্ধ্যের ঝোঁকে কাপড় চাপা দিয়ে ফুলুরী আর বড়া নিয়ে। পাছে অনুকূলবাবু দেখে ফেলেন তাই এই লুকোচুরি। তখন মেয়েটির কতই বা বয়স। কোনরকমে টলটল করে হেঁটে বেড়ায়। মাঝে মাঝে হামাগুড়ি টানে। তখন কি আর স্বপ্নেও ভাবতে পেরে-ছিলো যে, বয়সকালে সেই মেয়ে ছেদী-লালকে হামাগুড়ি টানাবে।

কারবার বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছেদী-লাল জন দুয়েক লোক রাখলো। কাজে কর্মে তাকে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। উঠানে জমানো পাটের হিসেব নিকেশ করার লোক দরকার।

অন্য সময়টা তেমন অসুবিধে নেই, মুশকিল কেবল এই বর্ষাকালটা। ঘর বাড়িয়ে পিছন দিকে পাটের গোছা টেনে টেনে তুলে রাখতে হয়। কিন্তু ওই ছোট ঘরে কি আর সব পাট আঁটে। উঠানে জড়ো করা পাট-গুলোর ওপর তেরপল চাপাতে হয়, কিন্তু অত তেরপল জোগাড়ই বা হয় কোথা থেকে।

আকাশের অবস্থা দেখেই ছেদীলাল বেরিয়ে পড়েছিলো। হরেরাম সাহার গদীতে আলাপ করে যদি কিছু তেরপলের বন্দো-বস্ত করা যায়। মেজবাবুকে ধরাধরি করে জোগাড়যন্ত্র করতেই হবে নইলে পাট ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে যাবে, খদ্দের পা দিয়েও ছোঁবে না সে জিনিস।

গদী অবধি আর পোঁছোতে হলো না, মাঝ রাস্তাতেই কালবোশেখীর ঝড় উঠলো। ধুলোর ঘূর্ণিতে চারদিক কানা। ছাতাটা খুলতেই শিক থেকে কাপড়টা খুলে গিয়ে টাউনহলের মাথায় টাঙানো নিশানের মতন উড়তে লাগলো। অদ্ভুত যোগাযোগ। ছেদীলাল যখন প্রাণপণে বাঁশ ধরে ছাতাটাকে আয়ত্বে আনার চেষ্টা করছে, ঠিক তেমনি সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো এগোবে না পেছোবে ভাবনার মুখেই ছেদী-লালের কানে গেলো অদ্ভুত মিষ্টি এক আওয়াজ, চওড়া শালপাতার ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার চেয়েও মিষ্টি।

'ছেদীদা, ও ছেদীদা।' সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল হাসি।

ছাতি সামলে নজর ফেরালো ছেদীলাল। অনুকূল মাস্টারের বাড়ির সামনে এসে পড়েছে। গামছা পাট করে মাথায় দিয়ে বারুণী, মানে অনুকূল বসাকের মেয়ে, প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

বরুণদেবের প্রকোপের চেয়ে বারুণী ঢের সহনীয়। ছাতিটা কিছুটা মুড়ে ছেদীলাল বারুণীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

অনুকূল মাস্টারও জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন, 'আরে এসো ছেদীলাল এসো। আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভিজছো, অথচ ভেতরে আসতে পারো না। কি যে হয়েছো তোমরা আজকাল।'

ছাতিটা দেয়ালে ঠেশ দিয়ে রেখে ছেদীলাল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ওই একটিই ঘর। মাঝখানে ছোট টিন দিয়ে ভাগ করা ওদিকে রান্নাঘর আর এদিকে বাকি সব কিছু।

'তোমার ব্যবসা কেমন চলছে বলো' অনুকূল মাস্টার চৌকির ওপর টান হ'য়ে বসলেন।

'আজ্ঞে আপনাদের আশীর্বাদে ভালোই চলছে' ছেদীলাল কোঁচার খুঁট নিংড়ে মাথাটা মুছে ফেললো।

অনুকূলবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'তোমার ভালো হবে আমি জানি। স্কুলে পড়বার সময়ই লোককে বলেছি এ কথা।'

ছেদীলাল অনুকূল মাস্টারের দিকে আড়-চোখে চেয়েই মাথা নামিয়ে ফেললো। স্কুলে থাকতে ওর সম্বন্ধে মাস্টারমশায় ঠিক যা বলেছিলেন, সেটা বলতে গেলে এ বৃষ্টিতে আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এ ঘরে আর ঠাঁই হবে না। কাজেই ছেদীলাল পাঁচন গেলার মতন অনুকূল মাস্টারের কথাগুলোও বেমালুম গিলে ফেললো। সামান্য ঢেঁকুর পর্যন্ত তুললো না।

'আর বাবা, মাস্টারীতে সুখ নেই। তোমাদের কালে একরকম ব্যাপার ছিলো। সবাই মানতো শুনতো। এখন কথায় কথায় ছেলেরা মারমুখী হয়ে ওঠে।' অনুকূল মাস্টার নিঃশ্বাস ফেললেন, 'কোনরকমে মেয়েটার একটা গতি করতে পারলেই, সব ছেড়েছুড়ে দেবো। দরকার হয় তো তোমার ওখানেই খাতা লেখার কাজ করবো'খন, কি বলো হে?'

ছেদীলাল চট করে কিছু উত্তর দিতে পারলো না। মেয়েটার গতি করার ব্যাপারে একটু অন্যমনস্ক ছিলো। ও মেয়ের যে গতি করতে যাবে তার দুর্গতির কথা স্মরণ করে একটু যেন বিমর্ষই হয়ে পড়লো।

খেয়াল হলো আচমকা ঠক করে একটা শব্দ হতে। হাতল ভাঙ্গা কাপে বারুণী চা নিয়ে রাখলো সামনে। বাপকে দিলো কাঁচের গ্লাসে।

'কিন্তু' ছেদীলাল আমতা আমতা করলো 'চা তো খাই না আমি।'

'আমরাই কি আর খাই' বারুণীর গলা খন খন করে উঠলো, 'বাদলার দিনে আদা দেওয়া শরীরের পক্ষে উপকারী।' কথার শেষে আর দাঁড়ালো না বারুণী, টিনের আড়ালে চলে গেলো।

এদিক সেদিক কথাবার্তা, দেশকালের অবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্যের হালচাল। অনুকূল মাস্টারই বলে গেলেন, অবহিত হয়ে শোনার চেষ্টা করলো ছেদীলাল। কিন্তু এসব ভালো ভালো কথায় কি আর মন বসে। কেবলি ঘুরে ফিরে মন চলে যায় ভিজে পাটের কাছ বরাবর। তুমুল বৃষ্টি। সব ভিজে একেবারে একশা হয়ে গেছে। ও পাট শুকিয়ে গাঁট বাঁধতে ডবল খরচ পড়ে যাবে। দামে পোষাতে পারা দুষ্কর।

'ছেদীদা পেয়ালাটা দাও' আবার বারুণীর গলার আওয়াজ। অন্ধকার নেমেছে, অথচ বাতি জ্বালানো হয়নি এখনও। হাতড়ে হাতড়ে পেয়ালাটা নিয়ে বারুণীর হাতে তুলে দিতে গিয়েই ছেদীলাল যেন 'শক' খেলো। তুলতুলে নরম, আবছা অন্ধকারে সোনালী রংয়ের জেল্লাও নজর এড়ালো না। পাকা জহুরী ছেদীলাল। মৈমনসিংয়ের পাট। এ আর দেখতে হবে না। তেমনি রেশমের মতন নরম আর কাঁচা সোনার বর্ণ।

অনুকূল মাস্টারের বিপদও ওর চেয়ে কম নয়। ঠিক মত তেরপল ঢাকা দিতে না পারলে কালবোশেখীর তোড়ে এ জিনিসও বাঁচানো মুশকিল।

বাইরে যা দমকা হাওয়া, ছেদীলালের দীর্ঘনিঃশ্বাসটাও বেমালুম হাওয়ায় হারিয়ে গেলো।

একটা বেশ ভাল দাঁও। বড়লোকের ছেলে নতুন বাধ হয় নেমেছে এ লাইনে। আশ্চর্য, আর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শেষকালে পাটের ব্যবসা! ছেদীলালের সাহায্য চায়। বিশেষ কিছু নয়, শুধু সংগে থাকবে। পাট বাছাই করবে, তেমন তেমন হলে দর যাচাই।

ছেদীলাল রাজী। কিছু টাকার প্রয়োজন। গোটা দুই তিন তেরপল আর একটা টিনের চালা। এ হলেই এ বছরটা চলে যাবে। কাজেই এ রকম দু একটা যোগাযোগ দরকার বৈ কি। অসুবিধা কিছু নেই। নিজের মোটর। বাঁধা শড়ক। যেতে আসতে জোর ঘণ্টা চারেক। খাওয়া দাওয়ার এলাহি বন্দোবস্ত।

কিন্তু অসুবিধা হলো। বেশ অসুবিধা। ব্যাপারটা চোখে পড়তেই ছেদীলালের বুকটা টনটন করে উঠলো। অস্পষ্ট কিছু নয়। দুপুরের কড়া রোদ। রেলের পুলটা ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে ঝাঁকড়া বটগাছটার তলায়। ছেলেটা অচেনা নয়। পেট্রোলের দোকানে খাতা লেখে। যেতে আসতে তাকে ছেদীলাল অনেকবার দেখেছে। আর মেয়েটাকে সেদিন আবছা অন্ধকারেই চিনতে ভুল হয়নি আর আজ তো খটখটে দুপুর।

সুবিধা করতে পারলো না ছেদীলাল। আড়তদারের সংগে বেফাঁস দু একটা কথা বলে ফেললো। সারা গুদাম ঘুরে ঘুরে মনের মতন পাটের খোঁজ মিললো না। উল্টো পাল্টা দরও বলে বসলো দু এক জায়গায়।

সরেস পাট মৈমনসিংয়ের। রামামুতগঞ্জের সেরা জিনিস। কিন্তু ছেদীলাল ঠোঁট ওল্টালো। না, গোলমাল আছে। ঠিক আসল জিনিস বলে মনে হচ্ছে না। ভালো করে খুঁটিয়ে দশ জায়গা না দেখে পাকা কথা দেওয়া যাবে না। ভেজালের যুগ। আসল নকল চেনা মুশকিল।

অনেক রাত পর্যন্ত দাওয়ায় ছেদীলাল ছটফট করলো। গরমে ঘরে টেঁকা দায়। পাটের গরম আর মনের গরম মিশিয়ে স্থির হয়ে দুদণ্ড বসতে দেবে না। মনের এদিকটার যেন খোঁজই পাইনি এতদিন। দাওয়ার এক কোণে টিন দিয়ে আড়াল করে তোলা-উনুনের সামনে কপালের কাছ বরাবর ঘোমটা টেনে অনায়াসে তো বসতে পারে একজন। চান করতে যাবার সময় তেলের শিশিটা কিংবা গামছাটা এগিয়ে দেবার জন্য নিটোল কোন একটা হাত। ভাতের থালার সামনে পাখা নাড়ার সংগে সংগে চুড়ির ঝুনঝুন আওয়াজ। সবই তো হয়। ঘরে বৌ আনা আর এমন কি শক্ত কথা। ছেদী-লালের হাতে মেয়ে দিতে পারলে অনেক মেয়ের বাপই ভাগ্যবান মনে করবে নিজেকে। কিন্তু বারুণীর পাশাপাশি আর কাউকে দাঁড় করাতে যেন মন চায় না। অনুকূল-মাস্টার কি আর অবাঙ্গালীর হাতে মেয়ে দেবে? আর মেয়েই বা রাজী হবে কেন? পেট্রোলের দোকানের খাতালেখা ছোকরাটা আবার রয়েছে মাঝখানে।

না, হাই তুলে ছেদীলাল উঠে পড়লো। বালিশের তলা থেকে নিমের দাঁতন বের করে খালের পাড়ে গিয়ে বসলো।

সবে মুখটা ধোবার জন্য নেমেছে খালের জলে এমন সময় পিছনে খুট করে আওয়াজ হতে ফিরে ছেদীলাল একেবারে অবাক হয়ে গেলো। একি মেঘ না চাইতেই জল। এত ভোরে বারুণী বিছানা ছেড়ে উঠেছে যে।

'তোমার কাছেই এসেছিলাম ছেদীদা' বারুণী চুলের কুচিগুলো হাত দিয়ে কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিলো।

কি ব্যাপার চাল বাড়ন্ত বুঝি, না কি এমাসেও মাইনে পায়নি অনুকূল মাস্টার।

কিন্তু আর নয়। ছেদীলালের চোখের সামনে ঝাঁকড়া বটগাছটা ভেসে উঠলো। হিজিবিজি ছায়ার আঁচড়। দুটো মানুষের ঘন হয়ে বসার সুস্পষ্ট ছবি।

'পয়সাকড়ি কিছু হবে না' ছেদীলাল কচুরীপানা সরিয়ে জল মুখে দেবার চেষ্টা করলো।

'বেশী নয় গোটা দুয়েক টাকা, এ মাস গেলেই শোধ দিয়ে দেবো' বারুণীর গলার আওয়াজ বেশ নিস্তেজ।

এবার ছেদীলাল ঘুরে বসলো। দাঁতনটা ছুঁড়ে না ফেলে দিলে তেরচাভাবে হয়তো গলায় গিয়েই আটকাতো।

নতুন কথা যে বলছে বারুণী। শুধু হাত পেতে নেওয়ার কথা নয়, শোধ দেবার কথাও।

পাটের দর যাচাই করার সময় যেমন শুকনো গলায় কথা বলে ছেদীলাল তেমনি খটখটে গলায় বললো, 'শোধ দিয়ে দেবে? কোথা থেকে পাবে সেটা শুনি?'

'সে যেখান থেকেই পাই, শোধ দিলেই তো হলো।'

আর অস্পষ্ট নয়। ছায়াঘন বটগাছতলার ছবিটা বারুণীর চোখের তারায় ফুটে উঠেছে ছেদীলালের দেখতে একটু ভুল হয়নি।

গামছাটা কোমড়ে বেঁধে ছেদীলাল টান হয়ে দাঁড়ালো 'পেট্রোলের দোকানের ছোকরাটা আশ্বাস দিয়েছে বুঝি? ভালো, ভালো। এবার তোমার গতি হবে একটা।'

বারুণীর ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠেই থেমে গেলো। কোন কথা বেরোলো না। জলে ডোবা আসামের পাটের মতন ফ্যাকাসে হয়ে গেলো মুখের রং। দু হাতে আঁচলটা বুকে চেপে ধরে বারুণী পিছু হেঁটে উঠান পার হয়ে গেলো। ছেদীলালের দিকে মুখ তুলে চাইলেও না একবার।

কম দামী পাট নতুন খদ্দেরের কাছে চড়া দামে গছাতে পারলে যেমন আনন্দ হয়, প্রথম প্রথম ছেদীলালের মনের সেইরকম অবস্থা হলো। কিন্তু কতটুকুর জন্যই বা। নতুন করে আর দাঁতন যোগাড় করে দাঁত মাজবার উৎসাহই রইলো না।

গলার স্বরটা এতটা না চড়ালেই ভালো হতো। নিজের মনের সমস্ত বিষ কথার খাঁজে খাঁজে না ঢাললেই হতো। অন্যায়টা আর কি। সোমত্ত বয়েস। মনের মতন ছোকরা জুটিয়ে নেবে এতো জানা কথা। ছেদীলালের অত গরজ কিসের।

কিন্তু কিছুতেই না। সারাটা দিন বুকের মধ্যে যেন একটা কাঁটা বিঁধে রইলো। নড়তে চড়তে গেলেই খচ করে উঠে। এক একবার মনে করলো দুটো টাকার মামলা বৈতো নয়। এক সময়ে গিয়ে বারুণীর হাতে দিয়ে আসবে। কিন্তু শোধ দেবার কথা কেন বললো বারুণী। সব কিছু কি যায় শোধ দেওয়া—এ সহজ সত্যটা বুঝলো না অনুকূল মাস্টারের মেয়ে।

বলা যায় না, কাজকর্ম সেরে বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে ছেদীলাল হয়তো বারুণীকে টাকা কটা দিয়েই আসতো, কত টাকা তো খরচ হচ্ছে কতদিকে। ইয়ার্ডের বাবু থেকে শুরু করে মাঝিমাল্লারা সবাই হাত পেতেই তো রয়েছে। কিন্তু দুপুরের দিকে সব ভেস্তে গেলো। একখানা করে খবরের কাগজ রাখে ছেদীলাল। খুব যে পড়ে এমন নয়, ও রাখার একটা রেওয়াজ। আড়তদারের কাছে নাকি ইজ্জৎ থাকে। 'ওঃ! কি অবস্থা হচ্ছে দেশের' কিংবা 'মানুষের দুঃখের আর অবধি নেই' এইরকম হেডলাইন মার্কা দু একটা খবর দিয়ে আরম্ভ করে গদীতে বসে পাটের দরদস্তুর আলোচনা করা যায়।

কিন্তু খবরের কাগজই কাল হলো। খুলেই ছেদীলাল ধড়মড় করে উঠে পড়লো। মানকাছাড়ে পাটের গুদাম ভস্মীভূত। আনুমানিক ক্ষতি দশ লক্ষ। কাগজওয়ালারা অবশ্য ঠিক অমনি করেই লেখে। তিলকে তাল করে আর তালকে তরমুজ। ছেদী-লালের ওসব ফিকির জানা আছে। ভস্মেই সব কিছুর শেষ নয়। ছেলেবেলায় পড়া কবিতাটা বেশ মনে আছে এখনও। 'যখনি দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো ভাই—'। ঠিক সময়ে পৌঁছে ছাই নাড়াচাড়া দিলে ঠিক পাটের গাঁট বেরিয়ে আসবে—একটু হয়তো লালচে কিংবা তার ওপর আগুনের ছোঁয়া লেগেছে। একবার ওর উঠানে এনে ফেলতে পারলে আর ভাবনা নেই। আগুনে কারুর কপাল পোড়ায় আবার সোনা গলায় কারুর। অতএব মা ভৈঃ।

ছেদীলাল উঠে পড়লো। একটু ঘুর-রাস্তা। গাড়ী বদলানোর হাঙ্গামা আছে। তা হোক ভাগ্য বদলানোর ব্যাপারও তো হতে পারে।

কিন্তু পৌঁছে ছেদীলাল একটু মুশকিলে পড়ে গেলো। ওর আগেই বড় বড় মক্কেল এসে জুটে গেছে। টানা মোটরে কেউ এসেছে, কেউ একেবারে আকাশ পথে। কোমরে বাঁধা গেঁজে থেকে টাকা বের করে না, কথায় কথায় চেক কাটে। কলম হাতেই রয়েছে, পকেটে আর ঢোকায় না। অবশ্য বুঝে মালিকরাও টালবাহানা শুরু করলো।
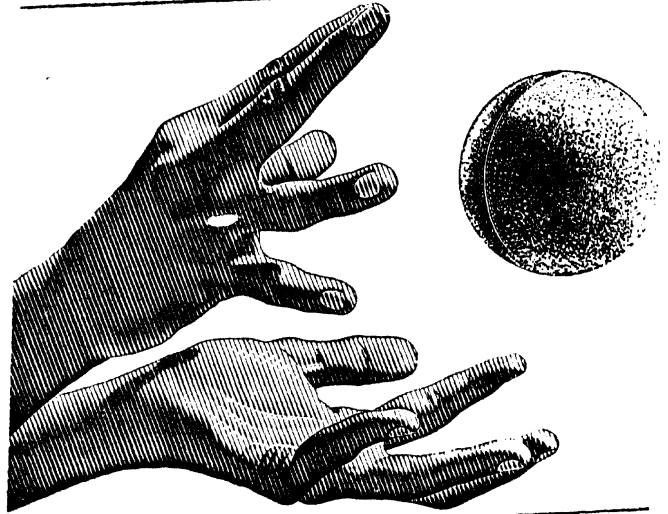
ফ্যাক্ড়া তুললো হাজার রকম। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর দোহাই পাড়লো। ওজর রটালো পোড়া পাট না কি প্লেনে কলকাতা যাবে। দু-দশ দিনের ব্যাপার নয়, দু-দশ টাকারও নয়, বেশ বুঝতে পারলো ছেদীলাল। পাক্কা খেলোয়াড় জুটেছে দু দিকেই। জালের দাঁড় যেমন শক্ত, মাছও তেমনি রাঘব বোয়াল। দেখতে হবে শেষ অবধি।

দু দিনের জন্য এসে ছেদীলালের দিন কুড়ির ওপর লেগে গেলো। যাক্, সব ভালো যার শেষ ভালো। যা ভেবেছিলো তা নয়, তবে কিছুটা পাট ছেদীলালের উঠানে এসে পৌঁছলো। পাট কম হোক, ইজ্জৎ বড়ো কম নয়। কলকাতার বড়ো বড়ো আড়তদারের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ানো সহজ কথা।

ছেদীলালের মনটা বেশ খুশী খুশীই ছিলো। স্টেশন থেকে ফেরার পথে তাই একবার বাজার ছুঁয়ে আসবার চেষ্টা করলো।

ত্রিলোচন নন্দীর দোকানের সামনে ছোটখাটো একটা জনতা। বয়াটে ছেলের সংখ্যাই বেশী, বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানোর দল। কিন্তু যা দিনকাল, পিঠ চাপড়ে তাদেরও হাতে রাখতে হয় বৈকি।

ছেদীলালকে দেখে ভীড়ের মধ্য থেকেই কে একজন বলে উঠলো, 'ছেদীদা, এই ফিরছেন না কি?'

'হ্যাঁ ভাই' ছেদীলালের দাঁড়িয়ে কথা বলার মতন অবস্থা নয়—কি দেহের, কি মনের।

কিন্তু পাশ কাটিয়ে যাবার যো আছে।

নফর কুণ্ডুর সেজ ছেলে বলাই এগিয়ে এলো, 'এদিকের খবর শুনেছো?'

খবর? পাটের দর বাড়ার খবর সে তো আগেই পেয়েছে, আর এ সব খবরে বলাইয়ের কোন উৎসাহ নেই। তার চেয়ে বরং শহরের সিনেমা হলের খোঁজ সে ভালো করেই রাখে। নতুন হল হচ্ছে বুঝি কোথাও।

'আরে না না,' বলাই ভুরুদুটো অদ্ভুত কায়দায় নাচাতে লাগলো, 'সে সব কিছু নয়। অনুকূল মাস্টারের মেয়ে হাওয়া।' হাতের দুটো আঙুলের সাহায্যে বলাই চটাস্ করে একটা শব্দ করলো।

পলকের জন্য একটু বিচলিত হয়েই ছেদীলাল নিজেকে সামলে নিলো। এদের সামনে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতে হবে। এমনিতেই বারুণীর ওর বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত নিয়ে দু একটা রসিকতার টুকরো এরা ছুঁড়ে দিয়েছিলো পথে ঘাটে। ছেদীলাল গায়ে মাখেনি। তারপরে অবশ্য ছেদীলালের কারবার ফলাও হয়ে উঠতে সব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলো। ওর গুদামে খাতা লেখার কাজটার আশা রাখে বৈকি ওরা।

বলাই অল্পে ছাড়বার পাত্র নয়। এঁটেল মাটির ধাত। একবার গায়ে গিয়ে পড়লে টেনে তোলা দায়।

'একলা যায়নি, জোড়ে গিয়েছে। রমেন বোস সঙ্গে আছেন।'

'রমেন বোস।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে শেঠী কোম্পানীর পেট্রোলের দোকানে কাজ করতো। পাতলা চেহারা, প্রজাপতি প্যাটার্নের গোঁফ। গড়ন পাতলা হলে হবে কি, বুক আছে চওড়া, নয়তো ওই মেয়েকে বাগানো সোজা কথা।'

ছেদীলাল আর দাঁড়ালো না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। তা ছাড়া অন্য পাট সরিয়ে, উঠানে নতুন পাটের জায়গা করতে হবে। বাছাই, ঝাড়াই, গাঁট বাঁধা—অল্প জায়গাতে কুলোয় কখনও।

অনুকূল মাস্টারের বাড়ীর সামনে ছেদীলাল একটু থামলো। অন্য কোন কারণে নয় অনুকূল বুঝি বেরোচ্ছে বাড়ী থেকে, মুখোমুখি দেখাটা না হ'য়ে যায়।

পাটের মরশুম শেষ। ছেদীলালের উঠান ঝকঝক তকতক করছে। একটি ঘাসের চাবড়াও নেই। বাকী মাস কটা অন্য একটা ব্যবসা আরম্ভ করলে হয়। সুপুরী কিংবা তেলের। কিন্তু খাটতে যেন আর ইচ্ছা করে না। কি হবে এত সব করে। মানুষ তো একলা।

খালের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে—অনুকূল মাস্টারের মেয়ে। ঠিক ওই কচুরীপানার মতনই হয়তো ভেসে ভেসে চলেছে।

অনুকূল মাস্টারের সঙ্গে পথে একবার দেখা হয়েছিলো। ক' মাসে যেন ক'টা বছর তার বেড়ে গেছে। তামাটে হয়ে গেছে গায়ের রং, কোঁচকানো মাংসের তলায় নিষ্প্রভ দু'টি চোখ।

'এর চেয়ে ও খালের জলে ডুবে মলো না কেন ছেদী, পরের দিন ফুলে ভেসে উঠতো, সবাই জানতো ও মরেছে। দু'হাতে কালি নিয়ে এমনভাবে আমার মুখে কেন মাখিয়ে গেলো।'

ছেদীলাল উত্তর দেয় নি। ছল ছুতো ক'রে সরে এসেছে। কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছিলো সেটাও যে অক্টোপাশের মতন বাহু বিস্তার ক'রে দিনে রাতে এমনভাবে চেপে ধ'রবে ওকে, সেটা ভাবতেই পারে নি।

সারা কাটিহারই ছেদীলালের কাছে যেন বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো। তেলের ব্যবসার ব্যাপারে দু' একটা মহাজনের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চলছিলো, ছেদীলাল হঠাৎ মত বদলে ফেললো। না, লাভ নেই বিশেষ তেলের কারবারে। মাঝ রাস্তাতেই টিন ফুটো ক'রে অর্ধেক মাল বেহাত হ'য়ে যায়। দরকার নেই ও ঝঞ্ঝাটে। সুপুরীর ব্যাপারেও হাঙ্গামা কম নয়। বরিশাল থেকে নৌকা আনা সোজা কথা নাকি। রাস্তায় ঠেকতে ঠেকতে যখন এসে পৌঁছোয়, তখন পাটাতনের তক্তাটাই থাকে, সুপুরী আর থাকে না।

অন্য কিছু একটা করতে হবে। চটপট লাভের মোটা অঙ্ক ঘরে আসে এমন একটা কিছু। কিন্তু ভেবে ছেদীলাল কুলকিনারা পেলো না। হঠাৎ খেয়াল হ'লো নবীনকিশোর সাহার সঙ্গে পরামর্শ করলে হয় না একবার। খানদানী কারবারী। হদিস একটা বাতলে দিতে পারে। লাভের কড়ি যাতে দুনো হ'য়ে ফিরে আসে ঘরে।

এবারেও ছেদীলাল অনুকূল মাস্টারের বাড়ি পার হ'তে পারলো না। চাপ চাপ লোক আনাচে কানাচে দাঁড়িয়েছে জোট বেঁধে। ঠিক বাড়ির সামনেটা নয়, একটু দূরে দূরে। নজর কিন্তু বাড়ির ওপর।

ছেদীলাল একটু পা চালিয়ে এলো। মেয়ের শোকে অনুকূল মাস্টার পরনের কাপড় গলায় বেঁধে আড়কাঠে ঝুলে পড়লো নাকি, না, উপোস ক'রে বুড়ো ভিমড়িই গেলো।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে যাবার মুখে কি মনে হ'লো ছেদীলালের, সামনে দাঁড়ানো লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হয়েছে, ভীড় কিসের এত?'

লোকটি ছেদীলালকে চেনে। সেলাম ক'রে বেমালুম ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলো। উত্তর দিলো তার পাশের লোকটি।

মিনিট দু'য়েক ছেদীলাল মাথা নিচু ক'রে দাঁড়া'লো। তুফানের মুখে পাটবোঝাই নৌকা যেমন দুলে দুলে ওঠে, তেমনি বারদুয়েক তার সমস্ত শরীরটা দুলে উঠলো। নিজেকে সামলে নিয়ে ছেদীলাল ফিরে এলো। নতুন কোন কারবারের পরামর্শের আর দরকার নেই, পুরোনো ব্যবসা চালাতেই ছেদীলাল হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। একলা মানুষ কতদিক

দেখবে। পাটই ওর লক্ষ্মী, এই আঁকড়েই থাকবে সারাজীবন।

বাড়ির কাছ বরাবর এসে ছেদীলাল বিড় বিড় ক'রে নিজের মনে মনে বললো, 'অনুকূল মাস্টারের মেয়ে ফিরে এসেছে। বারুণী ফিরে এসেছে।'

কাজকর্ম আর হিসেব পত্তর দেখার ফাঁকে ফাঁকে কেবলি মনে পড়তে লাগলো কথাটা। বাতাসে কান্নার সুর। খালের জল থেকে উঠে ভিজে পায়ে ওর উঠান মাড়িয়ে যেতো বারুণী। পরিষ্কার উঠানে জলের পায়ের দাগ—লক্ষ্মীর পায়ের আল্পনার মতনই।

গরুর গাড়ি বোঝাই জলে ডোবা পাটের রাশ এসে পেঁ'ছোলো। পাটের মরশুম কবে শেষ হ'য়ে গিয়েছে। কার বুঝি গুদাম-কুড়োনো পড়েছিল লাভের আশায়। চালান দিতে গিয়ে চড়ায় লেগে নৌকা বানচাল হ'য়েছে। মাঝির কারসাজি কিনা কে জানে। আশ্চর্য, ছেদীলাল জানেও না কিছু। জল থেকে পাট তুলে ঠিক ওর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। হেন্ডারসন কোম্পানীর রাধারমণবাবুরই কাজ হয়তো।

ব'সে ব'সে পাটের গাঁইটগুলোর ওপর ছেদীলাল অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলালো। প্রত্যেকটি গাঁট খুলে মেলে দিতে হবে উঠানের ওপর। শুকোতে দেরী হবে না। আবার ঠিকমত প্রেস ক'রে গাঁট বাঁধতে পারলে বোঝবার উপায় থাকবে না। টেক্কা দেবে আনকোরা পাটের সঙ্গে।

একেবারে নতুন পাট। বিড় বিড় করে কথাটা বলেই কি মনে হলো ছেদীলালের। উঠে পাশের আলনা থেকে জামাটা পেড়ে নিলো তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

সচরাচর ছেদীলাল এমনভাবে সাজে না। সাজপোষাকে যেন বাপ শিউপ্রসাদের ছাপ। পাট করা সিঁথি। ধোপদোরস্ত জামা কাপড়, পায়ে শুঁড় তোলা জুতো।

জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে ব্যাপারটা ছেদীলাল দেখে নিলো। কেরোসিনের কুপীর ম্লান আলো। দু' হাঁটুতে মুখ গুঁজে বারুণী ব'সে আছে। 'একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে। জানলার দিকে ব'সে অনুকূল মাস্টার। সেই চৌকির ওপরে।

'এ বাড়িতে ঠাঁই হবে না স্পষ্ট কথা। যে চুলোয় মরতে গিয়েছিলে সে চুলোয় যাও। কেন নাগর রাখতে পারলে না সঙ্গে করে। শখ মিটতেই ফেলে পালালো।'

ছেদীলালের ছায়া চৌকাঠে পড়তেই বাপ আর মেয়ে দুজনেই মুখ তুলে দেখলো।

'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিলো মাস্টারমশাই' ছেদীলালের এত গম্ভীর গলা কাটিহারে কেউ শোনে নি।

'কথা' অনুকূল মাস্টার দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন। কথাটা কি তা তিনি ভালোই জানতেন। এর আগেও বলে গেছে দুজন। ও মেয়ে এ বাড়িতে রাখা চলবে না। সমাজে পতিত হবে অনুকূল বসাক, এইতো কথা।

ঘাড় নিচু ক'রে অনুকূল মাস্টার ছেদীলালের কথাগুলো শুনলো, তারপর দুহাতে তার একটা হাত জাপটে ধরলো।

'তুমি মানুষ নও ছেদীলাল, দেবতা।'

ঘরের মধ্যে ঢুকলো দুজনে।

অনুকূল মাস্টার চৌকি ছেড়ে দিলেন ছেদীলালকে। কোঁচার খুট দিয়ে নিজের চোখ দুটো মুছতে মুছতে বললেন, 'আমার এমন সৌভাগ্য হবে, আমি তা ভাবতেও পারি নি। সেই এগিয়ে এলে বাবা, আরো আগে যদি আসতে—এরকম একটা ব্যাপারের আগে।'

ছেদীলাল হাসলো। আড়চোখে চাইলো বারুণীর মুখের দিকে। এক দৃষ্টে মেয়েটা চেয়ে আছে। তারপর আবার একটু হেসে বললো, 'আনকোরা জিনিস ছোঁবার সামর্থ্য কই আমার। পোড়া অর্ধ পোড়া আর জলে ডোবা না হলে ছেদীলালের কথা কেউ আর ভাবে না।' একটু থেমে ছেদীলাল বললো, 'এবার উঠি, তাহলে ওই কথাই রইলো সামনের বুধবার। আপনিও দেখুন ভেবে। আমি তো আবার অন্য জাতের কিনা, সামাজিক আপত্তির কথাটাও বিবেচনা করবেন।'

'আমার আবার সমাজ, ক্ষেপেছো তুমি। আর জাতের কথা তুলছো, তোমরা হ'লে দেবতার জাত। ঐ পাকা কথা রইলো। তারপর বারুণীর দিকে ফিরে অনুকূল মাস্টার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হাঁ করে দেখছিস কি সর্বনাশী, নে প্রণাম কর।'

বারুণী ওঠবার আগেই ছেদীলাল পকেট থেকে করকরে নতুন একটা নোট বের ক'রে অনুকূল মাস্টারের হাতে গুঁজে দিলো।

'একি, টাকা কিসের' ছেদীলালের পিছন পিছন অনুকূল মাস্টার চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।

ঠিক বেরোবার মুখে ছেদীলাল ঘুরে দাঁড়ালো। রাস্তার আলোটা তেরচাভাবে তার চোখে আর কপালে এসে পড়েছে। মুচকি হেসে বললো, 'কিসের টাকা কি ক'রে বলি বলুন তো। পাট হ'লে না হয় বলতাম দাদন।'

কোনার্কের অর্কতীর্থে

নির্মলচন্দ্র বসুরায়

পুজোর ছুটিতে কোনার্কে যাবার প্রেরণা পেয়েছিলাম এক ঐতিহাসিক বন্ধুর কাছ থেকে। বন্ধুবর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ছাত্র। কোনার্কের সূর্যমন্দিরে যাবেন গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ করতে। যাত্রার আগে তিনি যখন বললেন যে ওখানে গিয়ে দুটো দিনের কম থাকা চলবে না, তখন তাঁর সংগে ঝগড়া করেছিলাম। ঐ নির্জন প্রান্তরে দুদিন থাকব কি করে! তখন কি জানতুম আমাদের জন্য জীবনের কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে আছে?

দুখানা গোযানে মালপত্র চাপিয়ে আমরা চার বন্ধু পুরী থেকে সন্ধ্যে ছ'টায় রওনা হলাম। একটু পরেই কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার হলদে চাঁদ তরুশীর্ষে দেখা দিল। দু' ধারে মর্মরমুখরিত ঝাউশ্রেণী। জ্যোৎস্নার ছোঁয়া লেগে সব কিছু কেমন অপরূপ রহস্যময় ঠেকছে। এমন রাত্রি জীবনে আর আসবে কিনা জানি নে। গাড়ীতে বসে থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে এসে হাঁটতে শুরু করলাম। মাইল পাঁচেক অতিক্রম করে নোয়া নুই (নতুন নদী) পাওয়া গেল। গাড়ী দুখানা নদীর মধ্য দিয়ে জল ঠেলে পরপারে চলল। আমরা লাঠিতে ভর দিয়ে একটি পাথরের সাঁকোর উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলাম। বড় বড় প্রস্তরখণ্ড পর পর সাজিয়ে অস্থায়ীভাবে সেতু রচনা করা হয়েছে। মাঝখানে এসে দেখি জেলেরা সেতুর উপরে বসে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণ নৈঃশব্দের মধ্যে এরাই কেবল প্রাণের স্পন্দনকে জাগিয়ে রেখেছে। চঞ্চলা তটিনী উপলখণ্ডে ব্যাহত হয়ে কলমুখর হয়ে উঠেছে। মাথার উপরে জ্যোৎস্না আরও ফুটছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য। চারদিকে চেয়ে মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় যাকে এতদিন জেনেছি, এ স্বপ্নভূমি—রূপকথার রাজ্য। ছায়াহীন জ্যোৎস্নাভরা প্রকৃতির এই রূপ দেখতে পেয়ে নিজেদের বড় ভাগ্যবান মনে হ'ল।

ওপারে পৌঁছে একটি ছোট বাজার পেলাম। দু' একটা দোকান তখনও খোলা ছিল। তারি একটিতে বসে চা সহযোগে সামান্য নৈশ আহার সেরে নেওয়া গেল। তারপরে আবার চলা শুরু হল। এবারে দৃশ্যপটের পরিবর্তন হল। ঝাউয়ের জটলা ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে বিশাল, ধূ ধূ দিগন্ত-জোড়া জনহীন প্রান্তর দেখা দিল। মাঝে মাঝে জল জমে 'বর্ষাপানি' সৃষ্টি হয়েছে। হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে জলের ভিতর দিয়ে যেতে অদ্ভুত লাগছিল। চারদিকে গভীর নিশীথিনীর নীরবতা ও জ্যোৎস্না। মানুষের বসতি চোখে পড়ে না, সাড়া নেই, শব্দ নেই। পরস্পরের সংগে যে কথা কইব সে ইচ্ছাও ছিল না। এখানে দাঁড়িয়ে কালের মন্দিরার ধ্বনি নিজের বুকের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে যেন শুনতে পাচ্ছি। এই বিরাটের ধ্যানভংগ করব কোন সাহসে? এই ভয়ংকর সৌন্দর্যকে প্রণতি জানাই। এখানে চপলতা করা চলবে না।

আরও একটি নদী। এর নাম 'লিয়াখিয়া'। মহাপ্রভু কোনার্কে যাবার সময়ে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এখানে এক বৃদ্ধার কাছে খই (লিয়া) চেয়ে নিয়ে খেয়েছিলেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এবার গাড়ীতে উঠে শুয়ে পড়লাম। গাড়ী আমাদের নিয়ে নদীবক্ষে অবতরণ করল। শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলাম ছইয়ের গায়ে ছোট ছোট ঢেউয়ের 'ছলাৎ ছল'। কি মিষ্টি আওয়াজ! মনে হল নদী আমাদের বুকে নিয়ে সোহাগ

করছে। পরপারে একটি মাত্র তালগাছ ঘন তরুরেখার পটভূমিকায় অসমুজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় কি রকম মায়াময় দেখাচ্ছে। ওধারে যেন স্বপ্নরাজ্য! আমরা ওদিকেই যাচ্ছি। গিয়ে কি দেখব কে জানে!

ওপারে গিয়ে আবার তেপান্তরের ধু ধু মাঠ। প্রকৃতির এ কি রূপ! এমন মুক্ত আকাশ, এমন নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি, এমন দিগন্তবিসর্পিত প্রান্তরেই এই অপার্থিব রূপলোক ফুটে ওঠে। এখানকার রহস্যময় অসীমতা ও দুরধিগম্যতার মধ্যে একটা ভয়াল গা ছম ছম করানো সৌন্দর্য আছে, শহরের জনারণ্যের মধ্যে যার কল্পনাও করা যায় না। এই মহৎ মৌনের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে মনটা কেমন হু হু করে উঠল। এখানে মানুষের নিয়ম খাটে না। মনে হল আজকের এই রাতটা না দেখতে পেলে ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব দিক আমার কাছে অপরিচিত থেকে যেত। চুপ করে থাকলে এই প্রান্তরের সংগীত বুঝি শোনা যায়। তার লয়-সংগতি জ্যোৎস্নার মায়াতে, নক্ষত্রের ঐ ক্ষীণ আলোকে, বালিয়াড়ীর ঐ অস্ফুট আকৃতিতে। এই মহাশূন্যতার বুক চিরে পাঁচটি শকট বালুকার উপরে চক্রচিহ্ন অঙ্কিত করে যাত্রা করেছে সূর্যমন্দিরের পানে। এ যেন আলোকের পথে মানুষের অন্তহীন জয়-যাত্রার প্রতীক। আমরা চলেছি সূর্যোদয়ের দিকে। এই পথে যুগযুগান্ত ধরে যাঁরা আমাদেরি মতো কোনার্কে গিয়েছেন তাঁদের সংগে একটি অন্তরের যোগ অনুভব করলাম। এই রাত্রি, এই স্তব্ধতা, এই ধূসর প্রান্তর, তাঁদের মনেও জাগিয়েছিল অপার বিস্ময়।

শেষ রাত্রির চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে চারটের সময়ে কোনার্কের ডাকবাংলোয় পৌঁছানো গেল। পূর্বাকাশে মেঘের সমাবেশ হওয়ায় বিখ্যাত সূর্যোদয় দেখা হ'ল না। তিন মাইল দূরবর্তী সমুদ্রের গর্জন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ভোরের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বামাত্র আমরা বেরিয়ে পড়লাম মন্দির দর্শন করতে। মন্দির কাছেই। সূর্যের প্রথম রশ্মিটি তখন মন্দিরশিখর স্পর্শ করেছে।

সমগ্র মন্দির একটি বিরাট রথের আকারে গঠিত। সূর্যদেবের রথ, তাতে চব্বিশটি বিশাল চক্র যোজিত, টানছে সাতটি তেজস্বী অশ্ব। কি অদ্ভুত কল্পনা! শোনা যায় রাজা নরসিংহদেব কুষ্ঠব্যাধির কবল থেকে মুক্তি-লাভ করে সূর্যের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ এই মন্দিরটি তৈরী করেন। এর নির্মাণকাল শ্রীযুত নির্মলকুমার বসুর মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। আলোকের প্রতি, সুন্দরের প্রতি মানুষের চিরন্তন প্রণতির প্রতীক এই মন্দির। এখানে বিরাটত্ব ও সূক্ষ্মতা, কঠিনতা ও কোমলতা,

মন্দির গাত্রে নায়িকা মূর্তি

আধ্যাত্মিকতা ও দেহমুখীনতার অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে।

নাটমন্দিরটি আসল মন্দির থেকে স্বতন্ত্র ও একটু দূরে অবস্থিত। তার পাষাণগাত্রে যেন লাবণ্যের প্রস্রবণ ছুটেছে। এখানকার মূর্তিগুলির অধিকাংশই নারীমূর্তি। পদ্মের উপরে চরণযুগল ন্যস্ত করে এক একটি মূর্তি অপরূপ ভংগীতে দণ্ডায়মান। কেউ মৃদংগে চাঁটি মারবার জন্য বাম হাত উর্ধ্বে তুলেছে। কারুর হাত মৃদংগে এসে লীলায়িত ভংগীতে পড়েছে। সেই ধ্বনি শুনে বাদিকার মুখে একটি পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। দেহের কি অপূর্ব সৌষ্ঠব ও সৌষম্য! সমগ্র দেহ যেন একটি ছন্দে রূপান্তরিত নর্তকী বা বাদিনীর দেহ ভংগীতে উন্মত্ততা প্রকাশ পেয়েছে। একেবারে আত্মহারা ভাব। মুখে কি অদ্ভুত প্রসন্নতা! নর্তকী যেন নাচের মধ্যে জীবনের সকল সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। তার আর কিছু চাইবার নেই। সমস্ত নাটমন্দির থেকে জীবনের জয়ধ্বনি উঠছে যেন। সংগীতের ঝঙ্কার যেন কার যাদুমন্ত্রে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। গতির কি বিচিত্র লীলা! এই লাবণ্যপুঞ্জের কাকে বাদ দিয়ে কাকে দেখব? এক একখানা মূর্তিতে দৃষ্টি যেন আটকে যাচ্ছে। একবার চোখে পড়লে চোখ আর ফেরানো যায় না। পাষাণের ধর্ম যেন শিল্পীর করস্পর্শে বদলে গেছে। 'ওহে সুন্দর মরি মরি, কি দিয়ে তোমায় বরণ করি!' এখানে এক সুন্দরী দেহের লীলায়িত ভংগীতে সুষমার তরংগ তুলে বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছে। তারই পার্শ্বে আর একজন হাত দুটি উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে ললিত-মধুর ভংগীতে করতাল বাজাচ্ছে। তার সুকুমার পেলব দেহটি বাদ্যের আবেগে ত্রিভংগ ঠামে বেঁকে গেছে। ওখানে দুটি মৃদংগবাদিকা ভাবাবেশে এক হাত দিয়ে মৃদংগে আঘাত ক'রে অন্য হাত উর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত করে নৃত্য করছে। তাদের চোখে মুখে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এদের পার্শ্বেই এক নর্তকী যুক্তকর মাথার উপরে প্রসারিত করে সৌন্দর্যের হিল্লোল সৃষ্টি করেছে। মূর্তিটিকে মৃণালদণ্ডের সংগে তুলনা করা যেতে পারে। পদতল থেকে কটিদেশ পর্যন্ত দর্শকের বামে, কটি থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত দক্ষিণে এবং কণ্ঠ থেকে শিরোদেশ পর্যন্ত বামে বেঁকে দণ্ডায়মান। প্রতিটি মুখ লাবণ্যে ঢলঢল করছে। সর্বাংগে যৌবনের ঐশ্বর্য। মূর্তিগুলিতে আনন্দের একটা উচ্ছল প্রবাহ যেন ছুটেছে। নাট মন্দিরটি অসমাপ্ত বলে মনে হ'ল। ছাদটি সম্পূর্ণ হয় নি। রেখদেউল বা প্রধান মন্দিরটিকে দেখলে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। কেউ বলেন কালোপাহাড় ওটি ভেঙে দিয়েছিলেন, কারুর মতে গঠনের ত্রুটির জন্য ওটা নাকি আপনা থেকে ভেঙে পড়েছিল। সে যাই হোক্ পাদপীঠ বা বেদীটি শূন্য দেখলাম। উপরে কোনও বিগ্রহ নেই। অনেকের মতে

ভগ্ন দেউল

বিগ্রহকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে অরুণ-স্তম্ভের ন্যায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। (সূর্য মন্দিরের সম্মুখস্থ অরুণস্তম্ভ এখন পুরীর মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত)। পাণ্ডারা যাঁকে সূর্যনারায়ণ বলে অভিহিত করেন, ইনিই নাকি কোনার্কের সেই অন্তর্হিত বিগ্রহ। সূর্যনারায়ণকে দেখে ইনি যে এককালে কোনার্কের রেখদেউলের শূন্যবেদী অলংকৃত করেছিলেন এরূপ মনে করতে পারলাম না। বিগ্রহহীন বেদী মনের মধ্যে একটা হাহাকার জাগায়। চতুর্দিকে এই আনন্দ উৎসবের মূল প্রেরণা ও কারণ যিনি, তিনি তাঁর আসন ছেড়ে কোথায় গেলেন? পাদপীঠের গাত্রে কালো মুগুনি পাথরের উপরে অপরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গতিকে পাষাণদেহে কে যেন মন্ত্রবলে বেঁধে দিয়েছে। সুন্দরী রমনীগণ নানাবিধ অর্ঘ্য বহন করে দেব সন্দর্শনে যাচ্ছে। কারুর হাতে চামর দুলছে। পাথরের বুকে একি অপূর্ব দোলা! চামর বাহিকার মুখে কি দিব্য হাসি! কালের আক্রমণ উপেক্ষা করে সে হাসি আজও অম্লান। মনে হয় ভাস্কর এইমাত্র তাঁর কাজ শেষ করেছেন। বেদীর পাদমূলে ধাবমান হস্তিযূথের মূর্তি। কোনটা শুণ্ড উঁচিয়ে, কারুর পা উত্তোলিত, কেউ বা সম্মুখস্থ শত্রুর পশ্চাতে ধাবমান। পাদপীঠের কোণায় কোণায় একটি করে গজসিংহের মূর্তি। গজের দেহে সিংহের মুণ্ড সন্নিবেশিত। (এটি উড়িষ্যার মন্দিরের ভাস্কর্যে একটি পরিচিত মূর্তি) দু'দিক থেকে দু'টি গজসিংহ কোণে এমন কৌশলে যুক্ত হয়েছে যে এই দু'টি ছাড়া সংযোগস্থলে আরও একটি গজসিংহ ফুটে উঠেছে। একদিন দেবতার এই বেদীমূলে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হ'ত। তাঁদের সম্মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে রেখদেউলের প্রাচীর প্রকম্পিত হ'ত। সেদিনের সেই উৎসব কোলাহল যেন মানসকর্ণে শুনতে পেলাম!

জগমোহন বা ভদ্রদেউলের জায়গায় জায়গায় পাথর ধ্বসে গিয়েছে। ১৯০৩ সালে দেউলের প্রবেশদ্বারটি এই জন্য দেওয়াল তুলে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ভেতরের নবগ্রহ ও বীণাপাণি মূর্তি বাইরে একটি 'মু্যজিয়মে' রক্ষিত হয়েছে। একটি উপবিষ্ট সূর্যমূর্তি দিল্লীতে স্থান হয়েছে। প্রতি শনিবার ও সংক্রান্তিতে নবগ্রহের পুজো হয় ও একটি মেলা বসে। ভাগ্যক্রমে আমরা শনিবারেই কোনার্কে উপস্থিত হওয়ায় মেলা ও পুজো দেখতে পেলাম। মুগুনি পাথরে নবগ্রহের মূর্তি-গুলো জ্বলজ্বল করছে। আশে পাশে সাতখানা গ্রাম থেকে গ্রামবাসিগণ এসেছে পুজো দিতে আর মেলায় সওদা করতে। ফল, মুড়ি, মুড়কি ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছে। জগমোহনের পাদমূলে ধাবনশীল হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধৃবৃন্দের মূর্তি। বিচার নিরত রাজা ও উড্ডীয়মান হংসের মূর্তিও আছে। সব কিছু গতির দ্যোতক। নির্জীব বা জড় মূর্তি একটিও নেই। চলমান সূর্যরথের গতিবেগ সকলের মধ্যে যেন সঞ্চারিত।

কোনার্ক মন্দিরের যে মূর্তিগুলো দেখে নীতিবাগীশেরা ভ্রূকুটি করেন তা' হচ্ছে কামবন্ধের মূর্তি। নানা ভঙ্গীতে সম্ভোগ-নিরত কামবিহ্বল নায়ক-নায়িকার অসংখ্য মূর্তি মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ। একে নৈতিক শুচিবায়ুগ্রস্ত মন নিয়ে বিচার করলে

গজসিংহ

চলবে না। একথা ঠিক যে দু'একটা মূর্তির মুখভাবে একটা পৈশাচিক উল্লাস ফুটে উঠেছে। কিন্তু এদের সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কামভাবের তাড়না ও ভঙ্গীকে মনোহর ও শোভন করে তুলেছে লাবণ্যের পরিমিতি। এখানে শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। ও প্রশ্ন তুললে আনন্দের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'বে। এখানে নিটোল, সুঠাম, স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহের নানা ভঙ্গীতে, ভাবরসের বিচিত্র প্রকাশে যে প্রাণের ছন্দ তরঙ্গায়িত হয়েছে তাকে অভিনন্দন জানাই। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয় 'এখানে চির যৌবনের হাট বসিয়াছে'। এই কামকেলির পাষাণচিত্রের মধ্যে যারা যৌবনকে অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল, তাদের প্রচণ্ড জীবনবোধের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হ'তে হয়। তারা মানুষের প্রবৃত্তি ও কামনাকে সহজভাবেই স্বীকার করে নিয়েছিল। এদের বাদ দিয়ে একটি পরিপূর্ণ জীবনের ধারণা করা যায় না। প্রবৃত্তির উদ্দাম ও অসংযত দিকটা যেমন মাঝে মাঝে প্রকট হয়েছে আবার তার সৌন্দর্যের দিকটাও চমৎকারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। জগমোহনের পশ্চিম দিকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি মূর্তিতে নায়ক নায়িকাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে চুম্বন করছে। কি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। নায়কের চোখ দুটি আবেশে নিমীলিত। মুখে একটি অপরিসীম তৃপ্তির প্রকাশ। নায়কের বামহাত নায়িকার কবরীতে, ডান হাত নায়িকার বামপার্শ্ব বেষ্টন করে স্তনমূল ঈষৎ ছুঁয়ে আছে। ভোগ যখন চরমে পৌছায় তখন তার মধ্যেও একটা সৌন্দর্যের দিক আছে। এই দৃশ্যে কামনার পঙ্কিলতার লেশমাত্র নেই। দেহের মধ্যে এখানে দেহাতীতের আভাস পাওয়া যায়। জীবনের পানপাত্রকে এরা যেন নিঃশেষে উজাড় করে নিচ্ছে। দুটি দেহ পরস্পরের মধ্যে জীবনের সকল চাওয়া পাওয়ার মধ্যে লীন হয়ে গেছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে সম্ভোগানিরত মূর্তির ছড়াছড়ি থাকলেও তারা সমগ্র মন্দির জুড়ে নেই। মন্দিরটি যেন মানুষের জীবনেরই একখানা ছবি। নিম্নভাগে ব্যবহারিক জীবনের চিত্র—বিচার; যুদ্ধ ও মৃগয়ার চিত্র। এদের উপরে মদনোৎসবের চিত্র। মন্দিরে আরোহণ করতে করতে কামবন্ধের মূর্তি ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসে এবং সর্বোচ্চ অংশে একেবারেই নেই। ভোগের পালা শেষ করে মানুষ যেন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছে।

উপরের দিকে দুটি অপূর্ব সূর্যমূর্তি আছে। একটি হরিদশ্বের মূর্তি। জগমোহনের উত্তর দিকের প্রাচীর গাত্রে মুকুট, কুণ্ডল, উপবীত ও নানা অলঙ্কার-শোভিত, 'বুট' পরিহিত সূর্যদেব মুখে একটি অনির্বচনীয় মধুর হাসি নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন। সেই হাসিতে অমৃত যেন ক্ষরিত হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে এই পাষাণ হাসি অক্ষয় হয়ে আছে। কি প্রসন্ন কোমল মুখ আর বলদৃপ্ত দেহ! সমস্ত মূর্তিটিতে একটি নয়নস্নিগ্ধকর, মনোহর ভাব। কোথাও এতটুকু রুক্ষতা প্রকাশ পায় নি। লাবণ্যের সুকুমার বন্ধনে বীর্য ও পৌরুষ সংহত হয়ে আছে। পশ্চিমের দেওয়ালে আর একটি সূর্য-মূর্তি। এটি সমভঙ্গ মূর্তি। মূর্তিটি দুই পায়ের উপরে সোজাসোজিভাবে দেহ ও মস্তক এতটুকু না হেলিয়ে দণ্ডায়মান। দেবতার শিরে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষে পদ্মবীজের মালা, কটি থেকে জানু পর্যন্ত অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত পরিচ্ছদ, পায়ে বুটজুতো। বুট নাকি 'স্কিথিয়ান' প্রভাবের ফল। বস্ত্রের খাঁজগুলো অতি স্পষ্ট ভাবে ফোটানো হয়েছে। কারুকার্য দেখে মনে হ'ল যেন পাষাণের উপরে ছুঁচের কাজ করা হয়েছে। এই মূর্তির মুখে একটি ধ্যানগম্ভীর, স্তব্ধ, সমাহিত ভাব। উভয় পার্শ্বে রাজ্ঞী, ছায়া, নিক্ষুভা ও সুরেণু সূর্যের এই চার স্ত্রী ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মানা। এদের নীচে দুদিকে দণ্ডী ও পিঙ্গল এই দুটি অনুচরের মূর্তি। পদতলে বিশ্ববাসী যুক্ত করে সূর্যবন্দনায় রত। আরও নীচে নৃত্যগীত ও বাদ্যানিরত নানা মূর্তি।

মন্দিরে আরোহণ করতে গিয়ে এই কথাই মনে হয় যে এখানে নানা মূর্তির ভিতর দিয়ে মানুষের জীবন ও মনের বিভিন্ন স্তরই অভিব্যক্ত হয়েছে। মানুষের ভোগ-লিপ্সাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে তার পাঁকে ডুবে থাকবে না। তাকে সে অতিক্রম করে যাবে। মানুষের মন নিজের সাধনায় ঊর্ধ্বায়িত হ'বে। সৌন্দর্যের পথে ভক্তির পথে, অতো-পলব্ধির পথে সে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে যাত্রা করবে। তাই মন্দিরশিখরে চতুরানন ব্রহ্মার মূর্তি শোভা পাচ্ছে। সেখানে কামকেলির স্থান নেই।

মন্দিরের অসংখ্য মূর্তিতে কোথাও দুঃখ, জরা বা ব্যাধির ছাপ পড়েনি। সর্বত্র অপরিমিত প্রাণ প্রাচুর্যের অভিব্যক্তি। এখান থেকে যেন আলোকের জয়ধ্বনি উঠছে। এখানে দুঃখবাদের স্থান নেই। এখানে কর্মমুখর জীবনের আনন্দ কোলাহল যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। দক্ষিণদিকে দুটি আশ্চর্য জীবন্ত অশ্ব-

মূর্তি দাঁড়িয়ে। তেজস্বী অশ্ব দুর্দমনীয় বেগে সম্মুখে ধাবমান। পার্শ্ববর্তী শক্তিমান পুরুষ বল্গাকর্ষণপূর্বক দৃপ্ত-ভঙ্গীতে তাকে সংযত করে রয়েছে। অশ্ব ও পুরুষ উভয়েরই সর্বশরীরে মাংসপেশী তরঙ্গায়িত। একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন পাষাণপুঞ্জে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। অমিত বীর্য অশ্ব একবার ছাড়া পেলেই বোধ হয় দিগ্বিজয় করে আসতে পারে।

মন্দির শীর্ষে কয়েকটি নারীমূর্তি লালিত্যে একেবারে অতুলনীয়। স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই যে একটি প্রতীক্ষমানা নায়িকামূর্তি আমাকে সম্মোহিত করেছে। তার সুকুমার বরতনু মনোহর ভঙ্গীতে লীলায়িত। আবেশস্নিগ্ধ নয়ন পল্লব দুটিতে একটি আমীলিত ঢলঢলভাব। ঠোঁটের আধফোটা হাসিটি মনকে দুর্নিবার ভাবে আকর্ষণ করছে। সর্বাঙ্গে যৌবনের উচ্ছ্বাস। বক্ষে পদ্মবীজের মালা দুলছে, দক্ষিণ হস্তের চাঁপার কলির মতো অঙ্গুলিতে আর নিম্নপ্রান্ত বিধৃত। শীতবৃষ্টি, ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নায়িকা কার প্রতীক্ষা করছে। ওর ঐ স্নিগ্ধ হাসিতে আমার মন বাঁধা পড়ে গেছে। ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গেলাম। পাষাণ প্রতিমায় কি প্রাণ সঞ্চারিত হ'তে পারে না? মূর্তিটির সম্মুখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাষাণ আমাকে পেয়ে বসেছে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি আমি মাটি থেকে দেড়শ ফুট উঁচুতে। এখান থেকে যদি পড়ে যাই? পড়ে গেলে পৃথিবীর কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হ'বে না। আমার কাছে আজকের এই মুহূর্তটির মূল্য অপরিমেয়। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ বলেন যে, ভারতীয় শিল্পে আকৃতির দিকটা নাকি পূর্ণতা লাভ করে নি, এখানটায় নাকি ভারতীয় শিল্পের একটা দৈন্য থেকে গেছে। আমার চারদিকে মূর্তির যে সমারোহ দেখছি এখানেও যদি আকৃতির ঐশ্বর্য প্রকাশ না পেয়ে থাকে তবে কিসে যে পাবে তা' জানি নে। শিল্প-শাস্ত্রের নিয়মকানুন জানিনে। পণ্ডিতদের তর্ক নিয়ে তাঁরাই থাকুন, আমার নায়িকা, নায়িকার ঐ সুঠাম নৃত্যশীল মৃদঙ্গবাদিনী চতুরাননের ওধারে ঐ অনিন্দ্যসুন্দর করতাল বাদিকা—এরা আমার কাছে অবিস্মরণীয়।

জগমোহনের সু উচ্চ চত্বরে বসে দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত করে দিয়েছি। এখানে মানুষের সৃষ্ট সৌন্দর্য আর প্রকৃতির সৌন্দর্যের অপূর্ব সম্মিলন হয়েছে। আমাকে ঘিরে শিল্পীর কল্পনা পাষাণের বুকে রূপের প্লাবন বইয়ে দিয়েছে। আমার সম্মুখে মর্মর মুখরিত ঝাউবন সমুদ্রাগত হাওয়ায় দুলছে। ঝাউয়ের বেষ্টনীর পরে সবুজের বন্যা। কে যেন একখানা গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। সবুজের মধ্যেই বা কতরকম বৈচিত্র্য! কোথাও গাঢ় সবুজ, কোথাও বা সবুজ ফিকে হয়ে এসেছে। আরও দূরে বৃক্ষবিরল ঢেউখেলানো বালুকাময় প্রান্তর। দূরে অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ আলোকে ঘননীল সমুদ্র স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সুন্দরের কি বিচিত্র প্রকাশ! 'আমার নয়ন ভোলানো এলে, আমি কি হেরিলাম নয়ন মেলে।' এই গানের মর্ম এমন করে আর কি কখনও জেনেছি? এই দিগন্তব্যাপী শূন্যতার মাঝখানে সূর্য-মন্দির তার সমারোহ নিয়ে সাতশ' বছর দাঁড়িয়ে আছে। মনটা কেমন হাহাকার করে উঠল। রূপের এই বিপুল আয়োজনকে ঘিরে এই বিরাট শূন্যতা কেন? কেন কে

বলবে? হয়তো এই বিরাটের পটভূমিকাতেই সুন্দরকে মানায় ভাল। যন্ত্র সভ্যতার জঞ্জাল একে কলঙ্কিত করবে না। এখানে বসে কেবল ভাবতে ইচ্ছে হয়। কত নতুন ধরণের অনুভূতি যে মনে এসে ভিড় করে। এরা মনের কোন অন্তস্তলে লুকিয়ে ছিল জানি নে। আজ গভীর আনন্দের মূর্তি ধরে আমার চৈতন্যে ফুটে উঠেছে। এত কথা বলার আছে যে পাতার পর পাতা ফুরিয়ে গেলেও বলা শেষ হ'বে না।

খাবার সময় এগিয়ে এল। আমার পাষাণ প্রেয়সী ঠিক তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর আকর্ষণে আমাকে পাথরের স্তূপ অতিক্রম করে চারবার মন্দিরশিখরে আসতে হয়েছে। জানি এই আসাই শেষ নয়, আরও আসতে হ'বে। এই পাষাণ ...কেবল নির্জীব জড়পিণ্ড নয়। এর একটা সত্তা আছে, ভাষা আছে, এর বাণী আমাকে পাগল করেছে। হে পাষাণ প্রতিমা, তুমি আমার জীবনের ধারাকে বদলে দিয়েছ। সুন্দরের এই অপরূপ লীলার মধ্যে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছি। 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান, তুমি জান নাই, জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ।'

কোনার্কের একটি অভিজ্ঞতার কথা না বলে পারছি নে। মন্দির থেকে মাইল তিনেক দূরে চন্দ্রভাগা নদী। এখানে মাঘী সপ্তমীতে মেলা বসে। ঐতিহাসিক বন্ধু বললেন যে এখানকার তীর্থ বারিতে অবগাহন করলে নাকি সূর্যলোক প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। রাত্রি কেটেছে স্বপ্নের মতো। সকালবেলায় মন্দিরে গিয়ে মনে ভাবের ঘোর লেগেছে। অপার আনন্দ নিয়ে চললুম চন্দ্রভাগার সন্ধানে। চন্দ্রভাগা যেন বাস্তবজগতের নদী নয়। এ যেন স্বপ্নে দেখা কোন পরীরাজ্যে এসেছি। স্বচ্ছ শীতল বারি, তল পর্যন্ত দেখা যায়। কোথায়ও বুকজলের বেশী গভীর নয়। স্নান করে শরীর জুড়িয়ে গেল। পুণ্যার্থিনীরা এখানে অবগাহন করে সমুদ্রে ফুল উৎসর্গ করছেন। সমুদ্রে নামতে ভরসা হ'ল না। এর রীতিনীতি জানা নেই। বেলাভূমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে। পুরীর সমুদ্রতীরে এখানকার মতো ঝিনুকের ঐশ্বর্য নেই। ক্ষণিকের জন্য আমরা শিশু হ'য়ে গেলাম। কোঁচড় ভর্তি করে ঝিনুক সংগ্রহ করলাম। কোনার্কের স্মৃতি এতে মাখানো থাকবে।

দিনের শেষে মন্দির থেকে যখন আমরা ডাকবাঙলোয় ফিরছি, তখন কারুর মুখে কথাটি নেই। সকলের চোখে স্বপ্নালুতা। লাভলোকসানের জগৎটা আমাদের কাছ থেকে সরে গেছে। আমরা কোন অমরলোকের অধিবাসী যেন। অমৃতলোক থেকে আমাদের উপরে সৌন্দর্যের বর, শান্তির বর অজস্রধারায় বর্ষিত হয়েছে। আজ আমরা নতুন দৃষ্টি লাভ করেছি, আমাদের মনের পরমায়ু বেড়ে গেছে। ভারতের ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা আমাদের চোখের সামনে খুলে গেছে যেন। দেশকে আজ বোধ হয় যথার্থরূপে চিনতে পেরেছি। যে বারোশত শিল্পী সূর্যের প্রতি মানুষের পাষাণ অর্ঘ্য রচনা করেছিলেন বারো বছরের সাধনা দিয়ে, তাঁদের পায়ে প্রণাম জানাই। আর স্মরণ করি শিল্পীদলপতি বিশু মহারাণার কিশোর পুত্র ধর্মপদকে যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বারোশত শিল্পীর মান রেখেছিল। প্রধান শিল্পীবৃন্দ যখন সহস্র চেষ্টাতেও মন্দির শীর্ষে স্বর্ণকলস বসাতে পারলেন না, যখন বিক্ষুব্ধ রাজার রোষবহ্নি তাঁদের গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল, তখন কিশোর ধর্মপদ তার সহজাত বুদ্ধিবলে চুম্বকলোহার আকর্ষণবদ্ধ একটি লৌহকীলক উৎপাটিত করে কলসকে যথাস্থানে স্থাপন করল। কিন্তু রাজা নরসিংহদেব যাতে শিল্পীদের ব্যর্থতার কাহিনী না জানতে পারেন সেজন্য ধর্মপদ মন্দিরশিখর থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তার ক্ষুব্ধ আত্মা গুমরে মরছে কি না কে জানে!

সন্ধ্যার ছায়া বনে বনে ঘনিয়ে এল। নির্জন, পরিত্যক্ত সূর্যমন্দিরের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নমন্দিরের' ক'টি কথা মনে পড়ে গেল—

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিতে ছিন্না
বীণার তন্ত্রী বিরত
সন্ধ্যা গগনে ঘোষে না শঙ্খ
তোমার আরতি বারত
তব মন্দির স্থির গম্ভীর,
ভাঙা দেউলের দেবতা

এত সাধনা, এত সমারোহের এ কি পরিণতি রূপের বিদ্যুৎচমক, কল্পনার বিপুল ঐশ্বর্য —সব কিছুর মধ্যে একটি সকরুণ রিক্ততার সুর যেন বাজছে। নির্জন, আরতিহীন মন্দিরের ট্রাজেডি সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলাম।

কোনার্কে আসার পথে তারাজ্বল আকাশের নীচে বিশাল প্রান্তরের ভয়াল সৌন্দর্য দেখেছিলাম। ফিরবার পথে প্রান্তরের অন্য রূপ দেখলাম। বনরেখার ঊর্ধ্বে মন্দিরের চূড়া আমাদের যেন বিদায় জানাল। অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদ্রে বালিয়াড়ি জ্বলছে। দূরে ভীতচকিত বনহরিণের পাল ত্রস্তপদে ছুটে গেল। গরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি পরিবেশটিকে আরও স্নিগ্ধ করে তুলেছে। আকাশ জুড়ে বিরাট রামধনু দেখা দিল অপরূপ শোভায়। এই মহাসুন্দরের আবির্ভাবের মধ্যে জীবনের পরম লগ্ন কোন প্রসন্ন দেবতার আশীর্বাদরূপে যেন আমাদের কাছে আজ ধরা দিল। অনাবিল আনন্দরসে অন্তরের যে পরিশুদ্ধি হল, তার তুলনা হয় না। আনন্দ আপ্লুত চিত্তে পুরীতে ফিরে এলাম।

[প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটোগুলি দিলীপকুমার বিশ্বাস কর্তৃক গৃহীত]

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

[পূর্বানুবৃত্তি]

১০

লেখক ইচ্ছে করেই গত কিছু-দিন অ্যানিকে এড়িয়ে চলেছে। স্টেশনে অ্যানিকে দেখতে না পেয়ে সেদিন মনে বেশ একটু আঘাত পেয়েছিল। আঘাতটা লেগেছিল মনের একটা স্পর্শকাতর জায়গায়। অ্যানির যদি তার কথা মনে না পড়ে, তবে তারই বা কি দায় পড়েছে অ্যানির কথা ভাববার! একটা হোটেলের মেয়ের সঙ্গে গল্প না করলে যেন তার খাওয়া হজম হয় না! গল্পের লোকের আবার অভাব প্যারিসে! প্রত্যেক লোকে খোশ গল্পের আর্টিস্ট এখানে!

সংকল্প ভাঙবার যম এই বিস্বাদ পৃথিবীটা। মানুষে দেবরায়ের গল্প ভাল লাগাবার চেষ্টা করতে পারে, কাফের আড্ডায় মুসিয়ো বুসাকের নতুন ঘোড়াটার সম্বন্ধে বিরামহীন গল্প শোনায় আগ্রহ দেখাতে পারে, প্যারিসের একঘেঁয়েমি কাটানোর চেষ্টায় দিয়েপ্, রুঁয়া, রাইম্‌স দেখতে যেতে পারে, ঘরের একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য অসম্ভব চরিত্রের দেবরায়কে নিয়ে একটা গল্পের প্লট ভাবতে পারে; কিন্তু চেষ্টার বেশী মানুষে কিছু করতে পারে না। পৃথিবী না ছাই! যুগ যুগ সঞ্চিত ব্যর্থ চেষ্টার আবর্জনা স্তূপের নামই জগৎ!

অ্যানির তো স্টেশনে আসবার কোন কথা ছিল না। তবে সে না এসে অন্যায় করল কি করে? নিজের উপর করা এই প্রশ্নের উত্তরটা এতদিন এড়িয়ে এসেছিল। কেননা এর উত্তর নেই তার কাছে। তবু অ্যানি অবিচার করেছে তার উপর। শুধু অবিচার নয়, এ এক ধরণের অপমান! মনের মধ্যের বদ্ধ আক্রোশটা তাকে বুঝিয়েছিল যে, অ্যানির সঙ্গে কথা না বলাটাই পর্যাপ্ত নয়। তার আনা চায়ের সরঞ্জামে চা না খেয়ে তাকে বুঝিয়ে দাও যে, তুমিও তার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা রাখ না। শুধু কথার বাঁধুনী আর লৌকিকতা! এসব সে অনেক দেখেছে। যেমন স্থূল বুদ্ধি অ্যানির, হয়ত সে বুঝতেই পারবে না যে, লেখক তাকে এড়িয়ে চলবার জন্যই ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ঘরের কোণের আবর্জনার বাক্সটাতে চায়ের পাতা না পড়ে থাকলে, সেটা তার নজরে পড়তে বাধ্য। যাদের দরদ কেবল লোক দেখানো, তারা বোধ হয় অন্য কেউ চা খেল কি না খেল সেকথা ভেবে দুঃখিত হতে জানে না! অ্যানির উপর অভিমান করবার সত্যিকার অধিকারটুকু জন্মালেও লেখক স্বস্তি পেত; কিন্তু সেই অধিকারটা যে সে পেয়েছে, একথা মনে করবার কোন যুক্তিসংগত কারণ সে খুঁজে পায় না। না থাকুক অধিকার, একজন হোটেলের মেয়ের সঙ্গের ব্যবহারে কৃত্রিম আড়ষ্টতা আনবার কোন মানে হয় না।

মনের কড়া ভাবটাকে একবার ভিজতে দিয়েছ কি আর রক্ষা নেই। ঐ আরম্ভ হতে যা দেরী। তারপর অষ্টপ্রহর ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়তে পড়তে কখন যে গলে কাদা হয়ে যায়, টেরও পাওয়া যায় না।

অ্যানি লেখকের অভিমানের কথাটা জানতে পেরেছে ত, তাহলেই হল। এই জিনিসটাইতো সে এতদিন থেকে চাচ্ছিল। যাকে শাস্তি দিতে গেলে সে যদি শাস্তি বলে জিনিসটাকে বুঝতেই না পারলো, আর তার অদর্শনটাই যদি তোমার সাজা হয়ে দাঁড়ায়, তখন আর এই যুক্তি না দেখিয়ে উপায় কি!

মনের এর পরের পথটুকু বেশ সরল। এই সামান্য ব্যাপারে আবার মান-অপমানের প্রশ্ন। নিজের অধিকার কতটুকু সেটা না বুঝে হট্ করে কিছু করাটা ঠিক হয়নি। এইসব ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে দিয়েইত লোকের মাত্রাবোধের পরীক্ষা হয়। যুক্তির শৃঙ্খলে হাজারটা নতুন বলয় একটার পর

কথামালার উপদেশের মত অপরের কানে—তাতে কি অসে যায়? লেখকের বর্তমানের কাজ এই দিয়েই চলে যাবে। লোককে শুনিয়েতো আর সে জোরে জোরে কথা-গুলো বলতে যাচ্ছে না!

একটা মনগড়া অভিযোগ সৃষ্টি করে নিয়ে তারপর সেটাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে দেওয়া লেখকের মত বুদ্ধিমান লোকের সাজে না—এই হল যুক্তির দরবারের অন্তিম রায়। এই পথে তার বুদ্ধিমত্তাও বজায় থাকে, অথচ বর্তমান অসহ্যতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবারও একটা পথ পাওয়া যায়। এইখানে পেঁছে তবে লেখক নিশ্চিন্ত হয়।

তবু রক্ষে যে মুসিয়ো দেবরায় আর কিছুদিন থেকে তাকে জ্বালাতন করতে আসছেন না! সেই তাঁর দাদার চিঠি পড়ানোর দিন দুয়েক পর একবার এসেছিলেন ঘরে। এক্সচেঞ্জের বিপদের জন্য দেশ থেকে তাঁর টাকা পৌঁছয়নি কিছুদিন যাবৎ অথচ তাঁর আলজাসে বেড়াতে যাবার সব ঠিক হয়ে গিয়েছে টুরিস্ট এজেন্সীতে। তাই তাঁর টাকার দরকার তখনই। বেশী নয় হাজার বিশেক ফ্রাংক হলেই তাঁর কাজ চলে যায়। 'মেডিক্যাল গ্রাউন্ডস'এ তিনি এখনও বহুকাল ভারত সরকারের কাছ থেকে এক্সচেঞ্জ আদায় করবেন—একবার ফিরে আসতে দিন না এই টুর থেকে—ইউরোপের সব শহরের বড় ডাক্তারদের সঙ্গে মুখচেনা। আছে মশাই আমার।...

লেখক মুসিয়ো দেবরায়কে একখানা চেক লিখে দিয়েছিল—তখনকার মানসিক অবস্থায় তাঁর হাত থেকে রেহাই পাওয়াটাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যতদিন আলজাস থেকে না ফেরেন, ততদিনই ভাল। সে কালই অ্যানিকে আর হোটেলওয়ালিকে বলে রাখবে যে, কোনদিন কেউ যদি লেখকের সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাহলে যেন তাঁকে বলে দেওয়া হয় যে, সে বাড়ী নেই। এরকম একটা স্থায়ী ব্যবস্থা না করলে মুসিয়ো দেবরায়ের হাত থেকে বাঁচা যাবে না কিছুতেই।

একটা সুবিধা হল—কাল থেকে আর ভোরে উঠতে হবে না। আজই খানকয়েক "ক্রোয়াসাঁ" কিনে এনে রাখবে। কাল সকালে নিজেই চা করে খাবে। না, চা নয়, কফি।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই লেখব ঠিক করে নেয়, আজ বি বলে অ্যানির সঙ্গে কথা আরম্ভ

সে সম্বন্ধে খবর না রাখা সত্ত্বেও প্রাচীন সভ্যতাগুলোর কদর ফরাসী দেশে অন্য যে কোন দেশের চেয়ে বেশী। সাধারণ লোকে খবর রাখে যে মিশর, ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সভ্যতা প্রাচীন ও গৌরবময় ঐতিহ্যের বাহক। ভারতে সাদাহাতী পাওয়া যায়, এই সংবাদ কোন ভারতবাসীকে দেওয়ার সুযোগ পেলে, কোনও ফরাসী ছাড়ে না। ভারতের ফকিররা অনেককাল না খেয়ে থাকতে পারে এখবরও বহুলোক রাখে। কোন প্রাচীন সভ্যতাকে ভাল বলতে হলে এর চেয়ে বেশী কিছু জানতে হবে এমন কিছু বাধ্য বাধকতা নেই।

ভারত সম্পর্কিত বিষয়ে গুরুত্বের ক্রমানুসার সাধারণ লোকে খবর রাখে নিম্ন-লিখিত জীবগুলির—বুদ্ধ, সাপ, গান্ধী, বাঘ, সাদাহাতী, আগাখাঁ। উচ্চশিক্ষিত লোকেরা রবীন্দ্রনাথের নাম জানে। গোয়াটেমালার মন্ত্রীর নামের খবর আমরা যেরূপ রাখি না, এরাও তেমনি ভারতবর্ষের মন্ত্রী নেহরুর নাম শোনেনি। নেহরুর নাম দূরে থাক ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে এ খবর শিক্ষিত ফরাসীও রাখে না। সাধারণ সরকারী দপ্তরে পর্যন্ত এর স্বীকৃতি নাই। পোস্ট অফিসের কাউণ্টারে এয়ার মেলে ভারতবর্ষে চিঠি পাঠাতে কত ডাক টিকিট দিতে হবে জিজ্ঞাসা করলে, কেরানী ভদ্র-মহিলাটি বিস্তর বই ঘাঁটাঘাঁটি করবার পর জিজ্ঞাসা করেন ফরাসী-ভারত না ব্রিটিশ-ভারত? কোনটাই নয়? তবে কি পোর্তুগিজ ভারত? যে পোস্টাল গাইড এ গোয়া-দমন-দিউ এর উল্লেখ থাকে, তার মধ্যে স্বাধীন ভারতবর্ষের কথা থাকে না। পুলিশ অফিসের ভিসা বিভাগে ভারতবর্ষের লোককে যেতে হয় 'ইংলণ্ড' সাইনবোর্ড দেওয়া ঘরে। বাঙলার দাঙ্গার খবর একদিন কোন খবরের কাগজে এক লাইন বেরিয়ে-ছিল—সেটাকে বলা হয়েছিল আরব ও হিন্দুদের মধ্য eclesiastical যুদ্ধ। সরকারী এবং সংবাদপত্রের স্তরেও যেখানে বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান এইরকম, সেখানে সাধারণ লোকের কাছ থেকে কতটা আশা করা যেতে পারে।

কাজে কাজেই ফরাসীদের ভূগোলের-জ্ঞানের দুর্নাম পৃথিবীব্যাপী। যে জাতের এত বিশ্বপ্রেম, তাদের বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান এত কম কেন? ফরাসী চরিত্রের এই অপ্রত্যাশিত অসংগতি দেখে অবাক হতে হয়। কারণটা খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। বিশ্বের সংগে ফরাসীদের সম্বন্ধটা ভাব-জগতের। আমেরিকানরা দল বেঁধে 'এয়ার লাইনার' এ চড়ে সপ্তাহান্তে পৃথিবী ঘুরে আসে। এরকম পরিক্রমায় ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর ঝাঁকি দর্শন পাওয়া যেতে পারে; ফিরে এসে "One world" নামের বই লেখা যেতে পারে; পৃথিবীটা যে গোল তার প্রমাণ অনুভব করা যেতে পারে। কিন্তু এই ছাপার অক্ষরের যুগে, বিশ্বের সুরসংগতি উপলব্ধি করবার জন্য দরকার শুধু একটা সংবেদনশীল মনের। অনেকদিনের সংস্কারে ফারসীদের এই মনটা গড়ে উঠেছে। অথচ ফরাসীদের শরীরটা ভোগবিলাসী। তাদের দেশটাও এত সুন্দর! এমন সুন্দর দেশের 'দুধ আর মধুর' আয়েশ ছেড়ে, কারও কি বাইরে যেতে ইচ্ছা করে? যাদের দেশ কুয়াশায় ভরা বারো মাস, যাদের দেশে লোক আঁটে না, যারা দেশে খেতে পায় না, বা যাদের দেশে সব থাকা সত্ত্বেও শিল্পকলা নেই, তারা যায় বাইরে। ফরাসীরা যাবে কেন? তাই ফরাসীরা এত ঘরকুনো। তারা জানে যে, ফ্রান্সে সখ করে বাইরে যায় খামখেয়ালি লোকে—যেমন গগাঁ গিয়েছিলেন তাইতি দ্বীপে।

ফরাসীদের যুক্তি অনুযায়ী কোন দেশ সুন্দর হতে হলে তার থাকা চাই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ; সেখানকার মেয়েদের হওয়া চাই চটুলা আর তাদের চোখে নাচা চাই বিজলী, C অক্ষর দিয়ে আরম্ভ হওয়া তিনটি বিষয়ে সে দেশের থাকা চাই সহজাত প্রতিভা—Conture, Cuisine, Coiffure অর্থাৎ পোষাকের ছাটকাট সেলাই, রান্না ও চুলবাঁধা। কারও মুখে অন্য দেশের প্রশংসা শুনলে ফরাসীরা উপরের বিষয়গুলো সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। এই প্রশ্নগুলো শুনলেই কোন্ ভাবানুষংগে জানি না, আমার মনে আসে, আমার দেশের একটা গল্প। আমাদের ওখানে একজন সখের কথকঠাকুর ছিলেন। তিনি কথকতা আরম্ভ করবার আগে জিজ্ঞাসা করতেন "মায়েরা এসেছেন?" মেয়েদের মধ্যে থেকে পিসিমা উঠে বলতেন, "হ্যাঁ বাবা"। "বৃদ্ধরা?"

একজন শ্বেতশ্মশ্রু লোককে উঠে হাজির দিতে হত। "যুবকরা? আজকালকার ছেলেদেরইত এসব শোনা দরকার" কথক-ঠাকুরের এ অভ্যাস সকলেই জানত। একদিন আমারই কয়েকটি সতীর্থ, কথকতা আরম্ভ হওয়ার আগেই, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সেজে তাঁকে প্রণাম করে বলেছিল—"যা চাই সব আছে, এখন তাড়াতাড়ি আরম্ভ করুন" ফ্রান্স হচ্ছে এই যা-চাই-সব-আছের দেশ।

কিন্তু অন্য দেশের দম্ভের সংগে ফরাসী-দের গর্বের তফাৎ হচ্ছে যে, ফরাসীরা দেশের খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সীমানা, রক্তের উৎকর্ষ ব্যবসায়িক সততা বা ঐ জাতীয় স্থূল বিষয়ের কথা তোলে না বিদেশীদের সম্মুখে। এই বোধ নেই বলে ফরাসীরা করুণার চোখে দেখে হ্যারিসটুইডের পোষাকপরা জনবুলকে কোটিপতি বেনে শ্যামখুড়োকে, ম্যাকারনিখোর ইতালিয়ানকে, সংস্কৃতির যুদ্ধের কুচকাওয়াজরত যোদ্ধা জর্মানকে—যারা রসজ্ঞানের অভাবে জীবনটাকে জানতে পারে না, রোজগারটা-কেই জীবন বলে ভুল করে।

ক্রমশঃ

আজব দীক্ষা

জি কে চেস্টারটন

অনুবাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটুখানি দম নিলেন রেভারেণ্ড্ মিঃ এলিস্ শর্টার; তারপর ফের শুরু করলেন, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন আমার চোখের সামনেই ঘুরপাক খেতে লাগলো। এ কী ভয়াবহ কাণ্ড! বিয়ে-থাওয়া না হলে মেয়েরা কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়? এরাও কি সব পাগল হয়ে গেছে? আমি মূর্খ নই, এককালে আমি বিস্তর বইপত্তর পড়েছি (এখন আর চর্চা নেই, বিদ্যেয় মরচে ধরে গেছে); পুঁথিপত্রে পড়া পরী আর ডাইনীদের কিম্ভূত সব আচার-আচরণের কথা আমার মনে পড়তে লাগলো। জলকন্যাদের ওপরে লেখা কী-একটা কবিতার গুটি দুই ছত্র সবে আমার মনে এসেছে, এমন সময়—কী ভয়ানক কাণ্ড—মিস্ মোরে হঠাৎ পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে জাপটে ধরলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা জিনিস আমি টের পেলাম; মিস্ মোরের হাত দুটিতে নারীসুলভ কোমলতা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। মিস্ মোরে মেয়ে নন, পুরুষ।

"ওদিকে মিস্ ব্রেট্, অর্থাৎ মিস্ ব্রেট্-এর ছদ্মবেশধারী ব্যক্তিটিও ততক্ষণে আমার নাকের ডগায় একটা পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছে। মুখে পৈশাচিক হাসি। মিস্ জেম্‌স্ ওদিকে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর আচরণেও একটা পৌরুষব্যঞ্জক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি মেঝের ওপর পা গুঁতোচ্ছেন, মাথার টুপিটি এক পাশে হেলে পড়েছে। দেখলাম, মিস্ জেম্‌স্‌ও একটি ছদ্মবেশধারী পুরুষ, মানে সেই পুরুষটি একটি ছদ্মবেশী মেয়ে। না না, এও বড়ো গোলমেলে শোনাচ্ছে; অর্থাৎ বুঝলেন কিনা—মিস্‌ই হোক্ আর মিস্টরই হোক্—মোদ্দা কথাটা হলো এই যে, সেই ছদ্মবেশধারী প্রাণীটি একটি পুরুষ-প্রাণী।"

ভাষাতত্ত্বের জটিল জালে জড়িয়ে গিয়ে মিঃ শর্টার খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়লেন; ক্রমেই তাঁর বক্তব্য যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগলো, "হ্যাঁ, মিস্ মোরের কথা বলছিলাম। সেই ভয়ংকর মহিলা—অর্থাৎ কিনা সেই ভয়ংকর পুরুষ—আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কী তাঁর হাত! হাত তো নয়, লোহা। গলার ওপরেই, বুঝলেন কিনা, আমার একেবারে গলার ওপরেই তাঁর পাঁচ-পাঁচটা আঙুল। চেঁচাতেও পারি না। ওদিকে মিস্ ব্রেট্, অর্থাৎ মিঃ ব্রেট্ অর্থাৎ সেই ছদ্মবেশী পুরুষ—যিনি আর যাই হোন মিস্ ব্রেট্ নন—আমার ওপরে একটা চক্‌চকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছেন। অপর দুই ভদ্রমহিলা—অর্থাৎ অপর দুই ভদ্রলোক—একটা বস্তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে প্রাণপণে কী যেন হাতড়াচ্ছেন। ব্যাপারটা ততক্ষণে আমি আঁচ করতে পেরেছি। আসলে এরা গুণ্ডা, আমাকে কোনও ফাঁদে ফেলবার জন্যেই এদের ছদ্মবেশধারণ। কে জানে, হয়তো আমাকে এরা গুম করে রাখবে। কিন্তু কেন? চাল্সীর এই নিরীহ ধর্মযাজককে লুকিয়ে রেখে কোন পরমার্থ সাধিত হবে এদের? তাহলে কি এরা নাস্তিক?

"যে গুণ্ডাটি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছিল, নিস্পৃহকণ্ঠে সে হুকুম দিল, 'ওহে হ্যারি, চট্‌পট্ সারো চাঁদ। বুড়োকে আগে সমঝে দাও ব্যাপারটা; তারপর চলো, ডেরা তুলি।'

"মিস্ ব্রেট্, অর্থাৎ পিস্তলধারী গুণ্ডাটি তাতে বললো, 'থামো দোস্ত, আসল ব্যাপার আর ফাঁস করবার দরকার নেই—'

"দ্বাররক্ষী গুণ্ডা বললো, 'একশোবার আছে। বুড়োকে সব সাফ্‌সুফ্ জানিয়ে দাও; কাজের তাতে সুবিধেই হবে।'

"মিস্ মোরে, অর্থাৎ যে গুণ্ডাটি আমাকে পেছন থেকে জাপটে রেখেছিল সে হঠাৎ হেঁড়ে গলায় বলে উঠ্‌লো, 'বিল্ ন্যায্য কথাই বলেছে; ও যা বলেছে একেবারে হক্ কথা। ওহে হ্যারি, ছবিটা একবার নিয়ে এসো ত?'

"আগেই বলেছি, দুজন গুণ্ডা আবার ঘরের এক কোণে বসে একটা বস্তার মধ্যে কি-যেন হাতড়াচ্ছিল; পিস্তলধারী গুণ্ডাটি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তারা তার হাতে কী একটা জিনিস তুলে দিল। সেটি নিয়ে সে আবার ফিরে এল আমার কাছে, আমার চোখের সামনে সেই নবলব্ধ জিনিসটিকে তুলে ধরলো। যা দেখলাম তাতে আর আমার বাক্‌স্ফূর্তি হলো না।

"দেখলাম, তার হাতে আমারই একটা ফটোগ্রাফ। হ্যাঁ আমারই চেহারা, কিছুমাত্রও ভুল নেই তাতে। আপনি ভাবছেন, এতে এত অবাক হবার কি আছে। ভাবছেন, গুণ্ডারা নিশ্চয়ই আগে থাকতে আমার একখানা ফটো হাতিয়ে রেখেছে। কেমন, তাই না? তা যদি হতো, তাহলে তো আর চিন্তাই ছিল না। ফটোটার একটা বর্ণনা দিই। বাগানের মধ্যে বেশ কায়দা করে আমি বসে আছি, হাতের চেটোয় থুতনি রেখে মৃদুমৃদু হাস্য করছি,—এই হলো ফটোখানার বিষয়বস্তু। দেখলেই বোঝা যাবে, ও ফটো অতর্কিতে কিম্বা আমার অজান্তে তোলা হয়নি; বেশ করে আমি পোজ্ দিয়ে বসেছি, তবেই তোলা হয়েছে; অথচ মজা এই যে, কস্মিনকালেও আমি অমন পোজ্ দিয়ে ফটো তোলাইনি।

"বোকার মতো আমি সেই ফটোখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম, সামান্য একটুখানি তাতে টাচ্-আপ করা হয়েছে; বাঁধানো ফটো, কাঁচের জন্যে একটু চক্‌চকে দেখাচ্ছে। এ ছবি যে আমার তাতে কোনও সন্দেহ নেই; এ আমারই ছবি, এ আমিই; আমারই মুখ, আমারই চোখ, আমারই নাক, আমারই হাত,—এ যা দেখছি এর সবকিছুই আমার; এ আমিই। অথচ কস্মিনকালেও যে আমি এ ছবি তোলাইনি তা-ও ঠিক।

"কতক্ষণ যে তাকিয়েছিলাম জানি না; পিস্তলধারী হঠাৎ ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠ্‌লো, 'নে ব্যাটাচ্ছেলে, এবার একটা ভেল্কী দ্যাখ্‌'। বলেই সে ফটোর উপর থেকে তার কাঁচখানাকে সরিয়ে নিল। দেখলাম যে, কাঁচখানার ওপরে ধপ্‌ধপে সাদা একজোড়া গোঁফ আর একটা কলার আঁকা রয়েছে। কাঁচ আর নীচের ফটো—এই দুইয়ে মিলিয়ে একখানা পুরো ছবি তৈরী হয়েছিল; কাঁচ সরে যেতেই ফটোখানার যেন চেহারা পালটে গেল। দেখলাম, আসলে সেটা এক বুড়ীর ছবি; কালো পোষাক-পরা থুরথুরে এক বুড়ী, হাতের চেটোর উপর থুতনি রেখে মৃদুমৃদু হাস্য করছে। বুড়ী ঠিক আমারই মতো দেখতে, দুজনের চেহারায় আশ্চর্য সাদৃশ্য। আর সেই সাদৃশ্যটাকে একেবারে পাকাপাক্কি করে তোলবার জন্যেই ফ্রেমের কাঁচের উপর সাদা গোঁফ আর কলার এঁকে দেওয়া হয়েছে।

"পিস্তলধারী সেই গুণ্ডা, নাম তার হ্যারি, পুনশ্চ কাঁচখানাকে সেই ফটোর উপরে এঁটে দিল; দিয়ে বললো, 'কেমন, খুব মজা লাগছে বুঝি? চেহারার মিলটা একবার চেয়ে দ্যাখ্‌। তোর সঙ্গে কিনা একটা বুড়ীর চেহারার মিল! বুড়ীও ধন্য হলো, তুইও ধন্য হলি, আমরাও ধন্য হলাম। হ্যাঁ, এবারে কাজের কথা শোন্‌। এ অঞ্চলে কর্ণেল হকার ব'লে এক ভদ্রলোক থাকেন, তুই তো তাঁকে চিনিস?'

"মাথা নেড়ে জানালাম যে চিনি।

"হ্যারি বললো, 'এই যে বুড়ীকে দেখছিস, এ হলো সেই কর্ণেলের মা। ওঃ, মাকে সে খুব ভালবাসে, খু-উব।'

"হ্যারির কথা তখনও শেষ হয়নি, দরজার কাছ থেকে বিল্‌ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'আঃ হ্যারি, বাজে কথায় সময় নষ্ট কোরো না, কাজের কথাটা বলে ফ্যালো চট্‌পট্‌। শোনো হে রেভারেণ্ড, আমরা তোমার এতটুকুও ক্ষতি করতে চাই না। বরং, যা তোমাকে করতে বলা হবে তা যদি তুমি ঠিকঠাক করে দাও তো তার জন্যে তোমাকে এক গিনি বক্‌শিশ দিতেও আমরা রাজী। ও হ্যাঁ, মেয়েদের পোষাক! তা, তাতে কি হয়েছে? সে পোষাকে তোমাকে চমৎকার মানাবে।'

"বিলের কথা তখনও শেষ হয়নি: পেছন থেকে যে আমাকে জাপটে রেখেছিল সে হঠাৎ ধম্‌কে উঠলো বিলকে, 'থামো বাপু, এখনো পর্যন্ত তুমি কথা কইতেই শিখলে না। এসো হে শর্টার, আমিই তোমাকে বুঝিয়ে বলছি ব্যাপারটা। এই যে কর্ণেল হকারএর কথা হচ্ছিল, আজ রাত্তিরেই তার সঙ্গে আমরা একবার মোলাকাৎ করতে চাই। হয়তো বা আমাদের দেখে সে খুশীই হবে, আদর করে শ্যাম্পেন খাওয়াবে। আবার এমনও হতে পারে যে, সে মোটেই খুশী হবে না আমাদের দেখে, এবং শ্যাম্পেনও খাওয়াবে না। চাই কি তাকে আমরা খুনও করতে পারি; আবার

এমনও হতে পারে যে, খুন করবার কোনও দরকারই হলো না। তা সে যাই হোক্, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে, দেখা আমাদের করতেই হবে। এখন মুশকিল হলো এই, ভয়ের চোটে সারা রাত্তির সে খিল এ'টে ঘুমোয়; কাউকেই সে দরজা খুলে দেয় না। কেন যে তার এই ভয়—একমাত্র আমরাই তা জানি; সেই সংগে এও জানি যে, একমাত্র তার মাকেই সে দরজা খুলে দেবে। শুনতে তোমার অবাক লাগবে, তা সত্ত্বেও বলি—তুমিই হচ্ছো তার মা।'

"ওদিক থেকে বিল্ তার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'ঠিক, তুমিই তার মা। আর আমিই তা আবিষ্কার করেছি। কর্ণেল হকার-এর মা-জননীর ছবিখানা যখন আমি দেখ্লাম, তখুনিই আমি বলে দিয়েছিলাম যে, এ হচ্ছে বুড়ো শর্টার; হ্যাঁ, বুড়ো শর্টার।'

"ভয়ে আমি কাঁটা হয়ে গেলাম। কি চায় এরা, কি চায়! রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি তোমরা চাও?'

"পিস্তলধারী শয়তান বললো, 'কি চাই, সেই কথাই তো বলছি। ওই যে দেখছো মেয়েদের একগাদা কাপড়-জামা পড়ে রয়েছে ঘরের কোণে, যাও—চট্পট্ ওগুলোকে পরে ফ্যালো।'

"মিঃ সুইনবার্ণ, অতঃপর কি ঘটলো—বলতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সহজেই আমার অবস্থাটা আপনি অনুমান করতে পারেন। বিবেচনা করুন, পাঁচ-পাঁচটা গুন্ডা, আর সেই সংগে একটা উদ্যত পিস্তল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার চেহারা পাল্টে গেল। একটা থুর-থুরে বুড়ী সেজে—অর্থাৎ কিনা কর্ণেল হকারের মার ছদ্মবেশে—রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হলো আমাকে; সংগে সেই গুন্ডার দল, তারাও মহিলাবেশী। কোথায় কোন্ পাপকার্যে যে এরা আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, কিছুই আমার বোধগম্য হলো না।

"পথে যখন বেরুলাম, গোধূলির নির্জন পদসঞ্চারে তখন আসন্ন রাত্রির আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। রাত্রি নামছে। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে, রাস্তা নির্জন। কর্নেল হকার-এর আস্তানায় চলেছি আমরা; কে জানে তা কোথায়। দুজনে আমরা পথ হাঁটছি, দেখে মনে হবে—সম্ভ্রান্ত দুজন মহিলা। কালো পোষাক, মাথায় পুরনো-ধাঁচের টুপি। আসলে যে আমরা মহিলা নই, পাঁচটি গুন্ডা আর একটি পাদ্রী, কারুরই তা বুঝবার জো নেই।

"আর বেশীক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না, ব্যাপারটা এবার সংক্ষেপে বলছি। ততক্ষণে আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি বললেও চলে। সারাক্ষণ শুধু একটিই মাত্র চিন্তা আমার মাথায়,—কি করে পালানো যায়, কি করে। চীৎকার করে যে কাউকে ডাকবো তারও উপায় নেই, শয়তানরা তাহলে আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে; হয়তো ছোরা মারবে, খুন করে আমার লাশটাকে হয়তো একটা খানাখন্দে ফেলে রাখবে। ভাবতেই আমি শিউরে উঠলাম। কি করা যায় তাহলে? পথচারীদের কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করবো? বুঝিয়ে বলবো সমস্ত ব্যাপারটা? পাকচক্রে ব্যাপারটা এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সে কাজটাও খুব সহজসাধ্য হবে না। আমার সংগীরা হয়তো তাদের বলবে, মদ টেনে আমি বেসামাল হয়ে পড়েছি, আমার এখন মাথার ঠিক নেই। কিম্বা আমাকে পাগল বলেই চালিয়ে দেবে হয়তো। হঠাৎ এই শেষ সম্ভাবনাটির মধ্যেই আমি মুক্তির একটি ক্ষীণ ইংগিত দেখতে পেলাম। একটিই মাত্র উপায় রয়েছে এখন, সে উপায় ভয়াবহ। পাগল কিম্বা মাতালই সাজতে হবে আমাকে। ধর্মযাজককে শেষে মাতাল সাজতে হবে? কি করবো, উপায়ান্তর নেই।

"চুপচাপ আমি পথ চলতে লাগলাম। সংগীরা সব মেয়েলী ছন্দে পথ হাঁটছে, সেই সংগে আমিও। আর অনবরত খালি সুযোগ খুঁজছি, কতক্ষণে জনমানিষ্যির সন্ধান পাওয়া যায়। অবশেষে সেই সুযোগ এল। দূরে একটি ল্যাম্পপোস্ট, তার নীচে এক কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। ততক্ষণে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। চুপচাপ এগোতে লাগলাম, তারপর—যেই আমরা সেই কনস্টেবলটির কাছে এসে পোঁছেচি হঠাৎ আমি একেবারে মাতালের মতো টলতে টলতে সেই রাস্তার ধারের রেলিং-এর ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম; আর পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগলাম সেই সংগে, 'হুররে! হুররে! হুররে! রুল ব্রিটানিয়া! চুলছাঁটাও! হুপ্ লা! ব্যু!' বিবেচনা করুন, নিরীহ একজন ধর্মযাজক আমি, দায়ে ঠেকে আমাকে তখন মাতলামির অভিনয় করতে হচ্ছে।

"যা ভেবেছিলাম। তৎক্ষণাৎ কনস্টেবলটি আমার দিকে লণ্ঠনটি উঁচিয়ে ধরলো, তীব্রকণ্ঠে শুধালো, 'কি হচ্ছে এসব? ব্যাপারটা কি?'

"স্যাম্ ঠিক আমার পাশেপাশেই হাঁট-ছিলো, তারও পরনে মহিলার ছদ্মবেশ। সে শুধু আমার কানে কানে বললো, 'টু শব্দটি করো না, চুপচাপ আমাদের সংগে চলে এসো; নইলে তোমার জান্ খেয়ে ফেলবো উল্লুক।' চেয়ে দেখি তার আপাতঃ-নিরীহ চোখদুটি যেন বীভৎস ক্রোধে জ্বলছে।

"কিন্তু ঐ যে বললাম, ততক্ষণে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। পাঁড়-মাতালের মতো আমি হাই তুলতে লাগলাম। শুরুই যখন করেছি তখন এর শেষ দেখে ছাড়বো। মুখে গাঁজলা তুলে অশ্লীল সব ছড়া কাটতে লাগলাম, আর টলতে লাগলাম সারাক্ষণ।

"কনস্টেবলটি আমাকে নিরীক্ষণ করলো দুচার মুহূর্ত, তারপর আমার সংগীদের বললো, 'আপনাদের এই বন্ধুটির তো দেখছি টালমাটাল অবস্থা। ভালোয় ভালোয় যদি একে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন তো আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এই রকমই যদি ইনি হল্লা করতে থাকেন তো বাধ্য হয়েই আমার এঁকে হাজতে নিয়ে যেতে হবে। দেখে মনে হচ্ছে আপনারা ভদ্রঘরের মেয়ে, কিন্তু কি করি বলুন, আমার উপায় নেই।'

"কনস্টেবলের উক্তি শুনে তৎক্ষণাৎ আমি আমার মাতলামির মাত্রাটাকে আরও চড়িয়ে দিলাম কয়েক ডিগ্রী; যতো রাজ্যের সব অশ্লীল কথা, অশ্লীল গান—কোনটাই আর আমি বাদ দিলাম না।

"বিল্-এর দিকে তাকিয়ে দেখি নিরুপায় ক্রোধে সে দাঁত ঘষছে; জনান্তিকে ফিস্‌ফিস্ করে আমাকে বললো, 'খুব চ্যাঁচাচ্ছো এখন;—তা চ্যাঁচাও, পরে তোমাকে আরো চ্যাঁচাতে হবে। একবার

ছাড়া পেলে হয়, গন্‌গনে আগুনের চুল্লীতে তোমাকে ঝল্‌সে মারবো; ষাঁড়ের মতো চেঁচিও তখন।'

"প্রাণের দায়ে তখন আমি মাতলামি করছি। আমার সামনে মহিলাবেশী সেই পঞ্চদস্যু; নিরুপায় নিষ্ঠুরতায় সারা মুখ তাদের বীভৎস হয়ে উঠেছে। পারলে তারা আমাকে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। মনে হলো যেন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন এই পাঁচ শয়তানের মধ্যে এসে মূর্তিলাভ করেছে।

"সঙ্গীদের বেশভূষার আভিজাত্য লক্ষ্য করে কনস্টেবলটি যেন একটু দোনমনা হয়ে পড়েছে মনে হলো। কে জানে, হয়তো বা সে আমাদের ছেড়েই দেবে। তাহলে তো সর্বনাশ। আমি আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করলাম না, বিকট-সুরে চেঁচিয়ে উঠলাম হঠাৎ, 'কোথায় বাবা সোনার চাঁদ', আর তারপরেই বিদ্যুদ্বেগে সামনে ছুটে গেলাম হঠাৎ, মাথা বাঁকিয়ে সেই কনস্টেবলটির পেটে এক নিদারুণ গুঁতো বসিয়ে দিলাম। ওঃ, ভেতরে ভেতরে লজ্জায় ক্ষোভে যেন আমার মাথা কাটা যেতে লাগলো; চান্সীর এক ধর্মযাজক আমি, আমার কিনা এই কান্ড! কিন্তু কি করবো বলুন, আমি তখন নিরুপায়। একমাত্র এই মাতলামির অভিনয়ই আমাকে বাঁচাতে পারে তখন।

"আর তা বাঁচালও। গুঁতো খেয়ে কনস্টেবলটি আমার টুঁটি টিপে ধরলো; বললো, 'নাঃ, কোনও মতেই আর একে ছেড়ে দেওয়া চলে না। হাজতেই নিয়ে যেতে হবে—।' আমি তো তা-ই চাই।

"ওদিকে আরেক গেরো। বিল্ হঠাৎ মেয়েলী সুরে অনুনয় সুরু করলো কনস্টেবলটির কাছে, 'দেখুন, এ নিয়ে আর ফ্যাসাদ বাধাবেন না। খুবই বড় ঘরের মেয়ে ইনি; মদটা অবশ্য একটু বেশীই খান—কিন্তু, বিশ্বাস করুন, আসলে ইনি খুবই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। এঁকে যদি এখন হাজতে নিয়ে যান তো জানাজানি হয়ে গেলে ঢি ঢি পড়ে যাবে চারদিকে; লজ্জায় আর এঁর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। হাতজোড় করে বলছি, দয়া করে এঁকে ছেড়ে দিন; আমরাই বরং এঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।'

"কনস্টেবলটি ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগলো, বললো, 'কি করে ছাড়ি? যেভাবে ইনি আমাকে গুঁতিয়ে দিয়েছেন তাতে আর এঁকে ছাড়া যায় না। ছাড়া পেলেই হয়তো আবার অন্য কাউকে গুঁতোতে আরম্ভ করবেন।'

"স্যাম বললো, 'কি জানেন, ও'র মাথায় একটু ছিট আছে। দয়া করে ওঁকে আপনি ছেড়ে দিন।'

"বিল্‌ও আবার তার অনুনয়-বিনয় আরম্ভ করলো, 'দয়া করে ওঁকে ছেড়ে দিন কনস্টেবল সাহেব; ওঁকে আমরা বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। তা ছাড়া ওর দেখাশোনা করবার জন্যেও একজন লোক দরকার—'

"কনস্টেবলটি বললো, 'নিশ্চয়ই দরকার; তা সে জন্যে আর ভাবনা কি, আমিই তো রইলাম—'

"বিল্ নাছোড়বান্দা। সে বললো, 'তা কি করে হয়? বন্ধুদের সঙ্গে থাকলেই উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, ওঁকে আপনি ছেড়ে দিন। তা ছাড়া বাড়ি গিয়ে ওঁকে ওষুধ খাওয়াতে হবে, সে ওষুধ একমাত্র আমাদের কাছেই আছে; দয়া করে ওঁকে ছেড়ে দিন।'

"মিস মোরেও বললেন, 'ঠিক কথা; অন্য ওষুধে কাজ হবে না। ছেড়ে দিন, ওঁকে আমরা বাড়ি নিয়ে যাই।'

"বুঝলাম, একবার যদি সুযোগ হারাই তো আমার রক্ষে নেই। আবার তাই মাতলামী আরম্ভ করলাম। জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলাম, 'কেন ঘাবড়াচ্ছো বাবা, বেশ তো রয়েছি; ট্রা লা লা লা লা—ওফ্।'

"কনস্টেবলটি আমার সঙ্গীদের ওপর তার লণ্ঠনের আলো ফেলে কঠিন গলায় বললো, 'না, ইনি বদ্ধমাতাল; ছেড়ে দেওয়া চলবে না। দেখুন, আপনাদের এই বন্ধুটির আচরণ অত্যন্তই আপত্তিজনক। তা ছাড়া যে সমস্ত অশ্লীল গান ইনি গাইছেন তাও আমার খুব ভালো ঠেকছে না। সত্যি বলতে কি, আপনাদের দেখেও আমার সন্দেহ হচ্ছে। কে আপনারা, সত্যি কথা বলুন—'

"মিস মোরে দেখলেন, সর্বনাশ; বেশীক্ষণ ঝুলোঝুলি করলে তাঁরাও শেষে প্যাঁচে পড়ে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠস্বরে সেই অপূর্ব আত্মমর্যাদার ভঙ্গীটিকে ফুটিয়ে তুলে তিনি বললেন, 'কে আমরা জিজ্ঞেস করছেন? আমরা ধর্মযাজিকা। সঙ্গে আমাদের পরিচয়পত্র নিয়ে আসিনি, নইলে আপনাকে দেখতে পারতাম। আর হ্যাঁ, মনে রাখবেন, মহিলাদের সম্মানরক্ষাই আপনার কাজ; অযথা তাঁদের অপমান করবার সামান্যতম অধিকারও আপনার নেই। আমাদের এই বন্ধুটিকে আপনি বাগে পেয়েছেন; বেশ, এঁকে আপনি হাজতে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদেরকেও যদি আপনি চোখ রাঙাতে আসেন তো পরিণামে আপনাকে পস্তাতে হবে। চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে আপনার, দয়া করে সেটা মনে রাখবেন।'

"মিস মোরের এই সুদৃঢ় উক্তি শুনে কনস্টেবলটি একটু বিমূঢ় হয়ে পড়লো। সেই সুযোগে আমার ছদ্মবেশী সঙ্গীরা একবার তাকালেন আমার দিকে। ক্রোধের আগুনে চোখ তাঁদের ধক্‌ধক্ করছে দেখলাম। পরমুহূর্তেই তাঁরা স্থানত্যাগ করলেন। জানতাম, শেষ পর্যন্ত তাঁরা সরে পড়বেন। কনস্টেবলটি যখন সন্দিগ্ধভাবে তাদের ওপর লণ্ঠনের আলো ফেলেছিলো তখনই তাদের মধ্যে একবার নীরব দৃষ্টি বিনিময় ঘটতে দেখি। সে দৃষ্টির অর্থ— এবার সরে পড়াই ভালো।" (ক্রমশ)

রূপময় ভারত

কন্যাকুমারিকা

আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল; তখন সে আপনার নদী-পর্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। তার তীর্থগুলি এমন করে বাঁধা হয়েছে,—দক্ষিণে কন্যাকুমারী, উত্তরে মানস সরোবর, পশ্চিম-সমুদ্রতীরে দ্বারকা পূর্ব সমুদ্রে গঙ্গা-সংগম,—যাতে করে তীর্থ-ভ্রমণের দ্বারা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রূপটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনের মধ্যে গভীর-ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু ভারত-বর্ষের ভূগোল জানা যেত তা নয়, তার নানা জাতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনিই হোত। সেদিন ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি প্রকৃত সত্য সাধনা ছিল বলেই তার আত্মপরিচয়ের পদ্ধতিও আপনিই এমন সত্য হয়ে উঠেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দর পরিব্রাজক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল দেশাত্মজ্ঞান। অর্থাৎ এই তীর্থ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে দেশের পরি-প্রেক্ষিতে নিজেকে চেনা ও জানা। এই তীর্থ পরিক্রমা তিনি সমাপ্ত করেছিলেন কন্যা-কুমারীর তীর্থ-সলিলে অবগাহন করে। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন—

"সম্মুখে অনিলান্দোলিত বীচি-বিক্ষোভিত উচ্ছ্বসিত সুনীল জলধি; পশ্চাতে মরু-গিরি-কান্তার পরিশোভিতা শস্য-শ্যামলা ভারতবর্ষ—আর তাহার সর্বশেষ প্রস্তরখানির উপর যোগাসনে সমাসীন নব্য ভারতের মন্ত্র-গুরু—পরিব্রাজকাচার্য বিবেকানন্দ! কি মহিমময় দৃশ্য! * *

কন্যাকুমারীর শ্রীমন্দির পার্শ্বে প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট যোগিবর ধ্যানস্থ হইলেন। মহা-পুরুষের তপোমার্জিত নির্মল পবিত্র চিত্ত-দর্পণে মাতৃভূমির অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ চিত্রসমূহ একে একে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। আশা-আনন্দ-উদ্বেগ-অমর্ষ-স্তম্ভিত হৃদয় বীর সন্ন্যাসীর ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে "বর্তমান ভারত" দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। "এই আমার ভারতবর্ষ—আমার প্রিয় মাতৃ-ভূমি!" ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল।"

সহস্র বৎসর পূর্বের নির্মিত এক মনোরম মন্দিরের অভ্যন্তরে রক্ষিত দেবী কন্যা-কুমারী মূর্তি। সমুদ্রোপকূলে দণ্ডায়মান নাতিবৃহৎ এই মন্দিরটি দশম শতাব্দীর দ্রবীড়ীয় স্থাপত্যশিল্পের এক পরমাশ্চর্য কীর্তি

কন্যাকুমারীর তীর্থক্ষেত্রে স্বামীজীর জীবনে যে আত্মোপলব্ধি ঘটেছিল সেকথা উল্লেখ করে এক পত্রে তিনি লিখেছেন—

"দাদা, এইসব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরার উপর বসে আমার মাথায় একটা নূতন পরিকল্পনা দেখা দিয়েছে। আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি লোককে Metaphysics শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না। গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে তার কারণ মূর্খতা; আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দুপা দিয়ে দলেছি।"

কন্যাকুমারীর তটভূমিস্থ নারিকেলকুঞ্জ সমুদ্রগর্ভোত্থিত প্রভাত-সূর্যকে অভিনন্দন জানাইতেছে

অস্তগামী সূর্যের সোনালী আভায় উদ্ভাসিত কন্যাকুমারীর সমুদ্র ও তটভূমির নয়ন মনোহর দৃশ্য

বিবেকানন্দ প্রস্তর—তটভূমি হইতে অদূরে পাশাপাশি দুইটি শিলাস্তূপ, যাহার উপরে বসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানের দ্বারা দেশাত্মবোধের সহিত দেশাত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছিলেন

মাতৃতীর্থ ও কন্যাকুমারী মন্দিরাভিমুখী পথ
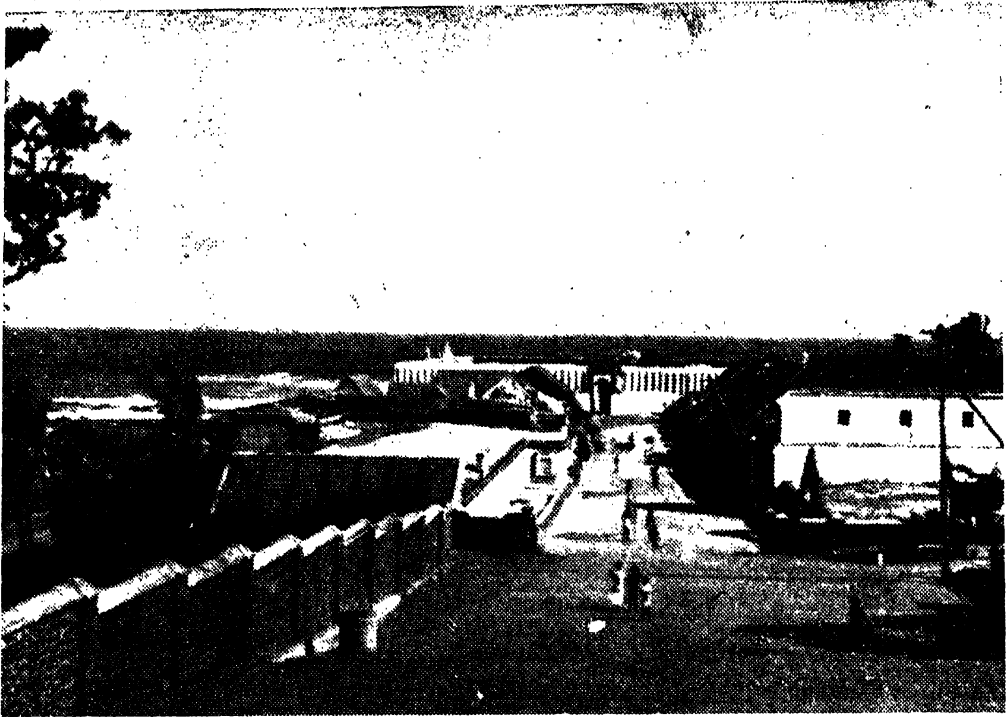
উপরে
তীর্থযাত্রীদের জন্য আধুনিক
বিলাসোপকরণ সংবলিত স্টেট হোটেল
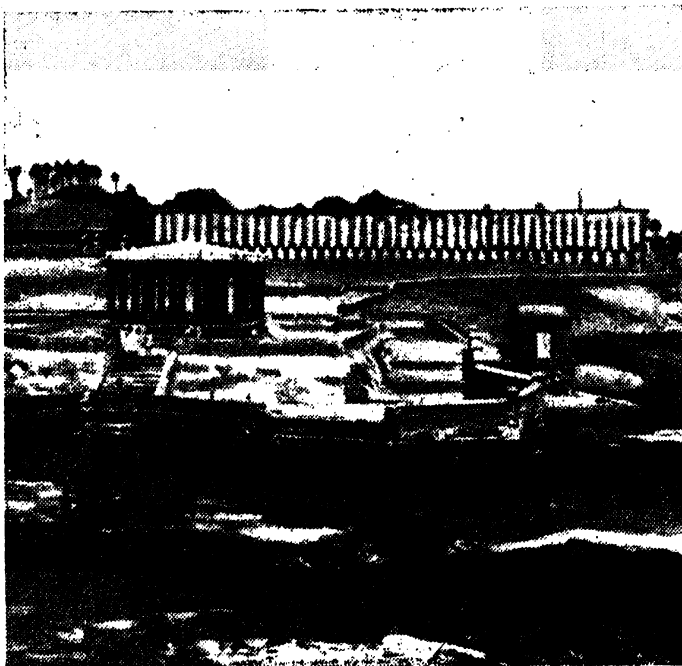
নীচে
মাতৃতীর্থে সমুদ্রতীরে স্নানার্থীদের জন্য
নির্মিত ঘাট

গড়ের মাঠে মরসুমী ফুটবল

রমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতার গড়ের মাঠে আবার এসেছে ফুটবল। এ এক মন মাতান, প্রাণ কাঁদান খেলা! ছেলে ছোকরা, যুবক যুবতী এদের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। এদের ত মাতবারই বয়স! উত্তেজনার রক্তকণিকা এদের শিরায় শিরায় বইছে; এদের অন্তরের আবেগ প্লাবনের নামান্তর। এদের মনের উপর প্রিয়দলের খেলায় হার জিতের প্রচণ্ড প্রভাব। এই হার জিৎ ধরে আনন্দ ও অবসাদ, দুই-ই আসে মনে দুকুল ছাপিয়ে, বন্যার স্রোতের মত। কিন্তু যাদের বয়স ভাঁটিয়ে এসেছে, যাদের মনের সোনা, জীবনের খাদে রং হারিয়েছে, যাদের অনুরাগে নেই আর কামনা, বাসনার তাড়না তাদেরও পুরাতন হৃদয় এই খেলার আগমনে আবার দুলে উঠে, ফুলে উঠে।

কলকাতার ফুটবলের যেমন একাল ও সেকাল আছে, অন্যান্য খেলায় তেমন আছে বলে মনে হয় না। প্রবীণদের মধ্যে এখনও অনেকেই রয়্যাল আইরিশ্ রাইফল্‌স্, গর্ডন হাইল্যান্ডার্স, শ্রফশায়ার, নর্দামবারল্যান্ড্ ফিউজিলিয়ার্স, ক্যালকাটা, ডালহাউসি প্রভৃতির নাম ফুটবলের অতীত গৌরবের কথা প্রসঙ্গে গর্বের সঙ্গে বলে থাকেন। অতীতের পরবর্তী এক অধ্যায়ে মোহনবাগান, ক্যালকাটা, ডারহামস্, শেরউড্ ফরেস্টার্স প্রভৃতি দল বয়োবৃদ্ধ খেলার অনুরাগীদের আসর জমায়। তারপর মধ্য যুগ সূচিত হল মহমেডান স্পোর্টিং দলের দিগন্ত প্রসারিত কীর্তি মহিমায়। এদেরই গৌরবের অধিকারী ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ধীরে ধীরে মধ্য যুগ শেষ করে আনল বর্তমানের মধ্যে।

এককালে প্রতিযোগিতার সান পড়ত সিভিল ও মিলিটারি দলের খেলায়। তারপর এল আর এক যুগ যখন কালা ধলার খেলার মধ্যে ছিল উত্তেজনার বিপুল উৎস। এরই শেষে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ ও অত্যুগ্র রেষারেষির পথেই ছিল ফুটবলের জ্বালাময়ী উন্মাদনা। একদিকে মুসলমান ও অন্যদিকে ভারতীয় বা হিন্দু দল। খেলার মাঠেই যেন জিন্না সাহেবের "টু নেশান থিওরি" বা দুই বিভিন্ন জাতের সংজ্ঞা স্পষ্ট ফুটে উঠছিল। ক্রমশ দেখা দিল, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভেদনীতিমূলক নামের অনর্থ—নামের সংঘর্ষ। প্রতিযোগিতার মাদকতা এতেই নেমে এল। এখনও সেই ইস্ট বেঙ্গল, সেই মোহনবাগান —সমবেতা যুযুৎসবঃ!

এককালে অনেকেই মনে করতেন ক্যালকাটা ও মোহনবাগান এই দুই দলের প্রবল আততায়ীতা না থাকলে কলকাতার ফুটবল শুকিয়ে উঠবে; তাঁরা ভাবতেন কালা-ধলার ক্রীড়া প্রাঙ্গণের রণতাণ্ডবের মধ্যেই ফুটবলের যা কিছু উন্মাদনা। পরবর্তীকালে তাঁরাই মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলেন ফুটবল জমবেই না যদি না প্রবল প্রতাপ মুসলমান দলের সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় হিন্দুদলের সংঘর্ষ না হয়। তারপর এল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের রেষারেষির যুগ। সে যুগের এখনও অবসান হয়নি। আজও ক্ষ্যাপার দল এই দুইটি শীর্ষস্থানীয় ক্লাব দুইটির জয়পরাজয়ে বাঁচে ও মরে।

উন্মাদনা ও উন্মত্ততা

অতীতের শেষভাগে উন্মাদনা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে উন্মত্ততায় গিয়ে দাঁড়াত তখন গ্যালারি পুড়ত; ঘোড়-সওয়ার পুলিশ ছুটত খেলার মাঠের অরাজকতা দমন করতে। একালে উন্মত্ততা বেশি করে দেখা দেয় খেলার মাঠে ঢিল, পাটকেল, সোডার বোতল ভাঙ্গা বর্ষণের মধ্যে। পুলিশ হাতজোড়ও করে, হুমকিও দেয়! একবার নাকি জনকয়েককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। একালে বাড়ার ভাগ কাঁদুনে গ্যাস।

সময়ের ফের ফারে আর কিছু হ'ক না হ'ক, লোকের মনে ভাল খেলা, রেষারেষির খেলা দেখবার ঝোঁকটা কিছুমাত্র কমেনি। উন্মাদনার আগুন হয়ত বা কিছু বেড়েছে। আবার বহু লোক খেলা দেখা ছেড়েও দিয়েছেন। বড় ক্লাবের মেম্বর না হলে কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে দহরম মহরম না থাকলে, ভাল খেলার টিকিট পাওয়া একরকম

ব্রেজিলে খেলোয়াড়দের হাফটাইমের সময় ভিটামিন পিল খাওয়ান হচ্ছে

অসম্ভব; কাজকর্ম বা সংসারের ঘানি; আত্ম-সম্ভ্রমের বালাই; ইট পাটকেল খাবার ভয়; টিয়ার গ্যাস প্রভৃতি কারণে তাঁরা মাঠ ছেড়েছেন। এখন ক্লাবের যুগ—অর্থাৎ বড় ক্লাবের। তাদেরই বাড়, বাড়ন্ত!

বড় হ'লে আরও বড় হবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। প্রতিযোগিতায় প্রধান হওয়া চাই—চাই প্রভাব, প্রতিপত্তি, খ্যাতি ও ক্ষমতার অপ্রতিহত আভিজাত্য। পর্দার পিছনে এই সবের তাড়নায় গড়ের মাঠের ফুটবল প্রাঙ্গণে বৃহত্তর বাঙলার সৃষ্টি হতে সুরু হ'ল। ভারতের নানা রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ, সর্বজাতি-সমন্বিত কলকাতা শহরের গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে, বাঙলার নিজস্ব খেলোয়াড় বনতে থাকলেন। হ'ল আইন রচনা, বাঙলার বাইরের খেলোয়াড় এখানে যেন বে-আইনী ভীড় জমাতে না পারে। কিন্তু হ'লে কি হয়, বাঙলার সীমান্তের বাহিরে খেলায় কারো যদি দুটো পা ভাল চলে, মাথা যদি দৈহিক ও মস্তিষ্কের দুরকম কাজেই পারদর্শিতা দেখায়, তাহ'লে কোন্ বাধা তাকে ঠেকিয়ে রাখবে?

কবির ছন্দোময়ী গানের যদি হাট বেছে নেবার স্বাধিকার থাকে; যেদিকে তার টান সেদিকে যদি তার যাত্রা স্বাভাবিক হয়; অসঙ্গত যদি না হয় ছেঁড়াছড়া এলোমেলোর মধ্যেই তার খেলা করতে চাওয়া কিংবা বিশ্ববাসীর ধ্বনির মাঝে যেতে তার সাধ; তাহ'লে, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম রাষ্ট্রের খেলার রসিকজন কলকাতার গড়ের মাঠে নিজেদের স্থান নির্বাচন করলে অবাক হবার কি আছে? এবারও দৈনিক পত্রিকার স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে নূতন নামের ছন্দ! এরা কারা এ প্রশ্ন বাড়ির বৈঠকখানায় করা চলতে পারে, খেলায় আসরে নয়। এরা নিপুণ খেলোয়াড় কিনা সেটাই হ'ল জিজ্ঞাস্য—যাচাইসাপেক্ষ! এরা প্রথম শ্রেণীর বড়, ছোট, মাঝারি দলে আইনের অনুমতিক্রমে এসেছে। এ যুগে এখানকার ফুটবলের এরাই অনেকখানি।

এ সবই হ'ল কালের পরিবর্তন। একালে কোন দলে যদি আর ভাদুড়ী দাদা-ভাইদের দেখা পাওয়া না যায়, যদি আর প্রফুল্ল বিশ্বাস, আশু বিশ্বাস, সুরপতি মুখুজ্জে, গোকুল মুখুজ্জে, রাধু কর্মকার, সুধীর চাটুজ্জে, ভূতি সুকুল, রাজেন সেনগুপ্ত, অভিলাষ ঘোষ, কানু রায় নাই দেখা যায়; নাই দেখা যায় গোষ্ঠ পাল, তুলসী দত্ত, ডাক্তার রবি দাস, ননী গোঁসাই, সামাদ, উমাপতি কুমার, রবি গাঙ্গুলী, মোনা দত্ত, ছোনে মজুমদার, সূর্য চক্রবর্তীর স্বগোত্রীয় খেলোয়াড়দের, তাতে অতীতের অনুরাগীজনের মত হা হুতাশ করে লাভ কি? বাঙলার বাহিরের অবাঙালী যখন কলকাতার মাঠে নিজেদের স্থান করে নিল; যখন রহিম, রহমৎ, রসিদ, নুরমহম্মদ, আব্দুল হামিদ, আকিল আমেদ, বাচ্ছি খাঁ, জুম্মা খাঁ, তাজ মহম্মদ, হাবুসি ওসমান বাঙলাকে দিলে নূতন গর্ব, নব নব খ্যাতি তখন আর দুঃখ কিসের? আর এখন যাঁরা প্রথম শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় দলগুলির শক্তি, সম্পদ ও গৌরবের আকর তাদের নিয়ে আমরা গর্ব করবই বা না কেন? তাঁদের মধ্যে হয়ত অনেকেই বলেন বটে কথাবার্তা অন্যদেশীয় চালে, কিন্তু কালের বিবর্তন ত মানতেই হবে। তাই অনন্যোপায়!

কালের প্রবাহ

এর থেকে সামনের কালে কি ঘটবে বলা শক্ত। কে বলতে পারে ব্রেজিল, বৃটেন, সুইডেন, ডেনমার্ক থেকে খেলোয়াড় গড়ের মাঠে এখানকার কোন দলের পক্ষে নিয়মিত খেলবে কি না। যদি খেলে, বাধা কি? আইন? ভাষার সৃষ্টি নাকি হয়েছিল মনের কথা ঢাকবার জন্য—আইন থাকলেই হয়ত আইনের ফাঁকও থাকবে! আসল কথা হচ্ছে চাহিদা—ইটালি চায়, স্পেন চায় যে কোন দেশ থেকে ভাল খেলোয়াড় নিজেদের দেশে টেনে আনা। এই নিয়ে এরা খরচাও করে প্রচুর। ফলে সুইডেন ও ডেনমার্কের ভাল খেলোয়াড় দেশে থাকছে না—ডেনমার্ক স্থির করেছে, বিশ্ব ফুটবল সঙ্ঘের নিকট আবেদন জানাবে যাতে তাঁরা এর প্রতিবিধান করে দেন। কে জানে এ দেশের ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ কখন খেলা সম্বল করে বিদেশে পাড়ি জমাবেন কিনা!

দেশময়, জগৎময় সব বিষয়েই যেন কালের দ্রুত পরিবর্তন চলেছে। সব কিছু 'ঠাওর' করা মুশকিল। এই বিবর্তনের পথে এদেশে এসেছে সুদূরের নামকরা দল; এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে; এসেছে চীন, ব্রহ্ম থেকে; এসেছে উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্তী দেশ সুইডেন্ থেকে। বিশ্বের ডাকে ভারতের নাম নিয়ে বাছাইকরা ফুটবল দল বাহিরের সফরে বেরিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, হংকং, ব্রহ্ম, লণ্ডন অলিম্পিকের আসরে।

কে দেবে এই দ্রুত রোজনামচার লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ? স্বাধীনতা পাবার পর অনিবার্য নিষ্ফলতার নিদারুণ চাপে ক্ষুব্ধ, অশান্ত এদেশ। সমাজদেহ দুর্নীতির ক্ষতে কদর্য, ক্লিষ্ট। চরিত্রের স্খলন, পতন সমাজের প্রায় সর্বস্তরেই অস্বাস্থ্যকর স্তূপ রচনা করছে। ফুটবলের খোলা মাঠ এ থেকে বাদ যাবে কেমন করে? এটা কিছু নবার্জিত স্বাধীনতার ব্যাধি নয়; এটা পরাধীনতার বিষময় ফল। তাই, ভাল মন্দ বিচার করবার এটা সময় নয়। শতাধিক স্খলন, পতন, দোষ, ত্রুটী, অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারত বিশ্ব সভায় তার যে স্বাতন্ত্র্য স্থান পেয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। অজানা অদৃষ্টের পথে আমরা চলেছি; যাত্রার দিক ও গতি নিয়ে তর্ক অবান্তর। আরব্ধ কাজের মূল্য নির্ধারণ করা শক্ত; তাই বর্তমান ও অতীতের তুলনা শুধু তর্কেই নিঃশেষিত হয়—মীমাংসায় নয়।

'শোচনীয়' পরাজয়!

খবরের কাগজের পাতা উল্টালে দেখা যাবে, প্রতি বৎসর বাঙলার ফুটবল খেলার মান যেন নেমেই যাচ্ছে; জয়, পরাজয়ের কথা বাদ দেওয়া যাক, উচ্চাঙ্গের খেলা কালে ভদ্রে কখনও দেখা যায়। "ভাল খেলিয়া শোচনীয় পরাজয়"—এ যেন অনিত্য সংসারে স্বভাবের নিত্য নৈমিত্তিক পরিণতি। বন্ধু মহলে ঠাট্টা করে বলেছি—'শোচনীয় পরাজয়ে আর মানাচ্ছে না; এবার শোচনীয় না বলে 'শোকনীয়' বল্লে অবস্থাটা ঠিকমত বুঝা যাবে—একটু নূতনত্বও হবে। 'সমস্যা-রাষ্ট্র'—ক্ষুদে, খণ্ডিত বাঙলার দুর্নাম ত আছে কত না! নয় আর একটু বাড়বে। সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য সংস্কৃততেই থাক; হিন্দি পরুক রাষ্ট্রভাষার মুকুট; শোচনীয় হোক 'শোকনীয়'—দিক বাঙলার স্বাতন্ত্র্য বাড়িয়ে।"

একদিকে নিজেদের মাঠে খেলার অবনতির এই নিত্য ঘোষণা, অথচ অন্যদিকে বিদেশী সমলোচকের মুখে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় ফুটবলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। এ যেন ঘরের বিড়াল বনে গিয়েই বনবিড়াল বনে গেল। লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলে এই ধরণের খেলায় এদের এই প্রথম অভিজ্ঞতা। এই দলে ছিলেন মহীশূরের ৪ জন ও বোম্বাই-এর একজন খেলোয়াড়,

বিদেশে খেলোয়াড়দের বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শুশ্রূষা করা হয়

বাকী সবাই বাঙলার। খালি পায়ে সাত জন মাঠে নেমেছিলেন। ইলফোর্ড মাঠে ফরাসী দলের বিরুদ্ধে খেলা। ফরাসী দল শেষ মুহূর্তে একটি গোল করে এবং তাতেই ২—১ গোলের মাত্রায় জয়ী হয়। ভারতীয় দল খেলায় দুইটি পেনালটী পায়; তা থেকে গোল করতে পারে না।

কিন্তু কি খেলা! এ যেন নরদানবের যুদ্ধ। সাগর পারের এই কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি, কৃশতনু লোকগুলো খালি পায়ে খেলতে এসে খেলার মাঠে অচিরেই ভবলীলা সাংগ করবে—এ কথা হয়তো দর্শকমণ্ডলীর অনেকেরই মনে হোয়েছিল। চোখের উপর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হবে এই ভেবে কারও মন হয়তো ভয়ে কণ্টকিত হোয়ে থাকবে। কিন্তু সে রকম কিছুই হোল না। ফরাসী দল এদের কোন মতেই এ'টে উঠতে পারছিল না; এদের লঘু পায়ে বল চালনা করবার অদ্ভুত ক্ষমতা, এ যেন সূক্ষ্ম মায়া-জাল।

ফুটবলে 'বডি-লাইন'

ফরাসীদল অনেকটা বিকল; ভারতীয় দল তাদের নাস্তানাবুদ করে তুলেছে। অগত্যা তারা ফুটবলে 'বডি-লাইন' সুরু করলে—মানুষটাকে বিকল করবার দিকে মন দিল। এই খেলায় ভারতীয় দল যেভাবে ফরাসী দলটিকে নাস্তানাবুদ করেছিল; যেভাবে গোল করবার সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করে-ছিল—তাতে তাদের হারবার কথা নয়। ইউরোপীয় যে কোন দল এরূপ অবস্থায় বহু গোলে জয়ী হত। গোলের সামনে পৌছে সট্ মারবার দায়িত্ব কেউ যেন নিতেই চায় না। দু দুটো পেনালটি থেকে একটা গোল হয় না। দায়িত্ব এড়িয়ে চলবার ঝোঁক বা গুরু দায়িত্বের চাপে, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব: এ যেন জাতীয় চরিত্রের পরিচায়ক!

ফুটবল খেলার বৃটিশ সমালোচক মিজেল তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন "ওদের খেলায় যেন দৈহিক সংযোগই নেই" "Play a sort of disembodied soccer")। তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন—"এরা যদি সুযোগ পেয়েই অব্যর্থ সন্ধানে গোলে প্রচণ্ডভাবে বল মারতে পারত, তাহলে এরা অনায়াসেই জয়ী হ'ত।"

আর একজন সমালোচক এই খেলা প্রসংগে লিখেছিলেন—ফরাসী দল খেলায় এমনই বিব্রত হয়ে পড়ল যে, তারা তৃতীয় ব্যাক মোতায়েন করেই ক্ষান্ত হোল না; মমুলী প্রথায় তারা বল ছেড়ে মানুষটিকে মারবার দিকেই ঝুকে পড়ল। এইভাবে প্রত্যেক তিন মিনিট অন্তর অবৈধ ধাক্কা মারার জন্য তারা দণ্ডিত হতে লাগল। ভারতীয় দল খেলার গোড়া থেকেই আক্রমণ সুরু করে। ঐরূপ অবস্থায় ইংরাজ অথবা সুইডিশ্ দল প্রথমার্ধেই তিন গাল চাপিয়ে দিত। ভারতীয় দল বেশীর ভাগ সময়েই গ্যালারীর মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করল গোলে স্তিমিত বেগে বল মেরে।

কোনরকমে যদি তারা এই দোষটা শুধরাতে পারে তাহলে যে কোন জাতীয় দল বিশেষ শক্তিশালী না হলে তাদের হারাতে পারবে না। তাদের খেলায় তারা এমনি একটা কারুশিল্পের উদ্ভব করতে পেরেছে যাতে পাশ্চাত্য খেলোয়াড়গণ ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে—তাদের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দৈহিক আয়তন ও শক্তির সুবিধা নিষ্ফল হয়েছে।

(....Their swiftness and thrust fulness, their dribbling and cross passes made the rough and ready body line tactics of the French appear futile so much so that they were forced to fall back upon the three-back defence formation and the expedient of charging the man instead of the ball. Every three minutes on the average there was a pull-up* for a foul charge. The The Indians were dominating right from the start. Had the English and Swedish teams been in their position they would certainly, have scored at least three goals in the first half but the Indians were so weak in shooting at the goal mouth that they disappointed 10,000 supporters time after time....They have evolved a technique which baffles the western player and makes his physical superiority appear futile).

আর একজন সমালোচক ইলফোর্ডে ভারতীয়দের খেলা দেখে মন্তব্য প্রকাশ করে-ছিলেন—"এই যদি ওদের খেলায় শক্তিমত্তার নমুনা হয় তা হলে আমাদের কাছে ওদের শেখবার কিছুই নেই—বরং ওদের কাছেই ফুটবলের সব কিছুর উত্তর আমাদের জেনে নেওয়া উচিত। If their display is a sample of their prowess they do not need our coaching. Rather we should ask them for the answers.)

নৈপুণ্য বিচার

সত্যি, খেলার নৈপুণ্যটা যে ঠিক কি, তা নিয়ে ক্রমান্বয়ে মত বদলাচ্ছে। এক সময় ছিল যখন খেলায় ক্ষিপ্রকারিতা, গতিবেগ-এর উপর ছিল প্রবল ঝোঁক। কিন্তু এখন তা আর নেই। এখন শুধু দৌড়—যত জোর সম্ভব দৌড়ের উপর আস্থা কমে গেছে। ক্রীড়াকৌশল, বুদ্ধিচালনা, বলের উপর আয়ত্ত, নির্ভুল, দৃঢ় সট—এই সব উচ্চাঙ্গের খেলায় চাইই। দ্রুতগতি কথাটা এখন

খেলোয়াড়ের চেয়ে বল চালনার উপর বেশি প্রযোজ্য। প্রায় পঁচিশ বছর হল, ইংলন্ডের ফুটবল খেলায় সেণ্টার হাফ্, তৃতীয় ব্যাকে পরিণত হয়েছে—ইন্‌সাইড্ ফরোয়ার্ড হয়েছে হাফব্যাকের সামিল। খেলার সমঝদার সমালোচকগণ এখন বলছেন এতে করে খেলাটা অনেকটা যান্ত্রিক ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেছে—খেলোয়াড় যেন কলের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে খেলায় বুদ্ধির প্রয়োগের বিশেষ অবকাশ নেই। ইউরোপের কোথাও আবার সেণ্টার হাফ্ অনেক সময় আক্রমণকারী ফরোয়ার্ডের সামিল। সুইজারল্যাণ্ডের রক্ষণভাগ সাজান হয় অনেকটা আক্রমণের সুবিধাকল্পে। জাতীয় এই পদ্ধতির নাম Riegel রাইজেল বা ঐরকম একটা কিছু হবে। গত বৎসর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ভিয়েনায় সুইস্ জাতীয় দলের একটা খেলায় রক্ষণভাগ সাজান হল "স্টপার," থার্ড ব্যাক" বা "ডবলিউ-এম" প্রণালী অনুযায়ী। প্রথমার্ধেই সুইস দল তিন গোলে পেছিয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় ম্যানেজার হুকুম দিলেন—"রাইজেল" চালাও। সুইস দল অনায়াসেই তিনটি গোল শোধ দিয়ে ম্যাচ ড্র করে।

একাল ও সেকালের ব্যবধান

সময়ের সঙ্গে ফুটবল খেলার চেহারাই যে কত বদলে গেছে তা মনে করলে বিস্মিত হতে হয়। এক সময় ছিল ইংলন্ডে ফ্ল্যানেলের ঢোলকা পাণ্টালুন খেলায় পরিধেয় বস্ত্র। খেলোয়াড়দের থাকত গালপাট্টা, গোঁফ। আর এখন পেশাদার একজন খেলোয়াড়ও নেই, যিনি দাড়ি, গোঁফ কামিয়ে, হাফ প্যাণ্ট পরিহিত হয়ে খেলেন না। একাল ও সেকালের প্রচুর ব্যবধান। পাঁচ বছর আগে ডরসেটের একটা ক্লাব বিলাতের ফুটবল কর্তৃপক্ষদের কাছে নালিশ জানিয়েছিল খেলার শেষে তাদের একজন খেলোয়াড়ের ঘাড়ে দাঁত বসান'র দাগ দেখা গেছে। এটা পুরাতনের জের, একালে চুঁইয়ে এসেছে।

খেলা এখন শুধুই গায়ের জোর নয়। এটা এখন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার। বর্তমান যুগে লড়াইএ যেমন ছক কেটে আক্রমণ, রক্ষণ, সবকিছু চালই ভেবেচিন্তে করতে হয়, ফুটবল খেলাতেও তাই। খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য, শারীরিক-স্বাচ্ছন্দ্য দেখবার ভার এখন বিশেষজ্ঞ ট্রেনারের উপর। ডাক্তারি ছাঁদের শাদা লম্বাঝুলে কোট পরে ট্রেনার এখন খেলোয়াড়দের প্রয়োজনমত 'আলট্রা ভাইওলেট' রশ্মি প্রয়োগ করে থাকেন। ব্রেজিলে খেলার প্রথমার্ধের শেষে খেলোয়াড়দের পিল ও অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া হয়।

এদেশের ফুটবল কর্তৃপক্ষগণ ভেবে দেখছেন, বুট পরে খেলা বাধ্যতামূলক করা হবে কিনা। এটা এখন একটি সাব-কমিটির বিচারাধীন। এবিষয়ে আদৌ কোন কিছু সিদ্ধান্ত হবে কিনা কে বলতে পারে? গোলের সম্মুখভাগে দুর্বল-চিত্ততাই এদেশের ফুটবল খেলার প্রধান অন্তরায় গোলে সজোরে, অব্যর্থসন্ধানে, ক্ষণমাত্র সময় নষ্ট না করে বল মারার ক্ষমতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভাব এখনও এদেশের খেলায় সাফল্য অর্জন করার পথে প্রধান বিঘ্ন। এইভাবেই হয় ভাল খেলিয়া শোচনীয় পরাজয়।

এদেশের ফুটবলের উন্নতিকল্পে সুচিন্তিত ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। আজও এই খেলাটি চলেছে নিজের খেয়ালে, অনেকটা চলেছে চলতি চাকার মত। ফুটবলের মরসুম আসে আবার চলে যায়। এককালে খেলা ছিল সখের ব্যাপার। রাজত্ব চালাতে এসে খেলার ভিতর দিয়ে যতটুকু সামাজিকতার সুখসুবিধা পাওয়া যায়, তার বেশী ইংরাজের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আজও কি সেই ব্যবস্থা চলবে?—যারা লক্ষ লক্ষ দর্শকের আনন্দের খোরাক জোগাবে; যারা কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য স্ফীত, অচল, অটুট করে রাখবে; বড়লোকদের ক্লাব করার সখ মেটাবে, তারা কি চিরকাল নিজের ও পরিবারস্থ সকলের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে? উঞ্ছবৃত্তি কি হবে তাদের পেশা? সম্মানের অধিকারী তারা হবে না? তাদের কষ্টার্জিত গৌরব হবে ক্লাবের, ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক, মালিক ও সদস্যদের? তারপর একদিন খেলা শেষ হয়ে গেলে তাদের হবে চিরদিনের বিসর্জন! এই অন্তঃসারহীন, কৃত্রিম আভিজাত্য সম্বল করে, এই হৃদয়হীন "বিসর্জনের" পথে এগিয়ে, জগৎ প্রতিযোগিতায় নমস্যের দলে আমরা কি আমাদের স্থান করে নিতে পারব?

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

সন্ধ্যা হল। শাঁখ বাজছে এদিকে-সেদিকে। গাছের মাথায় বসে মধুসূদনের ধাঁধা লেগে যায়, গ্রামের মাঝখানে রয়েছেন বুঝি! শঙ্খের আওয়াজ কি ভাবে আসছে, তা যে না জানেন এমন নয়। বাদাবনে রাতে নৌকো বাইতে নেই। এক এক জায়গায় পাঁচ-সাত-দশখানা নৌকো একত্র কূলে বেঁধেছে, সন্ধ্যাবেলা মাঝিরা গ্রাম-ঘরের রীতি রক্ষা করছে শাঁখ বাজিয়ে। দু-পাঁচ ক্রোশ দূরের আওয়াজও মনে হবে সামনের ঐ গাছগুলোর আড়াল থেকে আসছে। গাছের আড়ালে যেন ঘরবাড়ি—গৃহস্থ-বউরা শাঁখ বাজিয়ে গোলায় গোয়ালে তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। এই প্রায়-সমোচ্চ বনভূমি কোন গ্রামের বাগিচার গাছপালা যেন।

আরো অনেক কথা ভাবেন মধুসূদন। ভাবতে ভাবতে সম্বিত আচ্ছন্ন হয়ে আসে। তিমির-তন্দ্রিত গহন অরণ্য মানুষের সুখ-দুঃখবিমথিত জনপদ হয়ে উঠবে— যেমন ছিল এককালে। বনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার শতবিধ পরিচয়। পুরোনো দীঘি-জাঙাল, অট্টালিকা, নিমকির কারখানা, জাহাজ-ঘাটার ভগ্নাবশেষ, নানা জায়গার বিচিত্র অর্থপূর্ণ নাম........

কোথায় গেল সে সব! কেমন করে গেল? মধুসূদন বন্দুকটা আর এক ডালে ঝুলিয়ে নড়ে চড়ে পিছনে ঠেশ দিয়ে আরাম করে বসলেন। টিকে মাচার উপর আরও কিছু পাতা ভেঙে গদির মতো করে দিয়েছে। অনেক দূর অবধি নজর চলে। রাজাধিরাজ উঁচু সিংহাসনে বসে চতুর্দিকের প্রকৃতিপুঞ্জ নিরীক্ষণ করছেন, এমনি এক অবাস্তব অনুভূতি পেয়ে বসে মধুসূদনকে। চোখে যতদূর দেখা যায় দেখছেনই—কল্পনায় ভবিষ্যৎ দেখছেন। অতীতও দেখতে পাচ্ছেন যেন সুস্পষ্টভাবে।

সমৃদ্ধিবান জনপদ। নদীর কূলে কূলে বসতি। ঘাটে এসেছে মগেরা। গোড়ায় আসত ব্যাপার-বাণিজ্য করতে—কিন্তু কি-ই বা বয়ে নেওয়া যায় সদ্ভাবে বাণিজ্য করে? এখন দলে দলে পঙ্গপালের মতো এসে পড়ে। পর্তুগিজরাও আসে। প্রথমটা এসেছিল খৃষ্টের মহিমা প্রচার করতে, তারপর দেশটা চেনা-জানা হয়ে যেতে জাহাজের বহর সাজিয়ে আসে। কামান থাকে জাহাজে। গ্রামে আগুন দেয়। বুড়ো আর বাচ্চাগুলোকে ফেলে দেয় আগুনে। ধন-সম্পত্তি জাহাজ বোঝাই করে; শক্ত-সমর্থ মেয়ে-পুরুষগুলোও জাহাজে তুলে নিয়ে যায় সমুদ্রপারে বিদেশের বাজারে বিক্রির জন্য।.........

ভূমিকম্প। বাসুকি ক্ষিপ্ত হয়েছেন—পাপের পৃথিবী বইবেন না আর কাঁধে। শঙ্কান্বিত জলস্থল থর-থর কাঁপে। গাছ-গাছালি উপড়ে পড়ে, ঘর-দোর ভেঙে চুরমার হয়। হাম্বা-হাম্বা করে গোয়ালের গরু, দড়ি ছিঁড়ে ছুটোছুটি করে। বিপন্নের আর্তনাদে আকাশ ফেটে যায়। চড়-চড় শব্দে মাটি ফাটে—মুখব্যাদান করে বসুন্ধরা গিলে ফেলবে বুঝি সমস্ত! করাল সমুদ্রতরঙ্গ ছুটে এসে জলতলে চারিদিক নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। হাটখোলা, কামারশালা, সদাগর-বাড়ি, নন্দবালা-কুমুদবালার দোলমঞ্চ, জাহাজঘাটা—দেখতে দেখতে একগলা জল সর্বত্র।

আবার শতেক বছর ধরে পলি পড়ে পড়ে ভূমিলক্ষ্মী শ্যামানন উন্মোচন করছেন ধীরে ধীরে সমুদ্র-গুণ্ঠন সরিয়ে দিয়ে। জীব এসে বসতি করছে—প্রাচীন অট্টালিকার ইটের স্তূপে সাপ-বাঘ-বুনোশুয়োরের আস্তানা।

সেই সন্ধ্যা রাত্রে সমস্ত অরণ্যভূমি চকিতে যেন জনপদ হয়ে দাঁড়াল, মধুসূদন অতীত সমৃদ্ধি চোখের উপর দেখতে পান। রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি, মানুষ-জন......বিয়ে হচ্ছে, গ্রামবধূরা পাড়ায় পাড়ায় জল-সয়ে বেড়াচ্ছেন, ঢুলি-কাঁসিদার পিছনে চলেছে বাজাতে বাজাতে। নিঝুম চণ্ডীমণ্ডপে দাবা নিয়ে বসে দুই প্রবীণ, চাষীরা বাঁকে করে ধানের আঁটি দোলাতে দোলাতে বয়ে আনছে। নিশিরাত্রে চকচকে সড়কি হাতে গ্রাম পাহারা দিয়ে ফিরছে জোয়ান ছেলেরা........

ছায়াছবির মতো আবার সব বিলীন হয়ে গেল। মধুসূদন রায় উদ্ধত ঘাড় নেড়ে মনে মনে বলেন, আমি—আমি ফিরিয়ে আনব আবার। উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারেন না, খাড়া হয়ে দাঁড়াতে যান মাচার উপরে। কিন্তু উপরেও ডালপালা—মাথায় ঠোক্কর খেয়ে বসে পড়তে হয়। সহসা শঙ্কা জাগে, কতদিন বাঁচবেন আর তিনি!

উত্তরকালের মানুষ, তোমাদের উপর ভার দিয়ে যাচ্ছি—এই আমার দিব্যি দেওয়া রইল, বনের কবল থেকে ফিরিয়ে এনো আমাদের এই সুপ্রাচীন পিতৃ পিতামহের বাসভূমি।

টিকে ফিস্ফিসিয়ে বলে, হুজুর......

শিঙেল বলে সন্দ করি। তৈরি হন।

বহুদর্শী টিকের অনুমান মিথ্যা নয়। শিঙেল হরিণ চলে গেল ধীর-মন্থরভাবে। পাল্লার মধ্যে এসেছিল, তবু মধুসূদন তাক করলেন না। মন নেই এদিকে।

আর বাবুর হাতে বন্দুক থাকতে টিপের পক্ষেও দেওড় করা চলে না। রাগে দুঃখে তার নিজের বুকেই গুলী মারতে ইচ্ছে করে।

(১৩)

কেতুর অবহেলা নেই। তবু নৌকোর চেষ্টায় চারটে দিন কেটে গেল। অবশেষে জোগাড় হল এক বাছাড়ি-নৌকো। কি করে হল, ভদ্রজন তোমরা তা জিজ্ঞাসা কোরো না।

এলোকেশীকে বিকালবেলা খবর দিয়ে এসেছে। অনেক রাত্রি হল—এখনো আসে না কেন? বানতলার অন্ধকারে কেতুচরণ বোঠে হাতে অপেক্ষা করছে। জোলো হাওয়ায় শীত ধরে যায়। চারিদিক নিঃশব্দ—পাখনার ঝট-পটি শুধু এগাছে-ওগাছে পাখীর বাসায়। এলোকেশী হয়তো উপহাস করেছিল—তাই সত্যি ভেবে কেতুচরণ এত কাণ্ড করে নৌকো জুটিয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে দিগ্‌ব্যাপ্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝপসি-ঝপসি জঙ্গলে ভরা সেই এক মাঠের কথা। আর চার দিন আগেকার সেই বেহায়াপনা—বাপ-খুড়ো এবং

এক-উঠোন লোকের সামনে এলোকেশী তার হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজায় খিল দিয়েছিল। ভিতরে কিছু আছে—হাঁ, নিশ্চয় আছে—নইলে এত দুঃসাহস অমনি অমনি আসে না।

ঐ যে—আসছে এলোকেশী টিনের ক্যাশ-বাক্স হাতে। চিরদিনের জন্য যাচ্ছে তাহলে ঠিক। লঘু পায়ে এসে সে নৌকোর উপর উঠল। মাটিতে পা ঠেকিয়ে নয়—বাতাসে ভেসে এলো যেন। নইলে এত নিঃসাড়ে কি করে আসে?

ফিসফিস করে এলোকেশী বলে, যা ভয় করছিল—

ডাকাত মেয়ে, ভয় আছে নাকি তোমার? কেতুর ঠোঁটের আগায় কথাগুলো এসেছিল, কিন্তু মুখে সে কিছু বলল না।

এলোকেশী কৈফিয়তের ভাবে বলে, কাজ-কর্ম সেরেসুরে সবাই শুয়ে পড়লে তবে আসতে হল কিনা! তাই এত রাত। কতক্ষণ এসেছ?

বাজে কথা না বাড়িয়ে কেতু জলের উপর সাবধানে বোঠের টান দিল। তাড়াতাড়ি বার-কয়েক বেয়ে মাঝ-গাঙে টানের মুখে এনে ফেলল। নৌকা তীরবেগে ছুটেছে।

কি ভাবছিল এলোকেশী অন্যমনা হয়ে। হঠাৎ চমক ভেঙে উঠল।

কদ্দুর এলাম—

তা এসেছি মন্দ কি! মর্জালের মুখ ঐ সামনে।

আরে সর্বনাশ! উড়িয়ে নিয়ে এসেছ। অনেকটা পথ এসে পড়েছি।

কেতু পরম পুলকে বলল, কেউ আর নাগাল পাচ্ছে না। আমারও ভয় ছিল, কোথায় কোন চেনা-মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

ফিরতে হবে যে—

কেতু সবিস্ময়ে বলে, কেন—কি হল?

একটা কাজ বাকি আছে। সেটা না হলে কোনখানে গিয়ে সোয়াস্তি পাব না।

বোঠে তুলে কেতু উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। এলোকেশী বলে, দুর্লভকে অমনি-অমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না। এত শত্রুতা সাধল, তার কিছু হওয়া চাই—

তাতে পরমোৎসাহ কেতুরও। এলোকেশীর ইচ্ছাক্রমে দুর্লভের শাস্তিবিধান—এলো-কেশীর ঘরে বসে যে দুর্লভের হাসাহাসি ও পান খাওয়া দেখেছে। এর চেয়ে করণীয় কাজ কি থাকতে পারে আর কেতুর?

এলোকেশী প্রশ্ন করে, কি করা যায় বলো দিকি?

করা তো কত-কিছুই যেতে পারে। নাক-কান কেটে বোঁচা করে নিতে পারি। কানা করে দেওয়া যায়—খানিক ন্যাড়াসেজির আঠা চোখে দিয়ে মণির ওখানটা আঙুলে ঘুলিয়ে দিলে হল। ব্যস, দুনিয়া অন্ধকার।

চিন্তিতভাবে পুনশ্চ বলে, মুশকিল হল রায়গাঁ সদরে গেছে সে হারামজাদা। অনেক-দূর। তা-ও হত—কিন্তু বিষম উজোন কাটিয়ে যেতে হবে। পাশখালির ভিতর লা ঢুকবে কিনা—তাও বলা যাচ্ছে না।

যেতে হবে—। এলোকেশী জেদ ধরল, বুঝলে—না নিয়ে গেলে হবে না। ভয় নেই, তোমার কিছু করতে হবে না। আমায় পেঁছে দাও—যা করতে হয় আমি একাই করব।

ভয়? যেন ভয় পেয়েই কেতু এগুতে চাচ্ছে না—এই কথা এলোকেশী ইঙ্গিতে বলল। পথ যত কষ্টের হোক, এর পরে কোনমতে আর দ্বিধা করা চলে না।

নৌকোর মুখ ঘুরাল। প্রাণপণে বাইছে। গায়ে ঘাম বেরিয়ে গেল, কিন্তু পথ এগিয়েছে সামান্যই। এক জায়গায় নৌকো ধরে কেতুচরণ সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

গেল কোথায়? আশ্চর্য তো—কিছুই না বলে ছুটে বেরুল। এলোকেশী উদ্বিগ্ন হল—একা-একা কি করবে ভেবে পায় না। তবে যেখানে ফিরে এসেছে, জায়গাটা মৌভোগ থেকে দূরবর্তী নয়। গামছায় বাঁধা পুঁটুলিটা নৌকোর খোলে এলোকেশীর ক্যাশবাক্সের উপর রেখে দিয়েছে। এই পুঁটুলি নিয়ে কেতুচরণ এলোকেশীদের বাড়ি উঠেছিল—তার যথাসর্বস্ব এর ভিতর। যথাসর্বস্বের ওজন—কেতু আর এলোকেশী দুজনের মিলে—সের আড়েক হবে বড় জোর। যথাসর্বস্ব সঙ্গে নিয়েই তারা মৌভোগ ছাড়ল।

ফিরে এসে কেতুচরণ কাড়ালে বসে আবার বোঠে ধরেছে। এলোকেশী বলে, গিয়েছিলে কোথা?

বজ্জাত মানুষ তো—শুধু হাতে দুর্লভের কাছে যাওয়া ঠিক হয় না। তা পেয়েছি—একটা হেঁসো-দা জোগাড় করে আনলাম।

মধুসূদন রায়ের জঙ্গল-কাটা লোকজন কাছাকাছি কোথায় ছিল—হেঁসোখানা সেখান থেকে জুটিয়েছে।

অনেকক্ষণ কাটল। মুখ বেঁকিয়ে কেতু বলে, আর হয় না। বিষম বেগোন। লা মোটে নড়ছে না—ঠাহর পাচ্ছ?

তবে?

হালে বসতে পারো তো বলো। আমি তা হলে আর একটা বোঠে ধরি। দুই বোঠেয় কিছু কাজ হবে।

দেখি চেষ্টা করে—

নৌকো ঘুরে যায় না যেন। খবরদার! বিপদ হবে তা হলে।

বাঁক দুই গিয়ে পাশখালির মুখ। উল্টো-পাল্টা ঢেউ কাটিয়ে এলোকেশী অবলীলাক্রমে নৌকো খালের মধ্যে নিয়ে তুলল।

বিস্ময়ে কেতুচরণের চোখে পলক পড়ে না।

বাঃ রে বাঃ—পাকা মাঝি যে তুমি!

এলোকেশী হেসে বলে, কিন্তু দাঁড়ি তুমি মোটেই ভাল নও। নৌকো এগোয় কই?

এগোবে—এই দেখ, সাঁ-সাঁ করে চলবে এইবার—

ঝপ্‌পাস করে কেতুচরণ খালে লাফিয়ে পড়ল। ঠেলছে নৌকা। গায়ের সমস্ত শক্তিতে জীবন পণ করে ঠেলছে। রায়গাঁ পৌঁছুতে কতক্ষণই বা লাগিবে এত কষ্ট করলে? দুর্লভের হাঙ্গামাটুকু চুকিয়ে তারপর ভেসে পড়বে সে আর এলোকেশী। ঐ যেমন পুঁটলি ও ক্যাশবাক্স একত্র আছে অমনি জীবন-ভোর একত্র থাকবে দুজনে। জলজঙ্গল ছেড়ে উত্তরের ডাঙা অঞ্চলে হয়তো বা শান্তিনগরে গিয়ে ঘর বাঁধবে।

গাঙের অনতিদূরে রায়বাড়ি। ফটকের লাগোয়া গোলপাতার চৌরিঘর—আমলা-গোমস্তরা সেখানে থাকে। দুর্লভও নিশ্চয় সেই ঘরে এসে উঠেছে। কেতু কিন্তু গাঙের ঘাটে নয়—খাঁড়ির মধ্যে নৌকো নিয়ে এল। জায়গাটা চৌরিঘরের একেবারে কানাচে বললেই হয়। আর কোন নৌকো নেই। কাজ সেরে এখান থেকে খাঁড়ির অপর মুখে সোজা বড় গাঙে পড়বে, তুড়ুক সওয়ারের মতো তীব্র স্রোতে দুলতে দুলতে চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

পোহাতি তারা উঠে গেছে, রাত আর বেশি নেই। পাড়ে লাগতে না লাগতে এলোকেশী লাফিয়ে পড়ে, তার মোটে সবুর সইছে না। কেতু বলে, নৌকো বেঁধে আমিও যাচ্ছি। রোসো একলা যেও না, একলা যাওয়া ঠিক নয়।

তার হাত নিশপিশ করছে দুর্লভের চোখ ঘুলিয়ে দেওয়া অন্ততপক্ষে হেঁসোর পোঁচে নাক-কান কাটার জন।

এলোকেশী বলে, আসছি এক্ষুণি। এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

অর্থাৎ সে খবরাখবর নিতে গেল—ঘরে আছে কিনা দুর্লভ, কোথায় ঘুমুচ্ছে, বাইরের লোক কেউ সেখানে আছে কিম্বা নেই।

অসংকোচে চলে গেল—যেন বাড়িটার অন্ধি-সন্ধি তার নখদর্পণে, হামেশাই আসা-যাওয়া আছে এখানে। একা যাওয়া এক হিসাবে অবশ্য ভালই হয়েছে। কেতুচরণের সংগে থাকলে দুর্লভের সন্দেহ হতে পারত। তবু কেতু বার বার ভাবছে, ডাং-পিঠে মেয়ে একখানা বটে—বাপরে বাপ!

গেল তো গেল—ফিরবার নাম নেই। ঘর তো ঐ—খোঁজ-খবর নিয়ে আসতে কতটুকু সময় লাগে? রাতের মধ্যেই অঞ্চল ছেড়ে সরে পড়বার মতলব—কিন্তু সে আর ঘটে ওঠে কই? দুর্লভ যদি ঘুমিয়ে থাকে, সেই তো সবচেয়ে ভালো—নিঃশব্দে সাফাই হাতে কাজ সেরে ফেলবে।...হাঁসকল তুলে বা অপর কোন কৌশলে দরজা খুলে ফেলে শয্যার পাশে দাঁড়াল, হাত বুলিয়ে নাক-চোখ-কানের অবস্থানও অনুভব করে নিয়েছে, ধারালো যন্ত্রটা তারপর আঁধারে একটু ঝিকমিকিয়ে উঠল...ওরে বাবা রে!...ধুপধাপ দৌড়ানোর শব্দ—আততায়ী কোনদিকে যে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেল, কিছুমাত্র আর নিশানা নেই। প্রতিবেশীরা এসে জিজ্ঞাসা করে, কি গো, কি হয়েছে হালদার মশাই? মুখে দরদের কথা বলতে বলতেও মুখ টিপে হাসে সকলে। দুর্লভ হালদার তার পর থেকে খোনা-খোনা কথা বলে, লোকের সামনে নাক-কান ঢেকে বেড়ায়—

ভাবতে গিয়ে কেতুচরণ একাই খল-খল করে হাসে। কিন্তু এলোকেশীর হল কি বলো তো? মেয়েটাকে ওভাবে একলা যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি।

কেতুর সকল উৎসাহ হিম হয়ে আসছে। দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে মনে হচ্ছে, হাত-পাগুলো পর্যন্ত জমে অসাড় হয়ে গেল—চলে ফিরে বেড়াতে পারবে না সে আর।

পদশব্দে সচকিত হল। দুর্লভ আর এলোকেশী দুজনে—দুর্লভের হাতে লণ্ঠন। সাংঘাতিক মেয়ে সত্যিই—ঘরে বোধ করি বেশি লোকজন, ভুলিয়ে তাই খাল-ধারে এনেছে। ঘুম থেকে ডেকে তুলে ভুজুং-ভাজাং দিয়ে আনতে দেরি হয়ে গেল। চুপি-সারে কাজটা হবে না, কেতুচরণকে চিনে ফেলল। তা বলে উপায় কি? ক্ষতিও নেই, আর তারা এ তল্লাটে ফিরছে না। বরঞ্চ এ ভালই হল—ইচ্ছে থাকলেও সে বা এলোকেশী কেউ ফিরে আসতে পারবে না।

অনুমানে হাত বুলিয়ে কেতু পিছনের হেঁসো-দা'র বাঁট মুঠো করে ধরল। ঠিক আছে। এলোকেশীর ইসারার অপেক্ষা।

দুর্লভ বলছিল, এলে তা একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে। থাকো না আরও খানিক—কি হয়েছে? জানাজানি হল তো বয়ে গেল—একদিন তো হোতই। মধুবাবুর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি— কোন শালার আর পরোয়া করিনে। নৌকো কে বেয়ে নিয়ে এল—এই, কে রে তুই?

কেতুর দিকে চেয়ে বলে, এত তাড়া কিসের রে? এখনো বিস্তর গোন আছে। থাক না বসে। কে তুই, মুখ ফেরা দিকি—

কেতুচরণ মুখ ফেরায় না—ভালমন্দ জবাবও দেয় না কিছু। সে কি দুর্লভের ভিটে বাড়ির প্রজা যে পরম বশম্বদ হয়ে হুকুম তামিল করবে?

এলোকেশী পরিচয় দিয়ে দিল, আমাদের কেতুচরণ গো—

তারপর দরদভরা কণ্ঠে বলে, ভারি কষ্ট করে নিয়ে এসেছে। কেতু না থাকলে চলে আসা মুশকিল হত। মন গুমরে কেঁদে কেঁদে মরছি এ কদিন—জোর করে এসে পড়ে আজকে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করে বলে, তুমি কিন্তু কখনো যেতে না—হুঁ—বাদাবনের ঘোরিবাবু এখন—বয়ে গেছে আমাদের মতন খেঁদি-পেঁচির খোঁজ-খবর নিতে।

কেতুচরণ চমকে তাকাল তাদের দিকে। তাই তো রে! চলনে বলনে আনন্দের লহর খেলে যাচ্ছে। লণ্ঠনের আলোয় দেখল, এলোকেশী দু-চোখে অশ্রুর দাগ। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি ও মন বোঝাবুঝি চলছিল। আর মশার ঝাঁক এদিকে কেতুর গায়ের অর্ধেক রক্ত শুষে নিয়েছে।

লণ্ঠনটা তুলে ধরে দুর্লভ সহসা উচ্চ হাসি হেসে ওঠে।

দেখ, চেয়ে দেখ, কি মূর্তি হয়েছে হতভাগার!...কাদামাটি পায়ে মেখে অমনি-ভাবে এতক্ষণ রয়েছিস—হ্যাঁরে কেতু, মানুষ না জন্তু তুই?

মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা অবধি লোনা কাদা লেপটে রয়েছে। অদ্ভুত চেহারা। এলোকেশীও হাততালি দিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল।

এলোকেশী হাসছে—যার জন্য রাত্রির অন্ধকারে কুমীর-কামটের ভয় অগ্রাহ্য করে নৌকো ঠেলে নিয়ে এসেছে। অবিশ্রান্ত হাসি হেসে গড়িয়ে পড়ছে দুর্লভের গায়ের উপর। দুর্লভও হাসছে। ফুল-কোঁচা দেওয়া ধুতি দুর্লভের পরনে, চোখে চশমা। রাতে অমনি কোঁচানো ধুতি পরে শোয়—না এরই মধ্যে বদলে এসেছে? রাত্রিশেষে লণ্ঠনের ম্লান আলোয় পাশাপাশি ওদের মানিয়েছেও চমৎকার।

কলকণ্ঠে এলোকেশী বলে, আয়না থাকলে দেখতে পেতে, ও কেতুচরণ, ডোরা-কাটা চিতে বাঘের মতো হয়ে গেছ।

কেতুচরণ বোঠে দিয়ে পাড়ের মাটিতে আঘাত করল।

তুমি তো ফিরছ না এখন এলোকেশী, আমি চললাম। না বলে নৌকো নিয়ে এসেছি, সেইখানে আবার বেঁধে আসতে হবে।

একটু গিয়ে নৌকোর খোলে নজর পড়ল। চিৎকার করে বলে, নিয়ে নাও তোমার জিনিস—

এলোকেশী কি বলছিল—কোন কথা কেতুচরণের কানে পৌঁছল না। ক্যাশবাক্স ছুড়ে দিল খাঁড়ির মাঝখান থেকে। বাক্স খুলে গিয়ে জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ল।

স্রোতের সংগে নৌকো ভেসে চলেছে, বাওয়ার প্রয়োজন নেই। কুয়াসাচ্ছন্ন ঊষায় নিশ্চল প্রেতমূর্তির মতো কেতুচরণ বোঠে ধরে চুপচাপ বসে রয়েছে।

(ক্রমশ)

নারায়ণ চৌধুরী

পঁচিশে বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনে অতি পবিত্র দিন। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে এবার কলকাতায় এবং তার আশে-পাশে যে রকম ব্যাপক সমারোহের সঙ্গে উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো তাতে আশান্বিত হবার কারণ আছে। প্রথমত, উৎসব-আয়োজনের ব্যাপ্তিতে বোঝাচ্ছে এই কথা যে, আমাদের মধ্যে রবীন্দ্র-চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বভাবতঃ বিমর্ষতাবাদীদের মধ্যে কাউকে কাউকে মন্তব্য করতে শুনেছি, রবীন্দ্র-প্রভাব আমাদের মধ্য থেকে ক্রমশঃ অপসৃত হচ্ছে; কবির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নাকি আমরা ভুলে যেতে বসেছি। কিন্তু একথা যে কতো বড়ো সত্যের অপলাপ সেটা এবারকার সর্বাত্মক, সর্বব্যাপী রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানে বিনিঃশেষে প্রমাণিত হল। কেউ কেউ বলতে পারেন, আমাদের সকল রকম অনুষ্ঠানে যেমন, এখানেও তেমনি, অনুষ্ঠান-কর্তাদের ভিতর আন্তরিকতার চাইতে হুজুগের ভাবটাই অধিক বলবৎ। রবীন্দ্র-স্মৃতি আসলে উপলক্ষ; এই সুযোগে কিছু হৈচৈ-গণ্ড-গোল দ্বারা আসর মাৎ করতে চাওয়াটাই হলো আসল কথা।

বাঙালীর চিরাভ্যস্ত হুজুকপ্রিয়তার নজীর মনে রাখলে প্রথম প্রথম এই রকমই মনে হতে পারে বটে, কিন্তু সকল ব্যাপার দেখে-শুনে আর একথা মেনে নিতে ইচ্ছা করে না। রবীন্দ্র-স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের উপলক্ষে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে; অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে সর্বত্র যে উৎসাহ-উদ্দীপনার ভাব লক্ষ্য করেছি, অপরের কথা বলতে পারব না, তাকে হুজুগপ্রিয়তা বলে উড়িয়ে দেবার সাধ্য আমার অন্ততঃ নেই।

আরও একটি কারণে আশান্বিত হওয়া গেছে। কারণটি বলি। 'রবীন্দ্র-চেতনা' কথাটি অনুধাবনীয়। নিতান্ত জ্ঞানতঃ কথাটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের ভাবাদর্শ ও তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার শিক্ষা আমরা নিজ জীবনে কে কি পরিমাণ প্রয়োগ করতে চাই সে সম্পর্কে তর্কের অবকাশ থাকতে পারে এবং আছে, কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, রবীন্দ্র-নাথের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্পর্কে কেউ আর আমরা উদাসীন থাকতে পারছি না। আমাদের জাতীয় শিল্পসাহিত্যসংস্কৃতি-জীবনের উপর রবীন্দ্র-প্রভাব যে সবচাইতে সক্রিয়, গূঢ়, দূরপ্রসারী, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সেকথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। পশ্চিমের ভেসে-আসা আধুনিক ভাবাবর্তের মধ্যে পড়ে কেউ কেউ এমন কথা ভেবেছিলেন, বর্তমান কালের জীবন-দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্র-দর্শনের মিল সামান্য, পার্থক্য বিস্তর। সেই কারণে আধুনিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী মানুষের জীবনযাত্রার উপর রবীন্দ্র-প্রভাব স্থায়ী হবার সম্ভাবনা অল্প। তাঁরা সচকিত হয়ে দেখছেন, রবীন্দ্রনাথই এখন পর্যন্ত আমাদের সবচাইতে বড়ো নির্ভর, বড়ো আশ্রয়, বড়ো ভরসার স্থল। আধুনিক বা অনাধুনিক যে যে-রকম মানুষই হোন না কেন, শিল্প সংস্কৃতি যিনি ভালবাসেন, বাঙলা দেশের বর্তমান আবহাওয়ায় রবীন্দ্র-নাথের আশ্রয় ছাড়া তাঁর বাঁচবার পথ নেই। এককথায় বাঙলার শিল্প-সংস্কৃতির জগতে রবীন্দ্রনাথ সব চাইতে বড়ো রিয়ালিটি। এই রিয়ালিটি থেকে যতোই কেন না আমরা দূরে সরে যাবার চেষ্টা করি, ঘুরে-ফিরে আবার তাঁরই আশ্রয়ে আমাদের আসতে হয়। কেননা, রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিল্পসংস্কৃতির একেবারে কেন্দ্রমধ্যে অধিষ্ঠিত, আধুনিক-তার বড়াই নিয়ে আমরা বৃত্তের পরিধি সম্প্রসারিত করতে পারি, কিন্তু কেন্দ্রের টান অস্বীকার করব কেমন করে।

রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের রিয়ালিটি সম্পর্কে এই যে চেতনা এইটেকেই আমি বর্তমান প্রবন্ধে 'রবীন্দ্র-চেতনা' বলেছি। আর এই চেতনা ক্রমশঃ আমাদের মন অধিকার করে নিচ্ছে রবীন্দ্র-জন্মতিথি অনুষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাই তার প্রমাণ।

তৃতীয়ত, এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-গুলির মধ্য দিয়ে এ কথাই আবার নূতন করে প্রমাণ হলো যে, বাঙালীর প্রাণ শত বিপর্যয়েও মরেনি। গত দশ-এগারো বৎসরে কতো দুর্দৈব আমাদের মাথার উপর দিয়ে গেল, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই, কিন্তু কোন কিছুতেই আমাদের প্রাণশক্তিকে পিষে মারতে পারেনি। শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহ প্রাণপ্রাচুর্যের একটা প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণ আমাদের সাম্প্রতিক কার্যাবলীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অভিব্যক্ত হয়েছে। সেটা মস্ত বড়ো আশার কথা। তৈলতণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন-চিন্তা মানুষের জীবনের প্রধানতম চিন্তা বটে, কিন্তু সে চিন্তা যখন আর সবকিছু চিন্তা-কল্পনাকে গ্রাস করে, মানুষের পক্ষে তার চাইতে বিপত্তিকর আর কিছু হতে পারে না। এই অবস্থায় জাতির জীবন থেকে শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার সুকুমার কলার অন্তর্ধান ঘটে; খবরের কাগজ এসে সাহিত্যের স্থান জুড়ে বসে। অবকাশ ঘুচে গিয়ে মানুষের জীবন তখন একটা নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়। বাঙালীর জীবন এই অবাঞ্ছিত পরিণাম দ্বারা কবলিত হবার সমস্ত বাহ্য লক্ষণই বর্তমান, তা সত্ত্বেও তার জীবনের এই পরিণাম দেখা দেয়নি। শিল্পনিষ্ঠা তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। সঙ্গীত ও সাহিত্য-প্রীতি বাঙালীর সহজাত; আর রবীন্দ্র-প্রতিভা এই প্রীতিকে গভীরভাবে উচ্ছ্রিত করেছে। এই জোরেই আজ পর্যন্ত আমরা বেঁচে আছি, একথা বললে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হয় না।

কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, এই যে পল্লীতে পল্লীতে, ক্লাবে ক্লাবে রবীন্দ্র-জন্মতিথির অনুষ্ঠান হচ্ছে তাতে আমাদের উদাম বড়ো বিভক্ত বড়ো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই উদ্যমগুলিকে যদি একত্র সংহত করে দুটি কি তিনটি কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের আকার দেওয়া যেত, তাতে অনেক বেশি লাভ হত।

একথা মেনে নিতে পারা যায় না। কবি-গুরুর অমর প্রতিভা স্মরণ করে চারিদিকে এই যে স্মৃতি ও প্রীতি অনুষ্ঠানের ছড়া-

অসংকোচে চলে গেল—যেন বাড়িটার অন্ধি-সন্ধি তার নখদর্পণে, হামেশাই আসা-যাওয়া আছে এখানে। একা যাওয়া এক হিসাবে অবশ্য ভালই হয়েছে। কেতুচরণের সঙ্গে থাকলে দুর্লভের সন্দেহ হতে পারত। তবু কেতু বার বার ভাবছে, ডাং-পিঠে মেয়ে একখানা বটে—বাপরে বাপ!

গেল তো গেল—ফিরবার নাম নেই। ঘর তো ঐ—খোঁজ-খবর নিয়ে আসতে কতটুকু সময় লাগে? রাতের মধ্যেই অঞ্চল ছেড়ে সরে পড়বার মতলব—কিন্তু সে আর ঘটে ওঠে কই? দুর্লভ যদি ঘুমিয়ে থাকে, সেই তো সবচেয়ে ভালো—নিঃশব্দে সাফাই হাতে কাজ সেরে ফেলবে।...হাঁসকল তুলে বা অপর কোন কৌশলে দরজা খুলে ফেলে শয্যার পাশে দাঁড়াল, হাত বুলিয়ে নাক-চোখ-কানের অবস্থানও অনুভব করে নিয়েছে, ধারালো যন্ত্রটা তারপর আঁধারে একটু ঝিকমিকিয়ে উঠল...ওরে বাবা রে!...ধুপধাপ দৌড়ানোর শব্দ—আততায়ী কোনদিকে যে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেল, কিছুমাত্র আর নিশানা নেই। প্রতিবেশীরা এসে জিজ্ঞাসা করে, কি গো, কি হয়েছে হালদার মশাই? মুখে দরদের কথা বলতে বলতেও মুখ টিপে হাসে সকলে। দুর্লভ হালদার তার পর থেকে খোনা-খোনা কথা বলে, লোকের সামনে নাক-কান ঢেকে বেড়ায়—

ভাবতে গিয়ে কেতুচরণ একাই খল-খল করে হাসে। কিন্তু এলোকেশীর হল কি বলো তো? মেয়েটাকে ওভাবে একলা যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি।

কেতুর সকল উৎসাহ হিম হয়ে আসছে। দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে মনে হচ্ছে, হাত-পাগুলো পর্যন্ত জমে অসাড় হয়ে গেল—চলে ফিরে বেড়াতে পারবে না সে আর।

পদশব্দে সচকিত হল। দুর্লভ আর এলোকেশী দুজনে—দুর্লভের হাতে লণ্ঠন। সাংঘাতিক মেয়ে সত্যিই—ঘরে বোধ করি বেশি লোকজন, ভুলিয়ে তাই খাল-ধারে এনেছে। ঘুম থেকে ডেকে তুলে ভুজুং-ভাজাং দিয়ে আনতে দেরি হয়ে গেল। চুপিসারে কাজটা হবে না, কেতুচরণকে চিনে ফেলল। তা বলে উপায় কি? ক্ষতিও নেই, আর তারা এ তল্লাটে ফিরছে না। বরঞ্চ এ ভালই হল—ইচ্ছে থাকলেও সে বা এলোকেশী কেউ ফিরে আসতে পারবে না।

অনুমানে হাত বুলিয়ে কেতু পিছনের হেঁসো-দা'র বাঁট মুঠো করে ধরল। ঠিক আছে। এলোকেশীর ইসারার অপেক্ষা।

দুর্লভ বলছিল, এলে তা একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে। থাকো না আরও খানিক—কি হয়েছে? জানাজানি হল তো বয়ে গেল—একদিন তো হোতই। মধুবাবুর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি— কোন শালার আর পরোয়া করিনে। নৌকো কে বেয়ে নিয়ে এল—এই, কে রে তুই?

কেতুর দিকে চেয়ে বলে, এত তাড়া কিসের রে? এখনো বিস্তর গোন আছে। থাক না বসে। কে তুই, মুখ ফেরা দিকি—

কেতুচরণ মুখ ফেরায় না—ভালমন্দ জবাবও দেয় না কিছু। সে কি দুর্লভের ভিটে বাড়ির প্রজা যে পরম বশম্বদ হয়ে হুকুম তামিল করবে?

এলোকেশী পরিচয় দিয়ে দিল, আমাদের কেতুচরণ গো—

তারপর দরদভরা কণ্ঠে বলে, ভারি কষ্ট করে নিয়ে এসেছে। কেতু না থাকলে চলে আসা মুশকিল হত। মন গুমরে কেঁদে কেঁদে মরছি এ ক'দিন—জোর করে এসে পড়ে আজকে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করে বলে, তুমি কিন্তু কখনো যেতে না—হুঁ—বাদাবনের ঘোরিবাবু এখন—বয়ে গেছে আমাদের মতন খেঁদি-পেঁচির খোঁজ-খবর নিতে।

কেতুচরণ চমকে তাকাল তাদের দিকে। তাই তো রে! চলনে বলনে আনন্দের লহর খেলে যাচ্ছে। লণ্ঠনের আলোয় দেখল, এলোকেশী দু-চোখে অশ্রুর দাগ। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি ও মন বোঝাবুঝি চলছিল। আর মশার ঝাঁক এদিকে কেতুর গায়ের অর্ধেক রক্ত শুষে নিয়েছে।

লণ্ঠনটা তুলে ধরে দুর্লভ সহসা উচ্চ হাসি হেসে ওঠে।

দেখ, চেয়ে দেখ, কি মূর্তি হয়েছে হতভাগার!...কাদামাটি পায়ে মেখে অমনি-ভাবে এতক্ষণ রয়েছিস—হ্যাঁরে কেতু, মানুষ না জন্তু তুই?

মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা অবধি লোনা কাদা লেপটে রয়েছে। অদ্ভুত চেহারা। এলোকেশীও হাততালি দিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল।

এলোকেশী হাসছে—যার জন্য রাত্রির অন্ধকারে কুমীর-কামটের ভয় অগ্রাহ্য করে নৌকো ঠেলে নিয়ে এসেছে। অবিশ্রান্ত হাসি হেসে গড়িয়ে পড়ছে দুর্লভের গায়ের উপর। দুর্লভও হাসছে। ফুল-কোঁচা দেওয়া ধুতি দুর্লভের পরনে, চোখে চশমা। রাতে অমনি কোঁচানো ধুতি পরে শোয়—না এরই মধ্যে বদলে এসেছে? রাত্রিশেষে লণ্ঠনের ম্লান আলোয় পাশাপাশি ওদের মানিয়েছেও চমৎকার।

কলকণ্ঠে এলোকেশী বলে, আয়না থাকলে দেখতে পেতে, ও কেতুচরণ, ডোরা-কাটা চিতে বাঘের মতো হয়ে গেছ।

কেতুচরণ বোঠে দিয়ে পাড়ের মাটিতে আঘাত করল।

তুমি তো ফিরছ না এখন এলোকেশী, আমি চললাম। না বলে নৌকো নিয়ে এসেছি, সেইখানে আবার বেঁধে আসতে হবে।

একটু গিয়ে নৌকোর খোলে নজর পড়ল। চিৎকার করে বলে, নিয়ে না তোমার জিনিস—

এলোকেশী কি বলছিল—কোন ক[illegible] কেতুচরণের কানে পৌঁছল না। ক্যাশবা[illegible] ছুড়ে দিল খাঁড়ির মাঝখান থেকে। বাক্স খু[illegible] গিয়ে জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ল।

স্রোতের সঙ্গে নৌকো ভেসে চলেছে[illegible] বাওয়ার প্রয়োজন নেই। কুয়াসাচ্ছ[illegible] ঊষায় নিশ্চল প্রেতমূর্তির মতো কেতুচর[illegible] বোঠে ধরে চুপচাপ বসে রয়েছে।

(ক্রমশঃ

এবারের রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে

নারায়ণ চৌধুরী

পঁচিশে বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনে অতি পবিত্র দিন। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে এবার কলকাতায় এবং তার আশে-পাশে যে রকম ব্যাপক সমারোহের সঙ্গে উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো তাতে আশান্বিত হবার কারণ আছে। প্রথমত, উৎসব-আয়োজনের ব্যাপ্তিতে বোঝাচ্ছে এই কথা যে, আমাদের মধ্যে রবীন্দ্র-চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বভাবতঃ বিমর্ষতাবাদীদের মধ্যে কাউকে কাউকে মন্তব্য করতে শুনেছি, রবীন্দ্র-প্রভাব আমাদের মধ্য থেকে ক্রমশঃ অপসৃত হচ্ছে; কবির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নাকি আমরা ভুলে যেতে বসেছি। কিন্তু একথা যে কতো বড়ো সত্যের অপলাপ সেটা এবারকার সর্বাত্মক, সর্বব্যাপী রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানে বিনিঃশেষে প্রমাণিত হল। কেউ কেউ বলতে পারেন, আমাদের সকল রকম অনুষ্ঠানে যেমন, এখানেও তেমনি, অনুষ্ঠান-কর্তাদের ভিতর আন্তরিকতার চাইতে হুজুগের ভাবটাই অধিক বলবৎ। রবীন্দ্র-স্মৃতি আসলে উপলক্ষ; এই সুযোগে কিছু হৈচৈ-গণ্ডগোল দ্বারা আসর মাৎ করতে চাওয়াটাই হলো আসল কথা।

বাঙালীর চিরাভ্যস্ত হুজুকপ্রিয়তার নজীর মনে রাখলে প্রথম প্রথম এই রকমই মনে হতে পারে বটে, কিন্তু সকল ব্যাপার দেখে-শুনে আর একথা মেনে নিতে ইচ্ছা করে না। রবীন্দ্র-স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের উপলক্ষে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে; অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে সর্বত্র যে উৎসাহ-উদ্দীপনার ভাব লক্ষ্য করেছি, অপরের কথা বলতে পারব না, তাকে হুজুগপ্রিয়তা বলে উড়িয়ে দেবার সাধ্য আমার অন্ততঃ নেই।

আরও একটি কারণে আশান্বিত হওয়া গেছে। কারণটি বলি। 'রবীন্দ্র-চেতনা' কথাটি অনুধাবনীয়। নিতান্ত জ্ঞানতঃ সেটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ ও তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার শিক্ষা আমরা নিজ জীবনে কে কি পরিমাণ প্রয়োগ করতে চাই সে সম্পর্কে তর্কের অবকাশ থাকতে পারে এবং আছে, কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্পর্কে কেউ আর আমরা উদাসীন থাকতে পারছি না। আমাদের জাতীয় শিল্পসাহিত্যসংস্কৃতি-জীবনের উপর রবীন্দ্র-প্রভাব যে সবচাইতে সক্রিয়, গূঢ়, দূরপ্রসারী, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সেকথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। পশ্চিমের ভেসে-আসা আধুনিক ভাবাবর্তের মধ্যে পড়ে কেউ কেউ এমন কথা ভেবেছিলেন, বর্তমান কালের জীবন-দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্র-দর্শনের মিল সামান্য, পার্থক্য বিস্তর। সেই কারণে আধুনিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী মানুষের জীবনযাত্রার উপর রবীন্দ্র-প্রভাব স্থায়ী হবার সম্ভাবনা অল্প। তাঁরা সচকিত হয়ে দেখছেন, রবীন্দ্রনাথই এখন পর্যন্ত আমাদের সবচাইতে বড়ো নির্ভর, বড়ো আশ্রয়, বড়ো ভরসার স্থল। আধুনিক বা অনাধুনিক যে যে-রকম মানুষই হোন না কেন, শিল্প সংস্কৃতি যিনি ভালবাসেন, বাঙলা দেশের বর্তমান আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় ছাড়া তাঁর বাঁচবার পথ নেই। এককথায় বাঙলার শিল্প-সংস্কৃতির জগতে রবীন্দ্রনাথ সব চাইতে বড়ো রিয়ালিটি। এই রিয়ালিটি থেকে যতোই কেন না আমরা দূরে সরে যাবার চেষ্টা করি, ঘুরে-ফিরে আবার তাঁরই আশ্রয়ে আমাদের আসতে হয়। কেননা, রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিল্পসংস্কৃতির একেবারে কেন্দ্রমধ্যে অধিষ্ঠিত, আধুনিকতার বড়াই নিয়ে আমরা বৃত্তের পরিধি সম্প্রসারিত করতে পারি, কিন্তু কেন্দ্রের টান অস্বীকার করব কেমন করে।

রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের রিয়ালিটি সম্পর্কে এই যে চেতনা এইটেকেই আমি বর্তমান প্রবন্ধে 'রবীন্দ্র-চেতনা' বলেছি। আর এই চেতনা ক্রমশঃ আমাদের মন অধিকার করে নিচ্ছে রবীন্দ্র-জন্মতিথি অনুষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাই তার প্রমাণ।

তৃতীয়ত, এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে এ কথাই আবার নূতন করে প্রমাণ হলো যে, বাঙালীর প্রাণ শত বিপর্যয়েও মরেনি। গত দশ-এগারো বৎসরে কতো দুর্দৈব আমাদের মাথার উপর দিয়ে গেল, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই, কিন্তু কোন কিছুতেই আমাদের প্রাণশক্তিকে পিষে মারতে পারেনি। শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহ প্রাণপ্রাচুর্যের একটা প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণ আমাদের সাম্প্রতিক কার্যাবলীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অভিব্যক্ত হয়েছে। সেটা মস্ত বড়ো আশার কথা। তৈলতণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন-চিন্তা মানুষের জীবনের প্রধানতম চিন্তা বটে, কিন্তু সে চিন্তা যখন আর সবকিছু চিন্তা-কল্পনাকে গ্রাস করে, মানুষের পক্ষে তার চাইতে বিপত্তিকর আর কিছু হতে পারে না। এই অবস্থায় জাতির জীবন থেকে শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার সুকুমার কলার অন্তর্ধান ঘটে; খবরের কাগজ এসে সাহিত্যের স্থান জুড়ে বসে। অবকাশ ঘুচে গিয়ে মানুষের জীবন তখন একটা নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়। বাঙালীর জীবন এই অবাঞ্ছিত পরিণাম দ্বারা কবলিত হবার সমস্ত বাহ্য লক্ষণই বর্তমান, তা সত্ত্বেও তার জীবনের এই পরিণাম দেখা দেয়নি। শিল্পনিষ্ঠা তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। সঙ্গীত ও সাহিত্য-প্রীতি বাঙালীর সহজাত; আর রবীন্দ্র-প্রতিভা এই প্রীতিকে গভীরভাবে উচ্চকিত করেছে। এই জোরেই আজ পর্যন্ত আমরা বেঁচে আছি, একথা বললে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হয় না।

কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, এই যে পল্লীতে পল্লীতে, ক্লাবে ক্লাবে রবীন্দ্র-জন্মতিথির অনুষ্ঠান হচ্ছে তাতে আমাদের উদ্যম বড়ো বিভক্ত বড়ো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই উদ্যমগুলিকে যদি একত্র সংহত করে দুটি কি তিনটি কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের আকার দেওয়া যেত, তাতে অনেক বেশি লাভ হত।

একথা মেনে নিতে পারা যায় না। কবিগুরুর অমর প্রতিভা স্মরণ করে চারিদিকে এই যে স্মৃতি ও প্রীতি অনুষ্ঠানের ছড়া-

ছড়ি দেখতে পাচ্ছি তাতে বোঝাচ্ছে এই কথা যে, জনমনে রবীন্দ্র-প্রভাবের ক্রমপ্রসার ঘট্‌ছে। এটা তো খুশি হওয়ার মতো একটা কথা, এতে আশঙ্কার কি আছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদের ব্যবহার ও ভোগ যতো বেশি-সংখ্যক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে ততোই তার সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের একলার বস্তু নয়, কাজেই তাঁকে কৃত্রিম-রচিত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন অর্থনীতির ক্ষেত্রে, তেমনি সাহিত্যেও, 'মনোপলি' জিনিসটা ভালো নয়। বহুর অকল্যাণের কারণ এতে ঘটে। সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি মানব-মনের অতি সূক্ষ্ম-সুকুমার ভাবের প্রকাশক কলা কেবলমাত্র মার্জিত মনেরই অধিগম্য বটে, কিন্তু কল্পিত আভিজাত্যের গর্বে তাদের মুষ্টিমেয় মানুষের উপভোগের সামগ্রী করে তুললে তাদের খণ্ডিত করা হয়। শিক্ষার দোষে অথবা অভাবে সাহিত্যের উচ্চভাব সকলের পক্ষে গ্রহণীয় হয় না, কিন্তু যাতে সেটা বহু মানুষের গ্রহণযোগ্য হতে পারে সেইদিকেই আমাদের সকলের লক্ষ্য থাকা উচিত। জনতার স্থূল সান্নিধ্যে কলুষস্পৃষ্ট হয়ে সাহিত্য শুচিতাভ্রষ্ট হতে পারে এই আশঙ্কা যাঁরা করেন তাঁরা আভিজাত্যাভিমানী হতে পারেন, সাহিত্যের সত্যিকার কল্যাণকামী নন। সকল মহৎ সাহিত্যের লক্ষণই এই যে তা জনমনের দ্বারা গ্রাহ্য। দেশের অগণিত জনসাধারণ যতোক্ষণ পর্যন্ত না সাহিত্য-ভাবকে স্বকীয় করে নেয় তত-দিন সাহিত্য তার অশেষ গুণপনা সত্ত্বেও অংশতঃ ব্যর্থ হয়েই থাকে। রবীন্দ্র-কীর্তির চূড়ান্ত সার্থকতা তখনই মাত্র মিলতে পারে যখন তা সমগ্র জনমনের ভোগ্য হবে। রবীন্দ্র-ভাবের যতো বেশি প্রচার ও প্রসার ঘটে ততোই জাতির কল্যাণ। কৌলীন্য-প্রীতির মোহে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সমাজের উঁচুতলার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান তাঁরা বাহ্যত রবীন্দ্র-স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে চাইলেও প্রকারান্তরে তাঁর পবিত্র নামের অবমাননা করছেন একথা না বলে পারছি না।

২

ভরসার কথা এই যে, প্রাণের জিনিসকে খুব বেশি দিন কৌলীন্যের বেড়া দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। রবীন্দ্র-সংগীতের দিকে চাইলেই একথার বড়ো প্রমাণ মিলবে। আজ রবীন্দ্র-সংগীত সমগ্র জাতির সম্পত্তিতে পরিণত হতে চলেছে। হাটে-মাঠে-বাটে সকলের মুখে মুখে রবীন্দ্র-সংগীতের কলি শুনতে পাওয়া যায়। কবির জীবদ্দশায় রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচার ছিল, কিন্তু তার আবেদন এত ব্যাপক ছিল না। কবির তিরোধানের পর পুরো দশ বৎসরও অতিক্রান্ত হয়নি, এরই মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীত যে রকম দ্রুত গতিতে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। রবীন্দ্র-সংগীতের নির্বিচার প্রচার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে আজ যদি কেউ এই অনুশাসন খাড়া করেন যে, রবীন্দ্র-সংগীত কেবলমাত্র ফ্যাশনেবল্‌ মহলের ড্রইং-রুমে গাওয়া চলবে, আর কোথাও নয়, তাঁর সে নির্দেশের মর্যাদা রক্ষিত হবে বলে মনে হয় না। তথাকথিত অভিজাত মহলের গণ্ডী রবীন্দ্র-সংগীত অনেককাল কাটিয়ে উঠেছে; তাকে আর পুরনো গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। দেশের অগণিত জনমানুষের মধ্যে এখন তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে, আর সুখের বিষয়, সেইদিকেই রবীন্দ্র-সংগীতের মোড় ফিরছে। কবি বলে গেছেন, বাঙলার নিভৃততম পল্লীর দীনতম কৃষকের মুখে যখন তাঁর গানের সুর আপনা থেকে ভেসে উঠবে তখনই তাঁর গান যথার্থ সার্থকতা-মণ্ডিত হবে। এ কাঙ্ক্ষিত অবস্থা অবশ্য এখনও আসেনি, তবে যে রকম দ্রুত তালে সমস্ত কৃত্রিম অনুশাসন-বন্ধন ছেদন করে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রসার ঘটছে তাতে করে ওই অবস্থায় পৌঁছতে খুব বেশি বিলম্ব হবে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্র-সংগীতের মুক্তি মানে জাতির অন্তরে কপাটবদ্ধ আনন্দ-নির্ঝরের মুক্তি। সে মুক্তির দিন সমাগত, এটা পরম আশ্বাসের কথা।

৩

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একনবতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে এবার কলকাতায় ও তার আশেপাশে যতগুলি অনুষ্ঠান হয়েছে তার সবকটিতেই মুখ্য সূচী ছিল সংগীত —রবীন্দ্র-সংগীত। রবীন্দ্রানুষ্ঠানে সংগীতের প্রাধান্য থাকা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু মনে হয় এবারকার অনুষ্ঠানগুলিতে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৈশিষ্ট্য যেন কিছু বিশেষভাবেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। অনু-ষ্ঠানগুলিতে সুরের একটানা স্রোত বয়ে চলেছিল বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না।

প্রথমেই মহর্ষিভবনের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের কথা ধরা যাক। খোদ বিশ্ব-ভারতী কর্তৃক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠানে কবির এই ক'টি গান গীত হয়ঃ (১) জয় তব বিচিত্র আনন্দ—সমবেত গান; (২) অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে—অমলা সরকার; (৩) জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়—শান্তিদেব ঘোষ; (৪) সকল কলুষ তামস হর—সমবেত; (৫) হে চির নূতন আজি এ দিনের প্রথম গানে—সুচিত্রা মিত্র; (৬) হে নূতন দেখা দিক আরবার—সমবেত; (৭) তোমার আসন শূন্য আজি—ঝর্ণা হাজরা; এবং (৮) হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী—সুচিত্রা মিত্র। প্রত্যেকটি গান সুগীত হয়। সংগীত পরিচালনা করেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

অনুষ্ঠানে মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। জাতির জীবনে পঁচিশে বৈশাখ তারিখটির তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গিতে এক সুন্দর ভাষণ দেন। বেদ উপনিষদ প্রভৃতি থেকে উপলক্ষোচিত উদ্ধৃতি ভাষণের মাধুর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। আচার্য ক্ষিতিমোহন বলেন যে আজ পৃথিবী এক গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। এই সংকটে সে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের দ্বন্দ্ব, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সংঘাত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ, ধর্মীয় বিরোধ প্রভৃতি মিলে পৃথিবীকে দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল করে তুলেছে। এই সর্বব্যাপী অপ্রেম, অনৈক্য আর অসাম্যের আবহাওয়ার মধ্যে কবির বিশ্বপ্রেমের বাণী মানুষের একমাত্র নির্ভরের স্থল। কবির প্রেমময় বাণী সমস্ত অশুভের নিরসন করুক, সকল মানুষের জীবনে কবির ভাবাদর্শ মূর্ত হয়ে উঠুক। কবির বিচিত্র সৃষ্টির অন্তরালে যে প্রাণ-দায়িনী সংগীত নিহিত রয়েছে তার দ্বারা পৃথিবীর মানুষ সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক।

অনুষ্ঠানের সজ্জা ও অলঙ্করণ পবিত্র তিথির উপযোগী ভাবের কারক হয়েছিল

এই উপলক্ষে যে বেদিকা নির্মাণ করা হয় তা আলিম্পন-সজ্জায় বিশেষ মনোহর রূপ ধারণ করে। বেদীর সম্মুখে মঙ্গলঘট, পার্শ্বে শঙ্খ, পশ্চাতে দেদীপ্যমান ১০৮টি মাটির প্রদীপের আলোয় চারদিকে স্পষ্টতই, একটা পূত-পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়। তবে সজ্জা যে একেবারে নিখুঁত হয়েছিল এমন কথা বলা চলে না। সজ্জোপকরণের মধ্যে ময়ূরপুচ্ছের বাহুল্য না ঘটালেই বোধ করি ভালো হতো। পবিত্র তিথির গাম্ভীর্যকে তা' পীড়িত করেছে এমন অভিযোগ কেউ কেউ করেছেন।

নিখিল ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি কমিটির উদ্যোগে প্রতি বৎসর কলিকাতাবাসীর পক্ষ থেকে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে যে প্রতিনিধিত্বমূলক জনসভার আয়োজন করা হয় এবার সেটি অনুষ্ঠিত হয় সুভাষ-চন্দ্রের পুণ্য-স্মৃতি-বিজড়িত মহাজাতি সদনে—২৫শে বৈশাখের অপরাহ্নে। অন্যান্য বৎসর সিনেট হাউসে এই সভার অনুষ্ঠান হতো। বর্তমান বৎসরের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও জননেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। শ্রীযুত গুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেন, কেবলমাত্র রাজনীতির মধ্যেই আমাদের আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। দেশকে সর্বতোভাবে বিরাট ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে হবে। সর্বদাই যদি আমাদের দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কালযাপন করতে হয়, কবির দেশবাসী নামে পরিচিত হওয়ার যোগ্যতা আমরা হারাবো। জাতিকে কি করে বড়ো করে তুলতে হয় কবিগুরুর মহান ঐতিহ্যের বাহক হিসাবে সে পথ আমাদেরই দেখাতে হবে।

সভাপতি বাদে সভায় আর যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের ভিতর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীঈশ্বরদাস জালানের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই অনুষ্ঠানেও সংগীতের প্রচুর ব্যবস্থা হয়েছিল। সংগীত পরিবেশণের ভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদারের অধিনায়কত্বে সুপরিচিত সংগীত-প্রতিষ্ঠান গীতবিতান। প্রথমে সমবেত কণ্ঠে বেদগান করা হয়, তারপর কবির নিম্নলিখিত গানগুলি গীত হয়ঃ (১) জয় তব বিচিত্র আনন্দ—সমবেত; (২) হে নূতন দেখা দিক আরবার—গীত সেন (নাহা); (৩) যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি—সমবেত; (৪) সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে—সুচিত্রা মিত্র; (৫) যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন—শান্তিদেব ঘোষ; (৭) যে আমি ঐ ভেসে চলে—সমবেত; (৮) এই তো ভালো লেগেছিল—সাবিত্রী নাহা ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র; (৯) আবার যদি ইচ্ছা কর —চিত্রা মজুমদার এবং সর্বশেষে (১০) জনগণমন অধিনায়ক—সমবেত।

সভায় কবিগুরুর রচনা থেকে পাঠ ও আবৃত্তিরও ব্যবস্থা ছিল। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবোধকুমার সান্ন্যাল। ডক্টর সরোজকুমার দাস কবির রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করে শোনান।

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে এবার মহাজাতি সদনে আটদিন-ব্যাপী যে উৎসবের আয়োজন হয়, কলকাতায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের ইতিহাসে তা নানা-কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোচনা, আলোচনায় ও সংগীতানুষ্ঠানে শহরের বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠীর সমাবেশ, উচ্চ শ্রেণীর বক্তাদের দ্বারা বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা, সংগীতের ভূরি আয়োজন—যেদিক থেকেই ধরা যাক না কেন, নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগ উচ্চ প্রশংসা লাভের যোগ্য। এতো বড়ো একটা বিরাট আয়োজন যাঁরা করেছেন, তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীসুহৃৎ রুদ্র ও শ্রীপরিমল চন্দ্র সকলেরই আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

২৫শে বৈশাখ প্রাতঃকালে একটি উপলক্ষোচিত সুন্দর অনুষ্ঠান দ্বারা অষ্টাহব্যাপী রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের সূচনা হয়। এই উপলক্ষে মহাজাতি সদনের অভ্যন্তরভাগ অতি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅতুল গুপ্ত। মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। শ্রীসুবিনয় রায় ও শ্রীমতী কণিকা-দেবীর দ্বৈত কণ্ঠে গীত বৈদিক স্তোত্র মঙ্গলাচরণের উপযুক্ত পশ্চাদভূমি রচনা করে।

সভাপতির ভাষণে শ্রীঅতুল গুপ্ত চৈতন্য-চরিতামৃতের উল্লেখ করে বলেন, কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের চরিত্রকে আকাশের বিরাটত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রও ছিল এই রকম আকাশের মতো বিরাট-ব্যাপ্ত। এই বিরাটত্বের যথার্থ উপলব্ধি একমাত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগীদের দ্বারাই সম্ভব।

বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে সংগীতের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীসমরেশ চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়। পরে কণিকাদেবী ও ইলা মিত্র কয়েকটি একক সংগীত দ্বারা শ্রোতৃ-বর্গের তৃপ্তিবিধান করেন।

২৬শে বৈশাখ সান্ধ্য অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় 'রবীন্দ্রনাথ ও আমরা' এ বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘরোয়া ভঙ্গীতে একটি সুন্দর ভাষণ দেন। অন্নদা-শঙ্কর বাবুর বলবার কথা ছিল, এই যে, সাহিত্যিকদের মধ্যে আমরা, যাঁরা রবীন্দ্র-নাথের পরবর্তী কালে জন্মেছি, তাঁদের উপর বিশেষ গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য বহন করলেই শুধু আমাদের হবে না, সেই ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যকে আমাদের স্বকৃত চেষ্টায় বৃদ্ধিও করতে হবে। অন্নদাশঙ্করবাবু দুঃখ করে বলেন, আমরা রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার ভোগ করছি মাত্র, তাতে নিজেরা কিছু যোগ করছি না। রবীন্দ্রনাথের যোগ্য মানস-সন্তান হতে-হলে আমাদেরকে তাঁর উত্তরাধিকার বাড়াতে হবে।

এর পর রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনায় শ্রীযুত বন্দ্যো-পাধ্যায় রবীন্দ্র-সংগীতের গঠনে ও সুর-ভঙ্গীতে হিন্দুস্থানী মার্গ সংগীতের অপরিসীম প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাঁর বক্তব্য বিস্তারিত করেন। কবির প্রথম জীবনের ধ্রুপদাঙ্গ পদ্ধতির অনেক গান খাঁটি হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের সুরে রচিত, একথা অনেকেই জানেন, কিন্তু ঠিক কোন্ গান কোন্ গানের অনুকরণে রচিত হয়েছিল, তা বোধ করি খুব কম লোকেই জানে। বক্তা এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটন করেন। দৃষ্টান্তমূলক সংগীতের কয়েকটি স্বয়ং বক্তার দ্বারা এবং বাকী ক'টি গীতবিতানের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক গীত হয়।

প্রথমে সমবেত কণ্ঠে কবির 'আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে' এই বাহার-চৌতাল গানটি গাওয়া হয়। তারপর আলোচনার অনুষঙ্গ হিসাবে পর পর এই গানগু

গীত হয়ঃ (১) সুন্দর বহে আনন্দ-মন্দানিল—ইমন-কল্যাণ—সমবেত; (২) ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে—পরজ—বেলা ভট্টাচার্য; (৩) জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে—ধামার বেহাগ—অজিত গুঁই; (৪) এ পরবাসে রবে কে হায়—টপ্পা সিন্ধু—রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়; (৫) যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ দিয়েছ তারি পরিচয়, সবারে আমি নমি—কাফি—রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়; (৬) দিন যায়রে দিন যায় বিষাদে—পিলু—গীতা রক্ষিত; (৭) চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না—বেহাগ—চিত্রা মজুমদার এবং সর্বশেষে (৮) চরণধ্বনি শুনি তব নাথ জীবনতীরে—কাফি ঝাঁপতাল—সমবেত।

পরদিনের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশধর্ম' সম্পর্কে আলোচনা করেন। বক্তার সহজাত বাগ্মিতা গুণে আলোচনা খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। বক্তৃতায় শ্রীযুত রায় বলেন, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশধর্ম মহৎ মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদী আদর্শের অন্তরে প্রচ্ছন্ন সংকীর্ণতার তিনি কোন সময়েই পরিপোষক ছিলেন না। অত্যুগ্র স্বজাত্যাভিমান তাঁকে পীড়া দিত। ধীরে ধীরে তিনি মহৎ মানবিক মূল্যবোধের আদর্শকে তাঁর সমগ্র চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্র মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এর পর রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করেন শুভ গুহ-ঠাকুরতা। উপযুক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁর আলোচনাকে বিশদীকৃত করেন দক্ষিণী শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। প্রথমে সমবেত কণ্ঠে 'সবারে করি আহ্বান' গানটি গাওয়া হয়। তারপর কবির জাতীয় সংগীতের দৃষ্টান্তরূপে একে একে এই গানগুলি গীত হয়ঃ (১) হে ভারতে রাখো নিত্য প্রভু তব শুভ আশীর্বাদ—সমবেত; (২) জাগাও আনন্দধ্বনি গগনে—সমবেত; (৩) সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে—সুবিনয় রায়; (৪) আপনি অবশ হলি তবে বল দিবি তুই কারে— সমবেত; (৫) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না—সমবেত; (৬) একবার তোরা মা বলিয়া ডাক -সুনীলকুমার রায় এবং সর্বশেষে (৭) আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—সমবেত।

শনিবারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ও গীতিনাট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। কবির নৃত্য ও গীতিনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে শান্তিদেববাবুর যোগ প্রত্যক্ষ। তদুপরি নিজে তিনি শিল্পী। রবীন্দ্র-নৃত্য ও সংগীতে তাঁর কুশলতার কথা সকলেই জানেন। বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যোগ থাকায় তাঁর আলোচনা খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

ঐ দিনের সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, শ্রীগীতা সেন ও বক্তা স্বয়ং।

রবিবারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক আবু সৈয়দ আইয়ুব 'রবীন্দ্রনাথ ও নন্দনতত্ত্ব' সম্পর্কে আলোচনা করেন। সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন দ্বিজেন চৌধুরীর পরিচালনায় 'রবিতীর্থের' শিল্পিবৃন্দ। প্রধান প্রধান যে কটি গান গাওয়া হয়, সেগুলি এইঃ আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ' সত্যসুন্দর—সমবেত ইউরোপীয় ধাঁচে মূল গানের সমান্তরালে অসম সুরের প্রয়োগ দ্বারা কোরাসের সুরকে সমৃদ্ধতর করার চেষ্টা এই গানটিতে করা হয়েছে। চেষ্টাটি প্রশংসনীয়); জানি গো, দিন যাবে এ দিন যাবে—সুচিত্রা মিত্র; হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান—পঙ্কজ মল্লিক; তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে—পূর্ণা চট্টোপাধ্যায় এবং আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে—দ্বিজেন চৌধুরী।

একই সঙ্গে জীবন-স্মৃতি নামে একটি সংগীত-আলেখ্যের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে ব্যঞ্জনা দান করেন পঙ্কজ মল্লিক, নীলিমা সান্যাল ও জয়ন্ত চৌধুরী।

নৃত্যাংশে নীতা গুহ নৃত্যকুশলতার বিশেষ প্রমাণ দেন।

সোমবারের অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় ছিল 'রবীন্দ্র সংগীতে শিক্ষা'। আলোচনা করেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী। রবীন্দ্র-সংগীতে ইন্দিরা দেবীর জ্ঞান ও পারদর্শিতা সুবিদিত। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রবীন্দ্র-সংগীত শুধু যে আমাদের মাধুর্য ও সৌন্দর্যের সন্ধান দেয় তাই নয়, আমাদের জীবনযাত্রার অনেক মূল্যবান শিক্ষাও তাঁর সংগীত থেকে আমরা পাই। সংগ্রাম দুঃখ-শোক কণ্টকিত জীবন-পথে চলতে রবীন্দ্র-সংগীত এক অমূল্য পাথেয়।

শ্রীযুক্তা চৌধুরাণীর বক্তব্যকে উপযুক্ত সংগীত-উদাহরণের দ্বারা স্ফুটতর করেন—শ্রীসুপূর্ণা ঠাকুর, স্নিগ্ধা ঠাকুর, স্মিতা ঠাকুর ও শ্রীযুক্তা অমিয়া ঠাকুর। প্রথমোক্ত ত্রয়ী কণ্ঠে এই গান ক'টি গীত হয়ঃ (১) দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে; (২) কী পাইনি তার হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজী; (৩) যাহা পাবো তাহা লবো হাসিমুখে ফিরে যাবো; (৪) ওরে ভীরু তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার এবং (৫) তবে শেষ করে দাও শেষ গান, তারপরে যাই চলে। আলোচনার অনুষঙ্গ হিসাবে শ্রীযুক্তা অমিয়া ঠাকুরের গীত 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে' এই কীর্তনভঙ্গিম গানটি শ্রোতৃবর্গের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। গীতবিতানের অজিত গুঁইর গাওয়া' প্রখর তপন তানে গানটিও উপভোগ্য হয়েছিল।

'রবীন্দ্র-সংগীতে শিক্ষা' অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পর বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে কয়েকটি একক সংগীতের অনুষ্ঠান হয়। উৎসবের এই অধ্যায়ে এই ক'টি গান গাওয়া হয়ঃ আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে তোমার নাম সকল তারার মাঝে—সাবিত্রী নাহা, তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো ক'রে কাছি—অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় (গুহ-ঠাকুরতা); নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে—বেলা ভট্টাচার্য।

এর পর শ্রীসুনীল ঘোষ 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে এই ক'টি গান করেন—ওরে ঝড় নেবে আয়; বঁধু কোন্ মায়া লাগল চোখে; যাও, যাও যদি যাও তবে তোমায় ফিরিতে হবে; ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে মনে শুনি এবং দে তোরা আমায় নূতন করে দে নূতন আভরণে।

শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় "বহুরূপী"র সদস্যবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রকাব্য থেকে যৌথ আবৃত্তি এই দিনের আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

পরিশেষে শ্রীযুক্তা অমিয়া ঠাকুর কর্তৃক 'সুধা সাগর তীরে' গানটি গীত হবার পর সেদিনকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মঙ্গলবার সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ভারতীয় ললিতকলা কেন্দ্র 'পরিক্রমা' নামক

নৃত্যনাট্য পরিবেষণ করেন। একাধিক রবীন্দ্র-সংগীতের দ্বারা নৃত্যনাট্যটিকে স্ফুটতর করার চেষ্টা হয়। ভারতীয় ললিতকলা কেন্দ্র বহু শিল্পীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, শিল্পীদের মধ্যে কৃতী শিল্পীও কেউ কেউ ছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণে সেদিনকার অনুষ্ঠান মোটেই জমেনি। অনুষ্ঠানের ব্যর্থতার একটা কারণ আমার যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যেভাবে নাট্যের আখ্যান-ভাগ সাজানো হয়েছে, তাতে ধারাবাহিকতার অভাব ছিল, ফলে দর্শকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হতে পারেনি। নৃত্যাংশে যাঁরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে মহলা না দিয়েই নাবানো হয়েছে বলে মনে হলো। অন্যান্য ব্যবস্থাদিতেও উপযুক্ত পরিকল্পনা ও প্রযত্নের অভাব ছিল বলে মনে হয়। ভারতীয় ললিতকলা কেন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজের একটা স্থান করে নিয়েছেন; তাঁদের উপর আমরা অনেকখানি ভরসা রাখি। সেদিনকার অনুষ্ঠানের মতো অযত্নপ্রসূত অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁরা তাঁদের পূর্ব সুনাম নষ্ট করবেন না, এই শুধু কেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ।

পর দিন, অর্থাৎ রবীন্দ্র-সংগীত সম্মেলনের শেষ দিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-নাথের নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' অভিনীত হয়। কলকাতায় কবিগুরুর এই অমর নৃত্যনাট্যটির আগেও কয়েকবার অভিনয় হয়ে গেছে। সুখের বিষয়, ঐ দিনের অভিনয়ে শ্যামার পূর্ব-সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়নি। গানগুলি সুগীত হয়েছে, তবে নৃত্যাংশ আরও মার্জিত হলে অভিনয়ের সৌকর্য বৃদ্ধি পেত, এই রকমই সকলের ধারণা। শ্যামা ও বজ্রসেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যথাক্রমে সেবা মিত্র ও হরিদাস নায়ার। সংগীতাংশে ছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রা মজুমদার, বেলা ভট্টাচার্য, গীতা রক্ষিত, প্রসাদ সেন এবং আরও কেউ কেউ।

মোটের উপর, নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলনের অষ্টাহব্যাপী অনুষ্ঠান বেশ সুষ্ঠুভাবেই নিষ্পন্ন হয়েছে। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতাবাসীকে রবীন্দ্র নৃত্য সংগীত আবৃত্তি অভিনয় ইত্যাদি উপভোগের এরকম ব্যাপক সুযোগ-দানের জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সঙ্গত-ভাবেই সকলের কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারেন। ভবিষ্যতেও তাঁরা তাঁদের এই ঐতিহ্য বজায় রাখবেন বলে আমরা আশা করি।

উপরিউক্ত অনুষ্ঠানগুলি ছাড়াও শহর এবং শহরতলীর এখানে-সেখানে বিচ্ছিন্ন-ভাবে বহু অনুষ্ঠান হয়েছে, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন সাংগীতিক শিল্পীগোষ্ঠী (যথা গীতবিতান, দক্ষিণী প্রভৃতি) রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে তো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেনই, এ বাদে তাঁরা রবীন্দ্র-স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের উদ্দেশে নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে স্বতন্ত্র-ভাবেও মিলিত হয়েছিলেন। গীতবিতানের নিজস্ব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।

এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের অনুষ্ঠানটিরও উল্লেখ করতে হয়। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সংগীতের ভূরি আয়োজন হয়েছিল। সভায় এই গানগুলি গাওয়া হয়ঃ (১) হে নূতন দেখা দিক আর বার—সমবেত; (২) তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন—প্রসাদ সেন; (৩) জয় তব বিচিত্র আনন্দ—সমবেত; (৪) এই কথাটি মনে রেখো—প্রবীর গুহ-ঠাকুরতা; (৫) সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর—সুপ্রভা ঘোষ; (৬) দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—ক্ষমা গুপ্ত; (৭) যে ছিল আমার স্বপনচারিণী—কৃষ্ণা ঘোষ; (৮) পারবি নাকি যোগ দিতে—অমলা সরকার; (৯) আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ' সত্যসুন্দর—সমবেত; (১০) আজি যত তারা তব আকাশে—ইন্দুলেখা মিত্র; (১১) আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান; (১২) আমি তারেই জানি তারেই জানি এবং (১৩) আমাদের শান্তিনিকেতন —সমবেত।

২৫শে বৈশাখের সন্ধ্যায় মহর্ষি ভবনে 'বৈতানিক'এর উদ্যোগে একটি বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়, সেটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিশেষ বক্তৃতায় রবীন্দ্র-সংগীতের সুরবৈচিত্র্যের সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন এবং তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, কবি ছিলেন নিত্য নব নব সৃষ্টি-প্রতিভায় চঞ্চল সংস্কারমুক্ত মানুষ; রাগ-রাগিনী-ভিত্তিক ভারতীয় সংগীতের পুরাতন কাঠামো তিনি স্বীকার করে নিতে পারেন নি, মার্গ-সংগীতের সুরবৈচিত্র্যকেই তিনি শুধু স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-সংগীতের বাধাবন্ধনমুক্ত গতিশীল সুর-লীলা মনের মধ্যে এমন একটা আনন্দের অনুভূতির সঞ্চার করে, যা অন্য সংগীতে সম্পূর্ণ দুর্লভ। বৈতানিকের শিল্পীবৃন্দ রাগভিত্তিক এবং অন্যান্য শ্রেণীর সংগীত দ্বারা বক্তার বক্তব্য স্ফুটতর করেন।

সর্বশেষে রবিবারের আসর-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "পঁচিশে বৈশাখ" সংগীত-আলেখ্যটির উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রবিবার (১৩ই মে) সকালে উজ্জ্বলা সিনেমা হলে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন হয়। অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

আমরা একটু বিশদভাবেই এবারকার রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের বিবরণ দিলাম। বিশেষ ভাবে সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলির কথা মনে রেখেই এই বিবরণ লিপিবন্ধ করা হয়েছে। যেখানেই সম্ভব পাঠকদের অবগতি ও সুবিধার জন্য গীত গানগুলির প্রথম চরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি অকারণ নয়। এ থেকে মোটের উপর সকলে ধারণা করতে পারবেন, অগণন রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে কোন্ গানগুলি শিল্পীদের সর্বাধিক প্রিয় এবং বিদগ্ধ নাগরিক সমাজে কোন্ গানগুলিই বা বেশি গাওয়া হয়। একই গান যেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ গাওয়া হয়েছে, বুঝতে হবে সে সকল গান সব চাইতে বেশি জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথের কোন্ অধ্যায়ের গান শিল্পী মহলে অধিক প্রচলিত তারও একটা হদিস এ থেকে পাওয়া যাবে। রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেন এবং প্রত্যক্ষত তা অনুশীলন করে থাকেন, তাঁদের নিকট উপরের বিবরণ তথ্যপ্রদ হবে বলে মনে করি।

আড্ডা—তামাক

বাঙালী ছাড়া অন্য জাতিও আড্ডা মারতে জানে। তবে কায়রোতে আড্ডা কখনো কারো বাড়িতে বসে না—বসে কাফেতে। এই রকম একটি আড্ডাতে সবে দাখিল্ হয়েছি এমন সময় এক সভ্য তামাকের হুকুম দিলেন। আশ্চর্য হয়ে গেলুম,* কারণ জানতুম না মিশরের লোক হুঁকোয় করে তামাক খায়।

দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। জরির কাজ করা আমাদের ফর্শী কেমন যেন একটু 'নাজুক', মোলায়েম হয়—এদের যেন একটু গাঁইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে ভক্তি হল—ইয়া ভাবর পরিমাণ। একপো তামাক হেসেখেলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্যি আমি টিকের ধিকিধিকি গোলাপী গরম প্রত্যাশা করিনি কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকি বানাবার গুহ্যতথ্য সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চোদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবন বিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তৈরিবৎ করে বানাতে শিখল কি করে? আইস সে সম্বন্ধে ঈষৎ গবেষণা করা যাক্। এই সিগারেট বানানোর পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এন্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়নশাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে।

সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রীক কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী-গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে কাগজে পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মাখিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনলী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ন সিগারেট।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন চায়ের টিন যদি রান্না ঘরে ভালো করে বন্ধ না রাখা হয়, তবে ফোড়নের ঝাঁঝে চা বরবাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ আর কিছু না হোক খুশবাইটি আঁতুর ঘরে নুন-খাওয়ানো বাচ্চার মত প্রাণত্যাগ করে। মাল-জাহাজ লাদাই করা যে অপিসারের কর্ম তিনিও বিলক্ষণ জানেন যে-জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে তাতে কড়া গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না—পাছে তামাকের গন্ধ এবং কিঞ্চিৎ স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই তামাকের স্বাদ নষ্ট না করে সিগারেটকে খুশবাইয়ে মজানো অতীব কঠিন কর্ম। সিগারেটে একফোঁটা ইউকেলিপটস্ তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফুঁকে দেখুন, এক ফোঁটা তেল আস্ত সিগারেট একদম বরবাদ করে দিয়েছে। পাঁচ বছরের বাচ্চাও তখন সে সিগারেট না কেসে অনায়াসে ভস্ ভস্ করে ফুঁকে যেতে পারে (বস্তুত বড্ড বেশি ভেজা সর্দি হলে অনেকে এই পদ্ধতিতে ইউকেলিপটস্ সেবন করে থাকেন—যাঁরা সিগারেট সইতে পারেন না তাঁরা পর্যন্ত)।

বরঞ্চ এমন গুণী আছেন যিনি এটম বমের মাল-মশলা মেশানোর হাড়হদ্দ হালহকীকৎ জানেন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে খুশবাই! তার পিছনে রয়েছে গূঢ়তর, রহস্যাবৃত ইন্দ্রজাল।

কিছু বাড়িয়ে বলছি না। অজন্তার দেওয়াল এবং ছবির রঙ কোন্ কোন্ মশলা দিয়ে বানানো হয়েছিল, পাঠানযুগে পাথরে পাথরে জোড়া দেবার জন্য কি মাল কোন্ পরিমাণে লাগানো হয়েছিল আমরা সে তত্ত্বগুলো মাথাখুঁড়েও বের করতে পারিনি এবং পারেনি বিশ্বসংসার বের করতে কি কৌশলে, কি মশলা দিয়ে মিশরীরা তাদের মমীগুলোকে পচার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

স্বীকার করি, মিশরীরাই একদিন সে কায়দা ভুলে মেরে দিয়েছিল—পাঠান-মোগলযুগে যে রকম আমাদের অনেকখানি রসায়নবিদ্যা অনাদরে লোপ পায়। তবু তো আমরা আজও মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ বানাতে পারি—ভেজাল তো শুরু হল মাত্র সেদিন, আমাদেরই চশমার সামনে।

মিশরীরাও ঠিক সেই রকম সুগন্ধ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি। ঝড়তিপড়তি যেটুকু এলেম তখনো তাদের পেটে ছিল তাই দিয়ে তারা সেই সমস্যা সমাধান করলো, তামাকে কি করে খুশবাই জোড়া যায়, তামাকের 'সোয়াদ'টি জখম না করে।

তাই যখন কোনো ডাকসাঁইটে তামাক কদরদারের (হায়! এ গোত্র পৃথিবীর সর্বত্র কি কাবুল, কি দিল্লী, কি কায়রো—সুকুমারের ভাষায় বলি—হুশ হুশ করে মরে যাচ্ছে) তদারকিতে কায়রোর কাফেতে তামাক সাজা হয় এবং সেই কদরদার যখন সে তামাকের নীলাভ ধুঁয়োটি ফুরফুর করে নাকের ভিতর দিয়ে ছাড়েন এবং নীলনদের মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই ধুঁয়োটির সঙ্গে রসকেলি করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে কাফের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন রাস্তার লোক পর্যন্ত উন্নাসিক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, পাঁড় সিগারখেকো, পাইকারি সিগারেট-ফোঁকো পর্যন্ত বুকের উপর হাত রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে 'অলহমদুলিল্লা, অলহমদুলিল্লা' (খুদাতালার তারিফ) বলে।

আর ইলিশের বেলা যে-রকম হয়েছিল এ অধম ঠিক সেই রকম তাজ্জব মানে, বেহেশতের বর্ণনায় এ তামাকের বয়ান নেই কেন? তা হলে পাপ করে নরকে যেত কোন্ মূর্খ?

পাত্তর খোঁজা

সে জবাবুর মেজমেয়ে খুন্তিটাকে তো এই সেদিন পার করা হ'ল এখন ন বাবুর ছোট মেয়ে লোত্তিটা বিয়ের যুগ্যি হয়ে ওঠাতে তার ব্যবস্থা করার ভার এ ভায়াও আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আচ্ছা, এই বাজারে উপর্যুপরি গোটা পাঁচেক মেয়ের বিয়ে মহাপুরুষ ছাড়া কেউ দিতে পারে। বলতে গেলে বাড়িতে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মেয়ের সংখ্যা গোটা উনিশ—লোকে শুনলে মনে করুন, ইস্ করে চমকে ওঠে—তা, এ'দের একে একে স্থানান্তরে পাঠানো সোজা কথা? আর তার দরকার কি তাও তো বুঝি না।

আমি সবাইকে কতবার বলেছি, ওরে বাপু ব্যস্ত হয়ে করবি কি? যখন বিয়ের ফুল ফুটবে তখন আপনি হবে। বিয়ের ব্যাপার দেখে দেখে ঘেন্না হয়ে গেছে। পাত্তর তো নেইই উপরন্তু বহু খোঁজ নিয়েও একটা ভদ্দরলোক বেয়াই-বেয়ান পাবি না বাবা, অতএব গ্যাঁট্ হয়ে বসে থাক্। যখন আসবার আপনি আসবে। তা আমার কথার ওপর পৃথিবীর কারুর বিশ্বাস আছে? ওর কথা ছেড়ে দাও, পাগলের মত কিনা বলে এই তো ভাব সবার।

বাড়িতে আপিস থেকে ফিরে পাঞ্জাবীটি আনলায় ঝুলিয়ে একটু নিশ্চিন্তে বসবার জো নেই। আজ কোথাও গেছলে নাকি কিছু সন্ধান পেলে ইত্যাদি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে। আচ্ছা, এ বাজারে কোথায় পাত্তর খুঁজবো বলুন তো? মাত্তর গুটিকতক যা পাওয়া যায় তাদের দর শুনলে দুত্তোর বিয়ের নিকুচি করেছে বলে চলে আসতে হয়, আর বাকী যা আছে তাদের চাকরি বাকরি করে দিলে তবে হয়তো দয়া করে জামাই মেয়েকে ঠাঁই দিতে রাজী হতে পারেন—এ অবস্থায় করি কি? বাজারে বর নেই—তাই খুঁজতে বললে গায়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসে, আর নয় তাঁদের বাপ মায়ের দাম দেওয়া শুনলে রেগে টরটর্ করে বেরিয়ে আসতে হয়। কিন্তু বাড়ির লোকে ভাবেন রাস্তায় ঘাটে একেবারে বর গাদা গাদা পড়ে রয়েছে নইলে অপর লোকেরা পাচ্ছে কি করে? এদের বোঝাই কি করে যে ওরে বাপু, আজকাল

নিদারুণ অভিজ্ঞতা

শ্রীবিরূপাক্ষ
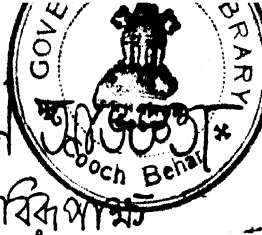
শুধু দাদার সংখ্যাই বেড়েছে, বরের গাদা কোথাও নেই। এক তাদের কাদা করে ফেলে যদি গুছিয়ে গাছিয়ে নেওয়া যায় তবেই গতি হতে পারে নচেৎ শ্রীমতীদের কোন চান্স্ নেই।

এই সেদিন মনে করুন, একটি ভদ্রলোক এলেন মেয়ে দেখতে। পছন্দ হল, দরদস্তুর ঠিক হয়ে গেল, শেষে ঠেকলো কোথায় জানেন? আঠারোখানা নমস্কারি কাপড়ে। এই নিয়ে টানা হেঁচড়া, যাচ্ছে তাই—কাণ্ড!

সাজানো-দাঁতের ঘর-সাজানোর প্রস্তাব

শেষে আমি রেগে বলে উঠলুম, মশাই যাদের বাড়িতে লোকে কাপড়ের অভাবে ঘরে গামছা পরে বসে আছে তাদের ওখানে আমরা মেয়ে দেব না। ব্যস্! ফেঁসে গেল!

আর একজন এলেন—ছেলে শ খানেক টাকায় সরকারি অফিসে চাকরি করে, অতএব ছেলের চাকরি গেলেও যাতে তার পেন্সনের টাকা পর্যন্ত আমি তাঁর হাতে জমা রাখি সেই রকম চেয়ে বসলেন। অতএব তাঁকেও বিদেয় দিতে বাধ্য হলুম।

আর একজন নিপাট ভালমানুষ মুখের দুপাটি দাঁত সর্বদাই বেরিয়ে আছে, দুটি ঠোঁট কখনও একত্র হয় না এমনি সদানন্দ পুরুষ, তিনি কিছু চান না। তবে ঘর সাজিয়ে দেবার জন্যে ছেলের খাট, দুটি আলমারি একটি ড্রেসিং টেবিল, একটি সোনার ঘড়ি, দু সেট বোতাম, পাঁচজোড়া ভাল জুতো, এক ডজন সিল্কের পাঞ্জাবী, ফাউন্টেনপেন, ছয়টা সুটকেশ, তিনটি সাহেবী সুট, বুট ইত্যাদি ঝুটমুট বহু বায়নাক্কা, এমন হাসতে হাসতে জানালেন যে সে সব দিতে গেলে অক্কা পাওয়া ছাড়া কনের বাপের গতি নেই। অতএব সেও ভক্কা হয়ে গেল।

লাস্ট—পাকা দেখা হব হব করে একটা গেল ভেস্তে। ভাগ্যি সেটা আগে গেছে তাই রক্ষে তা না হ'লে চক্ষে সরষে ফুল দেখতে হত। ছেলেটা বি এ পড়তো, স্বভাব চরিত্র ভাল, বাপ মা প্রায় চোত মাসেই বিয়ে দিতে চান এই রকম ভাব দেখালেন, খাঁই কিছু নেই কিন্তু ও মশাই, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার তিনদিন পরেই শুনি ছোকরা পাকাপাকি হয়ে যাওয়া দেখে লেকের জলে ঝাঁপ খেয়েছে।

কি ব্যাপার? পাশের বাড়ির দেখন হাসির সঙ্গে নাকি, তার ইতিপূর্বে ভালবাসাবাসি হয়েছিল, এ'রা অমত করাতে ছেলে রশি ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। লোত্তির সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়বার আগেই সে চট্ মেরে একেবারে ইহলোকের পাট চুকিয়ে দিলে—কিন্তু বাড়িতে আমার যা খোয়ার হল তা আর বলবার কথা নয়। আমার যা খোঁজপত্তর নেওয়ার ছিরি—ওরকম তো হবেই ইত্যাদি!

আচ্ছা এ সব খোঁজ আমি কোথায় নেব বলতে পারেন? স্বভাব চরিত্র ভাল, কবিতা লেখেনা, কে কটা কার জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, মেয়ের জন্যে কোন ছেলের এজমা হয়েছে একি অটর্নী আপিসে গিয়ে সার্চ করে আসবো? বলে, নিজের বাপ-মা ছেলেপুলেদের সামলাতে পারছে না তার আমি কি করবো?

তাছাড়া, আমি যা আনবো তাও তোমাদের পছন্দ, হবে না—ওঃ, ওটা একেবারে মুখ্যু—অথচ বুঝতে পারছে না যে এরপর ওদেরই রাজত্ব হবে, কারণ

কেউই—তো আর চুকে ছাড়া এগজামিনে পাশ করতে পারছে না। ও, বাউণ্ডুলে, ওর ঘর দোর কোন চুলোয় নেই—বুঝছেন না যে অবস্থা যা হয়ে আসছে তাতে পরে আমাদের সবাইকেই রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। ও মা, ও আবার একটা ছেলে হাড়গিলের মত দেখতে—কিন্তু এটা বোঝে না যে এ বাজারে গিলেকরা পাঞ্জাবী পরে বাবুরা ঘোরেন বলেই আসল জিনিসের পরিচয় পাওয়া যায় না, তা না হলে আজকালকার খাওয়াল্ল সেঁটে ক'রে আর খিলখিলে চেহারা নেই! অমুক যক্ষ্যাকালো, তমুক পেটমোটা, ওর দাঁত উঁচু, ওর গাল তোবড়ানো, তার নাক থেবড়ানো ইত্যাদি সমালোচনা তো আছেই—তাই কোন কিনারাও হল না।

পরিশেষে মশাই, ঘরদোর আছে, ভাল চাকরি করে, স্বভাবটি গঙ্গাজলের মত পবিত্র রয়েছে দেখেশুনে সেইরকম একটির সন্ধান আনলুম। সব ভাল, থাকবার মধ্যে সবই আছে, নেই শুধু পরিবারটি—আর নেই—সামনের গোটা এগারো কি বারোটা দাঁত—তাতে ক্ষতি কি? পাকা দেখার আগে আর দু-একটা যা নড়ছে তা উপড়ে ফেলে ভদ্রলোক দাঁত বাঁধিয়ে নেবেন কথা দিলেন, কিন্তু এঁরা তাই শুনে আমায় এই মারেন তো এই মারেন! বেরোও, বেরোও—ঘাট হয়েছে বাবা তোমায় পাত্তর খুঁজতে বলা, কোত্থেকে শেষে একটা ঘাটের মড়া নিয়ে এল গা, ছিঃ ছিঃ, ছিঃ!

আচ্ছা, আমার অপরাধটা কোথায় বলতে পারেন? দাঁত উঁচু থাকলে চেঁচাবে, আবার ও বালাই ঘুচিয়ে দিয়ে যারা একেবারে পেলেন হয়ে বসে আছে, তাদের নিয়েও চলবে না—তা হ'লে আমি করি কি? না চলে নিজেদের দুপাটি দাঁত বার করে বসে থাকো, আমার বাবা পাত্তর খোঁজার সাধ্য নেই!

বরবর্ণিনীর বরনির্ণয়

তোমাদের মেয়েগুলোই বা কি সেদিকে দেখ! না জানে, দুটো ইংরিজি কথা বলতে, না পারে গাইতে বাজাতে, নাচতে ওদের হবে কি? আজকালকার বাজারে এ-সব না-জানলে কিছু হয়? যারাই জানে তাদেরই তো দেখছি হৈ হৈ করে বর জুটে যাচ্ছে। অত কথা কি, বলে, থিয়েটার বায়োস্কোপ করতে করতে কত মেয়ের দু তিনবার করে ভাল ভাল বিয়ে হয়ে গেল, আর তোমরা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাক, আর অপরের বিয়ের শাঁক-বাজাও! একালের ছেলেদের পছন্দ মত মেয়ে তৈরী কর—তারা এরোপ্লেন করে এসে ছাদের ওপর থেকে ছোঁ মেরে মেয়ে তুলে নিয়ে যাবে—তা নয়, রান্না আর ব্লাউজের হাতায় ফুল তোলার কারিকুরি হচ্ছে—গুষ্টির মাথা হচ্ছে—যত সব বেয়াক্কেলে কাণ্ড!

আমি কিছু পারবো না—আমার দ্বারা আর পাত্তর খোঁজা অসম্ভব! ভাবছি মেয়ে পুলিসের দল হয়েছে, ঐ খানে ওদের ঢুকিয়ে দোব—পারে তো রুলের গুঁতো মেরে মেরে সব পাত্তর যোগাড় করে বিয়ে করুক, তা না হলে ভালমানুষির আর দিন নেই!

চিঠি

শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়

এখানে ভালোবাসা তো নেই। এখানে সব প্রেম
উধাও হয়ে হারিয়ে গেছে রুক্ষ সমীরণে।
অনেক পথ পেরিয়ে আজ এখানে জানলেম—
আসুক বনে ফাগুন, তবু আগুন নেই মনে।
এখানে আর বনানী নেই, এখানে মরুভূমি,
হাওয়ায় ওড়া রুক্ষ বালি এখানে আজ ধু ধু;
এখানে কেউ গায় না গান, এখানে মৌসুমী
হাওয়ায় জল ঝরে না, মিছে চাতক কাঁদে শুধু।

একথা তুমি মানো না বুঝি? যদি তা না-ই হবে,—
মনে কি পড়ে অতীতে সেই চকিত চোখাচোখি?
উজাড় করে বিলিয়ে মোর হৃদয়-বৈভবে।
পেয়েছি আমি কি বিনিময়ে, সে কথা ভেবেছো কি?
সেই যে কবে গেয়েছি গান, সেই যে আমি কবে
বেসেছি ভালো, পড়ে না মনে, মিথ্যে তার শোক-ই।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৪৩

পূর্বেই বলেছি লছমীপুর মকর্দমা চলেছিল ভাগলপুরের প্রথম সবজজের এজলাসে। হাকিম ছিলেন বর্ধমান নিবাসী বাঙালী মুসলমান মৌলবী বেদার বখৎ। নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ; উভয়পক্ষের দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টারের দাপট সামলাতে সামলাতে ভদ্রলোককে সাত-আট মাসকাল সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। উচ্ছ্বসিত প্রশংসার তাড়নায় কখনো চিত্তরঞ্জন মৌলবী সাহেবকে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে তুলে দিতেন, আবার হয়ত পরমুহূর্তেই নামিয়ে দিতেন ঠিক ততটাই পাতালের দিকে। হাকিম নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে আর কখনো কোনো উকিল ব্যারিস্টারকে দেখিনি।

মকর্দমার প্রথম দিকে, অর্থাৎ যে পাঁচ ছ'মাসকাল সাক্ষীদের এজাহার চলেছিল চিত্তরঞ্জনের গৃহে মন্ত্রণা-বৈঠক বসত শুধু সকাল বেলা। সন্ধ্যার পর বসত সাহিত্য এবং সঙ্গীতের স্পৃহনীয় আসর।

সকাল বেলাকার বৈঠকে বিতর্ক এবং বিবেচনার সুনিপুণ যন্ত্রে যে-সকল মারাত্মক অস্ত্র নির্মিত হোত, তার দ্বারা চিত্তরঞ্জন আদালতে বৈরীপক্ষের সাক্ষিগণকে ক্ষত-বিক্ষত করতেন। আমরা সানন্দ বিস্ময়ে চিত্তরঞ্জনের অস্ত্রচালনার অপরূপ কৌশল দেখতাম।

সাধারণত জেরা দু-রকমের আছে; প্রথমত গঠনমৈতিক (Constructive), আর দ্বিতীয়ত ধ্বংসনৈতিক (Destructive)। গঠননৈতিক জেরায় জেরাকারী উকিল অথবা ব্যারিস্টার বিপক্ষের সাক্ষীর মুখ দিয়ে সুকৌশলে এমন কতকগুলি উক্তি করিয়ে নেন যার দ্বারা তাঁর নিজ পক্ষের মামলা খানিকটা 'highly probable' (বিশেষরূপে সম্ভবপর) হয়ে ওঠে; অর্থাৎ খানিকটা গড়ে ওঠে। অপর পক্ষে, ধ্বংসনৈতিক জেরায় জেরাকারী উকিল বিপক্ষে সাক্ষীর উক্তির দ্বারা বিপক্ষে মামলার ধ্বংসসাধন করেন; অর্থাৎ আইনের ভাষায়, বিপক্ষে মামলা 'highly improbable' (বিশেষরূপে অসম্ভাব্য) করে তোলেন।

ধ্বংসনৈতিক জেরা অপেক্ষা গঠননৈতিক জেরা কঠিনতর কার্য। সকল বিষয়েই গড়ার চেয়ে ভাঙা অনেক সহজ ব্যাপার। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে একথার সত্যতা আমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। ধ্বংসনৈতিক জেরা হয়ত যেমন-তেমন করে সকলেই করতে পারে, কিন্তু গঠননৈতিক জেরায় অনেক উন্নত দরের বুদ্ধি বিবেচনা এবং লোকচরিত্র জ্ঞানের প্রয়োজন। ঠিক সময়-মতো থামতে না জানলে অনেক সময়ে এ অস্ত্র নিজের গলাও কাটে। একই সাক্ষীর মুখ দিয়ে সব কথা বলিয়ে নেবার লোভ গঠননৈতিক জেরার ক্ষেত্রে পাপ।

ব্যারিস্টার দাশ সাহেব যৎপরোনাস্তি নিপুণতার সহিত এ অস্ত্র পরিচালিত করতে জানতেন। অবশ্য এ অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধ্বংসনৈতিক জেরার অস্ত্রও চালিয়ে যেতেন। ফলে যুগপৎ ভাঙা ও গড়ার কার্য চলতে থাকত। এই দ্বিমুখী শিল্পকলার অপূর্ব ব্যবহার-চাতুর্য দেখে আমরা এক সঙ্গে শিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করতাম। জেরার শেষভাগে I put it to you, I put it to you বলে দাশ সাহেব যখন সাক্ষীর প্রতি গোটা কয়েক শেষ গোলা নিক্ষেপ করতেন, তখন আমাদের বুঝতে আর বাকি থাকত না, সাক্ষী গণেশ উল্টেছে।

আদালতে সাক্ষী হননের কার্য শেষ করে রণক্লান্ত চিত্তরঞ্জন বৈকালে গৃহে ফিরতেন। গৃহে পৌঁছানোর পর আদালতের বেশভূষা থেকে তাঁর দেহ মুক্তিলাভ করত; আইন-আদালতের পরিবেশ থেকে তাঁর মন কিন্তু মুক্তিলাভ করত আদালত থেকে গৃহে ফেরবার পথেই। সন্ধ্যার পর দীপনারায়ণ সিংহের বৈঠকখানা-গৃহে উপনীত হয়ে ব্যারিস্টার দাশ সাহেবকে আর খুঁজে পেতাম না; তৎপরিবর্তে দেখতাম কবি এবং রসিক চিত্তরঞ্জন আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য উৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করছেন। আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ আমার এবং আমার তিন চারটি বন্ধুর সঙ্গে। আমার বন্ধুগণের মধ্যে উকিল যতিনাথ ঘোষ, উকিল সুধাংশু রায়, টি এন জুবিলি কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এবং আরও এক-আধজন ছিলেন। চিত্তরঞ্জন ব্যতীত আমিই ছিলাম একমাত্র ব্যক্তি যাকে সকাল এবং সন্ধ্যার উভয় বৈঠকে হাজিরা দিতে হত; সকালে ব্যারিস্টার দাশ সাহেবের জুনিয়াররূপে মন্ত্রণা-বৈঠকে এবং সন্ধ্যাকালে কবি চিত্তরঞ্জনের সুহৃদরূপে কলা-মজলিসে। দৈবাৎ কোনোদিন সান্ধ্য আসরে উপস্থিত হতে না পারলে তার জন্য আমাকে চিত্তরঞ্জনের কাছে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হত।

আমাদের সান্ধ্য আসরে প্রধান বিষয়-সূচি ছিল সাহিত্য আলোচনা এবং সঙ্গীত। সাহিত্য আলোচনা ইংরাজি এবং বাঙলা সাহিত্য উভয় বিষয় অবলম্বন করেই হত। ইংরাজ কবিদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন ব্রাউনিং-এর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ব্রাউনিং কাব্যের দার্ঢ্য, সরলতা এবং বন্ধুরতা চিত্তরঞ্জনের বিশেষ ধাঁজের সাহিত্য-রুচি এবং কাব্য-বোধের তন্ত্রীতে যেমন সাড়া তুলত, এমন আর কোনো ইংরাজ কবির কাব্য তুলতে পারত না। তিনি অতি হৃদয়গ্রাহীভাবে গভীর মধুর কণ্ঠে ব্রাউনিং পাঠ করতে পারতেন। মাঝে মাঝে এক-এক দিন আমাদের ব্রাউনিং বৈঠক বসত। সেদিন চিত্তরঞ্জন তাঁর ব্রাউনিং খণ্ড থেকে অনর্গল কবিতার পর কবিতা পাঠ করে যেতেন, আমরা আমাদের গ্রন্থের পাতা উল্টে উল্টে মুগ্ধচিত্তে শুনতাম। পড়ার গুণে সুকঠিন ব্রাউনিং কাব্যের মর্মকোষ আমাদের কাছে একে একে তার দলগুলি খুলতে বাধ্য হত। Evelyn Hope নামে করুণরসাত্মক কবিতাটি চিত্তরঞ্জনের অতিশয় প্রিয় ছিল। কবিতাটির প্রথম ছত্র Sweet Evelyn Hope is no more এত দীর্ঘকাল পরেও চিত্তরঞ্জনের

কণ্ঠের সুমিষ্ট এবং সুস্পষ্ট অনুরণন নিয়ে আমার কানে ধ্বনিত হয়।

বাঙলা কাব্যসাহিত্যের মধ্যে চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত পদাবলী কাব্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আবার বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। 'রাধার কি হল অন্তরে ব্যথা। বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারো কথা॥' পদটি সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের প্রশংসার অন্ত ছিল না। তিনি বলতেন, শুধু চণ্ডীদাস সাহিত্যেই নয়, সমস্ত বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে এই পদটি সর্বশ্রেষ্ঠ লিরিক, অর্থাৎ গীতিকাব্য। তাঁর মতে—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥

পূর্বরাগের অর্থাৎ নব-পরিচয়ের এমন অপরূপ চিত্র শুধু বাঙলা সাহিত্যে কেন, যতদূর তাঁর জানা আছে, বিশ্বের কোনো সাহিত্যেই নেই।

'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।' পদটিও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি বলতেন, "এই দুটি ছত্র যেমন graphic, তেমনি intensive, আর তেমনি Extensive; পাঠ মাত্রই যে চিত্র মনের পটভূমিকায় ফুটে ওঠে, তা যেমন স্পষ্ট, তেমনি মধুর, তেমনি ভাবদ্যোতক।"

রবীন্দ্র কাব্য সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের অভিমত খানিকটা অনুদার ছিল। তিনি বলতেন রবীন্দ্র কাব্য prettey নিশ্চয়ই, কিন্তু grand নয়। আমরা, বন্ধুরা, এ মত পোষণ করতুম না এবং চিত্তরঞ্জনের এ মত আমাদের খানিকটা পীড়ন করত। আমাদের মধ্যে বিশেষ করে দুজন, যতিনাথ ঘোষ ও আমি, প্রবল রবীন্দ্র-ভক্ত ছিলাম। আমরা দুজনে এ মতের প্রতিবাদই শুধু করতাম না, সময়ে সময়ে খণ্ডন করবার চেষ্টাও করতাম।

সংগীত, বিশেষত কণ্ঠসংগীত, চিত্তরঞ্জনের বিশেষ প্রিয় বস্তু ছিল। সব শ্রেণীর গানই তিনি শুনতে ভালবাসতেন, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালবাসতেন বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত কীর্তন গান। কিন্তু তাই বলে উৎকৃষ্ট শ্যামা সংগীতের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যেত। তাঁর হৃদয়ের এক দিক জুড়ে ছিল যমুনাতটবিহারী মুরলীধর শ্যামসুন্দরের মূর্তি, অপর দিকে শ্মশানবাসিনী শবাসনা শ্যামার। শ্যাম এবং শ্যামাকে তিনি একই শক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ বলে মনে করতেন।

আমার মুখে দুটি গান শুনতে তিনি অতিশয় ভালবাসতেন, প্রসিদ্ধ শ্যামাসংগীত 'মনেরই বাসনা শ্যামা' এবং 'ধিনতাধিনা পাকা নোনা'। এই দুটি গান শোনবার সময়ে তাঁর মনের কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক দু-রকম ভাব হোত। 'মনেরই বাসনা' শুনতে শুনতে তিনি ভাবাবেগে স্তব্ধ নিমীলিতনেত্র হয়ে যেতেন। এমন নিস্পন্দভাবে নিঃসাড়ে বসে থাকতেন যে, দেখে মনে হত দেহে সম্বিৎ আছে কি নেই। সম্বিতের প্রথম পরিচয় পাওয়া যেত দুই চক্ষের দরবিগলিত ধারায়। আস্থায়ী শেষ করে যখন আমি অন্তরা ধরতাম, 'তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে', তখন অকস্মাৎ দেখতাম দুই চক্ষের দুকূল প্লাবিত করে অশ্রুর ঢল নেমেছে। দেহ কিন্তু তখনো তেমনি নিস্পন্দ অসাড়।

ধিনতাধিনা পাকা নোনা গান শোনবার সময়ে কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব দেখা যেত। চক্ষু তখন পূর্ণবিকসিত, মুখে সকৌতুক আনন্দের নিঃশব্দ মৃদু হাস্য এবং গানের স্থানে-অস্থানে দুই অবিমুক্ত অঙ্গুলীর নীরব উচ্ছলিত তুড়ি। ভাবটা ঠিক এই রকম যে, যে কোন মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে ধিনতাধিনা পাকা নোনা বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেও আশ্চর্যের কিছু হয় না।

'ধিনতাধিনা' গানটি নিতান্তই ছোট। সম্পূর্ণ গানটি শুনলে এই গান অবলম্বন করে চিত্তরঞ্জনের মনোভাব যেমন হত, তা

পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার পক্ষে পাঠকের সুবিধা হবে মনে করে গানটি এখানে উদ্ধৃত করলাম,—

ধিনতাধিনা পাকা নোনা!
ও তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে
আমায় ধরতে পারলি না!
ধিনতাধিনা পাকা নোনা!
পিছনে তোর মোটা-সোটা
দাঁড়িয়ে আছে গুণ্ডা ছটা!
মনে করেছিস ধরবি আমায়।
আমি বন্ধন-দশায় থাকব না!
ধিনতাধিনা পাকা নোনা।

চিত্তরঞ্জন বলতেন, গানটার মধ্যে সংসারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দেখাবার এমন একটা সহজ বেপরোয়া ভাব আছে যে, মনে হয় বন্ধন-দশা থেকে মুক্ত হওয়া খুব বেশি একটা কঠিন কাজ নয়।

বস্তুত, ঠিক এই সময় থেকেই চিত্তরঞ্জনের মনে বন্ধন-দশা হতে মুক্ত হবার বাসনা দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। এই সময় থেকে, অর্থাৎ যে সময়ে চিত্তরঞ্জনের কর্মজীবনের সফলতার সূর্য মধ্যাহ্ন-গগনে অবস্থিত; যে সময়ে একদা রিক্ত দুই হস্তে রাশি রাশি অর্থ অযাচিত ভাবে এসে জমাট বাঁধছে; যে সময়ে প্রথম শ্রেণীর আইন ব্যবসায়ী এবং দুর্বার দেশনায়করূপে সারা ভারতবর্ষে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অন্ত নেই। এই সময় থেকেই চিত্তরঞ্জন স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলেন ত্যাগের, রিক্ততার। স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, মহাভোগীর মধ্যে মহাত্যাগী বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছে।

সান্ধ্য আসরের পর প্রতি সপ্তাহে বার দুই চিত্তরঞ্জন আমাদের খাওয়াতেন। সে খাওয়ানো সাধারণ খাওয়ানো নয়। উপাদেয় খাদ্যবস্তুর প্রকার এবং পরিমাণের বাহুল্যে আমরা বিপন্ন হয়ে উঠতাম। চিত্তরঞ্জনও আমাদের সঙ্গে খেতে বসতেন। তিনিও খেতেন, আমরাও খেতাম; কিন্তু প্রভেদ এই ছিল যে, আমরা খেতে খেতে গল্প করতাম, আর তিনি গল্প করতে করতে খেতেন। সুতরাং আমরা যদি দশ রকম খাদ্যসামগ্রী খেতাম ত তিনি খেতেন তিনরকম।

আমি একদিন তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলাম, "আমাদের খাওয়াবার জন্যে আপনি এতরকম ব্যবস্থা করেন, কিন্তু আপনি অত কম খান কেন?"

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "খাদ্যবস্তু উপভোগ করবার দুটি উপায় আছে। এক খেয়ে আর এক খাইয়ে। আমি কতকগুলি খাদ্যবস্তু উপভোগ করি খেয়ে, আর বাদবাকি উপভোগ করি খাইয়ে। সুতরাং মোটের উপর নিজেকে একটুও বঞ্চিত করিনে।" বলে হা হা করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠেছিলেন।

এ অবশ্য হয়েছিল চমৎকার ব্যারিস্টারি উত্তর; কিন্তু আসল কথা, তিনি করছিলেন আহার্য-বস্তুর সমারোহের মধ্যে অবস্থান করে নিজের রসনাকে সম্বৃত করবার কঠোর অনুশীলন। রসনাকে সম্বৃত করা যে কত কঠোর কাজ, সে কথা শুধু সেই বলতে পারে না, রসনা হতে যে হতভাগ্য বঞ্চিত।

ভাবে-ভঙ্গিতে এ সকল কথা আমরা ভাগলপুরে থাকতে অনুমান করতাম। কিন্তু আমাদের অনুমান যে ভুল হয়নি, স্বয়ং চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে তার সুস্পষ্ট মৌখিক স্বীকৃতি পেয়েছিলাম মাস দুয়েক পরে মায়াবতীতে অবস্থান কালে।

সুদূর হিমালয়ে অবস্থিত আলমোরা শহর থেকে আরও মাইল বাহান্ন-তিপান্ন দূরবর্তী অঞ্চলে মায়াবতী একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রাম। এই গ্রামটির অধিপতি সুবিখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশন। এখানে তাঁদের অদ্বৈত আশ্রম অবস্থিত। পূজার ছুটিতে অদ্বৈত আশ্রমের আমন্ত্রণে চিত্তরঞ্জন সপরিবারে মায়াবতী ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সঙ্গে আমিও ছিলাম।

প্রত্যহ সকালে চা-পানের পর চিত্তরঞ্জন ও আমি প্রাতর্ভ্রমণে নির্গত হতাম। যে গৃহে আমরা বাস করছিলাম তাঁর অনতিদূরে মাদার্স ওয়াক (Mother's Walk) নামে একটি নিভৃত নির্জন পথ ছিল। যে দানশীলা পুণ্যবতী আমেরিকান মহিলা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবার সময় সমগ্র মায়াবতী স্টেট রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে যান, তিনি প্রত্যহ এই পথটিতে বেড়াতেন বলে এ পথের নাম রাখা হয়েছে মাদার্স ওয়াক। অদ্বৈত আশ্রমে সেই আমেরিকান মহিলা 'মাদার' নামে সম্মানিত।

ছায়াঢাকা জনহীন মাদার্স ওয়াক অতিশয় মনোরম স্থান বলে প্রায় প্রতিদিন সকালে এই পথটিতে উপস্থিত হয়ে কিছুক্ষণ আমরা বিচরণ করতাম। পরস্পরের মন খোলবার উপযুক্ত এমন স্থান, এমন কি, সমাজ সংসার হতে বিচ্ছিন্ন সুদূর মায়াবতীতেও দুর্লভ। এখানে বেড়াতে বেড়াতে চিত্তরঞ্জন মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর আশা-আশঙ্কার কথা, তাঁর সফলতা-বিফলতার কথা, তাঁর সংকট সমস্যার কথা শোনাতেন। একদিন বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তিনি বললেন, "একজন বড় জ্যোতিষী আমার কোষ্ঠি-বিচার করে কি বলেছেন জানেন উপেনবাবু?"

সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বলেছেন?"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "বলেছেন, আর পাঁচ বছর পরে আমার সন্ন্যাস-যোগ আছে।"

বললাম, "এ আপনি বিশ্বাস করেন?"

অল্প হেসে চিত্তরঞ্জন উত্তর দিলেন, "করি বই কি; নিশ্চয় করি। তার ইসারা আসতে আরম্ভ করেছে।" তারপর ক্ষণকাল নিঃশব্দে পাদচারণা করে পুনরায় বললেন, "বছর পাঁচেক আইন-আদালতের জগতে থাকতে হবে, কারণ টাকার কিছু দরকার আছে। তারপর এসব ছেড়ে ছুড়ে দোব।"

ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করলাম, "ছেড়েছুড়ে দিয়ে কি করবেন?"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "দু'বৎসর রাজনৈতিক জীবনের দ্বারা দেশের সেবা। তারপর, তাও ছেড়ে দিয়ে ভাগীরথী তীরে কুটির বেঁধে সাহিত্যের সাধনা আর আত্মসাধনা। এই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের নির্ঘণ্ট।" বলে হাসতে লাগলেন।

মনটা একটা অনিরূপেয় বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ জীবনের নির্ঘণ্ট কি জানি কেন তেমন ভাল লাগল না। যে শক্তি যেদিকে তার সফলতার পথ কেটেছে, সেই-দিকেই তার সিদ্ধি, বোধ হয় এই ধরণের কোনো চিন্তা মনকে অধিকার করেছিল।

সে যাই হোক, নিয়তির বিধানে নির্ঘণ্ট সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হতে পারেনি। কিন্তু সন্ন্যাসযোগের কথা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। আর ভাগলপুরে আমরা যে ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করতাম, তা যে এই সন্ন্যাসযোগেরই ইসারা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

এই সংসারত্যাগেচ্ছু, বিগতস্পৃহ অর্ধ-তাপস চিত্তরঞ্জন,—এই দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার দাশ সাহেব, ঠিক এই একই সময়ে তাঁর সাংসারিক জীবনে কিরূপ বালকের চেয়েও বালক ছিলেন, এবার তার একটা কৌতুকজনক কাহিনী বলি। (ক্রমশ:

খর জল

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন রাসায়নিককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়,—প্রয়োজনের দিক দিয়ে কোন্ জিনিস তাঁর কাছে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ? তা হলে নিশ্চয় উত্তর পাওয়া যাবে—জল। বাস্তবিক দ্রাবক হিসেবে জলের স্থান সর্ব শীর্ষে। প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্ জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। সেই জন্যই জলের একটি নাম—'জীবন'। বৈজ্ঞানিকগণও বলে থাকেন,—'No solution, no life.' আমরা যে সব বস্তু আহার করি জলে দ্রব না হলে শরীরের কোষ-সমূহ তা গ্রহণ করতে পারে না, কিংবা রক্ত সংগঠিত হয় না। তাই প্রতিদিন অল্পাধিক প্রায় তিন পোয়া পরিমাণ জল আমাদের পান করতে হয়। গাছপালা শিকড় দিয়ে মাটি থেকে যে আহার সংগ্রহ করে তাও জলে দ্রবীভূত না হলে গ্রহণযোগ্য হয় না। সৃষ্টির বিরাট দাবী মেটাবার জন্যই জল সর্বব্যাপী, হৃদ্য, স্নিগ্ধ ও সুপেয়। জীবনধারণের জন্য ছাড়াও কাপড়কাচা, বাসন মাজা প্রভৃতি অন্য প্রয়োজনেও আমরা প্রতিদিন ৫০-৭০ গ্যালন জল ব্যবহার করি।

নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় বলে সাধারণ লোকের কাছে জলের গুণের তারতম্য বিশেষ ধরা পড়ে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন দৃষ্টিতে জলের গুণাগুণ বিচার করে থাকেন। সেই বিচারের দ্বারা জলের যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নিরূপিত হয় তার উপরই বিভিন্ন শিল্পকলায় এর প্রয়োগ নির্ভর করে। জলের স্বাদের কথা ছেড়ে দিলেও সাবান দিয়ে কাপড় কাচতে গেলে দেখা যায় হয়তো আদৌ ফেনা না হ'য়ে কেবল সাবান ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে, কিংবা চায়ের জল তৈরী করতে গিয়ে নজরে পড়ে, যে-পাত্রে জল ফোটানো হচ্ছে তার ভিতরে চুণের একটা পুরু আস্তরণ জমে গিয়েছে। এই প্রকার জল দিয়ে দাড়ি কামানো ও স্নান করাও এক সমস্যার ব্যাপার। বুরুস দিয়ে ঘষলেও সাবানের ফেনা সহজে হতে চায় না। সেজন্য সভ্যজগতের অপরিহার্য এই নিত্যকর্মটি অর্থাৎ দাড়ি কামানো অত্যন্ত বিরক্তিজনক ব'লে বোধ হওয়া খুব স্বাভাবিক। এই রকম জলে সাবান মেখে স্নান করতে গেলে ছানার মত পদার্থ লোমকূপের গোড়ায় জমে গিয়ে চর্মের স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে। শুধু তাই নয়। স্নানের পরে মাথার চুলে গালির মত পদার্থ লেগে যায় এবং সেজন্য চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা থাকে না। এই সকল ঘটনা সাধারণের চোখে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ না ঠেকলেও বৈজ্ঞানিকের কাছে তার অর্থ আছে। এইরূপ গুণ বা ধর্ম বিশিষ্ট জলকে তাঁরা খর জল (Hard warter) বলে অভিহিত ক'রে থাকেন।

সাধারণতঃ ঝকঝকে পরিষ্কার জলকেই আমরা বিশুদ্ধ জল বলে মনে করি। কিন্তু

এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য অনেক শ্রম করতে হয়েছে।

প্রকৃত বিশুদ্ধ জল বলে বৈজ্ঞানিকেরা যা স্বীকার করেন তা তাঁদের ল্যাবরেটরীতেই প্রস্তুত হয়;—প্রাকৃতিক জগতে পাওয়া যায় না, পাহাড়ের কোন্ এক গোপন উৎস থেকে জলধারা উৎসারিত হ'য়ে আপনার গতিতে কতবাধা ঠেলে ছুটে চলে বটে, কিন্তু চলার পথে যা কিছু স্পর্শ করে তারই কিয়দংশ সে আত্মসাৎ করে নেয়। পাথর, বালি, ধাতব পদার্থ ছাড়াও কার্বনিক এসিড্ গ্যাস্ প্রভৃতি নানা প্রকার বায়বীয় পদার্থও জলের ভিতর মিশে থাকে। 'তুষার শুভ্র' কথাটা আমরা বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার পরিচয়রূপে ব্যবহার করি বটে, কিন্তু তুষার কণা দেখতে স্বচ্ছ ও শুভ্র হ'লেও তার মধ্যে অনেক পরিমাণে বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ও নানা বায়বীয় পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। সুতরাং তা হতেও বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় না।

জলের দ্রাবণ-শক্তি জীব ও উদ্ভিদ্ জগতের নিত্যপ্রয়োজন সাধনের জন্য প্রয়োজন হ'লেও শিল্প-জগতে ইহা আবার জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জলের ভিতরে নামমাত্র লোহাও যদি মিশ্রিত থাকে তা হলে সেই জল কাপড় ধোয়া বা কাচার পক্ষে অচল। সেই জল ব্যবহার করলে কাপড়ে একপ্রকার ছোপ ধরে যায়, এঞ্জিনে যদি খরজল ব্যবহার করা হয় তা হলে তার ভিতরে চুণের মত পদার্থ জমে যায়। চুণের মত এই পদার্থের উত্তাপ পরিবাহন শক্তি খুব কম, সেজন্য জলকে বাষ্পে পরিণত করতে বেশী পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন হয়। তার ফলে এঞ্জিনের কার্যকরী শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, এবং বিপদেরও আশঙ্কা থাকে।

গৃহ-কর্মে ও শিল্প কারখানায় খর জল ব্যবহারে যে কত অসুবিধা তা উল্লেখ করা হ'য়েছে। নানা উপায় উদ্ভাবন দ্বারা খরত্ব দূর করাই বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার বিষয়। ক্যাল্সিয়ম্ ও ম্যাগনেসিয়ম্ ধাতুঘটিত রাসায়নিক পদার্থ জলে মিশ্রিত থাকে বলেই জল খর হয়। এই সকল ধাতুর এক গ্রেনেরও কম (অর্থাৎ আধসেরের ৭০০০ ভাগের একভাগ) এক গ্যালন (সাড়ে তিন সের) জলে মিশ্রিত থাকলে সেই জল অনেক শিল্প কারখানার পক্ষে অব্যবহার্য বলে ধরা হয়। সাধারণ গৃহ-কর্মের পক্ষে কয়েক গ্রেন উক্ত ধাতু মিশ্রিত থাকলেও তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। সেই জল মৃদুজল বলেই গণ্য করা হয়। পৃথিবীর কোন কোন অংশে মৃদুজল স্বভাবতঃ সুলভ হ'লেও অধিকাংশস্থলেই খরজলই পাওয়া যায় বেশী। তাই খরজলকে মৃদু করবার জন্য সভ্যজগতে অনেক বড় বড় ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়েছে, এবং সেখানে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

কাঁচের গ্লাস, ডিস্ কিংবা রূপার বাসন খরজলে ধুলে তাতে একটা ময়লা দাগ প'ড়ে যায়। কাপড় চোপড় ঐ জলে যদি ধোওয়া যায় তা হ'লে একটা কটু টকগন্ধ তাতে লেগে থাকে। সীসার নলের ভিতর

দিয়ে উক্ত খরজল প্রবাহিত হতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যে ছয় ইঞ্চি নলের ছিদ্র সরু হ'য়ে এক ইঞ্চিতে পরিণত হয়, অর্থাৎ তার ভিতরে রাসায়নিক পদার্থ জমতে থাকে, খরজলে সাবান দিয়ে কাপড় কাচলে সাবানের খরচ হয় বেশী, সেজন্য খরচাও বেশী পড়ে। শুধু তাই নয়। খরজলে সাবান কাচলে ছানার মত যে পদার্থ প্রস্তুত হয় তা কাপড়ের তুলার আঁশের ভিতরে ঢুকে আটকে যায়। তার ফলে যে কাপড় ছ'মাস টিকবার কথা তা তিন মাসের বেশী টিকে না।

কতগুলি খাদ্য—যেমন সিম, বরবটি, মসুর, মটর, কড়াইশুটি জাতীয় শস্যের খরজলকে মৃদু করবার ক্ষমতা আছে। এই সকল শস্য খরজলে সিদ্ধ করলে জলথেকে ক্যালসিয়ম্ টেনে নেয়, এবং পাত্র থেকে যখন তোলা হয় তখন তা চামড়ার মত শক্ত অবস্থা ধারণ করে। পাশ্চত্য দেশে সাধারণ লোকে জলের খরত্ব ঐ সকল শস্যের সাহায্যে নিরূপণ করে। জলে সিদ্ধ করলে শস্য যদি বেশ নরম ও খাবার উপযুক্ত থাকে তা হলে বুঝতে হবে ঐ জল কাপড় কাচা, বাসন ধোওয়া প্রভৃতি গহস্থালীর কাজ-কর্মের পক্ষে অনুপযোগী নয়। এমন কি জল খাওয়া কাঁচের গ্লাস দেখেও জলের খরত্ব নিরূপণ করা হয়। কাঁচের গ্লাসে জল শুকিয়ে গেলে যদি তাতে খড়ি মাটির মত শক্ত দাগ জমে থাকে তা হ'লে ঐ জল খর বলে ধরা হয়।

সভ্যজগতে বৈজ্ঞানিককে খরজল সম্বন্ধে নানা অভিযোগ শুনতে হয় এবং তার প্রতিকারের চেষ্টা করতে হয়। মোটর গাড়ীর কারখানায় গাড়ীগুলি জলদিয়ে ধোবার পরে হয়তো তেমন ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার দেখা যায় না, হোটেলের পানীয় জলের স্বাদ ভাল নয় কিংবা তাতে লোহার পরিমাণ বেশী থাকায় কাপড় কাচলে ছোপ ধরে যায়, সুন্দরীগণের প্রসাধনের জল এত খর যে কেশের চিক্কণ ভাব আনা সম্ভব হচ্ছেনা,—এইরূপ কত সমস্যার দিকে বৈজ্ঞানিককে মনোযোগ দিতে হয়। এ ছাড়া তৈল, ইস্পাত, চলচ্চিত্র, রেডিও, রবার যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি শিল্পে বিশেষ বিশেষ প্রকার জলের ব্যবহার প্রয়োজন হয়। বোতলের কারখানায় বোতলের ভিতরে কোন দাগ না পড়ে সেজন্য মৃদু জলের সাহায্যে তা ধোওয়া হয়। কমলালেবু

আঙুর প্রভৃতি ফল বেশ ঝকঝকে দেখালে তা বেশী দামে বিক্রী হয়। সেজন্য বিদেশে চালান দেবার আগে সেগুলিকে মৃদু জলে ধোবার ব্যবস্থা করা হয়।

খর জলকে মৃদু করবার সাধারণ উপায় হল চূণ ও সোডা দিয়ে জল ফোটানো। তাতে ক্যালসিয়ম্ ও ম্যাগনেসিয়মকে অধঃক্ষেপণ (Precipitation) দ্বারা দূর করা যায়। বর্তমানে জিওলাইট (Zeolitias) নামক ধাতব পদার্থ দ্বারা জলকে মৃদু করবার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। খরজলকে

পদার্থ,—যথা—ক্ষারজাতীয় সোডা, অ্যালুমিনিয়ম্ বা লোহঘটিত অক্‌সাইড, বালি (Silica) এবং জল। এই সকল উপাদান রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশিয়েও জিওলাইট্ তৈরী করা যায়। অধুনা সভ্যাগতে বহু মিউনিসিপ্যালিটিতে এমন কি অনেক গৃহস্থালীতেও জিওলাইটের সাহায্যে জল মৃদু করবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। তার ফলে সাবানের খরচ অনেক বেঁচে গিয়েছে আর তাতে লোকের স্নান, প্রসাধন, কাপড়ের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও অনেক সুবিধা হয়েছে।

রীতিমতো জলকল বসবার আগে অনেক দেশেই জল বিক্রয় হতো

মৃদু করবার অদ্ভুত ক্ষমতা দানা বিশিষ্ট এই ধাতব পদার্থের আছে। জল যতই খর হোক না কেন তা জিওলাইটের স্তরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলে সম্পূর্ণ মৃদু হ'য়ে যায়। খরজল থেকে ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেসিয়ম্ টেনে নিয়ে তার বদলে জিওলাইট্ তার নিজস্ব সোডিয়ম্ ছেড়ে দেয়। সোডিয়ম্ দ্বারা জল খর হয় না। কিছুদিন ব্যবহারের ফলে জিওলাইটের গুণ নষ্ট হয়ে গেলে তা আবার লবণ (Common Salt) সহযোগে পুনরুদ্ধার করা যায়। লবণের ভিতরে যে সোডিয়ম্ আছে তা লাভ করে জিওলাইট আবার ক্রিয়াশীল হয়। জিওলাইটের ভিতর দিয়ে খরজল প্রবাহিত হলে উভয়ের মধ্যে যে ধাতু বিনিময় হয় (অর্থাৎ জিওলাইটের সোডিয়মের সহিত খর জলের ক্যালসিয়ম ম্যাগনেসিয়মের) তা বহুকাল পূর্ব হ'তে জানা থাকলেও বিংশশতকের প্রথম দিকেই তা জলকে মৃদু করার জন্য প্রথম ব্যবহৃত হয়।

জিওলাইটে আছে কয়েকটি রাসায়নিক

খরজল সম্বন্ধে এতবেশী গবেষণা হ'য়েছে যে কোনও রাসায়নিক শুধু এক পেয়ালা কফি পান ক'রে কিংবা লোকের চেহারা দেখে কোন স্থানের জলের খরত্ব আছে কিনা, কিংবা তার পরিমাণ কত ব'লে দিতে পারেন। বড় বড় কারখানায় এঞ্জিনের জন্য যে জল ব্যবহার করা হয় তা বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে প্রস্তুত করা হয়। জলে যদি কিছুমাত্র খরত্ব থাকে তা হ'লে তা ব্যবহার করলে এঞ্জিনের ভিতর আঁশের মত যে সাদা পদার্থ জমে যায় তা বিদূরিত করা এক কঠিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়, এবং সেজন্য অন্য অসুবিধা ছাড়াও জ্বালানির খরচ বহুগুণ বেড়ে যায়।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জল মৃদু করবার যে সকল ল্যাবরেটরী আছে তার মধ্যে পারমুটিট্ ল্যাবরেটরী (Permutit Laboratory) সর্বশ্রেষ্ঠ, তথাকার অধ্যক্ষ হাওয়ার্ড এল্, টাইগার (Howard L. Tiger), পঁচিশ বৎসরকাল জল সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। অন্যান্য তথ্য

আবিষ্কার ছাড়া তিনি এমন এক যন্ত্র বের করেছেন যাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বিল বা জলাভূমির পঙ্কিল অব্যবহার্য জলকে তুল্যাংক বিশুদ্ধ জলে পরিণত করা যায়। অথচ তাঁর আবিষ্কৃত উপায়ে যে খরচ তা সাধারণ পাতন (Distillation) প্রক্রিয়ার খরচের কুড়ি ভাগের এক ভাগ মাত্র। তাঁর এই গবেষণা বিগত যুদ্ধের সময়ে বিশেষ কাজে লাগে। যুদ্ধের সময়ে সৈনিকগণের ব্যবহারের জন্য নির্দোষ পানীয় জল ছাড়া আরও বিভিন্ন প্রয়োজনে জলের দাবী মেটাতে হয়। যেমন, রেডিও ও টেলিগ্রাফ পরিচালনা করিবার জন্য ব্যাটারিতে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন হয়। এই ভূরি পরিমাণ জল যুদ্ধক্ষেত্রে বয়ে নিয়ে যাওয়া এক কঠিন ব্যাপার এবং তাতে সময়ও অনেক নষ্ট হয়। মিঃ টাইগার এবং তাঁর সহকর্মিগণ কয়েকমাস পরিশ্রম করে এই সমস্যা পূরণ করতে সমর্থ হন। তাঁরা সুটকেসের আয়তন বিশিষ্ট একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তা' দিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জিওলাইট প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাটারির পক্ষে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থগুলিকে দূরীভূত করতে পারা যায়। অতি নোংরা জলকেও এই উপায়ে প্রয়োজন উপযোগী বিশুদ্ধ জলে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তবে সমুদ্রের লবণাক্ত জল সম্বন্ধে এই প্রক্রিয়া খাটে না।

সমুদ্রের লোনা জলকে সুপেয় পানীয় জলে পরিণত করা এযাবৎকাল এক সমস্যা বলে পরিগণিত ছিল। সমুদ্রবক্ষে নিপতিত ভাসমান নাবিক বা বিমানচালক জলের মধ্যে থেকেও একবিন্দু জলের অভাবে তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে পারেন, কিন্তু বর্তমানে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লবণাক্ত জলকেও সুস্বাদু পানীয় জলে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। এই যন্ত্র প্ল্যাস্টিকের তৈরী ও দেখতে একটি আইসব্যাগের মত। এর সংগে সংগে ছোট রাসায়নিক টোটা (Cbemical Cartridges) থাকে। ব্যাগটি সমুদ্রের লোনা জলে ভরে তার মধ্যে একটি টোটা ছেড়ে দেওয়া হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে লবণ জাতীয় যে সকল পদার্থ জলে থাকে তা তলানি পড়ে যায় এবং উহা ছেঁকে নেওয়া হয়। একটি টোটায় প্রায় তিন ছটাক পানীয় জল প্রস্তুত করা যায় এবং তাতে এক-জন লোকের একদিনের পক্ষে যথেষ্ট। যুদ্ধের সময়ে এই উপায় খুব কাজে লেগেছে এবং এখন উহা বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। রাসায়নিক টোটা কি উপাদানে তৈরী তা যুদ্ধের সময় থেকে গুপ্ত রাখা হয়েছে, সাধারণের ভিতরে প্রকাশ করা হয়নি।

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ও শিল্পকলা প্রসারের সংগে সংগে মৃদু জলের প্রয়োজন বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় অতি অল্প, কিন্তু ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের দাবী ও প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যে যখন ভারতের নানাস্থানে শিল্প ও কারখানা গড়ে উঠবে তখন মৃদুজল প্রস্তুত করবার জন্য গবেষণাগার স্থাপনেরও প্রয়োজন অনুভূত হবে। মৃদুজল সভ্যজগতে নানাবিধ শিল্প প্রচেষ্টার পক্ষে অপরিহার্য।

আলোচনা

বেতার জগতে বানানের ব্যভিচার

মহাশয়,

২৮শ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "'বেতারজগতে' বানানের ব্যভিচার" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে আপনারা যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা খুবেই সময়োচিত হইয়াছে। শুধু 'বেতারজগত' কেন, বিভিন্ন ছোট বড় পত্রিকাদি ও পুস্তকসমূহে বানান লইয়া আজকাল যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতা সুরু হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বাঙলা ভাষার প্রতি দরদী ও শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই ক্ষুব্ধ হইবেন। ব্যাকরণজ্ঞানহীন পণ্ডিতম্মন্য লেখকগণ আধুনিকতার দোহাই পাড়িয়া নিজ নিজ খেয়ালখুশী অনুযায়ী বেপরোয়াভাবে বানান চালাইয়া যাইতেছেন। বানানের সরলতা সম্পাদনের জন্য যাহা খুশী তাহা লিখিতে হইবে এরূপ হুতবুদ্ধিকর ধারণা যে সমস্ত লেখককে পাইয়া বসিয়াছে তাহাদিগের প্রতিও আপনাদের আলোচনাটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। আপনাদের পত্রিকা মারফত আমি বানানসমস্যা সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে অবহিত হইতে অনুরোধ জানাইতেছি। এ' সম্পর্কে আরও আলোচনা 'দেশ' পত্রিকায় স্থান পাইলে সুখী হইব। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীভূপেশচন্দ্র দাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ, (প্রুফসমীক্ষণ বিভাগ), আলিপুর।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

মহাশয়,

২৮শে বৈশাখ ১৩৫৮ তারিখে প্রকাশিত ২৮ সংখ্যা দেশে ইন্দ্রজিৎ রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য। রবীন্দ্র জন্মোৎসবে আমরা রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করে উৎসবের আয়োজন করি, কিন্তু সেই মহাপুরুষকে যে আমাদের মনের মধ্যে অনুভব করবার প্রয়োজন আছে সেই কথাটাই ভুলে যাই। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি আমাদের প্রাণবায়ু—কিন্তু সেই রবীন্দ্র সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপটা আমাদের মন থেকে মুছে যাচ্ছে। জীবনের আনন্দোচ্ছলতায় অভিষিক্ত যে উৎসবের জয়গান তাঁর জীবনের বাণী, তার জায়গায় আমরা বাহ্য আড়ম্বরময় উৎসবের আয়োজন করে উৎসবের সার্থকতাকে বিনষ্ট করছি। আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা উৎসবের সাড়ম্বর আয়োজন করতেই ফুরিয়ে যায়, উৎসবের লক্ষ্যের চেয়ে তার চাকচিক্যটাই আমাদের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয়—ফলে বিভ্রান্ত হতে আমাদের দেরি হয় না।

১৮০০ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ—বাঙলা দেশের এই গৌরবময় শতবর্ষের মধ্যে স্বদেশ-নিষ্ঠাই ছিল বাঙালীর ধর্ম—কিন্তু তার পর থেকে আমরা মতবাদকে সেই গৌরবের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছি। এখন আমাদের কাছে মানুষের চেয়ে মতবাদ বড়ো—স্বজাতির চেয়ে স্বদল বড়—মানুষকে একটা বিশিষ্ট আদর্শের মধ্যে পিণ্ডীভূত করতে আমরা দ্বিধাবোধ করি না।

বিনীত—শ্রীতারক ঘোষ, হুগলী।

দেহলক্ষণা

মহাশয়,

গত ২৮শে বৈশাখের "দেশ" পত্রিকার (অষ্টাদশ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা) ১১৪ পৃষ্ঠায় 'দেহ লক্ষণার' মধ্যে "রক্ত সংবহন তন্ত্র" সম্বন্ধে পড়িলাম, ইহাতে এক স্থানে লিখিয়াছেন—"এই লোহিত কণিকার পরমায়ু প্রায় চল্লিশ দিন, তার বেশী এরা বাঁচে না, সুতরাং রক্তের মধ্যে প্রত্যহই নতুন নতুন কণিকার সৃষ্টি হয়ে তার সংখ্যা বজায় থাকে।"

বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, পূর্বে মনে করা হইত, রক্ত কণিকার পরমায়ু তিন হইতে চার সপ্তাহ, কিন্তু এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, রক্ত কণিকা তিন হইতে চার মাস পর্যন্ত জীবিত থাকে। নিম্নে Wright's-এর পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—**Duration of Life of Red Cells.—Once the veticulocvte........age of an erythrocyte. Indirect methods suggest that the duration of life of erythrocytes in man may be 3 or 4 months**

(and not 3 or 4 weeks as previously supposed). ....."—Applied Physiology by Samson Wright (Eighth edition, Third Impression, Page. 404)

ভবদীয়—শ্রীসুধীরকুমার চট্টরাজ, জামসেদপুর

দুর্নীতি দমনে নারী

মহাশয়,

বর্তমানে এমন কতকগুলি ব্যবসায় এবং সরকারী চাকুরী আছে যেখানে দুর্নীতি খুব ব্যাপকভাবে চলছে; শ্রীমতী সেনগুপ্তার যদি সেইরূপ কোন ব্যবসায় বা চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকে তাহলেই তিনি জানতে পারবেন যে, দুর্নীতি-মূলক কার্যে নারীর সহায়তা আছে কিনা; অবশ্য সব ক্ষেত্রেই নারীর সাহায্যের প্রয়োজনও হয় না। প্রসঙ্গক্রমে একটি সংবাদের প্রতি লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিছুদিন আগে কোন ভারতীয় ব্যবসায়ী গোপনে বিদেশ থেকে সোনা আমদানী করার সময় সস্ত্রীক গ্রেপ্তার হ'য়েছিলেন এবং সংবাদে প্রকাশ পেয়েছিল যে, উক্ত ব্যবসায়ীর স্ত্রীর নিকট থেকেও প্রচুর পরিমাণ সোনা উদ্ধার করা হয়েছিল।

সমাজ ব্যবস্থা যখন বদলাবে, মানুষ যখন সত্যই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং আর্থিক মূল্য দিয়ে জীবনের মূল্যের পরিমাপ করবে না তখনই সমাজ থেকে সকল প্রকার দুর্নীতির অবসান ঘটবে, আর তা' নারী ও পুরুষের যুক্ত প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হবে—এ বিশ্বাস আমারও আছে। ইতি—

—প্রদ্যোতকুমার দাস, দিল্লী

মহাশয়,

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার দাস মহাশয় বাঙলার নারী-দিগকে উদ্দেশ ক'রে যে কয়টি কথা বলেছিলেন, তার প্রতিবাদ স্বরূপ বাঁকুড়ার কল্যাণী সেনগুপ্তা গত ১৪ই বৈশাখ "দেশ" সংখ্যায় বলেছেন, "দেশ যখন স্বাধীন হইয়াছে তখন নবযুগের সূচনা হইবেই এবং সেই নব প্রভাতে নারীও তাহার প্রভাবে দুর্নীতি দূর করিতে সচেষ্ট হইবে।"

আমি কেবল কল্যাণী সেনগুপ্তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই "নারীর দাঁড়াবার—জুড়াবার জায়গা পুরুষের পাশে ভিন্ন অন্য কোথাও নাই এবং সে জায়গা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শুদ্ধান্তঃপুরে। পুরুষদেরকে অবহেলা কোরে তাদের উপরে উঠবার চেষ্টা করলে অথবা সমানাধিকার লাভ করবার চেষ্টা করলে যে শান্তিটুকু আজও বাঙলার ঘরে ঘরে লুকিয়ে রয়েছে—তাও নিঃশেষে উড়ে গিয়ে নারী পুরুষ উভয় সম্প্রদায়কেই দাবানলের মতো অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে ছাই কোরে দেবে। দুর্নীতি দলন করতে চান—ধর্মে বিশ্বাস রাখুন। ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখুন।

শ্রীচণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া।

গত ২৮শে সংখ্যা 'দেশে' আমার পত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্তের অভিমত সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

দত্ত মহাশয় আমার পত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মনোভাব কোথায় পাইলেন জানি না। সম্ভবতঃ আমার আলোচনাটি তাঁহার বুঝিতে ভুল হইয়াছে—নতুবা ভাল করিয়া পড়েন নাই। কারণ এ কথাত দিনের আলোর মতই সত্য যে, নারীর মায়া, দয়া, কোমলতা ইত্যাদি সদ্‌গুণাদি থাকুক না কেন তার যদি পিছনে দাঁড়াইবার সংস্থান না থাকে সে স্বাধীনভাবে কোন কার্যই করিতে পারে না। যে দেশে নারীকে ভোগেরই সামগ্রী হিসেবে দেখা হয় 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যাঃ' এই মহাবাক্য অনুসারে স্ত্রী গ্রহণ করা হয়, সেখানে নারীর মতামতের মূল্য কতটুকু। স্বাধীনভাবে কোন কথা বলিতে গেলে হয় তাকে বাপের ঘরের পথ দেখাইয়া দেওয়া হইবে আর না হয় স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পথে (বাপমার অবর্তমানে ভ্রাতৃগৃহের প্রতি নারীর আতঙ্ক কম নয়) নামিতে হইবে। পথে নামাও সম্ভব যদি সৎপথে থাকিয়া স্বাধীনভাবে অর্থ সংস্থান করিবার কোন সুযোগ থাকে। চাকুরীর বাজারে যেখানে পুরুষেই হালে পানি পাইতেছেন না সেখানে নারী কত অসহায় তাহা সকলেই বোঝেন। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কোথায় নারীদের? অগত্যা তাহাদের মায়া, দয়া, কোমলতা এই সমস্ত গুণ মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াই কাল কাটাইতে হয়—সীমার বাহিরে গেলেই সর্বনাশ। এই 'সর্বনাশের' ভীতিই নারীর মনে অহরহ কাজ করিয়া যাইতেছে। তাই নারীর সদ্‌বৃত্তিগুলি দেশের কোন কাজে লাগিতেছে না। এই কথাটাই আমি পূর্ব পত্রে বলিয়াছিলাম। আরো বলিয়াছিলাম এ 'ভীতি' তাহাদের দূর হইবে সুশিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাইলে।

অন্নদাবাবু দেশের বর্তমান অবস্থায় পুরুষের এ জঘন্য অর্থলালসার বিরুদ্ধে শিক্ষিতা নারী-দের সমালোচনার অভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। হয়ত এমন ঘটনা তাঁহার চোখে পড়ে নাই। একটু সন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন অসংখ্য এমন দেশপ্রেমিকা ও শিক্ষিতা মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়—যাঁহারা নিজের আদর্শ অটুট রাখিতে গিয়া স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একাকিত্ব বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জন-সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে এমনি সম্ভাবিত কত মুকুল অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে কয়জনাই বা তাহার খবর রাখে? আমি আমার পূর্ব পত্রেই বলিয়াছি, প্রত্যেক ঘটনারই বিকল্প আছে। কয়েকজন 'কোটিপতি কালোবাজারীর' ও উচ্চপদে আসীন সরকারী কর্মচারীর' গৃহিণী যদিও স্বামীর নির্দয় কার্যের সমালোচনা করেন না—কিন্তু তাই বলিয়া কয়েকজনের জন্য সমগ্রকে দোষী করা অন্যায় নয় কি? আর কালোবাজারী কোটিপতি ও উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার হইলেই তাহার স্ত্রী শিক্ষিতা ও দেশপ্রেমিকা হইবে এমন কোন কথা নাই। তাই তাহাদের নাম 'তথাকথিত শিক্ষিতা'র পর্যায়েই থাকিবে—ইহার বেশী নহে।

উক্ত পত্রেই শৈলেশকুমার রায় তাঁহার আলোচনায় একটি সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমরা চিরকালই দুর্বল, সবল দুর্বলের প্রতি হামলা করে। সেই দুর্বল যতদিন না সবল হয়, ততদিনই তার দুরূহ বিপদ...? এই কথাটি নারীদের পক্ষে সুন্দরভাবে প্রযোজ্য। নারী আপন বলে বলীয়ান না হইলে তাহাদের মতামতকে সবল পুরুষ কোণঠাসা করিয়া রাখিবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ।

শৈলেশবাবুর পত্রটি সুচিন্তিত। তিনি দুটি দিকই দেখাইয়াছেন। কিন্তু পুরুষের সক্রিয় কার্যে নারীরা কেন নিষ্ক্রিয়, আশা করি সে সম্বন্ধে আমার মতের সহিত তাঁহার অমিল হইবার কোন কারণ নাই। তিনি বলিয়াছেন, সকলেরই দুটি দিক আছে—আমিও সেই কথাই বলিয়াছিলাম। —কল্যাণী সেনগুপ্তা, বাঁকুড়া

'দুর্নীতি দমনে নারী' প্রসঙ্গের আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত করা হইল। এই প্রসঙ্গে পত্রাদি আর প্রকাশ করা হইবে না।

—সম্পাদক দেশ

বেতারের গতমাসের রবীন্দ্র জন্মোৎসব

কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ২৫শে বৈশাখের দিন কি ধরণের কার্যসূচী রচনা করা উচিৎ তার বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম কয়েক সপ্তাহ আগে: আমাদের মোটামুটি বক্তব্য বিষয় ছিল যে, সেদিনে বেতারের ভিতর দিয়ে সকলের জন্যে এবং সকলকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব করতে হবে। গুটি কয়েক বাঁধাধরা লোক দ্বারা ঐ উৎসব দিনটি যেন পালন করা না হয়। যাঁরা এই দিনের কার্যসূচী অনুসারে আলোচনায়, গানে, অভিনয়ে যোগ দেবেন তাঁরা যেন এসে কেবল এইটুকুই স্পষ্ট করে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও কাজের ভিতর থেকে আমরা কি পেতে পারি যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের কাজে লাগতে পারে। ২৫শে বৈশাখ উপলক্ষ্যে কত স্মরণোৎসব নানা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা হলো, সবখানেই প্রায় এক কথা রবীন্দ্রনাথ কত বড়, তিনি এই বলেছেন, এই রকম করেছেন ইত্যাদি। কিন্তু তাঁকে আদর্শ করে চলতে আমরা পারি কিনা, চলতে হলে কি ভাবে তা পারবো, এই কথা কারু মুখ দিয়ে বের হতে দেখলাম না। বেতারের কার্যসূচীতেও আমরা এইরকম অভাব বোধ করলাম।

আরম্ভে কার্যসূচীতে যা ঘোষণা করা হয়েছিল তা দেখে বেশ বোঝা গেল যে সকলের জন্যে এবং সকলকে নিয়ে এই কার্যসূচীর কথা ভাবা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়টিকে সাজিয়ে ধরবার কোন চেষ্টাই ছিল না। কার্যসূচীটি ছিল অত্যন্ত মামুলী ধরণের। একটা উৎসব দিনের কার্যসূচী একে বলা চলে না কোনমতেই। ছাপার অক্ষরে কার্যসূচীটি দেখে সত্যই নিরাশ হয়েছিলাম। কিন্তু ঠিক সেই দিনেই কয়েকটি পরিবর্তন এখানে সেখানে লক্ষ্য করা গেল। বোঝা গেল তা শেষ মুহূর্তেই করা হয়েছে। কয়েকটি আলোচনাই এই পরিবর্তনের মধ্যে ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পরিবর্তনের কথা পূর্বে জানা না থাকায় অনেকেই তা শুনতে পায়নি। লেখাগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। কিন্তু যাঁরা এইসব আলোচনা করেন তাঁদের কাছে আমাদের বলবার কথা হল এই যে, রবীন্দ্র-

নাথ কি ভাবতেন, কি করতেন, কত বড় ছিলেন তাত' আমরা বুঝলাম; কিন্তু আমাদের জীবনে তাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি সে রকমের নির্দেশ তাঁরা দিতে পারলেন কি? তবুও এই রকমের আলোচনার মূল্য আছে—কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ঠিকভাবে ধরবার একটা চেষ্টা ছিল। এ ধরণের আরও নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারতো। কিন্তু তা করা হয়নি। বেশ অনুমান করা যায় যে, শেষ মুহূর্তে কোন কারণে কয়েকজনকে দিয়ে তাড়াতাড়িতে এই কার্যসূচী তৈরী করা হয়। এই তাড়াহুড়োর কারণ কি? আগে থেকে ঐ দিকে বেতারকর্মীদের চিন্তা খোলে না কেন বুঝতে পারি না।

ঐ দিনের কার্যসূচী নিয়ে আমরা আর একটি কথা বলেছিলাম, তা হল দুপুরে বেলা একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত যেসব গান শোনানো হয়, ২৫শে বৈশাখের দিনে তা না করে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বলা হোক বা তাঁরই রচিত বাঙলা গান শোনান হোক। যাদের কথা ভেবে ঐ সময় বিলিতি সংগীত বাজানো হয়, তারা কি বৎসরের একটি দিনের জন্যেও রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে পারে না? আমরা যত দূর জানি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এই সময়ের শ্রোতাদের অজ্ঞতা অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের চেয়েও শোচনীয়।

সকলের জন্যে ঐ দিনটি বলতে আমরা বুঝি যে, নানা দলের, নানা সমাজের, নানা ভাষার লোক সে দিন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদি করবে। হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই তাদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে যা বুঝেছে তাই বলুক। এ ছাড়া নানা ভাষার লোক তাদের ভাষায় এই আলোচনায় স্থান নিক।

ইংরেজি অলোচনা হয়েছিল। হিন্দি ভাষায় তা হল না কেন? ইংরেজিতে শিক্ষিত বাঙালীরা কয়েকজনে আলোচনা করলেন। মনে হয় কলকাতাবাসী শিক্ষিত কোন ইংরেজ যদি তা করত তা হলে খুবই ভাল হত। এই প্রসঙ্গে বাঙালী চরিত্রের একটি দুর্বলতার কথা এখানে না বলে পারছি না।

দেখা যায় শিক্ষিত বাঙালী আমরা ইংরেজি ভাষায় নিজ দেশবাসীকে দুকথা শোনাতে এখনো বেশ উৎসাহ বোধ করি। আমাদের হিন্দি ভাষার প্রতি বীতরাগ প্রবল। কলকাতা শহরে খাঁটি বাঙালী পাড়ায়, যেখানে কোন ইংরেজের বাস করার কোন সম্ভাবনা নেই, সেইখানে দেখি বাঙালী রোমান অক্ষরে বাড়ীর নাম, নিজের নাম লিখছে। অনেক বাড়ীর নাম ইংরেজী ভাষায় লেখা হয় তাও দেখেছি। সেই রকম বাঙালী পাড়ায় প্রায় দোকানেই দেখব রোমান অক্ষরে, ইংরাজী ভাষায় দোকানের নাম ও পরিচয় টাঙানো আছে। যেন ইংরেজীভাষীদের জন্যেই দোকান খোলা হয়েছে। অথচ যদি দেবনাগরী অক্ষরে নামগুলি লেখবার কথা বলা যায় তাহলে আমরা যথেষ্ট লজ্জা বোধ করবো। মনে করব আমরা "প্রগ্রেসিভ" বা "প্রগতিশীল" নই। বাঙলা ভাষার সর্বনাশ হল বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাবো। কিছু দিন আগে বাঙলা ভাষার কোন কাগজে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে বিহারের এবং বেনারসের মত বড় বড় তীর্থ স্থানে বাঙলা অক্ষরে রেল স্টেশনগুলির নাম লেখা হোক। বলা হয়েছিল তাতে বাঙালীদের সুবিধা হবে। তা না করলে বাঙলাভাষীদের প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু নিজেদের ঘরে রাস্তায়, দোকানে বাঙলা অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরে ও ইংরেজি ভাষায় যে নামের ছড়াছড়ি সেকথা তাদের মনে একবারও জাগে না। এ নিয়ে লজ্জাও বোধ করে না।

বেতারে ইংরেজী ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙালী মনের এই দিকটাই প্রকাশ পায়। ইংরেজী ভাষায় পড়তে বা বলতে পারি বলে নিজেদের মধ্যে সেই ভাষায় আলোচনা করা সত্যিই নির্বুদ্ধিতা। যদি এমন হোতো যে ইংরেজীভাষীরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কিছু বলতে পারেন, তখন বাঙালী হয়ে তাদের জন্যে ইংরাজী ভাষায় বলা চলে। কিন্তু কলকাতার মত শহরে ইংরেজী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বলতে পারে এমন একজনও ইংরেজ নেই একথা আমরা মেনে নিতে রাজী নই। এমন অনেক ইংরেজ প্রফেসর আছেন, পণ্ডিত আছেন, যাঁদের

বেতারে আমন্ত্রণ জানালে নিশ্চয়ই তাঁরা আনন্দের সংগে সে কাজ হাতে নিতেন। এইভাবে অন্য ভাষায়ও যদি আলোচনা হত তবে সত্যি আনন্দের বিষয় হত।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর মধ্যে জন্মেছেন এ বাঙালীর পরম গৌরবের কথা; কিন্তু আমরা তাই বলে যদি তাঁকে আমাদের ছোট মন নিয়ে নিজেদের মধ্যে গণ্ডিবন্ধ করে রাখি তবে তার মত অন্যায় আর কিছু নেই। আমরা ভাষার অধিকারে যে সুবিধা পেয়েছি আমাদের কর্তব্য হবে তাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

বেতার কর্তৃপক্ষকে আমরা অনুরোধ করি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবটিকে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা না করে অনেকের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেবার কথা ভাবুন। সকলকে এর মধ্যে ডেকে নিন। এবং একথা ভুলতে চেষ্টা করুন যে রবীন্দ্রনাথের সংগ বা সান্নিধ্যেই রবীন্দ্রনাথের গুণের অধিকার জন্মে না। শিবের সংগী গুণের অধিকার জন্মে না।

এই প্রসংগে বেতারে প্রোগ্রাম পরিচালকদের অজ্ঞতা ও গাফিলতির আরেকটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করব। পঁচিশে বৈশাখের বেতার-অনুষ্ঠানে গীতাঞ্জলি থেকে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি কবিতা Where the mind is without fear, head is held high (চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির) যাঁকে দিয়ে আবৃত্তি করানো হয়েছিল তিনি আবৃত্তিকার হিসাবে খ্যাত কিনা আমরা জানি না। আমরা জানি এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নিজ কণ্ঠে রেকর্ড করা আছে। সুতরাং এমন একটি দিনে রবীন্দ্রনাথের নিজ আবৃত্তির রেকর্ড না বাজিয়ে অপর একজন আবৃত্তিকার আনা হোলো কেন, তা আমাদের বোধগম্য হোলো না। কবি তাঁর স্বরচিত রচনা যে দরদ দিয়ে নিজে আবৃত্তি করে গেছেন সেই দরদকে উপেক্ষা করে অন্য ব্যক্তি দ্বারা এটি আবৃত্তি করিয়ে কত বড় ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন তা' তাঁরা হয়তো হৃদয়ংগম ক'রতেই পারেন নি এখনো। এটাকে প্রোগ্রাম পরিচালকদের অজ্ঞতার পরিচয় ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। তাঁদের অবগতির জন্যে আমরা আলোচ্য রেকর্ডটির নম্বর দিয়ে দিলাম—

H.M.V. P11856
Readings from Gitanjali
Spoken by Rabindranath Tagore

আরোও একটি কথা—একই ব্যক্তিকে দিয়ে ঐ দিনে তিনবার তিনটি অনুষ্ঠান করানো হয়। একবার বৈদিক স্তোত্র পাঠ, একবার বাঙলা কথিকা, একবার রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি। প্রোগ্রাম পরিচালকদের চৈতন্যোদয় ঘটে থাকে সব সময় শেষ মুহূর্তে। পঁচিশে বৈশাখ অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার মাত্র বারো ঘণ্টা আগে এ'রা কাকে দিয়ে কি করাবেন তাই নিয়ে তাড়াহুড়া আর দৌড়ঝাঁপ আরম্ভ করেন। তাই হাতের কাছে যাঁকে পান তাঁকে দিয়েই তিন তিনবার প্রোগ্রাম করিয়ে নিয়ে চাকরী বজায় রাখা ছাড়া আর কোন কাজই বা তাঁদের দ্বারা হতে পারে? রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাব দেখলে মনে স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগে যে, বাঙালী জাতি কি নিজের দেশের মহাপুরুষদের প্রতিও আন্তরিকতার সংগে সম্মান জানাতে ভুলে গেছে?

দুর্বৃত্তপনা প্রসারের কুৎসিৎ প্রবৃত্তি

দুর্বৃত্তপনার প্রসারে 'জিঘাংসা'ওয়ালারা এপর্যন্তকার আর সবাইকে টেক্কা মেরে চ'লেছেন। তাদের দৌরাত্ম্যবৃত্তি কেবলমাত্র ছবির মধ্যেই নিবন্ধ নয়, পরন্তু, ছবির বাইরেও, দুর্বৃত্তপনাকেই জীবনের ন্যায়-সংগত পরমকাম্য প্রমোদ ব'লে এরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে বিজ্ঞাপন মারফৎ প্রচার চালিয়ে আসছেন। ছবির মধ্যে ঠিক যেরকম বিকৃত ও বিধ্বংসী মনোবৃত্তির পরিচয় স্বতঃস্ফূর্ত পাওয়া যায়, ক্রাইম-ড্রামার প্রকৃতি অনুযায়ী লোককে পদে পদে ধোঁকা দেবার যে দৃষ্টান্ত তাতে তুলে ধরা হ'য়েছে, ছবির বাইরে, প্রচার ব্যাপারেও এরা ঐ মনোবৃত্তিরই বশে লোককে ধাপ্পা দিয়ে স্বর্মতে নিয়ে আসার জন্যে ঐরকমেরই দুষ্কৃতিকে অবলম্বন ক'রে নিয়েছে।

লোকের চোখে ধুলো দিয়ে সাধুর বেশ ঢাকা যে দুর্বৃত্তের জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থতা নিয়ে ছবিখানি তৈরি সেই চরিত্রটাই যেনো ছবি থেকে বেরিয়ে এসে জাল প্রশংসা-পত্র ছাপিয়ে নিজের সাধুপনা জাহির ক'রে যাচ্ছে। ছবিখানির আলোচনা প্রসঙ্গে 'দেশ' লিখেছিলো—"ক্রাইম-ড্রামা এখানে এপর্যন্ত যতো তোলা হ'য়েছে, 'জিঘাংসা' তাদের মধ্যে সবচেয়ে তেজী। তার কারণ ক্রাইম-ড্রামার ক্রাইমকে অর্থাৎ অপরাধের সূত্র ও মোক্ষকে, অর্থাৎ হত্যাদিকে সাংঘাতিক ক'রে তুলতে কলাকুশলতার বাহাদুরী যতোখানি থাকা দরকার, অভিনয় যে-ধাপে পৌঁছনো দরকার, সেসব দিক থেকে 'জিঘাংসা' এদেশের ছবির একটা নিরিখ হ'য়ে ওঠার যোগ্যতা নিয়ে হাজির হ'য়েছে।" ছবিখানির প্রকৃতরূপ এখানেই স্পষ্ট ব'লে দেওয়া হ'য়েছে। এ বক্তব্যে স্পষ্টই জানানো হ'য়েছে যে 'জিঘাংসা'তে ক্রাইম অর্থাৎ অপরাধ-প্রবণতা সাংঘাতিক রকম তেজী এবং সে-তেজ ফুটিয়ে তুলতে যন্ত্রকৌশলের যে পরিমাণ বাহাদুরী দরকার সেদিক থেকেই ছবিখানি একটি নিরিখ। কিন্তু 'জিঘাংসা'র সেই জালিয়াৎ দুরাত্মা বিজ্ঞাপনে 'দেশ' ব'লেছে বলে ছাপিয়ে দিলে--'ক্রাইম-ড্রামা' এখানে এ পর্যন্ত যত তোলা হ'য়েছে, জিঘাংসা তাদের মধ্যে সবচেয়ে তেজী......জিঘাংসা এ দেশের ছবির একটা নিরিখ হয়ে ওঠার যোগ্যতা নিয়ে হাজির হয়েছে।" অর্থাৎ ছবির আসল প্রকৃতি সম্পর্কে 'দেশ'এর যা বক্তব্য ছিলো মাঝের সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে ছবিখানিকে সমগ্রভাবে মায় ওর চেতনা অবশকারী, ক্রুর ও বীভৎস বিষয়বস্তু সমেতই নিরিখ হবার যোগ্য বলে 'দেশ'এর দোহাই দেওয়া হ'য়েছে—খুনের অপরাধকে চাপা দেবার জন্যে খুনির সাধুবেশ ধারণের মতোই এই জালিয়াতি 'জিঘাংসা'ওয়ালাদেরই যোগ্য প্রকৃতির পরিচয়।
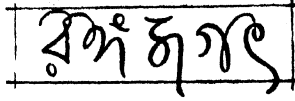
'দেশ'-এর সমালোচনার প্রত্যুত্তরে এরা রীতিমতো প্রবন্ধাকারে এক একজনের নাম দিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বিজ্ঞাপন প্রকাশ ক'রে যাচ্ছেন। এটাও ছবিরই দুর্বৃত্তের মতো দ্বৈত-প্রকৃতির অর্থাৎ অপরাধীর গা-ঢাকা দেবার মতোই একটি ছল। আর এই সব বিজ্ঞাপন-প্রবন্ধে কল্পিত-মিথ্যাকে আবরিত করে বার বার এই কথাই বলা হ'চ্ছে যে, "দেশে Cuckoo-র যৌন আবেদনপূর্ণ নাচ না থাকলে ছবি বিক্রী হয় না" এবং "ছোটোভাই-এর মত ছবি প্রযোজকের headache হ'য়ে দাঁড়ায়," সুতরাং এহেন দেশে "জিঘাংসার গল্প মনোনয়ন করে প্রযোজকরা কোন অন্যায়" করেন নি। চেপেচুপেও এরা ব'লতে চাই-ছেন যে, "Cuckoo-র যৌন আবেদনপূর্ণ" ছবির ওপরেই দেশের লোকের ঝোঁক এবং সেই ঝোঁকের দিকেই লক্ষ্য রেখে জিঘাংসা তৈরি হ'য়েছে। অর্থাৎ এরা নিজেরাই স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন যে "Cuckoo-র যৌন আবেদনপূর্ণ" ছবি আর জিঘাংসা, গুণপনায় দুটিই সমগোত্রীয়। শুধু তাই নয়।

প্রসঙ্গত 'দেশ'-এ বলা হ'য়েছিলো, "ছবি তৈরি হয় তিনটি প্রয়োজনের জন্যে—প্রমোদের জন্যে, প্রেরণা দেবার জন্যে, আত্মার তুষ্টি এবং প্রশান্তির জন্যে।" এই মন্তব্যকে অযৌক্তিক ব'লে প্রমাণ করার জন্যে 'জিঘাংসা'ওয়ালারা "গণতন্ত্রের যুগে জনমতের রায়" হিসেবে "খিড়কী, সানাই, সরগম প্রভৃতি ছবির সাফল্য এবং স্বামীজী, ছিন্নমূল, মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ছবির অতি সামান্য সাফল্যের কথা" উল্লেখ ক'রে-ছেন। ছবিতে যেমন দুর্বৃত্ত ভিষগাচার্য সেজে তার অপকীর্তিকে আড়াল ক'রে অপরাধপ্রবণতার মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর জৌলুষ নিয়ে আসতে চেয়েছে এখানে এই বিজ্ঞাপনেতে এরা "গণতন্ত্রের যুগে জনমতের রায়" ব'লে দোহাই দিতে গিয়ে ঐ একই দুরাত্মাবৃত্তিরই পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ এরা বলতে চাইছেন যে, জনমতের রায় মেনেই খিড়কী, সানাই, সরগম প্রভৃতিরই পথ অনুসরণ ক'রে জিঘাংসা তোলা হ'য়েছে—দেশের লোকের রুচি ও ধারণার এমন বিকৃত ব্যাখ্যাও দেখা যায় নি কখনও, আর, কোন চিত্রনির্মাতাই দেশের লোকের রুচি ও ধারণা সম্পর্কে অমন কুৎসিৎ মন্তব্য প্রকাশ ক'রতে সাহস করে নি। জানি না, দেশের লোক কিভাবে এর প্রত্যুত্তর দেবে।

যে প্রযোজক "গণেশ ওলটানো" থেকে বাঁচবার প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে যৌনাবেগ-পূর্ণ নাচ, আর খিড়কী, সানাই, সরগম-এর মতো ন্যক্কারজনক ছবিই আদর্শ ব'লে ধরে, "জনমতের রায়" ব'লে দোহাই দিয়ে নিজে-দের হিংস্রতা ও বিদ্বেষপ্রণোদিত দুরাত্মা-বৃত্তি তোষণের ধান্দা খুঁজে বেড়ায়, 'জিঘাংসা'ওয়ালাদের মতো সেই সব চিত্র-নির্মাতারা সরে না পড়া পর্যন্ত বাঙলা চিত্রশিল্পের মঙ্গলও নেই, মর্যাদাও আসবে না।

যারা আলোর সুন্দরতাকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে চলাটাই জীবনের পরম গতি মনে করে, যারা মনে করে অন্ধকারের কালিমার মধ্যেই তুষ্টি ও প্রশান্তি রয়েছে, যারা বলে, entertainment মানে দুরন্ত গতিবেগ, যাদের প্রচারধর্ম হ'চ্ছে রুচি ও সংস্কৃতির চেয়ে পয়সা করাই মূল কথা, সেই সব ব্যর্থ-জীবনের বিফল ও বিকৃত মন দেশের ও দশের পক্ষে যে কতখানি অনিষ্টকর হ'তে পারে 'জিঘাংসা' তারই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এরা বলতে চায় যে বিভীষিকা সৃষ্টিতেই আনন্দ, নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখানোই হ'চ্ছে আদর্শ প্রমোদ, নার্কোটিকের নেশার মতো মনকে অবশ ক'রে দেওয়াই হ'চ্ছে প্রেরণা-দায়ক! নিতান্তই এদেরই মতো রুচি বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধ সেন্সর বোর্ড ছিলো ব'লে এ ছবিও 'সর্ব-সাধারণ্যে প্রদর্শনযোগ্য' ব'লে ছাড়পত্র পায়—দুর্বৃত্তপনা প্রচারে 'জিঘাংসা'ওয়ালাদের সেইটেই হ'চ্ছে দম্ভের কারণ। কিন্তু জন-সাধারণও কি এদেরই দলের?

থিয়েটারকে বাঁচাতে হবে

দিন কয়েক আগে নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে বাঙলা রঙ্গালয়ের শিল্পী, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনা ব্যাপারে চলচ্চিত্রশিল্প, সাহিত্যিক এবং শিল্পরসিক-দেরও অনেকেই যোগদান করেন। বাঙলা রঙ্গমঞ্চে শচীন্দ্রনাথের দান সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করে বলেই সর্বমহলে সেদিনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে একটা অভূতপূর্ব সাড়া দেখা দিয়েছিলো। একটু ব্যাপকভাবে এই সাড়াটিকে বিচার ক'রলে বলা যায় যে, শচীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানানোর একটা উপলক্ষ্য পেয়ে সকলে বাঙলা মঞ্চের ওপরে তাদের গভীর দরদটাই প্রকাশ করেছেন। মঞ্চের ওপরে তাদের আন্তরিক নিষ্ঠা ও অনুরাগটাই সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে উঠতে দেখা গিয়েছিলো।

বস্তুত, থিয়েটারের ওপরে এখনও লোকের যে মোহ রয়েছে, একদিক থেকে ধরতে গেলে, চলচ্চিত্র এখনও সে-আভিজাত্য অর্জন করে নি। থিয়েটারের ওপরে সর্বশ্রেণীর সকল বয়সের লোকের যে ঝোঁক এখনও দেখতে পাওয়া যায়, থিয়েটারের আবেদনকে লোকে যতো সহজভাবে গ্রহণ করে, আর কোন প্রমোদ-মাধ্যমই লোকের মনে অতোটা অন্তরঙ্গ হ'য়ে নেই।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই থিয়েটারই আজ প্রায় লুপ্ত হ'য়ে যাবার পথ ধ'রেছে। এর কারণ অনেক আছে এবং তা নিয়ে আলোচনাও হ'য়েছে বা হ'চ্ছেও, কিন্তু এখন আলোচনা পর্যায়কে বাদ দিয়ে অনতি-বিলম্বেই এমন কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার হ'য়ে পড়েছে যাতে লোপ পাওয়ার দিক্ থেকে এর গতি ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সারা ভারতের মধ্যে স্থায়ী থিয়েটারের ব্যবস্থা একমাত্র কলকাতাতেই আছে এবং থিয়েটার নিয়ে যা কিছু আন্দোলন তা এতাবৎকাল এই শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। এখনকার এই হাজামরা অবস্থার মধ্যেও এমন সব প্রতিভা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা ক'রছে যাদের কৃতিত্ব পৃথিবীর যে-কোন মঞ্চের সঙ্গেই তুলনীয়। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে এই সব নতুন প্রতিভারা কলকাতাতে তো যথোপযুক্ত আদর পাচ্ছেই না এমন কি, ভারতীয় নাট্য আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার দাবীও আজ আর স্বীকৃত হ'চ্ছে না। থিয়েটার বলতে যা কিছু হয় কলকাতায়, ভারতের মধ্যে উল্লেখ করবার মতো গত দেড়-শো বছরের মধ্যে যতো নাটক রচিত হ'য়েছে তার সব ক'খানিই কলকাতারই দান এবং অন্যত্র কোথাও কলকাতার মতো থিয়েটারের সেবক ও পৃষ্ঠপোষক না থাকলেও, এখন ভারত গভর্নমেণ্টের নির্দেশে ভারতব্যাপী জাতীয় নাট্য আন্দোলনের যে খসড়া তৈরি হ'চ্ছে তাতে কলকাতার ওপরে কোন প্রাধান্য রাখা হয় নি। ভাবগতিক থেকে স্পষ্টই

মহাজাতি সদনে শ্যামা অভিনয়কালে সেবা মিত্র

বোঝা যাচ্ছে যে কলকাতার মঞ্চ সরকারী পৃষ্ঠপোষণ থেকে বঞ্চিতই হবে; অথচ একথাও অনস্বীকার্য যে, কলকাতার সহ-যোগিতা এবং মুখ্যত কলকাতার নাটুকে-দের হাতে বেশী দায়িত্ব ছেড়ে না দিলে ভারতীয় নাট্য আন্দোলনকে কিছুতেই সফল ক'রে তোলা সম্ভব নয়, যে যতো চেষ্টাই করুক।

বর্তমানে নাট্য-মঞ্চের সংকট কেবলমাত্র কলকাতাতেই নয়, পৃথিবীর বহু দেশে, এমন কি মঞ্চ-পাগল নিউইয়র্ক, লণ্ডন, ভিয়েনা, প্যারীস প্রভৃতি স্থানেও দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। আমেরিকায় একে সিনেমার প্রতিযোগিতা তার সঙ্গে ক'বছর হ'লো এসে জুটেছিলো টেলিভিসন, এখন সম্প্রতি এসে জুটেছে ফোনভিসন—বাড়ীতে আরাম কেদারায় শান্ত পরিবেশের মধ্যে বসে প্রমোদ উপভোগের এই সুযোগ মঞ্চের পৃষ্ঠপোষক কমিয়ে দিচ্ছে। লণ্ডনে কতকটা আমেরিকার মতো অবস্থা, আর কতকটা লোকের আর্থিক দুর্গতি। ভিয়েনার মঞ্চ যুদ্ধের সময় তো প্রায় লুপ্তই হয়ে গিয়েছিলো, এখন আস্তে আস্তে আবার বেঁচে উঠার চেষ্টা করছে। ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্রই কিন্তু মঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখার অদম্য চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। সিনেমা প্রধান প্রতিযোগী হলেও সিনেমার কর্ণধাররাও থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার যে কিভাবে চেষ্টা করছে তার উদাহরণ পাওয়া যায় আমেরিকা ও বিলেত, থেকে। আমেরিকার কয়েকজন চিত্রপ্রযোজক ছবির আয়ের অংশ থিয়েটারকে সাহায্য করার জন্যে দেবার ব্যবস্থা করেছে। বিলেতে সম্রাটকে প্রধান অতিথি রেখে বিশেষ চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়, আর বিক্রয়লব্ধ টাকা থিয়েটারের সাহায্যে প্রদান করা হয়। প্যারীসে মঞ্চানুষ্ঠানের ওপর প্রমোদ-কর রেহাই করে দেওয়া হয়েছে। ভিয়েনাতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর টিকিটের ওপর প্রমোদ-করের সঙ্গে একটি বিশেষ কর ধরে নেওয়া হয় যে টাকাটা থিয়েটারের উন্নতির জন্যে প্রদান করা হয়। কলকাতার রঙ্গালয়ে পূর্ণোদ্যমে চলবার শক্তি ফিরিয়ে আনতে গেলে ঐরকমই কোন কোন ব্যবস্থা প্রচলিত করা দরকার হয়ে পড়েছে। জনসাধারণের কাছ থেকে এ বিষয়ে সহযোগিতার অভাব ঘটবে না, সরকার পক্ষ সাহায্যের জন্য তৎপর হলে তবেই পথ করে নেওয়া যেতে পারবে। সরকার পক্ষের তরফ থেকে সাড়া পাওয়া যাবে না কি?

পরলোকে সেবা মিত্র

গত ২১শে মে, সোমবার রাত্রি ১০টায় নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী সেবা মিত্র কলকাতায় টালিগঞ্জের বাড়ীতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হয়েছিল। সেবা মিত্র মেদিনীপুর জেলার লাক্ষার বিখ্যাত জমিদার সুবোধনারায়ণ মাইতির কন্যা।

শৈশবে শান্তিনিকেতনে পাঠভবনে অধ্যয়নকালে নৃত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয় এবং পাঠভবনের অধ্যয়ন শেষ করে নৃত্যশিল্পচর্চার জন্য সঙ্গীত-ভবনে যোগদান করেন। এই সময়ে ১৯৩৮

সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের বহু উৎসবানুষ্ঠানে ও নৃত্যাভিনয়ে বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা,' 'চণ্ডালিকা,' 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রভৃতি কলকাতায় মঞ্চস্থ হলে শ্রীমতী সেবা প্রধান অংশে অবতীর্ণা হন এবং তাঁর নৃত্যমাধুর্য ও অভিনয়নৈপুণ্য কলকাতা বোম্বাই, দিল্লী, পাটনা এমন কি সুদূর সিংহল দেশের দর্শকদেরও পর্যন্ত মুগ্ধ ও অভিভূত করে।

তিনি শান্তিনিকেতনে সংগীতভবনে শিক্ষা সমাপন করে কিছুকাল সেখানে নৃত্যের অধ্যাপনাও করেছিলেন। শান্তি-নিকেতনের কলাভবনের ভূতপূর্ব ছাত্র ও নিউ থিয়েটার্স লিঃ-র আর্ট ডিরেক্টর শ্রীসুনীতি মিত্রের সংগে বিবাহের পর তিনি দক্ষিণী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে যোগদান করেন।

গত পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে মহাজাতি সদনে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য তাঁরই পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় এবং তিনিই শ্যামার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে নৃত্যের আবেদনে দর্শকদের মন বেদনা-মধুর আবেশে আচ্ছন্ন করে তোলেন। শ্যামা অভিনয়কালে শ্রীমতী সেবা শারীরিক অসুস্থ ছিলেন, তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে যোগদানের আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন নি। শ্যামা অভিনয়ের পরেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে এবং মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানের পরেই, দুর্বল শরীর নিয়ে তিনি শেওড়াফুলিতে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে 'শ্যামা' মঞ্চস্থ করেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারার যে বৈশিষ্ট্য তা ছাত্রছাত্রী পরম্পরায় বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া অন্য উপায় নেই। সেবা মিত্র ছিলেন এই নৃত্যধারার ধারক ও বাহকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর অকালমৃত্যুতে শান্তি-নিকেতন তথা বাঙলা দেশের এই নবনৃত্য আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

নিউ এম্পায়ারে নৃত্যানুষ্ঠান

আগামী ২৭শে মে, রবিবার সকালে ১০-৩০ মিঃ নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে 'বাণী কলা মন্দিরের' প্রযোজনায় একটি নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী বিনয়বিহারী।

কিছুদিন আগে ইনি সাধনা বোসের নৃত্য-সহচর ছিলেন ও সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর নৃত্যকলা দেখিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে ইনি শ্রীদুর্গা নামে একটি নৃত্যনাট্য কলিকাতার কলা-রসিকদের সামনে উপস্থিত করবেন। বিনয়বিহারীর নৃত্য সঙ্গিনী হয়ে অবতীর্ণা হচ্ছেন শ্রীমতী মালা। অন্যান্য ভূমিকায় সহযোগিতা করছেন শ্রীমতী মীরা, মণিকা, সুজাতা বিশ্বাস, লক্ষ্মী, মঙ্গল চ্যাটার্জি, কাল্লু কাহার, মিহির, প্রভাতকুমার ইত্যাদি।

সংগীত পরিচালনা ক'রছেন উদীয়মান সংগীতবিশারদ শ্রীবিনয় চ্যাটার্জি, সেই সংগে তিনটি অংকের নাটক 'চোয়ান্নী' (হিন্দী) অভিনীত হইবে। পরিচালনা করবেন মতিবাবু। নাম ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবেন শ্রীমতী লক্ষ্মী, মদন ট্যান্ডন, প্রভাতকুমার, জয়শংকর ইত্যাদি। প্রযোজনা করবেন রামকুমার আগরওয়ালা। ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করছেন প্রভাতকুমার।

এই অনুষ্ঠানের পর এই নৃত্য সম্প্রদায়টি উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি শহরে আমন্ত্রিত হয়ে নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য যাত্রা করবেন।

শিল্পশ্রীর নূতন নাটক পূর্বাপর

গত ১৪ই মে, সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীঅমল হোমের পৌরোহিত্যে হরিপদ বসু রচিত "পূর্বাপর" নাটকখানি শিল্পশ্রীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনীত হয়।

নাটকখানি পরিচালনা করেন সুধামাধব চট্টোপাধ্যায়, সুর সংযোজনা অজিত বসু।

এই উৎসব উপলক্ষে শিল্পশ্রীর কর্তৃপক্ষ মঞ্চের প্রত্যেকটি সিফটার, লাইটম্যান ও ড্রেসারকে একখানি নতুন কাপড় ও নাটকের প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীকে "পূর্বাপর" লেখা বোতাম ও ব্রোচ উপহার দেন। সৌখিন সম্প্রদায়ে এ জাতীয় উপহার দেয়া এই প্রথম।

সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, শ্যাম লাহা, শোভা সেন, আর এস ত্রিবেদী, আই সি এস, আর কে ঘোষ, জে এন মুখার্জি, এইচ এন চিবলা, ডি এন পাল, নিতাই দে প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে "পূর্বাপর" নাটকটি অভিনীত হয়।

নাটকের সম্বন্ধে বলতে গেলে এইটুকু বলতে হয় "পূর্বাপর" নাটকটি সামাজিক সমস্যার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। সংলাপ বড়ই প্রাণস্পর্শী। চরিত্রগুলি বলিষ্ঠ এবং ঘাতপ্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। তবে সংলাপ একটু কমান দরকার।

অভিনয়ের দিকে পরিমল সেনের মিঃ লাহিড়ী অপূর্ব। দীপেন ঘোষের মহেশ্বর মর্মস্পর্শী। পাগলা জারনালিস্ট মৃত্যুঞ্জয় সেনের ভূমিকায় সুধীর মুস্তফীর আরও একটু সংযত অভিনয়ের প্রয়োজন ছিল।

এ ছাড়া, অহীন ঘোষের শ্রীপতি, অনন্ত রাওর অতনু, আশু মুখার্জির নিদানবন্ধুর অভিনয় ভালো হয়েছে।

পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে অজিত ভট্টাচার্যের প্রজাপতি, জয়দেব মুখার্জির সঘনর... অনবদ্য।

মেয়েদের মধ্যে মঞ্জু দের চন্দা সবচেয়ে প্রাণস্পর্শী। পিয়াসার চরিত্রে পারুল ক... সুঅভিনয় করেছেন। পুতুলের ও মালা... চরিত্রে অমিয়া রায় ও বীণা ঘোষ ভাল অভিনয় করেছেন।
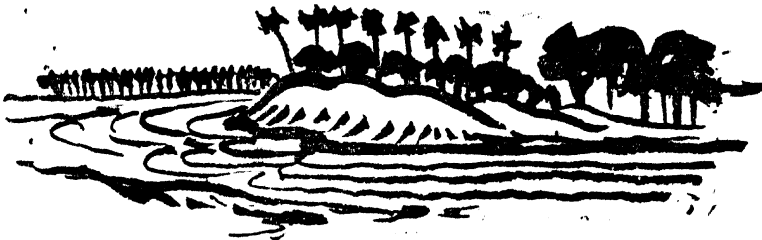
ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের বিভিন্ন দলের খেলার অনুষ্ঠান তালিকা এইবারে সাধারণ ক্রীড়ামোদী ও দর্শকগণের যেরূপ বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে ইতিপূর্বে তাহা কখনই পরিলক্ষিত হয় নাই। কারণ ইতিপূর্বে কোন বৎসরেই তিনসপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশ দলকে চারিটি অথবা পাঁচটি খেলায় যোগদান করিতে ও অপর দুইটি দলকে মাত্র দুইটি খেলায় যোগদান করিতে দেখা যায় নাই। ইহার পরিণাম হিসাবে হইয়াছে এই যে, সাধারণ ক্রীড়ামোদী ও দর্শকগণ নানা প্রকার কটূক্তি পর্যন্ত করিতেছেন। এই সকল উক্তি পরিচালকমণ্ডলীর উপর বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা বেশ নীরব আছেন দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য হইতে পারেন, কিন্তু আমরা হই নাই। দলবিশেষের প্রতি কৃপাদৃষ্টিদান ইহা পরিচালকদের চিরাচরিত প্রথা। এই প্রথার সম্পূর্ণ রোধ করিতে হইলে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা সাধারণ ক্রীড়ামোদী বা দর্শকগণ করিবেন বলিয়া আমাদের ভরসা নাই, সুতরাং তাহা আমরা উল্লেখ করিতে চাহি না, আমরা কেবল এইটুকুই বলিব "এই পরিচালকমণ্ডলী যতদিন আছেন ততদিন সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন কার্যকলাপ কখনই সম্ভব নহে।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ফেডারেশনের সভায় ফুটবল প্রতিযোগিতা অবশ্য অনুষ্ঠান তালিকার মধ্যে থাকিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সংবাদ ভারতের ফুটবল পরিচালক ও খেলোয়াড়দের বিশেষভাবেই উৎসাহিত করিবে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে অনেক বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানেই ফুটবল খেলার ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহা আর হইবে না। ভারতে ফুটবল পরিচালকগণ খেলার মান বা স্ট্যাণ্ডার্ড উন্নততর করিবার জন্য ইহার পর হইতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

খেলোয়াড়দের নম্বরযুক্ত জামা

বৈদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার সকল অনুষ্ঠানেই বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়দের নম্বরযুক্ত জামা পরিহিত অবস্থায় মাঠে খেলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের কোন স্থানেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত নাই। সম্প্রতি কলিকাতা মাঠে রাজস্থান ক্লাবের পরিচালকগণ এইরূপ নম্বরযুক্ত জামা প্রবর্তন করায় মাঠে বেশ অভিনবত্ব সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে কেবল যে খেলোয়াড়দের গতিবিধি লক্ষ্য করার সুবিধা হয় তাহা নহে ঠিক কে গোল দিল বা কাহার জন্য উহা সম্ভব হইল তাহাও নির্দিষ্ট করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না। কলিকাতার সকল বিশিষ্ট দলের পরিচালকগণ অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে আমরা খুশী হইব। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়দের নামের তালিকা প্রতিদিন যদি ছাপা হরফে মাঠে বিলি হয় তাহা হইলে দর্শকদের বা ক্রীড়া-সাংবাদিকদেরও বিশেষ সুবিধা হয়। এইরূপ প্রথা বিদেশের অনেক স্থানেই প্রচলিত আছে বলিয়া আমরা জানি। যদি শেষ মুহূর্তে কোন খেলোয়াড়কে পরিবর্তন করিতে হয় তাহাও মাইকযোগে মাঠে খেলা আরম্ভ হইবার পূর্বেও ঘোষণা করিলে চলিবে। এই ব্যবস্থাও বিদেশে আছে বলিয়াই উল্লেখ করিতে আমরা সাহসী হইতেছি। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে সুনাম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আমাদের আছে, সুতরাং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসরণ করায় কোন দোষ আছে কি?

বিশ্ব অলিম্পিক দল গঠনের তোড়জোড়

হেলসিঙ্কির ১৯৫২ সালের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারতীয় ফুটবল দল গঠনের জন্য কি তোড়জোড় চলিয়াছে তাহা সঠিক না জানা থাকিলেও আলোচনা প্রসঙ্গে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে একটি বাছাই খেলোয়াড় দলকে কোন শৈলাবাসে শিক্ষাধীনে রাখিয়া পরে চূড়ান্তভাবে দল গঠিত হইবে। এই বিষয়ে বাঙলার কর্তৃপক্ষগণ কি করিতেছেন জানিতে ইচ্ছা হয়। ইহারা কি এখন হইতেই বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-কৌশল অবলোকন করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন করিলে খুবই ভাল হয়। হঠাৎ একদিন বসিয়া খেলোয়াড় নির্বাচন করা অপেক্ষা মরসুমের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল খেলোয়াড়কে লক্ষ্য করিয়া নির্বাচন করিলে অনেক দোষ-ত্রুটিই অপসারিত হইবে। পক্ষপাতিত্ব করা হয় বলিয়া যে সকল অভিযোগ শুনা যাইয়া থাকে তাহাও ভবিষ্যতে শুনিতে হইবে না এই ভরসা আর কেহ না দিলেও আমরা দিতে পারি। তবে এই বিষয়ে একটি কথা না বলিয়া পারি না যে, আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর গঠিত খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর উপর অনেকেরই আস্থা নাই। প্রকৃত জ্ঞানী খেলোয়াড়দের লইয়াই উক্ত খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হওয়া উচিত। কোন দিন কোন প্রথম শ্রেণীর খেলায় যোগদান করেন নাই এই লোককে খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীতে দেখিলে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

অফিস ফুটবল দলসমূহের অসুবিধা

কলিকাতার বিভিন্ন অফিস ফুটবল দলের নিজস্ব মাঠ না থাকায় ইহাদের বিভিন্ন খেলার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যহানিকর ইহা না বলিয়া আমরা পারি না। বেলা ৪টার সময় প্রখর রৌদ্রের মাঝে ফুটবল খেলা অসম্ভব। ইহাদের খেলার অনুষ্ঠান প্রাতঃকালে করিলে বোধ হয় তত দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে না। তবে ইহাতে বিভিন্ন অফিসের কার্য পরিচালনায় অসুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিদিনই প্রত্যেক দলকে যখন খেলিতে হইবে না তখন অফিস দলের ফুটবল খেলোয়াড়দের খেলার দিনের বিলম্বে অফিসে যোগদানের নির্দেশ যদি কর্মাধ্যক্ষগণ দেন তাহা হইলে বোধ হয় সকল সমস্যার সমাধান হয়।

হকি

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা একরূপ শেষ পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। যে চারিটি দলকে বাছাই করিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে খেলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে ইতিমধ্যেই কয়েকটি দল সাফল্য লাভ করিয়া সেমি-ফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। ইহার মধ্যে পাঞ্জাব ও বোম্বাই দলের নাম উল্লেখযোগ্য। বাঙলা দল শীঘ্রই খেলিবে। নির্বাচিত দলই ছিল দুর্বল তাহার উপর দলের অধিনায়ক কর্মক্ষেত্রের কর্তাদের জন্য দলের সহিত যাইতে পারে নাই। সামান্য এক সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করা কি এত অসম্ভব ব্যাপার হইল বুঝা কঠিন। বাঙলা দলকে মহীশূর দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। মহীশূর দল বেশ শক্তিশালী। শক্তিহীন বাঙলা দল ইহাদের বিরুদ্ধে কি করিবে বলা খুবই কঠিন। বাঙলা দল সাফল্য লাভ করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

অলিম্পিক হকি দল গঠনের ব্যবস্থা

নিখিল ভারত হকি ফেডারেশন জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ২২টি খেলোয়াড়কে লইয়া দুইটি দল গঠনের মনস্থ করিয়াছেন। এই দুইটি দলকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী খেলাতে যোগদান করিতে হইবে। ইহার পর ইহাদের মধ্য এক শিক্ষা-শিবিরে রাখিয়া নিয়মিতভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পরে ঐ সকল খেলোয়াড়দের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল গঠন করা হইবে। যে ব্যবস্থা হইয়াছে ইহা প্রকৃত কার্যকরী হইলে ফল ভালই হইবে। বাঙলার কোন খেলোয়াড় এই ২২জনের মধ্যে পড়িবেন কি না সেই বিষয় সন্দেহ আছে। তবে বাঙলার ভরসা মিঃ গুপ্ত। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি বাঙলার খেলোয়াড়দের দলভুক্ত নিশ্চয়ই করিবেন।

দেশী সংবাদ

১৪ই মে—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত ১২ই মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যার ফলে দুইশত লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব অদ্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, যে সকল কাপড়ের কল নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করিবে না—গভর্নমেণ্ট সেই সকল বস্ত্র-কলের কার্য পরিচালনভার গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অদ্য হইতে টাকা দেওয়া এবং অন্যান্য প্রকার লেন-দেন বন্ধ রাখিয়াছেন।

১৫ই মে—করাচীর সংবাদে প্রকাশ, অদ্য পাকিস্থান সৈন্য ও বিমান বাহিনীর দশজন অফিসারকে সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের বিচারের জন্য পাকিস্থান সরকার তিনজন বিচারপতিকে লইয়া একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করিয়াছেন।

ভারত সরকারের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কেশকার অদ্য পার্লামেণ্টে '১৯৫১ সালের আসাম সীমানা পরিবর্তন বিল' পেশ করেন। এই বিল দ্বারা উত্তর আসামের দেওয়ানগিরি নামক স্থানের ৩২ বর্গমাইল স্থান ভুটানকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র ও খ্যাতনামা ব্যারিস্টার শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন অদ্য তাঁহার পাম এভেনিউস্থ বাসভবনে ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৬ই মে—অদ্য পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু শাসনতন্ত্র (প্রথম সংশোধন) বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, আদালতের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা, অথবা নাগরিক, সংবাদপত্র বা গোষ্ঠীবিশেষের অধিকার খর্ব করা বিলের উদ্দেশ্য নহে, সমাজ-জীবনের উন্নতির পথে সর্ববিধ প্রতিবন্ধক দূর করাই উহার উদ্দেশ্য।

গত শনিবার ফরিদপুর জেলার উপর দিয়া যে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনশতাধিক লোক নিহত এবং বার শত লোক আহত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় লোকজনের কাছ হইতে জানা যায়, ঘূর্ণিবাত্যা মাত্র পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা সঙ্ঘটিত হয়। পাঁচটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

নাগা জাতীয় পরিষদ ভারতের রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেণ্টের সদস্যগণকে জানাইয়াছেন যে, নাগাস্থানে নাগাদের স্বাধীনতার প্রশ্নে গণ-

ভোট গ্রহণ করা হইতেছে। কোহিমায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের নেতা হইতেছেন মিঃ এ ফিজো।

অদ্য কলিকাতায় ৭নং ক্রীক লেনে অবস্থিত একখানি দোতলা বাড়ীর পূর্ব দিকের ৪খানি ঘরসহ একাংশ ধ্বসিয়া পড়ে।

১৭ই মে—সদ্যোবিলুপ্ত ডেমোক্র্যাটিক ফ্রণ্টের নেতা আচার্য জে বি কৃপালনী কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন।

পার্লামেণ্টের ও রাজ্য পরিষদের নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা নির্ধারণ করিয়া রাষ্ট্রপতি যে আদেশ জারী করিয়াছেন, গতকল্য পার্লামেণ্টে তাহা পেশ করা হইয়াছে। লোক-সভার ও রাজ্যের ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে যে সকল নির্বাচন কেন্দ্রে বিভাগ করা হইবে, উহাদের নাম, আয়তন ও প্রদত্ত আসন-সংখ্যা এই আদেশপত্রে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্ধমানের সংবাদে প্রকাশ, প্রায় একশত রেলকর্মীর এক জনতা বর্ধমান লোকো শেডের নিকটস্থ এক উদ্বাস্তু কলোনী আক্রমণ করে; ফলে পূর্ববঙ্গের জনৈক উদ্বাস্তু নিহত হইয়াছে এবং জনৈকা উদ্বাস্তু নারী সমেত অপর আটজন আহত হইয়াছে।

১৮ই মে—তিনদিনব্যাপী বিতর্কের উপসংহারে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর বক্তৃতার পর অদ্য পার্লামেণ্টে শাসনতন্ত্র (প্রথম) সংশোধন বিল সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট দাখিলের সময় দুই দিন বৃদ্ধি করিয়া ২৩শে মে করা হইয়াছে।

১৯শে মে—নয়াদিল্লীতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ঢাকার মুসলমানগণ বলপূর্বক কয়েকটি হিন্দু অধ্যুষিত বাড়ীতে প্রবেশ করায় শহরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতের বৃহত্তম টায়ার ও টিউব প্রস্তুতকারক ডানলপ কারখানা অদ্য হইতে এক মাসের জন্য কার্বনের স্বল্পতার দরুণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, আফগান সীমান্তে বিপুলসংখ্যক পাকিস্থানী সৈন্য সমাবেশ করা সম্পর্কে আফগান সরকার পাকিস্থান গবর্নমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

২০শে মে—মাদ্রাজের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রী টি প্রকাশম অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস সভাপতির নিকট তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্থান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত সর্বশেষ রিপোর্টে জানা যায় যে, গত ১২ই মে তারিখে ফরিদপুর জেলার একাংশের উপর দিয়া যে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে, তাহার ফলে পাঁচ শত লোক নিহত ও দুই হাজার লোক আহত হইয়াছে।

পাকিস্থান গবর্নমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে পাকিস্থান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল নাজির আমেদকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৪ই মে—তৈলখনিসমূহ জাতীয়করণের ফলে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া আমেরিকা পারস্যকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে।

জাতীয়তাবাদী চীনে নিযুক্ত আমেরিকার মুখ্য সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল উইলিয়াম কার্টিস চেস অদ্য ঘোষণা করেন যে, চীনা জাতীয় সরকারের নৌবহর গড়িয়া তোলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুন মাসের মধ্যেই ৫৭ লক্ষ ডলার ব্যয় করিবে।

১৫ই মে—সিরিয়া ও ইসরাইল নিরাপত্তা পরিষদের গত ৮ই মে তারিখের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

১৬ই মে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেনেট ঋণ হিসাবে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতে প্রেরণের বিল সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করিয়াছেন।

পারস্যের একটি সংবাদপত্রে অদ্য এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, রাশিয়া পারস্যে সৈন্য প্রেরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। বৃটেন যদি আবাদান এলাকা দখল করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে রাশিয়া পারস্যে সৈন্য প্রেরণ করিবে।

১৭ই মে—অদ্য কম্যুনিস্ট বাহিনী ৩৮ অক্ষাংশের উত্তরে অবস্থিত ইনজের দক্ষিণে রাষ্ট্রপুঞ্জ ব্যূহের একটি ফাটল দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ চালায়।

১৮ই মে—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে কম্যুনিস্ট চীন ও উত্তর কোরিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সমরোপকরণ প্রেরণ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

২০শে মে—কোরিয়া রণাঙ্গনে কম্যুনিস্ট আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে।

পারস্যের তৈল শিল্পের প্রধান কেন্দ্র খুজিস্তানে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ আবাদানের তৈল খনি এলাকায় বৃটিশ সৈন্যদল প্রেরিত হইলে উত্তর পারস্যে সোভিয়েট সৈন্যদল প্রেরণের জন্য ক্রেমলীনস্থ কর্তৃপক্ষ পারস্য সরকারের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পারস্য সরকার ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাপানী শান্তিচুক্তি সম্বন্ধে রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—৷৵৹ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ৷৵৹ আনা, বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক—১০ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 2nd June, 1951 [৩১শ সংখ্যা

সংবিধানের সংশোধন

ভারতীয় শাসন-সংবিধানের সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির অভিমত সংসদে উপস্থাপিত হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটি মূল-সংশোধন প্রস্তাবের কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। একথা আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইতেছে। সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিবর্তনের মধ্যে বাক্-স্বাতন্ত্র্য এবং অভিব্যক্তি সম্পর্কিত মূল ধারাটির সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমতই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত সরকার এক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চাহিয়াছিলেন। বাক্-স্বাধীনতা এবং বক্তৃতায় স্বাধীনতার সঙ্কোচ সাধনে শাসকদের অবলম্বিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আইন-আদালতের কোনরূপ বিচারের অধিকার না রাখাই ছিল তাঁহাদের ইচ্ছা। সিলেক্ট কমিটি ইহাতে রাজী হইতে পারেন নাই। তাঁহারা মূল প্রস্তাবের পূর্বে 'যুক্তিযুক্ত' এই বিশেষণটি জুড়িয়া দিয়াছেন। ইহাতে নবলব্ধ ক্ষমতার প্রয়োগে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারসমূহ যে সকল কার্য করিবেন, তাহা আইন-আদালতের বিবেচনাধীন হইয়াছে। সুতরাং স্বৈরাচারের দুর্বুদ্ধি সরকারের মনে যদি কখনও দেখা দেয়, আদালতের আশ্রয় লইয়া তাহা সংযত করা যাইবে। এই পরিবর্তনের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করি না। বলা বাহুল্য, জনমত, বিশেষভাবে সংবাদপত্র-সমূহের বিরুদ্ধতার চাপে পড়িয়াই এই পরিবর্তন সাধন করিতে হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ

এইভাবে বিরুদ্ধতাকে প্রশমিত করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও বিরুদ্ধতার ভুল কারণ থাকিয়াই যাইতেছে। কারণ বাক্-স্বাধীনতা কিংবা অভিব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্কোচক কোন বিধানকে যুক্তিযুক্ততার মধ্যে আনাই বিরোধীদের উদ্দেশ্য ছিল না। মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণকে আদালতের দ্বারস্থ হইতে হইবে, এ অবস্থাও নিশ্চয়ই সন্তোষজনক নহে। সে স্বাধীনতার উপর কোনক্রমেই হস্তক্ষেপ না হয়, ইহাই ছিল সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য। অবশ্য সেই যে স্বাধীনতা, তাহা স্বেচ্ছাচারিতার সামিল হইবে, অর্থাৎ কোন সংযম সে বিষয়ে থাকিবে না, এমন দাবী কেহ করে নাই। সমাজ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রয়োজনে তাঁহার পরিচালনায় অবশ্যই সংযম থাকা যে প্রয়োজন, রাষ্ট্র বা সমাজ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে নিতান্ত সাধারণ জ্ঞানও যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও সেকথা স্বীকার করিবেন। এরূপ অবস্থায় অধিকারের সঙ্কোচ সাধনের দিক হইতে না গিয়া অধিকারগুলির সংযমন করিবার নীতি জনগণের প্রতিনিধি এবং বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের দ্বারা গঠিত হইবার মত সুযোগ রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা স্বাধীনতা পাইলেও স্বাধীনতার উন্মুক্ত আকাশের অবাধ বাতাসটুকুতে নিঃশ্বাস লইবার অবকাশটুকুও পাইলাম না। পরাধীন অবস্থায় বাক্-স্বাধীনতা এবং অভিব্যক্তির স্বাধীনতাকে সঙ্কোচ করিবার জন্য যেসব অস্ত্র প্রযুক্ত হইত, দেখা যাইতেছে, সেগুলিকেই পুনরায় ঘষিয়া মাজিয়া তীক্ষ্ণ করিয়া তোলা হইতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কদিগকে গুরুরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। বৃটিশ শাসনের আমলে বেআইনী আইন বলিয়া আমরা যেগুলির নিন্দা করিয়াছি এবং দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইয়া যেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি, এখন সেইগুলিকেই বরণ করিয়া লইবার জন্য আমাদের উপর অনবরত তাগিদ আসিয়া পড়িতেছে। কার্যত দেশবাসীর মৌলিক অধিকারের অনুযায়ী এই সব বেআইনী আইনগুলির সংস্কার সাধনের জন্য স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতেছে না। পরন্তু ঐসব বেআইনী আইনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জনাই শাসনতন্ত্র-নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকারেরই খর্বতা সাধনের জন্য প্রস্থে প্রস্থে প্রয়োজন দেখা দিতেছে। এ অবস্থা সত্যই অসহ্য; কিন্তু কারণ ইহার বুঝিতে পারি। প্রচণ্ড গণ-বিপ্লবের পথে বিদেশীর প্রভুত্ব সবলে উৎখাত না হইলে বড় রকমের পরিবর্তন স্বীকার করিয়া লইতে ভয় আসিবে এবং শাসনাধিকারিগণ নিরাপত্তার মোহে প্রচলিত ব্যবস্থাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার দিকে ঝুঁকিয়া

পড়িবেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতে বিদেশীর প্রভুত্বকে উৎখাত করিবার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের তেমন প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা না দিলেও স্বাধীনতার জন্য বেদনা এখানে জনচিত্তে জাগ্রত হইয়াছে। বুকের রক্ত দিয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির বিকাশ এখানে বিচিত্র-ভাবে ঘটিয়াছে। সে সাধনা, সে তপস্যা নিশ্চয়ই বৃথা যাইবে না। জনগণের অধিকার লইয়া এইরূপ ছিনিমিনি খেলা জাতির ভাগ্যবিধাতা বরদাস্ত করিয়া লইবেন না। সুতরাং কর্তৃপক্ষের যথাসময়েই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রনীতির কর্তৃত্ব যাঁহারা হাতে পাইবেন, তাঁহারা যদি কথায় কথায় এবং কারণ-অকারণে এইরূপ খেলায় প্রবৃত্ত হন, তবে জাতির স্বাধীনতা বিড়ম্বনাই সৃষ্টি করিবে, আমাদের এই আশঙ্কা।

জাতিভেদের পক্ষে যুক্তি

হিন্দু হইলে তাহার একটা জাতি থাকিতে হইবে। সরকার জাতির বিচার ছাড়িবেন না, ভারতের আইন-সচিব ডক্টর আম্বেদকর সেদিন সংসদে এই যুক্তি আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতীয় শাসন-তান্ত্রিক সংবিধানে ইহাই ধার্য হয় যে, সরকার নাগরিকদের সহিত ব্যবহারে কেবল ধর্ম, বংশ, জাতি প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া কোনরূপেই পৃথক ব্যবহার করিতে পারিবেন না। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হইবার পর পনর মাস যাইতে না যাইতেই ভারতের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়িয়াছে। তাঁহারা পৃথক ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন করিবার জন্য এই নিমিত্ত তাঁহাদের দাবী। সরকারী সংশোধন প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কোন প্রদেশের গভর্নমেণ্ট প্রয়োজন-বোধ করিলে সামাজিক এবং শিক্ষা সম্পর্কে অনুন্নত অথবা তপশীলী জাতি বা উপ-জাতিসমূহের উন্নয়নকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। তপশীলী সম্প্রদায়ের অথবা অনুন্নত উপজাতি-সমূহের উন্নয়নের জন্য 'সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কিংবা তাহাদিগকে শিক্ষা অথবা সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিলে কাহারো অবশ্য কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু 'সামাজিক এবং শিক্ষা-সম্পর্কে অনুন্নত-দের জন্য'ও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার তাঁহাদের থাকিবে, এ বিধান অতি অপূর্ব। বস্তুত সংজ্ঞাটি এক্ষেত্রে একেবারেই অস্পষ্ট এবং এতদ্দ্বারা প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে নূতন জাতিভেদ সৃষ্টিরই সুযোগ দান করা হইতেছে। ফলত যে কোন গভর্ন-মেণ্ট ইচ্ছা করিলে নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কোন সম্প্রদায়কে উক্ত গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারিবেন এবং এইভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে রাষ্ট্রীয় সংহতিকে ক্ষুন্ন করিবার পথ প্রশস্ত হইবে। অধিকন্তু সমাজ-জীবনে উদার দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। উপদলীয় স্বার্থের জন্য কি না করা যায়? বিশেষত মন্ত্রিগিরি বজায় রাখিবার দায়ে সকলই সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সিলেক্ট কমিটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। শাসনাধিকারীদের সদিচ্ছাকেই তাঁহারা বড় বুঝিয়াছেন। তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন গভর্নমেণ্ট শ্রেণীগত প্রাধান্য বা বিভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই ধারার সুযোগের অপব্যবহার করিবেন বলিয়া মনে হয় না। কমিটির সদস্য-দের মতে কোন সরকারই, যাহারা সত্যই অনুন্নত নয় তাহাদের প্রতি অনুন্নতের ন্যায় ব্যবহার করিবেন, এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। বলা বাহুল্য, সিলেক্ট কমিটির পক্ষে ইহা সদিচ্ছা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কোন সরকারই প্রাপ্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন না, ইহা নিশ্চিতরূপে তাঁহারা কেমন করিয়া বুঝিলেন? আমাদের মতে এই বিধান অত্যন্ত মারাত্মক। অতীতে যে ভেদ-বিভেদের জন্য এদেশের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, এইরূপ বিধানের দ্বারা সেই পাপের পথই উন্মুক্ত করা হইল। বস্তুত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদিবৃন্দের অবলম্বিত ভেদ-নীতিরই এতদ্দ্বারা অনুবর্তন করা হইতেছে। হিন্দু হইলেই তাহার জাতি থাকিবে, সুতরাং হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিভেদের নূতন পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে, ভারতীয় সংহতি এবং রাষ্ট্রীয় সমুন্নতি যাঁহারা সত্যই চাহেন, কোনক্রমেই আইন সচিবের এমন উৎকট এবং অনিষ্টকর যুক্তি মানিয়া লইবে না। হিন্দুরা এমন ভেদ চাহে না। ১৯৪১ সালের লোক-গণনায় হিন্দুরা 'জাতি' লিখাইতে অস্বীকার করিয়াছিল। ১৯৫১ সালের লোকগণনায় উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ফলত ভেদবুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলিবার এই উদ্যমকে সমগ্র দেশ আতঙ্কের দৃষ্টিতেই দেখিবে সন্দেহ নাই।

পুনরায় উদ্বাস্তু সমস্যা

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিশেষভাবে বরিশাল, খুলনা এবং ফরিদপুর হইতে পুনরায় দলে দলে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের দিকে ছুটিয়াছে। বনগাঁও স্টেশনে ইহাদের ভিড় জমিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রত্যহ অন্তত ৪০টি পরিবার এইভাবে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে। ইহাদের অধিকাংশই কৃষক অথবা মজুর শ্রেণীর লোক। আর্থিক দুর্গতিই ইহাদের দেশত্যাগের অন্যতম কারণ। ইহাদের অভিযোগ এই যে, পূর্ব-বঙ্গে ডাকাতির সংখ্যা অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়াছে। দিন-দুপুরে পর্যন্ত ডাকাতি হইতেছে; এজন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্র-দায়ের ধন-প্রাণ সেখানে নিরাপদ নয়। অধিকন্তু এই সব উপদ্রবের প্রতিকার ঘটে না। আমরা জানি, পূর্ববঙ্গ সরকার এমন কথার প্রতিবাদ করিবেন। সে বিষয়ে তাঁহাদের তৎপরতা সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ করে না। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সম্প্রতি যাহারা উদ্বাস্তুস্বরূপে পূর্ববঙ্গ হইতে আসিতেছে, তাহারা রাজনীতির ধার ধারে না। হিন্দুস্থান-পাকিস্থান এই প্রশ্ন লইয়া বিবেকের তাড়না তাহাদের অন্তরে বিন্দুমাত্রও দেখা দিবার কথা নয়। তথাপি ইহারা নিঃস্ব অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া কেন এই-ভাবে দেশত্যাগ করিতেছে? পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে ঢুকিতে পারিলেই তাহাদের যে দুধ-ভাত জুটিবে, এমন ভরসা এতদিনে তাহাদের নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানে উদ্বাস্তুদের দুর্দশার অবধি নাই। বনগাঁও স্টেশনে উদ্বাস্তুস্বরূপে যাহারা আসিয়া জমা হইতেছে, তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলেই এ-সত্য সম্যকরূপে প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং পূর্ববঙ্গ সরকার মুখে যাহাই বলুন, সেখানকার শাসন-ব্যবস্থার মধ্যেই গলদ থাকিয়া যাইতেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর

উপদ্রব অনেক ক্ষেত্রে শাসকেরা দমিত রাখিতে সমর্থ হইতেছেন না, এমন কতকগুলি উপাদান সেখানে জমিয়া গিয়াছে। প্রত্যুত পুলিশও এই উপদ্রবকারীদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না; এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা দেশত্যাগ করিতেই পরামর্শ দিতেছে বলিয়াও আমরা শুনিতেছি। ফলত দিল্লী-চুক্তির ব্যর্থতাই এই সব ব্যাপারে প্রতিপন্ন হয়, অন্তত তাহা যে সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে না, ইহা বুঝা যায়। বাস্তবিক পক্ষে সাম্প্রদায়িকতার একটা চক্র পূর্ববঙ্গের শাসন-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া এখনও পাক খেলিতেছে এবং দেশ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তম স্বার্থকে ভিত্তি করিয়া সেখানে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইতে দিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যা নাই। এখানে শাসন-নীতিতে সাম্প্রদায়িকতা স্বীকৃত হয় না। পশ্চিমবঙ্গ হইতেও পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তুস্বরূপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গতি বহুদিন পূর্বেই রুদ্ধ হইয়াছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে এখানে সাম্প্রদায়িকতার ভাব যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে, এমন আশঙ্কার কারণ আদৌ নাই। প্রকৃতপক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করা রাষ্ট্রের উন্নতির দিক হইতে পূর্ববঙ্গ সরকার যদি সত্যই প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিরুদ্বিগ্ন রাখিবার দিকে সর্বাধিক দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন এবং পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সম্পর্কের পথে যাহারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য বলিষ্ঠ মনোভাব অবলম্বন করা দরকার। বলা বাহুল্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্বস্তি এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ নিশ্চয়ই কোন উন্নতিশীল রাষ্ট্রের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। পক্ষান্তরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শান্তি, স্বস্তি এবং নিরাপত্তাই রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের জন-জীবনে এই রাষ্ট্রীয় মর্যাদাবোধ জাগ্রত হোক, আমরা ইহাই আশা করি।

শাসন-নীতিতে সনাতন ধারা

ভারত হইতে বৃটিশ প্রভুত্ব অপসারিত হইয়াছে। দেশে নূতন শাসনতন্ত্রও প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু তন্ত্র বদলাইলেও যন্ত্র বদলায় নাই। এদেশের শাসন-নীতি সাবেকী আমলাতন্ত্রের ধারা ধরিয়াই চলিতেছে। পরন্তু যদি কোথায়ও শাসন-নীতি নূতন পথে মোড় ঘুরিতে যায়, সেইখানেই আবার তাহাকে সাবেকী পথে পরিচালিত করিবার ঝোঁক শাসকদের মধ্যে জাগিয়া উঠে। বস্তুত বৃটিশ আমলাতন্ত্রের আনুগত্য যেন আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। সেটি ছাড়িয়া আমাদের আচার চলে না, বিচার চলে না, সকল ব্যবস্থাই যেন এলাইয়া পড়ে। পুলিশ বিভাগ এপক্ষে বড় প্রমাণ। যাহারা সরকারের সব নীতির দোষ ধরিতে ব্যস্ত এবং সেই পথে জনসাধারণের ভিতর অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে চায়, তাহাদের কথা আমরা আলোচনার মধ্যে স্থাপন করিতে চাই না। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের দুইজন বিচারপতি তাঁহাদের রায়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। বিচারপতি কে সি দাশগুপ্তের মন্তব্য এই যে, ম্যাজিস্ট্রেটদের হুকুম পুলিশেরা মান্য করিতে রাজী হয় না, এরূপ ঘটনা আজকাল আদৌ বিরল নয়। হাইকোর্টের পক্ষে ইহা একটা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিচারপতি বলেন, গত পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে এক আমাদেরই এজলাসে এইরূপ ধরণের অন্তত চারটি নজীর আমরা পাইয়াছি। এই সব ক্ষেত্রেই পুলিশ কর্মচারীরা ম্যাজিস্ট্রেটদের আদেশ প্রতিপালন করেন নাই। এই সব কর্মচারী আদালত অবমাননার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা বিনা-সর্তে ক্ষমা ভিক্ষা করায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এই যে, এই-ভাবে একপক্ষ কর্তৃক বেআইনী অপরাধের অনুষ্ঠান এবং অপর পক্ষ হইতে ক্ষমা-বৃষ্টির ব্যাপারই যদি চলিতে থাকে, তবে ন্যায়-বিচারের মর্যাদা কতদিন বজায় থাকিবে? অপর একটি মামলায় পুলিশ অপরাধী ধৃত করিবার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে সাক্ষীস্বরূপে উপস্থিত করে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ পি বি মুখার্জি এই মামলার রায়ে এই মন্তব্য করেন যে, একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে পুলিশ তাহাদের কাজ হাসিল করিবার জন্য যন্ত্রস্বরূপে গ্রহণ করিবে, তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া চালাইবে, এমন ব্যাপার যদি চলে, তবে ন্যায়বিচারের মর্যাদা থাকে না। নিরপেক্ষ এবং ন্যায়বিচারের মর্যাদা রাখিতে হইলে ম্যাজিস্ট্রেটদের পক্ষে পুলিশের শিক্ষানবিশীর সংস্পর্শ হইতে সর্বতোভাবে দূরে থাকা প্রয়োজন। বিচারপতির মতে কোন স্বাধীন জাতির মধ্যে নিরাপত্তাবোধ নিশ্চিত রাখিবার পক্ষে সর্বাগ্রে এই দিকেই দৃষ্টি রাখা দরকার যে, অপরাধের তদন্ত করিবার ভার যাহাদের উপর, তাহারাই যেন বিচারক হইয়া না বসে। ম্যাজিস্ট্রেটকে পুলিশ বিভাগের অঙ্গস্বরূপে পরিণত করিলে এই নীতি নিদারুণভাবেই লঙ্ঘিত হয়। বলা বাহুল্য, বিচারপতিদ্বয় পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সকলেই তাহা সমর্থন করিবেন। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে, পুলিশ সাবেকী আমলাতন্ত্রের আনুগত্যই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছে। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে তাহারা বেপরোয়া। পূর্বোক্ত মামলায় দেখা যায়, পুলিশ শুধু ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অমান্যই করে নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ দুর্নীতি-মূলক, এ পাঁতি দিয়া ছাড়িয়াছে। বিচারের মর্যাদা বজায় রাখিবার মত নিয়ম-নিষ্ঠা যদি শাসন-বিভাগে না থাকে, তবে ক্ষমতার সেখানে অপপ্রয়োগ ঘটিবেই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। এদেশেও তাহাই ঘটিতেছে। জনগণের সম্বন্ধে দায়িত্ব-বোধ এখন শাসন-ব্যবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, জনগণের যাঁহারা প্রতিনিধি, তাঁহারাও এ সম্বন্ধে সচেতন নহেন। এদেশের বিচার-বিভাগ শাসন-বিভাগের রথের চাকার সঙ্গেই বাধা রহিয়াছে। এই বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্তিদান করা অন্তত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এতদিনের মধ্যে কর্তব্য ছিল।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

রেজাউল করিম

কবি নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা পাঠ করিলেই বিদ্রোহীর যে ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, তাহা একদিকে যেমন ভীতিপ্রদ—অন্যদিকে সেইরূপ মধুর ও প্রীতিপ্রদ। এরূপ উজ্জ্বল-মধুর-কোমল-কঠোর রুদ্র-শান্ত মূর্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। বিদ্রোহী কাহারও নিকট মাথা নত করে না; মানবসমাজে প্রচলিত বিবিধ প্রকার দুর্নীতি দেখিয়া সে এত দুঃখিত, ব্যথিত ও মর্মাহত যে, এই মিথ্যা সমাজব্যবস্থাকে থান থান করিয়া ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য তাঁহার প্রাণ সর্বদাই আকুলি-বিকুলি করিতেছে; সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রলয়-শিঙ্গা বাজাইয়া সে সব পাপ-জঞ্জাল ও দুর্নীতিকে বিধুনিত তুলার মত গুঁড়া করিয়া দিতে চায়। পৃথিবীতে সে কোথাও খাঁটি মানুষ খুঁজিয়া পাইল না। তাই সে বিদ্রোহী, বিপ্লবী, তাই সে ধ্বংসাত্মক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সে আপনার কর্তব্য পথ ঠিক করিয়া নিখিল বিশ্বকে তাহার দৃপ্তকণ্ঠে জানাইয়া দিতেছে :—

বলবীর
চিরউন্নত মমশির॥
শির—নেহারি আমারি নতশির
ঐ শিখর হিমাদ্রির।

বল, মহাবিশ্বের মহাকাশফাড়ি
চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি
ভূলোক-দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি
বিশ্ববিধাত্রীর।

মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে
রাজ—রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!

পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যে এত বড় বিদ্রোহী আর আবির্ভূত হয় নাই। এই চিরবিদ্রোহী

ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মদিবসে ভক্তবৃন্দ কর্তৃক মাল্যভূষিত কবি নজরুল ইসলাম

যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেইদিকে কেবলই দেখে বন্ধন, বাধা-বিঘ্ন, শাসন-পীড়ন-অত্যাচার-অবিচার। সে এই বন্ধন-দশা সহ্য করিতে পারে না। সাম্যবাদী রুশো বলিয়াছেন :—

Man is born free, but everywhere he is in chain.

মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সর্বত্র তাহার চরণদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ। এই শৃঙ্খল ভাঙিবার জন্য রুশোর প্রাণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি জীবন-ব্যাপী সাধনা দ্বারা মানবজাতির চরণ শৃঙ্খল ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মূল নিদান ধরিতে পারেন নাই। তাই তিনি সম্পূর্ণভাবে চরণ-শৃঙ্খল ভাঙিতে সমর্থ হন নাই। তাহা ছাড়া তাঁহার যুগও সেজন্য প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু নজরুলের যুগ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ যুগ যেন বিদ্রোহেরই যুগ। তাই নজরুল যেদিন গাহিলেন—

আমি দুর্বার
আমি, ভেঙে করি সব চুরমার,
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল'
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন বাধা
নিয়মকানুন শৃঙ্খল।
আমি মানি নাকো কোন আইন
আমি ভরাতরী করি ভরাডুবি আমি টর্পেডো
ভীম ভাসমান মাইন
আমি ধূর্জটি,—আমি এলোকেশে ঝড়
অকাল বৈশাখীর,
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী সুত
বিশ্ববিধাত্রীর॥

সেদিন মানব দেখিল, সত্যসত্যই পৃথিবীতে একজন বিদ্রোহীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই-প্রকার বিদ্রোহীর আশায় কবিগণ দিন গণিতেছিলেন। মিল্টন শয়তানকে বিদ্রোহী করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইলেন। শেলী তাঁহার "প্রমোথিয়াস আনবাউন্ড" নামক নাট্য-কাব্যে এই বিদ্রোহীর কল্পনা করিয়াছিলেন। এতদিন পরে কাব্যজগতে একজন খাঁটি বিদ্রোহী আত্মপ্রকাশ করিল। বিভিন্ন যুগের বিদ্রোহী কবিদের সাধনা এতদিনে পূর্ণ হইল।

বিদ্রোহীর জয়যাত্রা আরম্ভ হইল। টর্পেডোর মত তাঁহার প্রচণ্ড শক্তি। সে ভরা তরীকে অম্লানবদনে ভরা-ডুবি করিয়া দেয়। সে ঝঞ্ঝা আনে, ঘূর্ণি আনে। পথ সম্মুখে যাহা পায় সবই ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার করিয়া দেয়। কখনো সাইক্লোন দেখিয়াছ?

বিদ্রোহী কবি [৫৩তম জন্মদিবসে গৃহীত ফটো]

আকাশ-পাতাল, সমুদ্র, পাহাড়, নদ-নদী, গিরিবর্ত্ম, সবকে অগ্রাহ্য করিয়া পদদলিত করিয়া, সে আপনার মনে আপনি আনন্দে ছুটিয়া চলে। আমাদের এই বিদ্রোহী সেই সাইক্লোন অপেক্ষাও ভীষণ। আণবিক বোমাও ইহার নিকটে হার মানিয়া যায়। বিদ্রোহীর প্রতিমূর্তি দেখিয়া কে না ভয় পায়? যমদূত অপেক্ষাও ভীষণ দর্শন ইহার চেহারা। বিদ্রোহীর এই রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখিয়া সকলেই ভয়ত্রস্ত।

"আমি মহামারী ভীতি এ ধরিত্রীর,
শাসন-ত্রাসন সংহার আমি
উষ্ণ চির অধীর॥"

চক্ষের সম্মুখে বিদ্রোহীর নৃত্য-পাগল ছন্দ দেখিয়া মানুষ থ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এই চিরদুরন্ত দুর্মদ, দুর্দম, বিদ্রোহী এত শক্তিশালী ও এত আত্মবিশ্বাসী যে, সে আপনাকে ছাড়া করে না কাহারে কুর্নিশ। কিন্তু দুরন্ত দুর্দম হইলেও ইহার হৃদয়ে প্রেম-করুণার প্রস্রবণ অহরহঃ অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত বহিতেছে। তাঁহার এই বিদ্রোহের মূর্তি জগতের কল্যাণের জন্যই, যেখানেই কল্যাণবোধ, সেখানেই প্রেম ও করুণার প্রস্রবণ বহিতে থাকিবেই। তাই এই চিরবিদ্রোহীর 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য।" তাঁহার হাতে চাঁদ—ভালে সূর্য। বিদ্রোহীর এই রণসজ্জা পৃথিবী হইতে অন্যায় দুর্নীতি ও পাপের প্রাসাদকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য। তাই সে থাকিয়া থাকিয়া আশার বাণীও শুনাইতে কাতর নহে। আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিয়া এই যে বিদ্রোহীর অভিযান তাহার উদ্দেশ্য কী?—তাহার উদ্দেশ্য শান্তি। সমাজের পরতে পরতে এত পাপ, এত জঞ্জাল প্রবেশ করিয়াছে যে, টর্পেডোর অথবা সাইক্লোনের মত প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া সমস্ত সমাজব্যবস্থাকে খান খান করিয়া ভাঙ্গিয়া না দিলে মানবসমাজের কল্যাণ নাই। তাই বিদ্রোহী বলিতেছেন—

"আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব—আনিব শান্তি
শান্ত উদার
আমি হল বলরাম স্কন্ধে—
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে
নব সৃষ্টির মহানন্দে"॥

সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বিদ্রোহী দেখিল, নূতন জগতের ভিত্তি তৈয়ার হইয়াছে,' আর ভাঙ্গিবার-চুরিবার কিছুই নাইও—পৃথিবী শান্ত হইয়াছে।—তখন বিদ্রোহী সৃষ্টির মহানন্দে বলিতেছেঃ—

মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
সেই দিন হবো শান্ত।
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে
বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত।

পাঠক বিদ্রোহী কবির বাণী শুনিলেন। এ যেন বিপ্লবের জয়ধ্বনি। এইবার কবির অন্য ভাবের সহিত পরিচিত হওয়া যাক। পৃথিবীতে সার্থক বিপ্লব না আনিলে শান্তি নাই। তাই কবি সর্বত্র বিপ্লবের বীজ ছড়াইয়া দিতেছেন।

কবি চারিদিকে বিধাতার অপরূপ দান দেখিতেছেন: কিন্তু কে তাহাকে ভোগ করে? কবি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন যে, বিধাতার মুক্তহস্তের অজস্র দান মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক ভোগ করিতেছে। তাই কবি খোদার দরগায় ফরিয়াদ করিতেছেন। "হে খোদা এত মহান তুমি, তবে তোমার রাজ্যে কেন এত অবিচার, অত্যাচার! আমার আঁখির দুখ দীপ নিয়া, বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া;" কিন্তু কি দেখা যায়? খোদার দানের কোথাও অপ্রতুলতা নাই, কিন্তু তবুও সমাজে চলিতেছে অত্যাচার, অবিচার লুণ্ঠন ও শোষণ। কবি অশ্রুপূর্ণ লোচনে দেখিতেছেনঃ—

জনগণে যারা জোঁক সম শোষে
তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়,
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ
মাটির মালিক তাহারাই হন,
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ সেই তত বলবান।

নিতি [illegible]রা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান
ভগবান! ভগবান!!

'পৃথিবীর চারিদিকে অত্যাচার অবিচার দেখিয়া দরদী কবির মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে। আজ যাহাদের হাতে শাসনের ভার, তাহারা শাসন করে না—কেবল শোষণ ও পীড়ন, দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে সর্বস্বান্ত করিতেছে। যাহারা পৃথিবী জুড়িয়া সাম্রাজ্য গড়িয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে রাজ্যসুখ ভোগ করিতেছে, তাহারা মানব-কল্যাণের জন্য কি করিতেছে? কবি ব্যথিত-চিত্তে দেখিতেছেন যে, তাহারা কিছুই করিতেছে না, নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা সারা পৃথিবীতে যুদ্ধের বিভীষিকা ছড়াইয়া দিতেছে। বর্তমান যুদ্ধ যে কি নির্মম ও প্রাণঘাতী, তাহার আভাস কবি বহু পূর্বেই পাইয়াছিলেন তখন আণবিক বোমার উদ্ভাবন হয় নাই; কিন্তু সেই সময় যে সব মারণাস্ত্র নিরপরাধ ও অসহায় মানবজাতিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাকে কবি ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন—তাঁহার সে অমূল্য বাণী, আজিও সমধিকভাবে প্রযোজ্য ঃ—

যে আকাশ হতে ঝরে তব দান
আলো ও বৃষ্টিধারা
সে আকাশ হতে বেলুন উড়ায়ে
গোলাগুলী হানে কারা?
"উদার আকাশ বাতাসে কাহারা,
করিয়া তুলিছে ভীতির সাহারা?
তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা
দিতেছে কার কামান?
হবে না সত্য দৈত্যমুক্ত? হবে না প্রতিবিধান?
ভগবান! ভগবান!!—"

কিন্তু কবি আশাবাদী। কিছুতেই নিরাশ হন না। কবি জানেন যে, শত দুঃখ ও শত তাপ অভিশাপে ধরণী জর্জরিত হইলেও একদিন না একদিন মানবের দুঃখ বিভাবরীর অবসান হইবে। কবি আশা-আকুলিত নয়নে সে মহিমান্বিত দিনের স্বপ্ন দেখিতেছেন ঃ—

"চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চশির,
বান্দা আজিকে বন্ধনে ছেদি ভেঙেছে
কারা-প্রাচীর।।
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো,
আকাশ বাতাস বাহিরের আলো
এবার বন্দী বুঝেছে মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ,
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে এক তান—
জয় নিপীড়িত প্রাণ,
জয় নব অভিযান,
জয় নব উত্থান।

কবি যে সত্যকার বিপ্লবী, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার সুবিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী'তে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর কোন সাহিত্যে এরূপ সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবের চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। এই কবিতাটির প্রতিটি লাইনে বিপ্লবের, বিদ্রোহের অগ্নি-কণা চতুর্দিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে। ফরাসী-বিপ্লব, রুশ-বিপ্লব প্রভৃতি বিপ্লবের কোন নেতাই এরূপ উচ্চকণ্ঠে সাম্যের গান

পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী কবিপত্নী ও শিয়রে উপবিষ্ট তাঁর দুই পুত্র। কোলে উপবিষ্ট কবির ভ্রাতুষ্পুত্র

গাহিতে পারেন নাই। যে সমাজে "এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান" সে সমাজের নিখুঁৎ চিত্র নজরুল ছাড়া আর কেহ দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।—কেমন এমন এক মানবসমাজের ছবি আমাদের সামনে আঁকিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন—যেখানে মানুষ কোন বিষয়ে কাহারও অধীন নহে। যেখানে জাতিতে সংঘর্ষ নাই,—বড় লোক গরীবের ব্যবধান নাই, ধর্ম লইয়া কোন্দল কোলাহল নাই,—সেই নূতন সমাজে মানুষের সব ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া কবি উচ্চ উদাত্ত সুরে গাহিয়াছেন ঃ—

"তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম সকল যুগাবতার।
তোমার হৃদয় বিশ্বদেউল সকলের দেবতার।।
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত পুঁথিকঙ্কালে
হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে,"

বহু শতাব্দী পূর্বে বাঙলার বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" তাঁহার এই সম্মোহনী বাণীর উপর আর কেহ এমন করিয়া দ্বিধাহীনচিত্তে মানুষের মহিমা-গান গাহিতে পারে নাই। বিদ্রোহী কবির দৃষ্টিতে মানুষের চেয়ে বড় বস্তু পৃথিবীতে আর কিছুই নাই।

"গাহি সাম্যের গান।
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই—
নাই কিছু মহীয়ান।।
নাই দেশকাল পাত্রের ভেদ অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে,—ঘরে ঘরে
তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানুষ পাপী বলিয়া অনাদৃত ও অবহেলিত হইতেছে; কিন্তু বিদ্রোহী কবি কাহাকেও "পাপী" বলিয়া স্বীকার করেন না। সমাজ যাহাদিগকে "পাপী" বলিয়া সর্বত্র ধিক্কার দেয়, কবি তাহাদিগকে কোল পাতিয়া বরণ করিতেছেন—

"সাম্যের গান গাই।
যত পাপীতাপী সব মোর বোন—
সব মোর হয় ভাই।
এ পাপ মুল্লুকে পাপ করে নি কো
কে আছে পুরুষ নারী.
আমরা ত ছার পাপে পঙ্কিল—
পাপীদের কাণ্ডারী।"

শুধু পাপীতাপী নয়—বারাঙ্গনা—নারী—কুলি, মুটে-মজুর-চাষাভুষা কেহই তাঁহার অবহেলার পাত্র নয়। বাস্তবিকই মানুষের প্রতি এত অগাধ ভালোবাসা আর কোন কবি কাব্যে এমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। এতদিন বাঙলা ভাষায় সত্যকার বিপ্লবী কবিতার অভাব ছিল, কবি নজরুল সে অভাব পূর্ণ করিলেন। তাঁহার এই বিপ্লব সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। তিনি দেশের চৈতন্য ফিরাইয়া আনিয়াছেন—দেশের বর্তমান গণ-চেতনার মূলে নজরুলের প্রেরণা যে অহরহঃ ক্রিয়া করিতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভবিষ্যতে যদি কোনদিন বিপ্লবী কবিদের তালিকা রচিত হয়, তবে তাহাতে এই চিরদুর্দম, দুর্মদ বিপ্লবী কবির নাম শীর্ষস্থানে রক্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সে স্থান হইতে কেহই তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

[প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটো শ্রীমণি গুহর সৌজন্যে প্রাপ্ত]
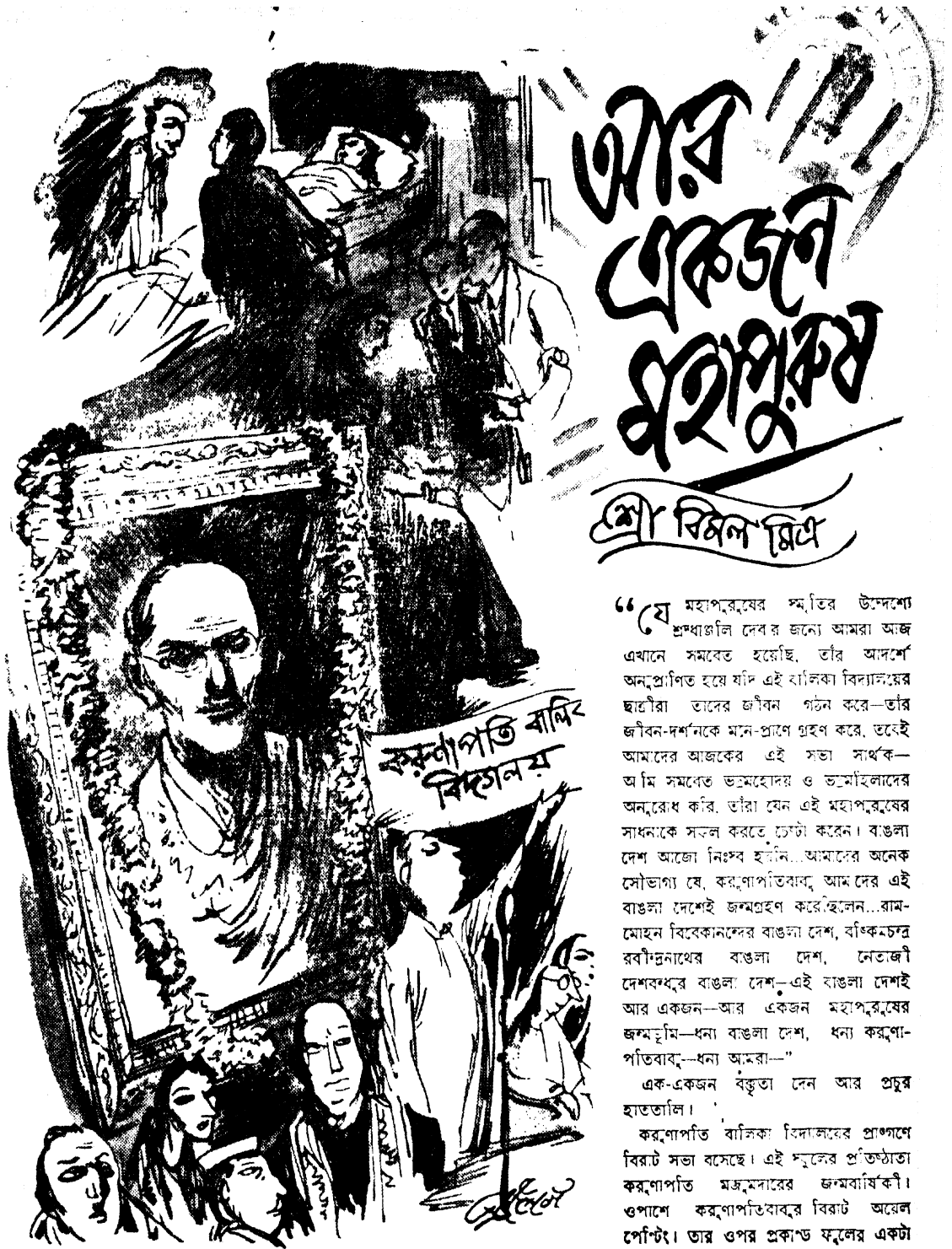
আর একজন মহাপুরুষ

শ্রী বিমল মিত্র

"যে মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্যে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি এই বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাদের জীবন গঠন করে—তাঁর জীবন-দর্শনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, তবেই আমাদের আজকের এই সভা সার্থক—আমি সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদের অনুরোধ করি, তাঁরা যেন এই মহাপুরুষের সাধনাকে সফল করতে চেষ্টা করেন। বাঙলা দেশ আজো নিঃস্ব হয়নি...আমাদের অনেক সৌভাগ্য যে, করুণাপতিবাবু আমাদের এই বাঙলা দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন...রাম-মোহন বিবেকানন্দের বাঙলা দেশ, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাঙলা দেশ, নেতাজী দেশবন্ধুর বাঙলা দেশ—এই বাঙলা দেশই আর একজন—আর একজন মহাপুরুষের জন্মভূমি—ধন্য বাঙলা দেশ, ধন্য করুণা-পতিবাবু—ধন্য আমরা—"

এক-একজন বক্তৃতা দেন আর প্রচুর হাততালি।

করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিরাট সভা বসেছে। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা করুণাপতি মজুমদারের জন্মবার্ষিকী। ওপাশে করুণাপতিবাবুর বিরাট অয়েল পেন্টিং। তার ওপর প্রকাণ্ড ফুলের একটা

মালা ঝুলেছে। লাল শালু আর হলদে চাদরের ওপর পদ্মফুল আঁকা শামিয়ানা। ডায়াসের ওপর গণ্যমান্য কয়েকজন লোক। ফুড মিনিস্টর প্রধান সভাপতি। জেল-খাটা কয়েকজন দেশনেতা। কয়েকজন সাহিত্যের পান্ডাও উপবিষ্ট।

একে একে অনুষ্ঠান হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রীর সংগীত। তারপর সভাপতি বরণ। নান্দীপাঠ, প্রধান অতিথি। সভার উদ্বোধক। মাল্যদান। তারপর কবিতা আবৃত্তি। নৃত্য। একক সংগীত। বক্তৃতা। শোনা গেছে শেষে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থাও আছে।

করুণাপতির বড়ছেলে তথাগত মজুমদার বড় ব্যস্ত। তাঁকেই সব দেখাশোনা করতে হচ্ছে। বর্ধমানের এস ডি ও। তারপরের ছেলে রাতুল মজুমদার বেহারের সিভিল সার্জেন। তারপরের ছেলে পল্লব মজুমদার রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনীয়ার। তারপর আরো অনেক আছে। সকলের নাম জানি না—মুখ চেনা। সবাই কৃতবিদ্য। সাত ছেলে তিন মেয়ে। সবাই আজ চারদিক থেকে এসে জুটেছে। বাবার জন্মবার্ষিকীতে তাদেরইতো খাটবার কথা। তবু মহাপুরুষরা কোনও দেশ-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। তাই দেশের লোকেদেরও দায়িত্ব কি কিছু কম।

ওপাশে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সার বেঁধে খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে লিখছে। বাঁ-পাশে মহিলাদের জায়গা। তিন মেয়ের সংগে প্রধান শিক্ষয়িত্রীও বড় পরিশ্রম করছেন। গণ্যমান্যরা যদি অভ্যর্থিত না হন, জলযোগের আগেই যদি তাঁরা চলে যান! তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সব দিকে।

তথাগত একবার কাছে এসে নিচু হয়ে বললে—কাকাবাবু, আপনাকে কিছু বলতে হবে—

মুখ তুলে চাইলাম। অনেক ছোটবেলায় দেখেছি। সংগে আর একটি ছেলে। বললাম —এটি কে—তোমার ছেলে নাকি?

তথাগত বললে—না, ছোট ভাই—দেখেন নি একে—এর নাম পরাশর—পরাশর হাত জোড় করে নমস্কার করলে। বয়স বেশি নয়। দেখে মনে হলো যেন চিনি-চিনি।

করুণাপতির সব ছেলেমেয়েদেরই চিনতাম। সাতটি ছেলে তিনটি মেয়ে। যতদূর মনে পড়ে, তখন কিন্তু নামের এত বাহার ছিল না। কিন্তু পরাশর? এ কবে হলো!

বললাম—একে তো কখনও দেখিনি—

তথাগত বললে—এ আমার ছোট-ভাই...... তাহলে এর পরেই কিন্তু আপনাকে বাবার সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে—

তখন দেশসেবকদের একজনের বক্তৃতা চলছিল। করুণাপতিবাবুর অসংখ্য গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিলেন। কত গোপন দান ছিল তাঁর। কত বিধবার ভরণপোষণ করতেন। দেশের ছেলেমেয়েরা কেমন করে একদিন মানুষ হবে, সেই চিন্তাই সারাদিন করতেন তিনি। আজীবনের সমস্ত উপার্জন কেমন করে এই 'করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ের' জন্যে দান করে গেছেন। নীরব, একনিষ্ঠ কর্মী তিনি—কখনও যশের জন্যে লালায়িত হননি। ইনিয়ে বিনিয়ে তিনি প্রমাণ করতে লাগলেন করুণাপতিবাবু আমাদের দেশের আর একজন মহাপুরুষ—

একে একে সকলের বক্তৃতা হয়ে গেল।

তথাগত একবার কাছে এসে মুখ নিচু করে বললে—এবার আপনার পালা কিন্তু—

সভাপতি ফুড মিনিস্টর নাম ঘোষণা করলেন।

আমি উঠে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

করুণাপতির সম্বন্ধে আমি কী যে বলবো! অথচ এই সভায় আমার চেয়ে তাঁকে আর কে অমন করে জানতো! প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা।

তখন দুজনেরই রেলের চাকরি। সিভিল সার্জেনের বাড়িতে আমাদের তাসের আড্ডা। সন্ধ্যে থেকে শুরু হয়েছে—তারপর রাত এগারোটাও বাজতে চললো। কম্পাউণ্ডার হরনাথ তখন বেশ কিছু মোটারকম জমিয়ে নিয়েছে। সিভিল সার্জেন হারছে; আমিও। আর স্যানিটারী ইন্সপেক্টর রামলিঙ্গমের না-হার, না-জিত। বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি।

এমন সময় সিভিল সার্জেনের বাড়ির কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠলো।

সিভিল সার্জেন বললে—দেখতো ফলাহারী কে ডাকে—

জুন মাসের মাঝামাঝি। সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টি নেমেছে। খেলাটাও বেশ জমে উঠেছে। কারুরই এখন ওঠবার ইচ্ছে নেই। আর বাড়িও কারো দূরে নয়। দু-পা গেলেই যে-যার কোয়ার্টারে ঢুকে পড়া।

ভয় ছিল সিভিল সার্জেনের। কিন্তু শমন এল আমারই।

স্টেশনের জমাদারকে পাঠিয়েছে করুণাপতি। স্ত্রীর ভীষণ অসুখ। এখনি যেতে লিখেছে। জমাদার রামভক্ত হ্যাণ্ড-সিগন্যাল ল্যাম্প নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকার বারান্দায় নীল কোট-পরা জমাদারকে যেন যমদূতের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু তা হোক—তবু যেতে হবে। যেতেই হবে। স্টাফের অবশ্য মিথ্যে অসুখ করে। একদিন পরে দেখতে গেলেও চলে। শেষ পর্যন্ত একখানা আনফিট্ সার্টি-ফিকেটের পরোয়া। তাতে বড়জোর লাভ একটা রুইমাছ নয়ত কলকাতা থেকে আনিয়ে দেওয়া একসের পটোল। কিন্তু করুণাপতির সংগে আমার অন্য সম্বন্ধ। এক জেলার মানুষ। এক স্কুল থেকে পাশ-করা।

জিগ্যেস করলাম—ডাউন গাড়ি কিছু আছে নাকি যাবার—

রামভক্ত বললে, কণ্ট্রোল অফিসে খবর নিয়ে এসেছে—'টু-নাইণ্টিন' অর্ডার হয়েছে সাড়ে বারোটায়। সেইটেতে যাওয়াই সুবিধের।

মাল গাড়ির ব্যাপার। সাড়ে বারোটায় যদি অর্ডার হয়ে থাকে, তাহলে সাড়ে বারোটাতেই যে ছাড়বে, তার কোনও ঠিক নেই। শেষ মুহূর্তে ড্রাইভার 'সিক্ রিপোর্ট' করতে পারে। গার্ড ঘুম থেকে উঠতে দেরি করতে পারে। কত রকমের হাংগামা।

তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরুলাম। ঘটনাচক্রে গাড়িও রাইট টাইমে ছাড়লো। মাল গাড়ির ব্রেক-ভ্যানের মধ্যে টিম্ টিম্ করছে হ্যারিকেনের আলো। দুটি ছোট ছোট বেঞ্চি। গার্ড নিজের বিরাট বাক্সটার ওপর বসতে বললে। রামভক্তও দরজাটা ভেজিয়ে কমোডটার পাশে হাঁটু জুড়ে বসলো। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

থ্রু ট্রেন। ঝড়ের মত উড়ে চলেছে। উড়ে চলুক আর নাই চলুক, অন্তত ভেতরে বসে আমাদের তাই মনে হচ্ছে। ঝন্ ঝন্, কট্‌কট্ শব্দ আর দুলুনি। ঠিক দুলুনি নয় ঝাঁকুনি। ঝাঁকুনির জ্বালায় বাক্সটা দু-হাতে ধরে বসে আছি। কণ্ট্রোল অফিসে বলা ছিল যেন বড়মুণ্ডায় থামান হয় গাড়ি। বড়মুণ্ডার স্টেশন মাস্টার করুণাপতি।

ছোট স্টেশন বড়মুণ্ডা। রাত্তিরবেলা স্টেশনটাকে দেখাই যায় না। ছোট্ট একটা

ঘর। জানালার কাচ দিয়ে হ্যারিকেনের আলোটা পর্যন্ত বৃষ্টির জন্যে দেখা যাচ্ছে না। মাল গাড়ির ব্রেক্‌টা থামলো স্টেশন থেকে এক মাইলটাক দূরে। সাবধানে দুটো ধাপ নেবে রেলের লাইন আর দুপাশে জড়ো-করা ব্যালাস্ট্‌। ক্রেপসোলের জুতো দুটো লাইনের মধ্যেকার জলে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ করে। চারদিকে জলা আর আগাছা। আর ধূ-ধূ করছে মাঠ। ঝড়ের ঝাপটা। ব্যাঙের আর ঝিঁঝিঁ'র ডাকে ভয় করে ওঠে। কেবল বিন্দুর মত দূরের সিগন্যালের লাল আলোটা স্থির হয়ে জ্বলছে। নামবার পরেই লাল বিন্দুটা নীলে রূপান্তরিত হলো—আর গাড়িটা একটা ঝাঁকানি দিলে। তারপর চাকায়, স্প্রিংয়ে, ব্রেকে, ওয়াগনে, ইঞ্জিনে মিলে সে এক বিচিত্র ঝঙ্কার দিতে দিতে চলতে শুরু করলো।

স্টেশন থেকে দোতলা সমান নীচুতে করুণাপতির কোয়ার্টার। রামভক্ত রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল।

করুণাপতি জাফ্‌রিওয়ালা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। বললে—এসেছ ভাই—বাঁচলে—

সামনে জাফ্‌রি দেওয়া বারান্দা। বারান্দা মানে এককালি জায়গা। বৃষ্টির ছাটে ভেতরে সব ভিজে যায়। কিন্তু তারই ভেতরে ঘুটের বস্তা, একটা তেলচিটে ডেক্‌ চেয়ার, দুখানা দড়ির খাটিয়া, বেতের দোলনা, ছেলেমেয়ে-দের জুতোর আণ্ডিল—সব কিছু—

ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে করুণাপতি যেন বড় বিব্রত বোধ করতে লাগলো। হঠাৎ একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেললে। বললে—কোথায় যে তোমাকে বসতে দিই—

বললাম—বসতে তো আসিনি, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন—

বললে—না, না, তবু—ওই দেখ না—ঘর দেখছ তো—

ঘরের ভেতরে চেয়ে দেখলাম। বারান্দার আলোটা ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সমস্ত ঘরটা জোড়া ময়লা মশারি। ঘরের ভেতরে ঢোকবার উপায় নেই।

রামভক্ত ওষুধের ব্যাগটা নাবিয়ে দিয়েছে।

করুণাপতি বললে—তুমি আর দাঁড়িয়ে ভিজছো কেন রামভক্ত, সারাদিন তো তোমার খাটুনির শেষ নেই—যাও একটু গড়িয়ে নাও গে—কাল সকাল থেকেই আবার ডিউটি—এখন তো ডাক্তারবাবু এসে গেছেন—বুঝলে ভাই, রামভক্ত আছে বলে তাই দুটি ভাত পাচ্ছি—নইলে কী যে হতো—

বললাম—সে কথা থাক—বৌদিকে দেখি চল—

পাশের ঘরটাতেই রোগী শুয়ে। সাত ফুট বাই ছয় ফুট একখানা ঘর। দেয়ালের কুলুঙ্গীতে একটা ছোট টেবিল ল্যাম্প। খাটের ওপর গিয়ে বসলাম।

বললাম—জ্বরটা নেওয়া হয়েছে নাকি—

—জ্বর নেব কি করে, থারমোমিটার কি আছে, একটা সাবান কিনতে গেলেও সেই বিলাসপুরে যেতে হয়—আর কিনলেই কি থাকবে অপোগণ্ডদের জ্বালায়—একটি-দুটি নয়তো—দশটি বে—সোজা কথা—গাছ যে ওদিকে খুব ফলন্ত—বুঝলে কি না—

জ্বর রয়েছে খুব। বুক পরীক্ষা করলাম। জিভ্‌ দেখলাম। একটু বরফ থাকলে ভালো হতো। শাদা ফ্যাকাশে চোখ দুটো। চোখের তলাটা টেনে দেখলাম—রক্তহীন। সমস্ত শরীরটাই যেন বড় নীল-নীল বলে মনে হলো। হাতের পায়ের শিরাগুলো নীল হয়ে বাইরে ফুটে উঠেছে।

করুণাপতিকে জিগ্যেস করলাম—কখন থেকে এরকম হলো—

বললে—এই পরশু এমনি সময় থেকে, প্রথমে ভাবলাম পড়ে-টড়ে গেছে বুঝি...... তারপর কাল সকাল থেকে এমন হলো যে, কাপড় একেবারে ভেসে গেল ভাই—শয্যাশায়ী একেবারে, ভাবলাম কী করি—আমি বইটা খুলে দেখে দিলাম দু ডোজ ক্যামোমিলা টুহানড্রেড্‌—শেষে আজকের অবস্থা দেখে আর ভরসা হলো না—রাম-ভক্তকে পাঠালাম তোমার কাছে—

জিগ্যেস করলাম—ক' মাস হলো—

করুণাপতিও জানে না। স্ত্রীর দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলে—হ্যাঁগো, ক'মাস হলো তোমার—শুনছো—ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করছেন ক' মাস হলো—

কোনও উত্তর না পেয়ে করুণাপতি শেষে নিজেই বললে—পাঁচ-ছ' মাসের বেশি নয়—

বললাম—বরফ যখন নেই, তখন কপালে জলপটি দিতে হবে, আর একটু গরম জলের ব্যবস্থা করতে পারো—তলপেটে 'সে'ক' দিলে ভালো হতো—

রামভক্তকে আবার ডাকতে হলো। করুণা-পতি বললে—তোমার কষ্ট হলো রামভক্ত—কিন্তু আমি যে বিপদে পড়েছি কী করবে বলো—

সঙ্গে করে মিকশ্চার এনেছিলাম। দিলাম এক দাগ খাইয়ে। কোনও রকম চোট না লাগলে এমন হবার তো কথা নয়।

একটু পরেই রোগীর যেন বেশ আরাম হলো। দেখলাম ঘুম এসেছে।

করুণাপতি বললে—এবার বাইরে একটু বসবে চলো—তোমাকেও খুব কষ্ট দিলাম—

বাইরের ডেক চেয়ারটায় বসলাম। করুণা-পতি সামনে টুল নিয়ে বসে আর একটা বিড়ি ধরালে। বাইরে তেমনি অঝোর বৃষ্টি। কল্‌ কল্‌ শব্দ করে সামনের রাস্তা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

করুণাপতি বললে—সেরে যাবে—কী বলো ডাক্তার—

—দেখা যাক্‌—

করুণাপতি আবার বললে—কপাল, সবাই কপাল—এত লোকই তো বিয়ে করেছে—কিন্তু এমন বছর বছর ছেলে-হওয়া দেখেছ ভাই—এযেন ঠিক কাঁঠাল গাছ—আজ বারো বছর বিয়ে হয়েছে, প্রথম দুটি বছর কেবল ফাঁক গিয়েছিল, তারপর সেই যে শুরু হলো, আর থামতে চায় না—নাগাড়ে চলেছে একটানা—কী খেয়ে যে এমন স্বাস্থ্য করেছে কে জানে বাবা, এমন ফলন্ত মেয়েমানুষ আমি আর দেখিনি—অথচ মাসের মধ্যে তো অর্ধেক রাত ঘরেই শুই না, নাইট্‌ ডিউটি করতে হয়—

মশারির মধ্যে ছোট ছেলের কান্না শোনা গেল।

করুণাপতি উঠলো।

ওই বাঁশী বেজেছে—ও নিশ্চয়ই ক্ষেন্তি—করুণাপতি মশারির ভেতর ঢুকতে গিয়ে কেমন টান পড়ে মশারির দুটো কোণ্‌ খুলে গেল।

—দুত্তোর ছাই—এমন জানলে কোন্‌ শালা বিয়ে করতো—দুহাতে মশারিটা টেনে বাইরে সরিয়ে দিলে করুণাপতি। দেখলাম—গড়া গড়া ছেলেমেয়েরা শুয়ে আছে। একজন আর একজনের ঘাড়ে পা দিয়ে। গুণে দেখলাম দশটি। সাতটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। দুটো-তিনটে ছেলে বিছানা বুঝি ভিজিয়ে দিয়েছিল। করুণাপতি সেই ভিজে বিছানার ওপরেই পিঠ চাপড়ে ক্ষেন্তিটার ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করলে। ছোটটির বয়েস ছ' মাসের বেশি নয়। করুণাপতির দিকে চেয়ে দেখলাম। ও তো এমন ছিল না আগে! ও কি পৃথিবীর কিছু খবরই রাখে না;

আজকাল তো কত রকমের উপায় রেয়িয়েছে। খবরের কাগজেও তো সেসব জিনিসের বিজ্ঞাপন থাকে।

ঘুম পাড়িয়ে উঠে এল করুণাপতি। আবার একটা বিড়ি ধরালে।

বললে—বিয়ের পর বোঁচা যখন প্রথম হলো, ভাবলাম আর নয়, একটি ছেলে—সামান্য যা চাকরি, একটি ছেলেকে ভালো করে মানুষ করে যাবো—কিন্তু বউ বললে আর একটি মেয়ে হলে হতো—তা হোক বাবা, তোমার যখন সখ, তখন হোক—কিন্তু পরের বছরেই হলো একটা ছেলে—তারপর থেকে আর কামাই দেয়নি ভাই—তাই বলি বউকে মাঝে মাঝে যে, তুমি কোন বড়-লোকের ঘরে পড়লে ভালো হতো—ছেলে-মেয়েগুলো অন্তত পেট পুরে তো খেতে পেতো—এ আমার কাছে এসে শুধু ব্যাঙাচির মত বাঁচা—একটা ভালো জামা কিনে দিতে পারি না—পেট ভরে খেতে দিতে পারি না—তারপর যদি বাঁচে, তো লেখাপড়া শেখাবেই বা কেমন করে, আর মেয়ে তিনটের বিয়েই বা দেব কি করে ভগবান জানেন—

ফস্ ফস্ করে করুণাপতি বিড়িতে টান দিলে কিছুক্ষণ।

—এদিকে ভাই চাকরিটাও যদি একটু ভদ্রলোকের মতন হতো তো বাঁচতুম—হেড অফিসে মুরুব্বি তো তেমন নেই কেউ—এখন কেবল মাদ্রাজীর রাজত্ব, এই দেখনা ছিলাম রায়গড়ে, দু-পয়সা হচ্ছিল, দিন গেলে কিছু না হোক তিন-চারটে টাকার মুখ দেখতে পেতাম, কারবারী মহাজন দু-পাঁচজন দিত হাতে গুঁজে, ওয়াগন-ভর্তি মুড়ি বুক্ হতো, মুড়িও পেতুম, ওয়াগন পিছু চার আনা হিসেবে আবার......তা ধর তোমার গিয়ে বেশ ছিলাম সেখেনে, মাইনেটায় হাত পড়তো না,—কিন্তু তেলেঙ্গীদের চক্রুশূলে হলো, হেড অফিসের আয়ার সাহেবকে ধরে ভেঙ্কটরাও সেখেনে গিয়ে এখন রাজত্ব করছে আর আমায় বদলি করে দিয়েছে এই বড়-মুণ্ডোয়, এখানে পানটি পর্যন্ত কিনে খেতে হয়—দুঃখের কথা আর কী বলবো ভাই—

রামভক্ত এসে বললে—এবার মা ঘুমোচ্ছে—আর কি জলপটি দিতে হবে—

করুণাপতি বললে—না থাক্—এবার তুমি একটু বিশ্রাম করগে যাও, রামভক্ত—কাল ভোরবেলা থেকেই তোমার তো আবার ডিউটি—

রামভক্ত চলে যাবার পর করুণাপতি বললে—এই রামভক্তকেই দেখ না—বেটা অনেক টাকার মালিক—সুদে খাটায়—এখনও আমার কাছে শতখানেক টাকা পায় বেটা—বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জাররা ছিটকে-ছুটকে ট্রেন থেকে নেমে এদিক-ওদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, ও গিয়ে ধরে, তা মাসে ওর পঞ্চাশ-ষাট টাকা উপুরি আয়... দেশে বউ আছে, ছেলেপিলের বালাই নেই—টাকা পাঠিয়ে দেয়, আর এখানে একজন জোয়ান দেখে জাতওয়ালীকে রেখেছে, সে-ই রান্নাবান্না করে, রোগ হলে সেবা করে...... আর রোগ না হলে আরামসে পা টেপায়—

গল্প করতে করতে একটু যেন তন্দ্রার মতন আসছিল। হঠাৎ করুণাপতির ডাকে উঠে বসলাম। যন্ত্রনায় ছটফট করছে রোগী। উঠে ঘরে গেলাম। অবস্থা দেখে বড় ভয় হলো। পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা। মুখ নীল হয়ে আসছে। সমস্ত শরীর সংকুচিত হয়ে আসে একবার আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। হাতের কাছে আর কোনও ওষুধও নেই। কিন্তু কেন এমন হলো।

বললাম—এখন বিলাসপুরে যাবার কোনও গাড়ি আছে করুণাপতি—একটা ওষুধ আনলে হতো—

বৃষ্টির মধ্যেই করুণাপতি দৌড়ে একবার স্টেশনে গেল। তখুনি আবার ফিরে এসে বললে—সেই ভোরের আগে তো আর গাড়ি নেই ডাক্তার—কী হবে—

সেদিন সেই রাত্রে মনে আছে, করুণাপতির স্ত্রীকে বাঁচাবার সে কি আপ্রাণ চেষ্টা আমার। যে-ওষুধটা দরকার শেষ পর্যন্ত সেটা আনানোও হয়েছিল বিলাসপুর থেকে। কিন্তু রোগীর সমস্ত শরীর যেন ক্রমেই নীল হয়ে আসছিল।

করুণাপতি বলেছিল—টাকা থাকলে কি আজ আমার ভাবনা—

বললাম—টাকা দিয়ে কি জীবন পাওয়া যায় নাকি—

করুণাপতি বলে—টাকা নেই বলেই তো এই বড়মুণ্ডায় পড়ে আছি—এখুনি যদি হেড অফিসে গিয়ে হাজার খানেক টাকা নিতাই-বাবুর হাতে গুঁজে দিতে পারতাম—আর আয়ার সাহেবকে হাজার চারেক, তাহলে দেখতে ওই ভেঙ্কটারওয়ের জায়গায় আমিই গিয়ে বসতাম—বউও বাঁচতো, ছেলেপুলে-গুলোকেও খাওয়াতে পরাতে, লেখাপড়া শেখাতে পারতাম—

সেদিন শেষ রাত্রে করুণাপতির স্ত্রী শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছিল। সমস্ত শরীরে কী যে একরকম বিষক্রিয়া শুরু হলো, কেমন সন্দেহ হলো আমার। এ তো সহজ স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।

সেদিন শোকসন্তপ্ত করুণাপতি আমার হাত দুটো ধরে কী অঝোর ধারে কান্না। বললে—তোমাকে বলেই বলছি ভাই—বউটাকে আমিই মারলাম আজ—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

করুণাপতি বলতে লাগলো—দশটা ছেলে-মেয়ের পর একদিন যখন শুনলাম আবার নাকি একটা হবে—তখন ভাই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ওষুধ আনালাম একটা—সেইটে খাওয়ার পর থেকেই—

করুণাপতি কথা শেষ করতে পারলে না।

অবস্থা নিজের চোখে তো আমি দেখছি। তখনও ছেলেমেয়েরা সেই স্বল্প-পরিসর ঘরে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে, করুণাপতির ছেঁড়া ফতুয়া আর ঘন ঘন বিড়ি খাওয়া, আর ওই নির্বান্ধব নিঃস্ব বড়মুণ্ডা স্টেশন—যেখানে স্টেশন মাস্টারকে পয়সা দিয়ে কিনে পান খেতে হয়!

সেদিন যে ডাক্তার হয়েও মিথ্যে ডেথ্-সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম আমি, সে শুধু করুণাপতির মুখের দিকে আর তার অসংখ্য অপোগণ্ডদের দিকে চেয়েই।

কিন্তু সেদিন আমিই কি ভেবেছিলাম, সেই করুণাপতিকেই কয়েক বছর পরে রঙ্গমঞ্চের আর এক দৃশ্যে আর এক নতুন ভূমিকায় দেখতে পাবো। কিন্তু অন্য ভূমিকা হলেও চামড়ার নিচের রক্তটা ছিল দুজনেরই এক জাতের।

আমি সেদিন একটা আলু চুরির মামলায় সাক্ষ্য দিয়ে ফিরছি। যুদ্ধ তখন বেশ ঘোরালো হয়ে বেধেছে। সিভিল টাউন থেকে বিকেল বেলা ফিরলাম তাজপুর জংশনে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাজপুর একটা বড় ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। আশে পাশে ধানের আর কাপড়ের মিল। বড় বড় চার পাঁচটা শহরতলীর কাছাকাছি। শহর-তলীর আশেপাশে। দুটো ডালোমাইটের খনি আছে ছ' মাইল দূরে। তারপর আছে চামড়ার কারবার। সিভিল টাউনটাই দেখবার

মত। সিমেন্ট-করা রাস্তা। আর একদিকে চলে গেছে ডিহিরির ব্রাঞ্চ লাইন। জি-আই-পি'তে গিয়ে মিশেছে। ঘি, দুধ আর ছানার দেশ। স্টেশনের সামনে বুকের পাঁজরার মত অসংখ্য লাইন মাইল দুই জুড়ে পড়ে আছে। কালো গ্র্যানাইট পাথরের স্টেশন বিল্ডিং। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর ইউ-রোপীয়ানদের কলোনী। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মাড়োয়ারী, মহাজন, কিছুরই অভাব নেই।

দোতলার ওয়েটিং রুমের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ওই সব দেখছিলাম। একজন বেয়ারা এসে বললে—বড় সায়েব সেলাম দিয়া—

—কোন্ বড় সায়েব?

—টিশন মাস্টার—

স্টেশন মাস্টার! কোন্ সাহেব? তাজপুর জংশনের স্টেশন মাস্টার বরাবরই সাহেব। আগে ছিল ম্যাক্‌মারুইস্, তারপর আসে লি-বেনেট্, তারপর আর কে ছিল জানি না। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্যে নির্দিষ্ট আরো কয়েকটা স্টেশনের মধ্যে তাজপুর জংশন একটা।

বেয়ারা আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে—মজুমদার সাব—

তারক মজুমদার। ওয়ালটেয়ারে ছিল। হয়ত প্রমোশন পেয়ে এসেছে। আমাকে চেনে। একবার এ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করেছিলাম তার। আমার হাতে জীবন ফিরে পেয়েছে।

খস্ খস্ দেওয়া ঘরে ঢুকে কিন্তু দেখলাম করুণাপতি মজুমদারকে—

বলাই বাহুল্য যে, অবাক হয়েছিলাম। সামনের য়্যাশ-ট্রেতে চুরোটটা রেখে উঠলো করুণাপতি। উঠলো আমাকে অভ্যর্থনা করতে।

সামনের চেয়ারে বসিয়ে বললে—শুনলাম তুমি এসেছিসে কোর্টে—শুনেই তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু খবর পেলাম ওয়েটিংরুমে আরো অনেক প্যাসেঞ্জার রয়েছে, সে যা হোক—আজকে থাকছো তো—তোমার সঙ্গে আমার জরুরী দরকার আছে—

তারপর আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে, চক্‌চকে পালিশ করা পেতলের কলিং বেলটা বাজিয়ে দিলে করুণাপতি। বেয়ারা আসতেই হুকুম হয়ে গেল—ডাক্তার সা'ব কা সামান মেরা বাঙলোমে পৌঁছা দেও—ঔর পাঁয়তালীকে মেরা পাশ ভেজ দেও—

পাঁয়তালী এল। করুণাপতি বললে—ডাক্তার সায়েব খাবেন আজকে—বেশ মুখ-রোচক রাঁধো দিকিনি কিছু—

আমার অবশ্য অবাক হবারই কথা। টেবিলের সামনে টাই স্যুট পরা করুণাপতি। বনাতের টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সিগ্রেটের টিন রয়েছে একটা, তার পাশে জ্বলন্ত চুরুট আধখানা। পুরোপুরি সাহেবি কায়দা কানুন। যেন ভিক্টোরিয়ান যুগের রোমাণ্টিক লেখকের লেখা কোনও উপন্যাসের গল্পের মতন। বিশ্বাস না হবার গল্প।

দু'চারজন মারোয়াড়ী মহাজন ওয়াগন সাপ্লাই নিয়ে কথা বলতে ঢুকলো।

করুণাপতি তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললে। তারপর বললে—চলো যাই—

করুণাপতির সঙ্গে বাইরে এলাম। তখনও দু'চারজন পেছন পেছন আসছিল। করুণাপতি বললে—আজ হবে না—কাল সকালে সব এসো—ওয়াগন এসেছে সাত আটখানা—

যেন ক্ষুন্ন মনে সবাই বিদায় নিলে।

এ-বাংলোয় আগে সাহেবরা বাস করে গেছে। সাহেবদের জন্যেই তৈরি। বাঙলোয় ঢুকতেই একজন এসে করুণাপতির হাতের টুপিটা আর গায়ের কোট খুলে নিলে। একটা গোল টেবিলের সামনে বসলাম দু'জনে। বললাম—সাতটায় যে আমার ট্রেন করুণাপতি—

—জানি—করুণাপতি বললে—কিন্তু এ-ও জানি যে তোমার আজ না গেলেও চলবে—

তারপর দু'গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ এল। করুণাপতি বললে—রাত্রে তোমার জন্যে ভাত না রুটি, কী হবে ডাক্তার—

বড়মুণ্ডা স্টেশনের সেই ছোট রেলের খুপরিটার কথাই আমার বার বার মনে পড়তে লাগলো। সাত ফুট বাই ছ' ফুট ঘর দুটোর চেহারা এখানে বসে মনে পড়া যেন অন্যায়। কিন্তু ক'টি বছরই বা কেটেছে! এরই মধ্যে কী এমন ঘটেছে যে এমন আমূল পরিবর্তন হতে হয়। যুদ্ধ অবশ্য বেধেছে—যুদ্ধে আমাদের পক্ষে হারও হচ্ছে বটে—জিনিস-পত্রের দর বাড়ছে এই যা'—বাঙলা দেশে একটা দুর্ভিক্ষও হয়ে গেছে—এ-দূর দেশে সে-খবরও পেয়েছি। কিন্তু তারা কোথায় সব? বাড়িটা যেন বড় নিস্তব্ধ মনে হলো। কোথায় গেল বোঁচা ক্ষেন্তির দল?

বললাম—ছেলেমেয়েদের কাউকে দেখছি নে—

—তা'রা তো কেউ এখানে থাকে না আর —তথাগত এবার ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছে ল'তে—ভাবছি ওকে দেব সিবিল সার্ভিসে আর রাতুল তো এবার ফাইন্যাল এম বি দিয়েছে, এখনও রেজল্ট্ বেরুই নি—আর সেজ ছেলে পল্লবকে দিয়েছি শিবপুরে... আর সবগুলো হোস্টেলে বোর্ডিং-এ থেকে পড়ছে—জানো তো এখানে থাকলে লেখা পড়া কিচ্ছু হবে না—তাই...

শুধু বললাম—ভালোই করেছ—কিন্তু...

করুণাপতি যেন বুঝতে পারলে আমার মনের কথাটা। বললে—তুমি ভাবছ ডাক্তার—এ-সব কেমন করে হলো—কেমন করে যে হলো—আমিও ঠিক তোমায় বোঝাতে পারবো না—সেই যে বড়মুণ্ডা স্টেশনে আমার স্ত্রী...খুনই তাকে করলাম বলতে পারো—সেই হলো আমার শুরু—সেই স্ত্রী মরার পর থেকেই আমার সময় ভালো হলো ভাই—

তবু বুঝতে পারলাম না—

করুণাপতি বললে—আয়ার সায়েব রিটায়ার করলে আর রস্ সায়েব হলো এস-ট্যাবলিশমেণ্টের কর্তা—আর তখন হাতে ছিল বউএর গয়নাগুলো। সেইগুলো সব বেচলাম—কয়েক হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে গেলাম হেড্ অফিসে—নিতাইবাবুও এখন রিটায়ার করেছে—তখন সেই চেয়ারে প্রমো-শন পেয়েছে জগদীশবাবু। লোকটা বরাবর মাতাল জানতাম—সোজা একেবারে বাড়িতে নিয়ে গেলাম দু'টি আসল মাল—বোতলের চেহারা দেখেই চোখ দুটো চক্‌চক করে উঠলো জগদীশবাবুর—

করুণাপতি থামলো।

বললাম—তারপর—

—তোমাকে বলেই বলছি—আর কাউকে তো এসব বলাও যায় না—তা'ছাড়া যত সহজে বলছি—জিনিসটা তো অত সহজও নয়—কিন্তু আমার যে তখন সঙ্গীন অবস্থা, হয় এস্পার নয়তো ওস্পার—শেষে যে কী করে কী হলো—চাকা আমি গড়িয়ে দিলুম—আর সে-ও গড়িয়ে চললো—। নইলে সেই জগদীশবাবু যে আগে দেখা হলে কথাই বলতো না—এক গ্লাশের বন্ধু হয়ে গেলাম—আর শুধু কি তাই—সেই বাঘের বাচ্ছা রস সায়েব, যা'কে দেখলেই

জম হতো, শেষকালে সে-ও নেশার ঝোঁকে কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে লাগলো—

করুণাপতি গল্প বলে আর থামে একটু।

কেমন করে করুণাপতি বড়মুণ্ডা থেকে বদলি হলো, নবাবগঞ্জে, সেখানে দিন গেলে তিন চারটে টাকা হতো—সেখান থেকে বদলি হলো ভাটাপাড়ায়—সেখানে দিন গেলে গড়ে পঞ্চাশ ষাট টাকা—তারপর যুদ্ধ শুরু হলো। সেখান থেকে বদলি নাইনপুরে, তারপর বিলাসপুরে, তারপর টাটানগরে তারপর এই তাজপুরে। দিন গেলে এখানে তিনশো-চারশো টাকাও হয় কোনও কোনও দিন। এক-একটা ওয়াগন পিছু দ'শো তিনশো করে ঘুষ!

'করুণাপতি বললে—গয়না বেচে সাত হাজার টাকা দিইছি বটে, দুজনকে—সেটা ঘুষই বলতে পারো—কিন্তু ব্যাপারটা স্রেফ আসলে ভাগ্য—কই, কত লোকই তো এখন ঘুষ দেবার জন্যে তৈরি—কিন্তু ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া কি অতই সহজ—

করুণাপতি আবার বললে—এই দেখ না, আড়াই শ' টাকা তো মোটে মাইনে পাই মাস গেলে, কিন্তু দশটা ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার পেছনেই মাসে সাতশো টাকা পড়ে যায়—তারপর আজকালকার বাজারে হোস্টেল বোর্ডিংএর খরচটা ভাবো একবার—তা রস্ সায়েবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে—বছরে বড়দিনের সময় পঁচিশ হাজার টাকা মেমসায়েবের কাছে দিয়ে আসি—কখনও আমায় বদলি করবে না এখান থেকে—আর দেবার মধ্যে আর একটা জিনিস দিতে হয়েছে—জেনারেল ম্যানেজারকে একখানা নতুন ক্যাডিলাক—কাজটা একেবারে পাকা করে নিয়েছি ভাই—

বাইরে অন্ধকার হয়ে এল। সামনের বাগানটায় অনেক ফুলের বাহার।

কথাবার্তার মধ্যেও কয়েকজন মহাজন দেখা করে গেল। সকলের একই বক্তব্য। ওয়াগন। যে কোনও প্রকারে ওয়াগন চাই। করুণাপতির বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা বসে মনে হলো পৃথিবীতে বুঝি মানুষের একটি মাত্র পরমার্থ কাম্য—তা'হচ্ছে ওয়াগন। ওয়াগনের যে এত চাহিদা, এত বাজার দর—তা কে জানতো। এক একটা ওয়াগনের জন্যে দুশো তিনশো টাকা অগ্রিম দিয়ে যায়। রেলের পাওনা যা', তা' পরে হবে—আগে তো গেট্-ফি দাও, পরে দর্শন।

সন্ধ্যে বেলা করুণাপতি বললে—যে জন্যে তোমায় ডাকা—সেইটে এবার বলি—

করুণাপতি কেমন গলাটা নামিয়ে আনলো।

—বড়মুণ্ডা স্টেশনে আমার স্ত্রীর বেলায় একবার সেই ভুল করেছিলাম—খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ওষুধ খাইয়ে বউটাকে তো মেরেই ফেললাম—কিন্তু এবার আর ওই রিস্ক নেব না—তোমার সঙ্গে দেখা না হলে তোমাকে আমি খবর পাঠাতাম—

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—তুমি কি আবার বিয়ে করেছ নাকি—

—না বিয়ে নয়, কিন্তু তবু ও-ঝঞ্ঝাটে দরকার কী?

আমি কিছু বলবার আগেই করুণাপতি ধুতি পাঞ্জাবী পরে নিয়ে ট্যাক্সি ডাকতে বলে দিয়েছে।

চক্‌বাজারের কাছে এসে একটা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামলো। নেমেই করুণাপতি বললে—এসো ডাক্তার—চলে এসো—

মাথা নিচু করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। কিন্তু ওপরে উঠে ভারি ভালো লাগলো। করুণাপতিকে দেখে ঝি-চাকর ছুটে এসেছে। করুণাপতি গিয়ে একেবারে খাটে বসে নির্মলাকে খবর দিতে বললে। সাদা ধবধবে উজ্জ্বল আলো। খানিক পরে নির্মলা এল।

করুণাপতি বললে—ডাক্তার, এরই। এরই কথা বলছিলাম—

এই সুদূর দেশে বাঙালী মেয়েকে কোথা থেকে সংগ্রহ করলে করুণাপতি।

করুণাপতি বললে—এমন ওষুধ দেবে ডাক্তার যা'তে স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি না হয় —কী বলো নির্মলা—আজ তিন মাস মাত্র হয়েছে—বেশী ভয়ের ব্যাপার নয়—এ-তোমার পাঁচ ছ' মাস নয় যে......

নির্মলা আমার দিকে একবার ভয়ে ভয়ে তাকাল। তার পাণ্ডুর চোখের দিকে চেয়ে আমি যেন কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। চোখের সামনে নিজের ভাবী হত্যাকারীকে দেখলে কেমন ভাব হয় মনে, বলতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে হলো—চাউনিটা যেন অনেকটা সেই রকম—

করুণাপতি বললে—তাজপুর বড় শহর —যা' কিছু ওষুধ পত্তর লাগবে, এখানে তোমায় আমি সব জোগাড় করে দিতে পারবো—তা'র জন্যে কিছু ভেবো না—

তবে দেখো ভাই আমার ওই একটা অনুরোধ—এমন ওষুধ দেবে যা'তে স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি না হয়—কী বলো নির্মলা—

নির্মলাকে সাক্ষী মানা হচ্ছে, কিন্তু নির্মলা যেন কাঠের পুতুলের মত মুখ নিচু করে চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে বসে রইল। সুডৌল ফরসা দু'টো পা যেন থর থর করে কাঁপছে মনে হলো।

—তা' হলে ওই কথাই রইল—কাল ওষুধ পত্তর জোগাড় করে একেবারে নির্মলাকে দেখে যাবে—কী বলো—করুণাপতি আবার বললে।

অনেক দিন আগেকার সব কথা। তবু স্পষ্ট সব মনে আছে। সেদিন আর ফিরে যাওয়া হয়নি, পরদিন রাত্রের ট্রেনে গিয়েছিলাম। করুণাপতির হাজার অনুরোধও আমাকে টলাতে পারে নি। যা' হোক, পরদিন সকালে করুণাপতি যেতে পারে নি চক্‌বাজারের বাড়িতে। ওষুধপত্র নিয়ে আমি একলাই গিয়েছিলাম। ওর বুঝি হঠাৎ কাজ পড়ে গেল একটা।

নির্মলার সেদিনকার কথাগুলো যেন এখনও আমার কানে বাজছে—

নির্মলা অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলেছিল—আপনাদের দুজনের খুব বন্ধুত্ব বলে' মনে হলো—কিন্তু আপনার বন্ধুকে একটা উপদেশ দিতে পারেন না—

জিগ্যেস করেছিলাম—কী? কী সে উপদেশ—

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল নির্মলা। আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি—।

তবু বার বার প্রশ্ন করার পর শুধু বলেছিল—না থাক্, উনি বড়লোক, কথাটা ওঁর কানে গেলে ক্ষতিই হবে আমার, মিছিমিছি মাঝখান থেকে হয়ত রেগে গিয়ে মাসোহারা বন্ধ করে দেবেন—দেশে আমার মা উপোষ করবে, বাবার চিকিৎসা হবে না ভাই বোনদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে—তা'র চেয়ে আপনি যা' করতে এসেছেন তাই করুন—

নির্মলার চোখের ওপর চোখ রেখে জিগ্যেস করলাম—তবে কি এতে তোমার অনিচ্ছে আছে?

নির্মলা বলেছিল—আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রশ্ন কেন তুলছেন—আমার তো স্বাধীন ইচ্ছে বলে' কিছু থাকতে নেই—আমার কাছে আমার বাবার চিকিৎসা, মা'র সংসার খরচ

ভাইবোনদের মানুষ হওয়ার প্রশ্নটাই বড়ো—যাক কী করতে হবে আমার বলুন—

দুপুর বেলা ফিরে এসে করুণাপতিকে বলেছিলাম—হলো না করুণাপতি—

করুণাপতি অবাক্ হয়ে গেল।—কেন?

—তিন মাস বাজে কথা—দেখে বুঝলাম ছ'মাস—এখন কোনও রকম রিস্ক্ নেওয়া উচিত নয়। জীবন হানি হতে পারে—

—তা' হলে কী হবে? করুণাপতি যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো।

—একটা উপায় আছে।

করুণাপতি উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

—একটা উপায়। নির্মলা মেয়েটি তো ভালো মেয়ে বলেই মনে হয়, আর তোমারও তো ঘরে স্ত্রী নেই—বিয়ে করো না কেন ওকে—

হো হো করে সাড়ম্বরে হেসে উঠেছিল করুণাপতি। বিয়ে? পাগল নাকি! এত-গুলো ছেলের বাবা হয়ে! হো হো করে করুণাপতি সেদিন হেসে উঠেছিল। সেই রাত্রের ট্রেনেই আমি তাজপুর ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

তারপর করুণাপতির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। চাকরি থেকে রিটায়ার করে করুণা-পতি কলকাতায় বাড়ী করেছিল। দেখা ক্বচিৎ হতো। একবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম তার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যে একজন সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী হেড মিস্ট্রেস চাই। তেমন হেড মিস্ট্রেস পেয়েছিল কি না, সে খবর পাইনি। তবে শুনেছিলাম ছেলেমেয়েরা সবাই কৃতি সন্তান হয়েছে।

রাস্তায় ঘটনাচক্রে একদিন দেখা হয়েছিল করুণাপতির সঙ্গে। বললে—ভালো হেড মিস্ট্রেস পাচ্ছি না ভাই—তোমার সন্ধানে আছে কেউ?

তারপর বলেছিল—গোটা পঞ্চাশেক ফ্যান কিনবো, মোটা কমিশন দেবে এমন কোনও পার্টি আছে—আর গোটা ছয়েক সেলাই-এর কল—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—রিটায়ার্ড লাইফ কেমন লাগছে তোমার করুণাপতি?

করুণাপতি বললে—রিটায়ার আর করলাম কোথায় ভাই—এখন ওই ইস্কুল চালাচ্ছি—তা মাস গেলে ফেলে ছড়িয়ে শ' পাঁচ-ছয় থাকে—আর অনারেবল্ প্রফেসন তো বটে—

সেই শেষ দেখা। তারপর বোঁচা কবে তথাগত হলো, ক্ষেন্তি কবে তপতী হলো—সে খবর কানে আসেনি।

বহুদিন পরে এবার কলকাতায় আসাতে 'করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ে' করুণাপতির জন্মবার্ষিকী উৎসবে নিমন্ত্রণ হয়ে গেল।

সভায় ডায়াসের ওপর বসে ভাবছিলাম পুরোন সব কথা! তথাগতর পাশে ওর ছোট-ভাই পরাশর—অনেকটা যেন নির্মলার মতই মুখের আদলটা। তবে শেষ পর্যন্ত নির্মলাকে কি বিয়ে করেছিল করুণাপতি? কিম্বা......কিম্বা......কিন্তু সে কথাটা কল্পনা করতেও কেমন লজ্জা হলো।

তা' হোক—করুণাপতি আসলে যাই হোক, পৃথিবী হয়ত তাকে মহাপুরুষ বলেই একদিন জানবে। আমি নগণ্য ডাক্তার—আমি চিরকাল বাঁচবো না। করুণাপতির কলঙ্কময় অতীতের সব সাক্ষ্য যখন একেবারে মুছে যাবে—তখন আমিই বা কোথায়? কলকাতার কোনো বড় রাস্তা করুণাপতির নামের সঙ্গে হয়ত জড়িয়ে থাকবে। ভেজাল ঘি-তেল খাইয়ে যাঁরা লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে—তা'দের কত মর্মর মূর্তি কলকাতার রাস্তায় পার্কে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা। তবে মাঝখান থেকে আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকি। আগামীকালের স্কুলের ছাত্ররা হয়ত পাঠ্যপুস্তকের পাতায় করুণাপতির জীবনী পড়ে নতুন আদর্শ গ্রহণ করবে—তাতে আমি বাধা দেবার কে?

কী জানি কী যে হলো, মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমিও বললাম—"করুণা-পতিকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনতাম, করুণাপতি ছিলেন সত্যিকার করুণাপতি, সদাশয়, মহৎ মহাপ্রাণ পুরুষ। অতি ছোট অবস্থা থেকে কেবলমাত্র পুরুষকার, আত্ম-বিশ্বাস ও কর্মনিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে তিনি বড় হয়েছিলেন—তাঁর জীবনে অসত্যের বা মিথ্যার কোনও স্থান ছিল না। তাঁর জীবন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, সত্যের জয় একদিন অনিবার্য—সত্যনিষ্ঠ মানুষ একদিন স্বপ্রতিষ্ঠ হবেই। বহুদিন আগে বহুবার করে বহু মহাপুরুষ ওই একই কথা বলে গেছেন। বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, গান্ধী, তাঁরা যা বলে গেছেন—করুণাপতি নিজের জীবন দিয়েই তাই কাজে পরিণত করে গেছেন—করুণাপতি বার বার বলতেন, 'ফাঁকি দিয়ে কিছু লাভ হয় না—' মহাপুরুষের এই বাণীই করুণাপতিকে প্রাতঃস্মরণীয় করে রাখবে—"

জল জঙ্গল

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

(১৪)

কত দিন গেল তারপর? হিসেব করে দেখ, হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না। এরই মধ্যে হঠাৎ একবার অনেকগুলো টাকা কেতুচরণের হাতে পড়ে গেল। সড়কি ও লাঠি সম্বলে বড় এক বাঘ মেরেছিল তারা। মরা বাঘ সদরে দেখিয়ে সরকার পুরস্কার পাওয়া গেল। তিনজন ছিল—প্রত্যেকের ভাগে পড়ল এক কুড়ি পাঁচ। টাকাগুলো পিতলের ঘটিতে পুরে কেতু মাটির নিচে পুঁতল। আর ভাবনা কিসের?

কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক ল্যাঠায় জড়িয়ে পড়েছে। দিগম্বর বিশ্বাসের মেয়ে টুনিকে পছন্দ করে ফেলেছে, বিয়ে করবে। বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হবে এবার। এলোকেশী যেমনধারা সংসার পেতেছে দুর্লভের সঙ্গে। দুর্লভ এখন আর মধুবাবুর মাটি-কাটা বাঁধবন্দীর ম্যানেজার নয়, বনকরের চাকরি পেয়ে কোথায় সে সরে পড়েছে। মতিরামও দোকানপাট তুলে ভাইকে নিয়ে কোন মুল্লুকে গেছে, খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। কেতুচরণ কিন্তু মৌভোগের মায়া কাটাতে পারেনি। দিগম্বরের ওখানে বেশির ভাগ সময় কাটায়, কাজকর্ম করে—যেমন এককালে করত মান্যধরের বাড়িতে। ওরই মধ্যে ফাঁক কাটিয়ে এক একদিন সে মৌভোগে চলে আসে। মৌভোগ পুরোপুরি গ্রাম এখন। জঙ্গল হাসিল হয়ে লোকবসতি আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। হাটবাজারের প্রয়োজন। মধুসূদন হাট বসাবার জন্য তাই উঠে পড়ে লেগেছেন। বড়দলের হাট কানা করে দেবেন, এই অভিপ্রায়।

অনেকদিন ধরে অনেক টালবাহানা করে কেতুচরণ অবশেষে স্পষ্টাস্পষ্টি প্রস্তাব করল দিগম্বরের কাছে। জবাব শুনে চক্ষু কপালে উঠল। মেয়ে দিতে আপত্তি নেই, তবে পণ লাগবে একশো এক টাকা। ঐ রকম নাকি দর উঠছে।

একশো এক...জানো তো কাকে বলে? পাঁচ কুড়ির উপরেও এক বেশি। বোঝ। যে টাকায় স্বচ্ছন্দে এক জোড়া হালের বলদ কিনতে পাওয়া যায়, কায়দায় পেয়ে দিগম্বর তাই হেঁকে বসল তার রোগা-ডিগডিগে বারো বছুরে মেয়েটার জন্য। অর্থাৎ কেতুচরণের আরও প্রায় চার কুড়ি টাকার জোগাড় দেখতে হবে।

আবার ছুটোছুটি। ঘর সে বাঁধবেই। এক কাঠুরে-নৌকোয় কাজ জুটিয়ে নিল। একশো টাকা জমানো—সোজা ব্যাপার! ক'জনের আছে? নবাব সিরাজদ্দৌলার ছিল। হয়তো, অযোধ্যার রাম-রাজার ছিল। মধুসূদনবাবুরও থাকতে পারে। তোমার আমার পক্ষে একশো টাকা এক ঠাঁই করা—বাপরে, বাপরে, বাপ!

তা বলে কেতু পিছপাও নয়। পর পর পাঁচ মরশুম বাদাবনে কাঠ কেটে বেড়ায়। মরশুম অন্তে ফিরে এসে মাটি খুঁড়ে ঘটি তুলে নতুন এক এক দফা টাকা পোরে। বউ চাই, ঘর সংসার চাই। টাকা না হলে কিছু হয় না, টাকার দরকার।

পাঁচটা বছর কাটল এমনি। এখনো বাকি আছে। শেষ বারে এসে দিগম্বরের বাড়ি খোঁজ নিতে গেছে—টুনি এক দেড় মাসের মেয়ে কাঁকালে নিয়ে বাঁকা হয়ে এসে দাঁড়াল। মেটে সিঁদুরের টানা রেখা সিঁথির মাঝ বরাবর—সিঁথি ও কপালের উপর তিন-নরী রুপোর সিঁথিপাটা। ক'দিন হল টুনি বাপের বাড়ি এসেছে, এই মেয়ে হয়েছে। কেমন হয়েছে দেখ দিকি! কোলের মেয়েটা কেড়ে নিয়ে কেতু যে তখন আছাড় মারেনি—সেটা টুনি ও মেয়ের বাপের ভাগ্যি।

কত দিন হয়েছে, হিসাব করে দেখ তাহলে।

উমেশের সঙ্গে ইদানীং খুব দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে। গুণী লোক উমেশ, বিদ্যার জাহাজ। সেই মানুষ কি রকম হয়ে গেছে! কথাবার্তা পণ্ডিতজনের মতোই বটে। বলে, বিয়ে-থাওয়ার নাম করবি তো বনবে না আমার সঙ্গে। বেশ তো আছিস—থাচ্ছিস, দাচ্ছিস, তা নয়, শালকে আহ্বান করা—শালগাছ, বনে থাকো কেন বাপু? শূল হয়ে এসে দিল-কলজে এফোঁড়-ওফোঁড় করো। মেয়েমানুষ হল শূল—অম্লশূল, পিত্তশূল কোথায় লাগে? তাই চক্ষুশূল আমার কাছে।

হা-হা করে উমেশ হাসতে থাকে। কথাগুলো কেতুচরণের পছন্দসই নয়, কিন্তু পদ্মর বৃত্তান্ত জানে বলে তর্কাতর্কি করে না। আহা, বড্ড দাগা দিয়ে গেছে পদ্ম। পদার সঙ্গে চলে গিয়েছিল—কিন্তু তারও চেয়ে বড় দুঃখ, পদ্মর ঘরকন্না সুখের হয়নি। পদ্মকে উমেশ দেখে নি তারপর। আর দেখবেও না। পাঁচুর (এখন আর এক পাঁচু জুটেছে বলে পদ্মর ভাই পাঁচুকে গোল-পাঁচু বলে সকলে) মুখে শোনা, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে সে। যারা পদাকে ভালরকম জানে, তারা কিন্তু বলে, মিথ্যে কথা—পদাই হয়তো গলা টিপে মেরে তারপর গলায় দড়ি পরিয়ে ঘরের আড়ায় টাঙিয়ে রেখেছিল। যেমন কর্ম তেমনি ফল! ভায়ের সংসারে দিব্যি তো ছিল—সাঙা করতে গেল কেন ভিনদেশি গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষটাকে?

উমেশের কিন্তু রাগ নেই। চোখে জল আসে পদ্মর কথা ভাবলে। মোহমুগ্ধ পদ্ম—সে তো পাগল তখন। মতিচ্ছন্ন মানুষের উপর রাগ করা চলে না। গলা টিপে তাকে মেরে ফেলেছে। পদা বাঘের মতন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেই অবস্থাটা উমেশ ভাববার চেষ্টা করে। কি ভাব মনে হয়েছিল তখন পদ্মর। চকিতে একবার মনে এসেছিল কি ওমশার কথা—পদা এসে পড়বার পর থেকে যাকে কেবলই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে, মানুষ বলে মনে করেনি?

উমেশ গান-বাজনা নিয়ে আছে। সবাই হেনস্তা করে, কিন্তু তাতে দৃক্‌পাত নেই। পদ্ম ও পদার কাছে লাঞ্ছনা পাবার পর এ সমস্ত একেবারে গা-সওয়া হয়ে গেছে। একটু যদি দুষ্টিমুখ দাও, আনন্দে শতখান হবে। বিরক্ত হয়ে গালমন্দ করো যদি—মুখ শুকনো হবে হয়তো, কিন্তু রাগ করবে না। রকমারি বাজনা গিয়ে ঢ্যাবঢেবে এক ঢোলে এসে ঠেকেছে। মান্যধর মারা গেছে, ঘর-বাড়ি, জমা-জমি সমস্ত গেছে—তাতেই

জোটে না, বাদ্যযন্ত্র কিনবে কি দিয়ে? তা হয়েছে ভাল। ভাল বাজনার সঙ্গে ও-গলার গান আরও উদ্ভট শোনাত।

উমেশ ছাড়াও গোল-পাঁচু, গদুলি-পাঁচু, ঋষিবর, খুশাল—একসঙ্গে অনেকে জুটেছে। তা আছে ভালই, সন্ধ্যার পর জমজমাট আড্ডা। যদি জিজ্ঞাসা করো, খাওয়া-পরা চলে কিসে? গায়ে জোর আর মাথায় একটু ঘিলু থাকলে কিসের দুঃখ বাদা অঞ্চলে? কোন অভাব নেই ওদের।

(১৫)

বনবিবিতলার প্রায় মুখোমুখি মধুসূদনের নূতন হাটের পত্তন হচ্ছে। এই বছর দশেক আগেও কশাড় জঙ্গল ছিল—হাসিল হতে হতে আবাদ এতদূর অবধি পেঁাচেছে। বনবিবিতলাই বাদার সীমানা। খালপারের যাবতীয় এলাকা বনবিবির করচ্যুত হয়ে এখন রায়বাবুর দখলে।

মেলা বসেছে হাটের মুখবন্ধ স্বরূপ। পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। খুব নাম ছড়িয়েছে, বিস্তর লোক যাতায়াত করছে, দোকানও বসেছে হরেক জিনিসের। লোকপরম্পরা শোনা যাচ্ছে, মেলার শেষ মুখে মাণিক-যাত্রা ও জারিগান হবে। বায়স্কোপ এসে এক রাত্রি চলন্ত ছবির খেলা দেখিয়ে যাবে, সে চেষ্টাতেও আছেন মধুবাবু। কিন্তু এত দূর বলে কোন কোম্পানি রাজি হচ্ছে না। এসব ছাড়াও আমোদ-স্ফূর্তির ব্যবস্থা আছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। মেলা শেষ হয়ে গেলে পৌষ-সংক্রান্তির পরে সপ্তাহান্তিক হাট বসবে মেলারই জের হিসাবে। এ-মচ্ছব জুড়িয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

হাট বসানো সোজা নয়—বিশেষ এই বাদা অঞ্চলে। রকমারি জিনিসের দোকান-পাট থাকবে, প্রচুর তরি-তরকারি ও মাছ-শাক উঠবে হাটের দিনে—তবেই না মানুষ গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে এসে জড় হবে। বাড়তি আকর্ষণের আর যত ব্যবস্থা করতে পারবে ততই ভাল। আমদানি মালপত্র প্রথমটা খরিদ্দারের অভাবে সম্পূর্ণ বিক্রী হবে না। কিন্তু মাল ফেরত নিয়ে গিয়ে পাইকার যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দ্বিতীয়বার সে এমুখো হবে না। তাই বেচাকেনার পরে অবশিষ্ট যা-কিছু থাকবে, কিনে নিতে হবে এস্টেটের তরফ থেকে। সেগুলো লোকজনের মধ্যে বিলি-বিতরণ করো অথবা গাঙের জলে ঢেলে দাও। গাঙে ঢেলে দেওয়াই সমীচীন—কলিকালের ছ্যাঁচড়া মানুষ একবার মাংনা পেয়ে গেলে অতঃপর আর পয়সা দিয়ে কিনতে চাইবে না, হাট ভাঙা অবধি অপেক্ষা করবে যদি আবার বিনি পয়সায় পাওয়া যায়।

গোড়ায় গোড়ায় এমনি করতে হয়। হাট একবার জমে গেলে তখন মজা—দু-হাতে দেদার তোলার পয়সা কুড়িয়ে বেড়াও। বড়দলের ঐ যে অত বড় হাট—যার এক আনা অংশের মালিকেরও মাস গেলে কোন না হাজার দেড়হাজার পাওনা হয়—সে হাটেরও গোড়ার ইতিহাস এই। বনবিবি মুখ তুলে চান তো রায় হাটেরও একদিন সেই অবস্থা হবে। আর তা হবেই। মধুসূদন কর্মবীর—অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা তিনি রাখেন। খাটছেনও খুব। যখন-তখন সেই যে জঙ্গলে গিয়ে পড়তেন—সে সব একেবারে বন্ধ এখন। নীলরঙের এক সৌখিন পানসি বানিয়ে নিয়েছেন—মৌভোগ ও রায়গাঁর মধ্যে সেই পানসি আনাগোনা করে। এ পথে যত ধানকর-জলকর পড়ে, বড় গাঙ-গুলো ছাড়া সমস্তই প্রায় মধুসূদনের সম্পত্তি। ছিটে চক যা দু-একটা বাকি আছে—তা-ও বেশিদিন অন্যের থাকবে না। পড়তেই হবে তাঁর কবলে। লক্ষ্মী ঝাঁপি উজাড় করে ঢালছেন—রায়গাঁর সদর উঠানে ফি বছর একটা-দুটো করে গোলা বাড়ছে। এবারেরটা দিয়ে মোট পনের হল।

একটা বড়ো অসুবিধা মিঠা জলের বন্দোবস্ত হচ্ছে না। অজস্র অর্থব্যয়ে মধুসূদন টিউবওয়েল বসিয়েছিলেন। গভীর ভূগর্ভ থেকে যে জল আহৃত হল, তা খাওয়া চলে; ডালও সিদ্ধ হয় অনেকক্ষণ জ্বালানোর পর। কিন্তু মুশকিল—একটা-দুটো টিউকলে (লোকের মুখে মুখে এই নামকরণ হয়েছে) হাটুরে লোকের দায় মেটে না। তা ছাড়া দারুণ লোনায় বছর তিন-চারের বেশি কর্মক্ষমও রাখা যায় না—উপরের লোহায় মরিচা ধরে অব্যবহার্য হয়ে যায়। নদী থেকে যথাসম্ভব দূরে পুকুর কেটে পরীক্ষা করা হবে, তার ব্যবস্থা হচ্ছে। আপাতত রায়গাঁ থেকে জল আসে—ডিঙি বোঝাই করে রোজ দু-তিন ক্ষেপ আনা হয়। রায়বাবু যখন আসেন, নীল-পানসিতে দশ-বারো কলসি তিনিও সঙ্গে আনেন।

খুশাল একদিন মধুসূদনের কাছে এল। মধুসূদন রায় গ্রামে আছেন—খোঁজ নিয়ে সেই সময়টায় এল, মৌভোগে মেলার মানুষের মধ্যে এত আগে জানাজানি হতে দিতে চায় না। দলের মধ্যে খুশাল ভারি হিসেবি। বেঁটে খাটো রোগা মানুষটি—দেহ হাড়মাংসে নয়, যেন ইস্পাতে গড়া। ইস্পাতের মতোই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—নোয়ানো যাবে, কিন্তু ভাঙবে না। ইস্পাতের মতোই গায়ের রং।

এক নূতন প্রস্তাব নিয়ে এসেছে—রায়-হাটের প্রান্তে তারা মাছের সায়ের করবে। গাঙে খালে মাছ পড়ে। আবার চকদারের পত্তনি-নেওয়া ধানকর, জলকর থেকেও চুরি করে মাছ ধরে অনেকে। মাছের খরিদ্দারও আছে, কিন্তু ঠিক সময়ে বেপারির নাগাল না পাওয়ায় বিস্তর মাছ নষ্ট হয়ে যায়। সায়ের হলে সেখানে বেপারিরা ওঠাবসা করবে, মাছের নৌকো এসে ভিড়বে। এরা দস্তুরি পাবে। বুদ্ধিটা করেছে ভালো। উঠতি হাট—জমিয়ে তুলতে পারলে, খুশাল হিসাব করে দেখিয়েছে, ঝুড়ি পিছু দুটো করে পয়সা রাখলেও দৈনিক দু টাকা আড়াই টাকা হওয়া বিচিত্র নয়।

মধুসূদন চমৎকৃত হলেন মনে মনে। করিৎকর্মা লোক এরা—মুখে যা বলছে, কাজেও ঠিক তাই করবে। এস্টেটের পক্ষে বিশেষ লাভের ব্যাপার—এখন যা দেয় দিক, দু-পাঁচ বছর পরে সায়েরের ইজারা নিলামে চড়িয়ে বেশ মোটা সেলামি আদায় হবে।

বাদার জঙ্গলে মধুসূদন একরকম, এখানে একেবারে আলাদা আর এক লোক। আবার যখন কলকাতায় ছিলেন, শোনা যায়, সেই ছিমছাম সৌখিন যুবকটির সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নেই এখানকার রায়বাবুর। ভূ-সম্পত্তির ব্যাপারে তিনি গভীর জলের মাছ—সহজে ধরা দেবার পাত্র নন। খুশালের প্রস্তাব শুনে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, বেশ তো—ভাল কথা। গ্রাহক আরও দু-চারজন হাঁটাহাঁটি লাগিয়েছে—

খুশাল স্তম্ভিত হল। বাদার এই দুর্গম সীমান্তে তার আগেও এ-ফন্দি এসে গেছে অন্য লোকের মাথায়!

বলে, দুজন না দশজন বাবু?

রায়বাবু হেসে বললেন, গুণে কে রেখেছে? আর তাতে এলো-গেলো কি? কারো সঙ্গে এখনো পাকা কথা বলিনি। লম্বা সেলামির লোভ দেখাচ্ছে—পাঁচশ' অবধি উঠেছে। উঠবে না কেন, লাভটা কি রকম হবে আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে তো! এ-বাজারে বোকা কে আছে বলো।

ক্রমশ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৪৪

পূজার ছুটি উপলক্ষে লছমীপুর কেস বন্ধ হওয়ায় কয়েকদিন পরে ১৯১৫ সালের ৮ই অক্টোবর অমাবস্যার দিন ভাগলপুর থেকে যাত্রা করে দশ দিন পরে ১৮ই অক্টোবর অপরাহ্নে আমরা মায়াবতী পৌঁছুই।

আমরা দলে ছিলাম আটজন,—চিত্তরঞ্জন, তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী, দুই কন্যা অপর্ণা ও কল্যাণী ওরফে যথাক্রমে মোনা ও বেবি, পুত্র চিররঞ্জন ওরফে ভোম্বল, বাসন্তী দেবীর সম্পর্কিত ভাই সতীনাথ ওরফে টগর, চিত্তরঞ্জনের দূরসম্পর্কিত আত্মীয় এবং ল' ক্লার্ক ললিতমোহন সেন এবং আমি। তা ছাড়া, একজন আয়া এবং চাকর-বাকর বাবুর্চি খানসামা সমেত আরও ছিল পাঁচ-ছয়জন।

যে বাঙলোয় আমরা বাস করতাম, তাতে পাশাপাশি তিনটি শয়নকক্ষ। পশ্চিম প্রান্তের ঘরে চিত্তরঞ্জন এবং বাসন্তী দেবী থাকতেন। মাঝের ঘরে চার কোণে চারটি খাটে আমরা চারজন,—অর্থাৎ ললিতবাবু, টগর, ভোম্বল ও আমি শয়ন করতাম। পূর্ব প্রান্তের তৃতীয় কক্ষে থাকতেন আয়াসহ অপর্ণা এবং কল্যাণী।

মায়াবতী পৌঁছবার দু-তিন দিনের মধ্যেই আমাদের প্রাত্যহিক কার্যক্রম আপনা-আপনি একরকম অনড় অপরিবর্তনীয়ভাবে বেঁধে গেল। অদ্বৈত আশ্রম ও চিরতুষারমালা ভিন্ন মায়াবতীতে চিত্তবিক্ষেপের পক্ষে আর বিশেষ কোনও উপচার না থাকায়, ওরূপ ভাবে কার্যক্রম না বেঁধে উপায় ছিল না।

মায়াবতী নগর ত' নয়ই, বস্তুত গ্রামও ঠিক নয়। জনসাধারণ বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তার অস্তিত্ব এখানে অবর্তমান। এখানে 'জন' অর্থেই আশ্রম-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। আশ্রম-নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তির এখানে জমি কিনে গৃহনির্মাণ ক'রে বসবাস করবার উপায় নেই। বাড়ি ভাড়া নিয়ে সাময়িক ভাবে বাস করবার কথাই ওঠে না, যেহেতু ভাড়াটে বাড়ির, শুধু অস্তিত্বই নয়, কল্পনাও এখানে নেই। এখানে আশ্রম-নিরপেক্ষ কেউ যদি থাকে ত সে একমাত্র অতিথি;—কিন্তু তাও স্বয়মাগত নয়, আশ্রম কর্তৃক আমন্ত্রিত। সুতরাং সে হিসাবে অতিথিও এখানে সম্পূর্ণ আশ্রম-নিরপেক্ষ ব্যক্তি নয়।

এখানে হাট নেই, বাজার নেই; দোকান নেই, পশার নেই; হোটেল নেই, রেস্তোরাঁ নেই; এমন কি একটা ব্যাঙ্ক পর্যন্ত নেই যে, একদিন টাকা তুলতে গিয়ে একটানা কার্যক্রমের মধ্যে একটু বৈচিত্র্যসাধন করা যায়। থিয়েটার-সিনেমার ত স্বপ্ন পর্যন্ত এখানে নেই। থাকবার মধ্যে শুধু আছে আশ্রম আর তুষার-পর্বত;—অর্থাৎ থোড় আর খাড়া। কিন্তু এমনই সরস ও মধুর, আর এতই বৈচিত্র্যরসে টস্‌টসে থোড় আর খাড়া যে, কোনদিনই আমাদের মুহূর্তের জন্য একঘেয়েমির ক্লান্তিবোধ করতে হয় নি,—কোনরকম একটা বড়ির অভাবের দরুণই নয়।

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে তাড়াতাড়ি গরম জামাজোড়া চড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতাম। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করে মনে হোত, কে যেন তুষার-পর্বতের গায়ে ফিকে এক পোঁছ নীল রঙ মাখিয়ে রেখেছে। দেখে চক্ষু জুড়িয়ে যেত। তারপর মিনিট কুড়ি-পঁচিশ ধরে এই নীলাভ রঙ ক্রমশ বেগুনে, রক্তাভ এবং ঘন রক্ত বর্ণের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে পরিণত হত। তুষারের উপর বর্ণবিবর্তনের এই অপরূপ লীলা প্রতিদিন নূতন দৃষ্টি দিয়ে নূতন আনন্দের সহিত উপভোগ করতাম।

পাহাড়ে জায়গায় শীতের দিনে প্রত্যূষের এই সময়টা শয্যার মধ্যে আর একবার পাশ ফিরে লেপ জড়িয়ে শেষ পালার ঘুম দেওয়া একটা উপভোগের ব্যাপার সন্দেহ নেই। প্রতিদিন রাত্রে শয্যা গ্রহণ করে দেহে লেপ টেনে নিয়ে মনে মনে সংকল্প করি, প্রত্যূষের তুষার দেখা যথেষ্টই ত হল, কাল সকালে ঘরের আর তিনজনের শয্যাত্যাগ করার আগে লেপ ত্যাগ করা কিছুতেই নয়। শীতের দেশে এসে প্রত্যূষের তুষার দেখার আগ্রহে প্রত্যূষের লেপ থেকে নিজেকে যদি একেবারে বঞ্চিত করি, তাহলে মায়াবতী ভ্রমণে খুঁৎ থেকে যায়। সংকল্প করি, কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙলেই কে যেন গায়ে ঠেলা মেরে বলে, চল, চল! ছবি দেখবে চল। আজ হয়ত নূতন পোঁছের নূতন আভা। পায়ের দিকে লেপ ঠেলে দিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসি।

ছবি দেখার পালা সাঙ্গ হলে হাত-মুখ ধোয়ার ক্ষণকাল পরে আরম্ভ হত চা-পান এবং প্রাতরাশের পর্ব। সকলে মিলে কথোপকথন করতে করতে সে পর্ব শেষ করতে প্রায় ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হ'ত। তারপর চিত্তরঞ্জন ও আমি প্রাতর্ভ্রমণে নির্গত হতাম। এপথ ওপথ, এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে, কোনদিন বা আশ্রমে অল্প-স্বল্প ঢুঁ মেরে শেষ পর্যন্ত আমরা নিভৃত নির্জন মাদার্স ওয়াকে উপনীত হতাম। সেখানে ক্ষণকাল গল্পে ও পদচারণায় অতিবাহিত করে বেলা দশটা আন্দাজ আমরা প্রত্যাবর্তন করতাম।

গৃহে ফিরে দেখতাম কেউ বই পড়ছে, কেউ গল্প করছে, বাসন্তী দেবী হয়ত মধ্যাহ্নভোজনের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত, অপর্ণা হয়ত হারমোনিয়ম খুলে আমার দেওয়া সুরে চিত্তরঞ্জনের রচিত গান অভ্যাস করছেন। আমরা দুজন ফিরে আসার পর আবার একটা প্রাক্‌-মধ্যাহ্নভোজন আড্ডা জমতে আরম্ভ করত। গল্পে, আলোচনায়, হাস্যকৌতুকে, একটু-আধটু গান-বাজনায় বা দেখ্‌তে দেখ্‌তে আড্ডা চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠ্‌ত।

আড্ডা যখন চরমে উঠেছে, হঠাৎ এক সময়ে বাসন্তী দেবী দিতেন স্নানাহারের তাড়া। ধীরে ধীরে আড্ডা ভাঙতে আরম্ভ করত। তারপর চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পে[illegible] চতুরঙ্গ আহার কার্য সমাপনান্তে গুরু[illegible] ভোজনজনিত অলস দেহ ও মন নি[illegible] ক্ষণকাল আলগা কথোপকথনের পর মধ্যাহ্ন কালীন বিশ্রামের লালসায় যে যার আপ[illegible] আপন আস্তানায় গিয়ে আশ্রয় নিত। এ[illegible] সময়টায় কেউ বই পড়ত, কেউ লিখত, কে[illegible]

বা সকল কাজের সেরা কাজ লেপ গায়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আয়েসে দিবানিদ্রায় মগ্ন হ'ত।

বেলা তিনটে বাজতে না বাজতে পুনরায় মিলিত হবার আগ্রহে আমরা উন্মুখ হয়ে উঠতাম। একে একে সকলে এসে জুটতাম চায়ের বৈঠকে। তখনো চায়ের হয়ত কিছু দেরী আছে;—আরম্ভ হয়ে যেত লঘু চটুল আড্ডা। যথাসময়ে চা এবং বিবিধ খাদ্য-বস্তু এসে পড়ত। গুরুভার চা-পানের পর দল বেঁধে অথবা একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তাম বৈকালিক ভ্রমণে।

সন্ধ্যাকালে ফিরে এসে আরম্ভ হ'ত আমাদের সারাদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈঠক,—গানের মজলিশ। এ বৈঠকের প্রধান উপকরণ গান হলেও, গানের ভিতরে ভিতরে হাস্য-পরিহাস, তর্ক-বিতর্ক, গল্প ও কথোপকথনের দ্বারা সম্প্রসারিত হয়ে বৈঠক হয়ে উঠ্‌ত বিচিত্র। মাঝে মাঝে এক-আধ-দিন আশ্রমের মহারাজরা এসে কালীকীর্তন করতেন। তার পাল্টা আমরা দিতাম বৈষ্ণব-পদাবলীর গান গেয়ে।

ন'টা পৌনে ন'টার সময় ডাক পড়ত নৈশ আহারের। সান্ধ্য-বৈঠক ভেঙ্গে দিয়ে আমরা উপস্থিত হতাম খাবার টেবিলে,—কিন্তু সঙ্গে নিয়ে আসতাম আমাদের শেষ আলোচনার সূত্রটুকু। তাই দিয়ে জাল-বোনা আরম্ভ হ'ত আহার-টেবিলের কথোপকথনের।

আহারের পর বস্‌ত যৎপরোনাস্তি আনন্দময় ও উত্তেজনাপূর্ণ তাসের বৈঠক। এই বৈঠকের স্থান ছিল মাঝের ঘরে আমার খাটের উপরে এবং কাল ছিল রাত্রি সাড়ে নটা থেকে আরম্ভ করে যতক্ষণ না চার জোড়া চক্ষু বুজে আসে ততক্ষণ। তাসের বৈঠকের পর ঘরে ঘরে আরম্ভ হোত পরিতৃপ্ত দিনাতিপাতের নিশ্চিন্ত নাসিকা-গুঞ্জনের ঐকতান।

মনোজ্ঞ আড্ডার দ্বারা মাঝে মাঝে খচিত এই ছিল আমাদের দৈনিক কার্যক্রমের অপরিবর্তনীয় চক্র। যে কাহিনী বলতে উদ্যত হয়েছি, সে কাহিনী তাসের বৈঠকের ঘটনা।

চিত্তরঞ্জন তাস খেলতে যেমন ভালবাসতেন, খেলতে পারতেনও তেমনি অদ্ভুত। ব্রীজ, পোকার কিম্বা অপর কোনও ইয়োরোপীয় খেলা তিনি খেলতেন না;—একমাত্র খেলতেন বত্রিশখানা তাসের গ্রাবু খেলা। আর, খেলবার সময়ে সেই বত্রিশখানা তাসের এমন বিস্ময়জনক সন্ধান রাখতেন যে, তাঁর গোলামের হাতে নিজের চোদ্দ ধরা দিয়ে বাসন্তী দেবী যে কুপিত হয়ে বলতেন, 'তুমি চুরি করে আমার হাত দেখো,' ওরূপ ঘটনার পৌনঃপুনিকতা দেখে সে কথা একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হোত না।

প্রতিদিন আমরা ঠিক একইভাবে দল বেঁধে খেলতে বসতাম। বাসন্তী দেবী আর আমি বসতাম এক দিকে, অপর দিকে বসতেন চিত্তরঞ্জন এবং ললিতবাবু। বাসন্তী দেবী ছিলেন হালদার বংশের কন্যা; সুতরাং দৈবক্রমে প্রতিযোগিতাটা দাঁড়িয়েছিল ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যের মধ্যে। চিত্তরঞ্জন তাই খেলার নাম দিয়েছিলেন বামুন-বদ্যির,—অর্থাৎ বামুন বনাম বদ্যির খেলা।

এই তাসখেলার বৈঠকের প্রতি চিত্তরঞ্জন সমস্তদিন সাগ্রহ প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকতেন; বাসন্তী দেবীর এবং আমার আগ্রহও এর প্রতি কম ছিল না; কিন্তু চতুর্থ খেলোয়াড় ললিতবাবুর পক্ষে, আগ্রহ ত' বহুদূরের কথা, এ তাস খেলা হয়েছিল একটা দণ্ড। চিত্তরঞ্জন নিজে একেবারে নির্ভুল খেলতেন; তাই তাঁর খেঁড়ির, অর্থাৎ সহ-খেলুড়ির খেলার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। ললিতবাবু ভুল করলেই বিরক্ত হয়ে উঠে তিনি ললিতবাবুকে তিরস্কার করতেন, আর চিত্তরঞ্জনের দ্বারা তিরস্কৃত হলেই ললিত-বাবুর ভুল করবার শক্তি উৎসাহ লাভ করত। ফলে, সমস্ত খেলা জুড়ে ভুল করা আর তিরস্কৃত হওয়া এবং তিরস্কৃত হওয়া আর ভুল করার একটা পাপচক্র চল্‌ত। ললিত-বাবুর মুখ দেখে মনে হ'ত না তিনি তাস খেলছেন, মনে হ'ত যেন কুইনিন গিলছেন। খেলা ভেঙ্গে গেলে তখন তাঁর মুখে হাসি দেখা দিত; কিন্তু সে হাসি বেদনার আবরণ ভেদ করে নিষ্ক্রান্ত দুঃখের বিষণ্ণ হাসি।

এ বিষয়ে একদিন ললিতবাবুর সঙ্গে আমার নিম্নলিখিতভাবে কৌতুকাবহ কিন্তু করুণ আলোচনা হয়।

বিরসমুখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ললিতবাবু বলেন, "দেখুন উপেনবাবু খাসা স্বাস্থ্যকর জায়গা এই মায়াবতী, থাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা যা হচ্ছে, তা চরম। বলতে নেই, এই কয়দিনেই আপনাদের সকলের দেহে একটু করে চেকনাই দেখা দিয়েছে। আমার এই কৃশ শরীর দিন দিন আরও কৃশ হয়ে যাচ্ছে কেন জানেন?"

সহানুভূতির কণ্ঠে বলি, "ক্রিমি-দোষ-টোষ নেই ত'?"

বিরক্ত হয়ে ললিতবাবু উছলে ওঠেন, "আরে, দূর মশাই, আপনার ক্রিমি-দোষ-টোষ! এর জন্যে দায়ী আপনাদের ঐ তাসখেলা!"

ব্যাপারটা বুঝতে বাকি থাকে না; তবু নিরীহভাবে বলি, "কেন, তাসখেলা দায়ী কেন?—তাসখেলা ত' আনন্দের কথা।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ললিতবাবু উত্তর দেন, "আনন্দের কথা আপনাদের, আমার কিন্তু যার নাম ঠেলা! সায়েবের কাছে বকুনি খেয়ে খেয়ে রোগা মেরে যাচ্ছি, আর বলেন কি না আনন্দের কথা! তিনটে থেকে যেমন যেমন বেলা প'ড়ে আসে আমার মনও তেমনি অন্ধকার হ'তে থাকে। রাত্রে খাবার টেবিলে অত রকম ত' খাবার; কিন্তু ফাঁসির আগের খাবারে শরীরে রক্ত বাড়ে, না, যে রক্ত থাকে তারও খানিকটা জল হয়ে যায়? বলুন!"

সত্যি! ললিতবাবুর কথা শুনে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। যে ইক্ষু দণ্ড তিনজনকে রস জোগায়, সেই ইক্ষু-দণ্ডই চতুর্থ ব্যক্তির পিঠ ভাঙে।

অথচ ললিতবাবুর অত ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও ললিতবাবুদের কাছে আমাদের হারার সীমা-পরিসীমা থাকে না। আর সে কি সাধারণ হার? যাকে বলে গো-হারান একেবারে ঠিক তাই। ছক্কা-পঞ্জা-বোম-তিরি; ধরবার কুড়িখানা ছুটো তাস শেষ হয়ে আসে। তাই কি একদিন?—নিত্য এই ব্যাপার!

ললিতবাবু রঙ খেলেছেন; বাসন্তী দেবীর হাতে রঙের চোদ্দ, অন্য রঙও আছে; হয়ত চিত্তরঞ্জনের হাতে গোলাম নেই, এই ভরসায় কপাল ঠুকে বাসন্তী দেবী চোদ্দ ছাড়েন। সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী দেবীর চোদ্দর ওপর চিত্তরঞ্জনের গোলামের সশব্দ সোল্লাস পতন। স্ত্রী বলে বিন্দুমাত্র রেয়াৎ অথবা করুণা নেই।

পরদিন বাসন্তী দেবী স্থান পরিবর্তন করে চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণ দিকে বসেন। রঙের খেলা পড়েছে, চিত্তরঞ্জনের খেলবার পালা,—ধীরে ধীরে গোলামটি আমার খেলা তাসের উপর স্থাপন ক'রে সপুলক মুখে চিত্তরঞ্জন বাসন্তী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। বাসন্তী দেবীর হাতে একমাত্র রঙ চোদ্দ,—না দিয়ে উপায় নেই। সরোষে চোদ্দখানা ফেলে দিয়ে তর্জন করে ওঠেন

"তুমি দেখে দেখে তাস দাও, দেখে দেখে খেলো।"

সহাস্যমুখে চিত্তরঞ্জন বলেন, "তা ছাড়া কি আর বলবে বল! এ তো আর নৈবিদ্যির চাল-কলা নয় যে, গামছা খুলে বাঁধলেই হ'ল। এ বত্রিশখানা তাসের রীতিমতো হিসেব রাখার খেলা।"

নৈবেদ্যর চাল-কলা ব্রাহ্মণদের অপটুতার নির্দেশক।

বাসন্তী দেবী বলেন, "তোমার মতো জোচ্চুরি করলে আমরাও হিসেব রাখার খেলা খেলতে পারি।"

মানুষ যখন জিতের ওপর থাকে, তখন তার মেজাজ থাকে ঠান্ডা, মনের ঔদার্য থাকে প্রসারিত, কটূক্তি সহ্য করবার শক্তি থাকে অক্ষুণ্ণ। স্মিতমুখে প্রসন্নকণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বলেন, "একবার আমার মতো জোচ্চুরি ক'রে দেখ না, কত হারান হারাতে পার আমাদের।"

এইরূপ একটানা হারের খেলা এবং বাক্-বিতণ্ডা প্রতিদিনই চলে।

একদিন কিন্তু অকস্মাৎ চাকা ঘুরল। পড়তা বলে একটা জিনিস সব তাতেই দেখা যায়,—তাসে ত' বিশেষভাবে। সেই পড়তা দেখা দিলে আমাদের দিকে; বিজয়লক্ষ্মী সেদিনকার খেলার প্রারম্ভ থেকেই প্রসন্ন হলেন আমাদের প্রতি। ছক্কার পর ছক্কা, পঞ্জার পর পঞ্জা। যাকে বলেছিলাম গোহারান, একেবারে ঠিক তাই। জিতের পর জিতে আমাদের উৎসাহ যত বেড়ে চলে, হারের পর হারে অপর পক্ষের মনের বল তত কমতে থাকে।

স্রোতের গতি ফেরাবার জন্য চিত্তরঞ্জন ভাল ক'রে হিসাবপত্র রেখে মনস্থির করে খেলতে সচেষ্ট হন; কিন্তু গোলাম চোদ্দ টেক্কা যদি আমাদের হাতে আসে, তাহলে হিসাবপত্রের যে কোন পরিমাণ, বন্যার মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায়, ভেসে চলে যেতে বাধ্য হয়। পরাজয়ের মেঘসঞ্চয় দেখে ঝটিকার আশঙ্কায় ললিতবাবুর মুখ শুকিয়ে ওঠে।

ওদিকে চিত্তরঞ্জন মনে মনে বারুদ হ'য়ে উঠেছেন। তাঁর রুষ্ট বিরস মুখের উপর বারুদের ছাপ এসে পড়েছে। মকর্দমাতেই হোক, অথবা তাস খেলাতেই হোক, কোন প্রকারেরই পরাজয় বরদাস্ত করবার অভ্যাস তাঁর নেই। অবস্থা তখন এমন হয়ে এসেছে যে, একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গপাতের অপেক্ষা তার পরই বিস্ফোরণ।

বেশি বিলম্ব হ'ল না,—ক্ষণকাল পরেই সহসা স্ফুলিঙ্গপাত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণও ঘটল।

এক সময়ে বাসন্তী দেবী স্মিতমুখে আমাকে বললেন, "দেখেছেন উপেনবাবু, প্রতিদিন জোচ্চুরি ক'রে জেতেন,—আজ আমরা একটু সতর্ক হয়েছি, আর হারের কাণ্ডখানা দেখুন।"

ব্যস! আর যায় কোথায় জিতের উপর যে 'জোচ্চুরি' শব্দ হাসিমুখে পরিপাক করা গিয়েছিল, হারের মুখে তা অসহ্য হয়ে উঠল। রোষায়ত লোচনে বাসন্তী দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বললেন, "কিঃ! আমি জোচ্চোর?—আমি জোচ্চোর?—আমি জোচ্চোর?—তবে এইঃ!" ব'লে দু-হাতে একগোছা তাস ধরে পড় পড় করে ছিঁড়ে শয্যার উপর ফেলে দিয়ে ঘর থেকে দুদ্দাড় ক'রে বেরিয়ে গেলেন। তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা; চিত্তরঞ্জন কিন্তু তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ না ক'রে তক্তা-বাঁধানো খোলা বারান্দার উপর খটাখট্ খটাখট্ ক'রে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন, প্রবল উত্তেজনার বশে মস্তিষ্কে যে রক্তাধিক্য উপস্থিত হয়েছিল, তুষারস্পৃষ্ট বায়ুর সংস্পর্শে বোধ হয় কতকটা প্রশমিত করবার উদ্দেশ্যে।

একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল। লাল টক্টকে মুখ নিয়ে বাসন্তী দেবী ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন; তারপর সহসা এক সময়ে আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "কি ছেলেমানুষ দেখুন, প্রতিদিন আমাদের কত কথা শোনান,—আজ আমি সামান্য একটা কথা বলেছি, আর রেগে অগ্নিশর্মা!"

সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বললাম, "এ এমন কিছুই নয়। নামে খেলা হলেও, এর চেয়ে অনেক বড় বড় কাণ্ডও খেলার মধ্যে ঘট্তে দেখা যায়।" মনে মনে বললাম, শুধু তাস ছিঁড়েই তিনি নিরস্ত হয়েছেন, রেগেমেগে আমাদের লেপ ছিঁড়েও যে দেন নি, এর জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

আর কিছু না ব'লে বাসন্তী দেবী ধীরে ধীরে স'রে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যে যার শয্যায় লম্বা দিয়ে লেপ মুড়ি দিলাম। তখনো বারান্দায় ত্বরিত পদের শব্দ শোনা যাচ্ছে, খটাখট্ খটাখট্।

তুষার দেখবার নেশায় প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করি সে কথা সত্যি, কিন্তু তাই বলে শেষ রাত্রে করিনে। চার কোণে চারজন নিশ্চিন্ত সুখে নাক ডাকাচ্ছি, এমন সময়ে রুদ্ধ দ্বারে প্রচণ্ড শব্দ—ধাঁই ধাঁই ধাঁই ধাঁই। তড়িৎ সংযুক্তের মতো চার কোণে চারজন ধড়মড় করে উঠে বসি। কি ব্যাপার!

"উপেনবাবু জেগে আছেন?"

চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠস্বর। মনে মনে কাতর-ভাবে উত্তর দিই, আজ্ঞে, ছিলাম না।' প্রকাশ্যে বলি, "আছি।"

"একবার বেরিয়ে আসুন ত!"

তাড়াতাড়ি গরম বস্ত্র প'রতে ,আরম্ভ করি। তিন কোণে তিনজন পুনরায় শুয়ে প'ড়ে লেপ মুড়ি দেয়।

দোর খুলে চিত্তরঞ্জনকে দেখে ঈষৎ চিন্তিত হয়ে বলি, "কি বলুন ত? শেষ রাত্রি যে!"

চিত্তরঞ্জন বলেন, "না, না শেষরাত্রি কোথায়? চারটে অনেকক্ষণ বেজে গেছে।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বলেন, "কাল রাত্রে ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। বাসন্তী ভয়ানক রাগ করেছে। আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কচ্ছে না। বলেছে, আর তাস খেলবে না।"

বুঝতে বাকি থাকে না, শেষোক্ত কথাটাই হয়েছে আসল চিন্তার কারণ। যে সান্ত্বনা বাসন্তী দেবীকে দিয়েছিলাম, চিত্তরঞ্জনকেও তাই দিই; বলি, "ও এমন কিছুই হয় নি। খেলতে খেলতে অমন কত হয়ে থাকে। রাগের মাথায় খেলবেন না বলছেন; নিশ্চয় খেলবেন।"

ব্যগ্রকণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বলেন, "না, না, বুঝছেন না আপনি—ভারি বেঁকে বসেছে। আপনি খেলবার জন্যে অনুরোধ করবেন, তাহলে খেলবে।"

"নিশ্চয় অনুরোধ করব।"

"চা-খাবার আগে করবেন।"

তাই করবো।

(ক্রমশ)

হি. লা. স

ভ্রাম্যমান গ্যালাটীয়ার ভ্রমণ ইতিহাস সত্যই অদ্ভুত। গ্যালাটীয়া যেন গ্‌বিজয়ে বার হয়েছে। 'প্রিন্সের' মত ালাটীয়া যেদিন 'পিন্সেপ ঘাটে' াঁছোল সেদিন জনসমুদ্র ভেসে সেছিল গ্যালাটীয়াকে দেখতে। তার ম্বর্ধনার আয়োজনও কম হয়নি। ভারত-াসীর পক্ষ থেকে ডেনিস গ্যালাটীয়াকে হরবাসীরা কামান গর্জনের সঙ্গে রাজকীয় ভ্যর্থনা জানিয়ে ছিল।

গ্যালাটীয়া সত্যই 'প্রিন্স' নয়—গ্যালাটীয়া কটি ডেনিস জাহাজ। এটি অজানাকে নবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রের বুকে পাড়ি য়েছে। ১৯৫০ সালের ১৪ই অক্টোবর কাপেনহেগেন থেকে গ্যালাটীয়ার অভিযান ারম্ভ হয়েছে। সমস্ত অভিযানের খরচ

গ্যালাটীয়া

বহন করবেন ডেনিস সরকার। এই অভিযানের জন্য প্রায় ২০ লক্ষ ক্রুনার (ক্রুনার ডেনমার্কের টাকা, দেড় ক্রুনার আমাদের দেশের ১ টাকার সমান) খরচ করা হবে। এই টাকাটা ডেনমার্ক সরকার বেশ মজা করে জোগাড় করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ডেনমার্কে প্রসাধন দ্রব্যের খুব অভাব ঘটে, তখন ডেনমার্কের বাইরে যে সমস্ত ডেনমার্কবাসীরা বাস করছিল, তারা তাদের সাধ্যমত এইসব জিনিস ডেনমার্ক সরকারের কাছে এত বেশী উপহার পাঠাতে আরম্ভ করলো যে সরকার এইসব জিনিস দেশের লোকের কাছে নাম মাত্র মূল্যে বিক্রি করে এই টাকাটা তুলে ফেললো।

গ্যালাটীয়া প্রায় দু'বছর ধরে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে এর অভিযান শেষ করবে। এই অভিযানে ডেনমার্কের পক্ষে একটা নতুন সৌভাগ্যের পরিচয় নয়। ডেনমার্ক চিরদিনই সামুদ্রিক অভিযানের জন্য বিখ্যাত। বিশেষত আজকের গ্যালাটীয়া আমাদের কাছে 'প্রথম' হলেও ডেনমার্ক-বাসীর কাছে এটি 'দ্বিতীয়' গ্যালাটীয়া। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে ১৮৪৫ সালে এদের প্রথম গ্যালাটীয়া এমনি করেই জলে ভেসে জগত দেখতে বের হয়েছিল। আজকের মতই প্রথম গ্যালাটীয়াও বের হয়েছিল অজানাকে জানবার নেশায়। অবশ্য বর্তমানের গ্যালাটীয়ার মত তার এত নতুন ধরণের যন্ত্রপাতি নেবার সুবিধা হয়নি বটে, তবে সে জগতকে অনেক কিছু নতুন খবর দিতে পেরেছিল—বিশেষত সমুদ্রের গভীর তলদেশের।

সমুদ্রের তলদেশ যে কত গভীর হতে পারে সে ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই। প্রায় ৩২,৪০০ ফিট পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা আজ পর্যন্ত মানুষ জানতে পেরেছে। কিন্তু এই গভীর সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি। আজ পর্যন্ত মানুষ মাত্র ১৫,০০০ ফিট সমুদ্রের তলার খবর জানতে পেরেছে। গ্যালাটীয়ার নানারকম গবেষণার মধ্যে সমুদ্রের গভীরতম তলদেশের খবর জানাই প্রধান।

অবশ্য ১০০ বছরের ভেতর আরো কয়েকটি ছোটখাট সামুদ্রিক অভিযানের কথা আমরা শুনেছি, তবে সেগুলি খুব সুপরিকল্পিত নয়—নিতান্তই খাপছাড়া।

এই অভিযানের দলটি গড়ে উঠেছে

দলপতি ডাঃ ব্রুন

নাবিক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার, চলচিত্র গ্রহণকারীদের নিয়ে। সবশুদ্ধ ১০০ জন লোক এই দলটিতে আছেন। এদের সবাই ডেনমার্ক দেশীয় নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের লোক এই দলটিতে স্থান পেয়েছে। দলের দলপতি হচ্ছেন ডাঃ ব্রুন। ডাঃ ব্রুনের বয়স হচ্ছে ৪৮, তিনি কোপেন-হেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী বিভাগের মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ। এছাড়া ডেনমার্কের যুবরাজ এক্সেল গ্যালাটীয়ার একজন সাধারণ নাবিক হিসাবে যোগ দিয়েছেন। জাহাজের নাবিক এবং অন্য সব বিভাগের লোকেরা খুবই অল্প বয়েসের। ডেনমার্কে একটা নিয়ম আছে যে প্রত্যেক লোককেই তার দেশের জন্য ৯ মাস যে কোন কাজ করতে হবে। নাবিক এবং বৈজ্ঞানিকদের অনেককেই এই ধরণের ৯ মাসের চুক্তিতে আসতে হয়েছে, তার মধ্যে আবার অনেকেই যতদিন না অভিযান শেষ হবে ততদিন কাজ করবার চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

এই বৈজ্ঞানিক অভিযানের কাহিনী যাতে প্রত্যেক জায়গায় লোকেরা কিছু কিছু জানতে পারে তার জন্য গ্যালাটীয়া কোন একটা বন্দরে আসার পর সেই দেশের একজন বৈজ্ঞানিক এই জাহাজে যোগ দেন। আবার অন্য কোন দেশের বন্দরে জাহাজটি পৌছন মাত্র আগেকার বৈজ্ঞানিকটি সেখানে নেমে যান এবং স্থানীয় কোন বৈজ্ঞানিক তার স্থান অধিকার করেন। এই উদ্দেশ্যে ভারত-বর্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণাগারের একজন বৈজ্ঞানিক কলম্বো থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত এদের সঙ্গে থাকবেন। এর পর গ্যালাটীয়া ফিলিপাইন

গ্যালাটীয়ার ভ্রমণপঞ্জীর ম্যাপ

দ্বীপপুঞ্জের কাছে যখন ৩২০০০ ফিট সমুদ্রের তলার তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবে সেই সময় আমেরিকার বিখ্যাত জীবাণুতত্ত্ববিদ অধ্যাপক জোবেল এদের সঙ্গে যোগ দেবেন। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে সমুদ্রের এত তলায় কোনরকম সামুদ্রিক জীবজন্তু বাস করতে পারে না তবে জীবাণু বাস করতে পারে। অধ্যাপক জোবেল এই নিয়েই গবেষণা করবেন।

গ্যালাটীয়ার ভ্রমণপঞ্জী পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের তথ্য সংগ্রহ করবার উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে। এর জন্য যাওয়ার পথে বিভিন্ন শহরে কয়েকদিন করে থামবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই সময় এরা স্থানীয় বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের অভিযানের কথা প্রচার করে তাদের মূল উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করবে।

গ্যালাটীয়ার কোপেনহেগেন থেকে বের হয়ে ইংলিশ চ্যানেলের ভেতর দিয়ে বে অফ বিস্কে, ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ হয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ কূল ধরে উত্তমাশা (কেপ অফ গুড হোপ) ঘুরে ম্যাডাগাস্কার এবং মরিসাস ঘুরে আফ্রিকার উত্তরকূলে মোম্বাসায় যাবে। এখান থেকে সেচিল্লেস দ্বীপ হয়ে কলম্বো। কলম্বো থেকে বের হয়ে ভারতবর্ষের পূর্ব-কূলে ডেনিস উপনিবেশ ট্রাঙ্কুবার হয়ে কলিকাতা। তারপর নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ সিঙ্গাপুর এবং ব্যাংককে যাবে। ব্যাংকক থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হয়ে জাপান। জাপান থেকে ইন্দোনেশিয়া, নিউ-গিনি, সোলেমান দ্বীপ হয়ে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া ঘুরে টাস্‌মেনিয়া হয়ে নিউজি-ল্যাণ্ডে যাবে। এখান থেকে ক্যাম্বল দ্বীপ হয়ে ফিজি, টোঙ্গা, সামোয়া, তাহিটি, পিট-কেরিন ইস্টার দ্বীপ হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার ভ্যালপারাইসো, ক্যাল্লোয়ো, গুইয়াকুইল হয়ে গ্যালাপেগোস, আর্কিপেলাগো। এখান থেকে পানামা খাল হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে এজোরেস হয়ে কোপেনহেগেন।

সমুদ্রের তলার খবর নেওয়া ছাড়াও গ্যালাটীয়ার অভিযানের অন্য অনেক উদ্দেশ্য আছে—সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্বন্ধে গবেষণা, সমুদ্রের কত তলায় প্রাণী থাকতে পারে; যদি থাকতেই পারে, তাহলে এদের চেহারা জীবনধারণ প্রণালী ইত্যাদি কেমন। গ্যালাটীয়াতে গবেষণার জন্য আধুনিক যন্ত্র-পাতি লাগান একটা সুন্দর গবেষণাগার
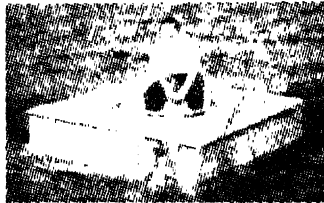
চলচ্চিত্র গ্রহণকারী জলের মধ্যে ভাসান চৌকো বাক্সের ওপর বসে আছেন
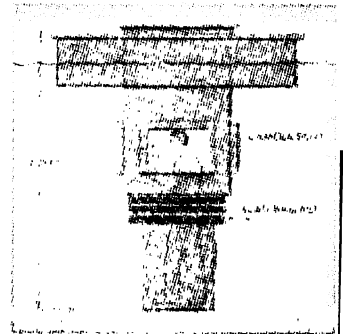
চলচ্চিত্র গ্রহণকারী চৌকো বাক্সের ভেতর নেমে গিয়ে জলের ভিতরের প্রাণীদের ছবি তুলছেন

আছে। এখানে নতুন নতুন যে সব সামুদ্রি জীবজন্তু পাওয়া যাচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ গবেষণা করছেন। উদ্ভিদতত্ত্ব বিদ্ সামুদ্রিক গাছগাছড়া নিয়ে ব্যস্ত রসায়নবিদ্ জলের গুণাগুণ বিচার করছেন ফোটগ্রাফার ছবি তুলে চলেছেন। চলচ্চি গ্রহণকারী সমুদ্রে ভাসানো চৌক বাক্সর মধ্যে নেমে গিয়ে জীবন্ত প্রাণীদের চলচ্চি তুলছেন। সাংবাদিক তার সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত। এখানে বলে রাখা ভাল গ্যালাটীয়া সাংবাদিকের নাম হেকন মিল্‌চে। সাংবাদি হিসাবে ইনি সুপরিচিত। এর আগে অনে অভিযানের দলের সঙ্গী হয়েছেন।

এছাড়াও গ্যালাটীয়া গভীর সমুদ্রের তলায় পৃথিবীর চুম্বকীয় শক্তি নিয়ে গবেষণা করবে। এর জন্য একটি বিশেষ ধরণের যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল কি করে এই চুম্বকীয় শক্তি মাপবার যন্ত্রটিকে সমুদ্রের তলায় নামান যায়। ঠিক্ করা হোল যে একটা বড় ধাতুর তৈরি বলের ভেতরে এই যন্ত্রটি রেখে তারের সাহায্যে সমুদ্রের তলায় নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল যে ৩২০০০ ফিট সমুদ্রের তলায় প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চির ওপর প্রায় ১৪,৭০০ পাউন্ড জলের চাপ পড়ছে। এত বেশী চাপ সহ্য করার মত শক্তি যে কোন ভাল জাতের

জাহাজ থেকে বলটি জলে নামান হচ্ছে

লোহারও নেই। অথচ এমন একটা ধাতুর প্রয়োজন যেটা এই ধরণের চাপ সহ্য করতে পারে। পৃথিবীর কোন অভিজ্ঞ ধাতুবিদ্ এ ধরণের কোন ধাতুর কথা বলতে পারলেন না। চেষ্টা চলতে লাগল এমন একটা ধাতু কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা যায় কিনা যেটা এই ধরণের চাপ সহ্য করতে পারে। তখন ডেনমার্কেরই এক ইঞ্জিনিয়ার এই ধরণের একটা ধাতু তৈরি করলেন এবং তার নাম দিলেন 'গ্যালাটীয়া ব্রঞ্জ'। এই ধাতুর সাহায্যে একটা ৩৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ফাঁপা বল তৈরি করা হোল। বলটার ওজন হোল প্রায় ২৭ মণ এবং পুরু হোল প্রায় ৪ ইঞ্চি।

বলের ভেতর চুম্বকীয় শক্তির যন্ত্রটি পরীক্ষা করা হচ্ছে

এই বলটা দুভাগে খোলা যায়। এখন এই বলটার ভেতর চুম্বকীয় শক্তি মাপবার যন্ত্রটি রেখে বলটিকে বন্ধ করে সমুদ্রের তলায় নামান হয়।

পৃথিবীর চুম্বকীয় শক্তি নিয়ে ভাল রকম কোন গবেষণা এ পর্যন্ত হয় নি বলেই আজ এই বিপুল আয়োজন। এখনও এটা সঠিকভাবে জানা যায় নি যে, পৃথিবীর এই চুম্বকীয় শক্তি পৃথিবীর মাঝখানে বাড়ে কি কমে? নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ব্ল্যাকেটের মত হচ্ছে যে পৃথিবীর মাঝখানে চুম্বকীয় শক্তি কমে যায়। এক ৬০০০ ফিট

উইঞ্চে তার জড়ান হচ্ছে

গভীর ধাতুর খনির মধ্যে যন্ত্র নামিয়ে তিনি এটা পরীক্ষা করে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অনেক অসুবিধা থাকার জন্য কার্যকরী হয় নি। কিন্তু সমুদ্রের গভীরতম তলদেশে যন্ত্র নামিয়ে পরীক্ষা করতে পারলে, তবে এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে বলা সম্ভব।

সমুদ্রের তলায় এই চুম্বকীয় শক্তি মাপবার যন্ত্র বলের ভেতর রেখে নামাবার জন্য গ্যালাটীয়াতে ভাল দুটি 'উইঞ্চ' লাগান আছে। প্রত্যেকটি উইঞ্চের ওজন প্রায় ২৭০ মণ করে। সব সুদ্ধ প্রায় ৩৬,০০০ ফুট ভাল ইস্পাতের তার এই উইঞ্চের গায়ে

সাংবাদিক হেকন মিলচে

জড়ান আছে। এই তার উইঞ্চের সাহায্যে জড়ান যায় এবং খোলা যায়। সমুদ্রের তলা থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রাণী উদ্ভিদ সংগ্রহ করবার জন্য 'ট্রল' জাতীয় জাল, ছোট ধরণের জাল, 'প্ল্যাংকটন' সংগ্রহের জাল, বঁড়শী, জলের তলা থেকে মাটি তোলবার যন্ত্র ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

গ্যালাটীয়ার এই অভিযান কতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে বলা যায় না—শোনা যাচ্ছে যে তাদের সঞ্চিত টাকা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্য সাংবাদিক হেকন মিলচে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরে গিয়ে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাজদরবারে হাজির হয়েছেন।

আমরাও গ্যালাটীয়ার সাফল্য কামনা করি

একচক্ষু

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কী দেখলে তুমি? রৌদ্রকঠিন
হাওয়ার অট্টহাসি
দু-হাতে ছড়িয়ে দিয়ে নিষ্ঠুর
গ্রীষ্মের প্রেত-সেনা
মাঠে মাঠে বুঝি ফিরছে?—ফিরুক;
তবু তার পাশাপাশি
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী তুমি
একবারো দেখলেনা?

একবারো তুমি দেখলেনা তার
বিশীর্ণ ঝরা ডালে
ছড়িয়ে গিয়েছে নম্র আগুন,
মৃত্যুর সব দেনা
তুচ্ছ সেখানে। নবযৌবনা
কৃষ্ণচূড়ার গালে
ক্ষমার শান্ত লজ্জা কি তুমি
একবারো দেখলেনা?

বন্দী পাখীর অভিজ্ঞান

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এই তো সেদিন আম্রকুঞ্জে আমার জন্ম, আর
আজকে মৃত্যু শিয়রে। তবুও ভিড় ক'রে ছেলেমেয়ে
খাঁচার দুধারে। প্রতীক্ষা করি নিবিড় অন্ধকার :
শেষবার তাই ম্লান-সায়াহ্নে যাবো শেষ গান গেয়ে।

তোমাদের চোখে পালকের মোহ হাজারো রাত্রিদিন
এ'কে গেছে নীল-স্বপ্ন। তাইতো অনেক-যত্ন ক'রে
শিল্পীর তুলি আমায় করেছে গোপনে অন্তরীণ।
জানো না তো ঝরে আরো কত রং হৃদয়ের প্রান্তরে।

জানো না তো কেউ প্রথম যেদিন চেতনার ভোর হলো
ডাল-থেকে-ডালে মেলেছি আমার চকিতচপল ডানা
কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম ফুলে যেতেও ছিল না মানা......
মিনতির লাল-লজ্জায় ডাল কেঁপে কেঁপে টলোমলো।

সমস্ত দিন-পরিক্রমার মাঠ-নদী চঞ্চল—
কাজল-গাঁয়ের দীঘিরা সজল ঢেউয়ে হতো উদ্দাম
তাদের আয়না সহস্রবার লিখেছে আমার নাম;
আর তারপর স্তব্ধ এখন নিতল নিথর জল।

রৌদ্রতপ্ত তমাল-মহুয়া-শালের গভীর বন
আমার গানের সুর মেখে নিয়ে দিশাহারা কতোবার
হয়ে গেছে তার হিসেব রাখিনি। ভ্রমরের গুঞ্জন
শেষ হ'লে ভীরু করবীর মনে ঢেলেছি স্নেহ আমার।

তারুণ্যে আজো শরীর আমার লাবণ্য থরো থরো
তোমাদের লোভলিপ্সু নয়ন কৌতুকে-বিদ্রূপে
নিশ্চিত-ভাঁটা এনে দেবে জানি স্বপ্নস্বরূপরূপে—
তার চেয়ে শোনো এবার আমায় শায়কে বিদ্ধ করো॥

সাহিত্য প্রসঙ্গ
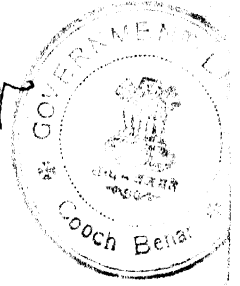
শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

বাঙলা লিরিক সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে গোড়াতেই তুলতে হয় চর্য্যাপদ বা চর্য্যা গীতিগুলোর কথা। তবে সেই সঙ্গে এও বলতে হয় যে, চর্য্যাপদের বাঙলা আর বাঙলা নেই। অর্থাৎ এগুলোকে আধুনিক বাঙলায় না বুঝিয়ে দিলে, তাদের বিন্দু-বিসর্গ কিছু বোঝবার যো নেই। আবার অনুবাদ করে দিলেও যে সহজে বুঝতে পারা যাবে, তাও নয়। কারণ, এই পদগুলি এক-রকম সাঙ্কেতিক ভাষায় রচিত। তার নাম হচ্ছে সন্ধ্যা ভাষা। এ একরকম ধূপছায়া রঙের আবছায়া গোছের আলোয় আঁধারে মেশান এক ভাষা। অর্থাৎ যেটা বাহ্যিকে প্রকাশ পাচ্ছে, সেটাই এর আসল মানে নয়; হেঁয়ালীর মতন এর এক গুপ্ত অর্থ আছে। সেটা হচ্ছে সাধন-তত্ত্বের কথা। যাঁরা ও পথের পথিক নন, তাঁদের কাছে এর কিছুটা ধরাছোঁয়া দেয়, কিছুটার আবার একেবারেই নাগাল পাওয়া দায়।

চর্য্যাপদের সাধনতত্ত্বের নাম হচ্ছে বজ্র-যান বা সহজযান। এটা বাঙালী বৌদ্ধ আচার্যদের মত। তবে এর নেপালী, তিব্বতী, চীন সংস্করণও হয়েছিল। এই সব আচার্য-দের নাম ছিল সিদ্ধাচার্য। সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে বোধ হয় তাঁদের এই নাম। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা লুই-পাদ; রাঢ়দেশের লোক বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এঁরই নাম অনুসারে এই সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যরা নিজেদের নামের সঙ্গে 'পাদ' কথাটি যোগ করে দিতেন। যেমন, কিলপাদ, কাহ্নুপাদ, শান্তিপাদ, ভুসুকুপাদ, ডোম্বীপাদ ইত্যাদি। এঁরা সকলেই চর্য্যা গান বেঁধে গেছেন। এঁরা নিজেরা এক এক জন মহা মহা জ্ঞানী পণ্ডিত হলেও, প্রচলিত শাস্ত্রে এঁদের বিশ্বাস ছিল কম, আর শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডে আস্থা ছিল তদোধিক অল্প। এঁদের মুখে মুখে ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকাণ্ডের নিন্দা। তাঁদের আচার অনুষ্ঠানকে বলতেন, লোক ঠকানর এক চমৎকার কৌশল।

এঁদের ধর্মমত ব্যাখ্যা করে বোঝান আমার কর্ম নয়। তত্ত্বকথা বলতে গেলে গভীর জলে নাবতে হয়, তখন আর কুল-কিনারা পাওয়া দায় হবে। তাছাড়া এ প্রবন্ধে আমি কোনো ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করতে বসিনি। কাব্য নিয়েই আমার কথা। তবে এই সম্প্র-দায়ের দোঁহার পুঁথি থেকে একটু আধটু তুলে দিচ্ছি, তার থেকে সহজধর্মের কিছুটা হয়ত বোঝবার সুবিধা হতে পারে।

কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ নিবেজ্জেঁ।
কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সেবেঁব॥
কিন্তহ তিথ্থ তপোবন জাই।
মোক্খ কিং লব্ভই পাণি হ্নাই
এসো জপ হোমে মণ্ডল কম্মে।
অনুদিন আচ্ছসি বাহিউ ধম্মে॥
তো বিণ তরুণি নিরন্তর ণেহে।
বোধি কি লব্ভই প্রণ বিণ দেহে॥

আন্দাজে আন্দাজে এর যা মানে বোঝা গেল, সেটা হচ্ছে এই—

দীপ জ্বালিয়েই তোর কি হবে? আর নৈবেদ্য সাজিয়েই বা কি হবে? মন্ত্রজপ করে আর তীর্থ তপোবনে গিয়েই বা তোর কি লাভ? স্নান করলেই কি মুক্তিলাভ ঘটে? ওরে তরুণি, তুই এইসব জপ হোম আর মঙ্গল কর্ম নিয়ে বাহ্যিক ধর্মেই সারাদিন লিপ্ত হয়ে আছিস। জানিসনে কি প্রেম ছাড়া মুক্তি নেই? এই দেহ প্রেম বিনা প্রাণহীন। তখন সে আর কি জ্ঞান লাভ করবে?

এই পদটির ভিতর তত্ত্বকথা যাই থাক না কেন, এটা যে একটা আসল কবিতা, সে বিষয়ে আমি অন্তত একেবারে নিঃসন্দেহ।

সব দেশেই দেখা যায় যে, তত্ত্বকথার কবিতা বা ধর্মসঙ্গীত কিম্বা জাতীয়তা-মূলক কবিতা বা স্বদেশী সঙ্গীত প্রায়ই লিরিক হয়ে ওঠে নি। তার কারণ এগুলোর সর্বদা একএকটি প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। কিন্তু কোনো তত্ত্বকথা শোনানো, লিরিকের কাজ নয়। প্রাণের আবেগে মনের থেকে যে কথাটি সহজ সুরে বেরিয়ে আসে, তারই নাম লিরিক। তার কাজ হচ্ছে নিছক আনন্দ প্রকাশ করা, আর সেই আনন্দে অপরকে ভাগ দেওয়া।

প্রবোধচন্দ্রোদয় বলে সংস্কৃতে লেখা এক বিখ্যাত আধ্যাত্মিক নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে একজন প্রাচীন আচার্য বলে-ছিলেন, অদ্বৈততত্ত্ব দিয়ে নাটক লেখা চলে না। গল্প আছে, ইংরেজ কবি মিলটন তাঁর লেখা প্যারাডাইস লস্টের একখণ্ড তাঁর বন্ধু বাটলারকে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাটলার সাহেব কেম্ব্রিজে গণিতের এক মস্ত বড় অধ্যাপক। অঙ্কে তাঁর পাকা মাথা। তিনি বইখানি পড়ে মিলটনকে লিখে পাঠালেন, তোমার লেখাটা ভালই মনে হচ্ছে ত বটে, কিন্তু এটা কি প্রমাণ করতে চাচ্ছে? বাটলার সাহেব বোধ হয় জান্‌তেন না যে, কাব্য যদি কিছু প্রমাণ করতে বসে যায়, তাহলে সেটা আর তখন কবিতা থাকে না।

প্রায় হাজার বছরের আগেকারে লেখা চর্যাপদগুলির ভাষা যে বাঙলা ভাষা, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের আর কোনো সন্দেহ নেই। কিছুদিন পূর্বেও এই ভাষাকে কেউ প্রাচীন মাগধী, কেউ মৈথিলী, কেউ বা উড়িয়া ভাষা বলে মনে করতেন। এখন একেবারে স্থির হয়ে গেছে, এ ভাষা প্রাচীন বাঙলা ভাষা। কিন্তু এই বাঙলার সঙ্গে তার তিন চারশ' বছরের পরবর্তী বাঙলা ভাষার আকাশ-পাতাল তফাৎ। সগোত্র বলেও চেনা যায় না। শব্দের বানানও এখনকার কালে অতি অদ্ভুত বলে মনে হয়। সেকালের জ্ঞানী গুণী ভদ্রলোকেরা লিখতেন পড়তেন, সংস্কৃত ভাষায়। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথাবার্তাও বোধ হয় চল্‌ত সংস্কৃতে। বাঙলা তখনও ছিল অসাধু গ্রাম্যভাষা, সাধারণ বা ইতর লোকদের ব্যবহারের নিমিত্ত। বোধ হয় সহজধর্ম সকল লোকদের কাছে সহজে প্রচারের ইচ্ছেয়

সিদ্ধাচার্যগণ বাঙলাতেই তাঁদের গানগুলো বেঁধে ছিলেন।

চর্যাপদগুলোর পর প্রায় আড়াইশ তিনশ বছরের মধ্যে বাঙলা ভাষায় লেখা আর কোনো পুঁথি আমরা এখনও দেখতে পাইনি বলে, এসব গানের ভাষা কি করে যে ক্রমে ক্রমে মঙ্গলকাব্যের, পদাবলীর কবিতার ভাষায় পরিণত হল, সেটার চাক্ষুষ কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

চর্য্যাপদগুলোও বৌদ্ধ আচার্যদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশ থেকে অন্তর্ধান হয়েছিল। এ তল্লাটে তাদের অস্তিত্বই কেউ জানত না। এই সেদিন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় নেপাল থেকে সেগুলোকে উদ্ধার করে এনে ছাপিয়ে দেন। শাস্ত্রীমশায়ের পুঁথিতে এই চর্যা-গানের সংগ্রহের নাম দেওয়া আছে চর্য্যা-চর্য্যবিনিশ্চয়। এই নাম ঠিক কিনা, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক তর্কবিবাদ আছে। কিন্তু আমাদের সে বিতর্কে কাজ কি?

সবশুদ্ধ পঞ্চাশটি গান নিয়ে এই সংগ্রহ পুঁথি সম্পূর্ণ। শাস্ত্রীমশায় আড়াইটা পদের খোঁজ পাননি। পরে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্য্যাপদের এক তিব্বতী অনুবাদ থেকে এই তিনটি গানের তিব্বতী সংস্করণ উদ্ধার করেন এবং অনেক অশুদ্ধ পাঠও সেই সঙ্গে শুদ্ধ করে দেন। পুঁথিতে গানগুলির এক সংস্কৃত টীকা দেওয়া আছে। কিন্তু সে টীকা আসলের চেয়ে অনেক বেশী ভারী।

লিরিক কবিতার একটা মস্ত গুণ হচ্ছে যে, বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে, সেগুলোকে মনে মনে গুণগুণিয়ে বা মুখে মুখে আউড়িয়ে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যলোকেই এক স্বর্গলোক রচনা করে কিছুক্ষণের জন্যেও অন্ততঃ পার্থিব দুঃখ-কষ্টের হাত এড়ান যায়। কিন্তু চর্য্যাপদগুলি নিয়ে তা হবার জো নেই। সাধারণ লোকের পক্ষে এগুলো উচ্চারণ করা যেমনি শক্ত, আর টীকাভাষ্য করে বুঝিয়ে না দিলে, এগুলোর মানে বোঝাও তেমনি দুরূহ ব্যাপার। এই জন্যে অনেকে চর্য্যাপদগুলোকে লিরিকের পর্যায় স্থান দিতে চান না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, একটু ধৈর্য ধরে চর্য্যাপদগুলি নিয়ে চর্চা করলে, এগুলোর মধ্যে লিরিকের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। তবে সেটা হয়ত অনেকের কাছে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানর মত একটা কাণ্ড বলে উপাদেয় না হতেও পারে।

চর্য্যাগানের দুচারটি পদের নমুনা তুলে দিচ্ছি। আধুনিক বাঙলা ভাষায় সামান্য কিছু কিছু ব্যাখ্যাও দেওয়া গেল। এরকম ব্যাখ্যা অনেকের মনঃপুত না হলেও, অক্ষরে অক্ষরে প্রতি শব্দের শব্দার্থ দিয়ে অনুবাদ করতে গেলে বিপদ আছে। যেমন বিপদ হয়েছিল এক ইংরেজ সাহেবের—যিনি ভাল বাঙলা জানেন বলে গর্ব করতেন। তিনি গোপাল উড়ের যাত্রার ইংরিজি অনুবাদ করে বসেছিলেন, The journey of the flying cowherd. চর্য্যাপদগুলি প্রকারে না হোক, আকারে পরবর্তী পদাবলীর কবিদের পদেরই মতন। তখনকার দিনের যাঁরা এই বাঙলা ভাষার সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন, তাঁরা বোধ হয়, লিরিকেরই মতন এগুলো উপভোগ করতেন। কারণ, দেখা যায়, সেকালে এই পদগুলিতে সুর লাগিয়ে গান করা হোত। পুঁথিতে প্রত্যেক গানের উপর কি সুরে তা গাওয়া হবে, তার রাগরাগিণীর নাম লেখা আছে। অনেকগুলি সুর যদিও এখন একেবারে অচল বলে আর তাদের চেনা যায় না।

*

তিন ন ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী॥
হরিণী বোলঅ হরিণা সুন হরিণা তো।
এ বন ছাড়ি হোহু ভান্তো॥
তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হিঅহি ন পইসই॥

কখন ব্যাধের শর এসে বেঁধে, সেই ভয়ে হরিণ ঘাসও ছোঁয় না, জলও খায় না। হরিণ হরিণীতে কাছ ছাড়াছাড়ি; কেউ কার সন্ধান পায় না। তাই দেখে হরিণী হরিণকে ডেকে বল্লে, এই বন ছেড়ে, সরে পড়ো। তীরের মতন ছুটল সেই হরিণ। ত্রস্ত হরিণের আর খুরটুকুও দেখা গেল না। ভুসুকুপাদ বলছেন, এতেও মূর্খদের মনে কোনোই আঁচড় পড়ল না।

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিনউরা॥

গঙ্গা যমুনার মাঝ দিয়ে নৌকা বেয়ে চলেছে। প্রেমরসে মত্ত ডোমকন্যা তাতে ডুবে ডুবে অবলীলাক্রমে পার করে নিয়ে যায়। ডোমকন্যা, দিন ত বেড়ে চলল। বেয়ে নিয়ে চল ডোম্বীপাদকে সেই পরমানন্দে ভরা জিনপুরে। সেখানে আমার সৎগুরুর পাদপদ্ম দর্শন পাব।

কুলেঁ কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিন একু বাকু ন ভুলহ রাজপথ কণ্টারা॥
মাআমোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
অগে নাব না ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥

*

বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলাথেউ সংকেলিউ।
বাটন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ॥

ওরে মূঢ়, কুলে কুলে আর ঘুরে মরিসনে মিছে। চেয়ে দেখ্, এই সংসারের মাঝ-খানেই ত এক সহজ পথ আছে। শিশুর মতন ভুলে তুই সোনাবাঁধা রাজপথ দিয়ে যাসনে। সে পথ যেখানে গেছে, সেখান থেকে বেরোবার যে আর রাস্তা নেই। মায়ামোহ সমুদ্রের ত অন্ত নেই, তার থই পাওয়া ভার। আগে যদি কোনো নৌকা না দেখতে পাস ত সন্ধানী লোককে পথ জিজ্ঞেস করেনে। শান্তিপাদ বলেন, ডাইনে বাঁয়ের দুদিকের পথ ছেড়ে মাঝখানের সহজ পথে চল্। এ পথে ঝোপঝাপ কিছুই নেই; একেবারে চোখ বুজেই চলে যেতে পারবি।

মুসলমানী আমলেই আসলে আধুনিক বাঙলা ভাষার লিরিকের উৎপত্তি আর প্রসার। বাঙলা দেশে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত রচনার আদর কমে আসতে লাগল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও রাজদরবারে আর তেমন খাতির রইল না। বাধ্য হয়েই লোক-দের ভাষার আশ্রয় নিতে হোল। আশ্চর্য এই যে, ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই ভাষায় রচিত কাব্যসাহিত্যের শুরু হয় এই মুসলমানী আমলেই।

গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এর অনেক পরে। গদ্য হচ্ছে প্রধানতঃ কারবারের ভাষা। যে গদ্য সাহিত্য রচনার বাহন, সে গদ্য তৈরী হতে আরও পাঁচশ বছর সময় লেগেছিল। বাঙলা দেশে আর এক বিদেশী রাজত্বের সংস্পর্শে এই গদ্যের আরম্ভ ও কালে কালে তার উন্নতি ঘটে। ইংরেজদেরই সাহায্যে ও চেষ্টায় বাঙলা ভাষায় গদ্য সাহিত্যের পত্তন হয়। একথাটা একেবারে উৎকট স্বদেশাভিমানী ব্যক্তি ছাড়া, আর সকলেই স্বীকার করবেন। সাহিত্যের গদ্য যুক্তি

র্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙলা দেশে ক্তমার্গ ছেড়ে যুক্তিমার্গের ধারা শুরু হয় লাশীযুদ্ধের পর।

মুসলমান রাজত্বকালে বাঙলা দেশের রবারী ভাষা ছিল ফার্সী। কিন্তু মুশকিল ই যে, মানুষের তো কেবল কারবার নিয়েই ল না। মনের কথা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে তে না পারলে মানুষের দিন কাটে না। ই তাড়নায় তো মানুষ পদ্য লেখে, াহিত্য রচনা করার চেষ্টা করে। তাই নের কথা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করতে পেরে, বাঙলা দেশের লোকেরা ঙলা ভাষাতেই পদ্য রচনা করতে শুরু রে দিলেন।

এতে লাভ হোল এই যে, সংস্কৃতের াট-সাঁট পোষাকী ভাষা ছেড়ে বাঙলা েশের বেশ ঢিলে-ঢালা আটপৌরে ভাষাতে নের কথা বলতে পারায় ভাষায় লেখা পদ্য-লো এক একটা আসল কবিতা হয়ে ঠল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও পেলো ঙলা দেশের একটা নিজস্ব রূপ। তাই এই ময় থেকেই বাঙলা ভাষা দানা বাঁধতে রু করেছিল। ইংরিজি সাহিত্যে যাঁরা শগুল থাকেন, তাঁরা জানেন ইংরেজ কবি সারের ইংরিজি ভাষার সঙ্গে ইংরিজি াইবেলের আর মহাকবি সেক্সপীয়রের ভাষার ভেদ কতখানি। আর তাঁদের সেই ময়ের ইংরিজি ভাষার সঙ্গে বর্তমান-ালের ইংরিজি ভাষার তফাৎ সেই পরিমাণে কতখানি কম। সেই কম বাঙলা ভাষা এই সময়কার কবিদের াতে পড়ে যে চেহারা নিল, তার সঙ্গে আমাদের আজকালকার কাব্যের ভাষার আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বৈষম্য অনেকখানি কম।

ভাব ও কথার বৈচিত্র্য ও প্রসার এখন অনেক বেড়ে গেলেও, ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বাঙলা কবিতার রূপ তখনও যা ছিল, এখনও প্রায় সেই রকমই আছে। আমার কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে আমি সেকালের পদকর্তাদের কয়েকটি পদ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। আকারে একটু ছোট করবার জন্যে মাঝে মাঝে সামান্য কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে। একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে যদি দেখেন যে, এগুলি টীকা-টিপ্পনী ছাড়াও বেশ বুঝতে পারছেন; এগুলোর রস আস্বাদনে কোনো বাধা পাচ্ছেন না, তাহলে জানবেন আমার কথাটাই ঠিক।

পদকর্তাদের আদি-গুরু চণ্ডীদাস। কিন্তু আমরা যে পদকর্তা চণ্ডীদাসকে জানি, পণ্ডিতদের মতে তিনিই যে ঠিক চণ্ডীদাস, এ নাও হতে পারে। বস্তুতঃ অনেকগুলি চণ্ডীদাসের খবর পণ্ডিতেরা পেয়েছেন; কোন্‌টি যে কে, ঠিক করে বলা শক্ত। আবার চণ্ডীদাসের দেশ সম্বন্ধেও অনেক তর্কবিতর্ক আছে। কেউ বলেন, তাঁর বাস ছিল বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে। আবার কেউ বলেন না, সেটা ছিল বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের কাছে। বড় গোলমেলে কথা! তা আমাদের অত গোলমালে কাজ কি? নাম ধাম সঠিক না জানা থাকলেও, ভাল কবিতা পড়ার আনন্দ তাতে আমাদের কিছু কম হবে না। আমাদের কাছে পণ্ডিতদের বারদুয়ার বন্ধ থাকলেও, ভিতর দুয়ার খোলা,—সেইখান থেকেই ত নন্দন-কাননের পারিজাত ফুলের সুগন্ধ আমাদের কাছে ভেসে আসে।

তবে একটা কথা আছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এঁরা বড় কবি বলে, পরবর্তী অনেক পদকর্তারা তাঁদের স্বরচিত পদ ঐ দুই মহাকবিদের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এতদিন পরে, কোনটা সত্যিকারের চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদ, আর কোনটা নয়, স্থির করা বড় সোজা কাজ নয়।

বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
জাতি কুল শীল মান॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

সতী কি অসতী—তোমার বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডিদাস পাপ পুণ্য মম
তোমার চরণখানি॥

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পীরিতি
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয়লো সজনি
আঁধার পেরিলে আলা॥

এখন বিদ্যাপতির পদ। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি। তাঁর ভাষার নাম ব্রজভাষা। তবুও ভাল করে পড়ে দেখলে বোঝার অসুবিধা হবে না। এঁকে আমরা বাঙালী কবিই বলে মেনে নিয়েছি। আর নোবোই বা না কেন? মৈথিলীরা ত বিদ্যাপতিকে এতদিন বাঙলা দেশেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। নিজেরা তাঁর নামগন্ধ জানতেন না। তারপর প্রাদেশিক আত্মাভিমান জাগতে, আর তাঁকে বাঙালীর কবি বলে স্বীকার করতে চাননা। বরঞ্চ খাঁটি বাঙালী কবি গোবিন্দদাসকেও নিজেদের দিকে টানতে চান। যেমন উৎকলবাসীরা জয়দেব কবিকে উড়িয়া বলে নিজেদের দলে টানবার চেষ্টা করেন।

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখলু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলু
দেশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোয়ে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথ পরশ ন গেল॥
কত বিদগধ জন রস অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখল
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
হিয় ন জুড়ন গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝিনু কৈসন কেল।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত লাখে ন মিলল এক।

একটু পড়লেই বোঝা যায়, চণ্ডীদাসের প্রেম স্থির, ধীর, শান্ত। তাতে বিরহের দহন আছে বটে, কিন্তু যৌবনের দাপানি নেই। বিদ্যাপতির প্রেম চঞ্চল, আপনাতে আপনি সে বিভোর, যেন নব-যৌবনের ভারে হৃদয়ের একুল ওকুল দুকুল ভেসে যায়।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যে পথ দেখিয়ে গেলেন, সে পথে প্রায় তিনশ' বছর ধরে

অনেক বাঙালী কবি বিস্তর পদ লিখে গেছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙলা ভাষার কাব্য-সাহিত্য এক নতুন শক্তি পেল। মহাপ্রভুর শিষ্য প্রশিষ্য এবং তাঁদেরও শিষ্যানুশিষ্যরা বাঙলা ভাষায় অনেক কাব্য লিখে প্রচার করেছিলেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম বাঙলা দেশের মরা গাঙে এমন এক নতুন বান ডেকে এনেছিলেন যার প্রচণ্ড বেগ বাঙলা কাব্য সাহিত্যকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নৈয়ায়িক আর স্মার্ত পণ্ডিতরা যাই বলুন না কেন, একথাটা না মেনে উপায় নেই। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির হাজার হাজার করে দু হাজার পদ ছাড়া পদ সংগ্রহ 'গ্রন্থাদি থেকে আরও প্রায় দুশ' পদ-কর্তাদের লেখা প্রায় দুহাজার পদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে হিন্দু আছেন, মুসলমান আছেন, স্ত্রী-কবিও দু-চারজন আছেন। প্রতি বছরেরই আবার নতুন নতুন পদ-কর্তাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। শান্তি-নিকেতনে বিশ্বভারতীর পুঁথিখানায় এইরকম এক পদ-সংগ্রহ পুঁথি আছে। তার নাম পদমেরুগ্রন্থ। সেটা এখনও ভাল করে কারও দেখা হয়নি। উপরি উপরি দেখা থেকে জানা গেছে, এর থেকে অনেক অজানা পদকর্তাদের ও তাঁদের নতুন পদাবলীর সন্ধান পাওয়া যাবে।

তবে সব পদকর্তারা যে ভাল কবিতা লিখতে পেরেছেন, তা নয়। পরবর্তী-কালের অনেকেই একটা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পদ্য রচনা করেছেন। যাঁরা কবিতা লেখেন এবং যাঁরা কবিতা পড়ে থাকেন, তাঁরা সকলেই জানেন বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে পদ্য লিখতে বসলে সেটা অধিকাংশ সময়ে কবিতা হয় না।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরবর্তী পদ-কর্তাদের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, বলরামদাস বেশ প্রসিদ্ধ। এঁরা ইংরিজি পনের থেকে ষোল শতকের লোক।

গোবিন্দদাস বাঙালী হয়েও, ব্রজভাষার বিষম পক্ষপাতী। তাঁর প্রায় সমস্ত পদই ব্রজবুলিতে ভরা। যেমন—

যব ধনী ঘর সঞে ভেল বাহির।
ঝরঝর বরখে জলদ ঘন নীর॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চমক।
চলইতে খলয়ে সঘন মহী পঙ্ক॥
উঠইতে কাঁপি অপি উজোর হেরি।
কনক দণ্ড বলি ধর কত বেরি॥
ঐছনে সোপলুঁ তৈছে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ॥

সুন্দরি রাধে আও এ বনি।
ব্রজরমণীগণমুকুটমণি॥
কুঞ্চিতকেশিনী নিরুপমবেশিনী
রসআবেশিনী ভঙ্গিনীরে।
অধরসুরঙ্গিনী অঙ্গতরঙ্গিনী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিনীরে॥
কুঞ্জরগামিনী মোতিমদশনী
দামিনীচমকনেহারিণীরে।
আভরণধারিণী অখিলসোহাগিনী
পঞ্চমরাগিণী মোহিনীরে॥
রাসবিলাসিনী হাসবিকাশিনী
গোবিন্দদাসচিত সোহিনীরে॥

জ্ঞানদাসের পদে ভাষা ও বিষয়বস্তু আশ্চর্যভাবে মিশে গিয়ে একটা বেশ স্বয়ংপূর্ণ নতুন আকার ধারণ করেছে। সেইজন্য এঁর রচিত পদগুলোকে অনেক সময় চণ্ডীদাসের পদ বলে ভ্রম হয়। আবার অনেক সময় মনে হয় যেন সেগুলো বিদ্যা-পতির লেখা।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতে লাগি থির নাহি বান্দে॥
ঘরের সকল লোক করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাব আগুনি॥

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমারি রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লয়ে রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি যে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কয় তোমার পীরিতি
অন্তরে অন্তরে বাঁধা॥

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যেদিকে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখনি সে দিকে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতিদিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর রমণী
পীরিতে বান্ধিল তায়॥

এখন বলরামদাস ও লোচনদাসের একটি করে পদ দিই।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটী কল্প যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে দুইটি নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
হিয়ার ভিতর থুথে না হয় পরতীত।
হারাই হারাই যেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হতে কে কৈল বাহির।
তেঁঞি বলরামের পহুঁ চিত নহে থির॥

এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস
আমি নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি।
(আমার) অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমাধনে মিলাইল বিধি॥
মণি নও মাণিক নও হার করে গলায় পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
আমায় নারী না করিত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে
আমি চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইয়ে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালেতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরিগো
তাহে পরিজন পরিবাদ।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচন দাসের এই সাধ॥

এতো গেল সামান্য দু-চারটে কবিতা। এরকম কত শত ভাল ভাল পদ পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থে পাওয়া যায় তার ইয়ত্তা নেই। এখন আপনাদের জানা বর্তমান যুগের আপনাদের যে সব সাধের কবিতা আছে, সেগুলোর সঙ্গে মহাজনদের এই সব পদাবলী মনে মনে তুলনা করে দেখুন যে, আকারে প্রকারে উভয়েই সজাতি সগোত্র কি না।

বাঙলা দেশের জল-হাওয়া আর মাটির গুণে বাঙলা দেশের কাব্য হয়ে ওঠে গান। সুরের বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে হয় বলে, লিরিকে বলার চেয়ে না বলাটাই বেশী। যেটা বলা হোল, সেটা তো খুবই অল্প। অতিশয় ক্ষীণপ্রাণ; ছুঁতে না ছুঁতেই সেটা নুইয়ে পড়ে; আর তাকে ধরা যায় না। কিন্তু যেটা বলা হোল না, তারই ধ্বনি তো মনের মধ্যে এমন একটা অপূর্ব সুরলোকের সৃষ্টি করে যে, সেটা আর যাই হোক, তাকে পার্থিব পদার্থ তো কোনোমতেই বলা চলে না। তাকে তো বলি বলি করে বলা যায় না।

বাঙলার মাটিতে এই গানের আবেগ এতই প্রবল যে, বাঙলা এপিক কাব্য-গুলোরও প্রাণবস্তু হচ্ছে আসলে লিরিক। মঙ্গলকাব্যে, কাশীরাম দাসের মহাভারতে, কীর্তিবাসের রামায়ণে তো পদে পদে এই লিরিক প্রাণবস্তুটি ধরা পড়ে। এমন কি বাঙলা দেশের সবচেয়ে বড় এপিক কবি মাইকেলেরও কাব্য প্রকৃতপক্ষে কতকগুলো বড় বড় লিরিকের সমষ্টিমাত্র। বাঙলা দেশের খাঁটি নিজস্ব ধন যে ছেলে-ভুলোনো ছড়া—সেগুলোও লিরিকের রসে ভরপুর। তবে খাঁটি স্বদেশী মালে আজকাল আর কারোরি মনস্তুষ্টি হয় না। এ ছড়া দিয়ে আজ-কালকার ছেলেদের ভুলোনো যায় না। কারণ, আজকালকার ছেলেরা তো বাঙালী-মায়ের দুধে মানুষ নয়; তারা কেউ মেলিন্স-ফুড বেবী, কেউ বা গ্ল্যাক্সো বেবী আর কেউ বা ল্যাকটোজেন বেবী।

মুসলমানী আমলে বাঙলা ভাষায় সঙ্গীত-প্রাণ লিরিক কবিতার যে ধারা একবার শুরু হয়ে গেল, আজ ছ'শ বছর ধরে সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। প্রথমেই ভক্ত বৈষ্ণবদের হাতে পরিপুষ্টি লাভ করে এই ধারা আরও বেগবন্ত হয়। তারপর কখনও ক্ষীণ আবার কখনও স্ফীত অবস্থায় প্রবাহিত হয়ে, অবশেষে আমাদেরই সময়ের কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে পৌঁছল। তাঁর হাতে পড়ে, আর অনেকটা ইংরিজি শিক্ষাদীক্ষার গুণে, বাঙলা লিরিক এমন এক ছাপ পেয়ে গেল যে, সে-ধারা আর কখনও যে লুপ্ত হয়ে যাবে, এ আশঙ্কা এখন আর নেই। বাঙলা ভাষা যতদিন জীবিত থাকবে, বাঙলা লিরিকও ততদিন প্রাণবন্ত হয়ে থাকবে।

প্রাচীন বাঙলা লিরিকগুলির উৎপত্তি হচ্ছে বাঙলা দেশেরই শ্রীজয়দেব কবির রচিত এক খণ্ডকাব্যের আদর্শ থেকে। সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই গীতগোবিন্দ কাব্য হচ্ছে এসব কবিদের কাছে প্রমাণ শাস্ত্রের মতন। কিন্তু তার মধ্যে না বলার আর্টটুকু না জানা থাকার দরুণ জয়দেবের এই কাব্য বড় এক ধর্মগ্রন্থ হয়ে আছে, উঁচু দরের কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। গীতগোবিন্দে সুরের ঝংকার আছে বটে, কিন্তু সুরের ধ্বনি নেই। ছন্দের ব্যঞ্জনা নেই। তবে স্থানে স্থানে এই ধ্বনি যেন অজ্ঞাতে একটু আধটু ফুটে বেরুচ্ছে। যেমন গোড়াতেই—

মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

ছোট্ট দুটি লাইনে তমালবৃক্ষরাজিঘন শ্যামল বনভুমির যে অপরূপ চিত্রটি আমাদের মনের মধ্যে হঠাৎ ফুটে উঠল, সেটা অনু-প্রাসের গুণে বা কোনো অলংকারের ব্যবহারের জন্যে নয়। কেবলমাত্র বাক্য সংযমের ফলে। কিন্তু শুধু সুরের ঝংকারও মানুষের মন কতখানি আকর্ষণ করতে পারে, তারও দৃষ্টান্ত গীতগোবিন্দে অনেক আছে। যেমন,—

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিত কোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥

মানুষের শিশুর মতন মন চিরকালই ত ছন্দের কাছে পরাভব স্বীকার করে এসেছে। এই কারণে বাঙলার গীতগোবিন্দ কাব্যের আদর ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই। এই কাব্যে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, যদিও এটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, কিন্তু সে সংস্কৃত প্রায় ভাষায় এসে ঠেকেছে। আরও দেখা যায় যে, তালের ছন্দের উপর নির্ভর না করে, গানের যা স্বাভাবিক ছন্দ, সেই মিলের ছন্দই এই কাব্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। যেমন—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপয়ানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরম্ অধীরং ত্যজ মঞ্জীরং
রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং
শীলয় নীলনিচোলম্॥

অনুস্বর বিসর্গগুলো বাদ দিলে এ ত বাঙলা! আর বাঙলা গানেরইত এই সুর, এই রূপ। এই কারণেই ত অনেক পণ্ডিতরা অনুমান করেন, জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্য প্রথমে বাঙলাতেই রচনা করেছিলেন, পরে তার এক সংস্কৃত সংস্করণ করেন। হবেও বা।

গীতগোবিন্দকে আশ্রয় করলেও, তার ভাবের রসে সম্পূর্ণ মগ্ন হলেও, বাঙলা ভাষায় কিন্তু যেসব লিরিকের সৃষ্টি হোল, তার প্রাণবস্তু ছিল আরও গভীর। মানুষের আদিম মনের ঠিক মাঝখান থেকেই সেগুলো ছন্দের ফুলকি হয়ে যেন বেরিয়ে আসছে। সহজ সরল সুন্দর।

এই সব প্রাচীন গানগুলোকে সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবিতা বা বৈষ্ণব পদাবলী বলে আখ্যা দেওয়া হয়। আর তারি সঙ্গে এদের একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়ারও রীতি চলে আসছে। কিন্তু অন্যান্য রসের মতন কাব্যরসও ত অনির্বচনীয়। আখ্যা-ব্যাখ্যা দিয়ে তার কুল-কিনারা পাওয়া শক্ত। পদ্য হয় কবিতা হোল, না হয় হোল না। যে-টা কবিতা হোল, তার টীকাটিপ্পনী করা যদিও মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তার সম্পূর্ণ স্বরূপ, কথা দিয়ে বোঝান এক অসম্ভব ব্যাপার।

চৈতন্যদেব বাঙলা দেশে যে প্রেমের ধর্ম প্রচার করলেন, তার একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে নামকীর্তন। মহাপ্রভুর ভক্ত শিষ্যেরা বাঙলায় রচিত প্রাচীন কবিতাগুলিকে হাতের কাছে পেয়ে, তাতে কীর্তনের সুর জুড়ে দিয়ে, সহজেই তাদের নামকীর্তনের কাজে লাগিয়ে দিলেন। সেই জন্যে বোধ হয় এইসব কবিতার বৈষ্ণব কবিতা বা বৈষ্ণব পদাবলী বলে খ্যাতি। নতুবা দেখা যায়, এই সব পদের প্রথমদিগের রচয়িতারা প্রায় সবাই ছিলেন শাক্ত। এঁদের পরবর্তী অনেক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কবি শুধু নামকীর্তনের কাজের নিমিত্তই অনেক পদ রচনা করেছিলেন। সেগুলি সব যে ভালো কবিতা হয়েছিল, তা নয়।

তার কারণটা আগেই বলে রেখেছি। তাছাড়া, কোন ভাল কবিতাই কোন সম্প্র-দায়বিশেষের কাব্য নয়, এ বলাই বাহুল্য। তাহলে বিদেশী ভাল কবিতাগুলো আর আমাদের কাছে একেবারেই ভালো লাগত না। ক্রীশ্চান বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কবিতা বলে তাদের আমরা দূরেই রেখে দিতুম।

ধর্ম-সাধনার অঙ্গরূপে ব্যবহার হতো বলেই বোধ হয় এই কবিতাগুলির একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়াও অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এসব কবিতায় রাধাকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁরা কাব্য-জগতে ঠিক দেবতা নন, মানুষেরই মতন। মানুষেরই মতন এঁদেরও সুখ-দুঃখ আছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, মান-অভিমান আছে, লজ্জা, ঈর্ষা, ভয়ও আছে। পৃথিবীর সব দেশেরই কাব্যে দেবতারা মানুষেরই মতন, এবং ঠিক এইজন্যেই তাঁরা আমাদের এত প্রিয়। নতুবা শুধু আধ্যাত্মিকতাটুকুই যদি তাঁদের একমাত্র সম্বল হোত ত' তাঁরা আমাদের এত প্রিয়, এত আপনার জন হতেন কিনা সন্দেহ।

ভাষায় রচিত এই প্রাচীন কবিতাগুলি পড়ে যদি কারো মনে ধর্মভাবের উদয় হয়, তাহলে তাতে কিছু আসে-যায় না। কিন্তু এই কবিতাগুলিকে নিছক কাব্য বলে মেনে নিলে বোধ হয় তাদের প্রতি আরো সুবিচার করা হয়। দেখার বিষয় হচ্ছে এইমাত্র যে, এগুলোর ভিতর কাব্যের ধ্বনি আছে কিনা; আর সেই ধ্বনি মানুষের মনে এক লোকোত্তর জগতের আভাস এনে দেয় কিনা। সে যতই ক্ষণিকের তরে হোক না কেন।

আমার কথাটা আর একটু পরিষ্কার করার ইচ্ছেয় আমি বহুদিনগত সেই অতীত-কালের দুটি অপূর্ব বর্ষার গান এখানে তুলে দিচ্ছি। বর্ষাঘনরাত্রে মানুষের চিরন্তন বিরহী মনের ছবি, কথা দিয়ে আঁকা এই দুটি কবিতায়।

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

শিখরে শিখণ্ডরোল, মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেনকালে॥ (জ্ঞানদাস)

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাহত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
নথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥ (বিদ্যাপতি)

কত শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে। কত রাজা-বাদশা এল গেল, কত রাজ্য-মসনদ উঠল, আবার টলে পড়ল। কত গড়-ইমারত ভাঙল গড়ল, কত মন্ত্রী-উজির, শেঠ-সওদাগর, ধনদৌলত, লোকলস্কর কালের স্রোতে ভেসে গেল। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে বাঙলার এই নিজস্ব কবিতাগুলি আমাদের এই বাঙলা দেশের মানুষের মনে কি যে অসীম আনন্দের সৃষ্টি করে এসেছে, এবং এর পর যে কতদিন ধরে করে চলবে,—তা কে জানে?

হৃদযন্ত্র

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

বুকের মাঝখানে হাত দিয়ে আমরা বলি এখানে আমাদের হৃদয় আছে, তার মানে সেই হৃদয় আমাদের আবেগ সমূহের কেন্দ্রস্বরূপ। ও ছাড়াও শরীরের রক্ত সংবহনের কাজের জন্যে যে মাংসপিণ্ডবৎ একটি বাস্তব হৃদযন্ত্র আছে সেটিও থাকে ঐ বুকেরই মধ্যে, কিন্তু আমাদের কল্পিত হৃদয়ের মতো ঠিক মাঝখানে নয়, খানিকটা বাঁদিক ঘেঁষে। এই হৃদ্‌যন্ত্রের একমাত্র বাস্তব কাজ অনবরত শরীরের রক্তকে পাম্প করতে থাকা, অর্থাৎ এক একটা চাপ প্রয়োগের দ্বারা শিরাসমূহের ভিতর দিয়ে রক্তকে সর্বদা সঞ্চারিত করতে থাকা। জীব-দেহের রক্তের মধ্যে সকল সময়েই যে একটা চলমান স্রোত বইছে সেটা কেবল এই চাপের দ্বারাই সম্ভব হয়। শরীরের মধ্যে যত কিছু রক্তবাহী ধমনী ও শিরা জাতীয় নল আছে সবেরই উৎপত্তি এখান থেকে। শুধু উৎপত্তিই নয়, বলতে গেলে তার পরিণতিও এ এইখানে, অর্থাৎ যে রক্ত এক নল দিয়ে হৃদ্‌যন্ত্র থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত শরীরটাকে প্রদক্ষিণ করে সেই রক্তই আবার অন্য নল দিয়ে সেই হৃদ্‌যন্ত্রেই ফিরে আসছে। অতএব এই হৃদ্‌যন্ত্রকে একাধারে দু কাজই করতে হচ্ছে, একবার করে বর্জন ও একবার করে গ্রহণ, একবার করে চাপের জোরে রক্তকে ঠেলে বের করে দেওয়া, আবার পরক্ষণেই আল্‌গা দিয়ে তাকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া। বলা বাহুল্য তার চাপেরই জোরে রক্তের যাওয়া আসা দুইই হয় অর্থাৎ যে চাপের জোরে সেটা এক ধরণের নল দিয়ে শরীরের চতুর্দিকে ছুটলো, তারই বেগটা রক্তের মধ্যে থেকে বলে প্রত্যেক চাপের ফাঁকে ফাঁকে হৃদ্‌যন্ত্রকে খালি অবস্থায় পেয়ে অন্য ধরণের নল দিয়ে সেই রক্ত আবার ফিরে এসে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। মোটামুটি এমনিভাবে আকারে অনবরত রক্তের সংবহন ক্রিয়া চলছে। কিন্তু এর মধ্যে আরো অনেক কথা আছে। প্রথম কথা, হৃদ্‌যন্ত্র অনবরত পাম্প করছে কোন্ শক্তিতে?

হৃদ্‌যন্ত্র একরকম মজবুত ধরণের মাংস-পেশীর তৈরী। এই মাংসপেশী এক বিশেষ রকমের মাংসকোষের দ্বারা গঠিত। এই জাতীয় কোষগুলির স্বভাবই হোলো কারো বিনা সাহায্যে আপনা থেকে অনবরত একবার করে সংকুচিত ও একবার করে প্রসারিত হতে থাকা। ওর এ কাজের কখনো বিরাম নেই, যতকাল জীবিত থাকবে তত-কাল ঐ কোষগুলি অনবরত এই কাজই করতে থাকবে। সুতরাং ঐ বিশিষ্ট রকমের কোষক দিয়ে তৈরী হৃদপেশীগুলি এই সংকোচন-প্রসারণের ক্রিয়া পর্যায়ক্রমে করে যেতে থাকে, তারই ফলে হৃদ্‌-যন্ত্রটি একবার করে চুপ্‌সে গিয়ে রক্তকে পাম্প করে, আর একবার করে ফেঁপে উঠে এই ক্রিয়া থেকে বিরত হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের এই ক্রিয়াটি তার অধিকারীর জ্ঞানের বা ইচ্ছার অধীন নয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এ যে কেমনভাবে কাজ করে যাচ্ছে সে কথা অধিকারী জানতেও পারে না। অধিকারী জেগেই থাক কিংবা ঘুমিয়েই থাক, কাজই করুক কিংবা বসেই থাক, হৃদ্‌যন্ত্র আপনার নিয়মে আপনার কাজ করে যায়। কোনো জীব মাতৃগর্ভে জন্ম নেবার সংগে সংগেই যে তার হৃদ্‌যন্ত্র কাজ করতে শুরু করে তা নয়, এটি প্রস্তুত হতে কিছুকাল সময় লাগে, কারণ উপযুক্ত কোষগুলি আগে না জন্মালে এ যন্ত্র তৈরী হতে পারে না। একটি হাঁসের বা মুরগির ডিমকে দু দিন তা দিয়ে রেখে তার পরে যদি সেটা ফাটিয়ে শক্তিশালী লেন্সের সাহায্যে ভিতরটা পরীক্ষা করা যায়, তাতে দেখা যাবে ওর ভিতরকার একটু অংশ ঠিক হৃদ্‌যন্ত্রের মতোই স্পন্দনশীল। তার মানে সেখানে ঐ নির্দিষ্ট ধরণের কোষগুলি ইতিমধ্যে আবির্ভূত হয়েছে, অতঃপর ওর থেকেই তার হৃদ্‌যন্ত্রটি গড়ে উঠবে। আবার জীবটির দৈবাৎ মৃত্যু হলেই যে তার হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন থেমে যাবে এমন নাও হতে পারে। একটি ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্র যদি তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে স্বতন্ত্র জায়গাতে লবণ-জলে ভিজিয়ে রাখা যায় তাহলে সেটি বহুক্ষণ পর্যন্ত পাম্প করার মতো কাজ সমানে করে যেতে থাকবে, এমন কি যত্ন করে রাখলে দুই একদিন পর্যন্তও এইভাবে সেটি বেঁচে থাকতে পারে। ব্যাং কখন মরে গেছে, কিন্তু তার হৃদ্‌যন্ত্র তখনো মরেনি। কোনো ফাঁসীর আসামীর ফাঁসী হয়ে যাবার প্রায় এগারো ঘণ্টা পরে হৃদ্‌যন্ত্রটি কেটে বের করে এনে সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তার ফলে সেটি স্পন্দিত হতে শুরু করে এবং কয়েক ঘণ্টা ঐভাবে স্পন্দিত হতে থাকে। মানুষটা এগারো ঘণ্টা আগে মরে গেছে কিন্তু তার হৃদ্‌যন্ত্রটা তখনো মরেনি। অথচ এমনও হয় যে, সুস্থ মানুষের হৃদ্‌-যন্ত্রটা থেমে গিয়ে মানুষটি হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মরে যায়। এটা হয় অবশ্য কোনো রোগের কারণে, যেহেতু অনেকরকম রোগের দ্বারাই হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে। হৃদ্‌যন্ত্র এমনি স্বয়ংক্রিয় এবং স্বাধীন হলেও অনেক কিছুই ওর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, বিশেষত নার্ভের উত্তেজনা। সাধারণতঃ এর উপর দুইরকম নার্ভের ক্রিয়া লক্ষিত হয়, এক-রকম উত্তেজক, একরকম নিস্তেজক। হৃদ্‌-যন্ত্রের স্বাভাবিক স্পন্দনের গতি প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ৭০ বার হওয়ার কথা, কিন্তু প্রায়ই এর কোনো স্থিরতা থাকে না। একটু পরিশ্রম বা ছুটোছুটি করলেই এর গতি অনেক বেশি বেড়ে যায়, এমন কি দ্বিগুণ পর্যন্তও হয়ে যায়, আবার বিশ্রামের অবস্থা এলেই আপনা থেকে স্বাভাবিক হয়ে যায়। মনে কোনো ভয় বা উদ্বেগ হলেও এর স্পন্দন খুব দ্রুত হয়, আবার জ্বর হলেও তাই হয়। এগুলি সবই হয় নার্ভের ক্রিয়াতে অথবা রোগের কারণে। সদ্যোজাত শিশুর হৃদ্‌পিণ্ডের গতি খুব দ্রুত হয়, মিনিটে প্রায় ১৬০ বার। বার্ধক্যে এর গতি খুব কমে যায় প্রায় মিনিটে ৬০ বারের বেশি হয় না।

হৃদ্‌যন্ত্রটি দেখতে খুব বড়ো এক খণ্ড রক্তবর্ণ মাংসপিণ্ডের মতো, মাপে প্রায় ৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪ ইঞ্চি চওড়া, এবং আকারে অনেকটা কূর্মাকৃতি। এর সরু মুখের দিকটা থাকে নিচের দিকে, আর চওড়া মুখটা থাকে উপর দিকে। আমাদের বুকের বাঁ-দিকের স্তনবৃন্তের প্রায় আধ ইঞ্চি নিচে বরাবর জায়গাটিতে এর নিম্ন-প্রান্তটির স্থান নির্দেশ করা হয়, আর সেই-

খানে স্টিথোস্কোপের নল লাগিয়ে শুনলে ওর ধুকধুকানির শব্দটি স্পষ্ট শোনা যায়। এর দুই পিঠের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সমতল পিঠটা থাকে পিছন দিকে, কুব্জ পিঠটা থাকে সামনের দিকে। কাগজের ঠোঙার মধ্যে যেমন জিনিস ভরা থাকে অনেকটা তেমনি-ভাবে এই হৃদ্‌যন্ত্র সর্বদা একটি পুরু ঝিল্লীর থলির মধ্যে ভরা থাকে, সেই থলির মধ্যে সর্বদাই কিছু রসক্ষরণের দ্বারা ওটিকে স্নিগ্ধ এবং মসৃণ ক'রে রাখে। এই থলির নাম পেরিকার্ডিয়ম, এতে কোনো রোগপ্রদাহ উপস্থিত হলে তার দ্বারাও হৃদ্‌যন্ত্রের অনেক ক্ষতি করতে পারে।

হৃদ্‌পিণ্ডটি ভিতরের দিকে ফাঁপা এ কথা বলাই বাহুল্য। ছুরি চালিয়ে একে যদি লম্বালম্বি দুফাঁক ক'রে চিরে ফেলা যায় তাহ'লে দেখা যাবে যে, ফাঁপা মানে ওর ভিতরে যে একটিমাত্রই গহ্বর আছে তা নয়, ওর মাঝ বরাবর লম্বালম্বি একটি মাংসেরই দেয়াল দিয়ে সমস্ত গহ্বরটা দুই ভাগে ভাগ করা, অর্থাৎ ঐ দেয়ালটির দুই পাশে দুইটি স্বতন্ত্র গহ্বর রয়েছে, বাম দিকের গহ্বরের সঙ্গে দক্ষিণ দিকের গহ্বরের কোনো যোগাযোগ নেই। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক দিকের গহ্বর আবার উপর নিচে দুই কুঠরিতে ভাগ করা, কিন্তু উপরের ও নিচের কুঠরির মাঝে পূর্ববৎ মাংসের দেয়াল নেই, তার বদলে রয়েছে মাংস-ঝিল্লীর তৈরি এক একটা কপাটিকা, এবং সেই কপাটিকা এমনভাবে বিন্যস্ত যে, উপরের কুঠরি থেকে সমস্ত রক্ত তার ভিতর দিয়ে অনায়াসে নিচের কুঠরিতে নেমে আসতে পারবে, কিন্তু নিচের কুঠরির রক্ত উপরের কুঠরিতে একটুও যেতে পারবে না, কারণ নিচের দিক থেকে চাপ পড়লেই পাল্লা বন্ধ হয়ে সে কপাটিকা তৎক্ষণাৎ বুজে যাবে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে দুই স্বতন্ত্র অংশ, এবং প্রত্যেক অংশের মধ্যে দুটি ক'রে কুঠরি। ঐ অংশ দুটিকে বলা হয় দক্ষিণ-হার্ট ও বাম হার্ট, অর্থাৎ যেন দুটি আলাদা আলাদা হার্টকে একত্রে জুড়ে একটা হৃদ্‌পিণ্ডে পরিণত করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের উপরের কুঠরিকে বলা হয় অরিকল্‌ বা অলিন্দ, নিচের কুঠরিকে বলা হয় ভেণ্ট্রিকল্‌ বা নিলয়।

কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে এই দুটি স্বতন্ত্র অংশ থাকবার কারণ কি? কারণ এই যে, আমাদের দেহের মধ্যে রক্ত সংবহনেরও দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ বা চক্র রয়েছে, এবং তার উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র। আমরা জানি যে, রক্তকে দুই রকমের কাজ করতে হয়, একদফা তাকে কোষে কোষে খাদ্য সরবরাহ করতে হয়, আবার সেই সঙ্গে তাকে অক্সিজেন সরবরাহও করতে হয়। খাদ্যনির্যাসগুলিকে সে পায় পেটের অন্ত্রাদির ভিতর থেকে, কিন্তু অক্সিজেন সে পাবে কোথায়? নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা অক্সিজেনের আদান-প্রদান সর্বক্ষণ কেবল ফুসফুসের মধ্যেই হচ্ছে। অতএব খাদ্যের সরবরাহ নিয়ে কোষের কাছে উপস্থিত হবার আগে প্রত্যেক রক্তস্রোতকেই একবার ক'রে ফুসফুসের ভিতর দিয়ে ঘুরে অক্সিজেন সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হয়, তারপরে সে ঐ দুটি কর্তব্য পালনে শরীরের সর্বত্র আবার প্রবাহিত হতে পারে। তাহ'লে প্রত্যেক রক্তস্রোতকে প্রথমত হৃদ্‌পিণ্ডে পৌঁছে তার পাম্পের জোরে একদফা ক'রে ফুসফুস-চক্রটা ঘুরে আবার হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরে আসতে হয়, তারপরে দ্বিতীয় দফায় আবার ওর পাম্পের জোরে সারা শরীরে সংবাহিত হতে হয়। হৃদ্‌পিণ্ডের দুটি অংশ থাকবার এই হোলো কারণ। ওর দক্ষিণ অংশটা ফুস্‌ফুস্‌-চক্রের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, বাম অংশটা সাধারণ সরবরাহ-চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ব্যাপারটা তাহ'লে ঠিক এইরকম দাঁড়ায়। চতুর্দিক থেকে ফিরে আসা রক্তস্রোত অন্তিম দুটি মহাশিরার ভিতর দিয়ে প্রথমে এসে ঢুকলো হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ অংশের উপরকার অলিন্দ কুঠরিতে, এবং সেখান থেকে নেমে গেল ওরই নিচেকার নিলয় কুঠরিতে। তার পরে হৃদ্‌পিণ্ড যেমনি পাম্প করতে শুরু করলে অমনি তার চাপে ঐ নিলয় থেকে নির্গত এক ধমনী দিয়ে সে রক্ত চলে গেল ফুস্‌ফুসে অক্সিজেন সংগ্রহ করতে, এবং তাজা অক্সিজেনে সমৃদ্ধ হয়ে সে রক্ত আবার ফিরে এলো হৃদ্‌পিণ্ডের বাম অংশের উপরের অলিন্দ কুঠরিতে। ওখান থেকে সেটা নেমে এলো ঐ বাম অংশেরই নিচেকার নিলয় কুঠরিতে। আবার যখন হৃদ্‌পিণ্ড পাম্প শুরু করেছে তখন তার চাপে সেই রক্ত প্রধান ধমনী দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সর্বত্র সঞ্চারিত হতে থাকলো। অবশ্য এখানে একই পাম্পের জোরে হৃদ্‌-পিণ্ডের দুই অংশ দুই রকমের কাজ করছে। ডান দিকের অংশ পাঠাচ্ছে তার ভিতরকার রক্তকে ফুস্‌ফুসের দিকে, আর বাঁ দিকের অংশ পাঠাচ্ছে তার ভিতরকার রক্তকে সাধারণভাবে শরীরের চতুর্দিকে।

কিন্তু তাহ'লে হৃদ্‌পিণ্ড বা হৃদ্‌যন্ত্রকে ঠিক কেমনভাবে তার পাম্প করার প্রক্রিয়াটি সাধন করতে হয়? ওর সংকোচন ক্রিয়ার সময় সমস্ত অংশটাই যে এককালে সংকুচিত হয়ে গেল তা নয়। সংকোচনক্রিয়াটি শুরু হয় প্রথমে উপর দিক থেকে অর্থাৎ অলিন্দের দিক থেকে। প্রথমে অলিন্দ দুটি উপর থেকে নিচের দিকে সংকুচিত হয়ে গেলে তারপরে দুইদিকের নিলয় দুটি সংকুচিত হয়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির নাম হোলো সিস্‌টোল অর্থাৎ চুপসে যাওয়া। এতে এই সুবিধে হয় যে, প্রথমে অলিন্দের রক্তটা সবই নিলয়ের মধ্যে চলে আসে, এবং তার পরেই দুই অংশের নিলয় থেকে তাদের আপন আপন রক্তবহা নল দিয়ে দুই স্বতন্ত্র অংশের রক্ত দুই স্বতন্ত্র দিকে ধাবিত হয়। এই সিস্‌টোল সম্পন্ন হবার অব্যবহিত পরেই ওর সমস্ত পেশী-গুলো হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়, এবং তার ফলে হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতরকার গহ্বর ফাঁপা হয়ে যায়। এই শিথিল এবং ফাঁপা অবস্থার নাম ডায়াস্টোল। ডায়াস্টোলের অবস্থাতেই যত কিছু বাইরের রক্তের ওর মধ্যে এসে ঢোকবার পালা। তখন যথাক্রমে ফুস্‌ফুস-চক্রের ফেরত রক্ত এসে ঢোকে ওর দক্ষিণ অংশে, আর সরবরাহ-চক্রের ফেরত রক্ত এসে ঢোকে বাম অংশে। এর পরেই সামান্য একটু থেমে আবার হোলো সিস্‌টোল শুরু। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে সিস্‌টোল ও ডায়াস্টোলের দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ চলতে থাকে।

এইটুকু হোলো হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি কথা। কিন্তু এর মধ্যে আরো অনেক জটিল ব্যাপার আছে। তার মধ্যে একটা কথা এই যে, অলিন্দের দিক থেকে নিলয়ের দিকে সংকোচন ক্রিয়ার ঢেউটি সঞ্চারিত হতে অল্প একটু বিলম্ব হয়, তার কারণ অলিন্দ-নিলয়ের মাঝখানে কতকগুলি পেশীগুচ্ছের ব্যবধান আছে, তারই মাধ্যমে (হিস্‌ পেশীগুচ্ছ) সেই সংকোচন ক্রিয়াটি ওদিক থেকে এদিকে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এই গুচ্ছগুলি কোনো কারণে বিকল হয়ে গেলে তখন হৃদ্‌পিণ্ড সংকুচিত হলেও সেটা কেবল উপর দিকেই হয়, নিলয় পর্যন্ত তার ঢেউ আসে না, সুতরাং নিচের দিকটা সংকুচিত

হয় না। এই অবস্থাকে বলে হার্ট-ব্লক, এতে মৃত্যুও ঘটতে পারে, যদি সম্পূর্ণ হার্ট-ব্লক হয়। কিন্তু অনেক সময় অসম্পূর্ণ রকমের হলে এটা আবার কাজেও লাগে, যখন হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়া কমিয়ে দিয়ে তখন তাকে একটু বিশ্রাম দেবার দরকার হয়। ডিজিটেলিস প্রভৃতি ঔষধের দ্বারা এ অবস্থাটি কৃত্রিমরূপেও আনতে পারা যায়। দ্বিতীয় কথা, হৃদ্‌পিণ্ডের প্রত্যেক অংশের অলিন্দ-নিলয়ের মাঝখানে যে কপাটিকা আছে, তারও নানারকম বিকৃতি ঘটতে পারে, তার ফলে নিচের দিকের সংকোচনের সময় সেগুলি পুরোপুরি বন্ধ হতে না পারায় সিস্টোল অবস্থাতে খানিকটা রক্ত নিলয় থেকে অলিন্দে ফিরে যেতে পারে। তাতে হৃদ্‌পিণ্ডের পাম্পের কাজটা যথেষ্টই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য হৃদ্‌পিণ্ড সহজে তাও হতে দেয় না, এমন অবস্থায় ওর মাংসপেশী আরো মোটা হয়ে যায় এবং তার দ্বারা পাম্পের জোরটা আরো অনেক বাড়িয়ে দিয়ে ওর ত্রুটি পুষিয়ে নেয়। তবে এমনি করতে করতে হৃদ্‌পিণ্ড এক সময় অত্যন্ত স্ফীত হয়ে উঠতে পারে। তৃতীয় কথা, হৃদ্‌পিণ্ডের নিজস্ব মাংসপেশীগুলিরও স্বতন্ত্র পুষ্টি দরকার, খাদ্যের সরবরাহ পাওয়া তার নিতাই চাই। যে রক্তকে সে অনবরত পাম্প করছে, তার থেকে কোনো খাদ্য সে নিজের জন্যে সংগ্রহ করতেই পারে না। সুতরাং ঐ পেশীগুলিকে রক্ত সরবরাহ করবার জন্যে স্বতন্ত্র রক্তবাহী ধমনী আছে। এই ধমনীগুলি অতি সূক্ষ্ম, এবং এর কোনো বিকৃতি ঘটলে তখন আবার সর্বনাশ উপস্থিত হয়। আর শেষ কথা, লবণ, ক্যালসিয়ম এবং গ্লুকোজ হৃদ্‌পিণ্ডের পুষ্টির পক্ষে বিশেষ দরকার, এইটুকু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

ধমনী ও শিরা

রক্ত সংবহনের নালীপথগুলি স্বভাবতঃই দুই রকমের হওয়া উচিত, কারণ, একরকম নল দিয়ে রক্ত সজোরে হৃদ্‌পিণ্ড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রাপসারীভাবে, আর একরকম নল দিয়ে রক্ত মন্থর গতিতে ফিরে আসছে কেন্দ্রাভিমুখীভাবে। যাবার সময় রক্তের চাপটাও খুব বেশি আর গতিটাও প্রবল, সুতরাং তাকে ধারণ করবার জন্যে রীতিমত মজবুত নলের দরকার। ফিরবার সময় রক্তের চাপও খুব কম আর গতিও মন্দ, সুতরাং একটু নরম গোছের নলই সেখানে দরকার। তাই রক্তবাহী নলগুলি দুই রকম ভাবেই তৈরি। যেগুলি দিয়ে হৃদ্‌পিণ্ড থেকে রক্তস্রোত বাইরে বেরিয়ে যায় সেগুলিকে বলে আর্টারি বা ধমনী, আর যেগুলি দিয়ে রক্তস্রোত ফিরে আসে সেগুলিকে বলে ভেন বা শিরা। তবে ধমনী ও শিরার মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটা নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ আছে, নতুবা ধমনীর রক্ত শিরাতে যাবে কেমন ক'রে? প্রত্যেক ধমনী বহু বহু সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম শাখা প্রশাখায় ভাগ হতে হতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সূক্ষ্মাতিতম একরকম নলীতে পরিণত হয়, তাকে বলে কৈশিক নলী। ঐ ধমনীর কৈশিক থেকে আবার শিরার কৈশিকের উৎপত্তি হয় এবং তার থেকে উৎপত্তি হয় স্ফীত থেকে স্ফীততম শিরায়।

গাছের একটিমাত্র কাণ্ড থেকে যেমন তার শাখা ও সেই থেকে বহু প্রশাখা নির্গত হয়, ঠিক তেমনিভাবে হৃদ্‌পিণ্ডের মূলে আওটা নামক একটিমাত্র মহাধমনী থেকে ক্রমে ক্রমে যাবতীয় শাখা ধমনী ও প্রশাখা ধমনী নির্গত হয়েছে। এই মূল মহাধমনীর উৎপত্তি হয়েছে হৃদ্‌পিণ্ডের বাম অংশের নিচের দিকের নিলয় থেকে। ধমনী মাত্রেরই দেয়াল স্থিতিস্থাপক মজবুত মাংসপেশীর তৈরি, সুতরাং কখনো রক্তশূন্য হলেও সেগুলি চুপসে না গিয়ে ফাঁক হয়ে থাকে। অবশ্য কোনো জীবন্ত প্রাণীর কোনো ধমনী কখনই রক্তশূন্য হয় না, সেগুলি সর্বদা রক্তপূর্ণ হয়ে আছেই, তার উপরে হৃদ্‌পিণ্ডের পাম্প করার চাপে প্রত্যেকবারেই নূতন রক্তের স্রোত তার মধ্যে এসে প্রবেশ করায় ওর স্থিতিস্থাপক দেয়ালগুলি প্রত্যেক বারেই স্ফীত হয়ে ওঠে। কিন্তু ওর ঢেউটা পার হয়ে গেলেই তখনই আবার সে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সুতরাং শরীরের সর্বত্র প্রত্যেকটি ধমনীর প্রত্যেক অংশটাই হৃদ্‌পিণ্ডের পাম্পের চাপের তালে তালে একবার ক'রে লাফিয়ে ওঠার মতো স্ফীত হয়ে উঠছে। এই জিনিসটাই আমরা টের পাই হাত ধরে নাড়ী পরীক্ষা করবার সময়। হাতের কব্জির কাছে ঠিক চামড়ার নিচেই একটি ধমনী আছে, তারই উপরে আঙুলের চাপ দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করা হয়। ঐভাবে পরীক্ষা করলে সেখানে নাড়ীর বেগ অর্থাৎ রক্তের চাপ বেশি আছে না কম আছে তাও আন্দাজ করা যায়, আর নাড়ীর গতি, বা হৃদ্‌স্পন্দনের গতি মিনিটে কতবার ক'রে হচ্ছে তাও নিরূপণ করা যায়। আবার কোনো ধমনী যদি দৈবাৎ কখনো কেটে যায় তাতে দেখা যায় যে, রক্ত সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটছে, কিন্তু তবুও সেটা সমধারায় নয়, হৃদ্‌স্পন্দনের তালে তালে তার বেগ একবার ক'রে একটু বেড়ে উঠছে, আবার একবার ক'রে একটু কমে যাচ্ছে।

শিরাগুলির বেলাতে কিন্তু এমন নয়। কোনো শিরা কেটে গেলে তার রক্ত অমন ফিনকি দিয়ে সবেগে ছোটে না, অনেক রক্তপাত হতে থাকলেও সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং সেটা সমধারাতেই নির্গত হতে থাকে। তার কারণ শিরাগুলির মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের পাম্পের চাপটা ঐভাবে দফায় দফায় সজোরে সদ্য এসে পৌঁছচ্ছে না, কৈশিকের ভিতর দিয়ে পার হয়ে আসবার দরুণ রক্তের স্রোতটা সেখানে সমধারাতে বইছে। আরো এক কথা, শিরার দেয়ালগুলি খুব নরম, কাজেই স্রোতে সেখানে কোনো বাধা জন্মাচ্ছে না। আর তৃতীয় কথা, শিরার মধ্যে জায়গায় জায়গায় কপাটিকার ব্যবস্থা করা আছে, তাতে রক্তকে একদিকেই অগ্রসর হতে বাধ্য হতে হয়। চাপ কোনো সময় কম হলেও রক্তের পিছু হটে আসবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু শিরার রক্তস্রোত এমনিভাবে চলতে থাকলেও সেটা নিতান্তই মন্দগতি নয়। হাতের বা পায়ের কোনো সরু একটি শিরার মধ্যে যদি ইনজেকশনের দ্বারা কোনো ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তার হৃদ্‌পিণ্ডে গিয়ে পৌঁছতে আধ মিনিটের চেয়েও কম সময় লাগে। আমরা শরীরের নানা স্থানে যে নীলবর্ণ আঁকা-বাঁকা শিরগুলি দেখতে পাই সেইগুলিই রক্তশিরা এবং তার মধ্যে মাঝে মাঝে যে উঁচু গাঁঠের মতো দেখা যায় সেগুলি কপাটিকা। শিরার দেয়াল খুব নরম বলে রক্তশূন্য হলেই তা চুপসে যায়। শরীরের মধ্যে অসংখ্য শিরা আছে। কিন্তু সবগুলি মিলে শেষ পর্যন্ত দুটি মহাশিরায় পরিণত হয়ে সেই দুটি হৃদ্‌পিণ্ডের ডানদিকের অলিন্দে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিক নলিকাগুলি হোলো ধমনী ও শিরার মধ্যবর্তী জিনিস। দেহের মধ্যে যেখানে যত ধমনী আছে তার সঙ্গে জোড় মেলানো সেখানে ঠিক ততই শিরা আছে, আর ধমনী মাত্রই যেখানে গিয়ে কৈশিকে শেষ হয়েছে, সেখানে ঐ কৈশিক থেকেই আবার তার সহগামী শিরার উৎপত্তি হয়েছে। কৈশিক নলিকাগুলি সাধারণতঃ

কেবল ঝিল্লীবস্তু দিয়েই তৈরি, ওতে বিশেষ কোনো মাংসপেশীর দেয়াল নেই। ধমনীর কৈশিক সূক্ষ্ম হতে হতে শেষ পর্যন্ত শিরার কৈশিকের সঙ্গে মিশে যায় এবং এইভাবে ওরা পরস্পরে মিলে বহু শাখাপ্রশাখার দ্বারা এক রকমের জালক প্রস্তুত করে। সুতরাং ধমনী বা শিরা যে শেষ পর্যন্ত শরীরের কোষে কোষে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এটা মনে করা উচিত নয়। রক্তস্রোত ধমনী থেকে শিরা পর্যন্ত অব্যাহতই থাকে, কেবল কৈশিক জালকের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবার সময় তার পাতলা দেয়ালের ভিতর দিয়ে রক্তের ভিতরকার সার রসটুকু চুয়ে বেরিয়ে কোষে কোষে গিয়ে উপস্থিত হয়, আবার সেখানকার সেই রসই রক্তের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করে এবং এইভাবে ওর রসের মাধ্যমেই কোষের সঙ্গে রক্তের যা কিছু আদান প্রদান ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই রসেরই মধ্যে শরীরের সমস্ত কোষগুলি সর্বদা সিক্ত হয়ে থাকে। এই রসের নাম লিম্ফ বা লসিকা। এই লিম্ফের দ্বারাই এক তরফের খাদ্যসার ও অক্সিজেন এবং অন্য তরফের আবর্জনা-বস্তুর অনবরত লেন-দেন চলতে থাকে। এই লিম্ফ-রসের পরিমাণ অনেক বেশি, সুতরাং তার অধিকাংশই পুনরায় রক্তস্রোতের মধ্যে এসে ঢুকতে পারে না। সুতরাং একে চালিত করবার জন্যে আবার এক স্বতন্ত্র সংবহন তন্ত্রের দরকার হয়। এর জন্যেও শরীরের সর্বত্র বহুসংখ্যক লিম্ফ্যাটিক নলী আছে, সেগুলি শেষ পর্যন্ত এক বৃহত্তম নলে পরিণত হয়ে সেটা এক মহাশিরার মধ্যে গিয়ে উন্মুক্ত হয় এবং এইভাবেই বেশিরভাগ লিম্ফ অন্য রাস্তায় ঘুরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত রক্তেরই সঙ্গে মিলিত হয়।

কৈশিকগুলি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভতন্ত্রীর দ্বারা জড়িত থাকে। রক্ত সংবহন তন্ত্রের মধ্যে কৈশিকের স্থান খুব সামান্য নয়। রক্ত সংবহনের বেগ কখন কেমন হবে সেটা অনেকটা কৈশিকের অবস্থার উপরেই নির্ভর করে। কারণ কৈশিকগুলি স্ফীত অবস্থায় থাকলে রক্তস্রোত সেখান দিয়ে অনায়াসে প্রবাহিত হতে পারে আর সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকলে রক্তস্রোত তাতে অল্পবিস্তর বাধা পায়। আমাদের গায়ের চামড়ার ঠিক নীচেও কৈশিকের জালক সর্বত্র ছড়ানো আছে এবং তারই দ্বারা বাইরের আবহাওয়া প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের শরীরে অবস্থার একটা সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। গরম লাগলেই সেগুলি স্ফীত হয়ে ওঠে, ঠাণ্ডা লাগলেই সঙ্কুচিত হয়ে যায়। চামড়ার কোথাও সামান্য একটু কেটে গেলেই যে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে, সে রক্ত আসে ঐ কৈশিক থেকে। আমাদের দেহের উপরে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে ঐ কৈশিকের জালক নেই এবং নার্ভের দ্বারা আমাদের মনের ক্রিয়ার সঙ্গেও তার যথেষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। তাই মনে ভয় উপস্থিত হলেই আমাদের মুখের চামড়া সঙ্কুচিত হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, আর লজ্জা বা অনুরাগ উপস্থিত হলেই দেখতে পাওয়া যায় যে মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। এগুলি স্থানীয় কৈশিকের সঙ্কোচন ও স্ফীতির দ্বারাই ঘটে।

কৈশিকের মতো ধমনী ও শিরার গায়ে গায়েও নার্ভতন্ত্রী জড়ানো আছে এবং তার দ্বারা সময়বিশেষে ওগুলিও প্রয়োজন-মতো সঙ্কুচিত এবং স্ফীত হয়ে থাকে। শরীরের কোনো স্থানবিশেষে কোনো কারণে যদি অন্য স্থানের চেয়ে বেশি রক্তের সরবরাহ দরকার হয় তা'হলে সেটা এই-রূপেই ঘটে থাকে। যেমন আহারাদির পরে সেগুলির সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার জন্যে পেটের মধ্যে তখন বেশি রক্ত যাওয়া দরকার, তাই ওখানকার ধমনীগুলি তখন স্ফীত হয়ে ওখানে বেশি পরিমাণ রক্ত টেনে নেয়, তাতে অন্য জায়গার রক্তের পরিমাণটা সাময়িকভাবে কমে যায়। এটা আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি শীতকালে আহারাদি করবার পরে। খেয়ে উঠলেই তখন দেখা যায় অন্য সময়ের চেয়ে বেশি শৈত্য অনুভব হচ্ছে। তার কারণ তখন বাইরের দিকে শরীরকে গরম রাখবার জন্যে প্রচুর রক্ত নেই। আবার মাথায় কোনো দুর্ভাবনা ঢুকলে, কিংবা হঠাৎ কোনো একটা শক্ পেলে বা মানসিক আঘাত পেলে আমাদের মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যায়, অনেকে ওতে হঠাৎ অজ্ঞানও হয়ে যায়। তখন বুঝতে হবে যে মস্তিষ্কে কম রক্ত যাচ্ছে বলেই ওটা ঘটেছে এবং মস্তিষ্কের ধমনীর নার্ভতন্ত্রী-গুলি উত্তেজনার দ্বারা তাকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে বলেই মস্তিষ্কের ঐ সাময়িক রক্তহীনতা এসেছে। এই বুঝে তখন আমাদের মস্তিষ্কের দিকটা যথাসম্ভব নীচু করেই রাখা উচিত, যাতে কিছু বেশি পরিমাণ রক্ত সেইদিকে গড়িয়ে গিয়ে দোষটা কতক কাটিয়ে দিতে পারে।

আমরা আজকাল প্রায়ই রক্তচাপ বৃদ্ধি নামক রোগের কথা শুনতে পাই। এটা কতকটা হৃদ্‌পিণ্ডের দোষেও হতে পারে, আবার কতকটা ধমনী ও শিরার দোষেও হতে পারে। ধমনীগাত্রের মাংসপেশীগুলি যতক্ষণ স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপক অবস্থায় থাকে ততক্ষণ রক্তচাপ সহজে বেশি বাড়ে না। কিন্তু ওর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হলেই তখন সেগুলি বেশিরকম কঠিন হয়ে পড়ে, হৃদ্‌পিণ্ডের পাম্পের স্রোত আসবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি উপযুক্তরূপে স্ফীত হতে পারে না, কাজেই তার দ্বারা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রকম বাধা পেয়ে রক্তের চাপটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এর ফলে অনিষ্টও হতে পারে এবং অত্যধিক চাপে কঠিন ধমনীগাত্র বা শিরাগাত্র হঠাৎ কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে ফেটেও যেতে পারে। অবশ্য সহজে এটা হয় না, কারণ একদিক থেকে হৃদ্‌যন্ত্র আর অন্যদিক থেকে ধমনী ও শিরাগুলি প্রায়ই এর একটা সামঞ্জস্য করে নিয়ে কাজ চালায়। একজন পরিণতিপ্রাপ্ত সুস্থ মানুষের রক্তের চাপ সাধারণতঃ ১১০ থেকে ১২০ মিলিমিটার (পরিমাপ যন্ত্রের পারদ নির্দেশ অনুযায়ী) পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটু বাড়ে। সাধারণতঃ এই কথা বলা হয়ে থাকে যে, ১৫০ মিলি-মিটারের বেশি রক্তচাপ হওয়া উচিত নয়, কিন্তু কারো স্বাভাবিক রক্তচাপই প্রথম থেকে বেশি থাকতে পারে সুতরাং কার পক্ষে কতটা হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে সঠিক নির্দেশ দেওয়া যায় না। বিভিন্ন অবস্থাতে রক্তচাপ আবার স্বাভাবিকের চেয়ে কমেও যেতে পারে। কোনো শক্ পেলে (যেমন আগুনে পোড়া, জলে ডোবা প্রভৃতির পরে) কিংবা শরীর থেকে রক্তক্ষয় হলে রক্তচাপ অনেক কমে যায় এবং তখন গ্লুকোজ ও সেলাইন প্রভৃতি ইনজেকশন দেবার দরকার হয়। রক্তচাপ যে বরাবর একভাবেই থাকবে এমন কোনো কথা নেই, অবস্থার তারতম্যে তার অল্পবিস্তর তারতম্য হবেই। পরিশ্রমের সময় রক্তচাপ বেড়ে যাবে, বিশ্রামের সময় একটু কমে যাবে। খুব উঁচু পাহাড়ে উঠলে রক্তচাপ বেড়ে যাবে, নীচু জায়গাতে নেমে এলে কমে যাবে। সুতরাং রক্তচাপের ইতরবিশেষ হওয়া স্বাভাবিক।

পারস্যের তৈল

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সম্পদ তৈল। এই তৈলকে কেন্দ্র করেই মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি। চেস্ জাতীয় ব্যাঙ্কের পেট্রোলিয়ম দপ্তর যে জরীপ করেছেন তা থেকে জানা যায় ১৯৫০ সালের শেষে পৃথিবীর ভূগর্ভে যে তৈল সঞ্চিত থাকবে তার পরিমাণ হবে প্রায় ৮৬০০০০ লক্ষ পিপা (৭ পিপা=১ টন)। এই সঞ্চিত তৈলের শতকরা ৪৫·৩ ভাগ রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে আর ৪৬·২ ভাগ আছে পশ্চিম গোলার্ধে। দেশ হিসাবে আছে পারস্য উপসাগরস্থ কুয়াইত রাজ্যে ১১০০০০ লক্ষ পিপা অর্থাৎ প্রায় ১২·৮ ভাগ; সৌদী আরবে আছে ১০০০০ লক্ষ পিপা; ভেনেজুয়েলায় আছে ৯,০০০ লক্ষ পিপা; ইরাণে ৯,৫০০০ লক্ষ পিপা; ইরাকে ৭০০০ লক্ষ পিপা; আর রুশে ৫,৫০০০ লক্ষ পিপা। পৃথিবীর বাকী অশোধিত সঞ্চিত তৈল রয়েছে মার্কিন কানাডা এবং অন্যান্য পশ্চিম গোলার্ধের দেশসমূহে, দূরপ্রাচ্যে ও ইউরোপে। খনিজ তৈলে মধ্যপ্রাচ্য যখন এত সম্পদশালী তখন এর রাজনীতি যে তৈলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম দেশ পারস্য। তার তৈল সম্পদও অফুরন্ত। কিন্তু সে সম্পদে সম্পদশালী হয়েও পারস্য তার প্রধান সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। কেন পারেনি, কেনই বা পারস্যের তৈল নিয়ে বিশ্ব সংকট সৃষ্টি হতে চলেছে সংক্ষেপে তাই আলোচনা করব।

প্রধানত চারিটি মুখ্য তৈল ক্ষেত্র থেকে পারস্যে তৈল উত্তোলিত হয়। এই তৈল ক্ষেত্র আবাদানের ১৬০ মাইল উত্তর হতে ১৬৫ মাইল পূর্বে বিস্তীর্ণ। আবাদান হচ্ছে প্রধান তৈল সংশোধন ক্ষেত্র। বিশ্বের তৈল উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে ইরাণ হচ্ছে চতুর্থ।

বর্তমানে আগা জারি তৈল ক্ষেত্র থেকেই সবচেয়ে বেশী তৈল উত্তোলিত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রটিতে মাত্র ১৯৪৩ সাল থেকে কাজ আরম্ভ হয়েছে। এর পরে হল হাফট্ কেল। অপর দুটি প্রধান তৈল ক্ষেত্র হচ্ছে মসজিদ-ই-সুলেমান আর গক্ সারণ। নফ্‌ট্ সফিদ ও লালি-তেও দুটি তৈল ক্ষেত্র রয়েছে। ঐ দুটি স্থানে যদিও এখন পর্যন্ত তৈল পাওয়া যায় না, তবে আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতে এ দুটোও প্রধান তৈল উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হবে। এই তৈল ক্ষেত্রগুলি দক্ষিণ পারস্যের পারস্য উপসাগরের শীর্ষে অবস্থিত। এগুলি ছাড়াও উত্তর পারস্যে, বিশেষ করে আজারবাইজান, গুইলন, মাজানডেরান প্রভৃতি জেলায় দক্ষিণ পারস্যের মত পেট্রোলিয়ম আছে বলে হদিস পাওয়া যাচ্ছে।

হাফ্‌ট্ কেল, আগা জারি, গক্ সারণ, মুসজিদ-ই-সুলেমান প্রভৃতি তৈল ক্ষেত্রে ৩০০০ হতে ৪০০০ হাজার ফিট গভীর থেকেই তৈল তোলা হয়। ইরাণে প্রতিদিন ৩ লক্ষ পিপা করে তৈল উৎপন্ন হয়। তবে কোন কোন কূপের ১০০০০ ফিট গভীর থেকেও তৈল তোলা হয়েছে বলে জানা গেছে। পর্বতসংকুল প্রান্তরে অবস্থিত তৈলকূপ থেকে তৈল উত্তোলন করে পাইপ দিয়ে আবাদানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১০০ থেকে ১৫০ মাইল দীর্ঘ এই পাইপ লাইনগুলি বিভিন্ন পার্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করে মরুপ্রান্তর অবস্থিত আবাদানের সঙ্গে তৈল ক্ষেত্রের সংযোগ সাধন করেছে। পূর্বে এই পাইপগুলি ছিল ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি চওড়া জোড়া দেওয়া পাইপ। বর্তমানে এগুলি হচ্ছে ১০ ইঞ্চি চওড়া এবং পিটিয়ে সংযুক্ত করা পাইপ।

পূর্বেই বলা হয়েছে দক্ষিণে তৈল সংশোধন করা হয় আবাদানে। উত্তরে তৈল সংশোধিত করা হয় কারমানসাহ নামক এক স্থানে। এ জায়গাটি অবস্থিত ইরাক সীমান্তে। আবাদান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তৈল সংশোধনাগার। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মোহনায় সাত-এল-আরবে অবস্থিত আবাদান একটি দ্বীপ। বৎসরে প্রায় ২৫০ লক্ষ টন তৈল সংশোধন করার ক্ষমতা এর রয়েছে। আর কারমেনসাহতে বৎসরে সংশোধন করা সম্ভব ১ লক্ষ টন। যুদ্ধের পূর্বে প্রায় ১০০০০০০০ টন তৈল আবাদান সংশোধনাগার থেকে চালান গিয়েছে।

যাদের চেষ্টায় এবং যত্নে আজ পারস্যের তৈল শিল্পের এত উন্নতি হয়েছে, যারা 'তরল কালো সোনাকে' মাটির তলা থেকে
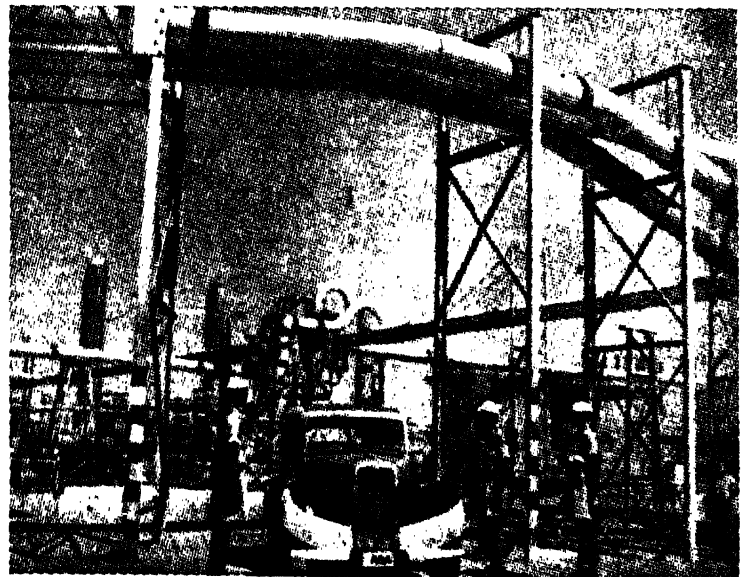
তৈল সংশোধনাগারে পাহারারত সৈনিক একটি মোটর গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে

আবাদানের সর্ববৃহৎ তৈল সংশোধনাগার

যুক্ত করে বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং যাদের সঙ্গে আজ পারস্য সরকারের বিরোধ তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে সেই ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীর কথা এবং কি করে তারা পারস্যের তৈল শিল্পের একচেটিয়া অধিকার পেল তার কথা এবার আলোচনা করব।

পারস্যে তৈল আছে একথা সেখানকার লোকে বিশ্বাস করত কারণ 'জ্বলন্ত জল' তারা অনেকেই দেখেছিল। কিন্তু তাকে ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করবার মত অর্থ বা সামর্থ্য তাদের না থাকায় তা অবহেলিত অবস্থাতেই পড়েছিল। এমনভাবে কিছুদিন চলার পর মুজাফরুদ্দিন শাহ এই 'প্রোথিত মহাসম্পদ'কে উদ্ধার সাধনের জন্য উইলিয়ম নক্স দা'আর্কি নামক জনৈক ইংরেজকে ১৯০১ সালের মে মাসে ৬০ বৎসরের জন্য এক ইজারা-স্বত্ব লিখে দিলেন। দক্ষিণ পারস্যে প্রায় ৪০০০০০ বর্গ মাইল স্থানে (পরে এই পরিমাণ হ্রাস করা হয়) অনুসন্ধান কার্য চালাবার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হল। এই অধিকার লাভ করে দা'আর্কি সাহেব বর্মা অয়েল কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে অনুসন্ধান কার্য চালাতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও 'তরল সোনার' সন্ধান মিলল না। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। অনুসন্ধান কার্য বন্ধ করে দেবার জন্যে তাঁরা 'কেবল'ও পাঠালেন। তখন সেই নিষেধাজ্ঞা মানলে আজকের ঘটনাচক্র হয়ত অন্যভাবে আবর্তিত হত। যা হোক, সকল প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হোল। পুরাতন পার্থিয়ান ধর্মমন্দির মসজিদ-ই-সুলেমানের নিকটে ১১০০ ফিট মাটির নীচে ১৯০৮ সালের ২৬শে মে তৈলের সন্ধান পাওয়া গেল।

এই তৈল খনির উন্নতি সাধনার্থে অর্থ সরবরাহের সুবিধার জন্য পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯০৯ সালে লণ্ডনে ইঙ্গ-পারসিক তৈল কোম্পানী গঠিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত হল। পরে এই কোম্পানীরই পরিবর্তিত নামকরণ হল ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানী এবং এ'রাই আজ পারস্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের একচ্ছত্র অধিকারী। শুধু পারস্য কেন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে যতগুলো তৈল কোম্পানী তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে তৈল কারবারে নিযুক্ত আছে তাদের সবার সঙ্গেই এই কোম্পানী যুক্ত রয়েছে।

এই কোম্পানীতে বর্তমানে বৃটিশ সরকারের প্রচুর স্বার্থ রয়েছে। কারণ মোট ২০১৩৭৫০০ পাউণ্ডের সাধারণ শেয়ারের মধ্যে বৃটিশ সরকার ১১২৫০০০০ পাউণ্ড সাধারণ শেয়ারের মালিক। প্রেফারেন্স শেয়ারগুলিরও বেশ মোটা অংশের মালিক সে। হিসাবে দেখা গেছে কোম্পানীর শেয়ারের শতকরা ৫৫·৯ ভাগ হচ্ছে বৃটিশের, শতকরা ২৬·৩০ ভাগ হচ্ছে বর্মা অয়েল কোম্পানীর এবং শতকরা ১৭·৮ ভাগ হচ্ছে অন্যান্য কয়েকজন ব্যক্তির। সি এস গুলবেনকিয়া নামক জনৈক আমেরিকানের, বর্তমানে তিনি বৃটিশ প্রজা, ঐ কোম্পানীতে শতকরা ৫ ভাগ শেয়ার রয়েছে। তিনি আজ পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম। বর্তমানে তিনি লিসবনে বসবাস করছেন।

বৃটিশ বণিক সরকার জানে কখন কোথায় কোন শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। সে সুযোগ বুঝেই প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে ইরাণের তৈল শিল্পে। বৃটিশ সরকারের হাতে কোম্পানীর বেশীর ভাগ শেয়ার এসে পড়ে ১৯১৪

সালে। তখন উইনস্টন চার্চিল বৃটিশ নৌ-দপ্তরের কর্তা। তিনি উপলব্ধি করেন যে, পৃথিবীর মোট তৈল উৎপাদনের ৬ ভাগ রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। সুতরাং এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে পারলে তৈল ব্যাপারে রাজকীয় নৌবহরের ভবিষ্যতে কোন অসুবিধায় আর পড়তে হবে না। তাই তিনি জ্বালানী তৈল সরবরাহের জন্য কোম্পানীর সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার কোম্পানীতে ২০ লক্ষ পাউন্ড নিয়োগ করে ফেললেন। এমনি করে কোম্পানীর মোট শেয়ারের প্রধান অংশ তার হস্তগত হয়ে পড়ল।

যা হোক, তৈল কোম্পানী গঠনের পরে তৈল উত্তোলনের কাজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। হিসাবে দেখা যায়, কোম্পানী ১৯১২ সালে তৈল উত্তোলন করে ৪৩০৮৪ টন, ১৯১৩-১৪ সালে ২৩৩৯৬২ টন, ১৯২৩-২৪ সালে ৩৭১৪১০৯। পনের বৎসর পরে ১৯৩৯ সালে ৯৫৮৩২৮৫ টন, ১৯৪৩ সালে ৯৭০৫৭৬৯ টন, ১৯৪৭ সালে ২০১৯৪৮৩৮ টন, ১৯৪৯ সালে ২৬৮০৭০০০ টন এবং ১৯৫০ সালে ৩১৭৫০০০০ টন। ১৯৪৩-৪৪ সালে এই কোম্পানী প্রায় ৮৪৩৬০৪৭ টন তৈল বিদেশে রপ্তানী করে।

কোম্পানীর অধীনে দক্ষিণ পশ্চিম পারস্যের বিশেষ করে আবাদানের যে উন্নতি হয়েছে তা অত্যাশ্চর্য। যে স্থান ছিল পতিত অবহেলিত—তা আজ প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ একটি আধুনিক নগর। অবশ্য তৈলশিল্পের উন্নতির জন্যেই এই অভাবনীয় পরিবর্তন সম্ভবপর হয়েছে। আবাদান ও তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানের লোকসংখ্যা হবে প্রায় ১৭৩০০০ লক্ষ। এখানে ২১টি স্কুল ও ৬টি কিন্ডারগার্ডেন স্কুল রয়েছে। স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতির জন্য ও অধিবাসীদের সুখ সুবিধার জন্য কোম্পানী প্রচুর পয়সাই বৎসরে বৎসরে ব্যয় করে থাকেন। কোম্পানীতে প্রায় ৭৯৫০০ জন কর্মী নিযুক্ত আছেন। এর মধ্যে মাত্র ৪৫০০ জন অ-পারসিক আর সবাই পারস্যবাসী।

ইংগ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানী কি ভাবে নানা চুক্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে কায়েম করে নিয়েছে এবার তা আলোচনা করা থাক।

দা'আর্কিকে যে সব সর্তে তৈল আবিষ্কারের সুযোগ দেয়া হয়েছিল তাতে পরবর্তী ইরাণ সরকারের আপত্তি ছিল। কারণ তাঁরা মনে করেন যে তদানীন্তন শাহ্ দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থের দিকে বেশী লক্ষ্য রেখে ঐ সুবিধা দান করেছিলেন। তাই পরবর্তী ইরাণ সরকার তা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করেন। যে সর্ত তাঁরা তখন দেন তা কোম্পানীর স্বার্থের অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও প্রথমত তারা তা গ্রহণ করতে চায় নি। পরে ১৯২০ সনের ডিসেম্বর মাসে একটা নূতন চুক্তি হয় সত্য কিন্তু সরকার পরিবর্তন হওয়ার ফলে সেই চুক্তি পরিষদ গ্রহণ করতে রাজী হয় না। ১৯২৮ সালে সরকার পক্ষ থেকে আবার নূতন প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য পরের বছর কোম্পানীর চেয়ারম্যান সর জন ক্যাডম্যান তেহেরাণে এলেন। সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলতে থাকল কিন্তু ১৯৩১ সালের রয়্যালটি হিসাবে যে অর্থ দেবার প্রস্তাব কোম্পানী করল দেখা গেল তা ১৯৩০ সালে যে রয়্যালটি দেওয়া হয়েছে তার এক চতুর্থাংশ মাত্র। ব্যাপার দেখে তদানীন্তন শাহ্ এবং তাঁর সরকার ১৯৩২ সালের ২৭শে নবেম্বর কোম্পানীকে প্রদত্ত সমস্ত সুবিধা প্রত্যাহারের নোটিশ দিলেন। কোম্পানীর দেয় রয়্যালটির হার, চাকুরিতে পারস্যের নাগরিককে নিয়োগের হার, ও হিসাবে গোলযোগের বিরুদ্ধে পারস্য সরকারের অভিযোগ ছিল। সুবিধা প্রত্যাহার সম্পর্কে নোটিশ দেওয়া হলেও নূতন শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে পারস্য সরকার রাজী আছেন বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কোম্পানী তাতে রাজী হল না। ব্রিটিশ সরকার ভয় দেখিয়ে পারস্য সরকারকে এক পত্র দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পারস্য উপসাগরে ব্রিটিশ নৌবহরও পাঠালেন। কিন্তু পারস্য ভয় পেলো না। ইংরেজ সরকারকে বাধ্য হয়ে ব্যাপারটা রাষ্ট্র-পুঞ্জ পরিষদে উপস্থিত করতে হল শান্তি-পূর্ণ মীমাংসার জন্য। কিন্তু পারস্য সরকার বললেন, এটা তাঁদের ঘরোয়া ব্যাপার, ব্রিটিশ সরকার বা রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের এখানে কিছু করার নেই। যাক্, পরে দুপক্ষের সুরই কিঞ্চিৎ নরম হয়ে আসে এবং আলাপ আলোচনা দ্বারা একটা সন্ধিও হয়ে যায়। ১৯৩৩ সালের মে মাসে ৬০ বৎসরের জন কোম্পানীকে আবার নূতন সুবিধা দান করা হয়।

এই চুক্তির ফলে ইরাণ সরকার কোম্পানীর মোট লাভের শতকরা ১৬ ভাগের পরিবর্তে বাৎসরিক মোট একটা অর্থ পাবে যা অর্ডিনারী শেয়ারের ডিভিডেন্ডের শতকরা ২০ ভাগের সমান।
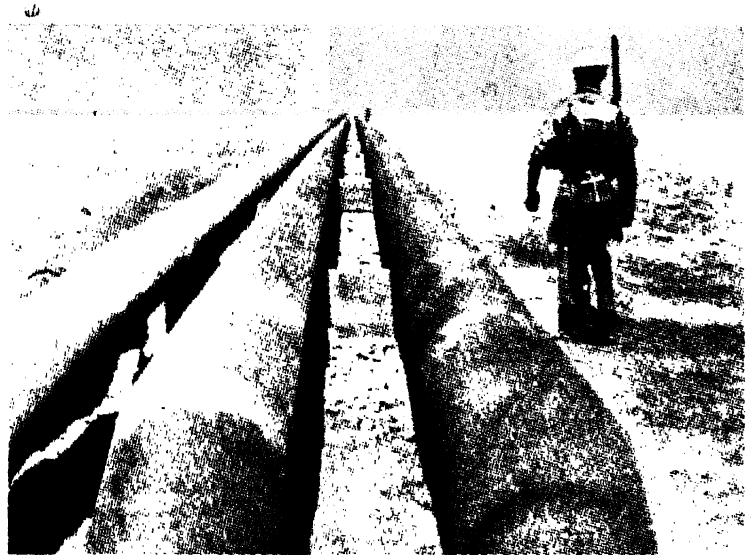
তৈলবাহী সুদীর্ঘ পাইপ লাইন

তাছাড়া অন্যান্যভাবে সরকার কোম্পানীর কাছ থেকে বাৎসরিক যে অর্থ পাবে তা ১০৫০০০ পাউন্ডের কম হতে পারবে না। এই চুক্তির ফলে পূর্বের পাওনা বাবদ ১০০০০০০ পাউন্ড দিয়ে দেওয়া হয়। এই চুক্তিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, "এই তৈল-সুবিধা রদ করা যাবে না (পারস্য সরকার কর্তৃক) অথবা এর শর্তাদি ভবিষ্যতে বিশেষ বা সাধারণভাবে আইন করে অথবা শাসন বিভাগীয় ব্যবস্থা হিসাবে অথবা শাসন• কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তন করা যাবে না।" ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এই সুবিধা বর্তমান থাকবে তারপর কোম্পানীর সমস্ত সংগঠন—তার যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর ইত্যাদি পারস্য সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। ১৯৪৯ সালের ১৭ই জুলাই পারস্য সরকার ও কোম্পানীর মধ্যে একটি অতিরিক্ত চুক্তি হয় কিন্তু তা কখনও অনুমোদিত হয় নি। এই চুক্তিতে—(১) ১৯৪৮ সাল থেকে টন প্রতি রয়্যালটির হার ৪ শিলিং থেকে ৬ শিলিং বৃদ্ধি; (২) ১৯৪৮ সাল থেকে পারস্যের দেয় কর টন প্রতি ১ শিলিং করে বৃদ্ধি; (৩) পাওনা অর্থের শতকরা ২০ ভাগ অবিলম্বে সরকারকে পরিশোধ। এই নূতন চুক্তি প্রত্যাহৃত না হলে ১৯৪৮ সালের তুলনায় পারস্য সরকার ১৯৪৯ সালে দ্বিগুণ অর্থ পেতেন। যা হোক, ঐ চুক্তি বাতিল করা সত্ত্বেও সম্প্রতি রয়্যালটি হিসাবে কোম্পানী পারস্য সরকারকে যে হারে অর্থ দিতে চেয়েছে তাতে সরকার ১৯৫১ সালে পেত প্রায় ২৮৫০০০০০ পাউন্ড।

ঐ চুক্তির প্রত্যাহারের পর কোম্পানীর সঙ্গে সরকারের বিরোধ তীব্রতর হয়। জাতীয়তাবাদী জনসাধারণ তৈল শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের জন্য চাপ দিতে থাকে। তারা বলে যে বিদেশী শক্তি অযথা দেশের কোষাগারকে ফাঁকি দিচ্ছে। ইরাণের তৈল কমিশন রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সুপারিশ করেন। তৈল শিল্প পরিচালনার ক্ষমতা ইরাণের নাই বলে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিরোধিতা করায় জেনারেল রাজমারা প্রাণ দিয়েছেন ধর্মান্ধ একটি গুপ্ত দলের আততায়ীর হাতে। এর পরেই পারস্যের দুইটি পরিষদ কর্তৃকই তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। শাহ প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। একটি তৈল বোর্ড গঠিত হয়েছে। ইরাণ সরকার বিদেশ থেকে তৈল বিশেষজ্ঞ আনাচ্ছেন। ছয় দিনের মধ্যে তৈল কারখানা হস্তান্তর করার নোটিশ দিয়েছে ইরাণ সরকার। ইংরেজ ও পারস্যের মধ্যে স্নায়ুর যুদ্ধ শেষ অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। ইংরেজ ব্যাপারটা সালিশীর হাতে দিতে চেয়েছে; কিন্তু ইরাণ রাজি হয়নি। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য মার্কিন রাষ্ট্র হুকুম দিয়েছে; কিন্তু তাতেও কিছু হয়নি। অবস্থা সঙ্গীণ। কি হবে এখনও বলা কষ্টকর। শেষ পর্যন্ত আবার নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না ১৯৩৩ সালের ঘটনারই পনরাবৃত্তি হবে তা আজও বলা সম্ভব নয়। তবে ১৯৩৩ সালের বিরোধে রুশিয়া চিত্রে স্থান পায় নি এবার রুশিয়াও সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছে। তার সঙ্গে যে চুক্তি আছে তাতে পারস্যকে সাহায্য করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করা তার পক্ষে সহজ। সুতরাং ইংরেজকে এবার বিশেষ করে ভাবতে হচ্ছে যদিও সে প্যারা সৈন্য প্রস্তুত রাখছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পারস্য সরকার তাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, ভয় দেখিয়ে তাকে বশ করার দিন আর নেই।

এই দ্বন্দ্বে অন্য একটি পক্ষও রয়েছে। সে আমেরিকা। এতদিন সে গোপনে কল-কাঠি নেড়েছিল আজ প্রকাশ্যেই দ্বন্দ্ব মিটাবার নামে এগিয়ে এসেছে। ফলে ব্যাপারটা ঘোরালোই হয়ে উঠেছে।

কোম্পানীর সঙ্গে পারস্য সরকারের যে আলাপ আলোচনা না চলছে তা নয়। শোনা যাচ্ছে ইংগ-ইরাণীয় কোম্পানী সরকারকে যে নূতন সর্ত দিয়েছেন তাতে মোট লাভের আধাআধি বখরায় তারা কাজ করতে ইচ্ছুক বলে জানিয়েছে। অবশ্য এ সম্পর্কে সরকারের অভিমত এখনও জানা যায় নি। পারস্য সরকার কোন অদৃশ্য সুতার টানে কি করবে, কোথাকার জল কোথায় গড়াবে, জোর করে এখনও কিছু বলা যায় না। তবে ইংরেজ সরকার সহজে ইরাণের তৈল শিল্প হাতছাড়া করবে না এ জোর করেই বলা যায়। কারণ এখানে কেবলমাত্র যে তার মর্যাদার প্রশ্ন কেবল তা নয়—তার অন্নের প্রশ্নও জড়িত। এই কোম্পানী হস্তচ্যুত হলে ইংরেজের রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে।

মরু দুপুরের গান

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

দুপুরে যদি রোদের চিতা জ্বলে—
দেবে কি সাড়া? প্রাণের পল্বলে
স্বচ্ছ জলে মিটাতে চাও তৃষ্ণা?
ঝর্ণা মনে মনেই ছিলো সুপ্ত
পাথর ভেঙে হল কি উন্মুক্ত!
দুপুর রোদ মাথায় করে এসেছ তুমি কৃষ্ণা।

এসেছ তুমি, এসেছ তুমি এনেছ একী লগ্ন;
দুপুরে শাদা মেঘের পাল—তোমার কটিলগ্ন
একটু ছায়া, একটু হাওয়া, নদীর তটে জলের তাল।

মধ্যদিন ধুলোর জালে
অন্ধ আজ, হয়তো কাল
ঝরা পাতার হাহাকারেই মাতে একাকী বৈশাখী
এখানে তুমি, এখানে তুমি,
দোলাবে যদি মনের ভূমি
এ-সাবধান কাল-কে তুমি কী করে দেবে ফাঁকি?

এখানে মাঠ, ক্লান্ত মাঠ হৃদয়ে জ্বলে; দগ্ধ
এ কোন্ মরুচারী হাওয়া ছড়ালো নৈঃশব্দ্য;
(গ্রীষ্মজয়ী বর্ষা, হায়!)
অগ্নি নিশ্বাসেই যার,
সেখানে ছায়া? হে অশনায়া, কী করে দেবে সে উপহার?

সত্যি ভ্রমণকাহিনী

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

[পূর্বানুবৃত্তি]

পারি শহরটার একটা ব্যক্তিত্ব আছে। যে আসে, সেই এর আওতায় পড়ে যায়। 'পারি' বলে একটা ফরাসী কথা আছে, যার মানে বাজি রাখা। এখানকার হাওয়া-বাতাসে মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার তাগাদা। এ পাওনাদারের হাত থেকে যদি রেহাই পাওয়া যায়, তবে আর প্যারিস প্যারিস কিসের! এত সূক্ষ্ম এর আবেদন যে, নিজে টের পাবার আগেই মনটা যুধিষ্ঠিরের চাইতে বেপরোয়াভাবে সব লুটিয়ে দেবার বাজি ধরে বসে থাকে।

প্রেমপাগল শহরটা লেখকের মনেও তার পরশ বুলিয়েছে। নইলে কি আর সে সকালে ক্লাসে যাওয়া ছেড়েছে, দুপুরে বির্বলিওতেক-নাসিওনেল-এ যাওয়া বন্ধ করেছে। সাঁঝের পর যে ফটোগ্রাফার ভদ্রমহিলাকে ইংরেজি পড়াতো, সেখানেও যাওয়া হয়নি অনেকদিন থেকে। না যাবার সমর্থনে অনেক কথা সে ঠিক করে নিয়েছে মনে মনে—ফরাসী কথা-বার্তা শিখবার জন্যই ছিল সেখানে যাওয়া—এখন একরকম চলনসই ফরাসী বলতে শিখে গিয়েছে—তবে আর সেখানে যাওয়ার দরকার কি? সে ভদ্রমহিলা কথা বললেই চিউয়িং-গামের গন্ধ বার হত—বড় খারাপ লাগত মিন্টের গন্ধটা। ......আর যেতে পারবে না সে কথাটা পরিষ্কার করে বলা হয়নি তাঁকে। ভদ্রমহিলা সে কথা না তুললেও পথে-ঘাটে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে লজ্জা লজ্জা করে। থাকবার মধ্যে আছে কেবল এক, বেশি রাতের রুশ ভাষার ক্লাসটা। ভাল না লাগলেও সেখানে যেতে হয়, কেননা, রুশ দেশ দেখতে যাবার উৎসাহের রেশ এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি মন থেকে।

নূতন নূতন পরিচয়ের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার নেশা কেটেছে। যত পরিচয় বাড়াবে, ততই খরচ বাড়বে। অনেক লোককে ভাসাভাসাভাবে জানার চেয়ে অল্প দুই-একজন লোকের অন্তরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেলে কোন জাতিকে ভালভাবে চিনতে পারা যায়। তাছাড়া সে এসেছে মানুষের উপর বিশ্বাস বাড়াতে—অন্তরঙ্গ পরিচয় বিনা এটা কি সম্ভব? ......না এ শেষের যুক্তিটা মনের মত হল না। ......কথাটাকে ঘষেমেজে নিজে মেনে নেওয়ার মত করে নিতে আরও কিছু সময় লাগবে।

হিন্দীজ্ঞানা মুস্যিয়ো ফিলিবারকে লেখক এড়িয়ে চলা আরম্ভ করেছে; সে বড় বেশি বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ান শুরু করেছিল। বোধ হয় সে ভারতবর্ষে যেতে চায় একবার; সেই সময় লেখকের সাহায্য তাঁর দরকার হতে পারে ভেবেই এত আদর। অন্তত লেখকের তাই ধারণা—কারণ সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাশীতে সংস্কৃত পড়বার কথাটা তোলে। তাঁর বুড়ী মা-ও খাওয়ার টেবিলে একথা তুলেছেন। খুব নিজের রান্নার গর্ব বুড়ীর। প্রত্যেকটা ডিশ দেবার পর উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেন, রান্না খুব ভাল হয়েছে, সেই কথাটা শোনবার জন্য। বড় ভালমানুষ। রসিকতা করবার চেষ্টা করে বলেন, ইংরেজদের মধ্যে খাওয়ার গল্প করা কেন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলুন ত মুস্যিয়ো? তারপর লেখকের অজ্ঞতা নিরসনকল্পে জানান, "তাঁদের রান্না খারাপ, সেই জন্য। খারাপ জিনিসের গল্প কি ভদ্রসমাজে করতে আছে? এই বাঁধা রসিকতাটা দ্বিতীয় দিন করবার সময় বোধ হয় তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, আগেও একদিন লেখকের সম্মুখে এই গল্পটাই বলেছেন। বুড়ো মানুষদের এসব ভুল না হওয়াটাই আশ্চর্য। তবে হ্যাঁ, একথাও ঠিক যে, বুড়ো মানুষদের গল্পের শ্রোতা কেউ ইচ্ছে করে হতে চায় না।

যাক! মুস্যিয়ো দেবরায় আর আসেননি দেখা করতে সে একটা বাঁচোয়া! হয়ত হোটেলের নীচের তলা থেকেই অ্যানি কিংবা হোটেলওয়ালি তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। হয়ত তিনি বুঝেছেন যে, লেখক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায় না। বুঝুন গিয়ে।

আজকাল দিনে বেরোনো আর হয়ে ওঠে না। বেরোয় সন্ধ্যায় পর। কনকনে হাওয়া ভরা শীতের নোটিশ দিচ্ছে। পথের প্লেন গাছগুলোর পাতা ঝরলেও এখনও শুকনো কদম ফুলের মত ফলগুলো হাওয়ায় দোলে—মধ্যে মধ্যে পথচারীদের মাথায় গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কবি Verlaine যতই এই বাতাসকে 'অটাম্নের বেহালা' বলুন, এ-বেহালা শোনার আনন্দের চেয়ে অ্যানির গল্প অনেক মিষ্টি। এই বেহালার কনকনানিতে নাকে অনবরত জল আসে, চোখের চশমা ঝাপসা হয়ে যায়, আঙুলের দিকের মোজাটা ভিজে ওঠে, ওভারকোটের তোলা কলারের ঘষটানি লেগে কানের ছাল উঠে যায়। রুশ ভাষার ক্লাসে যাবার সময় রোজ এই অসুবিধাগুলোর কথা না ভেবে উপায় নেই। এই সময়টায় প্রত্যহ তাঁর মনে পড়ে যে, আজও বাড়িতে চিঠি দেওয়া হল না—আজ রাতে শোবার আগে নিশ্চয়ই চিঠি লিখে রাখবে। আগে ত তার এমন হত না; প্রতি শনিবারে সে নিয়মিত বাড়িতে চিঠি দিয়ে এসেছে এতকাল। বিদেশে কিছুকাল থাকবার পর সকলেরই বোধ হয় এমন হয়। অভ্যাস কিছুটা বদলাতে বাধ্য। কোটের পকেটে হাত না দিয়ে, প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়ানোটা কবে থেকে তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, তা কি সে জানে? দেশে থাকতে একদিন স্নান না করলে শরীর আনচান করত—শীতকালেও। আর আজকাল? বোধ হয় শীত পড়েছে বলে। সপ্তাহান্তে যেদিন স্নানের দোকানে যায়, সেদিনও 'শাওয়ার'এর টিকিট কেনে না, মার্গটকে এড়ানোর জন্য। তবু একদিন হাসিখুশি মার্গটের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় সে আঙুল নেড়ে অভিবাদন জানিয়েছিল। ...শীতের দিনে শাওয়ারের চাইতে টবের আরাম এত বেশি যে, দ্বিগুণ খরচটা পুষিয়ে যায়।...... না না এটা তার একটা বিচ্যুতির অজুহাত নয়। সে মানুষ, পাথর না। অভিজ্ঞতার ফলে পুরনো জিনিসকে নূতন দৃষ্টিতে দেখছে মাত্র। এ না করলে মানুষের বুদ্ধি-বিবেক সৃষ্টি হয়েছিল কিসের জন্য। সত্যিই ত একজন বুদ্ধিমান প্রৌঢ় লোকের—ঠিক প্রৌঢ় না হোক—চাল্লিশের উপর বয়সের লোকের

কয়েক ঘণ্টা ধরে ক্লাসে লেকচার শন্‌নে লাভ কি?

কোন কাজ করবার পর নিজের আচরণের সমর্থনে যন্‌ক্তির জাল বোনবার তার কামাই নেই। অথচ মজা হচ্ছে যে, মনের মত যন্‌ক্তি পাবার পর তার মনে হয় যে, এটা আগে থেকেই তার জানা ছিল; এই অনন্‌যায়ী চলেছে বলেই সে ঐ কাজটা করেছিল।

......যে বই পড়তে জানে না, তার কথা আলাদা, কিংবা ক্লাসের লেকচারের বিষয়ের উপর যদি বই না থাকে, তাহলেও অবশ্য ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। দেখা বা শোনার চেয়ে ছাপার অক্ষরের লেখাটা তার মনের উপর কোন বিষয় সম্বন্ধে ছাপ রেখে যায় বেশি, একথা সে চিরকাল লক্ষ্য করে এসেছে। তাছাড়া এই বিভিন্ন স্থানের ক্লাসে যাতায়াতে সময় নষ্ট কি কম হয়? সেটাও ভাববার বিষয়। একজন লেখকের পক্ষে পড়াটাই সব নয়, তাকে লিখতেও হবে। ঘরে থাকলে খানিকটা লিখবার সময় সে নিশ্চয়ই করে নিতে পারবে। শীতের দিনে একটা গরম-করা ঘরে বসে বসে বই পড়ার চেয়ে আরাম আর কিছন্‌তেই নেই। এই ত সেদিন লেখক খবরের কাগজে পড়েছে যে, এদেশে লাইব্রেরীগন্‌লো থেকে বই নেওয়ার সংখ্যা শীতকালে গ্রীষ্মকালের দেড়গন্‌ণ। খবরটার সে কাটিং রেখে দিয়েছে। ভারতবর্ষে আগন্‌নের সঙ্গে সম্পর্ক লোকের রান্নাঘরে আর শ্মশানঘাটে; এদেশে আগন্‌নের সম্বন্ধ আরামের সঙ্গে। গরম ঘরে আরাম করে বসে এতদিনের সঞ্চিত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করা অনেক ভাল। অযথা ছন্‌টোছন্‌টি করলেই কি কোন দেশের সংস্কৃতির সম্বন্ধে খন্‌ব খানিকটা বেশি জানা যায়?

টিপটিপ্‌ন্‌নি বৃষ্টির মধ্যে রাতে ফিরবার সময়, হোটেলওয়ালির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় হোটেলের দোরগোড়ায়। মাদাম বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর চোখেও আজকাল লেখক ভাল হয়ে উঠেছে খন্‌ব—হিন্দন্‌টা রোমে যায়; হয়ত ক্যাথলিক; তিন সপ্তাহ অনন্‌পস্থিত থাকলেও ঘরটা রেখে যায় পন্‌রো ভাড়ায়; কোন ঝগ্‌ড়াটে ভাড়াটের বিছানার আলোর বালব্‌টা খারাপ হলে মন্‌সিয়ো হিন্দন্‌র বিছানার আলোর বালব্‌টার সঙ্গে বদলাবদলি করে রেখে দেওয়া যায়; যে ক'দিন দেরি করে নন্‌তন বালব্‌ দেওয়া যায়, তাতেই লাভ; রাই কুড়ায়ে বেল; নইলে পণ্ডিত লোকের ঘরে অনেক রাত আলো জন্‌বলে; এই ত মন্‌সিয়োর ঘরের ইলেকট্রিক হিটারটার বারো আনা অংশ গরমই হয় না; সেটা মেরামত করবার দরকার, কিন্তু মন্‌সিয়ো নিজে এ নিয়ে কোনদিন নালিশ করতে আসে না; পণ্ডিত মানন্‌ষ; অ্যানি বলে যে, মন্‌সিয়ো পৃথিবীর সব ভাষা জানে; সব ভাড়াটের এ'রই মত হোটেলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবার মনের ভাব থাকত, তবে না হোটেল চালিয়ে সন্‌খ ছিল; মন্‌সিয়ো হিন্দন্‌র চাদর-তোয়ালে দন্‌ সপ্তাহ পর পর বদলালেও ও ভালমানন্‌ষের ছেলে একটি কথা বলবার লোক নয়; কিন্তু অ্যানির জন্‌বালায় তাকি হওয়ার জো আছে?

লেখক জিজ্ঞাসা করে, "কি মাদাম বাজার করে নাকি? একেবারে যে ভিজে গেলেন।"

—"হ্যাঁ, বড় দন্‌ষ্টন্‌ আবহাওয়া!"

লেখক দরজাটা খন্‌লে ধরে। হোটেল-ওয়ালি আগে ঢোকেন, তারপর সে ঢোকে গরম ঘরের ভিতর। হোটেলওয়ালা অফিস কাউণ্টারে বসে কাজ করছিল। একগাল হেসে বলে, "আশা করি, দন্‌জনে খন্‌ব ফন্‌র্তিতে সময়টা কাটিয়েছেন আজ মন্‌সিয়ো?" হোটেলওয়ালি লেখকের পিঠে একটা আঙন্‌লের খোঁচা মেরে খিলখিল করে হেসে ওঠেন—

"দেখছেন, কি হিংসন্‌টে লোকটা!" তাঁর ড্রয়িংরন্‌মের দরজা খন্‌লে ডাকেন, "আসন্‌ন, মন্‌সিয়ো এক মিনিটের জন্য।"

স্বামীর দিকে তাকিয়ে রসিকতা করেন, "আজকের সঙ্গ-সন্‌খের দাম দিচ্ছি।"

শেলফের উপর থেকে দন্‌খান বাজে ইংরেজি ডিটেকটিভ নভেল দেন লেখককে। আমেরিকান মিলিটারী ভদ্রলোকটির রক্ষিতাটি, মধ্যে মধ্যে নিজের ঘর পরিষ্কার করে এই সব জঞ্জাল হোটেল অফিসের কাউণ্টারে রেখে দিয়ে যান—যদি কারও কাজে লাগে, এই মনে করে।

"পণ্ডিত মানন্‌ষ না হলে ইংরেজি বই আর কার কাজে লাগবে? আপনার মত-পৃথিবীর সব ভাষা যদি জানতাম—ওলালা! তাহলে কি যে করতাম ভেবে পাই না!"

লেখকের তখন এসব দিকে নজর নেই। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, পাশের ঘরে কলে কি যেন সেলাই করছে অ্যানি। সন্ধ্যার পরও ছন্‌টি হয়নি আজ। প্যাট্রোনের সম্মন্‌খে অ্যানির সঙ্গে কথা বলতে কেন যেন সঙ্কোচ আসে তার। তবন্‌ লেখক কৌতূহল চাপতে না পেরে হোটেলওয়ালিকে জিজ্ঞাসা করে, "আজ অ্যানি এখনও কাজ করছে যে?"

"জানেন না? আজ যে সেণ্ট ক্যাথেরাইনের দিবস। পণ্ডিত মানন্‌ষ, আপনারা কি পাঁজি-পন্‌থির খবর রাখেন; নিজের লেখা-পড়া নিয়েই ব্যস্ত। দেখেন নি আজ রাস্তায় দরজির দোকানগন্‌লো সাজিয়েছে?"

সেণ্ট ক্যাথেরাইন সেলাই ও গিন্নিপনার দেবী। ফরাসী ইডিয়মে যে মেয়ের বছর প'চিশেক বয়স পর্যন্ত বিয়ে না হয়, তাকে ঠাট্টা করে বলা হয় যে, সে সেণ্ট ক্যাথে-রাইনের চুল বে'ধে দিচ্ছে। লেখক এ-ইডিয়মটা নন্‌তন শিখেছে। সময়োপযোগী

কথার অজুহাতে নিজের ফরাসী ভাষায় জ্ঞান হোটেলওয়ালিকে জানিয়ে দেবার জন্য বলে —"অ্যানি কি সেণ্ট ক্যাথেরাইনের চুল বাঁধছে নাকি?"

মাদামের মুখে জবাব যেন তৈরি করা ছিল।

মঁসিয়োর কি ধারণা, অ্যানির বয়স পঁচিশ বছরেরও কম?"

লেখক অপ্রস্তুত হয়ে যায়। যদি অ্যানি শুনে থাকে তাদের কথা! মেয়েমানুষের বয়স নিয়ে আলোচনা করাটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। হোটেলওয়ালি জোর করেই যেন কথাটা তুললো। মাদাম কি অ্যানিকে ঈর্ষা করে? সত্য হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও কথাটা ভাবতে বেশ। নিজের পৌরুষের দম্ভটা একটু তৃপ্ত হয়।

বইয়ের জন্য মাদামকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে চলে আসে। মনে হয় সেণ্ট ক্যাথেরাইন তাঁর ভক্তদের অযথা বড় খাটিয়ে মারেন। সকাল সাতটা থেকে রাত সাতটা হল। ......অ্যানি কালই জামা তুলে তার দুই হাঁটুর কাছের ছেঁড়া মোজা দেখিয়ে বলেছিল —লোকের মোজা ছেঁড়ে গোড়ালির কাছে, আমার ছেঁড়ে হাঁটুর কাছে। যত শক্ত মোজাই কেনো, হাঁটু গেড়ে কাঠের মেজে আর সিঁড়ি ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হলে পনের দিনের বেশি টিকতেই পারে না। ...

বেশ মোটা তার পায়ের গোছা। তবু লেখক বলেছিল—এ-পা কি আর সিঁড়িতে হাঁটু গেড়ে বসবার? এ-পা নাচবার।

ওলালা! বলে অ্যানি পায়ের বুড়ো অঙুলের উপর ভর দিয়ে একপাক ঘুরে নেবার চেষ্টা করছিল। ...বলেছিল একি আর আমি পারি? এ অভ্যাস করতে হয় ছোটবেলায়। পয়সা পাব কোথায় যে নাচ শিখবো? মা বলে, পয়সার অভাবে কোনদিন একটা কুকুর পুষতে দেয়নি। কত কান্নাকাটি করেছি এ নিয়ে ছোটবেলায়......

বেচারী! উদয়াস্ত খাটতে হয় অ্যানিকে। অন্য ফরাসীদের মত সে যে কাজে ফাঁকি দিতে জানে না! অ্যানি যে ঘরটাতে সেলাই করছিল, সেটা এমন দূরে নয় যে, সে লেখকের ড্রয়িংরুমে আসাটা বুঝতে পারবে না। তার মত অ্যানিরও তাদের অন্তরঙ্গতার পরিমাণটা মালিক-মালিকানীকে না জানতে দেবার একটা প্রয়াস আছে এটা লেখক লক্ষ্য করেছে। হোটেলওয়ালির সম্মুখে অ্যানির এই দূরত্বের ভাণ করাটুকু লেখকের বেশ লাগে; —লেখক নিজের একই আচরণের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে। তাদের আলাপের কথাটা যে মালিক-মালিকানীর অজ্ঞাত নয়, একথাও তারা জানে। অন্যর মধ্যে নিজেকে দেখতে পাওয়ায় আছে আবিষ্কারের আনন্দ। কে জানে! হয়ত পিছন ফিরে বসেছিল বলে দেখতে পায়নি। ...দেখলে মুহূর্তের জন্য চাউনিতে ফুটে উঠত অজানা আকাশ-ভরা বিস্ময়। তারপর ঠোঁটের উপর তর্জনীকে একবার ঠেকিয়ে কলের উপর মুখটা আরও গুঁজে সেলাই করতে বসত। ......

অ্যানিকে এতক্ষণ পর্যন্ত খাটিয়ে হোটেলওয়ালি কি করে যেন লেখকেরই উপর অন্যায় করছে। ......লেখকের ঘরখানাকে কি হোটেলওয়ালি যেমন করে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে? ......দুখান বাজে ডিটেকটিভ বই!......

(ক্রমশ)

অজেব দীর্ঘিকা

জি কে চেস্টরটন

অনুবাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবাক বিস্ময়ে আমি শুনতে লাগলাম মিঃ শর্টারের সেই অপূর্ব কাহিনী। একটুখানি চুপ করে থেকে পুনশ্চ তিনি সুরু করলেন, "গুন্ডারা সরে পড়লো। তখন আবার আমার আর এক চিন্তা; প্রথম ফাঁড়াটা তো কাটলো, এবারে আমার কর্তব্য কী। গুন্ডারা যতক্ষণ কাছে ছিল, মাতলামীর ছদ্মবেশটাকে ত্যাগ করতে আমি সাহস পাইনি। কেননা, কনস্টেবলটি আমার সাধু কথায় কর্ণপাত করতো কিনা সন্দেহ। আসল ব্যাপারটা যদি তখন তাকে বুঝিয়ে বলতে যেতাম তো সূত্রপাতেই সে ধরে নিত যে, আমি বোধ হয় খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছি; অতঃপর পুরো-বক্তব্য না শুনেই সে আমাকে আমার সঙ্গীদের হাতে সমর্পণ করতো। এখন আর সে ভয় নেই। সঙ্গীরা সরে পড়েছে; এবারে হয়তো তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারি।

"স্বীকার করতে লজ্জা নেই মিঃ সুইনবার্ণ, সে সাহসও আমার হলো না। কেন হলো না বলছি। বহু বিচিত্র ব্যাপারই ঘটে থাকে আমাদের জীবনে, অবস্থাগতিকে একজন ধর্মযাজককেও যে মাতলামীর অভিনয় করতে হতে পারে তাতেই বা এমন অবাক হবার কি আছে। মজা হচ্ছে এই যে, সেই বিচিত্র ব্যাপার-গুলো কিছু আখছার ঘটে না। ফলে সাধারণ মানুষের চোখে তা একটু অস্বাভাবিকই ঠেকে। তা যদি হয় তো বড়ো মুশকিলের কথা। কোন সাহসে কনস্টেবলটির কাছে আমি আত্মপরিচয় প্রকাশ করি? কে জানে, আমার এই মাতলামীর কথাটা হয়তো জানাজানি হয়ে যেতে পারে। কে জানে, সেটা যে আমার শুধুই মাত্র অভিনয়—কজনে তা বিশ্বাস করবে।

"রাস্তার উপর গড়াগড়ি খেতে খেতে এবম্প্রকার চিন্তা করছি, কনস্টেবলটি আমাকে ঘাড় ধরে টেনে তুললো। আমিও আর কথা বাড়ালাম না, টলতে টলতে তার সঙ্গে পথ হাঁটতে লগলাম। চলার মধ্যে এমন একটা দুর্বল টালমাটাল ভঙ্গী ফুটিয়ে তুললাম যে, কনস্টেবলটির ধারণা হলো—অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি। ভাবলো, পালানো আমার পক্ষে অসম্ভব; আলতোভাবে সে তাই আমার একটি হাত ধরে রাখলো মাত্র। হাঁটতে হাঁটতেই আমরা কয়েকটি বাঁক অতিক্রম করে এলাম। প্রথম বাঁক, দ্বিতীয় বাঁক, তৃতীয় বাঁক, চতুর্থ বাঁক। ব্যস্, চতুর্থ বাঁকে পোঁছেই আচমকা আমি আমার হাতখানাকে এক ঝটকায় তার শিথিল মুঠির থেকে ছিনিয়ে নিলাম, বিদ্যুদ্বেগে দৌড় লাগালাম সামনের দিকে। কনস্টেবলটি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। সে বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, এইভাবে আমি ছুট লাগাবো। আর কি সে আমার নাগাল পায়। একেই তো সে মোটা, তার ওপরে পথটাও বেশ অন্ধকার। চোখকান বুজে দৌড়তে লাগলাম আমি। মিনিট পাঁচেক দৌড়েই বুঝলাম, ব্যবধানটা বেশ দীর্ঘ হয়ে এসেছে। আধ ঘণ্টাটাক পরে পথ ছেড়ে আমি মাঠে নেমে পড়লাম। উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ; আঃ, বুক ভরে আমি মুক্তির নিশ্বাস নিলাম। মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়লাম তারপর, ছদ্মবেশটাকে নিক্ষেপ করলাম তার মধ্যে। গাউন আর টুপি—সব কিছুকে সেখানে আমি গোর দিয়ে এসেছি।"

মিঃ শর্টারের কাহিনীর এইখানেই ইতি। গল্প শেষ করে তিনি চেয়ারটাতে বেশ হেলান দিয়ে বসলেন। এই অদ্ভুত কাহিনী এবং বক্তার চমকপ্রদ বাচনভঙ্গী—দুয়েতেই আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। ভদ্রলোকের হাবভাব একটু মিনমিনে সন্দেহ নেই, তবে তিনি যথেষ্ট আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তা ছাড়া বিপদের মুহূর্তে তিনি যে সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাও প্রশংসার যোগ্য। একটু বা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলতে ভালবাসেন, তা হোক, —তবু বলবো, তাঁর কথাবার্তায় একটা প্রত্যয়বাচক ভঙ্গী উপস্থিত।

বললাম, "তাহলে এখন—"

"তাহলে এখন—" সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন মিঃ শর্টার, আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "তাহলে এখন সেই যে কর্নেল হকার—তাঁর কথাটা একবার ভাবুন। না জানি কী আছে তাঁর অদৃষ্টে। গুন্ডারা যা বলেছিল তাকি সত্যি? সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, কর্নেল হকার-এর যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। সরাসরি আমি পুলিশে খবর দিতে পারতাম, অথচ বর্তমান অবস্থায় তাও আমার পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া পুলিশ যে আমার কথা বিশ্বাস করবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। কী করা যায় তাহলে? মিঃ সুইনবার্ণ, যা হোক একটা উপায় বাৎলান।"

পকেট থেকে আমি আমার ঘড়িটা বার করলাম; সাড়ে বারোটা বাজে।

বললাম, "আমার এক বন্ধু আছেন, নাম বেসিল গ্র্যান্ট। এ সব ব্যাপারে তাঁর চমৎকার মাথা খোলে। আজ একটা ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল আমাদের। আমার তো আর যাওয়া হলো না, সেও হয়তো এতক্ষণে ফিরে এসেছে। চলুন, তার ওখানেই যাওয়া যাক। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?"

"কিছুমাত্র না।" শালটাকে ঠিকমতো বিন্যস্ত করতে করতে বিনীত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ শর্টার।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ফিটন নেওয়া হলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ল্যাম্বেথে গিয়ে পৌঁছুলাম। বেসিল যে বাড়িটায় থাকে তার কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। দরজার বাইরে থেকেই দেখলাম, বেসিলের শাদা শার্ট আর ঝলমলে ফার-কোটটা একটা কাঠের তেপায়ার উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। বেসিল তখন শুতে যাবে, শোবার আগে বার্গাণ্ডিব গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। বুঝলাম যে, বেশ কিছুক্ষণ আগেই সে ডিনারের থেকে ফিরেছে।

বেসিলের একটা মস্ত বড়ো গুণ, কখনোই সে অধৈর্য হয়ে পড়ে না; বেশ শান্তভাবেই সে আগাগোড়া মিঃ শর্টারের

সেই অপূর্ব কাহিনীটি শুনলো। তারপর নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, "মিঃ শর্টার, ক্যাপ্টেন ফ্রেজারকে আপনি চেনেন?"

এ আবার কি অবান্তর প্রশ্ন! বাঁদর-বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন ফ্রেজার, যাঁর সম্মানার্থে সেই বিধবা ভদ্র মহিলা আজ এক ডিনার-পার্টির আয়োজন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়! তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমি বেসিলের দিকে তাকালাম। মিঃ শর্টারের দিকে তখন আর আমার মনোযোগ নেই; শুধু তাঁর স্খলিত-দুর্বল জবাবটা আমার কানে এলো,—"না তো, ও নামে কাউকেই আমি চিনি না।"

বেসিল যেন একটু কৌতুক বোধ করলো। জবাব শুনে, না মিঃ শর্টারের বিভ্রান্তভাব দেখে, বলতে পারিনা। বড়ো বড়ো নীলাভ চক্ষু দুটি মেলে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে মিঃ শর্টারকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। তারপর ফের জিজ্ঞেস করলো, "চেনেন না? সে কি? ঠিক বলছেন তো?"

"সত্যি বলছি তাঁকে আমি চিনি না।" কাতরকণ্ঠে ধর্মযাজক মিঃ শর্টার জবাব দিলেন। এমনই একটা ত্রস্ত ভয় তাঁর কথার মধ্যে ফুটে উঠলো যে, আমি শুধু অবাক হয়ে গেলাম।

বেসিল আর বাক্যব্যয় করলো না, চট্‌পট্ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "বেশ, উত্তম কথা। এবার তাহলে তদন্ত আরম্ভ করা যাক, কেমন? চলুন, প্রথমেই যাওয়া যাক ক্যাপ্টেন ফ্রেজারের কাছে।"

"কখন যাবো?" আমতা আমতা করে মিঃ শর্টার প্রশ্ন করলেন।

ফার-কোটের হাতার মধ্যে হাত গলিয়ে দিতে দিতে বেসিল বলো, "এক্ষুনি, এই মুহূর্তে।"

জবাব শুনে সেই বৃদ্ধ ধর্মযাজক যেন ভেঙে পড়লেন একেবারে, ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, "তার কি কোনও দরকার আছে? সেখানে গিয়ে কোনও লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

ফার-কোটটা ছেড়ে ফেললো বেসিল, সেটাকে সে পুনশ্চ সেই তেপায়ার উপরে নিক্ষেপ করলো।

তারপর বললো, "বেশ, ক্যাপ্টেনের কাছে তাহলে না-ই গেলাম। তবে তার একটা সর্ত আছে। সর্তটা হলো এই যে, আপনার ওই ধপধপে গোঁপজোড়াটি আমার চাই।"

প্রস্তাব শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বেসিল বলে কী! বুঝলাম, আবার সেই সর্বনাশ ঘটেছে। বেসিলের সাহচর্য অবশ্য সবসময়েই বেশ উদ্দীপনাময়, একটুকুও সন্দেহ নেই তাতে; তবে সেই সঙ্গে একথাও আমার মনে হয়েছে যে, সে উদ্দীপনা সুস্থ মস্তিষ্কতার একেবারে শেষ সীমানায় অবস্থিত। যুক্তি জিজ্ঞাসার যে সীমান্তে তার কল্পনা বাসা বেঁধেছে, তার ঠিক অব্যবহিত পরের ধাপেই সমস্ত যুক্তি জিজ্ঞাসার অবসান; উন্মত্ততার সীমানা আরম্ভ। যে কোনও মুহূর্তেই এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে, আর তাহলেই সর্বনাশ। এর আগেও বেসিলের কথা-বার্তায় কখনো কখনো উন্মত্ততার এই অনিবার্য লক্ষণ আমি লক্ষ্য করেছি। তাতে বিষণ্ণ বোধ করেছি। এ উন্মত্ততা যে-কোনও মুহূর্তে দেখা দিতে পারে; মাঠে কিংবা ফিটনে, সূর্যাস্তের সময় কিংবা ধূমপানের নিশ্চিন্ত অবসরে। আবারো তার পায়ের ধ্বনি শুনতে পেলাম। পাগল হয়ে গেছে—হতভাগ্য মিঃ শর্টারকে যখন একটা সদ্‌যুক্তি দেবার সময় সমাগত, সেই চূড়ান্ত মুহূর্তেই বেসিল গ্র্যাণ্ট পাগল হয়ে গেছে।

বেসিলের চোখের দিকে তাকালাম। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুই চোখ, বিস্ময়ে বিস্ফারিত। পায়ে পায়ে সে সামনে এগিয়ে এল, চেঁচিয়ে উঠলো তারপর, "দিন, গোঁফ-জোড়াটি দিন; শুধু গোঁফ নয়, ওই টাক্‌টাও দিন—"

আতঙ্কে পিছিয়ে গেলেম বৃদ্ধ ধর্ম-যাজক। আমি আর সময় নষ্ট করলাম না; দুজনের ঠিক্ মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, "বেসিল, তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছো। চুপচাপ একটু জিরোও তো ভাই, নাও—ওই বার্গাণ্ডিটুকুকে খেয়ে নাও তো আগে। কথা শুনবে না ভাই?"

উত্তরে সে কঠিন কণ্ঠে বললো, "গোঁফ চাই, গোঁফ।"

বলে সে আর অপেক্ষা করলো না, ঝাঁপিয়ে পড়লো মিঃ শর্টারের দিকে। বেগতিক দেখে মিঃ শর্টারও বুঝি দরজার দিকে দৌড় লাগাচ্ছিলেন, বেসিল তার পথ আটকে দাঁড়ালো। ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে বুঝবার আগেই দেখি, ঘরখানা যেন কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। চেয়ার উল্টে, টেবিল ভেঙে, পর্দা ছিঁড়ে, বাসন ভেঙে সে এক জগঝম্প কাণ্ড। তবুও শ্রান্তি নেই বেসিলের, তখনো সে মিঃ শর্টারের টুঁটি টিপে ধরবার চেষ্টা করছে।

সেই উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলার মধ্যেও অদ্ভুত একটা জিনিস চোখে পড়লো আমার; বিস্ময় তাতে বেড়েই গেল। বৃদ্ধ ধর্মযাজক রেভারেণ্ড মিঃ এলিস্ শর্টারের আচরণে যেন পূর্বেকার সেই বার্ধক্যভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ঠিক এমনটা আমি আশা করি নি। বেসিলের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বেশ সমানেই পাল্লা দিয়ে চলেছেন; যে রকম তড়িৎগতিতে তিনি ঘরময় ছুটোছুটি হুটোপাটি করছেন, লাফাচ্ছেন, ঝাঁপাচ্ছেন—একমাত্র ছেলেছোকরাদের পক্ষেই তা সম্ভব। তা ছাড়া মুখ দেখে মনে হলো, বেসিলের আচরণে তিনি খুব বিস্মিত হন নি, একটু বা কৌতুকবোধ করছেন; যেন আগের থেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, এমন একটা কিছু ঘটবে। বেসিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, তার চোখেও কৌতুকের ছটা। সত্যি বলতে কি, দুজনেই যেন মৃদু মৃদু হাসছে।

বেশীক্ষণ আর ছুটোছুটি করতে হলো না, একটু পরেই মিঃ শর্টার কোণঠাসা হয়ে পড়লেন।

হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি বললেন, "দোহাই মিঃ গ্র্যাণ্ট, আর আমার পিছু লাগবেন না। আপনি তো জানেন, এ কিছু বেআইনী ব্যাপার নয়। তাছাড়া কারুর তো আর এতে কোনও ক্ষতি হয় নি? কি করি বলুন, সামাজিক কাঠামোটাই এমন বদখৎ যে, এসব না করেও আমাদের কোনও উপায় থাকে না। বুঝতেই তো পারছেন—"

ঠাণ্ডা গলায় বেসিল বললো, "না না, আপনার আর দোষ কি। সে কথা হচ্ছে না। নিন, এবার গোঁফজোড়াটা দিয়ে দিন তো? টাক্‌টাও দিন। ভাল কথা, ও দুটো কি ক্যাপ্টেন ফ্রেজারের সম্পত্তি?"

হাসতে হাসতেই মিঃ শর্টার বললেন, "না না, ক্যাপ্টেনের হবে কেন? আমাদেরই।"

সব কিছুই আমার গোলমেলে ঠেক্‌তে লাগলো; দুজনেই কি এরা পাগল হয়ে গেছে? বিস্ময়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম "কি সব আবোল-তাবোল বক্‌ছো তোমরা? কী এর অর্থ? মিঃ শর্টারের টাক্ তো তাঁর নিজেরই টাক্,—ও-টাক্ ক্যাপ্টেন ফ্রেজারের হতে, যাবে কেন? আর তা হওয়াও কি সম্ভব? একজনের টাক্ কি আরেকজনের হয়? ক্যাপ্টেন ফ্রেজারের সঙ্গেই বা এর সম্পর্ক কোথায়? বেসিল তাঁর সঙ্গে তুমি আজ ডিনার খাও নি?"

বেসিল বললো, "না।" বলে সে হাসতে লাগলো।

"সে কি? মিসেস্ থর্নটন যে পার্টি দিয়েছিলেন, তুমি সেখানে যাও নি? কেন, যাও নি কেন?"

হাসতে হাসতেই বেসিল বললো, "কি করে যাই বলো? অচেনা এক আগন্তুক এসে অযথা আমার সময় নষ্ট করলেন। তা আমিও তাঁকে ছেড়ে দিই নি, শোবার ঘরে তাঁকে আট্‌কে রেখেছি।"

"আটকে রেখেছো? শোবার ঘরে? বলো কি?" আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কে জানে, এর পরেই বেসিল হয়তো বলবে যে, কয়লাকুঠ্‌রিতে—কিংবা তার বুকপকেটেই—সে কাউকে আট্‌কে রেখেছে। কিছুতেই আর তাকে বিশ্বাস নেই।

ভিতরের দিকের একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো বেসিল, দরজা খুললো তার। একটু পরেই আর-এক বিস্ময়ের অবতারণা। ঘাড় ধরে যে ভদ্রলোকটিকে সে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল, তাঁকে দেখে আর আমার বাক্‌স্ফূর্তি হলো না। ইনিও আর একটি পাদ্রী, মাথায় চওড়া টাক্, গোঁফ শাদা, গায়ে শাল-জড়ানো। হুবহু মিঃ শর্টারেরই প্রতিমূর্তি যেন।

"বসুন সকলে, বসুন—" সহাস্যমুখে বেসিল বললো, "বসে পড়ুন সবাই। নিন, সকলেই একপাত্তর করে মদ ঢেলে নিন। খুব খানিকটা রগড় হলো, কেমন? তা, মিঃ শর্টার, ঠিকই বলেছেন আপনি,—এ কিছু দোষের কাজ হয় নি। শুধু ক্যাপ্টেন ফ্রেজারের জন্যেই যা-একটু দুঃখ হচ্ছে। আহা, ব্যাচারা! ঘুণাক্ষরেও যদি একবার আমাকে জানাতেন, তাহলে কি আর ও'র এই অর্থদণ্ড হয়! আপনারা দুজনে অবশ্য তাতে খুশী হতেন না, কেমন—তাই না?"

যুগল-পাদ্রী চুপচাপ বসে বার্গাণ্ডি টানছিলেন, বেসিলের কথায় তাঁরা হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন। একজন দেখি নিস্পৃহভাবে তাঁর গোঁফজোড়াটি খুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

"বেসিল," কাতরকণ্ঠে আমি বললাম, "কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে বলো ব্যাপারটা, নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো।"

হেসে উঠ্‌লো বেসিল; বললো, "বন্ধু, আজব জীবিকা সঙ্ঘ-এরই কাণ্ড এসব। এই যে দুই ভদ্রলোককে দেখছো, এ'রা হচ্ছেন 'আটকদার'।"

"আটকদার! সে আবার কি?"

রেভারেণ্ড এলিস্ শর্টার বললেন, "ঘাবড়াবেন না মিঃ সুইনবার্ন, ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি—"

রেভারেণ্ডের গলা শুনে আমি চম্‌কে গিয়ে তিন পা পিছিয়ে এলাম। কী তাজ্জব, কোথায় সেই বার্ধক্যের স্খলিত কণ্ঠ! এ একেবারে শহুরে ছোকরার চাঁচাছোলা গলা। রেভারেণ্ড বললেন, "যা বলছিলাম; ব্যাপারটা কিছু গুরুতর নয়। অবাঞ্ছনীয় লোকদের আট্‌কে রাখবার জন্যে আমরা ভাড়া খেটে থাকি। ক্যাপ্টেন ফ্রেজার হচ্ছেন—" বাকিটুকু আর মিঃ শর্টার বললেন না, আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

বেসিল বললো, "বলতে আপনার লজ্জা হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা, তাহলে আমিই বলছি। শোনো হে চার্লি, ক্যাপ্টেন ফ্রেজার হচ্ছেন এ'দেরই একজন মক্কেল। ফ্রেজার আমাদের বন্ধুলোক, তা সত্ত্বেও তিনি চান নি যে, আজকের ডিনারে আমরা উপস্থিত থাকি। কেন চান নি, না? তাও বলছি। এই যে মিসেস্ থর্নটন, যিনি আজ আমাদের নেমন্তন্নে ডেকেছিলেন, ক্যাপ্টেন ফ্রেজার তাঁর প্রণয়াসক্ত। তা মুশকিল হয়েছে এই যে, কালকেই বেচারাকে আফ্রিকায় চলে যেতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আজ রাত্রেই মিসেস থর্নটনের কাছে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব পাড়তে হয়, কেমন ঠিক কিনা? ওদিকে, মিসেস্ থর্নটনও আবার ঠিক আজ রাত্রেই আমাদের ডিনারে ডেকে বসেছেন। কী করা যায় তাহলে? একটিইমাত্র উপায় বর্তমান, ডিনার থেকে আমাদের সরিয়ে-রাখা। তাই বা কী করে সম্ভব? ক্যাপ্টেন ফ্রেজার অগত্যা এই এ'দের শরণাপন্ন হলেন।"

বিনীত ভঙ্গীতে মিঃ শর্টার আমার দিকে চাইলেন; বললেন, "আমার কোনও দোষ নেই; যা-হোক করে আপনাকে আট্‌কে রাখতে হবে তো? বাধ্য হয়েই তাই ওই আষাঢ়ে গল্প ফাঁদতে হলো। মারাত্মক একখানা গল্প ফেঁদেছিলাম, তাই না?"

"ওঃ মারাত্মক! চমৎকার!"

আমার এই মন্তব্যে, স্পষ্টই বোঝা গেল, মিঃ শর্টার বেশ খুশী হলেন; বললেন, "ধন্যবাদ। আপনার এই প্রশংসার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।"

অপর ভদ্রলোকটির দিকে তাকালাম; দেখি, তিনি তাঁর নকল-টাক্‌টি মাথার থেকে খুলে রাখছেন। তার নীচে লাল্‌চে ঘন চুল। বার্গাণ্ডি টেনে চোখ দুটি তাঁর ঢুলুঢুলু হয়ে উঠেছে; স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় তিনি বলে যেতে লাগলেন, "এখন আর কেউ অবাক হয় না; ব্যাপারটা বেশ চালু হয়ে এসেছে আজকাল। এই তো আমাদের ছোট্ট একটা অফিস, দিন-রাত সেখানে মক্কেলদের ভীড় লেগে রয়েছে। আগেও নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আপনাদের মোলাকাৎ হয়েছে কখনো-না-কখনো, আপনারা হয়তো বুঝতে পারেন নি। এবার থেকে একটু নজর রাখবেন। এই ধরুন কারুর সঙ্গে আপনি দেখা করতে যাবেন; হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, অচেনা এক ভদ্রলোক এসে গালগল্প জুড়ে দিলেন আপনার সঙ্গে। বুঝবেন, তিনি আমাদেরই লোক। কিংবা ধরুন, কোনও এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে চলেছেন; হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা এসে এটা-ওটা ছুতোনাতায় বেশ খানিকক্ষণ গাল-গল্পে আপনাকে জমিয়ে ফেললেন। বুঝবেন, তিনিও একজন আটকদার,—আমাদেরই লোক। বলা যায় না, আপনার বন্ধুই হয়তো তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

বললাম, "তা তো হলো, একটা কথা কিন্তু আমি এখনও বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। দুজনেই কেন আপনারা পাদ্রী সাজতে গেলেন?"

মিঃ শর্টারের মুখে যেন একটু ক্ষোভের চিহ্ন ফুটে উঠ্‌লো, হাত উল্টে তিনি বললেন, "কি বলবো, ঐখানেই একটু ভুল হয়ে গেছে। তা সেটা আমাদের দোষ নয়; আগ্রহের আতিশয্যে ক্যাপ্টেন ফ্রেজারই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। তাঁর নির্দেশ দেওয়া ছিল, আপনাদের আটকে রাখবার জন্যে যেন সবচাইতে বেশী ফী-ওয়ালা আটকদার লাগানো হয়। তা, আমাদের মধ্যে যারা পাদ্রী সাজে, তাদের ফী-ই হলো সবচাইতে বেশী। পাদ্রী সাজাটা বেশ কঠিন কাজ কিনা, তাই। প্রতি-বারে আমরা পাঁচ গিনি করে পাই। কোম্পানী আমাদের কাজে খুবই সন্তুষ্ট, এখন তাই আমাদের পাদ্রী ছাড়া আর অন্য কিছু সাজতে বলা হয় না। এর আগে আমরা কর্নেল সাজতাম। পাদ্রীর ঠিক্ নীচেই হলো কর্নেল। কর্নেলরা পায় চার গিনি।" [তৃতীয় গল্প সমাপ্ত]

(ক্রমশ)

রূপময় ভারত

অরণ্যচারী

বনের নিভৃতে বনচারীদের দেখে তাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন—'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' বিক্ষিপ্ত-ভাবে অরণ্যচারীদের দেখলে তাদের প্রকৃত সৌন্দর্য হয়তো চোখে পড়ে না। কিন্তু বনের পটভূমিতে তাদের সৌন্দর্য ও সুষমা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য আসাম অরণ্য-পর্বতবেষ্টিত এমন একটি দেশ, যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আর সেই প্রকৃতির কোলের পল্লীবাসী ও আদিম জাতির সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন আমাদের মত যন্ত্র-সভ্যতাক্লিষ্ট শহুরে মানুষদের কাছে ঈর্ষার বস্তু হয়ে রয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে একদিন বলেছিলেন—

> দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
> লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
> হে নব-সভ্যতা!

আসামের অরণ্যচারীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নৃতত্ত্ববিদ্ আর ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌রা বলেছেন যে, বাঙলা আর আসামে খাঁটি আর্যরক্ত বলতে কিছু নেই। এখানে আর্য-অনার্য উভয় রক্তের মিশ্রণ হয়েছে প্রচুর। তাই এরা আমাদের জ্ঞাতিভাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের এই জ্ঞাতিভাইদের সম্বন্ধে এতকাল জানবার আগ্রহ আমাদের হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি দেশ স্বাধীন হবার পর এদের সম্বন্ধে আমাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়েছে—এটা শুভ লক্ষণ।

ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন বহুবৈচিত্র্যের সমাবেশ, তার দেব-দেউলের সুকুমার স্থাপত্যশিল্প যেমন বহু শতাব্দীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, আসামের অরণ্যচারীরাও তেমনি বিশ্বের নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে এক অপার বিস্ময়ের বস্তু। এই আদিম মানবগোষ্ঠীর অধিকাংশই সেই সুদূর অতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-

মৎস-শিকার

জীবিকা অর্জন

জাল বুনন
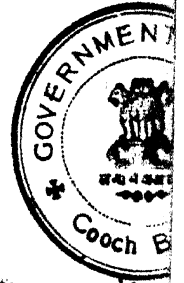
স্নানরতা

বস্ত্র বয়ন

ব্যবহার, রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রেখে পুরুষানুক্রমে অরণ্য-পর্বতে বাস করে আসছে, এদের বিচিত্র জীবনধারায় আজও বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না।

আসামের অরণ্যচারীদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহাবয়ব শিল্পীর হাতের খোদাই-করা মূর্তির মতই মনে হয়। নারী-পুরুষ উভয়েই একত্রে পরিশ্রম করে, কিন্তু সে-পরিশ্রমের মধ্যে নিরানন্দের ছাপ কোথাও নেই। এক-দিকে বেঁচে থাকার জন্যে প্রকৃতির সঙ্গে যেমন নিত্যানিয়ত তাদের সংগ্রাম করতে হয়, অপরদিকে প্রকৃতিই এঁদের জীবন-মনকে কুসুমের মত পবিত্র সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন। জীবিকার্জনের জন্য সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর এরা এদের অবসরকাল যাপন করে পূজা-উৎসবাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষ ক'রে দলবদ্ধভাবে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে। নানারকম নক্সা করা হাতের কাজ ও বস্ত্র বয়নে এদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত পল্লীবাসী বা অরণ্যচারী মেয়েদের নৈপুণ্য অপরিসীম। এতে সৌন্দর্য-সৃষ্টির আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এরা এদের প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবও মিটিয়ে নেয়। সভ্যতার আলোক এদের আজও তেমনভাবে স্পর্শ করেনি, কিন্তু এদের শৌর্যবীর্য, এদের পৌরুষ ও বলিষ্ঠতা এবং এদের সৌন্দর্যানুভূতি ও সারল্য সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে কদাচ দৃষ্টিগোচর হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই অরণ্য-স্তুতি ক'রে বলেছেন—

শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।
নিশ্চল নির্জীব নহ সৌধের মতন—
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুল ফল,
দাও বস্ত্র, দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা;
নিশি দিন মর্মরিয়া কহ কত কথা
অজানা ভাষার মন্ত্র; বিচিত্র সংগীতে
গাও জাগরণ-গাথা; গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মতো
জননীবক্ষের; বিচিত্র হিল্লোলে কত
খেলা কর শিশু সনে; বৃদ্ধের সহিত
কহ সনাতন বাণী বচন-অতীত।
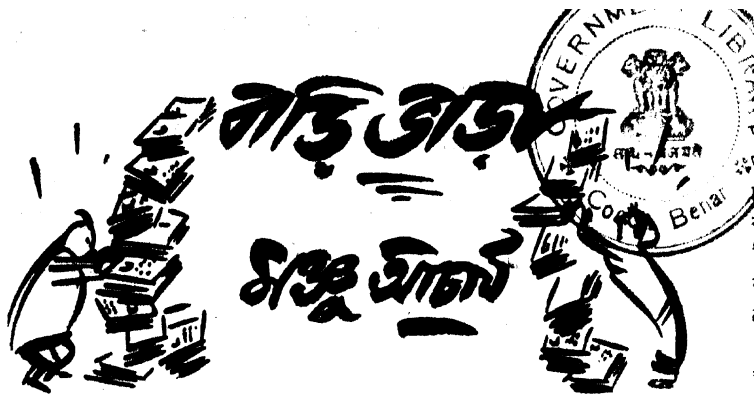
নিবারণবাবু বড় মনোকষ্টে আছেন। বরাবর ভালো বাড়িতে থেকে অভ্যেস—সেই যে বোমা পড়ার হিড়িকে বাড়িটা ছাড়লেন—আর পেলেনই না তেমনি আর একটা বাড়ি। দেশে ওঁদের প্রকাণ্ড চকমিলানো বাড়ি—দেউড়ী, সদর, অন্দর, লোকজনে গম্‌গম্‌ করে। নেহাৎ চাকরীর খাতিরেই না এই ঘিঞ্জি কলকাতা শহরে থাকা। তাওতো এতদিন ছিলেন বালিগঞ্জ পাড়ায়। বেশ বড় বাড়ি, সামনে ফুলের বাগান। দু'খানা শোবার ঘর একটা বসবার ঘর, একটা পড়ার ঘর। চারখানা তো খুব বড় ঘরই ছিল। তা ছাড়া রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, চাকরদের থাকবার ঘর, নায় খানিকটা উঠোন পর্যন্ত ছিল। এক কথায় ছড়িয়ে থাকা যেতো বাড়িটাতে। কি যে হ'ল এক সর্বনেশে বোমা পড়ার আতঙ্কে। পাড়ার শুভার্থীরাইতো আরও ভয় পাইয়ে দিল, নইলে নিবারণবাবু কিছুতেই অমন বাড়ি হাতছাড়া করতেন না। নন্দরাণীও তেমনি। নিজের থাকতে ভয় করছে বেশ তো বাপু দেশে বাড়ি পড়ে রয়েছে, যাও না। না, তিনি নিবারণবাবুকেও ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে যাবেন। তাও বলি, ছেলে নেই পুলে নেই অতো ভয়ই বা কিসের? তবু যেতে হল শেষ পর্যন্ত। নইলে নন্দরাণী প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলতো না? বড় অবুঝ নন্দরাণী, আর বড় মুখরা। নিবারণবাবুতো ভয়ে তার কথার উপর টুঁ শব্দও করেন না। এই তো গেলেন, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আর কি পেলেন সে রকম একখানা বাড়ি? এতো লোকও কি হয়েছে কলকাতায়। বাড়ি আর পাওয়া যাবেই বা কোত্থেকে। কোথায় বালিগঞ্জের সেই খোলামেলা বাড়ি আর এখন শ্যামবাজারের একটা এঁদো বাড়ির দু'খানা ঘর। টাকা ফেললেই নাকি সব পাওয়া যায়—তা নিবারণবাবু পয়সাওয়ালা লোক তাঁরও ত ভালো বাড়ি মিলছে না। নন্দরাণী এখন দোষ দেন নিবারণবাবুকেই। নিবারণবাবুর নাকি চেষ্টা নাই। হুঁঃ বলে কলকাতা শহর চষে ফেললেন একটা ভালো বাড়ি পাবার জন্যে। নন্দরাণী তবু বিশ্বাস

বইএর বাড়াবাড়ি

করেন না। সকাল বেলা উনুনে ডাল চড়িয়ে এসেই তিনি বসেন আনন্দবাজার আর যুগান্তরে বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখতে কিন্তু প্রায়ই সব সাহেবী পাড়ায় আর এতো দূরে যে সেখান থেকে নিবারণবাবুর আপিস করা চলে না। মোটর অবিশ্যি একটা কিনতে পারেন, কিন্তু বাড়ি তেমন ভালো না মিললে মোটর মানাবে কেন? দু একটা জায়গায় খোঁজ নিয়েও ছিলেন কিন্তু সেলামীর বহর দেখে দূরে থেকেই সেলাম জানিয়ে চলে এসেছেন। নন্দরাণী কিন্তু বলেন দু চারশো টাকা সেলামী লাগলোই বা, বাড়ি যদি ভাল হয়। নিবারণবাবু সেটা পছন্দ করেন না। দু পয়সা না হয় আছেই তাই বলে খামোখা নষ্ট করবেন কেন? অন্য ভাঁওতায় নন্দরাণীকে বুঝিয়ে দিন এক রকম চলে যাচ্ছিল, কিন্তু আরেক ভাড়াটের বৌ কল নিয়ে এমন উপদ্রব শুরু করেছে যে, তিষ্ঠোনো দায় হয়ে উঠেছে। নন্দরাণীর কাছে রাজ্যের যত বাড়ি ভাড়ার খবর আসে সেও এক মুশকিল। মাঝে মাঝে কি হয়রানীটাই হতে হয় নিবারণবাবুকে। আর খুঁজতে কি নিবারণবাবুই বাকী রাখছেন? নন্দরাণী তবু বিশ্বাস করতে চান না। আপিস থেকে এসেই নিবারণবাবুর প্রথম কাজ নন্দরাণীর মুখে সারাদিনের ফিরিস্তি শোনা, কার মামা, কার দাদা, এই বাজারেও সস্তা বাড়ি পেয়েছে... চেষ্টা করলে কি না হয়...এতো অসুবিধা আর সহ্য হয় না...মেয়েমানুষ বলেই না হাত পা গুটিয়ে তাঁকে বসে থাকতে হয় আর নিবারণবাবুকে খোসামোদ করতে হয় ...এতোও কপালে ছিল...তারপর হয়ত দু এক পশলা চোখের জলও পড়ে।

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে নিবারণবাবু নন্দরাণীকে বাড়ি পেলেন না। এমনটি সাধারণতঃ হয় না। যাক গেছে বোধ হয় কোনো বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে, কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে বসা যাবে। চাকর এসে জল খাবার, চা দিয়ে গেল। নিবারণবাবু খেয়ে দেয়ে একখানা মাসিক পত্রিকা হাতে ইজিচেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে বসলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন নন্দরাণীর গলা শুনে—"একি কখন এলে? আমি বলে দৌড়ে দৌড়ে আসছি? গিয়েছিলাম ঐ রেণুদের বাড়ি। একটা বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেছে। রেণুর স্বামী খবরের কাগজের অফিসে কাজ করেন তো—তাঁদের কাগজে বেরিয়েছে। আমরা তো সে কাগজ নিই না, তাই সারাদিন পরে খবরটা পেলাম। এতোক্ষণ কি আর আছে সে বাড়ি?"

নিবারণবাবু বইয়ে আরো বেশী মন দিলেন। নন্দরাণী বইটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন, "ভেবেছ কি তুমি? কথা যে কানে ঢুকছেই না। নিজে তো খোঁজ নেবেই না,, আমি যদি খোঁজ এনে দি তাও গরজ করবে না?"

নিবারণবাবু নিরুপায় হয়ে সোজা হয়ে

উঠে বসলেন, "কোথায় বাড়ি? কত ভাড়া? সেলামী লাগবে কিনা? বল সে সব। আগেই একেবারে চটে লাল হয়ে যাচ্ছ।"

"বাড়ি নবকৃষ্ণ লেনে। তিনটে ঘরওয়ালা একটা ফ্ল্যাট। এক রকম নতুনই বলা যায়। মাত্র ৩।৪ বছর হল তৈরী হয়েছে। ভাড়া চাইছে ১২৫, টাকা আর সেলামীর কথা—ঠিক করে কিছু বলে নি—যে উপযুক্ত সেলামী দিতে পারবে তাকেই বাড়িটা দেবেন আর কি। ও, তুমি বুঝি সেলামীর কথায় ঘাবড়ে গেলে? ও সব শুনছিনে,—এবার এ বাড়ি ছাড়তেই হবে। কতই বা আর লাগবে সেলামী—খরুশ পাঁচেক, তাকি আর তুমি দিতে পার না? কত টাকাই তো নষ্ট হয়।"

"আচ্ছা আচ্ছা, কাল দেখবো। বারোটার থেকে চারটের মধ্যে খোঁজ নিতে বলেছে তো? কাল আপিস থেকে একঘণ্টার ছুটি নিয়ে যাবো।"

"ঠিক যাবেই কিন্তু। নইলে তোমার একদিন কি আমার একদিন। আর দেখ এরই মধ্যে আরো কেউ কেউ বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলেছে হয়তো। তুমি কিন্তু তাদের ওপরে সেলামী দিতে চাইবে। এ বাড়ি আমার চাই-ই।"

ঘুম না আসা পর্যন্ত নিবারণবাবু বাড়ি সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনলেন। পরদিন আপিসে যাবার সময় বারবার করে নন্দরাণী বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিলেন। একেবারে ভাড়া অগ্রিম দিয়ে আসা চাই। চেক বইটা যেন সঙ্গে নিয়ে যান—আর সেলামীর কথাটা যেন মনে থাকে।

বেলা বারোটা বাজল। নন্দরাণীর মনে আর শান্তি নেই। কি জানি নিবারণবাবু হয়ত ভুলেই গেছেন। সেলামী দেওয়ার ভয়ে বাড়ি এসে বললেই হল ভুলে গিয়েছি। ও বাড়ি কি আর পড়ে থাকবে? পাঁচটা পর্যন্ত এখন কি করে কাটান তিনি? ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ, বাইরে চাওয়া যায় না যেন। বাড়িওলা সময়টা বড় বেখাপ্পা দিয়েছে। নিবারণবাবু কি এতো রোদে বেরোবেন? দেড়টার সময় ঘুমোনোর ব্যর্থ চেষ্টা করে নন্দরাণী উঠে পড়লেন। পাশের বাড়ির নিমাইকে নিয়ে তিনি নিজেই একবার যাবেন নাকি? নিমাইই কথাবার্তা বলবে বাড়িওয়ালার সাথে। দুটোর সময় নন্দরাণী বেরিয়ে পড়লেন নিমাইকে নিয়ে। বাড়িওয়ালার বৈঠখানায় ৩।৪ জন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন। কই নিবারণবাবু তো নেই। ঠিকই করেছেন নন্দরাণী নিজে এসে। যে কয়জন বাড়ির জন্য এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক সবচেয়ে বেশী

ভারাক্রান্ত হৃদয়যুগল

সেলামী দিতে চেয়েছেন। বেশ ফিটফাট ভদ্রলোকটি পয়সাওয়ালা মানুষই হবেন বোধ হয়। বাড়িওয়ালা বিনীতভাবে বললেন "দেখুন আমার তো বলাই আছে যিনি উপযুক্ত সেলামী দিতে পারবেন এই ভদ্রলোক চারশ দিতে চেয়েছেন।"

নিমাইয়ের মারফৎ নন্দরাণী বললেন, তিনি পাঁচশো দেবেন। চারশ টাকার ভদ্রলোকটি একটু চিন্তা করলেন তারপর বললেন "আমি দেবো ছ'শো।"

নন্দরাণীর খুব রাগ হল। বাড়ি ভাড়াও নীলামের মত নাকি? দর হাঁকাহাঁকি চলছে? নন্দরাণী দেবেন সাড়ে ছ'শো। ভদ্রলোকটি বললেন সাতশো।

বড় মুশকিলে পড়লেন নন্দরাণী। সাতশোর উপরে উঠলে বড় বেশী হয়ে যায়। সাতশো আটশো টাকা সেলামী দিয়ে বাড়ি নেওয়া কোন কাজের কথা নয়। তাছাড়া নিবারণবাবু রাগারাগি করবেন বেজায়। তবু জেদ চেপে গেল নন্দরাণী—বললেন আটশো।

ভদ্রলোকটি একটু মাথা চুলকে বাড়িওয়ালার কাছে একটা টেলিফোন করবার অনুমতি নিয়ে কাকে যেন ফোন করে এলেন। এসেই হাঁকলেন। "হাজার"।

এরপরে নন্দরাণীর সেখানে থাকা অসম্ভব। ভদ্রলোকটির মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে নিমাইকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। লোকটার ভারী পয়সার গরম হয়েছে। আর নিবারণবাবুই বা কেমন। এতো করে বলে দিলেন নন্দরাণী। কিন্তু এলেই বা কি হত? এতো টাকা দিতে নন্দরাণীই নিষেধ করতেন আর নিবারণবাবু তো রাজীই হতেন না। কিন্তু তবু তো নিবারণবাবু কথা রাখেননি। আজ আপিস থেকে এলে আচ্ছা ঝাল ঝাড়বেন নন্দরাণী।

পাঁচটা বাজলো। নিবারণবাবু ফিরতেই নন্দরাণী রণরঙ্গিনী মূর্তিতে সামনে এলেন। "কই, বাড়িভাড়ার রসিদ কই? মুখ দিয়ে কথা সরছে না যে? বল—পাঁচটা মিথ্যে কথা বানিয়ে বল। আমারও যেমন কপাল তোমাকে আমি আবার কিছু বলি।"

কিন্তু অবাক হয়ে নন্দরাণী দেখলেন, রোজকার মত নিবারণবাবু নীরবে বকুনী হজম করলেন না—এগিয়ে এসে একটা কাগজ নন্দরাণীর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "এই নাও রসিদ। ১২৫, টাকা ভাড়া আর হাজার টাকা সেলামী। যতো সব। হোল তো এবার?"

"আঁঃ বাড়ি ভাড়া করে এসেছ? তা আবার কি করে হয়? তুমি তো যাওনি সেখানে?"

"যাইনি তাই কি? কাজে আটকে পড়েছিলাম তাই বিনয়বাবু বলে আপিসেরই এক ভদ্রলোককে পাঠিয়েছিলাম সবচেয়ে বেশী সেলামী কবুল করে বাড়ি নিতে। কিন্তু আমি যাইনি তুমি জানলে কেমন করে? ওঃ বুঝেছি বিনয়বাবু বলছিল বটে যে একজন মহিলা এসে বোকার মত কেবলি দর চড়াচ্ছিলেন।"

একথা শুনে নন্দরাণী—নিরঞ্জনবাবুর দিকে বোকার মতই তাকিয়ে রইলেন।

প্যাঁচ

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

সেদিন ভোরবেলায় চার বছরের কন্যার সরব কলতানে ঘুমটা ভেঙে গেল—সে সুর ধ'রেছে—"সুরে সুরে কত প্যাঁচ, গিটকিরী ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্"। রবীন্দ্রনাথের "যেতে নাহি দিব" কবিতাটি স্মরণ হ'তেই অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হেতু বিরক্তিটি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হ'লো। বলা বাহুল্য, কন্যার কলতানে 'প্যাঁচ্' শব্দটি আমার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে, এবং ঐ শব্দটিকে কেন্দ্র করে, মনের মধ্যে যে সকল ভাবের সমাবেশ হয়েছিল, যদিও সেগুলো রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত দর্শনজাতীয় উচ্চমার্গের নয়, তবে বাস্তবতার দিক থেকে তাদের যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে, আলোচনা প্রসঙ্গে সেটা বোঝা যাবে।

কবি গেয়েছিলেন, "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।" কাব্যিক দৃষ্টিতে গানের কথাগুলো যে হৃদয়স্পর্শী সন্দেহ নাই; কিন্তু বাস্তব জগতের অধিবাসীর কাছে ভুবনটি প্রেম ব্যতীত আরও নানা প্রকার ফাঁদে সমাচ্ছন্ন ব'লেই মনে হয়। এখন বিবর্তন প্রণালী অনুযায়ী সকল পরিণত বস্তুর পিছনে সরল থেকে জটিলতার ইতিহাস পাওয়া যায়। সকল প্রকার ফাঁদের তেমনি বিবর্তন আছে। উদ্ভিদ্ জগতে Pitcher plant বা ঘটপত্রীর কথা অথবা প্রাণী জগতে মাকড়সার জালের কথা আপনারা জানেন—পোকা-মাকড় ধরা অর্থাৎ প্রাণ ধারণের জন্য তারা কি রকম ফাঁদের অবতারণা করে থাকে। কিন্তু মানবস্তরে পৌঁছে ফাঁদের ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশী জটিল হয়ে পড়ে এবং প্রাণ-ধারণের ন্যায় মৌলিক প্রয়োজন ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্র বা অবস্থা বিশেষের তাগিদে ফাঁদের নানা প্রকার ভেদ হয়।

এখন একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে সকল প্রকার ফাঁদের মূলেই ব্যক্তিগত স্বার্থ-বিশেষের নির্দেশ পাওয়া যায় এবং সেই স্বার্থের সিদ্ধির জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা হয়, চলতি কথায় তাদের 'প্যাঁচ' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে, সরল অথবা জটিল, অহিংস বা সহিংস, কোন না কোন রকম প্যাঁচের সঙ্গে আমাদের নিত্যই পরিচয় ঘটে। শিশু অনেক সময় কাঁদে ক্ষুধা বা শারীরিক কোন গ্লানি কান্নার কারণ মনে করে, অনেক মায়েরা হয়ত সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েন, কিন্তু দেখা যায় যে মাকে কাছে পাবার জন্যই শিশু কখন কখন ঐরকম কান্নার আশ্রয় নেয়, অন্য কোন কারণে নয়। সেই রকম বয়োবৃদ্ধির ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, প্যাঁচের রূপটি ক্রমশঃ কি রকম জটিল আকার ধারণ করে এবং কত বিভিন্নভাবে ও ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োগ হয় অথবা প্রকাশ পায় সেটা লক্ষ্য করার মত বস্তুই বটে।
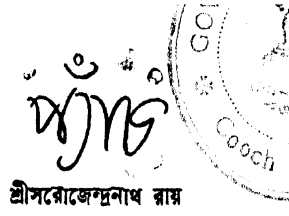
প্রথমেই পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যাক। বন্ধুবর রসময়, আমুদে ও নির্বিবাদী বলে বন্ধুমহলে তাঁর সুনাম আছে। সেদিন দেখি বন্ধুটি গম্ভীর হয়ে চুপটি করে আরাম-চেয়ারে শুয়ে আছেন। জিগ্যেস করলাম, 'কিহে—শরীর খারাপ নাকি?" "না-না ভালোই এমনিই শুয়ে আছি—এস বস", যেন মুখে জোর করে হাসি টেনে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর চুপ্‌চাপ্—ভারী অসোয়াস্তি লাগছিলো। এমনসময় রসময়ী (বন্ধু পত্নীকে আমরা ঐ নামেই ডেকে থাকি) প্রবেশ করলেন—তাঁরও দেখি গম্ভীরা-বিবির অবস্থা। ক্রমে আসল কারণটি প্রকাশ হ'লো। স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই অভিযোগ যে, অপরপক্ষ নাকি, সোজা অর্থাৎ সরলভাবে, আজকাল কোন কথা বলেন না বা নেন না—অমৃতি—জিলাপীর ন্যায় প্যাঁচে মনটি পরিপূর্ণ ইত্যাদি। গত কয়েকদিন থেকে উভয়েই, অপরপক্ষের তথাকথিত প্যাঁচের গ্রন্থি আলগা করার এবং সরল রেখা সমতুল্য স্বীয় সারল্য সপ্রমাণ করার সাধ্যমত ত্রুটিবিহীন চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু তার ফল অর্থাৎ এই অকৃত্রিম (!) চেষ্টার ফল, তাঁদের মুখমণ্ডলেই প্রতিভাত হয়ে রয়েছে—ঠিক যেন পেচক দম্পতির স্বাভাবিক মুখাকৃতির দ্বিতীয় সংস্করণ। নিজেদের গার্হস্থ্য জীবনেই স্মরণ করুন না কেন—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'প্যাঁচোয়া' এই আখ্যা পাননি, এমন অবস্থা যে কখনও আপনার হয়নি, সে কথা কি জোর করে বলতে পারেন? পারিবারিক ক্ষেত্রে প্যাঁচের অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়। নাবালককে সম্পত্তিচ্যুত করা, ভাই ভায়ের মধ্যে রেষারেষি, বিমাতা-সপত্নী-পুত্রের মধ্যে চিরন্তন ঈর্ষা, ইত্যাদি ঘটনার পিছনে কত বিভিন্ন রকমের প্যাঁচ যে ইন্ধন জোগায়, সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন।

সাধারণ সমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। কেউ কেউ বলেন যে ব্রাহ্মণ নাকি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য অথবা অব্রাহ্মণের দেবদ্বিজে অভক্তি বা অবিশ্বাস দূর করার জন্য যত রকম প্যাঁচের সম্ভাবনা আছে তা প্রয়োগ করে থাকেন। আবার কারুর মতে, ব্রাহ্মণ যে বর্ণশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাঁর যে জাতিগত কোনরূপ বৈশিষ্ট্য আছে অব্রাহ্মণে তা স্বীকার করতে চান না, কিংবা স্বীকার করলেও, আধুনিক ব্রাহ্মণ যে সর্বতোভাবে আচারভ্রষ্ট এবং তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের যে কোন চিহ্নই বর্তমান নাই, তা সপ্রমাণ করার জন্য বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দেন। ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-শিক্ষিত, প্রভু-ভৃত্য, শাসক-শাসিত, ইত্যাদি সামজ-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণীগত বা জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা বা উচ্ছেদ করা ব্যাপারে চেষ্টার অপ্রতুলতা কখনও ঘটেনি এবং সেই উপলক্ষ্যে হাজার হাজার রকমের পরস্পর-বিরোধী প্যাঁচ উদ্ভাবিত ও প্রয়োগ করা হয়ে আসছে। বঞ্চিত করা এবং বঞ্চিত না হওয়া উভয়দিক থেকে প্যাঁচই প্রধান অস্ত্র এবং অবলম্বন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবার কূটনীতিজ্ঞ না হ'লে সফলকাম হওয়া যায় না। বড় বড় নেতাদের জীবন একটু লক্ষ্য ক'রলেই দেখতে পাওয়া যায় যে তাঁদের মধ্যে এই নীতি বেশ বেশী পরিমাণেই বিদ্যমান থাকে। চাণক্য, আওরঙ্গজেব প্রভৃতির নাম এই কারণে ঐতিহাসিক হ'য়ে আছে। এই কূটনীতি যে প্যাঁচেরই নামান্তর সেটা বলা বাহুল্যমাত্র। অবশ্য যুদ্ধ বা শান্তি দুই অবস্থাতেই সময়োপযোগী এবং যোগামত প্যাঁচ না কষতে পারলে রাজত্ব যে লাটে ওঠার উপক্রম হয় তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজ-রাজড়াদের এই প্যাঁচের চাপে পড়ে উলুখাগড়াদের প্রাণগুলো অনেক ক্ষেত্রে ঠোঁটের কিনারায় এসে কি রকম ধুক্

ধ'রে করে সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

এবার সাহিত্য-জগতের কথা ধরা যাক। নায়ক-নায়িকার চরিত্র কিভাবে চিত্রিত করলে কোন্ জায়গায় কি কি দৃশ্যপটের অবতারণা করালে, কখন এবং কোথায়, বীররস, করুণরস, বা আদিরস প্রভৃতি বিভিন্ন রসাবলীর মধ্যে কোনটি পরিবেশিত হ'লে গল্প, উপন্যাস বা নাটকটি, মিলনান্তক, বিয়োগান্তক বা অন্য কোন ধরণের হবে, তাদের পশ্চাতে সাহিত্যিককে কল্পনাপ্রসূত কত প্যাঁচের সাহায্য নিতে হয়, সে তথ্যের পরিচয় অল্পবিস্তর আপনাদের নিশ্চয়ই আছে। এতদিনের ঘনিষ্ঠতার পর অমিট রায়ের সঙ্গে লাবণ্যর বিয়ে না দেওয়াতে অনেকের মনেই হয়ত বেশ আঘাত লাগে, কিন্তু কবিবর যদি শেষপর্যন্ত বিবাহটি শুভ ও সোজাসুজি-ভাবে সমাপ্ত করাতেন, তাহলে নায়ক-নায়িকার প্রেমের বিশেষ রূপটি ঠিক ঐ রকম সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠতো কি? জগৎসিংহ সমীপে যাবার সময় বঙ্কিম-চন্দ্র গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে বিমলার সাথী হ'তে বাধ্য করেছিলেন। সকল রকম বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাই পীড়াদায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে ঋষিবর, বিমলাকে দিয়ে রসিকরাজের ওপর যে সব প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়েছিলেন, তাতে পীড়াজনক না হ'য়ে দৃশ্যটি কি বিশেষ উপভোগ্য হয়নি?

সাধারণভাবে শিল্প-জগতে, শিল্পী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরই উপাসক। চির-সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতিকে তাঁরা যখন যে দৃষ্টিতে দেখেন, তুলি ও রঙের সাহায্যে তাঁরা সেটিকে পর্দার ওপর ধরে রাখার চেষ্টা করেন। মানব-মনে সেটা কিরূপ রেখাপাত ক'রবে তাঁরা সে চিন্তা আদপেই করেন না। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর সাময়িক মনোভাবই চিত্ররূপে বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহণ করে—জনসাধারণের কাছে তাঁর চিত্র রুচিকর বা রুচিবিরুদ্ধ হবে কিনা, সেটা তাঁর লক্ষ্যের বিষয় নয়। কিন্তু অধুনা বণিজ্য ও শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে একদল শিল্পী গড়ে উঠেছেন, যাঁদের Commercial artist বলা হয়। এ'রা সাবেকী শিল্পীজাতি হ'তে একটু স্বতন্ত্র। চিত্রের মধ্যস্থতায়, বস্তু বা অবস্থা বিশেষের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বা তাঁদের মধ্যে অনুরাগ জন্মাবার জন্য এই শিল্পীরা সবিশেষ যত্নবান হয়ে থাকেন।

যেমন ধরুন; স্যার আশুতোষের পাশে রক্ষিত সন্দেশ বা দধির ভাণ্ড, অথবা চলচ্চিত্র জগতের কোন জনপ্রিয় তারকার সামনে অবস্থিত 'স্নোর' শিশি, ইত্যাদি যেসকল বিভিন্ন ধরণের চিত্র দৈনিক সংবাদপত্রে বা মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, তা থেকে শিল্পীদের অভিনব প্যাঁচের সঙ্গে আমাদের নিত্যনূতন পরিচয় ঘটে না কি?

আবার যৌবনকালে বিশেষ করে প্যাঁচের অভিব্যক্তি যে কত রকমের হয়, তা সত্যিই চমকপ্রদ। এক্ষেত্রে আমি কিন্তু একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেব। বিজ্ঞানীদের মতে রূপ-সজ্জার মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো একের প্রতি অপরজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এখন একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, মেয়েরা সাধারণতঃ অতি সাধাসিধাভাবেই কাপড় প'রে থাকেন। আজকাল কিন্তু smartness এর দোহাই দিয়ে সাড়ী পরার ব্যাপারে কেমন যেন একটা নতুনত্ব দেখা যায়। মানে, এই একটু পেঁচিয়ে কাপড় পরার রেওয়াজ আর কি। কিন্তু সাড়ী পরিধানকে প্যাঁচযুক্ত করার জন্য পরিণতিটি অনেক ক্ষেত্রে কিরূপ চরম আকার ধারণ করে, অর্থাৎ কত শত যুবক বা রসলিপ্সুদের মস্তিষ্ক যে, ঘূর্ণায়মান হয়, তাদের হৃদয়রাজ্যে আলোড়ন অথবা কণ্ডূয়ন উৎপাদিত হয়, সেটা সপ্রমাণের জন্য কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

কিন্তু প্যাঁচের অচিন্তনীয় বিশিষ্ট প্রকারের সাথে যদি পরিচিত হতে চান, তাহ'লে ব্যবসা ক্ষেত্রে নেমে আসুন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যের ব্যাপারে কখন কখন কি রকম কারবার চলে সেটা একবার নজর করুন। জলদুগ্ধকে পিটুলী, ময়দা বা এ্যারোরুট ও চিনির সংমিশ্রনে (আজকাল অবশ্য বিদেশীয় দুগ্ধচূর্ণ মেশানো হয়) খাঁটি দুগ্ধে পরিণত করা, চাল মিশ্রিত কাঁকরকে চাল ব'লে চালানো, দালদাকে হরিদ্রাভ ও এসেন্স বিশেষের সাহায্যে গব্যঘৃতে রূপান্তর অর্থাৎ মেকীকে আসল ব'লে চালু করার যে সীমাহীন সমারোহ চলেছে তাতে জগৎটাকে প্যাঁচের একটি বিরাট গবেষণাগার ব'লে মনে হয় না কি? নিত্য-স্মরণীয় কালোবাজার, যেটি পুলিসের ঝাঁঝালো ও চির সতর্ক-দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিয়ে দেশে সুদৃঢ় বনিয়াদ স্থাপন ক'রে বসেছে; সেটা এইরূপ গবেষণার যে চূড়ান্ত অবদান বিশেষ তাতে কোন সন্দেহ নাই। এর ফল হ'য়েছে এই যে সুযোগ পাবামাত্রই পরস্পরকে ডাইনে বাঁয়ে প্রতারিত করাই আধুনিক যুগের একটি বিশেষ ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শ্রেণীর প্যাঁচকে বিনা দ্বিধায় 'সহিংস' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এইসব ভেজাল খেয়েও এবং মেকীর মধ্যে বাস ক'রেও কিন্তু আমাদের বাঁচতে হবে—আমাদের শরীর সুস্থ রাখার চেষ্টা ক'রতে হবে। সেজন্য অর্ধভুক্ত থেকেও বা অপভুক্ত হয়েও আমরা কেউ কেউ প্রাতর্ভ্রমণ বা সান্ধ্য-ভ্রমণের শরণাপন্ন হই। কেউ আবার হয়ত বিষ্টু ঘোষ বা বুদ্ধ বোসের নির্দেশ অনুযায়ী যৌগিক আসনের অভ্যাস বা ডন্ বৈঠক জাতীয় ব্যায়াম ক'রে এবং মুষ্টিপ্রমাণ বিশুদ্ধ ছোলা চর্বণ ক'রে, ছ্যাক্‌ড়া গাড়ীর অশ্বসদৃশ শরীরে শক্তি ও লাবণ্য সঞ্চারের প্রয়াস পান। কিন্তু নিরীহ ব্যায়ামের ক্ষেত্রেই কি রক্ষা আছে—সেখানেও দেখুন 'প্যাঁচ' শব্দটি অপ্রচলিত নয়। যেমন ধরুন, কুস্তীর প্যাঁচ, যুযুৎসুর প্যাঁচ এবং আরও নানা প্রকার প্যাঁচ হয়ত থাকতে পারে আমার জানা নেই;—এইসব প্যাঁচ উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগের ফলে অতি সবল ব্যক্তিও দুর্বলের কাছে কাবু হয়ে প'ড়ে থাকেন।

সেদিন কি একটা ছুটির বার। আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে বেশ একটি মাঝারি-গোছের আড্ডা জমায়েৎ হ'য়েছে। জনৈক ভদ্রলোক, কালোবাজার করে নাকি, বেশ দুপয়সা ক'রেছিলেন, কিন্তু শেয়ার মার্কেটে সম্প্রতি মোটামুটি বেশ ঘা খেয়েছেন,—তিনিও উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ভদ্রলোকটি বললেন যে, তার সহকর্মী ভারী 'প্যাঁচোয়া' লোক--ঠিক স্ক্রুপের প্যাঁচের মত অর্থাৎ যেটা ধরে সেটাকে ধীরে ধীরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নিঃসাড়ে একেবারে বিদীর্ণ করে ছেড়ে দেয়। সে রকম লোক নাকি জগতে দু'একটিই জন্মায়। অন্য একটি বন্ধু, একটু মৃদু হেসে ব'ললেন, "সে কি মশায়, এটা আর এমন কি একটা দুর্লভ গুণ বলুন—স্ক্রুপ তো কেবল যাবার সময় কাটে, কিন্তু কল্পনা করুন তো এমন একটি স্ক্রুপ যে ঢোকবার সময় পেঁচিয়ে তো কাটে বটেই, উপরন্তু বেরোবার সময়ও সমভাবে পেঁচিয়ে কাটে;—শাঁখের করাতের মত।" নিখিলেশবাবু আবগারী বিভাগে বড় চাকুরী করতেন, অধুনা অবসরপ্রাপ্ত—তাঁর মধ্যে বেশ একটু

যেন চাঞ্চল্য দেখা গেল। এর পর আলোচনার মোড় যেদিকে ফিরেছিল, সেটা সহজেই অনুমেয় অর্থাৎ তর্কাতর্কি ও পরস্পরের ওপর দোষারোপের ফলে শেষ পর্যন্ত প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল আর কি?

যাই হোক আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেল, যে মানবজীবনে এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে কোন না কোন রকম প্যাঁচের সঙ্গে সকলেরই অল্প-বিস্তর সাক্ষাৎ বা সংঘাত না ঘটে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মোটামুটি প্যাঁচের দুইটি শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো। প্রথম শ্রেণীর প্যাঁচ হচ্ছে মনোজাত এবং দ্বিতীয়টি হলো শিল্প-বিশেষ,—যার সাথে মনের কোন সরাসরি যোগাযোগ নাই; অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ অনুযায়ী এর বৈশিষ্ট্য। সুরের প্যাঁচ, ব্যায়ামের প্যাঁচ ইত্যাদি, এগুলি যে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত সেটা বলা বাহুল্য। এখন স্বার্থবিশেষের সিদ্ধির জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকে চোলাই ক'রে মনের মধ্যে যে ঘোরালো ধরণের নির্যাস উৎপাদিত হয়, তাই হচ্ছে মনোজাত সকল প্যাঁচের আসল রূপ। অর্থাৎ প্যাঁচ হচ্ছে মনোবৃত্তির একটি বিশেষ পরিশোধিত অবস্থা—ক্ষেত্রের প্রকারভেদ অনুযায়ী এর রূপান্তর হয় মাত্র।

তথাকথিত সভ্যতার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল মনোজাত প্যাঁচের জটিলতা ও ব্যাপকতা খুবই বেড়ে উঠেছে এবং এক দিক থেকে এদের সভ্যতার মাপকাঠি বললে অত্যুক্তি হয় না। যদি কোন সভ্যজাতির সঙ্গে আফ্রিকা বা আবিসিনিয়ার আদিম অধিবাসীদের অথবা সভ্যদেশেই শহরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের তুলনা করেন, তাহলে আমার অভিমতটি যে নিতান্ত অযৌক্তিক নয় তা প্রমাণিত হবে। এখন দেখুন, চিরপরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাইয়ে আনন্দ বা স্বাচ্ছন্দ্য আহরণ করাই সকল প্রকার স্বার্থের গোড়ার কথা। আবার স্বার্থ-বোধ ও তার সিদ্ধির যোগ্যমত উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন, আমাদের সকল প্রকার বাঁচার পিছনে অনুপ্রেরণা জোগায়। উদ্ভিদ্‌জগৎ থেকে আরম্ভ করে মানবজগৎ পর্যন্ত সকলেরই বাঁচার অধিকার যে আছে, এটা যেমন সত্য, ডারউইন সাহেবের "Survival of the fittest" তত্ত্ব অনুযায়ী সবল নিজের বাঁচার জন্য দুর্বলকে সৎ বা অসৎ উপায়ে যে কিছুটা উৎপীড়ন করবেই, সেটাও সমভাবেই সত্য। স্বনামধন্য লেখক পরশুরাম, "তিমি, তিমি-ঙ্গিল, তিমি-ঙ্গিল-গিল ইত্যাদি এই অবস্থার উল্লেখ করেছেন এবং দেখা যায় যে, সত্যই এই প্রণালী সকল প্রকার বিবর্তন প্রগতির ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং উপযুক্ত-ভাবে ও ক্ষেত্রে প্যাঁচের প্রয়োগ, ব্যক্তি বা সমাজবিশেষের পক্ষে যে কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয়, তাতে কোন সন্দেহ নাই এবং এ অবস্থায় প্যাঁচকে মানবজীবনের সাধারণ ধর্মবিশেষ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য যতক্ষণ সেটা সীমার মধ্যে থাকে, ততক্ষণ সেটা ধর্ম ও সহনোচিত বটে, কিন্তু এই সীমা অতিক্রম করলেই অধর্ম হয়ে পড়ে এবং সকলের বিশেষ কষ্টের কারণ হয়। শুধু তাই নয়, এইরূপ অতিক্রমের জন্য আমরা এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে শতেক সমস্যা আহবান বা সৃষ্টি করে বসি। এর ফলে স্বরচিত জালে নিজেরাই শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ি, অর্থাৎ কবির ভাষায় 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরি', এবং অপরাপরকেও এই জড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিই না। সাধারণত এর শেষ পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, আমরা নিজ নিজ অদৃষ্টকে দোষী বা দায়ী সাব্যস্ত করে হাহুতাশ করে থাকি। এমন সৌভাগ্যবান আর ক'জন আছেন বলুন, যাঁরা "বড় প্যাঁচে পড়েছে আজি ভোলা দিগম্বর" গান গেয়ে, তাথৈ নৃত্য করে, নিজ সৃষ্ট প্যাঁচের দায় ভগবানের ওপর ন্যস্ত করে, অন্তরের ভার লাঘবের প্রয়াস পান এবং হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ সাফল্যলাভও করেন। সে যাই হোক, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে বক্রপথে চালিত এবং নিজ নিজ স্বার্থের গন্ডী অতিক্রম করার ফলে যে সমস্ত তথাকথিত প্যাঁচের সৃষ্টি হয়েছে, সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের পক্ষে সেগুলি যে বিশেষ অন্তরায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধনের কি কোন উপায় নেই? এর সংস্কৃতি কি সত্যই অসম্ভব? মনো-বিদ্, সমাজতত্ত্ববিদ্, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের কাছ হতে আমাদের সাধারণ মানবসমাজ এ বিষয়ে অনেক কিছু আশা করে।

আমন্ত্রণ

মিহির সেন

অনেক হলো স্বপন আঁকা,
অনেক আলপনা
বাতাস ফাঁকা উঠোন ভরে,
অনেক জাল বোনা
মেঘের এলো পশম চুলে;
বাতাস এলোমেলো,
ফেরার মেঘ, স্বপন ম্লান,
এবার তবে চলো
মেঘের ক্ষেতে প্রলয় কণা
ঝড়ের ক্রূর হাসি
ছড়াই, চলো বাতাস ভরে
বারুদ দিয়ে আসি।

এবার চলো বাতাস ভরে
বারুদ দিয়ে আসি;
মেঘের ক্ষেতে ফসল হোক
ভোরের সোনারাশি,
কপত পাক পশম ওম
প্রিয়ার এলোমেলো,
কিষাণ হোক অবাক চোখঃ
জোয়ার বুঝি এলো
বউয়ের বুকে, ঊষর ক্ষেতে
উজাড় করা সোনা!
খামার ভরে জ্বলুক ফের
ধানের আলপনা।

স্বামী যোগানন্দ

শ্রীআশুতোষ মিত্র

স্বামী যোগানন্দ বা যোগীন মহারাজ ব্রাহ্মণ-শরীর—দক্ষিণেশ্বরবাসী —সাবর্ণ চৌধুরী বংশজাত। ইনি শ্রীঠাকুরের দ্বাদশটি অন্তরঙ্গের মধ্যে অন্যতম। ইঁহার বৃদ্ধ পিতা নবীনচন্দ্রকে বহুবার দেখিয়াছি। মাঝে মাঝে মঠে আসিতেন, কিন্তু নিষ্ঠাবান হওয়ায় অন্ন ভক্ষণ করিতেন না—ফলাহার করিতেন। সদা হাস্যমুখ—সকলের সঙ্গে হাসি-তামাসা করিতেন।

যোগীন মহারাজ ভক্ত—অতি সরল প্রকৃতির। একবার শ্রীঠাকুর তাঁহাকে বড়বাজার হইতে একখানি কড়া কিনিয়া আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কড়া লইয়া আসিলে শ্রীঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, তিনি বড়বাজারের একটিমাত্র দোকানে গিয়া দোকানদার যে দাম চাহিয়াছে, তাহাই দিয়া উহা কিনিয়া আনিয়াছেন। ইহা শুনিয়া শ্রীঠাকুর তাঁহার শিক্ষার্থে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহেন, 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন? দুটো দোকানে দর যাচাই করে কিনতে পারিস নি? যা নহবতে গিয়ে মন্ত্র নিগে।' শ্রীঠাকুরের ঐ আদেশে যোগীন মহারাজ নহবতে গিয়া শ্রীমার নিকট হইতে দীক্ষা লয়েন—ইহা আমরা শুনিয়াছি।

শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর যোগীন মহারাজ শ্রীমার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। শ্রীমার জন্য যে বাড়ি কলিকাতায় যখন ভাড়া লওয়া হয়, তখন প্রায়শঃ যোগীন মহারাজ সেই বাটীতে সেবকরূপে থাকিতেন। শ্রীমার আদেশে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রতি বৎসর হইত। ঐ পূজার জন্য কিছু জমি জগদ্ধাত্রীর নামে যোগীন মহারাজের উদ্যোগে ক্রয় করা হয় এবং প্রতি বৎসর ঐ জমিতে উৎপন্ন ধান ইত্যাদি ঐ পূজায় লাগান হইয়া থাকে। শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে শ্রীমাকে লইয়া যোগীন মহারাজ এবং তৎপরে কয়েকটি গুরুভাই কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থভ্রমণ করিয়াছেন। বৃন্দাবনে যোগীন মহারাজের জীবনে এক নূতন কষ্ট দেখা দেয়। শ্রীমা তখন কালাবাবুর কুঞ্জে বাস করিতেছেন। ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তদের মুখে শ্রীমা জানিতে পারেন যে যোগীন মহারাজ জপ করিতে পারিতেছেন না—বীজ ভুলিয়া গিয়াছেন, কোন প্রকারেই মনে আসিতেছে না। শ্রীমা তাঁহাকে ডাকাইয়া ঐ বীজ বলিয়া দিলে তাঁহার চৈতন্য হয় এবং সেই অবধি জপ ও ধ্যানের উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে চলিতে থাকেন।

শ্রীমার বাটী তখন নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের বাটীর উত্তরে বসুপাড়া লেনে ছিল। যোগীন মহারাজের জীবনের শেষ দিনগুলির বিষয় লেখক প্রণীত 'শ্রীমা' নামক পুস্তক হইতে এইবার উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"যোগীন মহারাজের অসুখ করিল। অসুখ ক্রমে বৃদ্ধির দিকে গেল। নিত্যের আহার ত্যাগ হইল। ডাক্তার দেখিতে থাকিল। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এবং শশিভূষণ দেখিয়া ব্যাধিকে গ্রহণী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। বড় বড় কবিরাজ আসিলেন। কিছুতেই উপশম হইল না।

"কৃষ্ণলাল একাকী সেবা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। মঠ হইতে লেখক আসিল তাঁহার সাহায্যে। দিবাভাগে কৃষ্ণলাল ও লেখক এবং রাত্রে সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীত) সেবায় রত হইলেন। সারদা মহারাজ দিনে কম্বুলিটোলায় 'উদ্বোধন' প্রেসের পরিচালনা করেন, আর রাত্রে আমাদিগকে আরাম দিবার উদ্দেশ্যে যোগীন মহারাজের সেবায় থাকেন। কৃষ্ণলাল শ্রীমায়ের সন্তান হইলেও যোগীন মহারাজের বিশেষ অনুরক্ত। মল-মূত্র পরিষ্কারের কার্য অপর কাহাকেও না দিয়া নিজেই করেন। লেখক বেঙ্গার্স-ফুড তৈয়ার, রোগীকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য দেওয়া এবং অপর সাধারণ পরিচর্যার কার্যে লাগিল। কার্য হইতে অবসর পাইলেই উপরে শ্রীমার নিকটে যায় এবং রোগীর অবস্থা তাঁহাকে জানায়—তিনি আগ্রহ সহকারে শুনেন।

"যোগীন মহারাজের অসুখ ক্রমশ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে—কথা কহিবার শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। অতি ক্ষীণ সুরে কথা কহিতে থাকিলেন। সকলে উৎকণ্ঠিত হইলেন। বিশেষত শ্রীমা অতিমাত্রায় ভাবিতা হইলেন। মঠ হইতে গুরুভ্রাতারা আসিয়া দেখিয়া যাইতে থাকিলেন। একদিন তাঁহার পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও দেখিয়া গেলেন। আমরা প্রাণপণে সেবা করিতে থাকিলাম।

"এই সময় একদিন পূর্ব-পূর্ব দিনের মত প্রাতে শ্রীমার পূজার নিমিত্ত মালির দেওয়া ফুল লইয়া উপরে গিয়া দেখি—শ্রীমা নিজঘরে পশ্চিমাস্যা হইয়া পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, আর তাঁহার গণ্ড-যুগল বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাঁহাকে ঐভাবে দেখিয়া মনে হইল, তিনি রোগীর জন্যে কাঁদিতেছেন। যাহা কিছু ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসিল, তাহা দিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম। তিনি শুনিলেন কিনা, জানি না। কিছুক্ষণ পরে অধীর হইয়া বলিলেন, 'আমার ছেলে যোগীনের কি হবে বাবা?' উত্তর দিলাম, 'ভাবছেন কেন মা, সেরে যাবেন বইকি।' তিনি বলিলেন, 'আমি যে দেখেছি, বাবা।' 'কি দেখেছেন?' তিনি বলিলেন, 'ভোরবেলা দেখলুম, ঠাকুর নিতে এসেছেন।' —বলিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া আমারও চক্ষে জল আসিল। পরক্ষণে আবার সতর্ক করিয়া দিলেন, 'কাউকে বলো না—বলতে নেই।' উত্তর করিলাম, 'আচ্ছা, মা, বলব না।' প্রতিশ্রুত রহিলাম বটে এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে এ পর্যন্ত কাহাকেও বলিও নাই সত্য, কিন্তু আজ কেন জানি না, লেখনী দ্বারা বাহির হইয়া গেল। আবার বলিতে লাগিলেন, যোগীন যে আমার ছেলে—সারদা যেমনটি, যোগীনও তেমনটি।

"অনেক বুঝাইতে শ্রীমা পূজায় বসিলেন দেখিয়া নামিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, রোগীর অবস্থা অতীব খারাপ হইয়াছে। সারদা মহারাজ সেদিন আর উদ্বোধনের কার্যে গেলেন না। ডাক্তার শশিভূষণ সারদা মহারাজকে আলাদা লইয়া গিয়া কি

যেন বলিলেন। দ্বিপ্রহর হইতে অবস্থা ভীষণাকার ধারণ করিতে থাকিল। তখন মাঘ মাসের মাঝামাঝি। অপরাহ্নে দেখা গেল, রোগী সত্যসত্যই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। মঠে খবর গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রোগীর মুখ এক অপূর্ব জ্যোতিতে ভরিয়া উঠিল। কৃষ্ণলাল শিয়রে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহার শব্দে উপরে শ্রীমা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে কখনও শ্রীমাকে চেঁচাইয়া কথা কহিতেও শুনি নাই, আজ তাহার ব্যতিক্রম হইল। তাঁহার আর্তনাদে ব্যথিত হইয়া গিয়া শ্রীচরণ দুইটি জড়াইয়া চুপ করিতে অনুনয়-বিনয় করিলাম, কোন ফল ফলিল না। তিনি ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি যাও, যাও আমার যোগীন আমায় ফেলে চলে গেল—কে আমায় দেখবে?' ইত্যাদি।

"মঠ হইতে সাধুরা আসিয়া পেঁৗছিলেন। তাঁহারা আসিয়াই কাঁদিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, 'সন্ন্যাসীর শরীর মৃত শরীর—সে শরীরের জন্য আবার কান্না কেন? সুবোধ মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) যথারীতি স্বহস্তে যোগীন মহারাজের শরীরে বিভূতি লেপন করিয়া পূজান্তে আরতি করিলেন। ক্রমে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনেরও কতিপয় সভ্য আসিয়া যোগদান করিলেন। শবদেহ পুষ্পে গন্ধে ও মাল্যে ভূষিত হইয়া খট্টোপরি স্থাপিত হইল। সারদা মহারাজকে শ্রীমার বাটীতে রাখিয়া বাকী সকলেই শবদেহের অনুগমন করিলেন।

"রাত্রি তখন আন্দাজ ন'টা, যখন স্বামী যোগানন্দের নশ্বর দেহ শোভাযাত্রা সহকারে কাশী মিত্রের ঘাট অভিমুখে গুরুগম্ভীর 'হরিঃ ওঁ তৎসৎ' ধ্বনিতে কলিকাতার বাগবাজার পল্লী বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ কর্তৃক প্লাবিত করিয়া নীত হইতে লাগিল। সেই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যে এবং অশ্রুতপূর্ব ধ্বনিতে পল্লীস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা আকৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ বাটী হইতে বাহিরিয়া আসিতে থাকিল, আর সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল। ইহা কলিকাতার পক্ষে এক অভিনব দৃশ্য!

"যথাসময়ে শবদেহ চিতোপরি স্থাপিত হইয়া সন্ন্যাসিবৃন্দ কর্তৃক অগ্নিসংযুক্ত হইয়া সমবেত কণ্ঠে—

'বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং।
ওঁ ক্রতোস্মর, কৃতংস্মর, ক্রতোস্মর, কৃতংস্মর॥'

ইত্যাদি বেদমন্ত্রে শ্মশানভূমি মুখরিত হইতে থাকিল, আর দেখিতে দেখিতে স্থানটি চিতাভস্মে পরিণত হইল।

"ভস্মস্তূপ ভগীরথী জলে ধৌত হইতেছে, এমন সময় নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র থিয়েটার হইতে তথায় আসিলেন, আর দুই বিন্দু শ্রদ্ধাশ্রু দ্বারা সেই ধৌতকার্যে সহায়তা করিলেন।

"সব শেষ হইয়া গেলে সুবোধ মহারাজ কতিপয় অস্থি সংগ্রহ করিয়া লইলেন এবং সযত্নে বহন করিয়া আনিলেন। উহা একটি কৌটায় রক্ষিত হয় এবং পরে যোগীন মহারাজের একখানি তৈলচিত্র করাইয়া ঠাকুরঘরের বাহিরের দালানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়।

"পরদিন শ্রীমাকে দুঃখের সহিত বলিতে শুনিয়াছি—'বাড়ির একখানা ইট খসল'।"

আলোচনা

ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসুশীল রায়ের 'ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার' শীর্ষক পত্রটি সাহিত্যরসিক ও ভাষার উন্নতিকামী বাঙালীমাত্রেরই যে মনের কথা, এ বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না। 'দেশে'র মতো প্রভাবশালী ও জনসমাদৃত সাময়িক পত্রে যে এই বিষয় নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে, তা আশার কথা। সেইজন্যে আপনাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করলুম।

সুশীলবাবু উক্ত পত্রের উপসংহার করেছেন বাঙলায় বানান বৈষম্য সম্বন্ধে মন্তব্য করে। রবীন্দ্রনাথও একদিন ভাষার এই দুর্বলতা লক্ষ্য করে তা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যার ফলে আমরা বাঙলায় রানী, গভর্নমেণ্ট, জিনিস ইত্যাদি এবং অর্থ অনুসারে মত-মতো, কি-কী ইত্যাদি বানান ব্যবহার করতে পেরেছি।

তবু একথা মানতেই হবে 'ত্রাহস্পর্শে'র অন্যতম 'স্পর্শ' যে 'বানান ব্যভিচার', তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়নি। অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষাকে সরল ও সহজগ্রাহ্য করে তোলবার জন্যে আরও সংস্কার করা চাই। এ সম্বন্ধে লেখকের প্রস্তাব হোল, বাঙলা বর্ণমালা থেকে শ, ষ ও স এর ব্যবহার লুপ্ত করে একটিমাত্র স রাখার, জ ও য এর স্থানে (যুক্তাক্ষর ছাড়া) কেবল জ ব্যবহারের এবং শুধুমাত্র ন রাখার বিধান করা হোক। কারণ, বাঙলা যখন ধ্বন্যাত্মক (phonetic) ভাষা নয়, তখন সংস্কৃতের মতো একই ধরণের অথচ বিশেষ বিশেষ ধ্বনিবিশিষ্ট বর্ণের এতে উপযোগিতা কী? কেউ হয়ত ভাষার কৌলিন্যের কথা উত্থাপন করবেন। কিন্তু 'সুশীতল সমীরণ' লিখতে গিয়ে যদি দশ মিনিট চিন্তা করতেই যায় অথবা কোন অল্পবয়সী শিক্ষার্থীকে শাস্তিভোগ করতে হয়, তবে সেই কৌলিন্যের মর্যাদা রক্ষিত হবে কেমন করে? তৎসম শব্দের প্রশ্নও করা হোতে পারে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ইংরেজী hospital বাঙলা ভাষার শক্তির ফলে হয়ে উঠেছে হাসপাতাল এবং সংস্কৃতের প্রভৃতি শব্দ প্রকাশ করছে অন্য অর্থ। ঠিক সেইমতো প্রস্তাবিত সংস্কারও দুঃসাধ্য ও অবাস্তব বলে প্রতিভাত হবে না। এবং তার ফলে বাঙলা ব্যাকরণের কুটিল নিয়মগুলোও হয়ে উঠবে সরল।

ভাষাকে জটিলতার আবর্তে ফেলে রেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে দুপাশের সুস্নিগ্ধ শ্যামলিমায় ঘেরা রাজপথ তৈরীর বাসনা সুদূর পরাহতই থেকে যাবে।

বিনীত—রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, খিদিরপুর।

মহাশয়,

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ সালের 'দেশে' শ্রীযুত রাজশেখর বসুর "ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার" শীর্ষক প্রবন্ধটির সময়োচিত আলোচনা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। বাস্তবিকই বর্তমান বাংগালী সাহিত্যিকদের লেখায় বানানের যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া মনে হয় যেন বাংলা বানানের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, যাহার যাহা খুশী লিখিলেই হইল। আশা করি, 'বৌ' 'বউ', 'কুয়া' কু-আ, সর্দি, শর্দী, মাস্টার, মাষ্টার, ষ্টেশন, স্টেশন ইত্যাদি বানানের বিভিন্নরূপ প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। ইহা হইতে মনে হয়, বাংলা বানানপদ্ধতি সম্বন্ধে কাহারও কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান নাই। ইহার একটি কারণ বোধ হয়, বানানপদ্ধতি সম্বন্ধে বাংলা ভাষাবিদদের মতানৈক্য। এখানে আমি পণ্ডিতপ্রবর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিব। বিদ্যানিধি মহাশয় পরিবর্তন, পর্বত, সূর্য চক্র ইত্যাদি বানানের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি বাঙালী, ভাঙা, সংকট, মাস্টার ইত্যাদি বানানের ঘোর বিরোধী। তাঁহার মতে শেষোক্ত বানানগুলি বিজ্ঞানসম্মত নহে।

বলা বাহুল্য, বাংলা বানানের এইরূপ ব্যভিচারে আমরা বড়ই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আমাদিগকে এই বানান-সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কি?

বিনীত—শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার, হাজারীবাগ।

মহাশয়,—গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠের 'দেশ' 'আলোচনা' বিভাগে শ্রীসুশীল রায়ের লেখাটি পড়ে যে কথাগুলো আমার মনে হল, আপনাদের বহুল-প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে বাঙলা দেশের পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের কাছে তা' নিবেদন করতে চাই।

নানাপ্রকার ব্যবসামূলক প্রচারকার্যে বাঙলা বানানের যে নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যায়, তাতে বাঙলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যথিত হবার কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলা বানানের একটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। কিন্তু একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ছাড়া অন্য কোথাও সে নিয়ম পালন করতে দেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাঙলা বানান পদ্ধতি সর্বজন-গ্রাহ্য কিনা জানি না; যদি না হয় তবে সর্বজন-গ্রাহ্য একটি পদ্ধতি প্রবর্তন অবিলম্বেই প্রয়োজন নয় কি? মনীষীদের কাছে আমার প্রশ্ন (১) বাঙলী জনসাধারণকে বানানের শুদ্ধতা-বিষয়ে সচেতন করে তোলার কোন উপায় আছে কি? (২) বাঙলা ভাষা তথা বাঙলা বানানের সঙ্গে জনসাধারণের নিত্যকার পরিচয় যে সাময়িক পত্র-পত্রিকার মারফৎ, সেই পত্র-পত্রিকাগুলি যদি একটি সুনির্দিষ্ট বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করেন তাহলে বানানের শুদ্ধতা সম্পর্কে জনসাধারণ একটু সচেতন হবে নাকি? —ইতি মিহির-কুমার রায়, তীর্থকুটীর, নবদ্বীপ।

অসবর্ণ বিবাহ

মহাশয়,

৪ঠা জ্যৈষ্ঠের 'দেশে' শ্রীচুনীলাল রায় চৌধুরী লিখিত "অসবর্ণ বিবাহ" সমর্থন করিতে পারিলাম না।' কারণ (১) এদেশে জাতির অধঃপতনই বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বর্তমান বিদ্বেষের কারণ। জাতি প্রাণবান্ হইলে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আদর্শ ভ্রাতৃভাব অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে। (২) চুণীলালবাবু কি আশা করেন যে, দেশে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সন্তানের, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়সন্তানের এবং বৈশ্য বৈশ্যসন্তানের কামনা পরিত্যাগ করিবে? না সেরূপ করা তাহাদের কর্তব্য? (৩) অনুলোম জাতিগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে দেশের কি কল্যাণ হইবে বুঝি না। উহারা "যেমন তেজস্বী, শক্তিমান এবং জাতির কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না" এই উক্তির কোনও কারণ দেখি না। প্রকৃতপক্ষে অনুলোম জাতিগুলি দুর্বল এবং ভাবপ্রবণ হয়। সেই ভাবপ্রবণতাই "তেজস্বিতার" ন্যায় দেখাইতে পারে। কিন্তু যে ধৈর্য ও স্থৈর্য দ্বারা ব্রাহ্মণ বেদ ধারণ করেন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, অথবা বৈশ্য ব্যবসা করেন, সে ধৈর্য ও স্থৈর্য অনুলোম জাতিতে অল্পই দেখা যায়। (নমঃশূদ্র জাতিকে লেখক অনুলোম বলিয়াছেন, তাহা আমার মতে সংগত হয় নাই)।

ইতি—ইন্দ্রনারায়ণ বরা, দিল্লী।

মহাশয়,

আপনাদের অষ্টাদশ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা দেশ কাগজখানায় শ্রীচুণীলাল রায় চৌধুরী লিখিত অসবর্ণ বিবাহ প্রবন্ধখানা পড়িয়া আশ্চর্য হইলাম। আজকালও যে বিশেষ কোন শ্রেণীকে আক্রমণ করিয়া লেখা প্রবন্ধ আপনাদের কাগজে প্রকাশ হয় ইহাই আশ্চর্য। এক স্থানে লিখিয়াছেন, সঙ্কর জাতি হিসাবে বৈদ্য, মাহিষ্য ক্ষত্রিয় উগ্রক্ষত্রিয় পারশর। চুণীবাবু কি প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, বৈদ্য সঙ্কর জাতি ছিল? উক্ত প্রবন্ধে জাতি হিসাবে কায়স্থের উল্লেখ নাই। আমার মতে আজকালকার দিনে বর্ণসঙ্কর নিয়া কোন আলোচনা হইলে তাহাতে কোন জাতের উল্লেখ না করাই ভাল। ইতি নিবেদক শ্রীমাখনলাল দাশগুপ্ত, রামগড়, বিহার।

খেলা-ধূলায় প্রদেশিকতা

মহাশয়,

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে তারিখের 'দেশে' "খেলাধূলা" বিভাগে প্রকাশিত কয়েকটি মতামত সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই।

ঐ বিভাগে জানান হয় যে, অবাঙ্গালী খেলোয়াড় অধিক সংখ্যায় কোলকাতায় আসায়, বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা ফুটবল খেলার সুযোগ পান না। কোলকাতার প্রথম ডিভিশন লীগে যোগদানকারী দলের সংখ্যা কম নয়, আর তাতে প্রায় তিন শ খেলোয়াড় নিয়মিত খেলবার সুযোগ পান। একথা মানতেই হবে এই সংখ্যার তুলনায় অবাঙ্গালী (আমদানী) খেলোয়াড়ের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা কোলকাতায় খেলবার সুযোগ পান না? হয়তো উত্তরে বলা হবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানে বাঙ্গালী খেলোয়াড় খেলার তেমন সুবিধা পান না। কিন্তু এই দুটি দলে না খেললেই যে খেলায় উৎকর্ষতা দেখানো অসম্ভব এরতো কোন মানে নেই। কালীঘাট, এরিয়ান্স, স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রভৃতি দল চিরকাল খেলোয়াড় তৈরী করে এসেছে। আর এই দলের খেলোয়াড়েরা প্রকৃত কৃতিত্ব দেখানোর পর ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানেও খেলার সুযোগ অনায়াসে পেয়েছেন। তাই আবারও বলি, বাঙ্গালী খেলোয়াড় খেলা শেখার সুযোগ পান না, এ অভিযোগ ভিত্তিহীন।

এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখনও কি আমরা তুচ্ছ প্রাদেশিকতার উপরে উঠতে পারব না? একথা সবাই মানেন সারা ভারতে কোলকাতার ফুটবলের স্ট্যান্ডার্ডই সবচেয়ে উঁচু। তাই প্রত্যেক প্রদেশের ফুটবল খেলোয়াড়ের বাসনা থাকে কোলকাতায় এসে নাম কিনবার। তাঁদের সে ইচ্ছায় বাধা দেবার কোন কারণ নেই। আমার যুক্তির সারবত্তা বুঝতে পারবেন, যদি "বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মান বাড়াব" না ভেবে, চিন্তা করেন "ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার স্ট্যান্ডার্ড উঁচু করব।" খেলাধুলো হচ্ছে প্রাদেশিকতার অনেক উর্ধ্বে—এমন কি জাতীয়তারও উর্ধ্বে। তাই যখন ল্যাঙ্কেশায়ার লীগে সুদূর ভারত থেকে হাজারে, মানকড় প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড়েরা ক্রিকেট খেলতে যান, তখন সেখানে কোন আপত্তিই ওঠে না।

আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—"খেলাধুলোর যে প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাহা ঐ সকল বিশিষ্ট ক্লাবের পরিচালকগণ সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হওয়ার ফলেই এই সমস্যা দেখা দিয়াছে।" খেলাধুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়দের বিতাড়িত করে নিজের প্রদেশের খেলোয়াড়দের আসনে বসান?

আর এক জায়গায় বলা হয়েছে—"প্লেয়ার্স এসোসিয়েশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে এবং ইহার কয়েকজন পরিচালক তরুণ খেলোয়াড়দের উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী করিবার জন্য নিয়মিত শিক্ষা দিতেছেন। প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সাফল্য লাভ করা অসম্ভব যতদিন বাহিরের খেলোয়াড় আমদানী প্রথা বন্ধ না করা হইতেছে।" সত্যিই যদি ঐ প্রতিষ্ঠানটি ভালো খেলোয়াড় তৈরী করেন তবে সাফল্য কেন অসম্ভব? সব ক্লাবই ভালো খেলোয়াড় চায়, তাই সেক্ষেত্রে তাঁদের খেলার সুযোগ না পাবার তো কোন কারণ দেখিনে।

বিনীত—অমর্ত্যকুমার সেন, দিল্লী।

তিব্বত

চীন-তিব্বত চুক্তির সর্তগুলিকে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। প্রথম হতেই বুঝা গিয়েছিল যে, দুটি বিষয়ে পিকিং সরকার কর্তৃত্ব আদায় না করে নিরস্ত হবেন না। তার একটা হোল তিব্বতের বৈদেশিক নীতির পরিচালনা এবং দ্বিতীয়টি হোল তিব্বতের সামরিক সুরক্ষার ব্যাপার। যে চুক্তি হোল, তাতে এই উভয় বিষয়েই পিকিং সরকার যা চেয়েছিলেন, তাই স্বীকৃত হয়েছে।

চুক্তির সর্ত অনুযায়ী তিব্বতের স্থানীয় স্বাধিকার বা "regional autonomy" এবং বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকবে ও দলাই লামার পদমর্যাদা ও ক্ষমতাদিও অপরিবর্তিত থাকবে। তবে সেই সংগে সংগে পাঞ্চেন লামার অধিকারাদিও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তিব্বতীদের ধর্ম-বিশ্বাস ও আচারাদি এবং লামা মঠসমূহের মর্যাদা ও আয়ের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। তিব্বতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার তিব্বতের স্থানীয় সরকারই ধীরে ধীরে করবেন এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ পিকিং সরকার জোর জবরদস্তি করবেন না, যা হবে তিব্বতী জনসাধারণের দাবী অনুসারেই হবে। তিব্বতের স্থানীয় সরকার "জনগণের মুক্তি বাহিনী" অর্থাৎ চীন সরকারের সৈন্যবাহিনীকে তিব্বতে প্রবেশ করতে এবং তিব্বতের সুরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে। তিব্বতীরা সকলে এক হয়ে তিব্বত থেকে "সাম্রাজ্যবাদী" শক্তির জড় উৎপাটন করে ফেলবে। পিকিং সরকারের পক্ষ থেকে তিব্বতে একটি সামরিক এবং কার্যকরী কমিটি ও একটি সামরিক হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হবে। তিব্বতের পার্শ্ববর্তী দেশ-সমূহের সহিত সদ্ভাব রক্ষা ও পারস্পরিক সমস্বার্থের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছাও চুক্তিতে উল্লিখিত হয়েছে।

চুক্তির ভাষায় যাই হোক না কেন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তিব্বতের জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হোল। তিব্বতের কর্তৃপক্ষ যে পিকিং সরকারের সহিত এরূপ চুক্তি করলেন, তা থেকেই বুঝা যায় যে, তিব্বতের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ইতো-

মধ্যেই একটা পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেছে অর্থাৎ যেসব শ্রেণীর লোক পিকিং সরকারের সহিত তিব্বতের ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনায় বিশেষভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল, তাদের প্রভাব অনেকটা কমে গেছে। তা না হলে একরকম বিনাযুদ্ধেই চীন-তিব্বত সমস্যার এরূপ সমাধান হোত না। এখন বুঝা যাচ্ছে যে, দলাই লামা লাসা ত্যাগ করার পূর্বে যাঁদের হাতে শাসনভার দিয়ে আসেন, তাঁরা পিকিং-এর সহিত একটা আপোষ নিষ্পত্তির পক্ষপাতীই ছিলেন। দলাই লামা যে লাসা ত্যাগ করে আসেন, সেও হয়ত মুখ্যত চীনাদের উপর একটা নৈতিক চাপ দেবার উদ্দেশ্যেই। যাই হোক বর্তমান চুক্তি দলাই লামার মতের বিরুদ্ধে হয়েছে এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই, যদিও পাঞ্চেন লামার প্রত্যাবর্তনের পরে দলাই লামার ক্ষমতাদি প্রকৃতপক্ষ অপরিবর্তিত থাকবে ইহা সম্ভব নয়। তিব্বতের বৈদেশিক নীতির পরিচালনা এবং তিব্বতের সামরিক সুরক্ষার কর্তৃত্বও দলাই লামার হাত থেকে পিকিং সরকারের হাতে চলে যাচ্ছে। এটা কিন্তু নূতন নয়। অতীতে একাধিকবার তিব্বতের উপর চীনা প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েও আবার কালক্রমে শিথিল হয়ে গেছে।

বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের সংগে তিব্বতের কতকগুলি বিশেষ ধরণের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেগুলিকে সনাতন বা অপরিবর্তনীয় মনে করার কোন কারণ নেই। কোনো কোনো বিষয়ে সেগুলির হয়ত পরিবর্তন আবশ্যক হবে। সেজন্য অত্যধিক দুশ্চিন্তার কারণ দেখি না। চীন ও ভারতবর্ষের মৈত্রী উভয় দেশের পক্ষেই একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং তিব্বত সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে যে-সব প্রশ্ন উঠবে বা উঠতে পারে, মিত্রভাবেই সেগুলির সমাধান হবে এটা আশা করা যায়। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষ আশা করে যে, চীন-তিব্বত চুক্তিতে তিব্বতের ধর্ম, কৃষ্টি ও স্বাধিকার রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, চীন সেগুলি আন্তরিকভাবে পালন করবে।

ইরাণের পরিস্থিতি

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও এ্যাংলো-ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানী হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে ইরাণী গভর্নমেণ্টের তৈল জাতীয়করণের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। ইরাণী সরকার জানিয়েছেন যে, এটা সার্বভৌমত্বের ব্যাপার, আন্তর্জাতিক আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে। উভয় পক্ষই জানেন যে, ব্যাপারটা আদালতে মিটবে না। ইংরেজদের মতলব হচ্ছে, সময় নেওয়া, যাতে ইরাণী সরকার ধীরে ধীরে নরম হয়ে আপোষের পথে আসে। ইতোমধ্যে আমেরিকা ইংরেজদের হয়ে ইরাণী সরকারকে একটা সাবধান বাণী শুনিয়েছেন, তাতে অবিশ্যি ইরাণীরা প্রকাশ্যে আমেরিকার উপর খুব রাগ করেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছে। মার্কিন সরকার জানিয়েছেন যে, ইংরেজদের জোর করে হটিয়ে দিয়ে তেলের খনি চালাবার জন্যে ইরাণী গভর্নমেণ্ট মার্কিন টেকনিশিয়ানদের সাহায্য পাবেন, এটা যেন তারা আশা না করেন। ইরাণীরা অবিশ্যি বলতে পারে এবং কেউ কেউ বলছেও যে, মার্কিন সাহায্য না পাওয়া গেলে রাশিয়ান তো পাওয়া যাবে। কিন্তু মুখে যাই বলুক, ইরাণের বড়লোকেরা যাদের হাতে এখনও সরকারী ক্ষমতা রয়েছে, তারা রাশিয়ার কবলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে না। আসল কথা, উভয় পক্ষেই অনেকখানি ভাঁওতা চলছে। ইংরেজরা আকার ইংগিতে বলছে যে, দরকার হলে গায়ের জোরেই অর্থাৎ সৈন্য-সামন্ত এনে তারা তাদের সম্পত্তি রক্ষা করবে, কিন্তু সেটা করা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে, তাও তারা জানে এবং শেষপর্যন্ত করতে পারবে কিনা নিজেরাই এখনো জানে না। আবার ইরাণীরা ভয় দেখাচ্ছে যে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তারা রাশিয়াকে ডেকে আনবে সেটাও অনেকখানি ভাঁওতা। কারণ সে ইচ্ছা তাদের নেই। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ইরাণী গভর্নমেণ্ট "পথে আসতে" বাধ্য হবে এই আশায়, বৃটিশ কূটনীতি তার সনাতন উপায়গুলি (ঘুষ দেওয়াও নাকি তার মধ্যে একটি) প্রয়োগ করে যাচ্ছে। ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর মোসাডেকের গরম পালাও শেষ হয়ে এলো কিনা কে জানে! ৩০।৫।৫১

মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিব। বিদ্যানিধি মহাশয় পরিবর্তন, পর্বত, সূর্য চক্র ইত্যাদি বানানের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি বাঙালী, ভাঙা, সংকট, মাস্টার ইত্যাদি বানানের ঘোর বিরোধী। তাঁহার মতে শেষোক্ত বানানগুলি বিজ্ঞানসম্মত নহে।

বলা বাহুল্য, বাংলা বানানের এইরূপ ব্যভিচারে আমরা বড়ই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আমাদিগকে এই বানান-সংকট হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কি? বিনীত—শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার, হাজারীবাগ।

মহাশয়,—গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠের 'দেশ' 'আলোচনা' বিভাগে শ্রীসুশীল রায়ের লেখাটি পড়ে যে কথাগুলো আমার মনে হল, আপনাদের বহুল-প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে বাঙলা দেশের পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের কাছে তা' নিবেদন করতে চাই।

নানাপ্রকার ব্যবসামূলক প্রচারকার্যে বাঙলা বানানের যে নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যায়, তাতে বাঙলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যথিত হবার কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলা বানানের একটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। কিন্তু একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ছাড়া অন্য কোথাও সে নিয়ম পালন করতে দেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাঙলা বানান পদ্ধতি সর্বজন-গ্রাহ্য কিনা জানি না; যদি না হয় তবে সর্বজন-গ্রাহ্য একটি পদ্ধতি প্রবর্তন অবিলম্বেই প্রয়োজন নয় কি? মনীষীদের কাছে আমার প্রশ্ন (১) বাঙালী জনসাধারণকে বানানের শুদ্ধতা-বিষয়ে সচেতন করে তোলার কোন উপায় আছে কি? (২) বাঙলা ভাষা তথা বাঙলা বানানের সঙ্গে জনসাধারণের নিত্যকার পরিচয় যে সাময়িক পত্র-পত্রিকার মারফৎ, সেই পত্র-পত্রিকাগুলি যদি একটি সুনির্দিষ্ট বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করেন তাহলে বানানের শুদ্ধতা সম্পর্কে জনসাধারণ একটু সচেতন হবে নাকি? —ইতি মিহির-কুমার রায়, তীর্থকুটীর, নবদ্বীপ।

অসবর্ণ বিবাহ

মহাশয়,

৪ঠা জ্যৈষ্ঠের 'দেশে' শ্রীচুনীলাল রায় চৌধুরী লিখিত "অসবর্ণ বিবাহ" সমর্থন করিতে পারিলাম না।' কারণ (১) এদেশে জাতির অধঃপতনই বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বর্তমান বিদ্বেষের কারণ। জাতি প্রাণবান্ হইলে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আদর্শ ভ্রাতৃভাব অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে। (২) চুণীলালবাবু কি আশা করেন যে, দেশে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সন্তানের, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়সন্তানের এবং বৈশ্য বৈশ্যসন্তানের কামনা পরিত্যাগ করিবে? না সেরূপ করা তাহাদের কর্তব্য? (৩) অনুলোম জাতিগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে দেশের কি কল্যাণ হইবে বুঝি না। উহারা "যেমন তেজস্বী, শক্তিমান এবং জাতির কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না" এই উক্তির কোনও কারণ দেখি না। প্রকৃতপক্ষে অনুলোম জাতিগুলি দুর্বল এবং ভাবপ্রবণ হয়। সেই ভাবপ্রবণতাই "তেজস্বিতার" ন্যায় দেখাইতে পারে। কিন্তু যে ধৈর্য ও স্থৈর্য দ্বারা ব্রাহ্মণ বেদ ধারণ করেন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, অথবা বৈশ্য ব্যবসা করেন, সে ধৈর্য ও স্থৈর্য অনুলোম জাতিতে অল্পই দেখা যায়। (নমঃশূদ্র জাতিকে লেখক অনুলোম বলিয়াছেন, তাহা আমার মতে সংগত হয় নাই)।

ইতি—ইন্দ্রনারায়ণ বরা, দিল্লী।

মহাশয়,

আপনাদের অষ্টাদশ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা দেশ কাগজখানায় শ্রীচুণীলাল রায় চৌধুরী লিখিত অসবর্ণ বিবাহ প্রবন্ধখানা পড়িয়া আশ্চর্য হইলাম। আজকালও যে বিশেষ কোন শ্রেণীকে আক্রমণ করিয়া লেখা প্রবন্ধ আপনাদের কাগজে প্রকাশ হয় ইহাই আশ্চর্য। এক স্থানে লিখিয়াছেন, সংকর জাতি হিসাবে বৈদ্য, মাহিষ্য ক্ষত্রিয় উগ্রক্ষত্রিয় পারশব। চুণীবাবু কি প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, বৈদ্য সংকর জাতি ছিল? উক্ত প্রবন্ধে জাতি হিসাবে কায়স্থের উল্লেখ নাই। আমার মতে আজকালকার দিনে বর্ণসংকর নিয়া কোন আলোচনা হইলে তাহাতে কোন জাতের উল্লেখ না করাই ভাল। ইতি নিবেদক শ্রীমাখনলাল দাশগুপ্ত, রামগড়, বিহার।

খেলা-ধূলায় প্রদেশিকতা

মহাশয়,

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে তারিখের 'দেশে' "খেলাধূলা" বিভাগে প্রকাশিত কয়েকটি মতামত সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই।

ঐ বিভাগে জানান হয় যে, অবাঙ্গালী খেলোয়াড় অধিক সংখ্যায় কোলকাতায় আসায়, বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা ফুটবল খেলার সুযোগ পান না। কোলকাতার প্রথম ডিভিশন লীগে যোগদানকারী দলের সংখ্যা কম নয়, আর তাতে প্রায় তিন শ খেলোয়াড় নিয়মিত খেলবার সুযোগ পান। একথা মানতেই হবে এই সংখ্যার তুলনায় অবাঙ্গালী (আমদানী) খেলোয়াড়ের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা কোলকাতায় খেলবার সুযোগ পান না? হয়তো উত্তরে বলা হবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানে বাঙ্গালী খেলোয়াড় খেলার তেমন সুবিধা পান না। কিন্তু এই দুটি দলে না খেললেই যে খেলায় উৎকর্ষতা দেখানো অসম্ভব এরতো কোন মানে নেই। কালীঘাট, এরিয়ান্স, স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রভৃতি দল চিরকাল খেলোয়াড় তৈরী করে এসেছে। আর এই দলের খেলোয়াড়েরা প্রকৃত কৃতিত্ব দেখানোর পর ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানেও খেলার সুযোগ অনায়াসে পেয়েছেন। তাই আবারও বলি, বাঙ্গালী খেলোয়াড় খেলা শেখার সুযোগ পান না, এ অভিযোগ ভিত্তিহীন।

এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখনও কি আমরা তুচ্ছ প্রাদেশিকতার উপরে উঠতে পারব না? একথা সবাই মানেন সারা ভারতে কোলকাতার ফুটবলের স্ট্যাণ্ডার্ডই সবচেয়ে উঁচু। তাই প্রত্যেক প্রদেশের ফুটবল খেলোয়াড়ের বাসনা থাকে কোলকাতায় এসে নাম কিনবার। তাঁদের সে ইচ্ছায় বাধা দেবার কোন কারণ নেই। আমার যুক্তির সারবত্তা বুঝতে পারবেন, যদি "বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মান বাড়াব" না ভেবে, চিন্তা করেন "ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড উঁচু করব।" খেলাধুলো হচ্ছে প্রাদেশিকতার অনেক উর্ধে—এমন কি জাতীয়তারও উর্ধে। তাই যখন ল্যাঙ্কেশায়ার লীগে সুদূর ভারত থেকে হাজারে, মানকড় প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড়েরা ক্রিকেট খেলতে যান, তখন সেখানে কোন আপত্তিই ওঠে না।

আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—"খেলাধুলার যে প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাহা ঐ সকল বিশিষ্ট ক্লাবের পরিচালকগণ সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হওয়ার ফলেই এই সমস্যা দেখা দিয়াছে।" খেলাধুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়দের বিতাড়িত করে নিজের প্রদেশের খেলোয়াড়দের আসনে বসান?

আর এক জায়গায় বলা হয়েছে—"প্লেয়ার্স এসোসিয়েশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে এবং ইহার কয়েকজন পরিচালক তরুণ খেলোয়াড়দের উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী করিবার জন্য নিয়মিত শিক্ষা দিতেছেন। প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সাফল্য লাভ করা অসম্ভব যতদিন বাহিরের খেলোয়াড় আমদানী প্রথা বন্ধ না করা হইতেছে।" সত্যিই যদি ঐ প্রতিষ্ঠানটি ভালো খেলোয়াড় তৈরী করেন তবে সাফল্য কেন অসম্ভব? সব ক্লাবই ভালো খেলোয়াড় চায়, তাই সেক্ষেত্রে তাঁদের খেলার সুযোগ না পাবার তো কোন কারণ দেখিনে।

বিনীত—অমর্ত্যকুমার সেন, দিল্লী।

তিব্বত

চীন-তিব্বত চুক্তির সর্তগুলিকে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। প্রথম হতেই বুঝা গিয়েছিল যে, দুটি বিষয়ে পিকিং সরকার কর্তৃত্ব আদায় না করে নিরস্ত হবেন না। তার একটা হোল তিব্বতের বৈদেশিক নীতির পরিচালনা এবং দ্বিতীয়টি হোল তিব্বতের সামরিক সুরক্ষার ব্যাপার। যে চুক্তি হোল, তাতে এই উভয় বিষয়েই পিকিং সরকার যা চেয়েছিলেন, তাই স্বীকৃত হয়েছে।

চুক্তির সর্ত অনুযায়ী তিব্বতের স্থানীয় স্বাধিকার বা "regional autonomy" এবং বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকবে ও দলাই লামার পদমর্যাদা ও ক্ষমতাদিও অপরিবর্তিত থাকবে। তবে সেই সংগে সংগে পাঞ্চেন লামার অধিকারাদিও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তিব্বতীদের ধর্ম-বিশ্বাস ও আচারাদি এবং লামা মঠসমূহের মর্যাদা ও আয়ের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। তিব্বতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার তিব্বতের স্থানীয় সরকারই ধীরে ধীরে করবেন এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ পিকিং সরকার জোর জবরদস্তি করবেন না, যা হবে তিব্বতী জনসাধারণের দাবী অনুসারেই হবে। তিব্বতের স্থানীয় সরকার "জনগণের মুক্তি বাহিনী" অর্থাৎ চীন সরকারের সৈন্যবাহিনীকে তিব্বতে প্রবেশ করতে এবং তিব্বতের সুরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে। তিব্বতীরা সকলে এক হয়ে তিব্বত থেকে "সাম্রাজ্যবাদী" শক্তির জড় উৎপাটন করে ফেলবে। পিকিং সরকারের পক্ষ থেকে তিব্বতে একটি সামরিক এবং কার্যকরী কমিটি ও একটি সামরিক হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হবে। তিব্বতের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সহিত সদ্ভাব রক্ষা ও পারস্পরিক সমস্বার্থের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছাও চুক্তিতে উল্লিখিত হয়েছে।

চুক্তির ভাষায় যাই হোক না কেন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তিব্বতের জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হোল। তিব্বতের কর্তৃপক্ষ যে পিকিং সরকারের সহিত এরূপ চুক্তি করলেন, তা থেকেই বুঝা যায় যে, তিব্বতের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ইতোমধ্যেই একটা পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেছে অর্থাৎ যেসব শ্রেণীর লোক পিকিং সরকারের সহিত তিব্বতের ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনায় বিশেষভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল, তাদের প্রভাব অনেকটা কমে গেছে। তা না হলে একরকম বিনা-যুদ্ধেই চীন-তিব্বত সমস্যার এরূপ সমাধান হোত না। এখন বুঝা যাচ্ছে যে, দলাই লামা লাসা ত্যাগ করার পূর্বে যাঁদের হাতে শাসনভার দিয়ে আসেন, তাঁরা পিকিং-এর সহিত একটা আপোষ নিষ্পত্তির পক্ষপাতীই ছিলেন। দলাই লামা যে লাসা ত্যাগ করে আসেন, সেও হয়ত মুখ্যত চীনাদের উপর একটা নৈতিক চাপ দেবার উদ্দেশ্যেই। যাই হোক বর্তমান চুক্তি দলাই লামার মতের বিরুদ্ধে হয়েছে এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই, যদিও পাঞ্চেন লামার প্রত্যাবর্তনের পরে দলাই লামার ক্ষমতাদি প্রকৃতপক্ষে অপরিবর্তিত থাকবে ইহা সম্ভব নয়। তিব্বতের বৈদেশিক নীতির পরিচালনা এবং তিব্বতের সামরিক সুরক্ষার কর্তৃত্বও দলাই লামার হাত থেকে পিকিং সরকারের হাতে চলে যাচ্ছে। এটা কিন্তু নূতন নয়। অতীতে একাধিকবার তিব্বতের উপর চীনা প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েও আবার কালক্রমে শিথিল হয়ে গেছে।

বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের সংগে তিব্বতের কতকগুলি বিশেষ ধরণের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেগুলিকে সনাতন বা অপরিবর্তনীয় মনে করার কোন কারণ নেই। কোনো কোনো বিষয়ে সেগুলির হয়ত পরিবর্তন আবশ্যক হবে। সেজন্য অত্যধিক দুশ্চিন্তার কারণ দেখি না। চীন ও ভারতবর্ষের মৈত্রী উভয় দেশের পক্ষেই একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং তিব্বত সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে যে-সব প্রশ্ন উঠবে বা উঠতে পারে, মিত্রভাবেই সেগুলির সমাধান হবে এটা আশা করা যায়। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষ আশা করে যে, চীন-তিব্বত চুক্তিতে তিব্বতের ধর্ম, কৃষ্টি ও স্বাধিকার রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, চীন সেগুলি আন্তরিকভাবে পালন করবে।

ইরাণের পরিস্থিতি

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও এ্যাংলো-ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানী হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে ইরাণী গভর্নমেণ্টের তৈল জাতীয়করণের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। ইরাণী সরকার জানিয়েছেন যে, এটা সার্বভৌমত্বের ব্যাপার, আন্তর্জাতিক আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে। উভয় পক্ষই জানেন যে, ব্যাপারটা আদালতে মিটবে না। ইংরেজদের মতলব হচ্ছে, সময় নেওয়া, যাতে ইরাণী সরকার ধীরে ধীরে নরম হয়ে আপোষের পথে আসে। ইতোমধ্যে আমেরিকা ইংরেজদের হয়ে ইরাণী সরকারকে একটা সাবধান বাণী শুনিয়েছেন, তাতে অবিশ্যি ইরাণীরা প্রকাশ্যে আমেরিকার উপর খুব রাগ করেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছে। মার্কিন সরকার জানিয়েছেন যে, ইংরেজদের জোর করে হটিয়ে দিয়ে তেলের খনি চালাবার জন্যে ইরাণী গভর্নমেণ্ট মার্কিন টেকনিশিয়ানদের সাহায্য পাবেন, এটা যেন তারা আশা না করেন। ইরাণীরা অবিশ্যি বলতে পারে এবং কেউ কেউ বলছেও যে, মার্কিন সাহায্য না পাওয়া গেলে রাশিয়ান তো পাওয়া যাবে। কিন্তু মুখে যাই বলুক, ইরাণের বড়লোকেরা যাদের হাতে এখনও সরকারী ক্ষমতা রয়েছে, তারা রাশিয়ার কবলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে না। আসল কথা, উভয় পক্ষেই অনেকখানি ভাঁওতা চলছে। ইংরেজরা আকার ইঙ্গিতে বলছে যে, দরকার হলে গায়ের জোরেই অর্থাৎ সৈন্য-সামন্ত এনে তারা তাদের সম্পত্তি রক্ষা করবে, কিন্তু সেটা করা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে, তাও তারা জানে এবং শেষপর্যন্ত করতে পারবে কিনা নিজেরাই এখনো জানে না। আবার ইরাণীরা ভয় দেখাচ্ছে যে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তারা রাশিয়াকে ডেকে আনবে সেটাও অনেকখানি ভাঁওতা। কারণ সে ইচ্ছা তাদের নেই। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ইরাণী গভর্নমেণ্ট "পথে আসতে" বাধ্য হবে এই আশায়, বৃটিশ কূটনীতি তার সনাতন উপায়গুলি (ঘুষ দেওয়াও নাকি তার মধ্যে একটি) প্রয়োগ করে যাচ্ছে। ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর মোসাডেকের গরম পালাও শেষ হয়ে এলো কিনা কে জানে! ৩০।৫।৫১

নিশীথদা

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, নিঃস্বার্থ দেশসেবক শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদেশের বহু গুণী-জ্ঞানী, বহু প্রখ্যাত কর্মী তাঁর সংস্রবে এসেছিলেন—এমন কি, একথা বললে ভুল বলা হবে না যে, দেশসেবা করেছেন, কিন্তু শ্রীযুত নিশীথ সেনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি, এরকম লোক বাঙলা দেশ দেখেনি। তাই নির্ভয়ে বলতে পারি, কৃতী নিশীথ সেনের কর্মজীবনের প্রশস্তি কীর্তন করার লোকের অভাব হবে না।

আমি কিন্তু নিশীথদাকে সেভাবে চিনিনি। আমি তাঁকে পেয়েছিলুম বন্ধুরূপে, তাঁর জীবন-অপরাহ্নে। তিনি তখন কলকাতার ভিতর-বাইরে এতই সুপরিচিত যে প্রথম আলাপের দিন কেউই আমাকে বুঝিয়ে বলল না, নিশীথ সেন বলতে কি বোঝায়। তারপর নানা রকম গাল-গল্পের মাঝখানে কে যেন আমাকে বলল, 'আনন্দবাজারে যে ইংরেজকে কটু-কাটব্য আরম্ভ করেছ (আমি তখন 'সত্যপীর' নাম নিয়ে ঐ কাগজে-কলমে ধার দিচ্ছি) তার আগে খবর নিয়েছ কি, 'সিডিশন', 'ডিফেমেশন', 'মহারাণীর বিরুদ্ধে লড়াই' এসব জিনিসের অর্থ কি?' আমি কোনো কিছু বলবার আগেই নিশীথ সেন বললেন, 'আমরাই জানিনে, উনি জানবেন কি করে? আপনি তো দর্শনে ডক্টর, না?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' নিশীথ সেন আমার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ইংরেজ তার সমালোচককে জেলে ঠেলবার জন্য যেসব আইনকানুন বানিয়েছে, সেগুলো কোন্ স্থলে প্রযোজ্য, কাকে সেই ডাণ্ডা দিয়ে ঠ্যাঙানো যায়, তার টীকাটিপ্পনি, নজীর-দলিল ইংরেজ আপন হাতেই রেখেছে। সুবিধে মত কখনো সেটা টেনে টেনে রবারের মত লম্বা করে, কখনো ফাঁদ ঢিলে করে পাখীকে উড়ে যেতেও দেয়। এই দেখুন না, লোকমান্য তিলককে যে আইনের জোরে জেলে পুরল, সে আইন ওরকমধারা কাজে লাগানো যায়, সে কথা একেবারে আনাড়ি উকিলও মানবে না। তবু তিলককে তো জেলে যেতে হল। তাই সিডিশন কিসে হয় আর কিসে হয় না, সেকথা ঝানু উকিলরা পর্যন্ত আগেভাগে বলতে পারে না। ইংরেজ যদি মনস্থির করে আপনাকে আলীপুরে পাঠাবে তবে সে তখন আপনার বিরুদ্ধে

অনেক নূতন-পুরাতন আইন বের করবে। আমরা—অর্থাৎ উকিল-ব্যারিস্টাররা—তখন তার বিরুদ্ধে লড়ি, সব সময়ে যে হারি, তাও বলতে পারিনে' তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমার ফোন নম্বরটা জানেন তো? কোনো অসুবিধে হলে ফোন করবেন। আমি যা পারি করে দেব।'

প্যারীদা কান পেতে শুনছিল, লক্ষ্য করিনি। তক্ষুণি বললে, 'নম্বরটা টুকে নাও হে, আলী। কাজে লাগবে।'

পরে খবর নিয়ে জানতে পারলুম, নিশীথদা কত বড় ডাকসাঁইটে ব্যারিস্টার এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেই আলীপুরের আমল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচজনের জানা-অজানাতে কত অসংখ্য বার ফীজ না নিয়ে বিপ্লবীদের জন্য লড়েছেন। লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠলো।

কিন্তু থাক এসব কথা। পূর্বে নিবেদন করেছি, এসব কথা গুছিয়ে বলবার জন্য লোকের অভাব হবে না।

নিশীথদা প্রায় আমার বাপের বয়সী ছিলেন, কিন্তু কি করে তিনি যে একদিন দাদা হয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, তাঁকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করে দিয়েছি। সে শুধু যাঁরা নিশীথদাকে চিনতেন, তাঁরাই বলতে পারবেন।

একই প্লেনে শিলং গেলুম, সেখানে প্যারীদার বাড়িতে উঠলুম। সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে আমার ঘরে ঢুকে খাটের একপাশে বসে বললেন, 'কবি (বিশ্ব সাক্ষী, আমি কবি নই) চমৎকার ওয়েদার, বাইরে এসো।' বাইরে মুখোমুখি হয়ে বসলুম। তিনি নানা রকমের প্রাচীন কাহিনী বলে যেতে লাগলেন; অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন বাড়ুয্যে, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখুয্যে, আব্দুর রসুল এঁদের সম্বন্ধে এমন সব কথা বললেন, যার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, কতখানি পাণ্ডিত্য, কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকলে পরে মানুষ এত সহজে বাঙলা দেশের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এবং তার কৃতী সন্তান-দের জীবনী একবার মাত্র না ভেবে অনর্গল বলে যেতে পারে। আজ আমার দুঃখের অবধি নেই, কেন সেসব কথা তখন টুকে রাখলুম না।

আমি মূর্খের মত মাঝে মাঝে আপত্তি উত্থাপন করেছি এবং খাজা গবেটের মত আইন নিয়েও। নিশীথদার চোখ তখন কৌতুক আর মৃদু হাস্যে জ্বলজ্বল করে উঠত। চুপ করে বাধা না দিয়ে শুনতেন। তারপর মাত্র একখানি চোখা-যুক্তি দিয়ে আমাকে দু'টুকরো করে কেটে ফেলতেন। আমার তাতে বিন্দুমাত্র উত্তাপ বোধ হয়নি। তাই শেষের দিকে যখন যে সব জিনিস নিয়ে আমি মনে মনে দম্ভ পোষণ করি, সেখানেও আমি তর্কে হেরে যেতুম তখন প্রতিবারে আনন্দ অনুভব করেছি, এই লোকটির সংস্রবে আসতে পেরেছি বলে।

কী অমায়িক অজাতশত্রু পুরুষ! আর কি একখানা স্নেহকাতর হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। আইন আদালতের খররৌদ্র তাঁর সে শ্যামমনোহর হৃদয়ে সামান্যতম বাণ হানতে পারেনি।

তাঁর বয়স তখন ৭০। সেই শিলঙে একদিন সকাল বেলা দেখি, ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত পুরে বারান্দায় ঘন ঘন পাইচারি করছেন, মুখে সিগার নেই। কথা কয়ে ভালো করে উত্তর পাইনে। কি হয়েছে, ব্যাপার কি নিশীথদা?

তিন দিন ধরে স্ত্রীর চিঠি পাননি।

সে কি নিশীথদা, সত্তর বছর বয়সে এতখানি?

সেই জ্বলজ্বল চোখ—সে চোখ দুটি কেউ কখনো ভুলতে পারে—দিয়ে বললেন, 'কবি, সব জানো, সব বোঝো, কিন্তু বিয়ে তো করোনি, তাহলে এটাও বুঝতে।'

নিশীথদা বউদিকে বড্ড ভালোবাসতেন। আমি জানি নিশীথদা আরো কিছুদিন কেন এ সংসারে থাকলেন না।

ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ডসৌভাগ্যবতী শ্রীমতী শোভনা ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশীথদার জীবনের জ্যোতিও যেন নিভে গিয়েছিল।

আজ বোধ হয় নিশীথদার আর কোনো দুঃখ নেই—আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

সাধারণতঃ মানুষ সাজ-পোষাক পরে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু এই পোষাকটি মানবীয় রূপকে দানবীয় রূপ দিয়েছে। অবশ্য এই পোষাক সাজবার জন্য তৈরী হয়নি, বাঁচবার জন্য তৈরী হয়েছে। বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছে, কিন্তু ডুবো জাহাজের নাবিকদের প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে কোনও উপায়

পোষাকটি পরে একটি নাবিককে জলের মধ্যে ভাসতে দেখা যাচ্ছে

বার করতে পারেনি। এই সব নাবিকেরা তাদের প্রাণটি হাতে করেই ডুবো জাহাজে করে জলের তলায় নামে। কারণ অনেক সময় এই সব ডুবো জাহাজের সলিল-সমাধি ঘটে। বৃটেনে এই নূতন পোষাকটি বার হওয়ায় নাবিকদের খুব সুবিধা হয়েছে। এই পোষাক পরে থাকলে নাবিকেরা জাহাজ ডুবে গেলেও জাহাজ থেকে জলের ওপর ভেসে আসতে পারে। এই পোষাকটি রবার ও নাইলন দিয়ে তৈরী হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার একরকম যন্ত্র এই পোষাকটির সঙ্গে লাগান থাকে। পোষাকটির পিঠের কাছে একটা আলো থাকে। এই আলো আবার সমুদ্রের জলের সাহায্যে জ্বলে। এইভাবে ত্রিশ ঘণ্টা জ্বলতে পারে। সমুদ্রের জলের ঠাণ্ডা থেকে এই আলো শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে।

*

আমেরিকার কৃষি-বিভাগ শস্য থেকে যে চিনি তৈরী হয়, সেই চিনি দুধের সঙ্গে মিশিয়ে একরকম কৃত্রিম উপায়ে রবার তৈরী করছে। এই জাতীয় রবারের নাম Lactoprene B N.। এই রবার আসল রবার ও অন্যরকম নকল রবারের চেয়ে অনেক ভাল। এই রবার তেলে-জলে কিংবা খুব গরম আর ঠাণ্ডায় নষ্ট হয়ে যায় না। এই ধরণের রবার জ্বালানী তেলের ট্যাংকের পলস্তারা আর রেফ্রিজারেটারের বিভিন্ন জায়গায় ফুটো বন্ধ করা কিংবা গ্যাসকেটের মুখ বন্ধ করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

*

লোহার বা ইস্পাতের যন্ত্রপাতি পুরনো হলেই মরচে ধরে যায়। আমেরিকায় একরকম রাসায়নিক কাগজ বার হয়েছে—এই কাগজে যন্ত্রপাতি মুড়ে রাখলে মরচে ধরে না। অবশ্য ভেসলিন মাখিয়ে মুড়ে রাখলে মরচে ধরার সম্ভাবনা থাকে না, তবে এই কাগজে মুড়ে রাখা ভেসলিন মাখিয়ে রাখার চেয়ে অনেক সোজা ব্যবস্থা বলেই মনে হয়। এতে খরচও কম পড়ে। Vip নামে একরকম রসায়ন-দ্রব্য এই কাগজে মাখান থাকে। এই 'ভিপ' সাদা সাদা গুড়ো পদার্থ। এতে কোনও গন্ধ নেই। এই কাগজে মুড়ে যন্ত্রপাতি রাখলে অনেক দিন ভাল রাখা যায়; এমন কি, জলীয় বাষ্পতেও নষ্ট হয় না।

*

আজকালকার দিনে একখানা কাপড় যত বেশীদিন টিকিয়ে রাখা যায় ততই ভাল। অবশ্য সাধারণ কাপড় খুব বেশীদিন টেঁকে না। তবে আজকাল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তুলোর আঁশকে যদি 'হাইড্রোসিয়ানিক এসিডে' চুবিয়ে নিয়ে সুতো তৈরী করা হয়, তাহলে সেই সুতোর কাপড় খুব টেঁকসই হয়। এই কাপড় সাধারণ কাপড়ের চেয়ে দশগুণ বেশী টেঁকসই হতে পারে।

*

অস্ত্র-চিকিৎসকদের পক্ষে অস্ত্রোপচারের সবচেয়ে বড় সমস্যা এই যে, কাটাকুটির পর খুব তাড়াতাড়ি রক্তবাহী শিরা ও ধমনীগুলো না সেলাই করতে পারলে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। একজন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক এতদিনে এই অসুবিধা দূর করতে পেরেছেন। এই বৈজ্ঞানিকটির নাম Vasili Gudov. তিনি একটি যন্ত্র বার করেছেন, এই যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই সব শিরা ও ধমনী সেলাই করে ফেলা যায়। রাশিয়ার বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক Michail Akhalya এই যন্ত্রে কাজ করে দেখেছেন যে, যন্ত্রটি সত্যই কার্যকরী। এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করে ভ্যাসিলী গুডাভ বিখ্যাত স্ট্যালিন প্রাইজ পেয়েছেন।

*

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় Bulb তৈরী করা হচ্ছে

ওপরের ছবির Bulbটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় Bulb। এই Bulbটি ৫০,০০০ ওয়াটের, আর এর থেকে ১৩০০০০০ ক্যান্ডল পাওয়ারের আলো পাওয়া যায়। প্রায় চল্লিশখানা বাড়ীর আলো জ্বালানোর যা খরচ, এই একটি আলো জ্বালাতে সেই খরচই পড়ে। এই আলো জ্বালাতে খুব শক্তিশালী বৈদ্যুতিক শক্তির দরকার। এটি লম্বায় ৩৫" ইঞ্চি এবং এর ব্যাস ২০" ইঞ্চি। যুদ্ধের সময় এইরকম চারটি Bulb তৈরী করা হয়েছিল।

*

ইংলণ্ডের এক ওষুধ তৈরির কম্পানী ফুসফুসের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করবার জন্য পেনিসিলিন থেকে এস্টোপেন বলে এক নতুন ধরণের ওষুধ তৈরি করেছে। দেখা গেছে যে এস্টোপেন প্লুরেসি, ব্রঙ্কাইটিস্ ইত্যাদির পক্ষে বেশ উপকারী।

(১) উলু (২য় সংস্করণ)—২।০, (২) দিল্লি অনেক দূর—২৲; মনোজ বসু, বেংগল পাবলিশার্স; ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

ছোট গল্পের পরিণামরস যাতে একটি অমোঘ আবেদনের তীব্রতা অর্জনে সক্ষম হয় সাহিত্যিকরা তার জন্যে, সচরাচর যা দেখা যায়, ঘটনাবিন্যাসের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। ক্লাইম্যাক্স নামক বস্তুটি—সদর্থে —তাঁদের তুরুপের তাস এবং গল্পের যখন প্রায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থা, তাসটিকে টেবিলে নামিয়ে দিয়ে অবশচিত্ত পাঠককে তাঁরা প্রায় তৎক্ষণাৎ জয় ক'রে নেন্। এ কৌশলের ক্রিয়া খানিকটা অনিবার্য, প্রয়োগ ফলটাও তাই হাতে-হাতেই পাওয়া যায়। মূলত এতে দোষের কিছু আছে বলে আমাদের মনে হয়না, তবে দুঃখের কথা—ইদানীং এই ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে উৎকট স্টাণ্ট্-প্রীতির ঈষৎ বাহুল্য দেখা যাচ্ছে। সুস্থচিত্ত পাঠক তার জন্যে উদ্বেগ বোধ করবেন।

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু ভিন্ন পথাশ্রয়ী লেখক। তাঁর লেখা ছোট গল্পে, ঘটনা নয়, মেজাজটাই বড়ো কথা। শিল্পশৈলীতে তিনি প্রখর নন, একটুবা ঢিলেঢালা। ফলে, অতিকৌশলের শৈল-শিখরেও আর আমাদের মাথা ঠুকে মরতে হয় না। গল্প বয়নের ক্ষেত্রে কড়া-ইস্ত্রীর অস্বস্তিকর অবস্থাটাকে তিনি এতই সযত্নে পরিহার করে চলেন যে তাতে আমাদের দম ফেলবার একটু নিশ্চিন্ত অবকাশ মেলে, অবসরের প্রশ্রয় পাওয়া যায়।

তা ছাড়া তাঁর ছোট গল্পের সর্বত্রই একটি স্নিগ্ধ সান্ত্বনা বর্তমান। গল্প পাঠের পর উপলব্ধি করা যায়, পাঠকচিত্তেও তার সমস্তটুকু স্বাদ সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

একসাথে তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ 'উলু' এবং 'দিল্লী অনেক দূর' পড়বার পর এই সহজ সত্যকে আমরা আরো একবার উপলব্ধি করলাম। দুটিই ছোট গল্পের বই। তবে তাদের সুর আলাদা। প্রথমটির বিষয়বস্তু মূলত রোমাণ্টিক, দ্বিতীয়টির রাজনৈতিক। তা সত্ত্বেও, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে, শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে একটি চারিত্র্যগত সাদৃশ্য এসে গেছে। রাজনীতির মতো উদগ্র বিষয়বস্তু নিয়েও তিনি যে শান্তসুর ছবি ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস পেয়েছেন তাতে করে, আর কিছু না হোক, এটুকু অন্ততঃ বোঝা গেল যে, সরব জয়ধ্বনিতে নয়, সহজ স্বীকৃতিতেই তিনি অধিকতর আস্থাশীল।

প্রথম গ্রন্থের 'উলু' এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের 'কুম্ভকর্ণ' —এ দুটি গল্প আমাদের সব থেকে বেশী ভালো লেগেছে। অ্যাটমস্ফিয়ের নির্মাণের দিক থেকে 'উলু' গল্পটি অপূর্ব।

আধুনিক আলোকচিত্রণ—শ্রীপরিমল গোস্বামী প্রণীত। ফটোগ্রাফিক স্টোর্স অ্যাণ্ড এজেন্সি লিঃ, ১৫৪ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

পরিমলবাবু সাহিত্যিক এবং সেই সঙ্গে তিনি একজন বিশিষ্ট আলোকচিত্রশিল্পীও বটেন। একাধারে এই দুইটি গুণের অধিকারী হওয়ায় তাঁহার পক্ষে এইরূপ পুস্তক প্রণয়ন সম্ভব হইয়াছে।

বাঙলায় ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে ছোট-খাট কয়েকটি বই ইতিপূর্বে বাহির হইয়াছে; কিন্তু এমন সহজ সরল ও নিখুঁত আলোচনা সম্বলিত সচিত্র বই বাহির হয় নাই। পরিমল-বাবু অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে এরূপ বই যে রচনা করিয়াছেন ইহার জন্য শিক্ষানবীশ ফটোগ্রাফারগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে। কারণ এ বইতে কেবল ফোটোগ্রাফির কৌশলেরই বিষয়ই যে শিক্ষাদান করা হইয়াছে এমন নয়, বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা আলোকচিত্র-শিল্পের পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আর্ট কাগজে লাইনো হরফে ছাপাইবার দরুণ বইটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। পাতায় পাতায় ছবি আছে, ছবিগুলিও এই কারণে স্পষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯টি আর্ট প্লেট সংযুক্ত করা হইয়াছে এবং একটি স্বাভাবিক বর্ণের চিত্র আছে। ছবিগুলি সবই লেখক কর্তৃক গৃহীত।

প্রকাশক যে এই বই প্রকাশে কোনোরূপ কৃপণতা করেন নাই, তাহার নিদর্শন স্পষ্ট। এরূপ ব্যয়সাধ্য গ্রন্থ প্রকাশে তাঁহারা যে উৎসাহী হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারাও ধন্য-বাদার্হ। ১০৭।৫১

মঞ্জরী—সম্পাদিকা শ্রীমতী আরতি সেন। প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টারস্ য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা। দাম চার টাকা।

বাঙলা সাহিত্যের কয়েকজন সুবিখ্যাত লেখকের লেখা ও শিল্পীর আঁকা ছবি একত্রে সংগ্রহ করে সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। রচনা-বৈচিত্র্য ও মুদ্রণ পারিপাট্যে পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক। পাঠকসমাজে এটির সমাদর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সত্তা—সম্পাদক শ্রীযোগেশচন্দ্র মণ্ডল। প্রাপ্তিস্থান—জ্ঞানদানন্দ সেবা সঙ্ঘ, ৫১, মধু রায় লেন, কলিকাতা।

জ্ঞানদানন্দ সেবা সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম বর্ষ দোলসংখ্যা সত্তা পত্রিকাখানিতে শ্রীজ্ঞানদানন্দ ঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। এই পত্রিকা পাঠে সঙ্ঘের আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্বন্ধেও সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। ক্রোড়পত্রে জ্ঞানদানন্দ মহারাজের একটি ধ্যানরত ছবি রহিয়াছে, প্রচ্ছদপট, ছাপা ও কাগজ মনোরম।

জগদ্বন্ধু পঞ্জিকা, ১৩৫৮—শ্রীমনোহর জ্যোতির্ভূষণ। প্রকাশক: যোগ জ্যোতিষাশ্রম ৬১, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট (আনন্দ লেন) কলিকাতা—৫। মূল্য—৸০।

পঞ্জিকা হিন্দু গৃহস্থের একান্ত সঙ্গী। বর্তমানে পঞ্জিকাকে না অনুসরণ করার একটা ঝোঁক দেখা গেলেও তাহা প্রবল নহে। নানা-ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, পঞ্জিকা না হইলে হিন্দু গৃহস্থের চলিতে পারে না এবং যেসব তথ্য ও তত্ত্ব থাকিলে পঞ্জিকা সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে, আলোচ্য 'জগদ্বন্ধু পঞ্জিকায়' তাহার অভাব নাই। নবপর্যায়ে প্রকাশিত পঞ্জিকাটির মূল্য অল্প হওয়ায় গৃহস্থের পক্ষে ইহা ক্রয় করা সহজ হইবে।

পূর্ণিমা (রবীন্দ্র সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৫৮)—প্রধান সম্পাদক: কুমার পিনাকভূষণ। কার্যালয়: ৪৮এ, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য—৷৷০।

কলিকাতার অভিজাত মাসিকপত্রসমূহের মধ্যে 'পূর্ণিমা' অন্যতম। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিমূলক আলোচনা দ্বারা ইহা প্রতি মাসেই রসিক সমাজকে আনন্দ দান করিয়া সুযশ অর্জন করিতেছে। ইহার আলোচ্য সংখ্যাটি 'রবীন্দ্র সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। রচনা সম্ভারে ইহা যেমন সুন্দর তেমনি তথ্য-পূর্ণ হইয়াছে। ইহা ছাড়া, বর্তমান সংখ্যায় বিভিন্ন বিভাগীয় প্রবন্ধাদিও মনোরম হইয়াছে। আমরা পূর্ণিমার বহুল প্রচার কামনা করি।

১। প্রভাত চিন্তা—২৷৷০

২। নিশীথ চিন্তা—২৷৷০

কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

পুস্তক দুইখানির পরিচয় বাঙালী পাঠক সমাজে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের মনীষামূলক অবদান একদিন বাঙলা দেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গভীর চিন্তাশীলতা তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। বস্তুত বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে "বান্ধব" সম্পাদকের ভাবগর্ভ রচনারাজী একটি উল্লেখ-যোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। আলোচ্য গ্রন্থ দুইখানি পুনঃ প্রকাশিত হওয়াতে আমরা সুখী হইয়াছি। স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয়ের অন্যান্য গ্রন্থগুলিও পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইতেছে একথা জানিয়াও আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এই ধরণের গম্ভীর রচনার পঠন পাঠনের প্রয়োজন বর্তমান সময়ে বিশেষভাবে আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ১১৯-১২০।৫১

রঙ্গজগৎ

এখনকার প্রমোদ বাজার

গত ক'বছর ধরে গড়াতে গড়াতে প্রমোদ-বাজার এখন দুর্দশার প্রায় চরম অবস্থায় এসে পেঁছেছে। যুদ্ধের জের কেটে গিয়ে সাধারণ বাজার যে রেটে লোকের আর্থিক দুর্গতিকে প্রতিফলিত করে আসছে, প্রমোদ-বাজারও তার সঙ্গে অনুপাত বজায় রেখে আসছে। পয়সার অনটন দুবাজারের ক্ষেত্রেই সমান, কিন্তু তার মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে, সাধারণ বাজারের বিপণিকাররা লোককে প্রলুব্ধ করার জন্যে যেমন উদ্যোগী হয়েছে, প্রমোদ-ব্যবসায়ীরা চলে আসছেন ঠিক তার উল্টো দিক ঘেঁষে। একদিকে চেষ্টা বিপণির জৌলুষ বাড়িয়ে পণ্যসম্ভারকে যতদূর সম্ভব চটকদার করে ব্যাপকভাবে প্রচার-বিজ্ঞাপনের সাহায্যে লোকের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তোলার চেষ্টা, আর অপর-দিকে প্রমোদ-ব্যবসায়ীরা প্রমোদ উপাদানের মনোহারিত্বকে বিলোপ করে তোলায় মনোনিবেশ করেছেন, আর সেই সঙ্গে এমন কি উৎকর্ষ জলাঞ্জলি দিয়েও ঝুঁকে পড়েছেন খরচ কমিয়ে 'যা হোক কিছু' এনে হাজির করার দিকে। ফল এই হলো—একে লোকে পয়সার অভাবে প্রমোদের জন্যে ব্যয় করায় খানিকটা সংযত হয়ে পড়েছিলো, তবু যাও বা তারা বরাদ্দ করে রাখে, একেবারে বাজে জিনিস আমদানী হতে থাকায় তারা আরো বেশী করে হাত গুটিয়ে ফেলতে আরম্ভ করেছে। গত বছর কয়েক ধরে এইভাবে চলতে চলতে এখন এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়ে পড়েছে যে, কোন প্রমোদই আর লোকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়াতে পারছে না—প্রমোদের খাতে খরচ সংকুচিত করতে করতে এমন অবস্থায় এসেছে যে, এখন আদপেই খরচ করাটা লোকের পক্ষে শংকার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে ভালো ছবি, কি ভালো নাটক, অথবা অন্যান্য মনোজ্ঞ অবদান উপস্থিত হয় নি তা নয়, কিন্তু সেগুলিও যে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা ও জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি তার কারণ আর্থিক অনটনের চেয়ে খরচ করার শংকাটাই হচ্ছে বেশী দায়ী। তা নয়তো লোকের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়াটা যেমন সত্যি, তেমনি একথাও হিসেবে ধরতে হবে যে, আগের চেয়ে প্রমোদ-ভক্তের সংখ্যাও গিয়েছে অনেকগুণ বেশী হয়ে। বরং হিসেব করলে হয়তো দেখা যাবে যে, প্রমোদ-ভক্তের সংখ্যা এখন যা দাঁড়িয়েছে, তাতে তাদের বেশীর ভাগকে যদি প্রমোদ-গৃহের দিকে আকর্ষিত করা যায়, তাহলে প্রমোদ-ব্যবসা এখনকার দুর্দশা থেকে বোধ হয় পরিত্রাণ পেয়ে যায়। এই অবস্থায় পেঁছতে গেলে লোকের মধ্যে থেকে প্রমোদের জন্যে খরচ করার শংকাকে দূর করে দিতে হবে, আর তা করতে গেলে প্রমোদ-অবদানগুলির জৌলুষও যেমন বাড়িয়ে তুলতে হবে, তেমনি রূপে ও রসে তাকে মোহনীয় করে তুলতে হবে, আর সেই সঙ্গে চটকদার প্রচারের সাহায্যে লোকের মধ্যে এমন সাড়া জাগিয়ে তুলতে হবে, যাতে সে অবদানের প্রতি লোকের স্বতঃস্ফূর্ত ঝোঁক দেখা দেয়। আরও একটা বিশেষভাবে নজর রাখার দিক হচ্ছে, যা কিছুই করতে যাওয়া যাক রূপ ও নীতির সৌষ্ঠবটুকু যেন সর্বথা পরিব্যাপ্ত থাকে—এর ব্যতিক্রমও এখনকার দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কোন ছবি বা নাটক, অন্য কোন প্রমোদ অবদান চেহারায় ও নীতিতে

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ও পরিচালিত 'হানাবাড়ি' চিত্রের একটি রহস্যজনক চরিত্রে বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য। ছবির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে

রূপায়ন থিয়েটার্সের আগতপ্রায় চিত্র দুর্গেশনন্দিনীর 'আয়েষা'র ভূমিকায় শ্রীমতী ভারতী দেবী

সুষ্ঠু হয়েও হয়তো বিন্যাস দোষে বা অন্য কোন কারণে জমাটি হতে পারে নি, কিন্তু সে অবদানের জন্যে প্রমোদ-ব্যবসার অমর্যাদা হয় নি বা প্রমোদের ওপরে লোককে বীতশ্রদ্ধ করে নি। কিন্তু এ রীতি যারা না মেনে সংসারের বিকৃতি, কদর্যতা ও দুর্নীতিকে অবলম্বন করে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছে, তাদের সে অবদানগুলি তো নিন্দিত ও অপ্রিয় হয়েছেই, সেই সঙ্গে পর্দা বা মঞ্চেরও এমন দুর্নাম করিয়ে দিয়েছে যে, লোকের যেটুকুও বা ওদিকে ঝোঁক ছিল, তাও ঘৃণায় পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ ধারণা মোটেই কল্পনাপ্রসূত নয়। সম্প্রতিকালের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত ডজনখানেক ছবির ওপরে বহু লোককে পর্দা সম্পর্কে এমন মন্তব্য প্রকাশ করতে শোনা গেল যে, অদূর ভবিষ্যতে ছবি দেখায় তাদের প্রলুব্ধ করা মোটেই সহজ হবে না। এইসব দর্শকদের কেউ বলেছেন যে, ছবি দেখার দরকার বোধ করলে তাঁরা বরং বিদেশী ছবিই দেখতে যাবেন; কেউ কেউ জানিয়েছেন ছেলেমেয়েদের ছবি-দেখা বন্ধ করে দেবেন; আবার কেউ কেউ ছবি না দেখে পয়সা বাঁচাবার সন্তোষও প্রকাশ করেছেন। রূপ ও নীতিকে বিকৃত ও কদর্য করে ঐসব ছবির নির্মাতারা চলচ্চিত্র-শিল্পের দুরবস্থাকে আরও সাংঘাতিকই করে তুলছেন। তাদের জন্যেই চলচ্চিত্র আজ উত্তরোত্তর পৃষ্ঠপোষক হারাচ্ছে; পৃষ্ঠপোষক তথা খরিদ্দার কমে যাচ্ছে বলে উৎপাদনও যাচ্ছে কমে; আর উৎপাদন কমে যাচ্ছে বলে শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

স্টুডিওগুলিতে কাজ কমিয়ে অথবা একেবারে অচল করে দেওয়ার জন্যে শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীদের বেকার অবস্থার দুর্গতির জন্যে দেশের আর্থিক দুরবস্থা এবং প্রমোদ-করের গুরুতর চাপ যত না দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী ঐসব চিত্রনির্মাতারা, যাঁরা 'ভৈরব মন্ত্র', 'সংকেত', '...য়তি', 'সে নিলো বিদায়', 'জিঘাংসা', '...পান্তর', 'সগাই', 'সরগম্', 'হালচাল' প্রভৃতির মতো ছবি তুলে সমগ্র চিত্রশিল্পের দুর্নাম সৃষ্টি করে পৃষ্ঠপোষক হ্রাস করেছেন। নিজেদের অজ্ঞতাপ্রসূত ব্যর্থতাকে ...পময় সংক্রামিত করে দেবার এ'দের এই ...তি অচিরে রোধ না করতে পারলে শিল্পকে বাঁচাবার উপায় থাকবে না।

এখন শুধু সেইসব চিত্রনির্মাতা, পরিচালক, শিল্পী, কলাকুশলীর দরকার যাঁদের চিত্রশিল্পের ওপরে প্রতি টুকরো ইট-কাঠ ও প্রতিটি ব্যক্তির ওপরে সত্যিকারের দরদ আছে; দেশের প্রতি, দেশের মানুষ-জনের প্রতি যাঁদের সত্যিকারের টান আছে; শিল্প ও সাহিত্যের ওপরে যাঁদের মোহ আছে—তাঁরাই পারবেন চলচ্চিত্রকে ঠিক-মতো কাজে লাগাতে এবং শিল্পকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে।

সংগীতে বালিকার কৃতিত্ব

সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে যে সংগীত-কলা প্রতিযোগিতা হয়ে গেল, তাতে কলকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীঅমলচন্দ্র রায়ের সপ্তম বৎসর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী উর্মি রায় খেয়াল, ভজন, কীর্তন ও রবীন্দ্র-সংগীতে প্রথম এবং ভাটিয়ালীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর সম্মান অর্জন করেছেন। শ্রীমতী উর্মি সুবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীসুখেন্দু গোস্বামীর এবং কলকাতা সংগীত ভারতী স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী।

টেবিল টেনিস

বহু আকাঙ্ক্ষিত পূর্ব ভারত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা ইডেন উদ্যানস্থ ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের নবগঠিত অসম্পূর্ণ "ইন্ডোর" স্টেডিয়ামে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় বহু ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলেও দীর্ঘ এগার দিন স্টেডিয়াম কয়েক সহস্র পুরুষ ও মহিলা দর্শকের আনন্দোজ্জ্বল হর্ষ-ধ্বনি ও করতালিতে যে মুখরিত হইয়াছে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এমন কি এই প্রতিযোগিতার পরিচালকগণের অনেককে পর্যন্ত বলিতে শুনা গিয়াছে "এত অধিক দর্শক যে এই খেলা দেখিবার জন্য সমবেত হইবেন ও প্রতি দিনের অসুবিধা ও অসচ্ছন্দতা নির্বাক-চিত্তে বরণ করিয়া লইবেন ইহা আমাদেরও কল্পনাতীত ছিল।" খেলার মান বা স্ট্যান্ডার্ড ও প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও আকর্ষণ যে দর্শক-গণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য। এই প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা আকর্ষণের কারণ ছিলেন বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ান ব্রিটেনের খেলোয়াড় জনী লীচ। ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে ইতঃপূর্বে কোন খেলা বা প্রতিযোগিতায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানকে প্রত্যক্ষ-ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের সহিত ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ কিরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ইহা দেখিবার জন্যই ক্রীড়ামোদীদের এত উৎসাহ ও উত্তেজনা। ইহার পরেই ফরাসী চ্যাম্পিয়ান মাইকেল হগনেয়ারের যোগদানও উল্লেখযোগ্য। এই সদা হাস্যময় ফরাসী খেলোয়াড়ও একজন বিশ্বখ্যাত টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। বিশ্ব ক্রমপর্যায় তালিকায় ইহার স্থান অষ্টম হইলেও ইনি যে জনী লীচ অপেক্ষাও কম যান না তাহাও এই প্রতিযোগিতায় প্রমাণিত হইয়াছে। ইনি প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কল্যাণ জয়ন্তকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে অনায়াসে স্ট্রেট গেমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জনী লীচকেও পরাজিত করিয়াছেন। এই সাফল্যের পর বহু ক্রীড়া সাংবাদিক ইঁহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন "ইতিপূর্বে কি আপনি জনী লীচকে পরাজিত করিয়াছেন? ইনি সহাস্যবদনে উত্তর দেন বহুবার আমরা মিলিত হইয়াছি এবং বহুবারই আমি পরাজিত হইয়াছি। কতবার যে আমি সাফল্যলাভ করিয়াছি বলিতে পারি না।" বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিতে ইনি এতই অনিচ্ছুক যে কিছুতেই তাহা নিজ মুখে প্রকাশ করেন নাই। সাংবাদিকগণকে বহু অনুসন্ধানের পর আবিষ্কার করিতে হইয়াছে যে হগনেয়ার পূর্বে জনি লীচকে পাঁচবার পরাজিত করেন ও ১৫বার লীচের নিকট পরাজিত হন। ১৯৪৯ সালে প্যারিসে ফ্রান্স বনাম

ইংলণ্ডের খেলায় তিনি শেষ জয়পরাজয় নির্ণয়ক খেলায় স্ট্রেট গেমে জনি লীচকে পরাজিত করিয়া দেশের ও জাতীয় টেবিল টেনিস দলকে জয়যুক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে আরও জানিতে পারা যায় যে, হগনেয়ার প্রায় ২০ বৎসর টেবিল টেনিস খেলিতেছেন। ১৯৩১ সালে সর্বপ্রথম ১৫ বৎসর বয়সে ইনি

পূর্ব ভারত টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ান ফরাসী খেলোয়াড় মাইকেল হগনেয়ার।

টেবিল টেনিস খেলায় যোগদান করেন। ১৯৩৩ সালে ইনি ফরাসী চ্যাম্পিয়ন হন। ইহার পর একাদিক্রমে ঐ সম্মান তিনি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হন। খেলা শিক্ষার গুরু হিসাবে তিনি ভিক্টর বার্নার নাম উল্লেখ করেন। ইনি বলেন ১৯৩৬ সালে ইংলিশ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপের সেমি-ফাইনালের খেলায় লণ্ডনে ভিক্টর বার্নারকে পরাজিত করিয়া ইনি সর্বপ্রথম বিশ্বখ্যাত টেবিল টেনিস খেলোয়াড় বলিয়া পরিগণিত হন। ইনিই সেই লোক যাহার জন্য বিশ্ব টেবিল টেনিস ফেডারেশন খেলার ফলাফল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করিবার জন্য আইন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইনি ১৯৩৬ সালে প্রাগের বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় রুমানিয়ার ম্যারিয়নের সহিত সাড়ে সাত ঘণ্টা পর্যন্ত একটি খেলা চালাইয়াছিলেন। ফলে খেলার ফলাফল নির্ধারণ করিতে টাকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এতবড় একজন খ্যাতিমান ও কৃতী খেলোয়াড় ভারতে আসিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছেন ইহাও কম গৌরবের বিষয় নহে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের মান

জনি লীচ ও মাইকেল হগনেয়ারের ন্যায় দুইজন বিশ্বখ্যাত টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ বিশেষ করিয়া কল্যাণ জয়ন্ত ও তিরুভেঙ্গদম যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে ভারতের টেবিল টেনিস খেলার মান সম্পর্কে হতাশ হইবার কিছুই নাই উপরন্তু আশান্বিত হওয়া উচিত। ইহারা দুইজনেই ভারতীয় খেলার মানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ইহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন ভারতীয় খেলোয়াড়গণ আরও অধিক সংখ্যক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়দের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে ফলাফল ভালই হইবে ও অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানদের মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে। কল্যাণ জয়ন্ত সম্পর্কে বলিয়াছেন "বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হইবার উপযুক্ত নৈপুণ্য ইহার আছে, কেবল অভাব আত্মনির্ভরতা ও দৃঢ়তার।" তিরুভেঙ্গদম সম্পর্কে ইহারা বলিয়াছেন "ইঁহার আত্মরক্ষা কৌশল অপূর্ব—আক্রমণ করিবার কৌশল আয়ত্ত করিলে ইনি বিশ্বখ্যাত হইতে পারিবেন।" ভারতের মহিলা খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে ইঁহারা বিশেষ উৎসাহ-বর্ধক অভিমত প্রকাশ করেন নাই। তবে বলিয়াছেন ইঁহাদের মান উন্নততর করিতে হইলে নিয়মিতভাবে পুরুষদের সহিত খেলিতে হইবে। মিস সুলতানার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই উৎসাহপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন।

কল্যাণ জয়ন্ত ও তিরুভেঙ্গদম

এই দুই জনও তরুণ। ইঁহাদের দুইজনের বয়সই ২০ বৎসর। ইঁহাদের খেলার কৌশল দেখিয়া সত্য সত্যই বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না। কল্যাণ জয়ন্ত জনি লীচের সহিত প্রদর্শনী খেলায় অনেক সময়েই লীচকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে হগনেয়ারকে পর্যন্ত পরাজয়ের সম্মুখীন করিয়াছিলেন। কেবল অভিজ্ঞতা ও দৃঢ়তাই হগনেয়ারকে শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। তিরুভেঙ্গদম জনি লীচের সহিত সেমি-ফাইনালে তীব্র প্রতিযোগিতার পর পরাজয় বরণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয়দের জন্য যে বিশেষ নির্ণয়ক প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা ছিল তাহাতে ফাইনালে প্রবীণ ভিঠলকে পরাজিত করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। অথচ এই ভিঠলের নিকটেই কল্যাণ জয়ন্ত সেমি-ফাইন্যালে পরাজিত হন।

দেশী সংবাদ

২১শে মে—ভারতীয় পার্লামেণ্ট অদ্য এই সিদ্ধান্ত করেন যে, আটক বন্দীদের আগামী সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইবে।

পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কেশকার বলেন, পূর্ববঙ্গে হিন্দু গৃহে হিন্দু মালিক অথবা দখলকার বাস করা সত্ত্বেও হিন্দু গৃহ দখল করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আসামে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ব্যক্তিদের দমনে নিরত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী কর্তৃক একটি গুপ্ত অস্ত্রাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানে বিভিন্ন ধরণের আধুনিক অস্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে।

বরিশালে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় ডাকাতি, হত্যা এবং আরও কতকগুলি অপরাধ করার অভিযোগে জেলা ও দায়রা জজ মিঃ এম আমেদ ভোলা মহকুমার তজুমদ্দি থানার সাতজন মুসলমান দাঙ্গাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, মালান সরকারের বর্ণবিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রবাসী ভারতীয়রা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকার পণ্য বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

২২শে মে—শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী অদ্য কংগ্রেসের এবং কংগ্রেস কমিটিসমূহের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতের খাদ্য ও কৃষিসচিব শ্রী কে এম মুন্সী নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের খাদ্য কমিটির এক বৈঠকে বলেন যে, দেশের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে আমরা এখনও বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। আগামী আগষ্ট হইতে জানুয়ারী মাসের অবস্থা এখনও অনিশ্চিত।

২৩শে মে—পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট কোচবিহারে পুলিশের গুলী চালনা সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বিচারপতি শ্রী এস এন গুহ রায়কে নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিচারপতি শ্রী গুহ রায় আগামী ৪ঠা জুন কোচবিহারে তাঁহার তদন্ত কার্য আরম্ভ করিবেন।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ১৯ (২) অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধন সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ও নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি লালা দেশবন্ধু গুপ্তের মধ্যে যে পত্রালাপ হয়, আজ তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। লালা দেশবন্ধু গুপ্তের পত্রের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলিয়াছেন, এই সংশোধন উত্থাপনের সময় আমরা সংবাদপত্র সম্পর্কে কোনরূপ চিন্তাই করি নাই এবং এই সংশোধনের কুফল যাহাতে সংবাদপত্রের উপর পড়িতে না পারে, তজ্জন্য আমরা যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করিব।

প্রধান মন্ত্রীর এই পত্রের উত্তরে লালা দেশবন্ধু গুপ্ত বলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর এই আশ্বাসগুলির প্রকৃতপক্ষে আইনগত কোন সার্থকতা নাই।

সাপ্তাহিক সংবাদ

শাসনতন্ত্রের ১৯ (২) অনুচ্ছেদ সংশোধনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে ভোটদান ও কার্য সম্পাদনের স্বাধীনতা চাহিয়া পার্লামেণ্টের কংগ্রেস দলের প্রায় ৮০ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত একটি রিকুইজিশন প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর নিকট পেশ করা হইয়াছে।

২৪শে মে—কোচবিহারের স্বর্গত মহারাজকুমার ইন্দ্রজিত জিতেন্দ্রনারায়ণের পত্নী বলিয়া নিজের দাবী প্রমাণ করিবার জন্য অদ্য বোম্বাই হইতে মিসেস বিলি এভেলিন ব্রিজেস নামক একজন আমেরিকান মহিলা অদ্য কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি আলীপুরে কোচবিহার রাজবাটী উডল্যাণ্ড প্রাসাদে গমন করেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। কোচবিহারের রাজপরিবার তাঁহাকে পরলোকগত মহারাজকুমারের পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

২৫শে মে—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য পার্লামেণ্টে শাসনতন্ত্র (প্রথম সংশোধন) বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট দাখিল করেন। সিলেক্ট কমিটি ১৯নং এবং ৩১নং অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। বাক্-স্বাতন্ত্র্য ও অভিব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত ১৯ (২) অনুচ্ছেদের সংশোধনে সিলেক্ট কমিটি "বিধিনিষেধ" শব্দটির পূর্বে "যুক্তিযুক্ত" শব্দটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

জমিদারী প্রথা বিলোপ সংক্রান্ত ৩১নং অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনে সিলেক্ট কমিটি যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, জমিদারী দখলের উদ্দেশ্যে রাজ্য পরিষদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগের পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিতে হইবে।

ভারত ও পাকিস্থানের সীমান্তবর্তী বনগাঁ রেল স্টেশনে গত ২৬শে মে হইতে পুনরায় পূর্ব বঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের ভীড় আরম্ভ হইয়াছে।

দেশ-বিভাগের ফলে উদ্ভূত উভয় রাষ্ট্রের অমীমাংসিত আর্থিক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারত-পাকিস্থান অর্থনৈতিক সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে।

২৬শে মে—ভারত ও পাকিস্থানের সীমান্তবর্তী বনগাঁ রেল স্টেশন দিয়া ভারত হইতে প্রত্যহ বহু শত মণ লবণ ও তৈল পাচার হইতেছে। দিবালোকে সংগঠিতভাবে ও চাঞ্চল্যকর পদ্ধতিতে এই চোরাই চালান চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৭শে মে—বোম্বাইতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতীয় নৌবাহিনীকে পতাকা প্রদান করেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভারতীয় নৌবাহিনীকে অবিচলিত কর্তব্য নিষ্ঠার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য বজায় রাখিতে আহ্বান জানান।

শিলং-এ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মুখ্যসচিব সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, দুর্বৃত্তগণ যাহাতে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আসিয়া দুষ্কার্য করিতে না পারে, তজ্জন্য সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

বিহারের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য যেরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, সমগ্র ১৯৫০ সালে উক্ত রাজ্যে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ট্রেনযোগে প্রেরিত হইয়াছে, কেবলমাত্র এপ্রিল মাসেই তদপেক্ষা অধিক খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ—

২১শে মে—পারস্যের তৈল সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বোর্ডের সেক্রেটারী হোসেন মাকি তৈল বিরোধ সম্পর্কে বৃটেনের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার সকল প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

২৩শে মে—প্রাচ্যদেশগামী ইউরোপীয় বিমানে যাত্রিগণ বসরা হইতে করাচী দিয়া যাইবার সময় অদ্য রাত্রে জানান যে, তাহারা শাত-এল-আরব-এর মোহনায় পারস্য উপসাগরে ১০।১৫টি যুদ্ধ জাহাজ দেখিয়াছেন।

২৪শে মে—অদ্য সমগ্র কোরিয়া রণাঙ্গন ব্যাপিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনার আক্রমণে হতবল ও বিধ্বস্ত সহস্র সহস্র কম্যুনিস্ট সৈন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে পশ্চাদপসরণে প্রবৃত্ত হয় এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে। মাত্র ৮ দিন কম্যুনিস্টরা তাহাদের বসন্তকালীন অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ শুরু করে।।

দক্ষিণ কোরীয় বাহিনী পুনরায় ৩৮ অক্ষাংশ অতিক্রম করিয়া উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।

অদ্য পারস্য সরকার অ্যাংলো-ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানীকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, আগামী ছয়দিনের মধ্যে তাহাদিগকে কারবার বন্ধ করিতে হইবে, অন্যথায় তাহাদের কারবার গুটাইতে বাধ্য করা হইবে।

অদ্য মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে দুর্ভিক্ষ নিরোধকল্পে খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য ভারতকে ১৯ কোটি ডলার কর্জ দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

২৬শে মে—তৈল সম্পর্কে পারস্য গভর্নমেণ্টের সহিত যে বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহার মীমাংসার জন্য এ্যাংলো-ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানী এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট অদ্য হেগে আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট একজন সালিশী নিয়োগ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছে।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।৴৹ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৴৹ আনা, বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক—১০ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ]   শনিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ সাল।   Saturday, 9th June, 1951.   [৩২শ সংখ্যা

সংবিধান সংশোধনের ঝুঁকি

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংবিধান সংশোধনের যে প্রস্তাব প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ভারতীয় সংসদে উপস্থিত করেন, বিপুল ভোটাধিক্যে তাহা পাশ হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাবের পক্ষে ২২৮ এবং বিপক্ষে মাত্র ২০টি ভোট হয়। বলা বাহুল্য, ভোটের ফল যে এইরূপ দাঁড়াইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করা গিয়াছিল। বস্তুত এক্ষেত্রে সংসদের সদস্যদের উপর চাপ দিয়াই ভোট আদায় করা হইয়াছে। কংগ্রেসী দলের ৭৭ জন সদস্য এই সম্পর্কে স্বাধীনভাবে ভোট দানের অধিকার চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসী সদস্যদিগকে সে অধিকার দেওয়া হয় না এবং এইভাবে তাঁহারা অনেকে বিবেকের বেদনা বুকে রাখিয়াই দলগত স্বার্থসুবিধার দায়ে ভোট দিয়াছেন। সহজেই বুঝা যায়, সম্মুখে সাধারণ নির্বাচন; এক্ষেত্রে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া বিবেকের স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের সাহসে কুলায় নাই। নতুবা যাঁহারা কিছু আগে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর উপসংহার বক্তৃতা শুনিবার পর চৈতন্যোদয় হওয়াতে তাঁহারা প্রস্তাবের সমর্থনের দিকে ভিড়িয়াছেন এমন মনে করা সম্পূর্ণই অযৌক্তিক। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী প্রস্তাবের পক্ষ সমর্থনে নূতন কোন যুক্তিই উপস্থিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে সমর্থন করিয়া স্বরাষ্ট্রসচিব হিসাবে শ্রীরাজাগোপালাচারী মহাশয়ের যে উক্তি সেগুলিও বিচারসহ নহে। বস্তুত উভয়েরই কথা একই সুরে বাঁধা। তাঁহাদের উভয়ের কথা হইতে অন্তত এ বিষয়টি বেশই স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, সংবিধান সংশোধনের জন্য এতটা তাড়াহুড়া করিবার কোন দরকারই ছিল না। পণ্ডিত নেহরু বলেন, "এই সব সংশোধনে যে সব অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুযায়ী একটি আইনও আজ প্রণয়ন করিতে চাহি না।" রাজাজীর উক্তিও তদনুরূপ। তিনি বলিয়াছেন, "এতদ্দ্বারা গভর্নমেণ্টের হাতে কতকগুলি অধিকার দিয়া রাখা হইতেছে মাত্র; সুতরাং এই সংশোধনগুলি গৃহীত হইলেই যে জনগণের স্বাধীনতা কোন রকমে ব্যাহত হইবে, এমন মনে করা ভুল—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তো নহেই।" সুতরাং বাক্-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ হাতে রাখিবার উদ্দেশ্যে দেশের লোকের প্রবল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াও এমন অশোভন উদাম কেন, এ প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার কথা এই যে, তাঁহারা হাতিয়ার উঁচু করিয়া প্রস্তুত থাকিতে চাহেন। আঘাত উঁচাইয়া থাকিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। তিনি বলিয়াছেন যদিও এই সব অধিকারের প্রয়োজন এখন আমাদের নাই, কিন্তু জগতের অবস্থা যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এগুলি আমাদের দরকার হইয়া পড়িতে পারে! কিন্তু যখন কোন জরুরী অবস্থা দেখা দিত, তখন উদ্যমে প্রবৃত্ত হইতে বাধা কি ছিল? জগতের মধ্যে ভারত তো একমাত্র দেশ নয়। জগতের অবস্থা সুবিধাজনক নয়, এই আতঙ্কে আর কোন দেশ দেশের লোকের বাক্-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে কি প্রবৃত্ত হইয়াছে? বাস্তবিকপক্ষে সংশোধন প্রস্তাবের স্বপক্ষে এ সব একান্তই অবান্তর। সেইরূপ জরুরী অবস্থার জন্য গভর্নমেণ্ট প্রস্তুত থাকিতেছেন, এখন তাঁহারা বাক্-স্বাধীনতা কিংবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর কোনক্রমেই হস্তক্ষেপ করিবেন না, ফলতঃ তাঁহাদের এই ধরণের আশ্বাসিতও দেশের লোকে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারে না। ফলতঃ এই ধরণের সদিচ্ছা কর্তৃপক্ষের রহিয়াছে, আলোচনার আগাগোড়া আমরা এই একই কথা বারংবার শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা জানি, বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সব সদিচ্ছা ক্রমে শূন্যগর্ভ শব্দমাত্রে পর্যবসিত হয়। বস্তুত শাসকদের হাতে ন্যস্ত অধিকারকে সংহত করিবার মত ক্ষমতা যদি দেশের লোকের হাতে না থাকে, তবে তাহার অপ-প্রয়োগ ঘটিবেই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ভারতের প্রধান মন্ত্রী নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, "কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট-

সমূহের মধ্যে যদি কেহ স্বৈরাচারিতামূলক নীতি অবলম্বন করিয়া লব্ধ ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে তাহারা তদ্দ্বারা নিজেদের পক্ষেই সমূহ সংকট সৃষ্টি করিবেন। যদি তাঁহারা সে পথে চলেন, বিদ্রোহ দেখা দিবে।" জনমতকে অগ্রাহ্য করিবার ঝোঁক যদি এতটাই হয়, তবে, শাসকদের ক্ষমতা অপব্যবহার সুযোগ যাহাতে না ঘটে, সংবিধান-সংশোধনের উদ্যমে সেদিকে প্রথমে লক্ষ্য রাখাই কি প্রয়োজন ছিল না?

স্বৈরাচারের ঝোঁক

ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংবিধানের সংশোধন সম্পর্কিত আলোচনার আগাগোড়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী সমালোচনায় অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন। সময় সময় তাঁহার এই অসহিষ্ণুতা উত্তেজনার আবেগে তাঁহাকে অধৈর্য করিয়া ফেলিয়াছে এবং ব্যক্তিগত অসংগত জিদ বা ঔদ্ধত্যের ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে এমন আচরণ অত্যন্তই অশোভন হইয়াছে। অন্তত এক্ষেত্রে এই সত্যটুকু তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, বাচনভঙ্গীর দৃঢ়তার দ্বারা যুক্তিকে দৃঢ় করা যায় না। বাক্-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংকোচন সাধনের আশঙ্কায় যাঁহারা তাঁহার প্রস্তাবিত সংশোধনের বিরুদ্ধতা করেন, তাঁহাদের উপর আক্রমণে প্রধান মন্ত্রী ভাষার সংযম রাখিতে পারেন নাই। সাংবাদিকগণ প্রধান মন্ত্রীর আক্রমণের বিশেষ বিষয়ীভূত হইয়াছেন। কিন্তু যে সব দমন আইন, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিরোধী প্রতিপন্ন হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশের হাইকোর্ট কর্তৃক বিধিবহির্ভূত বলিয়া এ পর্যন্ত বাতিল হইয়াছে, সংশোধন আইনে পরিণত হইবার ফলে সেগুলি পুনরুজ্জীবিত হইল, প্রধান মন্ত্রী এই অভিযোগ অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? সংশোধন-বিধানে আইন আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাঞ্জাব হাইকোর্ট মাস্টার তারা সিংহের মামলা সম্পর্কে ১২৪(ক) ধারার কতকগুলি বিধানকে বর্তমান শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত করিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন, ১৫৩ ধারার বিধানও উক্ত হাইকোর্ট কর্তৃক বাতিল হয়। ইহা ছাড়া নিরাপত্তা আইনের কতকগুলি বিধানও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বিধি-বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়। এই বিধানগুলি বিশেষভাবে সংবাদপত্রের অধিকার সম্পর্কিত। সরকারের নিকট হইতে প্রবন্ধাদি পরীক্ষা করাইয়া লইবার ব্যবস্থা এগুলির মধ্যে অন্যতম। পাটনা এবং মাদ্রাজ হাইকোর্ট হইতেও সংবাদপত্র জরুরী বিধানের ৪ ধারাটি বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। দেশের নিরাপত্তা বিধান এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার যুক্তির জোরে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের আমলের ঐ সব বহুনিন্দিত দমন আইন যে অতঃপর পুনরায় প্রযুক্ত হইবে না এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কোথায়? বাস্তবিকপক্ষে দমনমূলক বিধানগুলি বর্তমান আকারে বলবৎ রাখিবার সুযোগ কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবেই নিজেদের হাতে লইলেন; এখন তাঁহাদের কৃপা বা সদিচ্ছার উপরই একমাত্র আমাদের ভরসা। প্রস্তাবের বিরোধীদিগকে উদ্দেশ করিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই কথা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মনে মনে সংসদের ভয়ে ভীত; অধিকন্তু তাঁহারা ভারতের জনসাধারণকেও ভয় করেন। এই জন্য তাঁহারা বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় থাকিতে চাহেন। বস্তুত এইরূপ যুক্তি একান্ত উৎকট। বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় থাকিতে চাহিলে, তাহা দোষের বিষয় হইবে এবং দুর্বলতার পরিচায়ক হইবে! শাসকদের হাতে বেপরোয়া অধিকার ছাড়িয়া দিলেই সাহস দেখানো হয়; কর্তার ইচ্ছায় কর্মে সায় দিলে তাহাতেই শুভবুদ্ধি ফুটিয়া উঠে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যিনি নায়ক, তাঁহার মুখে এমন উক্তি সত্যই আমাদিগকে অবাক করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এদেশের সংবাদপত্রসেবীরা নিতান্তই নাবালক। শাসকদের অভিভাবকত্বের আওতায় তাহাদিগকে না রাখিলে চলে না, প্রধান মন্ত্রী সম্ভবত ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এতদিনে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তাই এই সব নাবালকদিগকে শিক্ষা দিবার ভার তাঁহারা নিজেরাই হাতে লইলেন। পণ্ডিত নেহরুর নিজের উক্তিই আমাদের ঐ সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবে। সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত বিতর্কের মুখে পণ্ডিতজী নিজেই বলিয়াছেন,—"সংবাদপত্র জন-জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। আমরা শুধু এগুলিকে স্বাধীনতা দিব না, স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় এবং সেই স্বাধীনতা কিভাবে পরিচালিত করিতে হয়, আমরা সংবাদপত্রসমূহকে তাহাও শিক্ষা দিব।" স্বাধীনতার চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া শরণাগতির এই পথ, স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্র-সেবার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত হইল! এ অবস্থার জন্য কর্তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে আমাদের কর্তব্য বজায় থাকে কোথায়?

পরলোকে পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে নৈনিতাল হাসপাতালে শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে বাঙালী সমাজের সর্বত্র শোকের ছায়া আপতিত হইয়াছে। তীব্র দীপ্ত দেশ-সেবায় এবং অপ্রতিহত মনোবলে উজ্জ্বল কর্ম-প্রতিভায় বাঙলার বাহিরে বাঙালী সমাজের গৌরব যাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। যুক্তপ্রদেশের জনগণের অন্তরে অন্তরে পূর্ণিমা শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশই ছিল তাঁহার কর্মভূমি। পূর্ণিমা অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি সুখ-সম্পদ এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। তিনি দেশসেবার পথে দুঃখ-কষ্টকেই বরণ করিয়া লন এবং বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ১৯৪২ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলন যখন এক সময়ে গোপন-ক্রিয়াকলাপের নীতি গ্রহণ করে, সে সময় এই তেজস্বিনী মহিলা তাঁহার ভগ্নী শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলীর সঙ্গে সেই গোপন সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নেতৃবর্গ এই সময় অনেকেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণিমা গোপনে কাজ চালাইয়া যাইতে থাকেন। তিনি পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া গ্রামে গ্রামে বিপ্লবের আগুন ছড়াইতে প্রবৃত্ত হন। এই মহীয়সী মহিলা কংগ্রেস আন্দোলনের সম্পর্কে বহুবার কারাবরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আগস্ট বিপ্লবের সময় পুলিশ তাঁহাকে ধরিতে সমর্থ হয় নাই। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর পূর্ণিমা লোক-সেবা ক্ষেত্রে পুনরায় অবতীর্ণ হন। মান, যশ এবং প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী তিনি কোন দিন ছিলেন

না; কিন্তু প্রতিষ্ঠা তাঁহার অনুগমন করিয়াছে। এলাহাবাদ নগর রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ম সচিব, উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থা-পরিষদের এবং গণপরিষদে সদস্যস্বরূপে জাতির কল্যাণ সাধনায় পূর্ণিমা যে সাধনা করিয়া গিয়াছেন, দেশবাসী সশ্রদ্ধ অন্তরে তাহা স্মরণ করিবে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সচিব শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন সেদিন আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তাঁহার মতে দুর্ভিক্ষের মুখ হইতে আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি। খাদ্য পরিস্থিতির দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ যদিও খুব উজ্জ্বল নয়, তথাপি বিহারের মত একেবারে নৈরাশ্যজনকও নহে। অধিকন্তু ১৯৫৩ সালের মধ্যে পশ্চিম বাঙলা খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থা লাভ করিবে, খাদ্য সচিব এমন ভরসাও প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুত সেন হিসাবের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ২১ লক্ষ উদ্বাস্তুর সমাগম হইয়াছে, ইহার উপর বিহারে দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা দেখা দেওয়ার ফলে প্রায় তিন লক্ষ নরনারী ঐ প্রদেশ হইতে এখানে আশ্রয় লইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসংকটের মূলে এই সব কারণ রহিয়াছে। তবে, এ বৎসরের আউস ফসল একেবারে খারাপ হয় নাই। এই ফসলের শস্য বাজারে আসিলে খাদ্যাবস্থার আরও উন্নতি ঘটিবে। বলা বাহুল্য, খাদ্য সচিব শ্রীযুত সেনের এইরূপ আশ্বাস প্রদান সত্ত্বেও অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমরা মনে বিশেষ জোর পাই না। সরকারী রেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ সত্ত্বেও কোচবিহারে চাউলের মূল্য কোন কিছু হ্রাস পায় নাই। দিনহাটা অঞ্চলে এখনও চাউল মণ করা ৪৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। কোচবিহারে চাউলের সর্বনিম্ন মূল্য ৪২৲ টাকার কম নয়। সরকারী রেশন ব্যবস্থা সংশোধিত এবং সম্প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও অবস্থা এইরূপ। কিছুদিন আগেও কোচবিহারের মহকুমা হাকিমের বাসভবনের সম্মুখে আসিয়া বুভুক্ষা-পীড়িত নরনারীর দল অন্নের জন্য আর্তনাদ উত্থাপন করে। উপায় কি তাহাদের? অন্নের অভাব মানুষকে পাগল করিয়া তোলে। ইহারা তেমন কিছু অন্যায় করে নাই। বাস্তবিকপক্ষে মণকরা ৪৮৲ টাকা মূল্য দিয়া চাউল ক্রয় করিবার ক্ষমতা কতজনের আছে? সরকারী ব্যবস্থার সুবিধা হয়ত অনেকে পাইতেছেন এবং যাঁহারা পাইতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নয়; কিন্তু ইহাদের সমস্যা মিটিবে কিসে? বাঙলার বিগত দুর্ভিক্ষের সময় এদেশের বেশী লোক মরে নাই, মোট জনসংখ্যার হিসাবে হয়ত তাহাদের সংখ্যা খুব সামান্য মনে হইবে, কিন্তু মানবতার ক্ষেত্রে মানুষের দুঃখ ও বেদনার হিসাব সংখ্যার পরিমাণে হয় না। কষ্ট কাহারো না হয়, এদিকে লক্ষ্য রাখাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। ১৯৫৩ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ যদি খাদ্যশস্যের দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ জনসংখ্যার হিসাব কষিয়া যে পরিমাণ খাদ্যশস্য এই প্রদেশে প্রয়োজন, এখানে তাহাই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেই যে সমস্যার সমাধান হইবে, ইহাও মনে করা যায় না; কারণ, উৎপন্ন হইলেও যথোচিতভাবে এবং সকলের পক্ষে সুলভরূপে যে শস্যের বণ্টন হইবে, এমন কোন নিশ্চয়তা কোথায়? লাভখোর মজুতদারের দল তখনও থাকিবে। ফলতঃ এখনও ইহারাই খাদ্যসমস্যাকে সমধিক জটিল করিয়া তুলিতেছে। খাদ্য সচিব শ্রীযুত সেনের বিবৃতিতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। খাদ্যশস্য অন্যায়ভাবে মজুত করিয়া কৃত্রিমভাবে ঘৃণ্য বৃদ্ধির পথ যদি এইরূপ প্রশস্ত থাকে এবং রাজ্যে খাদ্যের যথার্থ অনটন না থাকিলেও অনটন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে গণিতশাস্ত্রের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ যদি দুই বৎসর পরে খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণও হয়, তাহাতেই যে খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে এবং প্রত্যেকে দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে সমর্থ হইবে, আমরা কিরূপে এমন আশা করিতে পারি? প্রকৃতপক্ষে সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি দেশ ও জাতির আত্মাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়া পিশাচ দলের নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। বুভুক্ষিতের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া রাক্ষসদের প্রমোদ ও উল্লাস চলিতেছে। অথচ ইহাদিগকে সায়েস্তা করিবার কেহ নাই। যতদিন পর্যন্ত দুর্নীতির এই পাকচক্রের সমূলে উৎখাত না ঘটিতেছে এবং মানবধর্ম জাগ্রত হইয়া সমাজ সংস্থিতিকে না নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দুর্গতি দূর হইবার নহে।

কলিকাতায় সশস্ত্র ডাকাতি

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরে কলিকাতা শহরের রাজপথ হইতে এয়ার ওয়েজ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ৯০ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে। ডাকাতেরা স্টেন গান ও রিভলবারে সজ্জিত হইয়া কোম্পানীর টাকা ভর্তি গাড়ী আটক করে। তাহারা ড্রাইভারকে সরাসরি গুলী করিয়া গাড়ী হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া গাড়ীতে চড়িয়া উধাও হয়। গাড়ী ছুটাইয়া যাইবার সময় তাহার যথেচ্ছভাবে গুলী চালাইতেছিল, তাহাদের গুলীর আঘাতে তিনজন পথচারী নিহত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ধরণের দুঃসাহসিক ডাকাতি কলিকাতা শহরে এই নূতন নয়। পর পর কয়েকটি ক্ষেত্রে এই ধরণের ডাকাতি হইয়াছে। দস্যুদলের কাজ দেখিয়া বেশই বোঝা যায় যে, এইরূপ কাজে তাহারা হাত বেশ পাকাইয়া লইয়াছে। ইহারা দস্তুরমত সঙ্ঘবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত ধারায় কাজ করে। ইহাদের কাজ দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের দলের কেন্দ্র কোথায়ও আছে এবং সেই কেন্দ্র হইতে ইহারা বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় এই ধরণের ডাকাতি নিবারণের জন্য পুলিশ যে কোন চেষ্টা করিতেছে না তাহা নহে; কিন্তু দেখা যাইতেছে, ডাকাতদের সংগে ফন্দীবাজীতে তাহারা আটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বস্তুত এই গুরুতর সমস্যা সম্মুখীন হইবার জন্য পুলিশকে বিশে পরিকল্পনা ও উদ্যমের সংগে অগ্রসর হই হইবে এবং এমন ব্যবস্থা করিতে হই যাহাতে দস্যুরা অপরাধ অনুষ্ঠানের প উধাও হইতে না পারে। অপরাধ যেরূ উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন ক অবিলম্বে প্রয়োজন।

স্বামী বিরজানন্দ

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার রামকৃষ্ণ মিশন এবং মঠের প্রেসিডেণ্ট স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাত্ম-প্রতিভার প্রখর প্রভায় সমুজ্জ্বল যে জ্যোতিষ্ক-পরিমণ্ডল ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির রশ্মিরাজী জগতের সর্বত্র বিকীর্ণ করিয়াছিল, স্বামী বিরজানন্দের তিরোধানে লোকদৃষ্টিতে তাহার একটি নিভিয়া গেল। একথা সত্য যে, পারমার্থিক সত্তায় যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা জন্মমৃত্যুর অতীত। কোন কর্মবন্ধন ইঁহাদের নাই। ইঁহারা অমরলোকের অধিকারী। কিন্তু তথাপি জাগতিক সমাজ এবং বৃহত্তর মানবসভ্যতার দিক হইতে ইঁহাদের মর্ত্য-জীবনের অবসানজনিত অভাব পূর্ণ হইবার নহে। বস্তুত ইঁহাদিগকে হারাইবার বেদনার ভিতর দিয়াই মানবসমাজ ইঁহাদের সাধনাকে আপন করিয়া পায় এবং আত্মভাবনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই দেশ ও জাতির পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনা।

স্বামী বিরজানন্দ ১৮৭৩ সালে জুন মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল কালীকৃষ্ণ বসু। কালীকৃষ্ণ শৈশব হইতে অত্যন্ত ধর্মভাবপ্রবণ ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবনেই স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধনানন্দ এবং স্বামী আত্মানন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাবান মহাপুরুষদের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ যখন বালক, দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা তখন চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে এবং সাধক ও ভক্তগণ তাঁহার চরণমূলে সমবেত হইয়া নিজেদের জীবন ধন্য করিতেছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের রচয়িতা শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্র গুপ্ত ইহাদের অন্যতম। কালীকৃষ্ণ রিপণ কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি উক্ত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহারই অনুপ্রেরণায় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের সাধকবর্গের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। ঠাকুরের মর্ত্যলীলা অপ্রকট হইবার পর তাঁহার শিষ্যবর্গ বরাহনগরে মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হন। কালীকৃষ্ণ এই মঠে যাতায়াত করিতে থাকেন। বৈরাগ্যের ভাব তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ছিল। বাল্যজীবনেই কালীকৃষ্ণ সংসার ত্যাগ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স সপ্তদশ বৎসরের অধিক ছিল না।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতে পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং স্বামী বিরজানন্দ এই নামে খ্যাত হন। প্রথমে স্বামীজী দরিদ্রনারায়ণের সেবার পবিত্র ব্রত সাধনে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। বিরজানন্দ দেওঘরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর সেবার জন্য প্রেরিত হন। প্রকৃতপক্ষে কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান এই তিনের সমন্বয়ের পথে সাধনা

স্বামীজীর মরদেহ সুসজ্জিত শবাধারে স্থাপন করিয়া শোকযাত্রা

স্বামী বিরজানন্দের জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। দরিদ্রনারায়ণের সেবার মধ্যে তিনি ঐ সাধনার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর স্বামী বিরজানন্দ তিন বৎসর কাল নিভৃত-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। ইহার পর মায়াবতী আশ্রমের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় এবং তিনি পুনরায় লোকসংসর্গে আসিতে বাধ্য হন। এই সময় তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মায়াবতী আশ্রমে অবস্থান কালেই স্বামী বিরজানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের বিস্তৃত জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানা বাঙলার চিন্তা-জগতে একটা যুগান্তর ঘটায়। স্বামীজীর বক্তৃতাবলী সংগ্রহ করিয়াই তিনি সংকলন করিয়াছিলেন। সুকঠোর তপশ্চর্যার প্রতি তিনি সমধিক আকৃষ্ট ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি পুনরায় হিমালয়ের নির্জন প্রদেশে আশ্রম স্থাপন করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং আত্মসমাহিত অবস্থায় অবস্থান করেন। দশ বৎসরের অধিককাল ঐরূপ নীরব এবং নিভৃতে তপশ্চরণের পর পুনরায় কর্মক্ষেত্রে তাঁহার আহবান আসে। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সালে স্বামী শুদ্ধানন্দের তিরোধানের পরে স্বামী বিরজানন্দ প্রেসিডেণ্টের পদে বৃত হইয়াছিলেন। মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

স্বামী বিরজানন্দের পরিচালনাধীনে রামকৃষ্ণ মিশনের বাণী চারিদিকে সমধিক প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারত এবং ভারতের বাহিরের নানা দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনার ফলে বিস্তার লাভ করিয়াছে। স্বামী বিরজানন্দের কঠোর তপস্যা এবং তাঁহার তপোলব্ধ সম্পদ সহস্র সহস্র সাধকের অন্তর আকর্ষণ করে। ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার অমৃত রসে মানুষকে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামী বিরজানন্দ দেশ এবং জাতিকে ধন্য করিয়াছেন। অজ্ঞান-অন্ধকারের মধ্যে মানব-সমাজকে তিনি আলোকের পথ দেখাইয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মানবতাময় পরম ব্রতকে তিনি সার্থক করিয়াছেন। দেশ ও জাতিকে তিনি মহীয়ান্ করিয়াছেন। তিনি মহামানব। আমরা তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বর্মায় সাধারণ নির্বাচন

আগামী ১২ই জুন থেকে বর্মায় সাধারণ নির্বাচন শুরু হবার কথা। নূতন শাসন-তন্ত্রের বিধান অনুযায়ী যে তারিখের মধ্যে প্রথম নির্বাচন হওয়ার নির্দেশ ছিল দেশের অশান্ত অবস্থার দরুণ একাধিকবার সেটা পিছিয়ে দিতে হয়েছে। এবার কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন বলে মনে হয়, যদিও দেশে শান্তি স্থাপনের কাজ এখনো বহুলাংশে অসমাপ্ত রয়েছে। বড় বড় শহর ও সেগুলির যোগাযোগকারী রাস্তাসমূহ থেকে একটু দূরে গেলেই বহু অঞ্চলে সরকারী শাসনের চিহ্ন দেখা যায় না। তৎসত্ত্বেও বর্মা সরকার নির্বাচন আর স্থগিত রাখতে ইচ্ছুক নন। কারণ শীঘ্র যে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হবে তার স্থিরতা নেই। সুতরাং অশান্তির কারণে ঐ তারিখ পিছিয়ে দিয়ে নূতন তারিখ ধার্য করলে তখনও যে অনুরূপ আপত্তির কারণ থাকবে না সেটা আদৌ আশা করা যায় না। অবশ্য যতগুলি কেন্দ্র থেকে নির্বাচন হবার কথা ততগুলি কেন্দ্রে নির্বাচন হবে না। নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা ১১২ থেকে কমিয়ে ৭৭ করা হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। এখন প্রশ্ন, এই ৭৭টি কেন্দ্রেও মোটামুটি-রকম শান্তি রক্ষা করে নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কিনা। যদি হয়, তবে সেটাও বর্মা গভর্নমেণ্টের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা হবে না। বলা বাহুল্য, বিদ্রোহী দলগুলি ও তাদের সমর্থকগণ নির্বাচন পণ্ড করে দেবার চেষ্টাই করবে। কারণ, ৭৭টি কেন্দ্র থেকেও নির্বাচন সম্পন্ন করাতে পারলে বর্মা সরকারের নৈতিক প্রতিষ্ঠা বাড়বে।

কোরিয়ার যুদ্ধ—

ক'দিন আগে কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে কাগজে যে রকম খবর বেরুচ্ছিল তা পড়ে অনেকের নিশ্চয়ই মনে হয়েছে যে, এবার উত্তর কোরিয়ান ও চীনা বাহিনীর একদম দফারফা হয়ে গেল। তাদের আক্রমণাত্মক অভিযান তো চূর্ণ হয়ে গেছেই, তার ওপর তাদের এমনি পিছু ধাওয়া করা হচ্ছে যে, কোরিয়া ছেড়ে পালানো বা মরে নিঃশেষ হওয়া ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর নেই। পরবর্তী সংবাদের [illegible]র অনেকখানি বদলে

গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, অবস্থা চীনা বাহিনীর পক্ষে ততটা শোচনীয় নয়। বোধ হচ্ছে, যুদ্ধটা আবার মোটামুটি ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর এসে কিছুদিনের জন্য একটু স্তিমিত ভাব ধারণ করবে। মার্কিন জেনারেল ভ্যান ফ্লীট যে ইচ্ছে করে ৩৮ অক্ষরেখার উত্তরে বেশি দূর এগুচ্ছেন না, তা নয়। উত্তর কোরিয়ান ও চীনা বাহিনী তাঁকে আর এগুতে দিচ্ছে না।

এতদিনে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেটা এই যে, যেভাবে যুদ্ধ চলেছে তাতে "ইউনো" বাহিনীর জনবল ও অস্ত্রবল যতই বাড়ানো হোক, কিছুতেই তাঁরা সমগ্র কোরিয়াকে "শত্রুর" কবল থেকে মুক্ত করতে পারবে না। সেইজন্যই কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে যে, চীনারা যদি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সরে গিয়ে যুদ্ধবিরতিতে রাজী হয় তবে এ পক্ষও ইউনো'র "এ্যাগ্রেসর"-দমনের কর্তব্য পালন সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নিতে রাজী আছে, যদিও কোরিয়া ইউনো'র গৃহীত প্রস্তাবে আরও অনেক কিছু করার কথা ছিল। ট্রুম্যান সরকারের মুশকিল হয়েছে এই যে, তাড়াতাড়ি যুদ্ধের একটা অন্ত করতে না পারলে আমেরিকাবাসীর সামনে জেনারেল ম্যাকআর্থারের কাছে নিজেদের ভুল স্বীকার করতে হয়। এভাবে "সীমাবদ্ধ যুদ্ধ" "limited war" করে যে কোরিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে না, ম্যাক-আর্থার এই কথাই বলে আসছেন। ম্যাক-আর্থারের অন্য দুটি মত ট্রুম্যান সরকার কার্যত মেনে নিয়েছেন—ফরমোজাকে কিছুতেই হাতছাড়া করা হবে না, বরঞ্চ সম্ভব হলে চিয়াং কাইশেককে দিয়ে চীন আক্রমণ করার চেষ্টাও করা যেতে পারে। পিকিং সরকারকে ইউনো'তে স্থান দেয়া তো হবেই না। কিন্তু তবুও ম্যাকআর্থারের পক্ষে একটা যুক্তি থেকে যাচ্ছে যেটার প্রভাব থেকে আমেরিকার জনমতকে রক্ষা করা ট্রুম্যান সরকারের পক্ষে ক্রমশঃই কঠিন হয়ে উঠছে। সেটা হোল এই যে, ট্রুম্যান নীতি অনুসারে চালিত কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকায় প্রচুর লোকক্ষয় হচ্ছে বটে, কিন্তু জয়ের কোনো আশাই নাই। ম্যাকআর্থারের মতে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যাপকতর না করে কোরিয়ায় জয়লাভ সম্ভব নয়। চীনের বিরুদ্ধে ব্যাপকতর যুদ্ধ আরম্ভ করলে তৃতীয় মহাযুদ্ধ লেগে যেতে পারে—এ সম্ভাবনায় ম্যাকআর্থার ভীত নন। আমেরিকার জনমত নিশ্চয়ই তৃতীয় মহাযুদ্ধ চায় না। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বাস্তব ঘটনার দ্বারা ম্যাকআর্থারের এই যুক্তি সমর্থিত হবে যে, কোরিয়ায় অনর্থক আমেরিকান প্রাণ নষ্ট হচ্ছে ততদিন ট্রুম্যান সরকারের নীতির বিরুদ্ধে আমেরিকাবাসীদের মনে একটা বিক্ষোভ জমতে থাকবেই। এর প্রতিকার হতে পারে যদি কোরিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ হয়। কিন্তু আমেরিকা যদি ফরমোজায় এবং ইউনো'তে চিয়াং কাইশেককে জীইয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হয়, পিকিংকে বাদ দিয়ে জাপানের সঙ্গে আলাদা চুক্তি করে এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি মার্কিন ঘাঁটি রাখবারও বন্দোবস্ত করে তবে কিসের জন্য চীনের যুদ্ধবিরতিতে আগ্রহ হবে? ট্রুম্যান সরকার যখন ম্যাকআর্থারী নীতির বারো আনা গিলেছেন তখন বাকী চার আনাও বোধ হয় শেষ পর্যন্ত গিলতে হবে। তা না'হলে যে-বারো আনা গিলেছেন সেটাও উগরে ফেলতে হবে। সে কি আর সম্ভব!

ইরাণ

এ্যাংলো-ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানী এতদিন এই ধুয়া ধরে বসেছিল যে, "তৈল জাতীয়করণ"এর আইন পাশ করাই বে-আইনী হয়েছে। আমেরিকার পরামর্শে ইংরেজেরা সুর একটু নামিয়েছে। কোম্পানী ইরাণী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলোচনার জন্য তেহরাণে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে বলে ঘোষণা করেছে। আমেরিকা আশা দিয়েছে যে, "জাতীয়করণ" আইনটা মেনে নিয়ে কথা বলতে এলে ইরাণীরাও মিটমাটের সুরে কথা কইবে। ইতিমধ্যে অবিশ্যি বৃটেন একদল প্যারাসৈন্য সাইপ্রাসে পাঠিয়েছে—সেখান থেকে তেলের খনিগুলির দূরত্ব ৯০০ মাইল। যদি দরকার হয়—তবে বোধ হয় দরকার হবে না—আমেরিকার মধ্যস্থতায় যতদূর সম্ভব বৃটিশ স্বার্থ এবং ইরাণের মুখরক্ষার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

৬-৬-৫১

রবীন্দ্রনাথ ও আমরা
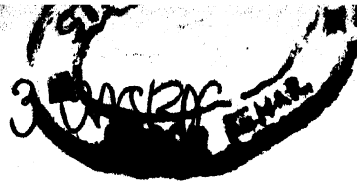
অন্নদাশঙ্কর রায়

দশ বৎসর আগে যখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন, তখন আমাদের দায়িত্ব বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। বাপ বেঁচে থাকলে ছেলে যেমন থাকে আমরা তেমন ছিলাম। এখন তিনি নেই, আমরা আছি। দায়িত্বের কথা আমাদের কাছে এখন প্রধান প্রশ্ন। তিনি যখন ছিলেন, প্রশ্ন করার প্রয়োজন হলে তাঁর কাছে যেতাম এবং প্রশ্নের উত্তর পেতাম। এখন আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার কেউ নেই। তাঁর অবর্তমানে সেসব প্রশ্ন আমাদের কাছে আসে। আমাদেরকে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করতে হয়। অনেক প্রশ্ন জমে গেছে। তার উত্তরের চেষ্টা বহুদিন থেকে চলছে। সে সব প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আজ বলব না। মোটামুটিভাবে বলব— রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী লেখক আমরা, আমরা তাঁর কাছে কি পেয়েছি, তাঁর অবর্তমানে আমরা কি করেছি এবং আমাদের কি করা উচিত।

সাধারণত দেখা যায়, বাপ যদি বড়লোক হয়, ছেলেদের সুবিধা হয়, তাদের খাটতে হয় না, সংগ্রাম করতে হয় না। তারা হাতের কাছে সব পায়। বাপ বেচারাকে খাটতে হয়, সংগ্রাম করতে হয়, সবকিছু তাঁর নিজের হাতে গড়তে হয়। আমরা দেখছি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের খাটুনি বহু পরিমাণে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি সংগ্রাম করেছেন—আমরা তার ফল ভোগ করছি।

বাঙলা সাহিত্যে যখন তিনি প্রথম প্রবেশ করেন, বাঙলা ভাষা তখন কি ছিল আপনারা জানেন। এই ভাষাকে কি রকম অসাধারণ রূপদান তিনি করেছেন, আপনারা জানেন। এজন্য সারা জীবন তাঁকে সাধনা করতে হয়েছে, সাধনা কি কঠিন কাজ, তার অল্পস্বল্প অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। তাঁর কাজ ছিল মাটি কেটে শহর তৈরি করা, জঙ্গলের পর জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি করা। আর আমরা ভাল জমি পেয়ে বাড়ি তৈরি করেছি। সাধনা ছিল তাঁর অসাধারণ। এ-কাজ তিনি না করলে আমরা করতে পারতাম না। বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ যদি না থাকতেন, তাহলে আমরা আজ যা করতে পেরেছি, তা করতে পারতাম না। বাঙলা গদ্য তাঁরা তৈরি করেছেন। বিশেষভাবে এক্ষেত্রে তাঁরা যা দিয়ে গেছেন, অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে দেখবেন—তার পরিমাণ কতখানি। একদিন তা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয় হবে। এটা সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মত মহামানবের জীবনব্যাপী সাধনায়। আমরা যারা পরে এসেছি, তার ফল ভোগ করছি। কলম ধরলেই আমাদের লেখা আসে, আমরা লিখে যাই। যা আমাদের কাছে এত সহজ হয়েছে, সেই কঠিন কাজ তিনি করেছেন। আমরা পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করছি। সময় সময় মনে প্রশ্ন জাগে—আমরা তাতে কি যোগ করেছি, যাতে পরে যারা আসছে, তাদের পক্ষে এ-কাজ সহজ হয়। আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় তাঁর অবর্তমানে আমরা যেসব কাজ করছি, সেসব কি এমন কিছু কাজ, যাতে ভবিষ্যতে যারা আসছে, তাদের সাহিত্য-সাধনা অনায়াসসাধ্য হবে। সে-প্রশ্ন আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা যদি ঋণী হয়ে থাকি, এবং সে-ঋণ যদি শোধ না করি, তাহলে ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আমাদের কি বলবে। ভবিষ্যতের সামনে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে—আমাদেরকে বলতে হবে—আমরা কিছু যোগ করেছি, আমরাও কিছু দিয়েছি। কিন্তু সেটাও চূড়ান্ত নয়। পরে যারা আসবে, তাদেরও কিছু দিতে হবে। এটা ফুরোবে না।

আমাদের উপর যে ভার এসেছে, তা কি পরিমাণে পালন করেছি, সেটা ভেবে দেখতে হবে। ভাষা সম্বন্ধে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষাকে অসাধারণ রূপ-লাবণ্য-মণ্ডিত করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন—তার উপর আর কিছু করবার নেই, কারিগরী ফলাতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত নয়—করলে কোন ফল হবে না। তা ঠিক নয়। আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। আমরা, যারা ভাষা নিয়ে কাজ করি, আমরা অনুভব করেছি, এই ভাষাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, যেখানে গেলে সাধারণ লোকের পক্ষে এটা বোধগম্য হবে, তাদের এটা প্রাণের ভাষা হবে। যেমন কাব্যে তেমনি গদ্যে, নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে—সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে ভাষা যেন সর্বসাধারণের ভাষা হয়, তারা যেন এটাকে নিজেদের ভাষা বলে স্বীকার করে, সেটা দেখতে হবে। আমরা এখনও সেখানে পৌঁছতে পারি নি, বার বার একটা বাধা অনুভব করছি। আমরা যেটা লিখছি, সেটাকে জনসাধারণ প্রাণের ভাষা বলে গ্রহণ করছে কিনা— সাহিত্যিকের পক্ষে ভাবনার বিষয়। সেটাকে সম্ভব করার ভার সাহিত্যিকদের উপর।

রবীন্দ্রনাথ আর একটা কাজ করেছেন—পাঠক তৈরি করার কাজ। পাঠক তৈরি না করলে আমরা যা লিখছি, অনেকে তার মর্ম গ্রহণ করতে পারবে না, রবীন্দ্রনাথ নিজের পাঠক নিজেই তৈরি করেছেন। প্রথমে তাঁকে কেউ স্বীকার করতে চায়নি—বাঙলা সাহিত্যে তিনি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছেন। আস্তে আস্তে দেখা গেল, তিনি অনেক পাঠক তৈরি করেছেন, সংখ্যা ক্রমে বেড়ে গিয়েছে। এখন সকলে তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করছে। চল্লিশ বৎসর আগে তাঁকে এভাবে গ্রহণ করা সহজ ছিল না। এত বেশি লোক তাঁর নিন্দা করেছে—আমরা তা কল্পনা করতে পারি না। শিক্ষিত লোক পর্যন্ত বলতেন—রবীন্দ্রনাথের কথা তাঁরা বুঝতে পারেন না, তাঁর কাব্য বোঝা যায় না। আমরা তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, আমরা কিন্তু বুঝতে পারতাম। গুরুজনেরা বলতেন—রবীন্দ্রনাথ কি লিখছেন, তাঁরা বুঝতে পারেন না। লেখাপড়া-জানা লায়েক ব্যক্তিরাও বলতেন—বুঝতে পারেন না। আমরা ছেলেমানুষেরা তাঁর খুব তারিফ করতাম। এমন কতকগুলি শিক্ষা মানুষের আছে, যা undo করা দরকার। মানুষ যা শেখে, তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেটা না ভুললে মানুষ নূতন জিনিস শিখতে পারে না। শিক্ষিত লোককে খানিকটা অশিক্ষিত করা দরকার। যে শিক্ষা তারা পেয়েছে, সেটা তাদেরকে ভোলাতে হবে এবং নূতন জিনিস শেখাতে হবে। এটা সহজ কাজ নয়। কঠিন কাজ। রবীন্দ্রনাথ এই কঠিন কাজ করে গেছেন। আমাদেরও তা করতে হবে। না করলে আমাদেরকে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। অনেক জিনিস আছে, লোকের ভুলে যাওয়া উচিত। ভোলান মস্ত

কথা। আমি উদাহরণ দিতে পারব না, হাতের কাছে আসছে না। অনেকদিন থেকে আমি অনুভব করছি—আমাদের শিক্ষা এমন-ভাবে হয়েছে—রস জিনিসটা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। বরং সাধারণ লোক,—যাদের শিক্ষা-দীক্ষা নাই, তাদের মধ্যে রস গ্রহণের ক্ষমতা বেশি। তাদের কাছে directly যাওয়া সহজ। তারা সহজে নেবে। Sophisticated-রা দূরে সরিয়ে দেবে। এদের নূতন করে শেখানো কঠিন ব্যাপার, তাতে আমাদের বিপদ।

রবীন্দ্রনাথ যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তাকে রক্ষা করাও অত্যন্ত কঠিন কাজ। তিনি যে মহান্ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন, সে-ঐতিহ্য আগে যা ছিল, তার সঙ্গে বেশি মেলে না। একজন সাহিত্যিক বন্ধু বলেছেন বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ একটি দ্বীপ। তার চারিদিকে কিছু নেই, শুধু সমুদ্র। তাঁর আগে কিছু ছিল না, পরেও কিছু হয়নি। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা পাওয়া যায় না, পরেও পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তীও নাই, পরবর্তীও নাই। কেন তিনি (সাহিত্যিক বন্ধু) একথা বলেছেন, কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে পূর্ববর্তী বাঙলা সাহিত্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যার ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়ে। পরেও কিছু নাই—একথা তিনি বলেছেন—রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিণতির সঙ্গে তুলনা করে। সহসা মনে হয়—তা বুঝি সত্য। হয়ত সত্য, হয়ত সত্য নয়। আগে কিছু থাক, না থাক, পরে কিছু থাকা দরকার। সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদেরও যোগ-বিয়োগ করতে হবে। সেই ঐতিহ্যকে চলমান করতে হবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাঙলা সাহিত্যের standard নেমে গেছে। সেজন্য আমরা হা-হুতাশ করছি। আজকাল ভাল বাঙলা দেখা যায় না। ভাল প্রবন্ধ, ভাল কবিতা পাওয়া যায় না। লোকে আমাদের গালাগালি দেয়। আমরা সেটা নিঃশব্দে পরিপাক করি। আমরা কিছু করছি, এটা দেখাতে হবে। অন্ধকারের প্রতিকার হচ্ছে আলো। সত্যিকার ভাল লেখা যদি আমরা দেখাতে পারি, তাহলে বলতে পারব—বাঙলা সাহিত্যের standard আমরা রাখতে পারছি, রবীন্দ্রনাথের পতাকা আমরা বহন করছি, আমরা তাঁর যোগ্য। সেটা যদি না করতে পারি, শুধু তর্ক করে কিছু হবে না। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উত্তীর্ণ হতে পারে, এমন কয়খানা বই লেখা [illegible]ছে? হয়নি তা নয়, তবে তার [illegible] কম। পূর্ব-পুরুষদের উপযুক্ত বংশধর এখনও আমরা হতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এমন কীর্তি আমাদের হয়নি। যা হয়েছে, তা উল্লেখযোগ্য নয় বলে তুলনায় দাঁড়াতে পারে না। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে কিছু কিছু হয়েছে। যেসব বিষয় নিয়ে গুরুদেবের মনে অশান্তি ছিল, অতৃপ্তি ছিল, সেটা তিনি কারো কারো কাছে ব্যক্ত করেছেন। তিনি খুব বড় একটা solid জিনিস করে যেতে পারেন নি, যেমন ডনকুইকসোটের মত বই যা সর্ব দেশের লোক পড়বে। সেজন্য তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। সত্যিকারের drama যাকে বলে তেমন নাটক দিয়ে যেতে পারেন নি বলেও তাঁর মনে দুঃখ ছিল। তাঁর দুঃখ ছিল, তিনি মহাকাব্য লিখে যেতে পারেন নি। মহাভারত থেকে বিষয় বেছে নিয়ে নাটক লিখতে পারেন নি বলেও তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। তিনি বলতেন, তোমরা লেখ, শেষ বয়সেও তাঁর মন সম্পূর্ণ সতেজ ছিল।

তাঁর মধ্যে আশ্চর্য দুঃসাহস ছিল। এমন বিষয় ছিল, যা পড়ে লোকে হয়ত মারতে আসবে, তিনি বলতেন—এসব করতে হবে, এসব করার সাহস তোমাদের থাকা উচিত। সব রকম কাজে হাত দিয়ে করবার সাহস তাঁর ছিল। আমাদের সে সাহস নেই। মহাভারত সম্বন্ধে তিনি যা করতে চেয়েছিলেন করলে দেখতেন—পুরানো জিনিস হলেও তাকে কি রকম আধুনিক ছাঁচে গড়ে তোলা যায়। সেটা দুঃসাহসিক কাজ হত।

আমরা সেরূপ কাজ করতে পারব কিনা, জানি না। দেশ থেকে দাবী না উঠলে আমাদের পক্ষে করা কঠিন। সাধারণত পাঠকদের কাছ থেকে চাহিদা আসে, আমরা লেখকেরা যোগান দেই। চাহিদা না থাকলে লেখক যোগান দেবে কি! পাঠক আগে আগে যায়, লেখক যায় তার পিছনে। কিন্তু এমনও হয়েছে— লেখক আগে আগে চলে, পাঠক পিছন পিছন চলে। পাঠক চাক বা না-চাক, রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, বহু বৎসর পর লোকে তাঁর কথা বুঝতে পেরেছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর লাগল চিত্রাঙ্গদার দ্বিতীয় সংস্করণ হতে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে সে-কাব্যের কত আদর হয়েছে, অনুবাদ হয়েছে। তার মানে, এদেশে পাঠক তৈরি হয়নি। অল্প লেখকই পাঠকের অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে। লেখক পঁচিশ বৎসর ধরে অপেক্ষা করবে—এ-ধৈর্য অল্প লেখকেরই আছে। বাঙালী লেখক হয়ত মনে করে, পঁচিশ বৎসর সে বাঁচবেই না। পাঠক তৈরি না হলেও আমার যা দেবার দিয়ে গেলাম, রবীন্দ্রনাথের জীবনে তা বহুবার ঘটেছে।

যেসব বিষয়ে তাঁর অতৃপ্তি ছিল—করা উচিত ছিল, কিন্তু করা হয়নি—তার কিছু idea তিনি আমাদের দিয়েছেন। ছড়ায় কিছু কাজ করা দরকার। Ballad বা গাথা বাংলা সাহিত্যে নেই বললেও চলে, এসব বিষয়ে লোকের মনে মস্ত ক্ষুধা জেগেছে। পাঠক যেন বলছে—তোমরা লেখ, আমরা পড়ি। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন—এ সকল বিষয়ে তাঁর কাছে লোকের অলিখিত দাবী আছে। একদিন না একদিন আমাদেরকে Ballad লিখতে হবে। সাধারণ লোক গুলি আওড়াবে। আরও জিনিস আছে। মজলিসী গান—একজন গাইলে পাঁচজনে কেড়ে নেয়। পাঠক যদি এ-জিনিসটি পায়, নিশ্চয়ই আনন্দের সংগে গ্রহণ করবে। কিন্তু এগুলি কে দেবে? এর possibility লোকে জানে না। যা পোষাকী নয়, তার দিকে আমাদের মন যায় না। 'ক্ষণিকা' লেখা হয়েছে পঞ্চাশ বৎসর আগে। যেমন হাল্‌কা ভাব, তেমনি লঘু ছন্দ। এর সমকক্ষ হতে পারে, এমন কোন জিনিস এখন পর্যন্ত হয়নি, এসব লাইনে কাজ করা হয়নি। করা উচিত. এমন কিছু আমাদেরকে দিতে হবে, যেটা লোকে মজলিশে, সমাবেশে, পাঁচজনে মিলে আওড়াতে বা গাইতে পারবে। আমাদের আছে ভজন-কীর্তন। লঘু জিনিস নেই। এ বিষয়ে গুরুদেব কিছু কিছু করে গেছেন। উদাহরণ দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি অবসর পান নি। কত লোকের দাবী তাঁর উপর এসেছে। ব্রাহ্ম সমাজ চেয়েছে তাঁকে আচার্য করতে। রাজনীতিকরা চেয়েছেন—স্বদেশী আন্দোলনে এসে লড়াই করতে। কত দিক থেকে তাঁর উপর দাবী-দাওয়া এসেছে। অনেক জিনিস আরম্ভ করে ছেড়ে দিয়েছেন। পরে কেউ আসেনি—তার সমাপ্তি করতে। 'ক্ষণিকার' যে সুর তিনি ধরিয়ে দিয়ে গেলেন, নিজেও না, অন্যেও না, কেউ তার অনুসরণ করেনি, এসব কাজ পড়ে আছে, করতে হবে। তারপর Classic হবার মতো পুস্তক রচনা করা দরকার; এ বিষয়েও আমরা বিশেষ কিছু করতে পারিনি। যা করেছি সমসাময়িকদের জন্য করেছি। ভাবী কালের জন্য করা হয়নি। স্পৃহাও নাই, দৃষ্টিও নাই। 'গোরা'র মত জিনিস আর হল না। ঐখানেই শেষ হয়ে গেল। 'যোগাযোগে' চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শরীরে কুলোল না। এগুলি করবার মত কাজ।

রবীন্দ্রনাথের আর একটা ক্ষোভ ছিল—Characterisation বা বিশেষ করে Character সৃষ্টি। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে যা করা হয়েছে। এমন Character সৃষ্টি করা দরকার, যা হয়ত ১০০।২০০।৫০০ বৎসর থাকবে। তাঁর খেদ ছিল এ বিষয়ে তেমন কিছু করতে পারেন নি। তাঁর অসমাপ্ত কাজ আমাদেরকে সমাপ্ত করতে হবে। চেষ্টা করলে পারব—এমন কথা কেউ সাহস করে বলতে পারে না। তবে কি কি কাজ করা উচিত, সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে চেষ্টা সফল হতে পারে।

গতানুগতিক ধারায় আমরা নূতন কিছু করতে পারব না। সে বিষয়ে চূড়ান্ত হয়ে গেছে। করলে পুনরুক্তি হবে। যেসব কাজ হয়নি, মহাজাতি সদনের মত যেসব কাজ অসমাপ্ত রয়েছে, তাকে সমাপ্ত করতে হবে। যা আরম্ভ হয়নি, তাকে আরম্ভ করতে হবে। বহু চেষ্টা করেও যা করতে পারলাম না, পরবর্তী যারা আসবে, তাদেরকে বলব—তোমরা কর। কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে।

প্রত্যেক বৎসর গুরুদেবের জন্মদিনে আমাদিগকে প্রশ্ন করতে হবে—গুরুদেবের এসব কাজ কি আমরা করছি? যা ভোগ করছি, তার সংগে কিছু যোগ করছি কি? গুরুদেবের সম্পত্তি আমরা ভোগ করছি। যতই বড়লোক হউক না কেন, যোগ না করে ভোগ করলে দশ বৎসরে দেউলিয়া হতে বাধ্য। পরে যারা আসবে, তারা দেখবে—সব শেষ হয়ে গেছে। বাঙলার বাইরের লোক বলছে—বাঙলা দেশ থেকে lead আসছে না। আমেরিকা থেকে একজন সাহিত্যিক বোম্বে এসে নামলেন। বোম্বের লোকেরা তাঁকে বলল—"কেন বাঙলা দেশে যাচ্ছ। Bengalees have lost their lead. সাহিত্য ক্ষেত্রে তারা আর lead করছে না।" এখানে আসার পর আমেরিকান ভদ্রলোক বললেন—"তিনি ভুল শুনেছেন। বাঙলা দেশে এখনও যা আছে, অন্য জায়গায় তা নেই।" শুনে আনন্দ হল—আমাদের কিছু আছে। আমরা যে সাধনা করছি, রবীন্দ্র-নাথের সাধনার তুলনায় তা হয়ত নগণ্য, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় নগণ্য নয়।

প্রত্যেক বৎসর যখন রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব আসবে, তিনি যে ঐশ্বর্য রেখে গেছেন, সেটা যখন আমরা স্মরণ করব, তখন সংগে সংগে মনে রাখতে হবে—আমাদের কাজ এখনও আমরা শেষ করতে পারি নি। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে," যে-কাজ করা দরকার, সে-কাজ যেন আমরা ভুলে না যাই, শয়নে স্বপনে যেন আমরা সেজন্য বেদনা অনুভব করি। হতাশ হলে কিছু হবে না। পরবর্তী যারা আসছে, তাদের উপর ভার দিয়ে যাব। দশ বৎসরে বাঙলা সাহিত্যের অভাব কিছু মিটেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগে তুলনা করলে মনে হয় —এখনও আমাদের অনেক জিনিস করতে বাকী আছে। তার জন্যে যেন আমরা বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।

যে-কাজ তিনি নিজে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু করতে পারেন নি, যে-কাজ আমাদের করা উচিত ছিল, কিন্তু করতে পারি নি, সে সম্বন্ধে পাঠক সচেতনভাবে দাবী না জানালেও অচেতনভাবে দাবী জানাচ্ছে, তারা বলছে—আমাদের যা দরকার, তোমরা দিতে পারছ না কেন? সেজন্য একটা আত্ম-নিবেদনের ভাব থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথের সেই ভাব ছিল। আমরাও যেন তার অধিকারী হতে পারি।

[রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে মহাজাতি সদনে প্রদত্ত বক্তৃতা, শ্রীইন্দুকুমার চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত]

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৪৫

চা পানের পূর্বেই বাসন্তী দেবীর নিকট কথাটা একান্তে উত্থাপিত করি। বলি, "শোবার আগে খানিকক্ষণ তাস না খেললে সারা রাত তাসের স্বপন দেখতে হবে। সুনিদ্রা হবে না।"

পূর্ব রাত্রের ক্ষোভের থমথমে ভাব তখনো বাসন্তী দেবীর মুখে সামান্য একটু লেগে ছিল। ঈষৎ গভীর স্বরে বলেন, "বেশ ত', খেলবেন।"

স্মিতমুখে বলি, "যেমন প্রতিদিন খেলি, সেইভাবেই ত?"

মাথা নেড়ে বাসন্তী দেবী বলেন, "না, সেভাবে নয়। আমি আর খেলব না।"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলি, "তবে আমার পার্টনার হবে কে?"

বাসন্তী দেবী বলেন, "কেন, টগর।"

বলি, "রাজি আছি, যদি আপনি দাশ সাহেবের সঙ্গে বসেন। তা হলে—" কথাটা শেষ করিনে।

বাসন্তী দেবী কিন্তু কথাটা অনুক্ত থাকতে দেন না; জিজ্ঞাসা করেন, "তা হলে কি হয়?"

মনে মনে বলি, তা হলে ললিতবাবুর হাড়ে শুধু বাতাসই লাগে না, মাংসও একটু লাগে। মুখে বলি, "তা হলে আপনার চোদ্দগুলো অনেকটা নিরাপদ হয়।"

সবেগে মাথা নেড়ে বাসন্তী দেবী বলেন, "আমার চোদ্দ নিরাপদ হয়ে কাজ নেই। অমন ছেলেমানুষের সঙ্গে কিছুতেই খেলা হবে না।"

খেলায় ছেলেমানুষেরই অগ্রাধিকার,—সুতরাং ছেলেমানুষের সঙ্গে খেলা করার স্বপক্ষে কয়েকটি সারগর্ভ যুক্তি দেখাই। যুক্তিগুলি ধৈর্যসহকারে শুনেও বাসন্তী দেবী মাথা নাড়েন, না, কিছুতেই নয়।

অগত্যা তখনকার মতো রণে ভঙ্গ দিই।

চা পানের পর পথে বেরিয়েই চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করেন, "বলেছেন বাসন্তীকে?"

বলি—"বলেছি,—কিন্তু রাজি হতে চান না। সত্যিই বেশ একটু বেঁকে রয়েছেন।"

ঈষৎ অধীরভাবে চিত্তরঞ্জন বলেন, "কিন্তু তা বললে ত' চলবে না উপেনবাবু,—রাজি আপনাকে করাতেই হবে।"

বলি, "শেষ পর্যন্ত রাজি নিশ্চয়ই হবেন। খেলার বিবাদ বেশীক্ষণ টেঁকে না।" এ কথায় আশ্বাস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে একটি গল্পের অবতারণা করি। গল্প শুনতে চিত্তরঞ্জন অতিশয় ভালবাসতেন, নিবিষ্ট মনে গল্প শুনতে থাকেন।

ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীর ঠিক সামনে এক বৃদ্ধ বাস করত। তার সমবয়স্ক অপর এক বৃদ্ধ যখন-তখন এসে তার সঙ্গে দাবা খেলত। দাবা খেলার বিষয়ে বৃদ্ধ দুজনের সময়-অসময়ের কোনো বিবেচনা ছিল না। দেখা হওয়া,—আর দাবার ছক পেতে দুজনে মুখোমুখি উবু হয়ে বসা।

সে সময়ে ভবানীপুরে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ড্রেন হয়নি। সদর দরজার সম্মুখে কাঁচা ড্রেনের উপর সিমেণ্ট-বাঁধানো সাঁকো; তার দুধারে দুই মঞ্চ; প্রত্যেক মঞ্চে জন তিনেক লোক বসতে পারে। তারই একটি মঞ্চে উবু হয়ে বসে দুই বৃদ্ধ দাবা খেলত। খেলতে খেলতে তাদের তর্ক-বিতর্ক চেঁচামেচির অন্ত থাকত না। সময়ে সময়ে অবস্থা এমন হয়ে উঠত যে, মনে হত মুখের ঝগড়া হাতেই বুঝি নেমে আসে!

একদিন বেলা দশটার সময়ে দুজনে মুখোমুখি উবু হয়ে খেলতে বসেছে। খেলা কিন্তু আরম্ভ হতে পারছে না। প্রথমে কে চালবে তাই নিয়ে বিষম ঝগড়া বেধেছে। ঝগড়াটা বোধ হয় পূর্বদিনের কোনো বিবাদের জের।

ঝগড়ার এক সময়ে দুই বৃদ্ধের মধ্যে একজন চীৎকার করে উঠল, "কাল কে হেরেছিল আর জিতেছিল, সে কথা কালই শেষ হয়ে গেছে। আজকে আমার প্রথমে চালবার অধিকার আছে।"

ভ্রুকুঞ্চিত করে অপর বৃদ্ধ বললে, "কি তোর অধিকার শুনি?"

প্রথম বৃদ্ধ বললে, "তুই শূদ্দুর আমি ব্রাহ্মণ, তাই আমি আগে চালবে।"

উত্তরে চোখ পাকিয়ে দ্বিতীয় বৃদ্ধ বললে, "এ কি বাপের ছেরাদ্দো হচ্ছে যে, বামুন বলে তুই আগে চালবি?"

আর যায় কোথায়! প্রথম বৃদ্ধ গর্জন করে উঠল, "তবে রে হারামজাদা! শূদ্দুর হয়ে তুই আমাকে বাপের ছেরাদ্দো দেখাস্!"

তারপর লেগে গেল হাতাহাতি, ধ্বস্তাধ্বস্তি; অবশেষে জাপ্টাজাপ্টি করে উভয়ে ফুট তিনেক নীচে একেবারে ঘন থক্‌থকে কৃষ্ণদ্রাধর ড্রেনের ভিতরে ঝপাং! ইতিপূর্বেই পথে লোক জমে গিয়েছিল; তাদের মধ্যে জন দুই যখন দয়াপরবশ হয়ে দুজনকে টেনে তুললে, তখন ড্রেনের পঙ্কিল উভয়কে এমন অভিন্ন আবরণে এক করে দিয়েছে যে, কে বামুন কে শূদ্দুর তা নির্ণয় করবার উপায় নেই।

আমরা ভাবলাম, বাঁচা গেল, এর পর নিশ্চয়ই উভয়ের মধ্যে মুখ দেখাদেখি থাকবে না। কিন্তু হরি, হরি! সেই দিনই বৈকালে দেখি মঞ্চের উপর মুখোমুখি উবু হয়ে ব'সে যেন অনালোড়িতপূর্ব সৌহৃদ্যের সহিত দুজনে বড়ে টিপছে। ঘণ্টা পাঁচেক পূর্বে জড়াজড়ি ক'রে উভয়ে যে ড্রেনে পড়েছিল, উভয়ের তৈলচিক্কণ দেহে তার কোনো চিহ্ন যেমন নেই, উভয়ের আচরণের মধ্যেও তেমনি তার পরিচয়ের একান্ত অভাব।

গল্প শুনে চিত্তরঞ্জন বললেন, "গল্পটি আপনার ভাল; তবে আমাদের ক্ষেত্রে এ গল্প ঠিক খাটে না, কারণ এ গল্পে উভয় পক্ষই সমান অপরাধী; কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে, বলতে গেলে, এক পক্ষই অপরাধী। আপনি ফিরে গিয়ে আবার ভাল ক'রে বলবেন।"

বললাম, "নিশ্চয়ই বলব।"

সেদিন আমরা একটু শীঘ্র শীঘ্রই ঘরে ফিরি।

বাসন্তী দেবীকে একান্তে পেয়ে সনির্বন্ধে বলি, "দয়া ক'রে আপনার পুনর্বিবেচনা করতেই হবে।"

মাথা নেড়ে বাসন্তী দেবী বলেন, "না, না, বিবেচনা যা করেছি, তার আর পুনর্বিবেচনা নেই।"

তখন মনে মনে বাগ্‌দেবীর শরণাপন্ন হ'য়ে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন পরাক্রান্ত ব্যারিস্টারের পক্ষ অবলম্বন ক'রে বেশ খানিকটা ওকালতি করি।

ওকালতি ফলপ্রদ হয়। মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে বাসন্তী দেবী বলেন, "দেখুন উপেনবাবু, আপনার অনুরোধে পড়েই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, খেলতে শেষ পর্যন্ত হবেই; কিন্তু তার আগে ও'কে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

উত্তরে বলি, "দণ্ডের দ্বারা যদি শিক্ষা দেওয়ার আপনার অভিপ্রায় থাকে, তা হ'লে আমার নিবেদন, সে শিক্ষা যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। এর পরও আপনার দণ্ডের ভার বাড়তে থাকলে ও পক্ষের অপরাধ কিন্তু ক্রমশ লঘু হ'তে থাকবে।"

বাসন্তী দেবী চুপ ক'রে থাকেন। লক্ষণ শুভ ব'লে মনে করি।

ক্ষণকাল পরে দেখি উৎফুল্লমুখে চিত্তরঞ্জন আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। নিকটে এসে স্মিতমুখে বলেন, "উপেনবাবু, বাসন্তী খেলতে রাজি হয়েছে।"

মনে মনে হেসে ফেলি, মুখেও বোধহয় সে হাসির খানিকটা আভাস ভেসে আসে; বলি, "খুবই আনন্দের কথা।"

চিত্তরঞ্জন বলেন, "এ শুধু আপনার অনুরোধেই হ'ল।"

মাথা নেড়ে বলি, "না, না, তা কেন! আপনার অনুরোধই কি তিনি শেষ পর্যন্ত অমান্য করতে পারতেন।" মনে মনে বলি, বাইরের জলসেচনের ফলে অঙ্কুর উদ্গত হয় বটে, কিন্তু উদ্গত হবার মূল কারণ মাটির ভিতরেই লুকিয়ে থাকে।

সেদিন চা-পানের পর একটু সকাল-সকালই আমরা বৈকালিক ভ্রমণে নির্গত হই। বাসন্তী দেবী যে রাত্রে তাস খেলতে স্বীকৃত হয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতায় ভরপুর চিত্তরঞ্জনের মন তাঁর প্রতি সুপ্রকাশ আগ্রহে উদগ্র হ'য়ে আছে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক সময়ে তিনি বলেন, "দেখ, দেখ, বাসন্তী, চেয়ে দেখ, আজকের আকাশটা কি wonderfully নীল! তুমি বেশ ক'রে ভেবে দেখ, প্রতিদিন এতটা নীল আকাশ দেখতে পাওয়া যায় না।"

আরক্ত মুখে বাসন্তী দেবী নিতান্তর মতোই সাধারণ নীল আকাশের প্রতি দৃষ্টি-পাত করেন। মেয়েরা মুখ ফিরিয়ে বোধ করি মুখ টিপে টিপে হাসে। মনে মনে আমি বলি, আকাশে নীল যেমন থাকে তেমনিই আছে;—শুধু "নয়নে তোমার নীল অঞ্জন লেগেছে, নয়নে লেগেছে।"

ক্ষণকাল পরে পাহাড়ের গা থেকে একটা অতি ক্ষুদ্র ফুল ছিঁড়ে নিয়ে বাসন্তী দেবীর হাতে দিতে দিতে চিত্তরঞ্জন বলেন, "দেখ, দেখ বাসন্তী, চেয়ে দেখ, সামান্য একটা ফুল; অবহেলায় অনাদরে পাহাড়ের গায়ে ফুটে থাকে, কেউ ভুলেও একবার চেয়ে দেখে না; অথচ, এর মধ্যে কত বিচিত্র কলাকৌশল, কি অপরূপ colour-scheme! আমি ভাবি, কেই বা কোথায় ব'সে এ সব করে, আর কিসের জন্যেই বা করে! খুব অদ্ভুত নয় কি?"

ফুলটি নিজের হাতে গ্রহণ ক'রে সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বাসন্তী দেবী বলেন, "হ্যাঁ, অদ্ভুত।"

আমিও মনে মনে বলি, অদ্ভুত! অদ্ভুত এই সাক্ষীর বাপের নামভোলানো দুর্দান্ত ব্যারিস্টারের সঙ্গে বালকের চেয়েও বালক চিত্তরঞ্জনের নিরন্তর একত্র বাস! এ চিত্তরঞ্জনকে দেখলে কে বলবে এ সেই ভাগলপুরের এজলাসে হাকিম নিয়ে ছিনি-মিনি খেলা করা ব্যারিস্টার সি আর দাশ?

সে রাত্রে যথাকালে যথারীতি তাসের বৈঠক বসে। কিন্তু উভয় পক্ষকে উভয় পক্ষের কোনো প্রকার ক্ষোভ না দেওয়ার
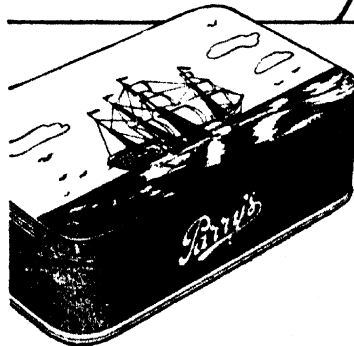
ীতি সচেতনতা বশতঃ সেদিনকার খেলা ঠিক-মতো জমতে পারে না। কিন্তু সে ঐ ক রাত্রিরই জন্য। পরদিন থেকে বিবাদ-তর্ক বিতণ্ডায় মণ্ডিত হয়ে পুনরায় ঠিক পূর্বের মতোই মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

তাসখেলার এই কাহিনীর সহিত আর একটি অতি ক্ষুদ্র উপকাহিনী জড়িত আছে। সেই উপকাহিনীটিকে এখানে স্মরণ করলে আশা করি সুরসিক পাঠকপাঠিকাগণ খুশিই হবেন।

মায়াবতী পৌঁছানোর পর দু-চার দিন কামিয়েই অনাবশ্যক বোধে চিত্তরঞ্জন দাড়ি গোঁফ কামানো বন্ধ ক'রে দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ বেরিয়ে মুখ একেবারে চ্যাড়বেড়িয়ে উঠল। জেল থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর ক্ষৌরকার্য করবার পূর্বে যে রকম আকৃতি হয়েছিল, চেহারাটা কতকটা যেন সেই পথেই পা বাড়িয়েছে।

হঠাৎ একদিন খেয়াল হ'য়ে ব্যগ্রকণ্ঠে বাসন্তী দেবী বললেন, "আচ্ছা, দাড়ি-গোঁফ কামাও না কেন বলত? দাড়ি-গোঁফ না কামিয়ে চেহারাটা কেমন চমৎকার হয়েছে, একবার আয়নায় তাকিয়ে দেখেছ?"

উত্তরে চিত্তরঞ্জন যে কথা বলেছিলেন, জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হ'য়ে বুঝতে পারি কত মূল্যবান সে কথা। চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, "আঃ বাসন্তী, তুমি স্ত্রীলোক, দাড়ি-গোঁফ কামানোর দুঃখ তুমি কি ক'রে বুঝবে? কলকাতায় থাকি, ভাগলপুরে থাকি, সভ্য সমাজে চলা-ফেরা করি, দাড়ি-গোঁফ কামাতে বাধ্য হই। এই সমাজ-সম্প্রদায়হীন মায়াবতীতে এসেও যদি সেই দাড়ি-গোঁফ কামানোর দুঃখ ভোগ করতে হ'ল, তা হ'লে এত খরচপত্র করে এই দুর্গম স্থানে কেন এলাম বল দেখি?"

একথার সমীচীন উত্তর বাসন্তী দেবী সেদিন হয়ত খুঁজে পান নি; কিন্তু বিরোধ-নিবৃত্তির পর দিন সকালে চিত্তরঞ্জন যখন চা-পান করবার জন্য চায়ের টেবিলে উপস্থিত হলেন, তখন দেখা গেল গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে তিনি পরিচ্ছন্ন হয়েছেন।

সুধী পাঠকপাঠিকাগণের নিকট এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৪৬

পূর্বেই বলেছি, মায়াবতীতে নিমন্ত্রিত অতিথিগণের বাসের জন্য একটি অতিথি-শালা বা Guest House আছে। সাধারণত সেই গৃহটিই অতিথিগণের বাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশেষ সম্ভ্রান্ত অতিথি হ'লে, অথবা অতিথি-পরিবারের সদস্যসংখ্যা অধিক হ'লে, আমরা যে গৃহে অবস্থান করছি, সেই মাদার্স কট্ বাংলোটি ব্যবহার করবার জন্য দেওয়া হয়।

আশ্রমের কর্তৃপক্ষ কিন্তু সেই সাধারণ অতিথিশালাটিও আমাদের ব্যবহারের জন্য অর্পণ করেছিলেন। বাসের উদ্দেশ্যে অবশ্য নয়, আমাদের বসবাসের পক্ষে মাদার্স কট্ বাংলোই যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। তাঁরা ঐ গৃহটিতে চিত্তরঞ্জন এবং আমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। মালঞ্চ এবং সাগর সঙ্গীতের কবি, 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ ত' নিঃসন্দেহ একজন লেখক; যমুনা ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রের গল্প-লেখক এবং 'সপ্তক' নামক গল্প-পুস্তকের গ্রন্থকার হিসাবে আশ্রম-কর্তৃপক্ষ আমাকেও একজন লেখক ব'লে গণ্য করেছিলেন। কাব্য এবং কাহিনীর সৃষ্টিভূমিরূপে তাঁদের অতিথি-শালাটি ধন্য হবে, এই অভিলাষে তাঁরা তথায় আমাদের সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্র রচিত ক'রে রেখেছিলেন।

পাঁচ-সাত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন সকাল বেলা চিত্তরঞ্জন বললেন, "এ পর্যন্ত একদিনও আমাদের লেখার আড্ডায় যাওয়া হ'ল না,—এ কিন্তু ভারি খারাপ দেখাচ্ছে উপেনবাবু। আজ চা খাওয়ার পর চলুন সেখানেই যাওয়া যাক্।"

খুশি হ'য়ে বললাম, "বেশ, তাই চলুন।"

চা-পানের পর অতিথিশালায় উপস্থিত হ'য়ে গৃহ দেখে বেশ ভাল লাগল। সুনির্মিত পরিচ্ছন্ন একটি মনোরম গৃহ; পাশাপাশি দুখানি চতুষ্কোণ ঘর। ঘরের কোলে দু পাশে দুটি টানা বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালে চতুর্দিকের দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আমাদের সাধন মন্দিরের বহিরাবরণ ত' তৃপ্তিপ্রদ, কিন্তু ভিতরের ব্যবস্থা দেখে খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম।

অতিথিশালার অভ্যন্তর ভাগ সদ্য চুণকাম করার দরুণ ঝক্‌ঝক্ করছে। দুটি ঘরের মধ্যস্থলে দুজন লেখকের লেখাপড়ার উপযুক্ত দুই প্রস্ত সম্ভ্রান্ত আয়োজন। সে আয়োজনের চেয়ার নূতন, টেবিল নূতন, টেবিলের উপরকার দোয়াতদান নূতন। দোয়াতদানে আঁটা কলমদানের ডালে ডালে নূতন কলমগুলির মুখে ঝিক্‌ঝিক্ করছে

নূতন নিব। নূতন ব্লটিং প্যাডের ব্লটিং কাগজের সারা আয়তনের মধ্যে কোথাও একটু মসীর স্পর্শ খুঁজে পাবার উপায় নেই। পিতলের কাগজচাপাগুলির দেহে নূতনত্বের রসান এখনো পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতায় বর্তমান।

ঘরের কোণে নূতন জলপাত্রের উপর রাখা কাঁচের গেলাসটিও যে, এই নূতনত্বের সমারোহের মধ্যে পূর্বব্যবহৃত পুরাতন বস্তু নয়, সে কথা হলপ নিয়ে বলা যেতে পারে।

সবই ত' সুন্দর, কিন্তু সাধনক্ষেত্রের এই অনাবিল পরিচ্ছন্নতার মধ্যে সিদ্ধির পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে ত? এই ছিম্‌-ছাম্‌ পারিপাট্যের ভিতর অবস্থান ক'রে লছমীপুর মামলার কাগজপত্র হয়ত' দেখা চলে;— কিন্তু কাব্যরচনা?— কাহিনী সংগঠন? সন্দেহ ভরে মন মাথা নাড়ে। নিখুঁৎ পরিবেশের মধ্যে কোথাও এমন একটু ভাঙাচোরা, এমন একটু ছেঁড়া-খোঁড়া অথবা এমন একটু ধুলো-ময়লা নেই, যার উপর আশ্রয় ক'রে মন সহজ হ'তে পারে। হাজার হোক, মানুষের মনই ত?—কলের মন ত আর নয়?

যাই হোক, চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি নেই মনে ক'রে, দু ঘরে দুজনে ব'সে পড়া গেল। মধ্যে দরজা খোলা সামনাসামনি আমরা বসেছি, সুতরাং কে কি করছে, না করছে, দেখতে পাওয়ার উন্মুক্ত সুযোগ বর্তমান। কলমদান থেকে কলম তুলে নিয়ে দেখি, দু দিকে দুই দোয়াতে দু রকমের কালি।— কালো আর লাল। লাল কালি দেখে মনে মনে হেসে আর বাঁচিনে! কালোই হালে পানি পায় কিনা তার ঠিক নেই, তার ওপর আবার লাল!

যাই হোক, মিনিট পাঁচেক ধরে সুগভীর নিদিধ্যাসনের পর লেখবার বিষয়বস্তু ঠিক ক'রে নিয়ে উৎফুল্ল মুখে কালো কালির দোয়াতে কলম ডোবাই; তারপর সবেগে লিখতে আরম্ভ করি,—

Babu Ramanimohan Ganguly
Athol Cottage
Simla (Punjab)

Babu Jatinath Ghosh
Station Road,
Bhagalpur (Bihar).

Srimati Bibhabati Ganguli,
27, Beltala Road,
Bhownipur Calcutta,
(Bengal) [India].

তারপর, হঠাৎ লিখি,

কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কি সে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

অবশ্য, মায়াবতীর অতিথিশালায় ব'সে আশীবিষে দংশনের কথা খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হয়, কারণ মায়াবতীতে আশী-বিষ নেই, তার বদলে আছে বড় বড় জোঁক; কিন্তু আমার রচনার যা পরিকল্পনা, তাতে আশীবিষের কথাই লিখি, আর জোঁকের কথাই লিখি, কিছুই অপ্রাসঙ্গিক হয় না; সুতরাং লিখি—

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝরঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়।

পুনরায় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের আর এক ঝাঁক ঠিকানা লিখি। হঠাৎ খেয়াল পড়ে লাল কালির দোয়াতে কালো কালির কলম রেখে দিয়ে নূতন একটা কলম তুলে নিয়ে তাতে চোবাই; তারপর যত ঠিকানার ডাকঘরের নামগুলো লাল কালি দিয়ে রেখাঙ্কিত করি। সে কার্য শেষ হ'লে, লাল ও কালো কালির সাহায্যে ছবি আঁকতে বসি।

ওদিকে ও-ঘরে সুতীব্র চিন্তার তাড়সে চিত্তরঞ্জনের মুখ হ'য়ে উঠেছে কঠোর; চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে চুল-গুলো উস্কোখুস্কো হ'য়ে গেছে। মাঝে মাঝে দোয়াতে কলম ডোবাচ্ছেন, কিন্তু কালি কাগজে অবতরণ করবার বাগ পাচ্ছে না; কলমের কালি কলমেই শুকিয়ে যাচ্ছে; আবার কলম ডোবাচ্ছেন। বুঝতে পারছি, ছন্দ হাত-পা গুটিয়েছে; ভাব কোটর প্রবিষ্ট হয়েছে।

এ ঘরে, আমি ছবি আঁকা ছেড়ে আবার অবিরত ঠিকানা লিখে চলেছি। চিত্তরঞ্জন মাঝে মাঝে চেয়ে দেখেন, আর ভাবেন, আমার গল্প লেখা হয়ত বা আধখানাই শেষ হ'য়ে এল। আমার লেখার অজচ্ছলতাই বোধ করি তাঁর লেখন শক্তিকে আরও পঙ্গু ক'রে দিয়েছে। হয়ত' তিনি মনে করেন, এই সামনা-সামনি দেখতে পাওয়ার অসুবিধা না থাকলে কিছু সুবিধা তিনি করতে পারতেন।

উঃ' শব্দ ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসে মধ্যবর্তী দরজায় এক পাশে ঠেলা সবুজ রঙের ভারি পুরু পর্দাটা দরজা জুড়ে টেনে দেন। আমিও অন্তরিত হয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে পুনরায় চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করি।

মিনিট দশেক পরে পর্দাটা ঈষৎ ন'ড়ে ওঠে। তাকিয়ে দেখি, এক পাশে পর্দাটা সামান্য একটু স'রে গেছে, আর সেই ফাঁকে একখানা চশমার দুটো পুরু লেন্স আগুনের মতো গন্‌গন্‌ করছে। জিজ্ঞাসা করি, "কিছু লিখলেন নাকি?"

পর্দা সরিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ ক'রে চিত্তরঞ্জন বল্লেন, "একটা অক্ষরও নয়। আপনি?"

দুখানা স্লিপ্‌ লিখেছিলাম; চিত্তরঞ্জনের হাতে দিয়ে বলি, "এই লিখেছি।"

স্লিপ্‌ দুখানা একমুহূর্ত চোখ বুলিয়ে চিত্তরঞ্জন হো হো ক'রে হেসে ওঠেন। বল্লেন, "চলুন বেরিয়ে পড়া যাক্‌। এ বাড়িতে কোনো দিন কিছু হবে না।"

স্লিপ্‌ দুখানা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে একেবারে টাটকা নতুন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে প'ড়ে সোজা উপস্থিত হই নিভৃত-নির্জন মাদার্স ওয়াকে।

মায়াবতীতে থাকতে চিত্তরঞ্জন কয়েকটা গান রচিত করেছিলেন; আমিও কিছু লেখা লিখেছিলাম;—কিন্তু সে সবই শব্দকোলা-হলময় নানা বাধাবিঘ্ন আকীর্ণ মাদার্স কটেজে ব'সে। অনাবিল শান্তিমণ্ডিত ঠায়-ঠিক্‌ ছিমছাম্‌ অতিথিশালায় সেই এক দিনেই প্রথম দিন আরম্ভ হয়েছিল এবং শেষ দিন শেষ হয়েছিল। (ক্রমশ)

উৎক্রান্তা

হীরালাল দাশগুপ্ত

মহাকাল, ইতিহাস পূর্ণ বৃত্ত ব্যাসে,
নিঃশব্দ গম্ভীর মৌন বিন্দু বিবর্তনে,
চিরচঞ্চলের মাঝে স্থির প্রলম্বিত,
উদ্বেলিত আলোকের তরঙ্গ শিখরে
অকস্মাৎ স্তব্ধ প্রাণ—
বন্দী বিন্দু অনন্ত একক!
বিস্তৃতিবিহীন স্থিতি জ্যামিতি জৌলুশ—
নহে সৃষ্টি-বিপর্যয় আবেগ প্রবাহ,
নহে ঊর্ধ্ব হাউই-উল্লাস,
নহে অধঃপতন পিচ্ছিল,
শূন্য শিখা,
পূর্ণ দ্যুতি,
বিন্দুবক্ষে বিন্দু মুক্তামালা।

জন্ম-মৃত্যু সঙ্গমের লঘুগুরু তালে,
প্রকাশ-বেদনা ক্ষণে ব্যাকরণহীন,
তমিস্রা ও গোধূলির গোপন মিলনে,
সদ্যজাত শিশিরের পতন ধারায়,
সময়ের শীর্ষে শীর্ষে,
ফোয়ারার শতচ্ছিদ্র মুখে,
বিচ্ছুরিত ঊর্ধ্ব গতি স্রোতে,
মূর্ছিত মুহূর্ত রাশি মুহূর্তে বিলীন।

ধূসরিত পাণ্ডুপত্রে স্মৃতি বিস্মৃতির
আক্ষরিক ইতিবৃত্ত অর্থহীন বিকল্প ব্যঞ্জনা!
পথ ভ্রমে পথ পরিভ্রম,
ভ্রষ্ট লক্ষ্য পাথেয় বিহীন;
কভু ঘন মৃত্যু-কালো অরণ্য অন্তরে,
বরফ কাদার নদী পাহাড়ে পাহাড়ে।
কিংবা মরু মন্দানিল—
মারি মরীচিকা—
স্বর্ণ মৃগ শিকার সন্ধানে।
চুম্বিত কি অচুম্বিত অধর রক্তিম,
দিবাস্বপ্ন আশা আর বেনামী বেদনা,
রাত্রি আর দিন দুই পক্ষ সঞ্চারণে
বিলম্বিত এ জীবন অপসৃয়মান।

জাতিভ্রষ্ট সিসৃক্ষার বিজ্ঞানবিভ্রম,
মননের যান্ত্রিক যাতনা।
অপচয়, অপচয়, শুধু অপচয়!
পোড়া মাটি,
কঠিন পাথর!
শূন্য গর্ভ,
ফাঁকা অবয়ব।
অন্ধকারে অবলুপ্ত সূর্য আলো সমুদ্রের ঢেউ
কঙ্কালের করতালি রিক্ত চতুর্দিকে!
প্রেতায়িত ছায়ায় ছায়ায়
অন্ধকারে চলে অন্ধকার,
আলোহীন আলোর প্রবাহ!
কোথা প্রাণ?—
কোথায় প্রত্যাশা?

নিরবলম্ব কি মন?
শুধু সংখ্যা? অঙ্কের পূরণ?
প্রয়োজনে প্রতিমানির্মাণ,
প্রয়োজনে সলিলসমাধি!
দর্শনবিমুখ মন বিজ্ঞানবিলাসী,
ধরিত্রীর রক্তপানে পাশব পিপাসা!
নহে যীশু অহিংস উন্মাদ।
নহে বুদ্ধ অতি বুদ্ধিহীন!
মুক্তিরত্ন যুক্তির ভাণ্ডারে!
নিত্যবস্তু পদার্থবিদ্যায়—
মাংস স্বাদ সুস্বাদু নরম,
সোনা আর সৈন্যের সমাস!
কোথা প্রাণ?—
কোথায় প্রত্যাশা?
এ শরীর পোড়া মাটি,
হৃদয় পাথর!
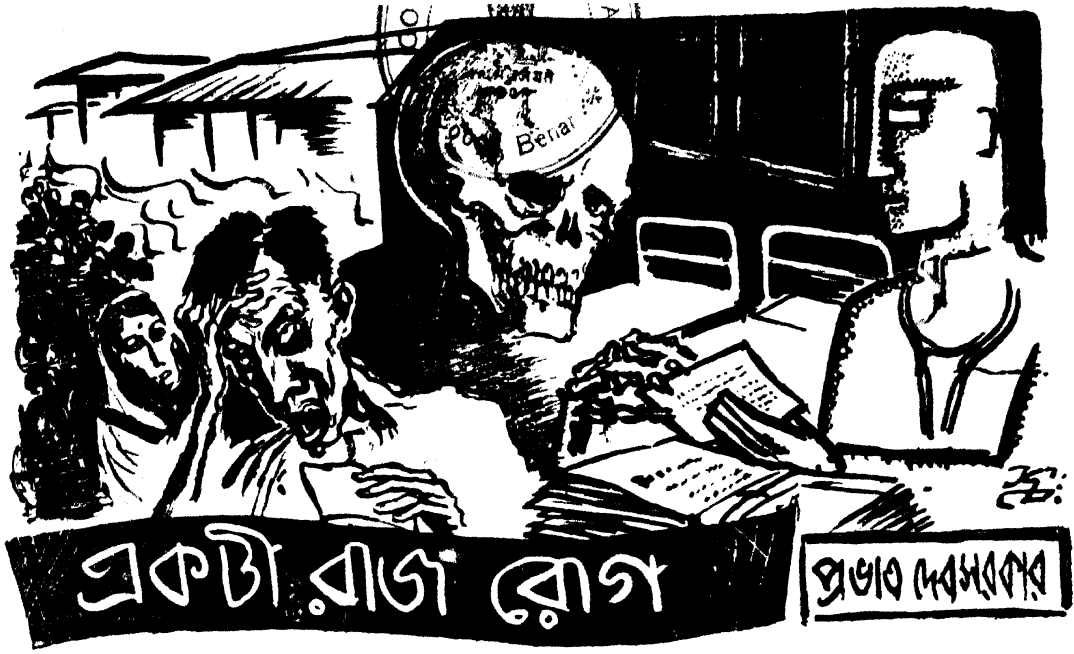
যা কে ধরেছে তাকে নিয়ে তো ভয় নয়, আর যাদের ধরেনি তাদের নিয়েই মন ভয়!—একজনের জন্যে আবার পাঁচজন মারা পড়ে!"

বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া পরিচয় পত্রটা স্খলিত হাতে বাড়িয়ে ধরে জড়িত-কণ্ঠে প্রবোধ বললে।

কিন্তু যাঁর সামনে এত আগ্রহভরে পত্রটা মেলে ধরা হলো তাঁর মুখচোখের না হলো কোন ভাবান্তর, না বেরুল তাঁর মুখ দিয়ে সম্মতিসূচক কোন কথা। যেন পাথরকে নিবেদন করা হলো। নিজের কথার নিঃশব্দ প্রতিধ্বনিটা বিকৃত সুরে প্রবোধকে ব্যঙ্গ করলে—মরলেই বা কার কি! আর এই প্রথম বোধ হয় প্রবোধ নিজ অবস্থার হীনতাটা উপলব্ধি করলে মর্মান্তিকভাবে।

ঐ চিঠির পরেও কিছু বলাটা বোধ হয় অশোভন প্রগলভতা, প্রবোধ লজ্জা পেয়ে ব্যগ্র চোখ দুটো নামিয়ে নিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে অপ্রস্তুতের মত! সুপারিনটেন-ডেণ্টের যোগ্য ঘর বটে—পর্দায়-আসবাবে পরিচ্ছন্নতায় ফিট্‌ফাট! এ ঘরে সব কিছু মানানের মধ্যে সেই কেবল বেমানান আর বেখাপ্পা।

ঘাড় ফিরিয়ে প্রবোধ চোখ দুটো জানালায় বাইরে বার করে দিলে—তবু কিছুটা স্বস্তি। অনেকটা জমি ফাঁকা ছেড়ে দিয়ে ঐ দূরে ব'-এর মত টিনের চালাগুলো ক্ষয়-রোগীদের আস্তানা—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের পর খানিকটা অবসর। ভাইটাকে যদি একবার এখানে এনে ফেলা যায়, প্রবোধের কেমন আশা হয়—নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে, তারাও বাঁচবে। আজও ভাইএর জ্বর-কাশি দেখে এসেছে। এখানে কোন রকমে ভর্তি হলে বোধ হয় ও-সব কিছুই থাকে না, আস্তে আস্তে সব শান্ত হয়, জুড়িয়ে যায়। অমন সাংঘাতিক রোগকে সায়েস্তা করার মন্ত্র এরাই জানে কেবল।

কিন্তু এত চেষ্টাচরিত্র করে শেষ পর্যন্ত যদি ভাইকে এখানে আনতে না পারে? ঘাড় ফিরিয়ে প্রবোধ আবার চোখ দুটো ঘরের মধ্যে আনে। চিঠিটা তখনো আলগোছা তুলে ধরে সুপারিনটেনডেণ্ট চুপ করে নির্বিকার চেয়ে আছেন, যেন বলবার কিছু নেই, ভাববার কিছু নেই, একটা অবাঞ্ছিত অস্পৃশ্যতার সম্মুখীন হলে মানুষের যেমন হয়।

মুখোমুখি তবু যেন অনেকটা দূর—প্রবোধের চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে আসে, সুপারিনটেনডেণ্টের মুখটা তেড়া-বেঁকা দেখায়। বাইরে ব-এর মত চালাগুলো মেঘের কোলে মিলিয়ে গেল যেন।

চোখ দুটো মুছবে কি না ভাবতে গিয়েই যেন অকারণে ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। উদ্গত অশ্রু আশা-নিরাশায় উজ্জ্বল। হয়তো এই-ই করুণা ভিক্ষা ভদ্র, দুঃস্থ ব্যক্তির নিঃশব্দে।

পড়া শেষ করে চিঠিটা টেবিলের ওপর যত্ন করেই সুপারিটেনডেণ্ট রাখলেন। উত্তর হিসেবে কিছু একটা বলতে গিয়েও যেন হঠাৎ থেমে গেলেন—ঘুরান চেয়ারটা বার-কতক ঘুরিয়ে নিলেন শুধু।

প্রবোধের উৎসুক চোখের কোলে জমে-ওঠা অশ্রুবিন্দু থর-থর করে কেঁপে উঠলো—প্রথম আলোর স্পর্শে শিশিরবিন্দু যেমন কাঁপে ঘাসের বুকে।

নির্বিকার কণ্ঠে সুপারিনটেনডেণ্ট বললেন, জীবনবাবুর চিঠি এনেছেন যখন, তখন—

দু' ফোঁটা অশ্রু টেবিলের কাঁচের ওপর ঝরে পড়লো। প্রবোধ প্রকাশ্যেই চোখ মুছলে। আজই হয়তো একটা ব্যবস্থা হবে, বড়লোকের কথার কোন দাম না থাকলে তাদের জীবনের মূল্য তো কাণা কড়ি! কে মুছবে তাদের?

সুপারের অসমাপ্ত কথার জেরটা কিন্তু শেষ হলো আর একভাবে রবার টেনে ছেড়ে দেওয়ার মত ঃ কিন্তু কোন উপায় নেই, মুশকিল!

আর হয়তো কোন কথা চলবে না, চালালেও তা বৃথা বাক্যব্যয় হবে। অত বড় লোকের সুপারিশে যখন কোন কাজ হচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই কোন উপায় নেই।

তবু স্মৃতর্পণে একবার ভীরু আড়ষ্ট হাতটা টেবিলের অশ্রুসিক্ত স্থানে বুলিয়ে নিয়ে রুদ্ধস্বরে প্রবোধ বললে, দয়া করে একটা উপায় না করি দিলে আমরা যে মারা পড়ি, বাড়িতে রাখা কি উচিত হবে ও রুগী...

মনে হলো সুপারিনটেনডেন্ট যেন হাসলেন কথাটা শুনে। সত্যিই তো উচিত-অনুচিতের উনি কি ধার ধারেন? যার রুগী সে-ই বুঝবে! নির্লিপ্তকণ্ঠে দোষারোপের মত বললেন, উপায় থাকলে তো করবো—সব বেড্ই ভর্তি, পয়সা দিয়ে লোকে জায়গা পাচ্চে না! তার ওপর--

কথার টানে কিছু ইঙ্গিত ছিল বোধ হয়, প্রবোধ আশান্বিত হলো। যেখানে যত ভর্তিই থাক, কোন ফাঁকে খালি পাওয়া বিচিত্র নয়। শুধু আবেদন-নিবেদনের রকম ফের—যে জিনিস তুমি পাও না, সে জিনিস আমি তো পাচ্ছি স্বচ্ছন্দে!

প্রবোধ আবেদন করলে, আমাদের মত লোক কখনো ও রোগ পুষতে পারে! নিজেরাই তাই খেতে পাই না, রুগীকে খাওয়াব!

উস্কে দেওয়া প্রদীপশিখার মত প্রবোধের অধর বোধ হয় স্ফুরিতঃ আপনারা দয়া না করলে এ দুনিয়ায় আমাদের থাকার স্থানই হয় না। রাখতে আপনারা মারতেও আপনারা!

নিবেদনের ভাষাটা আরো প্রাঞ্জল করবার ইচ্ছে ছিল প্রবোধের, কিংবা ইচ্ছে ঠিক নয়, কেমন যেন এসে যাচ্ছিল দম-দেওয়া পুতুলের হাত-পা নাড়ার মত। হঠাৎ সুপারিন্-টেন্ডেণ্টের মুখের ওপর নজর পড়তে প্রবোধ নিজেকে সামলে নিলে—ভাগ্যিস্ পায়ে ধরার প্রস্তাব করে বসেনি, নিবেদিত ব্যক্তিটি বয়সে অনেক ছোট হবে, যে ভায়ের অসুখ করেছে তার চেয়েও ছোট বোধ হয়।

সুপারিনটেন্ডেন্ট বললেন, রিফিউজি-দের ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিতে হবে, মন্ত্রীদের চিঠি বা সুপারিশ! বেড্ তো মোটে চার শো একুশটা!

না, কোনই আশা নেই আর। কেঁদেও বোধ হয় সুবিধা করতে পারবে না সে। হলেই বা জীবনবাবু খবরের কাগজের লোক!—রুগ্ন উদ্বাস্তু, ওপরওয়ালাদের ডান হাত বাঁ-হাতের সম্পর্ক ঠেলে যাবার তাঁর সাধ্য কি!

তবু তোর না পারি তোর কাজের পায়ে গড়। প্রবোধ কেঁদে ফেলবার যোগাড় করলে—বাধা না পেলে পায়ে হাত দিয়ে ফেলেছিল আর কি!

সুপারিনটেনডেণ্ট স্মিতহাস্যে বললেন, এই তো বললুম—আজকাল নানা ব্যাপার! আমাদের বিবেচনার কোন মূল্যই নেই। চাকুরি করা দায় হয়ে পড়েছে!

প্রবোধ আর সামলাতে পারলে না নিজেকে, বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললে, আমি আর কাউকে জানি না, আপনাকেই জানি—রাখতে হয় রাখবেন, মারতে হয় মারবেন। উপায় একটা আপনাকে করে দিতেই হবে।

মনে হলো যেন একটু আবদারের সুর আছে প্রবোধের আবেদনে। আর সত্যি এ আবদার ছাড়া আর কি! এক কথায় জীবন-বাবুর লোক তো আর সুপারিনটেনডেণ্টের লোক হতে পারে না।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, প্রবোধ অধীর আগ্রহে দম একরকম বন্ধ করে ফেলে। হয়তো দম ফেটে যাবার মত হয়।

সুপারিনটেন্ডেণ্টের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তারতম্য কিছু হয় না। কণ্ঠস্বর সব কিছু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ঃ বললুম তো আপনাকে আমাদের হাত-পা বাঁধা--করবার কিছু নেই! এ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যান, কমিটির কাছে প্লেস করবো!

প্রচণ্ড ক্রোধ, প্রচণ্ড অভিমান, প্রচণ্ড হতাশা দমন করে, প্রবোধ হাসবার চেষ্টা করে বললে, সে তো তাহলে এ বছর নয়! কত এ্যাপ্লিকেশন অমন পড়ে আছে বছর-খানের ধরে!

উপায় কি বলুন? যেখানে পাঁচ লাখ লোকের রোগ, সেখানে পাঁচ শো সিটে কি হবে? লোকে তো বুঝবে না! সুপারিন্-টেন্ডেণ্ট আক্ষেপ করেন কি অভিযোগ করেন বোঝা যায় না।

পাঁচ লাখ! এত লোকের টি বি! ইস্-স্! অবিশ্বাস্য সুরে প্রবোধ আঁৎকে ওঠে। কে জানে এ তত্ত্বে কিছুটা প্রবোধ মানে কি না সে মনে মনে।

সুপারিনটেনডেণ্ট নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন। পাঁচ লাখ এ আর এমন বেশি কি! পঞ্চাশ লক্ষ হলেও বোধ হয় তিনি আশ্চর্য হোতেন না। রোগ প্রতিষেধক নানা প্রক্রিয়ার প্রাকার তুলে তিনি অবস্থান করছেন, তাঁর ভয়টা কি? যতবার বাইরে থেকে হাওয়া আসছে ততবার ঘরের ওষুধ-ওষুধ গন্ধটা ঘুলিয়ে উঠছে—যক্ষ্মা প্রতিরোধের আপ্ত-বাক্যগুলো কাচের বাঁধান ফ্রেমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ঃ ফাঁকা জায়গায় বাস করুন! বাসগৃহের চারপাশে প্রচুর আলোবাতাসের ব্যবস্থা করুন! অন্ধকার স্যাঁত-সেঁতে, বসতি-ঘন স্থানে যক্ষ্মার জীবাণু পরিস্ফুট হয়! ....যেখানে-সেখানে থুতু ফেলিবেন না, থুতুর দ্বারা যক্ষ্মা সংক্রামিত হয়!

একটা উদ্গত শ্লেষ্মা গলাধঃকরণ করে প্রবোধ সচকিত হয়ে ওঠে। ভায়ের রোগ হওয়ার কারণটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়—হায় কোথায় আলোবাতাস, কোথায় ফাঁকা জায়গা? বৌবাজারের অন্ধকার স্যাঁত-সেঁতে দুখানা ঘর! বসতিঘন? গায়ে-গায়ে তবু ভাল, পায়ে মাথায় এক করে চালনী পশু-পাখীর মত মানুষের শহর-বাস! থুতু? আকাশের গায়ে তো ছুঁড়ে ফেলা যায় না—তাই যেখানে-সেখানে ফেলতে হয়। মাটিতে তাদের পা রাখবার জায়গা নেই, শরীরের ক্লেদ তারা রাখবে কোথায়?

কিন্তু তা যে এত বিপজ্জনক কে ভেবেছিল! এতদিন না ভেবেই বরং তার ভাল ছিল, ভাবলে তো আর জ্ঞান থাকে না।

নাঃ, প্রবোধ কিছু ভাববে না। যক্ষ্মা আর যার পারে হোক, তার কি!—ভায়ের জন্যে কেবল একটা ফ্রি বেড্, তা হলেই তার ভাবনার নিবৃত্তি।

এখনো বসবে, না উঠবে, না আরো খানিক কাকুতি-মিনতি করবে, প্রবোধ ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

সুপারিনটেন্ডেণ্টের মুখের হাসি অনেকক্ষণ মিলিয়ে গেছে—ভদ্রলোক কেমন যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। আর বোধ হয় সুবিধা হবে না।

প্রবোধ অপরাধীর মত আমতা আমতা করলে, তা হলে——

সুপারিনটেন্ডেণ্ট যেন বলবার জন্যে

স্তুতই ছিলেন, একটা এ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ন।

কথার সুরে কোন আশ্বাসই প্রবোধ পায় ।। এতক্ষণের সাহচর্যে কোনই ফল হয়নি। ার একটু বলে দেখবে নাকি?

প্রবোধ বললে, একটা ব্যবস্থা তাহলে ীগ্গিরই করবেন! বড় গরীব আমরা!

অবাক সুরে সুপারিনটেনডেণ্ট বললেন, । কি করে বলবো! কমিটির হাত—ডিউ র্সে এ জানতে পারবেন।

প্রবোধ শেষ চেষ্টা হিসেবে বললে, আমরা ড় গরীব—দয়া না করলে মারা যাব!

মরাটা অত সহজ নয় বলেই বোধ হয় পারিনটেনডেণ্ট কথাটা কানে করলেন া। অনন্যমনে কাজ করতে লাগলেন। একটা জ্ঞাতকুলশীলের জন্যে অনেকটা সময় তিনি পব্যয় করেছেন।

হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে কোন পক্ষ থেকে ার কোন সাড়া-শব্দ হয় না। একটা বোকা প্রতিভতা নিঃশব্দে ঘরময় চঙ-মঙ করে। ধিন ছবির মত সবটা মনে হয়—এই ঘর ই দোর। রোগ প্রতিকারের সরকারী এই ত আয়োজন, কোন মানেই হয় না! নরর্থক! মিছে প্রবঞ্চনা!

ফেরবার পথে সাইকেল রিক্সার ওপর থেকে বোধ একবার পিছন ফিরে দেখেছিল। দূরে থকে মধ্যবর্তী ঝিলের কালো জলে মনে য়েছিল রূপো ঠিকরে উঠছে—ওপারে যক্ষ্মা সপাতালের টিনের ছাউনিগুলো রোদে লসে গেছে। সামনে গরুচরা মাঠে ঘাস-লো ডগা থেকে শুকিয়ে গুটিয়ে কেমন ক রকম হয়ে আছে। ঘাসের শীষে আকাশ খানে প্রান্তলীন নয়। বড় উর্ধ্বস্থিতি তার।

প্রবোধের মনে পড়ে যায়, এক সময় লটারী অধ্যুষিত ছিল এই অঞ্চল। শত্রুর থে চেয়ে যেখানে ঘাটি গেড়েছিল মিত্রপক্ষ, াবতে কেমন অদ্ভুত লাগে, এখন সেখানে ক্ষ্মা হাসপাতাল; রাজ-রোগের চিকিৎসা-ন্দ্র! ভাববিলাসিতার মত মনে হয় এই রিকল্পনা। পাঁচ লক্ষে পাঁচ শো, তাহলে াজারে কত?

আর আশ্চর্য চোখের ওপর সুপারিন-টেনডেণ্টের ঘরের ছবিটা অবিকল ভেসে ঠে—যক্ষ্মা না-ছড়াবার কত ছেঁদো কথা, ত অভিনব ছাঁদে মেলে-ধরা! রিক্সার সঙ্গে ঙ্গে গোটা হাসপাতালটাও যেন মরীচিকার ত সামনে এগিয়ে চলেছে, কোথা থেকে ষুধ-ওষুধ গন্ধটাও নাকের ডগায় ভেসে আসছে। খালিপেটে গা গুলিয়ে বমি না হয়ে মুখ দিয়ে কেবল থুতু ওঠে—প্রবোধ থু-থু করে একটানা অনেকক্ষণ।

'থুতু ফেলিবেন না।' কেন কি হয় ফেললে? তা বলে থুতু গিলে খাবে নাকি? যত রোগ থুতুতে! বাজে কথা! থুথু!

স্টেশন পর্যন্ত সারা রাস্তা প্রবোধ থুতু ফেলতে ফেলতে আসে। প্রতিবাদে না অভ্যাসে না ঘৃণায় বলা যায় না। মুখের থুতু কিছুতে ফুরোয় না। থু-থু করে করে কণ্ঠতালু শুকিয়ে ওঠে। 'থুতু ফেলিবেন না!' কি মনে হয় ও কথায়। থু-থু!

চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে থুতু ফেলতে গিয়ে হঠাৎ ভয়ে আতঙ্কে প্রবোধ শিউরে ওঠে—তাকেও কি রোগে ধরলো নাকি! তানা না হলে অনবরত থুতু ফেলবার ইচ্ছে হচ্ছে কেন? থুতু ফেলা রোগ তো—

যে বিপদের মধ্যে তারা পড়েছে, সেটা কাটাবার আগেই যদি আরো একটা বিপদ আসে, আরো সাংঘাতিক আরো মর্মান্তিক কিছু একটা ঘটে, তাহলে এখন যেমন চলছে সব তখন তেমনই চলবে? কোলকাতা থেকে কাঁচড়াপাড়া ট্রেন ঠিক সময়ে যাতায়াত করবে? ধর যক্ষ্মা তার হলো, তার বউ-এর হলো, তার ছেলেপুলের হলো—এক এক করে তার পরিবারের সকলেই মারা পড়লো—তাহলেও কি সব একই তালে চলবে? কখনই না! প্রবোধের ইচ্ছে করলো, চলন্ত ট্রেনটাকে টেনে ধরে থামিয়ে দেয়—যাত্রীরা জানুক তার বিপদের কথা, তার ভায়ের মরণাপন্ন অসুখের কথা। আর শুনুক তাদের মত গরীব লোকের হাসপাতালে জায়গা হয় না! তার ভায়ের অসুখের সঙ্গে সব থেমে যাক, জ্বলে যাক, পুড়ে যাক—কি দরকার এই পৃথিবীর! থু-থু!

"একটু দেখে-শুনে থুতুটা ফেলবেন—সাবধান হতে পারেন না, ছি!" পাশের জানালায়-বসা ভদ্রলোক বললেন রুষ্ট কণ্ঠে।

প্রবোধের সম্বিত ফিরে এল। এতক্ষণ পাগলের মত কি যা তা ভাবছিল সে! তা বলে লোকের গায়ে থুতু ফেলবে সে? ছি ছি!

স্তিমিত চোখ দুটো তুলে প্রবোধ সহযাত্রীর মুখের ওপর চেয়ে থাকে। মূক অপরাধ স্বীকারে সঙ্কুচিত হয়ে নিজ অবস্থার প্রতিচ্ছবিটা তুলে ধরতে চায় কি না কে জানে।

ছবিটা হয়তো সহযাত্রীর চোখে ধরা পড়ে। ভদ্রলোক সহজভাবে বলেন, থুতু জিনিসটা ভাল নয়, রোগের গোড়া! দেখে-শুনে ফেলাই উচিত!'

প্রবোধ তেমনিভাবেই সহযাত্রীর কথাগুলো শোনে—হাঁ-না কিছুই বলে না। সত্যিই অপরাধ তো তার! বলবার কিছু নেই—যেখানে-সেখানে যত্র-তত্র থুতু না-ফেলার নিষেধবাক্য পালন করা উচিত: থুতু ফেলিবেন না! থুতু ফেলা নিষেধঃ—ট্রেনের কামরার গায়ে এনামেল্ প্লেটে স্পষ্ট লেখা আছে, তুমি দেখতে পাও না!

এখান থেকে কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেণ্টের ঘরটা কতদূরে? প্রবোধ মনে মনে হেসে ওঠে—অভ্যাস ছাড়াও যে মানুষ দারুণ ঘৃণায় থুতু ফেলে সে খবর ক'জন রাখে!—মুখ দিয়ে থুতু শুধু রোগে ওঠে না, রাগেও ওঠে। অসহায় ক্রোধে কারো উদ্দেশে নিষ্ঠীবন উৎক্ষিপ্ত হয় না কি? সে যেই হোক, সমাজই হোক সংসারই হোক বা কোন ব্যক্তি হোক! থু-থু!............

কে যেন কবে খোঁচা দিয়ে চোখটা কানা করে দিয়েছিল—সেই থেকে বউবাজারের ফটিকচাঁদ দত্তের গলির মুখে দাতব্য আলোটা চোখ বুজে আছে—চাঁদের আলো বা দিনের আলো ছাড়া সেখানে আর কোন আলো বড় একটা চোখ মেলে না। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না, প্রবহমান জীবন স্রোতে চিঠিপত্রে, পৌরপ্রতিষ্ঠানের নথিপত্রে আর শহরের চৌহদ্দিতে ফটিকচাঁদ দত্তের নাম আজো অক্ষুণ্ণই আছে। হাজার বছর পরে কোন পুরাতত্ত্ববিদের গবেষণায় ঐ নামটা ধরা পড়লেও পড়তে পারে—আজ এই গলির অন্ধকারে কোন আলোর ব্যবস্থা থাক বা না থাক।

দূর থেকে প্রবোধ চমকে উঠলো। তার বাড়ীর ভাঙা দরজার দোরগোড়ায় একটা কঙ্কাল মূর্তি যেন দাঁড়িয়ে আছে। একি, ভাই কি তার অপেক্ষায় রোগশয্যা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু কি সংবাদ সে তাকে দেবে—হাসপাতালে সিট্ পাওয়া গেল না—মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঐ অন্ধকূপে অপেক্ষা করতে হবে। কোন উপায় নেই ভাই! রোগগ্রস্ত না হয়েও আমি তোর চেয়েও অসহায় নিরুপায়! তোর দাদার কোন দামই নেই!

মালতী! তুমি? প্রবোধ আরো চমকে উঠলো। দূরে সদর রাস্তার চোলাই করা আলোর স্তিমিত রেখায় গলির অন্ধকার স্পষ্ট উদ্ভাসিত না হলেও কাছের মানুষ চেনা যায়।

বোধ হয়, মালতী ম্লান হেসেছিল! হাঁ আমি! ভয় পেলে নাকি!

প্রবোধ সহজ হয়েছে এতক্ষণে। বললে, না ভয় পাব কেন! ভাবছিলুম তুমি হঠাৎ আমার জন্যে—

মালতী বললে, কেন দাঁড়াতে নেই? সেই কখন ভোর বেলায় বেরিয়েছিলে, কত রাত হলো!

তার সংসারের নিদারুণ বিপর্যয়ের পটভূমিকায় মালতীর এই আলাপ বড় নতুন শোনায় প্রবোধের। একটা নিবন্ত প্রদীপ শিখাকে কে যেন হঠাৎ উস্কে দিয়েছে।

মালতী হয়তো আরো কত কি বলবে। এত দুঃখেও প্রবোধ কোথায় যেন সান্ত্বনা পায়। অপহৃতশ্রী মালতীর দেহ অপরূপ শ্রীমণ্ডিত দেখায়, গলির অন্ধকার আর ভয়াবহ নয়।

হাত বাড়িয়ে প্রবোধ বললে, এস!

মালতী দু পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, তুমি যাও, আমি আসছি।

কেন? প্রবোধ কাছে ঘেঁষে এসে বললে। মালতীর স্পর্শ এড়ানর মনোভাবটা সে বুঝতে পারলে না।

যাও না! আমি যাচ্ছি! মালতী ততক্ষণে রাস্তায় পা দিয়েছে।

প্রবোধের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে: মানে! ও কি তোমার হাতে ওটা কি? রাস্তায় নামলে যে!

ঠাকুর-পোর পিকদানী! মালতী সহজ কণ্ঠে বললে।

পিকদানি! প্রবোধ আঁৎকে উঠলো।

মালতী স্বামীর আতঙ্কের কারণ বুঝতে পারলে না। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ফেলে দাও! 'ফেলে দাও! থু থু! মারা পড়বে! গায়ে লাফিয়ে ওঠার মত প্রবোধ বললে।

ফেলে দিতেই তো যাচ্ছে সে। হঠাৎ স্বামীর এতটা উদ্বেগের কারণ মালতী বুঝতে পারে না। আজ কি নতুন নাকি যে মালতী রাতদুপুরে রুগ্ন দেবরের দৈহিক ক্লেদ-গ্লানি সদর রাস্তায় মুক্ত করে এসেছে? আর সে না পরিষ্কার করলে এ কাজ করবে কে? তা ছাড়া থুতুতে অত ভয় পাবার কি আছে—রোগকে যত ভয় করবে তত কামড়ে ধরবে।

মালতী ম্লান হেসে বললে, ফেলতেই তো যাচ্ছি। তুমি যাও।

না না! প্রবোধ ছুটে এসে পিকদানিটায় এক চাপড় মারলে। পাঁচশো দিন বলেচি ও তুমি করো না—তোমাকে করতে হবে না—সেই শুনবে না!

ক্ষীণ আর্তনাদে এলুমিনিয়মের পিকদানীটা রাস্তায় পড়ে গড়াতে লাগলো। যক্ষ্মারুগীর থুতু গয়ের মালতীর গায়ে কাপড়-চোপড়ে মাখামাখি হয়ে গেল।

দুষ্কৃতকারীর কুণ্ঠায় প্রবোধ জড়সড় হয়ে গেল। ছি ছি কি ছেলেমানষী করলে সে! অন্ধকারে কিছু ঠাহর করতে না পারলেও প্রবোধের মনে হলো, ঐ পিকদানীর মুখ দিয়ে কয়েক ঝলক রক্ত যেন গড়িয়ে রাস্তায় পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে একটা লেলিহান অগ্নিশিখা ছুটে এসে মালতীকে গ্রাস করলো। মালতী পুড়ে ছাই হয়ে গেল।......

এত জায়গায় এত ধরাধরি, ছোটাছুটি, হাঁটাহাঁটি কিছুতেই কোন ফল হলো না। বিনামূল্যে ভায়ের চিকিৎসায় প্রবোধ কোন ব্যবস্থাই করতে পারলে না। ফেলে দেওয়া যায় না তাই এক পরম নিষ্ঠুরকে সদা শঙ্কিত হৃদয়ে তারা গ্রহণ করলে। দুখানি ঘরের একটিতে রোগশয্যা অন্তিম কালের অপেক্ষায় পাতা হলো। জানাশোনা মৃত্যু জানাশোনা পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল। প্রথমে হোমিওপ্যাথি, তারপর কবিরাজী, তারও পরে এ্যালোপ্যাথি—স্ট্রেপ্টোমাইসিন, পি-এ-এস! তারও পরে যখন সাধ্যে কুলাল না তখন জল-পোড়া, চরণামৃত, মাদুলী আরো কত কি! একটি মাত্র দেওয়ালের ব্যবধানে আশ্চর্য জীবনের অনুভূতি, এই বাঁচা, এই মরার কত অদ্ভুত ভাঙা-গড়া!

মালতীই ওঘরে যাতায়াত করে—সময় মত রোগীকে খাওয়ান মোছান-ধোয়ান সে-ই করে। প্রবোধ মানা করেছিল কিন্তু সে শোনেনি, আর শুনলেও সে ছাড়া রোগীর দেখা-শোনার ভার কে নেবে? প্রবোধকে তো সে ওঘরে ঢুকতে দিতে পারে না তা বলে! সুতরাং—

ওঘরে কাশির শব্দে প্রবোধ কতদিন রাত্রে জেগে উঠেছে—মনে হয়েছে, ওঘরে কারা যেন গভীর ষড়যন্ত্র করছে তার ঘুমন্ত সংসারটাকে পাতালে নামিয়ে দেবার জ[ন্য] অনেক সাবধানতা অবলম্বন ক[রে] কাশিটাকে সামলাতে পারছে না—খুক, খ[ুক] —খক্ খক্! খচ্!

মালতী যেমন ঘুমোয় রোজ তে[মনি] ঘুমুচ্ছে আজ অকাতরে—কি দুর্বল দে[খায়] ঘুমলে মালতীকে! গালটা ভেঙে গে[ছে] চোখও অনেকটা ঢুকে গেছে। শুকিয়ে যা[ওয়া] লাউ ডগার মত নেতিয়ে পড়েছে, জে[গে] থাকলে যে সংসারটাকে মাথায় করে র[াখে] ঘুমলে সে যেন সবার পায়ের তলায় [লুটিয়ে] পড়ে।......না, ও সবাইকে মেরে ত[বে] ছাড়বে। ভাই নয় শত্রু! সন্তর্পণে প্রবো[ধ] বিছানা থেকে উঠে আসে—যেন রাত দুপুরে চোর ধরতে হামাগুড়ি দিয়ে হাটছে সে।

প্রবোধ বাষ্পাকুল চোখে রোগীর ঘরে[র] দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। হাসপাতালে[র] ওষুধ ওষুধ গন্ধে নাকটা সড় সড় করে- চোখের ওপর মাটীর ধুনুচির ব[ু]কে পুড়ে যেন খাক হয়ে গেছে, এক পা[শে] রাখা প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় ঘরটা থম থম্ করছে ভূতাবিষ্টের মত, মেজের ওপর ভাইএর বিছানাটা পাণ্ডুর, নিঝুম! ও বোধ হয় এতক্ষণ কেশে কেশে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ প্রদীপ শিখাটা কাঁপলো—[...] দেওয়ালে অস্পষ্ট কি সব যেন লেখা হ[য়ে] গেল, অনেক বোবা মুখের ভয়ঙ্কর প্রতিচ্ছা[য়া] পড়লো। প্রবোধের পা থেকে মাথার চু[ল] পর্যন্ত ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠলো—আ[লো] আঁধারে একটা প্রচণ্ড অশরীরী হাতের ছা[য়া] যেন শূন্যে থেকে ঝুলছে,, উদ্বন্ধনের রজ্জুর মত!

প্রবোধ চোখ রগড়ে আবার দেখলে— মনের ভুল নয় তো, কে জানে! মালতী ঘরকন্নার সমস্ত জিনিস সরিয়ে নিয়ে গেছে, ঘরটাকে রোগীর জন্যে একেবারে খালি করে দিয়েছে। একদিকের দেওয়ালের তাকের ওপর লক্ষ্মী, কালীর ছবি-পটগুলো অপসারিত। খালি তাকটা তেল-সিঁদুরের দাগে কেমন যেন দেখাচ্ছে। রোগীর বিছানাটাকে ঘিরে এদিক ওদিক ওষুধের মালিশের শিশিগুলো বোড়ের চালের মত খাড়া আছে।—সম্প্রতি রোগীর উত্থানশক্তি লোপ পাওয়ায় সারা ঘরময় একটা জলীয় আর্দ্রতা পচ্-পচ্ করছে। নর্দমার মুখে ভিজে খবরের কাগজের টুকরো আর ছেঁড়া ন্যাকড়া ছড়ান।

হঠাৎ প্রবোধের বুকের ভেতরটা ধা[...]

করে উঠলো। কাশতে গিয়ে সুবোধ মরে যায়নি তো? ঘাড়টা কেমন মট্‌কানর ভঙ্গিতে বালিশ থেকে হেলে আছে। মৃদু প্রদীপের আলোয় মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে সুবোধের মুখটা। বিছানাটা শবাধার।

হঠাৎ সুবোধ কাশতে আরম্ভ করলে—কাশতে কাশতে নেতিয়ে পড়া দেহটা ধনুকের মত বেঁকে শক্ত হয়ে গেল—গায়ের জোরে হেঁচকা টানে দড়ি ছেঁড়ার মত কাশির ধমক। এখুনি বোধ হয় সুবোধের দেহটা ছিঁড়ে যাবে, ভেঙ্গে যাবে টুকরো টুকরো হয়ে।

প্রবোধ স্থির থাকতে পারলে না। ভাইএর কাশির জন্যে যত না ভাবনা তার চেয়ে ভাবনা পাশের ঘরে যারা অকাতরে ঘুমুচ্ছে তাদের জন্যে। এই রাতদুপুরে ওরা যদি জেগে ওঠে, বায়না নেয়!

পা পা করে চৌকাঠ পেরিয়ে প্রবোধ ঘরে ঢুকলো। এগুতে গিয়ে মনে হলো, সুবোধের বিছানার ঠিক ওপরে একটা অস্পষ্ট হাতের ছায়া উদ্যত ফণা সাপের মত দুলছে—ছোবল দেবার অবসর খুঁজছে।

কি মনে করে প্রবোধ নিজের হাত দুটোকে থাবার মত করে বাগিয়ে নিলে। ততক্ষণে সুবোধের কাশি থেমে গেছে—আর হয়তো ও কাশবে না, শেষবারের মত কেশে ও শেষ হয়ে গেছে। মাথার কাছে পিকদানীটা উল্টে গেছে—রক্তমাথা থুথু চারদিকে গড়িয়ে পড়েছে। যাক সব শেষ, আর ভাবনা নেই, আর ভয় নেই।

প্রবোধ স্থির থাকতে পারলে না, চোখ দুটো জ্বালা করে। জলে ভরে এল—দেহ কাঁপতে লাগল। অভিমানে না বেদনায় বলা যায় না—বিড় বিড় করে অস্ফুটে কি যেন বললে সে। এই মৃত্যু? এই ক্ষয়? এইভাবে তারা একদিন ফুরিয়ে যাবে—বিনা চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষায়? সুপারিশ ভাল না থাকলে মৃত্যুটাও তাদের পক্ষে সুখের হবে না? হাতে পায়ে ধরেও এত বড় সভ্য দুনিয়ায় মরবার আগে শান্তি পাবে না—ঘৃণা বিদ্বেষে মৃত্যুর বীজ ছড়িয়ে যাবে?

প্রবোধ চমকে উঠলো। দোর গোড়া থেকে মালতীর উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ শোনা গেলঃ সেই আবার তুমি ওঘরে ঢুকেছ—কি করছো ওখানে? চলে এস!

প্রবোধ উত্তর দেওয়ার আগেই ঘরের প্রদীপটা নিভে গেল। মালতী চেঁচিয়ে উঠলোঃ কি সর্বনাশ [illegible]ছো! চলে এস, তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি!

নিঃশব্দ হা-হা[illegible] অন্ধকার অট্টহাসি করে উঠলো।......

তিনদিন পরে সু[illegible] প্রতিষ্ঠানকে জানাতে তাঁরা দয়াপরবশ হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে রুগীর ঘরটা বীজাণু শূন্য করে গেলেন। কদিন ধরে চোঁয়া ঢেঁকুরের মত একটা অশ্বস্তি প্রবোধের ঘরে দোরে বিরাজ করতে লাগল, কি গন্ধ ওষুধের!

আরো তিনদিন পরে হাসপাতাল থেকে সুবোধের নামে একটা কার্ড এলো। সুপারিনটেনডেন্ড জানাচ্ছেন যে, তাকে ফ্রি বেডের জন্যে মনোনীত করা হয়েছে; তবে উপস্থিত তার মত মনোনীত আরো অনেকে আছে বলে এই পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে যে, যদি পারে তো সে অন্যত্র ভর্তি হবার চেষ্টা করুক। মনোনীত অর্থে এ বোঝায় না যে, অচিরাৎ হাসপাতালের ফ্রি বেডে ওপর কোন অধিকার!

চিঠিটা পেয়ে প্রবোধ হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারলে না। মালতী খোঁজ করতে বোধ হয় একটু ম্লান হেসেছিল। আর কটা দিন বেঁচে থাকলে সুবোধ হয়তো মরে শান্তি পেতে পারতো—তাদের জন্যে দেখবার লোক আছে ভেবে। দাদা তার নেহাৎ ইতর শ্রেণীর নয়!

জীবনবাবু হাসলেন, বোধ হয় তাঁর কৃতিত্বের কথা ভেবে। সুপারিনটেনডেণ্ট তা হলে তাঁকে অপমান করেননি। আজই হোক কালই হোক, তার কথা ঠেলেননি! রোগী মারা গেল তা তিনি আর কি করবেন—শেষ পর্যন্ত ফ্রি বেডের তো একটা ব্যবস্থা হলো! ছোকরার কপালে বাঁচা নেই, তাঁরা আর কি করবেন!

তবুও প্রবোধ কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলে যায়নি—জীবনবাবুকে তাঁর মহানুভবতার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ জানালেন। বিপদে-আপদে তাঁদের শরণ নেওয়া যায় বলে তবু বাঁচোয়া! ভাই মরুক, স্ত্রীপুত্র মরুক কঠিন রোগে তবুও সে অভ্যাস মত তাঁর দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াবে। নাই বা হলো তার কোন উপকার, রাষ্ট্রে বা সমাজে জীবন-বাবুদের নাম-ডাক তো কম নয়?

এ কার্ডটা নিয়ে আর কি কববো? ওঠবার সময় প্রবোধ জিগ্যেস করলে।

কথায় সুরটা যেন বক্রোক্তির মত। জীবন-বাবুর [illegible]টা আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত ছিল ত[illegible] খুশী তিনি হতে পারলেন না [illegible]ন্ত। কার্ডটা নিয়ে আর কি করবো! [illegible]?

রেখে দাও তোমার কাছে—কাজে লাগবে! জীবনবাবু বিরক্ত হয়েছেন মনে হলো।

প্রবোধ ম্লান হেসে বললে, কি আর কাজে লাগবে!

জীবনবাবু মনের বিরক্তিটা আর চাপতে পারলেন না—তিক্ত স্বরে বল্লেন, তা হলে ফেলে দাও!..... ওদের ফেরৎ পাঠাও—জানিয়ে দাও তোমার ভাই মরে গেছে। আমাকে জিগ্যেস করছো কেন?

প্রবোধ তাড়াতাড়ি অপরাধ স্বীকার করে বললে, না না, আমি ওকথা ভেবে বলিনি। অপরাধ ক্ষমা করবেন!

কার্ডটা প্রবোধ ফেরৎ পাঠায়নি। কি হবে পাঠিয়ে?—জানিয়ে কি লাভ তাদের করুণায় কৃতার্থ মানুষটি আর বেঁচে নেই! সময়ে তাঁরা কিছু ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে কি কমিটি ডেকে শোকসভা করবেন? আরে রাম তা হলে আর এত লোক ও রোগে মরতো না।

মালতী একদিন বললে, ওটাকে আর রেখেছ কেন—বিদেয় কর না। মানুষই চলে গেল, এখন কার্ড ধুয়ে জল খাব নাকি!

প্রবোধ বলে, থাক না ক্ষতি কিঃ ভায়ের জন্যে করার ঐ তো আমার সাক্ষী!

মালতী মানতে চায় না। তাদের যা করবার ছিল তারা করেছে। সাক্ষীর দরকারই বা কি! মালতীর হঠাৎ কি খেয়াল হলো বললো সাক্ষী চাও সত্যি?

প্রবোধ হাসলে। মালতী নাছোড়বান্দা। প্রবোধকে টেনে আয়নার কাছে এনে দাঁড় করাল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, নিজের চেহারাটা দেখেচো ভাল করে? কি মূর্তি হয়েচে—সাক্ষী চাইলে দেখিও তারা যদি চোখের মাথা খেয়ে থাকে!

প্রবোধ বুঝতে পারলে না এতে রাগের কি আছে।

স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল এমনিভাবে মালতী বললে তোমার গা টা যেন গরম মনে হলো।

প্রবোধ বললে, ও কিছু না।

না, দেখি ভাল করে। মালতী ডানহাতটা স্বামীর কপালে চেপে ধরলে।

আঃ কি ছেলেমানষী করচো—শুধু শুধু জ্বর হতে যাবে কেন! ছাড় ছাড়! প্রবো

সরে দাঁড়াল। মালতী গম্ভীর হয়ে গেল। যাবার সময় আলগোছা বলে গেল, আমাকে লুকিয়ো না কিন্তু, তোমার পায়ে পড়ি!

কণ্ঠ তার ধরে এলো। প্রবোধ হয়তো বুঝলে হয়তো বুঝলে না। সত্যিই তো মালতীর কাছে সে কোন কিছু গোপন করতে যাবে কেন!

কদিন পরে একদিন অফিস থেকে ফিরে প্রবোধ স্ত্রীকে ডেকে বললে, তোমার কথাই ঠিক, আমার রোজ জ্বর হতো বুঝতে পারতুম না, আজ অফিসের ডাক্তার পরীক্ষা করে বললে, সাবধানে থেকো! ভয়ের কিছু নেই।

মালতী ভয় পেয়েও চেপে গেল। ম্লান হেসে প্রবোধের সুরে বললে, না, ভয়ের কি! সেরে যাবে! ও কিছু নয়!

কিন্তু ভয় একদিন করতেই হলো। জ্বরের সঙ্গে কাশি দেখা দিল। প্রবোধ উত্তরোত্তর দুর্বল হয়ে পড়ল, স্ত্রীকে লুকোতে গিয়ে আরো যেন ধরা পড়তে লাগল—মালতী স্বামীকে আশ্বাস দিতে গিয়ে নিজেই হাত পা হারিয়ে ফেললে। গোপনে অশ্রু-সংবরণ করে অন্তর্যামীকে জানালে, ভাল করে দাও ঠাকুর!......

ইতোমধ্যে একদিন হাসপাতাল থেকে সুবোধের নামে আর একটি কার্ড এলো। তাতে নির্দেশ দেওয়া আছেঃ যদি তুমি কোথাও ভর্তি না হয়ে থাক, যদি তোমার অসুখ পূর্বের মতই থাকে, যদি তোমার অবস্থার অবনতি না ঘটে থাকে তা হলে এই কার্ড সঙ্গে করে আমার সহিত দেখা কর—তোমার জন্যে ফ্রি বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিলম্ব করলে এ সুবিধা তোমাকে না দেওয়া যেতে পারে। ইতি. পুনশ্চ তোমার এক্সরে প্লেট সঙ্গে এনো।

চিঠি হাতে করেই মালতী একচোট গালা-গালি দিলেঃ মরা লোকের জন্যে মুখ-পোড়াদের দরদ দেখ না।

প্রবোধের মুখটা কিন্তু কৌতুক হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। শাপে বর! ভাগ্যিস, তখন হাসপাতালকে জানিয়ে দেয়নি ভাই তার মারা গেছে। ভাগ্যের পরিহাস যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন ভাগ্য তার কিছু পরিমাণে সুপ্রসন্ন—আজই শুরুতেই তার রোগের চিকিৎসা হতে পারবে। মালতীকে কিছু ভেঙে বলার দরকার নেই। আজই একটা প্লেট তুলিয়ে সে সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা করবে। অকুলপাথারে কুটীর নাগাল পেয়ে প্রবোধ যেন বর্তে গেল।......

'আপনার নাম সুবোধচন্দ্র বসু?' কার্ড নেড়ে-চেড়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সুপারিনটেন-ডেণ্ট বল্‌লেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, না মানে—" প্রবোধ আমতা আমতা করলে।

"তবে?"

"মানে, আমার ভাই কি না!"

"তাকে এনেচেন? ওয়ার্ড মাস্টারের কাছে নিয়ে যান।"

"সে আসতে পারলে না, তাই আমি এলুম কিনা!"

"কেন?"

"তার আসবার উপায় নেই, তার বদলে আমাকে যদি—"

"মানে? আপনার আবার কি? তাকে নিয়ে আসুন।"

"আমারও T. B! যার নামে কার্ড সে আজ তিনমাস মারা গেছে, কিন্তু আমি তার সহোদর ভাই, তার জায়গায় আমাকে নিন।"

"সে কি করে হয়—কমিটির অনুমোদন ছাড়া। না না, সে হ'তে পারে না।"

"কেন হ'তে পারে না, তার রোগটা যদি আমি পাই তার খালি বিছানাটা আমি পাব না কেন?

"অনেক মুশকিল আছে।"

"মুশকিল আর কি, তার নাম কেটে আমার নাম লিখে নিন! উপকার যার হোক এক-জনের তো হ'বে!"

"না না, কেস 'কনসিডর না করে' কিছু করা চলবে না।"

"আমাকে দেখেও কি কিছু বুঝতে পারবেন না?"

"উপায় নেই, আপনি যান—পরে জানাবো।"

না আমি এখানে থাকব।

"কি মুশকিল!—বলচি পরে জানাবো!

"তখন আবার আমি না এসে আমার স্ত্রী আসতে পারেন! দয়া করে আমাকে নিন।"

"অসম্ভব! হাসপাতাল চালান ছেলে-খেলা নাকি! যান, যান!"

"ছেলে খেলা হ'বে কেন আমাদের নিয়ে খেলা—"

প্রবোধ সবটা শেষ করতে পারলে না—হঠাৎ কাশতে কাশতে তার দম ছুটে যাবার মত হ'লো। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের টেবিলের ওপর কয়েক ঝলক রক্ত আর থুথু আছাড় খেয়ে পড়লো। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লাফিয়ে উঠলেন—চীৎকার করে হাসপাতালের সকলকে জড় করলেন। অবাধ্য, অসভ্য রোগীটাকে নিয়ে কি করবেন ভেবে পেলেন না,—হাসপাতালের কোন্ আইন অনুসারে একে ভর্তি করা যায় সকলে মিলে জল্পনা কল্পনা করতে লাগলেন।

ততক্ষণে বেহুঁস হ'য়ে প্রবোধ টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে পড়েছে......

অনেক রাত পর্যন্ত মালতী দোর গোড়ায় অপেক্ষা ক'রেছিল সেদিন। কে জানে কেন এত রাত হ'চ্ছে ফিরতে—রুগ্ন শরীরে কোন কিছু ঘটলো না তো!

শেষে অপেক্ষা করে যখন চোখের পাতা ভারি হ'য়ে এল, রাস্তায় আর টুঁশব্দটি উঠলো না, গ্যাসের আলো পথ চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল তখন মালতী স্বামীর জন্যে বিশেষভাবে পাতা শয্যায় এক পাশে এসে বসলে। কিছুদিন পূর্বে এখানে আর একজনের বিছানা পাতা হ'য়েছিল। খালি ঘরের মাঝখানে শূন্য শয্যা খা খা করছে। বিনিদ্র রজনীর চোখের জলের বোধ হয় শেষ হ'বে না আজ।

জল জঙ্গল

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

পাঁচ শ' অঙ্কের উল্লেখ করে মধুসূদন সতর্কভাবে খুশালের মুখ-ভাব লক্ষ্য করেন। নিরাশাব্যঞ্জক। গলা নামিয়ে সদয়কণ্ঠে তখন বলতে লাগলেন, কিন্তু আমার তো শুধু টাকা দেখলে হবে না। নতুন হাট বসাচ্ছি—জিনিসটা ভালভাবে গড়ে উঠুক, সেইটে চাই সকলের আগে। তা তোমায় দেখে ভরসা হচ্ছে। বাদাবনে চলাচল করে বেড়াও—বলতে গেলে জঙ্গলের মানুষ—তোমাদেরই হবে। বাইরে থেকে এসে হঠাৎ কেউ সুবিধে করতে পারবে না। মাংনাই দিয়ে দিচ্ছি—দেড়শ'টি টাকা দিও এ বছরের মতো। ওর থেকে আমি সিকি পয়সাও খাচ্ছি নে, মায়ের পুজোর খাতে পুরোপুরি জমা থাকবে।

খুশাল বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকে। বিনা পুঁজির ব্যবসা বলেই এত দূর এগিয়েছে। অবাক করে দেবে বলে দলের সকলের অজান্তে একাকী সে এসেছে। কিন্তু টাকা কোথায়? যে রকমটা দেখা যাচ্ছে—আর দশজনার মতো একটা কোন বৃত্তি ধরে স্থিত হয়ে বসা তাদের ভাগ্যে নেই।

মধুসূদন লোক চরিয়ে বেড়াচ্ছেন এত বছর। অবস্থা বুঝতে পেরে আরও সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, আপাতত পঞ্চাশ জমা দিয়ে জুত মতো জায়গা বেছে ঘর বাঁধোগে। বাকি টাকা কাজকর্ম শুরু হয়ে গেলে তারপর—

বলে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। অর্থাৎ এর উপরে আর কোন কথা শুনতে তিনি নারাজ।

মনের দুঃখে খুশাল ফিরে এল। এয়ার-বন্ধুদের বলল সমস্ত। নবাব খাঞ্জে খাঁ তো সকলে—পঞ্চাশটা পয়সা চাঁদা করে ওঠে কিনা সন্দেহ। কেতুচরণের ছিল—কিন্তু টুনির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত সে ফুঁকে দিয়েছে। এমন কি খুলনা শহরে গিয়ে সেই সময়ে পনেরটা দিন হোটেলে খেয়ে পড়েছিল যাতে টাকাপয়সা খরচ করে তাড়াতাড়ি ভারমুক্ত হতে পারে।

হঠাৎ অভিনব ভাবে সুরাহা হয়ে গেল। ধন্য মাতা বনবিবি! বনবিবির করুণার অন্ত নেই।

(১৬)

গার্ড হরিপদ মর্জাল স্টেশনে ফিরছে সদলবলে। একটা জঙ্গল জরিপ হচ্ছে—সেই ব্যাপারে যেতে হয়েছিল। বাবুরা গিয়েছিলেন লঞ্চে। রেঞ্জার সাহেবের লঞ্চ—ওখানকার কাজ শেষ করে আরও নাবালে সুপতি স্টেশনের দিকে তাঁরা চলে গেছেন। এরা ডিঙিতে আসছে। মাঝিমাল্লা ইত্যাদিতে সাকুল্যে আটজন। ভাঁটার খরস্রোতে দুলে দুলে ডিঙি চলেছে। আর ডিঙির গলইতে বসে, বাবুরা উপস্থিত না থাকায়, হরিপদই হুকুম-হাকাম দিচ্ছে যেন বাদারাজ্যের রাজচক্রবর্তী।

তিনখানা বোঠে পড়ছে। সহসা হরিপদ হাতের ইঙ্গিতে থামতে বলে। তামাক খাচ্ছিল, হুঁকো নামিয়ে মাঝিকে ফিসফিস করে বলল হালটা আলগোছে ছুঁয়ে রাখতে জলের উপর—যাতে কোনরকম শব্দসাড়া না হয়। কূল ঘেঁষে আস্তে আস্তে ডিঙি এগুচ্ছে। বিপজ্জনক এভাবে চলা। জানোয়ারের আক্রমণের ভয় তো আছেই, তা ছাড়া চড়ায় আটকে নৌকো বানচাল হতেও পারে। কিন্তু যতই হোক সরকারী মানুষ বসে থেকে হুকুম করছে—এ তো খোদ লাট সাহেবের হুকুমেরই সামিল। তা ছাড়া হরিপদ বাদা-অঞ্চলে আছেও বহুত দিন—সমস্ত জেনে শুনে যখন বলছে, ব্যাপার আছে নিশ্চয় গুরুতর।

পাড়ের মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাটি আর কোথায়—বলা ঝোপ, গোলবনের শিকড়, শুলো। দোয়ানিয়ার মুখে এল। হরিপদ বাঁদিকে আঙুল বাড়ায়। অর্থাৎ ঢুকতে হবে ঐ দোয়ানিয়ার ভিতরে।

মাঝি অশ্বিনীনাথ ঘাড় নাড়ে। সে-ও পুরানো লোক—অনেক অভিজ্ঞতা। এত উজান কেটে নৌকো তোলা দুষ্কর তো বটেই—তা ছাড়া দোয়ানিয়ার দু-মুখ দিয়ে অতি দ্রুত জল নামছে, নৌকোর তলি এখনই বসে যাবে লোনা কাদায়। তখন জোয়ারের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গরম বাদা—জনমানবহীন—পারতপক্ষে কেউ এদিকে আসে না। হরিপদর হাতে সড়কি এবং নৌকোর ভিতর গাদা-বন্দুকও আছে একটা। তবু এই জিনিসের উপর ভরসা করে বিপজ্জনক স্থানে এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে থাকা উচিত হবে না।

হরিপদও বুঝে দেখল। ভেবে চিন্তে ঐখানে খালের মুখে ডিঙি রাখতে বলে। একটু দূর হল, কিন্তু কি করা যাবে? অশ্বিনীকে প্রশ্ন করে, শুনতে পাও?

অশ্বিনী কান খাড়া করল। এক ধরণের মৃদু আওয়াজ আসছে এপার-ওপার দুদিক থেকে। বলে, বাঁদর—

ঠিক বলেছ। থেমে আবার একটু শুনে নিয়ে হরিপদ বলে, হুঁ, বাঁদরই।

ক্ষণকাল চুপ করে রইল। তারপর বলে উঠল, এই—এইবার?

বাঁদরের ডাক। বাঁদর ছাড়া আবার কি?

হরিপদ মুখ খিঁচিয়ে ওঠে।

কান দিয়ে শুনছ—না কি? আসল বাঁদর আর নকল বাঁদরে তফাৎ ধরতে পারো না—এদ্দিন বাদায় ঘুরছ তবে কোন কর্মে।

বাদাবনে হাতকাটা-হরি নামে সে পরিচিত। মুখের বাঁদিকটা অতি বীভৎস দেখতে। বাঘে ধরেছিল সেবার। সঙ্গীদের চেঁচামেচিতে বাঘ গ্রাস ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রাণে বাঁচে হরিপদ।

বাঘের কামড়ের চিকিৎসা জানো—কোন মলম লাগাতে হয় সর্বাঙ্গে? জ্যান্ত অবস্থায় নরক ভোগ। বরঞ্চ মরে যাওয়াই ভালো ঐ বস্তু মালিশ করে পড়ে থাকার চেয়ে। কিন্তু টোটকা চিকিৎসায় হরিপদর ঘা সারল না, শেষ পর্যন্ত তাকে হাসপাতালে যেতে হল। সেখানে অনেক দিন থাকতে হয়েছিল—বাঁ হাতের কনুই অবধি কেটে ফেলতে হল, বাঁ চোখটাও গেল।

কিন্তু বাকি চোখ ও কানের শক্তি

আশ্চর্যরকম তীক্ষ্ম হয়েছে সেই থেকে। অশ্বিনী ও আর সকলের কাছে সাধারণ বানরের ডাক—হরিপদ কিন্তু নিঃসংশয়রূপে বুঝেছে, মানুষই বানরের মতো ডাকছে। গাছাল দিচ্ছে মানুষ। আর এ যে রীতির গাছাল। ঐসব মানুষ বড় একটা পাশ নিয়ে বাদায় ঢোকে না। আর শিকারের মরশুমও এটা নয়—এখন পাশ বন্ধ। দিন দুপুরে ডাক ধরেছে, দুঃসাহস কি রকম তাহলে বোঝ। রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র ্রঁধি জ্বালা করে। মাদারকে বলে, নেমে গিয়ে দেখে আয় তো চুপি-চুপি ক'জন আছে, কি বৃত্তান্ত।

শুলোবন ও কাদা ভেঙে বনে ঢোকা সহজ নয়। হয়তো সবটাই হরিপদর মনের কল্পনা। বাঘের কামড় খেয়ে সাহেবের নজরে পড়ায় সে বড় বেশি মাতব্বর হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনের ভিতর যা-ই থাক, হুকুম না শুনে উপায় নেই। আরও দু-জনকে সঙ্গে নিয়ে মুখ বেজার করে মাদার নেমে গেল।

ক্ষণপরে ফিরে এসে পরমোৎসাহে বলে, ঠিক ধরেছ। মানুষ—গাছের মাথায় গুঁটি-সুটি হয়ে আছে।

সকলের চোখ টাটায় আমার উন্নতি দেখে। হেঁ—হেঁ, বোঝ্ তাহলে। সাধে কি সকলকে ডিঙিয়ে হেড-গার্ড করে দিয়েছে!

আত্মপ্রসাদে হরিপদ যেন ফেটে পড়ছে। আবার বলে, ক-জন দেখে এলি?

একটা দেখেই খবর দিতে এলাম। আরো আছে নিশ্চয়—একা-দোকা ওরা বাদায় ঢোকে না। আর হরিণ মারতে এসেছে যখন, নিতান্ত খালি হাতেও আসে নি।

হরিপদ বলে, তাই সুড় সুড় করে পালিয়ে এলি? একনম্বর মেয়েমানুষ। মিছেই কেবল দৈত্যের মতো গতর দুলিয়ে বেড়াস।

যাই হোক এবার উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে সকলে বাদায় নামল। পবন আর মাখনলাল ডিঙি আগলে রইল শুধু। বলে গেল, ফিরতে দেরি দেখলে রান্নাবান্না সেরে রাখে যেন। ভাঁটার টানে জল যদি অত্যধিক সরে যায়, নৌকো নাবালে সরিয়ে রাখতে বলল।

জঙ্গলে হরিণের সঙ্গে বানরের বড় মিতালি। বানরে কেওড়াগাছের ডালে লাফায়, ফল পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে, আর আওয়াজ করে নিমন্ত্রণ জানায়। ডাক শুনে হরিণের দল গাছতলায় আসে। শিকারিরাও অবিকল বানরের মতো করে ডাকে—খাওয়ার লোভে হরিণ এলে গুলি করে গাছের উপর থেকে।

বাদায় ঢুকে পড়ে হরিপদ হেন ব্যক্তিও দিশেহারা হচ্ছে আজকে। চারিদিক থেকে বানরের ডাক। কোনটা খাঁটি আর কোনটা নকল—ঠিক করবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। অনেক জলকাদা ভেঙে ও শুলোর গুঁতো খেয়ে আন্দাজ মতো একটা জায়গায় চলে এল। কা কস্য পরিবেদনা! নির্জন, নিঃশব্দ। অথচ এই এতক্ষণ একটানা ডাক শোনা যাচ্ছিল এখান থেকে—হ্যাঁ—এই জায়গায়ই বটে! তাকিয়ে তাকিয়ে গাছের অন্ধিসন্ধি দেখছে—হঠাৎ পিছনে ধ্বনি ওঠে, যে দিকটা অতিক্রম করে এসেছে। লোনা রাজ্য—পৌষ মাস হলেও শীত প্রখর নয়। ঘোরাঘুরিতে ঘাম ঝরছে, গায়ের ফতুয়া ভিজে জবজবে হয়ে গেছে গায়ের ঘামে এবং অসাবধান চলাচলের দরুণ জল-কাদা ছিটকে উঠে। পা রক্তাক্ত হয়েছে কাঁটার খোঁচায়, কিন্তু অপরাধী ধরবার তাড়ায় এমন মশগুল যে, আঘাত টেরই পায়নি। আড়াই প্রহর অতীত হল, সঙ্গের লোকেরা অধীর হয়েছে ফিরবার জন্য। কিন্তু হরিপদ ঘুরে ঘুরে যত নাজেহাল হচ্ছে, জেদ বাড়ছে ততই।

একটা মানুষ তো চোখে দেখেছিস মাদার। সেটাই বা গেল কোথায়?

দলের মধ্যে একজন গুণীন লোক আছে —জলধর। সড়কি বন্দুক ইত্যাদি যতই থাক, গুণীন সঙ্গে না নিয়ে কেউ বাদায় ঢোকে না বা ঢোকা উচিত নয়। গুণীন বলেই জলধরকে ডেকে বনকরের চাকরি দিয়েছে। বাদায় নামবার সময় সে সঙ্গে নামবেই। ঘাড় নেড়ে মৃদু কণ্ঠে জলধর বলে, মানুষ হলে ঠিক পাওয়া যেত। পাখনা নেই যে উড়ে পালাবে। মানুষ নয়—বুঝলে হরিপদ? ওনাদেরই কেউ হবেন।

সকলের মনে ঐরকম সন্দেহ। বাদা-বনে হিংস্রপ্রাণী অনেক—কিন্তু ওসবের উপরে আছেন, তাঁরাই বেশি সাংঘাতিক। নানাবিধ মূর্তিতে উদয় হন—বাঘের মূর্তি, সাপের মূর্তি। অব্যর্থ বাঘবন্ধন মন্ত্রেও সে বাঘের আক্রমণ ঠেকানো যায় না, সে সাপের বিষ নামাতে পারে এমন ওঝা ত্রিভুবনে নেই। মানুষের চেহারা নিয়েও দেখা দিয়েছেন, এমনধারা শোনা যায়। কখনো অবিশ্বাস্য রকমের বিশালাকৃতি পুরুষ, যাঁর এক একটা পায়ের ছাপ মেপে দেখলে দেড়হাত পোণে দু'হাতে গিয়ে দাঁড়াবে। কখনো বা অতি সাধারণ একজন—এই আজকের ব্যাপারে মাদার যেমন দেখে এসেছে। দেড় প্রহর বেলা থেকে এরা সন্ধান করে বেড়াচ্ছে —এখন এই প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যাবেলায়ও এদিক-ওদিক থেকে ডাক এসে বিভ্রান্ত করছে। মানুষের কাজ বলে ভরসা করা যায় কি করে?

জলধর বলে ফেরা যাক এবার—

ভাষাটা অনুরোধের মতো কিন্তু আদেশের আমেজ কণ্ঠস্বরে। বাদাবনের অশরীরী অধিবাসীদের সুলুক-সন্ধান একমাত্র তারই নখদর্পণে। তার কথা কেউ অবহেলা করতে পারে না।

যাবার সময় কাদায় পা বসে বসে গিয়ে-ছিল চিহ্নস্বরূপ গোলপাতায় গেরো দিয়ে গিয়েছিল মাঝে মাঝে। সেই সব লক্ষ্য করে অনেক দুঃখে অনেকবার পথ হারিয়ে অব-শেষে তারা দোয়ানিয়ার মুখে ফিরে এল। কোথায় ডিঙি? জোয়ার এসেছে—জঙ্গলের অনেক দূর অবধি জল উঠে ছলছল করছে। শেষ ভাঁটায় নৌকো যদি দূরে নিয়ে বেঁধে থাকে, এখন তো আবার যথাস্থানে এসে পৌঁছবার কথা। হু-হু করে বাতাস বইছে, ভরসন্ধ্যায় জল বেশ কনকনে হয়েছে। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে দারুণ উদ্বেগে সতৃষ্ণ চোখে এরা দূরের দিকে চেয়ে আছে। কু দিচ্ছে, বাঁশির আওয়াজ করছে, কিন্তু জবাব পাওয়া যায় না। হল কি? মুখ শুকনো সকলের।

ডিঙি নয়—পবন ও মাখনলালকে পাওয়া গেল অবশেষে। গাছে উঠে বসেছিল, সাড়া পেয়ে নেমে এসেছে। হরিপদ রাগে চেঁচিয়ে ওঠে, এক পহর খোঁজাখুঁজি করছি—ঘাপটি মেরে তোরা কোথায় ছিলি বল্?

ভয়ে তারা জবাব দিতে পারে না। তাদেরই দোষ। ভাঁটা সরে যাওয়ার পর অল্প জলে পাশ-খালিতে মাছ ধরার ভারি সুবিধা। ভাত চাপিয়ে দিয়ে দু-জনে ওরা জাল নিয়ে বেরিয়েছিল। এমন হল, মাছের ভারে জাল টেনে তোলা দায়। বাছাই মাছ গোটা কয়েক করে খালুইতে ফেলে বাদ বাকি জলে ছেড়ে দিচ্ছে। কত নেবে, কি হবে অত মাছ দিয়ে? মনের আনন্দে জাল ফেলতে ফেলতে এমনি অনেকটা দূর এগিয়েছে—তারপর খেয়াল হল, ভাত এতক্ষণে ফুটে গেছে—নামাবার প্রয়োজন। ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে

পড়ল। কোথায় কি—গোটা ডিঙিটাই অদৃশ্য! নোঙর ফেলা ছিল—তা ছাড়া কাছি দিয়ে নৌকা বাঁধা ছিল গাছের সঙ্গে, জলের টানে ভেসে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। খুলে নিয়ে গেছে কারা।

কি সর্বনাশ, বন্দুক ছিল যে!

বন্দুক হাতে করে নিয়ে জাল ফেলবে কি করে—বাঁশি, বন্দুক সমস্ত নৌকায় ছিল। সব গেছে। এমনটা হতে পারে, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। কত এরকম রেখে দূরদূরান্তরে যায়, কখনো তো কিছু হয় না।

হরিপদ চোখ পাকাল পবনের দিকে। স্টেশনে গিয়ে পেঁছিতে পারলে বাবুকে সমস্ত তো বলবেই—বাড়িয়ে এবং প্রচুর রং দিয়ে বলবে। বাবু আজকে আর নয়—রেঞ্জারের সঙ্গে কাল স্টেশনে ফিরবেন। আসা মাত্রই একটা বিষম কান্ড ঘটবে, সন্দেহ নেই। হরিপদ লোকটা সোজা নয়।

অশ্বিনীনাথ চার বছর একাদিক্রমে এই নৌকোয় মাঝিগিরি করছে—নৌকোর উপর কতকটা অপত্যস্নেহ জন্মে গেছে। সে তো ক্ষণে ক্ষণে ওদের মারতে যায়।

কোন্ আক্কেলে নৌকো ছেড়ে যাস তোরা? খা—খালুই-ভরা কাঁচা মাছ চিবিয়ে চিবিয়ে খা এখন। উঃ—সবসুদ্ধ প্রাণে মারলি রাত্তিরবেলা বাদাবনের ভিতর!

জলধর ধীরকণ্ঠে বলল, ওসব যাক। ফিরবার উপায় ভাবো সকলের আগে।

ক্ষিদেয় নাড়িশুদ্ধ হজম হয়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু স্টেশনে কি করে ফিরবে, সেইটেই সকলের চেয়ে বড় ভাবনা এখন। নদীখালে পায়ে হেঁটে যাওয়া চলে না। বিশেষ এই রাত্রিবেলা।

হরিপদ সহসা সচকিত হয়।

দেওড় শুনতে পাচ্ছ?

কই?

সত্যি সত্যি বন্দুকের দেওড় হলে এতগুলো লোকের মধ্যে হরিপদ ছাড়া আর কারো কানে গেল না, এমন হতে পারে না। কিন্তু শুনতে পেয়েছে হরিপদ—হ্যাঁ ঠিক শুনেছে। কেবল কানে শোনা নয়। চোখের উপরও যেন দেখতে পাচ্ছে, সরকারী ডিঙি নিয়ে সরকারী গাদা-বন্দুকে দেওড় করতে করতে বে-আইনী শিকারিরা জয়যাত্রায় চলেছে, বিষম স্ফূর্তিতে গরম গরম তাদেরই রাঁধা ভাত খাচ্ছে, আর হরিপদর দল বন-প্রান্তে পৌষের শীতে দুর্ভাবনায় হি-হি করে কাঁপছে—নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

হরিপদ চেঁচিয়ে ওঠে, ঐ যে—শুনতে পেয়েছ এবার?

অনতিদূরে হা-হা-হা হাসির শব্দ। তীক্ষ্ম বিদ্রূপের হাসি। এই তো—একেবারে কাছে। ক্ষিপ্ত দলবল জলকাদা ভেঙে ছুটল।

অশ্বিনী দেখিয়ে দেয়, মানুষ নয়—ভীমরাজ পাখী। মানুষের কলরবে পাখীটা ডালের উপর থেকে উড়ে গেল।

ভীমরাজ এক আশ্চর্য পাখী—নির্জন অরণ্যমধ্যে মাঝে মাঝে বয়স্ক মানুষের মতো গম্ভীর উচ্চহাসি হাসে, কঠিন কণ্ঠে কাকে যেন কি আদেশ দেয়। জলধর কিন্তু পাখী বলে এদের স্বীকার করে না। বিড় বিড় করে অবোধ্যভাবে কি বলে সেই কাদাজলের মধ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে প্রণাম করল।

(১৭)

ডিঙি ও বন্দুক জোটানোর পর কেতুদের আর পায় কে! কাউকে পরোয়া করে না তারা—বনবিবি, তুমি মা শুধু প্রসন্ন থেকো।

সরাসরি মেলার মধ্যে মানুষের সামনে ডিঙি নিয়ে এল না, দু-বাঁক দূরে খাঁড়ির ভিতর রেখে দিল। ছই ভেঙে দিল ডিঙির, বড়দল থেকে আলকাতরা কিনে এনে রাতা-রাতি মাখিয়ে নূতন রং ধরাল। আগেকার চেহারা আর নেই। বনকরের লোকগুলোই যদি এ ডিঙির সওয়ার হয়ে বসে যায়, তবু চিনতে পারবে না কোনক্রমে।

চকচকে ডিঙি ঘাটে বেঁধে সগর্বে কেতু-চরণ বলে, কি বলো খুশাল, রোজগার হবে না? কত পঞ্চাশ হয়ে যাবে এই মেলার মওকায়!

ডাঙার নয়—ডিঙির মানুষ কেতুচরণ। অত বড় জোয়ান দু-পা হাঁটিতে হিমসিম হয়ে যায়, কিন্তু বৈঠা হাতে ডিঙিতে বসিয়ে দাও—সারাক্ষণ বেয়েও হাতে সাব হরে না। গাঙ-খালের খুশিখেয়াল ও অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে।

পরম উল্লাসে কেতুচরণ কাড়ালে বসে বৈঠা ধরল। আর ঘাটে নেমে দাঁড়িয়ে ঋষিবর হাঁক পাড়ছে—

শামুকপোতা—বয়রা—খলষেমারি—এসো, চলে এসো চড়ন্দার—লা ছাড়ে—এ—এ—

মেলায় আগন্তুক মেয়েপুরুষে বোঝাই হয়ে যায় ডিঙি। এ বড় ভাল হয়েছে, লোকের ভারি সুবিধা। দু-আনা তিন আনায় মৌভোগের মেলায় যাতায়াত চলবে, পুরো একখানা নৌকো ভাড়া করতে হবে না।

দিনমানে মেলার মানুষ আসা-যাওয়া করে। প্রহরখানেক রাত্রি হতে না হতে মানুষ পেঁছে দিয়ে ডিঙি ফিরে আসে. সকল কাজকর্ম সারা হয়ে যায়। তারপর এন্তার ছুটি। বাদা অঞ্চলে লোকজন রাত্রিবেলা সহজে নদীখালে বেরোয় না। অসংখ্য রকম বিপদের আশঙ্কা। ডিঙির আলো নিভিয়ে দিয়ে কেতুচরণ ঐ সময়ে চুপিসারে বেরোয় সারাদিনের খাটনির পর অবসর সময়ে কিছু উপরি রোজগারের ব্যবস্থায়। হাট-খোলায় অনেক চালা বাঁধা হচ্ছে—তার জন্য গরানকাঠ, বেত ও গোলপাতার প্রয়োজন। কেতুরা কিছু কিছু সরবরাহ করবে। একেবারে বিনা পুঁজির কারবার— তাদের মতো এত সস্তায় কে মাল দিতে পারবে?

কোন পথে কি ভাবে বনকরের লোকের চোখ এড়িয়ে যাতায়াত করতে হয়, সমস্ত কেতুচরণের জানা। এত বছর কাঠুরে নৌকোয় কাটিয়ে পাকা হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া সাঁইতলা মোড়ল বাড়িতে ছিল —তাদের কাজকর্মের কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছে। অনেক দেখে শুনে ঘাত-ঘোত বুঝে বাদায় ঢুকতে হয়। বিপদের অবধি নেই—জলের বিপদ, ডাঙার বিপদ। গার্ডদের নজর এড়িয়ে কখনো পাশখালি দিয়ে যেতে হয়; খাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে বোঠে তুলে চুপচাপ থাকতে হয় কখনো। গোলবন বা বলা-ঝোপের মধ্যেও ডিঙি ঢুকিয়ে দিতে হয় বেকায়দা বুঝলে। পাঁকাল মাছের মতো কেতুচরণ কতবার ছিটকে বেরিয়ে এসেছে জলপুলিশের কবল থেকে। এমনও ঘটেছে, প্রহর ধরে বেয়ে বেয়ে তারপর বিপদ বুঝে অকস্মাৎ ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে তীরবেগে পালিয়ে এসেছে। এর উপর আছে ঝড়-বাতাস, চোরাদহ এবং মোহানার কাছে উল্টোপাল্টা ঢেউ ও জলের টান। একটু অসাবধান হলেই নৌকা তলিয়ে গিয়ে কুমীরের মুখে যাওয়া নিশ্চিত। ডাঙায় সাপ-বাঘ-দাঁতাল—কোনখানে ওৎ পেতে আছে, এক হাত তফাতে থেকেও বুঝবার জো নেই। এ প্রকরকম রাতবিরেতে যম-দূতের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়ানো। তার চেয়ে বাপু নৌকোর মাপ অনুযায়ী সরকারী পাওনাগন্ডা চুকিয়ে একখানা পাশ করে নিয়ে বাদায় ঢোক, শব্দ-সাড়া করে কুড়ুল মারো গাছে, বেলাবেলি ফিরে এসো কিম্বা ভাল জায়গা দেখে চাপান দেও, আগে পিছে পাঁচ-সাতখানা নৌকোর বহর সাজিয়ে

যাতায়াত করো—বিপদের ভয় থাকবে না। কিন্তু কেতুগ্রাম বুঝবে না কিছুতেই। আর দশটা বাওয়ালির মতো আফসের ঘাটে নৌকো বেঁধে নৌকোর মাপ দিতে ওদের যেন মাথা কাটা যায়। সারাদিনের খাটনির পর যে সন্ধ্যাটা হাত-পা মেলে জিরোবার কথা, বাদায় ঢুকে সেই সময় এই চৌর্য-বৃত্তি। সকল রকম শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে বনের মধ্যে দুঃসাহসিক বিচরণ—টাকার অঙ্কে লাভের চেয়ে এইটাই পরম লাভ বোধ হয় মনে করে এরা।

ডাঙার শত্রু, জলের শত্রু—এরা তবু যা হোক একরকম—চোখে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিরোধেরও নানা পন্থা আছে। যাঁরা অন্তরীক্ষে দৃষ্টির অগোচরে থেকে শত্রুতা সাধেন, ভয়ের বস্তু তাঁরা অনেক বেশি। বাদাবনের আদিকাল থেকে কত যে অপঘাত হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। এত সাবধানতা সত্ত্বেও এখনও ফি বছর বিশ-পঞ্চাশটা ভাল হয় (বাদা সম্পর্কে 'মৃত্যুর' উল্লেখ করতে নেই—ভাল হয়েছে, এই কথা বোলো), অনেকেরই তাদের মধ্যে গতি হয় না—কে যাচ্ছে বলো কাঠুরে মাঝিমাল্লার জন্য গয়ায় পিণ্ড দিতে, কার দরদ উথলে উঠছে! লোকালয়-সীমার বাইরে আরণ্য রাজ্যে তাঁরাই সব স্বাচ্ছন্দ বিহার করেন। নানা প্রকৃতির লোক ছিল তো জীবিতকালে —বিদেহী অবস্থায় কার কি ধরণের গতি-বিধি, কে কোন মূর্তিতে উদয় হবেন, আগে থাকতে বলবার জো নেই।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ভয়ানক—কিন্তু তার গ্রাস থেকে বেঁচে আসবার কায়দা গুণীনেরা জানে। বাঘবন্ধন পড়ে নৌকো চাপান দেও—বাঘের বাপের সাধ্য নেই সে নৌকো স্পর্শ করবার। একরকম আছে খিলমন্ত্র; বাঘের দাঁতে দাঁতে খিল এঁটে যায় মন্ত্রের গুণে, হাঁ করে কামড়াবার শক্তি থাকে না। খিল খুলে না দেওয়া পর্যন্ত খেতেই পারবে না কোন-কিছু—না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে। কিন্তু অকারণে জীবের কষ্ট দেওয়া গুণীনদের বিধি নয়, গুরুর নিষেধ—মন্ত্র অসিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে এতে। বিপত্তারণের জন্যই মন্ত্র, অন্যকে বিপদে ফেলবার জন্য নয়। তাই বিপদ অপগত হবার সঙ্গে সঙ্গে খিল খুলে দেয় গুণীনরা। শুধু মন্ত্রতন্ত্র নয়, গাছ-গাছড়াও জানা আছে নানা রকম। বাঘের ঘায়ের বীভৎস মলমের কথা জানে তো সকলেই—তা ছাড়া একরকম শিকড় আছে, বেটে লাগালে সপ্তাহের মধ্যে কামড়ের চিহ্ন পর্যন্ত বেমালুম হয়ে যাবে।

বিষধর সাপই বা কত! দুধরাজ-বঙ্করাজ, শঙ্কাবতী-শাখমুটি, হরিণবোড়া-উদয়কাল—নগরবাসী নাম শুনেছ এসবের? দশনাগ্রে সুনিশ্চিত মৃত্যু—কিন্তু ভাঁজে ভাঁজে কি অপূর্ব সুন্দর বঙ্করাজের ফণা তোলবার ভঙ্গিমা! দেখ, ক্ষণে ক্ষণে কেমন রং বদলাচ্ছে উদয়কালের! আবার ওঝারাও তেমনি। মরা মানুষে প্রাণ দিতে পারে। নীলবর্ণ হয়ে গেছে, গাঙে ভাসিয়ে দিতে যাচ্ছে—কাকপক্ষীর মুখে খবর পেয়ে জল-জাঙাল ভেঙে ছুটতে ছুটতে এসে ওঝা বিষহরির দোহাই পাড়ে—রাখো, রাখো মা, প্রাণ নিও না। বিষ নামতে দেরি হলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে—কানে আঙুল দিতে হয় মন্ত্রের বচন শুনে। ঝাঁটার বাড়ি মারে—রোগীর গায়ে যদিচ, কিন্তু রোগীকে নয়—সেই অলক্ষ্য আততায়ীকে, শয়তানি করে যে বিষ নামাতে দিচ্ছে না।

ক্রমশঃ

রূপময় ভারত

দক্ষিণ ভারতের দেবদেউল

স্থাপত্য জাতির জীবনের পরিচয় বহন করে। তবে শুধু বৈষয়িক সম্পদের ও উপকরণের প্রাচুর্য থাকলেই যে স্থাপত্য সমৃদ্ধ হবে, এমন কোন কথা নেই। মূলত অন্যান্য চারুকলার মত স্থাপত্যও রূপ গ্রহণ করে জাতির অন্তরের রূপ থেকে।

ভারতবর্ষের চিত্তে যার উপাসনা, তিনি বিরাট, নয়ন-মনের অভিরাম ও প্রশান্ত। ভারতবর্ষের স্থাপত্যের রূপ যেন এই আন্তরিক উপাসনার প্রতিচ্ছবি। পাষাণে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে যে বিরাটত্ব, তাকেই সুললিত গঠন ও অলংকার দান করেছেন ভারতের স্থপতি। যুগে যুগে এই বিরাটের সাধনা বহুতর বৈচিত্র্য গ্রহণ করেছে। ভারতীয় স্থপতির ইতিহাস কয়েক সহস্র বৎসরের ইতিহাস। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে ও দৌত্যে স্থপতি যে কাজ করেছে, তার মূল্য হিসাব করা যায় না। স্থপতির কীর্তিই জাতির জীবনের রূপকে সহস্র বৎসর ধরে প্রমূর্ত করে রাখতে পারে।

দক্ষিণ ভারত দেব-দেউলের দেশ। নগরে প্রান্তরে গ্রামে যেখানেই যাওয়া যায়, সেখানেই মন্দির আর সেখানেই অগণিত তীর্থযাত্রীর সমাগম। বহুদূর থেকে মন্দিরের সুবিশাল উন্মুক্ত গোপুরম (প্রবেশ দ্বার) পথশ্রমক্লিষ্ট পুণ্যার্থীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির সাদর আহ্বান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রামেশ্বরম ও কন্যাকুমারিকা, মাদুরা ও মহাবলীপুরম্, তাঞ্জোর ও ত্রিচিনাপল্লী, কাঞ্চীপুরম ও শ্রীরঙ্গম দক্ষিণ ভারতের ধর্মপ্রাণ নরনারীর কাছে অতি প্রিয়স্থান, যেখানকার দেবতালয়গুলিকে তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্বদাই স্মরণ করে থাকে। মৃত্যুর পূর্বে মাদুরার মীণাক্ষী মন্দিরের পবিত্র সরোবরে অথবা কন্যাকুমারীর তীর্থ-সলিলে একবার অন্তত পুণ্য স্নান না করাকে তারা পাপ বলেই মনে করে। ভারতবর্ষের দূর-দূরান্ত হতে দলে দলে তীর্থযাত্রী বৎসরে একবার তাদের তীর্থ-পরিক্রমার পথে এই সব মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। তারা আসে শুধু কি পুণ্যার্জনের জন্যই? দেবতা যেখানে সুন্দররূপে প্রতিভাত, সেই সৌন্দর্যকে নয়ন-মন দিয়ে অনুভব করে যে আনন্দে তাদের চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠে, তা কি শুধু দেবদর্শনে অথবা তীর্থস্নানের পুণ্য অর্জনের চেয়ে কোন অংশে কম? মন্দিরের স্থাপত্যশিল্পে এবং কারুকার্য-মণ্ডিত দেবদেবীর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তির মধ্য দিয়ে সে-যুগের শিল্পীরা যে পরিশ্রম, কলানৈপুণ্য, নিষ্ঠা ও সাধনার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, এ-যুগের তীর্থযাত্রীর কাছে তা এক অপার বিস্ময়ের বস্তু।
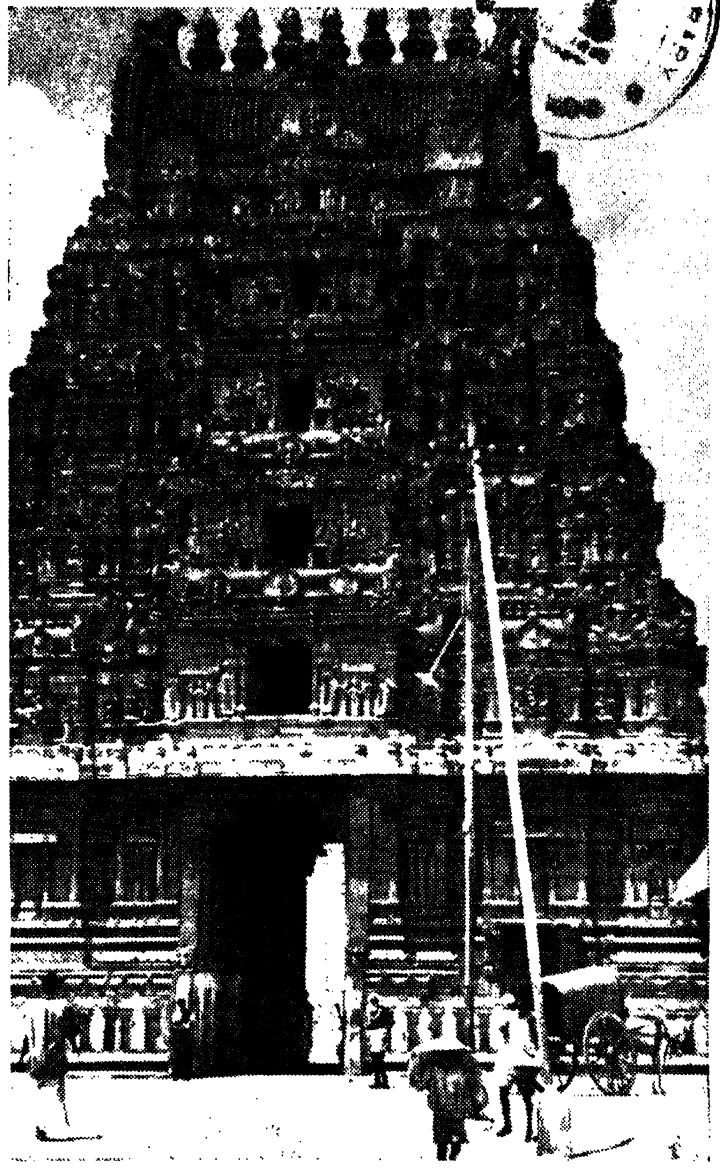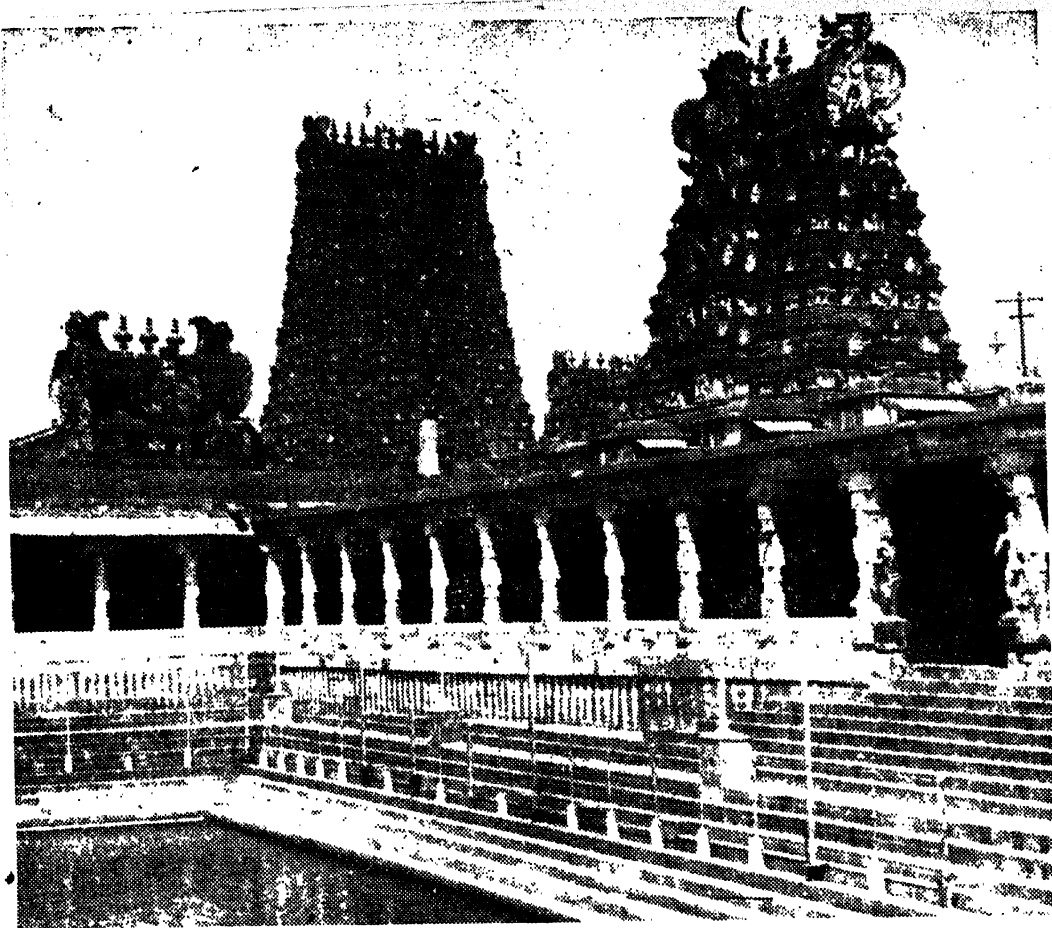
কাঞ্চীপুরমে কামাক্ষী মন্দিরের গোপুরম। এইখানেই শ্রীশংকরাচার্যকে সমাধিস্থ করা হয়

মাদুরায় মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের মন্দির। পুরোভাগে একটি বাঁধানো পুষ্করিণীর একাংশ

রামেশ্বরের মন্দিরের ৪,০০০ ফুট দীর্ঘ অলিন্দ

তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দির। দ্রবীড়ীয় স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন
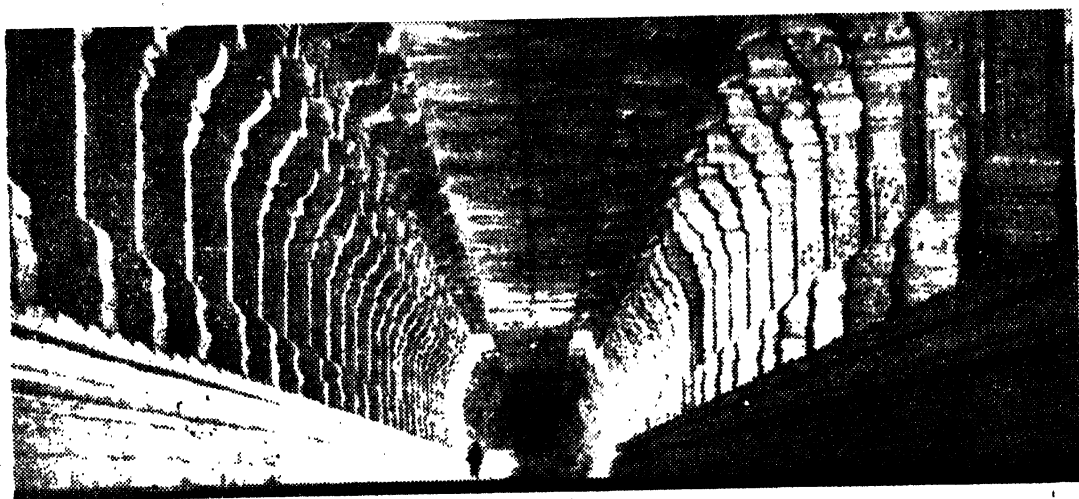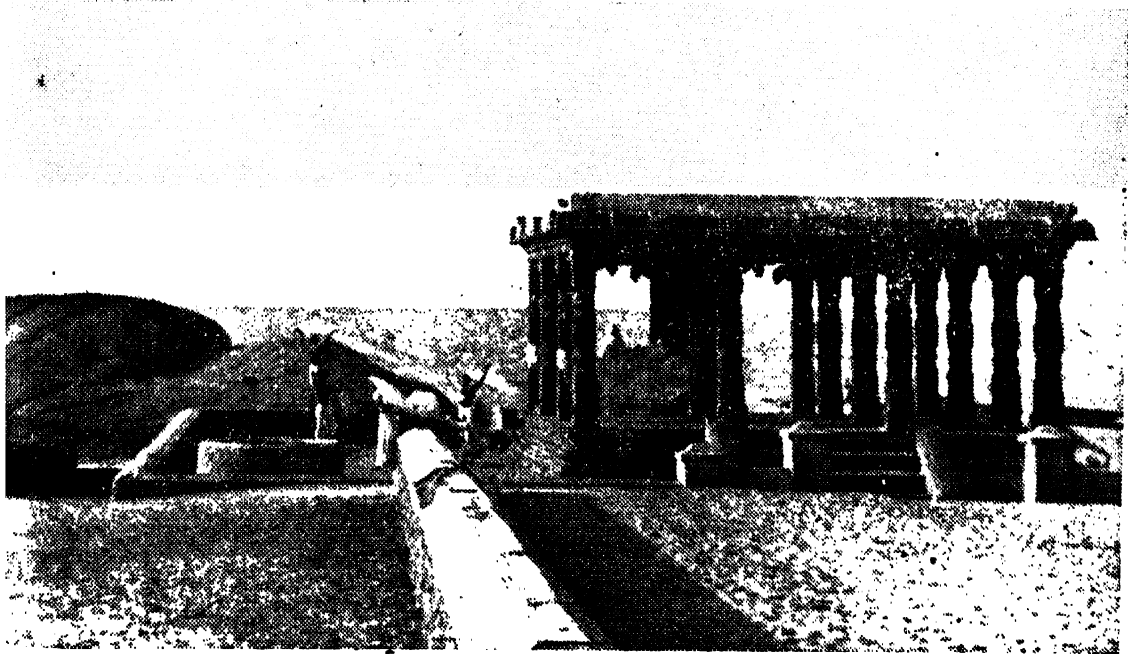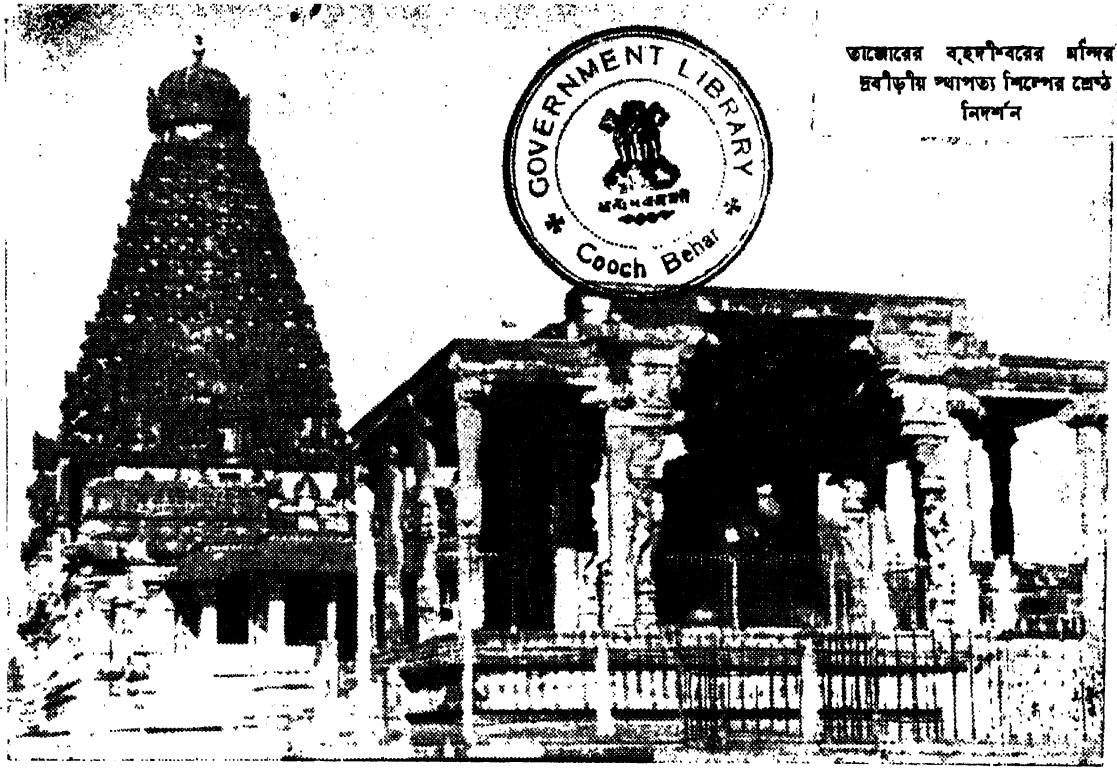
ভারতবর্ষের শেষ সীমান্ত কন্যাকুমারীকার ঘাট

মহাবলীপুরম মন্দিরের প্রস্তরগাত্রে খোদিত ব্রতচারী অর্জুনের জীবন-কাহিনী। গ্রেনাইট পাথরের উপর ৯০ ফুট দৈর্ঘ্যে এবং ৩০ ফুট প্রস্থে সপ্তম শতাব্দীর শিল্পীবৃন্দ এই খোদাই কার্যে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।
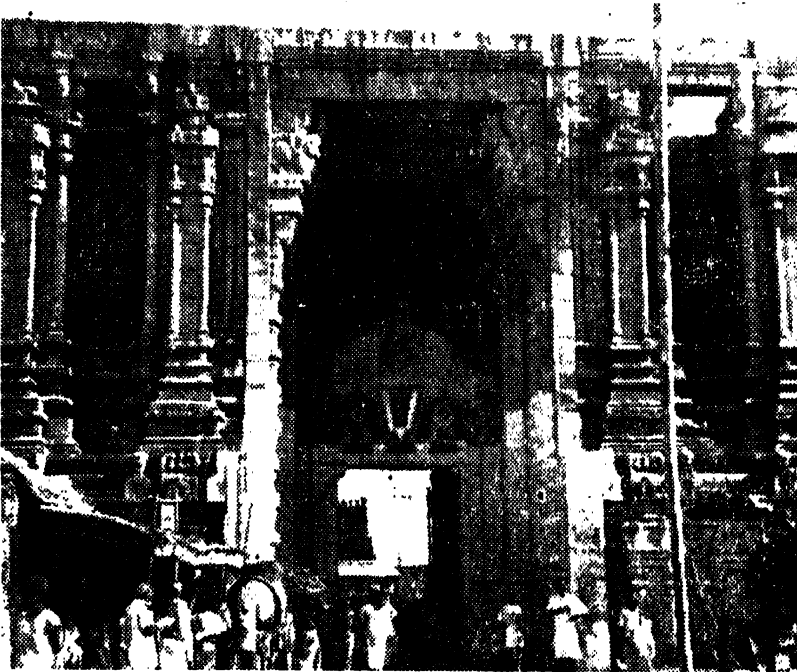
শ্রীরঙ্গমে বিখ্যাত রঘুনাথস্বামী মন্দিরের অসমাপ্ত প্রবেশদ্বার। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববৃহৎ মন্দির-রূপে ইহা প্রখ্যাত। দশম ও ষষ্ঠ-দশ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য-পালের দ্বারা এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।

[ফটো : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

সেলাইকলের কথা

অমরেন্দ্রকুমার সেন

আমরা দৈনন্দিন জীবনে সাধারণত যেসব যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি, যেমন ...ড়, স্টোভ, সাইকেল ইত্যাদি তাদের মধ্যে ...লাই-কল অন্যতম। আজকের সভ্য-...বিনে সেলাই-কল অপরিহার্য। এ হেন ...সেলাই-কল তারও একটা ইতিহাস আছে, ...মন আছে আরও পাঁচটা যন্ত্রের।

...ছুঁচের আবিষ্কার চীনদেশে। প্রাচীনরা ...ঁচ দিয়ে হাতে করেই সেলাই করতেন। ...থম সেলাই-কল উদ্ভাবন করার কৃতিত্ব ...ওয়া হয় টমাস সেণ্ট নামে একজন ...রাজকে; তিনি ছুঁচকে যন্ত্রে আবদ্ধ ...রবার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন। এ হ'ল ...রেজি ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের কথা; কিন্তু ...নি শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারেন নি। ...এর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে টিমোনিয়া ...মে একজন ফরাসী দর্জি একটি সেলাই-...ল তৈরী করেন; এই কলটি কিছু কাজ ...রতে পারত, কারণ তিনি তাঁর কারখানায় ...ই যন্ত্র আশিটি বসিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর ...রখানার কর্মীরা মনে করল বুঝি তাদের ...ন মারা যাবে, এই মনে করে তারা একদিন ...মোনিয়াকে আক্রমণ করে এবং তাকে প্রায় ...রে ফেলেছিল। বলা বাহুল্য যে, তারা ...লাই-কলগুলি সব ভেঙে দিয়েছিল। এই ...রণে টিমোনিয়া কলটির উন্নতিসাধনের ...ন্য আর চেষ্টা করেন নি।

ইংলণ্ডের পর ফ্রান্স এবং তারপর ...মেরিকা। এখানে নিউইয়র্ক শহরে ...৮৩২ সাল আন্দাজ সময়ে ওয়াল্টার হাণ্ট ...মে এক ব্যক্তি একটি সেলাই-কল তৈরী ...রেন। এই কলে ছোট্ট একটি মাকু ছিল ...ং এই কলে শৃঙ্খলিত সেলাই করা যেত। ...ণ্ট তার কলের কোন পেটেণ্ট করিয়ে নেন ..., যার জন্য তাঁর অনুকরণে অনেকেই সেই ...ম সেলাই-কল তৈরী করে বিক্রয় করতে ...কে, ফলে হাণ্ট তাঁর প্রাপ্য লাভ থেকে ...ঞ্চত হন।

এর পর আমরা দেখা পাই ইলিয়াস ...ওইএর। হাওই আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস প্রদেশে স্পেন্সার নামক শহরে ১৮১৯ সালের ৯ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। হাওই পরিবার নানাপ্রকার ছোট ও বড় আবিষ্কারের জন্য ইতিমধ্যেই পরিচিত ছিলেন, যেমন এই পরিবারের একজন প্রথম স্প্রিং-লাগানো বিছানার গদি তৈরী করে-ছিলেন, কেউ তৈরী করেছিলেন নতুন ধরণের সেতু, আর কেউ আর কিছু। তবে পরিবারের

আইজ্যাক মেরিট সিংগার আবিষ্কৃত সেলাই কল। যে বাক্সে ভর্তি করে কলটি বিক্রয় হত, তারই ওপর কলটি বসিয়ে সেলাই করতে হত।

সকলেই প্রায় চাষী ছিলেন এবং তাঁর পিতাও চাষবাস নিয়েই থাকতেন এবং ইলিয়াসও চাষী হবে পিতার ইচ্ছাও ছিল তাই; কিন্তু ইলিয়াস শিশুকাল থেকেই যন্ত্রপাতি ভালবাসতেন, আর তা ছাড়া তিনি ছিলেন সামান্য খোঁড়া; তাই চাষের কাজ তাঁর ভাল লাগল না; তাঁকে অন্যত্র কাজের সন্ধান করতে হল। কাছাকাছি একটা কাপড়ের কলের যন্ত্রবিভাগে একটা কাজ পেয়েও গেলেন। দুঃখের বিষয় যে, চাকরীটি তাঁর বেশীদিন টেকে নি, কারণ দেশের অর্থনৈতিক কারণের জন্য কলটি তুলে দিতে হয়। হাওই তখন বোস্টনে চলে আসেন এবং সেখানে আরি ডেভিস নামে এক ব্যক্তির কারখানায় কাজে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে হাওই বিবাহ করেছিলেন।

তাঁর মালিক আরি ডেভিস একটু অদ্ভুত প্রকৃতির খামখেয়ালী লোক ছিলেন। আবিষ্কারক বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল, অনেকে তাঁর কাছে পরামর্শ করতেও আসত, কিন্তু তিনি যে কি আবিষ্কার করেছিলেন, তা কারও জানা নেই। একদিন ডেভিসের কাছে একজন খরিদ্দার এসে একটি বোনবার কলের ফরমায়েস দেয়, কিন্তু ডেভিস ভাবটা এমন দেখালেন যে, বোনবার কল কেন? ইচ্ছা করলে তিনি একটা আস্ত সেলাই-কলই তৈরী করে ফেলতে পারেন; কিন্তু তাঁর ক্ষমতা যে ছিল সীমাবদ্ধ তা বোধ হয় তিনি জানতেন না। সেইজন্য কোন কলই কোন-দিনই তিনি তৈরি করতে পারেন নি। হাওই সব ব্যাপারটা জানতেন এবং গোপনে একটা সেলাই-কল তৈরী করবার চেষ্টা শুরুও করে দিয়েছিলেন।

সপ্তাহে তাঁর তখন মাত্র নয় ডলার বেতন, সংসারে স্ত্রী ও তিনটি ছেলেকে খাওয়াতে হয়: ঐ টাকায় কুলোয় না। স্ত্রীও অবসর সময়ে হাতে সেলাই করে কিছু উপার্জন করত। স্ত্রীর শ্রম লাঘব করবার জন্যও হাওই একটি সেলাই-কল তৈরী করা মনস্থ করেন। বাড়িতে তিনি একটি ছোটখাটো কারখানা স্থাপন করেছিলেন এবং সেলাই-কলটি তৈরী করবার জন্য এবং পুরোপুরি সময় দেবার জন্য চাকরীটি ছেড়ে দিলেন। এই সময় তাঁর এক বন্ধু তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। বন্ধু হাওইকে পাঁচশ ডলার অগ্রিম হিসেবে দিয়েছিলেন এবং হাওইএর পরিবারকে নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন। কঠিন পরিশ্রমের পর ১৮৪৫ সালের মে মাসে হাওই তাঁর প্রথম সেলাই-কল তৈরি করলেন। এই কলের সেলাই খুলে যেত না, তবে হাণ্টের কলের মতো চোখওয়ালা ছুঁচ তিনি ধার নিয়েছিলেন।

তখনকার দর্জিরা এই সেলাই-কলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেছিল, ফলে অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে,

আমেরিকায় সেলাই-কল বিক্রয় অসম্ভব হয়ে ওঠে। হাওই তাঁর কলের পেটেন্ট নিয়ে নিজের ভাই অ্যামাসাকে লন্ডনে পাঠালেন এই উদ্দেশ্যে যে, সেখানে যদি কল বিক্রয় করা যায়। অ্যামাসা কিন্তু কৃতকার্য হল। অ্যামাসা একজন কারখানার মালিককে ধরে সেলাই-কল তৈরী করাতে রাজি করালো। হাওইও লন্ডনে এলেন, কিন্তু তাঁর অর্থের অভাবের জন্য এবং ব্যবসা-বুদ্ধি না থাকায় ইংলন্ডে সেলাই-কল তৈরি করবার স্বত্ব মাত্র হাজার ডলারে বিক্রয় করে দিলেন। এই হাজার ডলার খরচ হতে বেশীদিন লাগল না; অতএব হাওই ও তাঁর ভাই এবং পরিবারের আর সকলে যখন আমেরিকায় ফিরে এলেন, তখন তাঁরা কপর্দকহীন। হাওই তাঁর পরিবারকে একস্থানে রেখে অন্যত্র কাজকর্মের সন্ধান করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য যে, হাওইএর স্ত্রী ছেলেমেয়েকে নিয়ে অতিকষ্টে দিনযাপন করছিলেন। অল্পদিন পরেই হাওইএর স্ত্রী মারা গেলেন।

কথায় বলে 'ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে'। স্ত্রীর মৃত্যুর পর হাওইএর বরাত যেন খুলে গেল। হাওইএর যে বন্ধু তাঁকে পাঁচশত ডলার দিয়েছিলেন, তিনি সেই অর্থের পরিবর্তে হাওইএর কারখানার অর্ধেক স্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন। এই বন্ধু আবার সেই স্বত্ব একজন ধনী ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করেছিলেন। এই ধনী ব্যক্তি হাওইকে অর্থ সাহায্য করতেন। ইতিমধ্যে অনেকে হাওইএর সেলাইকলের অনুকরণে সেলাইকল তৈরী করে বিক্রয় করতে আরম্ভ করেছিলেন। হাওই তাদের সঙ্গে মামলা লড়তে আরম্ভ করেন এবং সব ক্ষেত্রেই জয়লাভ করে প্রচুর ক্ষতিপূরণ লাভ করতে থাকেন। এইরূপে তিনি আইজ্যাক মেরিট সিঙ্গার নামে একজন কারখানাওয়ালার কাছ থেকে পনেরো হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিলেন। ১৮৬০ সালের মধ্যে হাওই ক্ষতিপূরণ বাবদ দশলক্ষ ডলার উপার্জন করেছিলেন।

আইজ্যাক মেরিট সিঙ্গার হাওইকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পনেরো হাজার ডলার দিয়েছিলেন সত্য কিন্তু সেলাই কলকে তিনি জনপ্রিয় করেছিলেন এবং বর্তমানে সেলাই-কল বলতে সিঙ্গারকেই বোঝায়। সিঙ্গারেরও বাড়ি ছিল ম্যাসাচুসেট্‌সে। সিঙ্গারেরও একটি ছোটখাটো কারখানা ছিল। এই কারখানায় মাঝে মাঝে সেলাই-কলও মেরামত হতে আসত। সিঙ্গার এই
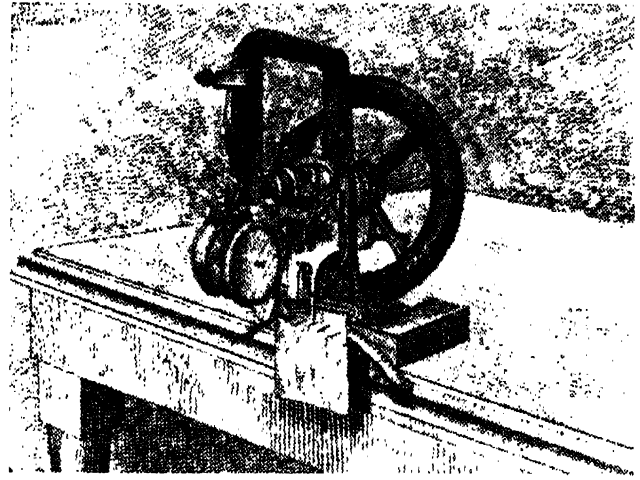
ইলিয়াস হাওই আবিষ্কৃত সেলাই কল।

সেলাইকল মেরামত করতে করতে লক্ষ্য করলেন যে, এদের অনেক উন্নতিসাধন করা যায়। এই উদ্দেশ্যে সিঙ্গার মাত্র চল্লিশ ডলার ধার করে এগারো দিন কঠিন পরিশ্রম করে সত্য সত্যই একটি ভালো সেলাই কল তৈরী করে ফেললেন। এই কলটি কিন্তু ঠিক পারিবারিক ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল না, সে কল তৈরী হয়েছিল পরে।

সিঙ্গার তাঁর আসল ভাল কল তৈরী করেন ইংরেজি ১৮৫১ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে। অতএব বর্তমান বৎসর সিঙ্গার সেলাই কলের শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানের পালা। সিঙ্গার তাঁর ব্যবসায়ে হয়ত অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করতে পারতেন না যদি না তিনি এডওয়ার্ড ক্লার্ক নামে একজন ভদ্রলোকের সহযোগিতা লাভ করতেন এবং ব্যবসায়ে তাঁকে অংশীদাররূপে পেতেন। ক্লার্ক আসলে ছিলেন অ্যাটর্ণি কিন্তু সিঙ্গারের সঙ্গে সেলাই কলের ব্যবসায়ে তিনি পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন যার ফলে ব্যবসায়টি অচিরে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রসারলাভ করে।

যান্ত্রিক সরলতা ব্যতীত সিঙ্গার সেলাই-কল জনপ্রিয়তা অর্জন করবার প্রধান কারণ হল এর বিক্রয় পদ্ধতি। সেলাই কলটি ব্যবহার করতে করতে কিস্তিবন্দীহারে মূল্য পরিশোধ করবার পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রথম সিঙ্গার প্রতিষ্ঠানই চালু করেন। আজ পৃথিবীর সর্বত্র সিঙ্গার সেলাইকল ছড়িয়ে পড়েছে ফ্রান্স থেকে ফরমোজা, পাতিয় থেকে প্যাটাগনিয়া, কলকাতা থেকে ক্যা ফর্নিয়া, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বর্তম ভারতে এই সেলাইকল পাওয়া যাচ্ছে বললেই চলে।

ক্রমশঃ সেলাইকলের উন্নতি হতে লা কাঠের অংশের পরিবর্তে ধাতুর অংশ বস হতে লাগল। নিউইয়র্কের অ্যালেন বেঞ্জা উইলসন কোনো সেলাইকল না দেখে হাওইএর বিষয় ইতিপূর্বে অবগত না হে স্বাধীনভাবে একট সুন্দর সেলাইকল করেন। তাঁর সেলাইকলের মাকু প্রচা সব কয়টি কলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। পরে উইলসন আর এক ব্যক্তির স অংশীদারী ভিত্তিতে তাঁর সেলাইকল বা বিক্রয় করতে থাকেন।

ভার্জিনিয়ার জেমস্ ই গীবস্ মা পত্রে ছবি দেখে উৎসাহিত হয়ে এ সেলাইকল তৈরী করেন। এই কল স কাজ করবার পক্ষে উপযোগী হয়েছি উইলসনের মতো তিনিও পরে আর এ জনের সঙ্গে মিলে তাঁর কল বিক্রয় কর থাকেন।

সেকালের দর্জিরা সেলাইকলের আবিষ্কা ব্যবসায় উঠে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে আজকালকার দর্জিরা সেলাইকল না পে ব্যবসায় উঠে যাওয়ার ভয়ে বোধহয় ভী হয়।

আজব জীবিকা

জি কে চেস্টারটন

অনুবাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ গল্প : স্থান-রহস্য

লেফ্‌টেন্যাণ্ট ড্রামন্ড কীথ্‌ হচ্ছেন সেই জাতের মানুষ—যে-কোনও রকমের আড্ডাকেই যাঁরা রোমাঞ্চকর সব ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চারের গল্পে জমিয়ে রাখতে ওস্তাদ এবং আড্ডাঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাঁদের সম্পর্কে শ্রোতারা সব তীক্ষ্ন সমালোচনায় মত্ত হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ তাঁর এই সব উদ্ভট গল্প, শুনতে যদিও চমৎকার, কেউই প্রায় বিশ্বাস করেন না। তা না করুন, লেফ্‌টেন্যাণ্টকে উপেক্ষা করবারও উপায় নেই কারুর। অন্তত সামনাসামনি। ভদ্রলোকের সর্বাঙ্গে এমন একটা অনায়াসলব্ধ বৈশিষ্ট্য বর্তমান যে, সহজেই তা আপনার চোখে পড়বে। হাল্কা ফুরফুরে মানুষটি, পরনে ঢিলেঢালা ট্রাউজার আর শাদা শার্ট। বহুদিন গরম-দেশে ছিলেন, পোষাক পরিচ্ছদ যে বাহুল্য-বর্জিত—এইটেই তার হেতু। চেহারায় একটা নির্লিকে স্বাচ্ছন্দ্য বর্তমান। চোখ দুটি ঘনকৃষ্ণ, ঈষৎ চঞ্চল।

এবং সবসময়েই তাঁর হাত-টানাটানি অবস্থা। এর থেকে তাঁর চরিত্রের খানিকটা আভাষ পাওয়া যাবে। দরিদ্রদের মধ্যে, লক্ষ্য করে দেখবেন, সবসময়েই একটা বাসা-বদলানোর মর্মান্তিক তাড়না বর্তমান। যেন বাসা-বদলালেই তাদের সব দুর্দশার অবসান হবে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট ড্রামন্ড কীথ্‌-এর মধ্যেও এ-তাড়না উপস্থিত। বড়ো বেশী পরিমাণেই উপস্থিত। কৃত্রিম সভ্যতার পীঠস্থান এই লন্ডন শহরের মধ্যেই, হিসেব করলে বোঝা যাবে, জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ যেন পুনর্বার যাবাবর হয়ে উঠেছে। অনবরত তারা বাসস্থান পালটাচ্ছে। এবং তাদের মধ্যে সবচাইতে বড়ো হাঘরে হচ্ছেন এই লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌। ভদ্রলোক এককালে মস্ত শিকারী ছিলেন; কথা শুনে অন্তত তা-ই মনে হয়। নিরীহ স্নাইপ থেকে শুরু করে মত্ত হস্তী, কিছুই নাকি তিনি বাদ দেননি। শ্রোতারা সব আড়ালে হাসাহাসি করে; বলে—গাঁজাখুরি গল্প।

সম্পত্তি বলতে এক কীট-ব্যাগ। সেটা তাঁর [illegible] সঙ্গেই ঘোরে। দুটো বর্শা থেকে তার মধ্যে, একটা সবুজ ছাতা, এককপি শতচ্ছিন্ন পিকউইক-পেপার, বড়ো একটা রাইফেল, আর এক বোতল ধেনো মদ। বর্শা দুটো একটুকরো দড়ি দিয়ে বাঁধা; কোত্থেকে তিনি এদের সংগ্রহ করেছেন জানি না, বোধ হয় কোনও জংলী-জাতির কাছ থেকে। যেখানেই গিয়ে এবং যতো অল্প-দিনের জন্যেই গিয়ে তিনি ডেরা বাঁধুন না কেন, কীট-ব্যাগটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই যাবে। প্রতিবেশীরা ঠাট্টা করে, চ্যাংড়া ছোড়ারা হাত-তালি দেয়,—লেফ্‌টেন্যাণ্ট তা গ্রাহ্যও করেন না।

আর হ্যাঁ, আর একটা জিনিস তাঁর নিত্য-সঙ্গী; সে হলো তাঁর ফৌজী জীবনের তরোয়াল। প্রতিবেশীদের কৌতুক তাতে আরো খানিকটা বেড়ে যায় মাত্র।

আগেই বলেছি, লেফটেন্যাণ্ট ড্রামন্ড কীথ্‌-এর চেহারাটা বেশ ছিমছাম। আর তিনি বেশ কর্মক্ষমও বটে। তবে ঠিক যুবক বলতে যা বোঝায়—তা আর তিনি নন এখন, বয়েসে এখন ভাঁটা পড়ে এসেছে। অযত্নবিন্যস্ত চুলে মরচে পড়া লোহার রঙ ধরেছে। গোঁফজোড়া কিন্তু কালো, কুচকুচে কালো। মুখে একটা ফুরফুরে প্রফুল্লতার আমেজ। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে ওটা তাঁর মুখোস মাত্র। আসলে সে মুখ চিন্তাবিষণ্ণ। মাঝ-বয়সে পৌঁছে তিনি চাকরীর থেকে অবসর নিলেন, ইতিমধ্যে লেফ্‌টেন্যাণ্টের বেশী আর এক ধাপও যে তিনি এগোতে পারেননি—এ বড়ো নৈরাশ্যপ্রদ ব্যাপার। আর এইজন্যেই বোধ হয় কেউ তাঁকে পাত্তা দেয় না।

তা ছাড়া আরো একটা মুশকিল হলো এই যে, যে ধরণের অভিজ্ঞতার তিনি গল্প করেন তাতে শ্রোতারা সব বিস্ময়াবিষ্ট হয় বটে, তবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয় না। ভাঁটিখানা জুয়োর আড্ডা—ইত্যাদি নিকৃষ্ট জায়গায় কতোবার কী নিদারুণ ফ্যাসাদে তিনি পড়েছিলেন, তাই নিয়েই তাঁর গল্প। শ্রোতাদের মনশ্চক্ষে একটা জঘন্য ছবি ফুটে ওঠে, তাঁদের গা-ঘিনঘিন করে। এ ধরণের গল্পে—তা সে সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক—বক্তার বড়ো বিপদ। যদি মিথ্যে হয়, বক্তা তাহলে মিথ্যাবাদী; সত্যি হলেও লাভ নেই, শ্রোতারা সেক্ষেত্রে তাঁকে দুশ্চরিত্র ঠাউরে নেয়।

চারজনে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম এতক্ষণ; আমি, বেসিল গ্র্যাণ্ট, বেসিলের ভাই শখের-গোয়েন্দা রুপার্ট গ্র্যাণ্ট এবং লেফ্‌টেন্যাণ্ট ড্রামন্ড কীথ। এই মাত্তর লেফ্‌টেন্যাণ্ট বিদায় নিয়েছেন; ফলে প্রায়ই যা হয়, সকলেই আমরা তাঁর সম্পর্কে তীব্র সমালোচনায় মত্ত হয়ে উঠেছি। রুপার্ট ছোকরা বেশ চালাক চতুর। তবে এ বয়েসে একটু বেশী চালাক হয়ে পড়লে যা হয়—কোনও কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই। সব কিছুতেই তার অবিশ্বাস, সবার ওপরেই তার সন্দেহ। এই অত্যধিক বাড়াবাড়িতে মাঝে মাঝে আমি চটে যাই অবিশ্যি, তবে এক্ষেত্রে তার সন্দেহকে আমার সত্যি বলেই মনে হলো। তাই বেসিল যখন তার অবিশ্বাসকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো, আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমি এমন কিছু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক নই, কিন্তু লেফ্‌টেন্যাণ্ট এতক্ষণ পর্যন্ত যে সমস্ত গাঁজাখুরি গল্প করে গেলেন—যে কোনও সুস্থ মস্তিষ্ক'লোকের পক্ষেই তা বিশ্বাস করা অসম্ভব।

বেসিলকে তাই বললাম, "না না, ঠাট্টার কথা নয়। সত্যিই কি তুমি বিশ্বাস করো যে, ও লোকটা ঐভাবে জাহাজের খোলের মধ্যে আত্মগোপন করে বসেছিল? কিংবা

ঐ যে বললো, কোথায় যেন একবার ওকে মোল্লা সাজতে হয়েছিল, সেটাও কি খুব একটা কিছু বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার?"

বেসিল একটু চিন্তা করে বললো, "কি জানো, ভদ্রলোকের চরিত্রে একটা দোষ বর্তমান। তোমরা তাকে গুণও বলতে পারো। সেটা হচ্ছে এই যে, উনি বড্ডো বেশী সত্যি কথা বলেন এবং বড়োই সাদা-মাঠাভাবে বলেন।"

রুপার্ট চটে গেল; বললো, "কি বললে? লেফটেন্যান্ট কীথ সত্যবাদী? ও, তোমার হেঁয়ালী হচ্ছে বুঝি? তা বাপু, হেঁয়ালীই যদি করতে চাও তো আরও এক ধাপ এগোতে পারো; বলতে পারো যে, লেফ্‌টেন্যান্ট জীবনে কখনো তার বাড়ির বাঁধাধরা চৌহদ্দীর বাইরে পা-ই দেয়নি।"

নির্লিপ্তকণ্ঠে বেসিল বললো, "তা কেন হবে? ঘুরে বেড়ানোটা ওঁর একটা নেশা: যতো অস্থানে গিয়ে উনি ডেরা বাঁধেন ততোই ওঁর আনন্দ। তাতে করে কিন্তু কোনও মতেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, লোকটা সোজা সরল নয়। আসল কথাটা কি জানো, সত্য ঘটনাকে তুমি যতোই খোলাখুলিভাবে শ্রোতাদের কাছে পেশ করবে ততোই সেটা অদ্ভুত শোনাবে। এই সহজ কথাটাই তোমরা বোঝ না। কীথ্ যা বলেন, তার একবিন্দুও মিথ্যে নয়। ও'র গল্প তোমরা শুনেছো। সে গল্পের স্থান-কাল-পাত্র যে অত্যন্ত বদখৎ এবং তা যে তিনি গোপন করেন না—তাও তোমরা জানো। তার থেকেই বুঝতে পারা উচিত, ও গল্প শুনিয়ে আর যাই হোক্ মহৎ সাজবার অভিপ্রায় ও'র নেই। কেন তাহলে শোনান উনি? আসলে, শুনিয়েই ও'র আনন্দ: তোমরা যে কী মনে করছো না করছো, তা নিয়ে উনি এতটুকুও মাথা ঘামান না।"

রুপার্ট, স্পষ্টই বোঝা গেল, নিদারুণ চটে গেছে। বললো, "অর্থাৎ বাস্তবের দৌড় কল্পনার থেকেও বেশী, এই তো? তা তুমিও কি ওই বস্তাপচা প্রবাদবাক্যে বিশ্বাস করো?"

বেসিল বললো, "কেন নয়? মনের অস্তিত্ব একটা বাস্তব ব্যাপার, কল্পনার সে জনক। বাস্তব তাই কল্পনার থেকে অনেক বড়ো, অনেক বেশী রহস্যময়। কল্পনা—তা সে যতোই উদ্ভট হোক—মনে রেখো, বাস্তবের থেকেই তার উদ্ভব হয়েছে।"

রুপার্ট দেখলো যুক্তির পথে গিয়ে সুবিধে হবে না। তাই সে তৎক্ষণাৎ ব্যঙ্গের পথ ধরলো। বললো, "হবেও বা। তা তোমার এই লেফ্‌টেন্যান্টের কাহিনী বাপু বাস্তবকেও হার মানায়। এই যে লোকটা সমুদ্রের তলায় হাঙরের ছবি তোলবার গল্প শুনিয়ে গেল—বুকে হাত দিয়ে বলো ত, ও গল্প তুমি বিশ্বাস করো?"

বেসিল বললো, "করি। কীথ্ সৎ লোক, কখনোই তিনি মিথ্যা কথা বলেন না।"

"ওকে যারা চেনে, তারা কিন্তু অন্য কথাই বলবে—"

ভেবে দেখলাম রুপার্টের কথাই ঠিক। বেসিল তবু নির্বিকার। অগত্যা আমি বললাম, "ব্যাপারটা একটু ভেবে দ্যাখো বেসিল। লেফ্‌টেন্যান্টকে আর যাই হোক্

সৎ লোক বলা চলে না। যে লোকটার চালচুলোর পর্যন্ত ঠিক নেই—"

আমার কথা তখনও শেষ হয়নি, দরজাটা হঠাৎ দড়াম্ করে খুলে গেল। দেখলাম, লেফ্‌টেন্যাণ্ট ড্রামণ্ড কীথ্।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে তিনি বললেন, "ভালো কথা মিঃ গ্র্যাণ্ট্, একটা জিনিস আপনাকে জানানো হয়নি, সেইজন্যেই আবার ফিরে আসতে হলো। আপাতত এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমার বড়ো টানাটানি অবস্থা। শ'খানেক পাউণ্ড ধার পাওয়া যাবে আপনার কাছে? পেলে বড়ো ভালো হতো—"

রুপার্ট এবং আমি নীরবে দৃষ্টিবিনিময় করলাম। বেসিল একটা ঘোরানো চেয়ারে বসেছিল, টেবিলের দিকে ঘুরে গিয়ে সে একটা কলম তুলে নিল। তারপর চেক্-বই খুলে বললো, "চেক্‌টা কি ক্রস্ করে দেব?"

লেফ্‌টেন্যাণ্টের আর উত্তর দেবার অবসর হলো না, রুপার্ট বললো, "একটা কথা। লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ যখন আমাদের সামনেই টাকাটা ধার চাইলেন, তখন—"

"আঃ, কী ছেলেমানুষী হচ্ছে রুপার্ট,—" বেসিল তাকে থামিয়ে দিল; তারপর লেফ্‌টেন্যাণ্টের দিকে চেক্‌টা এগিয়ে দিয়ে বললো, "এক্ষুনি আবার চলে যাবেন?"

"এক্ষুণি।" লেফ্‌টেন্যাণ্ট বললেন, টাকাটা পেয়ে বড়ো উপকার হলো। এক্ষুণি আমাকে একবার আমার এজেণ্টের কাছে দৌড়তে হবে।"

ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে রুপার্ট তাঁর দিকে তাকালো। সে দৃষ্টির অর্থ, 'সবাই জানি প্রভু, এজেণ্ট মানে তো চোরাই মালের জিম্মেদার!' মুখে সে বললো, 'এজেণ্ট! কিসের এজেণ্ট?"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট যেন একটু চটে গেলেন এই আকস্মিক প্রশ্নাঘাতে; তারপর একটু সামলে নিয়ে রুক্ষকণ্ঠে বললেন, "কিসের আবার, বাড়ির এজেণ্ট।"

রুপার্ট বললো, "তাই নাকি? তা বেশতো, চলুন—আমরাও আপনার সঙ্গে যাবো।"

বেসিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, নীরব হাসিতে সে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্ চুপ করে রইলেন একটুক্ষণ; রুপার্টের প্রশ্নে যে অবিশ্বাসের আভাষ ছিল তাতে তিনি অপমান বোধ করেছেন বুঝলাম। বললেন, "কী বললেন আপনি, কী বললেন মিঃ রুপার্ট গ্র্যাণ্ট?"

রুপার্টের দিকে চাইলাম, মুখেচোখে তার একটা হিংস্র বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে। বললো, "এই বলছিলাম, আমরাও আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে আসি চলুন না? আপনার ওই এজেণ্টটিকেও দেখে আসা যাবে—"

রাগে ফেটে পড়লেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট ড্রামণ্ড কীথ্। হাতের ছড়িটাকে সশব্দে আন্দোলিত করে বললেন, "তার মানে আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন এইতো? বেশ তো, চলুন আমার এজেণ্টের কাছে। তাতেও যদি আপনার সন্দেহ না মেটে তো আমার ঘর-দোর, বিছানা-বালিশ যা আপনার খুশী তছ্‌নছ্ করে দেখে আসবেন। চলুন—" বলে তিনি বিদ্যুৎবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

রুপার্ট দেখলাম উত্তেজনায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে। সে আর এতটুকুও সময় নষ্ট করলো না; আমাদের নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে লেফ্‌টেন্যাণ্টের সঙ্গ নিলো, আমি আর বেসিল পিছু পিছু চলতে লাগলাম। একটু বাদেই দেখলাম, রুপার্ট বেশ জমিয়ে নিয়েছে। ছদ্মবেশী গোয়েন্দারা যেভাবে ছদ্মবেশী গুণ্ডাদের সঙ্গে কথা বলে, সেইভাবেই কথাবার্তা চালাচ্ছে সে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট যে আসলে একটি বদমায়েস সে বিষয়ে আর আমার মনে তখন এতটুকুও সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক দেখলাম রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছেন। আমি এবং বেসিল, দুজনেই সেটা টের পেলাম।

বাড়ির এজেণ্টের সন্ধানে চলেছি আমরা, লেফ্‌টেন্যাণ্ট আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। অসাধারণ নোংরা জায়গা, বেসিল এবং রুপার্ট দুজনেই সেটা লক্ষ্য করলো। পথগুলি সব ক্রমশই সরু হয়ে আসছে, বাড়ির ছাদ অস্বাভাবিক নীচু, রাস্তায় প্যাচপেচে কাদা। বেসিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, মুখেচোখে তার তীক্ষ্ম কৌতূহল ফুটে উঠেছে। আর রুপার্টকে বেশ খুশী খুশী বলেই মনে হলো। তার কারণ, তার অনুমান সত্যি হতে চলেছে; লেফ্‌টেন্যাণ্ট যে আসলে একটি নিতান্তই ও'ছা লোক, তাতে আর তার সন্দেহ নেই তখন। এই জঘন্য পল্লী—এখানে কোনও ভদ্রলোক আসে!

ঠিক কতগুলি গলি যে আমরা পার হয়ে হয়ে এসেছি জানি না। চারটেও হতে পারে, পাঁচটাও হতে পারে, পনেরোটা হওয়াও অসম্ভব নয়। লেফ্‌ন্যোণ্ট হঠাৎ থমকে থামলেন, মরীয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকালেন একবার, তারপর সামনের দিকে অঙ্গুলী-নির্দেশ করলেন। দেখি, একটা ছোট্টমতন কুঠ্‌রি, নিতান্তই অপরিসর। আর তারই গায়ে নেম্‌প্লেট টাঙানো রয়েছে—'পি মণ্ট্‌মরেন্সী, হাউস-এজেণ্ট্'।

তীক্ষ্মকণ্ঠে মিঃ কীথ্ বললেন, "এইটেই তাঁর অফিস। আপনারা কি একটু বাইরে দাঁড়াবেন? না-কি এতবড়ই আপনারা হিতৈষী আমার যে, আমাদের কথাবার্তা-গুলোও আপনাদের না শুনলে চলবে না?"

রুপার্ট ততক্ষণে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে সে! পাগল! এত সহজে সে তার শিকার ছেড়ে দেবে!

মুখে বললো, "তা, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো—" .

লেফ্‌টেন্যাণ্ট একেবারে ফেটে পড়লেন, "এখনও অবিশ্বাস? বেশ, ভেতরেই আসুন আপনারা।" আমি বুঝলাম, এ-ক্রোধ তাঁর ছদ্মবেশমাত্র; ভদ্রলোক বেশ ভালভাবেই বুঝেছেন, এবারে আর তাঁর ধরা না দিয়ে উপায় নেই। নীরবে আমরা মিঃ কীথ-এর পেছনে পেছনে সেই কুঠ্‌রিতে গিয়ে ঢুকলাম।

মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সীকে দেখলাম। বুড়ো ভদ্রলোক, নিরিবিলি একটি ধূসর কাউণ্টারের পেছনে তিনি বসে আছেন। অদ্ভুত চেহারা। মাথাটি ডিম্বাকৃতি, ব্যাঙের মতন চোয়াল, ছাঁটা সরু দাড়ি, সর্বোপরি একটি সুতীক্ষ্ম ঈগলচঞ্চু নাসিকা। পরণে অপরিচ্ছন্ন ফ্রক্-কোট, শ্লথবন্ধ টাই। চেহারা দেখে, আর যাই হোক্, বাড়ির দালাল বলে মনে হয় না। এর চাইতে কেউ যদি বলতো যে, ইনি একটি স্কচ্ হাই-ল্যাণ্ডার তো তাও আমি বিশ্বাস করতাম।

ঝাড়া চল্লিশটি সেকেণ্ড আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম, ভদ্রলোক তবু মুখ তুলে চাইলেন না। আমরাও যে অবশ্য ঠিক তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম তাও নয়, তাকাতে কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। আসলে তিনি যেদিকে তাকিয়েছিলেন, আমরাও ঠিক সেই একই দিকে তাকিয়েছিলাম; আমাদের সকলের দৃষ্টিই তখন তাঁর কাউণ্টারের ওপর নিবদ্ধ। অদ্ভুত একটি প্রাণী সেখানে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে; ছোট্ট একটি বেজী।

রুপার্ট গ্র্যাণ্টই কথা কইলো সর্বপ্রথম। কণ্ঠস্বরে যেন সে মধু ঢেলে দিল। ক্ষেত্র-বিশেষে সে এই ধরণের কথা কয় এবং তার জন্যে অবসর-মুহূর্তে সে রীতিমত রিহার্স্যাল দিয়ে থাকে। মধুমাখা গলায় সে শুধোলো, "আপনিই তো মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী?"

তন্মগতভাবে বসেছিলেন ভদ্রলোক, রূপার্টের কথায় তিনি চমকে উঠলেন; তারপর একসঙ্গে এতগুলি লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু-বা নার্ভাস হয়ে পড়লেন যেন। কাউণ্টারের ওপর থেকে বেজীর বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে সেটিকে তিনি তাঁর ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দিলেন; অতঃপর বিনীত ভঙ্গীতে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি তো একজন বাড়ির এজেণ্ট, তাই না?" রূপার্ট শুধোলো।

এই আকস্মিক প্রশ্নাঘাতে মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়লেন; বিব্রতভাবে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌এর দিকে তাকালেন তিনি। তাঁর এই অস্বস্তি দেখে রূপার্ট খুশীই হলো।

"জবাব দিন, আপনি বাড়ির এজেণ্ট?" চেঁচিয়ে উঠলো রূপার্ট। 'বাড়ির এজেণ্ট' কথাটাকে সে এমন ধিক্কারভরা গলায় উচ্চারণ করলো যেন সে বলতে যাচ্ছিল 'জোচ্চোর।'

লজ্জিতভাবে একটু হাসলেন মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী, তারপর কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

রূপার্ট বললো, "তা বেশ। লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌ আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান; তাঁরই অনুরোধে আমরা এখানে এসেছি।"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুস্‌ছিলেন। এই প্রথম তিনি কথা কইলেন, "মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী, সেই নতুন বাসাটার জন্যেই আমি এসেছি। সব ঠিক-ঠাক আছে তো?"

কাউণ্টারের ওপর রাখা হাতের চেটোটাকে বিব্রতভাবে একটু টান-টান করে মেলে ধরলেন মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী, তারপর বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। তবে কিনা ওই—"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌ তাঁকে মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন, "ব্যস্‌ ব্যস্‌, ওতেই হবে। আর যা যা আপনাকে করতে বলে গিয়েছিলাম, সেগুলো সব করা হয়েছে তো? তাহলেই যথেষ্ট।"

কথা শেষ করে তিনি দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সীর দিকে তাকিয়ে দেখি, ভদ্রলোকের প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা। আমতা আমতা করে তিনি বললেন, "মাপ করবেন, আমার কথা এখনো শেষ হয় নি। ঐ আপনার জল গরম রাখবার ব্যবস্থাটা, মানে ওটা আর ঠিক হয়ে উঠলো না শেষ পর্যন্ত। একে তো শীতকাল, তারপর উঁচুও তো কম নয়—"

পুনশ্চ তাঁর বক্তব্যে বাধা পড়লো, লেফ্‌টেন্যাণ্ট বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, ওতেই হবে। অন্য কোনও গণ্ডগোল না হলেই হলো। চলি তাহলে—" বলে তিনি দরজার হাতলে হাত দিলেন।

রূপার্ট আর সময় নষ্ট করলো না, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো, "একটু দাঁড়ান লেফ্‌টেন্যাণ্ট, মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী বোধ হয় আরও কিছু বলবেন আপনাকে—"
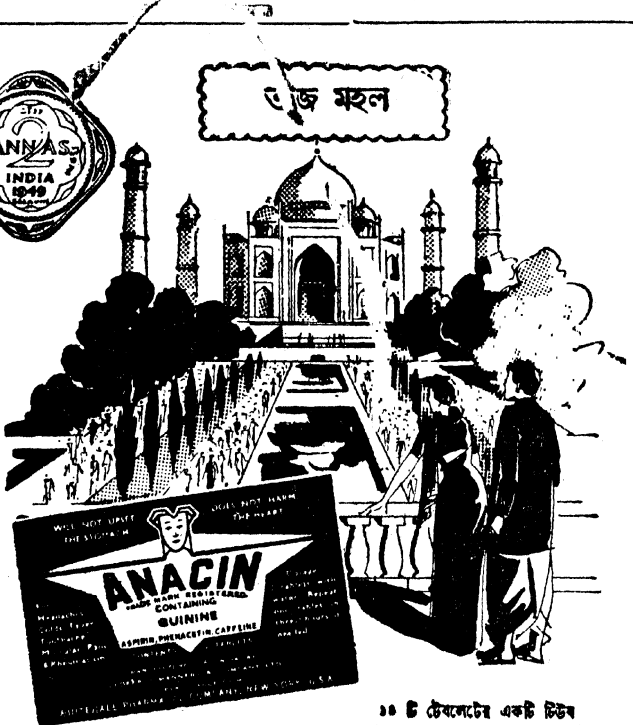
মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সীও বললেন, "হ্যাঁ

লেফ্‌টেন্যাণ্ট, একটু দাঁড়ান। পাখীগুলোর কি ব্যবস্থা করবেন?"

রুপার্টের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠ্‌লো; অস্ফুটস্বরে বললো, "পাখী! তার মানে?"

মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী বললেন, "হ্যাঁ পাখী। পাখীগুলোর কি ব্যবস্থা হবে লেফ্‌টে-ন্যাণ্ট?"

বেসিল এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। সত্যি বলতে কি, একটু যেন বোকাবোকাই দেখাচ্ছিল তাকে। এতক্ষণে সে মাথা তুলে চাইলো; বললো, "লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌, মিঃ মণ্টমরেন্সীর প্রশ্নের একটা জবাব দিয়ে যান। সত্যিই তো, পাখীগুলোর কি করবেন?"

ফিরে না তাকিয়ে জবাব দিলেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট, "সে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, পাখীদের কোনও কষ্ট হবে না।"

"ধন্যবাদ আপনাকে," আনন্দের আবেগে মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী যেন গলে পড়লেন, "জানেন তো, পশুপাখীদের জন্যে আমি প্রায় পাগল বললেও চলে। পাখীদের তাহলে কোনও কষ্ট হবে না, কেমন? ধন্যবাদ আপনাকে, অজস্র ধন্যবাদ। তবে হ্যাঁ, আরও একটা কথা— "

লেফ্‌টেন্যাণ্ট এবারে সশব্দ হাস্যে ফেটে পড়লেন; তারপর ফিরে দাঁড়ালেন মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সীর দিকে। সে হাসির অর্থ অতি পরিষ্কার; তার অর্থ, 'না আপনার জ্বালায় আর পারা গেল না ব্যাপারটা আপনি গোপন রাখতে দেবেন না দেখছি।'

দুর্বল গলায় মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী বললেন, "হ্যাঁ, আরও একটা কথা। নিরিবিলি অজ্ঞাতবাসই যদি আপনার কাম্য হয় তো বাড়িটার আমরা সবুজ রং করিয়ে দেব; আর নয়তো আপনার যদি—"

মিঃ কীথ যেন গর্জে উঠলেন, "সবুজ! হ্যাঁ, সবুজ রংই আমার চাই। এ নিয়ে আবার প্রশ্ন কেন? সবুজ রংই করিয়ে দেবেন।"

ব্যাপারটা তখনও আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারি নি, সশব্দে দরজা খুলে লেফ্‌টেন্যাণ্ট রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

রুপার্টও যেন প্রথমটায় তাঁর এই আকস্মিক নিষ্ক্রমণে বিব্রত হয়ে উঠলো; পরক্ষণেই সে সামলে উঠে প্রশ্ন করলো, "ব্যাপারটা কি মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী? লেফ্‌টেন্যাণ্টকে যেন একটু উত্তেজিত মনে হলো, তাই না? ব্যাপারটা কি? উনি কি অসুস্থ?"

মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী বললেন, " না না, অসুস্থ হবেন কেন? বাড়ি ভাড়ার ব্যাপার তো, সাত ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছে। বাড়িটাও আবার—"

রুপার্ট তাঁকে বাধা দিয়ে বললো, "সবুজ হওয়া চাই, কেমন? সবুজ রংএর ওপর লেফ্‌টেন্যাণ্টের দেখছি ভারী ঝোঁক; যে করেই হোক্‌ বাড়ির রং তাঁর সবুজ হওয়া চাই! অদ্ভুত! তা সে যাই হোক্‌, লেফ্‌টেন্যাণ্ট আমাদের জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন; এক্ষুনি আমরা উঠবো। তার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। আপনার খদ্দেররা কি সব এইভাবে রং দেখে বাড়ি পছন্দ করেন? ব্যাপারটা আমার একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে। ভাড়াটেদের বুঝি এখানে রংএর উপরেই ঝোঁক? এই ধরুন, কারুর বা লাল বাড়ি চাই, কারুর বা নীল বাড়ি, আবার কারুর বা সবুজ বাড়ি না হলে চলবে না—কেমন?"

কাঁপা-কাঁপা গলায় মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী বললেন, "তা যা বলেছেন। তবে কি জানেন, বাড়ির ব্যাপারে রংই হচ্ছে আসল কথা। কেউ যদি লোকচক্ষুর অন্তরালে একটু নিরিবিলি থাকতে চান তো সবুজ বাড়ি তাঁকে নিতেই হবে। লেফ্‌টেন্যাণ্টও তাই সবুজ বাড়ি নিচ্ছেন। ভদ্রলোক একটু নিরিবিলি থাকতে চান; চট্‌ করে তাঁর বাড়িটা সকলের নজরে পড়ুক—এ তিনি চান না।"

যুক্তি শুনে রুপার্ট খুশী হলো না। বললো, "সবুজ বাড়িই বরং চট্‌ করে সকলের চোখে পড়বে। এমন কোন্‌ জায়গা আছে মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী সবুজ-রঙা বাড়ি যেখানে সকলের নজর এড়িয়ে যায়?"

মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী বিব্রত অস্বস্তিতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন হাতড়াতে লাগলেন। একটু বাদে ছোট্ট দুটো গিরগিটিকে টেনে বার করলেন সেখান থেকে; সে দুটোকে কাউণ্টারের ওপর ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, "মাপ করবেন, এ প্রশ্নের জবাব দেবার উপায় নেই।"

"একটা ইঙ্গিত দিন অন্তত?"

"তারও উপায় নেই," চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী, "কোনই উপায় নেই। ও-কথা থাক্‌। তার থেকে বলুন, আপনাদের কি বাড়ির দরকার আছে? থাকলে আমাকে দয়া করে জানাবেন একবার। কী ধরণের বাড়ি আপনাদের পছন্দ?"

নীলাভ দুটি চক্ষু মেলে তিনি রুপার্টের দিকে তাকিয়ে রইলেন; রুপার্ট, মনে হলো, অপ্রস্তুত হয়েছে। যাই হোক্‌ তক্ষুনি সে সামলে উঠে বললো, "ওঃ হো, লেফ্‌টেন্যাণ্ট আবার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন, খেয়ালই ছিল না আমার। আচ্ছা মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী, আজ তাহলে উঠি। আমার কৌতূহলে যদি অসৌজন্য প্রকাশ পেয়ে থাকে, ক্ষমা করবেন।"

"না না, সে কি," মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী তাঁর পকেট থেকে ধীরে ধীরে একটা মাকড়সা টেনে বার করলেন; ডেস্কের গায়ে সেটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "না না, তাতে কি হয়েছে? যদি কখনও বাড়ির দরকার হয় তো অনুগ্রহ করে একবার পায়ের ধুলো দেবেন; তাহলেই যথেষ্ট।"

রাগে যেন ফেটে পড়ছিলো রুপার্ট, সবেগে সে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপরেই আমাদের চক্ষুস্থির। কোথায় লেফ্‌টেন্যাণ্ট! তাঁর টিকিটিরও চিহ্ন নেই। রাস্তা নির্জন, আকাশে নক্ষত্রের চোখ-মিটিমিটি। বোকার মতো আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। (ক্রমশ)

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

[পূর্বানুবৃত্তি]

১২

ডায়েরী

সত্য কথা বলতে কি, যারা সমাজকে ফাঁকি দিতে চায়, তারাই মানসিক পরিশ্রম করে। আজকালকার লোকের একটা ভুল ধারণা জন্মেছে, যে পৃথিবীর শাসনভার আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে ও যাবে, যারা শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের হাতে। এটা যাদুকর ও পুরোহিতের ঐতিহ্যের বাহক intellectualsদের চালাকি। আসলে ক্ষমতাটা যাচ্ছে, যোদ্ধাদের হাত থেকে মনন-বিলাসীদের হাতে, বহু উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে নানা চোরাখাতে। এই মৌলিক সত্যটাকে ঢাকবার রূপ, বিভিন্ন সামাজিক দর্শনে বিভিন্ন রকমের। উপরের 'কমোফ্লেজ'টুকুকেই লোকে দেখে আসল জিনিস বলে ভুল করে।

দূর থেকে দেখে ফরাসী মনেরও যে ধারণাটা হয়, আসল জিনিসটা তার থেকে একেবারে আলাদা। এদেশে খুব পণ্ডিত লোকও হালকা আচরণের আবরণে নিজের পাণ্ডিত্য ঢাকবার প্রয়াস পান, গণিতজ্ঞ কবির ভাষায় কথা বলতে পারেন, জোলিও কুরির মত বৈজ্ঞানিকও সাহিত্যিকদের আসরে অস্বস্তি বোধ করেন না। চিত্রকর স্থপতি, ভাস্কর, সাহিত্যিক সকলেই নিজের প্রজ্ঞাকে একটা হাল্কা মুখোস পড়ান, যাতে সেটা স্থূল চোখে দেখা না যায়। ফরাসীরা বলে যে যে দেশের বড়রা হলফ• নিয়েছে ছোট-চিন্তা করবে না বলে, তাদের ভুল কোন পর্যায়ে পড়ে জান? দেওয়ালে সেই দুটো গর্ত খোঁড়বার মত—বড় বিড়াল বড় গর্ত দিয়ে যাবে, ছোট বিড়াল যাবে ছোট গর্ত দিয়ে। সেই রকম ভুল। স্বেচ্ছাকৃত বৈরাগ্যের দেশের লোক আমরা। তাই আমরা জানি, যে কত বড় মন হলে লোকে নিজের আত্মবিলোপন ও আত্মনিগ্রহ উপভোগ করতে পারে। ফ্রান্সে বোধ হয় এটা ক্যাথলিক সংস্কৃতির দান।

আমাদের দেশের বড়দের সাধারণ হওয়া শাস্ত্রের বারণ। তাই আমাদের পণ্ডিতরা শাস্ত্রকে জটিল করতে চেষ্টা করেন—নইলে পাণ্ডিত্য ফলাবেন্ কিসের উপর। তাঁরা ভুলে যান যে উঁচুতে উঠতে [illegible] রা জিনিস সঙ্গে রাখতে [illegible]ই। এদেশের পণ্ডিতদের ঔদার্যও অসীম। সাধারণ ডক্টরেট ডিগ্রির [illegible] তারই একটি সামান্যতম নিদর্শনমাত্র। নিজে গাড়ীতে কোন রকমে উঠতে পারলেই আমাদের দেশের যাত্রী দরজা আটকে দাঁড়ায়। সেই কুলীন সর্বস্ব দেশের পণ্ডিতরাও ঐ লাইনেই চলেন। প্যারিসে প্রথম এসে যখন রুশ ভাষার ক্লাসে নাম লিখোতে যাই, তখন সেখানকার মহিলা প্রোফেসার দুঃখ প্রকাশ করে জানান যে তাঁদের রুশের ক্লাশটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর নিজেই ফোন করে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষায়তনে আমাকে ভর্তি করে দেন। আমাদের দেশের কোন প্রোফেসারের কি এ সময় বা সৌজন্য আছে?

এদেশের পণ্ডিতরা সাধারণ লোকের সঙ্গে কোন ব্যবধান রাখেন না বলেই বোধ হয় এখানে বিদ্যার এত কদর। শিক্ষিত লোকের চোখে, ফটোগ্রাফি, এসপারেণ্টো বা গায়ে রং লাগাবার কলা (L' Art du maquillage কেনটার মর্যাদা, দর্শন বা পদার্থবিদ্যার চেয়ে কম নয়। আমাদের দেশে বিদ্যারও জাত আছে।

প্যারিসের উপরের ঢেউটা উগ্র আলোতে ঝলমল করে। এটা সিল্কের-লম্বা-মোজা, রুলেৎ, উথলেওঠা সুরার ঝাঁঝ, ও English-spoken-here-এর প্যারিস। কোটিপতি আমেরিকান, পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী, আন্তর্জাতিক জুয়াচোরের দল, তথাকথিত রুশের নাচিয়ে অস্ট্রিয়ার বাজিয়ে, ইটালীর গাইয়ে, এই সব শ্রেণীর লোকের ভিড় সেখানে। দালালের দল ছাড়া স্থানীয় লোক এ সব জায়গায় কম। দুচার দিনের বিদেশী টুরিস্টরা এই খোসাটুকুরই স্বাদ পায়; এর নীচের গভীরতায় যেতে পারে না।

এই হাল্কা আবরণ সরিয়ে ঢুকতে হয় আসল ফরাসী মনে। স্থৈর্যে গাম্ভীর্যে, গভীরতায় এর জুড়ি পাওয়া ভার। সাধারণ ফরাসী জানে যে ব্যক্তিগত সুখগুলোকে যোগ করলে সারা সমাজের সুখের হিসাব পাওয়া যায়। সমাজ ব'লে আলাদা কোন একটা জীব নেই, যে তার জন্য আবার একটা আলাদা সুখ-সুবিধার মাপকাঠি [illegible]। তাই ছোটটো পারিবারিক জীবনের সুখই আসল ফরাসী মনের আদর্শ। বাড়িতে paying guest রেখে ফরাসীরা গার্হস্থ্য জীবনের অনাবিল আনন্দে বাধা সৃষ্টি করে না। অথচ পারিবারিক জীবনের privacy নিয়ে শুচিবাই নেই,—এক কেবল জানলার পর্দাটা টেনে দেওয়া ছাড়া। সাধারণতঃ একটা না হয় দুটি সন্তান শহুরে দম্পতির। সে ছেলেটাকে নিয়ে কি করবে বাপমা ভেবে পায় না। সবচেয়ে গরীব পরিবারও ফুটপাথে নাগরদোলায় প্রায় প্রত্যহ কোন ফ্রাঙ্ক কত খরচ করে, ছেলেটার জন্য। প্রত্যহ একবার করে ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়। ছোট মেয়েটার পর্যন্ত তিন বছর বয়স থেকেই ঝোঁক, পুতুলের পেরাম্বুলেটার ঠেলে পার্কে নিয়ে যাবার। ফরাসী মহিলাদের গিন্নিপনার সুনাম আছে পৃথিবী জুড়ে—তাঁরা নাকি টাকা টেনে লম্বা করতে পারেন। গিন্নীপনার বিরাট মেলা বসে প্রতি বৎসর প্যারিসে। মেলায় কেবল যে সংসার চালানোর জন্য দরকারী আধুনিকতম জিনিসপত্র পাওয়া যায় তা' নয়। এখানে গিন্নীপনায় দক্ষতার জাতীয় প্রতিযোগিতা হয়। কম সময়ে, কম খরচে, গুছিয়ে কে কেমন গৃহস্থালির কাজ করতে পারেন তারই হয় পরীক্ষা। সারা দেশ থেকে মহিলারা এতে এসে যোগ দেন। যিনি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, তিনি "বাড়ির পরী" (Fee du

Logis) এই উপাধি পান। এদেশের মেয়েরা আমাদেরই দেশের মত রান্নাঘরে থাকতে আনন্দ পায়। নিরামিষ আমিষ, শাকপাতা মিশিয়ে, এটা ফোড়ন দিয়ে, ওটা দিয়ে দুর্গন্ধ করে, পুরুষদের খাওয়াতে ভালবাসে। এদের রান্না ইংলন্ডের মত কেবল সিদ্ধ সিদ্ধ নয়, আলুর বাহুল্যও সেখানকার মত নেই। তিত, টক কষায় সব রকম স্বাদের বিধান আছে। পারিবারিক বন্ধনের তাগাদা দৃঢ় বলেই এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের ছুটি দুই ঘণ্টা। মেয়ে মানুষের পুরুষালি ভাব ফরাসীরা অন্তর থেকে অপছন্দ করে। সন্তান থাকুক আর না থাকুক, ফরাসীরা মেয়ে মানুষের মধ্যে খোঁজে, মায়ের স্নেহ, গৃহিণীর শৃঙ্খলা, প্রেয়সীর মাদকতা। পুড়িয়ে মারবার আগে জোয়ান অফ আর্কের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির মধ্যে একটা ... যে, তিনি পুরুষের পোষাক পরতেন। ... ... বিরোধ দৃঢ়তর করবার রাজনীতিক প্রোগ্রাম এদেশে সকলেরই পছন্দ। সেইজন্য কোন দল বলে যে অবিবাহিতা মেয়ে চাকরি করতে পারবে না; কোন দল বা সন্তানের পিতাদের লোকেগুলো অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়াতে চায়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Berthelet-এ ... কে সকলে শ্রদ্ধা করে, তিনি স্ত্রীর মৃত্যুর ... ঘণ্টার মধ্যে মারা গিয়েছিলেন বলে।

এত মিষ্টি এদের পারিবারিক বাঁধন। যে দেশে 'মায়ের দিন' বলে একটা উৎসব আছে, যা আমাদের মাতৃপূজার দেশেও নেই। আমাদের ভাইয়ের দিন ও ইফোঁটার ... এদেশের ছেলেপিলেদের কাছে মায়ের দিন'এর গুরুত্ব কম নয়। ... ছেলে-মেয়ে সেদিন নিজের নিজের মাকে ফুল বা অন্য কিছু উপহার দেয়, নিজেদের সাধ্যমত ঘরে ঘরে উৎসব অনুষ্ঠান করে।

হাল্কা প্রেমের খেলাটাই এদেশে সফল নয়। প্রেম জিনিসটা ল্যাটিন জাত-গুলোর মনের একটা দুকুল ভাঙ্গা প্লাবন। ... প্রেমের মত সব আইনের উপর এর ... সমাজের চোখে, সেই রকমই রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয়। অন্য সব দেশের হিসাব করা এক ... ভালবাসার সঙ্গে ল্যাটিন জাতের প্রেমের তফাৎ, এর গভীরতায় আর অমোঘ শক্তিতে। এখানকার প্রেমের মাতনে মনের ... টা তছনছ হয়ে যায়; অন্য দেশে কেবল মনের উপরের ভাবের খোলশটাতে সুড়সুড়ি লাগে। ইংরাজরা ডিউক অব উইন্ডসরের বুদ্ধিহীন ভাবপ্রবণতার নিন্দা করে; ফরাসীরা ধর্মযাজক আবেলারের (Abelard) পুজো করে তাঁর নিজের ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের কথা মনে করে। ওভিদের লেখা "ভালবাসার আর্ট" নামের ল্যাটিন বইখানা থেকেই বোধ হয় দুর্বার প্রেমের ভাবধারা প্রথম জনপ্রিয় হয়েছিল ফ্রান্সে—করেছিলেন ধর্মযাজকরা। একে মহিমমণ্ডিত করে-ছিলেন নাইট্ এরাণ্টরা।

বনেদী জমিদাররা যেমন মোটর গাড়ীও কেনে আবার পুরনো পাল্কিখানও ফেলতে পারে না, ফরাসীদেরও মনের ভাব তাই। মনের মধ্যের পাশাপাশি খোপে নূতন পুরানো দুই জিনিসই রাখা থাকে। যখন যেটার সময় তখন সেটাকে কাজে লাগায়। রোমের চেয়েও বেশী রোমানক্যাথলিক শহর প্যারিস, অথচ রবিবারে সকালে ঘুমের লোভে কেউ গির্জাতে যায় না। এদেশের প্রথম শ্রেণীর কাগজেও প্রত্যহ একটা করে ধর্মের ... কলাম থাকে। অথচ এখানকার লোকেরাই এক সময় ইটালিতে গিয়ে পোপকে বন্দী করেছিল; আর এক সময় নিজের দেশের Avignon ... মনের মত লোককে পোপ করে বসিয়েছিল। আবার এরাই এখন ভেটিক্যানে পোপের জন্য টেলিভিশন সেট বসিয়ে এসেছে। এত ধর্মপ্রাণ জাত, যে রোমে ফরাসী তীর্থযাত্রীরা সংখ্যায় এ বছর সর্বোচ্চে তাই নিয়ে এখানকার প্রতি সংবাদপত্রের গর্ব। কোন কোন তীর্থযাত্রী রোমে খালি পায়ে তীর্থ করতে যাবে পণ করেছে, তাদের ফটো সব কাগজে বার হয়েছে। এদেশে নাস্তিকরাও ক্যাথলিক। এটা এখানে কেবল একটা ধর্মবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, এ একটা জীবন যাত্রার ধরণ এবং যথার্থতঃ ফরাসীদের সামাজিক জীবনের কাঠামো। নৎর দাম ক্যাথেড্রালকে এরা ফরাসী বিপ্লবের যুগে "যুক্তির মন্দির" করেছিল। সেটা ছিল ঝড়ের দোলা; আজও দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় সামাজিক শক্তি ক্যাথলিক ধর্ম। জীবনের সব ক্ষেত্রে ক্যাথলিক ধর্মের ঐতিহ্য আঙুল উঁচিয়ে আছে—তোমাকে লঘু চাপল্যের পথ থেকে বিরত করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। 'কারেম' উৎসব পালনের দিন কোন কোন জিনিস খাবে না তাও বেরোবে প্রত্যেক ভাল খবরের কাগজে। ফরাসী সাহিত্যের ক্ষেত্রে পর্যন্ত ক্যাথলিক পরম্পরার গতি অপ্রতিহত। আজও Mauriac ও Paul Claudel এর মত শক্তিমান সাহিত্যিক, এরই প্রেরণায় নিজের লেখনী চালিত করছেন।

আসলে ফ্রান্স পুরনো ঘেঁষা দেশ। এখানকার সাহিত্যিকদের বুড়ো না হলে নাম হয় না। আঁদ্রে জিদ Faux-Monnayeurs লিখে নাম করেছিলেন সাতান্ন বছর বয়সে। টিউব ট্রেনের মধ্যে লেখা থাকে "মনে রাখবেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয়। অ্যাকাডেমিতে একজন সদস্য যতক্ষণ না মরে স্থান খালি করে দিচ্ছেন, ততক্ষণ নূতন সদস্য নেওয়া হয় না। কাজেই অল্প-বয়সী লোকের ঢোকা কঠিন। পুরনো ধরণের যন্ত্রপাতি দিয়েই এরা কলকারখানা চালায় পুরানোকালের প্রথা অনুযায়ী, পাড়ায় পাড়ায় অস্থায়ী হাটের ব্যবস্থা, আজও এরা প্যারিসের মত আধুনিক শহরের বুকেও জিইয়ে রেখেছে। শহরের পুরনো রাস্তার কাঠামো বজায় রাখতে গিয়ে ফ্রান্সে বহু ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট অকেজো হয়ে পড়েছে। ভাল মদ খাওয়া যে দেশের লোকের অভ্যাস, সে দেশের লোক পুরনো জিনিসকে ভাল না বেসে পারে না।

অন্তর থেকে রক্ষণশীল ফরাসী জাতটা বাইরের খোলসটা বদলায় পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য, কিন্তু মনের মধ্যে গাঁথা জীবনের পুরনো মান-গুলো কিছুতেই বদলাতে চায় না। এরা এত যুক্তিবাদী যে, ইহুদী Dreyfus-এর উপর ক্যাথলিকধর্মাবলম্বী লোকদের অত্যাচারের কথা বলবার সময় মনে হবে গির্জাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে চায়। এটা লোক দেখানো রাগ নয়। সেই ফরাসীটিরই সঙ্গে আর একটু অন্তরঙ্গ হও; সে তার মনের আর একটা কুঠরি খুলে দেখাবে তোমার কাছে। তার মুখে শুনবে, গির্জা না থাকলে দেশের শ্রেষ্ঠ প্রাচীন শিল্পসম্পদ-গুলো কবে নষ্ট হয়ে যেত—চামড়ার উপর রং দিয়ে ছবি আঁকা, হাতে-লেখা বইয়ের কারিকুরি, দেশের সবচেয়ে ভাল মদ তৈরির প্রক্রিয়া, বহুরকমের ইতিহাসের উপাদান, আজও বেঁচে আছে গির্জার মত প্রতিষ্ঠান ছিল বলেই। এসব জিনিস শাসকের খেয়াল, রাজ্যের ভাগ্যবিপর্যয় বা লঘুচিত্ত নাগরিক-দের খামখেয়ালির উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। সামান্য অযৌক্তিকতা হয়ত গির্জায় আছে, কিন্তু মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ মানগুলো বজায় রাখতে গেলে ক্যাথলিক গির্জা না হলে

চলে কই! আপনাদের দেশেও দেখেন নি, প্রাচীন হিন্দু রাজারা রাজপ্রাসাদ থেকে মন্দিরটাকে ভাল ও মজবুত করে তয়ের করতেন। পিরিনিজের Lourdes-এর গির্জায় উপাসনা করে যদি কারও রোগ সারে, আলেক্সি ক্যারেল-এর মত বৈজ্ঞানিকও সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন, তাহলে অবিশ্বাসটা একটা গোঁড়ামি নয় কি? বিজ্ঞানের নির্ণয় ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যবধান দিন দিন কমছে, একথা ভাবা ভুল। জেনে রাখবেন, মুসিয়ো আমাদের নাতি-পুতিদের মন আমাদের চেয়ে কম সংশয়ী হবে। যারা আজকে নিজেকে সবচেয়ে যুক্তিবাদী বলে, তারাও দেখবেন, মানুষের ভবিষ্যতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। যারা সব সময় নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা করে বলে গর্ব করে, তারা কারও কাছ থেকে তো নিশ্চয়ই শিখেছে যে, নিজস্ব মৌলিক চিন্তাটা করা ভাল। ক্যাথলিক ধর্মের চাপ আর ছাপ আমাদের চিন্তায়—বাইরের লোক বলে; কিন্তু যত বড় পণ্ডিতই হন না কেন, সত্যি করে স্বাধীনভাবে কি কেউ ভাবতে পারে? মানুষের ট্র্যাজেডি কোন বিশেষ ঘটনায় নয়; নিজের তয়ের করা আগের যুক্তিটাকে ভাঙবার জন্য নতুন যুক্তি তয়ের করা, চব্বিশ ঘণ্টা এই কাজ করাটাই মানুষের ট্র্যাজেডি।...

কোনও জিনিসে বিশ্বাস না থাকলে মাপবেন কি দিয়ে যে, মনের উপরের সাময়িক ছোপগুলো কতদূর সত্যি, কতটা ভুয়ো।

সবই বেশ যুক্তিপূর্ণ কথা। 'দেকার্ৎ'-এর দেশের লোক কি না ফরাসীরা। তাই প্রতি বিতর্কের একটা যুক্তিসঙ্গত পরিণতি চায়। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত হয়ত তুলবে বিভিন্ন ধর্মের একটা আন্তর্জাতিক ফেডারেশন গোছের স্থাপনা করবার কথা; —সদস্যতার ন্যূনতম যোগ্যতা হবে কতকগুলি ক্যাথলিক স্বীকৃত নৈতিক মান স্বীকার করা। ...... আরও অনেক জল্পনাকল্পনা।

এই সিরিয়াস দিকটাই ফরাসী মনের আসল দিক। এদেশের মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীগুলোর গত বৎসরের রিপোর্টে দেখছিলাম যে, হাল্‌কা ডিটেকটিভ বা প্রেমের উপন্যাসের চাহিদা নেই। Dumas, Zola, Balzac ও Jules Verne এই পুরনো লেখকদের বইয়েরই সবচেয়ে বেশি চাহিদা। আজকালকার লেখকদের মধ্যে Colette, Gide, Mauriac, Jules Romains ও Sartre, এই কয়জন লেখকের বই-ই পাঠকেরা সবচেয়ে বেশি চায়। পছন্দ দেখেই বোঝা যায় যে, ফরাসীদের গভীর মন নকল বা হাল্‌কা জিনিসের চটকে ভোলে না। অতীতের পরম্পরা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ভারসাম্য কোথায় রাখতে হবে, তা তারা জানে। ফরাসীরা ভাবে, জীবনের লঘু চপলতায় বিরতি আনবার জন্য দরকার হয় ধর্মের ও সাহিত্যের। এই জন্যই বোধ হয় এদের মনের একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা আছে যে, ভাল সাহিত্যের মধ্যে খানিকটা ভারি জিনিস থাকা উচিত। ফরাসী লেখকরা জানেন যে, বইয়ে গুরুত্ব আনতে হলে বই খানিকটা একঘেঁয়ে হতে বাধ্য; একজন মার্জিত রুচির পাঠক যতখানি পর্যন্ত একঘেঁয়েমি সহ্য করতে পারে, ততখানি সহ্য করাতে এদেশের বড় ঔপন্যাসিকরা দ্বিধা করেন না।

Marcel [illegible] A la Recherche [illegible] temps perdu, Roger Ma[illegible]gard এর লেখা Les Thibault, Sartre র Les Chemins de la Liber[illegible]; কত আর নাম করব[illegible] অধিকাংশ ভাল বড় বইয়ে এই একই [illegible]পার।

যে নূতন ব[illegible] খুব বেশি বিক্রি হয়, তার উৎকর্ষে সন্দেহ ফরাসী দেশের মত আর কোন দেশে নেই। এ গেল ফরাসী মনের স্থৈর্য ও গাম্ভীর্যের দিকটার কথা।

সাহিত্যও ফরাসী দেশে ধর্মেরই মত একটা গভীর, সর্বব্যাপী, নিয়মানুবর্তী জিনিস বলে সমাদৃত। 'সাহিত্যই সভ্যতা' ভিক্টর হুগোর এই কথাটা শোনা যায় পথে-ঘাটে, যেখানে-সেখানে। এ্যাকাডেমির সদস্য হওয়াকে ফরাসী ভাষায় বলে 'অমর' হওয়া। এইটাই দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান বলে গণ্য। রাজনীতির নেতাদের এদেশের লোক বড় একটা আমল দেয় না; সাহিত্যিকদের কথা তাদের মনে সাড়া জাগায় অনেক বেশি। তাই রাজনীতিক বা বৈজ্ঞানিক সভাতেও সাহিত্যিকদের উক্তি উদ্ধরণ না করতে পারলে শ্রোতাদের মনঃপূত হয় না। যে কোন নূতন হুজুগ জনপ্রিয় করতে হলে উদ্যোক্তারা সাহিত্যিকদের সম্মুখে রেখে আড়াল থেকে কাজ করেন। ব্যবস্থাপক সভায় সাহিত্যিক কোটেশনের ছড়াছড়ি। কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী বস্তুনিষ্ঠ Maurice Thorez-কে পর্যন্ত নিজের পার্টির সম্মুখে বার্ষিক রিপোর্ট দেবার সময়, লেনিন ছাড়াও ব্যালজাকের উক্তি উদ্ধরণ করতে হয়—ছাপা রিপোর্টে অবশ্য এটা দেওয়া থাকে না। সাধারণ লোকের এত সাহিত্য-প্রীতি দেখলেই বোঝা যায় যে, মনের মৌলিক ভিত্তিটার সঙ্গে তাদের পরিচয় নিবিড়। কোন জাতির পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। Dreyfus-এর বিচারের রায় নিয়ে রাজ্য টলমল হয়ে গিয়েছিল, সাহিত্যিক Zola তার পক্ষ নিয়েছিলেন বলে। মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ফরাসী সাহিত্য চিরকাল সমান তালে পা ফেলে চলেছে, এটাও এ-জাতির সাহিত্য-প্রীতির একটা কারণ। সমসাময়িক সমাজের সমালোচনা করা এদেশের চিন্তাশীল লোকরা অবশ্য করণীয়ের মধ্যে ধরেছেন। শুকনো এনসাইক্লোপিডিয়ার মাধ্যমে সমাজের ভিত্তি নাড়িয়ে দে[illegible] [illegible]দ্যম ও সৎসাহস দু'শ বছর [illegible] এদের সাহিত্যিকদের ছিল। সাধারণ লোকে এই জিনিসটাই চায়।

এই বিশালতা ও গভীরতার জন্য ফরাসী সাহিত্যের ধারা কখনও শুকিয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথ যাওয়ার পর বাঙলা সাহিত্যে খানিকটা জায়গা খালি থাকে। একদিনের জন্যও এ-জিনিস ফরাসী সাহিত্যে অসম্ভব। [illegible]ব দেশেই এক-আধজন বড় সাহিত্যিক জ[illegible]ান; কিন্তু বড় সাহিত্যিক থাকা, আর সে [illegible]ষাটা বড় সাহিত্য হওয়া আলাদা জিনি[illegible]। ফরাসী সাহিত্যে সৃজন-প্রতিভা এত ব্য[illegible]ক যে, এক-আধজন প্রতিভার উপর তা নি[illegible]র করে না। বড়লোকের সংসারের পর্যাপ্ত[illegible]র বিশৃঙ্খলা এদের সাহিত্যে; কে কোথা[illegible] কি লিখছে সব খবর রাখা সম্ভবও নয়। সাহিত্যের সব বিভাগে সব সময় পাঁচ-সাতজন প্রায় সমান কৃতিত্বের লেখক আপন মনে নিজের কাজ করে যান। আর কি পণ্ডিত প্রত্যেকে!

একটা জিনিস বুঝতে পারি না। গভীর সাহিত্যের প্রতি যে দেশের লোকের এত অনুরাগ, তারা রোমাঁ রোলাঁর বই পড়তে ততটা ভালবাসে না কেন? গান জিনিসটাকে যারা অন্তর থেকে ভাল না বাসে, আর জর্মান সংস্কৃতিকে অন্তর থেকে অপছন্দ করে, 'জাঁ ক্রিসতোফ্' তাদের ভাল লাগা শক্ত। কিন্তু এত স্থূল কারণটা মন নিতে চায় না। হয়ত ফরাসী মনের একটা অজ্ঞাত স্থানের হদিস এখনও পাইনি।

(ক্রমশ

রাজগৃহ - নালন্দা • ডাঃ অমূল্যচন্দ্র সেন

• রেখাচিত্র • ইন্দ্র দুগার •

ভূমিকা
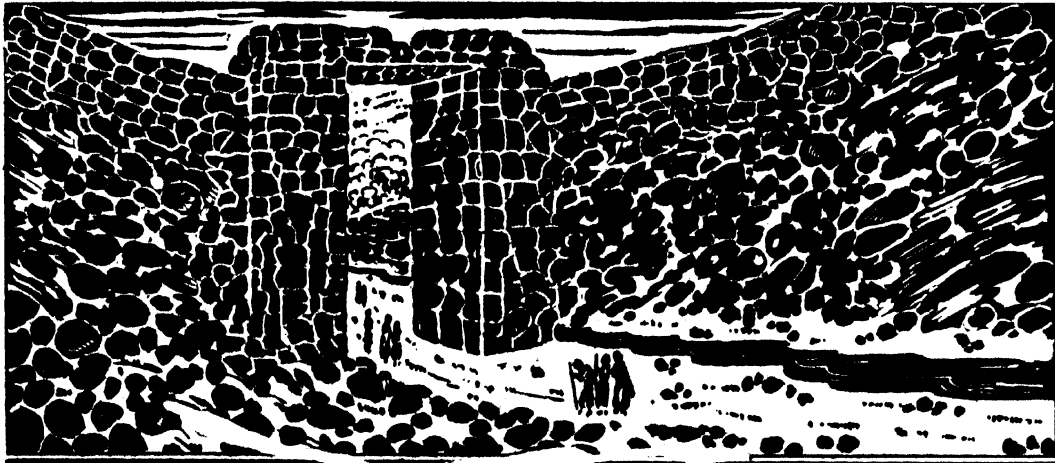
মোহেঞ্জোদড়ো হড়প্পা ও তক্ষশিলা আ[illegible]রত ছাড়া হইয়া গিয়াছে, এখন রাজগ[illegible]ই [illegible]রতের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক স্থান।

আজকাল রাজগীরে শিক্ষিত [illegible]ঙালী [illegible]র্শকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। [illegible]ারণের [illegible]ঠযোগ্য ঐতিহাসিক ভিত্তিতে [illegible]কান বই [illegible] থাকায় যাত্রীদিগকে অশি[illegible]ত বা [illegible]ল্প শিক্ষিত ব্যবসায়ী লোকে[illegible] উপর [illegible]র্ভর করিতে হয়, পুরাতত্ত্ব বিভাগের [illegible]রেজি গাইড বুকে সব বিষয় পরি[illegible]ষ্কার হয় [illegible]। সেই অভাব দূর করিবার জন্য আশা [illegible]রি এই প্রবন্ধটি কিছু কাজে লাগিবে।

রাজগৃহের পথ

প্রাচীন রাজগৃহের বর্তমান নাম রাজগীর। [illegible] পাটনা জেলার বিহার সব ডিভিশনের [illegible]ন্তর্ভুক্ত। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পাটনা [illegible]শনের ২৮ মাইল পূর্বদিকে বখতিয়ারপুর [illegible]শন; বখতিয়ারপুরে গাড়ী বদল করিতে [illegible]। এখান হইতে বখতিয়ারপুর-বিহার [illegible]ইট রেলওয়ে নামক একটি ছোট রেল [illegible]ইন আরম্ভ হইয়া রাজগীরে শেষ হইয়াছে; [illegible] ৩৩ মাইল। পথে বখতিয়ারপুর হইতে [illegible] মাইল পরে বিহার-শরীফ স্টেশন, ইহা বিহার সব ডিভিশনে[illegible] সদর। প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর বা ওদন্তপুর [illegible]এখানে অবস্থিত ছিল। বিহার-শরীফ হইতে ৮ মাইল পরে নালন্দা। নালন্দা হইতে ৭ মাইল পরে রাজগীর মধ্যে সিলাও নামক একটি স্টেশন।

পাটনা বা মুঙ্গের হইতে রাঁচি বা গয়ার দিকে যে সব বাস চলে তাহাও বিহার-শরীফ
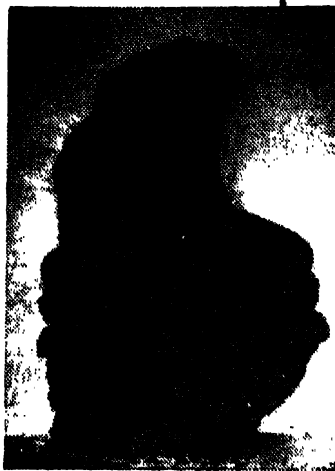
নালন্দার ভাস্কর্য—পালযুগ

হইয়া যায়। বিহার-শরীফ হইতে গয়া-রাঁচির মোটর পথে (রাজগৃহের পথে নয় কারণ বিহার-শরীফ হইতে বড় মোটর রাস্তা ছাড়িয়া একটি শাখা রাস্তা রাজগৃহে গিয়াছে) ১৬ মাইল দূরে জৈনদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পাবাপুরী; এখানে জৈনদের শেষ তীর্থংকর মহাবীর দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। পাবাপুরীর মন্দিরাদি অতি আধুনিক কালে নির্মিত। বিহার-শরীফ হইতে রাজগীর পর্যন্ত বাসেও যাতায়াত করা যায়।

বখতিয়ারপুর হইতে বিহার-শরীফ পর্যন্ত ছোট রেল লাইন ও মোটর পথ সোজা ও খুব পাশাপাশি গিয়াছে। তাহার পর রাজগীর পর্যন্ত শাখা পথ ও রেল লাইন আঁকিয়া বাঁকিয়া কখনও পরস্পরকে কাটাকাটি করিয়া গিয়াছে। নালন্দা স্টেশন হইতে প্রাচীন মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ ও তাহার সন্নিকটের মিউজিয়ম প্রায় দুই মাইল পথ। নালন্দায় কোন যানবাহন, থাকিবার বা আহারাদির স্থান নাই। তাই সঙ্গে জিনিসপত্র থাকিলে ও আহার্যাদি না থাকিলে সোজা রাজগীরে গিয়া সেখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া পরে সুবিধামত নালন্দা দেখা ভাল। সকাল হইতে প্রায় প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর রাজগীর-নালন্দা যাতায়াতের

'নূতন' রাজগৃহ
অশোক স্তূপ
উত্তর-দ্বার
বিপুলগিরি
শৈলগিরি
সপ্তপর্ণী স্তূপ?
পূর্ব-দ্বার
ছঠাগিরি
রত্নগিরি
বৈভারগিরি
অশোক স্তূপ
গৃধ্রকূট
রাজগৃহ গিরিব্রজ
মাদ্রকুচ্ছি
উঃ
পঃ
পূঃ
দঃ
জীবকাম্রবন
উদয়গিরি
রণভূমি
বানগংগা নদী
সোনাগিরি
দক্ষিণদ্বার
১নং মানচিত্র
নগর প্রাচীর
গিরিপ্রাকার
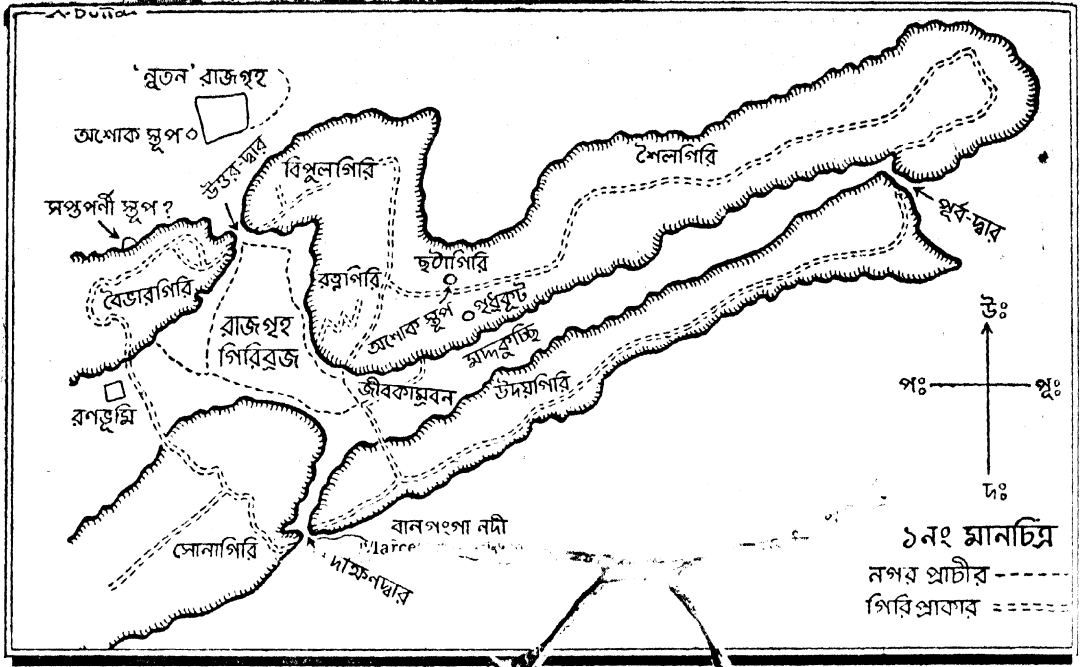
ট্রেন পাওয়া যায়। ধ্বংসাবশেষ ও মিউজিয়ম দেখিতে অন্তত ৩ ঘণ্টা সময় দেওয়া উচিত। সিলাও স্টেশনের কাছেই বাজার; এখানকার চিঁড়া ও খাজা প্রসিদ্ধ।

সিলাও স্টেশনের পর হইতেই রাজগীরের পাহাড়গুলির পূর্বদিকের অংশ অর্থাৎ প্রথমে শৈলগিরি, তারপর ছঠাগিরি ও ক্রমে বিপুলগিরি (১নং মানচিত্র) চোখে পড়ে। রাজগীরে দুই-একখানি এক্কা ও ডুলি ছাড়া কোন যানবাহন পাওয়া যায় না। বাজার, ধর্মশালা ও অন্যান্য বাসস্থান স্টেশন হইতে ½ মাইলের মধ্যে। স্টেশন হইতে বাহির হইয়া ডান (উত্তর) দিকে বাজার ধর্মশালা গ্রাম প্রভৃতি এবং বাম (দক্ষিণ) দিকে ব্রহ্ম-দেশীয় মন্দির, ইনস্পেকশন বাংলো, রেস্ট হাউস, জাপানী মন্দির এবং উষ্ণ-প্রস্রবণ ও পর্বতমালাবেষ্টিত প্রাচীন দ্রষ্টব্য স্থানগুলি।

প্রাচীন ইতিহাসের আকর

রাজগৃহের তথা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে আকর-গ্রন্থগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের মধ্যেও প্রাচীন বা কিছু সব সম্বন্ধেই কিম্বদন্তী বা শাস্ত্রোক্তি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া নির্বিচারে গ্রহণ করিবার অভ্যাস এবং প্রাচীন মাত্রকেই হাজার হাজার কি লক্ষ বছর পুরাতন বলিয়া মনে করিবার ইচ্ছা দেখা যায়। ইহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত তুলনা যুক্তিমূলক ঐতিহাসিক বিচার-আলোচনার পদ্ধতি নয়। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের বহু গবেষণা ও চর্চার সারমর্ম অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি।

কোন প্রাচীন শাস্ত্র বা গ্রন্থ মানুষ ছাড়া আর কাহারও দ্বারা লিখিত নয়। তাই এ সবেতে বহু উক্তির বিভিন্নতা বিরোধ এমন কি ভুলভ্রান্তিও দেখা যায়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগুলির অধিকাংশ একদিনে একজনের দ্বারা লিখিত হয় নাই; কয়েক যুগ ধরিয়া রচিত, অনেকের রচনা অনেকদিন লোকের মুখে মুখে চলিয়া কোন এক সময়ে একত্র সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয় এবং তাহার পরও তাহাতে অনেকদিন ধরিয়া জোড়াতালি চলে।

রাজগৃহের ডুলি

ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ও গ্রন্থাদির লেখক বা রচনাকাল, গ্রন্থকার ও অন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনকাল, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময় প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সঠিক নির্ধারণ করা যায় না, একটা মোটামুটি ধারণা লইয়া কাজ চালাইতে হয়।

ভারততাত্ত্বিক ঐতিহাসিকদের মতে বৈদিক সংহিতার প্রাচীন অংশগুলি খৃঃ পূঃ অনুমান ১৬—১৩ শতকের মধ্যে রচিত। অথর্ববেদের শেষাংশ, ঐতরেয় তৈত্তিরীয় শতপথ প্রভৃতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাচীন অংশগুলি অনুমান খৃঃ পূঃ ৯—৬ শতকের মধ্যে রচিত। মহাভারতের রচনাও এই সময় হইতে আরম্ভ হয় এবং খৃঃ ৩ শতক পর্যন্ত তাহা পরিবর্ধিত হইতে থাকে। মহাভারত বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সম্ভব অনুমান খৃঃ পূঃ ৯ শত[illegible]না। রামায়ণ অনুমান খৃঃ পূঃ ৩—২ শতকে [illegible] রচিত হইয়া পরে আরও পরিবর্ধিত হয়। পুরাণগুলিতে অনেক প্রাচীন কাহিনী ও কিম্বদন্তী সংগৃহীত হইলেও এখন পুরাণগুলিকে যে মূর্তিতে দেখা যায় তাহার রচনা সম্ভব খৃঃ ৩ শতকের পূর্বে নয়। ভাগবত পুরাণখানি আরও অনেক পরবর্তীকা[illegible] সম্ভব খৃঃ ১০ শতকের রচনা।

বুদ্ধের জন্ম হয় অনুমান খৃঃ পূঃ ৫৬৩ এবং মৃত্যু হয় অনুমান খৃঃ পূঃ ৪৮৩। জৈনতীর্থংকর মহাবীর, রাজা বি[illegible]সার ও অজাতশত্রু বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটক পালিভাষায় রচিত। অনেকদিন মুখে মুখে চলিয়া [illegible]নুমান খৃঃ পূঃ ২ শতকে ইহার সুত্তপিটক বিনয়পিটক ও জাতকগুলি লিপিবদ্ধ হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ অনুমান খৃঃ ৫ শতকের লোক। সিংহলের পালি ঐতিহাসিক গ্রন্থ মহাবংস অনুমান খৃঃ ৬ শতকে রচিত। অন্যান্য বৌদ্ধটীকাদিও পরবর্তীকালের রচনা।

শ্বেতাম্বর-জৈন শাস্ত্রের অংশবিশেষ রচনার পর বহুদিন তাহা মুখে মুখে প্রচলিত থাকিয়া পরিবর্ধিত হইতে থাকে এবং অনুমান খৃঃ ৫ শতকে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। দিগম্বর-জৈনরা এই শাস্ত্র প্রামাণিক বলিয়া জানেন না। দিগম্বররা শাস্ত্রতুল্য বলিয়া যে গ্রন্থগুলিকে মানেন তাহা সবই খৃষ্টপর যুগের রচনা।

চীনদেশের সঙ্গে ভারতের সংযোগ, চীনা পরিব্রাজকদের ভারত ভ্রমণ ও ভারতীয় পণ্ডিতদের [illegible] খৃঃ [illegible] ১১ শতক পর্যন্ত। চীনা পরিব্রাজকদের মধ্যে ফা হিয়েন ১৪ বছর (খৃঃ ৪০০—৪১৪) হিউয়েন ৎসাং ১৬ বছর (খৃঃ ৬২৯—৬[illegible]) এবং ই ৎসিং ২৪ বছর (খৃঃ ৬৭১—৬৯[illegible]) ভারতে কাটাইয়াছিলেন। রাজগৃহ ও নালন্দা সম্বন্ধে বহু সংবাদ আমরা চীনা পরিব্রাজকদের নিকট পাইয়াছি।

চীনের মত তিব্বতের সঙ্গে ও ভারতের সংযোগ ও আদান প্রদান চলিয়াছিল খৃঃ ৮ হইতে ১৩ শতক পর্যন্ত। নালন্দা বিক্রমশিলা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য আমরা জানি তিব্বতী গ্রন্থ হইতে। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথ সম্ভব খৃঃ ১৪ শতকের পরের লোক।

এই পুস্তিকাটি প্রণয়নে প্রাচীন শাস্ত্র ও গ্রন্থাদি ছাড়া সরকারী ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (Archaeological Department) কর্তৃক প্রকাশিত বিবিধ সন্দর্ভাদি ব্যবহার করিয়াছি। তা ছাড়া যে সব প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও অন্যান্য লেখকের মতামত ও তথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছি, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মগধ

প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের আর একটি নাম গিরিব্রজ। লক্ষ্য করিবার বিষয়, গিরিব্রজ-রাজগৃহ নামে উত্তর-পশ্চিম ভারতেও একটি নগর ছিল; রামায়ণে দেখা যায় ইহা ছিল কেকয় দেশের রাজধানী। কেকয় দেশ বা কেকয় জাতির উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই, কিন্তু শতপথব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য-উপনিষদে আছে; রামায়ণ-মহাভারতের কেকয়রা সুবিজ্ঞাত। দশরথপত্নী ভরতমাতা কৈকেয়ী এই দেশের রাজা অশ্বপতির কন্যা ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কেকয় দেশ কুরুপক্ষে যোগ দিয়াছিল। রামায়ণের বর্ণনায় কেকয় দেশ বিপাশা নদী (আধুনিক বিয়াস্) হইতে পশ্চিমে গান্ধার দেশের (আধুনিক কাবুল অঞ্চল) সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জেনারেল কানিংহাম ঝিলম নদীতীরস্থ জালালপুরের নিকটবর্তী আধুনিক গিরুয়াক নামক স্থানে কেকয় দেশের রাজধানী গিরিব্রজ-রাজগৃহের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের আধুনিক রাজগীরের কাছেও, পূর্বদিকে ৭ মাইল দূরে, গিরিয়াক নামে একটি স্থান আছে। সম্ভব গিরি+অগ্র=গির্যগ্র হইতে এই নামের উদ্ভব হয়, অর্থাৎ যাহা পাহাড়ের আগে (অল্প বাহিরে, কাছে) অবস্থিত। কেকয় দেশের গিরিব্রজ-রাজগৃহ হইতে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য মহাভারত রামায়ণ ও বৌদ্ধ-বিনয়পিটকে আমাদের রাজগৃহকে সর্বদা "মাগধদের গিরিব্রজ (বা রাজগৃহ)" বলা হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশে একই নামের স্থান থাকিলে প্রায়ই দেখা যায় তাহার কারণ এক দেশের লোক অন্য দেশে গিয়া বসতি বা নগরাদি স্থাপন করিয়াছে, যেমন ইংলণ্ডের লোক

রাজগীর স্টেশনের কাছে মূষিক-আহারী অস্পৃশ্য আদিম অধিবাসীদের কুঁড়ে

উত্তর-আমেরিকায় গিয়া নিউ-ইংলণ্ড নিউ-ইয়র্ক প্রভৃতির স্থাপনা করে, বিহারের রোহতাস্‌গড়ের অধিপতি শের শা পঞ্জাব জয় করিয়া সিন্ধুনদের তীরে রোহতাস নামে দুর্গ স্থাপনা করেন। উত্তর ভারতের মথুরা (=মধুরা) হইতে দক্ষিণ ভারতের মদুরা নগরের নামকরণ হয় আবার দক্ষিণ ভারতের লোক শ্যাম-সুমাত্রা-যব-বলি প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নূতন দেশে মদুরা ও অন্য বহু দক্ষিণ ভারতীয় নগরের নাম দিয়া নগর স্থাপনা করে। অতএব এরূপ অনুমান অসংগত নয় যে, কেকয়ের ও মগধের গিরিব্রজ-রাজগৃহ-গিরিয়াকের মধ্যে ঐরূপ কোন যোগসম্বন্ধ থাকিতে পারে। কেকয়ের লোক মগধে আসিয়াছিল, না মগধের লোকই কেকয়ে গিয়াছিল?

পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমে বক্ষু নদীর (আধুনিক Oxus) তীরে বাল্‌খ্‌ (প্রাচীন বাহ্লিক) প্রদেশে হিউয়েন ৎসাং রাজগৃহ নামে তৃতীয় আরও একটি নগর দেখিয়াছিলেন। ইহাকে "ছোট" রাজগৃহ বলা হইত। রাজার গৃহ অর্থাৎ রাজধানী অর্থে যে কোনও দেশের প্রধাননগরের নাম রাজগৃহ হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু তথাপি বাহ্লিক ও কেকয়ের রাজগৃহের মধ্যে কোন সংযোগ থাকা হয়তো সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। সম্ভবত কেকয় জাতির কোন শাখা পরবর্তীকালে বাহ্লিকদেশে গিয়া "ছোট" রাজগৃহের স্থাপনা করিয়াছিল।

পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে যে, কেকয় জাতি অনার্য অনুনামক জাতি হইতে উদ্ভূত। জৈন শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে যে, কেকয় দেশের অর্ধেকমাত্র আর্য। ঋগ্বেদের ৮ মণ্ডলে দেখা যায় যে অনুজাতির বাসস্থান ছিল পঞ্জাবের ঠিক সেই অঞ্চলে যাহা রামায়ণে কেকয়দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের বর্ণনায় কেকয় ও বাহ্লিক দেশদ্বয়ের মধ্যে খুব নিকটসম্বন্ধ দেখা যায় এবং পুরাণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মদ্রদেশের (লাহোরের পশ্চিমাঞ্চল) সংগে কেকয়জাতি ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ। এইসব কারণে মনে হয় যে আর্যরা যখন উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতে প্রবেশ করে তখন তাহাদের দ্বারা বিজিত ও তাহাদের সংগে কিছু পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া অনার্য অনুজাতির বংশধর কেকয়গণ ক্রমে পূর্বদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। "অনার্য" মানেই অসভ্য নয়; ইহার অর্থ আর্য হইতে বিভিন্ন অন্য জাতি। আর্যদের ভারত প্রবেশের পর যেসব ভারতবাসী জাতির সংগে আর্যদের যুদ্ধ করিতে হয় তাহাদের মধ্যে অনেক অসভ্য জাতি ছিল সত্য কিন্তু আর্যদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে সুসভ্য জাতিও যে ছিল তাহা আধুনিক ইতিহাসজ্ঞানে সুবিদিত। আর্যরা বাহুবলে এই সুসভ্য ভারতবাসী জাতিদের জয় করিলেও ইহাদেরই সংস্পর্শে অর্ধসভ্য আর্যরা সভ্যতার পথে উন্নতিলাভ করে। ভারতীয় সভ্যতার বহিরাবরণ মাত্র আর্য, ভিতরের অধিকাংশই অনার্য। আর্য ও প্রাগার্য ভারতীয় জাতির সংমিশ্রণে ভারতীয় জাতি ও সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হয়। দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীনলিপি হইতে জানা যায় যে, কেকয় জাতির একটি শাখা দক্ষিণ ভারতে গিয়া মহীশূরে রাজ্য স্থাপন করে; ইহাদের দ্বারা বোধহয় মহীশূরের একটি প্রাচীন রাজবংশের প্রবর্তন হয়। কেকয় জাতির অপর কোন শাখা কি পূর্ব-দক্ষিণ ভারতে অগ্রসর হইয়া মগধে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নিজেদের প্রাক্তন রাজধানীর নামে মগধে গিরিব্রজ-রাজগৃহের স্থাপনা করে?

অনুজাতি-উদ্ভূত অর্ধ-আর্য কেকয়-জাতির সংগে মগধের সংযোগ সম্বন্ধে হয়তো আরও একটি প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারা যায়। ঋগ্বেদের ৩ মণ্ডলে কীকট নামক একটি জাতির উল্লেখ আছে। নিরুক্তকার যাস্ক (অনুমান খৃঃ পূঃ ৫ শতক) কীকট দেশকে "অনার্য-নিবাস" বলিয়াছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে কীকট দেশকে "পাপভূমি" এই দেশের রাজা কাককর্ণকে "ব্রহ্মদ্বেষকর" এবং এই দেশে গয়া নামক একটি স্থান আছে বলা হইয়াছে। বায়ুপুরাণে আছে যে কীকট-দেশে পুণ্যা গয়া, পুণ্য রাজগৃহবন, পুণ্য চবনাশ্রম এবং পুণ্যা পুনঃপুনা (বর্তমান

পুনপুনা বা পুনপুন) নদী আছে। ভাগবত পুরাণে কীকট দেশের উল্লেখ প্রসঙ্গে টীকাকার শ্রীধর বলিয়াছেন যে, গয়া এই দেশে অবস্থিত। এইসবে বেশ বুঝা যায় য, মগধেরই প্রাচীন নাম কীকট। পরবর্তী-কালের গ্রন্থকাররাও একথা বলিয়াছেন। অভিধান চিন্তামণিকার হেমচন্দ্র (খৃঃ ১২ শতক) স্পষ্ট বলিয়াছেন যে মগধেরই নাম কীকট। অনার্যদের দেশ, অর্থাৎ আর্যরা তখনও তাহা জয় করিতে পারে নাই বলিয়া হা আর্য-ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে "পাপ-ভূমি" আখ্যা পাইয়াছিল, এখানকার রাজা ও লোক বৈদিক ধর্ম জানিতেন না তাই তাঁহারা ব্রহ্মদ্বেষকরা" ঐতিহাসিক যুগে মগধের একজন রাজার নাম কালাশোক বা কাকবর্ণ ছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত ব্রহ্মদ্বেষকর কীকটরাজ কাককর্ণের নামের "কর্ণ" শব্দটি হয়তো ঐতিহাসিক যুগের ... কাক-বর্ণের নামের "বর্ণ" শব্দের ভ্রমে ..., পুঁথি নকল করার সময়ে "ব" স্থানে "ক" হইয়া গিয়াছে। কাকের কানের চেয়ে রংটিই বেশি উপমাযোগ্য। যদিও একদেশে এক-নামের একাধিক রাজা থাকা মোটেই অসম্ভব নয় কিন্তু ডাঃ শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় মনে করেন যে বৃহদ্ধর্মপুরাণের কাককর্ণ ও ইতিহাসের কাকবর্ণ একই ব্যক্তি হইতে পারেন। অধ্যাপক কীথ সাহেব বলেন যে ঋগ্বেদের কীকটদেশ যদি সত্যই মগধ হয় তবে মগধের প্রতি বিদ্বেষ ঋগ্বৈদিক যুগেও আর্যদের মধ্যে প্রবল ছিল এবং ইহার কারণ খুব সম্ভব এই ছিল যে, এই দেশে অনার্য-প্রভাবের প্রাবল্য ছিল এবং বৈদিক আর্য এখানে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, যাহার ফলে পরবর্তী যুগে মগধ বৌদ্ধাদি অবৈদিক ও অব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান ক্ষেত্র হইয়াছিল। কেকয় ও কীকট এই দুই শব্দে কিছু ধ্বনিগত সাদৃশ্যও আছে। হয়তো কেকয়জাতি মগধে আসিয়া কীকট নাম পাইয়াছিল অথবা কীকটজাতি পঞ্জাবে গিয়া কেকয় নাম পাইয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে উত্তর-পশ্চিম হইতে বিজেতাদের পূর্ব-দিকে বিস্তৃতি যেমন, তেমনি মগধ হইতেও উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃতি বহুবার ঘটিয়াছে।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, আর্যরা ভারতে প্রবেশের সময়ে এবং তারপর অনেক-দিন পর্যন্ত যেসব ভারতবাসী সভ্যজাতির সঙ্গে আর্যদের সঙ্ঘর্ষের কথা ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় এবং যাহাদের আর্যরা অসুর দৈত্য দানব দস্যু দাস প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা বা তাহাদের কোন শাখা মোহেঞ্জোদড়ো ও হড়প্পা প্রভৃতি সিন্ধুনদ উপত্যকায় আবিষ্কৃত প্রাচীন সভ্যতার প্রবর্তক। পঞ্জাবের উত্তর ও পশ্চিমে অনেক দূর পর্যন্ত এই সভ্যতার আরও অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই প্রাগার্য প্রাচীন সভ্যতা একটি জাতি বা এক জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা বা বিভিন্ন জাতি দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল কিনা তাহা বলা যায় না, কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক তাহাকে সাধারণ-ভাবে "অসুর" নাম দিয়াছেন। কেহ বলেন, "অসুররা", অন্তত তাহাদের কোন কোন শাখা বোলান-গিরিবর্ত্ম-পথে, কেহ বলেন, সিন্ধুনদ-মোহানার পথে, কাহারও কাহারও মতে পূর্বাঞ্চল হইতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বিস্তৃত হয়। আর্যদের আক্রমণে পরাজিত হইয়া এই "অসুররা" উত্তর ও পশ্চিম হইতে হটিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে আশ্রয় ... করে। মগধ-রাজগৃহের রাজা জরাসন্ধ ও আসাম-প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত অসুরবংশীয় বলিয়া সুবিদিত ছিলেন। মগধের অতি প্রাচীন স্থান গয়াও গয়াসুর বা গজাসুরের পুরী বলিয়া খ্যাত ছিল। ভারতের প্রাগার্য দ্রাবিড় সভ্যতা সম্ভব এই অসুর সভ্যতার বংশধর।

অথর্ববেদে মগধবাসীদের ব্রাত্য অর্থাৎ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভূত বলা হইয়াছে। সামবেদীয় লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে মাগধব্রাহ্মণদের হীনব্রাহ্মণ ও ব্রাত্য বলা হইয়াছে। পরবর্তীকালের শাস্ত্রাদিতে মগধের লোককে বর্ণসংকরজাত একটি বিশিষ্ট জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌতমধর্মশাস্ত্র ও মনুসংহিতায় "মাগধ" অর্থে মগধদেশের অধিবাসীদের না বুঝাইয়া বৈশ্যাপিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান বুঝাইয়াছে এবং মনু-সংহিতায় মাগধদের বাণিজ্য ব্যবসায়ী ও গায়ক-কথকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে মাগধদের উচ্চ কণ্ঠস্বরের উল্লেখ আছে। শতপথব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যে, কোশল ও বিদেহে (অর্থাৎ উত্তর বিহারের পশ্চিম ও পূর্বাংশে প্রাচীকালে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপিত হয় নাই এবং মগধে তারও চেয়ে কম হইয়াছিল। শতপথব্রাহ্মণে আরও বর্ণিত আছে যে, পঞ্জাবের সরস্বতী নদী হইতে পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়া অগ্নি (আর্যদের উপাস্য দেবতা অর্থাৎ বৈদিক-ধর্ম ও বৈদিক প্রভাব) সদানীরানদী (আধুনিক রাপ্তিনদী, গণ্ডকনদের পশ্চিমে) পর্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং সদানীরার অপর পারে প্রাচীনকালে কোন ব্রাহ্মণ যাইতেন না। মহাভারতে সদানীরার পূর্ব-দেশভাগকে "জলোদ্ভব" বলা হইয়াছে অর্থাৎ এ অঞ্চল দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলের মত জলময় ছিল, নদীবহুল উত্তর বিহারের নিম্নভূমি তখনও কৃষিহীন ছিল। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় যে, সুগ্রীব সীতান্বেষণে বানর সেনাকে ভারতের সর্বদেশে এবং ভারতের বাহিরেও পাঠাইবার সময়ে মগধকে পূর্বদিকের, যেন ভারতের বাহিরে একটি দেশ বলা হইয়াছে। এই সবেতে মনে হয় যে অতি প্রাচীনকালে আর্য ব্রাহ্মণ সমাজ মগধকে যে হীনচক্ষে দেখিতেন তার কারণ মগধ তখনও আর্যাধিকারে আসে নাই এবং মগধের লোক সুসভ্য হইলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবাধীন হয় নাই। কিন্তু তথাপি মগধের সঙ্গে যাতায়াত ও বাণিজ্য সম্বন্ধ। ধর্মব্যবসায়ী পুরোহিতব্রাহ্মণরা বিদ্বেষের চোখে দেখিলেও সাধারণ লোকের মধ্যে মগধের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধও চলিত; বাণিজ্য সম্পর্কে মগধের ধনী লোক ভারতে আসিয়া ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিত। বাণিজ্য সমৃদ্ধি শিল্পকৌশল ও বিবিধ পণ্যদ্রব্যের জন্য মগধের খ্যাতি ছিল। রামায়ণে মগধকে অতি সুসভ্য দেশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কৈকেয়ীর ক্রোধশান্তির জন্য দশরথ তাঁহাকে মগধজাত শিল্পদ্রব্যাদি উপহার দিবার প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। কালক্রমে যখন মগধ কিছু পরিমাণে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের ও আর্যাধিকারের অধীন হয় তখন গয়া চ্যবনাশ্রম পুনপুনানদী রাজগৃহ প্রভৃতি স্থান ব্রাহ্মণদের কাছে ক্রমে "পুণ্য" বলিয়া বিবেচিত হইতে আরম্ভ করে।

জরাসন্ধের যুগে রাজগৃহ

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, কুরুর পুত্র ছিলেন সুধন্বা, সুধন্বার পর চতুর্থ রাজা বসু মগধ জয় করিয়া রাজধানী গিরিব্রজসহ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বৃহদ্রথকে দান করেন এবং বৃহদ্রথ সেখানে বার্হদ্রথ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। রামায়ণের আদিকাণ্ডে কিন্তু আছে যে, ব্রহ্মার চতুর্থ পুত্র বসু গিরিব্রজে রাজধানী স্থাপনা করিয়াছিলেন। বসু হইতে রামায়ণে গিরিব্রজের একটি নাম "বসুমতী" বলা হইয়াছে। বৃহদ্রথ-পুত্র জরাসন্ধের রাজধানী বলিয়া আর একটি নাম

"বার্হদ্রথপুর।" মৎস্যপুরাণে জরাসন্ধের বহু বংশধরদের নামের মধ্যে একজনের নাম কুশাগ্র এবং আর একজনের নাম বৃষভ; সম্ভব ইহা হইতেই গিরিব্রজের জৈনসাহিত্যোক্ত "কুশাগ্রপুর" ও "বৃষভপুর" নামদ্বয়ের উৎপত্তি হয়। হিউয়েন ৎসাং কুশাগ্রপুর বা কুশাগারপুর নামের ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন যে, রাজগৃহে উৎকৃষ্ট কুশ (সুগন্ধি ঘাস, খশ্-খশ্) জন্মে বলিয়া ঐ নামের উৎপত্তি হয়। এ ব্যাখ্যা পরবর্তীকালের বৌদ্ধদের কল্পনা-প্রসূত, যাঁহারা পৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ ধার ধারিতেন না; যদিও একথা সত্য যে, রাজগৃহ অঞ্চল উত্তম খশ্‌খশ্ ঘাসের জন্য প্রসিদ্ধ। টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে, রাজগৃহ মান্ধাতা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল; এই কিম্বদন্তীতে সূচনা করে যে, রাজগৃহের স্থাপনা অতি প্রাচীনকালে হইয়াছিল। বৌদ্ধরা বলেন যে, মহাগোবিন্দ নামক একজন স্থপতি রাজগৃহনগর নির্মাণ করেন। গিরিব্রজ নামের "ব্রজ" শব্দের অর্থ দুর্গ, গোচারণভূমি নয়। প্রাচীন সাহিত্যে গিরিব্রজকে সর্বত্র পর্বতবেষ্টিত সুরক্ষিত দুর্গস্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাভারতের বর্ণনায় আছে যে, গোরথগিরি হইতে মগধের রাজধানী দেখা যাইত। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয় ও জ্যাকসন সাহেব দেখাইয়াছেন যে, গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পাহাড়কে গোরথগিরি বলা হইত; ইহা পরে প্রবরগিরি নামে আখ্যাত হয় এবং প্রবর শব্দ হইতে বরাবর শব্দের উৎপত্তি হয়।

মহাভারতের সভাপর্বে আছে, জরাসন্ধ প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং আদিপর্বে বলা হইয়াছে, তিনি অসুররাজ বিপ্রচিত্তির অবতার ছিলেন; ইহাতে তাঁহার অনার্য "অসুর" জাতিত্ব সূচনা করে। বিপ্রচিত্তি ও জরাসন্ধ নাম সম্ভব অনার্য ভাষার শব্দের সংস্কৃতরূপ। জরা রাক্ষসী প্রভৃতির কাহিনী সম্ভব কাল্পনিক বা কোন "অসুর"-কিম্বদন্তীপ্রসূত। বিষ্ণুপুরাণে আছে জরাসন্ধ মথুরার রাজা কংসের সঙ্গে দুই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ কর্তৃক কংস-বধের পর কৃষ্ণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে জরাসন্ধ বিপুল সৈন্য সমভি-ব্যাহারে মথুরা আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। মহাভারত ও ব্রহ্মপুরাণে আছে যে, মথুরা আক্রমণের সময়ে জরাসন্ধ উত্তর ভারতের অনেক রাজাদের পরাজিত ও বন্দী করিয়া আনিয়া গিরিব্রজে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং শিবের কাছে ঐ রাজাদের বলি দিতেন। হরিবংশে আছে যে, মথুরা আক্রমণের সময়ে জরাসন্ধ কৃষ্ণভ্রাতা বলরামের রথের ঘোড়া মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহাভারত-শান্তিপর্বে আছে যে, কর্ণের শৌর্যখ্যাতি শুনিয়া জরাসন্ধ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও পরাজিত হন; কর্ণের বীরত্বে প্রীত হইয়া তিনি কর্ণকে মালিনীনগরীর রাজা করেন। জরাসন্ধ এত প্রতাপশালী ছিলেন যে, তাঁহাকে পরাস্ত না করিয়া যুধিষ্ঠির রাজ-সূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া একচ্ছত্রাধিপতা-লাভ করিতে পারেন নাই। মহাভারত ও ভাগবত পুরাণে আছে ভীম ও অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ গিরিব্রজে যান এবং সেখানে ভীম জরাসন্ধকে বধ করার পর কৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দীকৃত রাজাদের কারাগারমুক্ত করেন। বৌদ্ধরা বলিয়াছেন, বহু প্রাচীন কাল হইতে বহু রাজা এখানে রাজত্ব করায় রাজধানীর নাম [illegible] হয়, আবার পুরাণকাররা বলিয়াছেন যে, জরাসন্ধ বহু রাজাকে এখানে বন্দী করিয়া রাখায় গিরিব্রজের নাম রাজগৃহ হয়। এই দুই ব্যাখ্যাই অলীক; আসলে রাজগৃহ মানে রাজার বসতি [illegible] বা রাজধানী।

জরাসন্ধের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় আর্যবংশীয় রাজাদের বিরোধের কাহিনীতে প্রাচীন [illegible]গের আর্য-অসুর বিরোধের ছায়া পাওয়া যায়। অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঠিকই বলিয়া[illegible]লেন যে, মগধ বহুদিন পর্যন্ত আর্যাধিকার প্রতিরোধ করিয়াছিল এবং মগধের অসুর বিক্রমের সঙ্গে আর্যরা প্যারিয়া উঠেন নাই। জরাসন্ধের শিবপূজাও অর্থময়। শৈবধর্মের আরম্ভ যে অনার্য অসুরসভ্যতায় হইয়াছিল তাহা আজকাল ঐতিহাসিকগণের কাছে সুবিদিত। শ্রীযুক্ত রাখালদাস দেখাইয়াছেন যে, শিব বহুদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বীকৃত হন নাই এবং অনেক পরে ব্রাহ্মণ্য দেবসভায় গৃহীত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধ বধের পরও আর্যদের মগধজয় সম্পূর্ণ হয় নাই। মহাভারতের সভা-পর্বে আছে জরাসন্ধপুত্র সহদেব রাজস্ব না দেওয়ায় ভীম আবার গিরিব্রজে গিয়া সহদেবকে রাজস্ব দানে বাধ্য করেন এবং সহদেব পাণ্ডবদের সামন্তরাজারূপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে যোগ দেন। উদ্যোগপর্বে আছে জরাসন্ধের আর এক পুত্র ধৃষ্টকেতু কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সসৈন্যে পাণ্ডব-পক্ষে যোগ দেন; সহদেব সহজে পাণ্ডবদে[র] বশ্যতা স্বীকার না করিলেও ধৃষ্টকেতু হয়তে[া] নিজস্বার্থ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পাণ্ডবপক্ষী হইয়াছিলেন। অশ্বমেধপর্বে আবার দে[খা] যায় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠি[রে]র অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া যখন হস্তিনাপু[র] অভিমুখে যাইতেছিল তখন সহদেবের পু[ত্র] মেঘসন্ধি ঘোড়া আটকাইয়া অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হন। মগধে অসুররাজবংশ বার বার আর্যদের রাজ চক্রবর্তীত্বের বিরোধিতা করিতে পশ্চাদ্‌প[দ] হয় নাই।

বিম্বিসারের সময়ে রাজগৃহ

পৌরাণিক বর্ণনায় জরাসন্ধের শেষ বংশধ[র] রিপুঞ্জয়ের পর প্রদ্যোতবংশ মগধে[র] অধীশ্বর হন এবং প্রদ্যোতবংশের পর শিশু[-] নাগ রাজগৃ[হের] সিংহাসন অধিকার করেন। [illegible] বিম্বিসার শিশুনাগের বংশধ[র] ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ মহাবংসমতে শিশুনা[গ] বিম্বিসারের পরবর্তী যুগের রাজা। বিম্বিসারের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজ[-] গণের বংশ নাম পৌর্বাপর্য রাজত্বকা[ল] প্রভৃতি বিষয়ে পুরাণ ও মহাবংসমতে ঘো[র] বৈষম্য দেখা যায় এবং আধুনিক ঐতি[হা]সিকরাও এবিষয়ে সম্পূর্ণ একমত নহে[ন] কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক এখন মহা[-] বংসমতেই বেশি আস্থাবান। তাঁহাদের ম[তে] খৃঃ পূঃ ৬ শতকে বার্হদ্রথ বংশের রাজত্ব শে[ষ] হয়। [কা]শীরাজ্য তখন খুব প্রতাপশালী হয়তো অঙ্গদেশ (আধুনিক ভাগলপু[র] অঞ্চল) [প]র্যন্ত কিছুকালের জন্য কাশী রাজ্য বি[স্তৃ]তিলাভ করিয়াছিল। কাশী ব্রহ্মদত্তবংশীয় একজন অঙ্গাধিপতি হয়[তো] মগধও জয় করিয়াছিলেন কারণ বিধু[র] পণ্ডিতজাতকে রাজগৃহকে অঙ্গদেশের নগ[র] বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভট্টিয় নাম[ক] মগধের রাজার পুত্র বিম্বিসার ব্রহ্মদত্তবংশী অঙ্গরাজকে পরাজিত ও বধ করিয়া অঙ্গ দেশের রাজধানী চম্পানগরী অধিকার করি[য়া] সেখানে পিতার উপরাজা (Viceroy) রূপে বাস করেন এবং পিতার মৃত্যুর প[র] রাজগৃহে আসিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কবি অশ্বঘোষের বু[দ্ধ]চরিতকাব্যে বিম্বিসারকে হর্যংকবংশীয় ব[লা] হইয়াছে। বিম্বিসার নামের অর্থ ঠিক জা[না] যায় না; কেহ বলেন তাঁর মাতা রা[নী] বিম্বির নামানুসারে এই নাম হয়, কে[হ] বলেন তাঁর বর্ণ উৎকৃষ্ট সুবর্ণের মত ছি[ল]

ই তাঁহাকে বিম্বসার নাম দেওয়া হয়। নি শ্রেণীক বা শ্রেণ্য নামেও পরিচিত লেন; এই নামেরও অর্থ স্পষ্ট নয়, কেহ য়াছেন তিনি বহু সৈন্যের অধিপতি য়ায় ঐ নাম পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধদের ছে রাজগৃহ বিম্বিসারপুরী নামেও খ্যাত ল। বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে অঙ্গদেশ জয় ার সময়ে বিম্বিসারের বয়স ১৬ বছর ল।

বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বকালই জগৃহের চরমসমৃদ্ধির যুগ। বিম্বিসারের ত্বকালের প্রারম্ভে আধুনিক পাটনা জেলা আধুনিক গয়াজেলার উত্তরাংশ, এই গ ছিল মগধের সীমা। এই সময়ে প্রাচীন সমৃদ্ধ কাশীরাজ্য কোশলরাজ মহা-শল দ্বারা পরাজিত ও অধিকৃত হয় এবং রাজ্যও মগধের অঙ্গীভূত হয়। বুদ্ধিমান ম্বিসার নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য অন্য ক্তিশালী রাজাদের সঙ্গে মিত্রতা ও বাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তিনি শলরাজকন্যা কোশলাদেবীকে বিবাহ রেন এবং এই বিবাহে কোশলরাজ কন্যার নচূর্ণের (স্নানের সময়ে ব্যবহৃত গন্ধ াদির) ব্যয় নির্বাহের জন্য কাশীগ্রামের জস্ব যৌতুকস্বরূপ দান করেন। গান্ধার-জ পুক্কুসাতির সঙ্গে বিম্বিসারের পত্র হার ছিল এবং অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের ড়ার সময়ে প্রদ্যোতের অনুরোধে বিম্বি-র নিজ চিকিৎসক জীবককে প্রদ্যোতের কিৎসার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। পাঞ্জাবের দেশের রাজকন্যা ক্ষেমা, বৈশালী লিচ্ছবি-জবংশীয়া এক কন্যা এবং বিদেহাধিপতির ক কন্যাকেও বিম্বিসার বিবাহ করিয়া-লেন। বিভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত বিম্বি-রের আটটি পুত্রের নাম পাওয়া যায়, তার ধ্যে অজাতশত্রুই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। অজাত-রুর মাতা কে ছিলেন সে সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন থা উল্লিখিত আছে, কিন্তু সম্ভব কোশল-জকন্যাই তাঁর মাতা ছিলেন। বিম্বিসার জকার্যে সুনিপুণ ছিলেন। চুল্লবগ্গে ল্লিখিত আছে যে, তিনি মহামাত্র বা মন্ত্রী-র ও উচ্চরাজকর্মচারিদের কাজে তীক্ষ্ম ষ্টি রাখিতেন এবং যাহারা কার্যে সততা ও ক্ষতা দেখাইত তাহাদের পুরস্কার দিতেন বং অসাধু ও অক্ষমদের পদচ্যুত করিতেন। জ্যের গ্রামিকদের (গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের) ইয়া তাঁর একটা বড় রাজসভার কথা হাবগ্গে উল্লিখিত আছে।

বৌদ্ধ জৈন সাহিত্যের বর্ণনায় দেখা যায় সে যুগে রাজগৃহ বহু তরুপুষ্পশোভিত বহু অট্টালিকা-প্রাসাদ-সমন্বিত বহুজনপূর্ণ অতিসমৃদ্ধ নগর ছিল। অনেক ধনবান শ্রেষ্ঠী প্রভৃতির তোরণযুক্ত প্রাচীরবেষ্টিত গৃহাদি ছিল। রাজগৃহ ব্যবসাবাণিজ্যের বড় কেন্দ্র-স্থান ছিল। অনেক রাজগৃহবাসী বড় বড় ব্যবসায়ী বাণিজ্যোপলক্ষে সমুদ্রযাত্রা করিতেন এবং অনেক বিদেশী ব্যবসায়ীরা রাজগৃহে আসিতেন। নগরে অনেকপ্রকার উৎসব হইত এবং কোন কোন উৎসবে নগর দীপমালা-শোভিত হইত। কোন কোন উৎসবে লোকে বহু মদ্যপান ও মাংসভোজন করিত এবং নানাবিধ নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান হইত। এইরূপ মেলা বা উৎসবকে 'সমাজ' বলা হইত। একবার কয়েকজন বিদেশী বণিক পণ্যক্রয় করিতে রাজগৃহে আসিয়া নগর উৎসবমত্ত থাকায় কেনাকাটা কিছুই করিতে পারে নাই। এরূপ একটি উৎসবের নাম পালিতে 'গিরগ্গ-সমাজ' বলা হইয়াছে; গিরগ্গ শব্দে ... বুঝা হয়তো অসম্ভব নয়; এখনও কার্তিক-পূর্ণিমায় গিরিয়াক গ্রামে বড় মেলা বসে। বৈদিকব্রাহ্মণ্যধর্মবিদ্বেষী এবং অন্য নানা-বিধ ধর্ম ও দর্শনসম্বন্ধীয় স্বাধীন মতবাদ প্রচারের প্রধানক্ষেত্রও সে যুগে ছিল রাজ-গৃহ। মহাসকুলদায়ি নামক একজন পরি-ব্রাজক একবার বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন যে, মগধ ও অঙ্গদেশ বিবিধপ্রকার ধর্মমতে পরিপূর্ণ। মজ্ঝিমনিকায় ও মহাবগ্গে উল্লিখিত আছে যে, সম্বোধিলাভের পর বুদ্ধের মনে হইয়াছিল যে মগধে প্রচলিত বিবিধ দূষিত ধর্মমত ও আচারের সংস্কার-সাধনই তাঁহার প্রথম কর্তব্য।

প্রাচীরবেষ্টিত রাজগৃহ নগরের চার দিকে নদী বা পরিখা ছিল। নগরের প্রবেশদ্বার-গুলি সন্ধ্যার পর যখন বন্ধ করা হইত, তখন কাহাকেও, এমনকি রাজাকেও নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। বিম্বিসার একবার 'তপোদা' সরোবরে স্নান করিয়া ফিরিবার সময়ে নগরদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া 'বেণুবনে' রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। বুদ্ধ-ঘোষ প্রবেশদ্বারগুলির সংখ্যা ৬৪ ও রাজ-গৃহ-অধিবাসীদের সংখ্যা বহুকোটি বলিয়াছেন। ইহা অত্যুক্তি সন্দেহ নাই। নগরের উত্তর দ্বার হইতে যে রাস্তা বাহির হইয়াছিল তাহা নালন্দা পাটলিগ্রাম এবং গঙ্গার অপরপারে বৈশালী প্রভৃতির দিকে গিয়াছিল। পূর্বদিকের চম্পানগরী প্রভৃতি স্থানে যাইতেও এই পথে রাজগৃহ হইতে বাহির হইতে হইত। রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যে খানুমত ও অম্বলট্ঠিকা (আম্র-যষ্টিকা) নামে গ্রাম ছিল, ইহাই ছিল রাজ-গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম বিশ্রামস্থান। অম্বলট্ঠিকাতে বিম্বিসারের একটি 'আরাম' বা বাগানবাড়ি ছিল। বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে, রাজগৃহ 'অন্তোনগর' বা ভিতরের নগর এবং 'বহিনগর' বা বাহিরের নগর, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। গিরিমালাবেষ্টিত নগর সম্বন্ধেই একথা বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন কিনা তা ঠিক বলা যায় না। ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা মহাশয় বলেন যে, বুদ্ধঘোষ গিরিবেষ্টিত নগরকে 'অন্তোনগর' এবং তাহার বাহিরের শহরতলি অংশকে (যেমন উত্তরে বর্তমান New Fort অঞ্চল প্রভৃতি) 'বহিনগর' বলিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মনে করেন গিরিমালাবেষ্টিত নগরের দক্ষিণাংশে রাজপ্রাসাদাদি ছিল এবং উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশের মধ্যে প্রাচীর ছিল। সম্ভব ... প্রাসাদ-সমন্বিত ভাগকে বুদ্ধ-ঘোষ অন্তোনগর ও উত্তরাংশকে বহিনগর বলিয়াছেন। প্রাচীন নগর সম্পর্কে হিউয়েন ৎসাঙও কখন 'প্রাসাদনগর' কখনও বা 'গিরি-নগরের' উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই দুই নগরকেই এক মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। ডাঃ মজুমদার দেখাইয়াছেন যে, হিউয়েন ৎসাঙ প্রাসাদনগর বলিতে গিরি-বেষ্টিত প্রাচীন নগরের দক্ষিণাংশ এবং গিরি-নগর বলিতে ইহার উত্তরাংশ বুঝিয়াছিলেন। হিউয়েন ৎসাঙ শুনিয়াছিলেন যে, গিরি-মালাবেষ্টিত নগরের এখন যাহাকে Old Fort বলা হয়, নাম ছিল গিরিব্রজ এবং তাহার বাহিরে উত্তরদিকের নগরকে (এখন যাহাকে New Fort বলা হয়) রাজগৃহ বলা হইত। ফা হিয়েনও 'নূতন নগর' ও 'পুরাতন নগরের' কথা বলিয়াছেন এবং তিনি শুনিয়াছিলেন যে, 'নূতন নগর' (New Fort) অজাতশত্রুদ্বারা নির্মিত হইয়াছিল কিন্তু হিউয়েন ৎসাঙ শুনিয়াছিলেন যে, কেহ বলেন ইহা বিম্বিসার নির্মিত, কেহ বলেন ইহা অজাতশত্রু নির্মিত। ডাঃ লাহা বলেন 'নূতন' ও 'পুরাতন' নগর সম্বন্ধে এই যে সব জনশ্রুতি চীনা পরিব্রাজকরা শুনিয়াছিলেন তাহা ভ্রমপ্রসূত—পরবর্তী কালে পাটলিপুত্র প্রভৃতি স্থানে একাধিকবার রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় জনস্মৃতিতে এই ভ্রমের উৎপত্তি হয়, কারণ যেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত হইত রাজা সেখানে থাকিতেন বলিয়া তাহাই যেন 'নূতন'

রাজগৃহ অর্থাৎ রাজধানী হইয়া দাঁড়াইত। ডাঃ লাহার মতে New Fort অঞ্চল প্রাচীন রাজগৃহের সমসাময়িক শহরতলি অঞ্চল ছিল; ইহার পশ্চিমাংশের পাথরের গড়ের মত এলাকায় সম্ভব রাজপ্রাসাদাদি ছিল এবং পূর্বাংশে প্রাচীরবেষ্টিত সাধারণ বসতি ছিল। (২ মানচিত্র) কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে রাজগৃহের বর্ণনায় 'নূতন নগরের' অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং হিউয়েন ৎ সাঙ যেসব কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় বিম্বিসারের রাজত্বকালের শেষ দিকে অথবা অজাতশত্রুর সময়ে 'নূতন নগর' নির্মিত হয়। অগ্নিকাণ্ড বা মহামারীতে প্রাচীন নগর ছাড়িয়া হয়তো রাজা এখানে আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন অথবা উত্তরদিক হইতে বৈশালীর লিচ্ছবিদের আক্রমণ-প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজনে রাজা এখানে নূতন দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজগৃহের পাহাড়গুলি এখন [illegible] পরিচিত, যথা বিপুলগিরি রত্নগিরি ছঠাগিরি (অর্থাৎ ষষ্ঠাগিরি) শৈলগিরি উদয়গিরি সোনাগিরি ও বৈভারগিরি (১ মানচিত্র) তাহা জৈনদের দেওয়া। মহাভারতে এখানকার 'পাঁচ' পাহাড়ের নাম একবার বলা হইয়াছে বৈহার (ইহার বিশেষণরূপে 'বিপুলঃ শৈলঃ' কথা ব্যবহৃত হইয়াছে), বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও শুভচৈত্যকে এবং আর একবার বলা হইয়াছে পাণ্ডর, বিপুল, বরাহক, চৈত্যক ও মাতঙ্গ। বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাদের নাম পাণ্ডব, গিজ্ঝকূট (গৃধ্রকূট), বেভার (বৈভার), ইসিগিলি (ঋষিগিরি) ও বেপুল্ল (বিপুল)। ডাঃ লাহা সবিশেষ আলোচনা করিয়া সত্যই বলিয়াছেন যে, কিছু কিছু ঐক্য থাকিলেও এইসব বিভিন্ন নামে কাহারা কোন্ পাহাড় বুঝিতেন তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ। বিভিন্ন যুগে পাহাড়গুলির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বলিয়াছেন যে, হিউয়েন ৎসাঙ যে পাহাড়কে পি-পু-লো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আধুনিক বৈভারগিরি কিন্তু ডাঃ মজুমদার ঠিকই বলিয়াছেন যে, হিউয়েন ৎসাঙ ঐ নামে বিপুলগিরিকেই মনস্থ ' করিয়াছিলেন। বৈভার গিরিতে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে বৈভার বা বৈহার স্থলে, 'ব্যবহার গিরি' নামও পাওয়া গিয়াছে। এখন যে ছোট পাহাড়টিকে গৃধ্রকূট বলা হয়, ডাঃ লাহার মতে বৌদ্ধরা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর গিরিভাগকে (অর্থাৎ শৈলগিরি ও উদয়গিরিকেও) ঐ নাম দিতেন। বৌদ্ধদের ইসিগিলি=খুব সম্ভব আধুনিক সোনাগিরি। ডাঃ লাহার মতে বৌদ্ধদের পাণ্ডব=আধুনিক বিপুলগিরি এবং বৌদ্ধদের বেপুল্ল=আধুনিক রত্নগিরি+ছঠাগিরি।
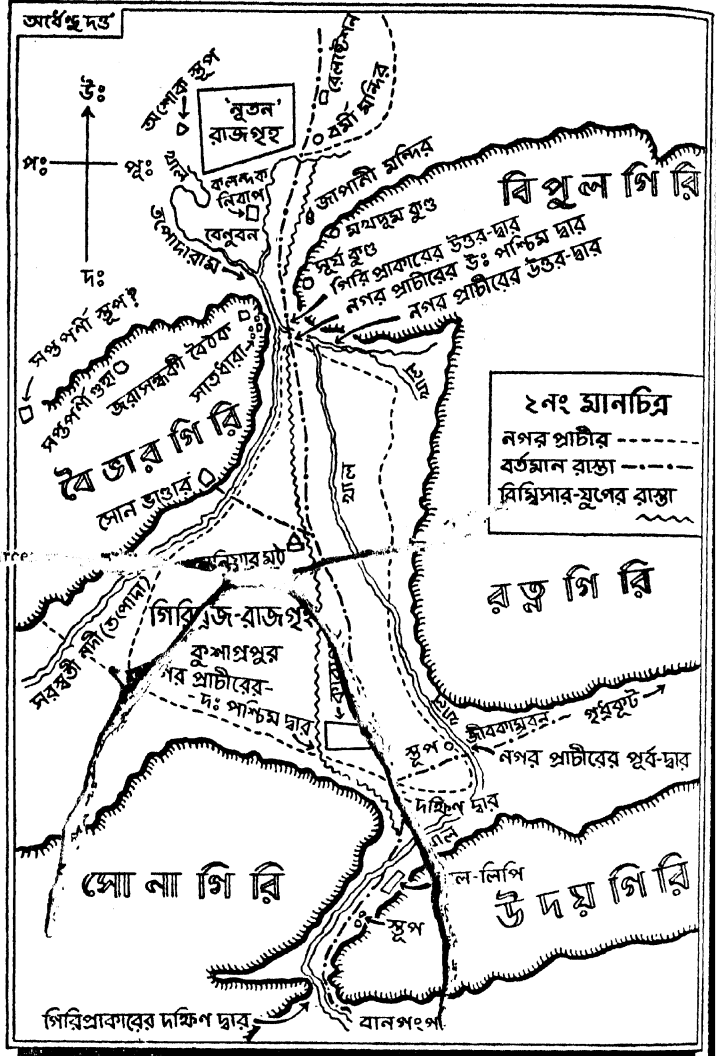
রাজগৃহের উষ্ণজল প্রস্রবণের উল্লেখ 'তপোদ' নামে মহাভারতে আছে। ব্রহ্মার তপস্যাপ্রসূত বলিয়া এই নামের উদ্ভব হয় এ ব্যাখ্যা বোধহয় ঠিক নয়। সম্ভব তপ্ত+উদ (বা উদক) হইতে এই নামের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে রাজগৃহের প্রধান জলস্রোতের নাম তপোদা; এই জল বাঁধিয়া একটি ছোট হ্রদ বা পুষ্করিণী প্রস্তুত হইয়াছিল, রাজা বিম্বিসার তাহাতে স্নান করিতেন। ইহার তীরে তপোদারাম নামে বিম্বিসারের একটি বাগান ছিল। বুদ্ধ ও সংঘের জীবনসম্পর্কে বৌদ্ধশাস্ত্রে রাজগৃহের অনেক স্থানের উল্লেখ আছে কিন্তু কোন্ স্থানটি কোথায় ছিল তাহা সব সময়ে ঠিক বুঝা যায় না। (ক্রমশ)

বেয়াক্কেলে মক্কেল

জগতে বলে আমার পরিচিত লোকের অভাব ঘটেনি কিন্তু বরাতগুণে দেখলুম আমার চেনা লোকদের মধ্যে শতকরা আশিজন বেয়াক্কেলের আক্কেল বলে পদার্থটা নেই। এ'দের নিয়ে দুঃখের সংসারে আমার যে কিভাবে কাটে তা শুনলে আপনারা বোধহয় কোঁকিয়ে কেঁদে উঠবেন। আহাম্মক অনেক দেখেছেন আপনারাও, কিন্তু বেয়াক্কেলদের নিয়ে আপনারা নিশ্চয় এত ভোগেননি। আমার দুর্দৈব এই যে, এ'রা চরকির মত অবিরত আমার চারপাশে বাঁইবাঁই করে ঘুরছেনই। এঁদের প্রতিজ্ঞা আমায় রাস্তায় ভাল করে চলতে দেবেন না, কোথাও সামাজিকতা রাখতে দেবেন না, নীরবে পাশ কাটিয়ে, দূর থেকে দূরে সরে থাকবো, তাও এ'রা সহ্য করতে পারবেন না।

রাস্তা দিয়ে চলেছি—ওপরের জানলা থেকে দিলেন জ্বলন্ত সিগারেটের এক টুকরো মাথায় ফেলে, নয় এক ধাবড়া পানের পিচ, নয় ছেলেপুলেদের যা-হোক কিছু। সর্বাঙ্গ পবিত্র হয়ে গেল। গালাগালি দিন—ওপর থেকে তিনিই ইঁট মারবেন আর পাড়ার লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবেন। প্রতিকার চুলোর দোরে যাক্, আমাদেরও একজন সমর্থক জুটবে না। স্বাধীন দেশের লোক, এ'দের কার্যকলাপের স্বাধীনতা খর্ব করবে কে?

শেষপর্যন্ত হবে— যাক্ মশাই অ্যাক্সিডেন্ট একটা হয়ে গেছে, তাতে অত মাথা গরম করবার কি আছে? বাড়িতে গিয়ে জামা কাপড়টা বদলে আসুন না—আপনি তো আর খুন হয়ে যাননি।

আচ্ছা এ শুনলে মাথা ঠান্ডা হয় কারুর? তখন মনে হয় না যে, মাথার চুলগুলো পট্‌পট্ করে ছিঁড়ে ফেলে সেইখানে লোকের মাথা খুঁড়ি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! যেহেতু সরকারী রাস্তা এবং আমার পিতৃদেব তো ওটা বাঁধিয়ে দিয়ে যাননি অতএব সব জিনিস সব্বার ঘাড়ে ফেলবার অধিকার তো নির্ঘাৎসিদ্ধ! কোন ভারী জিনিষ তো আর ফেলেনি? হাল্কা জিনিস, একটু রাস্তার কলে মাথা বাড়িয়ে ধুয়ে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল।

আচ্ছা, এইসব জ্যাঠামশাইদের আপনি কী যুক্তি দেখাবেন? মানে যাকে বলে একের নম্বরের মুখ্যু, এদের সঙ্গে সর্বদা মারামারি করে চলবার মত রেশনও যে পাই না—অতএব চুপ করে থাকাই প্রশস্ত! কিন্তু আর কত চুপ মেরে থাকবো?

ট্রামে, বাসে সিগারেট বিঁড়ি খাওয়া আইনতঃ না হলেও ভদ্রতার খাতিরে নিষিদ্ধ কিন্তু পাছে স্বাধীনতা [illegible] যায় —

বেয়াক্কেলে প্রদর্শনীর নিদর্শন

বাবুরা তা খাবেনই এবং কিছু বলবার উপায় নেই। তার ফলে আমার পাঞ্জাবিটার অবস্থাটা যা দাঁড়িয়েছে তা আর চোক চেয়ে দেখা যায় না। এবার নিখিল ভারত বেয়াক্কেলে প্রদর্শনী হলে টাঙিয়ে দিয়ে আসবো—দেখবেন, সর্বত্র একেবারে বসন্ত-মার্কা করে ছেড়ে দিয়েছে। গর্মীকালে লোকে ফুটো গেঞ্জি পরে আমাকে ফুটো পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াতে হয়। মনে করুন, রিপুর জায়গা নেই, ইয়া ইয়া সব গর্ত।

তার ওপর এসব যানবাহনে সুস্থির হয়ে যাবেন তারও উপায় নেই। ঠিক একটি পরিচিত ভদ্রলোক উঠলেন, মুখে একগাল হাসি আর তাঁর যত প্রাণের কথা, আপনার গোপন কথা সব সুরু হয়ে গেল। লোকের দম আটকে যাচ্ছে ভীড়ে, পাশের লোককে একটু ঘাড় ফিরিয়ে যে দেখবেন তারও উপায় নেই, ট্যারা চোখে দেখে নিতে হয়, সেই সময় বিনিয়ে বিনিয়ে তাঁর প্রশ্ন সুরু হল, তাঁকে গুষ্টির সংবাদ দিন।

এই যে বিরূপাক্ষবাবু যে, কোত্থেকে মশাই? ওঃ, সেদিন খুব একচোট নিয়েছেন, যা লিখেছেন মাইরি খুব সত্যি, সবেতেই ঝঞ্ঝাট কি বলুন? হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ করেই তারপর একচোট হাসি।

কথার জবাব হুঁ হাঁ করে সেরে দিলুম, তাতে [illegible] রেহাই আছে? —চললো। শুনলুম, আপনি নাকি কি একটা সিনেমায় ডিরেকসান দিচ্ছেন, হ'ল না বুঝি? তা খবরের কাগজে আজকাল যে লেখাগুলো ছাপাচ্ছেন ওরা কিছু দিচ্ছে টিচ্ছে? কত দেয়? আপনার আর কিছু বই বেরুলো নাকি? হ্যাঁ ভাল কথা, শুনলুম আপনাদের বড় সাহেব নাকি কি একটা ব্যাপারে আপনার চার টাকা ফাইন করে দিয়েছিল আপনি নাকি খুব ঠুকে দিয়েছেন? বেশ করেছেন। তারপর আপনার ছেলেটা তো ভাল ছিল শুনেছিলুম, কিন্তু সে এবার ম্যাট্রিকে গাড্ডু মারলে কেন বলুন দেখি? আর যা ইউনিভার্সিটির কান্ড হয়েছে, স্রেফ্ বজ্জাতি—আর কি! যাই হ'ক বড় মেয়েটাকে পাচার করতে পেরেছেন? আর সবার কি কচ্ছেন? অর্থাৎ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব খবর দাও, চীৎকার করে বাড়ির সাতগুষ্টির হিসেব বলতে থাক, আপিসের কেচ্ছা আওড়াও, ছেলে গাড্ডু মারলে কি লাড্ডু খেলে তার ফর্দ দিতে থাক আর ট্রামের লোক হাঁ করে তোমার চরিতামৃত পান করুক, হাঁড়ির খবর শুনতে থাকুক তাহলেই তাঁর তৃপ্তি হয়। উঃ! মনে হয় এক একসময় গালে ঠাস্ করে একটি থাপ্পড় বসিয়ে দিই, কিন্তু কাজে করে উঠতে পারি না—হাজার হ'ক হিতৈষী তো! আচ্ছা বলতে পারেন এদের আক্কেল কবে হবে?

যেখানে সেখানে স্থান অস্থান কিছু নেই এ'দের সব সংবাদ চাই। আবার এর ওপরও

একদল আছেন তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা হলে হয়। নিজে আলাপ জমিয়েও সুখ হল না আবার সঙ্গী পরিচিত কোন যাত্রী থাকলে চীৎকার করে পরিচয় দিতে হবে। এঁকে চেনেন তো? এঁরই নাম অমুক, ইনিই অমুক কার্য করেছেন, তমুক করেন ইত্যাদি। অর্থাৎ, ইনি প্রমাণ করতে চান যে, আমিও বড় কেউ কেটা নয়—এঁদের মত সব লোকের সঙ্গে আলাপ আছে—হুঁ হুঁ!

আচ্ছা, বুঝে বুঝে এই রকম লোকই আমার পরিচিত কেন বলতে পারেন? এ কী দুর্ভোগের ভোগ! সাধারণ সভ্যতা ভব্যতা-টুকুও জানে না, অথচ মরবার টাইম হয়ে এল? ছিঃ ছিঃ! এঁরা আবার রসিক হলে প্রাণ যায়! এঁদের রসিকতার ঠেলাতেই রাস্তায় কলার খোসায় আছাড় খেতে হয়, কাঁচের টুকরোয় পা ফুটো হয়ে যায়, এঁরাই অজান্তে পেছনের চেয়ার টেনে অপরকে ফেলে দিয়ে রসিকতা ও বুদ্ধির চরম দেখান, মেয়েদের ভীড়ের মাঝে পেয়ে ... নিজেদের গা টেপাটেপি করে হেসে আসর মাৎ করেন, কোন একটা ভাল জিনিস হচ্ছে অমনি পেছন থেকে বিদ্‌কুটে ফুট্‌ কাটেন, অপরে কথা বলছে অবিরত মাঝ পথে তাকে থামিয়ে দিয়ে ধাক্কা মেরে নিজের কথা শোনাবার জন্যে গাঁক গাঁক করে চেল্লাতে থাকেন, অসুবিধে হচ্ছে কথাবার্তা বলতে। তিনি সরে গেলে ভাল হয় বুঝেও সেখান থেকে নড়েন না ঠিক দাঁত বার করে বসে থাকেন, লোকে লেখা শুনতে রাজী নয় তবুও নিজের কেরামতি দেখাবার জন্যে তাকে ধরে বেঁধে লেখা শোনাতে বসেন, যে জিনিসের কিচ্ছু জানেন না তাই করতে গিয়ে একেবারে ন্যাজে গোবরে হয়ে কেলেঙ্কারী করেন, কোথাও যাবার ঠিক করে অপরকে তিথির কাকের মত অপেক্ষায় রেখে অপর জায়গায় সরে পড়েন, মদ্যপান করে সমাজে পাক্‌ মেরে মরাল্‌ কারেজ্‌ দেখান, যা নিজের নেই চাল দেখাতে তাই নালঝোল মেখে সবার কাছে খুব বড় করে জাহির করেন, বাপ খুড়োর কাঁধে মোট চাপিয়ে নিজেরা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে পাড়ায় প্রেস্টিজ বজায় রাখেন, পরিবারের বংশবৃদ্ধির ঠেলায় এনিমিয়া ধরে গেলেও সেনসাস্‌ ডিপার্ট-মেণ্টের কাজ একটু হাল্কা করার চেষ্টা করেন না, নিজেদের মুরোদে এক গাড়ী ইঁট কেনবার ক্ষমতা না থাকলেও মেয়ের বাপের গলায় রসুড়ি দিয়ে তেতলায় দুখানা ঘর তৈরীর পয়সা আদায় করে নেন, দেশের সব বেটা চোর বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ট্রামের দরজার সামনে ঝুলে টিকিটের ছ'টা পয়সা ফাঁকি দেওয়ার তালে দু'বেলা সাধুভাবে যাতায়াত করেন, অপরের রীতিমত ক্ষতি করে দেশের সবাই বজ্জাত এইটে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন—অতএব এদের আক্কেল বিধানের ব্যবস্থা কিভাবে হতে পারে বলতে পাবেন? ,

লোকে কথায় বলে, মানুষকে বুদ্ধি দেওয়া যায় কিন্তু আক্কেল দেওয়া যায় না, এর চেয়ে

প্যাণ্টের পট্‌কা নিক্ষেপ
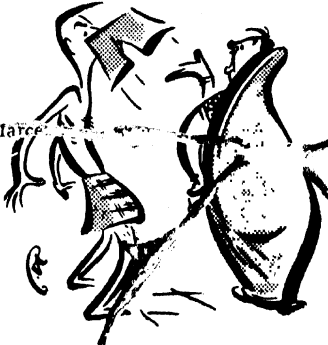
খাঁটি কথা আর বোধ হয় নেই। ভাল কথা বোঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। গাল দিলে এরা হাসে, হাসির দুটো কথা বললে ভুরু কুঁচকে এরা রাশভারি হয়ে বসে থাকে। কোন কথার মানে এরা বোঝে না।

মশাই, আমি মরছি নিজের জ্বালায়, দুঃখের কথাই সবার কাছে নিবেদন করি কিন্তু লোকের কাছে তার মানে হয় উল্টো। সেদিন এক পরিচিত লোকের বাড়ি গেছি তাঁদের মেয়ে মন্দ আমায় ধরে কি আব্‌দার জানালে জানেন? এই যে বিরূপাক্ষবাবু এসেছেন, আপনার একটা কমিক শোনান না?

বুঝুন! প্রাণ ফেটে চৌ-চাক্‌লা হয়ে যাচ্ছে, আমি আর্তনাদ করে মরছি আর এঁদের কাছে সেটা কমিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা'হলে এদের ওষুধ আপনি কিভাবে দেবেন? সেরকম ইন্‌জেক্‌সন বেরিয়েছে কি? যেখানে ভাল কথা বললে লোকে ঘুমোয়, বোদার মত কথা বললে কাঁদে, গাল দিলে বুঝতে না পেরে হাসে, খাঁটি কথা বললে কমিক কচ্ছে বলে—সেখানে করবেন কি?

আসলে আক্কেল বস্তুটাই দেশ থেকে লোপ পাচ্ছে। ঘরে বাইরে, কোথাও তাই শান্তি নেই। সমস্ত অবুঝের দল, আমি সেখানে গুঁজ গুঁজ করে কি করবো?

আমার যেসব জিনিস ব্যবহারের বা সখের, বন্ধুবান্ধবদের প্রত্যেকের তা দরকার। সত-রঞ্চি, তক্তাপোষ থেকে সুরু করে ছাতে ফুলের টবটি পর্যন্ত সবার প্রয়োজন। থার্মোমিটার পর্যন্ত আলমারিতে রাখবার জো নেই—পাশের বাড়ির ঘোষজা মশাই চেয়ে নিয়ে গেলেন। যেহেতু এঁরা আমার বন্ধু সেইহেতু অবিরত আমায় আক্কেল সেলামী দিয়ে দিয়ে চলতে হবে।

নিজের বাড়িতেও নিজের বলে কোন জিনিস ... । জুতো, জামা, ছাতা, গামছা, দোয়াত, কলম, কাগজ, পেন্সিল—সব্বার দরকার আমার ছাড়া। রেগে চীৎকার করেও আজও পর্যন্ত বাড়ির লোকের আক্কেল আর জাগ্রত করতে পারলুম না। এমন কি পুরোনো ছেঁড়া কাপড়গুলো পরে যে আপিস থেকে এসে একটু মাদুর বিছিয়ে নিশ্চন্তে গড়াবো তারও যো নেই—ন খানা কাপড় দিয়ে গিন্নী একটি মুড়ি খাবার কলাইয়ের ডিস্‌ সংগ্রহ করে বসে আছেন।

এই নিয়ে সেদিন কি অশান্তি!

বল্লুম, আচ্ছা, এই বাজারে তোমাদেরও কি একটু আক্কেল গজালোনা—ছেঁড়া দুখানা কাপড় পরে বাড়িতে বসে থাকতুম তাও সইলো না!

তিনি ফট্‌ করে পট্‌কার পুরোনো হাফ্‌ প্যাণ্টটা নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, এখন এইটে পরে বেড়াও না, পরে আর দুটো মোটা দেখে কিনও, অনেকদিন চলবে।

আচ্ছা, বলুন দেখি বুড়ো মন্দ—আমি এখন হাফ্‌ পেণ্ট্‌ পরে বাড়িতে বসে থাকবো?

সত্যি স্ত্রী পর্যন্ত এই রকম বেয়াক্কেলে হলে সুস্থ শরীরে সংসার ধর্ম করা যায়? —আপনারাই ধর্মতঃ বুকে হাত দিয়ে বলুন।

ইন্দ্রজিতের আসর

আমি মফঃস্বলের অধিবাসী। কাজেকর্মে কলকাতায় কখনো সখনো আসতে [illegible]; কিন্তু দু-চার দিনের বেশি আর থাকা [illegible] না। অনেকদিন পরে এবার গিয়ে তিন-[illegible] সপ্তাহ কাটিয়ে এলাম। ছাত্রজীবনে [কল]কাতার প্রতি যে মোহ ছিল, সে মোহ [এখ]নও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারি নি। [কল]কাতার বাইরে গিয়ে জীবন কাটাতে হবে [illegible] এককালে মনে মনে শিউরে উঠতুম। [প্রা]চীন রোম্যানরা রোম-এর বাইরের [জগ]ৎটাকে বর্বর জগৎ বলে মনে করত। [কল]কাতার বাইরের জগৎ সম্বন্ধে আমাদেরও [অ]রূপ ধারণা ছিল। জীবনে যা কিছু [illegible]ণীয় এবং উপভোগ্য তারই অপর নাম [illegible] কলকাতা। এইজন্যে [illegible] এতদূরেও [illegible] কিছুদিন কলকাতাকে প্রাণপণে আঁকড়ে [illegible] ছিলুম। কিন্তু জীবনযুদ্ধের তাড়নায় [illegible] পর্যন্ত কলকাতার বাইরে গিয়েই ছিটকে [illegible]তে হয়েছে। প্রথম প্রথম সে কি দুর্বার [illegible] শনি রোববার কলকাতায় চলে আসতাম, [শু]ধু চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়ার জন্য। [illegible]র নিয়ে আড্ডা জমত, একে একে তাঁরা কোথায় ছিটকে পড়েছেন। ক্রমে আমারও [illegible] এসেছে শিথিল হয়ে, কলকাতার [illegible] নিজের অজান্তে কখন আলগা হয়ে [illegible]।

[illegible] প্রায় উনিশ বছর কলকাতার বাইরে। [illegible] যে কলকাতা ছিল নিতান্ত আপন, [illegible]দিনের বিচ্ছেদে সে পর হয়ে গেছে। [illegible] তার মন পাওয়া ভার। কলকাতার [illegible] এখন অপরিচিতের দৃষ্টি। মনে ক্ষোভ [illegible] আবার কলকাতার ব্যবহারটা দেখে [illegible] পায়। মহানগরীর বয়স যত বাড়ছে [illegible] ঢংও তত বাড়ছে। নতুন নাগরদের [illegible] সে পুরোনো নাগরিকদের ভুলেছে। [illegible] দেহে প্রৌঢ়ত্বের স্থূলতা দেখা [illegible]। শ্রীবৃদ্ধি হয়নি, মেদ বৃদ্ধি হচ্ছে। [illegible] যার ছিল মোহিনী-মূর্তি, এখন [রা]ক্ষসী-মূর্তি।

[কলক]াতার হাল-চাল গেছে বদলে, এখন [illegible] সমান তালে পা ফেলে আর চলতে [illegible]। যানবাহনে চলতে গেলে জান নিয়ে [illegible]। দু' দিন কলকাতায় থাকলে তিন [illegible] ব্যথা থাকে। এবারের ধাক্কা [illegible] অনেকদিন যাবে। শুধু শরীরের ওপর দিয়ে নয়—মনের ওপর দিয়েও যথেষ্ট পীড়ন গিয়েছে।

অনেক আশা নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম কলকাতার সঙ্গে পরিচয়টা নতুন করে ঝালিয়ে নেব। লোকমুখে শুনেছি পুরোনো দিনের বন্ধুরা অনেকে আছেন কলকাতায়। ওঁদের নাম জানি তো ধাম জানিনে। এই জনারণ্যের মধ্যে কেমন করে ওঁদের খুঁজে বের করব? তবু পণ করেছিলুম অতীত জীবনের ভগ্নস্তূপ থেকে হারানো সম্পত্তি কিছু অন্তত [illegible] হবে। বন্ধুদের মধ্যে সবাই কিছু আমার মতো অকৃতী নয়। এক-আধটু খোঁড়াখুঁড়ি করলেই অপরিচিতের আস্তরণ ভেদ করে এঁরা বেরিয়ে পড়বেন।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। গত উনিশ বছর আমি আমার [সম]সাময়িকদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। ইদানীং যাঁরা আমার নিত্য-সহচর তাঁরা সবাই আমার চাইতে অন্যূন পনের বছরের ছোট। এঁদের সঙ্গে থেকে থেকে আমার স্বভাবটা তিরিশের কোঠা ছাড়িয়ে আর উঠতে পারছে না। হ য ব র ল'র সেই ক্ষ্যাপা লোকটার মতো আমার বয়স চল্লিশে পৌঁছে আবার কমতির দিকে চলেছে। অল্পবয়স্কদের সঙ্গে থেকে থেকে আমি সমবয়স্কদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাসই হারিয়ে ফেলেছি। আমার স্বভাব-চাপল্য দেখে সমবয়স্করা মনে মনে হাসেন।

কলকাতায় গিয়েছিলাম পুরোনো বন্ধুদের আবিষ্কার করতে, কিন্তু আবিষ্কার করলুম নিজেকে। সমসাময়িকের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখলুম। চিনতে পাচ্ছেন? মাথায় টাক; সামনের দুটি দাঁত পড়ে গিয়েছে—অধ্যাপক বন্ধু কয়েক মুহূর্তে অপরিচয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নাম বলতেই গদ-গদ হয়ে—বিলক্ষণ বিলক্ষণ; কিন্তু যাই বলুন, আপনার চেহারা বিষম বদলে গিয়েছে। নিশ্চয় ডিস্‌পেপসিয়ায় ভুগছেন? আমারও সেই 'ট্রাবল' কিনা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান। কেবল সেদ্ধ—আর কিছু না। বয়স হচ্ছে তো—কি বলেন? কত হ'ল আপনার? ইত্যাদি ইত্যাদি। সরকারী দপ্তরখানায় যে বন্ধুটির সঙ্গে দেখা, তিনি গৃহিণীর অসুস্থতানিবন্ধন যে বিষম বিভ্রাটে পড়েছেন, সে কথাই ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে লাগলেন। তার উপরে দেখুন না মেয়ের বিয়েটা ঘাড়ের উপর। ও হ্যাঁ, আপনাদের তো দেশ পূর্ববঙ্গে। তা বাড়ি-ঘর-দোরের কি অবস্থা, সব গেছে বুঝি? তা এদিকটায় জায়গা-জমি কিছু রেখেছেন? দেখুন তো কি মুশকিল।

পুরোনো বন্ধুদের আর বেশি ঘাঁটাবার সাহস হয়নি। উৎসাহ যেটুকু ছিল, এই দুই অভিজ্ঞতার পরে সবটুকু উবে গেল। আমিই ভুল করেছিলাম। মাটি খুঁড়ে অতীতের ভগ্ন[illegible] উদ্ধার করা যায়, কিন্তু সময়কে তো খুঁড়লে অতীত জীবনের আর সন্ধান মেলে না। যে জীবনকে পেছনে ফেলে এসেছি সে জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। এক দিক থেকে অবশ্য বলা যায়, যে বন্ধুদের খুঁজে বের করেছিলাম, তাঁরা পুরোনো বন্ধুত্বের ভগ্নাবশেষ মাত্র। অতীতের ভগ্নাবশেষ মিউজিয়মের সামগ্রী। আমার এই বন্ধুত্বের ভগ্নাবশেষ আমি কোন্ মিউজিয়মে রাখব?

অভিজ্ঞতাটা শোচনীয় হলেও কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হয়েছে। আমি ভুললে কি হবে, বয়স তো ভোলে না। আমারও যে মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চোখে চাল্‌শে, মুখে নকল দাঁত। আমি গোটা মানুষটাই নকল। অল্পবয়স্কের দলে ভিড়লে কি হবে আমি ঐ ওঁদেরই সগোত্র।

One equal temper of heroic heart
made weak by time and fate.

এককালে এঁরাই আমার সঙ্গে চায়ের দোকানে আড্ডা জমিয়েছেন। আমার চাইতেও বেপরোয়া ছিলেন কথায় এবং কাজে।

বেতার জগতে বানানের জুলুম

কয়েক সপ্তাহ আগে আমরা বেতার জগতে বানানের ব্যভিচার সম্বন্ধে আলোচনা করি। আশা করা গিয়েছিল, এই আলোচনায় হয়তো কিছু কাজ হবে।

বেতার-জগতে যে ধরণের বানান অনুসরণ করা হচ্ছে তা সমর্থনযোগ্য কি না এবং ব্যাকরণসিদ্ধ কি না—এই ছিল আমাদের প্রশ্ন। আমরা তখন ব্যাকরণের নিয়ম উদ্ধৃত করে দেখাতে পেরেছিলাম যে, গ্রীক জার্মান ইংরেজি হিব্রু বা বাঙলা—কোনো ব্যাকরণেই বেতার-জগতের বানানকে শুদ্ধ বলা হয় নি। এঁরা যে বানান অনুসরণ করছেন সে-বানান তাঁদের নিজেদের বানানো। হাসি পায়। বাঙলার বানান-সংস্কারের জন্যে যখন রাজশেখর বসু, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক ও ভাষা-বিদরা সচেষ্ট এবং একটা কিনারা খুঁজে হয়রান হচ্ছেন, তখন [illegible] জগতের মাইনে-করা এক [illegible] কেরাণক বানানের নিয়ম বা'র করে চলেছেন। মনে হয়, ঐরাবতেরা যখন এই বানান মহা-সমুদ্রের তল খুঁজছেন ও থৈ পাচ্ছেন না, তখন বেতারের কলমচি এসে বিজ্ঞের মত যেন জিজ্ঞাসা করছে, কত জল?

অন্যান্য বিষয় আমরা গতবার বিশেষ আলোচনা করি নি। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল বাঙলার ং-এর ব্যবহার নিয়ে। আমরা দেখলাম, বেতার-জগতের নতুন সংখ্যাতেও ং যথারীতি আছে। বিক্ষিপ্তভাবে ং-এর কথা বললে হয়তো বেখাপ্পা শোনাতে পারে, কিন্তু যাঁরা আমাদের গতবারের আলোচনা পাঠ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন। সরকারী দপ্তরের কর্মচারী মাত্রেই যে বানান নিয়ে ব্যভিচার করার পক্ষপাতী এমন কথা বলা যায় না। কেন না, আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারী দপ্তর থেকে এ-বিষয়ে আমরা চিঠি পেয়েছি; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাপাখানা থেকে প্রাপ্ত একটি পত্রও 'দেশ' পত্রিকার 'আলোচনা বিভাগে' প্রকাশও করা হয়েছে। তাঁরাও এই বানানের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়েই আমাদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন।

বাঙলা জানেন এবং বাঙলা শুদ্ধভাবে লিখতে পারেন, এমন লোকের অভাব বাঙলা দেশে এখনো হয় নি। এরূপ ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ অজ্ঞ ও আনাড়ির দ্বারা বাঙলা ভাষা প্রচারের ব্যবস্থা সরকারী উদ্যোগে করা হয়েছে কেন, এই আমাদের প্রশ্ন। হয়তো এর উত্তরে বলা হবে যে, উক্ত কর্মচারী যে বাঙলা জানে, তার প্রমাণ আছে—ডিগ্রী আছে। স্বীকার করা গেল, ডিগ্রী তার না হয় আছেই। কিন্তু ডিগ্রীটাই কি জ্ঞানের, সাধারণজ্ঞানের ও কাণ্ডজ্ঞানের মাপকাঠি? গত সপ্তাহের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙলার তরুণদের শোচনীয় দৈন্য' শীর্ষক যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার থেকেই তো স্পষ্ট জানা যাচ্ছে কেবল ডিগ্রী দিয়ে কিছু হয় না। সেই জন্যে আমরা বলব, ডিগ্রী দরকার হলেও সেই সঙ্গে যেন প্রার্থীকে বাজিয়েও নেওয়া হয়। অচল টাকা গড়িয়ে দিলেই চলে, কিন্তু সেই চলাটাই তো তার আসল চলা নয়। [illegible] জানতে হলে ঝুন দিয়ে নিতে হয়।

আমাদের মনে হয়, বেতার-জগত চালাবার জন্যে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের ঝুন দিয়ে বাজিয়ে দেখে নেওয়া হয় নি। পনর দিন অন্তর অতগুলো পাতা ভরতি যে ছাপার হরফ বার হচ্ছে, তার বেশীর ভাগই অনুষ্ঠানসূচী, বেতারে প্রচারিত কথা ও কথিকা; সামনের দু-এক পাতা হয়তো বেতারের নিযুক্ত সহকারী 'সম্পাদকের' রচনা। [illegible]ন অংশ, নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত-ভাবে বলা চলে, অপাঠ্য এবং এই অংশের মধ্যে তাঁর (বা তাঁদের) বিদ্যে জাহির করার চেষ্টা দেখা যায় এবং বানান নিয়ে ছেলেখেলার বহর ফুটে ওঠে। সহজ করে যে কথাটা বলা যায়, তা বলতে এঁরা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ওঠেন এবং অকারণে কবিত্ব করার চেষ্টা করেন। কিন্তু

> সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে,
> সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

আমরা একথা বুঝি। বুঝি বলেই আমাদের বলতে হচ্ছে যে, বেতারের কর্মচারীদের শ্রম স্বীকার করা দরকার। সহজ করে লিখবার জন্যে চেষ্টা ও যত্ন করা দরকার। দরকার বটে, কিন্তু সকলকে দিয়েই কি সব কাজ হয়?—

> যে পারে সে আপনি পারে,
> পারে সে ফুল ফোটাতে।

ফুল ফোটাবার জন্যে বৃন্তের ওপর মাথা কুটে কোনো কাজ হবে না।

আমরা আগেই বলেছি, বেতার-জগত বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছচ্ছে, অন্ততঃ কয়েক হাজার ঘরে। এই অকথ্য বাঙলা ও জঘন্য বানান নিয়ে তাকে এভাবে পৌঁছতে দেওয়া হচ্ছে কেন? এর জন্যে সরকারী নির্লিপ্ততা কতটা দায়ী, তার পরিমাপ করা দরকার। আমরা এমন নির্মম দাবী করি নে যে, এই সব অযোগ্যদের বরখাস্ত করা হোক; কিন্তু এ দাবী করবই যে, এদের যেন বরদাস্ত করা না হয়। সরকারের অধীনে হাজার রকমের দপ্তর আছে, অযোগ্যদের সে সব দপ্তরের মধ্যে এমন দপ্তরে চালান করা যেতে পারে, যেখানে এঁরা যোগ্যতা দেখাতে পারবেন। তা না হলে অনর্থক অর্থের অপচয়ই যে শুধু হয়, এমন নয়; এর দ্বারা দেশের ক্ষতিসাধন করা হয় অনেক। শিক্ষা-ক্ষেত্রে বাঙলার তরুণদের শোচনীয় দৈন্যের যে প্রসঙ্গ এর আগে উল্লেখ করেছি, তার জন্যেও কতক অংশে সরকারকে দায়ী হতে হয়। বেতার [illegible]কার মাধ্যম, বেতার-জগতও [illegible]টো বাহন। তাঁরা শিক্ষাবিস্তারের জন্যে যে ধরণের উদ্যোগ করেছেন, তাতে এর বেশি আর কি হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের জনকয়েক শিক্ষাবিদ্ কয়েকজন ডিগ্রীধারী চাকুরীপ্রার্থীকে প্রশ্ন ক'রে যে উত্তর পান, তার থেকেই তরুণদের শিক্ষার দৈন্য ধরা পড়ে—

প্রশ্ন। বিসমার্ক কে?
উত্তর। ডেনমার্কের রাজা।
প্রশ্ন। স্যার আশুতোষ কে ছিলেন?
উত্তর। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
প্রশ্ন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ কে ছিলেন?
উত্তর। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি।
প্রশ্ন। ডবলিউ সি ব্যানার্জি কে ছিলেন?
উত্তর। নিরুত্তর।

এসব গেল সাধারণজ্ঞানের প্রমাণ। অন্যান্য জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেও অনুরূপ উত্তরই পাওয়া যাবে।

এই সব কারণেই আমরা বলি যে, শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যাপারে লোক নিয়োগ করার সময় শৈথিল্য দেখালে পরিণাম শোচনীয়তর হয়ে উঠবেই। এর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বও অবশ্য কম নয়। কিন্তু আমাদের এ আলোচনা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে নিয়ে নয়, বেতার প্রতিষ্ঠান নিয়ে। এইজন্যে বেশি করে বেতার-জগতের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। বেতার প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃত একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করা হোক দাবী আমরা জানাচ্ছি।

বেতার-জগতে বানানের ব্যভিচার ম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য দেখে অনেকে বলে-ছেন, এ কাজ তো একা বেতার-জগতই রছে না, অমন বানান আরও অনেক কাগজ াপছে। আরও পাঁচটা কাগজ চালাচ্ছে লেই তা চালাতে হবে, এমন যুক্তি দেওয়া লে না। তাঁরা চালান, তাঁরা অন্যায় করেন। সই অন্যায় মেনে না নিয়ে, ন্যায়ের পথে তে চলা হয়—এই হল আমাদের প্রস্তাব। াছাড়া আরও একটা কথা হচ্ছে এই যে, নজের পাঁঠা তাঁরা ল্যাজেই কাটুন আর াড়েই কাটুন—আমরা বলার কে?—তাঁরা নজ নিজ ব্যয়ে হয়তো এক একটা পত্রিকা াপেন, তাতে যা-খুশি তাই করেন এবং া-খুশি তাই বলেন—এমন তো কত নাচারই চলেছে। সে অনাচারকে সরকারী-াবে সমর্থন করা যায় না। বেতার-জগৎ রকারী উদ্যোগে এবং ... ই অর্থে নয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে—দেশে শিক্ষা-বস্তার করাই বেতারের উদ্দেশ্য। হরি ধু যদু কি করল বা না করল, তার নুসরণ করে বেতারের চলা সাজে না। বাদপত্রে স্বাধীনতা সংকোচ করা নিয়ে নেক আলোচনা হয়ে গেছে। এই বাধীনতা সংকোচের দ্বারা দেশের কল্যা... তো হবে। হরি মধু যদুরা যথেচ্ছভাবে করে বেড়াচ্ছেন, এই আইনের দ্বারা তা রাধ করার ক্ষমতা গভর্নমেণ্ট পেলেন বলেই নে হয়। গভর্নমেণ্টের যদি এরকম লক্ষ্য কে থাকে তাহলে তাঁদের নিজেদের ত্তরের দিকেও নজর দিতে হবে। অশ্লীল াহিত্য এবং অনাচারী ও মিথ্যাভাষী সংবাদ-পত্র দেশের ক্ষতিসাধন অবশ্যই করে, সেই ঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষার াম করে অশিক্ষা যে ছড়ায় সেও কম অপরাধে অপরাধী নয়। কলকাতার বেতার-প্রতিষ্ঠান ও বেতার-জগৎ সেই অপরাধে অপরাধী। বেতার যদি তেমন সক্রিয় ও সক্ষম তে তাহলে এতদিনে দেশের লোকের মন থেকে অনেক কলুষ ধুয়ে যেত, অনেক শিক্ষায় তারা শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারত।

কিন্তু আগেই বলেছি—যা না হবার, তা বার জন্যে পণ্ডশ্রম করে লাভ নেই। বেতার-জগৎ আগে বানান সংশোধন করুন, শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে শিখুন—তারপর তাঁদের দিয়ে অন্য কাজ করাবার কথা ভেবে দেখা যাবে।

আলোচনা

ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার

মহাশয়,

ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার সম্বন্ধে শ্রীযুত রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ ও শ্রীযুত সুশীল রায়ের আলোচনা পাঠ করে আমরা বিশেষ প্রীত হয়েছি। বাঙলা ভাষায় জটিলতার অন্ত নেই, সেই জটিলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন রুচির দরুণ। যেহেতু বাঙলা বানানের কোনো পাকা নিয়ম নেই, সেইজন্যে যার যেমন খুশি তেমন নিয়ম খাড়া করে সেই স্ব-রচিত নিয়ম-মাফিক চলায় বাঙলা বানান ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠছে। এর হেতু হয়তো এই যে, বাঙলার কোনো আলাদা ব্যাকরণ নেই; বাঙলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা প্রভাবিত। এর ফলে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত নানারূপ বানান বাঙলায় ঢুকেছে। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, বাঙলার ব্যাকরণকারগণ বাঙলার জন্যে একেবারে পৃথক ব্যাকরণ প্রণয়ন করুন। শ ষ ও স—এর একটা রেখে দুটো বাদ দেওয়া ও ন ও ণ থেকে একটা বাদ দেওয়া উচিত। উকার ইকার একটা ক'রে রাখা এবং ওকার ঔকারের চিহ্ন বদল করাও সমীচীন। বাঙলার সাহিত্যিকদের উদ্যোগ দেখে আশান্বিত হয়েছি। [illegible] যেন এই মত চিন্তা ক'রে কিছু [illegible]র পথ সুগম করেন। —সুশান্ত হালদার, মালতী হালদার, দেরাদুন।

অসবর্ণ বিবাহ

সম্পাদক সমীপেষু,—

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখের দেশে প্রকাশিত শ্রীচুণীলাল রায়চৌধুরী মহাশয়ের "অসবর্ণ বিবাহ" নামক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনা করিতে চাই। প্রবন্ধটিতে শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার মহাশয় কি বলিতে চান স্পষ্ট করিয়া তাহা বলেন নাই,—একটি প্রশ্ন দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। তবে সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হয় প্রবন্ধকার মহাশয় বর্তমান হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন চাহেন, তবে তাহা অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ—প্রতিলোম নহে।

তিনি তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার আগে হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে বর্ণবিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি পুরাতন এবং বর্তমান হিন্দুসমাজে আর সেই বর্ণবিভাগ নাই। আজ বহু জাতি (ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কর্মকার, স্বর্ণকর্মকার, তাঁতী বাড়ুই, ধোপা, নাপিত ইত্যাদি) হিন্দুসমাজকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, অবশ্য প্রবন্ধকার একবার এই বর্ণসংকরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রবন্ধে তাঁহার যুক্তি আরোপের দিক হইতে তাহার কোনই প্রভাব নাই। তিনি যে বর্ণাশ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন সে বর্ণাশ্রমের বর্ণবিভাগের মান ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে আজ প্রায় সমস্ত হিন্দু পরিবারেই দুই তিন বর্ণের লোক বাস করিতেছেন। মোদ্দা কথা, আজ চতুর্বর্ণাশ্রমের হিন্দু সমাজ নাই, আজিকার হিন্দুসমাজ বহু জাতিতে বিভক্ত। প্রবন্ধকার তাঁহার বক্তব্যের যুক্তিস্বরূপ যে সকল শ্লোক ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সবই চতুর্বর্ণাশ্রমের হিন্দুসমাজের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত, বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে কোনরূপ ইঙ্গিত পর্যন্ত তাহাতে নাই এবং তাঁহার অনুলোম-বিবাহ প্রচলন ও প্রতিলোম বিবাহ বর্জনের যুক্তি পর্যন্ত ঐ সমাজের উপরই প্রযোজ্য।

সমাজ সংস্কারের দৃষ্টিতে বর্তমান সমাজকে দেখিলে দেখা যাইবে যে, বর্তমান হিন্দু সমাজকে ভাগ করা চলে একটিমাত্র মানদণ্ডের সাহায্যে —মানদণ্ডটি হইতেছে শিক্ষা ও সংস্কৃতি। সমগ্র হিন্দুসমাজ দুইভাগে বিভক্ত—'শিক্ষিত ও সংস্কৃত' এবং 'অশিক্ষিত ও অসংস্কৃত'। যতগুলি জাতি বর্তমান হিন্দু সমাজে আছে তাহার উঁচুনীচু (সামাজিক হিসাবে) সবগুলিই আজ দুইভাগে বিভক্ত। এমন অনেক পরিবার আছে যাহারা তথাকথিত নীচু জাতিভুক্ত হইয়াও তথাকথিত উঁচু জাতির অনেক পরিবার অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ও সংস্কৃত। কিন্তু বর্তমান হিন্দুসমাজে এই তথাকথিত উঁচুনীচু জাতিতে বিবাহ প্রচলন নাই। মাঝে মাঝে দুই চারিটা ঘটনা [illegible] ঐরূপ অসবর্ণ বিবাহ হইলে কোনদিক দিয়াই কোন ক্ষতি হয় না। বর্তমান সমাজে "অনুলোম বিবাহ" বলিতে বুঝায় তথাকথিত উঁচু জাতি ছেলের সহিত তথাকথিত নীচু জাতির মেয়ের বিবাহ এবং "প্রতিলোম বিবাহ" তাহার বিপরীত।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবন্ধকার "অনুলোম অসবর্ণ" বিবাহ সমর্থন করেন এবং প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ অসমর্থন করেন; এমনকি তিনি বলিয়াছেন, "সর্বনাশকারী প্রতিলোম আকাঙ্ক্ষা হীনপ্রেস্থ যৌন আবেদন দিকে দিকে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে।" প্রতিলোম বিবাহের দোষ নিরূপণের জন্য গোড়ার দিকেই বলিয়াছেন, "প্রতিলোম পথে অবাধ্য, বিকৃত, অসংযত বৃত্তির আধিক্যবশতঃ মানুষ কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া থাকে।" কথাটি প্রবন্ধকারের নিজের নহে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উদ্ধৃতি। তাঁহার নিজের কথা, "নিম্নবর্ণের নারীর উচ্চবর্ণের পুরুষের প্রতি স্বাভাবিক একটা শ্রদ্ধার ভাব বজায় থাকে এবং এই শ্রদ্ধাই তাহাকে সুসন্তানের জননী হইবার গৌরবদান করে। নারী-পুরুষকে যেইভাবে উদ্দীপিত করে তেমনতর ভাব লইয়াই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এইজন্যই সংহিতাকারগণ সমাজকে পুষ্ট ও শক্তিশালী রাখিবার জন্য অনুলোম বিবাহের প্রচলন আবশ্যক বলিয়া বিধান দিয়া গিয়াছেন। আবার ঠিক তাহার বিপরীত প্রতিলোম বিবাহকে পরিহার্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন।" স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রবন্ধকার মনে করেন উচ্চবর্ণের নারী নিম্নবর্ণের পুরুষকে শ্রদ্ধা করিতে পারে না। একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা বর্তমান সমাজে প্রযোজ্য নহে।

ইহা অবশ্য সত্য স্বামী যদি স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর গুণী জ্ঞানী না হন, তবে স্ত্রীর পক্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা রাখা কঠিন ব্যাপার এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে না—স্ত্রীর একটু দম্ভ থাকিয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সমাজে বর্ণ বা জাতি দিয়া নারী পুরুষের গুণাগুণ বিচার চলে না—চলিতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম যে, যদি কোন পুরুষ তথাকথিত নীচু জাতিসম্ভূত হন, কিন্তু বহুবিধ গুণ ও শিক্ষায় ভূষিত হন এবং তথাকথিত উচ্চজাতিসম্ভূতা নারী যদি ঐ পুরুষ অপেক্ষা কম গুণ বা শিক্ষামণ্ডিতা হন তবে ঐ পুরুষের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। প্রশ্ন উঠিতে পারে, Heridity বা বংশানুক্রমিক গুণাগুণ লইয়া যিনি উপরিউক্ত পুরুষের পরিবার তিন পুরুষ বা পাঁচ পুরুষ ধরিয়া উচ্চশিক্ষা পাইয়া থাকে এবং ঐ নারীর পরিবারও যদি সেইরূপ হয় তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে কি? বর্তমান হিন্দুসমাজকে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দিক দিয়া অনেক তথাকথিত উঁচু জাতির পরিবার এবং তথাকথিত নীচু জাতির পরিবার একই পর্যায়ে পড়ে। ঐরূপ দুই পরিবারের মধ্যে যদি নীচু জাতির কোন পুরুষ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন এবং উচ্চ জাতির কোন নারী তদপেক্ষা অল্প শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই নারীর মধ্যে ঐ পুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধার লেশমাত্র [illegible]তে পারে না। অতএব ঐ [illegible]বারা সামাজিক অনিষ্ট হইবার কোন আশংকা নাই। তাই বলিতেছিলাম, বর্তমান সমাজে প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ মাত্রই সর্বনাশকারী নহে বরং কখনও কখনও মঙ্গলকারী; অতএব ঐরূপ বিবাহ প্রচলিত হইতে বাধা থাকা উচিত নহে। ইতি, ভবদীয়—শ্রীপ্রিয়দর্শন সেন-শর্মা, কলিকাতা।

বিনয় নিবেদন,—

আপনার বিখ্যাত পত্রিকার শনিবার ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অষ্টাদশ বর্ষ, ২৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীচুণীলাল রায়চৌধুরীর 'অসবর্ণ বিবাহ' প্রবন্ধে লেখক অনুলোম অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন ও তার বিস্তৃতির আবেদন জানিয়েছেন। প্রবন্ধে নিম্নবর্ণের নারীর সঙ্গে উচ্চবর্ণের পুরুষের মিলনকে অনুলোম বিবাহ বলে কথিত হয়েছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য আছে। এই মিলনসঞ্জাত সন্তান নিশ্চয়ই উচ্চবর্ণের অন্তর্গত হবে। যদি সেই সন্তান কন্যা হয়, তবে তার বিবাহ অবশ্যই হতে হবে উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে। নইলে তা গিয়ে পড়বে 'পরিহার্য' প্রতিলোমের পর্যায়ে। কেননা, উচ্চবর্ণের কন্যার সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহের নাম প্রতিলোম বিবাহ এবং তা প্রবন্ধকারের মতে অসিদ্ধ ও অন্যায়। সুতরাং এই প্রশ্ন স্বতই উঠতে পারে যে, প্রবন্ধকার কেবল অনুলোম বিবাহকে সমর্থন করে কি পরোক্ষভাবে অসবর্ণ বিবাহ বিস্তৃতির ছেদই সূচিত করেন নি?

বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির উন্নতিও যদি কাম্য হয় তবে নর-নারীর মিলনের পথে উপসর্গ কণ্টকিত কোনরূপ বাধানিষেধের গণ্ডী না থাকাই উচিত। গুণ ও মনের কথাই যেখানে প্রধান, সেখানে সমাজ, সংস্কার বা শাস্ত্রের কোন কৈফিয়ৎই গ্রাহ্য নয়। এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, যুগের দাবী ও প্রয়োজন অনুসারে সর্বকিছু গঠিত হতে বাধ্য। ভবদীয়—শ্রীশশিভূষণ মণ্ডল, কলিকাতা।

ইনজেকশন দেওয়ার আর এক অর্থ সূঁচ ফোটান। কথাটি শুনতে খুব সামান্য মনে হ'লেও তবুও ইনজেকশন দেওয়ার নামে একটুও অস্বস্তি বোধ করেন না এমন লোক খুব কমই আছেন। ছোট ছোট ছেলেরা তো রীতিমত ভয় পেয়ে যায় ডাক্তারবাবুর সূঁচ খুললেই। অবশ্য এবার আর ইনজেকশনের ভয়ে সন্ত্রস্ত হতে হবে না। এক ধরণের হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বার হয়েছে, যাতে করে ইনজেকশন দিলে শুধু যে ব্যথা লাগে তা নয়, একটুও অনুভব করা যায় না। ইনজেকশনের এই নতুন সূঁচটির নাম "হাইপো স্প্রে জেট ইনজেকটর"। এটি প্রায় দশ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এতদিন একে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। এই সূঁচে এমন একটা বন্দোবস্ত আছে যে, সূঁচ ফুটিয়ে শরীরের যতটা গভীরে ওষুধটা প্রবেশ করান হয় তার আগে খানিকটা চাপা বাতাস খুব তাড়াতাড়ি চামড়ার নীচে বা পেশীতে দিয়ে দেওয়া হয়, ফলে ওষুধটা শরীরের মধ্যে গেলে যে ব্যথা পাওয়া যায়, সেটা আর অনুভব করা যায় না। সাধারণ ইনজেকশনের সূঁচের চেয়ে এই সূঁচ প্রায় বাইশ গুণ সরু। সেই জন্য এই ছোট্ট সূঁচটি ফোটানোর ফলে শরীরের টিস্যুগুলি খুব সামান্যই জখম হয়। তবে এই সূঁচের জন্য সাধারণ ভাবে ওষুধ চলবে না। এর জন্য নতুন ধরণের ক্যাপসুলে ভরা ওষুধের দরকার। এই নতুন ক্যাপসুল এবং নতুন সূঁচের সুবিধে এই যে, একটা ওষুধ ইনজেকশন করার পর আর একটা ওষুধ ইনজেকশন করার জন্য আর সিরিঞ্জ ধুতে হবে না।

*

যখন খুব বেশী গরম পড়ে তখন পাখা চালিয়ে দিলেও আরাম পাওয়া যায় না; কারণ পাখার হাওয়ায় চতুর্দিকের গরম হাওয়া দূর করা যায় না। তবে ঘরের গরম হাওয়া টেনে বার করে দেওয়ার একরকম পাখাও আছে। ফলে পাখা না চালিয়েই ঘর ঠাণ্ডা রাখা যায়। বর্তমানে ঘর ঠাণ্ডা রাখার এর চেয়েও ভাল ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। একরকম পাখা বার হয়েছে যেটি একাধারে দু'রকম কাজ করে। এই পাখা ঘরের গরম হাওয়া টেনে বার করে আর দরকার হলে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে নিয়ে আসে।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

এই পাখাটির মজা এই যে, একবার চালিয়ে দিলে প্রয়োজনমত নিজেই কাজের গতিবিধি বদল করে। রাতে পাখা চালিয়ে শুলে ঘর থেকে গরম হাওয়া বার করে দিয়ে প্রয়োজন হলে আবার বাইরের দিকে ঘুরে গিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে নিয়ে আসে এইভাবে ঘরের আবহাওয়া একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছালে পাখাটি বন্ধ হয়ে যায়। আবার ঘরের আবহাওয়া গরম হলে পাখাটি নিজেই চলতে আরম্ভ করে। পাখাটির গতি নির্ধারণের জন্য রেগুলেটরের ব্যবস্থাও আছে।

*

প্রায় দেড়শত বছর আগে "টিটানিউম" ধাতু আবিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু ১৯১০ সালের আগে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি। মাত্র ক'এক বছর আগে এই ধাতুর যথাযোগ্য ব্যবহার এবং উপকারিতার বিষয় জানা গিয়েছে। "টিটানিউম" ধাতুটি লোহার চেয়ে হালকা আর এলুমিনিয়মের চেয়েও শক্ত এবং ইস্পাতের চেয়ে কম ক্ষয় হয়। মাটির মধ্যে যে সব ধাতু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তার মধ্যে 'টিটানিউম' চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এই ধাতুকে ভালভাবে পরিষ্কার করাই বর্তমানের সমস্যা। তবে খুব শীঘ্রই এই সমস্যা দূরীভূত হবে এবং এই ধাতু মানুষের ব্যবহার্য হবে। 'টিটানিউম' ধাতুতে মরচে ধরে না বলে এই দিয়ে জাহাজের হাল আর জল কাটবার চাকাটি তৈরী হয়। এলুমিনিয়ম গলাবার জন্য যতটা পরিমাণ তাপের দরকার টিটানিউম গলাতে তার দ্বিগুণ তাপের প্রয়োজন। এইজন্য ইঞ্জিনের যে অংশগুলি খুব বেশী তাপের সংস্পর্শে আসে, সেইগুলি টিটানিউম দিয়ে তৈরী হয়।

*

মানুষের অনেক নেশার মধ্যে মাছ-ধরাও এক শ্রেণীর নেশা। রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে মানুষ ছিপ হাতে জলের ধারে বসে পূর্ণোদ্যমে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারে। অনেক মানুষ জলের ধারে না বসে নৌকায় করে জলের বুকে ভেসে ভেসে মাছ ধরে। এইজন্য দরকার হলে লোকে ছিপ-বঁড়শীর সঙ্গে ঘাড়ে করে নৌকা বয়ে নিয়ে যায়। অবশ্য আস্ত একখানা নৌকা ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া খুব সোজা নয়। তবে একরকম ভাঁজ করা নৌকা বার হয়েছে যার ওজন মাত্র তের সের আর ভাঁজ খুলে মেলে ধরলে নৌকাখানি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৬×৪ ফিট। খুব হালকা এলুমিনিয়মের নল দিয়ে এর কাঠামো তৈরী হয়েছে, তার ওপরে ওয়াটার-প্রুফ কাপড় দিয়ে খোলটা তৈরী হয়। নৌকার মধ্যে একখানা ভাঁজ-করা চেয়ারও থাকে।

পিঠে বাঁধা ভাঁজ করা নৌকাখানি খুলে জলের ওপর মাছ ধরা হচ্ছে

(১) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-তীর্থ বা শ্রীপাঠ-বিবরণী, (২) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন, প্রথম ও (৩) দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহরিদাস দাস। হরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে—৩, ৭, এবং ৫, টাকা।

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ব্যক্তি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যময় জীবন গ্রহণ করিবার পর হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গোস্বামীগণের অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর আহরণ, সঙ্কলন এবং প্রকাশ করিবার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ নামে বৈষ্ণব গোস্বামীগণের বহু দুর্লভ গ্রন্থরাজী এই অকিঞ্চন বৈষ্ণবের অসামান্য অধ্যবসায়ের ফলে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ-সংস্কৃতির সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ তিনখানার প্রথমখানিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ও ভক্ত মহাত্মাদের লীলাস্মৃতি-বিজড়িত স্থানসমূহের বিবরণ এবং সেগুলির ভৌগোলিক নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুত এইসব বৈষ্ণব-তীর্থের স্থান নির্ণয় করা সহজ নয়; বহু স্থান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেশের সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে এই সব ভক্ত এবং সাধকদের স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া [illegible] গঠিত হইয়াছে, তাহার ইতিকথা জানা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে এইসব মহাত্মা এবং সাধকদের চিন্তা এবং ভাব-সম্পদকে সম্বল করিয়াই জাতির সংস্কৃতি পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়া থাকে। জাতির ইতিহাস বলিতে প্রধানত ইঁহাদের ইতিহাসই বুঝায়। রাজা-রাজড়ার ঐশ্বর্যময় জীবনের যত আড়ম্বর কিংবা বিভিন্ন রাজবংশের বৈপ্লবিক উত্থান-পতন ইঁহাদেরই সাধনা-প্রবাহ প্রাণস্রোতের বুকে বুদ্বুদ-বিকাশ মাত্র। গ্রন্থ কয়েক খানির গুরুত্ব এই দিক হইতে বিশেষভাবে রহিয়াছে। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দ ভাষ্য-প্রণেতা গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসরের পার্ষদ, প্রাচীন কবি ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং দ্বিতীয় খণ্ডে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সাধক ও ভক্তদের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত বহু অনুসন্ধানের ফলে গ্রন্থকার এতৎ-সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এগুলির যথাযোগ্য পরিবেশনেও তাঁহার প্রভূত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বস্বত্যাগী সাধু-মহাত্মাদের পুণ্য জীবনী পাঠে চিত্ত সমুন্নত হয় এবং মানবতার পরম মাধুর্যে মন-প্রাণ আপ্লুত হইয়া পড়ে। বাস্তবিকপক্ষে ইঁহাদের জীবন আত্ম-মহিমায় যেন এক একটি অনির্বাণ উৎস। মানুষ যে কত বড় অবস্থা লাভ করিতে পারে, এইসব মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনায় আমরা তাহা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই: অধিকন্তু ভগবৎ-তত্ত্ব আমাদের দৃষ্টিতে প্রেমের অদীন-লীলায় পরিস্ফুর্ত হইয়া উঠে। সমগ্রভাবে দেশকে জানিবার চিনিবার এবং দেশের সংস্কৃতিকে দরদ দিয়া উপলব্ধি করিবার পক্ষে এইরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন বহু দিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। প্রচেষ্টা ইতঃপূর্বে কিছু কিছু না হইয়াছে, এমন নয়; কিন্তু বিভিন্ন সাময়িকপত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সেইসব উপাদান নিহিত ছিল। গ্রন্থকার তৎসমুদয় সঙ্কলিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া বাঙলার একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন। এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদভাজন। ছাপা ও কাগজ সুন্দর; কাগজের এই অভাবের দিনে ইহা কম প্রশংসার বিষয় নয়। বাঙলার এবং চিন্তাশীল সমাজে এই গ্রন্থরাজি সর্বত্র সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

গীতায় স্বরাজ—শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, মূল, সরল বঙ্গানুবাদ ও অভিনব ব্যাখ্যা সমন্বিত। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী প্রণীত। [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা [illegible] হইতে প্রকাশিত।

"জেলে ত্রিশ বছর"-এর লেখক বাঙলার বিপ্লব-যুগের অন্যতম কর্মবীর শ্রীযুত ত্রৈলোক্য-নাথ চক্রবর্তী বাঙালী-সমাজে সুপরিচিত। ত্রৈলোক্য মহারাজের ব্যাখ্যাত গীতার এই সংস্করণটি পাইয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। কারাগারে গীতার এই টীকা লিখিত হয়। দেশ তখন পরাধীন ছিল। বাঙলার বিপ্লব-যুগে নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে স্বদেশপ্রেমিক সাধকের অন্তরে একদিন গীতার উদার তত্ত্বদর্শ অগ্নিময় বীর্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বাঙলার তরুণ দল সেদিন আগুনের খেলায় মাতিয়া উঠিয়া অঘটন ঘটাইতে থাকে। দ্বীপান্তরের অন্ধকার কারাকক্ষে দেবতার বাণী সেদিন তাহাদের অন্তরে অমৃতত্বের মহিমা বিস্তার করিয়াছিল। ফাঁসি কাঠে চাঁড়য়া তাহারা মৃত্যুর জয়গান গাহিয়াছিল। ত্রৈলোক্য মহারাজ আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, "জাতির হৃদয় স্পর্শ করিতে হইলে গীতার নিষ্কাম কর্মী হওয়া চাই। এখানে স্বার্থবুদ্ধি চলিবে না। স্বজন-পোষণ-নীতি চলিবে না। মনে করিতে হইবে প্রত্যেক নরনারী আমার আপন-জন, তাহাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমার ভোগ-বিলাসিতায় কোন অধিকার নাই। বিপ্লব যুগে আমরা গীতার এমন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। এখন স্বাধীনতা লাভের পর প্রয়োজন এক দল নিষ্কাম কর্মীর, যাহারা গীতার আদর্শে জাতি গড়িয়া তুলিবে।" "গীতায় স্বরাজ" নিষ্কাম কর্মের এই মহান্ আদর্শ জাতির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। ত্রৈলোক্য মহারাজের গীতাব্যাখ্যার বিশেষত্ব এই যে, মূলকে সোজাভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ ব্যাখ্যায় কষ্ট কল্পনার কোন অবসর নাই কিম্বা বিশেষ কোন মতবাদ আরোপ করিবার প্রয়াস ইহাতে পরিলক্ষিত হয় না। দার্শনিক পারিভাষিক পাণ্ডিত্যের বিচারে এবং বিস্তারে প্রতি শব্দের ধাতুগত প্রত্যয় ভাঙিয়া যৌগিক, যোগারূঢ় কিংবা রূঢ় অর্থের পাকে ফেলিয়া এই ব্যাখ্যা মনকে পরিশ্রান্ত করে না। হিংসা এবং অহিংসার ঊর্ধ্বে মানুষের জীবন এবং তাহার সংস্থিতির মূলে যে শাশ্বত ও সার্বভৌম সত্য রহিয়াছে, গ্রন্থকার সেই সত্যকে সহজভাবে সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছেন। নিষ্কাম কর্ম সাধনার পথে গীতার দেবতা মানুষকে অমরত্বে অব্যয় মহিমায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং অন্যায়ের প্রতিরোধে মানুষের এই মহিমাকে মর্যাদা দানের মধ্যেই গীতায় মানব-ধর্মের পরম প্রতিষ্ঠা নির্দেশিত হইয়াছে এবং যাহা ইহার বিরোধী তাহা গীতায় অধর্ম বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই দিক হইতে গীতা নির্দেশের সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি জাতিকে কর্ম বুদ্ধিতে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] বুঝিতে [illegible] পাইতে হয় না। ফলত গীতার উপদেশের অন্তর্নিহিত আদর্শটি এ ব্যাখ্যা সকলের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে এবং প্রা[illegible] বলিষ্ঠ প্রেরণা দেয়। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "এক পরাধীন জাতিকে স্বাধীন করা যেমন শক্ত কা[illegible] আবার একটা দুর্বল, অবনত জাতিকে স[illegible] স্বাধীনতার যোগ্য করিয়া তোলা তেমনই, এমন[illegible] বরং আরও কঠিন কাজ।" গীতায় স্বরাজ এ[illegible] উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। ছাপা নির্ভুল, কাগজ এবং বাঁধাই সুন্দর মনোরম। ১২২।

মহামানব শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথের মহানির্বাণ—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২।১, কালি[illegible] পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা—২৬। মূল্য [illegible] আনা।

স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রনাথ দে একজন সাধক পু[illegible] ছিলেন। "ভাই" এই ছদ্ম নামে তাঁ[illegible] উপদেশরাজী কয়েকখানা পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার মহাপ্রয়াণকে উপল[illegible] করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। নৃপেন্দ্রনাথের দেহত্যাগের এক মাস পূর্ব হইতে [illegible] প্রদত্ত হইয়াছে। অন্তিম অবস্থায় সাধক-জী[illegible] একটি পরম মাধুর্য উন্মুক্ত হয়, পুস্তকের পাঠে সে পরিচয় পাওয়া যাইবে। ১১৫।

হালখাতা—শ্রীরামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বি[illegible] প্রকাশক—হিন্দুস্থান বুক ডিপো লিঃ, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। এক টাকা চার আনা।

তিনটি গল্পের সংগ্রহ। অত্যন্ত [illegible] হাতের লেখা। চরিত্র আখ্যানভাগ, [illegible] পকথন কোন কিছুই উৎরায় নাই। সা[illegible] সাধনা দুরূহ ব্যাপার। লেখককে এই দ[illegible] কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনু[illegible] করি।

সুশীল রায়

ধাতু পালিশ করা যায়, এমন মনোমত বার্নিশ আজ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না। নতুন পেতলের টব এনেছি একটা, যতই ঘষি আর মাজি-না কেন কিছুতে সেটা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে তুলতে পারছি নে। এইজন্যে মন খুঁৎখুঁৎ করছে ক'দিন ধরে। ঘরের শোভা বাড়াবার জন্যে যেটার আমদানী, সেটা যদি ঘরের মধ্যে নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে না ওঠে তাহলে আমারও তো গৌরব বাড়ে না কিছুতে।

সিমেণ্ট আর কংক্রিটের পৃথিবীতে থেকেও আমার মধ্যে শিল্পবোধ ও রসপ্রাণতা এখনো কিছুটা আছে, আমি যে আর পাঁচ-জন শহরবাসী থেকে কিছুটা অন্তত স্বতন্ত্র, তার বিজ্ঞাপন দেওয়া চাই-ই। এই খেয়াল হওয়ার পরেই আমি টব কিনে ফেলেছি। আগে কিনেছি টব, পরে একটা গোলাপ-চারা।

অগাধ সমুদ্র। চারদিক জলে থই থই। কিন্তু তবুও পিপাসা মেটাবার উপযুক্ত জলের জন্যে মাঝ-সমুদ্রেও হাহাকার নাকি করতে হয়। নাবিকের জীবনে এমন দুঃসময়ও নাকি আসে। মাটির পৃথিবীতে বসবাস ক'রেও একমুঠো মাটির জন্যেও তেমনি হাহাকার করতে হল সেদিন। সেদিন মনে হল, সত্যিই বুঝি আমরা মাটিময় এই মহাসমুদ্ররূপ পৃথিবীর এক-একজন অসহায় নাবিক। টব ভরতি করব কী দিয়ে তাই ভাবছিলাম। কাঁকর আর বালি দিয়ে তা করা যায় বটে, কিন্তু অতটা ...ফালন বরদাস্ত হয়তো করবে না গোলাপ ফুলের ঐ ক্ষুদে চারাটা। টব ...ন্ত মেনে সে নিয়েছে বটে, কিন্তু আর ...শি প্রত্যাশা তার কাছে করা যায় না। সুতরাং কিছুটা মাটি অবশ্যই দরকার।

নিউকাস্‌লে কয়লা পাঠানো আর তেলে-মাথায় তেল দেওয়া নাকি একই রকমের ...কী। মাটির সংসারে মাটি ফিরি ... তার চেয়েও যে বড় প্রহসন, এটা হয়তো ... ঠাহর করেন না। ফিরিওলার অপেক্ষায় ... কয়েক থাকার পর টব-পূরণের মাটি ...গাড় হল। 'মাটি লেবে গো'—হাঁকটা ...দিন থেকে ব্যাঙের মত আজও বাজছে ...র মধ্যে। কিন্তু সে কথাকে আর আমল ...ছি নে। আমার কাজ হয়ে গেছে। মস্ত

টবটার বিরাট উদর দু' ঝুড়ি মাটি ঢেলে ভরাট করে নিয়েছি, আর পুঁতে দিয়েছি গোলাপ-চারা।

এখন দুশ্চিন্তা অন্য কারণে। টবটা যেন মাটি হয়ে না যায়, তাহলে আমার সৌন্দর্য-বোধটা একেবারে মাঠে মারা যাবে, এই চিন্তা অহরহ আমাকে পীড়ন করছে। তাই খুঁজছি পেতল পালিশ করার বার্নিশ। এমন পালিশ চাই, যাতে পেতলের টবটা ... সোন... আমি যে রুচিশীল, সৌন্দর্য-পিপাসু ও পুষ্পপ্রাণ, তা যেন টবের থেকে আলোর প্রতিফলন দিয়ে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে যায়। এই চিন্তায় মশগুল হয়ে রইলাম।

লম্বাটে কাঠের স্ট্যান্ড এনেছি। দক্ষিণের জানালার পাশে, ঘরের নিভৃত একটি কোণে সেই স্ট্যান্ডের ওপর পরম ...ত্ন বসিয়েছি টব। দূর থেকে মাঝে মাঝে তাকাই ওই টবের দিকে, অমনি চাঙ্গা হয়ে ওঠে মন। মনোমত পালিশ না পেলেও ...-পালিশ পেয়েছি তাতেই টব চিক্‌চিক্ করছে।

টবের ওপর আমার মায়া গাঢ় হয়ে উঠছে ক্রমশ। ওর মাঝখানে যে ছোট গাছ পোঁতা হয়েছে, বর্ণে গন্ধে জীবনে যৌবনে উতরোল হয়ে উঠতে তার দেরি আছে হয়তো কিছু। তা'তে কিছু আসে-যায় না। সে ক'টা দিন প্রতীক্ষা করার মত ধৈর্য আমার আছে। কিন্তু টবে দাগ লেগে যদি তার চাকচিক্যের সামান্য হানি ঘটে তাহলে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ি কেন-যেন। কখনো কাঁধের তোয়ালে দিয়ে, কখনো-বা পকেটের রুমাল দিয়ে ঘষে দাগ মুছে দিই দেখা-মাত্র। আমার পারি-পাট্যের এই আগ্রহ দেখে ইতিমধ্যেই কয়েকজন মন্তব্য করেছেন, আমি সত্যিই নাকি সৌন্দর্যপ্রাণ। আমাকে তারা যে চিনেছে, এতে, বলা বাহুল্য, আমি কেবল উল্লসিত নয়, পুলকিতও হয়েছি।

গাছহীন ছায়াহীন শোভাহীন শব্দময় শহরের এই নিভৃতি আমি অরণ্য দিয়ে পরি-পূর্ণ করে তুলতে পারিনি বটে, কিন্তু আমি অগাধ বনের গন্ধ যে ওই ছোট চারা থেকেই একা একা সংগ্রহ করতে পারব—মনে মনে এ আশা রাখি। ওই গোলাপ-চারাটি আমার কাছে অরণ্যের নির্যাস। আজ তার ডালে পরিপূর্ণভাবে পাতা গজিয়ে ওঠেনি, তার বৃন্ত কাঁটায় পরিপূর্ণ হয় নি, সেই অনাগত সকল কাঁটাকে ধন্য করে একটা কুঁড়িও ফুল হয়ে ফুটে ওঠে নি বটে, কিন্তু আমার প্রতীক্ষাকে সার্থকতায় ভরপুর করে একদিন ঐ চারা যে গাছ হয়ে উঠবেই—এটা আমি জানি। আমার এই ছোট ঘরটি টবের গৌরবে ও ফুলের সৌরভে একদিন মাৎ হয়ে উঠবেই—একটু তফাতে বসে বসে এই কল্পনা আমি মাঝে-মাঝে করে থাকি।

পা... ...তুন কৌটা খুলে টবের সারা গায়ে মেখে দিই। ঘষে ঘষে তাকে খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি করে তুলি। টবের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে উঠি নিজেই। ফুর্তিতে ভরে উঠে মন। আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে শিষ দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াই ঘর-ময়।

কাঁকর আর কংক্রিটের জগৎ এক নিমেষে হয়ে ওঠে সোনার সংসার। পাঁচজন এসে আমার রুচির তারিফ করে যায়। আমি তাদের কথার জবাব দিই নে, মনে মনে প্রসন্ন হয়েও গুণীজনোচিত গাম্ভীর্য নিয়ে বসে থাকি। এই শুক্‌নো সংসারে রসের স্রোত কিছুটা যে টেনে আনতে পেরেছি এই আমার তৃপ্তি। তৃপ্তির আলোতে আমার মুখ হয়তো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিজে চাক্ষুষ দেখতে পাই নে বটে, কিন্তু আন্দাজ করি। এই আত্মতৃপ্তিটা আমার মুখেও অবশ্যই পালিশের কাজ করে দিয়ে যায়।

ক'দিন থেকে ঘরের দু-কোণে নীরবে বসে আছি দু'জন—এক কোণে টব, এক কোণে আমি। দু'জন যেন মুখ দেখছি দু'জনের। আমি যেমন খুশি হচ্ছি ওর মুখ দেখে, ওই টবও তেমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আমাকে দেখে। জানিনে, আমার মুখের ছায়া তার ওপর পড়ছে কি না, ও-ও হয়তো জানে না তার ছায়াটা এসেই আমার মুখকে এতটা উদ্ভাসিত করে তুলেছে কিনা। কিন্তু দু-জনেই এটুকু জানি যে, আমরা দু-জনেই পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে আছি।

বেশ ছিলাম। দিন কাটছিলও মন্দ না।

হঠাৎ একদিন উজ্জ্বল মুখ কালো হয়ে গেল। উঁকি দিয়ে দেখি, চারা শুকিয়ে মরে গেছে, টবের মাটি খটখট করছে। চারা পোঁতার পর, এতক্ষণে মনে পড়ল, একদিন জল দেওয়া হয়নি ওতে।

টব-বিরোধীরা এ-সংবাদে উল্লসিত হতে পারেন। কিন্তু তাঁদের উল্লাসের কোনো কারণ নেই। শুকনো চারা উপড়ে সেই দিনই ফেলে দিয়েছি, কিন্তু টব এখনো যথাস্থানেই স্ট্যান্ডের ওপর উদ্ধত ভঙ্গি নিয়ে বসে আছে। প্রথম দিন আচমকা আঘাতে মুখ বিষণ্ণ হয়েছিল বটে। কিন্তু ভেবে দেখেছি, ওটা কিছু না, সাময়িক দুর্বলতা মাত্র। টবে চারা থাক বা না-থাক, ফুলের কুঁড়ি উঁকি দিক বা না-দিক, ঘরে টব একটা থাকলেই তাতে ঘরের ইজ্জৎ বেড়ে যায়। বিশ্বাস না করলে আমার ঘরে একবার উঁকি দিয়ে দেখে যেতে পারেন।

টব হচ্ছে গাছের খাঁচা। [illegible] পাখিকে বন থেকে কেড়ে এনে খাঁচায় আটক করা যদি গর্হিত অপরাধ না হয় তাহলে টবে ভরতি করে যদি কেউ গাছ পুষতে চায় তাতে আপত্তি করার কি আছে? টবের যাঁরা বিরোধিতা করেন, তাঁদের এই কথা এক-একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কোনো বিরোধিতার মধ্যে যেতে আমার আপত্তি আছে। এই জন্যেই টবেরও আমি বিরুদ্ধতা করিনে। আপোষ করে একটা মধ্য পথ তাই বেছে নিয়েছি। ঘরে আমার টব আছে, কিন্তু তাতে গৃহপালিত কোনো গাছের বালাই আর নেই। নতুন কোনো চারা এনে তাই টবের মাটিকে আর পীড়িত করে তুলিনি।

মাটি ফেলে দিয়ে শূন্য টব রাখা হয়তো যেত, কিন্তু সেটা বড় বাড়াবাড়ি আর বেআড়া দেখায়। এই কথা ভেবে মাটিটুকু আর ফেলে দিইনি।

ফুল লতা পাতা ইত্যাদির ওপর টান একেবারে যে ছিল না, এমন নয়। কিন্তু এখন সে-সব একেবারে বর্জন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছি। ভেবে দেখেছি, ও সব কিছু না। তার চেয়ে এই বেশ, এই অনাবিল ও নির্ঝঞ্ঝাট আনন্দ। টব অত পরিচর্যার প্রত্যাশী নয়, তাকে একদিন পালিশ করতে ভুল হলেই সে কুঁকড়ে মরে যায় না, রাতারাতি উবেও যায় না।

সৌরভ আর চাই নে তাই, এখন যা চাই, তা হচ্ছে অকৃত্রিম গৌরব—পালিশ-করা ওই টবের মত। যদি কখনো কোনোদিন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে ঐ টব, তাহলে একটা রং-চঙে ফুল এনে পুঁতে দিলেই মিটে [illegible]—হয় যদি হোক-না সে ফুল নেহাৎ কাগজেরই। দূর থেকে দেখতে তা অবশ্যই গাছের গোলাপের মতই দেখাবে। রং যখন চটে যাবে তখন সেটা বদল করে দিতে আর কতক্ষণ। আমি হিসেব ক'রে দেখেছি, গাছের গোলাপের চেয়ে কাগজের গোলাপের আয়ু বেশি, রংও বেশি টেঁকসই। এক সন্ধ্যাতেই সে ঝরে প[illegible]ড়ে না।

এত প[illegible]কা যার পরমায়ু, এত ক্ষণস্থায়ী যার রং [illegible]কে নিয়ে লাফালাফি করার দিন আর নেই। তা যদি থাকত, তাহলে ঘরের টব দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাকা উঠোনে মাটি ঢালাই করে প্রশস্ত একটা বাগানই এতদিন বানিয়ে তুলতাম। ইচ্ছে হয়েছিল বটে একদিন, অরণ্যের নির্যাস ঘরে এনে রাখব, কিন্তু তাতে ঝামেলা অনেক—প্রতি মুহূর্তে তার দিকে নজর দিয়ে বসে থাকতে হয়।

বাঁধানো সড়কে হেঁটে হেঁটে অভ্যাস হয়ে গেছে অন্যরকম। জীবনটা হবে মসৃণ—এখন এইমাত্র চাহিদা। কোথাও সামান্য উঁচু-নীচু দেখলে মন তাই বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। অনড়* অনাবিল নিশ্চেষ্ট নিরাপদ জীবন এখন একমাত্র কাম্য।

টব ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছিল ক'দিন ধ'রে। তাই একটা শুকনো ডাল এনে পুঁতে রেখেছি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, ওটা দেড় শ বছর বয়সের ওক গাছ। নিজে এ কথা বিশ্বাস করি নে বটে, কিন্তু যাকেই বলি, সেই চট করে স্বীকার করে নেয়। অমন দামী আর অমন ঝকঝকে তকতকে টবে কোনো রুচিসম্পন্ন মানুষ অখ্যাত অজ্ঞাত একটা কাঠের টুকরো যে গেঁথে রাখতে পারে না, এ কথাটাই বিশ্বাস করে সকলে।

তাই বেশ আছি, আরামেই আছি আজ-কাল। এক কোণে টব, এক কোণে আমি। দুজনের মুখই আনন্দে উজ্জ্বল। দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে যেন মিটিমিটি হাসছি। আর কেউ আমাদের চিনুক বা না-চিনুক, আমরা উভয়ে যে উভয়কে চিনেছি, এটা কিন্তু ধরে ফেলেছি দুজনেই। ও এক কোণে বসে বহন করছে পুরাতন ওক বৃক্ষ, আর-এক কোণে বসে আমি বহন করছি অকৃত্রিম রুচি।

উপহার

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

আমার মনের নভে তুমি নব প্রভাতের তারা,
যে তারার ক্ষীণালোকে অন্ধকার মানে পরাজয়।
পথের সন্ধান পায় দিগ্‌ভ্রান্ত যতো পথহারা,
যে তারার সাথে সাথে জীবনের নব সূর্যোদয়।

আমার অধরে দিলে তুমি রাণী কি মোহিনী ভাষা,
বিশ্রান্ত চরণে এলো দুর্নিবার চলার আবেগ।
শুভ্রা উষসীর মতো অন্তরের স্বচ্ছ ভালোবাসা,
মুহূর্তে মুছিয়া দিল যাযাবর-হৃদয়ের মেঘ।

ভুলে যাই অতর্কিতে জীবনের যতো বিড়ম্বনা,
পদে পদে ব্যর্থতা ও পথে পথে বেদনার গ্লানি।
তুমি এলে সঙ্গে নিয়ে স্বরগের মধুর সান্ত্বনা—
জরতী ধরার বুকে লিখে যাও যৌবনের বাণী।

নরম মোমের মতো ঐ তব শ্যাম তনুলতা
রেশমের মতো ঐ সুবিন্যস্ত চিকণ চিকুর,
অধরের প্রান্তদেশে জমে-ওঠা অকথিত কথা
আমার প্রাণের পাত্র অলক্ষ্যে করেছে ভরপুর।

খুলেছে মনের কোণে জ্যোতির্ময় আলোর দুয়ার,
আমার কবিতা তাই তোমারে দিলাম উপহার।

রঙ্গজগৎ

বাঙলা চিত্রশিল্পের অবস্থা

বেংগল মোসন পিকচার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় গত ৪ঠা জুন এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের এখনকার অবস্থা জানিয়ে দেবার জন্যে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় তার বিবৃতিতে বাঙলার চিত্রশিল্প ধ্বংসের মুখে এসে পড়ার একটা ছবি সামনে তুলে ধরেন এবং এর জন্যে তিনি এগারটি কারণকে দায়ী সাব্যস্ত করেন এবং এই কারণগুলির ওপর ভিত্তি করেই তিনি একটি দীর্ঘ বিবরণ পেশ করেন।

বিবরণটি শ্রীচট্টোপাধ্যায় আরম্ভ ক'রেছেন নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ চলচ্চিত্র শিল্প ও বাণিজ্যের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য, মত-বিরোধিতা, স্বার্থপরতা ও অদূরদর্শিতার কথা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার ক'রে নিয়ে। তার পর তিনি উল্লেখ করেন বাইরেকার এগারোটি কারণের কথা। প্রথমেই তিনি কর-ভারের কথা বলেন। প্রমোদ-করের বোঝা ছাড়াও পৌর প্রতিষ্ঠান, পুলিস প্রভৃতিকেও নানাভাবে কর প্রদান ক'রতে হয়। দ্বিতীয় কারণ তিনি বলেন, পশ্চিম বাঙলার সিনেমার সংখ্যাল্পতা। বাঙলা ছবি ধরতে গেলে কেবলমাত্র পশ্চিম বাঙলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ অথচ এখানে এমন সংখ্যক চিত্রগৃহ নেই যে, ছবি দেখিয়ে খরচের টাকাও তোলা যায়। তৃতীয় কারণ, তিনি বলেন, এক শ্রেণীর চিত্রব্যবসায়ীর অসাধু বৃত্তি, যে কারণে ছবির নির্মাতা তার প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তারা এই ফাঁকি দিতে গিয়ে গভর্নমেন্টকেও কর থেকে ফাঁকি দেয়। চতুর্থ কারণ, সরকারি ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের যারা কোন সূত্রে চলচ্চিত্র শিল্পের সংস্পর্শে আসে বিনা পয়সায় বসে ছবি দেখার জন্য তাদের জুলুম। পঞ্চম কারণ, ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে বাধানিষেধ। ষষ্ঠ কারণ হ'চ্ছে, ছবির ওপর অযৌক্তিক আয়কর ধার্য। ছবির খরচ তোলা যাক আর না হোক, আয়কর বাবদ তার খরচের ওপরে প্রথম বছর ধার্য করা হয় শতকে ৫০, দ্বিতীয় বছর শতকে ৩৩⅓ এবং তৃতীয় বছরে ১৬⅔। সপ্তম কারণ, শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন, দেশের লোকের বাঙলা

এম পি'র 'প্রত্যাবর্তন' চিত্রে
পাহাড়ী সান্যাল

ছবির ওপর বিতৃষ্ণা; বাঙলা ছবির যথাযথ পৃষ্ঠপোষণে জনসাধারণের সহযোগিতার অভাব। অষ্টম কারণ হ'চ্ছে, সংবাদপত্রে ছবির সমালোচনা। নবম কারণ, সরকারী বা পদস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য প্রদর্শনীর জন্যে জুলুম। দশম কারণ, অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন খরচ এবং একাদশ কারণ, শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন, তাদের নিজেদের নৈরাশ্য ছবি নিয়ে চিত্রশিল্পের লোকে বড়াই করার চেয়ে অনবরত তার নিন্দেই ক'রে থাকেন। যাদের তৈরী জিনিস, তারাই যদি নিন্দে করেন, শ্রীচট্টোপাধ্যায় উপসংহারে বলেন, তাহ'লে লোকে তা শুনলে ছবি দেখতে যায় কি ভেবে!

শ্রীচট্টোপাধ্যায় বর্ণিত ছাড়াও বাঙলার চিত্রশিল্পের পতনের আরও কারণ আছে। [illegible] উল্লেখ ক'রতে হয় নিকৃষ্ট ছবির কথা, যা লোককে সিনেমা থেকে দূরে হঠিয়ে দেয়। এবছরে এপর্যন্ত যে উনিশখানি ছবি মুক্তিলাভ ক'রেছে, তার মধ্যে খুঁজেপেতে তিন-চারখানির বেশিকে লোকের কাছে অনুমোদন করা যায় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, ছবি ভালো বলে, সত্যিকার মনোরঞ্জক হ'লে সে ছবি পশ্চিম বাঙলার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থেকেও অর্থার্জন ক'রতে পারে। দ্বিতীয় কথা হ'চ্ছে, বাজার ছোট ব'লে বাঙলা ছবি যথেচ্ছ সংখ্যক তৈরি করা সম্ভব নয় জেনেও এখানকার চিত্রশিল্পকে কর্মক্ষম রাখার জন্যে কলাকুশলী কর্মীদের কাজ জুগিয়ে যাবার জন্যে বাইরের বাজারের উপযোগী ছবি তোলা ব্যাপারে একেবারেই ঔদাসীন্য। সবাক ছবি আরম্ভ হওয়ার যুগে

ঙলার স্টুডিওজাত হিন্দী ছবিই হিন্দী বির বাজার সৃষ্টি ক'রে তোলে, কাজেই ঙলার স্টুডিওতে, বাঙলার কলাকুশলী ও শল্পীদের দ্বারা সারা ভারতের জন্যে ছবি তালা সম্ভব নয় ব'লে যে ধারণা এখন 'য়েছে, তার মূলে কোন সত্যিই নেই। দখাই যখন যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র বাঙলার বাজারটুকু আঁকড়ে বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পের চলা সম্ভব নয়, তখন বাইরে থেকে অর্থ আমদানীর উপায় ক'রে তোলা একান্তই দরকার। এর পরের কারণ হ'ছে, সিনেমার ওপরে লোকের চেতনা উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলার জন্যে সিনেমার সাহায্য প্রচারে উপযুক্ত জনসংযোগ ব্যবস্থার অভাব। সকল বয়সের এবং সকল শ্রেণীর লোককে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় কিভাবে আকর্ষণ ক'রতে পারা যায়, সমগ্রভাবে চিত্রশিল্পের দৃষ্টি ও ক্ষমতা তৎপ্রতি নিবদ্ধ রাখাই হ'চ্ছে ছবিকে জনপ্রিয় এবং অর্থকরী ক'রে তোলার প্রকৃষ্টতম পন্থা।

চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘ

আগামী ৭ই জুলাই বি-এম-পি-এ জার্নাল অফিসে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হবে। এই সভায় কার্যকরী সমিতির সভ্যও নির্বাচিত হবে। ঘোষণা করা হ'য়েছে, এবছরের ১৫ই জুনের মধ্যে যেসব চলচ্চিত্র সাংবাদিক সভ্য হবেন, তারা উক্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ক'রতে পারবেন।

নৃত্য শিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরী

আগামী ২০শে জুন থেকে ২২শে জুন নিউ এম্পায়ার মঞ্চে তরুণ বাঙ্গালী নট ভাস্কর রায়চৌধুরী তাঁর সম্প্রদায়সহ নৃত্যকলা প্রদর্শন করবেন। নৃত্যশিল্পী ভাস্কর স্বনামধন্য ভাস্কর ও শিল্পী দেবী-প্রসাদ রায়চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। ভারতের ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য ভারতনাট্যমের রূপদানে এই তরুণ শিল্পী যে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। প্রথমত আশৈশব দক্ষিণ ভারতে থেকে সেখানকার নৃত্যচর্চার সুযোগ তিনি পেয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠ নৃত্যাচার্য গুরু এলাপ্পার শিষ্যরূপে দীর্ঘকাল নৃত্য-শিক্ষা লাভ করে কথাকলি ও ভারতনাট্যমে পারদর্শিতা লাভ করেছেন। ভারতীয় নৃত্যের সংগে পাশ্চাত্য ব্যালে নৃত্যেও ভাস্কর সমান

ভাস্কর রায় চৌধুরী

দক্ষতা লাভ করেছেন। সুন্দর কান্তির নমনীয়তাই ভাস্করের নৃত্য সাফল্যের মূল কারণ। একুশ বৎসর বয়সে [illegible] সাফল্য অর্জন করা খুব কম ভারতীয় নৃত্যশিল্পীর ভাগ্যেই ইতিপূর্বে ঘটেছে।

ষ্ঠিত হবে। বেতারে, রেকর্ডে, ছায়াচিত্রে সংগীতানুষ্ঠানে কয়েকটি রবীন্দ্র-সংগীত ন রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজারের থেকে ী সংগীত-রচনাকে বিচার করা সম্ভব । সংগীত-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এ দেশকে যে পদ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে জানা দেশ-ী মাত্রেরই কর্তব্য এবং এই সম্মেলনের মে রবীন্দ্র-সংগীতকে যথাযথভাবে জন-ধারণের কাছে তুলে ধরা রবীন্দ্রসংগীত ল্পী মাত্রেরই দায়িত্ব। রবীন্দ্র-সংগীতকে গ্রভাবে এবং বিভিন্ন ধারানুযায়ী স্বতন্ত্র-বে জানা এই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই ম্ভব। এই সম্মেলনে শান্তিনিকেতন, লিকাতা ও বাহিরের শতাধিক শিল্পী ংশ গ্রহণ করবেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীত-ন্টিকে যাঁরা জানতে চান ও বুঝতে চান দের কাছে এই ধরণের সম্মেলনের য়োজন রয়েছে। এইসংগে সম্মেলনের নুষ্ঠান-সূচী দেওয়া হলো। অন্যান্য াতব্য ১৩২, রাসবিহারী এভিনিউতে ক্ষিণী'র কার্যালয়ে সন্ধ্যা ৬টা হতে ৯টা র্যন্ত জানা যাবে—

থম অধিবেশন:

১৫ই জুন, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা, বেদগান, স্বস্তিবাচন, সংগীতযুক্ত আলোচনা—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রেম-সংগীত, জাতীয়-সংগীত।

দ্বিতীয় অধিবেশন:

১৬ই জুন, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা, বেদগান, সংগীতযুক্ত আলোচনা—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, কাব্য-সংগীত, নতুন তালের গান, ভানুসিংহের পদাবলী।

তৃতীয় অধিবেশন:

১৭ই জুন, সকাল ৮টা বেদগান, সংগীতযুক্ত আলোচনা—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অনুষ্ঠানাদি-শিশু-সংগীত, ঋতু-সংগীত।

চতুর্থ অধিবেশন

১৭ই জুন, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা বেদগান, সংগীতযুক্ত আলোচনা—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, ধ্রুপদ ও ধামার, লোক-সংগীত, উদ্দীপনার গান।

পঞ্চম অধিবেশন:

১৮ই জুন, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা, বেদগান, রাগসংগীত, হাস্যরসাত্মক গান, টপ্পা, ধর্ম-সংগীত, প্রাচীন ঢংএর গান।

হকি

ভারতের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা মাদ্রাজে বিশেষ সাফল্যের সহিতই শেষ হইয়াছে। মাদ্রাজ হকি এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলীর অন্তর্কলহ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে কোন বিশৃংখলা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে নাই বা করে নাই ইহা খুবই আনন্দের ও সুখের বিষয়। গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া কোনরূপেই বিধেয় নহে, বিশেষ কার্যকালে উহার কোন অস্তিত্বই থাকা উচিত নহে। মাদ্রাজ হকি এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু ও চরম শৃংখলার মধ্যে পরিচালনা করিয়াই ঐ আদর্শের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দিয়াছেন। আমরা আন্তরিকভাবে তাঁহাদের অভিনন্দিত করিতেছি।

গত দুই বৎসরের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা বিজয়ী পাঞ্জাব দল এইবারেও সাফল্যলাভ করিয়া উপর্যুপরি তিনবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হইবার গৌরব অর্জন করিয়াছে। ভারতীয় হকি ইতিহাসে পাঞ্জাব এক নূতন অধ্যায় রচনা করিল। ভারতীয় হকি খেলায় পাঞ্জাবের দান সত্য সত্যই উল্লেখযোগ্য। বিশ্বঅলিম্পিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতীয় হকি দল যে কীর্তি ও গৌরবোজ্জ্বল খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহার জন্য পাঞ্জাবের খেলোয়াড় পেলিজার, মহম্মদ জায়াব, জারা, মামুদ মিনহাস, গুরুজিৎ সিং, ত্রিলোচন সিং, বলবীর সিং প্রভৃতি কিছুটা দায়ী ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং সেই পাঞ্জাবের হকি দল জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় অপূর্ব কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আমরা পাঞ্জাব হকি দলের খেলোয়াড়গণের সাফল্যে সেই জন্য কোনরূপ আশ্চর্য হই নাই। বাঙলার হকি দল জাতীয় প্রতিযোগিতায় যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। আমরা এতদূর আশা করি নাই। বিজয়ী পাঞ্জাব দলের সহিত বাঙলা সেমিফাইনালে দুই দিন অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া তৃতীয় দিনে ২—১ গোলে পরাজয় বরণ করিয়াছে। প্রথম দিনে একরূপ দুর্ভাগ্যবশতঃই বাঙলা বিজয়ী হইতে পারে নাই, নতুবা বাঙলা দল পাঞ্জাবকে এই দিনে একরূপ কোণঠাসা করিয়া রাখে। দ্বিতীয় দিনেও পাঞ্জাব দলকে পরাজয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত শেষ পর্যন্ত খেলিতে হইয়াছে। তৃতীয় দিনেও বাঙলা প্রথমার্ধে পাঞ্জাবকে চাপিয়া ধরিয়া শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ায় পরাজিত হইয়াছে। শারীরিক পটুতা ও সহনশক্তি দলকে কিভাবে শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত করে বাঙলার খেলোয়াড়গণ পাঞ্জাবের সাফল্য হইতেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ভবিষ্যতে বাঙলার খেলোয়াড়গণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে একটু দৃষ্টি দিবেন বলিয়া আশা করি।

ভারতীয় হকি দল নির্বাচন

১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কির অলিম্পিক

অনুষ্ঠানে যাহাতে রীতিমত শক্তিশালী ভারতীয় হকি দল প্রেরিত হয় তাহার দিকে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের পরিচালকগণ বিশেষভাবেই দৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহারা ১৯৪৮ সালের ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের খেলোয়াড়গণকে লইয়া একটি ভারতীয় দল ও জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার সকল যোগদানকারী দলের মধ্য হইতে বাছিয়া ১৮ জন খেলোয়াড়কে লইয়া অপর একটি ভারতীয় দল গঠন করিয়াছেন। এই দুইটি দলের খেলোয়াড়গণ কয়েক মাস পরে একত্রে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী হকি খেলায় যোগদান করিবেন। ইহার পর ঐ দুই দলের খেলোয়াড়দের এক মাস এক শিক্ষা শিবিরে রাখিয়া নিয়মিতভাবে ক্রীড়াকৌশল শিক্ষা দেওয়া হইবে ও তাহার পরে চূড়ান্তভাবে উক্ত দুই দলের খেলোয়াড়গণের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া ১৯৫২ সালের ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল গঠন করা হইবে। ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল গঠনকল্পে হকি ফেডারেশনের এই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ভারতের অন্যান্য ক্রীড়া পরিচালকগণ অনুসরণ করিলে আমরা বিশেষ সুখী হইতাম। জানি না আমাদের এই প্রস্তাব অন্য কাহারও মনঃপূত হইবে কি না। তবে এইরূপ ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন আছে ও হওয়া বাঞ্ছনীয় ইহা আমরা না বলিয়া পারি না। নিম্নে দ্বিতীয় ভারতীয় হকি দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ

গোল—দেশমাথু (মহীশূর) ও রাম প্রকাশ (পাঞ্জাব)।

ব্যাকগণ—রিচোর (মাদ্রাজ), ডি পাল (বাঙলা) হরবংশ সিং (উত্তর প্রদেশ)।

হাফ-ব্যাকগণ—গুরুচরণ সিং (পাঞ্জাব), সাহেব সিং (পাঞ্জাব), বক্সি (সার্ভিসেস), ডালুজ (বাঙলা) ও রুদ্রভেলু (হায়দরাবাদ)।

ফরোয়ার্ডগণ—রামস্বরূপ (পাঞ্জাব), উধম সিং (পাঞ্জাব), বদশীস সিং (পাঞ্জাব), সি এস দুবে (বাঙলা), ফিটজারেল্ড (মহীশূর), রাজগোপালন (মহীশূর), শিব প্রকাশম (মাদ্রাজ) ও কটিলহো (বোম্বাই)।

অতিরিক্তঃ গোল—শেঠ (উত্তর প্রদেশ), **ব্যাক**—স্বরূপ সিং (সার্ভিসেস), **হাফ-ব্যাক**—পদভং (মহীশূর) ও অর্লোক (দিল্লী)।

ফরোয়ার্ডগণ—হরবক্স সিং (সার্ভিসেস), দর্শন সিং শেঠী (সার্ভিসেস) ও গুরুং (বাঙলা)।

কাবুল ভ্রমণকারী ভারতীয় হকি দল

আফগানিস্থানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এইবারেও আগামী আগষ্ট মাসে এক ভারতীয় হকি দল কাবুলে প্রেরিত হইবে। এই দল নির্বাচন পূর্বে যেভাবে হইয়াছে এইবারে তাহা অনুসৃত হয় নাই। তরুণ অথচ উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী এইরূপ খেলোয়াড়দের লইয়াই ভারতীয় দল গঠন করা হইয়াছে। কাবুলে হকি খেলা কেন কোনখেলাই খুব উন্নততর স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই, সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলী কেন যে বেশ শক্তিশালী দল নির্বাচন করিলেন বুঝা গেল না। নিম্নে কাবুলে ভ্রমণকারী ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল—

শেঠ (উত্তর প্রদেশ), কুলবন্ত সিং (বাঙলা), রবি দাস (বাঙলা), হরবক্স সিং (উত্তর প্রদেশ), ভেঙ্কট মুদালিয়ার (মধ্য প্রদেশ), ডেভিড (বাঙলা), আনন্দ সিং (উত্তর প্রদেশ), রামস্বরূপ (পাঞ্জাব) অধিনায়ক, ইদ্রিস আমেদ (উত্তর প্রদেশ), রবি সিং (পেপসু), হরদয়াল সিং (সার্ভিসেস), দর্শন সিং শেঠী (সার্ভিসেস) ও বনবীর সিং (পাঞ্জাব)।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় নূতন পুরস্কার

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা বা পূর্বের আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার জন্য যে পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল তাহা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হইয়া পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানে পরিণত হইলে হকি প্রতিযোগিতার পুরস্কারটি লাহোরেই থাকিয়া যায়। বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই পর্যন্ত উহা উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। এইজন্য পাঞ্জাব হকি দল ইতোপূর্বে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় দুই দুইবারের সাফল্যলাভ করিয়াও কোন পুরস্কার লাভ করিতে পারে নাই। এইবারে সেই অভাব মাদ্রাজ হকি এসোসিয়েশনের বিশেষ সাহায্যের জন্যই পূরণ করা সম্ভব হইয়াছে। মাদ্রাজ হকি এসোসিয়েশন "রামস্বামী স্মৃতি কাপ" নামক একটি সুদৃশ্য বৃহৎ কাপ ফেডারেশনের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন এবং উহা জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার বিজয়ী পাঞ্জাব হকি দলের হস্তেই অর্পিত হইয়াছে।

হকি আম্পায়ারদের সম্মেলন

ভারতীয় জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের সময় ভারতীয় হকি ফেডারেশনের টেকনিকাল কমিটি হকি আম্পায়ারদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সভায় হকি খেলা পরিচালনা সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবসমূহ ইতোপূর্বে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং সেই বিষয় আলোচনা করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। কেবল আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, ফেডারেশনের অনুমোদনের উপর সকল প্রস্তাবসমূহের কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে তখন সম্মেলন আহ্বান করিয়া এইভাবে কতকগুলি আম্পায়ারকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে টানিয়া মাদ্রাজে আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? যে সকল প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটিও সুচিন্তিত বলিয়াও মনে হয় নাই। "অভাগা আম্পায়ারদের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করুন ইহাই যেন স্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে।

ফ্বটবল

কলিকাতা ফ্বটবল লীগ প্রতিযোগিতা এক মাস হইল আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যে বিভিন্ন দলের খেলার ফলাফল যের্প হইতেছে তাহাতে এইটুকু বলা চলে যে, উত্তেজনা ও উম্মাদনা শেষ পর্যন্তই বজায় থাকিবে। কোন একটি বিশেষ দল অপর সকল দলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া চলিতে পারিবে না। যে দলই চ্যাম্পিয়ান হউক না কেন অপরাজিত থাকিয়া গৌরব অর্জন করা খ্বই কঠিন হইবে। খ্যাতিমান, শক্তিমান দলসম্হের মধ্যে কে কোন দিন পরাজয় বরণ করিবে বলা খ্বই কঠিন। অধিকাংশ দলই প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে একর্প দ্বিধাহীনচিত্তে বলা চলে যে বাঙলার ফ্বটবল খেলার মান বা স্ট্যান্ডার্ড খ্বই নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের খেলোয়াড়দের বিভিন্ন দলে টানিয়া আনিয়া দলের শক্তি ব্দ্ধির জন্য যে প্রচেষ্টা হইয়াছে বা চলিয়াছে তাহাতে আশান্র্প অবস্থার কোনই পরিবর্তন হয় নাই।

টেবিল টেনিস

মিস স্বলতানার কৃতিত্ব

মিস স্লতানা ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালের ভারতের মহিলা চ্যাম্পিয়ান। কি জন্য যে চ্যাম্পিয়ান তাহার নিদর্শন প্র্ব ভারত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি দিয়াছেন। প্রতিযোগিতায় সিংগলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস তিনটি বিষয়েরই চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। ভারতের অন্য কোন মহিলা খেলোয়াড় যে এই সামান্য ছোট্ট বালিকাটির সমকক্ষতা করিবার অযোগ্য তাহা প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি খেলাতেই প্রমাণিত করিয়াছেন। বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া প্রথম খেলায় আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান টকফ্কে পরাজিত করিলে সকলেই এই বালিকা খেলোয়াড়টিকে "বিস্ময়কারী বালিকা খেলোয়াড় নামে অভিহিত করেন।" এই নামের খ্যাতি মিস স্লতানা ইউরোপ ভ্রমণকালেও দিয়াছেন। ইউরোপ ভ্রমণের সময় মোট ৫৫টি খেলায় যোগদান করিতে হইয়াছে উহার মধ্যে ৪০টিতে বিজয়ী ও ১৫টিতে পরাজিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে তিনি হল্যাণ্ড, মিশর, স্ইজারল্যান্ড, সার, ল্ক্সেমবার্গ ও আমেরিকার এক নম্বর ও দ্ই নম্বর খেলোয়াড়দের পরাজিত করিয়াছেন। ইসরাইল, বেলজিয়াম, র্মানিয়া ও চেকোশ্লাভাকিয়ার ২নং খেলোয়াড়কে পরাজিত করিয়াছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান র্মানিয়ার খেলোয়াড় মিস অঞ্জেলিকা রোশেন্র নিকট হইতেও একটি গেম দখল করিতে সক্ষম হন।

ই'হার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। ১৯৩১ সালে হায়দরাবাদে ই'হার জন্ম হয়। ১৯৪৮ সালে প্রথম টেবিল টেনিস খেলায় যোগদান করিয়াই হায়দরাবাদ চ্যাম্পিয়ান হন। ইহার পর ১৯৪৯ সাল ও ১৯৫০ সালে ভারতের চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। এত অল্প বয়সে মিস স্লতানা যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাহাতে আশা করা যায় ইনি ভারতের নাম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান-সিপেও স্প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। শোনা যাইতেছে কোন এক বিত্তশালী ব্যক্তি এই বালিকাটিকে বিলাতে রাখিয়া কিছুদিন শিক্ষা দিবার সকল ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কে এই ব্যক্তি প্রকাশ লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃত দেশান্রাগী ইহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

আন্তর্জাতিক খেলা

এই প্রতিযোগিতার শেষে ইউরোপ বনাম ভারতীয় দলের এক প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয়। ঐ প্রতিযোগিতায় ভারত শোচনীয়ভাবে ৩—০ খেলায় পরাজিত হইয়াছেন।

প্র্ব ভারত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার সিংগলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসের বিজয়িনী মিস সৈয়দ স্লতানা

নিম্নে বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

প্র্বভারত প্রতিযোগিতা

প্র্ষদের সিংগলস ফাইনাল

মাইকেল হগনেয়ার (ফ্রান্স) ২১—১৬, ২১—১৪, ২১—১৮ গেমে জনি লীচকে (ব্রিটেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনাল

মিস এস স্লতানা ২১—১৪, ২১—১৮, ২১—১৮ গেমে মিসেস নাশিকওয়ালাকে পরাজিত করেন।

প্র্ষদের ডাবলস ফাইনাল

জনি লীচ (ব্রিটেন) ও মাইকেল হগনেয়ার (ফ্রান্স), ১৪—২১, ২১—১০, ১৮—২১, ২১—১৪ ২১—১৬ গেমে কল্যাণ জয়ন্ত ও রণবীর ভাণ্ডারীকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল

মিস স্লতানা ও মিসেস রাজাগোপালন ২১—১৭, ২১—১৩, ২৩—২১ গেমে মিস র্কিমণী ও মিস ম্যাডানকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল

মিস স্লতানা ও রণবীর ভাণ্ডারী ১৮-২১, ২১-১৩, ২১-১৫, ২১-১৬ গেমে মিসেস নাশিকওয়ালা ও জয়ন্ত দেকে পরাজিত করেন।

প্রতির্পক প্রতিযোগিতা

সেমিফাইনাল খেলা

এম ভি ভিঠল ২৩-২১, ১৬-২১, ২১-১৭, ১৫-২১, ২১-১১ গেমে কল্যাণ জয়ন্তকে পরাজিত করেন।

তির্ভেংগদম ২১-১৬, ২১-১৩, ১০-২১, ১৭-২১, ২১-১১ গেমে রণবীর ভাণ্ডারীকে পরাজিত করেন।

ফাইনাল

তির্ভেংগদম ২১-১১, ১৭-২১, ১৩-৯, ১২-২১, ৯-৩ গেমে এম ভি এস ভিঠলকে পরাজিত করেন।

আন্তর্জাতিক খেলার ফলাফল

জনী লীচ (ইউরোপ) ২১-১২, ২১-১৪ গেমে কল্যাণ জয়ন্তকে (ভারত) পরাজিত করেন।

মাইকেল হগনেয়ার (ইউরোপ) ২১-১০, ১০-২১, ২১-১৮ গেমে তির্ভেংগদমকে (ভারত) পরাজিত করেন।

জনী লীচ ও এম হগনেয়ার (ইউরোপ) ২১-১৩, ২১-১৫ গেমে কল্যাণ জয়ন্ত ও রণবীর ভাণ্ডারীকে (ভারত) পরাজিত করেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৮শে মে—সহকারী বৈদেশিক মন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকার অদ্য সংসদে বলেন যে, ভারত সরকার ইদানীং এই মর্মে সংবাদ পাইতেছেন যে, পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখনও তাঁহাদের ধনসম্পত্তি, সম্মান ও জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছেন না।

ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব আজ সংসদে জানান যে, বস্ত্র উৎপাদনের বর্তমান হার বজায় থাকিলে ১৯৫১ সালে তাঁত বস্ত্রসহ মাথাপিছু ১১ গজ বস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে।

আজ সংসদে জনপ্রতিনিধিত্ব (২নং) বিলের দ্বিতীয় দফা আলোচনা শেষ হয়। এইদিন সংসদে বিতর্কের উত্তরে আইন সচিব ডাঃ আম্বেদকর বলেন, "যাহাই ঘটুক না কেন, আমরা আগামী নবেম্বর-ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন শেষ করিতে বদ্ধপরিকর।"

অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম বি বি এস পরীক্ষার প্রথম দিন ছাত্ররা পরীক্ষা সম্পূর্ণ বর্জন করে। কোন ছাত্রই পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যান নাই।

২৯শে মে—অদ্য সংসদে সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রেরিত ভারতীয় সংবিধানের প্রথম প্রথম সংশোধন বিল সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। প্রধান মন্ত্রী এই বিলটি আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন এবং প্রারম্ভে ৮০ মিনিটকাল বক্তৃতা করেন।

আজ সংসদে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ঘোষণা করেন যে, এই দেশে যদি বিভেদ সৃষ্টি বা সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টির কোন চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে ভারত সরকার উহা কঠোরহস্তে দমন করিবেন।

কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়াই অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারত-পাকিস্থান অর্থনৈতিক আলোচনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

৩০শে মে—রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সভাপতি স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ অদ্য প্রাতঃকাল ৬-৫৬ মিনিটের সময় বেলুড় মঠে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিরোভাবকালে তাঁহার ৭৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

অদ্য সংসদে ভারতীয় সংবিধানের প্রথম সংশোধন বিল সম্পর্কে দ্বিতীয় দিবসের আলোচনা হয়। আলোচনাকালে দুইজন সদস্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং আচার্য কৃপালনী বিলটির তীব্র বিরোধিতা করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন।

৩১শে মে—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু সিলেক্ট কমিটি হইতে প্রেরিত সংবিধান (প্রথম সংশোধন) বিল বিবেচনা করিবার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন অদ্য উহা সংসদে গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ২৪৬ ভোট এবং বিপক্ষে ১৪ ভোট হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার (ওয়েস্টার্ন সার্কেল) শ্রী এস কে সেন অদ্য বাঁকুড়া হইতে ৪০ মাইল দূরে এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। আরও তিনজন পদস্থ কর্মচারী এই দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছেন।

গতকল্য নয়াদিল্লীতে অর্থ সচিব শ্রীযুত দেশমুখের সভাপতিত্বে স্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির অধিবেশন হয়। কমিটি পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

১লা জুন—অদ্য সংসদে সংবিধান (প্রথম সংশোধন) বিলের দ্বিতীয় দফা আলোচনা আরম্ভ হয় এবং বিতর্কমূলক ৫টি খণ্ড গৃহীত হয়। এই সকল খণ্ডে সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনুন্নত শ্রেণী, তপশীলী শ্রেণী এবং তপশীলী উপজাতির উন্নয়ন সম্পর্কে ১৫নং অনুচ্ছেদ এবং পেশা, বৃত্তি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংকোচ বিধান করিয়া ১৯নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৩১নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করিয়া অ[illegible] সম্পর্কে একটি নূতন তপশীল সংযোজিত করা হইয়াছে এবং সম্পত্তি দখল সংক্রান্ত আইন বৈধ করা হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতায় ডালহৌসী স্কোয়ার সন্নিকটে মিশন রো এক্সটেনসনে এক সশস্ত্র ডাকাতিতে এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ৯০,০০০৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

অদ্য কলিকাতার লেক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠরোগ চিকিৎসার বহির্বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। হাসপাতালের সম্মুখে এক জনতা ইহার প্রতিবাদ জানাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

শ্রীনগরে জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা উহাতে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণকল্পে গণ-পরিষদ আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

২রা জুন—অদ্য সংসদে সংবিধানের প্রথম সংশোধন বিলটি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। বিলটির পক্ষে ২২৮টি এবং বিপক্ষে ২০টি ভোট প্রদত্ত হয়।

৩রা জুন—কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী সেখ আবদুল্লা সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে নিরাপত্তা পরিষদের ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি আরও বলেন যে, কাশ্মীর ও ভারতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং উহা রক্ষা করিতে কাশ্মীর দৃঢ়সংকল্প।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য বিমানযোগে নয়াদিল্লী হইতে শ্রীনগরে উপনীত হন।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অদ্য গভর্নমেণ্ট হাউসে সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিনিধিদের নিকট হইতে 'জন দাবী' শ্রবণ করেন। প্রায় ৫০ হাজার লোকের এক শোভাযাত্রা প্রতিনিধিদলের অনুগমন করে। ডাঃ রামমোনোহর লোহিয়া রাষ্ট্রপতির সম্মুখে 'জন দাবী' পাঠ করেন। উহাতে জমিদারী উচ্ছেদ, ভূমি পুনর্বণ্টন, পণ্য মূল্য হ্রাস এবং সকলের জন্য কর্ম সংস্থান দাবী করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৮শে মে—পারস্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অদ্য হেগে আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট এক তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ তারে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক আদালতের পারস্যের সহিত বৃটেনের তৈল সম্পর্কিত বিরোধের বিষয় বিচার করার ক্ষমতা আছে বলিয়া পারস্য সরকার মনে করেন না।

কাবুল বেতারে প্রচারিত সংবাদে জানা যায় যে, আফগান সীমান্তে ও পাখতুনিস্থানে পাকিস্থানীদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ফলে আফগানিস্থানে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

২৯শে মে—অদ্য রাত্রে পূর্ব কোরিয়া রণাঙ্গনে কম্যুনিস্টদের দৃঢ় প্রতিরোধের ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ইজিংটনে এক কয়লা খাদে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। ফলে ৭০ জন শ্রমিক অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

৩০শে মে—পারস্য গভর্নমেণ্ট অদ্য বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বৃটেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পারস্যের তৈল সরবরাহ সম্পর্কে বৃটেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে সম্মত আছেন।

গতকল্য রাত্রিতে ৩০ হাজার লোক তৈল রাষ্ট্রায়ত্তকরণে বিদেশীদের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানাইয়া তেহরানের সমস্ত রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

১লা জুন—বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ হার্বার্ট মরিসন তৈল বিরোধ মীমাংসাকল্পে তেহরানে একটি বৃটিশ প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পারস্যের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ মোসাদেক অদ্য উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

২রা জুন—উত্তর কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন অভিযানের অবসান হইয়াছে।

৩রা জুন—বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সহিত আলাপ আলোচনা দ্বারা ইঙ্গ-ইরাণীয়ান তৈল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রেসিডেণ্ট টুম্যান যে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, পারস্যের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ মুসাদ্দিক তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন **সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ**

ষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ৮ই আষাঢ়, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 23rd June, 1951. [৩৪শ সংখ্যা

রণে

গত ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং চার্য প্রফুল্লচন্দ্রের তিরোভাব তিথি িপালিত হইয়াছে। ইঁহারা দুইজনেই রাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ইজনেই ছিলেন নেতা। নেতৃত্ব করিতে ইলে কি কি গুণ থাকা দরকার এবং রূপ যোগ্যতা থাকিলে নেতা হওয়া যায়, কথা বলা শক্ত। কতকগুলি গুণ চরিত্রের েগ যুক্ত করিয়া অন্বয় মুখে যেমন নেতৃত্বের েশ করা যায় না, তেমনই কতকগুলি দোষ র্জনে ব্যতিরেক বিচারেও নেতৃত্ব-শক্তির রূপ নির্ণয় করা সুকঠিন। মনীষী ার্টিনীর মতে নেতৃত্ব প্রভাবশালী াক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাঁহার থায় নেতৃত্বের মূলে পাওয়া যায় প্রচণ্ড কটা অহঙ্কার। কিন্তু এই অহঙ্কার, াধারণ ভাষায় আমরা যাহাকে অহঙ্কার বলি, স বস্তু নয়। আধ্যাত্মিক বিচারে এই হঙ্কার শুদ্ধ অহঙ্কার না হইতে পারে, বং অখিলাত্ম-ভাব তাহার মধ্যে হয়ত সব ময় থাকে না। কিন্তু নেতৃত্বের মূলীভূত হঙ্কারের মধ্যেও থাকে প্রাণের বিপুল স্তার এবং বৃহৎকে আপনার করিবার ধিকার বা অন্য কথায় প্রেম। এই প্রেম তন দৃষ্টিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং নেতার ন্তরে কর্মসাধনার আগুন প্রজ্বলিত রিয়া তোলে। সে আগুনে যিনি নিজে টা দগ্ধ হইতে পারেন, নিজকে দেশ এবং াতির সেবায় নিঃশেষে উৎসর্গ করিতে নুপ্রাণিত হন, তিনি তত বড় নেতা। শবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং আচার্য প্রফুল্ল-ন্দ্রের জীবনে নেতৃত্বের এই মহিমা প্রদীপ্ত

হইয়া উঠিয়াছিল। দুইজনের জীবনের ধারা বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দুই রকম মনে হয়। একজন বিলাস ও ঐশ্বর্যের রাজসিংহাসন হইতে পথের ধুলায় নামিয়া আসিয়াছিলেন। কঠোর রাজনীতিক কর্মসাধনার মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িয়া তিনি দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, অন্য জন ছিলেন তপস্বী। তিনি স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের মধ্যে বৈরাগ্যের ব্রতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ফলত জীবনের ধারাটি ইঁহাদের বিভিন্ন হইলেও শক্তির ভিত্তি ইঁহাদের উভয়েরই এক ছিল। ইঁহারা দেশের লোককে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। বাঙলার নরনারীকে ইঁহারা অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। মানবতার এই সূত্রে, প্রীতির প্রগাঢ় বন্ধনে জনগণের সঙ্গে তাঁহারা নিজদিগকে এক করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফলে জাতি ইঁহাদের কথায় চলিয়াছে। ইঁহাদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে কাজ করিয়াছে এবং বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতেও ভীত হয় নাই। প্রেমের বলে ইঁহারা জাতিকে দিয়া অসাধ্য সাধন করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বাঙলা দেশ আজ অসহায়। বর্তমানে বাঙলা দেশে যাঁহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মশ্লাঘা বাঁচাইয়াও একথা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, বাঙলা দেশে বর্তমানে নেতা নাই, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র—ইঁহাদের মত নেতা বাঙলা দেশ হারাইয়াছে। চারিদিকে তাহার অন্ধকার। প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের এই অভাব যদি বাঙলা দেশে এতটা দেখা না দিত, তবে বাঙালীর সমাজ-জীবনে বর্তমানের মত এত বড় দুর্দৈব দেখা দিত না এবং ব্যবচ্ছেদের আঘাত সত্ত্বেও বাঙলার বুকে বল থাকিত। তাহার সংস্কৃতি শক্ত থাকিত এবং বাঙালীর প্রাণের পর আজ এতখানি আঘাত আসিয়া পড়িতে পারিত না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং আচার্যদেবের মহাপ্রয়াণের স্মৃতি এই ব্যথাই আমাদের বুকে বড় করিয়া তোলে। কিন্তু আশা আমরা হারাই নাই। ইঁহাদের মত মহামানবের আবির্ভাব যে দেশ এবং যে জাতির ভিতর ঘটে, আমরা জানি, সে জাতি মরে না, মরিতে পারেও না। দেশবন্ধু দাশ এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান অবিনশ্বর এবং তাহার শক্তি কাজ করিবেই। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই বাঙালী নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিগত পহেলা আষাঢ় বাঙলার এই দুইজন জননায়কের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া মেঘাচ্ছন্ন সেদিনের আকাশে আমরা সেই বজ্রবাণীই শুনিতে পাইয়াছি।

আদর্শ ও কাজ

পাটনা সম্মেলনে আচার্য কৃপালনীর নেতৃত্বে নূতন দল গঠিত হইল। এই দলের নাম হইয়াছে 'কৃষক-প্রজা-মজদুর দল'। দলের আদর্শ অবশ্য ভাষার বিন্যাস-কৌশলে খুবই জনপ্রিয় করিয়া উপস্থিত করা

হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মতে ভাষার বিস্তার এবং বিন্যাস ছাড়া তাঁহারা আদর্শের দিক হইতে নূতন কিছু উপস্থিত করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে আদর্শের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে যে তাঁহাদের মতদ্বৈধ নাই, দলের অগ্রণিবর্গ একথা আগেই বহুবার বলিয়াছেন। ফলত কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহাদের মতবিরোধ শুধু প্রয়োগ-নীতি সম্পর্কে। আদর্শানুযায়ী নীতির বাস্তব নিয়ন্ত্রণ-ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মধ্যে কেন এই দুর্বলতা বা ত্রুটি দেখা দিয়াছে, আচার্য কৃপালনী পাটনা সম্মেলনের উদ্বোধন-বক্তৃতায় তাহার ইঙ্গিতও কিছু করিয়াছেন। তাঁহার মতে অভ্যন্তরীণ শত্রুর দলের অস্তিত্বই ইহার কারণ। এই শত্রুরা অতি ভীষণ। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতিকে বহিঃশত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা বরং সোজা। আচার্য কৃপালনী এই শত্রুদিগকে নৈর্বাক্তিক উপাধিস্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি অনুসারে আলস্য, ঔদাসীন্য, কুসংস্কার এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে শক্তির জন্য মত্ততাই হইতেছে এই সব শত্রু। আচার্যজী শক্তিমদকেই উক্ত শত্রুবর্গের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। কারণ, শক্তিমদে মানুষ যদি অন্ধ হয়, তবে জাতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অনিষ্ট ঘটে। সংজ্ঞা-নির্দেশে অবশ্য ত্রুটি কিছুই নাই। কিন্তু সুবিধা হাতে আসিলে নবগঠিত দলের মধ্যেও যে শক্তিমত্ততা বা ক্ষমতালিপ্সু মনোবৃত্তি দেখা দিবে না, ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? বাস্তবিক পক্ষে নূতন নির্বাচনের পর বিভিন্ন দলের শক্তি রাষ্ট্রক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবার পর পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাত স্পষ্ট হইয়া পড়িবে, এমন আশঙ্কা বিশেষভাবেই রহিয়াছে। অধিকন্তু কতকগুলি দলের রীতি-প্রকৃতি এ পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোন সংহত গতিই ধরে নাই। এরূপ অবস্থায় ঐসব দল নির্বাচনের পর কোন্ মূর্তি ধরিয়া বসিবে, কে বলিবে? এই দিক হইতে কংগ্রেসের দিকেই আচার্য কৃপালনীর অন্তরের ঝোঁক এখনও রহিয়াছে। কারণ, কংগ্রেসের আদর্শ সর্বাধিক পরিস্ফুট। আচার্য কৃপালনী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার কোন বিরোধ নাই। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চিরদিনই সৌহার্দ্য বিদ্যমান থাকিবে। আশার কথায় সন্দেহ নাই। কিন্তু দলীয় স্বার্থ-সংঘাতের ক্ষেত্রে এই সব সদিচ্ছা শেষটা অনেক ক্ষেত্রে অকেজো হইয়া পড়ে। বস্তুত আদর্শের পারস্পরিক সমন্বয়তিই জাতি এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে বিভিন্ন দলের মধ্যে মৈত্রীর এই সমভূমি গঠন করিতে সমর্থ হয় এবং বিরোধী পক্ষের অবলম্বিত নীতির ভিতর দিয়া জাতির অগ্রগতিকে সুসংহত করিয়া তোলে। নবগঠিত কৃষক-প্রজা এবং মজদুর দল যদি সত্যই সেই মর্যাদা লাভ করিতে চাহেন, তবে পদমানের লোভ তাঁহাদিগকে ছাড়িতে হইবে এবং জাতির সেবায় একান্ত নিষ্ঠাবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। দলের নেতারা তেমন চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বৃহদাদর্শে নিষ্ঠা-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিবেন কি না, ইহা ভাবিবার বিষয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা যদি সে কাজ করিতে পারেন, তবে কংগ্রেসের আদর্শকে তাঁহারা পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তুলি[illegible] সমর্থ হইবেন। বস্তুত কংগ্রেসের আদর্শের যে পতন ঘটিয়াছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং নূতন নির্বাচনের ভিতর দিয়া সেই আদর্শকে জীবন্ত করিয়া তোলাও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যুত কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে একটা ভ্রান্ত আত্ম-শ্লাঘাবোধ এই সত্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সম্যকরূপে সচেতন হইতে দিতেছে না। এ পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যাইতেছে। কংগ্রেসের জেনারেল-সেক্রেটারী শ্রীকালাভেঙ্কট রাও সেদিন কলিকাতায় আসিয়া এই গর্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস-ত্যাগীরা কেন্দ্র কিম্বা প্রাদেশিক আইন-সভার শতকরা বারটির বেশি আসন অধিকার করিতে পারিবে না। কংগ্রেস-নেতাদের দলগত প্রাধান্য সম্বন্ধে এই যে ভ্রান্তি, ইহা রাষ্ট্রক্ষেত্রে অনেক রকমের অনাচার বহন করিয়া আনিতেছে। এই ভ্রান্তি হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাঁহাদের সমগ্র কর্মোদ্যম শ্রদ্ধিত এবং সমাহিত করিবার জন্য একটি সুগঠিত শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা যে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

অন্ন সমস্যার সমাধান

ভারতের খাদ্যসচিব আমাদিগকে আশ্বাসের কথা শুনাইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের মুখেও আমর[া] আশার কথা শুনিয়াছি। আমেরিকা হইতে গড়ে প্রতিদিন একখানা করিয়া জাহাজ খাদ্যশস্য লইয়া ভারতের বন্দরে আসিয়া ভিড়িতেছে। কয়েক মাস ধরিয়া এইভাবে সেখান হইতে খাদ্যশস্য আসিবে। আমেরিকা ছাড়া ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, পাকিস্থান, চীন অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, কানাডা, আর্জেণ্টিনা উরুগুয়ে, গ্রেট বৃটেন—এই সব দেশ হইতে ভারতে খাদ্যশস্য আসিয়া পৌঁছিতেছে রেশনের পরিমাণ নয় আউন্স হইতে বার আউন্স করিবার নির্দেশও ভারত সরকার হইতে জারী করা হইয়াছে। কয়েকটি প্রদেশের গভর্নমেণ্ট ইহার মধ্যেই রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থাও অবলম্বন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ এখনও হয় নাই, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা অনেকটা স্বতন্ত্র। ভারত গভর্নমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গের জন্য এক লক্ষ টন খাদ্যশস্য অধিক মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে এখানে রেশন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও এক লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই অনুরোধ অবিলম্বে রক্ষিত হইবে। এইভাবে পূর্ণ রেশন প্রবর্তিত হইলে পরিস্থিতির যে অনেকটা উন্নতি সাধিত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, লাভখোর এবং চোরাবাজারীর দলের ব্যবসায়ে ইহার ফলে ভাঁটা পড়িবে। অন্তত শাসনবিভাগীয় অন্য কোন ব্যবস্থার দ্বারাই ইহাদের কূটচক্র ভেদ করা সম্ভব হয় নাই। জনসাধারণের মনে ইহাতে বিক্ষোভের কারণ ঘটিয়াছে। বস্তুত ইহাদের পাপ ব্যবসা ব্যাহত না হওয়ার ফলে খাদ্যাভাবজনিত সমস্যাকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দিক হইতে দেশের জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। দেশের স্বার্থে এবং জাতির স্বাধীনতার জন্য দুঃখ-কষ্ট যে সহ্য করা উচিত, এমন বিবেচনা বোধ তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হইবার মত অবসর লাভ করে নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রী খাদ্যাভাবজনিত দুঃখ-কষ্ট জনসাধারণ যেভাবে সহ্য করিয়াছেন সেজন্য সম্প্রতি তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। ফলত জন-সাধারণ যদি রাষ্ট্রের স্বার্থে

জন্য, দেশের প্রতি দরদ বোধে এই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিত, তবেই এইরূপ ধন্যবাদের সার্থকতা থাকিত। কিন্তু সে বস্তু কোথায়? তাহার মূল্য যে অনেক। এদেশের লোক বৃহৎ আদর্শের জন্য দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে না পারে, এমন নয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহারা নিদারুণ দুঃখ-দুর্গতির সম্মুখীন হইতে ভীত হয় নাই। কিন্তু আমরা স্পষ্টই বলিব, খাদ্যাভাবজনিত সমস্যা দেশবাসীর মনে আদর্শনিষ্ঠার সে গৌরব-বোধ উদ্দীপ্ত করিতে পারে নাই। চোরা-বাজারী এবং মুনাফাশিকারীদের কঠোর হস্তে দমনে সরকারের অসামর্থ্য বা ঔদাসীন্যই ইহার প্রধান কারণ। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে এই দিকে এখনও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং বণ্টন-ব্যবস্থার গলদ দূর করিতে হইবে।

বস্ত্রের অভাব মোচন

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, জুলাই মাস হইতে দেশের কোথায়ও আর কাপড়ের অভাব থাকিবে না। বলা বাহুল্য, অতীতের তিক্তকর অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক রহিয়াছে, এজন্য তাঁহার এই প্রতিশ্রুতিও আমাদের মনে বিশেষ কোন আশার সঞ্চার করিতে সমর্থ হইতেছে না। বাস্তবিক পক্ষে বস্ত্র-ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতিটি সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহজ পথ এখনও ধরিতে পারিতেছে না এবং আগাগোড়া আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, তাঁহাদের নীতি মিলওয়ালা, ধনিকদের স্বার্থেরই ধাঁধার ভিতর পড়িয়া ক্রমাগত পাক খাইতেছে। শ্রীযুক্ত মহতাবের সাম্প্রতিক যে উক্তি—একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে, তাহার মধ্যে যুক্তির তেমন জোর নাই। বিশেষত তিনি আসল কথাটাই বাদ দিয়া গিয়াছেন। বস্ত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে, এই কথাই তিনি বলিয়াছেন; কিন্তু দাম যে কমিবে, এমন ভরসা দিতে পারেন নাই। ভারত গভর্নমেণ্টের যিনি বাণিজ্য-সচিব, তাঁহার অন্তত ইহা বোঝা উচিত ছিল যে, বস্ত্রসঙ্কটের সমাধান করিতে হইলে শুধু সরবরাহ বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, দামও কমানো দরকার। ফলত বস্ত্রের মূল্য যদি ক্রেতাদের ক্রয়-সামর্থ্যের বাহিরেই থাকে তবে কাপড় দিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিলেও সমস্যা কিছু কমিবে না। পক্ষান্তরে দোকানে দোকানে কাপড় জমা হইয়া পড়িবে, ইহাতে মিল-ওয়ালাদের পক্ষে নূতন ফন্দী খাটাইবারই সুযোগ জুটিবে, তাহারা বিদেশে রপ্তানি বাড়াইবার জন্য সরকারের কাছে বায়না ধরিবে। আমরা জানি তাহাদের আব্দারের অন্ত নাই। বর্তমানে কাপড়ের যে দর আছে, আমরা জানি, গরীব লোকের, শুধু গরীব কেন, এই দুর্দিনের বাজারে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে তাহা ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। এই কলিকাতা শহরেই এমন পরিবার অনেক রহিয়াছে, মাথা পিছু বরাদ্দের মাত্র নয় গজ কাপড় কিনিবার সামর্থ্যও যাহাদের নাই। মোটা কাপড় কিনিবার মত অর্থই যাহাদের জুটে না, তাহাদের ঘাড়ে আবার মিহি কাপড় চাপাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে—সে আরও এক বিড়ম্বনা। দেশের অধিকাংশ লোক, যেখানে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে, সেখানে মিহি কাপড় উৎপাদনের এই বাসন বর্জন করিয়া সর্বসাধারণের অভাব পূরণের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া ভারত সরকারের নীতি নিয়ন্ত্রণ করা আমরা উচিত বলিয়া মনে করি। কিন্তু বস্ত্র মূল্য হ্রাস করিলেই যে সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, ইহাও মনে হয় না। লোকে যাহাতে সহজেই বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। কণ্ট্রোল-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া এক্ষেত্রে অনেক গলদ আসিয়া ঢুকিতেছে। একদল লোক এই সূত্রে গোষ্ঠীস্বার্থ গড়িয়া তুলিয়াছে। দেশের লোককে শোষণ করিবার ঘাঁটি বাঁধিয়াছে। স্বার্থবাহ দলের এমন জোট ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রথমেই প্রয়োজন এবং ইহা করিতে হইলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের সংখ্যা আরও অনেক বাড়ানো আবশ্যক। বস্তুত বস্ত্র-সমস্যা সমাধানে সরকারী নীতির ক্রমাগত ব্যর্থতায় দেশের লোকের মধ্যে বিক্ষোভের ভাব বাড়িয়া চলিয়াছে, শুধু মুখের কথায় তাহা প্রশমিত হইবে না।

পুলিশ বিভাগের জ্ঞানোদয়

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগের কর্তাদের এতদিনে এই জ্ঞান হইয়াছে যে, জনতার উপর গুলী চালনা সম্বন্ধে যেসব নিয়ম-কানুন আছে, পুলিশ কর্মচারীরা কার্যক্ষেত্রে সেগুলি কড়াকড়িভাবে পালন করেন না। এই তথ্য বা সত্য উপলব্ধি করিবার ফলে কর্তৃপক্ষ নিয়মকানুনগুলি ভাল করিয়া পাঠ করিবার জন্য এবং নিম্ন কর্মচারীদিগকে সেগুলি বুঝাইয়া দিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের উপর নির্দেশ জারী করা হইয়াছে। এই সব নিয়মকানুনগুলির মধ্যে একটি এইরূপ যে, যে সকল সভা কিংবা শোভাযাত্রায় বহু-সংখ্যক স্ত্রীলোক অথবা শিশু থাকে, কিংবা নিরস্ত্র জনতা থাকে, ধরিয়া লইতে হইবে, হিংসামূলক কাজ বা হাঙ্গামা বাধাইবার অভিপ্রায় তাহাদের নাই। পুলিশ বিধানের এই ধারাটির কথা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম। ইহার কারণ এই যে, পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি স্থানে এমন শোভাযাত্রার উপর গুলী চালনা করা হইয়াছে, সেগুলিতে স্ত্রীলোক এবং শিশু ছিল। বিশেষভাবে সশস্ত্র জনতা এদেশে খুব কমই দেখা যায়; তবু এখানে হামেসাই গুলী চলে। প্রকৃতপক্ষে পুলিশ বিভাগের সাম্প্রতিক এই নির্দেশটি বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। জনতার উপর গুলী চালানো ছেলে খেলার মতো ব্যাপার নয়; অথচ নির্দেশটিতে স্পষ্ট ভাষাতেই এই কথা স্বীকার করা হইয়াছে যে, পুলিশ গুলী চালাইবার নিয়মকানুন কড়াকড়িভাবে না মানিয়া অন্য কথায় সেগুলি অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করিয়াই গুলী চালাইয়া থাকে। পুলিশের এই অনবধানতা বা কর্তব্য-বিমুখতার ফল কি দাঁড়ায়, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে খুন-জখমের সম্ভাবনা ঘটে, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে কোন সভ্য দেশে, যে দেশের লোক এদেশের লোকের চেয়ে সবল, জনতা যেসব দেশে সহজেই মারমুখো হইয়া দাঁড়ায়, সেসব দেশেও এইরূপ দায়িত্বহীনভাবে পুলিশ গুলী চালাইয়া কোন ক্ষেত্রেই রেহাই পায় না। সেসব দেশের তুলনায় এদেশের লোক তো সহজেই দুর্বল এবং প্রকৃতিতে নিরীহ। বস্তুত মানুষের প্রাণ লইয়া এইরূপ ছিনিমিনি খেলা কোন দেশের লোকই বরদাস্ত করে না এদেশের লোকও মানুষ, কর্তৃপক্ষের যথা-সময়ে এ সত্য উপলব্ধি করা কর্তব্য—নহিলে বিপদ আছে।

প্রতীক্ষা

কোপাই নদী
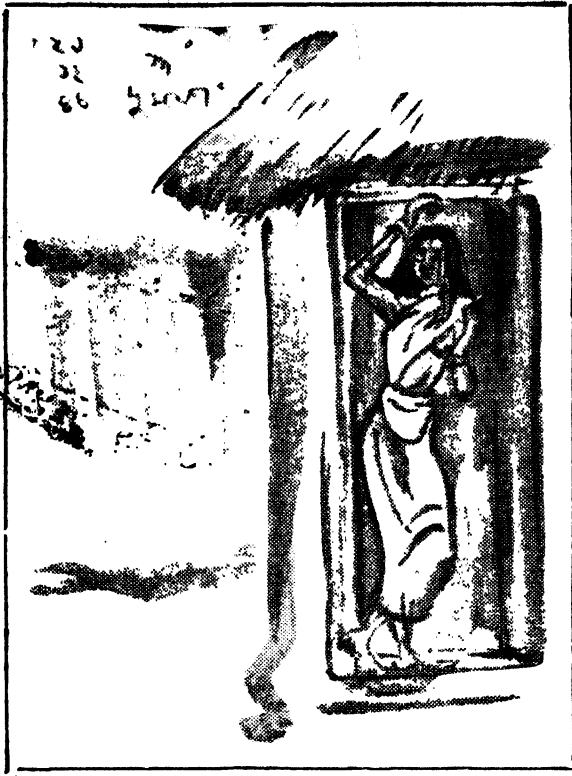
ছায়াপাহাড়

দিনেশ দাস

স্তব্ধ ভূগোল। কলকারখানা ক্ষেতখামার
কলের পাথরে লাঙলের ফালে গুঁড়োনো হাড়।
মাঝখানে শুধু শিং উঁচু ক'রে রাত্রিদিন
দম্ভের কালো ছায়াপাহাড়
সীমানাহীন।

জীবন-জলের কল্লোল ওঠে কলস্বরে
হৃদ্‌পিণ্ডের ঝুপ্‌ঝুপে দাঁড় এখনো পড়ে
ছলাৎ ছল,
প্রদীপের ভিজে শিখার মতই হৃদয় ঝরে
অচঞ্চল
দুর্নিবার।
মাঝখানে শুধু ছায়াপাহাড়।

রাত-নিশীথ।
বালুঝড় ওড়ে। ঢেউ ভাঙেচোরে। পুরোনো ভিত
টলমল করে। লোনাজল ঢোকে নতুন খাতে,
ভিতের শিকড় কুরে কুরে খায় ফেনার দাঁতে।
তবু অসাড়
মাঝখানে ফাঁপা ছায়াপাহাড়।

ছায়াপাহাড়ের কালোছায়া পড়ে অহর্নিশ
ঢাকে দূর-মাঠ দূরান্তের!
তারই নীচে তবু গম পাকে, জাগে ধানের শিষ
হেমন্তের।
হৃদয় এখনো পাখা ঝাপ্‌টায়, জীবন এখনো মানেনি হার—
ধোঁয়ার মতই ফুলে ওঠে শুধু দম্ভের কালো ছায়াপাহাড়।

ইন্দ্রজিতের আসর

গত সপ্তাহের লেখা পড়ে প্রমীলা দেবী বিষম রুষ্ট—দেখ তো কাণ্ড, এর মধ্যে আবার আমাকে টেনে আনা কেন? উনি মনে করেন, এই সব সদ্যবিবাহিতেরা আজকে যে জীবনে প্রবেশ করলেন, আমরা সে জীবনকে বহু পশ্চাতে ফেলে এসেছি। বিবাহিতে অবিবাহিতে কিম্বা বিবাহিতে বিবাহিতে যে ব্যবধান, কোনো লৌকিক নিয়মে তার পরিমাপ করা কঠিন। নক্ষত্রলোকে আলোকের গতি দিয়ে ব্যবধান নিরূপণ হয়, মনুষ্য জগতে বিবাহের গতি দিয়ে ব্যবধানের পরিমাপ করতে হয়। জ্যোতিষ্ক লোকে যাকে বলে লাইট ইয়ার মনুষ্যলোকে আমি তাকেই বলি ম্যারেজ ইয়ার। এঁদের সঙ্গে আমাদের twenty two marriage years-এর ব্যবধান। এই ব্যবধান যে অত্যন্ত দুস্তর ব্যবধান, সে আমি জানি। তবে এর মধ্যে সামান্য একটু তফাৎ এই যে, আলোর গতি সর্বত্র এক, কিন্তু আমি যাকে বলেছি বিবাহের গতি, সেটা ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন। কোনো কোনো ব্যক্তির দাম্পত্য প্রেম এমন অসম্ভব দ্রুতগামী যে, বিয়ের পরে দুদিন না যেতেই লোকটার খোল-নলচে শুদ্ধ বদলে যায়। কোনোকালে যে অবিবাহিত ছিল, দেখলে বোঝা দায়। সেদিক থেকে বলব, বিয়ের আঁচড় আমার গায়ে খুব বেশি লাগেনি। তার প্রমাণ বাইশ বৎসর পূর্বে বিয়ে করলেও আমার চুল এবং বুদ্ধি যতটা পাকা উচিত ছিল, ততটা পাকেনি, আর মেজাজ যতটা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, ততটা খারাপ হয়নি।

রয়ে সয়ে আস্তে ধীরে চলেছি বলে বিবাহিত জীবনে এখনও আমার হাঁপ ধরেনি। ঊর্ধ্বশ্বাসে চলতে গেলে অল্পতেই দম ফুরিয়ে যায়। ' প্রত্যেক দম্পতির মনে রাখা উচিত যে, দাম্পত্য জীবনের সব চাইতে বড় কথা দম। যত দ্রুত দম দেবেন, তত দ্রুত শমে এসে পৌঁছবেন। অর্থাৎ যেখানে দাম্পত্য প্রেম প্রচণ্ডবেগে শুরু হয়, সেখানে প্রেম নিঃশেষিত হতে বেশিদিন লাগে না। আরেকটা কথা মনে রাখা কর্তব্য —দাম্পত্য জগৎ অতিশয় সীমাবদ্ধ জগৎ। অত্যন্ত সন্তর্পণে ধীরপদে সেই সীমানার মধ্যে বিচরণ করতে হয়। একটু দ্রুত চলেছেন কি সীমানার বাইরে গিয়ে পড়বেন —আর সে সীমানার বাইরেই হচ্ছে ডিভোর্স কোর্ট। প্রেমের মধ্যে বিচারবুদ্ধি নেই, কিন্তু প্রেম যেই ফুরালো অমনি কাজির বিচার শুরু হোল।

বিয়ের দু-এক বছরের মধ্যেই যেসব ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়, সেই সব ক্ষেত্রে বিবাহ ব্যর্থ হয়েছে, এমন কথা ভাববার কোনো কারণ নেই। বরং আমি মনে করি, এঁদের দাম্পত্য প্রেম অল্প সময়ের মধ্যে খুবই জমে উঠেছিল। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, এঁরা একটু বোহিসেবী মানুষ। অর্থের সম্বলের মতো হৃদয়ের সম্বলও আপৎকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখতে হয়। এঁরা সেই রিজার্ভ তহবিলে কিছুই রাখেন নি। এ ধরণের দ্রুত নিঃশেষিত প্রেম সমাজে নিন্দিত হলেও আমি নিজে খুব নিন্দনীয় বলে মনে করি না।

সংসার ধর্মের প্রধান উপকরণ স্বামী-স্ত্রীর প্রেম। যাঁরা কোর্টশিপ করে বিয়ে করেন, তাঁরা সেই অত্যাবশ্যক উপকরণের বেশ খানিকটা বিয়ের আগেই খরচা করে বসে থাকেন। ব্যাপারটা কি রকম জানেন? ধরুন, একটা কোনো মুখরোচক খাদ্য আমার সম্মুখে রাখা হয়েছে। একটু একটু করে চেখে দেখতে দেখতেই সমস্তটা ফুরিয়ে গেল। দিব্য আসনপিঁড়ি হয়ে বসে মেখেজুকে খাবার আর সুযোগ হল না। অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন যখন শুরু হল, তখন দেখা গেল, রসবস্তুটুকু আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, যা পড়ে আছে, সেটা ছোবড়া মাত্র। প্রেম বলতে আমি বুঝি অনুরাগ, সে জিনিস পূর্বরাগে ব্যয় করা আমি বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি না। পূর্বরাগের আরেকটা বিপদ হচ্ছে, উক্ত নাট্যের নায়ক-নায়িকা দুজন আপন আপন স্বরূপ একে অন্যের কাছ থেকে যথাসাধ্য গোপন রাখবার চেষ্টা করবে। দুজনের চোখেই মোহের ঠুলিপরা। অপরের চোখে যা অনায়াসে ধরা পড়তে পারত, এঁদের চোখে তা কিছুতে ধরা পড়ে না। বিয়ে যেই হয়ে গেল মুখোসটি খসে পড়ল। আবিষ্কার করল স্ত্রী, স্বামীটি ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার রোগী। আর দুদিন না যেতেই দেখা গেল মেয়েটির হিস্টিরিয়ার ব্যামো, এছাড়া ছোটখাটো স্বভাবের অমিল তো আছেই। একে অন্যের গুণ দেখে আকৃষ্ট হলেই বিপদ। দাম্পত্য জীবন তখনই সুখের হবে, যখন উভয়ের দোষগুলো জানা থাকা সত্ত্বেও একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে। নইলে কোর্টশিপের প্রেম ধোপে টিকবে না।

আমার মতো অযোগ্য স্বামী দুনিয়াতে দুটি নেই। তা সত্ত্বেও আমাদের সম্পর্কটা যে আজ পর্যন্ত টিকে আছে, তার কারণ আমি গোড়াতেই আমার অযোগ্যতা, অক্ষমতা এবং সব রকমের দুর্বলতা পুরোপুরি ওঁর কাছে কবুল করে রেখেছি। বলে নিয়েছি, অয়ি সুচরিতে, এই অভাজনকে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিতে হবে। অর্থাৎ আড্ডা দিয়ে বেলা আড়াইটেয় বাড়ি ফিরলে রাগ কোরো না কিম্বা রাত এগারোটায় নিতান্ত এক কাপ চা খেতে চাইলে প্রার্থনা পূরণ কোরো, আর মাসের সাত তারিখের মধ্যে মাইনের টাকা যদি ফুরিয়ে যায়, তো দয়া করে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো না।

সমাজের দিক থেকে বিয়েটা একটা বজ্র-আঁটুনি। কিন্তু গেরো ফস্কা করবার ভার স্বামী-স্ত্রীর উপর। দুজনেই যদি একে অন্যকে একটু প্রশ্রয় দেন তো আর গোলমাল বাঁধে না। আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার—খুব ভালো কথা। কিন্তু এর সঙ্গে আর একটু জুড়ে দেওয়া প্রয়োজন—আমার জীবন আমার থাক, তোমার জীবন তোমার। You live your life, I live mine. হৃদয় আর জীবন তো এক কথা নয়। হৃদয় দান করতে রাজি আছি, কিন্তু বিয়ের জন্য প্রাণটা দিতে রাজি নই।

বাঙালীর হিন্দী চর্চা

রাজশেখর বসু

পনর বৎসর পরে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবে এই সংকল্প ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হওয়ায় অনেকে রাগ করেছেন, আরও অনেকে ভয় পেয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী উদাসীন হয়ে আছেন। পনর বৎসর দেখতে দেখতে কেটে যাবে, অতএব রাগের বসে হিন্দীকে বয়কট করা, ভয় পেয়ে নিরাশ হওয়া, অথবা পরে দেখা যাবে এই ভেবে নিশ্চেষ্ট থাকা—কোনওটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেউ কেউ মনে করেন পনর বৎসর পরেও সরকারী সকল কার্য হিন্দী ভাষায় নির্বাহ করা যাবে না, তখন ইংরেজীর মেয়াদ আরও বাড়াতে হবে; হয়তো কোনও কালেই ইংরেজী বর্জন চলবে না। এই রকম ধারণার বশে নিরুদ্যম হয়ে থাকাও হানিকর। অচির ভবিষ্যতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবেই—এই সম্ভাবনা মেনে নিয়ে এখন থেকে আমাদের প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য।

এ পর্যন্ত আমরা মাতৃভাষা ছাড়া প্রধানত শুধু একটি ভাষা শেখবার চেষ্টা করেছি—ইংরেজী। যাঁরা অধিকন্তু সংস্কৃত ফারসী ফ্রেঞ্চ জার্মন প্রভৃতি শেখেন তাঁদের সংখ্যা অল্প। ইংরেজী শেখার উদ্দেশ্য তিনটি—জীবিকানির্বাহ, ভিন্নদেশবাসীর সংগে কথাবার্তা, এবং নানা বিদ্যায় প্রবেশলাভ। হিন্দী যখন রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন কেবল ইংরেজীর সাহায্যে জীবিকানির্বাহ চলবে না, সরকারী চাকরি, ওকালতি প্রভৃতি বৃত্তি, এবং সামরিক ও রাজনীতিক কার্যে হিন্দী অপরিহার্য হবে। ভারতের অন্যপ্রদেশবাসীর সংগে প্রধানত হিন্দীতেই আলাপ করতে হবে। কিন্তু যাঁরা উচ্চশিক্ষা চান অথবা পৃথিবীর সকল দেশের সংগে যোগ রাখতে চান তাঁদের অধিকন্তু ইংরেজীও শিখতে হবে। মোট কথা, এখন যেমন ইতর ভদ্র অনেক লোক ইংরেজী না শিখেও কৃষি শিল্প ব্যবসায় বা কায়িক শ্রম দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, ভবিষ্যতে হিন্দী না শিখেও তা পারবে। কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশ লোক যেসব বৃত্তিতে অভ্যস্ত তা বজায় রাখবার জন্য হিন্দী শিখতেই হবে। তা ছাড়া অল্পাধিক ইংরেজীও চাই। অর্থাৎ, এক শ্রেণীর শুধু মাতৃভাষা আর এখনকার মতন নামমাত্র বাজারী হিন্দী জানলেই চলবে; আর এক শ্রেণীর মাতৃভাষা ছাড়া ভালরকম হিন্দী আর একটু ইংরেজী জানলেই চলবে; এবং উচ্চশিক্ষার্থীর অধিকন্তু ইংরেজী উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে হবে।

দুটির জায়গায় তিনটি ভাষা শিখতে হবে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। গণিত বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিদ্যা আয়ত্ত করতে যে যত্ন নিতে হয় তার চেয়ে অনেক কম যত্নে ভাষা শেখা যায়। হিন্দী আর বাংলার সম্পর্ক অতি নিকট, সে কারণে বাঙালীর পক্ষে হিন্দী শেখা সহজ। ইওরোপ আমেরিকা ও জাপানে বহু লোক তিন-চারটি বা ততোধিক ভাষা শেখে। যাঁরা রাজনীতিক বা বাণিজ্যিক দূত হয়ে অন্য রাষ্ট্রে যান তাঁদের বিভিন্ন ভাষায় দখল না থাকলে চলে না। যে বাঙালী এইপ্রকার পদের প্রার্থী তাঁকে বহু ভাষা শিখতেই হবে।

হিন্দীর আধিপত্যে আমাদের মাতৃভাষার ক্ষতি হবে এই ভয় একবারে ভিত্তিহীন। ইংরেজীর প্রভাবে বাংলা ভাষার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ভাল মন্দ অনেক বাক্যরীতি বা ইডিয়ম বাংলায় এসে পড়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইংরেজী ভাব ও পদ্ধতি আত্মসাৎ করেই পুষ্ট হয়েছে, কিন্তু নিজের বিশিষ্টতা হারায় নি। হিন্দী দ্বারাও বাংলা ভাষা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হবে, কিন্তু অভিভূত হবে না। অনেক কাল থেকেই কিছু কিছু হিন্দী শব্দ বাংলায় আসছে, ভবিষ্যতে আরও আসবে, কিন্ত তাতে বাংলার জাত যাবে না। বাংলা থেকেও বিস্তর শব্দ হিন্দীতে যাচ্ছে। বাংলার তুলনায় ইংরেজী ভাষার সমৃদ্ধি খুব বেশী, সেই কারণেই বাংলার উপর তার

অসামান্য প্রভাব। হিন্দীর সে সমৃদ্ধি নেই, সেজন্য তার প্রভাব কখনও বেশী হবে না—রাজনীতিক মর্যাদা যতই থাকুক।

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে পর্যন্ত এদেশে কেবল পাঠশালায় আর স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে বাংলা পড়ানো হত। তখনকার শিক্ষাবিধাতারা মনে করতেন, বাংলা তো আপনিই শেখা যায়, তার জন্য বেশী কিছু করতে হবে কেন। এই উপেক্ষা সত্ত্বেও সেকালের বাঙালী লেখক মাতৃভাষার উন্নতি করেছেন, উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁদের কীর্তির জন্যই পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্য কলেজেও শিক্ষণীয় হয়েছে। এখন বাংলা চর্চা করেই এম.এ, পি-এচ.ডি উপাধি পাওয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাওয়ায় বাংলা ভাষা জাতে উঠেছে, তার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পাঠ্যরূপে সমাদর পেয়েছে। কিন্ত কলেজী শিক্ষার গুণে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টার ফলে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা ভাষার বা সাহিত্যের কোনও উন্নতি হয়েছে এমন বলা যায় না। সেকালের লেখকরা পাঠশালায় বা স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতেই বাংলা শিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা ভাষার শুদ্ধি ও সৌষ্ঠবের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং নূতন লেখকদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। এখন অসংখ্য লেখক, তাঁদের অনেকে কলেজে বাংলা পড়েছেন। এখন রচনার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বেড়ে গেছে, আধুনিক প্রয়োজনে ভাষা নব নব ভাবের ধারক হয়েছে, তার প্রকাশশক্তিও প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সেকালে যে সতর্কতা ছিল, ইংলাণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ভাষার উপর যে শাসন আছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার একান্ত অভাব দেখা যায়।

সেকালের উপেক্ষা, একালের অসতর্কতা, এবং ইংরেজীর প্রবল প্রভাব—এই তিন বাধা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এতে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব নেই, বাঙালী লেখকের সহজাত সাহিত্য-প্রীতি ও নৈপুণ্যের জন্যই বাংলা ভাষা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে গণ্য হয়েছে। হিন্দীর প্রতিপত্তি যতই হক তাতে বাংলা ভাষার অনিষ্ট হবে না।

যাঁদের কর্মকাল শেষ হয়েছে বা শীঘ্র হবে, তাঁদের হিন্দী না শিখলেও চলবে। যাঁরা যুবক, এখনও বহুকাল কর্মরত থাকবেন, তাঁদের অনেককেই হিন্দী শিখতে হবে, নতুবা তাঁদের উন্নতি ব্যাহত হবে। আর যারা অল্পবয়স্ক তাদের সযত্নে হিন্দী শেখাতেই হবে, যাতে তারা ভবিষ্যৎ প্রতিযোগে পরাস্ত না হয়। ব্রিটিশ রাজত্বের আরম্ভকালে মুসলমানরা বাদশাহী জমানা আর ফারসী ভাষার অভিমানে ইংরেজীকে উপেক্ষা করেছিল। তার জটিল পরিণাম কি হয়েছে তা সকলেই জানেন। অন্ধ বিদ্বেষ বা অদূরদর্শিতার বশে হিন্দীকে উপেক্ষা করলে বাঙালীর অশেষ দুর্গতি হবে।

ভাগ্যক্রমে হিন্দুস্থানী অর্থাৎ উর্দু রাষ্ট্রভাষারূপে নির্বাচিত হয় নি। সংবিধান সভায় যাঁরা হিন্দীর পক্ষে লড়েছিলেন তাঁরা এখন 'শুদ্ধ হিন্দী' অর্থাৎ সংস্কৃতশব্দবহুল হিন্দীর প্রতিষ্ঠার জন্য সোৎসাহে চেষ্টা করছেন। ভারতের প্রধান ভাষাগুলির যোগসূত্র সংস্কৃত শব্দাবলী। হিন্দী ভাষায় যদি আরবী-ফারসী শব্দ কমানো হয় এবং সংস্কৃত শব্দ বাড়ানো হয় তবে দু-তিন কোটি উর্দুভাষীর অসুবিধা হলেও অবশিষ্ট বহু কোটি ভারতবাসীর সুবিধা হবে। হিন্দী ভাষায় যদি 'ইমতহান, দরখস্ত, পৈদাইশ, বনিসবত, মুহব্বত, স্যাহী' ইত্যাদির পরিবর্তে 'পরীক্ষা, বক্ষ, উৎপত্তি, অপেক্ষা, প্রীতি, মসি' ইত্যাদি লেখা হয় তবে বাঙালী আসামী ওড়িয়া গুজরাটী মারাঠী ও দক্ষিণ-ভারতবাসী সকলেরই বুঝতে সুবিধা হবে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৫১ অনুচ্ছেদে আছে—হিন্দী ভাষাকে সমৃদ্ধ করবার জন্য মুখ্যত সংস্কৃত থেকে এবং গৌণত অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করা হবে।

হিন্দী ভাষা একটা বোঝা হয়ে হঠাৎ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে এই ভেবে উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্ত এর একটা লাভের দিকও আছে, তা বাঙালী লেখকদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। ব্যবসায়বুদ্ধির যতই অভাব থাকুক একটি বিষয়ে বাঙালী এখনও এগিয়ে আছে। বাংলা সাহিত্য হিন্দী প্রভৃতির চেয়ে সমৃদ্ধ, পরিমাণে না হলেও গুণে শ্রেষ্ঠ। বাংলা কাব্য ইতিহাস দর্শন ইত্যাদির মর্যাদা যতই থাকুক পাঠক বেশী নয়। কিন্তু পণ্য হিসাবে বাংলা গল্পগ্রন্থের আদর আছে। অনেক বাংলা গল্পের হিন্দী গুজরাটী তামিল প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, অনেক অবাঙালী সাগ্রহে মূল বাংলা

গ্রন্থ পড়ে থাকেন। উদারস্বভাব অবাঙালী পাঠক বাংলা গল্পের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না।

ভাষা ভাবের বাহন মাত্র। বাংলা সাহিত্যের বা বাংলা গল্পের উৎকর্ষ বাংলা ভাষার জন্য নয়, বাঙালী লেখকের স্বাভাবিক পটুতার জন্য। বাঙালী সাহিত্যিক যদি হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে হিন্দীতে লেখেন তবে তাঁর পুস্তক সর্বভারতে প্রচারিত হবে, ক্রেতা বহুগুণ বেড়ে যাবে। যাঁরা অল্প বয়স থেকে হিন্দী শিখছেন তাঁদের যদি ভবিষ্যতে শখ হয় তবে অনায়াসে হিন্দীতে গল্প লিখতে পারবেন। এর জন্য অপর প্রদেশের সমাজে মিশতে হবে, তাঁদের আচার-ব্যবহার জানতে হবে। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে তা সুসাধ্য। যদি কেবল বাঙালী সমাজ নিয়ে হিন্দীতে গল্প লেখা হয় তা হলেও তার ভারতব্যাপী কাটতি হবে। লেখকের ক্ষমতা আর পাঠকের রুচির সামঞ্জস্য করে বলা যেতে পারে যে, গল্পের পাত্র-পাত্রী যদি কতক বাঙালী আর কতক অন্যপ্রদেশবাসী হয় তবেই সব চেয়ে ভাল ফল হবে। যাঁরা বাংলা গল্প লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং বিহারী উত্তরপ্রদেশী প্রভৃতি সমাজের সঙ্গে পরিচিত, স্থবির না হলে তাঁরা হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে এই কাজে নামতে পারেন। ফরাসী জার্মান চেক হাঙ্গেরীয় পোল প্রভৃতি অনেক বিদেশী ইংরেজীতে লিখে যশস্বী হয়েছেন। তাঁদের ভাষায় মাঝে মাঝে ভুল হয়, তার জন্য একটু আধটু উপহাসও সইতে হয়। কিন্তু রচনার গুণাধিক্যে তাঁদের ছোট ছোট ত্রুটি চাপা পড়ে যায়।

বাঙালী সাহিত্যিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এঁদের জনকতক যদি হিন্দী লেখায় মন দেন তা হলে বাংলা সাহিত্য নিঃস্ব হবে না। এঁদের প্রভাবে হিন্দী ভাষাও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার নিকটতর হবে। নগেন্দ্র গুপ্ত, প্রভাত মুখো, এবং চারু বন্দ্যো তাঁদের অনেক গল্পে বিহারী ও উত্তর-প্রদেশী পাত্র-পাত্রীর অবতারণা করেছেন। এই সকল গল্প হিন্দীতে লেখা হলে ভারতব্যাপী সমাদর পেত। উপেন্দ্র গঙ্গো, শরদিন্দু বন্দ্যো, বিভূতি মুখো এবং বনফুলের অনেক গল্পে অবাঙালী নরনারীর মনোজ্ঞ চিত্র আছে। এঁরা বহুকাল বাংলাদেশের বাইরে বাস করেছেন, সেখানকার সমাজের খবর রাখেন, অল্পাধিক হিন্দী জানেন, এবং সকলেই ভূরিলেখক। মাতৃভাষা চর্চায় ক্ষান্ত না হয়েও এঁরা মাঝে মাঝে মাতৃষ্বসার ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

আর বাণী নয়

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

আর বাণী নয়, মেঘের গুরু গুরু
শেষ হয়ে যাক্। এবার কাজের পালা।
ওই এলো ঝড়, হৃদয় দুরু দুরু।
ওরে অলস! প্রদীপটা তোর জ্বালা।

তোকে যে আজ বাঁচতে হবে জেগে।
বেরিয়ে পড় ভগ্ন-গৃহ ছাড়'।
হৃদয়-পালে চলার বাতাস লেগে
কাজের তরী জমাবে আজ পাড়ি।

আর বাণী নয়, কথার নীরবতায়
এবার জাগুক্ কাজের কোলাহল।
বাক্য যাবে নিঝুম হয়ে যেথা,
জাগবে সেথা দেহের মহাবল।

ঝড়ের মাঝে ওই শোনা যায় ডাক—
'মনের বোঝা মাথায় এবার রাখ'।

টবের ফুল

কল্যাণ সেনগুপ্ত

এই শহর ধূসর। হায়, ভিজে মাটির গান
বাজে না। নীল আকাশ দেখা যায় না এইখানে।
রৌদ্র-মেঘ-বৃষ্টিদের ললিতকলা জানে
এখানে আর ক'জন বল? পাঁপড়ি-ঘেরা প্রাণ
কি ক'রে তবে গন্ধে-গানে উঠবে ফুটে, আর
হাওয়ায় দেবে ভাসিয়ে দেবে ছড়িয়ে তার মন?
পথিক, পাখি, মৌমাছিরা পাবে নিমন্ত্রণ
কেমন ক'রে ফুলের ভীরু নম্র কামনার?

তাইতো এই বন্ধ্যা মাটি ছেড়ে অনেক দূর
ছাতের সেই চিলেকোঠার পাশে আনাই টব।
একটু ভিজে গঙ্গামাটি, অনেকখানি নীল
আকাশ যাকে দিলাম, যাকে দিলাম কথা, সুর—
বাঁধুক না সে গানে এবার নিজের অবয়ব,
ভরা আলোয় কাঁপুক তার স্বপ্ন ঝিলিমিল!!

বিশ্ববিশ্রুত চিত্রকর লেওনার্দো-দা-ভিনচির বহু বিখ্যাত ছবির মধ্যে একটি অতিবিখ্যাত ছবি আছে। এটির নাম—"মোনা লিজা—(Mona Lisa)"। অপূর্ব ভাবময়ী চিত্রটি অগণিত নরনারীকে

মোনালিজার সস্মিত মুখ

মুগ্ধ করে রেখেছে। এর বিষয়বস্তু হল ঃ একটি লাবণ্যময়ী ললনা হাতের ওপর হাত রেখে বসে আছেন, মুখে চাপা হাসি। কলারসিকরা এই হাসিটির নাম দিয়েছেন, Enigmatic smile—রহস্যময় হাসি। কি গভীর রহস্য মনের কোন নিবিড়তম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এসে চাপা হাসিতে প্রকাশ পেয়েছে তার সঠিক বিশ্লেষণ কোনও ধুরন্ধর, শিল্পবিচারক আজও করতে পারেন নি। , লোকে এই হাসি দেখে পাগল, যত না মোনালিজার মুখ দেখে। পেশীপারঙ্গমরা বলেন, ঐ হাসিতে ৩২টা মাংসপেশী চিত্রকরের তুলির নৈপুণ্যে ফুটে উঠেছে। দর্শকমণ্ডলী এসব বিশ্লেষণের ধার ধারেন না, তাঁরা হাসিটিই দেখেন।

মোনালিজার মত অনেকেই হয়ত হেসে থাকেন কিন্তু দা-ভিনচি না থাকায় তা আঁকে কে? যদি বা কোনও চিত্রকর ঐ রকম হাসি কোনও ললনার মুখে ফুটিয়ে তোলেন, তাহলেও দা-ভিনচির সম্মান কেউ তাঁকে দেবেন না। বলবেনঃ আরে ছ্যাঃ, 'মোনালিজার পেণ্টারের কাছে তুলি ধরা।' এটা নিছক পুরাতন প্রীতির নিদর্শন।

আধুনিক যুগে ধীমান আঁকিয়ের অভাব নেই। তাঁরা মোনালিজার হাসি থেকে রকমারি হাসি ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কিন্তু এই আঁকিয়েদের হার মানায় যান্ত্রিক-আঁকিয়ে-ক্যামেরা। চোখের নিমেষে এই যন্ত্র যতরকম হাসি ধরে, মানুষের হাত তা পারে না। এখন শুধু নিঃশব্দ হাসিই ক্যামেরা ধরে না, সশব্দ হাসিও ধরে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ক্ষণিকের হাসিটি ক্যামেরা ফোটোচিত্রে নিখুঁতভাবে চিরস্থায়ী করে রেখে দেয়।

ছবি তোলার সময় ফোটোগ্রাফারের—'Look pleasant please' অথবা হাসি-মুখে এই দিকে চান একথা বরাবরই শুনতে পাবেন। এটা হল জ্ঞাতসারের ব্যাপার। আর অজ্ঞাতসারে নানা মুখ-ভঙ্গীর সঙ্গে যে হাসি ধরা পড়ে তার নাম Candid picture—অকপট চিত্র। হাসির সঙ্গে চেহারাও Candid pictureএর একটা অংশ একথা বলাই বাহুল্য। ঐ ইংরেজী কথাটি কিছুদিন থেকে খুব চলছে। হাসুন, ভেংচান, দাঁত খিঁচুনি প্রকাশ বা জিব বার করুন, অঙ্গভঙ্গী বা কলা দেখান, যা-ইচ্ছা তাই অথবা যাচ্ছেতাই করুন ক্যামেরার কৌশলে সব ক্যানডিড পিকচার হয়ে যাবে।

অনেক সুবিখ্যাত ব্যক্তি, রাষ্ট্রনায়ক-নায়িকারা জানেন যে, তাঁদের ছবি তোলবার জন্যে ক্যামেরিস্ট ওত পেতে বসে আছেন। আর তাঁদের মনে বদ্ধমূল ধারণা যে, না হাসলে তাঁদের ছবির কদর হবে না। আর, সেই হাস্যবিকশিত আস্য ভাল দেখাবে কি দেখাবে না, একথা একবারও ভাবেন না। যাইহোক তাঁরা হাসেন। কথা ও কাজের যে কোনও অবসরে সামান্য ঠোঁট নাড়া হাসি থেকে আকর্ণবিস্তৃত প্রচণ্ড মুখ-ব্যাদনে হাসির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকেন। খবরের কাগজে এরকম হাস্যবদন অনেক দেখতে পাবেন। ক্যানডিড কথাটি এক্ষেত্রে উহ্য।

নানাজাতের হাসির নাম জানাচ্ছি। সব হয়ত এতে পাবেন না, তবুও যা পাবেন, তাই যথেষ্ট ঃ হে হে হে, হা হা হা, হি হি হি, হো হো হো, খিক খিক, খুক খুক, খিল খিল, ঝোলটানা, রাজনীতিক, কুট, ক্রূর, সলাজ, নিলাজ, ম্লান, মুচকি,
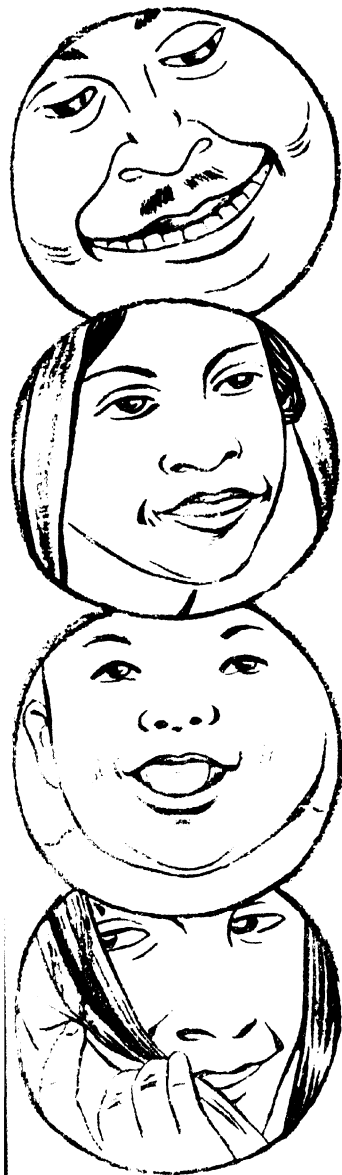
ভালবাসার, বোকার গালভরা, বাঁকা, বিকট, দাঁতকপাটি-মেলানো, মুরুব্বিয়ানা, ধূর্ত, দেঁতো, কাষ্ঠহাসি, অপ্রতিভ, পেটে খিল ধরা, কাতুকুতুর, অট্টহাসি, সংক্রামক, অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে কাঁধ নাচিয়ে, বিরাট হাঁ ও মুখবিকৃতি করে, হাততালি দিয়ে, ভুঁড়িনাচিয়ে, চোখ মটকে, জিভ বার করে, নিকটস্থ লোকের গা ঠেলে বা পেটে খোঁচা মেরে, পিঠ চাপড়ে ইত্যাদি। নিঃশব্দ হাসিতে ওস্তাদ হলেন; রাজনীতিজ্ঞ ও কূটচক্রীরা — বিদ্যুৎ বিকাশের মত ঠোঁটের দুপাশে একটু হাসির ভাব খেলে গেল। হাসির চোটে কেউ কেউ দিগম্বর হয়ে পড়েন, কারো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, হাসির বেগে কশ থেকে লালা গড়ায়, মুখ থেকে থুতুর ফোয়ারা ছুটতে থাকে। আরও দুরকম হাসি আছে ঃ জান্তব ও খগী—অর্থাৎ পাখীর মতো অশ্বের মুখব্যাদনে চিঁ হিঁ হিঁ ডাকের সঙ্গে অনেক মনুষ্যজাতির হাসিতে এর সাদৃশ্য পাওয়া যায় ও উটপাখী—অস্ট্রিচ এর মুখের ভাবে এই খগী হাসিটির নিদর্শন আছে।

অদন্ত শিশুর হাসি বড় মনোরম। বৃদ্ধের ফোকলা মুখের হাসিও অসুন্দর নয়। মহাত্মা গান্ধীর ফোকলা মুখের এই লোকপ্রিয় হাসিটি অনেকেই দেখেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শতসহস্র ছবির মধ্যে কেউ সহাস্যবদন দেখেছেন কি? ক্বচিৎ কোনও ছবিতে গালের দুপাশে একটু হাসির ভাব দেখা দিয়েছে। কবি বোধ হয় জানতেন বা মনে করতেন, হাসলে তাঁকে ভাল দেখাবে না, তাই ও চেষ্টা করতেন না। নরদুর্লভ দাড়িগোঁফের ফাঁকে যদি কেউ তাঁর হাসি তাঁর জীবদ্দশায় দেখে থাকেন, তাহলে তিনি ভাগ্যবান। সেকালের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সহাস্য ছবি বা মূর্তি একান্ত দুর্লভ। একালের কথাই আলাদা।

নিছক হাসি অল্পই দেখা যায়। হাসির পেছনে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য থাকে। তবে, উন্মাদ আপন মনেই হাসে। অনেকে ঠিক হাসেন না, হাসির ভঙ্গীতে ঠোঁট নাড়েন। সকল সময় হাসি লেগে আছে এমন মুখও বিরল নয়। ইংরেজীতে এই হাসির নাম কি Frozen smile? গোমড়া মুখে হাসি দেখলে পুণ্যার্জনের ফল হয়।

সুচতুর লোকে হাসিকে কাজে লাগিয়ে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করেনঃ পাওনাদারের তাগাদায় একটু হেসে সরে পড়েন, দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে অবজ্ঞার হাসি দেখিয়ে ক্ষুদ্র করে ফেলেন, কলঙ্ক কাহিনী হেসে উড়িয়ে দেন, সাহেবী দোকানে বিক্রেত্রী মুচকি হেসে নিকৃষ্ট জিনিস গছিয়ে দেন ও সময় সময় দামের ফেরত পুরোপুরি টাকা পয়সা দিতে ভুলে যান, কূটচক্রীরা হাসিতে বাজিমাত করেন, মরণাপন্নকে ডাক্তার হেসে আশ্বাস দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন, উকিল ব্যারিস্টারেরা
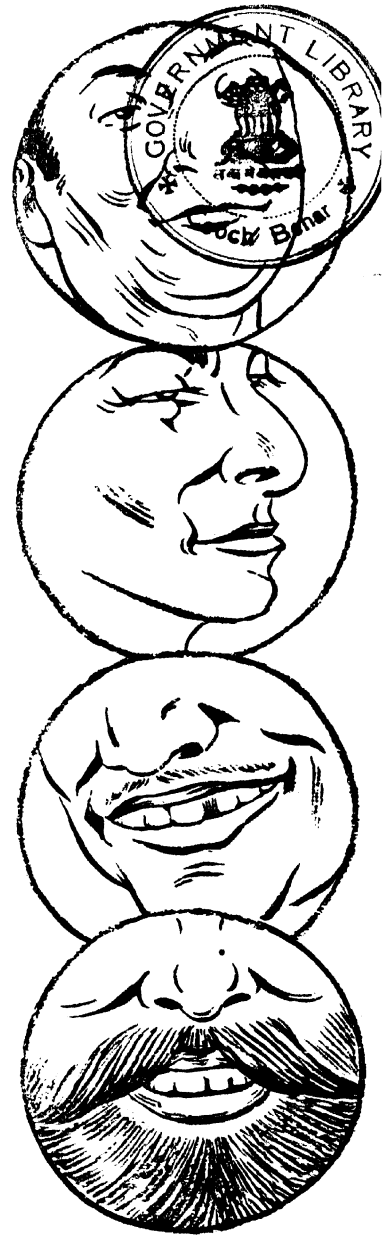
মক্কেলকে হেসে প্রবোধ দেন—'আপিলে খালাস করব,' ব্যবসায়ীরা ভাগ্যবিপর্যয়ে অংশীদারের টাকা হাসিমুখে গিলে ফেলেন, কুপিতা মানময়ী হাসলে হার মানেন—ভবী যদি ভোলেন।

গদ্যে পদ্যে হাসির বহুতর কথাই পড়া যায় ঃ প্রেমিক প্রেমিকাদের হাসিতে গলায় ফাঁসী পরা, নবপরিণীতার সলজ্জ হাসিতে পাগল হওয়া, কবির কথায় 'তোমার একটি হাসির লাগি, দিবসনিশি রহিব জাগি'—এই রকম অনেক কিছু। ললিত পদাবলী ও ভাবাবেশের কাহিনী ছেড়ে দিয়ে রূঢ় সত্যের ব্যাখ্যানও কিছু প্রকাশ করা যেতে পারে ঃ বীরেরা হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছেন, ভারতের অগ্নিযুগে বিপ্লবীরা সহাস্যে ফাঁসিমঞ্চে উঠেছেন, আত্মত্যাগের চরমোৎকর্ষ দেখিয়ে কত নরনারী প্রসন্নমুখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

লোকের দুর্ভোগের অবস্থা দেখলে ছেলে বুড়োরা হাসে, আমোদ পায়। আছাড় খেলেন ঃ কানে এল হা হা হা, হি হি হি শব্দ। মোটা লোক গাড়ির ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতে বিশেষ কষ্ট পাচ্ছেন, সহানুভূতির বদলে শুনলেন—হাসি।

ফোটোগ্রাফার ছোটছেলের ছবি তুলতে গেছেন। মাবাপ চান হাসিমুখ ছবি। অনেক চেষ্টা করে হাসাতে না পেরে তিনি টুলে উঠে কালোকাপড় মাথায় জড়িয়ে, একহাতে ছবিতোলার শাটারের লম্বা নল নিয়ে অপর হাত মুখে দিয়ে নানা শব্দ ও অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে নাচতে লাগলেন। ছেলেটি আমোদবোধ করলে, কিন্তু হাসলে না। তিনি নৃত্যবেগ আরও বাড়িয়ে দিলেন। ফলে, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন। ছেলেটি হেসে উঠল।

পিসি প্রতিপালিত একটি ভ্যাবারাম ছেলের দারুণ শীতে ঠোঁট ফেটেছে। সঙ্গীরা হাসির গল্প করছে। ছেলেটি আড়ষ্ট ঠোঁটে বারবার বলছে—'হাসাস নে ভাই।' সঙ্গীদের গ্রাহ্য নেই। শেষে হাসির কথা এমন বেড়ে উঠল যে, সবাইএর জোর হাসির সঙ্গে ছেলেটিও ঠোঁটের কথা ভুলে গিয়ে হেসে ফেললে। হাসির চোটে আড়ষ্ট ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেল। তার অবস্থা দেখে সঙ্গীরা পেলে বেজায় আমোদ। ভ্যাবারাম জোরে কেঁদে উঠে চেঁচাতে লাগল—। ও পিসি, শালাদের বললাম হাসাসনে, কিন্তু সেই হাসিয়ে দিলে। দ্যাখনা এসে ঠোঁট দুটো ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

এক আলুর গোলায় আগুন লেগে অনেক আলু পুড়ে গেছে। লোক ছুটে নিখরচায় আলুপোড়া খাচ্ছে। গোলার মালিক লোকশানের দুঃখে মাথা চাপড়াচ্ছেন। এক ন্যালাখেপা গোছের লোক পেটভরে আলুপোড়া খেয়ে এক গাল হেসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে—'বাবুমশাই আবার কবে পুড়বে গা?'

অবিশ্বাস্য ব্যাপার বা কথাতেও হাসি আসে ঃ মহাজনের তাগাদায় অস্থির হয়ে খাতক বললেন—'কাল সকালে আসবেন, টাকার ব্যবস্থা করব।' কথামত মহাজন আসতে খাতক বাড়ির সামনে অপরের জমিতে একমুঠো তেঁতুল বীচি ছড়িয়ে জানালেন—'কেমন, টাকার ব্যবস্থা হল কি না?' মহাজন অবাক। খাতক প্রকাশ করলেন—'ঐ বীচি থেকে গাছ, গাছ থেকে তেঁতুল, গুঁড়ি থেকে কাঠ। ওর আয় ঠেকায় কে? নিশ্চিন্ত হলেন [illegible]? আরও কিছু টাকা দিন, সুদে আসলে সব পাবেন।' খাতকের কাণ্ড দেখে মহাজন হেসে ফেলতে, তিনি বলেন—'হাতে হাতে টাকা পেয়ে গেলেন কিনা, তাই মুখে আর হাসি ধরছে না।'

সিনেমায় ইংরেজি ছবি দেখানো হচ্ছে। অভিনয়ে একটি কথা হল, সায়েব-মেমরা প্রথমে হেসে উঠলেন। দেখাদেখি বাঙালী অবাঙালী সবাই হাসিতে যোগ দিলেন। কি কথায় সকলে হাসলেন, পাশের দর্শকটিকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি জবাব দিলেন—'ঐ যে ঐ কথা হল। বুঝতে পারলেন না?' প্রশ্নকারী বললেন—'নাঃ।' দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করতে, বিরক্তিসূচক, 'আঃ' শব্দ শুনলেন। এই সংক্রামক হাসির পাল্লায় অনেকে পড়েন, কিন্তু বোকা বনতে চান না। সভাসমিতিতে গিয়ে দলে পড়ে অনেক কথায় অনেকে হাসেন, কিন্তু সকলেই কি প্রকৃত হাসির কথাটি শুনতে পান বা বুঝতে পারেন?

বিবাহের পাত্রপাত্রীর নাম জানতে চেয়ে কেউ না কেউ শুনেছেনঃ 'কুমারী হাস্যমুখী দত্ত,' 'স্মিতানন চ্যাটার্জি,' 'পেলোহাসিনী রায়,' 'হাস্যালোকবিহারী মজুমদার।' আরও হাসিমাখা নাম জানবার ইচ্ছে হলে ক্যালকাটা গেজেটের এগজামিন সংখ্যার পাতা ওল্টাবেন।
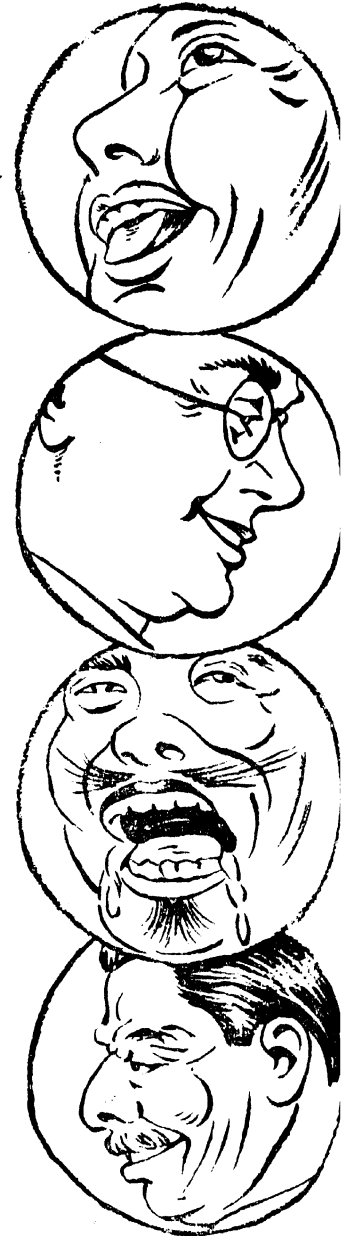
বড় দুঃখেও লোকে হাসে। সংযত বাক অনেকে হাস্যোদ্দীপক কথা বলেন। রাষ্ট্র নায়কেরা নানা অন্তঃসার শূন্য অবান্ত কথায় হাস্যাস্পদ হয়ে পড়েন। চলচ্চিত্র
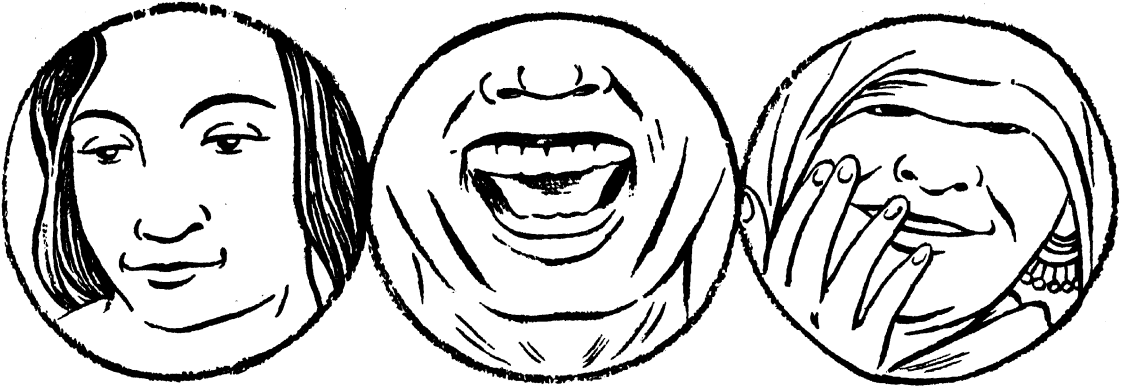
হাসির ছবি দেখে অনেকে হাসেন না। গণ্যমান্য লোকে ব্যঙ্গচিত্রে তাঁদের চেহারা দেখে না হেসে মানহানির মকদ্দমা ঠুকে দেন; অপরে আমোদ পেয়ে হাসেন। অনেক তথাকথিত হাস্যরসাত্মক লেখায় হাস্যরস খুঁজে পাওয়া যায় না; কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার চেষ্টা থাকে। বহু লেখক গল্পে হাসির কথা লেখেন, কিন্তু পাছে পাঠকপাঠিকারা রসবোধ করতে না পারেন, তাই জানিয়ে দেন—'সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।'

দার্শনিক কবি শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার কথায় গেয়েছেন—'তুমি হাসে জগৎ রোয়ে।' কবি দেশের পরাধীনতার লজ্জায় কাতর হয়ে বলেছেন—'হাসি দিয়ে কি লুকাবি লাজে?' বিরহান্তে মিলনের হাসি অতিমধুর। কবির কথায়ঃ 'হেরিব বিরহ-বিধুর অধরে মিলন মধুর হাসি।' আর, 'ছোড়দি জামাইবাবু এসেছে, হি, হি, হি।'

নানা অবস্থায় পড়ে নানাজনে হাসে বা হাসির ভাণ করে। প্রাণখুলে হাসতে পারলে মনের ভার অনেক কমে যায়। অবস্থা বিশেষে—He laughs best who laughs last—ইংরেজি বচনটির সার্থকতা আছে।

ধান ভানাতে

শ্রীমতী মনীষা বসু

শিবের গীত গাইতে, ধান-ভানার রীত মানি!
অনেক সাঁঝ-বেলায় পায়, ঢেঁকির পাড় শোনো,
শাওন-মেঘ আঁধার মঠে কখন দেখি বলো!
শিবের গান গাইলে ধান ভানার হবে কি?

শিবের গানঃ বিষ্টি পড়ে, খড়ের চালাঘরঃ
অঝোর ধারে ফুটোর ফাঁকে বাদল ঘরে এলো;—
কাঁপছে শীতে শিবের বৌ, গাইতে গীত দেখে,—
হাঁড়ির চাল মুঠোও নেই; খাওয়ার হবে কি?

শিবের গানঃ বিষ্টি পড়ে, ঝাপসা গাছপালা;
আবছা আলো-আঁধার ঘরে কিঁদেয় কাঁদে ছেলে,
মাণিক জ্বলে কোথায়? হায়, আগুন শুধু হেথাঃ
শিবের গান গাইবো? ধান ভানবে তবে কে?

দুগ্গা মাগো, অনেক দুখে, বিষ্টি টিপি টিপিঃ
জড়িয়ে গায় আঁচল ভেজা ভানছি তাই ধান;
শিবের গান গাইবো, গাঙ্ শুকনো কেন মা-গো!
বিষ্টি পড়ে অনেক দিন—নদেয় কই বান?
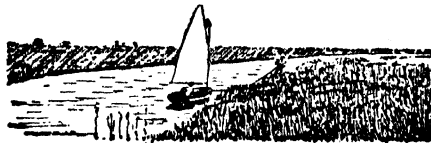
ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত নিয়ে মানুষের শরীরে দেওয়াটা যে কৃত্রিম উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য এক্ষেত্রে রক্তের মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা নেই। তবে ব্লাড ব্যাঙ্কের যে রক্ত মানুষের শরীরে দেওয়া হয়, সেটিকে ঠিক রক্ত বলা চলে না। রক্তের মধ্যের প্লাজমাটুকুই ব্যাঙ্কে রাখা থাকে এবং প্রয়োজন হলে তাই শরীরে দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে রক্তশূন্যতার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ যে জিনিসটি ব্যবহার হচ্ছে, সেটি আসলে রক্তই নয়। Marquette University-র ডাঃ বেঞ্জামিন ওকরা গাছের বীজ থেকে কৃত্রিম রক্ত তৈরি করেছেন। প্রয়োজন হলে এই কৃত্রিম রক্তই মানুষের রক্তের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ওকরা একটি জবা জাতীয় গাছ, অর্থাৎ সাধারণ গাছ-গাছড়ার অন্যতম। এই ওকরা গাছের ফলকে ভাল করে গুঁড়িয়ে নিয়ে ইথার ও অ্যালকোহলের সাহায্যে এর থেকে মোম ও স্নেহজাতীয় পদার্থ বার করে নেওয়া হয়। এর পর বাকী অংশটুকু জলের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত করা হয়। ডাঃ বেঞ্জামিন প্রথমে কুকুরের ওপরেই তাঁর এই নবাবিষ্কৃত রক্তের পরীক্ষা কার্য চালান। প্রথম পরীক্ষায় তিনি একটি কুকুরের শরীর থেকে ৭২ ভাগ রক্ত বার করে দিয়ে এই কৃত্রিম রক্ত কুকুরটির শরীরে প্রবেশ করিয়ে কুকুরটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আর একটি পরীক্ষায় একটি কুকুরের হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার পরও এই রক্ত শরীরে দেওয়ায় কুকুরটি বেঁচে ওঠে। খাঁটি রক্তের চেয়ে এই কৃত্রিম রক্ত অনেক বেশি সুবিধাজনক। এ-রক্ত তাড়াতাড়ি জমে যায় না, আর এতে কোনও রকম অনিষ্টকারী ভাইরাস জন্মাতেই পারে না। আর এই নকল রক্ত অনেকদিন রেখে দেওয়া যায়; এর জন্য কোনও রকম রেফ্রিজারেটরের দরকার হয় না।

সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, দরকার হলে এই রক্ত যত খুশি তৈরি করা যায়। ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে এত প্রচুর রক্ত প্রয়োজন হলেও পাওয়া সম্ভব হয় না। বর্তমানে আমেরিকায় এই রক্তকে পরিস্রুত করে মানুষের ওপর প্রয়োগ করার চেষ্টা চলছে।

*

আজকাল বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন রকম 'শর্টহ্যান্ড' লেখার প্রচলন হয়েছে। অবশ্য

চক্রদত্ত

এ পর্যন্ত চীনা ভাষায় কোনও রকম শর্টহ্যান্ড লেখার প্রচলন ছিল না। পৃথিবীর সব ভাষার মধ্যে চীনা ভাষার বর্ণমালা সংখ্যায় যেমন বেশি, তেমনি জবরজঙ্গ। এজন্যই বোধহয়, এই জবরজঙ্গ বর্ণমালাকে এ পর্যন্ত শর্টহ্যান্ড লেখায় রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আজ অবশ্য চীনা ভাষায় শর্টহ্যান্ড লেখার প্রচলন হয়েছে। S. C. Yip নামক জনৈক চীনা শর্টহ্যান্ড অভিজ্ঞ খুব সহজ পদ্ধতিতে এই শর্টহ্যান্ড লেখার প্রবর্তন করেছেন। S. C. Yip মাত্র চারটি সোজা লাইন, সাতটি বাঁকা লাইন এবং বারোটি বৃত্তাকার, ফাঁস ও আঁকশিজাতীয় চিহ্নের সাহায্যে জটিল চীনা বর্ণমালার ২৭৮৮টি অক্ষর লেখবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। Yip বলেন যে, তাঁর এই শর্টহ্যান্ড লেখনপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য শর্টহ্যান্ড লেখার চেয়ে অনেক সহজ।

*

'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণই আশ।' রোগীর শেষ নিশ্বাসটি পড়বার আগে পর্যন্ত আমরা আশা করি, কোনও বড় ডাক্তার এলেই রোগী বেঁচে উঠতে পারে। কিন্তু বড় ডাক্তারকে সব সময় পাওয়া সত্যিই সম্ভব হয় না কারণ রোগী দেখা ছাড়াও ডাক্তারদের ব্যক্তিগত জীবনের বহু কাজ থাকে। অবসর সময়ে ডাক্তাররা অনেক সময় সামাজিক উৎসব বা সভা-সমিতিতে গিয়ে থাকেন এবং তখনই বাড়িতে খোঁজ করে এঁদের পাওয়া যায় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য আমেরিকায় এক ধরণের উপায় বার হয়েছে। ডাক্তাররা ইচ্ছে করলে কিছু চাঁদার বিনিময়ে স্থানীয় রেডিও কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন, যার ফলে যে কোনও সময়ে যে কোনও জায়গা থেকে রোগীর খবর পেতে পারেন। এই ব্যবস্থা খুব বেশি শক্ত নয়। রেডিও কোম্পানী এক-একটি ডাক্তারের জন্য এক-একটি সাঙ্কেতিক সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়। ডাক্তারকে ডাকার প্রয়োজন হলে ডাক্তারের সহকারী বাড়ি থেকে রেডিও কোম্পানীকে বেতারের সাহায্যে ডাক্তারের সাঙ্কেতিক সংখ্যাটি জানিয়ে দিতে বলে। রেডিও কোম্পানী তখন এক মিনিট অন্তর এই সংকেতটি ঘোষণা করতে থাকে, আর এই সংকেত মতো ডাক্তার শুনতে পায়, এর জন্য ডাক্তারের কাছে রেডিও কোম্পানী একটি ছোট্ট পকেট-রিসিভার দিয়ে দেয়। ডাক্তার রেডিও মারফৎ সংকেতটি পাবার পর টেলিফোনের সাহায্যে জানিয়ে দেয় যে, খবরটি তার কাছে পৌঁচেছে। এর পর রোগী সম্বন্ধে ডাক্তার যথাকর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন।
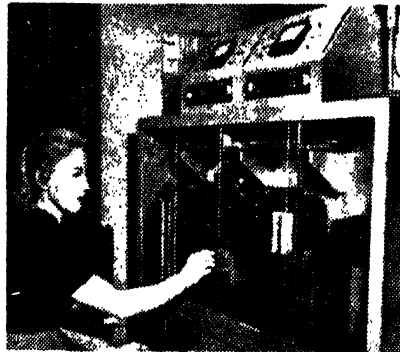
এক নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, রেডিও কোম্পানী ডাক্তারের কাছে খবরটি পাঠাচ্ছে দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, ডাক্তার তাঁর পকেট-রিসিভারের সাহায্যে খবরটি শুনছেন

সেই নিদাঘের মধ্যদিনের আকাশ সেদিন তপ্ত তাম্রের মত রক্তাভ হয়ে উঠেছিল, বলাকামালার চিহ্ন কোথাও ছিল না! সরোবর সলিলের বর্ণ হয়ে উঠেছিল গলিত স্ফটিকের মত, মীনপংক্তির চাঞ্চল্য ছিল না। খর সৌরকর তাপিত এক শৈবালবর্ণ শিলানিকেতন বহিঃস্পৃষ্ট মরকতস্তূপের মত সরোবরের এক প্রান্তে যেন শীতলস্পর্শসুখের তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মণ্ডুকরাজ আয়ুর প্রাসাদ।

সরোবরের আর এক প্রান্তে ছায়ানিবিড় লতাবাটিকার নিভৃতে কোমল পুষ্পদল-পুঞ্জের আসনে সুস্নাত দেহের স্নিগ্ধ আলস্য সঁপে দিয়ে বসেছিল মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনা। সম্মুখেই নীলবর্ণ ও নিবিড় এক কানন, উত্তপ্ত আকাশের দুঃসহ আশ্রয় থেকে পালিয়ে নীলাঞ্জনের রাশি যেন ভূতলে এসে ঠাঁই নিয়েছে।

মণ্ডুকরাজ আয়ু বিষণ্ণ, তাঁর মনে শান্তি নেই। এ দুঃখ ভুলতে পারেন না, কন্যা তার নারীধর্মদ্রোহিনী হয়েছে। কতবার স্বয়ংবরা সভা আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মণ্ডুকরাজ। কিন্তু বাধা দিয়েছে, আপত্তি করেছে এবং অবমর্দিতা ভুজঙ্গিনীর মত রুষ্ট হয়েছে সুশোভনা। —তোমার স্নেহপিঞ্জরের শারিকার জন্য নতুন বীতংস রচনা করো না পিতা, সহ্য করতে পারবো না।

স্বয়ংবরা সভা আহ্বানের আর কোন চেষ্টা করেন না নৃপতি আয়ু। ভয় পেয়ে চুপ করে থাকেন।

ভয়, অপযশের ভয়। লোকাপবাদের আশঙ্কায় ম্রিয়মান হয়ে আছেন মণ্ডুকরাজ আয়ু। কৌতুকিনী কন্যার মূঢ়তার কাহিনী লোকসমাজে নিশ্চয়ই চিরকাল অবিদিত থাকবে না। কিন্তু এ দুশ্চিন্তা করতে গিয়েও বিস্মিত না হয়ে পারেন না রাজা আয়ু, আজও কেন এ অগৌরবের কাহিনী জন-সমাজে অবিদিত হয়ে আছে এবং তিনি কেমন করে লোক-ধিক্কারের আঘাত হতে এখনো রক্ষা পেয়ে চলেছেন।

এ রহস্য একমাত্র জানে কিঙ্করী সুবিনীতা। কৌতুকিনী রাজতনয়ার ছল-লীলার সকল রীতি-নীতি ও বৃত্তান্তের কোন কথা তার অজানা নেই।

অপযশ হতে আত্মরক্ষা করার এক ছলনা-গূঢ় কৌশল আবিষ্কার করেছে সুশোভনা। প্রণয়াভিলাষী কোন পুরুষের কাছে নিজের পরিচয় দান করে না সুশোভনা। কেউ জানে না, কে সেই বরবর্ণিনী নারী, কোথা হতে এল আর চিরকালের জন্য চলে গেল? সে কি সত্যই এই মর্ত্যলোকের কোন পিতার কন্যা? সে কি সত্যই মানব-সংসারে লালিতা নারী? সে কি এক নিবিড় নীলবর্ণ বনস্থলীর সকল পুষ্পের আত্মমথিত সুরভি হতে উদ্ভূতা? অথবা কোন দিগঙ্গনার লীলা-সঙ্গিনী, মুক্তা কুড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য নেমে এসেছিল দুদিনের জন্য? সে কি এই ফুল্লারবিন্দের স্বপ্ন, অথবা ঐ নক্ষত্রনিকরের তৃষ্ণা? আকাশচ্যুত চন্দ্রলেখার মত কে সেই ভাস্বরদেহিনী অপরিচিতা, প্রমত্ত অনুরাগের জ্যোৎস্নায় প্রণয়ীজনের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত করে আবার কোন্ মেঘতিমিরের অন্তরালে সরে গেছে? শালীননয়না সেই অপরিচিতা প্রেমিকার বিরহ সহ্য করতে না পেরে এক নৃপতি উন্মাদ হয়েছেন, একজন রাজত্ব-ভার অমাত্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বনবাসী হয়েছেন। আনন্দহীন হয়েছে সবারই জীবন, প্রিয়াবিরহক্লিষ্ট সেই সব নরপতিদের সকল দুঃখের বৃত্তান্ত জানে রাজতনয়া সুশোভনা, জানে কিঙ্করী সুবিনীতা। তার জন্যে সুশোভনার মনে কোন আক্ষেপ নেই, আর সুবিনীতা সকল সময় মনে মনে আক্ষেপ করে।

কেন এই মায়াবিনী বৃত্তি, আর এই অপ্সরী প্রবৃত্তি? ক্ষান্ত হও রাজকুমারী! কিঙ্করী সুবিনীতার আকুল আবেদনেও কোন ফল হয়নি। সুবিনীতা আরও বিষণ্ণ হয়েছে, মণ্ডুকরাজ আয়ু আরও ম্রিয়মান হয়েছেন এবং শৈবালবর্ণের শিলা-প্রাসাদের চূড়ায় হৈমপ্রদীপ নীহারবাষ্পের আড়ালে মুখ লুকিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

কিন্তু দীপ জ্বলেছে আরও প্রখর হয়ে সুশোভনার কক্ষে। অভিসার শেষে ঘরে

ফিরে এসে যেন বিজয়োৎসবে প্রমত্তা হয়ে ওঠে সুশোভনা। মাধ্বকী আসবের বিহ্বলতায়, সুতন্ত্রিবীণার স্বর-ঝংকারে আর স্বর্ণমঞ্জীরের ধ্বনিতে সুশোভনার উৎসব আত্মহারা হয়। কেলিমঞ্জুলপদা নৃত্য-পরা সেই নিষ্ঠুরা নায়িকার জীবনের রূপ দেখে আতঙ্কে শিহরিত হয় সহচরী, বীজনপত্র শিহরিত হয়।

মুগ্ধ প্রেমিকের আলিঙ্গনের বন্ধন থেকে কি করে এত সহজে ছাড়া পেয়ে সরে আসতে পারে সুশোভনা? কোন্ মায়াবলে? কেউ কি বাধা দেয় না, বাধা দেবার কি শক্তি নেই কারও?

যাদুবলে নয়, ছলনার বলে। এবং সে-ছলনা বড় সুন্দর ও নিখুঁত। বিভ্রমনিপুণা সুশোভনা পুরুষচিত্ত বিজয়ের অভিযান শেষে অদৃশ্য হয়ে যাবার এক কৌশলও আবিষ্কার করে নিয়েছে।

প্রতি প্রণয়ীকে সঙ্গদানের পূর্ব-মুহূর্তে একটি প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করে সুশোভনা। একটি সর্ত, একটি নিয়ম। —তোমার জীবনে চির-সঙ্গিনী হয়ে থাকতে কোন আপত্তি নেই আমার, হে প্রিয়দর্শন নরোত্তম। কিন্তু একটি অঙ্গীকার করুন।

—বল প্রিয়ভাষিণী!

—আমাকে কখনো কোন মেঘাচ্ছন্ন দিনে তমালতরু দেখাবেন না।

—তমালতরুতে তোমার এত ভয় কেন শুচিস্মিতে?

—ভয় নয়, অভিশাপ আছে প্রিয়।

—অভিশাপ?

—হ্যাঁ, মেঘমেদুর দিবসের যে মুহূর্তে তমালতরু আমার দৃষ্টিপথে পড়বে, সেই মুহূর্তে আমাকে আর খুঁজে পাবেন না। জানবেন, আপনার প্রণয়কৃতার্থা এই অপরিচিতার মৃত্যু হবে সেদিন।

প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন প্রণয়ী—মেঘমেদুর দিবসের সকল প্রহর এই বক্ষঃ-পটের অনুরাগশয্যায় সুখসুপ্তা হয়ে তুমি থাকবে বাঞ্ছিতা। তমালতরু দেখবার দুর্ভাগ্য তোমার হবে না।

আর দ্বিধা করে না সুশোভনা। প্রণয়ীর আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করে এবং পর-মুহূর্ত হতে একটি ঘটনার জন্য কৌতুকিনীর প্রাণ যেন অপেক্ষা করতে থাকে। এক প্রহর, দুই প্রহর; একদিন বা দুই দিন; অথবা সপ্ত দিবানিশা, কিংবা মাসান্ত—আনন্দমুগ্ধ এই পুরুষ-চক্ষুর দৃষ্টি হতে খরকামনার বহ্নিছায়া সরে গিয়ে কবে অন্তরের ছায়া নিবিড় হয়ে ফুটে উঠবে?

এ প্রতীক্ষা একদিন সমাপ্ত হয়, যেদিন সুশোভনার করপল্লব সাগ্রহ সমাদরে বুকের ওপর তুলে নিয়ে প্রাতঃসূর্যের কিরণ-কিশলয়ে অরুণিত উদয়শৈলের দিকে তাকিয়ে প্রণয়ী বলে—এত আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে বড় ভয় করে প্রিয়া।

—কিসের ভয়?

—যদি তোমাকে কখনো হারাতে হয়, সে দুর্ভাগ্য সইতে পারবো না বোধ হয়।

সুশোভনার করপল্লব শিহরিত হয়, আনন্দের শিহরণ। প্রণয়ীর ভাষায় অন্তরের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। আন্তরিক হয়ে উঠেছে এই মূঢ় পুরুষের প্রেম। অন্তরজয়ের অভিযান সফল হয়েছে সুশোভনার।

তারপর আর বেশী দিন নয়। নীল মেঘের আড়ম্বরে আকাশ মেদুর হয়ে উঠলো এক-দিন। কৌতুকিনী সুশোভনা বর্ণায়িত দুকুলে কুসুমে আভরণে ও অঙ্গরাগে বর্ষা-ময়ূরীর মত সাজ করে। প্রণয়ীর হাত ধরে বলে—উপবন ভ্রমণে আমায় নিয়ে চল গুণাভিরাম। আজ মন চাইছে, উৎফুল্লা শিখিনীর মত নৃত্য করে তোমাকে নন্দিত করি।

উপবনে প্রবেশ করতেই শোনা যায়, তমালতরুর পত্রান্তরাল হতে কেকারব ধ্বনিত হয়ে দিক চমকিত করে তুলছে। প্রণয়ীর হাত ধরে সুশোভনা যেন কেকোৎ-কণ্ঠা বর্ষাময়ূরীর সঙ্গে নর্তনোৎফুল্ল আনন্দের প্রতিযোগিতা করবার জন্যে তমালতরুর কাছে এসে দাঁড়ায়।

হঠাৎ প্রশ্ন করে সুশোভনা—শিখীবাঞ্ছিত এই ঘনপত্রালীসুন্দর তরুর নাম কি প্রিয়তম?

—তমাল।

—ভাল জিনিস দেখালেন নৃপতি।

দুই অধরের স্ফুরিত হাস্য দমন করে সুশোভনা বেদনার্তভাবে প্রণয়ীর দিকে তাকায়—অভিশাপ লাগলো জীবনে, এই-বার আমাকে হারাবার জন্যে প্রস্তুত থাকুন নৃপতি।

আর্তনাদ করে ওঠে প্রণয়ী। সুশোভনার অলক্তরঞ্জিত চরণদ্বয় দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবার জন্য লুটিয়ে পড়ে। সরে যায় সুশোভনা। —আজ আমাকে একটু নির্জনে থাকতে দিন নৃপতি।

সন্ধ্যা হয়, তমালতলে অন্ধকার নিবিড়-তর হয়ে ওঠে। একাকিনী বসে থাকে সুশোভনা। তার পর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রণয়ী জানেন, খুঁজে আর পাওয়া যাবে না। নীলবর্ণ বনস্থলীর সকল পুষ্পের আঘ্রামথিত সুরভি হতে উদ্ভূতা, সেই পরিচয়হীনা বিস্ময়ের নারী এই মেঘাবৃত সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যেই হারিয়ে গেছে। মৃত্যু হয়েছে।

সেই নীলবর্ণ কাননের দিকেই তৃষ্ণার্তের মত তাকিয়েছিল রাজনন্দিনী সুশোভনা। তার সম্মুখে বসেছিল এক ব্যজনিকা সহচরী।

নবীন কিসলয়ের বৃন্ত পীতকুঙ্কুম রসে অনুলিপ্ত করে সুশোভনার বক্ষঃপটে পত্রলিখা এঁকে দেয় সহচরী। বীজনপত্র আন্দোলিত ক'রে সুশোভনার স্বেদাঙ্কুর-ব্যথিত কপোলে সমীরণ সঞ্চারণ করতে থাকে। নিপুণা কলাবতীর মত ধীর সঞ্চালিত করাঙ্গুলি দিয়ে রাজনন্দিনী সুশোভনার কপাললগ্ন চিকুর নিকুরম্বে বিলোল ভ্রমরক রচনা করে সহচরী। স্তবকিত মেঘভারের মত কবরীবদ্ধ কেশদামের ওপর একখণ্ড সুপ্রভ চন্দ্রোপল গ্রথিত করে দেয়। তারপর এক হাতে সুশোভনার চিবুক স্পর্শ ক'রে দুই চক্ষের সাগ্রহ দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে সহচরী, রাজকুমারীর মুখশোভা সম্পাদনে প্রসাধনের আর কিছু বাকী থেকে গেল কিনা।

সহর্ষে দুই ভ্রূধনু ভঙ্গুরিত ক'রে রাজকুমারী সুশোভনা সহচরীর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—কি দেখছো সুবিনীতা?

—তোমার রূপ দেখছি রাজনন্দিনী।

—কেমন লাগছে দেখতে?

—সুন্দর।

—কি রকম সুন্দর?

—রত্নখচিত অসিফলকের মত উজ্জ্বল, কনকধুতুরার আসবের মত বর্ণমদির, পুষ্পাচ্ছাদিত কণ্টকাটবীর মত কোমল। বস্তুহীনা প্রতিধ্বনির মত তুমি সুন্দরস্বরা। তুমি শ্রাবণী দামিনীর মত ক্ষণলাস্যনর্তিনী বহ্নি।

সুশোভনা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—তুমি ভাষাবিদগ্ধা চারণীদের মত কথা বলছো সুবিনীতা, কিন্তু তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।

সহচরী সুবিনীতার কণ্ঠস্বরে যেন একটা অভিযোগ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—রূপাতিশালিনী রাজতনয়া, তোমার রূপ বড় নিষ্ঠুর। এ রূপ মুগ্ধপুরুষের হৃদয় বিদ্ধ করে, বিবশ করে, আর বিক্ষত করে। তোমার কণ্ঠস্বরের আহ্বান প্রতিধ্বনির ছলনার মত প্রবয়িতার হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত করে শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। তুমি চকিত-স্ফুরিত তড়িল্লেখার মত পথিকজননয়ন শুধু অন্ধ ক'রে দিয়ে সরে যাও। রূপের কৈতবিনী তুমি। সবই আছে তোমার, শুধু হৃদয় নেই।

সহচরীর অভিযোগবাণী শ্রবণ ক'রে ক্ষুব্ধ হওয়া দূরে থাক, উল্লাসে হেসে ওঠে সুশোভনা—তুমি ঠিকই বলেছ সুবিনীতা। শুনে সুখী হলাম।

—কিঙ্করীর বাচালতা ক্ষমা করো রাজকুমারী, একটি সত্য কথা বলবো?

—বল।

—আমি দুঃখিত।

—কেন?

—তোমার এই রূপরম্য মূর্তিকে রত্নাভরণে সাজাতে আর আমার আনন্দ হয় না। মনে হয়, বৃথাই এতদিন ধরে তোমায় এত যত্নে সাজিয়েছি।

—বৃথা?

—হ্যাঁ, বৃথা। একের পর এক, তোমার এক একটি প্রেমহীন অভিসারের লগ্নে তোমার পদতল বৃথাই লাক্ষাপঙ্কে রঞ্জিত করেছি। বৃথাই এত সমাদরে পরাগচিত্রিত করেছি তোমার বরতনু। বৃথাই সুচারু কজ্জলমসীরেখায় প্রসাধিত ক'রে তোমার এই নয়নদ্বয়ে মৃগীলোচনদর্পহারিণী নিবিড়তা এনে দিয়েছি।

—তোমার কর্তব্য করেছ কিঙ্করী, কিন্তু বৃথা বলছো কোন্ দুঃসাহসে?

—দুঃসাহসে নয়, অনেক দুঃখে বলছি রাজনন্দিনী। তুমি আজও কারও প্রেমবশ হলে না, কোন প্রণয়ী হৃদয়ের সম্মান রাখলে না। আমার দু'হাতের যত্নে সাজিয়ে দেওয়া তোমার প্রেমিকামূর্তি শুধু প্রণয়ীর হৃদয় বিদ্ধ ক'রে রক্তক্ষত ও ছিন্ন ক'রে ফিরে আসে। আমার বড় ভয় হয় রাজনন্দিনী।

অবিচলিত স্বরে সুশোভনা প্রশ্ন করে—ভয় আবার কিসের কিঙ্করী?

—এক একটি ছল প্রণয়ের লীলা অবসানে যখন তুমি ভবনে ফিরে আস কুমারী, তখন আমি তোমার ঐ পদতলের দিকে তাকিয়ে দেখি। মনে হয়, তোমার চরণাসক্ত অলক্ত কোন্ হতভাগ্য প্রেমিকের আহত হৃৎপিণ্ডের রক্তে আরও শোণিম হয়ে ফিরে এসেছে।

প্রগল্‌ভ হাসির উচ্ছ্বাস তুলে, যৌবন-মদায়িত তনু হিল্লোলিত ক'রে সুশোভনা বলে—তোমার মনে ভয় হয় মূঢ়া কিঙ্করী, আর আমার মনে হয়, নারী জীবন আমার ধন্য হলো। এক একজন মহাবল যশস্বী ও অতুল বৈভবগর্বে উদ্ধত নরপতি এই পদতললীন অলক্তে কমলগন্ধ-বিধুর ভৃঙ্গের মত চুম্বন দানের জন্য লুটিয়ে পড়ে, পর-মুহূর্তে সে উদ্‌ভ্রান্তের জন্য শুধু শূন্যতার কুহক স্বপনে রেখে দিয়ে চিরকালের মত সরে আসি। বল দেখি সহচরী, নারী জীবনে এর চেয়ে বেশী সার্থক আনন্দ ও গর্ব কি আর কিছু আছে?

—ভুল বুঝেছ রাজতনয়া, এমন জীবন কোন নারীর কাম্য হতে পারে না।

—নারী জীবনের কাম্য কি?

—বধূ হওয়া।

আবার অট্টহাসির শব্দে মুখর্া ব্যজনিকা কিঙ্করীর উপদেশ যেন বিদ্রূপে ছিন্ন করে সুশোভনা বলে—বধূ হওয়ার অর্থ পুরুষের কিঙ্করী হওয়া, কিঙ্করী হয়েও কেন সেই ক্ষুদ্র জীবনের দুঃখ কল্পনা করতে পার না সুবিনীতা? আমাকে মরণের পথে যাবার উপদেশ দিও না কিঙ্করী।

—আমার অনুরোধ শোন কুমারী, পুরুষহৃদয় সংহারের এই নিষ্ঠুর কপট প্রণয়বিলাসের মোহ বর্জন কর। প্রেমিকের প্রিয়া হও, বধূ হও, ঘরণী হও।

বিদ্রূপকুটিল দৃষ্টি তুলে সুশোভনা আবার প্রশ্ন করে—কি ক'রে প্রিয়া-বধূ-ঘরণী হতে হয় কিঙ্করী? তার কি কোন নিয়ম আছে?

—আছে।

—কি?

—প্রেমিককে হৃদয় দান কর, প্রেমিকের কাছে সত্য হও।

হেসে ফেলে সুশোভনা—হৃদয় নামে কোন বোঝা নেই আমার জীবনে সুবিনীতা। যা নেই, তা দান করবো কেমন ক'রে বল?

ব্যজনিকা কিঙ্করীর চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়। ব্যথিত স্বরে বলে—আর কিছু বলতে চাই না রাজনন্দিনী। শুধু প্রার্থনা করি, তোমার জীবনে হৃদয়ের আবির্ভাব হউক।

বিরক্ত দৃষ্টি তুলে সুশোভনা জিজ্ঞাসা করে—তাতে তোমার কি লাভ?

—কিঙ্করীর জীবনেরও একটি সাধ তাহ'লে পূর্ণ হবে।

—কিসের সাধ?

—তোমাকে বধূবেশে সাজাবার সাধ। ঐ সুন্দর হাতে বরমাল্য ধরিয়ে দিয়ে তোমাকে দয়িতভবনে পাঠাবার শুভলগ্নে এই মুখর্া ব্যজনিকার আনন্দ শঙ্খধ্বনি হয়ে একদিন বেজে উঠবে। এই আশা আছে বলেই আমি আজও এখানে রয়েছি রাজকুমারী, নইলে তোমার ভৎর্সনা শুনবার আগেই চলে যেতাম।

সুশোভনা রুষ্ট হয়,—তোমার এই অভিশপ্ত আশা অবশ্যই ব্যর্থ হবে কিঙ্করী, তাই তোমাকে শাস্তি দিলাম না। নইলে তোমার ঐ ভয়ঙ্কর প্রার্থনার অপরাধেই তোমাকে আজই চিরকালের মত বিদায় করে দিতাম।

সুশোভনা গম্ভীর হয়। সহচরী সুবিনীতাও নিরুত্তর হয়। স্তব্ধ নিদাঘের মধ্যাহ্নে লতাবাটিকার ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে অঙ্গরাগসেবিত তনুশোভা নিয়ে বসে থাকে মণ্ডুকরাজপুত্রী সুশোভনা। সম্মুখের নীলবর্ণ কাননের উপান্তপথের দিকে অদ্ভুত তৃষ্ণাতুর দৃষ্টি তুলে চেয়ে থাকে। ব্যজনিকা সুবিনীতা নিঃশব্দে বীজনপত্র আন্দোলিত করে কিঙ্করীর কর্তব্য পালন করতে থাকে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সুশোভনা। কানন-পথের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি সুশোভনার দুই চক্ষু মৃগয়াজীবা ব্যাধিনীর চক্ষুর মতই দেখায়। কি যেন দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে উঠছে সুশোভনার নিবিড় কৃষ্ণপক্ষ্ম-সেবিত দুই লোচনের তারকা। সহচরী সুবিনীতাও কৌতূহলী হয়ে কাননভূমির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিতভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়। শিহরিত হস্তের বীজনপত্র কেঁপে ওঠে।

অশ্বারূঢ় এক কান্তিমান যুবাপুরুষ চলেছেন কাননপথে। বোধ হয় পথশ্রান্ত

হয়েছেন, কিংবা পিপাসার্ত হয়েছেন। তাই কাননের অভ্যন্তরের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে চলেছেন, শীতল সরসীসলিলের সন্ধানে। তাঁর রত্নসমন্বিত কিরীট সূর্য-করানকরের স্পর্শে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। কে এই বলদৃপ্ততনু যুবাপুরুষ? মনে হয়, কোন রাজ্যাধিপতি নরশ্রেষ্ঠ।

উঠে দাঁড়ায় সুশোভনা। ঐ কিরীটের বিচ্ছুরিত দ্যুতি যেন সুশোভনার চক্ষে খর বিদ্যুতের প্রমত্ত লাস্য জাগিয়ে তুলেছে। কিংকরী সুবিনীতা সভয়ে জিজ্ঞাসা করে—ঐ আগন্তুকের পরিচয় তুমি জান নাকি রাজকুমারী?

—জান না, অনুমান করতে পারি।

—কে?

—বোধহয় ইক্ষ্বাকুকুলগৌরব সেই মহাবল পরীক্ষিৎ। শুনেছি, আজ তিনি মৃগয়ায় বের হয়েছেন।

সুবিনীতা বিস্মিত হয়ে এবং শ্রদ্ধাপ্লুত স্বরে প্রশ্ন করে—ইক্ষ্বাকুগৌরব পরীক্ষিৎ? অযোধ্যাপতি, পরম প্রজাবৎসল, মহাবদান্য, ভীতজনরক্ষক, আর্তজনশরণ সেই ইক্ষ্বাকু?

সুশোভনা হাসে—হ্যাঁ কিংকরী, নরেন্দ্রসম পরাক্রান্ত ইক্ষ্বাকুকুলতিলক পরীক্ষিৎ। ধনুর্বাণ ও তূণীরে সজ্জিত, কটিদেশে বিলম্বিত দীর্ঘ অসি, দৃপ্ত তুরঙ্গের পৃষ্ঠাসীন বীরোত্তম পরীক্ষিৎ। কিন্তু...কিন্তু তোমাকে আর আশ্চর্য করে দিতে চাই না সুবিনীতা। তুমি মূর্খা, তুমি কিংকরী মাত্র, কল্পনাও করতে পারবে না তুমি, ঐ ধনুর্বাণতূণীরে সজ্জিত পরাক্রান্তের পুরুষহৃদয় একটি কটাক্ষে চূর্ণ করতে কি আনন্দ আছে!

কিংকরী সুবিনীতা সন্ত্রস্ত হয়ে সুশোভনার হাত ধরে। —নিবৃত্ত হও রাজতনয়া। অনেক করেছ, তোমার মিথ্যা-প্রণয়কৈতবে বহু ভগ্নহৃদয় নৃপতির জীবনের সব সুখ মিথ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু ... প্রজাপ্রিয় ইক্ষ্বাকুর সর্বনাশ আর করো না।

মদহাস্যে আকুল হয়ে কিংকরীর হাত সরিয়ে দেয় সুশোভনা। মণিময় সপ্তকী কাঞ্চী ও মুক্তাবলী তুলে নিয়ে নিজের হাতেই নিজেকে সজ্জিত করে। তারপর হাতে তুলে নেয় সপ্তস্বরা একটি বীণা। প্রস্তুত হয়ে নিয়ে সুশোভনা বলে—আমি যাই সুবিনীতা। বৃথা মূর্খের মত বিষণ্ণ হয়ো না। কিংকরীর কর্তব্য সদাহাস্যমুখে পালন কর, তাহলেই সুখী হবে।

লতাবাটিকার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সুশোভনা একবার থামে। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে। তার পরেই সুবিনীতাকে আদেশ করে। —যদি আজই না ফিরি, তবে ইক্ষ্বাকুর প্রাসাদলগ্ন উপবনের প্রান্তে চর ও শিবিকা অতি সংগোপনে প্রেরণ করো সুবিনীতা।

লতাবাটিকার নিভৃত থেকে বের হয়ে পান্থবিটপীর ছায়ায় ছায়ায় কাননভূমির দিকে অগ্রসর হতে থাকে সুশোভনা। মাথা হেঁট ক'রে অশ্রুসিক্ত চক্ষে অনেকক্ষণ লতাবাটিকার নিভৃতে চুপ করে বসে থাকে সুবিনীতা। আর একবার কানন-পথের দিকে তাকায়, সুশোভনাকে আর দেখা যায় না। লতাবাটিকার নিভৃত থেকে মণ্ডুকরাজের শৈবালবর্ণ প্রাসাদের কক্ষে একাকিনী ফিরে আসে সুবিনীতা।

সুন্দর কানন। বহুলবল্কল প্রিয়াল আ[...] শিবদ্রুম বিল্বের ছায়ায় সমাকীর্ণ। লত[া]পরিবৃত শত শত নভমাল কোবিদার [...] শোভাঞ্জন। চণ্ড নিদাঘের ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক[...] এই নিবিড় বনভূভাগের প্রতি তৃণ লতা [...] পুষ্পের প্রাণ যেন বিহগস্বরলহরী হ[...] উৎসারিত নাদপীযূষ পানে সরসিত হ[...] রয়েছে। কমলকিঞ্জল্কে সমাচ্ছন্ন [...] সরোবরের জল পান করে পিপাসার্তি শ[...] করলেন পরীক্ষিৎ। মৃণাল তুলে নিয়ে এসে ক্লান্ত অশ্বকে খেতে দিলেন। তারপর

মক্লম অপনোদনের জন্য নবপল্লবকুল-ল্লবের ছায়াতলে তৃণাস্তীর্ণ ভূমির ওপর য়ন করলেন।

পরীক্ষিতের সুখতন্দ্রা অচিরে ভেঙে যায়। উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসেন। বীণার তন্ত্রি-ঝঙ্কার, তার সঙ্গে রমণীকণ্ঠনিঃসৃত শ্রুতি-রমণীয় সুস্বর, মন্থর বনবায়ু যেন সেই স্বরমাধুরীতে আপ্লুত হয়ে গেছে।

উঠলেন রাজা পরীক্ষিৎ। বনস্থলীর প্রতি তরুতলে লক্ষ্য রেখে সন্ধান করে ফিরতে থাকেন। অবশেষে দেখতে পান, সেই সরোবরের তটে শৈবালাসনে উপবিষ্টা চন্দ্রোপলপ্রভাসমন্বিতা এক নারী সলিল-হিল্লোলিত রক্ত-কোকনদের মৃণাল তার অলক্তলিপ্ত পদের মৃদুল আঘাতে আন্দোলিত করছে। করধৃত বীণার তন্ত্রী চম্পককলিকাসদৃশ করাঙ্গুলির লীলায় ঝঙ্কারিত করে গান গাইছে নারী।

মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন রাজা পরীক্ষিৎ। ও কি কোন মানবনন্দিনীর মূর্তি? অথবা প্রমূর্তা বনশ্রী? কিংবা এই সরোবরের সলিলোত্থিতা দ্বিতীয় এক সুধাধরা দেবিকা?

এগিয়ে যান রাজা পরীক্ষিৎ। অপরিচিতার সম্মুখবর্তী হন। গীত বন্ধ করে অপরিচিতা নারী আগন্তুক পরীক্ষিতের দিকে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করেন। এতক্ষণে স্পষ্ট করে দেখতে পান পরীক্ষিৎ, নারীর কবরীগ্রথিত চন্দ্রোপলের রশ্মির চেয়ে বেশি শুভ্র ও স্নিগ্ধ, তার দুই এণলোচনের রশ্মি। ক্ষণ বলেন পরীক্ষিৎ—পরিচয় দাও শক্ষী।

—পরিচয় নেই।

—তোমার পিতা? মাতা? দেশ?

—কিছুই জানি না।

—বিশ্বাস করতে পারি না বিম্বোষ্ঠি। শ্তকীমেখলা ঐ কৃশকটিতট, মুক্তাবলী শোভিত ঐ সুধাধবল কণ্ঠদেশ, পীত-কুঙ্কুম পঙ্কে অঙ্কিত ঐ নবনীতকোমল বক্ষঃপট—কবরীর ঐ চন্দ্রোপল আর এই সপ্তস্বরা বিপঞ্চী, এ কি পরিচয়হীনতার পরিচয়?

—আমার পরিচয় আমি। এছাড়া আর কোন পরিচয় জানি না।

অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন পরীক্ষিৎ। নারী প্রশ্ন করে—কি দেখছেন গুণবান?

—দেখছি, তুমি বিস্ময় অথবা বিভ্রম।

—আপনি কে?

—আমি ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব পরীক্ষিৎ।

—এইবার যেতে পারেন রাজা পরীক্ষিৎ। বনলালিতা এই পরিচয়হীনার কাছে আপনার কোন প্রয়োজন নেই।

—কর্তব্য আছে।

—কি?

—রাজভবনে তোমাকে নিয়ে যেতে চাই, এ বনবাসিনীর জীবন তোমাকে শোভা পায় না সুনয়না।

—বুঝলাম, রাজার কর্তব্য পালন করতে চাইছেন মহাবদান্য প্রজাবৎসল পরীক্ষিৎ। এ উপকারে আমার কোন সাধ নেই নৃপতি।

ক্ষণিকের জন্য নিরুত্তর হয়ে থাকেন পরীক্ষিৎ। চোখের দৃষ্টি নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে। প্রেমপূরিত কণ্ঠস্বরে আহ্বান করেন। —রাজভবনে নহে, আমার মনোভব ভবনে এস সুতনুকা। প্রণয়দানে ধন্য কর আমার জীবন।

সপ্তস্বরা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় নারী। —একটি প্রতিশ্রুতি চাই রাজা পরীক্ষিৎ।

—বল।

—আপনি জীবনে কখনো আমাকে সরোবর সলিল দেখাবেন না।

—কেন?

—অভিশাপ আছে আমার জীবনে। প্রণয়ী-জনের সঙ্গে কোন ক্ষণে যদি আমাকে সরোবর সলিলের সান্নিধ্যে আসতে হয়, তবে আমার মৃত্যু হবে।

—অভিশাপের শঙ্কা দূর কর সুযৌবনা। তুমি রবে আমার প্রমোদভবনের চিরতরা হয়ে। কোন সরোবরের সান্নিধ্যে যাবার প্রয়োজন হবে না কোনদিন।

মণিদীপিত প্রমোদভবনের নিভৃতে পরীক্ষিতের প্রণয়াকুল জীবনের প্রতি দিন-যামিনীর মুহূর্তগুলি সুশোভনার নৃত্যে, গীতে, লাস্যে ও চুম্বনরভসে বিহ্বল হয়ে থাকে। এইভাবেই একদিন, সেদিন বৈশাখী সন্ধ্যার প্রথম প্রহরে পূর্ণেন্দুশোভিত আকাশ হতে কুন্দধবল কৌমুদীকণিকা এসে লুটিয়ে পড়ে প্রমোদভবনের ভেতরে। সেদিন মণিদীপ আর জ্বাললেন না রাজা পরীক্ষিৎ। শান্ত জ্যোৎস্নালোকে প্রমোদ-সঙ্গিনী সেই মেঘচিকুরা নারীর মুখের দিকে মমতাপূরিত ও সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইলেন। অনুভব করেন পরীক্ষিৎ, আকাশের ঐ শশাঙ্কচ্ছবির চেয়ে এই মুখচ্ছবিও কম সুন্দর নয়। পূর্ণচন্দ্রের মাঝে মৃগরেখার মত এই বরনারীর ললাটে কৃষ্ণ-চিকুরের ভ্রমরক সুস্থির হয়ে রয়েছে।

সযত্নে নারীর ললাটলগ্ন ভ্রমরক নিজ হাতে বিন্যস্ত করতে থাকেন পরীক্ষিৎ হাত ধরেন, মৃদুস্বানত শঙ্খের অস্ফুট নিঃশ্বাসধ্বনির মত নারীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে আহ্বান করেন—প্রিয়া

প্রমদা নারীর চক্ষু মণিদীপের মত হঠাৎ প্রখর হয়ে ওঠে। —কি বলতে চাইছেন রাজা?

—তুমি আমার মনোভব ভবনের চিরতর নও প্রিয়া, তুমি আমার অন্তরভবনের চিরতরা। ভালবাসার দীপ জেলেছে আমার হৃদয়ে, তাই মণিদীপ নিভিয়ে দিয়েও দেখতে পাই, তুমি কত সুন্দর।

কৌতুকিনীর অধর সুস্মিত হয়ে ওঠে এতদিনে আন্তরিক হয়েছেন রাজা পরীক্ষিৎ প্রমদা-তনুবিলাসী রাজার আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক প্রেমের পরিণাম লাভ করেছে অপরিচিতা নারীকে হৃদয় দিয়ে চির জীবনের আপন করে নিতে পেরেছেন।

পরীক্ষিতের হাত ধরে প্রমদা নারী হঠাৎ আবেগাকুল হয়ে ওঠে। —চন্দ্রিকাবিহ্বল এমন বৈশাখী রাতে আজ আর ঘরে থাকতে মন চাইছে না প্রিয়। চল তোমার উপবনে

নবকাশসন্নিভ সুশ্বেত ক্ষৌম পট্টবাসে সুতনু সজ্জিত করে, শ্বেত স্ফটিকোপল কণিকায় খচিত শ্বেতাংশুক জালে কবরী আচ্ছন্ন করে, শ্বেত পুষ্পের মালিকা কণ্ঠ লগ্ন করে কলহংসের মত উৎফুল্ল হয়ে নৃপতি পরীক্ষিতের সঙ্গে উপবনে প্রবেশ করে সুশোভনা। পরীক্ষিতের মুখের দিকে তাকিয়ে আবেদন করে।—আজ আমার মন চাইছে রাজা, কলহংসিনীর মত জলকেলি করে আপনাকে দুই চক্ষুর দৃষ্টি আনন্দিত করি।

—তাই হবে প্রিয়া।

উপবনের এক সরোবরের তটে এসে দাঁড়ালেন রাজা পরীক্ষিৎ, সঙ্গে সুশোভনা

মৃণালভুক্ মরাল আর কলহংসের দল অবাধ আনন্দে সরোবর সলিলে সন্তরণ করে ফিরছে। উৎফুল্ল কলহংসের মত হর্ষভরে জলে নামে সুশোভনা। কয়েকটি মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই হর্ষহীন বেদনাবিষণ্ণ মুখে পরীক্ষিতের দিকে তাকায়। —আমাকে এই সরোবর সলিলের সান্নিধ্যে কেন নিয়ে এলেন রাজা পরীক্ষিৎ।

—তোমারই ইচ্ছায় এসেছি প্রিয়া।

—আপনার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করুন রাজা।

প্রতিশ্রুতি? এতক্ষণে স্মরণ করতে পারেন পরীক্ষিৎ, প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে তিনি তার জীবনপ্রিয়াকে সরোবর সলিলের সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছেন।

—আপনি ভুল করে আমাকে আমার জীবনের অভিশাপের সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছেন রাজা। এখন আমাকে বিদায় দেবার জন্য প্রস্তুত হউন।

—তোমাকে বিদায় দিতে পারবো না প্রিয়া, এ জীবন থাকতে না।

ভগ্নহৃদয়ের আর্তনাদ নয়, অসহায়ের বিলাপ নয়, সংকল্পে কঠিন এক বলিষ্ঠের দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

চমকে ওঠে সুশোভনা। জীবনে এই প্রথম শঙ্কাতুর হয়ে ওঠে নিঃশঙ্কিণী কৌতুকিনীর মন।

—আবার ভুল করবেন না রাজা। দৈব অভিশাপের কোপ মিথ্যে করবার শক্তি আপনার নেই।

—সত্যই অভিশাপ, না অভিশাপের কৌতুক?

সুশোভনার নিঃশ্বাস-বায়ু বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে।

পরীক্ষিৎ এগিয়ে যেয়ে সুশোভনার সম্মুখে দাঁড়ালেন।—এস প্রিয়া, বাহু-বন্ধনে সর্বক্ষণকাল বক্ষঃলগ্ন করে রাখি তোমাকে, দেখি কোন্ অভিশাপের প্রেত আমার কাছ থেকে কেমন করে তোমার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যেতে পারে।

সভয়ে পিছিয়ে সরে দাঁড়ায় সুশোভনা। —বিনতি করি রাজা পরীক্ষিৎ, কাছে আসবেন না। আমাকে এইস্থানে কিছুক্ষণ একাকিনী থাকতে দিন।

ভীরু নারীর এই করুণ বিনতির অমর্যাদা করলেন না পরীক্ষিৎ। সরোবর-তটে থেকে চলে এসে উপবনের আম্র-বীথিকায় বিচরণ ক'রে ফিরতে থাকেন। আম্রমঞ্জরী হতে ক্ষরিত মধুবিন্দু ললাট-চুম্বন করে যেন সান্ত্বনা দেয়; মত্ত কোকিলের কুহুকূজনে ধরণী সংগীতময় হয়ে ওঠে, তবুও মনের উদ্বেগ ভুলতে পারছিলেন না পরীক্ষিৎ। সত্যিই কি একটা অভিশাপের কৌতুকে এই বৈশাখী যামিনীর চন্দ্রিকা তাঁর জীবনে প্রিয়াহীন শূন্যতা সৃষ্টির জন্যই দেখা দিয়েছে?

এ উদ্বেগ সহ্য হয় না, পরমুহূর্তে ত্বরিতপদে আবার সরোবরতটে এসে দাঁড়ান। —প্রিয়া।

ডাকতে গিয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন পরীক্ষিৎ। শূন্য ও নির্জন সরোবরতটে কোন নারীমূর্তি আর দাঁড়িয়ে ছিল না।

পরীক্ষিতের দুই চক্ষের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম সায়কের মত চারিদিকের শূন্যতা ভেদ করে ছুটতে থাকে। সরোবরের দিকে তাকিয়ে থাকেন; সন্দেহ করেন, সরোবরের খল-সলিল বুঝি তাঁর প্রিয়াকে গ্রাস করেছে। পরক্ষণে চোখে পড়ে, সরোবরের অপর প্রান্তে যেন এক মত্ত কলহংসের শ্বেত দেহপিণ্ড ভাসতে ভাসতে গিয়ে তট স্পর্শ করেছে। কতগুলি প্রেতচ্ছায়া এসে যেন মুহূর্তের মধ্যে সেই কলহংস-দেহ তুলে নিয়ে চলে গেল।

বিশ্বাস করতে পারেন না। সমস্ত ঘটনা ও দৃশ্যগুলিকেই সন্দেহ হয়; বুঝি তার উদ্বিগ্ন চিত্তের একটা বিভ্রম, ব্যথিত দৃষ্টির প্রহেলিকা।

কিন্তু আর এক মুহূর্তও কালক্ষেপ করলেন না পরীক্ষিৎ। উপবন প্রহরী-দের ডাক দিলেন, সরোবরের বাঁধ ভেঙে দিয়ে সরোবর জলশূন্য করলেন। কিন্তু নিমজ্জিতা কোন নারীদেহের সন্ধান পেলেন না।

ছুটে গিয়ে রাজভবনের মন্দুরা হতে রণাশ্বের মুখে রজ্জুযোজিত করেন পরীক্ষিৎ এবং অশ্বারূঢ় হয়ে পবনগতিবেগে সরোবরের প্রান্ত লক্ষ্য করে ধাবমান হন।

প্রান্তর আর বনোপান্তের সর্বত্র সন্ধান করেও সেই নারীমূর্তির সাক্ষাৎ কোথাও পেলেন না পরীক্ষিৎ। হতাশ হয়ে ফিরলেন রাজভবনের দিকে। ক্লান্ত মনের স্বেদজলের ধারার মতই পরাক্রান্ত পরীক্ষিতের দুই চক্ষু হতে অশ্রুধারা ঝরে পড়ে।

আবার উপবন-পথে প্রবেশ করেন রাজা পরীক্ষিৎ। হঠাৎ দেখতে পান, গোপন-চর চরের মত একটা ছায়ামূর্তি যেন বৃক্ষান্তরালে দাঁড়িয়ে আছে। কটিবন্ধ খড়্গ হাতে তুলে নিয়ে গোপনচর ছায়ামূর্তির দিকে ধাবমান হন পরীক্ষিৎ। কিন্তু ধরতে পারলেন না। সে ছায়ামূর্তিও দৌড় দিয়ে এক সলিল প্রবাহিকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অদৃশ্য হয়। কিন্তু তারই মধ্যে চরের মূর্তিটা স্পষ্ট করেই দেখে ফেললেন পরীক্ষিৎ, এক মণ্ডূক।

মণ্ডূকরাজের শৈবালবর্ণ শিলানিকেতনে রাজপুত্রীর কক্ষে এইবার কিঙ্কিনীকন-লাঞ্ছিত কোন চরণ তেমন করে আর নৃত্যায়িত হয়ে উঠলো না। সকল অভিসারের আনন্দও মাধুকরীবারিতে তেমন করে আর মত্ত হতে পারলো না। কপটাভিসারিকা যেন কণ্টকবিদ্ধ চরণে ফিরে এসেছে।

অপরাহ্ন কাল। মণ্ডূক জনপদের বাতাস হঠাৎ যেন আর্তনাদে আর হাহাকারে পীড়িত হয়ে উঠলো। প্রাসাদকক্ষের বাতায়ন পথে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত আর্তনাদের রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে সুশোভনা, কিন্তু বুঝতে পারে না। মনে হয়, একটা ধূলিলিপ্ত ঝঞ্ঝা যেন এই বৈশাখী অপরাহ্নকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে।

—এ কোন্ নতুন সর্বনাশ করেছ রাজপুত্রী?

বাহিরে নয়, কক্ষের ভিতরেই একটা আর্ত কণ্ঠস্বরের ধিক্কার শুনে চমকে ওঠে সুশোভনা। মুখ ফিরিয়ে রূঢ়ভাষিণী কিংকরী সুবিনীতার দিকে তাকায়। —কি হয়েছে কিংকরী?

—পরাক্রান্ত পরীক্ষিৎ মণ্ডূক জনপদ আক্রমণ করেছেন। শত শত মণ্ডূক সংহার করে ফিরছেন। প্রজা আর্তনাদ করছে, রাজা আয়ু অশ্রুপাত করছেন। শোকের শোণিতে ও দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠলো মণ্ডূকজনসংসার। কোন্ নতুন কৌতুকসুখে রাজ্যের এ সর্বনাশ করলে নির্মমা? পরাক্রান্ত পরীক্ষিতের কাছে কেন তোমার পরিচয় প্রকট করে দিয়ে এসেছ কপটিনী?

—মিথ্যা অভিযোগ করো না বিমূঢ়ে। নিমেষের মনের ভুলেও নৃপতি পরীক্ষিতের কাছে আমার পরিচয় প্রকট করিনি।

কিংকরী সুবিনীতা অপ্রস্তুত হয়। —আমার সংশয় মার্জনা কর রাজপুত্রী, কিন্তু......।

—কিন্তু কি?

—কিন্তু ভেবে পাই না, মহাচেতা পরীক্ষিৎ কেন অকারণে অবৈরী মণ্ডূক জাতির বিনাশে হঠাৎ প্রমত্ত হয়ে উঠলেন?......আমি রাজ-সমীপে চললাম কুমারী।

যেন দ্রুত বার্তা বহনের জন্যই ব্যস্তভাবে চলে যায় কিংকরী সুবিনীতা।

কক্ষের বাতায়ন-সন্নিকটে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে সুশোভনা। অপরাহ্ন-মিহির নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য সেই বৈশাখী ঝঞ্ঝার রুদ্ধ নিঃস্বন নিকটতর

আসছে। মনে হয় সুশোভনার, মণ্ডুক-পদের উদ্দেশ্যে নয়, এই প্রতিহিংসার আসছে তারই জীবনের সকল গর্ব ক্রমণ করতে।

হঠাৎ আপন মনেই হেসে ওঠে শোভনা। জীর্ণপত্রের আবর্জনার মত এই চিন্তার ভার মন থেকে দূরে নিক্ষেপ র। দীপ জ্বালে, মাধ্বীবারির পাত্রে দান করে। কনকমুকুর সম্মুখে রেখে লপর্ণীর তিলক অঙ্কিত করে কপালে। পদের আর্তস্বর আর অদৃশ্য ঝঞ্চার কুটি আসবমধুসিক্ত অধরের উপহাস্যে করে সুতন্ত্রিবীণা কোলের ওপর নেয়। কিন্তু ঝঙ্কার দিতে গিয়ে প্রথম ক্ষেপের পূর্বেই বাধা পায়।

—রাজকুমারী।

সুবিনীতা এসে দাঁড়িয়েছে। বিরক্তভাবে ক্ষেপ করে সুশোভনা—আবার কোন্ বার্তা নিয়ে এসেছ সুমুখী?

—দুর্বার্তাই এনেছি সুব্রতা রাজকুমারী। মার ছলনায় ভুলেছেন রাজা পরীক্ষিৎ; ন্তু মণ্ডুকজাতির দুর্ভাগ্য ভোলেনি। রের ইংগিতে তোমার অপরাধ আজ তির অপরাধ হয়ে ধরা পড়ে গেছে।

ভ্রূকুটি করে সুশোভনা—এর অর্থ?

—নৃপতি পরীক্ষিৎ দূতমুখে নিয়েছেন, দৈব অভিশাপে ভীতিগ্রস্তা র প্রিয়তমা যখন মূর্চ্ছিতা হয়ে সরোবর লে ভেসে গিয়েছিলেন, সেই সময় দুরাত্মা ডুকেরা চন্দ্রোপলপ্রভাসমন্বিতা তাঁর বিনবাঞ্ছিতা সেই নারীকে নিধন করেছে। নি স্বচক্ষে একজন মণ্ডুক চরকে পালিয়ে তে দেখেছেন।

সুতন্ত্রিবীণার ঝঙ্কার তুলে সুশোভনা লে—তোমার সুবার্তা শুনে আশ্বস্ত হলাম কঙ্করী।

—আশ্বস্ত?

—হ্যাঁ, আশ্বস্ত ও আনন্দিত। এই নীলতারকার কটাক্ষে, এই স্ফুরিতাধরের হাস্যে, এই মধুমুখের চুম্বনের ছলনায় রাক্রান্ত পরীক্ষিৎ কত নির্বোধ হয়ে গেছে।

—তুমি কৃতার্থা হয়েছ কৌতুকের নারী, কিন্তু তোমারই প্রেমিক আজ তোমারই বন্ধুদের দুঃখে কত নিষ্ঠুর হয়ে নিরীহের শোণিতে ভয়াল উৎসব আরম্ভ করেছে! তার জন্যে একটুও দুঃখ হয় না তোমার? এই অগ্নিদেহা দীপশিখারও হৃদয় আছে, তোমার নেই রাজকুমারী।

কিঙ্করী সুবিনীতা কক্ষ ছেড়ে চলে যায়।

সন্ধ্যা নামে গাঢ়তরা হয়ে। অন্তরীক্ষে অন্ধকার। বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ায় সুশোভনা এবং দেখতে পায়, জনপদ-পরিখার প্রান্তে শত্রুশিবিরে প্রদীপ জ্বলছে। শুনতে পায় শত্রুর খড়্গাঘাতে ছিন্নদেহ প্রজার মৃত্যুনাদ।

বাতায়নপথ থেকে সরে আসে সুশোভনা। কক্ষের দীপশিখা যেন আপন হৃদয় পুড়িয়ে অন্তরীক্ষের সেই ভয়াল অন্ধকারকে বাতায়ন পথে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। কিন্তু আজ অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে কিছুক্ষণের মত বধিরা হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে সুশোভনার।

আর্তনাদ শোনা যায়। ফুৎকারে দীপ-শিখা নিভিয়ে দিয়ে কক্ষের বহির্দ্বারে এসে চীৎকার করে সুশোভনা—সুবিনীতা!

কক্ষান্তর হতে ছুটে আসে কিঙ্করী সুবিনীতা। সন্ত্রস্ত-স্বরে বলে—আজ্ঞা কর কুমারী।

—আজ্ঞা করছি কিঙ্করী, এই মুহূর্তে দূত প্রেরণ কর শত্রু পরীক্ষিতের শিবিরে। জানিয়ে দাও, কোন মণ্ডুক তাঁর আকাঙ্ক্ষার নারীকে নিধন করেনি। জানিয়ে দাও, সে নারী মণ্ডুকরাজদুহিতা সুশোভনা, এই প্রাসাদের কক্ষে তার সকল সুখ নিয়ে বেঁচে আছে। ছলপ্রণয়ে মুগ্ধ নির্বোধ নৃপতিকে বলে দাও, উন্মাদ জহ্লাদের মত এই সংহারের উৎসব ক্ষান্ত করে চলে যেতে।

—জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজকুমারী। স্বয়ং মণ্ডুকরাজ আয়ু ব্রাহ্মণবেশে পরীক্ষিতের শিবিরে গিয়ে জানিয়ে এসেছেন।

সুশোভনা শান্তভাবে হাসে—শুনে সুখী হলাম। পিতা এতদিন পরে আমার ওপর নির্মম হতে পেরেছেন। ভাবতে ভাল লাগছে কিঙ্করী, আমার অপরাধ প্রকাশ করে দিয়ে পিতা আজ প্রজাকে উন্মত্ত পরীক্ষিতের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছেন। এক নির্বোধ প্রেমিক আজ ছলসর্বস্বা কপটা প্রণয়িনীকে ঘৃণা করে চলে যাবে, আমিও মূঢ় পরীক্ষিতের প্রেমের গ্রাস থেকে বাঁচলাম সুবিনীতা।

কিঙ্করী সুবিনীতা বিচলিত হয়—প্রজা বেঁচেছে রাজকুমারী, কিন্তু তুমি......।

—কি?

—পরীক্ষিৎ তোমারই আশায় রয়েছেন।

চীৎকার করে ওঠে সুশোভনা।—না, হতে পারে না। এমন ভয়ঙ্কর আশার কথা উচ্চারণ ক'রো না কিঙ্করী। সে নির্বোধকে জানিয়ে দাও, আয়ুনন্দিনী সুশোভনার হৃদয় নেই, তাই হৃদয় দান করে পুরুষের ভার্যা হতে সে জানে না। সুশোভনাকে ঘৃণা করে এই মুহূর্তে তাঁকে চলে যেতে বল।

—যদি তিনি ঘৃণা করতে না পারেন? তবে?

দীপশিখার দিকে তাকিয়ে স্থির-স্ফুলিঙ্গের মত চক্ষুতারকা নিশ্চল করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে সুশোভনা। তারপরেই নিজ দংশনাহত ভুজঙ্গিণীর মতই যন্ত্রণক্ত দৃষ্টি তুলে কিঙ্করী সুবিনীতার দিকে তাকিয়ে বলে—তবে ঘৃণা এনে দাও সে নির্বোধের মনে। নারী-ধর্মদ্রোহিণী কৌতুকিনী নারীর সকল ইতিহাস তাকে শুনিয়ে দাও। সুশোভনার অপযশ রটিত হোক্ ত্রিভুবনে। জানুক পরীক্ষিৎ, মণ্ডুকরাজ আয়ুর চন্দ্রোপলপ্রভা-সমন্বিতা তনয়া হলো বহুবল্লভা পরপূর্বা ভ্রষ্টা।

অশ্রুসিক্ত চক্ষে কিঙ্করী সুবিনীতা বলে—এতক্ষণে বোধ হয় জানতে পেরেছেন রাজা পরীক্ষিৎ।

—কেমন করে?

—পিতা আয়ু আজ তোমার ওপর নির্মম হয়েছেন কুমারী, তিনি স্বয়ং অমাত্যবর্গকে সংগে নিয়ে পরীক্ষিতের শিবিরে চলে গেছেন ইক্ষ্বাকুগৌরবের কাছে নিজমুখে নিজতনয়ার অপকীর্তি-কথা জানিয়ে দিতে। এ ছাড়া মহাবলী পরীক্ষিৎকে তোমার প্রণয়মোহ হতে মুক্ত করার আর কোন উপায় ছিল না দুর্ভাগিনী কুমারী।

করতলে চক্ষু আবৃত করে সবেগে কক্ষ হতে ছুটে চলে যায় কিঙ্করী সুবিনীতা।

মাধ্বীবারিতে পরিপূর্ণ পাত্রে ভাসছিল নীলগরলের বুদ্বুদ। আজ এতদিন পরে জীবনের শেষ অভিসারের লগ্ন দেখা দিয়েছে। বাতায়ন পথে দেখা যায়, আকাশে ফুটে আছে অনেক তারা, সিদ্ধকন্যাদের সন্ধ্যাপূজার ফুলগুলি যেন এখনো ছড়িয়ে রয়েছে। এইতো ঘুমিয়ে পড়বার সময়।

(শেষাংশ ৪৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রূপময় ভারত

নীলগিরি

মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্বর্তী পশ্চিম-ঘাট পর্বতের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত নীলগিরি। দক্ষিণ ভারতের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এত মনোহর স্থান খুব কমই আছে। ঘন কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় একের পর এক চলেছে যেন নীল রঙের মিছিল! সমারোহে, সুষমায়, স্বাতন্ত্র্যে নীলগিরি যে রূপময় ভারতের এক বিশেষ অংশ তা নির্বিবাদে বলা চলে। মানুষের সৌন্দর্য-স্পৃহা তাই এ অঞ্চলকে সুগম করে তোলবার চেষ্টায় বহুদিন নিয়োজিত আছে। নীলগিরির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রধান শহর উটাকামণ্ড, সংক্ষেপে বলা হয় উটী। উচ্চতায় স্থানটি প্রায় ৭৫০০ ফুট। বাঙলার শৈল-সৌন্দর্যের লীলাভূমি দার্জিলিঙ-এর উচ্চতা এ থেকে ৫০০ ফুট কম। রেল ও বাসের কল্যাণে আজ আর নীলগিরির প্রধান স্থানগুলি পরিভ্রমণ করতে কোনও বাধা নেই। পাহাড়ের পূর্বদিকের পাদদেশে অবস্থিত মেটুপালায়াম নামক স্থান থেকে পাহাড়ী রেলপথ সরু হয়েছে। মাত্র একটি ইঞ্জিন সহযোগে চার-পাঁচটি গাড়িকে পেছন থেকে ঠেলে ওপরে তোলা হয়। পাহাড়ের গা বেয়ে এ'কে-বে'কে চলেছে সুন্দর রাস্তা, মোটর চলার কোনো অসুবিধা নেই। অন্যান্য শহরের নাম কুনুর ও কোটাগিরি। প্রথমোক্ত স্থানটির উচ্চতা ৬০০০ ফুট এবং এখানেই প্রতিষ্ঠিত সেই প্রখ্যাত পাস্তুর ইন্সটিটিউট। দ্বিতীয় স্থানটির উচ্চতা ৬৭০০ ফুট।

এ অঞ্চলে চা কফি ও ইউক্যালিপটাস তেল প্রচুর উৎপন্ন হয়। বিষুবরেখা থেকে মাত্র ১১ ডিগ্রি তফাতে অবস্থিত হলেও নীলগিরির তাপমাত্রা কখনও ৬০ ডিগ্রি অতিক্রম করে না। গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা তাই এখানে নিষ্প্রভ।

শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়া এ অঞ্চলের আর একটি আকর্ষণ টোডা নামক এক প্রাচীন জাতি। বর্তমানে উটাকামণ্ডের আশে-পাশে মাত্র কয়েক ঘর টোডা দেখা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রেখে এদের জীবনযাত্রার প্রণালী লক্ষ্য করা যায়। মাত্র একখণ্ড কাপড় দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করাই এদের রীতি। বিবাহাদি ব্যাপারে এরা সকল ভাইয়ে মিলে একটি পত্নী গ্রহণ করে এবং সবাই মিলে একই গৃহে বাস করে।

পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিখোদিত মন্দিরের চূড়া। পশ্চাতে কুনুর শহরের একাংশ

দক্ষিণে

ট টোডা পরিবারের
পুরুষ। বাঁশ ও
ছাউনি দেওয়া
ট কুঁড়েঘরে এরা
একসঙ্গে থাকে

নীচে

চূড়া হইতে কুন্নুর
শহর
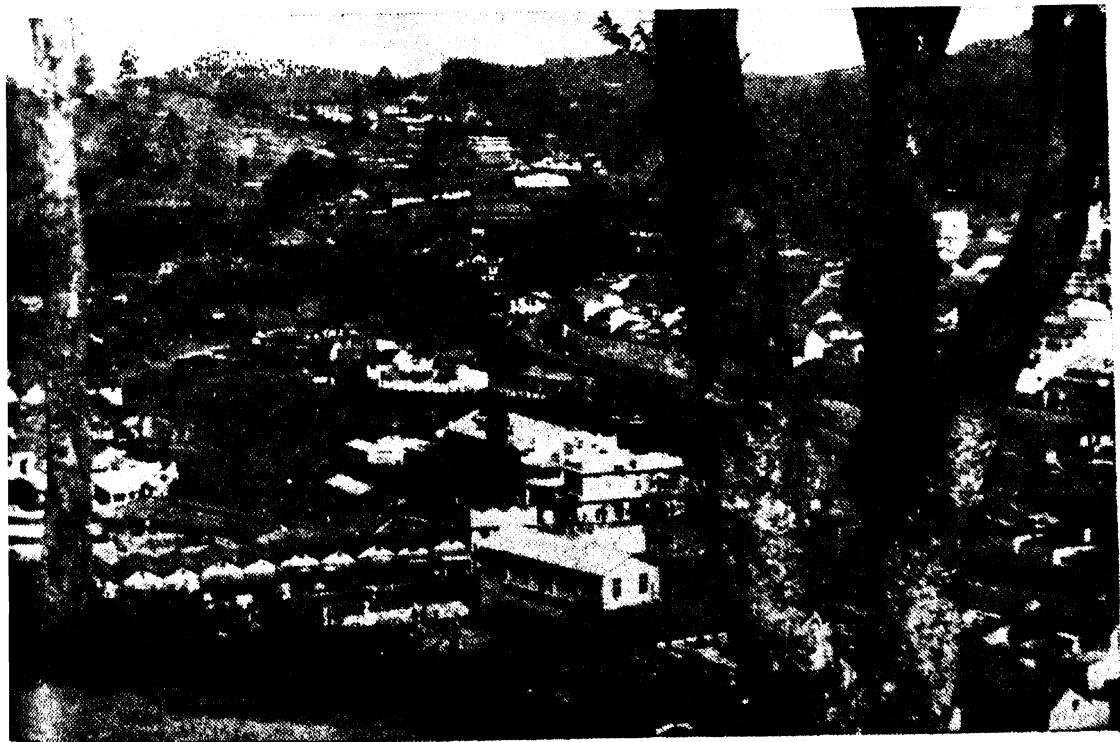
বামে

উটাকামণ্ডের টোডা পুরুষ ও তাহার শিশুসন্তান

নীচে

উটাকামণ্ডের কেন্দ্রস্থল। ভ্রমণকারীদের জন্য শহরটি কুসুমাস্তীর্ণ পার্ক আর সুদৃশ্য রাস্তাঘাটে পরিচ্ছন্ন ও মনোরম করিয়া রাখা হইয়াছে

[ফটো: সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়]

মপাসাঁ

...ওলায় বলি, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না', পদ্মার ওপারে বলি,

'পীর মানে না দেশে-খেশে,
পীর মানে না ঘরের বউয়ে'

...র পশ্চিমারা বলেন, 'ঘরকী মুর্গী দাল ...বর' অর্থাৎ ঘরে পোষা মুর্গী মানুষ ...নি তাচ্ছিল্য করে খায়, যেন নিত্যিকার ...-ভাত খাচ্ছে।

কিন্তু একবার গাঁয়ের কদর পাওয়ার পর ...র যে মানুষ গেঁয়ো যোগী হতে পারে, ... সম্বন্ধে কোনো প্রবাদ আমার জানা ...। কিন্তু তাই হয়েছে, স্পষ্ট দেখতে ...চ্ছি মপাসাঁর বেলায়।

...স তিনেক পূর্বে মপাসাঁর কয়েকখানা ... পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। * ...রি সমালোচনা করতে গিয়ে ফরাসী ...ডেমির সদস্য—অর্থাৎ তিনি অতিশয় ...-বিষ্টু জন—মসিয়ো আঁদ্রে বিইঈ ...lly) মপাসাঁ সম্বন্ধে মিঠে-কড়া ...রটি কথা বলেছেন।

...ক ফরাসী সাহিত্য প্রচারক নাকি ...ইঈকে বললেন, "কেম্ব্রিজের ছেলেমেয়েরা ...কাল যে মপাসাঁ পড়ে, সে শুধু ...ম্যাকর কৌতূহল নিয়ে।" (অর্থাৎ ...সাঁর যৌন-গল্পগুলোই তারা পড়ে ...।) উত্তরে বিইঈ বললেন, "বিদেশীরা, ...শেবত কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের লোক আজ-...ল আর মপাসাঁ পড়ে না, তারা পড়ে ...স্ত, ভালেরি, মালার্মে র‍্যাঁবো। মপাসাঁর ...র এখনো আছে জর্মনি এবং রাশায়। ...দ ফ্রান্সে ছোকরার দল তো মপাসাঁকে ...কদম পাঁচের বাদ করে দিয়ে বসে আছে। ...ল করেছে না ঠিক করেছে? কিছুটা ভুল ...ছুটা ঠিক——কারণ মপাসাঁ একদিক দিয়ে ...মন অত্যাশ্চর্য কলাসৃষ্টি করেছেন, অন্য-...কে আবার অত্যন্ত যাচ্ছে তাইও ...খেছেন।"

...এ সম্পর্কে মপাসাঁর চিঠি প্রকাশ করতে ...য়ে সম্পাদক মেনিয়াল বলছেন, ...মার্কিনকার লোক মপাসাঁ পড়ে উঁচু ...রর ক্ল্যাসিক হিসেবে। মপাসাঁর সর্বাঙ্গ-...দের ভাষাকে সেখানকার ফরাসী পড়ুয়া-...ই আদর্শরূপে মেনে নেয়। তাঁর ...র স্বচ্ছতার জন্যই (সে স্বচ্ছতার

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন আনতল ফ্রাঁসের মত গুণী) আমেরিকাতে মপাসাঁর লেখা উদ্ধৃত করে অন্তত কুড়িখানা পাঠ্য বই বেরিয়েছে।"

উত্তরে বিইঈ সায়েব অবিশ্বাসের সুরে বলছেন, "জানতে ইচ্ছে করে, এখনো কি মার্কিন পাঠক মপাসাঁকে এতটা কদর করে? আর ইংরেজদের অবস্থা কি? মেনিয়াল তো কিছু বললেন না; আমার মনে হয়, মপাসাঁর লেখাতে যেটুকু খাঁটি ফরাসী ইংরেজ সেটা এড়িয়ে চলে।"

চলতে পারে, নাও চলতে পারে। সে কথা উপস্থিত থাক। এর পর কিন্তু বিইঈ সায়েব যেটা বলেছেন সেটা মারাত্মক। সকলেই জানেন, মপাসাঁ ছিলেন ফ্লবেরের অতি প্রিয় শিষ্য—ফ্লবের তাঁকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়েছিলেন। বিইঈও বলছেন, "ফ্লবের তাঁর প্রিয় শিষ্যের কোনো দোষই দেখতে পেতেন না, কিন্তু তিনি পর্যন্ত বেঁচে থাকলে মপাসাঁর অত্যধিক (Surabondant = Superabundant) লেখার নিন্দা করতেন।"

এ কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, তবে এ-সম্পর্কে হিটলারের একটা মন্তব্য মনে পড়ল। হিটলার বলতেন, "আজকালকার ছোকরারা বড্ড বেশী বই পড়ে আর তার শতকরা নব্বই ভাগ ভুলে যায়। তার চেয়ে যদি দশখানা বই পড়ে ন'খানা মনে রাখতে পারে, তবে সেই হয় ভালো।" মাস্টার হিসেবে আমার জানা আছে, দশখানা বই পড়লে ছেলেরা ভুলে মেরে দেয় ন'খানা। কিম্বা বলতে পারেন পাঁচ দুগুণে দশের শূন্য নেমে হাতে রইবে পেন্সিল!

মপাসাঁ যদি তাঁর লেখার ত্রিশ ভাগ কমিয়ে দিতেন, তবে সে ত্রিশ ভাগে কি শুধু তাঁর খারাপ লেখাগুলিই—বিইঈর বিচারে—পড়ত? কাটা পড়ত দুইই। তাহলে অন্তত শতকরা কুড়িটি উত্তম গল্প আমরা পেতুমই না। ইংরেজিতে বলে 'টবের নোংরা জল ফেলার সময় বাচ্চাকেও ফেলে দিয়ো না।' ফেলা যায় বলেই এ সতর্ক বাণী।

ভালো লেখা বার বার পড়ি। খারাপ লেখা একবার পড়ে না পড়লেই হল।

কিন্তু মোদ্দা কথায় আসা যাক।

ইংরেজি, জর্মন, রাশান, স্পেনিস, এমনকি আরবী, ফারসী, বাঙলা, উর্দু নিন এমন কোন সাহিত্য আছে যে, মপাসাঁর কাছে ঋণী নয়? ছোট গল্প লেখা আমরা শিখলুম কার কাছ থেকে? উপন্যাসের বেলা বলা শক্ত কে কার কাছ থেকে শিখল, কিন্তু ছোট গল্প লেখা সবাই শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। কিম্বা দেখবেন রাম যদি শ্যামের কাছ থেকে শিখে থাকেন, তবে শ্যাম শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মপাসাঁর কাছে ঋণী—যদিও জানি অসাধারণ প্রতিভা আর অভূতপূর্ব সৃষ্টিশক্তি ধারণ করতেন বলে রবীন্দ্রনাথ বহুতর গল্পে মপাসাঁকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছেন। গীতিরস ছিল রবীন্দ্রনাথের হস্ততলে—মপাসাঁর সেখানে ছিল কিঞ্চিৎ অনটন—তাই ছোট গল্পে গীতিরস সঞ্চার করে তিনি এক নূতন রসবস্তু গড়ে তুললেন, কবিতাতে সুর দিয়ে যে রকম ঐন্দ্রজালিক গান সৃষ্টি করেছিলেন।

শেষ কথা, কার ভাণ্ডার থেকে মানুষ সব চেয়ে বেশী চুরি করেছে? যে কোনো একখানা হেজিপেজি মাসিক হাতে তুলে নিন। দেখবেন ভালো গল্পটি মপাসাঁর লোপাট চুরি—দেশকালপাত্র বদলে দিয়ে। আর আশ্চর্য মপাসাঁর বেলাই এ জিনিসটা করা যায় সব চেয়ে বেশী, কারণ তাঁর অধিকাংশ গল্পই সব কিছুর সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

এত চুরির পরও যাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত তিনি প্রাতঃস্মরণীয়।

• M. Edouard Maynial এবং Mme Artine Artinian কর্তৃক প্রকাশিত Correspondecce inedite.

৩
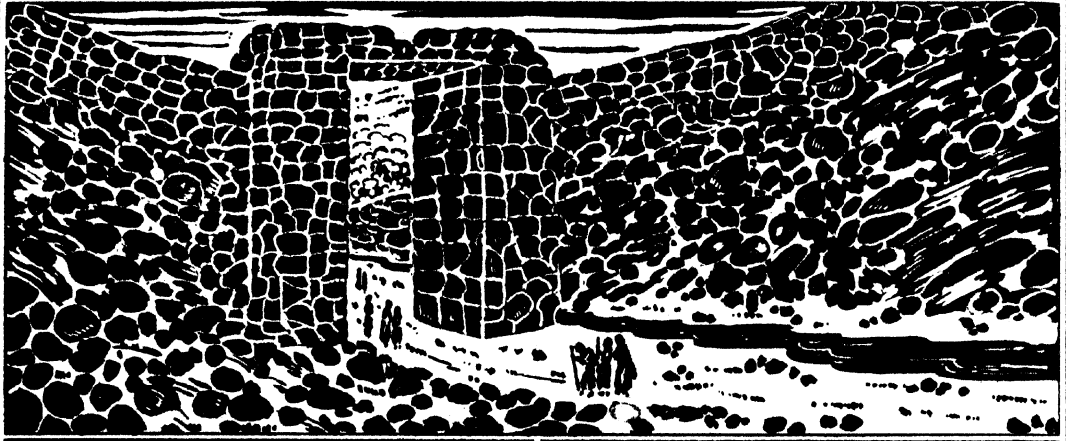
বর্তমান-রাজগৃহ পরিক্রমা

সাধারণত শীতকালেই রাজগৃহে দর্শকদের সমাগম হয়। শীতকালের বৈকাল ছোট হয়; যতদিন রাস্তা ও যানাদির ভাল ব্যবস্থা না হয় ততদিন হাঁটিয়াই দর্শককে রাজগৃহ দেখিতে হইবে, তাই দূরের জায়গাগুলি সকালে দেখার কথা নিচে বলিয়াছি। যাত্রীরা বেশির ভাগ দুপুরবেলায় বা বৈকালে রাজগীরে পোঁছেন, তাই সেদিন বৈকাল হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছি।

"নূতন" নগরের লোকালয়

১ম দিন বৈকাল—পাঠক এই অধ্যায়ের অংশগুলি পড়িবার সময়ে মানচিত্র দুইটির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবেন। আমরা রেল স্টেশন হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিব। পূর্বে যে "নূতন" রাজগৃহ, "নূতন"-নগর বা New Fort-এর কথা বলিয়াছি তাহারই মাঝখানে বর্তমানের রেল স্টেশন অবস্থিত। এই "নূতন"-রাজগৃহের দুটি অংশ ছিল—(ক) বড় বড় পাথরে তৈরী দেওয়াল ঘেরা গড়ের মত এলাকায় রাজপ্রাসাদাদি ছিল, ইহা স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং (খ) মাটির দেওয়াল ঘেরা সাধারণ লোকের বাসস্থান এলাকা; স্টেশনের দক্ষিণে, পূর্বে ও উত্তরে কিছুদূরে গেলেই এই মাটির দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। স্টেশন হইতে রেললাইন ধরিয়া উত্তর দিকে অল্পদূর অগ্রসর হইলে দ্বিতীয় যে রাস্তাটি পূর্ব-পশ্চিমে দেখা যায় তাহাতে পশ্চিমে সামান্য দূরে গেলে বাজারের মাঝখানে পৌঁছান যায়। এই রাস্তাটিই পূর্বদিকে ৭ মাইল দূরে গিরিয়াক পর্যন্ত গিয়াছে। গিরিয়াকে অনেক বাড়ীঘরের ধ্বংসাবশেষ আছে। "নূতন"-রাজগৃহের মাটির দেওয়াল ঘেরা এলাকায় এবং আধুনিক বাজারের চারি পাশের পাড়াগুলিতে প্রাচীন বাড়ীঘরের ভিত্তি অনেক চোখে পড়ে। পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের বাড়ীর বাগানে রাজগৃহের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত অনেক প্রস্তরমূর্তি সংরক্ষিত আছে।

"নূতন"-নগরের প্রাসাদ অংশ

২য় দিন সকাল—স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই দক্ষিণ-পশ্চিমে "নূতন"-রাজগৃহের পাথরবাঁধান রাজপ্রাসাদ এলাকার দেওয়াল দেখা যায়। এই দেওয়ালের পশ্চিম দিক মাটির, বাকি তিন দিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর বিনা চু[ন]
শুরকিতে উপর উপর সাজাইয়া নির্মি[ত]
এইরূপ বৃহদাকার পাথরের চূণশুরকিহ[ীন]
গাঁথনীকে পুরাতাত্ত্বিকরা Cyclope[an]
(অর্থাৎ যেন দৈত্যদানব-নির্মিত, মনু[ষ্য]
নির্মিত নয়) বলেন। এই দেওয়ালের চা[রি]
দিকে চারটি দ্বার ছিল, তাহার চিহ্ন এখন
দেখা যায়। এই গড়ের উত্তর দেওয়া[লের]
বাহিরে একটা মাটির দুর্গ ভাঙা অব[স্থায়]
দেখা যায়। দক্ষিণ দেওয়ালের উপরে
পাশে অনেক ইঁটের গাঁথনির চিহ্ন আ[ছে।]
এই গড়ের ভিতরের বাড়ীঘর নিশ্চি[হ্ন]
হইয়াছে কিন্তু খননের ফলে বাড়ীঘ[রের]
৩।৪টি স্তর পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবী[র]
সব প্রাচীন স্থানেই যেখানে ঘন লোকব[সতি]
বা প্রসিদ্ধ মন্দিরাদি গৃহ ছিল সেখ[ানে]
খনন করিলে যুগপরম্পরায় লোকবসতি[র]
গৃহাদি পুন পুন নির্মাণের বিভিন্ন স্[তর]
একটির নিচে একটি দেখিতে পাওয়া যা[য়।]
রাজগৃহ-নালন্দায় সামান্য যেটুকু [খনন]
হইয়াছে তাহা পালযুগ (খৃঃ ৮—
শতক), বড় জোর কোথাও গুপ্তযুগের (
৫—৭ শতক) স্তর পর্যন্ত মাত্র পৌঁছিয়া[ছে।]
গুপ্ত যুগের স্তরের ৫।৭ হাত নিচে অ

"নূতন"-নগরের এক দিক।

মৌর্য যুগের (খৃ পূ ৪—২ শতক) স্তর, তারও নিচে আছে বুদ্ধযুগের স্তর। বুদ্ধ-যুগের স্তরের অনেক নিচে ক্রমান্বয়ে আছে প্রাগার্য প্রাগৈতিহাসিক প্রভৃতি যুগের স্তর।

শীতবন, অশোকস্তূপ ও সর্পশৌণ্ডিক-প্রাগ্‌ভার।

"নূতন"-নগরের পশ্চিমে একটি খাল, বোধহয় পূর্বে ইহা নদীর মত ছিল, এখন ইহাকে বৈতরণী বলা হয়। ইহার তীরে প্রাচীন শ্মশানের চিহ্ন আছে, বোধহয় বুদ্ধের যুগের শীতবন শ্মশান এই অঞ্চলেই ছিল এবং এখান হইতে দক্ষিণের অনেক-খানি পর্যন্ত স্থানকেই শীতবন বলা হইত। বৈতরণীর পশ্চিম পাড়ের উঁচু ঢিবিটি অশোক নির্মিত ধাতু স্তূপের অবশেষ, ইহার অব্যবহিত পশ্চিমে একটি প্রকান্ড বিহারেরও চিহ্ন আছে। হিউয়েন ৎসাং যে অশোকস্তম্ভ দেখিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চয় কাছাকাছি ছিল। কেহ কেহ অন্যত্র অশোকস্তূপের স্থান কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সংগত মনে হয় না। এই অঞ্চল হইতে নালন্দা পর্যন্ত উন্মুক্ত ভূভাগ হইতে বৈভারগিরির উত্তর গাত্র সর্পফণা শ্রেণীর মত দেখায়, ইহাকেই বোধ হয় বৌদ্ধরা সপ্প-সৌণ্ডিয় পব্‌ভার (সর্পশৌণ্ডিক্-প্রাগ্‌ভার: শুণ্ড=ফণা, প্রাগ্‌ভার=গিরিপার্শ্ব) বলিতেন এবং সম্ভব এই পর্যন্ত শীতবনের সীমানা মনে করা হইত। সেইজন্যই বোধ হয় সর্প-শৌণ্ডিক প্রাগ্‌ভার শীত-বনের মধ্যে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রাচীন রাজপথের উভয় পার্শ্ব; বর্মী মন্দির, জাপানী-মন্দির, গোরক্ষিণী-ধর্মশালা, ইন্সপেক্সন বাংলো, রেস্ট হাউস।

"নূতন"-নগরের গড়ের দক্ষিণ সীমার ঠিক পূর্বদিকে যে ঢিবিটির উপর এখন বর্মীমন্দির তাহা ছিল "নূতন"-নগরের মাটির দেওয়ালের একটি প্রান্ত। এখনকার রাস্তা যেখান দিয়া গড়ের সীমানা ছাড়িয়া দক্ষিণে গিয়াছে সেখানে মাটির দেওয়ালে একটি দ্বার ছিল। বর্তমান রাস্তার কিছু বাঁয়ে (পূর্বদিকে) নিচু জায়গায় বিম্বিসার যুগের রাজপথের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। মাটির দেওয়ালের মধ্যের এলাকায়ও এই রাজপথের চিহ্ন অনেক স্থানে আছে। মাটির দেওয়াল (অর্থাৎ বর্মী মন্দিরের ঢিবি) হইতে দক্ষিণ দিকে জাপানী মন্দিরের গেটের সামনে দিয়া প্রাচীন রাজপথ গিরিপ্রাকারের উত্তর দ্বার পর্যন্ত গিয়াছিল। এই রাজপথের দুই পাশের উঁচু জায়গা ও ঢিবিগুলি সব প্রাচীন বাড়ীঘর স্তূপ-চৈত্য-বিহারাদির অবশেষ। পূর্ব দিকে প্রায় বিপুলগিরির তলদেশ পর্যন্ত এই অঞ্চল বাড়ীঘরে আচ্ছন্ন ছিল। জাপানী মন্দিরের উত্তর-পূর্বে একটি পাথর-বাঁধান প্রকান্ড পুষ্করিণী ছিল, এখনকার মখদুম-কুন্ডের জল আসিয়া এই পুষ্করিণীতে পড়িত, সে পয়ঃপ্রণালী এখনও দেখা যায়। বর্তমান রাস্তা হইতে ইন্সপেক্সন বাংলোয় যাইবার মোড়ে গোরক্ষিণী-সভার ধর্মশালা যেখানে, সেখানেও বোধহয় কোন প্রাচীন বিহারাদি ছিল।

বুদ্ধের ... ; বেণুবন ও ...ক-নিবাপ।

...মন্দিরের প্রায় সামনে, বর্তমান ...র পূর্বধারে যে উঁচু ও বড় পাথরে বাঁধান ভিত্তিটি আছে তাহাই সম্ভব ছিল অজাতশত্রু নির্মিত বুদ্ধধাতুর স্তূপ। ইহার পশ্চিম-দক্ষিণের প্রায় সমগ্র এলাকাই সম্ভব ছিল বেণুবন। এই এলাকার মধ্য দিয়া উত্তর-পশ্চিম বিস্তারী যে খালটি দেখা যায় তাহা আধুনিক, বিগত ৮০ বছরের মধ্যে কাটা। এই খালের গায়ে স্থানে স্থানে প্রাচীন ভিত্তির বড় বড় পাথর দেখা যায়। খালের পশ্চিমে যে গভীর বড় পুষ্করিণীটি, তাহাই সম্ভব ছিল কলন্দক-নিবাপ। বাঁশ বনে ঘেরা ছিল বলিয়া রাজা বিম্বিসারের এই বাগানবাড়ির নাম বেণুবন হইয়াছিল। পালিতে কলন্দ বা কলন্দক=কাঠবিড়ালী বা শালিখ পাখী; সংস্কৃত করণ্ড (বা করণ্ডক =বাঁশের চুপড়ি, ছোট বাক্‌স) শব্দের সংগে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। নিবাপ মানে পশুপাখীর বিচরণ ও জলপানের স্থান। আধুনিক পণ্ডিতেরা কেহ কেহ রাজগীরের অন্যত্র কয়েক স্থানে বেণুবন কলন্দকনিবাপ অজাতশত্রু নির্মিত-ধাতুস্তূপ প্রভৃতির স্থান নির্দেশ-সম্ভাবনা অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধগ্রন্থ ও চীনা বর্ণনার সঙ্গে অনেক অসংগতি হয়। ফা হিয়েন বলিয়া-ছেন বেণুবন (প্রাচীন বিম্বিসার) রাজপথের পশ্চিমে ছিল এবং পূর্বদিকে ইহার প্রবেশ-পথ ছিল। দক্ষিণে বেণুবনের সীমা এখনকার দোকানঘরগুলি পর্যন্ত সম্ভব পৌঁছিত। উত্তরে ইহার সীমা ছিল প্রায় রেস্ট হাউস ও ইন্সপেক্সন বাংলো কম্পাউন্ড পর্যন্ত। সমন্তপাসাদিকায় বর্ণিত আছে যে বেণুবন প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এবং প্রাচীরের গায়ে গোপুর-অট্টালিকাদি (নহবৎখানার মত gate-house) ছিল।* এই দেওয়ালের চিহ্ন ও চারকোণের চারটি ঢিবি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বোধ হয় এখনও ধরা পড়ে। এই বাগানবাড়ির সব চেয়ে বড় বাড়িটি বিহারে পরিণত হইয়া ছিল, সম্ভব,ইহা পুষ্করিণীর দক্ষিণে ছিল। সমগ্র বেণুবনে পরবর্তী যুগে আরও অনেক বিহার-স্তূপাদি নির্মিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই কারণ বৌদ্ধদের চক্ষে ইহা ছিল পরম পুণ্যক্ষেত্র। এখনও ইহার সর্বত্র বাড়িঘর দেওয়াল প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ প্রোথিত দেখা যায়। সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যুর

পর বেণুবনে তাঁহাদের স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

বেণুবনের যে পুষ্করিণীটিকে কলন্দক-নিবাপ বলিয়াছি তাহা দেখিতে খুব প্রাচীন নয়। বোধহয় পবিত্রতাবশত একাধিকবার ইহার পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছিল, তাই নূতনের মত দেখায়।

জাপানী মন্দিরের সামনের যে ভিত্তিটিকে আমরা বুদ্ধের ধাতুস্তূপ অনুমান করিয়াছি তাহা প্রাচীন বর্ণনার সঙ্গে মিলে। হিউয়েন ৎসাং বলিয়াছেন ইহা বেণুবনের পূর্বদিকে ছিল এবং বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন ইহা নগরের (অর্থাৎ "নূতন" নগর বা New Fort-এর, কারণ বুদ্ধঘোষের সময়ে গিরিমালার মধ্যবর্তী প্রাচীন নগর জনহীন জঙ্গলময় ছিল কিন্তু "নূতন" রাজগৃহে লোকবসতি ছিল) পূর্ব-দক্ষিণে ছিল। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে বর্ণিত আছে যে, এই স্তূপ বেণুবনের মধ্যে ছিল, ইহাতে মনে হয় বেণুবনের পূর্ব সীমা প্রাচীন রাজপথ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ভারত-পুরাতত্ত্ববিৎ সার জন মার্শালের মতে অশোকের যুগের আগে যেসব স্তূপ নির্মিত হইত তাহা আকারে খুব ছোট হইত। সাঁচী সারনাথ প্রভৃতি স্থানের মত বৃহদাকার স্তূপ নির্মাণ অশোকই প্রথম আরম্ভ করেন। সারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ন এমনকি বুদ্ধেরও প্রথম ধাতু-স্তূপ বোধহয় বেণুবনের মধ্যে ছোট ছোট ঢিবির মত ছিল। বুদ্ধঘোষ যেসব কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় বুদ্ধের ধাতুস্তূপ মগধ কোশল প্রভৃতি যেখানে যেখানে ছিল সেখানে অনেক স্থানে স্তূপ হইতে "ধাতু" (অর্থাৎ পূতাস্থি) চুরি হইয়া গিয়াছিল। রাজগৃহের ধাতু যাহাতে চুরি না হইতে পারে সেজন্য স্থবির মহাকাশ্যপ অজাতশত্রুকে পাথরের সুদৃঢ় স্তূপ নির্মাণ করিয়া তাহাতে মাটির তলায় ধাতু রক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই স্তূপ কালবশে নষ্ট হইলে ইহার পবিত্রতাবশত ইহারই উপর সম্ভব বৌদ্ধ রাজারা যুগে যুগে পুনরায় স্তূপচৈত্যাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন ৎসাং বলিয়াছেন এই বুদ্ধস্তূপের কাছে—কোন্ পাশে বা সামনে না পিছনে তাহা বলেন নাই—আনন্দের ধাতুস্তূপ ছিল। জাপানী মন্দিরের দেওয়ালের মধ্যে একটি স্তূপের ভিত্তি আছে, এই অঞ্চলে জাপানী মন্দিরের চারিপাশের এলাকায় অনেক স্তূপের ভিত্তি পাওয়া যায়, তার মধ্যে জাপানী মন্দিরের দেওয়ালের মধ্যের স্তূপ ভিত্তিটিই বুদ্ধধাতুস্তূপের পর বৃহত্তম।

বর্তমান রাস্তার দুই পাশে, বুদ্ধধাতু-স্তূপের উপর, বেণুবনের অন্যান্য ঢিবি বা স্তূপাদির উপর, জাপানী মন্দিরের চারিদিকে ও "জরাসন্ধকী বৈঠকের" উপর যেসব মুসলমানের কবর দেখা যায় তাহা মুসলমান যুগের দুষ্কৃতি। ইহারা ভাঙিয়াচুরিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, যেখানে উঁচু বা ভাল বাঁধান জায়গা পাইয়াছে সেখানেই কবরখানা তৈরী করিয়াছে। অনেক কবর দরগা প্রভৃতি যে প্রাচীন স্তূপাদির ইঁট পাথর দিয়া তৈরী হইয়াছিল তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। ব্যবসায়ী কণ্ট্রাক্টার ও সাধারণ লোকেও প্রাচীন বাড়ীঘরের ইঁটপাথর ভাঙিয়া রাস্তা বাড়ী প্রভৃতি নির্মাণের মশলা সংগ্রহ করিয়াছে, ইহা সব প্রাচীন জায়গায়ই হইয়া থাকে দেখা যায়।

বেণুবনের এলাকায় যেসব ভাঙা মাটির ঘরের দেওয়াল দেখা যায় সেগুলি মেলার সময়কার দোকানপাটের অবশেষ। প্রতি চার বছর অন্তর রাজগীরে মলমাসে একমাস-ব্যাপী বৃহৎ মেলা বসে। লক্ষ লক্ষ লোক এই মেলা দেখিতে আসে। শোনপুরের হরিহরছত্রের মেলার পর রাজগীরের এই মেলাই বিহারের সর্বপ্রধান মেলা। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে এই মেলা হইয়া গিয়াছে। রাজগীরের সর্বত্র যেসব সিমেণ্ট-বাঁধান কূপ দেখা যায় সেগুলি এই মেলার জলসরবরাহের জন্য খনিত। কিন্তু কয়েক-স্থানে ইঁটের প্রাচীন কূপও কতকগুলি দেখা যায়।

বিপুলগিরির তলদেশ—মখ্দুমকুণ্ড ও সূর্যকুণ্ড

জাপানী মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণে মখ্দুম-কুণ্ড ও মসজিদ প্রভৃতি। মখ্দুম শা নামক বিহারের একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধু এখানকার গুহায় বাস করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের জল প্রায় শীতলই। মখ্দুম যে গুহায় থাকিতেন সম্ভব সেই গুহায়ই, অথবা সন্নিকটের বিপুলগিরিগাত্রের অন্য গুহা-গুলির কোনটিতে বুদ্ধ প্রথমবার রাজগৃহে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পাণ্ডব পাহাড়=সম্ভব বিপুল-গিরি। বুদ্ধ-প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্তও সম্ভব পরে মখ্দুম গুহায় থাকিতেন। ডাঃ মজুমদার দেখাইয়াছেন যে, দেবদত্তের সমাধি (মৃত্যু) স্থানরূপে চীনা পরিব্রাজকরা যে গুহার কথা বলিয়াছেন তাহা এই মখ্দুম-গুহা, পুরাতত্ত্ব বিভাগের বর্ণিত সূর্যকুণ্ডের ধারের কোন স্থান নয়। মখ্দুমগুহা হইতে পাহাড়ের গায়ের সিঁড়ি দিয়া একটু উপরে উঠিলে এক জায়গায় পাথরের উপর লাল দাগ দেখা যায়। ইহা আসলে প্রাকৃতিক ভূতাত্ত্বিক কারণজাত; কিন্তু হিউয়েন ৎসাং এ সম্পর্কে একটি ভিক্ষুর আত্মহত্যার কাহিনী শুনিয়াছিলেন এবং মুসলমানরা এই দাগ সম্বন্ধে একটা বাঘের গল্প বলেন।

সূর্যকুণ্ডের পাশের মন্দিরগুলি আধুনিক। এগুলি যে প্রাচীন বাড়িঘর মন্দিরাদির বিধ্বস্ত অবশেষের উপর নির্মিত তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। বিপুলগিরির পাদদেশ ও বৈভার গাত্রে সাতধারার চারিপাশ প্রাচীনকালে বহু মন্দিরাদিতে আচ্ছন্ন ছিল, প্রাচীন ভিত্তিসমূহের বড় বড় পাথর ও ইঁটের গাঁথনি যত্র তত্র চোখে পড়ে। বিপুল-গিরিতে উঠিবার যে রাস্তা আধুনিক জৈনরা তৈরি করিয়াছেন, তাহার আরম্ভ সূর্যকুণ্ডের একটু দক্ষিণ-পূর্বে। বিপুলগিরি জৈন-দের কাছে অতি পবিত্র, কারণ মহাবীর এখানে বাস ও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। রাজ-গৃহের সব পাহাড়ের উপর যে সাদা মন্দির-গুলি দেখা যায়, তাহা আধুনিককালে জৈনদের দ্বারা নির্মিত, যে যে পাহাড়ে উঠিবার বাঁধান রাস্তা আছে সেগুলিও জৈনরা আধুনিক কালে নির্মাণ করিয়াছেন। সূর্যকুণ্ডের ঠিক উত্তর-পূর্বে বড় পাথরে গাঁথা যে চতুষ্কোণ উঁচু চবুতারার একটি গাত্র অবশিষ্ট আছে দেখা যায় তাহাকে পুরাতত্ত্ব বিভাগ ভুল করিয়া দেবদত্তের সমাধিস্তূপ বলিয়াছেন; পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মখদুমগুহাই দেবদত্তের গুহা। এই চবুতারাটি জরাসন্ধকী বৈঠকের মত প্রহরী-দের পর্যবেক্ষণ-মঞ্চ ছিল।

বিপুলগিরি আরোহণ

২য় দিন বৈকাল—সব পাহাড়ের মধ্যে বিপুলগিরিতে উঠিবার রাস্তাই বেশ ভাল ও সহজ। পাহাড়ে আস্তে আস্তে, বেশি কথাবার্তা না বলিয়া এবং মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া উঠিতে হয়, কখনও দ্রুতবেগে ওঠা উচিত নয়, ইহা হৃদযন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর—"শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্বত-

একটি গুহা

সম্ভব।" বৈকালবেলায় বিপুলগিরিতে ও ভোরবেলায় বৈভারগিরিতে উঠিলে সূর্য সম্মুখে থাকার অসুবিধা নিবারণ হয়। বিপুলগিরির শিরোদেশ হইতে বা নামিবার সময়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য মনোরম দেখায়। উঠিবার জন্য পুরা এক ঘণ্টা সময় দেওয়া উচিত। উপর হইতে উত্তরে রেল স্টেশন সিলাওগ্রাম প্রভৃতির এবং দক্ষিণে গিরিমালার মধ্যবর্তী প্রাচীন নগরের উত্তরাংশের বেশ ধারণা হয়। বিপুলগিরির শিখরের উচ্চতা সমুদ্রবক্ষ হইতে ১০৩৬ ফুট। উপরে উঠিতে অনেক ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। শিখরের বর্তমান জৈন মন্দিরগুলি প্রাচীন গিরিপ্রাকারের ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছে, তবে প্রাচীন মন্দিরাদিও সম্ভব ছিল। মন্দিরগুলির পূর্বদিকে স্তূপের মত্তও সম্ভব গিরিপ্রাকারের অংশ ছিল। ইহার কিছু উত্তর-পূর্বে মহাবীরের প্রথম ধর্মপ্রচার স্থানস্বরূপে একটি মর্মরফলক আধুনিক জৈনরা স্থাপনা করিয়াছেন। বিপুলগিরির শিখর হইয়া রত্নগিরিতে গিয়া সেখান হইতে অপরদিকে নামিলে দক্ষিণের প্রায় জীবকাম্রবনের কাছাকাছি পৌঁছান যায়; জৈনযাত্রীরা এই পথে পাঁচ পাহাড় পরিক্রমা করেন; কিন্তু এই পথে যাইতে হইলে ভোরবেলায় বিপুলগিরিতে ওঠা আরম্ভ করিতে হয়।

গিরিপ্রাকার

রাজগৃহের সব পাহাড়ের উপর হইতে পর্বতমালার শিরোদেশের গিরিপ্রাকারের (Outer Fortification) এবং প্রাচীন নগরের নগরপ্রাচীরের (Inner Fortification) স্পষ্ট ধারণা হয়। পাহাড়ে উঠিবার সময়ে অনেক স্থানে গিরিপ্রাকারের অংশ-বিশেষের ভিত্তি দেখা যায় ও তাহার উপর দিয়া চলাও যায়। গিরিপ্রাকার সম্বন্ধে এখন সবচেয়ে ভাল ধারণা হয় প্রাচীন নগরের একেবারে দক্ষিণসীমায় বানগঙ্গার কাছে। এখানে প্রাকার অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়।

এই গিরিপ্রাকার ছিল অতি আশ্চর্য জিনিস। মোহেনজোদড়ো ও হড়প্পা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে রাজগৃহের এই গিরিপ্রাকারই পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইত। ইহা কখন নির্মিত হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না তবে ইহা যে অজাতশত্রুর রাজত্বকালের পরে নির্মিত নয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কারণ অজাতশত্রুর পর রাজগৃহের রাজধানীত্ব লোপ হইয়াছিল, অতএব নগর রক্ষার জন্য আর কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সম্ভব লিচ্ছবিদের সঙ্গে ১৬ বছর ধরিয়া যুদ্ধের সময়ে অথবা অবন্তীরাজের আক্রমণের ভয়ে অজাতশত্রু রাজধানী রক্ষার জন্য এই প্রাকার নির্মাণ করিয়াছিলেন—ইহাই প্রাকার-নির্মাণকালের শেষ সীমা। কিন্তু ইহার পূর্বে বিম্বিসারের সময়ে অথবা তাহারও পূর্বে ইহা নির্মিত হইয়াছিল কিনা তাহা এখনও ঠিক বলা যায় না। বিনা চূণশুরকিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উপর উপর সাজাইয়া এই সাইক্লোপিয়ান দেওয়াল নির্মিত হয়। উদয়-গিরি ও স্থানীয় অন্যান্য পাহাড় হইতে এই পাথর কাটা হইত। পুরাতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন যে, এই প্রাকারের বড় বড় পাথরের ভিত্তির উপর আদিতে ছোট পাথরের গাঁথনি ছিল, তাহার উপর পোড়া বা কাঁচা ইঁটের গাঁথনি এবং তাহারও উপর কাঠের নির্মাণ ছিল। অতএব আদিতে দেওয়ালের উচ্চতা এখন বানগঙ্গার কাছে যতটা দেখা যায় তাহারও চেয়ে অনেক বেশি ছিল। প্রাকারের চওড়াই বিভিন্ন স্থানে বেশি কম ছিল, কিন্তু সাধারণ চওড়াই ছিল ১৭।১৮ ফুট। সমগ্র গিরিশ্রেণীর উপর দিয়া ইহার মোট দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৩০ মাইল। প্রাকার দৃঢ়তর করিবার জন্য অনেক জায়গায় অল্প দূরে দূরে ইহার গায়ে অর্ধবৃত্তাকার বা চতুষ্কোণ গাঁথনি সংযোগ করা হইয়াছিল এবং নানা স্থানে প্রাকারের শাখা-প্রশাখা ছিল। এই সবই ১নং মানচিত্রে দেখান হইয়াছে এবং নানা স্থানে দর্শক নিজেও দেখিতে পাইবেন। পাহাড়গুলির মধ্যে মধ্যে যেখানে গিরিবর্ত্মের মত ফাঁক আছে সেখানে এই প্রকারের দ্বার

ছিল, যেমন উত্তরে বিপুল-বৈভারের মধ্যে পূর্বে শৈলগিরি—উদয়গিরির মধ্যে, দক্ষিণে উদয়গিরি—সোনাগিরির মধ্যে এবং পশ্চিমে সোনাগিরি—বৈভারের মধ্যে। এই প্রাকার-দ্বারগুলি প্রহরী ও সৈন্যদের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত, পাহাড়ের উপরে প্রাকারের কাছাকাছিও নানাস্থানে সৈন্যদের ঘাটি ও ব্যারাকের মত ছিল মনে হয়।

সার জন মার্শালের মতে "জরাসন্ধকী বৈঠক" নামে পরিচিত চবুতারাটি সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ স্থান ছিল। ইহার গায়ের গুহাগুলি প্রহরীদের বাসকক্ষ ছিল। আদিতে ইহার বর্তমান ভিত্তির উপরও অনেক গাঁথনি ছিল সন্দেহ নাই। সূর্যকুণ্ডের উত্তর-পূর্বে বিপুলগিরির তলায় এরূপ আর একটি প্রহরী স্থানের কথা পূর্বে বলিয়াছি। বোধহয় উত্তর দিক হইতেই শত্রুর আক্রমণের ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল, কারণ অন্য কোন দিকে এরূপ চবুতাবার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায় নাই। লিচ্ছবি প্রভৃতিদের সঙ্গে অজাতশত্রুর দীর্ঘ যুদ্ধের সময়ে উত্তর হইতেই আক্রমণের আশঙ্কা বেশি ছিল।

তপোদা, তপোদারাম

৩য় দিন সকাল—বৈভারে উঠিবার আগে দর্শক বেণুবনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও বৈভারের উত্তরগাত্র দেখিবেন। বেণুবনের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানার কাছের জলস্রোতটি প্রাচীন তপোদা ও বর্তমান সরস্বতী নদী। ঠিক বেণুবনের সীমার নিচে এই জলস্রোতে একটি বড় বড় পাথরের বাঁধ ছিল এবং বাঁধের উপর দিয়া সম্ভব অপর তীরের তপোদারামে যাইবার পথ ছিল। তপোদারামের কথা পালিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, এই উপবনের মধ্যেও পরে বিহারাদি নির্মিত হইয়াছিল এবং এখন এখানে একটি সাধুসন্যাসীর ঘাটি আছে। এই বাঁধের দ্বারা জল বাঁধিয়া সম্ভব নদীর উপরের কিছু দূর অংশ "তপোদা-সরোবরে" পরিণত করা হইয়াছিল। আধুনিক লোহার পুলের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে নদীতীর কংক্রীট-বাঁধান ছিল মনে হয়। রাজগৃহ অনেক জায়গায় যেখানে যেখানে জল ছিল সেখানে দর্শক এই প্রাচীন কংক্রীটের বড় বড় চাঁই দেখিবেন। ছোট ছোট পাথর শুরকি চূণ ও অন্য কোন অজ্ঞাত মশলাদি দিয়া প্রস্তুত হইয়া ইহা এমন দৃঢ় হইত যে সমস্তটি একখণ্ড পাথরের মত মনে হয়।

পিপ্পলি গুহা

বিপুলগিরির মত বৈভারের তলদেশেও বহু মন্দিরাদিতে আচ্ছন্ন ছিল। এখনকার মন্দির মসজিদ সিঁড়ি প্রভৃতির নিচে প্রাচীন ইঁটপাথরের চিহ্ন অনেক দেখা যায়। তপোদারাম ও গঙ্গাযমুনা ধারা পার হইয়া একটু পশ্চিমে একটি বৃহৎ প্রাচীন পুষ্করিণী দেখা যায়। এই পুষ্করিণীর পূর্বসীমা বরাবর বৈভারগাত্রে একটু উপরে পূর্বমুখী যে গুহাটি, ডাঃ মজুমদার দেখাইয়াছেন যে, তাহাই সম্ভব বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত বিখ্যাত "পিপ্পলি-গুহা"। টীকাকাররা বলিয়াছেন যে, সামনে একটি অশ্বত্থ গাছ (আধুনিক হিন্দিতেও অশ্বত্থকে পিপল্ বলে) থাকায় গুহার ঐ নামহয়। বুদ্ধও সম্ভব কোন সময়ে এই গুহায় বাস করিয়াছিলেন। সারিপুত্র প্রভৃতি শিষ্যরাও পরে এখানে কখন কখন বাস করিতেন। ভিক্ষু মহাকাশ্যপ একবার এখানে বাস করার সময়ে খুব পীড়িত হইয়া পড়েন এবং বুদ্ধ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া প্রবোধ সান্ত্বনা ও উপদেশ দেন। পুরাতত্ত্ব বিভাগ বলিয়াছেন যে সৈন্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইবার পর জরাসন্ধকী বৈঠকের গায়ের কোন গুহাকেই সম্ভব বৌদ্ধরা পিপ্পলিগুহা বলিতেন। কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না। কারণ বুদ্ধের সময়ে গিরিপ্রাকার ও এই সামরিক পর্যবেক্ষণ-মঞ্চ সৈন্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কেহ বলিয়াছেন জরাসন্ধকী বৈঠকের ঠিক পশ্চিমের পাহাড়ের গা হইতে পাথর কাটিয়া এই চবুতারা নির্মিত হইয়াছিল এবং গিরিগাত্রে সেখানে পাথর কাটার ফলে যে গুহাটির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল, এখন ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং ইহাই পিপ্পলিগুহা ছিল। এই ব্যাখ্যাও সঙ্গত মনে হয় না, কারণ সেপাইশান্ত্রীর ঘাটির অত কাছে নির্জনবাসী ভিক্ষুরা আশ্রয়স্থান নির্মাণ করিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না। (ক্রমশঃ)

জল জঙ্গল

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

মধুসূদন হেসে আশ্বাস দেন, সেরে যাবে রোগ—আমি বলছি, নিশ্চয় সারবে। সারাতেই হবে। সাগর অবধি যত বাদা আছে, সব আমি চোখে দেখব। তুমি সঙ্গে থেকে চিনিয়ে দেবে দুকড়ি—

দুকড়ি ভাবে, হাঁপানি সত্যিই সেরে যাবে। ফিরে পাবে আগেকার মতো গায়ের শক্তি ও দুরন্ত যৌবন। তার অবস্থা হয়েছে, যে লোক স্বজনদের কাছ থেকে সুদূরবর্তী হয়ে আছে তারই মতো। রোগমুক্তির পর বনচারী আবার স্বস্থানে ঘুরে ফিরে বেড়াবে, পঙ্গু হয়ে এই রকম জনালয়ে পড়ে থাকবে না।

শুনুন বাবুমশায়, পুবে এক খাল আছে —গদা গাঙ থেকে বেরিয়েছে। কেউ যায় না সেদিকে, সরকারি মানুষদেরও পা পড়েনি। আমি দৈবাৎ ঢুকে পড়েছিলাম ঐ খালে। দুপুরবেলা—কিন্তু হলে কি হবে রাত দুপুরের অবস্থা হয়ে উঠেছে......

শান্ত আকাশে তারা ঝিলমিল করছে। সেইদিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে দুকড়ি মনের আগেকার এক দুর্যোগ-দিনের ছবি মনে আনছে। পুঞ্জিত মেঘ চারিদিক অন্ধকার করে তুলেছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাতাস বন্ধ—অসহ্য গুমোট। জলের রং কালি-গোলার মতো। জল-জল-আকাশের এ মূর্তি দুকড়ি খুব চেনে—বড় গাঙে থাকা অতঃপর কোনক্রমে উচিত নয়। খালের মধ্যেও একেবারে নিরাপদ নয়—গাছপালা ভেঙে পড়ে নিশ্চিহ্ন সলিল-সমাধি ঘটিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু উপায় কি—ঘরের মতো নিশ্চিন্ত আশ্রয় কোথায় মিলবে জলের ভিতর? কোন এক পাশখালি বা খাঁড়ির মধ্যে নৌকোর মাথা ঢুকিয়ে ঝড়-বাতাস না থামা পর্যন্ত চুপচাপ অপেক্ষা করবে, এই মতলবে সে খালে ঢুকে পড়ল।

খানিকটা দূরে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় দেখল—খাল বা খাড়ি নয়—মহাব্যস্ত কতকগুলো মানুষ। কালো-কালো চেহারা, লম্বায় আমাদের দুনো তে-দুনো হবে। মানুষ বলা উচিত নয়, মানুষ তারা নয়ও—পাথর কুঁদে কে বুঝি জীবন্ত দানব বানিয়েছে। খাল-ধারে কিসের প্রয়োজনে আনাগোনা করছে, কি করছে—জঙ্গলের আড়ালে থাকায় ঠাহর করা যাচ্ছে না। আসন্ন ঝড়ের মুখে এরা একদল নৌকো নিয়ে এসেছে—তা চোখ তুলে কেউ তাকাল না। টেরই পায়নি, এইরকম ভাব।

নৌকায় আর যারা আছে, সাহায্য চেয়ে হাঁকডাক করতে যাচ্ছিল। বহুদর্শী দুকড়ি বুঝতে পেরেছে—হাত তুলে তাদের নিষেধ করল। যেমন করছে ওরা করুকগে, ঘাটা দিয়ে কাজ নেই।

আকাশের ঘনঘটায় খুব ভয় হয়েছিল, কিন্তু সামান্য একটু বাতাস হয়ে মেঘ উড়ে গেল। আকাশ পরিষ্কার। দুকড়ি এগুচ্ছে তবু খাল দিয়ে। জোয়ারবেগে তরতর করে জল ঢুকছে—নৌকো আপনি ছুটেছে, বাইতে হচ্ছে না। খালপথে, দেখাই যাক না, কোথায় গিয়ে ওঠা যায়। মনে হচ্ছে, খুব এক সংক্ষিপ্ত পথে আগুন-জ্বালায় পৌঁছনো যাবে। নতুন পথের আন্দাজ পেয়ে দুকড়ি মেতে গিয়েছে।

কিন্তু ঝড় নেই, বাদলা নেই—ব্যাপার কি বলো তো? গাছপালা নুইয়ে এনে জলের উপর ধরছে, পথ আটকাচ্ছে। পিছন ফিরবার জো নেই—সেদিকেও ঠিক ঐ অবস্থা। ডাল ঠেসে ধরছে নৌকোর উপরে। দুকড়ি অবস্থা বুঝেছে। ভয় পেয়ে নৌকো থামালে ঐখানে দফা শেষ করবে। অবিরত বাইছে প্রাণপণ শক্তিতে, আর দমাদম লাঠির বাড়ি মারছে ডালপালায়।

খাল শেষ হলে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল। সেই সময় এক তাজ্জব জিনিস দেখতে পেল—নরম চরের উপর বড় বড় পদচিহ্ন। দুকড়ি নেমে গিয়ে মেপে এসেছে, সওয়া হাত, দেড় হাতের কম নয়। পা থেকেই পুরোপুরি মানুষটার আয়তন আন্দাজ করে নাও। শুধু কানেই শুনে থাকো বনবাসী অতি-মানুষদের কথা—দুকড়ি তাদের চোখে দেখেছে।

আর শুধু এমনি নির্বাক দুশমনের দল নয়, কথাও বলে অনেকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সাগরের কাছাকাছি ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ পড়ে। উপরের মাছের মতো তেমন স্বাদ নেই, তবু জাত্যাংশে ইলিশ তো! দুকড়ির দল সেবারে শিকারে গিয়েছিল। জেলেরা জাল তুলছে—গরানের কষে ভিজানো রাঙা জাল রুপালি ইলিশের প্রাচুর্যে ঝিকমিক করছে। নৌকো বেয়ে এগিয়ে গিয়ে দুকড়ি বলে, খাবার মাছ দাও—

জেলেরা তাকিয়ে দেখল, সত্যি সত্যি শিকারি নৌকা কিনা। দিয়ে দিল পাঁচ-ছটা মাছ। শিকারিরা মাছ চাইলে বিনাতর্কে দিয়ে দিতে হবে, বাদাবনের এই অলিখিত আইন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাত্রে আজ জবর খাওয়া-দাওয়া হবে। মাছ কোটা-ধোওয়া হতে লাগল। মনের আনন্দে দুকড়ি একটু ভাল জায়গা দেখে নৌকা বাঁধল। জেলেরা কাছা-কাছি মাছ ধরে বেড়াচ্ছে, শঙ্কার কিছু নেই।

কিন্তু পাড়ের জঙ্গলের মধ্য থেকে অনতিপরে খোনা গলায় বলে ওঠে, মাছ দাও না খানকয়েক—

কে তুই?

কাঠুরে। ওপারে আর সবাই কাঠ কাটতে গেছে, আমি একলা বসে আছি ওদের জন্য।

দুকড়ি খুব জোরে হাঁক দিয়ে উঠল, আ মরি আমার বাপের ঠাকুর! মাছ খাবি—তা হাত-পা রয়েছে কি করতে! ধরে খাগে—

তবু সেই করুণ আকুতি, মাছ দাও—

যা-যা-যা—ফাজলামির জায়গা পাসনি?

দুকড়ি বুঝতে পেরেছে। এত চিৎকার করল—কিন্তু ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও উঠছে না। এরকমটা হয় ওঁরা যখন আবির্ভূত হন শুধু সেই সময়ে। আরও দু-একবার হাঁকডাক করে সে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হল।

তখন বলে, আচ্ছা—তাই হবে। কাঁচা-মাছ খাবি কি রে? ভেজে দিচ্ছি—

উনুন টেনে ছইয়ের নিচে নিয়েছে। কড়াইয়ে তেল চাপিয়ে মাছ ছেড়ে দিতে কলকল করে উঠল। ভাজা ইলিশের সুবাসে বনভূমি ভরে উঠল।

দুকড়ি বলে, হাত পাত—

ভয়ে কাঁটা হয়ে আর সকলে খোয়ারিখোপে ঢুকে পড়েছে, দুকড়ির কাণ্ডকারখানা দেখছে। দুকড়ি দেখল, নদী-জলের উপর আলগোছে কুলোর মতো এক জোড়া হাতপাতা। মন্ত্র পড়ে চাপান-দেওয়া নৌকো—স্পর্শ করবার জো নেই, সে জানে।

নে, ধর—

উহু-হু, পুড়ে গেল—জ্বলে গেল—

ভয়াল আর্তনাদ দূর থেকে দূরবর্তী হয়ে অবশেষে বনান্তরালে মিলিয়ে গেল। দুকড়ি খলখল করে হাসে। হাসি চারিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। উচিত শাস্তি পেয়ে পালিয়ে গেছে মৎস্যপ্রত্যাশী। করেছে কি—মাছ দেবার নাম করে এক হাতা গরম তেল ঢেলে দিয়েছে হাতের উপর। সাহস বোঝ। অতি-সাবধানী পুরুষ দুকড়ি—তার মতো বহরদার অঞ্চলের মধ্যে নেই। আট প্রহরে অষ্টবন্ধন সেরে তাগা ও শিকড়বাকড়ের পোঁটলা নিয়ে তবে সে বাদায় বেড়ায়। সে ভয় করতে যাবে কেন?

শোন, হিতার্থে বলছি, সদুপদেশ কয়েকটা শুনে রাখো। নৌকো নিয়ে যাচ্ছ—জিজ্ঞাসা করবে, কোন দেশের লোক তুমি গো? যশোরে মণিরামপুরের হাটে গুড় উঠছে এবার কেমন? কোণ্টার দর কি? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবে। জবাব দিও না। নৌকো বেয়ে যেমন যাচ্ছিলে চলে যাবে।

বলবে, বেলকাটির জমির দপ্তরির খবর জানো? নৈমিন্দ কবিরাজ বেঁচে আছে না মরেছে? জানা থাকলেও জবাব দিতে যেও না।......অথবা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলতে পারে, রাতে পথের দিশা পাচ্ছি নে, দোহাই তোমাদের, একটুখানি তুলে নাও। বাঘে খেয়েছে মনে করে সঙ্গীসাথীরা নৌকো ভাসিয়ে সরে পড়েছে—এই দেখ, গাছের মাথায় উঠে বসে আছি, সেখান থেকে কথা বলছি, অতি বড় দিব্যি রইল—নিয়ে যাও নৌকোটা একটু কিনারে লাগিয়ে, নয়তো এবারে সত্যি সত্যি জানোয়ারের পেটে যাবো।

হয়তো সত্যিই বনের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া কোন মানুষ। ব্যাকুল হয়ে ডাকাডাকি করছে। কিন্তু সে রকম কদাচিৎ ঘটে। মোটের উপর তোমার ওসবে কান দেবার গরজ নেই। শুনতে পাওনি এইভাবে টেনে বেরিয়ে যাও। জঙ্গলরাজ্যে কে বা কার? সমাজ-সামাজিকতার দায় নেই এখানে। মানুষ এসে জন্তু হয়ে যায়। দয়াধর্ম লোকালয়ে ফিরে গিয়ে আবার দেখিও।

(২১)

আর একবারের বৃত্তান্ত বলি। এত অভিজ্ঞতা ও গুণজ্ঞান সত্ত্বেও সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল দুকড়ি নিজেই। অল্পের জন্য বেঁচে গেল। তাইতো বলি—বাদার কথা কিছু বলবার জো নেই, কার কপালে কখন কি ঘটে! মানুষ সেখানে গেলে আর একরকম হয়ে যায়, মাথা পরিষ্কার রাখা শক্ত।

রাত দুপুর। পাশখালির মুখে নৌকো বেঁধে আছে। সবাই ঘুমুচ্ছে—দুকড়ি নিজে পাহারায় আছে হুঁকো-কলকে ও আগুনের মালসা নিয়ে। ঘন ঘন তামাক খাচ্ছে ঘুম তাড়ানোর জন্য......

সেদিন এক ফুটফুটে ভদ্রলোক এসেছেন মৌভোগের কাছারিবাড়ি। সুকুমার নাম। এসেছিলেন রায়গ্রামে—মধুসূদন সঙ্গে করে এখানে এনেছেন। টিপিটিপি হাসছিলেন তিনি দুকড়ির গল্প শুনে। তারপর ছোট্ট একটু প্রশ্ন করলেন, বড় তামাক খাচ্ছিলে বুঝি বুড়ো? এমনি সাধারণ তামাকে নজর এত খোলতাই হয় না তো।

ভ্রূকুটি করে দুকড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল সুকুমারের দিক থেকে। নগরবাসী কি বুঝতে পারে বাদার ব্যাপার? এ হল আলাদা এক জগৎ, তোমাদের বাঁধা ছকের জীবন থৈ পাবে না জঙ্গলে ঢুকলে। গল্প যেমন চলছিল, চলতে লাগল।

দা-কাটা তামাক—বিষম তলোক। তা যা বলেছেন নতুন বাবু—বড়-তামাকের কাছাকাছিই বটে! তার দু-একটান টানলে নির্ঘাৎ তোমরা মাথা ঘুরে পড়বে। সেই বিষ নাকে মুখে এত উদ্গীরণ করছে, দুকড়ির তবু ঝিমুনি আসছে। এক একবার ঢলে পড়ার অবস্থা হয়। সেটা মধু ও মোম আহরণের মরশুম। সারাদিন মৌমাছির ঝাঁকের পিছনে ছুটোছুটি করে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়েছে। এখন ঝিরঝিরে জোলো হাওয়ায় ঘুম ঠেকানো মুশকিল।

হৈ-হৈ শুনল যেন হঠাৎ অনেক দূরে—অনেক লোক বুঝি তেড়ে আসছে। কি প্রলয়ংকর কাণ্ড বেধেছে ওদিকে! ঘুম ছুটে গেল, চোখ রগড়ে সে খাড়া হয়ে বসল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।...না, কোন-কিছু নয়। চাঁদ উঠেছে ধূসর জ্যোৎস্নায় বাদাবন পরিপ্লাবিত করে। তখন হাসি পেল দুকড়ির। দুর্গম জঙ্গলে আক্রমণ করতে আসবে কারা, আর শয়লা-পথে দুটো মানুষ পাশাপাশি যেতে পারে না—বড় দল নিয়ে হুল্লোড় করে আসবার পথই বা কোথায়? স্বপ্ন দেখছিল সে নিশ্চয়।

কিন্তু এখন নিঃসন্দেহ পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা—কান্না আসছে যেন কোন দিক থেকে! কে কাঁদে? কান পেতে একাগ্র হয়ে শোনে দুকড়ি। হরিণ বা আর কোন পশু-পাখীর ডাক এ নয়। অনতিস্পষ্ট—কিন্তু এ যে কান্নার আওয়াজ, তাতে সন্দেহ নেই। নিশিরাত্রে মহারণ্য গুমরে গুমরে কাঁদছে বুঝি! কিন্তু মানুষের গলা যে! মেয়ে-মানুষের।

নতুন রকমের কোন-কিছু দেখলেই সকলকে ডেকে তোলবার বিধি। বাদাবনের নিয়ম-কানুন কিছুই দুকড়ির অজানা নয়। কিন্তু সেই আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে কি মোহ তাকে পেয়ে বসল—দুরন্ত লোভ হল, এগিয়ে ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখে আসবার জন্য। দুর্নিবার আকর্ষণে তাকে টানছে, যেতে হবে—যাবেই সে। লোকজন ডেকে তুললে রাত্রিবেলা এখানে-সেখানে কখনো যেতে দেবে না, সে-ই বা কেমন করে এই অসঙ্গত প্রস্তাব তুলবে? সবাই অবাক হবে, সে পাগল হয়ে গেছে মনে করবে।

কাউকে কিছু না বলে দুকড়ি নিঃসাড়ে কাছি খুলে দিল।

গাঙটা ছোট সে জায়গায়—প্রায় নিস্তরঙ্গ। জ্যোৎস্না ঝিকমিক করছে জলের উপর। দুকড়ি বৈঠা বেয়ে চলেছে। অতি সন্তর্পণে বাইছে, জলে নাড়া না লাগে। এতটুকু দুলছে না নৌকো। নৌকোর লোক জেগে না ওঠে, সেজন্য তো বটেই—তা ছাড়া, ওপারের রোরুদ্যমানা পোঁচের আওয়াজে সচকিত হয়ে বনান্তরালে না পালায়, সেইটেই এখনকার বড় ভাবনা।

একটা বাঁক এইভাবে এগিয়ে গিয়ে আড়া-আড়ি পাড়ি ধরেছে। কূল ঘেঁষে চলেছে এবার। এমনিভাবে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক—চড়ায় আটকে যেতে পারে, জন্তু-জানোয়ারের ভয় আছে, জঙ্গল থেকে সাপ উঠতে পারে নৌকোর পাটাতনে। বাদাবনের বহুদর্শী মাঝি—সবই সে জানে। কিন্তু জেনে-শুনেও দ্বিধা করল না সে

এতটুকু। এমনি এক একটা ক্ষণ আসে, প্রাণের তখন কাণাকড়ি দাম থাকে না—মাটির ঢেলার মতো হাতের মুঠোয় নিয়ে ছুড়ে ফেলা যায়।

কিন্তু, কই......বুনো ঝিঁঝির আওয়াজ শুধু। কান্না থেমে গেল, কিম্বা ঝিঁঝিরাই কৌতুক করে নারীকণ্ঠে কাঁদছিল আরণ্য-রাত্রে। চাঁদাকাঁটার ঝোপের আড়ালে পড়ে গেছে এখন। ঝাঁড়ের ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে। দু-চোখের সকল দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করে তাকিয়ে আছে। ভাল দেখতে পাবে বলে নরম কাদায় বৈঠা বসিয়ে স্থির হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তবু হয় না—টিপিটিপি নামল তখন ডাঙায়। চাঁদাকাঁটায় পা ছড়ে গেল, ভ্রূক্ষেপ নেই।

দেখতে পেল—হ্যাঁ, স্পষ্ট চোখে দেখছে সে—

গল্প থামিয়ে হঠাৎ দুকড়ি মধুসূদনের পায়ে হাত দিল।

পা ছুঁয়ে বলছি বাবুমশায়, যে দিব্যি করতে বলেন রাজি আছি—দেখলাম, ঝোপের আবডালে সোনার প্রতিমা এক মেয়ে। হস্তেলের মতো রং—ও রকম রূপসী কেউ কোনদিন আপনারা দেখেন নি......

টিপিটিপি পা ফেলে দুকড়ি একেবারে কাছে এসে গেছে। হেঁতাল-ঝাড়টা পার হয়েই চাঁদের আলোয় মুখোমুখি হবে। ঢিব-ঢিব করছে বুকের মধ্যে—সামলাতে পারে না। আর একটু—সামান্য হাত কুড়ির মধ্যেই—

কিন্তু টের পেয়ে গেল এত সতর্কতা সত্ত্বেও। পালিয়েছে। হাউইবাজির মতো আলো ছিটকে সাঁ করে ছুটে গেল। বন-জঙ্গল তার গায়ে বাধে না—অবহেলায় যেন হাওয়ায় ভেসে ছুটেছে। পালিয়ে গিয়ে খালের ধারে ধারে—ঐ, ঐ যে—অনেকটা দূরে ফাঁকার মধ্যে একটা বেঁটে বাইন গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে। হাসছে কি তার দিকে চেয়ে চেয়ে—চোখের ইশারায় ডাক দিচ্ছে? দুকড়ি তো ছুটতে পারবে না কাঁটা-জঙ্গলের ভিতর—লাফিয়ে এসে উঠল নৌকোয়। খালের জল মৃদু কল্লোলে গাঙে এসে পড়ছে। মোহানায় স্রোত প্রখর—একটা মাত্র বৈঠার সাহায্যে এগুনো দুষ্কর। জোয়ান বয়স তখন—গায়ে অসুরের বল—সে কি কোন বাধা গ্রাহ্য করে? নেমে পড়ল কাদার মধ্যে। গায়ে যত জোর আছে, নৌকো ঠেলছে। ঠেলে ঠেলে খালে ঢুকিয়েছে, উজোন কেটে চলেছে অত্যন্ত ধীরে ধীরে...

হঠাৎ একজন মউলের ঘুম ভাঙল। ভাগ্যিস ভেঙেছিল। লোকটা মনে করেছে, জলের টানে কেমন করে বাঁধন খুলে নৌকো ভেসে চলেছে। মানুষে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে সে লাফিয়ে উঠে বসল। পিছন থেকে দুকড়িকে চিনতে পারে নি। বুড়োমানুষ সে—বাদায় ঘোরাফেরা আছে অনেক। কাজে-কর্মে যারা বনে আসে, তাদের মধ্যেও বদ্-লোকের অন্ত নেই। কি মতলবে কে কোথায় দলসুদ্ধ নিয়ে যাচ্ছে, আতঙ্কে সে চেঁচিয়ে ওঠে, [illegible]রে?

চুপ, চুপ!

ফিসফিস করে অতি কাতরতার সঙ্গে দুকড়ি বুড়োকে থামতে বলে। এত কষ্ট করে—জীবন পণ করে এই যে নৌকো টেনে আনছে—সকল কষ্ট নিরর্থক হবে, আবার পালাবে এদিক দিয়ে যদি শব্দ-সাড়া পায়।

চুপ! দাদা, তোমার পায়ে পড়ি—একটাও কথা কোয়ো না—

লোকটা আশ্চর্য হয়ে বলে, হল কি তোমার দুকড়ি? উঠে এসো।

হাত ধরে ফেলে একরকম জোর করে সে দুকড়িকে টেনে তুলল তেয়াজিখোপে। পাড়ের একগোছা কাশ মুঠো করে টেনে রেখেছে, নৌকো যাতে ভেসে না যায়। মুহূর্তকাল লোকটা দুকড়ির দিকে নিস্পলক চেয়ে রইল। তারপর বলে, হয়েছে কি?

মাটি করে দিলে। কে-একজন কাঁদছিল ইদিক পানে। আর তো দেখতে পাই নে।

এদিক-ওদিক ঠাহর করে দেখে বুড়ো শিউরে ওঠে। বলে, ওরে বাবা! চিনতে পারো না কোনখানে চলে এসেছ! খালটুকু শেষ হলেই যে সর্বনাশীর মুখ—সর্বনাশীতে এনে ফেলেছে। ওঠ্—উঠে পড় সবাই—

চেঁচামেচিতে সকলে জেগে উঠল। চোখ মুছতে মুছতে চারিদিক তাকিয়ে জায়গাটা ঠাহর করবার চেষ্টা করে। তাই তো রে—আর একটু হলেই সর্বনাশ হত। সবসুদ্ধ গাঙের নীচে যেতে হত। ঝড়-তুফান না-ই থাক, নৌকোর পরিত্রাণ ছিল না সর্বনাশীর চোরাদহে পড়লে। নিঃশঙ্কে এরা নিদ্রিত ছিল—গভীর রাত্রে সেই সময়ে দুকড়ি নিয়ে চলেছিল সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। যে দুকড়িকে কাণ্ডারী করে তারই ভরসায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে এতগুলো মানুষ দুর্গম জলজঙ্গলে এসেছে।

দুকড়ির ডাইনে বাঁয়ে দুজনে তার হাত জাপটে ধরে বসে আছে। দুকড়ি আর নয়—এবার হালে গিয়ে বসল এদেরই একজন।

জোরে বাও মরদের বেটারা। সাবাস, সাবাস! উড়িয়ে নিয়ে চলো। বিষখালিতে উঠে তবে জিরান পাবে—

এক সঙ্গে ছ'খানা বৈঠা পড়ছে, বাইচের মতো নৌকা তীরগতিতে ছুটছে। দুকড়ি এতক্ষণ বুঝতে পেরেছে অপরাধ। কি হয়েছিল যেন তার—দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। সর্বনাশী থেকে যত দূরে আসছে, একটা দুটো করে ততই কথা ফুটছে সকলের মুখে। দুকড়িকে যাচ্ছে-তাই করে বলছে। আর সেই বুড়োই তর্ক করছে দুকড়ির হয়ে

হুঁশজ্ঞান ছিল কি ওর? সর্বনাশী বেটী মাথা ঘুলিয়ে দেয়। সর্বনাশীর চোলে যে-কেউ তোমরা পড়তে, ঠিক এমনি দশাই হত। বকাঝকা ছাড়ান দাও, বাপের ভাগ্যি যে প্রাণে প্রাণে ফিরছ!......চাপান দেওয়া যাক এই জায়গায়—কি বলো? ঐ যে, আরও কখানা বেঁধে আছে। আর ঘুমানো নয়—রাতটুকু জাগতে হবে সকলে মিলে গল্প-গুজব করে। কি জানি, বলা যায় না—সর্বনাশী আশে-পাশে আছে হয়তো ওৎ পেতে। ক'টা আলো আছে? সবগুলো জেবলে দাও—। (ক্রমশঃ)

দেহ লক্ষণা

শ্বাস প্রশ্বাস তন্ত্র

পশুপতি ভট্টাচার্য

এবার বলি বায়ু গ্রহণের কথা। বায়ু এমন জিনিস যা আমরা চোখে দেখি না, কিন্তু নিত্যই গ্রহণ করি। বায়ু আমাদের পক্ষে খাদ্যের চেয়েও বেশি দরকারী, জলের চেয়েও বেশি দরকারী। কারণ খাদ্য আর জল আমাদের কেবল মাঝে মাঝেই দরকার হয়, কিন্তু বায়ুর দরকার প্রতি মুহূর্তে। বায়ুশূন্য স্থানে থাকলে আমরা কোনোমতে বাঁচবোই না। তার কারণ বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্প থাকে সেটিকে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি কোষের পক্ষে প্রতি মুহূর্তেই দরকার। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, আমরাও তেমনি বায়ু ছাড়া বাঁচি না। মাছও অক্সিজেন নেয় জল থেকে, আর আমরা অক্সিজেন নিই বায়ু থেকে। তাও পৃথিবীর উপরে যতটা বায়ুর চাপ আছে, অল্পবিস্তর ততটা চাপের মধ্যেই আমাদের থাকা দরকার। বায়ুর চাপ অত্যন্ত কমে গেলেই আমাদের বিপদ। উড়োজাহাজে চড়ে যদি আমরা খুবই উপরে উঠতে থাকি তাহ'লে এখানকার পরিমণ্ডলের বায়ুর স্তর ভেদ ক'রে আমরা যেতেই পারবো না। এমন কি বায়ুর চাপ যেখানে অনেকটা কম সেখান পর্যন্ত উঠতে হলেও সঙ্গে অক্সিজেনের বোতল নেবার দরকার হবে। যতটুকু অক্সিজেন নিতে আমরা অভ্যস্ত তার চেয়ে কম হলে আমাদের চলবে না।

সকল প্রাণীর পক্ষেই অক্সিজেন দরকার অর্থাৎ বায়ু গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু খুব নিম্নজাতীয় প্রাণীদের শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্যে আলাদা কোনও ব্যবস্থা নেই, তারা তাদের গাত্রাবরণের দ্বারা এবং কোষাদির দ্বারাই সরাসরি বায়ু গ্রহণ করে, কিন্তু উচ্চস্তরের প্রাণীদের পক্ষে ওর জন্যে আলাদা রকম ব্যবস্থার দরকার হয়। আমরাও আমাদের গায়ের চামড়ার ভিতর দিয়ে কিছু কিছু বায়ু গ্রহণ করি বটে এবং সেটুকুও আমাদের শরীরের তাপ সংরক্ষণাদির কারণে বিশেষ দরকার, কিন্তু তা ছাড়াও আমাদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থিত শ্বাসযন্ত্রাদির দ্বারা নিত্য নিত্য বায়ু গ্রহণ ও বায়ু ত্যাগ করা চাই।

অতএব অক্সিজেনের প্রয়োজনেই আমরা বায়ু গ্রহণ ক'রে থাকি। কিন্তু বায়ুর মধ্যে কেবল যে অক্সিজেন বাষ্পই আছে তা নয়, এমন কি খুব বেশি পরিমাণে আছে তাও নয়। ওর মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৯ ভাগ আছে নাইট্রোজেন, শতকরা মাত্র ২০ ভাগ আছে অক্সিজেন, আর অন্যান্য বাষ্প শতকরা ১ ভাগ। বায়ুর ভিতরকার ঐটুকু অক্সিজেনই আমাদের কাজে লাগে। ওর নাইট্রোজেনটা আমাদের কোনই কাজে লাগে না। অথচ নাইট্রোজেন জিনিসটাও আমাদের বিশেষ দরকার শরীরের পুষ্টির জন্যে। কিন্তু এই নাইট্রোজেন আমরা নিতে পারি, কেবল খাদ্যেরই ভিতর থেকে, বায়ুর ভিতর থেকে নেবার উপায় নেই। বায়ুর নাইট্রোজেন নিতে পারে পৃথিবীর মাটি। মাটিতে তাই থেকে নাইট্রেট জন্মায়, সেই নাইট্রেটের দ্বারা গাছ-পালা সমৃদ্ধ হয়। সেই গাছপালার কাছ থেকে খাদ্যের ভিতর দিয়ে নাইট্রেট হিসেবে এবং প্রোটিন হিসেবে আমরা নাইট্রোজেন সংগ্রহ করি। তা ছাড়াও গাছপালার সঙ্গে আমাদের নিত্যই বাষ্পের আদানপ্রদান চলছে। আমরা শ্বাস গ্রহণের দ্বারা বায়ুর অক্সিজেনটুকু নিয়ে তার বদলে নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা অঙ্গার বাষ্প পরিত্যাগ করি। আর গাছপালারা ঠিক তার উল্টো কাজ করে, অর্থাৎ আমাদের পরিত্যক্ত অঙ্গার বাষ্পটাই তারা গ্রহণ করে আর তার বদলে অক্সিজেন বাষ্প পরিত্যাগ করে।

যাই হোক শ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যতটা বায়ু গ্রহণ ক'রে থাকি তার মধ্যে রয়েছে শতকরা ২০ ভাগ মাত্র অক্সিজেন। ওর সবটুকুই কি আমাদের কাজে লাগে? তাও নয়। ওর মধ্যেও মাত্র ৪ ভাগই আমাদের কাজে লাগে, বাকি ১৬ ভাগ যেমন শ্বাসবায়ুর সঙ্গে ঢুকেছিল, তেমনি নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে আবার বেরিয়ে যায়। ঐ ৪ ভাগ অক্সিজেনের বদলে আমরা প্রতিবারে পরিত্যাগ করি ঠিক ততখানি কার্বন ডাই-অক্সাইড বা অঙ্গার বাষ্প। সেটা আসে আমাদের দেহস্থ কোষগুলির ভিতর থেকে। অতএব দেহের মধ্যে এই দুই রকম বাষ্পের আদানপ্রদান চলে দুই প্রস্থ। এক প্রস্থ আদানপ্রদান হয় যাবতীয় কোষগুলির মধ্যে অর্থাৎ তারা প্রত্যেকেই রক্তের ভিতর থেকে খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করে এবং সেই অক্সিজেনের দ্বারা খাদ্যের দাহন ঘটিয়ে তার যথোচিত সদ্ব্যবহার করে। এই দাহনের ফলে সেখানে জন্মায় অঙ্গার বাষ্প। সেই অঙ্গার বাষ্পকে তারা রক্তের মধ্যেই ফিরিয়ে দেয়। কোষে কোষে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটা অর্থাৎ বাষ্পের আদানপ্রদান এই-ভাবেই চলতে থাকে। আর দ্বিতীয় প্রস্থের আদানপ্রদান হয় আমাদের ফুসফুসের মধ্যে। প্রত্যেক কোষের ভিতর থেকে তৈরি সমস্ত অঙ্গার বাষ্প রক্তের মারফতে এসে ফুস-ফুসের মধ্যে যখন পৌঁছয়, তখন ফুস-ফুস প্রত্যেকবারের শ্বাসবায়ুর ঐ ৪ ভাগ অক্সিজেনের বদলে ততটা পরিমাণ অঙ্গার বাষ্প নিঃশ্বাসবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করে। এই হোলো আমাদের নিয়মিত শ্বাস-ক্রিয়া। তাহ'লে শ্বাস গ্রহণের দ্বারা বায়ু-মধ্যস্থ অক্সিজেন প্রথমে ফুসফুসে গিয়ে প্রবেশ করছে, সেখান থেকে রক্তের সঙ্গে মিশে সেটা চলে যাচ্ছে দেহের প্রতি কোষে কোষে, দাহনের কাজ সমাধা ক'রে সেটা অঙ্গার বাষ্পে পরিণত হচ্ছে, সেটা আবার রক্তের সঙ্গে মিশে ফুসফুসে এসে পৌঁছচ্ছে, তার পরে ফুসফুস থেকে নিঃশ্বাসবায়ুর সঙ্গে সেটা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটি করবার জন্যে নিযুক্ত হয়ে আছে যথাক্রমে আমাদের নাসিকা যন্ত্র, তার পরে গলার ভিতরকার গহ্বর, তার পরে আমাদের স্বরযন্ত্র, তার নিচে একটি মোটা শ্বাসনালী, তার পরে তার থেকে নির্গত দু'দিকে দু'টি ব্রোমশাখা এবং ওর থেকে ছড়িয়ে পড়া অসংখ্য শাখাপ্রশাখা, আর শেষকালে দুই দিকের দুটি ফুসফুস যন্ত্র। এইগুলির সম্বন্ধে একে একে কিছু আলোচনা করা যাক্।

নাসিকা—মুখ দিয়েও শ্বাস গ্রহণ করা যায়, কিন্তু সেটা অভিপ্রেত নয়, স্বাভাবিক অবস্থায় তাতে অনিষ্ট আছে। মুখের কাজ আলাদা। মুখ যেমন আমাদের বাইরের থেকে খাদ্য গ্রহণের প্রথম যন্ত্র, নাকও তেমনই বাইরের থেকে বায়ু গ্রহণের প্রথম যন্ত্র।

মুখের মধ্যেও যেমন খাদ্যকে উপযুক্ত
ম ভিতরে নেবার সম্বন্ধে অনেক রকমের
থা আছে, নাকের মধ্যেও তেমনি
কে উপযুক্ত রকমে নেবার সম্বন্ধে
ক রকমের ব্যবস্থা আছে। আমাদের এই
কো যন্ত্রটি এমনভাবে লম্বালম্বি খাড়া
থাকে যে বাইরের থেকে দেখলে মনে
যেন ওর ভিতরকার ফুটো দুটি নিচের
থেকে সোজা উপর দিকেই উঠে গেছে,
তু বাস্তবিক তা নয়। ফুটো দুটো
ন্তরালভাবে বরাবর সোজা ভিতর দিকে
ং তালুর উপরিভাগ দিয়ে ভিতরের
র দিকে চলে গেছে। তবে ওর উপরের
টারও কিছু প্রয়োজন আছে। মুখের
যেমন দুই রকমের অর্থাৎ খাদ্যগ্রহণ
এবং আস্বাদ গ্রহণ করা, নাকের কাজও
নি দুই রকমের অর্থাৎ বায়ু গ্রহণ করা
ং আঘ্রাণ গ্রহণ করা। নাকের নিচের
কর রাস্তা দুটির দ্বারা কেবল বায়ু
ণের কাজটি হয়, আর ওর উপরের
টাতে আঘ্রাণ গ্রহণের কাজ হয়। ঐ
জের উপযোগী যন্ত্রাদি রয়েছে ঐ উপরের
টাতে। আমাদের টিকোলো ধরণের
টি বাইরের থেকে খুব কঠিন দেখালেও
ট হাড়ের তৈরি নয় এটি কচ্‌কচে ধরণের
রকম উপাস্থি দিয়ে তৈরি যা আঘাত
লেও ভাঙবে না। ওর উপর প্রান্তে দুই
করা ছোটো ছোটো হাড় আছে বটে, কিন্তু
খানে সহজে কোনো আঘাত লাগে না।
ই স'জোরে নাকের উপর আঘাত করলে
তে প্রচুর রক্তপাত হয়, কিন্তু ক্ষতি তেমন
শেষ হয় না।

নাসিকা গহ্বরের ভিতরকার ব্যবস্থাও
কটু বিচিত্র। এর প্রবেশদ্বারের সামনেই
খা যায় অনেকগুলি চুল যেন চারিদিক
কে ঝুঁকে এসে গহ্বরের মুখটা আড়াল
রে রেখেছে। কারো কারো নাকের ভিতর-
র চুল এতই ঘন যে মনে হতে পারে বায়ু
বেশের রাস্তায় এত বেশি চুলের অবরোধ
থাকাই উচিত। কিন্তু এই চুলগুলি থাকা
বই প্রয়োজন, এগুলি অনেকটা যেন
র্দার আড়ালের কাজ করে। বায়ুর সঙ্গে
নেক রকমের ধুলো বালি বীজাণু ভেসে
াসতে পারে, অনেক রকমের পোকাও
াকের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়তে পারে, ঐ
লগুলি সব কিছুকে অনেক সময়েই
াটকায়। অবশ্য অপেক্ষাকৃত মোটা জিনিস
াড়া খুব সূক্ষ্ম কোনো জিনিস ওতে
আটকায় না, তার জন্যে নাকের মধ্যে আবার
অন্য রকমের ব্যবস্থা আছে।

নাকের ভিতরকার দুই গহ্বরের মাঝে
রয়েছে এক তরুণাস্থির ব্যবধান, তার গায়ে
অত্যন্ত পাতলা ধরণের হাড়ের দ্বারা
প্রত্যেক নাসিকা গহ্বরের মধ্যে দুটি তাক
করা আছে, সেই তাক দুটি ঝিল্লীর পর্দা
দিয়ে ঢাকা। ঐখানে থাকে যথেষ্ট রক্তশিরা।
নাকে আঘাত লাগলে ঐখান থেকেই রক্ত
নির্গত হয়। ওখানকার রক্ত খুব উত্তপ্ত,
কাজেই নাকের ভিতরকার ঐ স্থানের আব-
হাওয়াটাও খুব উত্তপ্ত। সেই কারণে নাকের
ভিতর দিয়ে যাতায়াত করবার সময় বায়ু
যথেষ্ট পরিমাণে গরম হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া নাকের ভিতরটা সর্বদাই সিক্ত
থাকে। ওখানকার ঝিল্লীগাত্রে এবং সমস্ত
শ্বাসপ্রণালীর ভিতরকার ঝিল্লীতে আগা-
গোড়াই দুই জাতের কোষ আছে। এক-
জাতের কোষের নাম গব্‌লেট সেল, সেগুলির
কাজ হোলো অনবরত তরল শ্লেষ্মারস
ক্ষরণ করা, নাকের বেলাতে যাকে আমরা
বলি সিক্‌নি এবং ভিতরকার শ্বাসনালি
থেকে নির্গত হয় তাকে বলি গয়ার। এই
সিকনি ছাড়াও চোখের কোণ থেকে কিছু
কিছু অশ্রুরস নাকের মধ্যে নিত্যই গড়িয়ে
আসে। এই দুই জিনিসের দ্বারা নাকের
ভিতরটা বরাবর সিক্ত হয়ে থাকে এবং
সেখান দিয়ে যাতায়াত করবার সময় শ্বাস-
প্রশ্বাসের বায়ুটাও তার সংস্পর্শে এসে
রীতিমত সিক্ত হয়ে ওঠে। এই শ্লেষ্মা বা
সিকনি রসের প্রয়োজনীয়তা কম নয়।
ধুলোবালি যতই সূক্ষ্ম হোক, বায়ুর সঙ্গে
প্রবেশ করলে তার বেশির ভাগই এর সঙ্গে
লেপটে গিয়ে সেখানেই আটকে থাকবে,
ফুসফুসের মধ্যে বায়ুর সঙ্গে আর প্রবেশ
করতে পারবে না। কিন্তু ধুলোবালি
আবর্জনার পরিমাণ যদি খুব বেশি হয়,
তাহ'লে সেগুলো ঐ ঝিল্লীগাত্রে লেগে
অনেকটাই জমে ওঠে। তখন সেগুলোকে
বাইরে বের ক'রে দেবার দরকার হয়। এর
জন্যে ঐ ঝিল্লীগাত্রে আর এক রকমের
কোষ রয়েছে, তার নাম সিলিয়া বা ঝাঁটার
মতো ঝালরযুক্ত কোষ। এই কোষের
বিশেষত্ব এই যে, তার মাথায় মাথায়
রয়েছে ঝালরের ন্যায় অনেকগুলি
সূক্ষ্ম তন্তু, সেগুলি একমুখী গতিতে
অনবরত সব কিছুকে বাইরের দিকে
ঠেলে ঝেঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করছে।
ওরই দ্বারা শ্লেষ্মাজড়িত আবর্জনা বাইরের
দিকে চালিত হয়। অধিক আবর্জনা এসে
পড়লে তখন ঐ কোষগুলি খুব উত্তেজিত
এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে, তারই ফলে
আমাদের হাঁচি ও কাসির উদ্বেগ আসে।
হাঁচি কাসি মানে আর কিছুই নয়, ভিতরে
যে আবর্জনাযুক্ত শ্লেষ্মা জমেছে সেগুলিকে
বাইরে বের ক'রে দেবার একটা প্রচেষ্টা।
নাকের ভিতরকার ঐ প্রচেষ্টায় আমাদের
হাঁচির উদ্রেক হয়, আর শ্বাসনালীর ভিতর-
কার ঐ প্রচেষ্টা থেকে হয় কাসির উদ্রেক।
বলা বাহুল্য যে আবর্জনা প্রভৃতির
উপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া আমরা ক'রে থাকি
সেটা বাইরের থেকেও ঢুকতে পারে আবার
ভিতর থেকেও নির্গত হয়ে আসতে পারে।
তাই নাকে বাইরের কোনো জিনিস, যেমন
ধুলো প্রভৃতি ঢুকলেও আমরা হাঁচতে থাকি,
আবার নাকের মধ্যে সর্দি রোগ প্রভৃতি
উপস্থিত হ'লে তাতেও আমরা হাঁচতে
থাকি। কাসির পক্ষেও ঠিক ঐ কথা,
আবর্জনা শ্বাসনালীতে বাইরের থেকেই
আসুক বা ফুসফুস থেকেই আসুক, তাতে
কাসি নিশ্চয় হবে। সুতরাং হাঁচি বা কাসি
জিনিসটাকে কোনো রোগ মনে করা উচিত
নয়। ওগুলি হোলো দেহপ্রকৃতির একরকম
প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্ন রোগের লক্ষণ হলেও
বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক বা
আশঙ্কাজনক মনে হলেও অনেক সময়ে এ
প্রতিক্রিয়াটি উপকারী। ওতে আরোগ্যের
পক্ষে অনেক সময়ে সাহায্যই করে। সেইজন্য
রোগীরা যখন বলে যে আগে কাসিটা থামিয়ে
দিন, তখন চিকিৎসকেরা তার জন্যে খুব
ব্যস্ত না হয়ে আগে রোগের দিকেই মনো-
যোগ দেয়, অর্থাৎ যে কারণে কাসির উদ্রেক
হয়েছে সেই কারণটাকেই দূর করবার চেষ্টা
করে। তারা জানে যে রোগ সারলেই কাসি
সারবে। অবশ্য কাসির মাত্রা খুব বেশি বেড়ে
উঠলে তখন তাকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা
করতেই হয়।

গলগহ্বর ও স্বরযন্ত্র—নাকের ভিতরকার
বায়ুপথ দুটি গলার ভিতরে গিয়ে উন্মুক্ত
হয়েছে। মুখের গহ্বরটিও ওখানে গিয়ে
উন্মুক্ত হয়েছে। এই সাধারণ গলগহ্বর
থেকে দুটি নল কণ্ঠদেশের ভিতর দিয়ে
নিচের দিকে লেগে গেছে। একটি হোলো
শ্বাসনালী অপরটি অন্ননালী। শ্বাসনালী
আছে সামনে, অন্ননালীটা পেছনে। পেছনের

অন্ননালীটা খাদ্য যাবার সময় ছাড়া অন্য সব সময়েই বুজে থাকে। কিন্তু শ্বাসনালী বা কণ্ঠনালী সব সময়েই থাকে খোলা, তার কারণ সেটি গোল গোল চাকার মতো কঠিন উপাস্থিকে উপর্যুপরি সাজানোর দ্বারা নির্মিত, অনেকটা যেমনভাবে কূপের পাড় গাঁথা হয়। এই চিরউন্মুক্ত নলটির উপরের মুখে কঠিন উপাস্থির একটি ঢাকনি বা ডালা দেওয়া আছে, ওর নাম এপিগ্লটিস। এই ঢাকনিটা সর্বক্ষণই খোলা থাকে। কিন্তু খাদ্য যাবার সময় হলেই ঐ ঢাকনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়, খাদ্যটি ওর উপর দিয়ে গড়িয়ে পিছনের অন্ননালীর মধ্যে ঢুকে গেলে তখন আবার ঐ ঢাকনি খুলে যায়। এই কারণে খাদ্যের কুচি সহজে কখনো কণ্ঠনালীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু দৈবাৎ কখনো যদি এক আধ কুচি খাদ্য ওর মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহ'লে কাসির দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেটুকু বের ক'রে ফেলতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটুকু বেরিয়ে না গেল, ততক্ষণ কাসির নিবৃত্তি নেই। একেই আমরা বলি বিষম লাগা। প্রকৃতির নিয়ম এই যে বায়ু যাবার পথে কখনো অন্য সামগ্রী ঢুকবে না। এই নিয়মের ক্বচিৎ লঙ্ঘন হলেই অবস্থাটা তখন বিষম হয়ে ওঠে।

এই এপিগ্লটিসের নিচেই কণ্ঠনালীর প্রথম অংশটা হোলো আমাদের স্বরযন্ত্র। ঐখানে বাঁশি তৈরির মতো এমন ব্যবস্থা করা আছে, যাতে অল্পবিস্তর সজোরে সেখান দিয়ে বায়ু নির্গত হলেই তখন সেই স্বরযন্ত্র থেকে নানারকমের স্বর বেরোতে থাকবে, অর্থাৎ বাঁশিতে সজোরে ফুঁ দিয়ে যেমনভাবে আমরা নানারকমের শব্দ বের করি। এই স্বরযন্ত্র কয়েকটি বিভিন্ন উপাস্থির সংযোগে বাক্সের মতো আকারে গঠিত, তার মধ্যে এক জোড়া উপাস্থি আমরা বাইরের থেকে চোখে দেখতে পাই, যাকে আমরা বলি কণ্ঠমণি, অর্থাৎ যে উঁচু মতো ত্রিকোণ জিনিসটা আমাদের কথা বলার সময়ে কণ্ঠের সামনের দিকে ওঠানামা করে। এই স্বরযন্ত্রের বাক্সের মধ্যে দুই পাশ থেকে দুটি ঝিল্লীর পর্দার আড়াল টানা আছে, তার মাঝখানে একটু ফাঁক। ঐ দুটি হোলো আমাদের গলার ভিতরকার বাঁশির পর্দা, ওর নাম ভোকাল কর্ড এবং ফাঁকটির নাম হোলো গ্লটিস। সাধারণ শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় এই ফাঁকটি থাকে সম্পূর্ণ খোলা, সুতরাং তখন ওর ভিতর থেকে কোনো স্বরই বেরোয় না। কিন্তু স্বর বের করবার প্রয়োজন হলেই কর্ড দুটি টান হয়ে দুদিক থেকে অল্পবিস্তর বুজে আসে এবং ফাঁকটি অল্পবিস্তর সঙ্কীর্ণ হয়ে যাওয়াতে তখন যন্ত্রটা বাঁশির মতো বেজে ওঠে। বলা বাহুল্য স্বরযন্ত্রের বাক্সটি এবং ভোকাল কর্ডের পর্দাগুলি যার যেমন আকারের হয় তার কণ্ঠস্বরও তেমনি বিশিষ্ট প্রকারে সরুমোটা হয়ে থাকে এবং তার থেকেই আমরা বুঝি কোনটা কার কণ্ঠস্বর।

কণ্ঠনালী ও শাখাপ্রশাখা—স্বরযন্ত্রের ঠিক নিচের থেকে লম্বমান যে মূল শ্বাসনালী বা কণ্ঠনালী সেটি প্রায় সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা, ভিতরকার ব্যাস এক ইঞ্চি। হৃদ্‌পিণ্ডের প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত নেমে গিয়ে এটি দুই পাশের দুই ব্রোমশাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। এই শ্বাসনালী সহজ অবস্থাতে কখনই বোজে না, কেবল একটি রোগে এর উপরের মুখটা বুজে যেতে পারে, সেই রোগের নাম ডিফ্‌থীরিয়া, যা ছোটো ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রায়ই হয়ে থাকে। এই রোগ হলে তার দ্বারা একটি পুরু পর্দার সৃষ্টি হয়, সেই পর্দা দিয়ে গলার ভিতর থেকে স্বরযন্ত্রের ও শ্বাসনালীর উপরের মুখটা বুজে যায়, তখন শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। তখন বায়ু গ্রহণের জন্যে শ্বাসনালীটিকে ছেদন ক'রে দিতে হয়। হাঁপানি রোগে এই শ্বাসনালীর মধ্যে যথেষ্ট আক্ষেপ হয় বটে, কিন্তু একেবারে বুজে যায় না।

দুই পাশের ব্রোমশাখা দুটি ডাইনে বাঁয়ে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত দুই দিকের দুই ফুসফুসের মধ্যে ঢুকে গেছে। এর সেই শাখাপ্রশাখাগুলি ঠিক যেন গাছের ডালপালার মতোই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এগুলি মোটা থেকে ক্রমশ সরু হয়ে যেতে থাকলেও ফুসফুসের মধ্যে ঢুকে খুব বেশি সূক্ষ্ম না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তেমনি কঠিন উপাস্থির দ্বারাই গঠিত, সুতরাং ওগুলিও মূল শ্বাসনালীর মতো বরাবর ফাঁপাই থাকে। কিন্তু শেষ বরাবর আর কোনো উপাস্থি নেই, তখন কেবল পাতলা মাংসপেশী আর স্থিতিস্থাপক তন্তু দিয়ে ওর সরু সরু নলগুলি তৈরি। অবশেষে আর তাও নেই, সেগুলি বিভক্ত হতে হতে এমন সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে চর্মচক্ষে আর দেখা যায় না। মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। এই অবস্থায় যখন এসে পড়ে তখন নলগুলি কেবল ঝিল্লীর দ্বারাই তৈরি, তখন তাকে বলে ব্রংকিওল। কিন্তু সেগুলি কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে? সেগুলি কোথাও একটা বিভিন্ন রকম আধারের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে না, অন্তিম প্রান্তে এসে হঠাৎ নিজেরাই কতকগুলি বেলুনের মতো হয়ে ফুলে উঠছে, সেই নিজস্ব কয়েকটা ফাঁপা বেলুনের মধ্যেই তার সমাপ্তি। সেই ফাঁপা বেলুনের মতো জিনিসগুলির নাম ইন্‌ফাণ্ডিবুলাম। ওর প্রত্যেকটির ভিতরকার গায়ে গায়ে রয়েছে অনেকগুলি বায়ুকোষ। বলতে গেলে ঐ ইন্‌ফাণ্ডিবুলামের সমষ্টির দ্বারাই মূল ফুসফুস যন্ত্রটি গঠিত। অর্থাৎ যা ছিল শ্বাসনালীর শাখাপ্রশাখা তাই যেন অসংখ্য বায়ুকোষে রূপান্তরিত হয়ে গেল, আর সমস্ত বায়ুকোষগুলিকে নিয়ে একটা মৌচাক গড়ার মতো গড়ে উঠলো ফুসফুস। পূর্বোক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্রংকিওলগুলির যদি সংখ্যা গণনা করা যায়, তাহ'লে প্রত্যেক দিকের সংখ্যা হবে প্রায় আড়াই কোটি, আর বায়ুকোষযুক্ত ইন্‌ফাণ্ডিবুলামের সংখ্যা গণনা করলে হবে প্রায় চল্লিশ কোটি।

তবু শ্বাসনালীর সূক্ষ্ম প্রশাখা বা ব্রংকিওল এবং স্বয়ং ফুসফুসের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ আছে। ব্রংকিওল হোলো বায়ুবাহী নল, ওগুলি কখনো চুপসে যায় না। কিন্তু ফুসফুসের বায়ুকোষ পর্যায়ক্রমে একবার ক'রে চুপসে গিয়ে বায়ুশূন্য হবে আবার ফুলে উঠে বায়ুপূর্ণ হতে থাকবে। রোগের বেলাতেও দেখা যায় যে বিভিন্ন স্থানের বিকৃতি ঘটে বিভিন্ন রকমের। শ্বাসনালীর মধ্যে যখন প্রদাহের সৃষ্টি হয়, তখন সেগুলি প্রচুর শ্লেষ্মা উৎপন্ন করে, কিন্তু কখনো তাতে একেবারে বুজে যায় না। এই ধরণের রোগকে আমরা বলি ব্রংকাইটিস আর ফুসফুসের মধ্যে প্রদাহ ঘটলে বায়ুকোষগুলি সেই অংশটাতে একেবারেই বুজে যেতে পারে, তাকে আমরা বলি নিউমোনিয়া ইত্যাদি। দুই রকম রোগের লক্ষণেও যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। শ্বাসনালীর কাজ আলাদা ফুসফুসের কাজ আলাদা, সুতরাং একই জিনিস থেকে গড়ে উঠলেও তাদের প্রকৃতি আলাদা।

সত্যি ভ্রমণকাহিনী

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

[পূর্বানুবৃত্তি]

(১৪)

যতই এখানকার শীত দেখছে ততই মনে হচ্ছে যে, প্রকৃতি এখানে মানুষের উপর ভারতবর্ষের চেয়ে নির্দয়। থাকবার জায়গাটা ...ানে এখানকার মত প্রাণবাঁচানোর জন্য ...ার হয় না। চিরকাল সে শুনে এসেছে এখানকার আবহাওয়ায় বেশী কাজ ...তে পারা যায়। সে ঘরের মধ্যে হতেও ...র বাইরের কাজ নিশ্চয়ই নয়। বাড়ির ...না করা সিঁড়ি ও করিডোরে কত ...কে কাজ করতেই হবে, ঝাড়ুদারকে ...া পরিষ্কার রাখতেই হবে, গলা ...র উপর পাথরের কুঁচি বা করাতের ...ড়ো ছিটোতেই হবে, পুলিসকে পথের ...ড়ে দাঁড়াতেই হবে। খাওয়া হজম করবার ...যারা ব্যায়াম করে, তাদের পক্ষে শীত ...। কিন্তু তারাই বা এখন প্যারিসে ...বে কেন? তারা চলে গিয়েছে কোন্দজুর ...ভিয়েরা), স্পেন, মরক্কো, আলজিরিয়া, ...জিয়ার, কাসারাঙ্কা না হয় নেপল্স। ...মাস আগে থেকে বামপক্ষীয় কাগজ-...লো ব্যঙ্গচিত্রে, প্রবন্ধে, গল্পে, উপদেশে ...কালে গরীবের কষ্টের কথাটাকেই ...জি করেছে। এ সব দেশের আচার-...হার রীতি-নীতি সব জিনিসের উপর ...তের সমকক্ষ প্রভাব আর কোন জিনিসের ...। মেঝের কার্পেট, দেওয়ালের প্যানেলিং কাগজ, গলার টাই, বিছানা পাতবার ধরণ, ...চলা, দেখা হলে আবহাওয়া সম্বন্ধে ...থা বলা,—সব জিনিসের সঙ্গে সম্বন্ধ এখানকার শীতের। আমাদের দেশের অল্প ...তে গাড়োয়ান গান গায়; এখানে পথচারী ...রকয়েক খটখট করে লাফিয়ে নেয় পা ...টোকে গরম করবার জন্য। শীতের জন্যই ...সব দেশের নৃত্যে বোধ হয় আঙুলের ...ার কারিকুরির বিকাশ হয়নি। ফুঁ দিয়ে আঙুল গরম করবে, না নাচ দেখাবে? দস্তানা পরলে তো কথাই নেই! দু চক্ষে দেখতে পারে না সে দস্তানা জিনিসটাকে! দস্তানা পরা আঙুল দিয়ে বইয়ের পাতা উলটানো যায় না; আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের স্পর্শটা না পাওয়ায় মৌতাতটাই মাটি হয়ে যায়। ....শীতের ঠেলায় পিঁপড়েগুলো পর্যন্ত এদেশে ঢুকে বসে থাকে পাঁউরুটির মধ্যে——চিনিভরা কাগজের বাক্স পাশে পড়ে থাকলেও। চিনিটা বোধ হয় ঠান্ডা কনকনে, আর রুটিখানা বেশ তুলোর গদির মত।.........

ঠুকে ঠুকে রুটির পিঁপড়ে ঝাড়বার সময় এই সব সাত-পাঁচ কথা মনে হয়।

অ্যানির প্রতীক্ষা করছিল লেখক। সকালে যখন অ্যানি ঘর পরিষ্কার করতে এসেছিল, তখন সে গিয়েছিল দোকানে, তরিতরকারী কিনতে। সে জানে যে, অ্যানি এখনই আবার আসবেই। আজকাল অনেক-বার করে আসে সে। দুজনের নিবিড় অন্তরঙ্গতাটাতে আর আগেকার শিষ্টাচারের আড়ষ্টতা নেই। মনের অব্যক্ত সহযোগিতায় দুজনেরই পরস্পরের আচরণের খুঁটিনাটি-গুলো জানা হয়ে গিয়েছে। লেখক জানে যে, অ্যানি যদি শিস দিতে দিতে আসে, কিম্বা ময়লার বাক্সটা শব্দ করে বাইরে রাখে, তা হলে সে আসছে ডিউটির অজুহাতে। তখন সে আর ঘরে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেবে না—সেটা হোটেলমেডের পক্ষে অশোভন। এ সময় গল্প করবে সে জোরে জোরে। যদি আসে নিঃশব্দে, তাহলে আসছে বিনা কাজে; প্যাট্রোনকে না জানিয়ে, কিম্বা অন্য কোন কাজে ফাঁকি দিয়ে। এমন করে ঘরে ঢুকবার সময়, ঠোঁটের উপর তর্জনীটি থাকবে। নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেবার পর একমুখ হেসে আরম্ভ করবে নীচু গলায় গল্প; যাতে পাশের ঘরের ভাড়াটেও স্বর শুনে বুঝতে না পারেন এটা কার গলা। দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু এ সব দেশে দু ঘরের মধ্যের পার্টিশন দেওয়ালটা এত ফঙ্গবেনে যে, এক ঘরের খবরের কাগজের খসখসানির শব্দটুকুও অন্য ঘরে শোনা যায়! মেড কোথায় কি করছে না করছে, তা নিয়ে অবশ্য ভাড়াটেরা মাথা ঘামায় না। জানাজানি হয়ে গেলে হোটেলের মালিক মালিকানী ছাড়া, আর সকলের এ বিষয়ে সহানুভূতি রাখাটাই নিয়ম। একদিন অ্যানির খেয়াল হয় 'হিন্দু' মেয়েদের পোষাক কেমন জানবার। এদেশের প্রকাণ্ড লম্বা বিছানার চাদর একখানা লেখক অ্যানিকে শাড়ির মত করে পরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। পাশের ঘরের ভদ্রমহিলা পরের দিন অ্যানিকে 'হিন্দু মেয়েদের পোষাক দেখানোর জন্য একখানা সার্কাসের হ্যান্ডবিল দিয়েছিলেন —ঘাগরা ও কাঁচুলি পরা এক হিন্দু নর্তকীকে একটা হাতী শুঁড়ে করে তুলে ধরেছে।...... সেই থেকে লেখকরা আরও নীচু গলায় গল্প করে।

প্যাট্রোনের হঠাৎ উপরে আসবার আশঙ্কা থাকলে দরজা রাখতে হয় খুলে। পিয়ের বলে একটা ছোট্টো ছেলে আছে হোটেলে। তার বাপ-মা চলে যায় কাজে, আর সে সারাদিন করিডোরগুলোতে ঘুর-ঘুর করে বেড়ায়। প্যাট্রোন আসতে পারে জানলে অ্যানি পিয়েরকে ঘরে নিয়ে আসে——তখন গল্প হয় জোরে জোরে। এরকম কত কি যে আছে!

হাতে একটা বালিশ নিয়ে শিস দিতে দিতে অ্যানি ঘরে ঢুকলো।

"বুড়ি মুরগীর ডাক আর মেয়েমানুষের শিস বড় অলক্ষুণে জিনিস।"

"ও লালা! তাই নাকি? কার অমঙ্গল হয়? যে শিস দেয় না, যে শিস শোনে?"

"যে শিস শোনে, তার।"

"তবে তো মজাই!" অ্যানি হাতের বালিশটাকে একবার বাজিয়ে নেয়। লেখক হেসে বলে "বাঃ! বেশ! আমার অমঙ্গলে একেবারে আহ্লাদে আটখানা।"

অপ্রস্তুত হয়ে যায় অ্যানি। "ও লালা! তা আবার কখন বললাম? তোমার কথা তো আমি ভাবিনি—আমি ভাবছিলুম প্যাট্রোনের সামনে শিস দেবার কথা! সত্যি বলছি। বিশ্বাস করতে হয় কর, না করতে হয় না কর। এত ভেবেচিন্তে আমি কথা বলতে পারি না বাপু!"

"না না ও আমি এমনি ঠাট্টা করছিলুম।"

"ও লালা! কোন্‌টা যে ঠাট্টা, আর কোন্‌টা যে আসল পণ্ডিত লোকের, বোঝা দায়! এই নাও তোমার বালিশ। মাথায় দেওয়া, পাশ-বালিশটার উপর এটা এমনি করে দিয়ে দিলে ঘাড়ের কাছ দিয়ে আর ঠাণ্ডা ঢুকতে পারবে না লেপের ভিতর। কিসের পালক কে জানে—এত ভারি বালিশটা!"

অ্যানির বিছানা ঝাড়বার কাজে লেখক সাহায্য করতে গেলে সে বলে—"তুমি ইংলণ্ডে যখন ছিলে তখনও কি মেডকে বিছানা পাততে সাহায্য করতে?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা কি বুড়ি ছিল?"

"না, বুড়ি কেন হতে যাবে।"

"অ্যানির মত সুন্দর ছিল?" দুজনেই হেসে ওঠে। এইটা অ্যানির রসিকতা। কবে লেখক দেশের আনি বলে একটা মেয়ের কথা কি যেন গল্প করেছিল, সেই থেকে একে নিয়ে রসিকতা অ্যানির উঠতে বসতে। অ্যানির কাছেও এ রসিকতাটা পুরনো হয় না, লেখকেরও খারাপ লাগে না।

"কি ঠাণ্ডা বিছানাটা! এই ঠাণ্ডা ঘরে কি লোকে শুতে পারে? তুমি তো আর বলবে না মালিককে হিটারটা মেরামত করবার কথা। আমি দু-তিনবার বলেছি। একজন ভাড়াটের জন্য বার বার এক কথা বলা, লজ্জা করে বাপু। সব হোটেল-ওয়ালাগুলো কি একই রকম!"

প্যাত্রোনের স্বর নকল করে লেখক বলে, "সব হোটেলের মেডগুলো কি একই রকম!"

হাসতে হাসতে অ্যানি চেয়ারের উপর বসে পড়ে।

"এত নকলও করতে পার তুমি! না না আজ তোমাকে বলতেই হবে হিটারটা মেরামত করবার কথা। এই দেখ, কি ঠাণ্ডা তোমার আঙুলের ডগাগুলো! অসুখে পড়লে তোমার সঙ্গে রোজ রোজ দেখা করতে আমি হাসপাতালে যেতে পারব না, বলে রাখলাম। লাল মদ একটু একটু গরম করে খেলেই পার। গরমের দেশের লোকরা কি কখনও এত শীত সহ্য করতে পারে। সব বুঝি আমি! রুশ যাবার জন্য আগে থেকেই ঠাণ্ডা সহ্য করা অভ্যাস করা হচ্ছে? সবই বাহাদুরি! বলছি শীতের শেষে জার্মানী, অস্ট্রিয়া যেও—দেখে এস কি সুন্দর দেশ! তা নয়। রুশ যাবার ধুম লেগেছে! আজ বাজার থেকে কোন্ কোন্ তরকারি এনেছ দেখি।—আন্দিভ? আন্দিভ শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। —মাশরুম? এ মাশরুমগুলো ভাল। এত বড় বড় করে কাটে নাকি? উপরের ছালটা ভাল করে ছাড়ানো হয়নি। এ কাটতে হয় সরু কুচি কুচি করে। ভাজতে হয় মাখনে, শুধু রশুন দিয়ে। জল একটুও দিতে নেই। জলপাইয়ের তেলটা আমার পছন্দ না, এক মরক্কোর তেল ছাড়া। মরক্কোর জলপাইয়ের তেল খেয়েছ? এ পাড়ার দোকানে পাওয়া যায় না। ভিনিগারের সঙ্গে মিশিয়ে আর্টিচোক দিয়ে খেয়ে দেখো।...........

এই রান্না দেখিয়ে দেবার ছুতো করেই অ্যানি আজকাল বারে বারে আসে। এক একদিন আধ-খাওয়া সিগারেটটা নিভিয়ে কৌটোতে রেখে নিজেই রাঁধতে বসে। এই ছোট্‌টো স্পিরিট স্টোভে যে এত রাঁধা যায়, তা আগে লেখকের জানা ছিল না। নিজে তৈরি করা খাবার-টাবারও মধ্যে মধ্যে নিয়ে আসে বাড়ি থেকে কাজের এপ্রনের মধ্যে লুকিয়ে—যাতে সেটা হোটেলওয়ালির নজরে না পড়ে।

অ্যানির মধ্যে একটা বাৎসল্যের ভাব আছে। এটা না থাকলে মেয়েকে মেয়ে বলেই মনে হয় না লেখকের। এরা ব্যথা না দিয়ে বকতে জানে, নিজে রেঁধে খাইয়ে আনন্দ পায়, ঘরে গোড়ালি-ছেঁড়া মোজা দেখলেই বাড়ি থেকে সেলাই করে নিয়ে আসে, শার্টের বোতাম ছেঁড়া দেখলে তখনি সুচ-সুতো নিয়ে বসে, গলায় বাঁধা টাইটা আরও সোজা করে বসিয়ে দেয়, বেরুবার সময় ওয়াটার-প্রুফ না নিলে বকে, গেঞ্জি ও আণ্ডার-উইয়ার তাকে দিয়ে না কাচালে কেঁদে ভাসায়। খাওয়ানোর সময় তাদের চাউনিতে অজ্ঞাতে আসে একটা নিবিড় কোমলতা। মরা মায়ের কথা শুনতে শুনতে তাদের চোখের ছলছলানিতে বাঁধা পড়ে সাগরের গভীরতা। সর্দিতে গাটা গরম গরম হয়েছে মনে হলে বন্ধুর হাতের উলটো পিঠটা গালে ঠেকিয়ে 'ও লালা!' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। এই সব অজস্র খুঁটিনাটিগুলোর স্রোত সব সময় আসে ঝিরঝির করে—— আপনা থেকে আসার আনন্দে। ছাত্রের মুখস্ত করা পড়া বলা মূর্খ মাস্টারেও ধরতে পারে। এ হল অন্য জিনিস। মনের আলোর ঝিকি-মিকি ধরা দেয় কারণে অকারণে আসা অশ্রুর মৌক্তিকে। সব তুচ্ছ জিনিসকে তাচ্ছিল্য করতে কি মন পারে?

অপরের ছায়া পড়লে মরা আয়নাটা পর্যন্ত জীয়ন্ত হয়ে ওঠে, তার আবার মানুষ! আসলে লোকটাই যায় বদলে। মেয়ে-মানুষে মার্চের তালে শিস দিলেও অশোভন ঠেকে না চোখে; সিগারেটের গোড়াটুকু নিভিয়ে তুলে রাখলেও সেটা বিসদৃশ বোধ হয় না। ঠোঁটের রঙ-লাগা সিগারেটে টান দিতে ঘেন্না করে না। "রামং রামং প্রতিরামং" বলবার মুদ্রাদোষ কবে থেকে যেন কেটে গিয়ে তার জায়গা আস্তে আস্তে দখল করতে আরম্ভ করে 'ও লালা' কথাটা। সমালোচনা করবার স্পৃহা কমে যায়। অপরের খারাপের চেয়ে ভালটা নজরে পড়ে বেশি। সামঞ্জস্যজ্ঞান ও হাস্যাস্পদ জিনিসটা ধরবার শক্তি একটু ভোঁতা হয়ে আসে। দুপুরে রেঁধে খাওয়াটাতে হঠাৎ মনে হতে আরম্ভ হয় যে, খুব পয়সার সাশ্রয় হচ্ছে। এক মেধাবিনী বিদেশিনী 'লুচি' ও 'লিচু' খাবার জিনিস দুটির অর্থে প্রত্যহ একবার করে গোলমাল করে ফেললেও সেটা বুঝিয়ে দিতে উৎসাহ পাওয়া যায়। লেখকের এত-কাল সখ ছিল রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থ-নীতি—এই সব বিষয়ের বই পড়া। আজকাল সে জানতে চায়, একক মানুষকে; বই কেনে মনোবিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত প্রভৃতি বিষয়ের। পড়া অবশ্য হালকা 'সংকলন' মাসিকপত্র-গুলো ছাড়া আর অন্য কিছু হয়ে ওঠে না। মনের মধ্যে বাইরের জিনিস রাখবার জায়গা কমে গিয়েছে। একটা প্রশান্ত আত্মবিশ্বাসের আলোতে মনের বাঁকাচোরা গলিঘুঁজি-গুলোর অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে। অতি সাধারণ শিষ্টাচারগুলোকেও আন্তরিক বলে বোধ হয়। ঘরের 'হিটার'টা মেরামত না করিয়ে দিলেও মনে হয় হোটেলওয়ালা হয়ত নানা কাজে ব্যস্ত আছে বলে সময় পাচ্ছে না। প্যারিসের প্রথম বন্ধু আদবানীর প্রতি অন্তরে কৃতজ্ঞতা জাগে—তারই জন্য এ হোটেলে আসতে হয়েছিল বলে। নইলে সে অ্যানিকে পেত কি করে? সার্থক হয়েছে তার এদেশে আসা। মনের পূর্ণ পরিতৃপ্তির মাদকতা কখনও যে ব্যাহত হয় না তা নয়, কিন্তু সে জিনিস এত সাময়িক, এত তুচ্ছ, এত অহেতুক যে, নিজে ছাড়া অন্য লোককে বোঝানো যায় না। এইত সেদিন ইলেকট্রি-সিটি 'ফেল' করলে প্রথমেই রাগ হয়েছিল অ্যানির উপর—সে একটা দেশলাই আর মোমবাতি কেন আগে থেকে এনে রেখে দেয়নি। আর একদিন রাগ হয়েছিল ছোটটো

[illegible]রের উপর;——যাকগে, সে সব অনেক !
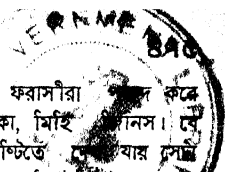
[illegible]মাটের উপর সে যেন একটা বিশ্বাসের [illegible]সের, ধরবার মত জিনিসের সন্ধান [illegible]ছ। এরই জন্য কি গত কয়েক বছর ধরে মন হাতড়ে মরছিল? কে জানে। [illegible]realisme এর জনক Guillaume [illegible]polinaire, নিজের প্রেমের কবিতা [illegible]বার সময় সুররিয়ালিজম্ ভুলে ছন্দ [illegible] মিলের মাধ্যমের আশ্রয় নিয়েছিলেন। [illegible]নিয়ে আগে আগে লেখক কত হাসি-[illegible] করেছে। এখন বোঝে যে এ জিনিস [illegible] থেকে আসতে বাধ্য।—মিলের [illegible] সমাজের ভিত্তি; পরিবেশ কখনও [illegible] নয় মানুষের....

[illegible]ক্ষণে অ্যানির মাশরুম ভাজা শেষ [illegible] স্টোভে রাঁধবার সময় হাঁটুগেড়ে [illegible] সাধে কি আর হাঁটুর মোজা ছেঁড়ে !

"ভোয়ালা! এই নাও" ব'লে অ্যানি [illegible] উঠে দাঁড়ায়। ওর পায়ে ঝিনঝিনি [illegible] গিয়েছে। এই রসুন ভাজা গন্ধটা [illegible] বেশ লাগে—কিন্তু তাই বলে এরকম [illegible] মেশানো গন্ধ নয়......

[illegible] তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে দেয়। "ও লালা! তোমার ঘর যে আরও ঠাণ্ডা [illegible] যাবে জানলা খুললে।"

[illegible] মৃদু করাঘাত পড়ে। দুজনেই [illegible] হয়ে ওঠে। হোটেলওয়ালি নয়ত? [illegible]ভীরভাবে কোটের বোতাম চিবোতে [illegible] ঢোকে পিয়ের। রান্নার গন্ধ পেয়ে [illegible] এসেছেন।

[illegible] দিক থেকে তাকে অ্যানি কোলে [illegible] অন্য দিকে নিয়ে যায়। দেরাজ খুলে [illegible] হাতে শুখনো ডুমুর দেয়। পিয়ের [illegible] করে খেজুর আছে কিনা—খেজুর [illegible] ডুমুর খেতে খুব ভাল; খেজুরটা [illegible] নেবেনা; ময়লা।

[illegible] হাসতে হাসতে খেজুরটা তার [illegible] পুরে দেয়। না না পিয়ের আজ আর [illegible] দেখা নয়। বিরক্ত করলে মুসিয়ো [illegible] বকবে। পণ্ডিত লোকের পড়া-[illegible] বেশী ক্ষতি করা ঠিক নয়। আবার [illegible] আসবো পিয়ের, আমরা।

"[illegible] দিমশ্!" (ভাল রবিবার কাটুক!) [illegible] বলেই শনিবারের দিন লেখক [illegible] চটায়। যাদের রবিবারে ছুটি [illegible] এই বলে বিদায় দিতে হয়। অ্যানির [illegible] ছুটি নেই।

"দুষ্টুমি হচ্ছে?" ব'লে রাগ দেখিয়ে অ্যানি চলে যায়।

লেখক জানালাটা বন্ধ করে দিল। ঘরখানা রান্না করবার পর গরম হয়ে ওঠে। মোটা গরম কোটটা সে খুলে রাখে। এ কোটটা পরা থাকলে তাকে রোগা রোগা দেখায় কম। তাই যতক্ষণ অ্যানির আসবার সম্ভাবনা থাকে ততক্ষণ সে এই কোটটা পরে থাকে। তার ধারণা, ডান দিক থেকে তার মুখের Profile ভাল দেখায়, নাকটাও টিকলো দেখায় বাঁ দিকের চেয়ে। সে পড়েছে ফরাসীরা Profile-এর রূপটার সম্বন্ধে খুব সজাগ—ভোঁতা ভোঁতা রূপ এরা অন্তর থেকে অপছন্দ করে। তাই মুখের বাঁ পাশটা অ্যানির চোখের সম্মুখে না রাখবার তার চেষ্টা আছে। তার হাতের তেলো খুব নরম, এইটা সে অ্যানিকে দেখাতে চায়, তার হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে। এই খানটাতেই অ্যানির দুর্বলতা। তার শক্ত লাল কড়াপড়া হাতটা অন্যকে দিতে অ্যানির একটা সংকোচ আছে। স্বাভাবিক সারল্যে সে নিজেই একদিন বলেছে, যে এই জন্যই সে বাইরে বেরোবার সময় হাতে দস্তানা পরে।

......আরও আছে এরকম বহু খুঁটিনাটি জিনিস। সব কথা কি বলা যায়? প্রেমের খেলার নিয়মের মধ্যে এগুলো। ভালবাসায় সব ভুলিয়ে দেয়, কেবল অ্যানি আর এইগুলোকে ছাড়া। না না এগুলো মনে করাও তো অ্যানিকেই মনে করা। তাকে না হারানর জন্যইত এত সব! দুজনে মিলে তৈরী করা এই ঘরের জগৎটা যদি ভেঙ্গে পড়ে—ভাবতেও ভয় হয়!

ডায়েরী

ভাষা, শিল্পকলা, মার্জিত সৌজন্য, ভালরান্না, বেশভূষা ও প্রসাধনের সৌকুমার্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বিশ্বমানবতা এই রকম অনেকগুলো জিনিসের ঝাপসা ধারণা একসঙ্গে মনের মধ্যে মেশানো থাকে, যখন ফরাসীরা নিজেদের সভ্যতার কথা বলে।

এদের সংস্কৃতির আবেদন বেশ সূক্ষ্ম। তাই বিশেষজ্ঞ কিম্বা খুব সংবেদনশীল মন ছাড়া এর বৈশিষ্ট্যের মাধুর্য অপরে ধরতে পারে না। আমাদের নিজস্ব গান, ছবি বা নৃত্যের সম্বন্ধেও একথা খাটে। তবে এই সংবেদনশীলতার ব্যাপ্তি আমাদের দেশের চেয়ে এদেশে অধিকতর লোকের মধ্যে।

ইন্দ্রিয়ের জগতে ফরাসীরা [illegible] করে সূক্ষ্ম ফিকে, হালকা, মিহি [illegible]নিস। যে জিনিসটা স্থূল দৃষ্টিতে [illegible] যায় সেটা সম্বন্ধে এরা নিস্পৃহ; কিন্তু যেটুকু কেবল সূক্ষ্ম বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা [illegible] সেটা সম্বন্ধে সজাগ। বাইরের কম জানা লোকে তাই প্রথমটায় ভাবে যে এরা আসল জিনিস ছেড়ে কেবল বাইরের পালিশে মনোযোগ দেয়। কারণ বিদেশীরা জানে যে আনাড়ী রাজমিস্ত্রিই গাঁথুনির বাঁকাচোরাগুলো প্লাস্টার দিয়ে সামলে নেয়; অপরিণত অভিনেতারাই ভাবে যে একেবারে স্টেজে গিয়ে মেরে দেব। এসব অগভীর জিনিসের স্থান নেই ফরাসী রুচিতে। সংযত প্রকাশই রুচিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় কথা। তাই ফরাসী শিল্পী ও সাহিত্যিক-দের সস্তা হাততালিতে অনাশক্তি; তাই মাদাম বোভারি বইখান সাতবার লেখা হয়েছিল; তাই চিত্রকর পুসাঁ বলেছিলেন "ছবিতে আমি কোন জিনিসকে অবহেলা করিনি"—অথচ তাঁর ছবিতে চটক বলে জিনিসটার চিহ্নমাত্র ছিল না।

প্রাসাদ নির্মাণে ফরাসী স্থপতির বিশালত্বের দিকে লোভ নেই। এদের প্রিয় কার্নেশান কিম্বা লাইলাক ফুলের মৃদু সুবাস, প্রাচ্যের কাঁঠালিচাঁপায় অভ্যস্ত নাকে গন্ধ বলেই বোঝা যায় না। ফরাসীরা রাইস পুডিংএ যতটুকু মিষ্টি খায়, আমাদের দেশের ডায়াবেটিস রুগীও সে রকম পানসে পায়েস মুখে দিতে পারবে না। আমেরিকার স্কাইস্ক্র্যাপার আকাশ ছুঁতে পারে, কিন্তু কেবল মনের স্থূল তন্ত্রীগুলোতে সাড়া জাগায় বলে, ফরাসী মনের নাগাল পায় না।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সূক্ষ্ম দিকটার সূচি-মুখ ফ্রান্স। তাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ যে কয়দিন আর বাঁচবে, সে কয়দিন প্যারিসেই থাকবে পৃথিবীর ফ্যাশনের কেন্দ্র। কেবল বেশভূষার ফ্যাশন নয়—লেখার ফ্যাশন, ছবি আঁকবার ফ্যাশন, ভালবাসার ফ্যাশন, শোয়া বসার ফ্যাশন, ভাবনার ফ্যাশন, জীবনটাকে গড়ে তুলবার ফ্যাশন। গভীর সামঞ্জস্য জ্ঞানের সঙ্গে খেয়ালের অভিনবত্ব না মিলোলে ফ্যাশন হয় না। সিজার 'গল'দের নূতনত্ব প্রিয়তার কথা লিখে গিয়েছেন। চরিত্রের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যটুকুর জন্যই, ব্যক্তিত্বের নূতনভাবে প্রকাশের পথে, জনমত এখানে ডিক্টেটারের মত দাঁড়িয়ে থাকে না। লোকের রুচি ও সমাজের চাহিদার মধ্যে

ব্যবধান এখানে নাই বললেই হয়। এক আসিরিয়ান ভাস্কর্যের কর্কস্ক্রুর মত দাড়ি ছাড়া, আর সকল সম্ভব ও অসম্ভব ধরণের দাড়ি নজরে পড়েছে, ফরাসীদের মধ্যে। খেয়ালের অভিনব সৃষ্টিগুলোকে উপর থেকে হাস্যাস্পদ মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলো এক রকম trial and error-এর রাস্তা মানুষের, এই সবের মধ্যে দিয়েই আসল জিনিস নীচে থিতোয়। পুকুরে ছাড়বার মাছের পোনার হাঁড়ি অনবরত নাড়াতে হয়—নইলে সেগুলো বাঁচে না। এও সেই রকম। অজস্র খেয়ালের যোগ-বিয়োগের ফল প্রকাশ ধারার পরিবর্তনটা। তাই সুরুচির ক্ষেত্রে মানুষের নেতৃত্ব ফরাসীদের হাতে।

ছেঁড়া জামা পরতে এখানকার ছাত্ররা লজ্জিত হয় না, কিন্তু রঙের দিক থেকে সামঞ্জস্য রহিত পোষাক পরতে তারা দ্বিধা বোধ করে। ফরাসীদের মত রং মিলানোর জ্ঞান আর কোন জাতির নেই। এদের রঙের নেশা চিরকালের। আজকাল প্যারিসের বোটানিকাল গার্ডেন (jardin des plantes)এর গোড়াপত্তন হয় প্রায় চারশ বছর আগে,—যাতে কারুশিল্পীরা বিদেশী ফুল থেকে বর্ণবৈচিত্রের নমুনা পেতে পারেন। সেই সময়ের লেখা বেশভূষার বর্ণনার মধ্যে নিম্নলিখিত রঙগুলো পাওয়া যায়ঃ—ঝরাপাতার রং, তিলের তেলের রং, জলের রং, আধমরা ফুল, ইঁদুরের রং, পাউরুটির রং, মুক্তোর রং, শুয়োরের মাংসের রং। এ ছাড়া চেনা যায় না এমন অনেক পোষাকের রঙের কথাও লেখা আছে,—যেমন বিষাদগ্রস্ত বন্ধু, পাপের রং, ভালবাসার রঙ, রুগ্ন স্পেনীয়, জুডাসের রং—আরও অসংখ্য নাম।

এত নাম দেখেই বোঝা যায় যে, এ জাত আমাদের মত রঙকানা নয়। আমাদের দেশের সত্যিকারের সাধারণ লোক লাল, কালো ও সাদা ছাড়া আর চতুর্থ রং চেনে না।

সাময়িক হুজুগ অনুযায়ী ছকে ফেলা রং মিশানো অবশ্য ইউরোপের সব শহরেই আছে। এগুলো ফ্যাশনের দোকানের আলমারী দেখে শেখা যায়; কিনতে গেলে দোকানদারই বলে দেয়। অন্য দেশে ঘরের আসবাবপত্র, দেওয়ালের কাগজ, পর্দা, কার্পেট ইত্যাদি খদ্দেররা দোকানদারের রুচির উপরই সাধারণতঃ ছেড়ে দেয়। কিন্তু ফ্রান্সের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সব মিলিয়ে মোটের উপর জিনিসটা কেমন ওতরালো, সেইটার উপরই এদের বেশী নজর। এই খানটাতেই তারা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের পরশ দেয়। এরই নাম পৃথিবীখ্যাত 'প্যারিসের পরশ' (Parisian touch)। এ নকল করা যায় না, কারণ দুইবার এ জিনিস এক রকম হয় না। বাঁধনের গ্রন্থিতে কাপড়ের ভাঁজে, মিহি পর্দার ফাঁপানিতে, আলপিনের কারসাজিতে, রঙ ও আলোর খেলায়, সুবাসের অচেনা স্নিগ্ধতায়, আট-পৌরে থোড়বড়িখাড়াই নূতন স্বাদ পায়। সুরুচিতে যে সব জাতির সহজাত প্রতিভা নেই, তারা নিখুঁত দেখাবার জন্য ছেলের পেরাম্বুলেটারটা পর্যন্ত রঙ মিলিয়ে কেনে; যন্ত্র খাড়া করবার মত টুকুরো টুকুরো অংশ মিলিয়ে সৌন্দর্য খাড়া করতে চায়। কিন্তু সব কয়টা মাপা জোখা নিখুঁত জিনিসের যোগফল লাবণ্যহীনা রূপসীর মত অসুন্দর হতে পারে। ফরাসীরা জানে যে চোখ না ধাঁধিয়ে সুষমা ফুটিয়ে তুলতে হলে জিনিসটাকে টুকরো টুকরো করে নিলে চলে না। দরকার দূরবীক্ষণের,—অনুবীক্ষণের নয়। চোখের কাছে কাণাকড়ি আনলে
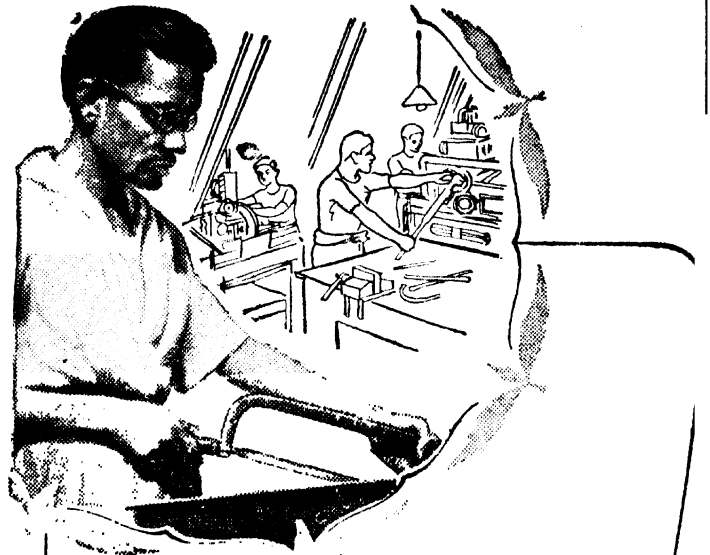
লয়ের বিরাট সুষমা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে।

তই এ জাতকে দেখছি, ততই মনে হচ্ছে এদের সঙ্গে বাঙালীদের নাড়ির যোগ ছ। সমগোত্রীয় না হলে মাছখোর লী কি কখনও বৈষ্ণব প্রেমের শ্রেষ্ঠ-তকাব্য গীতগোবিন্দ লিখতে পারে? সী দেশের trouvere (চারণ)এর এক-ত্রয়োদশ শতাব্দীর ছবি দেখেছিলাম,—যাকের তফাৎ না থাকলে নবদ্বীপের র সংকীর্তনরত লোকের অঙ্গভঙ্গী মনে হয়। অনেক জাতি আছে যাদের র দাবী হৃদয়ের দাবীর চেয়ে বড়। লী ও ফরাসী তাদের মধ্যে পড়ে না। দের মাথা বৈদান্তিক, অন্তর বৈষ্ণব। পাতের ধার বুদ্ধি থাকতেও এরা রিতাল মনের প্রভুত্ব মানে। দুই জাতিই ধর্মী। বাঁধন ছেঁড়া মন উড়িয়ে দেয় কোথায়—শাশ্বতের সন্ধানে কিম্বা বাদর্শের খোঁজে! বুদ্ধি তার পেছু ড়তে গিয়ে হাঁফিয়ে মরে। দুজনদেরই নর দৃষ্টিভঙ্গী সার্বিক; তাই তারা কবি। জাতগুলো খণ্ডিতরূপটাই বোঝে, তারা সময় বড়কে ছোট করে নিতে চায়; রা হিসাবনবিশ হতে পারে, কবি হতে রে না; মুহূর্তের জন্য আকাশ ছোঁবার বাদে ছাই হয়ে নীচে পড়বার আশঙ্কাকে পেক্ষা করতে পারবে না। ভাবাবেগ-ধান হলেও দুই জাতিই নাটকীয়তা পছন্দ করে। 'বারোক' ছবির মোহ নটাতে ফরাসীদের সময় লাগেনি; থাকথিত 'বিলিতি ছবির' স্থলে আবেদনের রুদ্ধে অভিযান, আমাদের দেশে প্রথম বাঙালীই করেছিল। দুই জাতির মনই ধারণের মধ্যে অসাধারণ খুঁজে মরে, অথচ দাবী অসাধারণত্বের তাঁকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। 'যুক্তি'র (Reason) কেন্দ্র প্যারিস মানবতার আহ্বানে ফরাসী বিপ্লব করে; ন্যায়ের কেন্দ্র নবদ্বীপ মানবতার ডাকে সারা দিয়ে প্রেমের বন্যা বওয়ায়। দুই জাতিই রাষ্ট্রও সমাজনায়কদের উপর আস্থাহীন। নিরীহ হলেও মুহূর্তের মধ্যেই ক্ষেপে ওঠে শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদে। এদের উদার মন বাইরের যে ভাল জিনিস দেখে নেয়; কিন্তু নিজের মত করে নেয়। মানবধর্মী বলেই বাঙালী ও ফরাসী দৃষ্টিভঙ্গী এত উদার ও মধুর। বিদেশী যে কেউ এসে, কেবল স্বীকার করে নাও এদের প্রাণধর্ম। সেই মুহূর্ত থেকে তুমি এদেরই একজন হয়ে গেলে। কেবল কবিতার ক্ষেত্রই ধর না ফরাসী ভাষার; Guillaume Apolinaire-এর মা পোল্যাণ্ডের লোক পিতা অজ্ঞাত; Milosz লিথুয়ানিয়ার লোক; Jules Superville-এর জন্ম উরুগোয়েতে; Tristan Tzara রুমানিয়ার লোক; Lautremont ও Laforgue বোধ হয় দক্ষিণ আমেরিকার। এ জাত উদার মানবধর্মী না হয়ে পারে না।

বাঙালীর যেমন মনের দিকটা বাঙলার নিজস্ব, শিক্ষা ও জ্ঞানের দিকটা উত্তর ভারতের; ফরাসীদেরও তেমনি মনের দিকটা Gaul-এর, শিক্ষা ও মননের দিকটা রোমের। তাই দুই জাতের লোকেই মননের গাম্ভীর্যটাকে ঢাকতে পারে, কিন্তু তীব্র হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাটাকে চেষ্টা করলেও লুকোতে পারে না।

দুজনদেরই খেয়ালী মনের দিকটা, নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখতে সব সময় সচেষ্ট, কিন্তু মননের দিকটা দশজনের গোষ্ঠীর একটা শাসন মানতে চায়। সেইজন্য কেবল গলাবাজি ও লম্ফঝম্ফ দিয়ে এদের সংশয়ী বিবেককে ভেজানো যায় না। চিন্তার ক্ষেত্রে এরা চায় সুশৃংখলা, যুক্তিভরা প্যামফ্লেট, তার খণ্ডন করা এস্তাহার, মাসিক পত্রে সুলিখিত প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে প্রচার; আর এইগুলোকে ঘিরে দানা বাঁধে এক একটি গোষ্ঠী।

ফ্রান্সের সর্বগ্রাসী প্যারিসের মত বাঙলার কলকাতা। তবু দুই দেশেরই আসল নাড়ির টানটা মাটির সঙ্গে—শহরের সঙ্গে নয়। ফরাসী জাতীয়-সঙ্গীতে তাই হলরেখার আবেদন; বাঙলাতে তাই মহানগরীর উপর একখানিও সার্থক উপন্যাস রচিত হয়নি। ফরাসীরা ছোট মেয়েকে আদর করে—"আমাকে একটু মিনি খেতে দাও না খুকী!" ঠিক আমাদের মত! আশ্চর্য!

আমাদেরই মত মন বলে, ফরাসীরা আমাদের বুঝতে পারে, কিন্তু এতকালের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ইংরাজ পারে না।

কবির দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ কাজের সহিত সম্পর্কহীন জিনিসও অনাবশ্যক নয়; তাই জনবহুল শহরের বুকে বহু খরচ করে বাজে গাছ পুঁতে জঙ্গল আর বুলভার তৈরী করে ফরাসীরা। অতিবুদ্ধি জাতগুলো সেই পয়সাটা খরচ করে সিমেন্ট কংক্রিটের উপর। ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য প্রাসাদগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, বাড়ির চেয়ে বাড়ির পরিবেশ সৃষ্টিতে খরচ হয়েছে অনেক বেশী। 'ত্রোকাদারো'র Chaillot প্রাসাদ থেকে দুই মাইল দূরের মিলিটারী স্কুল পর্যন্ত প্যারিসের মত শহরের বুকে দৃষ্টি ব্যাহত হয় না। লুভ্র মিউজিয়ম থেকে 'এতোয়াল' এর গেট পর্যন্ত তিন মাইল হবে বোধ হয়। 'কাজের' জাতের লোকরা ভাবে যে এতখানি জায়গার বাজে খরচ করা হয়েছে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী যাদের তারা জানে যে এটা তাদের মাত্রাবোধ। চাঁপার কলির মত আঙুলের মূল্য শুধু এক সুন্দরীর প্রত্যঙ্গ হিসাবেই।

শিল্পীর মন ফরাসী জাতটার। তাই একটি নগ্ন মূর্তির সৌন্দর্যের সঙ্গে, অশ্লীলতার যে কোন সম্বন্ধ নেই, সে কথা এদেশের ছেলে বুড়ো সবাই জানে। মানুষের মিউজিয়মের সম্মুখের বিরাট নগ্ন পুরুষ মূর্তিটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেটার সম্বন্ধে আলোচনা প্রত্যহ মায়ে ছেলেতে করে; কিন্তু ইংরাজ বা আমেরিকান দম্পতি এই জায়গাটায় এসেই তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করেন! লক্ষ্য করেছি যে, শালীনতার বিঘ্ন এই প্রতিমূর্তিটা তাদের অপ্রস্তুত করে দেয়। এই রাণী ভিক্টোরিয়ার শুচিবাই ফরাসীরা বুঝতে পারে না। "আবিষ্কারের মিউজিয়মে" (Palais de Decouverte) প্রকাণ্ড যন্ত্রে মেণ্ডেলের সূত্রগুলোর প্রয়োগের প্রদর্শন, বাপ মা ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে দেখে। তার মধ্যে একটি বুদ্ধিমতি মেয়ে প্রদর্শক প্রোফেসারকে জিজ্ঞাসা করছিল—ছেলে হবে না মেয়ে হবে, এ কি করে ঠিক হয় দেখিয়ে দিন। বাপ মা গর্বিত দৃষ্টিতে প্রোফেসারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

সিনেমার মারফৎ ছেলেপিলেদের শিক্ষার ফিল্মে পশুপক্ষীর যৌন সম্বন্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র দিতে এদেশের শিক্ষকরা ভয় পান না। ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ, তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে, পুরুষের প্রতি পুরুষের প্রেমের মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেন না। এমনই ফরাসীদের সত্য নিষ্ঠা! (ক্রমশ)

বেতারের সংগীত শিক্ষার আসর

কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের সংগীত শিক্ষার আসর বসে প্রতি রবিবার সকালে ৯টা থেকে ৯-৩০ মিনিট পর্যন্ত। সংগীত-শিক্ষা ও আসর পরিচালনা করেন খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুত পংকজ মল্লিক। সুনামের সংগে বহু বৎসর যাবৎ তিনি একাজ করে আসছেন। দেশের ছেলেমেয়েদের এ আসরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে। তার প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা আছে, তিনি গাইয়ে হিসেবেও বিখ্যাত সুতরাং তাঁর উপর এরূপ দায়িত্বভার দেওয়া খুবই ন্যায়সংগত কাজ হয়েছে বলেই মনে করি।

রবিবারের সংগীত-শিক্ষার আসরটি পংকজবাবু কিভাবে সাজান তার একটু বর্ণনা দিচ্ছি। আরম্ভেই আমরা শুনতে পাই "নাদ" বিষয়ে প্রাচীন একটি সংস্কৃত মন্ত্র তিনি সুরে গাইছেন। তারপরে ১০ মিনিটকাল তিনি শিক্ষার্থীদের চিঠিতে পাঠানো নানা প্রশ্নের জবাব দেন। জবাব শেষে শিক্ষার্থীদের শেখা পুরাতন কোন গান পাঁচ মিনিটকাল গেয়ে শোনান। শেষের বাকি ১৫ মিনিট তিনি ব্যয় করেন গান শেখানোয়।

এই আসরের কার্যক্রম নিয়মিত শুনে এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে যে, এই আসরে যেভাবে তিনি গান শেখান তা ঠিক কিনা। কেবলমাত্র গান শেখানোর জন্যে তিনি যেটুকু সময় দিচ্ছেন তা পর্যাপ্ত কিনা। নতুন গান আরম্ভ করে, তার কথা ঠিকমত লেখাতেই অনেকটা সময় তাঁর প্রথমদিকে ব্যয় হয়। পরে আর তত সময় লাগে না। এইভাবে একটি গান পাকাপোক্তভাবে শেখাতে তাঁর খুব কম করে হলেও ৪ থেকে ৬টি রবিবার পেরিয়ে যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি ধাপে ধাপে গান শেখানোই পছন্দ করেন। অর্থাৎ চারতুকের গান হলে প্রথম সপ্তাহে অস্থায়ী, দ্বিতীয় সপ্তাহে অন্তরা, তৃতীয় সপ্তাহে সঞ্চারী ও চতুর্থ সপ্তাহে আভোগ। তিনি যখন যে অংশটি শেখাচ্ছেন, ঠিক সেই অংশটি ছাড়া সেদিনে পরের অংশ একেবারেই গান না। তাঁর গান শেখানোর এ পদ্ধতি আমাদের কাছে ঠিক বলে মনে হয় না।

কথা, রাগিনী ও ছন্দের একত্র মিলনে যে রূপ ফোটে তাই হল গান। বিশেষত

বাংলা গানের এই হল মূলকথা। আর শিক্ষার আদর্শে শ্রেষ্ঠ পথ হল গানের সমগ্র রূপটি শ্রোতার মনে প্রথম থেকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করা। গানের পরিপূর্ণরূপে রসের একটি অনুভূতি মনে জাগে। সেইটিকে আগে শ্রোতার মনে জাগিয়ে তুলতে পারলেই গান শেখানোর কাজ অর্ধেক এগিয়ে যায় তার পরে বাকিটা শেখে বারে বারে গাওয়ার দ্বারা মুখস্ত করায়। কথাটা পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে অন্য উদাহরণে আসা যাক।

শিল্পী একটি জন্তু আঁকতে চায়। তার ইচ্ছা সমগ্র জন্তুটিকেই সে আঁকবে, কিন্তু সে ঠিক করল ধাপে ধাপে এগুবে, সবটা একসংগে আঁকতে চেষ্টা করবে না। প্রথমে আঁকলো সে জন্তুটির মুখ। তার পরে শুরু করলো জন্তুর পা। সেটি শেষ করে আঁকলো দেহ। এইভাবে ল্যাজ ইত্যাদি নানা অংগ। আলাদা খুব ভালকরেই আঁকতে শিখলো। বিচ্ছিন্নভাবে সব অংগ তার মুখস্ত। মনে করল এইভাবে জন্তুটিকে যথাযথ সে জেনেছে, আর সেটিকে দেখে আঁকার প্রয়োজন হবে না। তারপরে তার সেই বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে সে যখন একসংগে করলো, তখন দেখা গেল একটি নির্ভুল অংগপ্রত্যংগের সমষ্টি সেই জন্তুটি, কিন্তু তাতে জন্তুর স্বভাবের কোন পরিচয় ফুটলো না। পূর্ণজন্তুটিকে একসাথে দেখতে চেষ্টা করেনি বলে তার চরিত্রের কোন প্রকাশ সেখানে নেই।

পংকজবাবু যে পদ্ধতিতে গান শেখাচ্ছেন সেটি ঐ রকমেরই একটি পথ। টুকরো টুকরো করে শেখাতে গিয়ে গানটি এমনভাবে মনে বসে যাচ্ছে যে পরে যখন একসংগে সব গানটি তিনি শোনান তখন সম্পূর্ণ গানের রসটি মনে তেমনভাবে আর যায়গা পায় না। শিক্ষার্থীর মনে সমগ্র গানটি প্রেরণার বস্তুতে পরিণত হয় কিনা সন্দেহ। তাই বলছিলাম পংকজবাবুর উচিৎ প্রতিদিনই সমস্ত গানটি শ্রোতাদের সামনে অনেকবার গাওয়া। তার মাঝে মাঝে এক একটি অংশের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া, তাও কিন্তু খুব বেশিক্ষণের জন্যে নয়। আসলে সমগ্র গানের রূপটি হবে মুখ্য আর অংশগুলি শেখাবার সময় হবে গৌণ। তাঁর উচিৎ সমস্ত গানটি লিখিয়ে দেবার আগেই একবার ভালকরে শুনিয়ে দেওয়া এবং যতক্ষণ গানটি শোনাবেন ততক্ষণ গান শেখাতে বসেছেন এরকম কোন মনোভাব যাতে প্রকাশ না পায় তার প্রতি দৃষ্টি রাখা। গানের একটি মধুর আবেষ্টন রচনার দ্বারা শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট করে গান শেখানোই হল শ্রেষ্ঠ পথ।

পংকজবাবু বেতারের সাহায্যে দেশের শত শত শিক্ষার্থীদের গান শেখান। এরা সবাই তাঁর কাছে অদৃশ্য। তারাও তাঁদের গুরুকে চোখের সামনে দেখে না। শেখাবার এই প্রথা বেতারের এই যুগের একটি বিশেষত্ব। এই অবস্থাটির কথা শেখাবার সময় পংকজবাবুকে সব সময় মনে রাখতে হবে।

সামনে একদল ছাত্রছাত্রী নিয়ে শিক্ষক যেভাবে গান শেখায়, বেতারের শিক্ষার আসরে সেই একই পদ্ধতিতে গান শেখানো যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে। এই অদৃশ্য ছাত্রছাত্রীদল বেতারে যে মন নিয়ে গান শেখে, সামনে শিক্ষক থাকলে তাদের সে মনের পরিবর্তন ঘটেই। পংকজবাবু গান শেখাবার সময় যেভাবে নানারূপ উক্তি করেন সেগুলি শুনলে প্রশ্ন জাগে যে সেগুলি কাকে উদ্দেশ্য করে তিনি করছেন? রেডিয়ো স্টেশনে তিনি গান শেখাবার সময় দু'একজনকে যে সংগে রাখেন তা বুঝতে পারি তাদের গলা শুনে। মনে হয় তারা পংকজবাবুর শিক্ষার আসরে দোহারের কাজ করে। পংকজবাবুর কথ্যবার্তাকে তাদের গানের সংগে মিলিয়ে দেখলে অনায়াসে বোঝা যায় এ ... তাদের জন্যে নয়। ঐ গলাকটির একত্র গান ছাড়া, তারা যে গান শিখছে সে রকম একটুও মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা তাহলে কি? আমাদের মনে হয় তিনি বেতারের শিক্ষক হিসেবে আগেথেকেই ঠিক করে রেখেছেন যে, শেখবার আবহাওয়া ও গান শেখানোর পরিবেশে স্বাভাবিকতা আনতে হলে ঐরকম সব কথাগুলি বলা দরকার। তাতে মনে হবে যেন তিনি অদৃশ্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে রেখেই গান শেখাচ্ছেন। কিন্তু সত্যই কি তাতে সাধারণ শিক্ষার আবহাওয়া তৈরী হয়? সামনে শিক্ষার্থীদের গান শুনে ও নানারূপ ত্রুটি দেখে যে সব কথা

...কের মুখে বের হতে পারে, তিনি কি রকমের একটি আবহাওয়া তৈরী করেন? ...নি নিজে যদি কখনো তার এই আসরকে ...ক্ষার্থীর মত শুনতেন তাহলে বুঝতে ...তেন আমাদের এই প্রশ্ন কতখানি সত্যি। ...রা বহুদিন ধরে এইসব কথা শুনে আসছে, ...ং পঙ্কজবাবুর গান শেখানোর পদ্ধতির ...ই একমাত্র পরিচিত, তারা হয়তো ...ষয়ে অস্বাভাবিক কিছু পাবেন না। ...ন্তু যারা আলাদা শিক্ষকের কাছে গান ...খে তারা বারে বারেই মনে করে ঐ ...বার্তাগুলি অনাবশ্যক।

আমরা তো মনে করি যে তিনি তাঁর ...রে কণ্ঠে গানগুলিকে যদি ক্রমান্বয়ে শুনিয়ে যান তাতেই যথেষ্ট। কিছু বলতে হলে তাঁর বলা উচিৎ যেখানে তাঁর নিজের মনে হবে যে, শিক্ষার্থীরা শিখতে গোলমাল করতে পারে। অথবা বলবেন গানের সরগম। ক্রমান্বয়ে গান গেয়ে যাওয়ায় কেউ কেউ বলবেন গানে একঘেয়েমি আসে, তাই পঙ্কজবাবুর ঐ সব উক্তি শেখাবার একঘেয়েমি থেকে মনকে নাড়া দেয়। এসব কথা হল আসলে যারা সত্যিকারে গান শেখে না তাদের কথা। তারা শেখবার নাম করে অলস মনে গানটি শোনে মাত্র। এরকম শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ না করাই উচিত। যারা সত্যিকার মন দিয়ে শেখে তাদের মনে কখনো একঘেয়েমির কথা জাগবে না। তারা যতক্ষণ না গানটিকে মনে একেবারে পাকাপোক্তভাবে বসাতে পারলো ততক্ষণ একটানা গান শুনে যাবে বিনা ক্লান্তিতে। গানটি যদি ভাল লাগল ত আর কথাই নেই।

মোটকথা গানের একটি প্রাণ-মাতানো আবেষ্টনের মধ্যে তিনি যদি একটানা ১৫ মিনিট একটি পুরো গান গেয়ে যান প্রকৃত শিক্ষার্থীরা সেই প্রেরণায় যত তাড়াতাড়ি গান শিখবে এমন আর কোনরূপ চেষ্টার সম্ভব নয়।

পরে এই আসর বিষয়ে আরো দু'একটি প্রস্তাব আমাদের করবার ইচ্ছা আছে।

অজেয় গীবিক্ষা

জি কে চেস্টরটন

অনুবাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেদিনকার সেই সান্ধ্য-অভিযানের কথা ...দিন আমার মনে থাকবে। পার্লে-তে ...যখন আমরা দক্ষিণমুখো যাত্রা করলাম, ...ডনের সেই নির্জন উপকণ্ঠে তখন ...ধূলি নেমে এসেছে। এ কী ভয়াবহ ...র্জনতা! ইয়র্কশায়ারের জলাভূমি কি ...টল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলের থেকেও যে ...জায়গাটা আরো বেশী নিস্তব্ধ। অথচ ...লাহলমুখর লণ্ডনেরই এটা উপকণ্ঠ; ...তেও আমার কষ্ট হলো। সর্বত্র এক ...নিষ্প্রাণ স্তব্ধতা, এক ভৌতিক প্রশান্তি। ...কমন্-এর বিরাট প্রান্তর যেন একটা ...প্রাগৈতিহাসিক পশুর মতো . গা-হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। যেদিকে চাই, শুধু মাঠ আর মাঠ।

মাঠ তো নয়, যেন মূর্তিমান হতাশা : তখন আমার যা মানসিক অবস্থা তাতে অন্তত এই কথাটাই মনে হলো। এই মেঠো-পথ, এই ঊর্ধ্ববাহু এল্ম্-গাছ, এই বিরল-তৃণ প্রান্তর—এর কোনওকিছুরই যেন কোনও অর্থ নেই। এবং সবচাইতে নিরর্থক আমাদের এই সান্ধ্য-অভিযাত্রা। ভূতগ্রস্ত মূর্খের মতো এক মিথ্যা-আলেয়ার পিছনে আমরা দৌড়ে মরছি। তাও আবার এক উন্মাদের নেতৃত্বে। যে-ঠিকানার কোনও অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই সেই জাল-ঠিকানায় এক জোচ্চোরের সন্ধানে এসেছি আমরা। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মর্মান্তিক প্রহসন। পশ্চিম দিগন্তে তখন সূর্য ডুবছে, সমস্ত আকাশে সে যেন একটা বিদ্রূপের হাসি ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

সর্বাগ্রে বেসিল গ্র্যাণ্ট, কোটের কলারে গলা ঢেকে নিয়ে সে নীরবে পথ হাঁটছে। পিছনে আমরা। সূর্য ডুবে গেছে, রাত্রি নামছে, চারদিক অন্ধকার। বেসিল হঠাৎ থমকে থামলো; ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালো সে। সেই অন্ধকারের মধ্যে নজর চালিয়ে দেখলাম, সারা মুখে তার সাফল্যের হাসি ফুটে উঠেছে।

হাততালি দিয়ে সে বললো, "ব্যস। আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি।"

সেই নিষ্ফলা বন্ধ্যা প্রান্তরে তখন কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে; সামনে দুটি বিরাট এল্ম্-গাছ, আকাশে তাদের ডাল-পালা ছড়িয়ে দিয়ে স্তব্ধ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন। লোকালয়ের নামগন্ধও নেই কোনওখানে। চেয়ে দেখি, কী এক দুর্জ্ঞেয় আনন্দে বেসিল গ্র্যাণ্টের সারা মুখ যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

"আঃ, কী আনন্দ," বেসিল বললো, "আবার আমরা লোকালয়ে ফিরে এসেছি; ভাবতেই আমার আনন্দ হচ্ছে। শান্তির সন্ধানে যারা অরণ্যের শরণ নেয়, তারা মূর্খ। প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর রূপটিকে তারা দেখেনি, দেখলে তাদের ভুল ভাঙতো। বুঝতে পারতো যে, গৃহের তুল্য শান্তি আর অন্য কোথাও নেই; আকাশে নেই, বাতাসে নেই, কোথাও নেই। এই কনকনে ঠাণ্ডার দিনে চুপচাপ একটি আগুনের চুল্লীর পাশে বসে' বসে' নিঃসীম আনন্দের স্পর্শে উষ্ণ হয়ে ওঠা—অহো, অরণ্যের নির্জন শান্তি তার কাছে তুচ্ছ। কিংবা ক'জন বন্ধুবান্ধব মিলে এই শীতের সন্ধ্যায় বসে' মদের স্রোত বইয়ে দেওয়া—তার সঙ্গে কি নদীর স্রোতের তুলনা হয়? তুচ্ছ, নদী সেখানে তুচ্ছ। এবং শোনো হে রুপার্ট গ্র্যাণ্ট, আর মাত্র এক মিনিটের মামলা,—তারপরেই তুমি 'চমৎকার এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় বসে' বোতল বোতল মদ ওড়াতে পারবে—এ আশ্বাস তোমাকে আমি দিলাম। শুনে খুশী হলে তো?"

বেসিল বলে কী! রুপার্ট এবং আমি ভয়ে ভয়ে একবার দৃষ্টি বিনিময় করলাম। দেওদার-গাছের বুকে বাতাসের একটানা

হাহাকার। বেসিল বলেই চললো, "দেখে নিও তোমরা, সত্যি সত্যিই লেফ্‌টেন্যাণ্ট বেশ সজ্জন ব্যক্তি, রীতিমত অতিথিবৎসল। আগে যখন ইয়ারমুথ্‌-এর চোরকুঠ্‌রিতে থাকতেন, খুব খাইয়েছিলেন আমাকে একদিন। আরো একদিন খুব খাতিরযত্ন করেছিলেন, তখন তিনি লণ্ডনের এক গুদামঘরে থাকতেন। খুবই ভদ্রলোক। তা ছাড়া তাঁর আরও একটা বড়ো গুণ আছে, আগেই সেকথা বলেছি।"

"বড়ো গুণ?" আমি শুধোলাম, "কী তার বড়ো গুণ?"

বেসিল জবাব দিল, "লেফ্‌টেন্যাণ্টের সবচাইতে বড়ো গুণ হলো তাঁর সত্যবাদিতা।"

রুপার্ট একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। রাগের চোটে মাটিতে পা গুঁতিয়ে বললো, "তাই নাকি! তা এই বুঝি তাঁর সত্যবাদিতার নমুনা? আর তোমারও বলিহারী বুদ্ধি; খেয়েদেয়ে কাজ নেই, নাহক্‌ খানিকক্ষণ আমাদের ছুট্‌ করিয়ে মারলে।"

গাছে ঠেসান দিয়ে বেসিল বললো, "এ তোমার অন্যায় রাগ রুপার্ট। সত্যিই তিনি সত্যবাদী, বড্ডো বেশী সত্যবাদী; এতটা সত্যবাদী তাঁর না হলেও চলতো। মুশকিল কি জানো, আমাদের মতো তিনি রং চড়িয়ে কথা বলতে শেখেন নি, আর সেইখানেই যতো গোল বেধেছে। তা সে যাই হোক্‌, চলো—এবারে ঘরে ঢোকা যাক্‌; নইলে আবার খেতে বসতে দেরী হয়ে যাবে।"

রুপার্টের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সারামুখ তার ভয়ে শাদা হয়ে গিয়েছে। ফিস্‌-ফিস্‌ করে সে আমার কানে কানে বললো, "ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছেন? ঘর কোথায় এখানে? বেসিল কি স্বপ্ন দেখছে নাকি?"

তাই হবে বোধহয়। বেসিল বোধহয় তার সম্বিৎ হারিয়েছে। চিৎকার করে বলে উঠ্‌লাম, "কোথায় যেতে বলছো হে, ঘর কোথায় এখানে?" সেই নির্জন ধু ধু প্রান্তরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটাকে যেন নিজের কানেই কেমন অবান্তর শোনালো।

"কেন, এই তো"—বলে একলাফে বেসিল সেই বিরাট গাছে চড়ে বসলো। দেখলাম তরতর করে সে উপরে উঠে যাচ্ছে। একটু বাদেই সে শাখাপ্রশাখা আর নিবিড় পত্রগুচ্ছের আড়ালে মিলিয়ে গেল। দূর থেকে তার আহ্বান শুনতে পেলাম; অনেক উঁচু থেকে সে বলছে, "এসো হে, উঠে এসো সব। শীগ্‌গির এসো, নইলে আবার খেতে বসতে দেরী হয়ে যাবে।"

বিরাট দুটি এল্‌ম্‌-গাছ, একেবারে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা আকাশে উঠে গেছে। ডালপালা দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে পরস্পরকে যে, সহজেই পা রেখে রেখে ওপরে উঠে যাওয়া যায়।

আমরাও বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম; তাই যদি না হবে তো কী দরকার ছিল বেসিলের আহ্বানে সাড়া দেবার? ডালপালার সিঁড়িতে পা রেখে রেখে আমরা উপরে উঠ্‌তে লাগলাম। উপরে, উপরে আরো উপরে। মনে হলো এ সিঁড়ি বোধহয় আকাশে গিয়ে ঠেকেছে; আর সেখানে স্বর্গের দরজায় দাঁড়িয়ে বেসিল গ্র্যাণ্ট বোধহয় সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আমাদের।

তখন বোধহয় মাঝবরাবর গিয়ে পেঁৗছেচি। গায়ে হঠাৎ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ লাগতেই আমার সম্বিৎ ফিরে এল। এ কী করছি আমরা! এ কী পাগলামী করছি! সমস্ত ব্যাপারটার
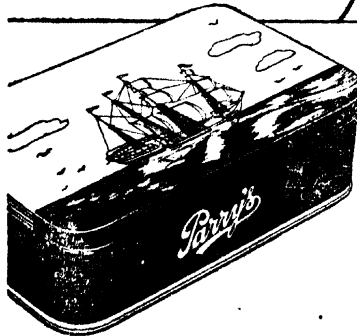
দারুণ হাস্যকরতা যেন একমুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো। এক মিথ্যাবাদী ধাপ্পাবাজ, তার সন্ধানে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ক'জন সুস্থ মানুষে গাছে চড়ে বসে আছি! আর সেই হতভাগা হয়তো এতক্ষণে সোহোর কোনও রেস্তোরাঁয় বসে' প্রাণপণে হাসছে আমাদের ঠকাতে পেরে। তবু তো সে আমাদের এই বৃক্ষারোহণ-পর্বের কথা জানে না। জানলে বোধহয় হাসতে হাসতে তার দম আটকে যেত। নিজেদের এই মূর্খ-তার কথা আর-একবার ভাবতেই আমার মাথা ঘুরে গেল। গাছ থেকে প্রায় পড়েই গিয়েছিলাম, হাত বাড়িয়ে একটা ডাল আঁকড়ে কোনওক্রমে আত্মরক্ষা করলাম।

আমার ঠিক্ ওপরেই হলো রুপার্ট, আরো কয়েক ধাপ সে এগিয়ে রয়েছে। হঠাৎ তার গলা শুনতে পেলাম, "মিঃ ব্রাইনবার্ণ, এ কী পাগলামী করছি আমরা, চলুন—নীচে নামা যাক্।" প্রস্তাব শুনে বাঁচলাম, তারও সম্বিৎ ফিরে এসেছে।

বললাম, "কিন্তু বেসিলের কি হবে? তাকে ফেলে তো আর চলে যাওয়া যায় না"—

"বেসিল?" রুপার্ট জবাব দিল, "সে এতক্ষণে ঢের উঁচুতে উঠে গেছে। শকুনের মত মধ্যে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌কে তালাশ করছে হয়তো। যতো সব ছেলেমানুষী!"

বলতে কি, আমরাও ততক্ষণে অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি। গাছের গুঁড়িগুলো এখন তীব্র বাতাসে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। নীচের দিকে তাকিয়ে আমি হিম হয়ে গেলাম; দেখলাম, এল্‌ম্‌-গাছ দু'টি একেবারে সরাসরি মাটিতে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু এ ধরণের দৃশ্য দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। সাধারণত নীচে দাঁড়িয়ে দেখে থাকি যে, উঁচু উঁচু গাছগুলি সব আকাশে গিয়ে মিশেছে। এই প্রথম ব্যাপারটাকে আমি উল্টো দিক থেকে দেখলাম। উপরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, সেই দীর্ঘ এল্‌ম্‌-গাছ দু'টি একেবারে মাটিতে গিয়ে মিশেছে। আবার আমার মাথা ঘুরে গেল।

সামলে উঠে ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, "কোনও উপায়ই কি বেসিলকে এখন ফিরিয়ে আনা যায় না?"

"না," রুপার্ট জবাব দিল, "সে এতক্ষণে অনেক উপরে উঠে গেছে। তাই যাক্; একে-বারে মগডালে গিয়ে পৌঁছুক। সেখানে গিয়ে যখন দেখবে যে সব কিছু ফাঁকিকার তখন হয়তো তার জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। এখন সে উন্মাদ; ঐ শুনুন, আপনমনে কী যেন সে বলছে।"

বললাম, "আমাদের উদ্দেশ্যেই কিছু বলছে না তো?"

রুপার্ট বললো, "না, সেক্ষেত্রে সে চেঁচিয়ে কথা বলতো। কিন্তু, এই বা কি রকম! মাঝে মাঝেই অবশ্য ও পাগল হয়ে যায়, কিন্তু আগে আর কখনো এভাবে নিজের সঙ্গে কথা কইতে শুনি নি। নাঃ, লক্ষণ বড়ো খারাপ; আজ বোধহয় একেবারেই খেপে গেছে।"

বললাম, "তাই হবে হয়তো।" তারপর কান পেতে তার কথাগুলি শুনতে লাগলাম। অনেক উঁচু থেকে ভেসে আসছে বেসিলের গলা; মৃদু, অস্পষ্ট। নিবিড় পত্রগুচ্ছের আড়ালে বসে আপনমনে সে কথা কইছে, আবার হাসছেও মাঝে মাঝে।

কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনলাম। তারপর রুপার্ট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, "হা ঈশ্বর! এ কী কাণ্ড!"

বললাম, "কেন, কেন—কী হয়েছে? খোঁচাটোচা লাগলো নাকি?"

"না," ভয়ত্রস্ত অদ্ভুত গলায় রুপার্ট বললো, "ভাল করে একবার বেসিলের কথা-গুলি শুনুন। কিছু বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারছেন না যে আর কারুর সঙ্গে ও কথা বলছে?"

বললাম, "তাই নাকি? তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলছে।"

"না, তাও না। অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলছে নিশ্চয়ই।"

হঠাৎ একটা দমকা-হাওয়ায় আমাদের মাথার ওপর থেকে ডালপালাগুলি একটু সরে গেল একপাশে; তারপর বাতাসের বেগটা একটু মরে আসতেই ফের বেসিলের গলা শুনতে পেলাম। এবারে আর আমার কোনও সন্দেহ রইলো না। ঠিক্‌ই বলেছে রুপার্ট,—শুধু বেসিলেরই গলা নয়, আরেকজনের গলাও শুনতে পেলাম আমি।"

আর হঠাৎ সেই উঁচু ডাল থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো বেসিল, "এসো হে, উপরে এসো সবাই। দেখবে এসো, লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌ তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

একটু পরে লেফ্‌টেন্যাণ্টের গলাও শুনতে পেলাম, "আসুন, আসুন। বড়োই খুশী হলাম আপনাদের দেখে। তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন।"

উপরে তাকিয়ে দেখি ডালপালার ভীড় সরিয়ে দিয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট তাঁর মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই বিবর্ণ, তবু সহাস্য, মুখ,—সেই কুচকুচে কালো সযত্নবিন্যস্ত গোঁফ। চিনতে আমাদের কষ্ট হলো না।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমরা, মনে হলো আমাদের বাক্‌শক্তি কেউ হরণ করে নিয়েছে। মোহাবিষ্টের মতো আমরা উপরে উঠ্‌তে লাগলাম। উপরে, আরো উপরে। উঠে দেখি, তাজ্জব ব্যাপার। গাছের ওপরেই ছোট্ট একখানা গোল মতন ঘর। দেওয়াল বৃত্তাকার, মেঝেতে গদী আঁটা। টিমটিমে একটা বাতি জ্বলছে একপাশে। দেওয়ালের গায়ে ঘোরানো তাক, বই সাজানো। আসবাব-পত্রের মধ্যে একটা গোলটেবিল, টেবিল ঘিরে বসবার আসন। ঘরের মধ্যে সবশুদ্ধ তিনজন লোক। প্রথমজন বেসিল। বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে। মুখে একটা নির্লিপ্ত প্রশান্তি। মৌজ করে সে সিগারেট টানছে, ধীরেসুস্থে ধোঁয়া ছাড়ছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি লেফ্‌টেন্যাণ্ট ড্রামণ্ড্ কীথ্। লেফ্‌টে-ন্যাণ্টকেও বেশ খুশী খুশীই দেখাচ্ছে, তবে বেসিলের মতো তাঁকে ঠিক অতোটা নিশ্চিন্ত মনে হলো না। আর তৃতীয়জন হলেন মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী, সেই গুঁফো হাউস-এজেণ্ট। লেফ্‌টেন্যাণ্টের বর্শা, তাঁর সবুজ ছাতা, তাঁর তরোয়াল—সেগুলোও বাদ পড়েনি—দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে। আর তাঁর সেই ধনোমদের বোতলটা, সযত্নে সেটা ম্যাণ্ট্‌ল্‌-পীসের ওপর রক্ষিত। ঘরের কোণে সেই রাইফেলটাও রয়েছে দেখলাম। টেবিলটার ঠিক মাঝখানে বড়ো একবোতল শ্যাম্পেন। গ্লাশগুলি সব পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। এবারে আমাদের বসে পড়লেই হয়।

আর আমাদের অনেক অনেক নীচে বাতাসের সেই অবিশ্রান্ত একটানা গর্জন। গাছটাকে একটা আলোকস্তম্ভ বলে মনে হলো, তার পায়ের তলায় যেন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। নাকি আমরা জাহাজে বসে আছি? ঘরখানা যেন তার ছোট্ট একটা কেবিন; ঢেউয়ে ঢেউয়ে আন্দোলিত হচ্ছে।

গ্লাশে গ্লাশে শ্যাম্পেন ঢালা হলো, তবু আমাদের উঠ্‌বার নাম নেই। বোকার মত আমরা বসে আছি, আমি আর রুপার্ট।

বিস্ময়ের জের আমাদের এতটুকুও কাটে নি। বেসিলই কথা কইলো সর্বপ্রথম। মৃদু হেসে বললো, "কি হে রুপার্ট, এখনো তোমার অবিশ্বাস? লেফ্‌টেন্যাণ্ট অবশ্য একটু বিশ্রীরকমেরই সত্যবাদী, কিন্তু তাই বলো—"

বোকার মতো আমতা আমতা করতে লাগলো রুপার্ট, "কিছুই আমি বুঝতে পারছি না বেসিল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট তো তাঁর ঠিকানা বলেছিলেন—"

সহাস্যে জবাব দিলেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট, "ঠিকই বলেছিলাম। কন্‌স্টেবল্‌টি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি থাকি কোথায়। আমি বললাম, 'এলম্‌-নিবাস, বাক্সটন কমন।' তা আমি কিছু অন্যায় বলেছি? এইটেই তো আমার ঠিকানা, এইখানেই তো আমি থাকি। মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সীর সঙ্গে তো আপনাদের আগেই আলাপ হয়ে গেছে; এই ধরণের যতো বাড়ি রয়েছে—ইনি হচ্ছেন তারই এজেণ্ট। এ ব্যাপারে ইনি একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। এসব বাড়ি আবার চট্‌ করে কাউকে ভাড়া দেওয়া হয় না, ব্যাপারটার বৈশিষ্ট্য তাতে নষ্ট হতে পারে। তবে আমাকে তো আপনারা জানেন, বাসাবদল আমার একটা নেশা বললেও চলে। আমার কি আর এসব অজানা থাকে?"

রুপার্ট ততক্ষণে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সাগ্রহে সে জিজ্ঞেস করলো, "তাই নাকি মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী? আপনি বুঝি গেছো-বাড়ির এজেণ্ট?"

মিঃ মণ্টমরেন্সী তার এই আকস্মিক প্রশ্নাঘাতে একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। অপ্রস্তুতভাবে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে আঙুলে জড়িয়ে ছোট্ট একটা নির্বিষ সাপকে তিনি টেনে বার করে আনলেন, তারপর অন্যমনস্কভাবে সেটাকে টেবিলের ওপরে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তা, হ্যাঁ—তাও বলতে পারেন। মানে হচ্ছে আমার বাবা-মা চেয়েছিলেন আমি বাড়ির এজেণ্ট হই। তা আমার আবার ছোটবেলা থেকেই জীব-জন্তু, গাছপালা এই সব নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সখ। বাবা-মা—কেউই আর আজ বেঁচে নেই। এখন, তাঁদের ইচ্ছেটাকেও তো অসম্মান করা যায় না;—তাই আমি এই গেছো-বাড়ির এজেন্সী খুলেছি। এতে করে' আমার দুদিকই বজায় রইলো। তাঁদের কথাও রাখা হলো, সেইসঙ্গে আমার নিজের সখটাও মিটলো। মানে এও তো একাহিসেবে উদ্ভিদতত্ত্বেরই ব্যাপার; কেমন তাই না?"

রুপার্ট আর হাসি চেপে রাখতে পারলে না; হাসতে হাসতে বললো, "নিশ্চয়; তাতে আর সন্দেহ কি। তা মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী, ভাড়াটে জোটে তো আপনার?"

"জোটে, তবে খুব কম। তা ছাড়া সব লোককে আবার ভাড়া দেওয়া হয় না।" জবাব দিয়ে তিনি লেফ্‌টেন্যাণ্টের দিকে তাকালেন। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হলো—লেফ্‌টেন্যাণ্ট ড্রামণ্ড্‌ কীথ্‌ই আপাতত তাঁর একমাত্র ভাড়াটে।

সিগারেটে টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়লো বেসিল, তারপর বললো, "দুটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখা দরকার। প্রথমটি হলো এই যে, কারুর সম্ভাব্য আচরণ সম্পর্কে কোনও অনুমান করতে গিয়ে কক্ষণো যেন তালগোল প্যাকিয়ে ফেলো না। মনে রাখবে, যাঁরা হিসেবী লোক—তাঁরা সব ব্যাপারেই হিসেবী; আর যাঁরা পাগলাটে—তাঁরা সব ব্যাপারেই পাগলাটে। দ্বিতীয় কথাটি হলো এই যে, সব চাইতে যেটা স্বাভাবিক সত্য, সেইটেকেই আমাদের সব-চাইতে অদ্ভুত বলে' মনে হয়। এই লেফ্‌টেন্যাণ্টের কথাই ধরোনা কেন। লেফ্‌টেন্যাণ্ট যদি আজ শহরের এক ঘিঞ্জিপাড়ার মধ্যে একটা পাকাবাড়ি কিনতেন, আর তার নাম দিতেন 'এলম্‌-নিবাস', তো তোমাদের কাছে সেটা এতটুকুও অদ্ভুত ঠেক্‌তো না। লেফ্‌টেন্যাণ্টের পক্ষে সেই অস্বাভাবিক নামকরণ মিথ্যাচরণেরই সামিল হতো এবং সেই মিথ্যাটাকেই তোমরা সহজ মনে গ্রহণ করতে। বর্তমান ক্ষেত্রে লেফ্‌টেন্যাণ্ট তাঁর বাড়ির একটা সত্যি-নাম দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তার অর্থ তোমরা বুঝতে পারো নি।"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট ড্রামণ্ড্‌ কীথ্‌-এর মুখে একটা স্মিতহাস্য ফুটে উঠলো; তিনি বললেন, "থাক্‌ থাক্‌, ওকথা এখন থাক্‌। নিন, শ্যাম্পেনের গ্লাশ তুলে নিন সবাই; যা হাওয়া বইছে সব নইলে উল্টে যাবে।"

মদের গ্লাশে চুমুক দিলাম আমরা। বাইরে তখন ঝড়ো- হাওয়া বইছে; হাওয়ায় হাওয়ায় 'এলম্‌-নিবাস' মৃদুমন্দ আন্দোলিত হতে লাগলো।

[চতুর্থ গল্প সমাপ্ত]

নিদারুন অভিজ্ঞতা

শ্রীবিরূপাক্ষ

ছেলেপুলের পরিবর্তন

চোখের সামনেই দেখলুম পৃথিবীটা কি রকম বে-প্যাটার্নভাবে বদলে গেল। মানে, আগেকার ধরণ ধারণ আচার ব্যবহার সব তো বদলেছেই উপরন্তু ছেলেমেয়ে লোকজন আত্মীয়স্বজন সব যদি একটু খাসাভাবে বদলায় তবু একটু মনে আশা থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে আমাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে। স্রেফ নিজের বাড়ির কান্ড দেখেই মুন্ডু ঘুরে যাচ্ছে, তা অপরের কথা কি বলবো বলুন!

এক এক সময় ভাবি, কাদের জন্য মাথা ঘামিয়ে মরছি। ছোট্ট প্যাঁটকাটা থেকে ধাড়ী রামছাগলগুলোর পর্যন্ত মেজাজ একেবারে মিলিটারি। ভদ্রতা, সহবৎ, শিক্ষা কিছু নেই—কাজকর্মের বালাই তো বহুদিন চুকে গেছে। যদি বলি বাড়ির বাজারটা রোজ এনে একটু উপকার কর—বয়ে যাচ্ছে! সারাদিন শুধু হুজ্জুৎ করে সন্ধ্যেবেলা বাবুরা বাড়ি ফিরবেন, আর আমি এঁদের ঋণ শোধ করবো!

সিগারেটওয়ালা এল তাকে তিন মাস কে পয়সা দেয়নি শেষকালে সে দু পয়সার বিড়ি পর্যন্ত ধার দিতে নারাজ হতেই তাকে গালিগালাজ করে দোকানের যথা-সর্বস্ব লুটে তার বাঁ চোকের ওপর একটি প্রকান্ড আব গজিয়ে দিয়ে একবাবু সরে গেলেন,—আপিস থেকে বাড়ি ফিরতেই শুনলুম, ভুঁটেবাবু এই কান্ড করে বসে আছেন। আমাকে পঁচিশ টাকা খেসারৎ দিতে হল। বাদু বাড়ি ফিরতে জিজ্ঞেস করলুম, হারে বাঁদর, পানওয়ালাকে থামকা ঠেঙালি কেন? অমনি মুখে জবাব খুললো—দাঙ্গার সময় বেটার দোকান বাঁচিয়ে দিয়েছিলুম না?

যেহেতু দাঙ্গার সময় তাকে চাঙ্গা করে রেখেছিলেন সেহেতু এখন নিত্যি তার সঙ্গে হাঙ্গামা করার ওর কপিরাইট জন্মে গেছে। মানে বজ্জাতিটা বুঝুন! পয়সা না থাকে নেশা করা কেন? যাই হোক, এ বিষয়টা নিয়ে তো আর ছেলেপুলেদের সঙ্গে সামনা সামনি আলোচনা করা যায় না—গিন্নীকে বললুম, আচ্ছা, তোমরা ছোঁড়াগুলোকে ওগুলো খেতে বারণ করনা কেন? তিনি খিঁচিয়ে বললেন, বয়েস কালে ছেলেপুলেরা ও সব না খেলে আর খাবে কবে? তার আবার বলবো কি? বলে, আজকাল কত মেয়ে ঐ সব খেয়ে ভুস্যিনাশ করে দিচ্ছে—ওরা তো ছেলে!

আমি ক্ষেপে বলে উঠলুম, কভি নেহি, দু চারজন হাই-জাম্প দেওয়া মেয়ে সিগারেট টিগারেট হয়তো খেতে পারে, তা বলে কেউ বিঁড়ি টানে না। তিনি বলে উঠলেন, আজ না টানলেও পয়সার টান পড়লে দুদিন পরে ওরাও টানবে। এই নিয়ে চুলোচুলি! শেষে তিনি ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, বেশ করবে খাবে! কত দুধ, ঘি, মাছ-মাংস ছেলেপুলেদের নিত্যি এনে খাওয়াচ্ছ তার ঠিক নেই—ওরা দুটো একটা কি খেলে না খেলে অমনি তোমার চোখ টাটালো?

আমি ক্ষেপে বললুম, থাকগে মরুগগে, খেয়ে পয়সা দেয় না কেন? তার জবাব সঙ্গে সঙ্গে। ওরা কোত্থেকে পাবে, ওদের রোজগারের ব্যবস্থা করেছ? মানে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হল মূলে সেই আমার দোষ! দোষ তো সংসারে শ্রীদুর্গা ফাঁদা অবধি করে আসছি—তা আমিও হাড়ে হাড়ে কি আর বুঝছি না? কিন্তু রোজগারের ব্যবস্থা করবো কোত্থেকে, কটা বামুন কায়েতের ছেলের আজকাল চাকরি জোটে বলুন তো? তাই একখানা মুদীর দোকান করে দিলুম, তাও টিঁকলো না। চিনির দাম চড়তে তিন নাগরি গুড় দিয়ে চা খেয়ে খেয়ে বাবুরা কারবার লাটে তুলে দিলে! এ ছাড়া দুপুরবেলায় ঘুম আছে, দোকানে কেউ যেতে পারবেন না, বিকেলে সিনেমা অতএব লোকজন যা করে। তারা একেবারে দফা সেরে দিলে—বাবুরা পুনরায় ঘরে বসে আয়েস করছেন। তাও চুপচাপ থাক্ তা নয়।

ইতিমধ্যে এক কান্ড! সেদিন দেখি হুড়-কোর পেছন পেছন মোড়ের চাওয়ালা হাঁ, হাঁ করে ছুটে আসছে! কি ব্যাপার কি?

শোনা গেল, বাবু রোজ ছ' কাপ করে চা খাবেন দাম দেবেন না—সেদিন সে বাকী পয়সা চেয়েছে অতএব আর যায় কোথা হিড় হিড় করে তার কেটলি শুদ্ধ বাড়িতে টেনে নিয়ে এসেছে। আমি আবার তার গায়ে হাত বুলিয়ে চায়ের দাম, কেটলী সব ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি, তাই রক্ষে! আচ্ছা, এরা ক্রমশঃ হচ্ছে কি? এই নিয়ে বকাবকি কম করেছি? কিন্তু যতই বলা হ'ক, এরা কাঁচ-কলা দেখিয়ে নিজেদের শলা পরামর্শ মত চলবে—আপনার জ্বালা বাড়লেও সেদিকে দৃষ্টি দিতে তাদের বয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টিছাড়া অঘটন ঘটাতে এরা ওস্তাদ।

ষষ্ঠমানের পরিমাণ

তা বলে বাপ দাদা খুড়ো জ্যাঠা মায় মাস্টার পর্যন্ত কউকে রেয়াৎ করবে না? কি আতান্তর ব্যাপার বলুন তো? সেদিন শুনলুম ন বাবুর সেজ ছেলের পরের যেটি ফালতুটা ইস্কুলে পড়া বলতে পারে নি। মাস্টার বকেছে। আর যায় কোথা? তারপর দিনই হঠাৎ মাস্টারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার নস্যির ডিবে থেকে এক মুঠো নস্যি নিয়ে তাঁর নাকে গুঁজে দিয়ে এল। সে ভদ্রলোকেরও গেরো—সেই সময় আবার তাড়াতাড়ি হেঁচ্ছো হেঁচ্ছো করে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে ঢুকে নাক মুখ দিয়ে সহস্র ধারায় পিচকিরি ছোটাতে লাগলেন—সে ভদ্রলোক নিজের মুখ চোক বাঁচাতে কেৎরে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন, মাস্টার মশাইও নালিশ জানাতে তার পেছনে ছুটলেন, অন্যান্য মাস্টাররাও কি হল, কি হল বলে তাদের দুজনের পেছনে দৌড়তে লাগলেন—সঙ্গে সঙ্গে সব ক্লাশ থেকে ছোকরার দল বেরিয়ে এসে পেছনে হাততালি দিতে সুরু করলে।

আচ্ছা এ কি?

ফালতুর বিরুদ্ধে নালিশ শুনে সন্ধ্যে-বেলা যাচ্ছেতাই করে বললুম, হ্যাঁরে গরু, তোরা গুরুকে মানিস্ না—তোদের দুবেলা জাবনার ব্যবস্থা করবার জন্যে তাহলে এত খেটে মরছি কেন? তার উত্তরে আমার ওপরেই চোপা, আমায় শক্ত শক্ত পড়া জিজ্ঞেস করে কেন?

আমি বললুম, পড়া আবার শক্ত কিরে বাঁদর? তার উত্তরে কি বললে জানেন? তুমি দুটোর উত্তর দাও না, দেখি!

গা জ্বলে গেল হতভাগার কথা শুনে। বললুম, নিয়ে আয় হতচ্ছাড়া, দেখি কিসের উত্তর না দিতে পারি? ষষ্ঠমানের পড়ার উত্তর দিতে পারবো না আমি? মশাই, বলতে না বলতে দু ঝাঁকা বই নিয়ে এসে সামনে ঢেলে দিলে। দেখলুম সেগুলো রপ্ত করতে পারলে প্রায় আইনস্টাইনের সমকক্ষ হওয়া যায়। নিজের মান বাঁচাতে শেষে পালাবার পথ পাই না। তবু গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, তাহলে পাশ করবি কি করে? সেও মহাস্ফূর্তির সঙ্গে বলে গেল, কেন, টুকে-টুকে। বুঝুন কি রকম শিক্ষা পাচ্ছে।

আসল কথা হয়েছে কি জানেন? আমরাও ওদের ঘাড়ে রাজ্যের জ্ঞান চাপিয়ে বিদ্যে দিগগজ না করে ছাড়বো না, ওরাও গজগজ করতে ছাড়বে না—ফলে অবিরত গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বাধছে। তার ওপর যুদ্ধ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, হুজুগে মনটা গেছে চলকে। এক মুহূর্ত সুস্থির থাকা কুষ্ঠিতে লেখে নি, তাই দেখুন সগুষ্টি আমি মারা পড়তে বসেছি। যদি বলেন, আমাদের বাড়িতে কি ছেলেপুলে নেই, তারা তো কেউ তোমার বাড়ির মত উদ্ভুট্টে নয়—আসলে তুমি নজর রাখ না, তাই। তাহলে বলবো আর কত নজর দোব বলতে পারেন? এত নজর দিয়েও তো কেউ কাহিল হচ্ছে না, শুধু আমার বিরুদ্ধেই লোকে খুঁত বার করতে খুঁত খুঁত করছে। তাহলে উপায় কি?

সেদিন আমাদের পাড়ায় এক শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক লাইব্রেরীর উদ্বোধন করতে এলেন, তাঁর পেছনে স্রেফ শেয়াল ডেকে এমন অবস্থা করলে যে, ভদ্রলোকের বোধ হয় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার ইচ্ছে হল। এ কার্যের নাটের গুরুটি কে সংবাদ নিতে গিয়ে শুনলুম, ন বাবুর ছোট ছেলে ন্যাড়া। পরে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁরে গর্দভ এ রকম করলি কেন? উত্তরে সটান বলে গেল, ও যে অনেক ভাল ভাল সব কথা বলছিল—তাই বেটাকে বসিয়ে দিলুম। অর্থাৎ এ যুগে এঁদের কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এসে ভাল কথা বলতে গেলেও হয় এঁরা শেয়াল ডাকবেন নয় পেছন থেকে গাঁট্টা মেরে বসিয়ে দেবেন। অভিনব অভিজ্ঞতা—আমায় অর্জন করতে হচ্ছে মশাই।

মাস্টারের পরিণাম

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

কালক্রমে হিন্দুসমাজের প্রাচীন অনেক আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেগুলি প্রচলিত আছে দশসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রধান। বঙ্গদেশে এখনও পুরোহিত (ঋত্বিক্) বরণ করিতে যজমানগণ লক্ষ্য রাখেন—পুরোহিত দশকর্মে অভিজ্ঞ কি না। শ্রীহট্ট জেলায় প্রবাদবাক্য শুনিয়াছি—'নান্দী চণ্ডী কুশণ্ডী, তবে তো পুরোহিতটি' অর্থাৎ নান্দীমুখ বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, চণ্ডীপাঠ এবং কুশণ্ডিকা অর্থাৎ দশকর্মাদি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই ঋত্বিক্‌পদে বৃত হওয়ার যোগ্য। উল্লিখিত দশটি কর্ম বা সংস্কার হইতেছে—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ। এই সকল মাঙ্গলিক কর্মের প্রারম্ভে গণাধিপের সহিত গৌরী, পদ্মা প্রমুখ ষোড়শমাতৃকার পূজা করা হয়। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃলোকের আশীষ প্রার্থনা করা হয়। এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বা আভ্যুদয়িকের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠাতার পক্ষেও বিশেষ কল্যাণপ্রদ বলিয়াই হিন্দুগণ মনে করেন। সংস্কারাদিতে বৈদিক বিধান অনুসারে হোম প্রভৃতি কর্মও করিতে হয়। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ এই সকল অনুষ্ঠানে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। দশ সংস্কারের মধ্যে নামকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে—

প্রাচীন কালে রীতি ছিল, শিশুর জন্মের পর একাদশ দিনে, দ্বাদশ দিনে, একাধিকশততম দিনে, অথবা সম্বৎসর পূর্ণ হইলে একদিন পরে শিশুর নাম রাখা হইত। এই বিভিন্ন বিধানের মধ্যে একাদশ দিনই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বৌধায়ন, গোভিল, আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব প্রমুখ ঋষিগণের প্রণীত গৃহ্যসূত্রাদিগ্রন্থে এই সব বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আজকাল একাদশ দিনে নামকরণের প্রথা প্রায় লুপ্ত। বাঙলাদেশের কোন কোন স্থানে ষষ্ঠ রাত্রিতে ষষ্ঠীদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে নাম রাখা হয়। নামকরণের পরের সংস্কার হইতেছে 'অন্নপ্রাশন'। অন্নপ্রাশন সাধারণত ছেলের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং মেয়ের পঞ্চম বা সপ্তম মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ইদানীং প্রায়ই অন্নপ্রাশনের দিনে প্রথমত নামকরণ সংস্কারের কাজ সমাধা করা হয়। অন্নপ্রাশনের দিনেই নাম রাখিতে হয়, এই প্রকার ধারণা অনেকেরই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন—

একজনেতে নাম রাখবে কখন অন্নপ্রাশনে,
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে ভারি বিষম শাসনএ।

নাম রাখার আসল অধিকারী শিশুর পিতা। পিতার অভাবে অপর ব্যক্তির অধিকার। আজকাল ছেলেমেয়ের নাম রাখিতে আমরা অনেক সময় বিশেষ যশস্বী বা কীর্তিমান ব্যক্তির নামসাদৃশ্য খুঁজিয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নাম বাঙালী পিতামাতার কাছে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। বাঙালী-সন্তানের জওহরলাল নামও শোনা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থের নায়ক-নায়িকার নাম, এমনকি—গ্রন্থের নাম পর্যন্ত চালু হইয়া গিয়াছে। গোরা, নিখিলেশ প্রভৃতি নামের তো এখন ছড়াছড়ি। এমনকি, রত্নাবতী, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি নামও শোনা যাইতেছে। মেয়েদের বেলা কীর্তিমতী মহিলার নামসাদৃশ্য বেশী না শুনিলেও গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী, অপালা, প্রজ্ঞাপারমিতা, স্বধা, স্বাহা প্রভৃতি বৈদিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধসাহিত্যিক নামগুলি যেন ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। সকল সময়ই সমাজে এরূপ রুচিবৈচিত্র্য দেখা যায়। শংকর, কালিদাস প্রভৃতি নাম চিরদিনই আদৃত হইতেছে।

গৃহ্যসূত্রাদিতে কি আছে, সম্প্রতি তাহাই দেখিব। ছেলের নাম হইবে যুগ্ম অক্ষরের—অর্থাৎ দুই, চারি বা ছয় অক্ষরের। আর মেয়ের নাম হইবে অযুগ্ম অক্ষরের—অর্থাৎ তিন বা পাঁচ অক্ষরবিশিষ্ট। নামের অর্থ হইবে সুস্পষ্ট ও সুখবোধ্য। শ্রুতিকটু এবং যুক্তাক্ষরকে যথাসম্ভব বাদ দিতে হইবে। পূর্বপুরুষের নামের অক্ষরের ধ্বনিসাদৃশ্য, আদিতে পিতার নামের আদ্যাক্ষরের প্রয়োগ প্রভৃতিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পিতার উপাস্য দেবতার নামের সহিত সম্বন্ধ নাম রাখা বিশেষ কল্যাণপ্রদ। পিতামাতাও তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

বৃদ্ধ অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল—'নারায়ণ'। আসন্নমৃত্যু পুত্রস্নেহাতুর বৃদ্ধ ধীরে ধীরে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন। সেই নামগ্রহণেই তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপাখ্যান ভক্তদিগকে অতিমাত্রায় আকর্ষণ করে। প্রাচীনপন্থিগণ এখনও নারায়ণ, হরিচরণ, কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদ, শিবশংকর, শিবপ্রসাদ, কালিকাপ্রসাদ, তারাপদ, দুর্গাচরণ, শঙ্করী, ভবানী, কমলা প্রভৃতি নামকেই বেশী পছন্দ করেন। এই সকল নামকে তাঁহারা গাম্ভীর্যদ্যোতক বলিয়াও মনে করেন। পুত্রকন্যার নাম রাখিবার সময় তাঁহাদের এই মনোভাব প্রকাশ পায়। দেব-দেবীতে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহাদেরও অনেকে অরূপ, অমিত, অসীম, নিরঞ্জন, বিভু প্রভৃতি ব্রহ্মবাচক নামকেই পছন্দ করেন।

শোনা গেল, বাবু রোজ ছ' কাপ করে চা খাবেন দাম দেবেন না—সেদিন সে বাকী পয়সা চেয়েছে অতএব আর যায় কোথা হিড় হিড় করে তার কেটলি শুদ্ধ বাড়িতে টেনে নিয়ে এসেছে। আমি আবার তার গায়ে হাত বুলিয়ে চায়ের দাম, কেটলী সব ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি, তাই রক্ষে! আচ্ছা, এরা ক্রমশঃ হচ্ছে কি? এই নিয়ে বকাবকি কম করেছি? কিন্তু যতই বলা হ'ক, এরা কাঁচ-কলা দেখিয়ে নিজেদের শলা পরামর্শ মত চলবে—আপনার জ্বালা বাড়লেও সেদিকে দৃষ্টি দিতে তাদের বয়ে

ষষ্ঠমানের পরিমাণ

যাচ্ছে। সৃষ্টিছাড়া অঘটন ঘটাতে এরা ওস্তাদ।

তা বলে বাপ দাদা খুড়ো জ্যাঠা মায় মাস্টার পর্যন্ত কউকে রেয়াৎ করবে না? কি আতান্তর ব্যাপার বলুন তো? সেদিন শুনলুম ন বাবুর সেজ ছেলের পরের যেটি ফালতুটা ইস্কুলে পড়া বলতে পারে নি। মাস্টার বকেছে। আর যায় কোথা? তারপর দিনই হঠাৎ মাস্টারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার নস্যির ডিবে থেকে এক মুঠো নস্যি নিয়ে তাঁর নাকে গুঁজে দিয়ে এল। সে ভদ্রলোকেরও গেরো—সেই সময় আবার তাড়াতাড়ি হেঁচ্ছো হেঁচ্ছো করে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে ঢুকে নাক মুখ দিয়ে সহস্র ধারায় পিচকিরি ছোটাতে লাগলেন—সে ভদ্রলোক নিজের মুখ চোক বাঁচাতে কেৎরে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন, মাস্টার মশাইও নালিশ জানাতে তার পেছনে ছুটলেন, অন্যান্য মাস্টাররাও কি হল, কি হল বলে তাদের দুজনের পেছনে দৌড়তে লাগলেন—সঙ্গে সঙ্গে সব ক্লাশ থেকে ছোকরার দল বেরিয়ে এসে পেছনে হাততালি দিতে সুরু করলে।

আচ্ছা এ কি?

ফালতুর বিরুদ্ধে নালিশ শুনে সন্ধ্যে-বেলা যাচ্ছেতাই করে বললুম, হ্যাঁরে গরু, তোরা গুরুকে মানিস্ না—তোদের দুবেলা জাব্‌নার ব্যবস্থা করবার জন্যে তাহলে এত খেটে মরছি কেন? তার উত্তরে আমার ওপরেই চোপা, আমায় শক্ত শক্ত পড়া জিজ্ঞেস করে কেন?

আমি বললুম, পড়া আবার শক্ত কিরে বাঁদর? তার উত্তরে কি বললে জানেন? তুমি দুটোর উত্তর দাও না, দেখি!

গা জ্বলে গেল হতভাগার কথা শুনে। বললুম, নিয়ে আয় হতচ্ছাড়া, দেখি কিসের উত্তর না দিতে পারি? ষষ্ঠমানের পড়ার উত্তর দিতে পারবো না আমি? মশাই, বলতে না বলতে দু ঝাঁকা বই নিয়ে এসে সামনে ঢেলে দিলে। দেখলুম সেগুলো রপ্ত করতে পারলে প্রায় আইনস্টাইনের সমকক্ষ হওয়া যায়। নিজের মান বাঁচাতে শেষে পালাবার পথ পাই না। তবু গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, তাহলে পাশ করবি কি করে? সেও মহাস্ফূর্তির সঙ্গে বলে গেল, কেন, টুকে-টুকে। বুঝুন কি রকম শিক্ষা পাচ্ছে।

আসল কথা হয়েছে কি জানেন? আমরাও ওদের ঘাড়ে রাজ্যের জ্ঞান চাপিয়ে বিদ্যে দিগগজ না করে ছাড়বো না, ওরাও গজগজ করতে ছাড়বে না—ফলে অবিরত গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বাধছে। তার ওপর যুদ্ধ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, হুজুগে মনটা গেছে চলকে। এক মুহূর্ত সুস্থির থাকা কুষ্ঠিতে লেখে নি, তাই দেখুন সগুষ্টি আমি মারা পড়তে বসেছি। যদি বলেন, আমাদের বাড়িতে কি ছেলেপুলে নেই, তারা তো কেউ তোমার বাড়ির মত উনভুটে নয়—আসলে তুমি নজর রাখ না, ভাই। তাহলে বলবো আর কত নজর দোষ বলতে পারেন? এত নজর দিয়েও তো কেউ কাহিল হচ্ছে না, শুধু আমার বিরুদ্ধেই লোকে খুঁত বার করতে খুঁত খুঁত করছে। তাহলে উপায় কি?

সেদিন আমাদের পাড়ায় এক শ্রদ্ধেয়

মাস্টারের পরিণাম

ভদ্রলোক লাইব্রেরীর উদ্বোধন করতে এলেন, তাঁর পেছনে স্রেফ শেয়াল ডেকে এমন অবস্থা করলে যে, ভদ্রলোকের বোধ হয় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার ইচ্ছে হল। এ কার্যের নাটের গুরুটি কে সংবাদ নিতে গিয়ে শুনলুম, ন বাবুর ছোট ছেলে ন্যাড়া। পরে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁরে গর্দভ এ রকম করলি কেন? উত্তরে সটান বলে গেল, ও যে অনেক ভাল ভাল সব কথা বলছিল—তাই বেটাকে বসিয়ে দিলুম। অর্থাৎ এ যুগে এঁদের কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এসে ভাল কথা বলতে গেলেও হয় এঁরা শেয়াল ডাকবেন নয় পেছন থেকে গাঁট্টা মেরে বসিয়ে দেবেন। অভিনব অভিজ্ঞতা—আমায় অর্জন করতে হচ্ছে মশাই।

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

কালক্রমে হিন্দুসমাজের প্রাচীন অনেক আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেগুলি প্রচলিত আছে দশসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রধান। বঙ্গদেশে এখনও পুরোহিত (ঋত্বিক্) বরণ করিতে যজমানগণ লক্ষ্য রাখেন—পুরোহিত দশকর্মে অভিজ্ঞ কি না। শ্রীহট্ট জেলায় প্রবাদবাক্য শুনিয়াছি—'নান্দী চন্ডী কুশন্ডী, তবে তো পুরোহিতটি' অর্থাৎ নান্দীমুখ বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, চন্ডীপাঠ এবং কুশণ্ডিকা অর্থাৎ দশকর্মাদি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই ঋত্বিক্‌পদে বৃত হওয়ার যোগ্য। উল্লিখিত দশটি কর্ম বা সংস্কার হইতেছে—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ। এই সকল মাঙ্গলিক কর্মের প্রারম্ভে গণাধিপের সহিত গৌরী, পদ্মা প্রমুখ ষোড়শমাতৃকার পূজা করা হয়। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃপুরুষের আশীষ প্রার্থনা করা হয়। এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বা আভ্যুদয়িকের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠাতার পক্ষেও বিশেষ কল্যাণপ্রদ বলিয়াই হিন্দুগণ মনে করেন। সংস্কারাদিতে বৈদিক বিধান অনুসারে হোম প্রভৃতি কর্মও করিতে হয়। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ এই সকল অনুষ্ঠানে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। দশ সংস্কারের মধ্যে নামকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে—

প্রাচীন কালে রীতি ছিল, শিশুর জন্মের পর একাদশ দিনে, দ্বাদশ দিনে, একাধিকশততম দিনে, অথবা সম্বৎসর পূর্ণ হইলে একদিন পরে শিশুর নাম রাখা হইত। এই বিভিন্ন বিধানের মধ্যে একাদশ দিনই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বৌধায়ন, গোভিল, আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব প্রমুখ ঋষিগণের প্রণীত গৃহ্যসূত্রাদিগ্রন্থে এই সব বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আজকাল একাদশ দিনে নামকরণের প্রথা প্রায় লুপ্ত। বাঙলাদেশের কোন কোন স্থানে ষষ্ঠ রাত্রিতে ষষ্ঠীদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে নাম রাখা হয়। নামকরণের পরের সংস্কার হইতেছে 'অন্নপ্রাশন'। অন্নপ্রাশন সাধারণত ছেলের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং মেয়ের পঞ্চম বা সপ্তম মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ইদানীং প্রায়ই অন্নপ্রাশনের দিনে প্রথমত নামকরণ সংস্কারের কাজ সমাধা করা হয়। অন্নপ্রাশনের দিনেই নাম রাখিতে হয়, এই প্রকার ধারণা অনেকেরই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন—

একজনেতে নাম রাখবে কখন অন্নপ্রাশনে,
বিশ্বশুদ্ধ সে নাম নেবে ভারি বিষম শাসনএ।

নাম রাখার আসল অধিকারী শিশুর পিতা। পিতার অভাবে অপর ব্যক্তির অধিকার। আজকাল ছেলেমেয়ের নাম রাখিতে আমরা অনেক সময় বিশেষ যশস্বী বা কীর্তিমান ব্যক্তির নামসাদৃশ্য খুঁজিয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নাম বাঙালী পিতামাতার কাছে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। বাঙালী-সন্তানের জওহরলাল নামও শোনা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থের নায়ক-নায়িকার নাম, এমনকি—গ্রন্থের নাম পর্যন্ত চালু হইয়া গিয়াছে। গোরা, নিখিলেশ প্রভৃতি নামের তো এখন ছড়াছড়ি। এমনকি, রঙ্গাবতী, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি নামও শোনা যাইতেছে। মেয়েদের বেলা কীর্তিমতী মহিলার নামসাদৃশ্য বেশী না শুনিলেও গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী, অপালা, প্রজ্ঞা-পারমিতা, স্বধা, স্বাহা প্রভৃতি বৈদিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধসাহিত্যিক নামগুলি যেন ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। সকল সময়ই সমাজে এরূপ রুচিবৈচিত্র্য দেখা যায়। শঙ্কর, কালিদাস প্রভৃতি নাম চিরদিনই আদৃত হইতেছে।

গৃহ্যসূত্রাদিতে কি আছে, সম্প্রতি তাহাই দেখিব। ছেলের নাম হইবে যুগ্ম অক্ষরের—অর্থাৎ দুই, চারি বা ছয় অক্ষরের। আর মেয়ের নাম হইবে অযুগ্ম অক্ষরের—অর্থাৎ তিন বা পাঁচ অক্ষরবিশিষ্ট। নামের অর্থ হইবে সুস্পষ্ট ও সুখবোধ্য। শ্রুতিকটু এবং যুক্তাক্ষরকে যথাসম্ভব বাদ দিতে হইবে। পূর্বপুরুষের নামের অক্ষরের ধ্বনিসাদৃশ্য, আদিতে পিতার নামের আদ্যাক্ষরের প্রয়োগ প্রভৃতিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পিতার উপাস্য দেবতার নামের সহিত সম্বন্ধ নাম রাখা বিশেষ কল্যাণপ্রদ। পিতামাতাও তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

বৃদ্ধ অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল—'নারায়ণ'। আসন্নমৃত্যু পুত্রস্নেহাতুর বৃদ্ধ ধীরে ধীরে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন। সেই নামগ্রহণেই তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপাখ্যান ভক্তদিগকে অতিমাত্রায় আকর্ষণ করে। প্রাচীনপন্থিগণ এখনও নারায়ণ, হরিচরণ, কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদ, শিবশঙ্কর, শিবপ্রসাদ, কালিকাপ্রসাদ, তারাপদ, দুর্গাচরণ, শঙ্করী, ভবানী, কমলা প্রভৃতি নামকেই বেশী পছন্দ করেন। এই সকল নামকে তাঁহারা গাম্ভীর্যদ্যোতক বলিয়াও মনে করেন। পুত্রকন্যার নাম রাখিবার সময় তাঁহাদের এই মনোভাব প্রকাশ পায়। দেবদেবীতে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহাদেরও অনেকে অরূপ, অমিত, অসীম, নিরঞ্জন, বিভু প্রভৃতি ব্রহ্মবাচক নামকেই পছন্দ করেন।

পিতার এবং পূর্বপুরুষের নামের ধ্বনি-সাদৃশ্য বাঙালীর নামে প্রায়ই লক্ষিত হয়। অন্যান্য দেশে নামের সহিতই কোথাও পিতার নাম এবং কোথাও বা বাসস্থানের নামও জুড়িয়া দেওয়া হয়। যেমন—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ্ ইত্যাদি। বাঙালীর নামে এই সকল বাহুল্য নাই এবং সম্ভবত বাঙালী হিন্দুর নামই সর্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর, সংস্কৃত, সংস্কৃতভব বা সংস্কৃতগন্ধী।

মেয়েদের নাম ঈকারান্ত বা আকারান্ত হইবে—ধর্মশাস্ত্রের এই নিয়ম প্রায় অব্যাহতই আছে। অজ্ঞতাবশত এবং নূতনত্বের তাগিদে সবিতা, অণিমা প্রভৃতি নামও মেয়েদের মধ্যে চলিতেছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, নামের আদিতে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে যথাসম্ভব বর্জন করিতে পারিলেই ভাল হয়। এই বিষয়ে সকল গৃহ্যসূত্রকার ও সংহিতাকার ঋষিগণের অভিমত একরূপ নহে। শ্রুতিমধুর ও বিস্পষ্টার্থ নাম রাখিতে হইবে—এই কথা সকলেই বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণশিশুর দুইটি নাম রাখিবার বিধান। ক্রিয়াকাণ্ডে নাম উল্লেখের নিমিত্ত একটি নামকে গোপন করিতে হয়, আর একটি নাম প্রকাশ্য বা ব্যবহারিক। এই রীতি এখনও অনেক বাঙালী পরিবারে অনুসৃত হইতেছে। দ্রাহ্যায়ণগৃহ্যসূত্রের রুদ্রস্কন্দ বৃত্তিতে বলা হইয়াছে যে, একটি নামকে গোপন করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। গুপ্ত নামটি জানিতে না পারিলে সেই ব্যক্তির অনিষ্ট-সাধনের নিমিত্ত কেহ অভিচারাদি কর্ম করিতে পারিবে না। তুক্‌তাক্ বা তন্ত্র-মন্ত্রাদি প্রক্রিয়ার অনিষ্টকারিতার ভয় এক-শ্রেণীর লোকের কাছে বিশেষত গ্রামাঞ্চলের প্রাচীন মহিলাদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান। রুদ্রস্কন্দবৃত্তির এই সিদ্ধান্তে সায় দেওয়া যায় না। অভিমতটি যুক্তিসহ বলিয়াও মনে করিতে পারি না। যদি ক্রিয়াকলাপের সময় প্রত্যেকেরই এক একটি গুপ্ত নাম ব্যবহৃত হয়, তবে পরবর্তী বংশধরগণ কি উপায়ে পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধাদি কর্ম করিবেন। শ্রাদ্ধ তর্পণাদিতে তো পূর্বপুরুষের নাম উল্লেখ করিতে হয়। পিতৃকুল ও মাতামহকুলের তিনপুরুষের পুরুষ ও মহিলাগণের গুপ্ত নাম জানা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না তাহাতে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর্ম পণ্ড হইয়া যাইবে।

পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে জননী জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম মুখে আনেন না। অপর একটি সুবোধ্য স্বল্পাক্ষর আদরের নাম ধরিয়া ডাকেন। ফলে প্রায় সকল সন্তানেরই এক একটি আদরের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। সন্তানের নামে পূর্বপুরুষের নামের ধ্বনিসাদৃশ্য থাকিলেও জননী তাহা উচ্চারণ করেন না। শ্বশুরাদি গুরুজনের নাম উচ্চারণ করা প্রাচীনাগণ অবৈধ বলিয়া মনে করেন। পোষাকী নাম ছাড়াও ছোট একটি আদরের নাম রাখার ব্যবহার বাঙালী সমাজে বহুল প্রচলিত। একই শিশুকে পরিবারস্থ বিভিন্ন ব্যক্তি আদর করিয়া একাধিক নামে ডাকেন, এরূপ উদাহরণও
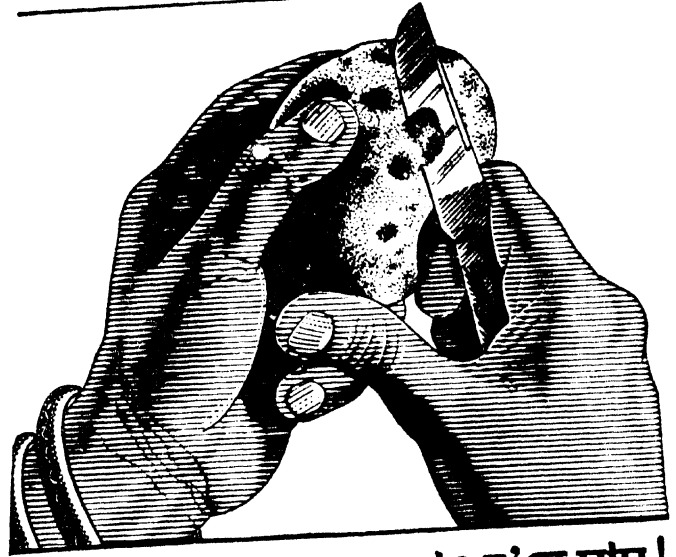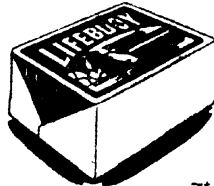
দের দেশে দুর্লভ নহে। খোকা, ননী, ়, খুকু, খুকী প্রভৃতি নাম তো প্রত্যেক ঘরেই আছে। শিব, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী য দেবতাগণের শতনাম সহস্রনাম স্তোত্র তও বোধহয় ভক্তগণেরই আদর ও ভক্তির কার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মানবগৃহ্যসূত্রে তে পাই, সাক্ষাৎভাবে দেবতাবাচক নাম তে নাই। নারায়ণ, হরি, শঙ্কর, কমলা ত নাম রাখা উচিত নহে, কিন্তু বাচক শব্দের সহিত চরণ, প্রসাদ, দাসী প্রভৃতি শব্দযোগ করিয়া নাম যাইতে পারে। যেমন—নারায়ণদাস, চরণ, শঙ্করপ্রসাদ, কমলাদাসী প্রভৃতি। নিয়ম কখনও সমাজে আদৃত হইয়াছে য় মনে হয় না। অজামিলের উপাখ্যানের তও এই নিয়মের বিরোধ হইতেছে।

জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে রাশি অনুসারে র আদ্য অক্ষর স্থির করিতে হয়। রীতিও অনেকে মানিয়া চলেন। তাঁহারা শ্রিত নামই রাখেন।

শশুর রূপ এবং গুণের সহিত নামের টি সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে—ইহা কখনও ভবপর নহে। কারণ এরূপ শৈশবে র কোন কথাই উঠিতে পারে না, আর শন না হইলেও কোন পিতামাতাই দের সন্তানকে অসুন্দর বলিয়া মনে ন না। পিতামাতার চোখেই সুন্দর। র্যেন্দ্র দাশগুপ্ত একটি শিশুপাঠ্য তায় লিখিয়াছেন—

ছেলেটির চোখ কানা তার পদ্মলোচন নাম,
ভ মেগে খায় দোরে দোরে
রঘুর ব্যাটা রাজারাম।
গৌরাঙ্গীর বর্ণ কালো কালীকৃষ্ণের ধব্‌ধবে
গাক কাঁদে ছেলের শোকে
মরুল অমর শৈশবে॥ ইত্যাদি।

প্রাচীন মহিলাগণের কতকগুলি সংস্কার তেও বাঙালী ছেলেমেয়েরা অনেকগুলি পাইয়াছে। উপযুক্ত বয়স পার হইয়া দীর্ঘকাল পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিতা লা 'তারকেশ্বরে ধরণা দিয়া মহাদেবের দে পুত্রবতী হইলে পুত্রের নাম রাখেন তারকেশ্বর, তারকনাথ ইত্যাদি। কুল-বৃক্ষস্থিত গ্রাম্য দেবতা পঞ্চানন বা পেঁচো ঠাকুরের প্রসাদে সন্তানবতী জননী পুত্রের নাম রাখেন—পঞ্চানন, পাঁচু, পেঁচো ইত্যাদি এবং কন্যার নাম রাখেন—পাঁচী। মৃতবৎসা জননী উপর্যুপরি কয়েকটি শিশুর মৃত্যুর পরে পুনরায় পুত্রবতী হইলে সদ্যোজাত শিশুকে সূতিকাগারে ধাত্রী বা অপর কোন মহিলার হাতে দান করিয়া পুনরায় এক, তিন, পাঁচ বা সাতটি কড়া দিয়া খরিদ করেন। মূল্যের কড়ার সংখ্যা অনুসারে পুত্রটি এককড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাত-কড়ি বা নয়কড়ি নামে পরিচিত হইয়া থাকে। বাঙলার বাহিরে বিহারেও এই রীতি দেখিয়াছি। বৈদ্যনাথধামের একজন পাণ্ডা তিনকড়ি বাবুলাল ঠাকুরকে প্রশ্ন করিয়াও এই কথাই শুনিয়াছিলাম। গ্রামের অপদেবতা হাজরার স্থানে মানত করার পরে পুত্র জন্মিলে হাজরা এবং কন্যা জন্মিলে হাজী নাম রাখা হয়। ক্রমাগত তিন চারিটি কন্যা সন্তানের মুখদর্শনের পর পুনরায় কন্যার আগমনে কন্যাদায়ভীত পিতামাতা ক্ষান্ত-মণি, থাকমণি, আন্নাকালী (আর-না-কালী) প্রভৃতি নামও রাখিয়া থাকেন। পুনঃ পুনঃ শিশুমৃত্যুতে নিরানন্দ দম্পতি নবকুমার লাভ করিলে লোহারাম, হেলারাম প্রভৃতি নামও রাখিয়া থাকেন। এই সকল প্রথা বঙ্গ-দেশের বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলেই বিশেষরূপে চোখে পড়ে।

মনুসংহিতাতে দেখি, ব্রাহ্মণসন্তানের নাম হইবে মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনসংযুক্ত এবং শূদ্রের হইবে দীনতাসূচক। ব্রাহ্মণের নামের অন্তে শর্মা শব্দ, ক্ষত্রিয়ে নামের অন্তে বর্মা শব্দ, বৈশ্যের নামের অন্তে ভূতিগুপ্ত ইত্যাদি এবং শূদ্রের নামের অন্তে দাস শব্দ যোগ করিতে হইবে। যমসংহিতাতেও এই কথাই বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে একটি বচন আছে—

'দেবপূর্বং নরাখ্যং হি শর্মবর্মাদিসংযুতম্।'

বাঙালী প্রবীণ স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য এই বচনের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের নামের শেষে 'দেব-শর্মা' শব্দ থাকিবে। কোন কোন প্রখ্যাত গ্রন্থকার এই মতের খণ্ডনও করিয়াছেন। খণ্ডনকারীদের মধ্যে গোভিলগৃহ্যসূত্রের ভাষ্যকার স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিচারশৈলী ও লিপিচাতুর্য অতুলনীয়। এই পক্ষের সিদ্ধান্ত হইতেছে—ব্রাহ্মণের নামের শেষে শুধু 'শর্মা' শব্দই থাকিবে। পরন্তু মূল নামটি হইবে দেববাচক শব্দের দ্বারা গঠিত।

জীবিত ব্যক্তির নামের আদিতে শ্রী শব্দ যোগ করা চাই,—ইহাও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। বর্তমানে এই নিয়মও শিথিল হইতে চলিয়াছে। অনেক খ্যাতনামা মনীষীও এই রীতির প্রতিকূলতা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

দ্বিজকন্যাদের নামের শেষে 'দেবী' শব্দ এবং শূদ্রকন্যাদের নামের শেষে 'দাসী' শব্দ যুক্ত হইবে—ইহাও শাস্ত্রীয় নিয়ম। এই নিয়মও আজকাল তেমন আদৃত হয় না। 'দাসী' শব্দের প্রয়োগ ক্কচিৎ চোখে পড়ে। 'দেবী' শব্দের ব্যবহারই বেশী। বর্তমানে অনূঢ়া কুমারীগণ পিতার বংশগত উপাধি এবং বিবাহিতা মহিলাগণ পতিকুলের উপাধিই যেন বেশী পছন্দ করেন। অবিবাহিতা অনেক মহিলা নামের পূর্বে-কুমারীশব্দও প্রয়োগ করিতেছেন। প্রাচীন কালে এরূপ ব্যবহার সম্ভবত ছিল না।

প্রাচীনা বিধবাগণ দেবী' শব্দের স্থলে 'দেব্যাঃ' এবং দাসী শব্দের স্থলে 'দাস্যাঃ' এই ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত সংস্কৃতপদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সম্ভবত স্বামীর অবর্তমানে বিষয়সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া নামসহি করিতে এরূপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই প্রকার ব্যবহারই চলিতেছে।

শিশুর নামকরণের দিন হইতে এক বৎসর কাল জনকজননী মাংস ভোজন করিবেন না —এই উপদেশটি বারাহগৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়। বাঙালী সমাজে কোথাও এই নিয়মের প্রচলন নাই।

পুস্তক পরিচয়

আমার কালের কথা : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স; ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৷৷০।

যুগমাত্রেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। সে বৈশিষ্ট্যের যেটুকু অংশ রাজনৈতিক তাৎপর্য লাভে সমর্থ হয়, ইতিহাসগ্রন্থ-প্রণেতার শুধু সেটুকু নিয়েই কারবার; তার বাইরে তিনি বড়ো একটা পা বাড়াতে চান না। জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে এতাবৎকাল যে সমস্ত গ্রন্থাদি আমরা পাঠ করে এসেছি, তাতে করে অন্তত এই কথাটাই প্রমাণিত হবে।

অথচ ইতিহাস বলতে শুধু মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান পতনের কথাই বোঝায় না। আরো যা কিছু বোঝায়, ঐতিহাসিকের মুখে প্রায়শই তা অনুক্ত থেকে যায়। উচ্চারিত হয় অন্যত্র। সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে।

বাঙলাদেশের বিগত অর্ধশতাব্দীকালীন সর্বাঙ্গীন ইতিহাসের মর্মরূপও তার সাহিত্য-শিল্প-সংগীতের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। বাঙলা-দেশের যাঁরা সার্থক সাহিত্যিক, দেশের সত্যিকারের ইতিহাস—অর্থাৎ তার সমাজ সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারাটিকে তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্মের দর্পণে প্রতিবিম্বিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন। বস্তুত তাঁর রচিত গল্প উপন্যাস পাঠের পর এই কথাটাই সর্বাগ্রে মনে হয় যে, সাহিত্যিকের ওপরেও ইতিহাস রচনার যে অলিখিত দায়িত্ব রয়েছে সে দায়িত্ব পালনে কখনোই তাঁর নিষ্ঠার অভাব হয়নি।

প্রশ্ন ওঠে, গল্প-উপন্যাসের মারফতেই যদি তিনি সে দায়িত্ব পালন করে থাকবেন তাহলে আবার পৃথকভাবে তাঁর এই গ্রন্থ রচনা করবার বিশেষ কোনও তাৎপর্য আছে কিনা। অবশ্যই আছে। আছে এই কারণে যে 'আমার কালের কথা' কালের কথাও বটে, তাঁর নিজের কথাও বটে। গল্প-উপন্যাস রচনার সময়ে লেখককে খানিকটা পরিমাণে হলেও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি-ভঙ্গী অবলম্বন করতেই হয়; অন্যথায় সৃষ্ট চরিত্রের ওপর লেখকের নিজস্ব চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য আরোপিত হবার আশংকা থাকে। বর্তমান গ্রন্থে তাঁকে সে অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। যে যুগের কথা তিনি এখানে লিখেছেন, অন্য কারুর চোখ দিয়ে তা তাঁর দেখবার কিংবা দেখাবার প্রয়োজন হয়নি। তিনি নিজে যেমনটি দেখেছেন, লিখেছেন। এবং আমাদের দেখিয়েছেন। এই ত্রিবিধ দায়িত্ব, দেখা, লেখা এবং দেখানোর মধ্য দিয়ে পাঠকের সংগে এমনই একটি মমতাপূর্ণ নিকট সম্পর্ক তিনি স্থাপন করতে পেরেছেন যা প্রায় অভূতপূর্ব বললেও চলে।

গ্রন্থের নামকরণে কালকেই যদিচ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তবু শুধুমাত্র কালের নিজস্ব কোনও তাৎপর্য নেই, তাই—দেশ এবং পাত্রও এখানে সমপরিমাণ গুরুত্ব নিয়েই উপস্থিত। বর্তমান শতকের যখন শৈশবাবস্থা, তখনকার সেই ঢিলেঢালা বাঙলাদেশ, দেশের সর্বস্তরের মানুষ এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা-কামনা, সহজ বিশ্বাস এবং মূল্য বোধের কখনো-আকস্মিক কখনো ধীরশান্ত পরিবর্তন—একটি মাত্র গ্রামের নির্দিষ্ট পরিধি গোলকে তা যতোখানি প্রতিভাত হয়েছিল—লেখক শুধু তাকেই তাঁর গ্রন্থের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অথচ তাকেই যে তিনি তখনকার কালের জীবনযাত্রার দর্পণ হিসেবে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন, এতেই তাঁর ক্ষমতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দু চারটি কাহিনীর অবতারণা করে বক্তব্য বিষয়টিকে তিনি আরো মনোরম করে তুলেছেন এবং সমগ্র গ্রন্থখানিই তাতে একটি নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শ লাভ করেছে, বর্তমান সময়ে যা প্রায় দুর্লভ।

এ যুগের সাহিত্যিকরা তারাশংকরের ক থেকে একটি বিষয়ে অন্তত শিক্ষালাভ কর পারেন। তা হলো তাঁর সত্য কথনের সংসাহ 'আমার কালের কথা'য় সর্বত্র তিনি যে স নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, লেখক হিসে শুধু নয়, মানুষ হিসেবেও তাতে তি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করবেন। ১১৪।

স্বয়ং সিদ্ধা, দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীমণিলাল বন্দ্যো পাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড স কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৪৷৷

সাহিত্য পদবাচ্য উপন্যাস হিসাবে যত হোক 'স্বয়ং সিদ্ধার' (প্রথম খণ্ড) সিনে খ্যাতিই দ্বিতীয় খণ্ড রচনার একম প্ররোচনা। আর প্রকৃত প্রস্তাবে আলো পুস্তকের কাহিনী বিন্যাস করা হয়ে সিনেমার দিকে লক্ষ্য করেই। অতঃপ কাহিনীটি যদি কোন উৎসাহী সিনে ডাইরেক্টরের নজরে পড়ে তা হ'লে বোধ ক লেখকের শ্রম সার্থক হয়, সাহিত্যের সম্প বৃদ্ধি হোক বা না হোক।

...তু গবা পাগলাকে চতুর এবং পণ্ডিত ...পর স্ত্রী চণ্ডী দেবী আর কি আলৌকিক ... সাধন করতে পারেন আমরা ভেবে ...। আর এই জন্যেই মনে হয়, দ্বিতীয় ... কাহিনী চর্বিত চর্বণে পর্যবসিত। না ...ীর নূতনত্বে, না বিন্যাসে, না ভাষা বা সম্পদে আলোচ্য উপন্যাসটি সার্থক। ... বিষয় বলে এর কোন বালাই নেই। ...রে অযথা আবোল-তাবোল বকুনি এবং ... অবাস্তব ঘটনার সমাবেশ মূলে ...ীটিকে শিথিল এবং দুর্বল করে ...। 'চণ্ডী মাহাত্ম্য' একেবারে ধূলিসাৎ গেছে। মহিয়সী নারীর মোহিনী ... পরিণতি সত্যই মর্মান্তিক!

...শেষে 'পরিস্থিতি' এবং 'পরিপ্রেক্ষিত' দুটি লেখকের বিশেষ মুদ্রাদোষের মত ... ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক তৃতীয় খণ্ড ... প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের ... তাঁর সে চেষ্টা না করে অন্য কোন ... মন দেওয়াই সমীচীন। ছাপা ও ... এক রকম। ১২১।৫১

...মদ্‌গীতার্থ সংগ্রহ—শ্রীমৎ যামুন মুনি ... অন্বয় মুখে ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য টীকা ... শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস সম্পাদিত। ...স্থান—শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজী মন্দির, ... ২৪ পরগণা কিংবা আশুতোষ ..., ৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, ...। মূল্য এক টাকা।

... যামুনাচার্য ভারতের সর্বত্র বৈষ্ণব ... সুপরিচিত। বৈষ্ণব বৈদান্তিকাচার্য ... বেদান্তকার রামানুজ ইঁহার শিষ্য ... প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীমৎ যামুনাচার্য ... শ্লোকে সূত্রাকারে সমগ্র গীতার ... সন্নিবিষ্ট করেন। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ... পরে সূত্রাকারে গ্রথিত ... গীতার্থ সংগ্রহের টীকা করিয়া-...। আলোচ্য গ্রন্থখানাতে গীতার্থ ...র মূল এবং তৎসহ বৈদান্তদেশিক ... টীকার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ... এই সূত্রে এবং ভাষ্যে শ্রীল রামানুজের ...কতার আলোক রহিয়াছে এবং ইহাতে ... পরাভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ... উপদেশের পারম্পর্য সুস্পষ্টভাবে ...র পক্ষে যামুনাচার্য প্রণীত এই সূত্র ... বিশেষভাবে সাহায্য করে। ... শাস্ত্রের আলোচনায় আগ্রহশীল সমাজে ... সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। ১৩১।৫১

ছোট বড় মাঝারি—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। ...ক : সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, ...ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৲।

এ দেশে ছোট গল্পের চাহিদা শুধু মাসিক-...র পাতা ভরানোর জন্য। স্বতন্ত্র গল্প-...র পাঠকের সংখ্যাও যেমন মুষ্টিমেয়, ...কের সংখ্যাও তেমন কম। আশার ... সত্ত্বেও মাঝে মাঝে কয়েকটি গল্প গ্রন্থ ...প্রকাশ করে এবং বাজারে আদৃতও হয়। স্বর্ণকমলবাবু প্রতিষ্ঠাবান লেখক। ...দিন আগে পর্যন্তও তাঁর গল্পে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আর দরদী মনের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। অধুনা রাজনৈতিক মতবাদের গরম মশলা সংযোগে তাঁর রচনা কি জাতীয় হয়ে উঠেছে এ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন কারণ আলোচ্য গল্প গ্রন্থ "ছোট বড় মাঝারি" তাঁর আট দশ বছর আগের লেখা গল্পের সমষ্টি।

আঙ্গিক ও রচনা সৌকর্যে প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই সুখপাঠ্য হয়েছে। দু একটি আঁচড়ে চরিত্র পরিস্ফুটনের প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু তবু মনে হয় লেখকের মন যেন নিস্পৃহ। নিজের সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি এই ঔদাসীন্য রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। দরদী মনের অভাবে দু একটি গল্প যেন কিছু পরিমাণে নিষ্প্রাণও।

ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। ১০০।৫১
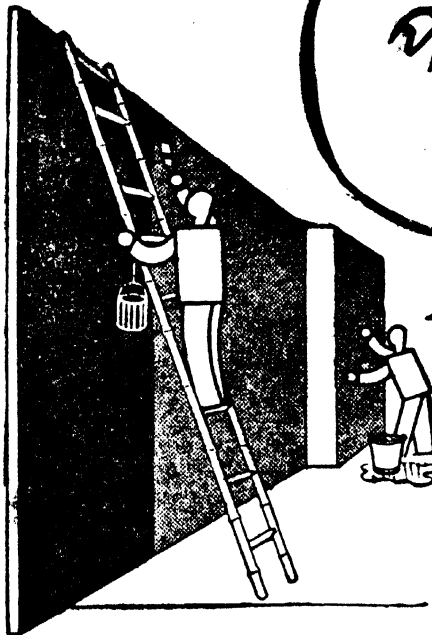
বিবেকানন্দ, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী বাঈ— শ্রীরেবতীকান্ত মৈত্র। প্রকাশক—শ্রীবিভূতি-কান্ত মৈত্র। ৫ এ, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা—২৬; দাম—যথাক্রমে চৌদ্দ আনা ও আট আনা।

'বিবেকানন্দ' স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত কিশোর নাটক। এই মহামানবের কুসুম-কোমল ও ইস্পাত কঠিন চরিত্র এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য অনন্যসাধারণ সাধনার নাটকীয় রূপ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এবং স্বল্প পরিসরের মধ্যে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর অপূর্ব দেশ-প্রেম দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ধমনীর শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ঋজু ও বলিষ্ঠ ভাষায় নাটকীয় ব্যাঞ্জনার মধ্যে সরলমতি বালক-বালিকার চিত্তে অতি সহজেই গভীর রেখাপাত করিবে সন্দেহ নাই।

আদর্শহীন—বিকৃত রুচী—চলচ্চিত্র প্লাবিত বাঙলাদেশে এই ধরণের মহৎ আদর্শ অনুপ্রাণিত শিশুনাট্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা সত্যি সত্যিই প্রশংসনীয়।

১২৭।৫১, ১২৫।৫১

কবি সার্বভৌম : মৈত্রেয়ী দেবী : প্রকাশক—শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ৯৩।১এ, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

রবীন্দ্রনাথের মতো মহামানবের আবির্ভাবে যে যুগ চিহ্নিত, আমাদের সৌভাগ্য, আমরাও সেই একই যুগে জন্মগ্রহণ করেছি। রবীন্দ্রনাথ আজ নেই, কিন্তু এমন কয়েকজন এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন—কবির নিকটতম সান্নিধ্য লাভের সুযোগ যাঁদের হয়েছিল। যাঁদের হয়েছিল শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী তাঁদের অন্যতম। এ কারণে তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থাদির সবিশেষ গুরুত্ব বর্তমান।

আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং জীবনবোধকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছেন। যে কটি প্রবন্ধ এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্ন-ভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তা পঠিত হয়েছিল। ফলে পারম্পর্যের কিছুটা অভাব ঘটেছে সত্য। তবে আলাদাভাবে দেখতে গেলে প্রবন্ধগুলির স্বকীয় মূল্য তাতে কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। আলোচনার ভঙ্গীটি ঘরোয়া, অন্তরঙ্গ।

৯৪।৫১

বেদস্তুতিঃ—শ্রীবিহারীলাল সরকার (ভূতপূর্ব ডিস্ট্রীক্ট ও সেসন জজ) কর্তৃক অনুবাদিত। বসুমতী সাহিত্য মন্দির,১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধের সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের নাম বেদস্তুতিঃ। ইহাকে শ্রুত্যধ্যায়ও বলা হইয়া থাকে। এই অধ্যায়ে উপনিষদের সারতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি শাস্ত্র। বেদস্তুতিতে সাক্ষাৎ বেদান্তসূত্রের ভাষ্যও বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকার এই মূল সহ শ্রীধর স্বামীর টীকার অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধর স্বামীর টীকাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছেন। আচার্য শ্রীধর ভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলাকে ভিত্তি করিয়া বেদান্তার্থের বিস্তার করিয়াছেন এবং শ্রবণ, মনন, স্মরণাদি বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়াছেন। আচার্য শ্রীধর মায়াবাদের নিরসন করিয়াছেন। তাহার পথ ভগবৎ কৃপা এবং শরণাগতির পথ। ভগবান্ নির্গুণ হইয়াও সগুণ। প্রকৃতপক্ষে নির্গুণতা তাঁহার স্বরূপের একটা দিক মাত্র। বস্তুত বেদস্তুতির মূলকে অনুসরণ করিতে হইলে অন্যভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিবার উপায়ও নাই। বস্তুত শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা মোটামুটিভাবে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ধর্ম সম্প্রদায়েরই সম্মত। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থসমূহে বেদস্তুতিঃ বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আচার্যগণ এই অধ্যায়ের কতকগুলি শ্লোক ভগবৎ-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু স্বামীবাদের টীকা সাধারণের পক্ষে কিছু দুরূহ। গ্রন্থকার তাঁহার অনুবাদে টীকার দার্শনিক পরিভাষাগুলিকে ভাঙিগয়া মূলের তাৎ[পর্য] উপলব্ধির পথ সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সু[গম] করিয়াছেন। অধ্যাত্মতত্ত্ব-পিপাসু ব্যক্তিগণ গ্রন্থ পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

রানী সংকট

বৃটিশ ও ইরাণী উভয় পক্ষের ব্যবহার ও দাবীর মধ্যেই খানিকটা ভাঁওতা মিশানো আছে। মুস্কিল হচ্ছে এই যে কোনো পক্ষই পরপক্ষের ভাঁওতার সঠিক পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারছে না। ফলে ইংগ-ইরাণী সংকটের চেহারা ক্রমশই বিকট আকার ধারণ করছে যাতে পৃথিবীশুদ্ধ লোকের মনে হচ্ছে এই বুঝি একটা সরকারী কাটা-কাটি লেগে যায়। তবে শেষপর্যন্ত এই সংকটের তেমন রোমাঞ্চকর পরিসমাপ্তি না ঘটার সম্ভাবনা এখনও বেশি, যদিও বাইরের লক্ষণগুলি দেখলে অন্যরকম মনে হতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত শেষ সংবাদ হচ্ছে এই যে, এ্যাংলো-ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানীর প্রতিনিধি ও ইরাণ গভর্নমেন্টের মধ্যে তেহেরাণে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল ইরাণ সরকার সেটা ভেঙে দিয়েছেন। প্রাথমিক সর্ত হিসাবে ইরাণ সরকার চেয়েছিলেন যে, গত ২০এ মার্চ থেকে অর্থাৎ যেদিন থেকে ইরাণের তৈল জাতীয়করণের আইন পাশ হয়েছে সেদিন থেকে হিসাব করে কোম্পানীর যত টাকা আমদানী হয়েছে তার চার ভাগের তিনভাগ ইরাণ গভর্নমেন্টকে এখনি দিয়ে দিতে হবে। বাকী এক চতুর্থাংশ কোম্পানীর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে জমা থাকবে। ইরাণ গভর্নমেন্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই দাবী 'ভূতপূর্ব' কোম্পানীকে অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। সঙ্গে ইরাণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অস্থায়ী বোর্ডের নিকট কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য কোম্পানীর ম্যানেজারকেও তাগিদ দেওয়া হয়েছিল। পূর্বোক্ত টাকার দাবী না মেটালে ইরাণ সরকার কোম্পানীর কলকারখানা জবরদখল করে নিতে অগ্রসর হবেন, ইরাণ সরকারের প্রতিনিধিদের মুখে একথাও শুনা গিয়েছে।

এ্যাংলো ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানীর যে প্রতিনিধিরা আলোচনার জন্য লণ্ডন থেকে তেহেরাণে এসেছেন তাঁরা ইরাণ সরকারের উক্ত দাবী সম্পর্কে সরাসরি কোন উত্তর

না দিয়ে লণ্ডনে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলেন। লণ্ডন থেকে যে উত্তর এসেছে তাতে ইরাণ সরকার সন্তুষ্ট হননি এবং এ্যাংলো-ইরাণিয়ান প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা ভেংগে দিয়েছেন। অবস্থাটা শুনতে খুবই ভয়াবহ সন্দেহ নেই, কারণ এর পর ইরাণ সরকার যদি তাঁদের পূর্ব-প্রকাশিত ইচ্ছা অনুযায়ী আবাদানের কারখানাগুলি জবরদখল করতে অগ্রসর হন তবে তার পরিণাম যে কী হবে তা বলা কঠিন। ইরাণীরা উপস্থিত হলেই ইংরেজরা তাদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে শুড়শুড় করে চলে আসবে এটা সম্ভব নয়। ইরাণ চীন নয়, ডক্টর মোসাদেকও মাও সি-তুঙ নন। আবাদানের কারখানার ওপরে ইরাণী পতাকা উঠেছে, তাতে ইংরেজরা বাধা দেয়নি—ইরাণী জাতীয়তার 'মান' রাখতে হবে, ইংরেজরা এটা বুঝেছে কিন্তু তাই বলে এতবড় একটা 'বিষয়' তাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে তারা সহজে রাজী হবে না। সুতরাং একদিকে যেমন আলোচনার দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা চলেছে অন্যদিকে বৃটিশ "স্বার্থ" রক্ষার জন্য প্রস্তুতিও অবশ্য চলেছে।

ইরাণ সরকার কর্তৃক আলোচনা ভেংগে দেবার পরেই ইরাণস্থ বৃটিশ রাজদূত শাহ'এর সংগে সাক্ষাৎ করেছেন। মার্কিন দূতও শাহ'এর সংগে সাক্ষাৎ করবেন বলে সংবাদ এসেছে। অর্থাৎ বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ইরাণ সরকার গোয়ার্তুমি করে একটা কিছু করে বসলে তার ফল ভালো হবে না। ইরাণ সরকারকে যদি এখন অনেকটা নিজে আপোষ করতে হয় তবে ইরাণের জন-সাধারণের মনে এই ধারণাই হবে যে, আবার একবার বিদেশী শক্তির চাপে ইরাণকে তার ন্যায্য স্বার্থ বলি দিতে হোল। এর দ্বারা ভিতরে ভিতরে ইংগ-মার্কিণের প্রতি ইরাণের মনোভাব ভালো হবে না, বরঞ্চ খারাপই হবে, যদিও অতঃপর আমেরিকা থেকে ইরাণে কিছু ঋণের টাকাও আসবে। এ ব্যাপারে রাশিয়া বেশ ভালো মানুষটি সেজে বসে আছে, সে বাহ্যত ইরাণীদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো উস্কানী দিচ্ছে না। ইরাণে এখনি ইংগ-মার্কিনের সংগে একটা সাক্ষাৎ সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে রাশিয়া চায় না। ইরাণ সরকার ইংগ-মার্কিনের সংগে ঝগড়া করে রাশিয়ার কোলে গিয়ে আশ্রয় নেবে—এরূপ আশাও রাশিয়া করতে পারে না। কিন্তু বর্তমান অবস্থার ফল রাশিয়ার অনুকূলে যেটুকু হওয়া সম্ভব সেটুকু হচ্ছে। অর্থাৎ ইরাণবাসীদের মনে ইংগ-মার্কিনের প্রতি অসন্তোষের ভাব বাড়ছে। রাশিয়ার পক্ষে সেইটাই লাভ। আরো মজা এই যে, রাশিয়া যত বেশী ভালোমানুষীর ভাব দেখাচ্ছে তার লাভটা হচ্ছে তত বেশি।

ফ্রান্সের নির্বাচন ফল

প্রধানত কম্যুনিস্টদের ঠেকাবার জন্য যে অভিনব নির্বাচনী রীতি—এ্যালায়েন্স প্রথা উদ্ভাবিত হয়েছে গত সপ্তাহের 'বৈদেশিকী'তে তার উল্লেখ ছিল, ফ্রান্সের সাম্প্রতিক নির্বাচন এই রীতি অনুযায়ী হয়েছে। সমস্ত ফলাফল এখনো প্রকাশিত হয়নি, তবে বেশির ভাগ হয়েছে। তা থেকে দেখা যায় যে, কম্যুনিস্ট ভোটদাতার সংখ্যা না কমলেও উপরোক্ত এ্যালায়েন্স প্রথার ফলে গতবারের তুলনায় এবার পরিষদে কম্যুনিস্ট সদস্যের সংখ্যা কিছু কম হবে। তবে কম্যুনিস্টদের যতটা দাবিয়ে রাখা যাবে বলে অনেকে ভেবেছিল ততটা হয়নি। এ্যালায়েন্স প্রথার দ্বারা জেনারেল দ্য গলকেও অনেকটা দাবিয়ে রাখা যাবে আশা ছিল। সে আশাও মাত্র আংশিকভাবে পূর্ণ হয়েছে। ফলে মধ্যপন্থী পার্টিগুলির মিলিত মন্ত্রি-মণ্ডলী যে খুব মজবুত হবে তা মনে হয় না। মন্ত্রিমণ্ডলীকে পূর্বের চেয়েও দক্ষিণে হেলতে হবে এবং আত্মরক্ষার জন্য এমন অনেক সদস্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে যাদের দ্য গল-অনুগামীদের পর্যায়ে ফেলা চলে। মোটের উপর বলা যায় যে, এ্যালা-য়েন্স প্রথার আশ্রয় নিয়ে ফরাসী গণতন্ত্র-বাদের জাতও গেল, পেটও ভরল না।

২০।৬।৫১

আলোচনা

ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার

দেশ সম্পাদক সমীপেষু,

রাজশেখরবাবু ভাষার মুদ্রাদোষ সম্পর্কে আলোচনা করবার পর থেকে অনেকেই ভাষার মুদ্রাদোষের বিশেষ করে বাহুল্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ ক'রে আসছেন। তাঁদের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আমি মৃদু অনুযোগ জানাচ্ছি।

হয়তো কাজের তাগিদেই ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু মানুষের একান্ত সৌভাগ্য এই যে, তার ভাষাটা প্রয়োজনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকেনি। বহুধা তার প্রকাশ—মানুষ তার অপ্রয়োজনকে ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ ক'রে তাকে সুন্দর ক'রে তুলতে চেয়েছে। ভাষা যদি কেবল প্রয়োজনের দাবী মিটিয়েই শেষ হ'য়ে যেত, তাহলে মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি আজ যে স্তরে এসে পেঁৗচেছে, সেখানে আসতে পারত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আমার বক্তব্য হলো এই যে, ভাষার মধ্যে অত্যুক্তি থাকবেই। যেখানে একটা কথা বললে চলে যায়, সেখানে দুটো কথা বলবো—যদি মনের কথাকে আরও ভালো ক'রে প্রকাশ করছি দেখি। রচনার মধ্যে যেখানে নিতান্ত সাদা কথা বললেও চলে যায়, সেখানে অলঙ্করণকে প্রশ্রয় দিতে দ্বিধাবোধ করবো না। কেবল এটুকু দেখবো, যেন সেই অত্যুক্তি, সেই অলঙ্কার যেন বিশ মণ ভারী হ'য়ে উঠে ভাষাসুন্দরীকে পীড়িত না করে।

আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য—কবিগুরু কোথাও তাঁর ভাষাকে কাটছাঁট করেন নি। বসন্তের সমীর হিল্লোলে যেমন শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে, তাঁর প্রতিভার স্পর্শে আমাদের নিত্য ব্যবহারে জীর্ণ ভাষাটা অপূর্ব ঐশ্বর্যশালী হ'য়ে উঠেছে। তিনি কোথাও তাঁর লেখনীকে সংযত ক'রে ভাষাটাকে হাওয়াই চিঠির মত সীমাবদ্ধ করতে চাননি। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ করতে গিয়ে তাঁর ভাবের বিরাটত্ব আমাদের অন্তরকে আলোড়িত করে; কিন্তু তাঁর ভাষার সৌন্দর্য আমাদের মনে মুগ্ধ-বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

মুদ্রাদোষ যেখানে ভাষাকে পঙ্গু ক'রে তুলছে, সেখানে তাকে বর্জন করবো; কিন্তু বহুলতা যেখানে ভাষাকে সুন্দর ক'রে তুলছে, সেখানে তাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবো না। ইতি—বিনীত—শ্রীতারক ঘোষ, শ্রীরামপুর।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারা

মহাশয়,

গত ৩৩শ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় ডাঃ অরুণ-কুমার রায় চৌধুরী লিখিত "চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারা" প্রবন্ধটির প্রতিবাদে আমার কিছু বক্তব্য আছে। শ্রীযুত রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন, "পুরাতন আয়ুর্বেদ ও ইউনানী প্রভৃতি ঔষধাবলীর ভিতর প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যই বেশীর ভাগ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কখনও বা রৌদ্রে শুকাইয়া, দগ্ধ করিয়া বা অন্য কোন সাধারণ উপায়ে উহাদিগের দ্বারাই ঔষধ তৈয়ারী করা হইয়াছে। পশ্চিম দেশীয় ঔষধে লতা-পাতা, ফুল, ফলকে রাসায়নিক প্রথায় বিশ্লেষণ করিয়া, অপকারী অংশকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া ঔষধের গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে ও ইহাতে শারীরিক ক্ষতির হাত হইতে রোগী রক্ষা পাইয়াছে।"

রায় চৌধুরী মহাশয় কি বলিতে চান যে, আয়ুর্বেদীয় ঔষধসমূহ অরাসায়নিক প্রণালীতে প্রস্তুত হয় ও তাহা রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর? এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আয়ুর্বেদবেত্তা ঋষিগণ এক একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁহারা সহস্র সহস্র বৎসর গবেষণার দ্বারা আয়ুর্বেদের যে অপরিবর্তনীয় রূপ দিয়া গিয়াছেন, তাহা সাধারণ মানুষের বিচার-বিবেচনার বহির্ভূত।

চিকিৎসাতত্ত্বের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় ভারতবর্ষেই চিকিৎসা বিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। ভারতবাসীদের নিকট হইতে আরবীয়েরা, আরববাসীদের নিকট হইতে গ্রীকবাসিগণ এবং গ্রীকবাসীদের নিকট হইতে ইউরোপবাসিগণ এই বিদ্যা আয়ত্ত করেন। বর্তমানে রাজ সাহায্যের অভাবে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পাশ্চাত্য চিকিৎসার নিম্নদেশে পতিত হইলেও ইহার ভেষজকল্পনা পাশ্চাত্য চিকিৎসা অপেক্ষা সমুন্নত। আয়ুর্বেদের বস্তি চিকিৎসা ও সূচিকাভরণ চিকিৎসা (ইনজেকসেন্) তাহা চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থপাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে তাহা কত উন্নত ছিল।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা জগতে হার্ভি সাহেব ১৬২৮ খৃঃ অব্দে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রথম আবিষ্কার কর্তা কিন্তু আয়ুর্বেদ চিকিৎসা জগতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে মহর্ষি সুশ্রুত তাহা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসাজগতে নিত্য নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে কিন্তু তাহা নিত্য পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য—সত্যের কোন পরিবর্তন নাই। যাহার দিন দিন পরিবর্তন হয় তাহাই কি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান? আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী অবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—ইহাই আমার বক্তব্য। ইতি—বিনীত—শ্রীপরেশ সরকার, ঝরিয়া।

খেলাধুলায় প্রাদেশিকতা

মহাশয়,—আপনাদের ১৮ই জ্যৈষ্ঠের 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা বিভাগে অমর্ত্যকুমার সেন মহাশয়ের 'খেলাধুলায় প্রাদেশিকতা' পড়ে বিস্মিত হলাম। তিনি আগাগোড়াই বাইরের খেলোয়াড় কলকাতার মাঠে আমদানী করা সমর্থন করে গেছেন এবং তাতে যে বাঙালী তরুণ খেলোয়াড়দের কিছু ক্ষতি হচ্ছে তা তিনি মোটেই স্বীকার করেন নি। এই খেলোয়াড় আমদানীর বিষয়ে দেশ পত্রিকায় বহু দিন যাবৎ অনেক কিছুই প্রকাশিত হয়েছে। আরও নানা পত্রিকায় এই বিষয়ে একযোগে তীব্র প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে। কিন্তু I. F. A. কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করছেন না মোটেই। এ বছরেও অন্যান্য বারের ন্যায় পুনরায় খেলোয়াড় আমদানী তো হয়েছেই, উপরন্তু কলকাতার ফুটবল ইতি-হাসে এত অধিকসংখ্যক বাইরের খেলোয়াড় আসতে পূর্বে কখনও দেখা যায় নি।

অমর্ত্যকুমার সেন মহাশয় 'বাইরের খেলোয়াড়-দের জন্য বাঙালী খেলোয়াড় খেলা শেখার সুযোগ পান না' এ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেছেন। তাঁকে এখানে জানিয়ে রাখা ভাল যে, কলকাতার মাঠে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, রাজস্থান, মোহামেডান স্পোর্টিং প্রভৃতি দল কটি প্রায় সম্পূর্ণই অবাঙালী আমদানী করা খেলোয়াড় দ্বারা পরিপুষ্ট। তাছাড়া ডালহৌসী, ক্যালকাটা গ্যারিসন প্রভৃতি দলেও অধিকাংশই অবাঙালী খেলোয়াড়। সুতরাং প্রথম ডিভিসন ১৪টি দলের মধ্যে প্রায় অর্ধেক দলেই অবাঙালী আমদানী করা খেলোয়াড় খেলে থাকেন। এই সকল খেলোয়াড়ের পরি-বর্তে যদি বাঙালী তরুণ খেলোয়াড়রা ঐ সকল দলে স্থান পেতেন তাহলে কি তাঁদের ভিন্ন খেলা শেখার সুব্যবস্থা হত না? বাইরে থেকে যে সব খেলোয়াড় আসেন তাঁরা অধিকাংশই ভারতখ্যাত, অভিজ্ঞ, প্রবীণ। সুতরাং তাঁরা অনায়াসেই বাঙালী, তরুণ, অনভিজ্ঞ, উৎসাহী খেলোয়াড়দের স্থান দখল করতে পারেন। তাতে তরুণ বাঙালী খেলোয়াড়দের আর খেলার সুযোগ থাকে না। তাহলে এদিক থেকে দেখা যাবে, বাইরের খেলোয়াড় আমদানী যদি বন্ধ হয় তাহলে বহু বাঙালী, উৎসাহী, তরুণ খেলোয়াড় খেলা শেখার সুযোগ অনায়াসে পেতে পারেন।

লেখক এক জায়গায় বলেছেন, "প্রাদেশিক প্রদেশের খেলোয়াড়দের বাসনা কলকাতায় এসে নাম কিনবার" এবং তাঁর মতে তাঁদের এখানে আসতে না দিয়ে বাঙালী, তরুণ খেলোয়াড়-দের খেলা শেখার সুযোগ দেওয়া সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার পরিচয় দেওয়া। এখানে তাঁর কথায় উত্তর দিতে হলো যে, খেলাধুলা হল প্রাদেশিকতার অনেক ঊর্ধ্বে এমন কি জাতীয়তারও ঊর্ধ্বে", আশা করি খেলাধুলা ব্যক্তিগত স্বার্থেরও অনেক ঊর্ধ্বে। তাই বাইরের খেলোয়াড়দের কলকাতায় এসে নাম কিনবার বাসনা মোটেই বরদাস্ত করা যায় না।

বাইরের খেলোয়াড় আমদানী করা যদি বন্ধ না করা হয় তাহলে শীঘ্রই দেখতে পাবো বাংলার মাঠে অবাঙালী অভিজ্ঞ, প্রবীণ খেলোয়াড়দের পূর্ণ আধিপত্য। তখন উৎসাহী বাঙালী, তরুণ, শিক্ষার্থীগণদের তাঁদের খেলা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। খেলার কোন সুযোগ আর তাঁরা পাবেন না। বিনীত—শ্রীসুজিতকুমার রায়, শান্তিনিকেতন।

রঙ্গজগৎ

দুর্গেশনন্দিনী—(রূপায়ণ থিয়েটার্স—**ইন্দ্রপুরী**)—কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র; চিত্রনাট্য—অমর মল্লিক ও শচীন বসু মল্লিক; পরিচালনা—অমর মল্লিক; আলোকচিত্র—শৈলেন বসু; শব্দ যোজনা—গৌর দাস; সুর-যোজনা—অনিল বাগচী; শিল্প নির্দেশ—বটু সেন, ক্ষিতীশ সেন; ভূমিকায়—নীতিশ মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন, অমর মল্লিক, চন্দ্রাবতী, ভারতী, শ্যামলী, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ইস্ট এণ্ড ফিল্মসের পরিবেশনায় ছবিখানি ৭ই জুন রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে মুক্তিলাভ করেছে।

'হ্যামলেট' নিয়ে বিলেতের অনেকে কথা [illegible] এই বলে যে, ছবিখানিতে হ্যামলেটই [illegible] সেক্সপীয়র নেই। 'দুর্গেশনন্দিনী'র [illegible] দেখা যাচ্ছে যে, ছবিখানিতে [illegible] যদিও-বা আছেন বলে টের [illegible] যায়, কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী নেই। [illegible] বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করে [illegible] নিষ্ঠাতন্ত্রই হচ্ছে ছবিখানির [illegible] বিচ্যুতির কারণ। এরা বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাটাই সব কিছু বলে [illegible] নিয়েছেন কিংবা ধরে নিয়েছেন যে, [illegible] ভাষাকে যথাসম্ভব বহাল রেখে [illegible] পারলেই বঙ্কিমের রচনাকেও [illegible] করে যাওয়া যায়। তাই এরা [illegible] ক্ষেত্রে মূল রচনার দিকে যতোটা [illegible] রেখেছেন, বঙ্কিম-পরিকল্পিত চরিত্র [illegible] ঘটনার ভাববিন্যাসে ঠিক ততোটাই [illegible] প্রকাশ করে ফেলেছেন। বেমানান [illegible] কথার অংশ যেভাবে রেখে যাওয়া [illegible], মানানসই করে চরিত্রগুলিকে [illegible] ফুটিয়ে তোলা হয়নি।

কাহিনীটিকে বঙ্কিমচন্দ্র এক বিস্তৃত [illegible] ওপরে বিছিয়ে দিয়েছেন। [illegible] আর পাঠানের জাঁকজমক সারাটা [illegible] ছেয়ে রেখেছে। কাহিনীর পাত্র এবং [illegible] কেউই সাধারণ ঘরের নয়; [illegible] কোন-না-কোন রাজ-পরিবারভুক্ত। [illegible] সর্বত্রই রাজপ্রাসাদ, দুর্গ আর [illegible] মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই লোককে [illegible] আগাগোড়া ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে [illegible] একটা বিরাট জমকালো পরিবেশের [illegible] নিয়ে ফেলে স্তম্ভিত করে দেওয়ার সুযোগ ছিল। ছবির নির্মাতা এদিকটায় নজর দিয়েছিলেন এবং একখানা প্রাদেশিক ছবির সীমাবদ্ধ ব্যয়-সামর্থ্যের কথা বিবেচনায় রেখে যতোখানি আড়ম্বর ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, তার অনেক কাছাকাছিই পৌঁচেছেন। বলা যেতে পারে যে, এখনকার রূপদীর্ণ বাঙলা ছবির বাজারে এ ছবিখানির খানিকটা রূপৈশ্বর্য বাঙলা ছবির প্রতি সবারের আকর্ষণ বাড়াতে সহায়তা করবে।

কিন্তু পটভূমিকার আড়ম্বরটাই ছবির প্রধান দিক নয়। তার ওপরে যারা বিচরণ করবে, সেই সব পাত্র-পাত্রীদের নাট্য-বৈভব এবং ঘটনাবলীর গতিবেগই হচ্ছে কাহিনীর আসল দিক, আর এই দিকেই ছবিখানির সাফল্য লোকের আশাকে দমিয়ে দেবে।

কাহিনীটি মূলত চরিত্রপ্রধান, কিন্তু চিত্রনাট্যে কেন্দ্র-চরিত্র নির্বাচনে প্রত্যয়ের অভাব দেখা যায়। নায়ক জগৎসিংহ থাকবে না ওসমান, নায়িকা থাকবে আয়েষা না বিমলা না তিলোত্তমা, এটা যেন ঠিক করে উঠতে পারা যায়নি। এক-এক ক্ষেত্রে এক-একজনের ওপরে দর্শকের ঝোঁক টেনে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যে চরিত্রের ওপরে কাহিনীর যবনিকা, তাকেই যদি প্রধানতম চরিত্র বলা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সে সৌভাগ্য আয়েষার, অর্থাৎ সেই হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'দুর্গেশনন্দিনী'। অথচ কাহিনীর প্রধান উৎস এবং সমস্ত ঘটনার মূল সূত্র হলো তিলোত্তমা। শিলাদিত্যের মন্দিরে তিলোত্তমা আর জগৎসিংহের দৃষ্টি বিনিময় মুহূর্তেই হচ্ছে কাহিনীর উন্মেষ। নিঃসঙ্গ জগৎসিংহ দারুণ ঝড়-জলের মধ্যে শিলাদিত্যের মন্দিরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলো। অন্ধকারের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে ভয়ার্ত নারীকণ্ঠ, তারপরই তিলোত্তমার সঙ্গে চোখাচোখি—মাত্র এক পলকের জন্যে, কিন্তু কি দারুণ ক্ষণ সেটা! সেই একবারের মাত্র দৃষ্টিতেই জগৎসিংহ তার আ-মৃত্যু সমস্ত ভালোবাসা অর্পণ করে দিলে—যে জগৎসিংহ হচ্ছে মোগল সেনাপতি মানসিংহের ছেলে, আদর্শ রাজপুত বীর, যে জগৎসিংহ পাঠান কতলু খাঁকে সায়েস্তা করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসে তিলোত্তমাকে পাওয়ার নেশায় ব্যাকুল হয়ে উঠলো—এতো গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় ঘটনাটাও যেনো আলতোভাবেই ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রকাণ্ডের এই শৈথিল্য পরে আর শক্ত বাঁধুনির মধ্যে এনে ফেলা যায়নি। ফলে পরবর্তী সমস্ত ঘটনাগুলিরই নাটকীয়তা যতোই তীব্র হোক, তা পুরামাত্রায় ফুটতে পারেনি, আভাসটুকুই কেবল সার।

জগৎসিংহ ধীর ও সম্মানিত বংশীয় হলেও তার সঙ্গে ক্ষণিকের পরিচয়ের পরই তার সঙ্গে তিলোত্তমার মিলন ঘটিয়ে দেবার জন্যে, মা হওয়া সত্ত্বেও বিমলাকে যেভাবে অতি তৎপরতার সঙ্গে ছলকৌশল অবলম্বন করতে দেওয়া হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে গেছে মেয়ের জন্যে দালালি করার মতো হয়ে। বিমলা শূদ্রাণী গর্ভজাতা বলে বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী বলে সাধারণ্যে পরিচয় দেবার অধিকার থেকে বঞ্চিতা ছিলো, কিন্তু তবুও সে নিজে জানতো সে রাজমহিষী এবং রাজকুমারীর মাতা। সেই বিমলাকে দিয়ে নিজের মেয়ে তিলোত্তমার সঙ্গে জগৎসিংহের যেভাবে মিলন ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এমন কোন নাটকীয় গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলা যায়নি, যাতে ব্যাপারটাকে সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে। ওদিকে তিলোত্তমার জন্যে জগৎসিংহকে এমনি বিচলিত দেখানো হয়েছে, যাতে সে তার কর্তব্যকেও অগ্রাহ্য করতে পেরেছে, কিন্তু তিলোত্তমার দিক থেকে ওদের প্রেমকে ঘোর করে তোলার মতো কোন সাড়া জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়নি। জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে চায়, আর এই চাওয়াকে ভিত্তি করেই গল্প, কিন্তু তিলোত্তমার কয়েকবার উদাসীন রূপ দেখিয়েই সেই চাওয়ার মধ্যে কোন নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। বরং উল্টোটাই ঘটেছে—তিলোত্তমাকে এমনি নিষ্প্রভ রাখা হয়েছে যে, তাকে নিয়ে যতো সব কাণ্ড ঘটানোই মনে হয় নেহাৎই অযৌক্তিক।

তেমনি—বিমলা ও জগৎসিংহের অসাবধানতার ফলে ওসমানের অধিনায়কত্বে

পাঠান সৈন্য বীরেন্দ্রকিশোরের দুর্গ অধিকার করার পর তাদের সংগে সংগ্রামে আহত জগৎসিংহকে শুশ্রূষা করতে গিয়ে আয়েষার প্রেমে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন স্পষ্ট সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। ওসমানকে কিছুতেই ভালোবাসবে না বলেই যেনো জগৎসিংহকে প্রাণেশ্বর করে নেওয়ার চেষ্টা। এখানেও জগৎসিংহ-তিলোত্তমার মতো একতরফা প্রেম।

আয়েষা ভালোবাসে জগৎসিংহকে, ওসমানের কাছে তা মৃত্যুর চেয়েও বড়ো আঘাত, তাই জগৎসিংহকে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে ওসমান পরাস্ত হলো, কিন্তু জগৎসিংহ তার প্রাণদান করলে এই কৃতজ্ঞতায় যে, ইতিপূর্বে যখন সে নিজে আহত হয়, তখন ওসমানই তার শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেয়। এমন রোমাঞ্চকর একটা অধ্যায়, কিন্তু এমনি নিস্তেজ বিন্যাস যে, রোমাঞ্চের আঁচও অনুভব করা যায় না এতটুকুও।

কতলু খাঁর আদেশে বীরেন্দ্রসিংহ নিহত হবার পর কাহিনীর ভার গিয়ে পড়ে বিমলা আর আয়েষার ওপর। জগৎসিংহ ও ওসমানকে যদিও-বা দেখা গিয়েছে, কিন্তু নেহাৎই গৌণ চরিত্ররূপে। পতি হত্যার প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যে বিমলার উদ্যোগ আর আয়েষার প্রেমাভিসার। তিলোত্তমা কেবল আয়েষার অভিসারের অববাহিকার কাজ করেছে। তারপর বিমলার হাতে কতলু খাঁ নিহত হবার পর আয়েষাই একমাত্র চরিত্র থাকছে, আর সবই তখন গৌণ। সুতরাং গোড়া থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, যার নামে কাহিনী, সেই তিলোত্তমাকে কাহিনী থেকে একরকম বাইরেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

ছবিখানির আরম্ভ বেগবান অশ্বের গতি আর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যার নাটকীয় আব-হাওয়ার চমক দিয়ে। কিন্তু তারপর গতিও পড়ে গিয়েছে, আর নাটকীয় পরিস্থিতিকেও জমিয়ে তোলা যায়নি বড় একটা। নাটকের রেশ পাওয়া যায় কেবল বীরেন্দ্রসিংহের বিচার থেকে হত্যা করা পর্যন্ত এবং তারপর বিমলা কর্তৃক কতলু খাঁকে ছুরিকাঘাত করার দৃশ্যে। আর সব ঘটনার ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবেশকে গুছিয়ে তোলার ব্যাপারে চিত্রনাট্যে ত্রুটি অবশ্য আছে, কিন্তু অভিনয়ের ব্যর্থতাটাও কম দায়ী নয়।

প্রযোজক অবশ্য নামকরা এবং বিশ্বাস-যোগ্য শিল্পীদেরই সম্মিলিত করেছেন। কিন্তু ওসমানের ভূমিকায় নীতীশ, আয়েষার ভূমিকায় ভারতী এবং বিমলার ভূমিকায় কুচুটে চন্দ্রাবতী ছাড়া আর কেউই চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতেও পারেন না। স্থান, কাল, ঘটনা ও পরিবেশ অনুসারে জগৎসিংহ একটি বেশ ওজনদার চরিত্র; কিন্তু প্রায় সকলেই তাকে এমনি হালকাভাবে রূপায়িত করেছেন, যাতে ঘটনার ওপরে কোন ছাপ সৃষ্টি হতে পারেনি। অভিনয়ের ব্যাপারে পরিচালক অমর মল্লিকের নিজের দোষটাই সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে। তিনি সেজেছেন মানসিংহ। কাহিনীতে মানসিংহের উপস্থিতি মাত্র কয়েকবার হলেও প্রতিবারই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে। কিন্তু রূপসজ্জায় এবং কিম্ভূত বেখাপ্পা বাচনভঙ্গীতে ও অঙ্গভঙ্গিতে চরিত্রটিকে প্রায় একটা ভাঁড়ের মতো করে তুলেছেন, ফলে তার আবির্ভাব সেই নাটকীয় গুরুত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিলোত্তমা এতোই নিষ্প্রভ যে, নায়িকা হওয়া তো দূরের কথা, ছবিতে তার অস্তিত্বটাকেও দাঁড় করিয়ে রাখার মতো সে যোগ্যতাই শ্রীমতী শ্যামলী প্রকাশ করতে পারেন নি। তার না পাওয়া গেল, ভঙ্গীর প্রকাশের ক্ষমতা আর না বলবার চলবার কোন নাটকীয় ভঙ্গী। ছবিখানি করুণ হয়ে ওঠার জন্যে তিলোত্তমা চরিত্রের অভিনয়-নিঃস্বতা বহুলাংশে দায়ী।

অজিত চট্টোপাধ্যায় রূপায়িত জগৎ-সিংহকে দেখে শৌর্যে, বীর্যে গরীয়ান রাজপুত বীর বলে মনে করা শক্ত। সেই তেজোদ্দীপ্ত পৌরুষের অভাব তার ওপরে কোন মোহ জাগিয়ে তোলে না। ছবি বিশ্বাসের কতলু খাঁর মধ্যে নেই বিশেষ কিছু, আর যাও-বা কিছু ছিলো, তিনি এমন ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারেন নি, যা নীতীশের ওসমান, কমল মিত্রের বীরেন্দ্র-সিংহ বা চন্দ্রাবতীর বিমলার সামনে চরিত্রটিকে দীপ্ত করে তুলতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, অভিনয়ের দিক থেকে ছবিখানির যাকিছু ইজ্জৎ রেখেছেন ওসমানের ভূমিকায় নীতীশ, আয়েষার ভূমিকায় ভারতী এবং বিমলার ভূমিকায় চন্দ্রাবতী।

দৃশ্যসজ্জা ও কলাকৌশলের দিক থেকে ছবিখানি প্রযোজকের সম্ভ্রম বাড়িয়ে দেবে। এছাড়া ছবির আর আকর্ষণ হচ্ছে এর সংগীতাংশ। ছবিখানি বসে দেখবার যোগ্যতা এই দিক থেকেই অর্জন করেছে।

রবীন্দ্র-সংগীত সম্মেলন

গত ১৫ই জুন থেকে ১৮ই জুন পর্যন্ত কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে রবীন্দ্র-সংগীত সম্মেলনের দ্বিতীয় ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন 'দক্ষিণী' সংগীত শিক্ষায়তন। রবীন্দ্র-সংগীতের বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন এবং শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী রবীন্দ্র-সংগীতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার যে চেষ্টা উদ্যোক্তারা করেছিলেন, তা কতকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তা নিঃসংশয়েই বলা যায়। আগামী সংখ্যায় এই সম্মেলন সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ

সংসদের আইন বলে বিশ্বভারতী একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সংসদ ও একটি কর্ম-সমিতি থাকবে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সমিতির সদস্যগণ সংসদ ও কর্ম-সমিতিতে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন। আশ্রমিক সঙ্ঘের আজীবন সদস্যগণ আগামী ১লা জুলাই থেকে বিশ্ব-ভারতীর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সমিতির সদস্য হবার অধিকারী হবেন। সুতরাং সঙ্ঘের সাধারণ সদস্যগণের পক্ষে অবিলম্বে ২০৲ চাঁদা দিয়ে আজীবন সদস্যভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় চাঁদা প্রেরিতব্যঃ— শ্রীসনাইলাল সরকার সেক্রেটারী, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ, ৬।৩, দ্বারিকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭।

পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা

(৪৫৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অপযশ রটিত হয়ে গেছে, মৃত্যু তো একরকম হয়েই গেছে। তবে আর কেন? শুধু ঘৃণার কাহিনী মাত্র হয়ে এ পৃথিবীতে পড়ে থাকবার আর কোন অর্থ হয় না। বিনা হৃদয়ের এই জীবনটাকে শুধু টেনে দেবার জন্যে আর ধরে রাখবার কোন প্রয়োজন নেই।

মধু-নীবারির পাত্রে গরলফেন টলমল করে, স্ফুরিত হয়ে ওঠে সুশোভনার ওষ্ঠাধর। হাতে তুলে নেয় সুশোভনা।

—রাজনন্দিনী!

কিঙ্করী সুবিনীতার আহবানে চমকিত হয়ে সুশোভনা মুখ তুলে তাকায়।

সুবিনীতা বলে—পরীক্ষিতের কাছ থেকে দূতী এসেছে রাজকুমারী।

—কি?

—তিনি তোমার আশায় রয়েছেন।

—এ কি সম্ভব?

—এ সত্য।

—তিনি কি শোনেননি, আমি কি?

—সব শুনেছেন।

গরলপাত্র ভূতলে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুশোভনা। বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে পায়, শত্রুর শিবিরে একটি প্রদীপ জ্বলছে; ধীর স্থির শান্ত ও নিষ্কম্প তার শিখা।

নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকে সুশোভনা। শত্রুশিবিরের সে প্রদীপের বিচ্ছুরিত জ্যোতি যেন সুশোভনার হৃৎপিণ্ডের অন্ধকার স্পর্শ করছে। জাগছে হৃদয়, ফুটছে যেন মরু-অন্ধকারের গভীরে নির্বাসিত এক মঞ্জীকোরক—কি সুন্দর শত্রু তুমি!

কিঙ্করী সুবিনীতা চমকে উঠে প্রশ্ন করে—কি বলছো রাজকুমারী?

সুবিনীতার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সুশোভনা।—আজ আমার জীবনে শেষ অভিসারের লগ্ন দেখা দিয়েছে সুবিনীতা। সাজিয়ে দাও কিঙ্করী, আর সুযোগ পাবে না।

বরষাবারিসিক্ত স্বর্ণচম্পকের মত সুশোভনার অশ্রুলুত মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় কিঙ্করী। সভয়ে প্রশ্ন করে—কোথায় যেতে চাও রাজনন্দিনী?

সুশোভনা— সুন্দর এক শত্রুর কাছে।

সুবিনীতা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—কোন্ বেশে সাজাবো?

সুশোভনা—বধূবেশে।

ফুটবল

বাঙলার ফুটবল পরিচালনা ক্রমশই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া পড়িতেছে। বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত সমস্যা, অপ্রীতিকর ঘটনার সমাবেশ এক এক সময় এইরূপ অচল অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে যে, পরিচালকগণ রীতিমত বিচলিত ও চঞ্চল হইতেছেন। সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ পর্যন্ত "সব বুঝি বা বন্ধ হইল" এই চিন্তায় ও আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। বাঙলার ফুটবল ইতিহাসের মধ্যে যে সকল ঘটনা ও সমস্যার নজির এই পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই অথচ বর্তমানে দেখা দিতেছে ইহা কিরূপে সম্ভব এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে দেখা দেওয়া উচিত। এই প্রশ্নের ঠিক সদুত্তর দিতে হইলে যে সকল ঘটনা ও বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে তাহা এতই জঘন্য ও পঙ্কিলময় যে, শুনিলে কেহই উত্তেজিত না হইয়া পারিবেন না। কিন্তু আমরা সেই সকল লইয়া আলোচনা অথবা কোন কিছুর আভাষ পর্যন্ত দিতে চাহি না। বাঙলার ঘরোয়া ব্যাপার বাহিরের লোকে শুনিয়া অথবা জানিয়া বাঙ্গালী জাতির উপর কলঙ্ক লেপনের সুযোগ পাইবে এইরূপ কোন কিছুই আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অব্যবস্থা ও শৈথিল্যের পরিণতি হিসাবেই যে উপরোক্ত সমস্যা ও ঘটনা সকল সংঘটিত হইতেছে ইহা বলিলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে। এইস্থানে পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে "তবে এই সকলের অবসান হইবে কি করিয়া?" ইহার উত্তরে আমরা বলিব "যেদিন সকল কিছু খেলাধুলো ও ব্যায়ামের কর্তৃত্ব দেশের সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত জ্ঞানী ও কর্মক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন।" বর্তমানে যাঁহারা কর্তৃত্ব করিতেছেন তাঁহাদের অধিকাংশই কোন এক সুযোগে পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই যে আসন আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন আর কোনরূপেই তাহা ত্যাগ করিতেছেন না। ছলে বলে কৌশলে ইঁহারা একরূপ 'চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাঙলা দেশে খেলাধুলো বা ব্যায়াম সম্পর্কে যে কোন নূতন পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হউক না কেন বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণের কিসের জোরে বা কি অধিকারে উহারা স্থান লাভ করিলেন তাহা কেহ কোনদিনই 'হদিস' পাইবেন না। সকল কিছুই যেন পূর্ব হইতেই ইঁহাদের জন্যই গড়িয়া রাখা হইয়াছে। ইঁহাদের সমস্ত কিছু কার্যকলাপই • বিস্ময়কর ও রহস্যাবৃত। এই রহস্য একদিন উদঘাটিত হইবে সন্দেহ নাই, তবে আমাদের ইঁহাদের নিকট বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা যেন বাঙলার ফুটবল খেলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটুখানি চিন্তা করেন। **বাঙলার ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড** বা মান চরম শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। প্রথম ডিভিসনের বর্তমানের যে কোন খেলাকে দশ বৎসরের পূর্বের তৃতীয় বা চতুর্থ ডিভিসনের খেলার সমতুল্য বলিলে কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না। খেলার পদ্ধতি বা নীতি বলিতে আর কিছুই যেন নাই। খেলোয়াড়গণ পর্যন্ত চরম বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের অন্যায় বা বে-আইনী আচরণের প্রতিরোধকল্পে রেফারী বা খেলার পরিচালক পর্যন্ত নির্দেশ দিতে শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত। ইঁহারা অসহায়। ইঁহাদের সমর্থন করিবার জন্য কেহই যেন নাই। নিগৃহীত রেফারী সকল কিছু প্রমাণসহ পরিচালকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইয়া সুবিচার পাইতেছেন না। প্রকৃত দোষী যে সে কেবল শাস্তিস্বরূপ পাইতেছে সামান্য একটুখানি "সতর্ক বাণী"। ইহার ফল হইতেছে এই যে, প্রতিদিনই খেলোয়াড় হস্তে রেফারী নিগ্রহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ভীতসন্ত্রস্ত রেফারী মাঠে ঠিকমত নির্দেশ না দিতে পারায় বিভিন্ন দলের সমর্থকগণ পর্যন্ত উত্তেজিত হইয়া হয় রেফারীকে মাঠের মধ্যে বাক্যবাণে জর্জরিত করিতেছেন না হয় মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অসহায় অবস্থার জন্য বেশ কিছুটা হস্তপদের সদ্ব্যবহার করিয়া লইতেছেন। প্রতিবাদ জানাইয়া ইহার কোন প্রতিকার হইতেছে না। ঘেরা মাঠে পুলিশ বাহিনী এই বেচারী রেফারীকে সাহায্য করিবার জন্য থাকেন, কিন্তু খোলা মাঠে সহস্র সহস্র দর্শকের উত্তেজনার মধ্যে তাহার মানসিক বৈকল্য হওয়া কি অসম্ভব? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় চরম অরাজকতা বাঙলার ফুটবল মাঠে দেখা দিয়াছে। ইহার প্রতিরোধ তখনই হইতে পারে যদি পরিচালকমণ্ডলী দৃঢ়হস্তে ইহা দমনের জন্য অগ্রসর হন। সম্প্রতি জামসেদপুর স্পোর্টিং এসোসিয়েশন পাঞ্জাব স্পোর্টস ক্লাবের এক ফুটবল খেলোয়াড়কে রেফারীকে প্রহার করিবার জন্য তিন বৎসরের জন্য সসপেণ্ড করিয়াছেন। এইরূপ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পূর্বে কলিকাতার মাঠে বহুবার পরিচালকমণ্ডলী গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বর্তমানে সেই নীতি ত্যাগ করিয়াছেন কিসের জন্য তাহা তাঁহারাই জানেন। আমাদের যতদূর ধারণা বাঙলার মাঠে এইরূপ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে খেলোয়াড়গণ শায়েস্তা হইবেন, সমর্থকগণও হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে রেফারী স্থির মস্তিষ্কে খেলা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

সভ্যদের স্থান না হওয়ায় খেলা বন্ধ

বাঙলার ফুটবল ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনই শোনা যায় নাই যে, কোন এক বিশিষ্ট ক্লাব নিজ ক্লাবের সভ্যদের প্রয়োজনীয় স্থান না দেওয়ায় তাঁহারা পরিচালকগণকে খেলা স্থগিত রাখিতে বাধ্য করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া এই খেলা স্থগিতের ফলে অপর পক্ষ ঠিক সময় জানিতে না পারায় মাঠে উপস্থিত হইয়া রীতিমত হতবাক হইয়াছেন। অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক যে বিবৃতি প্রদান করেন আশ্চর্যের বিষয় বহু সংবাদপত্রেই তাহা প্রকাশিত হয় নাই। ঐ ক্লাবের নেতৃস্থানীয় লোক বিভিন্ন সংবাদপত্রে ফোন করিয়া বিবৃতি প্রকাশ বন্ধ করিয়াছেন "কেন ঠিক সময় জানান হয় নাই? কেন একটি দল মাঠে উপস্থিত হইয়াও খেলায় পয়েণ্ট পাইবে না?" এই সকল প্রশ্ন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কি যে লাভ হইল বুঝিতে পারিলাম না। [illegible] ক্লাবের সম্পাদক ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আই এফ-এর পরিচালকগণ কেন করিলেন না [illegible]

জিজ্ঞাসা করিলে কি খুব অন্যায় হইবে? পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বেকায়দায় পড়িলে তাঁহারা কোন সদুত্তর দিবেন না নীরবে থাকিবেন ইহা বর্তমানে হয়তো বা সাধারণে সহ্য করিল কিন্তু ভবিষ্যতে যে করিবেই কে বলিতে পারে? স্থান লইয়া যে সমস্যা দেখা দিল ইহা লইয়া পূর্বে আলোচনা যখন হইয়াছিল তখন কেন তাঁহার সকল কিছু দিক বিবেচনা করা হয় নাই? একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়া পুনরায় সেই ব্যবস্থা অদল বদল করিয়া ব্যবস্থা করা অর্থে সর্ত ভঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নহে। একটি বিশিষ্ট ক্লাব যাহার খ্যাতি ও ঐতিহ্য বাঙলার ফুটবল ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সেই ক্লাবের পরিচালকদের সর্তভঙ্গকারী কার্যকলাপ করিতে দেখিয়া সত্যই মর্মাহত হইতে হয়। যাঁহারা ময়দানের মাঠের খবর রাখেন তাঁহারা সকলে জানেন ক্যালকাটা ক্লাব বা ইউরোপীয় সকল দল সকলেই পরের মাঠে খেলিবার সময় সাত দিন দল লইয়া গিয়া অপর ক্লাবের সভ্যদের খেলা দেখা হইতে বঞ্চিত করে নাই। প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক যাহারা তাহারা সকল সময়েই অপরের সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করিয়া কার্য করে। ইহার বিপরীত অর্থে চরম অ-খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দেওয়া—ইহা স্মরণ করিতে সকলকে অনুরোধ করি।

মুষ্টিযুদ্ধ

মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্ব হেভী ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান জো লুই সম্প্রতি নিউইয়র্কের পোলো মাঠে বিপুল দর্শক সমাগমের সম্মুখে বৃটিশ বক্সিং বোর্ড মনোনীত বিশ্বচ্যাম্পিয়ান লী স্যাভোল্ডকে নক আউটে পরাজিত করিলে সকলে আশা করিয়াছিলেন বৃটিশ বক্সিং বোর্ড জো লুইকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান বলিয়া ঘোষণা করিবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বৃটিশ বক্সিং বোর্ডের সম্পাদক মিঃ ই জে ওয়াটসন বলেন, "ইহা এক গুরুত্বের সমস্যা।" কেন তিনি এইরূপ উক্তি করিলেন তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা জানি ইহার পশ্চাতে কি আছে। বৃটিশ বক্সিং বোর্ড প্রায় ১৫ বৎসর ধরিয়া মুষ্টিযুদ্ধে কালা আদমীর প্রাধান্য নষ্ট করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইহার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে জো লুই ১৯৩৭ সালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হইলে একের পর এক শ্বেত প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করিতে আরম্ভ করেন। ম্যাক্স স্মেলিং (জার্মাণী), প্রাইমোকার্নেরা (ইটালী), উডকক (ইংলণ্ড) প্রভৃতি বহু সাদা মুষ্টিযোদ্ধাকে জো লুইর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খাড়া করিয়া বিফল মনোরথ হন। জো লুই ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পর পর ২৫ বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য রিংয়ে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিবারেই বিজয়ীর সম্মান অক্ষুন্ন রাখেন। কালা আদমীর প্রাধান্য নষ্টের প্রচেষ্টা যে চলিয়াছে ইহা লক্ষ্য করিয়া জো লুই লী স্যাভোল্ডের সহিত লড়বার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রচুর অর্থ লাভের আশায় লী স্যাভোল্ড বৃটিশ বক্সিং বোর্ডের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জো লুইর সহিত লড়িতে স্বীকৃত হইলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল, লুই লড়িতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার সে আশা নিরাশায় পরিণত হইল। জো লুই অনায়াসে স্যাভোল্ডকে নক আউটে পরাজিত করিলেন। ইহাতে বৃটিশ বক্সিং বোর্ডের সভ্যগণের উচিত ছিল জো লুইকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ঘোষণা করা। কিন্তু ঐ চুক্তি ভঙ্গ ব্যাপারটি আছে বলিয়া তাঁহারা এখনও ভাবিতেছেন লড়াইটিকে বাতিল করিবেন। তাঁহাদের মনোভাব যাহাই থাকুক উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইল না ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য। এই সঙ্গে জো লুইর বিচক্ষণতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। নিগ্রো জাতির সম্মান বৃদ্ধির জন্য এই বয়সেও তিনি যে সকল প্রকার অবস্থার সম্মুখীন হইতেছেন ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দেশী সংবাদ—

১১ই জুন—নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ঘোষণা করেন—“যাহাই ঘটুক না কেন, কাশ্মীর সম্পর্কে আমরা কোন প্রকার অসংগত কার্যকলাপ বরদাস্ত করিব না।”

আজ কোচবিহারে বিচারপতি শ্রী এস এন গুহ রায় গত ২১শে এপ্রিল কোচবিহার পুলিশের গুলী চালনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত আরম্ভ করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ঘোষণা করেন যে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ হইবে এবং সম্ভবতঃ জানুয়ারী মাস পর্যন্ত নির্বাচন চলিবে।

১২ই জুন—কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গবকে পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, রাজ্যপাল কয়েকজন উপদেষ্টার সাহায্য লইয়া রাজ্যের শাসন কার্য পরিচালনা করিবেন।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ১৩ই জুলাই বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হইবে। কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারপত্র সম্পর্কে আলোচনা এবং প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য এই অধিবেশনের আয়োজন হইয়াছে।

দিল্লী বেতার কেন্দ্র হইতে এক বক্তৃতায় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী ঘোষণা করেন যে, খাদ্য মজুত আছে এরূপ সমস্ত রাজ্যকে সুবিধা অনুযায়ী যথাসম্ভব শীঘ্র রেশনের পরিমাণ ৯ আউন্স হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১২ আউন্স করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আগামী বৎসর হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। উহা 'স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা' নামে অভিহিত হইবে।

১৩ই জুন—ভারত সরকার তুলা সম্পর্কে এক নূতন নীতি ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯৫১—৫২ সালে উৎপন্ন প্রতি গাঁট তুলার সর্বোচ্চ মূল্য ৫০, টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইবে।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, বিদেশের সহিত চুক্তির সর্তাবলী পূরণ করা হয় নাই এই অজুহাতে পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ ভারতগামী কতকগুলি পাট বোঝাই নৌকা খুলনায় আটক রাখিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরের সংবাদে প্রকাশ, নদীয়া জেলার সীমান্তে অবস্থিত করিমপুর থানার কয়েক-স্থানে পাকিস্থানীরা কতকগুলি ডাকাতি করিয়াছে। এই সব ঘটনায় তিনজন নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

অদ্য ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেডের ৫০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে। ফলে কলিকাতার রাস্তায় ১৬ হাজার গ্যাস লাইট জ্বলে নাই।

১৪ই জুন—কোচবিহারে গুলী চালনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের অদ্যকার শুনানীতে সরকার পক্ষের কৌঁসুলী শ্রী বি সি সেন বিচারপতি শ্রী এস এন গুহ রায়কে বলেন, খাদ্য দপ্তর মনে করেন যে, ভূতপূর্ব ডেপুটি কমিশনার শ্রী এইচ এন রায়ের অবহেলাই কোচবিহারের সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতির কারণ এবং সরকার পক্ষ সেই কারণেই তৎসম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে চান।

অদ্য কলিকাতায় দেড় শতাধিক বেকার যুবক চাকুরী পাইবার দাবী জানাইয়া ৫নং কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটস্থ আঞ্চলিক কর্মসংস্থান কেন্দ্রের অফিসে নীরব বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

অদ্য সেনেট হলের বারান্দায় ৭ জন ফাইনাল এম বি বি এস পরীক্ষার্থী অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন।

১৫ই জুন—পাটনায় আচার্য জে বি কৃপালনীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত রাজনৈতিক সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির অধিবেশনে স্থির হয় যে, প্রস্তাবিত নূতন সর্বভারতীয় দলের নাম “কিষাণ-প্রজা-মজদুর দল” হইবে। কমিটি সিদ্ধান্ত করেন যে, স্বাধীন গণতান্ত্রিক, বর্ণ ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই এই দলের লক্ষ্য হইবে। নিম্নলিখিত ৫ জনকে লইয়া দলের অস্থায়ী কর্মকরী সমিতি গঠিত হয়—আচার্য জে বি কৃপালনী, জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই, শ্রী টি প্রকাশম্, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকেলাপ্পন।

শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ, আকস্মিক বন্যার ফলে ডিকং নদীর উত্তর তীর প্লাবিত হওয়ায় আট সহস্রাধিক লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। একশত মাইল স্থান জলমগ্ন হইয়াছে।

১৬ই জুন—পাটনায় নিখিল ভারত রাজনীতিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে এগার শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। সভাপতি আচার্য জে বি কৃপালনী তাঁহার ভাষণে নূতন দলের কর্মপদ্ধতি বিবৃত করেন।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব রাজ্যপালের নিকট তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। ডাঃ ভার্গব তাঁহার পদত্যাগপত্রে বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। কাঠমাণ্ডুতে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু বলেন, ভারত ও বিশ্বের উপকারের জন্য নেপালের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন।

১৭ই জুন—অদ্য আচার্য কৃপালনীর সভাপতিত্বে সাড়ে তিন ঘণ্টা প্রকাশ্য অধিবেশনের পর কিষাণ-মজদুর-প্রজা দলের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন সমাপ্ত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নূতন দলের কার্যসূচী এবং দল গঠন, বিহারে খাদ্য সাহায্য ও গান্ধীজির গঠনমূলক সম্পর্কিত তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিদেশী সংবাদ

১১ই জুন—২০ লক্ষ টন মার্কিন খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষকে ১৯ কোটি ডলার ঋণ দানের বিলটি অদ্য মার্কিন সেনেটে গৃহীত হইয়াছে।

১৩ই জুন—বৃটিশ দূত স্যার ফ্রান্সিস শেফার্ড অদ্য পারস্য সরকারকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, বৃটিশ বিরোধী প্রচার কার্যের ফলে তৈল খনি অঞ্চলে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হইতে পারে।

প্রবীণ আইরিশ বিপ্লবী নেতা ইমন ডি ভ্যালেরা অদ্য আয়ারের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৫ই জুন—মার্কিন অভিযাত্রী বাহিনী কম্যুনিস্টদের 'পার্বত্য ত্রিকোণের' মধ্য দিয়া ১৫ মাইল অগ্রসর হইয়া উহার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত পাই-অং-গং শহরে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া অষ্টম আর্মি হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

সিংহল সরকার আগামী ১লা জুলাই হইতে অসিংহলীদিগকে সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৬ই জুন—মার্কিন অষ্টম আর্মির অধিনায়ক জেনারেল জেমস ভ্যান ফ্লীট এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, কোরিয়ার কম্যুনিস্টরা শীঘ্রই তৃতীয় পর্যায়ে অভিযান চালাইতে পারে এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

১৭ই জুন—তেহরানের সংবাদে প্রকাশ তৈল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বিধেয়ক গৃহীত হওয়ার সময় হইতে তৈল কোম্পানীর আয়ের তিন চতুর্থাংশ অবিলম্বে পারস্য সরকারকে প্রদানের করিবার দাবী সম্পর্কে সদুত্তর পাওয়া না গেলে পারস্য সরকার বৃটিশ তৈলবাহী জাহাজে সর্বপ্রকার তৈল সরবরাহ আগামী সপ্তাহে বন্ধ করিয়া দিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থানে মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

সপ্তদশ বর্ষ] শনিবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 30th June, 1951. [৩৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য রেশন

আমেরিকা হইতে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য শীঘ্রই বোম্বাই হইয়া ভারতে আসিতেছে। সেই বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশকে বর্তমান রেশন ৯ আউন্সের পরিবর্তে পূর্বনির্দিষ্ট ১২ আউন্স রেশন প্রবর্তন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিহার, মাদ্রাজ, মধ্যভারত, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতিতে রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু আজও বঞ্চিত রহিয়াছে পশ্চিম বাঙলা। অথচ পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, রেশনের পরিমাণ ১২ আউন্স হইতে ৯ আউন্স করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না; কিন্তু ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারেই বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে রেশনের পরিমাণ হ্রাস করিতে হয়। আজ কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যাবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। অবস্থা বুঝিয়াই তাঁহারা রেশনের বরাদ্দ বাড়াইবার অনুমতিও দিয়াছেন। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ এই সুযোগে বরাদ্দ বাড়াইয়াও দিয়াছে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহসে কুলাইল না। তাঁহারা সম্ভবত বড় বেশী হুঁশিয়ার। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া তবে তাঁহারা কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গ ভারত সরকারের কাছে অতিরিক্ত এক লক্ষ টন খাদ্যশস্য চাহিয়াছেন। যদি ঐ খাদ্যশস্য-সাহায্য মঞ্জুর হয় এবং এই লক্ষ টন খাদ্য-শস্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেদের গুদামে মজুত করিতে পারেন, তবে তাঁহারা রেশনের পরিমাণ বাড়াইতে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির তাৎপর্য ইহাই। শোনা যাইতেছে, ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই অতিরিক্ত সাহায্য সরবরাহে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু চাহিয়াছিলেন চাউল। এই পরিমাণ চাউল ভারত সরকারের হাতে নাই। প্রকাশ, অন্য যে প্রদেশে রেশনের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে, সে সব জায়গাতেও চাউলের পরিমাণ বাড়ানো হয় নাই। যাহা হোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই নীতির মর্ম আমরা উপলব্ধি করিতে সত্যই অসমর্থ। সোজা বুদ্ধিতে আমাদের ধারণা এই যে, ভারত সরকার ভারতের সব প্রদেশের কর্তৃপক্ষকে রেশন বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ যখন দিয়াছেন, তখন সব অঞ্চলে উপযুক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহের দায়িত্বও তাঁহারা লইয়াছেন। ফলত এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাবী বুদ্ধির বাড়াবাড়ি খাটাইতে যাওয়ার বিশেষ কোন প্রশ্নই উঠে না। অন্যান্য প্রদেশের কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের নির্দেশের উপর ভরসা রাখিয়া রেশনের পরিমাণ যেভাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও তাহাই করা উচিত ছিল। রেশনের বরাদ্দে চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা না করার প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত অবান্তর। চাউলের পরিমাণ বাড়ানো যদি অসম্ভবই হয়, গমজাত দ্রব্য গ্রহণেও লোকের বিশেষ যে কিছু আপত্তি উঠিত, এমন মনে হয় না; কারণ, বর্তমান বরাদ্দ অনুযায়ী আধপেটা থাকার চেয়ে অন্তত তাহাতে উদরপূর্তির কিছুটা ব্যবস্থা হইত। প্রকৃতপক্ষে ১২ আউন্স রেশন সকলের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই ১২ আউন্স হইতে রেশনের পরিমাণ কমাইয়া যখন একেবারে ৯ আউন্স করা হয়, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বরাদ্দ হ্রাসকে নিতান্ত সাময়িক ব্যবস্থা বলিয়া জনসাধারণকে ভরসা দিয়াছিলেন। সুতরাং ভারত সরকার হইতে সুযোগ পাওয়ামাত্র রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা তাঁহাদের উচিত ছিল। ভারতের সর্বত্র রেশনের পরিমাণ বাড়িবে অথচ পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব রেশন ব্যবস্থাই স্থায়ী হইয়া থাকিবে, এমন ব্যবস্থা অত্যন্তই উৎকট এবং ইহার ফলে দেশবাসীর মধ্যে অসন্তোষের ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে, ইহাও স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিলম্বে এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দেশের অবস্থাকে তাঁহারা আর জটিল করিয়া তুলিবেন না, আমরা ইহাই আশা করি।

অর্থনৈতিক দুর্দশার নিরোধ

ভারতের অর্থসচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ সম্প্রতি বোম্বাই শহরে একটি বক্তৃতায় আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট অর্থনৈতিক দুর্গতি নিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা দ্রব্যমূল্যের হার আর বর্ধিত হইতে দিবেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি দেশবাসীকে ধন্যবাদ দিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহারা অসীম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের

দুষ্প্রাপ্যতাজনিত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, ইত্যাদি তাঁহাদের পক্ষে সুখ্যাতির কারণ। বাস্তবিকপক্ষে অর্থসচিবের এই প্রশস্তি সম্বন্ধে দেশের লোক সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশের লোকের উপর দুঃখকষ্ট ভার অনেক রকমে বাড়িয়াছে। কিন্তু এগুলিকে তাহারা দেবতার অভিসম্পাতস্বরূপেই গ্রহণ করিয়াছে। স্বাধীনতার জন্য এ সব যে মূল্য-স্বরূপ, এমন দৃষ্টিতে নিজেদের দুর্গতি অবস্থাকে তাহারা দেখিতে পারে নাই। ইহার কারণ কি, আমরা পূর্বেই বহুবার বলিয়াছি। অর্থসচিবের আলোচ্য বিবৃতির মধ্যেও তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। বস্ত্র-সমস্যার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত চিন্তামন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ভারত সরকারের বস্ত্র বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক গলদ আছে। তাঁহার মতে ভারত সরকার এখন সেগুলির সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন এবং বণ্টন-ব্যবস্থার সংশোধন করা হইয়াছে। তথাপি সতর্ক থাকার প্রয়োজন যে এখনও আছে, অর্থসচিব একথাও স্বীকার করেন। সুতরাং গলদের নামে সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতি যে কিরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, ইহা হইতেই বোঝা যায়। বাস্তবিকপক্ষে অবস্থা এইরূপ দেখিয়াই সরকারী প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাস দেশের লোকে ততটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহারা ক্রমেই সরকারী ব্যবস্থার সম্বন্ধে আস্থা-হীন হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের দোষই বা কি? ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব কিছুদিন পূর্বে এই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, জুলাই মাস হইতে কাপড়ের কোন রকম কষ্ট আর থাকিবে না। কিন্তু ভারত সরকারের সাম্প্রতিক একটি বিজ্ঞপ্তি এ সম্বন্ধে দেশের জন-সাধারণকে নিরাশ করিয়াছে। ভারত সরকার এই ঘোষণা করিয়াছেন যে, "১লা জুলাই হইতে মিহি ও অতি মিহি কাপড়ের দর সামান্য কিছু কমান হইবে; কিন্তু মোটা ও মাঝারি কাপড়ের মূল্য হ্রাস পাইবে না—এখন যেরূপ আছে, তেমনই থাকিবে। মিহি কাপড়ের এই যে মূল্য হ্রাস তাহার পরিমাণও প্রচুর; শতকরা ১, হইতে ১০; অর্থাৎ দশ টাকা মূল্যের কাপড় কিনিলে ক্রেতাদের পৌণে এক পয়সা পরি-মাণ সুবিধা মিলিবে! মিহি কাপড়ের উপর কর্তৃপক্ষের এমন অনু-কম্পার কারণ ইহাই দেখান হইয়াছে যে, গত এপ্রিল মাসে মিহি কাপড়ের দাম মোটা ও মাঝারী কাপড়ের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, তাই এবার ঐ শ্রেণীর কাপড়ের দাম কমান হইল। বলা বাহুল্য, সমগ্র দেশের জনসাধারণের জীবন-যাত্রার নিরিখে আমরা এই যুক্তি বিচারসহ বলিয়া মনে করি না। মোটা ও মাঝারী কাপড় সাধারণত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই ব্যবহার করেন এবং অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী যাঁহারা তাঁহারাই প্রধানত মিহি কাপড়ের খরিদ্দার। বলা বাহুল্য, কিছু বেশী দাম দিয়াও মিহি কাপড় পরিবার সখ পূর্ণ করিবার সামর্থ্য বিত্তশালীদেরই আছে; কিন্তু মোটা ও মাঝারী ধরণের প্রতি জোড়া ধুতি ১৫, টাকা এবং শাড়ী ২০, টাকা দিয়া ক্রয় করিবার সামর্থ্যও দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নাই। দুর্ভাগ্য এই যে দেশের বিপুল জনশ্রেণী, ইহাদের প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ হওয়াই কর্তৃপক্ষের একান্ত আবশ্যক ছিল।

পশুবল বনাম মানবতা

সম্প্রতি প্যারিসে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার ষষ্ঠ অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের পক্ষ হইতে শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা দুইজনে বক্তৃতাও করিয়াছেন। মৌলানা আজাদের মতে গত দুই বৎসরে সঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্বন্ধে জগতের লোকের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সম্পর্কে তাঁহাদের মনের মধ্যে দেখা দিয়াছে ভয়ের ভাব। অথচ সংস্থাটি সঙ্ঘেরই অংশস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে যে জন্মদাতা, সন্তানের পক্ষে সে আতঙ্কের কারণস্বরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও মৌলানা আজাদের উক্তির মধ্যে আশাশীলতা অনেকখানি আছে। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের এই সংস্থাই মানব-সমাজের ভবিষ্যতের পক্ষে "একমাত্র ক্ষীণ আশার আলোকস্বরূপ" ইহাই তাঁহার অভিমত। আমরা কিন্তু ভবিষ্যতের সম্বন্ধে আশার তেমন কোন আলোক এখনও দেখিতে পাইতেছি না। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে এই সংস্থাটি রাজনীতিক প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে ইহা সত্য। কিন্তু সঙ্ঘের অন্তশ্চক্রে রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাক ক্রমে জড়াইয়া পড়িতেছে এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ এবং সংশয়ের প্রতিবেশ সম্প্রসারিত হইতেছে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করা কতটা সম্ভব ইহা বিশেষভাবেই বিবেচ্য। কারণ, একটি দেশের সঙ্গে অপর একটি দেশের সম্পর্ক ক্ষেত্রে রাজনীতিক প্রশ্নই প্রথমে আসিয়া পড়ে। ফলে তৎসম্বন্ধে অনাসক্ত অবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রশ্নের সমাধানে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। অধিকন্তু তেমন চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরোধী আদর্শ বঞ্চনা এবং আন্তরিকতাবিহীন বচন-বিলাসিতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে। কম্যুনিস্ট চীনের বিশ্বরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধতাতেই এ সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। সমস্যাটি অবশ্য নূতন নয়। রাজনীতিক প্রভুত্ব এবং বৈষম্যবাদ মানব সংস্কৃতিকে এইভাবেই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের দুর্দম স্পৃহা জগতের বুকে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। মানবতার পথে বিশ্ব-সমস্যার সমাধান যে সম্ভব, এ সম্বন্ধে অন্তরে অন্তরে সকলেই একান্ত সন্দেহই পোষণ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু সেই সন্দেহের ভাব উত্তরোত্তর উগ্র হইয়া উঠিতেছে। মারণাস্ত্র পুঞ্জীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন শক্তিবর্গের উদ্যম ও প্রচেষ্টা প্রধানত পর্যবসিত হইতেছে। পুরাপুরি এক বৎসর অতিক্রান্ত হইল কোরিয়ায় কামানের কালানল-বৃষ্টিতে ধ্বংসলীলা চলিতেছে; একটা জাতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে। নিরন্ন এবং বুভুক্ষুর হাহাকারে আকাশ-বাতাস মুখর। এই পরিস্থিতির মধ্যে মানবকল্যাণ-সাধনার সজ্জিত-বচন আমাদিগকে কতটুকু সান্ত্বনা দিবে?

মেডিক্যাল ছাত্রদের অনশন ভঙ্গ

দশ দিন পরে কলিকাতার মেডিক্যাল ছাত্রগণ গত ২৮শে জুন অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। গত ১৮ই জুন হইতে সাতজন ছাত্র অনশন অবলম্বন

রয়াছিলেন। ইঁহাদের কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে এবং ২১শে জুন একজন অনশনকারী ছাত্রকে হাসপাতালেও প্রেরণ করিতে হয়। ছাত্রদের এই অনশনে দেশের সর্বত্র একটা উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল। ইঁহারা অনশন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার ফলে সে উদ্বেগের কারণ দূর হইল এবং কয়েকটি অমূল্য জীবন রক্ষা পাইল। আমরা ইহাতে সুখী হইয়াছি। বস্তুতপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্র রাজনীতির দাবা খেলার স্থান নয়। এখানে শ্রদ্ধা, সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার প্রথমে প্রয়োজন হইয়া থাকে। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ভাইস-চ্যান্সেলার এবং বাঙালী সমাজের শীর্ষস্থানীয় সিণ্ডিকেটের সদস্যাদিগকে কার্যত সমস্ত রাত্রি অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছাত্রেরা যে দারুণ অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন, আমরা তীব্রভাষায় তাঁহার নিন্দা করিয়াছি এবং এ কথাও বলিয়াছি যে, এমন কাজ সত্যাগ্রহ নয়, ইহা বস্তুরমত গুণ্ডামী; ইহা নিতান্তই উৎপীড়ন। ছাত্ররা এই কাজের অনৌচিত্য পরে উপলব্ধি করেন এবং সেজন্য দুঃখও প্রকাশ করেন। তথাপি নিজেদের দাবী তাঁহারা প্রত্যাহার করেন নাই। পরন্তু উহার উপর বারংবার জোর দিতে থাকেন। তাহার ফলে পরবর্তী অনশন ধর্মঘট আরম্ভ হয়। অন্যান্য দাবীর সঙ্গে পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দিবার জন্য তাঁহাদের একটি দাবী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের এই দাবী মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এ পক্ষে তাঁহাদের অসুবিধা আছে, আমরা ইহা স্বীকার করি। বিশেষতঃ পরীক্ষার্থীদের দাবী অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ যদি পিছাইয়া দিতে হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানের নিয়মানুবর্তিতাই নষ্ট হইয়া পড়ে এবং সব কাজ যেন ছেলেখেলার ব্যাপারের মত হইয়া দাঁড়ায়। ফলত জগতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই কথায় কথায় বিধি-ব্যবস্থা উলটপালট করিবার নীতি অনুসৃত হয় না। কিন্তু এজন্য ছাত্রদেরও যে সব দোষ এমন কথা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারাই কার্যত এমন পথ দেখাইয়াছেন এবং পরীক্ষার তারিখের পরিবর্তন সাধন কিছুদিন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরীক্ষার্থীদের দাবী অনুসারে গত বৎসরও তাঁহারা এম এ ও এম এস-সি পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দিয়াছিলেন। অফিসের কাগজপত্র তৈয়ারী হয় নাই এই অজুহাতে গত বৎসর মেট্রিকুলেশন এবং বিএ পরীক্ষার তারিখও পিছাইয়া দেওয়া হয়। এরূপ অবস্থায় দাবী উপস্থিত করিলে পূর্ব পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী মেডিক্যাল পরীক্ষার তারিখও কর্তৃপক্ষ পিছাইয়া দিতে পারিতেন, ছাত্রদের মনে এরূপ ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বস্তুত ছাত্রদের অভিযোগের যে কারণ আছে, সিণ্ডিকেট ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। গত ২১শে জুন শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির উন্নতিসাধন প্রয়োজন বোধ করিয়া তাঁহারা একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করেন। মেডিক্যাল শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্তও করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ছাত্রেরা যে সব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন নয়। আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের অভাব অভিযোগের প্রতীকারের সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। বস্তুতঃ মান-ইজ্জতের প্রশ্ন এক্ষেত্রে বড় নয়। ছাত্ররা দোষ করিতে পারে, তাঁহাদের আচরণে ত্রুটিও ঘটিতে পারে, আশ্চর্য নহে; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের অভিভাবকস্থানীয়, স্নেহ এবং ভালবাসার পথে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ়তর করিবার দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকা কর্তব্য এবং তৎসম্পর্কে তাঁহাদের দায়িত্বই সমধিক।

কাশ্মীর সমস্যা ও ডক্টর গ্রাহাম

নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি ডক্টর ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ডক্টর গ্রাহামের সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের মনোভাব পণ্ডিত নেহরু একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছেন। ডক্টর গ্রাহাম একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। এই হিসাবে তিনি তাঁহার প্রাপ্য সম্মান এবং সৌজন্য নিশ্চয়ই এখানে লাভ করিবেন। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধিরূপে তিনি কাশ্মীর সম্পর্কে যে কাজের ভার লইয়া আসিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনরূপ সহযোগিতা করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তাঁহারা পরিষদের প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। দিল্লী-করাচী ঘুরিয়া গ্রাহাম সাহেব কাশ্মীরে যাইবেন কিনা, আমরা জানি না। তবে আমাদের বিশ্বাস এই যে, সেখানে গিয়া তাঁহার কাজের কোন সুবিধাই তিনি পাইবেন না। অধিকন্তু তাঁহার উপস্থিতির প্রতিবাদে কাশ্মীরের জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ঘটাও বিচিত্র নয়। বাস্তবিকপক্ষে সুদীর্ঘকাল নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরের প্রশ্ন লইয়া ক্রমাগত জটিলতাই বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থের কূটচক্রে এই সমস্যা সমাধানের ন্যায্য পথ অবলম্বনে তাঁহারা পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের আদর্শের সঙ্গে কাজের সংগতি নাই। বর্তমানে কাশ্মীরবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতেই তাঁহারা উদ্যত। সুতরাং উত্তেজনার কারণ না আছে এমন নয়। ফলতঃ কাশ্মীরের জনসাধারণ গ্রাহাম কমিশনকে বয়কট করিবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং আমরা ডক্টর গ্রাহামকে কাশ্মীরে পদার্পণ না করিবার জন্যই পরামর্শ দিব। দেখা যাইতেছে, ডক্টর গ্রাহামের আগমন সংবাদ পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিব স্যার জাফরুল্লাকে অতিমাত্রায় উল্লসিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি ইতোমধ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে একপ্রস্থ উপদেশও দিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি পণ্ডিত নেহরুর শুভবুদ্ধি উদয়ের আশা করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরুর এই শুভবুদ্ধি অনেক ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা এবং দ্বিজাতি-তত্ত্বের মূলীভূত বৈষম্য ও বর্বরতা যদি কাশ্মীরে বিস্তারলাভ করে এবং জঙ্গীবাদের আধিপত্য সেখানকার জনমতকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে, তবে তাহার প্রতিক্রিয়া ভারত, পাকিস্থান, এমন কি, বিশ্বমানবতার পক্ষে নিদারুণ অশুভ পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিবে। আমাদের ইহাই বিশ্বাস। এই সঙ্কটকে দৃঢ় হস্তে প্রতিহত করা ভারতের পক্ষে বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ডক্টর গ্রাহামের প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শনের ইচ্ছা আমাদের নাই; কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের যে কর্তব্য, আমরা তাঁহাকে সংস্কারমুক্ত চিত্তে তৎসম্বন্ধে প্রণিহিত হইতেই অনুরোধ করিব।

অশান্ত

অজিত দত্ত

আমার শান্তি কোথায় লুকায়ে থাকে?
উড়ে গেল কোন্ দূর বাসনার ডাকে?
কোন্ দুর্জ্ঞেয় দুস্তর দেশে লুকালো আমার ঘুম?
জাগ্রত তাই রাত্রি, যদিও ধরিত্রী নিঃঝুম।

এখনো তো কত গাছের ছায়ায় বিরাম-শয্যা পাতা,
এখনো তো কত অলস দুপুর ঘুঘুডাকা সুরে গাঁথা।
এখনো তো কত নতুন ঘরের শীতল শয্যাতলে
অনুবন্ধের দম্ভ ছাপায়ে মৃদু কথা কারা বলে।
এখনো তো ফোটে ফুল
শরতের মেঘে চকিতে এখনো সংসার হয় ভুল।

তবু আজ মোর মনের শান্তি আকাশে বাতাসে খুঁজি
স্মৃতির সোনার খাঁচা খুলে রেখে কতবার চোখ বুজি,
কথার শিকলে বাঁধি তৃপ্তির ছায়ার বিহঙ্গম,
তবু এ চিত্ত চঞ্চল জঙ্গম।

আমার শান্তি সে কোন্ দূরের নীড়ে
উড়ে চলে গেল ফেলে রেখে ক্লান্তিরে॥

সৈয়দ মুজতবা আলী

রাষ্ট্রভাষা

ভারতবর্ষের সবাই যদি এক ভাষায় কথা বলত তাহলে সব দিক দিয়ে আমাদের যে কত সুবিধে হত, সে-কথা বলার প্রয়োজন নেই। শুধু কাজ-কারবারের মেলা বখেড়ার লাঘব হয়ে যেত তাই নয়, এই ভাষার ভিত্তিতে আমরা অনায়াসে নবীন ভারতীয় সংস্কৃতি বৈদগ্ধের ইমারত তুলতে পারতুম। মালমসলা আমাদের প্রচুর রয়েছে তাই সে ইমারত বাইরের অন্য দেশের শাবাশীও পেত।

এ তত্ত্বটা কিছু নূতন নয়। কিন্তু একই ভাষার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ইমারত গড়তে গেলেই এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করজোড়ে স্বীকার করছি আমার জীবনে আমি যত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে এটাই আমাকে সব চেয়ে কাবু করেছে—এ দ্বন্দ্বের সমাধান আমি আজও করে উঠতে পারিনি। বিচক্ষণ জন যদি দয়া করে এ-অধমকে সাহায্য করেন।

বৈদিক সভ্যতা সংস্কৃতি একটি ভাষার উপরই খাড়া ছিল সে-কথা জানি তার কারণ সে যুগে আর্যেরা ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েননি এবং দ্বিতীয়তঃ অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক যোগাযোগ হয়নি বলে সে ভাষাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন অতি অল্পই হয়েছিল।

প্রভু বুদ্ধের যুগ আসতে না আসতেই বৈদিক সে ভাষা আর আপামর জনসাধারণ বুঝতে পারছে না। যতদূর জানা আছে প্রভু বুদ্ধ তাঁর নবীন ধর্ম প্রচারের জন্য বৈদিক ভাষা কিম্বা সে ভাষার তৎকালীন প্রচলিত রূপের শরণ নেননি। তিনি তৎকালীন সর্বজনবোধ্য ভাষার শরণ নিয়েছিলেন—সে ভাষাকে প্রাকৃত বলা যেতে পারে। ব্রহ্মণ্যধর্ম কিম্বা ব্রাহ্মণ্য ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তিনি যে বিহারে প্রচলিত তৎকালীন সর্বজনবোধ্য ভাষার শরণ নিয়েছিলেন তা নয়, কারণ সকলেই জানেন বুদ্ধদেব 'ব্রাহ্মণ-শ্রমণ' এই সমাস বার বার ব্যবহার করেছেন উভয়কে সমান সম্মান দেখাবার জন্য। লোকায়ত্ত ভাষা যে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তার একমাত্র কারণ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম গণ-আন্দোলন এবং গণ-ভাষার প্রয়োগ ব্যতীত গণ-আন্দোলন সফল হতে পারে না।

এস্থলে লক্ষ্য করবার বিষয় বিহারের আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করাতে বুদ্ধদেব সর্বভারতের পণ্ডিতজনবোধ্য ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিনি তাতে বিচলিত হননি।

ঠিক একই কারণে মহাবীর জৈনও আঞ্চলিক উপভাষার শরণ নিয়ে অর্ধ-মাগধীতে আপন বাণী প্রচার করেন। শাস্ত্রীয় মতবাদ এবং জীবহত্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতানৈক্য বাদ দিলে বৌদ্ধ ও জৈন গণ-আন্দোলন একই রূপ একই গতি ধারণ করেছিল।

অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ ভাষাও সংস্কৃত নয়।

তারপরের বড় আন্দোলন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আনয়ন করেন। তিনিও প্রধানত সর্বজনবোধ্য বাঙলার শরণ নিয়েছিলেন—যদিও তাঁর সংস্কৃতজ্ঞান সে-যুগের কোনো পণ্ডিতের চেয়ে কম ছিল না। পশ্চিম ও উত্তর ভারতেও তুকারাম মারাঠী ব্যবহার করেন, কবীর দাদু প্রভৃতি সাধকেরা হিন্দী ব্যবহার করেন। কবীর বললেন "সংস্কৃত কূপজল", সে জল কুয়ো থেকে বের করে আনতে হলে ব্যাকরণ অলংকারের লম্বা দড়ির প্রয়োজন কিন্তু "ভাষা (অর্থাৎ সর্ব-জনবোধ্য প্রচলিত ভাষা) বহত নীর", সে জল বয়ে যাচ্ছে, যখন তখন ঝাঁপ দিয়ে শরীর শান্ত করা যায়। আর তুকারাম বললেন "সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয় তবে মারাঠী কি চোরের ভাষা?"

তার পরের গণ-আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ করেন। তিনি যদিও জনগণের ভাষা হিন্দীর শরণ নিয়েছিলেন তবু লক্ষ্য করার বিষয় যে, অসহযোগ আন্দোলন বাঙলা তামিলনাড়, অন্ধ্র কেরালায় হিন্দী কিম্বা ইংরিজির মাধ্যমে আপামর জনসাধারণে প্রসার লাভ করেনি; জনগণ যে সাড়া দিল সে বাঙলা, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ভাষার মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলন প্রচার করার ফলে। বারদলই সত্যাগ্রহের প্রধান বক্তা ছিলেন 'বল্লভভাই পটেল। তিনি যে অদ্ভুত তেজস্বিনী গুজরাতি ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে ভাষা অনায়াসে সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে। বল্লভভাইয়ের গুজরাতির সঙ্গে তাঁর হিন্দীর কোনো তুলনাই হয় না।

এতক্ষণ ধরে যে ঐতিহ্যের বর্ণনা দিলুম সে শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রভু খৃষ্ট সাধু এবং পণ্ডিতি ভাষা হিব্রুতে তাঁর ধর্ম প্রচার করেননি। তাঁর প্রথম ও প্রধান শিষ্যদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতি সাধারণ জেলে। তাঁর প্রচারকার্য এঁদের নিয়েই আরম্ভ হয় বলে তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন গ্যালিলি-নাজারেত-অঞ্চলবোধ্য আরামেইক উপভাষায়। মহা-পুরুষ মহম্মদও যখন আরবীর মাধ্যমে আল্লার আদেশ প্রচার করলেন তখন আরবী ভাষা ছিল পৌত্তলিকদের 'না-পাক' ভাষা, এবং সে ভাষায় ধর্ম প্রচারের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। ইসলামের ইতিহাসে লেখা আছে মহাপুরুষ মুহম্মদের ঈষৎ পূর্বে এবং তাঁর সমবর্তীকালে মক্কাবাসীদের যাঁরা সত্য-পথের অনুসন্ধান করতেন তাঁরা হিব্রু শিখে সে ভাষায় ধর্মগ্রন্থ পড়তেন। তাই যখন মহাপুরুষ হিব্রুর শরণাপন্ন না হয়ে আরবীর মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করলেন তখন সবাই তাজ্জব মেনে গেল। তার উত্তরে আল্লাই কুরানে বলেছেন, "আমার প্রেরিত পুরুষ যদি আরব হয় তবে প্রচারের ভাষা আরবী হবে না তো কি হবে? আর আরবী না হলে সবাই বলত, 'আমরা তো এসব বুঝতে পারছিনে।'"

লুথারও পোপের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন জর্মনের পক্ষ নিয়ে—পণ্ডিতি লাতিন তিনি এই বলেই অস্বীকার করেছিলেন যে সে-ভাষার সঙ্গে আপামর জনসাধারণের কোনো যোগসূত্র ছিল না।

মোদ্দা কথা এই, এ-পৃথিবীতে যত সব বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে—তা সে নিছক ধর্মান্দোলনই হোক আর ধর্মের মুখোস পরে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্দোলনই হোক—তার সব কটাই গণ-আন্দোলন এবং গণ-আন্দোলন সর্বদাই আঞ্চলিক গণভাষার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেছে।* (ক্রমশ)

---

*রাষ্ট্র ভাষার স্বপক্ষে বিপক্ষে যে কটি যুক্তি আছে, সবকটিরই আলোচনা করা এ প্রবন্ধ-মালার উদ্দেশ্য—লেখক।

কোরিয়া

মিঃ জেকব মালিক ইউনো'তে রাশিয়ার প্রতিনিধি। সম্প্রতি তিনি নিউইয়র্ক থেকে একটি বেতার বক্তৃতায় কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে একটি উক্তি করেছেন যাতে অনেকের মনে এই আশার সঞ্চার হয়েছে যে হয়ত শীঘ্রই কোরিয়া যুদ্ধের অবসানের একটা ব্যবস্থা হবে। মিঃ মালিকের প্রস্তাব হচ্ছে যে, কোরিয়ায় দুই পক্ষে যে শক্তিসমূহ যুদ্ধে রত রয়েছে তাদের এখন কর্তব্য ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর যুদ্ধ বিরতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আলোচনা শুরু করা। মিঃ মালিকের এই প্রস্তাবের দ্বারা যুদ্ধাবসানের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশা সঞ্চারের কারণ এই যে, তিনি যুদ্ধ বিরতির প্রশ্নের সংগে চীন-মার্কিন বিবাদের রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি জুড়ে দেননি। পূর্বে চীন সরকার এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ফরমোজার ভবিষ্যৎ, ইউনোতে চীন প্রতিনিধিত্ব, জাপানের সহিত সন্ধি, ইত্যাদি প্রশ্নগুলি এড়িয়ে কেবল কোরিয়ার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু আমেরিকা ঐ সব প্রশ্নের আলোচনার প্রস্তাব কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতির সর্ত হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি; অন্য পক্ষে পিকিং সরকারও ঐসব প্রশ্ন বাদ দিয়ে কেবল যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। মিঃ মালিকের বক্তৃতায় যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের সংগে অন্য প্রশ্নগুলি জুড়ে দেয়া হয়নি এবং পিকিং-এ মিঃ মালিকের বক্তৃতা অভিনন্দিত হয়েছে দেখে মনে হতে পারে যে, চীনা সরকার এখন ফরমোজা প্রভৃতির প্রশ্ন না তুলে কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতিতে রাজী আছেন। তাই যদি হয় তবে যুদ্ধ বিরতি অবশ্যই সম্ভব, কেননা তাহলে আমেরিকার পক্ষে আপত্তি করার বিশেষ কারণ থাকবে না। বর্তমানে আমেরিকা এর চেয়ে বেশী কিছু চায় না। যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি না করে সমস্ত কোরিয়া দখল করা যে সম্ভব নয় আমেরিকা সেটা বুঝেছে। সুতরাং দক্ষিণ কোরিয়া থেকে কম্যুনিস্টদের খেদিয়ে দিলেই আপাততঃ ইউনো'র কর্তব্য করা হবে এই মত কিছুদিন যাবৎ ইংগ-মার্কিন মহল থেকে প্রচারিত হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় যদি মার্কিন প্রভাবের ভিত্তি দৃঢ় থাকে, যদি পিকিং সরকারকে ফরমোজা ছেড়ে দিতে না হয় এবং পিকিং সরকার ও রাশিয়াকে বাদ দিয়া যদি জাপানের সংগে সন্ধি করে নেয়া যায় তবে কোরিয়ার যুদ্ধ থামাতে আমেরিকার আপত্তি কেন হবে? কিন্তু চীনের পক্ষে এই পরিস্থিতি মেনে নেয়া সহজ নয়। সুতরাং মিঃ মালিকের বক্তৃতায় হয়ত কিছু কথা উহ্য আছে, সময়ে প্রকাশ হবে।

তাছাড়া, মিঃ মালিক যা বলেছেন তার মধ্যেও মতানৈক্যের অবসর রয়েছে। মিঃ মালিক ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর যুদ্ধ বিরতির কথা বলেছেন। তার অর্থ হয় এই যে উভয় কোরিয়ান ও চীনারা ৩৮ অক্ষরেখার উত্তরে ও ইংগ-মার্কিন পক্ষীয় সৈন্যেরা ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণে সরে আসবে। বর্তমানে প্রধান সমরাংগনে ইংগ-মার্কিন পক্ষীয় সৈন্যরা ৩৮ অক্ষরেখার উত্তরে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ বলে আসছেন যে, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৩৮ অক্ষরেখা কোন একটা কার্যকরী সীমানা হতে পারে না, তাঁরা কোরিয়া উপদ্বীপের কোমর বরাবর যে সীমানা রক্ষা করতে চান সেটা ৩৮ অক্ষরেখার উত্তরে গিয়ে পড়ে। যুদ্ধ বিরতির চুক্তি হলেও উভয় পক্ষের মনেই পরস্পরের প্রতি সন্দেহ থাকবে এবং উভয় পক্ষই সামরিক সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন বোধ করবে। সুতরাং মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ বিরতির সর্ত হিসাবে ইংগ-মার্কিন পক্ষীয় সৈন্যদের তাদের বর্তমান অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে সরিয়ে ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণে নিয়ে আসতে রাজী হবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু ইংগ-মার্কিন সৈন্য যদি ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণে সরে যেতে রাজী না হয় তবে সেটা মেনে নিয়ে চীনাদের পক্ষে যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হওয়া সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই বোধ হয় অসম্ভব হবে।

মিঃ মালিকের কথার সংগে আর একটা গোলমেলে প্রশ্ন জড়িত আছে। মিঃ মালিক বলেছেন যে, দুই দিকের "Belligerents" যারা অর্থাৎ দুই দিকে যে শক্তিগুলি যুদ্ধে রত রয়েছে তারাই যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করার জন্য আলোচনা করতে অগ্রসর হোক। ইংগ-মার্কিনের ধুয়া হচ্ছে যে তারা যুদ্ধ করছে ইউনো'র তরফে "এ্যাগ্রেশন"-এর বিরুদ্ধে। রাশিয়া কিন্তু, গোড়া থেকে বলে আসছে যে, কোরিয়া সম্পর্কে ইউনো'র নামে যা কিছু হয়েছে সমস্তই "বে-আইনী"। মিঃ মালিকের প্রস্তাব অনুসারে এক পক্ষে উত্তর কোরিয়া ও চীনা এবং অন্য পক্ষে মার্কিন, বৃটিশ এবং তাদের অন্য রণ-সংগীদের মধ্যেই যুদ্ধ বিরতির আলোচনা হওয়া উচিত। মিঃ মালিক ইউনো'র নাম করেননি। কিন্তু ইংগ-মার্কিন ইউনোর মারফৎ ছাড়া কি কিছু করতে চাইবে? বিষয়টির আলোচনার জন্য ইউনো'র এ্যাসেম্বলীর বৈঠক ইতিমধ্যেই ডাকা হয়েছে। গতিক দেখে মনে হচ্ছে, সোভিয়েট ও ইংগ-মার্কিন পক্ষ উভয়েই যেন পরস্পরের কাছ থেকে একটা প্রোপাগান্ডার ধাক্কার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে— যুদ্ধ-বিরতির জন্য নয়। কোরিয়ার দুর্ভাগ্যের অবসান যে কবে হবে তা কে জানে!

ইরাণ

মঙ্গলবার বৃটিশ পার্লামেন্টে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মরিসন বলেন যে, ইরাণের পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তিনি ইরাণ সরকারকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, ইরাণস্থ বৃটিশ প্রজাদের নিরাপত্তা রক্ষায় যদি ইরাণ সরকার অপারগ হন তবে সে দায়িত্ব বৃটিশ গভর্নমেন্টকেই গ্রহণ করতে হবে। এর অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্ট আবাদান বন্দরের নিকট বৃটিশ রণতরীও পাঠিয়েছেন। বৃটিশ প্রজাদের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব যেমন বৃটিশ গভর্নমেন্ট নিয়েছেন, ইরাণে বৃটিশ সম্পত্তি অর্থাৎ এ্যাংলো-ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানীর কলকারখানা ইরাণীদের হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্বও বৃটিশ গভর্নমেন্ট নিবেন কিনা পার্লামেন্টের একজন সদস্য এই প্রশ্ন করলে মিঃ মরিসন বলেন যে, ঐ প্রশ্নের উত্তর এখনই দেবার জন্য যেন তাঁকে পীড়াপীড়ি করা না হয়। অর্থাৎ ইরাণীদের সাবধান করে দেয়া হোল যে, দরকার হলে বৃটিশ গভর্নমেন্ট যে-কোনো চরম পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। তবে এখন পর্যন্ত বৃটিশ গভর্ন-

(শেষাংশ ৫৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৪৮

...ত্তরঞ্জন এবং তাঁর দলকে [illegible] অদ্বৈত আশ্রম রাজোচিত সম্মান [illegible] আতিথেয়তা দেখিয়েছিলেন, একথা [illegible] বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা [illegible] না। একটা কথা বললে এ কথার [illegible] প্রমাণ দেওয়া হবে।

আমাদের ব্যবহারের জন্য যা-কিছু [illegible], এমন কি সামান্য একটা টুল [illegible], আশ্রম বেরিলি থেকে একেবারে [illegible] নূতন খরিদ করে আনিয়েছিলেন। [illegible] এবং গেস্ট হাউসের যাবতীয় [illegible]পত্রের কথাই বলছি। তখনকার [illegible] সকল দ্রব্যের মোট মূল্য খুব বেশি [illegible] ছিল না; বেরিলি থেকে বহন করে [illegible] সমেত হয়ত চারশ' সাড়ে [illegible] টাকার অধিক পড়ে নি। কিন্তু এ [illegible] টাকা-পয়সার কথা গৌণ; আসল কথা হচ্ছে, পূর্ব-ব্যবহৃত কোনো জিনিসের [illegible] থেকে মুক্ত রাখার সুবিবেচনা এবং [illegible]।

[illegible] আহার-পর্ব শেষ হলে চিত্তরঞ্জন [illegible] চেকের ওপর তাঁর আশ্রম-ঋণ [illegible] করলেন। এ অবশ্য অর্থঘটিত [illegible] কথা নয়, আসবাবপত্রের মূল্যের [illegible] হিসাবও এর মধ্যে ছিল না। এ [illegible] মুক্তহস্ত পুরাতন পৃষ্ঠ-[illegible] সাধারণ কর্তব্যের ঋণ পরিশোধ।

চিত্তরঞ্জনের মতো দানশীল ব্যক্তি আমার অভিজ্ঞতায় আমি আর একটিও দেখি নি। এক সময়ে তিনি বাঙলা দেশের দ্বিতীয় [illegible] হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যেদিকে [illegible] সেইদিকেই তাঁর দয়া; যেদিকে অনটন সেইদিকেই দাক্ষিণ্য। মায়াবতী ত্যাগ করে [illegible] যাওয়ার পূর্বে কাঠগুদাম থেকে [illegible] আসবার পথে তাঁর দানশীলতার [illegible] কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম, তা বাদ দিয়ে গেলে মায়াবতী কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসের ১০ই ১১ই তারিখের কথা। রামগড়ের ডাক-বাংলো ত্যাগ করে আমরা মাইল দশেক দূরবর্তী পিউড়া অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করেছি। কাঠগুদামে রেল থেকে অবতরণ করার পর ডাণ্ডি ও অশ্বপৃষ্ঠে আমাদের পর্বতারোহণ আরম্ভ হয়েছিল। কাঠগুদামের পর ভীমতাল; তৎপরে রামগড়।

রামগড় থেকে পিউড়া পর্যন্ত পথের দৃশ্য অপূর্ব। পাহাড়ে পাহাড়ে সুসজ্জিত দীর্ঘ পাইন গাছের কুঞ্জ, এমনভাবে সজ্জিত যে, দেখলে মনে হয় কেউ যেন সেগুলিকে চারা অবস্থায় একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সাজিয়ে রোপিত করেছিল। পথের এক পার্শ্বে নানা শ্রেণীর ফার্ন এবং বনপুষ্পে শোভিত পর্বতগাত্র; অপর পার্শ্বে গভীর খড্ বহু-নিম্নে অধিত্যকায় গিয়ে শেষ হয়েছে,—তাকিয়ে দেখলে মনে হয় অধিত্যকা-ভূমির উপরে যেন নানা কারুকার্যখচিত একখানি মূল্যবান গালিচা পাতা রয়েছে। আকাশ সুনির্মল; বায়ু সুশীতল; এবং শেষ শরতের বর্ষণধারায় অচিরস্নাত গাছ-পালা লতাপাদপের মধ্যে প্রাণখোলা শ্যামলের অভিষেক।

কাঠগুদাম থেকে যাত্রা করবার কালে কুলির অনটনের জন্য সব জিনিসপত্র আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি, অধিকাংশই পিছনে ফেলে আসতে হয়েছিল। কাঠগুদামে যে বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের মায়াবতী যাত্রার ব্যবস্থা করছিলেন, তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, আমাদের রওনা হবার অনতিবিলম্বেই লোকজন সংগ্রহ করে জিনিসপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। সে আশ্বাস ব্যর্থ হয় নি। আমরা রামগড় পৌঁছবার ক্ষণকাল পরেই কুলি ঘোড়া এবং দ্রব্যাদি সবই এসে পৌঁছেছিল। পরদিন প্রাতে রামগড় থেকে আমরা যখন যাত্রা করলাম, তখন আটখানা ডাণ্ডি, একটা ডুলি, একশ' তিনজন কুলি, আটাশটা লাদ্দু ঘোড়া ও গুটিকয়েক সওয়ারি ঘোড়ার দ্বারা গঠিত আমাদের বিপুল বাহিনীটিকে দেখে মনে হচ্ছিল, হিমালয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করে আমরা যেন কোনো সুদূর এবং দুর্গমের অভিযানে যাত্রা করেছি। এই সুদীর্ঘ বাহিনীর সর্বাগ্রে চলেছিল চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডি, তার পরে বাসন্তী দেবীর এবং তৎপরে আমার।

রামগড় হ'তে কিছু দূর আসার পর সহসা এক জায়গায় দুই-তিনটি পাহাড়ি বালক-বালিকা চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডির নিকট উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকে ফার্ন ও পাহাড়ি পুষ্পে রচিত এক-একটি ক্ষুদ্র পুষ্পগুচ্ছ চিত্তরঞ্জনকে উপহার দিয়ে হাত পেতে ডাণ্ডির সঙ্গে সঙ্গে চলল। চিত্তরঞ্জনের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না—বকশিস দিতে হবে।

একবার তিনি পেছনদিকে দৃষ্টিপাত করলেন—বোধকরি কোষাধ্যক্ষ ললিতবাবুর উদ্দেশে,—যদি কিছু ভাঙানো পয়সা তাঁর কাছে পাওয়া যায় হয় ত' সেই অভিপ্রায়ে। ললিতবাবু কিন্তু বহু পশ্চাতে ছিলেন, তাঁর নাগাল পাওয়া সহজ মনে হ'ল না। তখন চিত্তরঞ্জন নিজ ডাণ্ডিতে রক্ষিত এটাচি কেস্ খুলে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে একটি করে রৌপ্যমুদ্রা উপহার দিলেন।

অর্থবান ব্যক্তিরা যখন পাহাড়ের পথে যাতায়াত করে, পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা এই উপায়ে কিছু পয়সা অর্জন ক'রে থাকে। সাধারণত সকলেই একটি করে পয়সা দেয়; কদাচিৎ কেহ কখনো দেয় দু পয়সা। বর্তমান ক্ষেত্রে এক পয়সার স্থলে এক টাকা করে পেয়ে ছেলেদের বিশ্বাসই হয় না যে, সত্যসত্যই তারা এক টাকা করে পেয়েছে। একবার হস্তস্থিত টাকার দিকে ও একবার চিত্তরঞ্জনের মুখের দিকে চাইতে চাইতে গভীর বিস্ময়ের সহিত দুরূহ রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করতে থাকে। সত্যই তারা এক টাকা করে পেয়েছে, অবশেষে যখন সে বিষয়ে সুনিশ্চিত প্রতীতি জন্মায়, তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা দিকে দিকে ছুটে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে দাবাগ্নির মতো চতুর্দিকে বার্তা ছড়িয়ে পড়ে 'কলকাত্তাকা রাজা আয়া হ্যায়'! পর্বতগাত্র থেকে গোটা তিন-চার ফুল ও কিছু ফার্ন

ছি'ড়ে নিয়ে লতাগুল্ম দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে ছেলেমেয়ের দল উন্মত্ত লালসায় ছুটতে থাকে চিত্তরঞ্জনের ডান্ডির দিকে। মুখে তাদের সমুচ্চ প্রশস্তি ধ্বনি, "রাজাজীকা জয়, রাজাজীকা জয়, রাজাজীকা জয়!'

কেউ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দফা ফুল দিচ্ছে কি না, বর্থাশশ্ পেয়ে দ্রুতগতিভরে পাকদন্ডি পথে অবতরণ ক'রে পুনরায় বাহিনীর অগ্রভাগে সদর রাস্তার উপর নূতন পুষ্প হস্তে কেউ উঠছে কি না, সে সকল দেখবার অথবা সন্দেহ করবার মতো বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তি রাজাজীর আছে বলে মনে হয় না। নিঃশব্দে নিরাপত্তি সহকারে প্রসন্নমুখে মাথা নেড়ে নেড়ে একটি ক'রে পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে তিনি একটি ক'রে টাকা দিতে লাগলেন। পুষ্পগুচ্ছের দ্বারা ডান্ডি যে-পরিমাণ সমৃদ্ধ হ'তে লাগ্‌ল, রৌপ্যমুদ্রার দ্বারা এ্যাটাসি কেস্ ঠিক সেই পরিমাণে রিক্ত হ'য়ে চলল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিনিট পনের কুড়ির মধ্যে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন টাকা উড়ে গেল।

আমার ডান্ডিওয়ালাদের মধ্যে একজন বল্‌লে, "হুজুর, মেমসাহেবের ডান্ডি থেমে গেছে।"

পরমুহূর্তেই আমার ডান্ডি বাসন্তী দেবীর ডান্ডির পাশে এসে উপস্থিত হল।

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বাসন্তী দেবী বললেন, "উপেনবাবু, সামলান আপনি ও'কে। এই রকম টাকার বৃষ্টি চলতে থাকলে ও'র অ্যাটাশি কেস ত দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে। তারপর হাত পড়বে আমার অ্যাটাশি কেসে,—আর, তারপর আপনারটাতে। মায়াবতী পৌঁছে খুচরো খরচের জন্যে একটি টাকাও হাতে থাকবে না।"

ব্যাঙ্ক, হাটবাজার, দোকান-পশারের একান্ত অভাববশতঃ মায়াবতীতে নোট ভাঙানো অসুবিধাজনক ব্যাপার বলে কিছু নগদ টাকা আমাদের সঙ্গে আনবার জন্য গণেন মহারাজ পরামর্শ দিয়ে এসেছিলেন। তদনুসারে হাজারখানেক কাঁচা টাকা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিনটি আ্যাটাশি কেসের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় চলেছিল। পাহাড়ের পথে ঐ তিনটি অ্যাটাশি কেস একত্রে না রেখে আমাদের তিনখানা ডান্ডিতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

বাসন্তী দেবীকে আশ্বস্ত করে আমার ডান্ডিওয়ালা কুলিদের বোঝালাম যে, যেরূপ প্রবল স্রোতে অর্থ নিঃশেষ হতে আরম্ভ করেছে, অচিরে তা রোধ করতে না পারলে তাদের পক্ষেও ব্যাপারটা সুবিধার হবে না। সুতরাং উভয়পক্ষের স্বার্থের অনুরোধে এই নাছোড়বান্দা ছেলেমেয়েদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দেওয়াই সমীচীন।

আমার কুলি চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন বললে, "হুজুর সুবিধেও আছে। সামনে অনেকখানি পথ মিঠা উৎরাই, দৌড় দেওয়া চলবে।"

বল্‌লাম, "তবে আর কথা নেই, সর্বশক্তি সংহত করে দাও দৌড়! কিন্তু তার আগে পিছনের ডান্ডিওয়ালাদিগকে দৌড়ে সরিক হবার জন্যে কথাটা বুঝিয়ে দাও। আর সাহেবের ডান্ডির কুলিদিগকে বুঝিয়ে দিয়ো সাহেবের ডান্ডি ছাড়িয়ে যেতে যেতে।"

ঠিক রণকৌশলেরই মতো এই গোপন অভিসন্ধিটুকু অবিলম্বে আমাদের বাহিনীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে গেল। তারপর আকাশ-বাতাস পাহাড়-পর্বত বিদীর্ণ করে আমার ডান্ডিকুলিরা এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর সকল কুলি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠল, জয়! চন্ডীমাই কী জয়! জয়! বরাই দেবী কী জয়! এবং সঙ্গে সঙ্গে সবেগে দৌড়।

দ্রুতগতি ভরে চিত্তরঞ্জনের ডান্ডি অতিক্রম করবার সময়ে চেয়ে দেখি চিত্তরঞ্জনের মুখ-মন্ডলে গভীর বিস্ময়ের প্রশ্ন। আমার সহিত চোখোচোখি হতে উপরদিকে মুখ নেড়ে নির্বাক ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? রেস?—না, অন্য আর কিছু?

উত্তর দেবার সময় পেলাম না, দিলেও হয়ত অসত্য ভাষণ করতে হত; চক্ষের নিমেষে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে এগিয়ে গেলাম।

পিছন দিকে তখন ছেলের দল 'রাজাজীকা জয়! রাজাজীকা জয়!' রবে দ্রুত বেগে আমাদের প্রতি ধাওয়া করেছে; আর, ললিত-বাবু তাঁর ডান্ডিতে অর্ধদন্ডায়মান অর্ধো-পবিষ্ট অবস্থায় অবস্থান করে উত্তেজিত হয়ে লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতে চিৎকার করছেন, হাটো! হাটো! হাটো! হাটো!

চতুর্বাহকবাহিত ডান্ডির সহিত পাল্লা দেওয়া শক্ত; সুতরাং ছেলের দল ক্রমশঃ পেছিয়ে পড়ছিল। ইত্যবসরে আমাদের বাহিনীটি দ্বিধাছিন্ন হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিশীল হওয়ার দরুণ ডান্ডিগুলো বেশ খানিকটা এগিয়ে চলেছে এবং অবশিষ্ট অংশ যথাসম্ভব গতি বৃদ্ধি করে পিছনদিকে অনুসরণ করছে। চেয়ে দেখে মনে হল, ছেলেরা পেছিয়ে গিয়ে বাহিনীর পশ্চাৎভাগের লোক-জনের নিকট কিছু আবেদন-নিবেদন করছে। কিন্তু তার দ্বারা ফললাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না; কারণ আমাদের ট্রেণের প্যাসেঞ্জার গাড়ির পিছন দিকের অংশ হচ্ছে মাল গাড়ি, —তার রুদ্ধ লৌহ দরজায় মাথা কুটলেও একটি কণিকা বার হবার সম্ভাবনা নেই। অবিলম্বে এ কথা উপলব্ধি করে ছেলের দল দাঁড়িয়ে পড়ে পলায়মান বাহিনীর প্রতি ক্ষণকাল নিরুপায় নৈরাশ্যে চেয়ে রইল, তারপর রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজেদের গ্রামের অভিমুখে ফিরে গেল।

দানশীলতার যে মহিমময় নিঃস্বার্থ কৌশলের, অথবা অপকৌশলের পাত ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিলাম, ডান্ডিতে বসে মুগ্ধচিত্তে তার কথাই ভাবছিলাম। যে অর্থ চিত্তরঞ্জন এইমাত্র দান করলেন, তার পরিমাণ অবশ্য এমন কিছু বেশি নয়, বড় জোর ছাপ্পান্ন-সাতান্ন টাকা। কিন্তু দানের মধ্যে পরিমাণের কথাটা তত বড় নয়, প্রবৃত্তির কথা তত বড়। ক্ষুধার্তকে ভিখারীর এক মুষ্টি অন্ন দানের কাছে ধনবানের কত সহস্র টাকার দান ম্লান হয়ে যায়। হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের অশ্রদ্ধাপ্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের শ্রদ্ধাপূত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেছিলেন। প্রবৃত্তির দিক থেকে বিচার করলে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় দাতা কদাচিৎ দেখা যায়। বৎসকে দেখলে গাভীমাতার স্তনে দুগ্ধ যেমন আপনা-আপনি নেমে আসে, অভাব দেখলে চিত্তরঞ্জনের মনে দানশীলতার প্রবৃত্তি ঠিক সেইরূপ স্বতঃস্ফূরিত হত।

পুষ্পগুচ্ছের বর্তমান কাহিনীটি এবং অতঃপর যে কাহিনী বলব, উভয় কাহিনীই 'মায়াবতী পথে'র বিবরণের মধ্যে বিবৃত করেছিলাম। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের দানশীলতার প্রসঙ্গে এ দুটি কাহিনী বাদ দিলে সে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলে এ দুটি পুনরাবৃত্তি করলাম। (ক্রমশঃ

রাজগৃহ - নালন্দা • ডাঃ অমূল্যচন্দ্র সেন

• রেখাচিত্র • ইন্দ্র দুগার •

সপ্তপর্ণী—স্তূপ (?)

পিপ্পলিগুহার উত্তরের খোলা মাঠের মধ্যে এবং নূতন-রাজগৃহের পশ্চিমের ...ক স্তূপ পর্যন্ত এলাকায় সম্ভবত বৌদ্ধ ...শীতবন ছিল। বুদ্ধ প্রায়ই শীতবনে থাকিতেন। পিপ্পলিগুহার সামনে হইতে ...সপ্তপর্ণী গুহার সীমানা পর্যন্ত ...অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, এই ...পবিত্রতাবশতঃ বোধহয় পরবর্তী-কালে এখানে অনেক বিহার-স্তূপাদি নির্মিত হইয়াছিল। এদিকের বৈভার গাত্রে ...বড় পাথরের গাঁথনির চিহ্ন এবং ...আছে এই গুহাগুলিতে সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকিতেন। পাহাড়ের নিচে হইতে ...উঠিবার জন্য বৈভারের উত্তর ...ভাল পথ যে ছিল তাহারও চিহ্ন ... কিন্তু দর্শক এ পথে উঠিবার ... একটু পরে বৈভারের উপর সপ্তপর্ণীর পথের যে বিবরণ দেওয়া ...সেই পথে সপ্তপর্ণী গুহা দেখিবেন। ...উত্তরের মাঠ হইতে উপরে ...সপ্তপর্ণী গুহা দেখা যায়। আরও ...পশ্চিমে গেলে বৈভারের তল-...জায়গার উপর প্রকান্ড একটি ...শেষ দেখা যায়। সার জন ... করেন যে, অজাতশত্রু প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির জন্য সপ্তপর্ণী গুহার সামনে বা কাছে যে মণ্ডপ তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন, এই উঁচু গাঁথনি সেই মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না, কারণ প্রথমত এই গাঁথনির কাছাকাছি গিরিগাত্রে কোন গুহা নাই যাহাকে সপ্তপর্ণী গুহা বলা যাইতে পারে এবং দ্বিতীয়ত অজাতশত্রু যাহা তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন তাহা 'মণ্ডপ' বা দ্রুত নির্মিত অস্থায়ী ছাউনিমাত্র ছিল। সপ্তপর্ণীর কাছে যে স্তূপের কথা ফা হিয়েন বলিয়াছেন, এই উঁচু গাঁথনি সেই (সম্ভবত অশোক নির্মিত) স্তূপ হইতে পারে, অথবা সপ্ত-পর্ণীর স্মারক অপর কোন চৈত্য বিহারাদি এখানে পরে নির্মিত হয়। ফা হিয়েন ও হিউয়েন ৎসাং উভয়েরই বর্ণনা হইতে ঠিক বুঝা যায় না যে, তাঁহাদিগকে সপ্তপর্ণী বলিয়া যাহা দেখান হইয়াছিল তাহা গিরি-গাত্রের অনেকটা পূর্বদিকে ও উপরের গুহা-গুলি, না নিচের এই উঁচু গাঁথনিটি। কিন্তু সর্বদিক বিবেচনা করিয়া মনে হয় উপরের গুহাগুলিই ছিল আসল সপ্তপর্ণী এবং সাধারণ লোকের মনে কালক্রমে নিচের স্তূপাদিও সপ্তপর্ণীর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছিল।

জরাসন্ধকী বৈঠক

জরাসন্ধকী বৈঠক, বৈভারের কুন্ড ও ধারা

৩য় দিন, বৈকাল—গঙ্গা-যমুনা ধারার দক্ষিণের পথ দিয়া জরাসন্ধকী বৈঠকে উঠিতে হয়। দর্শক এই দ্রষ্টব্যটি দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই নামিয়া আসিবেন, কারণ সন্ধ্যার পর বৈভারে বাঘ-ভালুক বাহির হইবার ভয় থাকে এবং পথও খারাপ।

সাতধারার প্রথম ধারা

নিচে ব্রহ্মকুণ্ড, সাতধারা (বা শতধারা?) প্রভৃতির চারিদিকে সর্বত্র প্রাচীন মন্দিরাদির অবশেষের উপর আধুনিক নির্মাণ। সাতধারার দক্ষিণে নিচু জায়গায়, একটি প্রকাণ্ড পাথর বাঁধান বড় প্রাচীন পুষ্করিণী। বৈভারের জলধারাগুলি খুব গরম। বৈজ্ঞানিকপ্রবর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বলিয়াছেন, রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণ-গুলির জলে রেডিয়াম-শক্তি আছে। বাত-প্রভৃতি বেদনায় এই জলে স্নান করিয়া এবং হজমের রোগে এই জল গরম বা ঠাণ্ডা করিয়া পান করিয়া অনেকে খুব উপকার পাইয়া থাকেন। রাজগীরের অন্য কয়েকটি কূপের জলেরও হজমীগুণ আছে শুনা যায়।

বৈভারগিরিতে আরোহণ, সপ্তপর্ণী গুহা

৪র্থ দিন, সকাল—জরাসন্ধকী বৈঠকের পাশ দিয়া বৈভারগিরিতে উঠিবার পথ। সব পাহাড়ের মধ্যে বৈভারে ওঠাই সবচেয়ে কষ্টসাধ্য, রাস্তাও ভাল নাই। উপরে সপ্ত-পর্ণী গুহা পর্যন্ত যাইতে হইলে উঠিবার জন্য অন্তত এক ঘণ্টা সময় দিতে হয়। উপরের সব দ্রষ্টব্য ঘুরিয়া দেখিতে হইলে আরও দুই তিন ঘণ্টা সময় হাতে রাখিতে হয়। উপরে উঠিবার সময়ে দুইদিকে অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, এখানে কোন স্থানে বুদ্ধ একবার ধর্মশিক্ষা দিয়াছিলেন এবং সেখানে হিউয়েন ৎসাং একটি স্মারক স্তূপ দেখিয়াছিলেন। কিছুদূর উপরে উঠিয়া যেখানে পাথর বাঁধান রাস্তার মত মনে হয় আসলে তাহা গিরিপ্রাকারের একটি শাখার ভিত্তি। উপরের নূতন জৈন মন্দিরগুলির দক্ষিণে একটি প্রাচীন জৈন মন্দির ও একটি প্রাচীন শিব মন্দির ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা যায়। তৃতীয় নূতন জৈন মন্দিরটির কাছে উত্তরদিকে যে পথ নামিয়া গিয়াছে তাহাতে অল্প দূর গেলে সপ্তপর্ণী গুহায় পৌঁছান যায়। বুদ্ধ কখন কখন এখানে বাস করিতেন। নিকটে সপ্তপর্ণী বা ছাতিম গাছ থাকায় গুহার ঐ নাম হয়। মহাবস্তুতে আছে যে, গুহাগুলির পুরোভাগ প্রস্তরাবৃত ও বৃক্ষাদিযুক্ত সুচ্ছায় ছিল। হিউয়েন ৎসাং গুহার পুরোভাগ (পাহাড়ের নিচে?) বাঁশ-বনে ঘেরা দেখিয়াছিলেন। গুহাগুলির পুরোভাগ এখন যতটা বিস্তৃত পূর্বে সম্ভব তার চেয়ে বেশি বড় ও পাথর বাঁধান ছিল। পুরাতাত্ত্বিকরা বলেন, সেই প্রাঙ্গণ যে ধসিয়া পড়িয়াছে তাহার চিহ্ন এখনও বর্তমান। সম্ভব সেই প্রাঙ্গণের উপরই মণ্ডপ বানাইয়া প্রথম সংগীতির অধিবেশন হয়।

বৈভারের সর্বোচ্চ উচ্চতা ১১৪৭ ফুট। বৈভারের উপর হইতে উত্তরদিকের সমতল-ভূমির আলবাঁধা খণ্ড খণ্ড নানা রঙের শস্যক্ষেত্রের শোভা বুদ্ধ একবার আনন্দকে দেখিতে বলিয়াছিলেন। বুদ্ধ বড়ই সৌন্দর্য-প্রিয় ছিলেন এবং সুন্দর কিছু দেখিলেই তাহার প্রশংসা করিতেন ও অন্যকে দেখাইতেন। তৃতীয় জৈনমন্দির হইতে আরও দক্ষিণের জৈনমন্দিরগুলির দিকে গেলে গিরিপ্রাকারের অনেক অংশ চোখে পড়ে। ঐদিকে পাহাড়ের উত্তর কোলে একটি বাঁধ বাঁধিয়া একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার জল নিয়মিত করিবার জন্য Sluice Gate ছিল। উপর হইতে পুষ্করিণীতে পৌঁছিবার জন্য সুন্দর প্রশস্ত বাঁধান ঢালু পথ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বৈভারের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ জৈন মন্দিরের কাছে দাঁড়াইয়া চারদিকের পর্বতশিরে গিরি-প্রাকার, নিচে সামনে সমগ্র প্রাচীন নগর ও তাহার প্রাচীর, ডাইনে নগরপ্রাচীর ও গিরি-প্রাকারের মধ্যবর্তী শহরতলীর পুষ্করিণী প্রভৃতি, গিরিপ্রাকারের বাহিরে রণভূম প্রভৃতির খুব ভাল ধারণা হয়।

গিরিপ্রাকারের উত্তর দ্বার, নগরপ্রাচীরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দ্বার

৪র্থ দিন, বৈকাল—এখন দর্শক গিরি-প্রাকারের উত্তর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইবেন। বেণুবনের দক্ষিণ সীমা ও দোকানপাটগুলি ছাড়াইয়া চলিবার সময়ে বামে বিপুল গিরির তলদেশ পর্যন্ত ও ডাইনে বৈভারের গায়ে ও তল-দেশে অনেক ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যাইবে। উত্তর দ্বারে পৌঁছিবার পূর্বে রাস্তায় প্রাচীন জলনিকাশের পথ দেখা যায়, এখান দিয়া বিপুলগিরির বৃষ্টিজল নদীতে আসিয়া পড়িত। গিরিপ্রাকারের দ্বারে সংলগ্ন প্রহরীদের বাসকক্ষের চিহ্ন দেখা যাইবে। বিপুলগিরি হইতে গিরিপ্রাকার কিভাবে নামিয়া বৈভারে উঠিয়াছিল তাহার

বৈভারশিরের একটি জৈন মন্দির

জরারাক্ষসীর মন্দির

...ও পাওয়া যাইবে। গিরিপ্রাকার ও ...র বড় বড় পাথর ভূমিকম্পাদিতে ও ... শত্রুর আক্রমণেও স্থানচ্যুত হইয়া ...রের সামনে পিছনে নানা স্থানে পড়িয়া ...। দ্বারের পশ্চিমদিকে নদীতীরে ...টি শ্মশান, হয়তো প্রাচীনকালেও নগর-...চীর ও গিরিপ্রাকারের মাঝখানে বা ...প্রাকারের বাহিরে এখানে শ্মশান ছিল। ...প্রাচীরের পরেই খাল। প্রাচীন নগরের ...ও উত্তরদিকে এই খাল এবং পশ্চিমে ... পরিখার কাজ করিত। খালের পরেই ...প্রাচীরের উত্তর পশ্চিম দ্বার—পুরাতত্ত্ব বিভাগ ইহাকে নগরপ্রাচীরের উত্তর দ্বার বলিয়াছেন কিন্তু তাহা ঠিক নয়, কারণ এই ...রের কিছু পূর্বদিকে যেখানে পূর্বদিক হইতে একটি খাল ও দক্ষিণদিক হইতে একটি খাল আসিয়া মিশিয়াছে সেখানে নগরপ্রাচীরে একটি দ্বারের ও খালের উপর দিয়া ... পুলের চিহ্ন আছে। বড় বড় ... খণ্ড ভাঙিয়া খালের মধ্যে ও পাশে পড়িয়া আছে। ডাঃ মজুমদার বলিয়াছেন ... ৎসাং নগরপ্রাচীরের উত্তর দ্বার বলিতে এই দ্বারটিই বুঝিয়াছিলেন, পুরাতত্ত্ব বিভাগ যাহাকে উত্তরদ্বার বলিয়াছেন ... নয়। অতএব পুরাতত্ত্ব বিভাগ যাহাকে উত্তরদ্বার বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক উত্তর পশ্চিম দ্বার। এই দুই দ্বারের পূর্বে ও পশ্চিমে নগরপ্রাচীরের উত্তরাংশের চিহ্নও ও ... দেখা যাইবে।

খাল পার হইবার পর বর্তমানের রাস্তার অল্প পশ্চিমে প্রাচীন রাজপথের ঢালু রেখা, এখনকার রাস্তা যেমন প্রাচীন বাড়িঘরের উপর দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার অনেক পরিচয় দর্শকের চোখে পড়িবে। একটু অগ্রসর হইয়া রাস্তার পূর্বদিকে এক জায়গায় বর্ষার জলনিকাশের পথে একটি গর্তের মত আছে, সেখানে প্রাচীন যুগের আর একটি রাস্তার উপর্যুপরি সাতটি স্তর দেখা যায়। এখান হইতে পিছনে বৈভারের দিকে তাকাইলে গিরিপ্রাকারের রেখা দেখা যাইবে। এখান হইতে দর্শক আবার খালে ফিরিয়া খালের দক্ষিণ পাড় দিয়া সরস্বতীর দিকে যাইবেন। নগরপ্রাচীরের উত্তরপূর্ব কোণের উপরে মন্দিরটি আধুনিক, পাণ্ডারা ইহাকে জরারাক্ষসীর মন্দির বলে। প্রাচীর-কোণ ঘুরিয়া ... প্রাচীরের পাশ দিয়া দ... গেলে প্রাচীরগাত্রে একটি কাটা ...। এখানে বড় বড় মাটির কল... মৃতাস্থি ... পাওয়া গিয়া...র গাত্রে এখন ...লসি ও অ...শেষ দেখা ...। ইহা খুব প্রাচীন যুগের মৃতসৎকার প্রথার পরিচায়ক, সে ...মৃতদেহ ...করিবার পর অস্থি-গুলি ...পাত্রে ভরিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হইত।

এখান হইতে দর্শক সন্ধ্যার মধ্যে নগরে ফিরিয়া আসিবেন কারণ প্রাচীন নগরে (Old fort) রাত্রে বাঘ ভাল্লুক ও বন্যশূকর বাহির হয়।

বলরামমন্দির

৫ম দিন, সকাল—"জরারাক্ষসীর মন্দির"-এর কাছে সরস্বতী পার হইয়া দর্শক নদীর পশ্চিম কূল ধরিয়া দক্ষিণে চলিলে অল্প পরেই একটি খুব বড় পাথরে গাঁথা ভিত্তি দেখিতে পাইবেন। এটি বোধ হয় আদিতে স্তূপ ছিল, পরে ইহার উপর সম্ভব হিন্দু-মন্দির নির্মিত হয়। খননের সময়ে এখানে বলরামের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া ইহাকে বলরামমন্দির বলা হয়।

সোনভাণ্ডার

আরও দক্ষিণে গেলে সোনভাণ্ডার। পাণ্ডাদের কাহিনী অনুসারে ইহা ছিল রাজা বিম্বিসারের স্বর্ণভাণ্ডার এবং ইহার ভিতরের দেওয়ালের রহস্যময় লিপিতে গুপ্তধন পাইবার পথের নির্দেশ আছে, যে এই লিপিরহস্য ভেদ করিতে পারিবে রাজার গুপ্তধন সেই পাইবে! আসলে

সোনভাণ্ডার—জীর্ণসংস্কারের পূর্বে

কিন্তু ইহা সাধুদের বাসের জন্য পাথরকাটা ঘর। ভিতরের দেওয়ালের (রহস্যময়!) ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, একজন জৈন সাধু তপস্বীদের বাসের জন্য ইহা খৃঃ ৪ শতকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার ভিতরের মূর্তিগুলি জৈন তীর্থংকরদের। এই গুহাগৃহ পূর্বে দ্বিতল ছিল, উপরের তলা এখন ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

রংভূম বা মল্লভূমি; জেঠিয়ান

সোনভাণ্ডার হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে কিম্বদন্তীর মল্লভূমি, যেখানে ভীম জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে বধ করেন। এখানে আসিবার পথে নগরপ্রাচীর, এবং গিরিপ্রাকারের শাখা বৈভার হইতে নামিয়া সমতলভূমির উপর দিয়া সোনাগিরিতে উঠিয়াছে, তাহা পার হইয়া যাইতে হয়। মল্লভূমির মাটি প্রাকৃতিক কারণে নরম ও সাদা, পাণ্ডারা বলে জরাসন্ধ দুধ ও ঘি দিয়া মল্লভূমির মাটি নরম ও মিহি করিয়াছিলেন। বিহারী কুস্তিগিররা এই মাটি গায়ে মাখিয়া ও লইয়া গিয়া প্রায় ফুরাইয়া দিয়াছে। মল্লভূমি হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে যে পথ গিয়াছে, সেই পথে ৬ মাইল দূরে জেঠিয়ান (যষ্টিবন, পালিতে লট্‌ঠিবন) এখানে অনেক ধ্বংসাবশেষ আছে।

সোনাগিরি

মল্লভূমি হইতে সোনভাণ্ডারের দিকে ফিরিবার সময়ে যে রাস্তা সোনভাণ্ডার হইতে মনিয়ার মঠের দিকে গিয়াছে সেই রাস্তায় সরস্বতী পার হইয়া পূর্বদিকে একটু গেলেই যে পথ দক্ষিণে গিয়াছে সেই পথে সোনাগিরিতে উঠিতে হয়। পথে নগরপ্রাচীরের দক্ষিণদিকের শাখা পার হইতে হয়, সম্ভব এখানে একটি দ্বারও ছিল। সোনাগিরি হইতে প্রাচীন নগরের দক্ষিণাংশ ও নগরপ্রাচীর বেশ ভাল দেখা যায়। প্রাচীন নগরের দক্ষিণাংশই ছিল প্রাচীনতম অংশ, গিরিব্রজ বা কুশাগ্রপুর। এখানে ঘনসন্নিবিষ্ট বহু বাড়িঘর ও রাস্তার চিহ্ন আছে, কিন্তু এখন দুষ্প্রবিশ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন। সোনাগিরির উপরে উঠিলে গিরিপ্রাকারও বেশ ভাল দেখা যায়। সেখান হইতে গিরিপ্রাকারের উপর দিয়াও বানগঙ্গায় যাওয়া যায়।

সোনাগিরি হইতে নামিয়া মনিয়ার মঠের দিকে এখন না গিয়া, সোনভাণ্ডারে আসিবার সময়ে দর্শক যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন সেই পথে বাসায় ফিরিবেন। ইহাতে পথ কম হইবে।

মনিয়ার মঠ

৫ম দিন, বৈকাল—গিরিপ্রাকারের উত্তর দ্বার দিয়া বর্তমান পাকা রাস্তা ধরিয়া দর্শক সোজা মনিয়ার মঠে আসিবেন। পথে দুই দিকে বাড়িঘরের ভিত্তি, ডাইনে প্রাচীন রাজপথের রেখা, বাঁয়ে একটি বড় ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি লক্ষ্য করিবেন। কয়েক জায়গায় অবস্থাপন্ন লোকের প্রাচীরবেষ্টিত বাড়ির চিহ্ন আছে। মনিয়ার মঠের ঠিক সামনে ইঁটবাঁধান একটা প্রাচীন কূপ আছে।

মনিয়ার মঠ খননে এ পর্যন্ত ৫টি স্তর পাওয়া গিয়াছে। উপরের স্তরে জৈন বৌদ্ধ শৈব প্রভৃতি দেবালয় ছিল এবং নিচের স্তরে (খৃঃ ১—২ শতক) প্রাপ্ত মূর্তি প্রভৃতি হইতে দেখা যায় যে, সে যুগে ইহা নাগ-নাগিনীপূজার ক্ষেত্র ছিল। মহাভারতে আছে যে, মণিনাগ ছিলেন রাজগৃহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং যক্ষ-যক্ষিনী পূজাও ছিল রাজগৃহে খুব প্রসিদ্ধ। মনিয়ার মঠই সম্ভব ছিল বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মণিমালক—চৈত্য এবং জৈনশাস্ত্রোক্ত মণিভদ্র-যক্ষালয়। নাগ-নাগিনী ও যক্ষ-যক্ষিনী পূজা অনার্য ভারতীয় ধর্মের অঙ্গ ছিল। নাগযক্ষাদি বিবিধ অপদেবতার প্রাধান্যের জন্য রাজগৃহের এত খ্যাতি ছিল যে, এইসব অপদেবতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বৌদ্ধভিক্ষুরা রাজগৃহে আসিলে একটি "পরিত্রাণ-মন্ত্র" জপ করিতেন। মনিয়ার মঠের চারিপাশ খননের সময়ে বড় গর্তের মধ্যে পশ্বাদির কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, সম্ভব এখানে পশুবলির প্রথাও ছিল। মহাভারতোক্ত জরাসন্ধের শিবলিঙ্গ পূজা ও নরবলির স্থানও সম্ভব এখানে ছিল। এইসব কারণে মনে হয়, এই "মঠ"টি অতি প্রাচীন দেবস্থান ছিল; ইহার দক্ষিণে ছিল প্রাচীন নগর গিরিব্রজ এবং সেই নগরের ইহাই ছিল সম্ভব প্রধান দেবালয়। গভীর খনন করিলে প্রাচীন যুগের পূজা, প্রাগার্য মগধের ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য এখানে আবিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই। চারিদিকের প্রাচীরের উপর দিয়া বেড়াইলে বুঝা যায়, কালক্রমে এই মঠ কত বড় আকার ধারণ করিয়াছিল।

মনিয়ার মঠ হইতে দর্শক সন্ধ্যার পূর্বে শহরের দিকে রওনা হইবেন। পরদিন সকালে অনেক পথ হাঁটিতে হইবে, তাই আজ বৈকাল-সন্ধ্যায় বিশ্রাম করিবেন।

৬ষ্ঠ দিন, সকাল—দর্শক যদি বানগঙ্গার দিক ও গৃধ্রকূট দেখা একই দিনে সারিতে ইচ্ছা করেন তবে মধ্যাহ্নের আহার, পানীয় জল ও স্নানের বস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া রওনা হইবেন কারণ এই দুইদিক অর্থাৎ প্রাচীন নগরের দক্ষিণ ও পূর্বদিক দেখিয়া ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইবে। অথবা যদি দুপুরের মধ্যে ফিরিতেই হয় তবে অতি প্রত্যুষে রওনা হইতে হইবে এবং গতিবেগ দ্রুত করিতে হইবে।

পাকা রাস্তা ধরিয়া সোজা মনিয়ার মঠে পৌঁছিয়া দর্শক পাকা রাস্তা ছাড়িয়া

মনিয়ার মঠ

নিয়ার মঠের পূর্ব দেওয়াল ঘেঁষিয়া যে পথ দক্ষিণে গিয়াছে সেই পথে চলিবেন, এই পথ প্রাচীন প্রশস্ত রাজপথ ছিল। পথের দুই পাশে বড় বড় বাড়ির ধ্বংসাবশেষ-শ্রেণীর ঢিবি পড়িয়া আছে, পশ্চিমে সমগ্র গিরিব্রজ কাঁটাগাছের জংগলে আচ্ছন্ন। জংগলের মধ্যে একটু প্রবেশ করিলে এখনকার বাড়ি ও রাস্তাগুলির কিছু ধারণা হইবে।

কারাগৃহ

প্রাচীন রাজপথ দিয়া নগরপ্রাচীরে পৌঁছিবার কিছু আগে বাঁদিকে একটা বড় ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি সম্ভব বন্দীশালা ছিল কারণ খননের সময়ে এখানে ভূসংলগ্ন লোহার আংটা পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে সম্ভব বন্দীদের শৃংখলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। অজাতশত্রু বোধ হয় বিম্বিসারকে এখানেই বন্দী করিয়া রাখেন কারণ বর্ণিত আছে যে, বন্দীশালা হইতে বিম্বিসার গৃধ্রকূট-শিরে বুদ্ধকে দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিক এই স্থান হইতে গৃধ্রকূট এবং গৃধ্রকূট-শিখর হইতে এই স্থানটি দেখা যায়।

প্রাসাদনগর

নগরপ্রাচীরে পৌঁছিলে যে দ্বারটি দেখা যায় তাহাকে দক্ষিণ-পশ্চিম দ্বার বলা হয়। কিন্তু হিউয়েন ৎসাং বর্ণিত প্রাসাদ-নগরের ইহা ছিল উত্তর-পশ্চিম দ্বার, ইহার দক্ষিণের অংশ ছিল রাজপ্রাসাদ-সমন্বিত প্রাসাদনগর। নগরপ্রাচীরের অল্প পরে ডানদিকে একটু দূরে একটা প্রাচীন কূপ আছে, ইহা সম্পূর্ণ পাথর কাটিয়া খনিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজপথ এই অঞ্চলে ধনুকের মত বাঁকিয়া যেখানে আধুনিক পাকা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে পুরাতাত্ত্বিকরা তাহার নির্মাণ-কৌশলের প্রশংসা করেন; ঢালু জমির উপর হইলেও রাস্তার চড়াই খুব অল্পে অল্পে বাড়িয়াছে।

রাজপ্রাসাদ; শেল (shell)-লিপি

প্রাচীন ও আধুনিক রাস্তার সংযোগ-স্থলের পশ্চিমে জংগলে আচ্ছন্ন অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ডাঃ মজুমদার হিউয়েন ৎসাং-এর বিবরণ হইতে অনুমান করিয়াছেন যে, বিম্বিসারের রাজপ্রাসাদ সম্ভবত এখানে ছিল। একটু অগ্রসর হইয়া বামে একটি এলাকায় অনেকখানি জায়গার উপর মাটিতে পাথরের উপর অদ্ভুত অক্ষরে কি যেন সব লেখা। এখানে পাথরের উপর গাড়ির চাকার গভীর দাগ হইতে মনে হয়, ইহা রাস্তা ছিল। এখন এখানে দেওয়াল ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে লিপি-গুলি নষ্ট না হয়। এই অদ্ভুত অক্ষরকে পণ্ডিতরা shell (ঝিনুক) লিপি বলেন, ইহার রহস্য এখনও ভেদ হয় নাই। এই অক্ষরের লিপি রাজগৃহের আরও অনেক স্থানে দেখা যায়, সাতধারার একটি উষ্ণ জল-প্রণালী মেরামতের সময়ে মাটির তলায় একটি পাথরেও এই লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপির চাবিকাঠি যেদিন আবিষ্কৃত হইবে সেদিন রাজগৃহ তথা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আমাদের জ্ঞানগোচর হইবে। "শেল"-

বানগঙ্গা
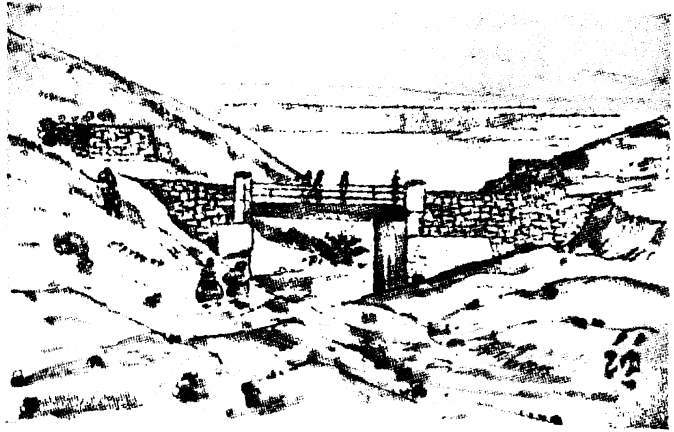
লিপির কাছ দিয়া উদয়গিরিতে উঠিবার পথ। আরও একটু দক্ষিণে রাস্তার বাম পার্শ্বে দুইটি ছোট স্তূপের অবশেষ।

বানগঙ্গা; গিরিপ্রাকারের দক্ষিণ দ্বার

বানগঙ্গার মুখের কাছে সোনাগিরি ও উদয়গিরির গিরিবর্ত্মে গিরিপ্রাকারের দক্ষিণ দ্বার। পূর্বে বলিয়াছি, এখানেই গিরিপ্রাকার সবচেয়ে দেখিবার মত; দর্শক সোনাগিরিতে উঠিয়া প্রাকারের আয়তন দেখিবেন। প্রাকারের বাহিরে দক্ষিণেও কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। রাস্তা এখানে গয়ার দিকে গিয়াছে।

সকাল ৮টা সাড়ে ৮টার মধ্যে এখান হইতে ফিরিতে না পারিলে "শেল"-লিপির কাছাকাছি খালের ধারের গাছের ছায়ায় পাথরের উপর দর্শক বিশ্রাম ও আহারাদি করিবেন। বানগঙ্গা বা খালের জলে স্নানাদি সারিয়া লইবেন কিন্তু এ জল পান করিবেন না।

৬ষ্ঠ দিন, বৈকাল—বেলা ২টা আন্দাজ এখান হইতে রওনা হইয়া যে প্রাচীন রাজ-পথে মনিয়ার মঠ হইতে আসিয়াছিলেন তাহা বাঁয়ে রাখিয়া দর্শক আধুনিক রাস্তা ধরিয়া নগরপ্রাচীরের যে দ্বারে উপস্থিত হইবেন তাহাকে দক্ষিণদ্বার বলা হয়। এই দ্বারকেই সম্ভব হিউয়েন ৎসাং 'প্রাসাদ-নগর'-এর উত্তরদ্বার বলিয়াছেন, কিন্তু জ্যাক্সন সাহেব ও ডাঃ মজুমদারের মতে ইহাকে পূর্বদ্বার বলাই বেশি সঙ্গত হয়। প্রাচীনকালেও সম্ভব এই দ্বারকে প্রাসাদ-নগরের পূর্বদ্বার বলা হইত। সুত্তনিপাত টীকায় আছে যে, বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইলে যেদিন প্রাসাদের উপর হইতে বিম্বিসার তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন সেদিন বুদ্ধ 'পূর্বদ্বার' দিয়া নগরে (নিশ্চয় প্রাসাদ-নগরে, কারণ অন্যত্র হইলে প্রাসাদ হইতে বিম্বিসার তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না) প্রবেশ ও নগর হইতে বাহির হইয়াছিলেন। অনেকে এই 'পূর্বদ্বার'কে নগরপ্রাচীরের পূর্বদ্বার বা উদয়গিরি ও শৈলগিরি গিরি-বর্ত্মে ৪।৫ মাইল দূরের গিরিপ্রাকারের পূর্বদ্বার ধরিয়াছেন কিন্তু সে সময়ে বুদ্ধ যদি পাণ্ডবপাহাড়ে (=বিপুলগিরি) থাকিতেন তবে সেখান হইতে শেষোক্ত পূর্বদ্বার দুইটির যে কোনটি দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইলে বুদ্ধকে গিরিপ্রাকার হইয়া ১০।১২ মাইল ঘুরিয়া আসিতে

হইয়াছিল কারণ গিরিপ্রাকার ও নগরপ্রাচীর পার হইবার অন্য উপায় ছিল না। অবশ্য ইহা হইতে পারে যে, বুদ্ধ পান্ডবপাহাড় হইতে গিরিয়াকে গিয়া এক বা ততোধিক দিন থাকিয়া সেখান হইতে গৃধ্রকূট হইয়া রাজগৃহের প্রাসাদনগরে আসিয়া পুনরায় পান্ডবপাহাড়ে ফিরিয়াছিলেন, যদিও বর্ণনায় তাহা যেন সব একই দিনের ঘটনার মত বলা হইয়াছে, অথবা হয়তো পরে গৃধ্রকূট বুদ্ধের প্রিয় বাসস্থান হইয়াছিল বলিয়া সুত্তনিপাত-টীকাকার ভুল করিয়া মনে করিয়াছিলেন সেদিনও বুদ্ধ গৃধ্রকূট হইতে নগরে আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, সম্ভব নগর-প্রাচীরের এই দ্বারের কাছেই হিউয়েন ৎসাং কয়েকটি স্মারক স্তূপ দেখিয়াছিলেন, যেখানে বুদ্ধশিষ্য অশ্বজিতের সঙ্গে সারিপুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, যেখানে অজাতশত্রু মাতাল হাতি লাগাইয়া বুদ্ধকে বধ করিবার চেষ্টা করেন প্রভৃতি। এখান হইতে পূর্বদিকের গভীর খালে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া শ্রীগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি বুদ্ধকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দ্বারের অল্প উত্তর-পূর্বে গৃধ্রকূটে যাইবার রাস্তা।

নগরপ্রাচীরের পূর্বদ্বার; জীবকাম্রবন

গৃধ্রকূটের রাস্তা ধরিয়া চলিলে অদূরে নগরপ্রাচীরের পূর্বদ্বার, ইহার কিছু উত্তরে একটি স্তূপাবশেষ আছে। পূর্বদ্বারের পরেই খালের উপর পুল। এই খাল নগরপরিখা ছিল এবং ইহার তলদেশ পাথর-বাঁধান ছিল; পরিখার উপর দিয়া প্রাচীন যুগেও পুল ছিল, বর্তমান পুলের নিচে পরিখাগাত্রের পাথরে প্রাচীন পুলের কড়ি-কাঠ বসাইবার খাঁজ কাটা দেখা যায়। উদয়গিরি হইতে গিরিপ্রাকারের যে শাখা নামিয়া রত্নগিরিতে উঠিয়াছে, তাহা একটু পরেই দেখা যায়। এইখানে ছিল রাজ-চিকিৎসক জীবকের আম্রবন, যাহা জীবক বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন; বামদিকের জঙ্গলে অনেক ধ্বংসাবশেষ আছে, সম্ভব জীবকাম্রবনে যে বিহারাদি পরে তৈরি হইয়াছিল এগুলি তাহাই।

গৃধ্রকূট

আরও মাইলখানেক পরে গৃধ্রকূটের পাদ-দেশে পৌঁছিয়া পাহাড়ের গায়ের রাস্তা দিয়া আরও প্রায় ১ মাইল উঠিলে শিখরে পৌঁছান যায়। পাহাড়ের এই রাস্তা বিম্বিসার নির্মাণ করিয়াছিলেন, পথে দুইটি ছোট স্তূপের ভিত্তি দেখা যায়। দেখিতে শকুনের মত ছিল অথবা উপরে শকুন বসিত বলিয়া এই শিখরের নাম গৃধ্রকূট হয়। শিখরের নিচের দিকের গুহাগুলি আনন্দ সারিপুত্রাদি প্রধানশিষ্যদের গুহা বলিয়া এবং উপরের যে গুহার ছাদের পাথর ভাঙিয়া পড়িয়াছে তাহা বুদ্ধের বাসগুহা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বুদ্ধের জন্মস্থান অদ্ভুত নেপাল-তরাই-এর জনশূন্য বনের মধ্যে; তাঁহার মৃত্যুস্থান কুশীনগর, বহুকালের বাসস্থান শ্রাবস্তীর জেতবন ও রাজগৃহের বেণুবন নিশ্চিহ্ন এবং তাঁহার স্মৃতিজড়িত অন্যান্য স্থানগুলি ঠিক কোথায় ছিল তাহাও দুর্জ্ঞেয়। তাই গৃধ্রকূটের এই গুহা আজ বৌদ্ধজগতের মহাতীর্থ। এখানে বুদ্ধ যেসব ধর্মশিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই বলিয়া ভক্ত ফা হিয়েন এখানে আসিয়া বালকের মত রোদন করিয়াছিলেন।

শিখরের পূর্বদিকে বুদ্ধ পায়চারি করিয়া বেড়াইবার সময়ে দেবদত্ত উপর হইতে পাথর গড়াইয়া তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সমতল স্থানে বসিয়া বুদ্ধ লোককে ধর্মশিক্ষা দিতেন তাহা পাথরবাঁধান প্রাঙ্গণের মত। গৃধ্রকূটের পূর্বদিকে পাহাড়ের গায়ে অনেক বড় বড় পাথরের গাঁথনির ভিত্তি আছে, উত্তরে ছটাগিরির সর্বোচ্চ স্থানে (১১৪৭ ফুট) একটি স্তূপ ছিল, সম্ভব ইহা অশোকনির্মিত। সমগ্র গৃধ্রকূট শিখরের উপর যুগে যুগে বহু পাথর ও ইঁটের চৈত্যবিহার-স্তূপাদি নির্মিত হইয়াছিল। শিখর হইতে পূর্ব-দক্ষিণে দূরে পঞ্চনানদী (প্রাচীন সর্পিণী) দেখা যায়। বামে ৪।৫ মাইল পূর্বে উদয়গিরি ও শৈলগিরির মধ্যবর্তী বন্ধ্রে গিরিপ্রাকারের পূর্বদ্বার, গিরিয়াক হইতে এই দ্বার দিয়া রাজগৃহে আসিতে হয়।

গৃধ্রকূট শিখরের দক্ষিণ-পাদদেশে ছিল মন্দকুচ্ছি-মৃগোদ্যান; ইহার কাছে যে পুষ্করিণীটি দেখা যায় তাহাই সম্ভব বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত রাজবংশীয়া মাগধীদেবীর সুমাগধা পুষ্করিণী. ইহারই সন্নিকটে ছিল একটি মোর-নিবাপ বা ময়ূর চরিবার স্থান। প্রাচীনকালে মন্দকুচ্ছি হইতে গৃধ্রকূট শিখরে উঠিবার যে পথ ছিল এখনও তাহার চিহ্ন দেখা যায়।

ফিরিবার সময়ে গৃধ্রকূটের পথ যেখানে বর্তমানের পাকা রাস্তায় পড়িয়াছে সেখান হইতে দর্শক বর্তমান রাস্তা ধরিয়া উত্তর-দিকে মনিয়ার মঠের দিকে অগ্রসর হইলে কিছু পরে বামে কারাগৃহ ও তাহার পর আরও একটি বড় ধ্বংসাবশেষ পাইবেন। এই দ্বিতীয় ধ্বংসাবশেষটির পর আর মনিয়ার মঠের দিকে না গিয়া পাকা রাস্তা ছাড়িয়া দর্শক ডাইনের কোন কাঁচা পায়পথ ধরিয়া গিরিপ্রাকারের উত্তরদ্বারে পৌঁছিতে পারিবেন. ইহাতে দূরত্ব কিছু কম হইবে ও প্রাচীন নগরের এই অংশও দেখা হইবে। এই অংশে বিশেষ ঘন বসতি বোধ হয় ছিল না কিন্তু কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ তবু আছে। একটি বড় ধ্বংসাবশেষকে স্থানীয় কিম্বদন্তীতে বিম্বিসারের গোশালা বলা হয়।

(আগামীবারে সমাপ্য)
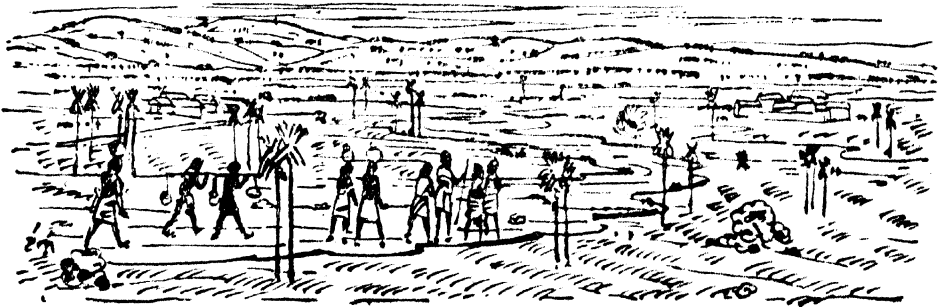
বিয়ের পর একাধিকবার বলেছে সুমতি, সে সুখী হয়নি। শুধু বাপের [illegible] এসে নয়, শ্বশুরের বাড়িতে বসেও [illegible] অন্তরঙ্গ বলে যার কাছে তাকে [illegible] দেওয়া হয়েছে সেই পরেশ [illegible]কেও হাবে ভাবে বলেছে।

পরেশ মিত্তির নামজাদা জুতোর দোকানের মালিক। কাজের মানুষ। ঘরে [illegible] থাকে না। সুমতি বাড়াবাড়ি [illegible] ভেবেছে রাগ হয়েছে বৌয়ের হয়ত। [illegible] সময় নেই, রাতে শোবার সময় অভি- [illegible] শোনা যাবে। মুচকি হেসে পাশ [illegible] পরেশ বেরিয়ে গেছে। কাজ সেরে [illegible] রাতে যখন বাড়ি ফিরে এসেছে তখন [illegible] ভুলে গেছে সব। সুমতিও [illegible] পড়েছে।

সুমতির বাবা ছিলেন সাব-জজ। ছেলের [illegible] দিয়েছেন ব্যারিস্টার দিগিন ঘোষের [illegible] সঙ্গে। বড় মেয়ের বিয়ে হোল এ [illegible] এর এক কর্তার সঙ্গে। আর সব [illegible] ছোট, সব চাইতে আদুরে মেয়ে [illegible], তার হোল কিনা—

[illegible] অদৃষ্টের কথা চিন্তা করে বৃথা [illegible] আর খারাপ করবে না সুমতি। বিয়ে [illegible] সে সুখী হয়নি। পরেশ মিত্তিরের না আছে চেহারা, না আছে কোন রুচির বালাই। জুতোর দোকান দেওয়া যদি ব্যবসা হয় তবে চামচিকেও পাখী। অথচ তাই নিয়ে বাবার কী বাগাড়ম্বর— বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। লক্ষ্মী ত নয়, প্যাঁচায় এসে বাসা বেঁধেছে জুতোর দোকানে। ছিঃ ছিঃ। আর জুতোর দোকানের মালিক হয়েও লোকটির কি কম গর্ব নাকি! নইলে বিয়ের পর স্ত্রী যদি বলে, আমি সুখী হইনি তবে কোন পুরুষ কি এমন করে চুপ করে থাকতে পারে! চিৎকার করবে, কৈফিয়ৎ তলব করবে, রাগারাগি ফাটাফাটি ব্যাপার। তা নয় আস্পর্ধা দেখ লোকটির, শুধু মিটি মিটি হাসবে! একটা কথা বলবে না! যেমন আকৃতি তেমন প্রকৃতি। হো হো করে পিলে চমকানো হাসি হাসবে। যে কথার জবাব নিতান্ত ঘরোয়া, আস্তে আস্তে বলতে হয় তা বলবে চেঁচিয়ে পাঁচজনকে শুনিয়ে। মিনিটে মিনিটে গণ্ডি দিয়ে পান খাবে। দাঁতের চেহারা দেখলে লজ্জা পেতে হয়। সকালে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাবে ফিরে আসবে সেই রাত দশটায়। এসে পায়খানায় বসবে এক ঘণ্টা। তারপর শীত হোক, গরম হোক বালতি বালতি জল ঢালবে মাথায়। আধ ঘণ্টা ধরে খাবে। তারপর এসে শুয়ে পড়েই বিশ্রীভাবে নাক ডাকাবে।

রাতে যখন বিছানায় আসে তখনকার দৃশ্যটা একেবারেই অসহ্য! ঘুমিয়ে না পড়লেও সুমতি চোখ বুজে ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকে। চোখ খুলতে তার ইচ্ছা হয় না। সুমতি সুন্দরী, তন্বী যুবতী। যেমন চেহারা তার তেমন তার সাজানো গোছান ঘর। ধবধবে সাদা বিছানা তার আলো পড়ে তক তক করছে। চুলের তেলের দাগ লাগে বলে রোজই সে বালিশের তোয়ালে পর্যন্ত কেচে রাখে। কোথাও সামান্য নোংরামি তার সহ্য হয় না। খালি গায়ে পরেশ এসে যখন রাতে ঘরে ঢোকে তখন গোটা ঘরটা বেমানান হয়ে যায়। বিছানার এক পাশে সুমতি, মাজা চাঁপা ফুলের রং তার গায়ের। আর এক পাশে পরেশ, বিরাট কৃষ্ণকায় লোমশ দেহ! বিছানায় এসেই পরিপাটি করে সাজান চাদর পায়ের ধাক্কায় কুঁচকে দেবে সে। বালিশ-গুলি ওলট পালট করে ঘাড়ে গুঁজবে। সুমতি চোখ কান বুজে পড়ে থাকে। তার যেন অগ্নিপরীক্ষা চলছে। তার যত কিছু সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ আর মার্জিত রুচি যেন

প্রচন্ড আঘাতে ভেঙেগ খান খান হয়ে পড়ছে।

তবে মহাভাগ্য বলতে হবে সমুতির, লোকটি বেয়াড়া অভদ্র নয়। জোর করে টেনে আদর দেখাতে চায় না। রোজই শোবার আগে একটিমাত্র প্রশ্ন করে সেঃ সমুতি ঘুমুলে নাকি? রোজই কোন জবাব না পেয়ে সুড় সুড় করে শুয়ে পড়ে আর তার পরেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাক ডাকবে। ঘুমিয়ে পড়েও সে রেহাই দেবে না সমুতিকে। গরম বেশ পড়েছে। মাথার ওপর বন বন করে পাখা ঘুরছে। তবুও ঘেমে ওঠে সমুতি। বিছানার এক কোণে সরে গিয়েও নিস্তার নাই তার। কেমন যেন একটা কটু কাঁচা চামড়ার গন্ধ ভেসে আসছে। আর কী বিশ্রীভাবে শুয়ে আছে দেখ লোকটি। উত্তেজনায় সমুতি উঠে বসে। ঘর ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয় তার। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। বাপকে গালাগাল দেয় মনে মনে। তারপর অসহায়ের মত আবার এক কোণে শুয়ে পড়ে।

কি খেয়াল হোল, রাতে শোবার আগে ঘরে অনেকগুলি ধূপ কাঠি জেবলে রাখল সমুতি সেদিন।

পরেশ এসে শুয়ে পড়ল কিন্তু নাক ডাকাল না।

হঠাৎ উঠে বসে পরেশ চেঁচাতে লাগলঃ এতগুলি কি জেবলেছ, নাকে এসে ধোঁয়া ঢুকছে। এই সমুতি—

এইরে, এগিয়ে এসে বুঝি গায়ে হাত দেয়। সমুতি ধড় মড় করে উঠে বসে বললঃ কি হয়েছে?

—বস্ত খাটুনি গেছে আজকে। দু' দুটো ব্রাঞ্চ খোলা হোল। বুঝলে সমুতি, আমার জুতোয় বাজার ছেয়ে দেব। ব্যবসা করতে বসে শুচিবাই প্রশ্রয় দিয়ে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি! এবার দেখ কি করি! শুধু কি জুতো! মস্ত বড় একটা—

রাত এগারোটায় বুঝি আবার চামড়া নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু হোল। সমুতি রেগে বললঃ জুতোর গল্প এখন থাক। আমার ঘুমে ধরেছে!

—আমাকেও। কিন্তু এতগুলি জেবলেছ কেন? নাকে ধোঁয়া ঢুকছে যে!

—গন্ধটা কস্তুরীর! খুব কি খারাপ লাগছে?

—লাগছে। নাকে এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। নিভিয়ে দাও নইলে ঘুমুতে পারব না।

সমুতি আর চুপ করে থাকতে পারল না। শেলষের সুরে বললঃ গল্পে শুনেছি জেলেরা মাছের চুপড়ি শিয়রে না রেখে ঘুমুতে পারে না। কস্তুরী তোমার সহ্য হবে কেন! ক'জোড়া নতুন জুতো এনে শিয়রে রেখে শুয়ো, ঘুম হবে ভাল।

কথা শুনে পরেশ হো হো করে হেসে উঠল তার সেই অট্টহাসি।

বাঃ, বেশ বলেছ কিন্তু, বেড়ে বলেছ!

পরেশের হাসিতে বাড়ির লোক সজাগ হয়ে উঠল। ননদ জায়েরা কোন কিছু একটা রঙগীন কল্পনা করে নিজেদের ঘরে বসে হাসাহাসি সুরু করল।

পরেশ ঘুমিয়ে পড়ল বটে কিন্তু সমুতি ঘুমুতে পারল না। লজ্জায়, ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে রইল।

বড়দিনের বন্ধে মায়ের সংগে পিসিমার বাসায় বেড়াতে এসেছে সমুতি। স্কুল ছেড়ে সবে তখন কলেজে ঢুকেছে।

পিসিমা মাকে বললঃ কেবল লেখাপড়াই শেখাবি, মেয়ের বিয়ে দিবি না বৌ?

জবাব মাকে দিতে হল না। সমুতিই দিল রাগে গরগর করেঃ বিয়ে আর বিয়ে! ও কথা ছাড়া ভাবতে আর কি কোন কথা নেই? তোমরা মেয়ে মানুষই পিসিমা, মানুষ নও।

ঘরের আর এক কোণ থেকে হাসির একটা ঝলক এল।

—যা বলেছেন। এতদিন বাদে কত কিছু করে বিদেশ ঘুরে এলাম। সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নেই জ্যাঠাইমার। ঐ একই প্রশ্নঃ এবার বিয়ে করবি কবে? যেন এটি না করলে আর কিছু করার কোন মানে হয় না!

আবারও সেই হাসি টুকরো টুকরো হয়ে যেন হালকা পালকের মত সমুতির গায়ে এসে লাগল! পুরুষ মানুষ যে এত সুন্দর হাসতে জানে, সমুতি এই প্রথম শুনলো!

এতক্ষণ নজরে পড়েনি। মুখ তুলে সমুতি ছেলেটিকে দেখল এবার! বিয়ের কথা শুনে লজ্জা পাবার মেয়ে সে নয়! তবু ছেলেটির মুখের দিকে তাকাতে অতর্কিতে কেমন যেন একটা লজ্জা এসে চেপে ধরল! শুধু লজ্জাও নয়, কেমন যেন একটা শিহরণ, একটা রোমাঞ্চ, বোঝা যায় অথচ বোঝান যায় না। একটা কাজের অছিলায় সমুতি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

এ ঘর ও ঘর ঘুরে, বৌদিদের সংগে আড্ডা মেরে সমুতি এসে বাইরে রেলিং-এর ধারে দাঁড়াল।

বাঃ বাঃ কী ফুলই না ফুটেছে পিসিমার বাগানে! ফুল বড় ভালবাসে সমুতি।

—ও মালী, মালী, শুনছ—

অজস্র একটা ফুলের ঝোপ থেকে মাথা বের করল সমুথ। উপরের দিকে চেয়ে হেসে বললঃ ফুল চাই? আনছি।

ছি ছি কাকে সে মালী বলে ডাকল! লজ্জায় সমুতি পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

দু' হাত ভর্তি ফুল নিয়ে সমুথ এসে সামনে দাঁড়াল।

—নিন, ধরুন।

পিসিমার ছোট মেয়ে শোভাও গুটি সুটি মেরে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হেসে বললঃ তুমি একটি অচল অধম সমুথদা! ফুল এনে কি ঐ ধরণের কথা বলতে হয়! বলঃ আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার।

পরে সমুতির দিকে একবার কটাক্ষ হেনে বললঃ এত লোক থাকতে সমুতিদি শেষ পর্যন্ত তোমাকেই মালী বলে ঠাওরালো! হায়, হায়!

সমুথ কিন্তু এতটুকু অপ্রতিভ হোল না! সমুতিকে বললঃ কুসুমগুচ্ছ এনেছি গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন সমুতি দেবী!

বলে হো হো করে হেসে উঠল সমুথ।

পরে বললঃ এর বেশী কাব্য আমার কাছে আশা করবেন না! ফুলের সম্পর্কে মালীর বেশী মর্যাদা দাবী করতে আমিও পারি না!

সমুতি সহজ হয়ে উঠল। আড়ষ্টতা কাটিয়ে সচ্ছন্দে দু'হাত পেতে ফুল নিয়ে বললঃ অসংখ্য ধন্যবাদ! ফুল বড় ভালবাসি আমি!

শোভা আবারও মুখ খুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সমুতি তাকে একরকম টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে এল। গম্ভীর হয়ে বললঃ বড় বাড়াবাড়ি করছিস্ শোভা!

চা খেতে বসে আরও দু'চারটি কথা হোল। সমুথ অনেক দেশ ঘুরেছে। দেশ ভ্রমণ নিয়ে বেশ মজার ক'টি গল্প বলল।

আসবার সময় পিসিমা মাকে ডেকে আড়ালে কি সব যেন বলাবলি করল। কানে শুধু এলঃ চমৎকার ছেলে আমাদের সমুথ!

মা বাড়িতে এসে বাবাকে বলল: চমৎকার একটি ছেলে দেখে এলাম আজ ঠাকুরঝির বাড়িতে।

ব্যস্, ঐ পর্যন্তই! সুমথ হাওয়ায় উড়ে এসেছিল হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সুমথর সুমতি হোল না!

ক্রমে কলেজের পড়াও সাঙ্গ হোল সুমতির।

বাবা বললেন: লেখাপড়া যা হবার খুব হয়েছে। এবারে সংসারে একটা স্থিতি হোক। মা ত সঙ্গে সঙ্গেই রাজী।

বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সুমতির গোঁ অনেকটা শিথিল হয়ে এল। মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে একটি সবল সুন্দর পুরুষকে সাথী পাবার একটা স্বপ্নালু বাসনা অতর্কিতে তার সব সংযম ভেঙ্গে দিতে চাইত। সুমতির সুন্দরী বলে নামডাক আছে। লেখাপড়া শিখে দেহের ও মনের সৌন্দর্য মার্জিত হয়েছে। তার কল্পলোকে মাঝে মাঝে সুমথর আবির্ভাব ঘটত। দু'হাত ভর্তি তার ফুল। মুখে ভরা মিষ্টি হাসি।

এমন সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সুমতির বাবা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন পরেশ মিত্তিরকে। বাবার রুচি আছে, তাই আশংকা আসেনি। কিন্তু বিয়ের পরই অভিযোগ। সবাই বলল: বড্ড কালো বর। কিন্তু সে কালো যে এত নিরেট বিয়ের পর সুমতি তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। বাপের বাড়িতে গিয়ে সে কান্নাকাটি আরম্ভ করল: বর পছন্দ হয়নি তার।

সাবজজ প্রথমে হাকিমী হাসি হেসেছিলেন। পরে সুমতির বাড়াবাড়ি দেখে কড়া সুরে বললেন: লেখাপড়া শিখলে হবে কি আসলে মানুষ হওনি তুমি! এমন পলকা মনের আবার বড়াই কর তোমরা ছি ছি!

কি মনে করে মেয়েকে তাড়াতাড়ি তিনি শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন: যখন তখন মেয়ে এনে আর কাজ নেই! থাক পড়ে ওখানে। পলকা মন পোক্ত হোক।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে সুমতি ঘুমিয়ে পড়েছিল তা নিজেই টের পায়নি। ঘুম যখন ভাঙ্গল বেশ বেলা হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে বিছানার পরে রৌদ্র এসে পড়েছে। পরেশ উঠে কখন চলে গেছে। সুমতি ধড়মড় করে উঠল।

দোতলা থেকে নেমে সোজা স্নানঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল সুমতি। তাকে দেখে ননদ জা'য়েদের ভেতর চোরা হাসি চলল। পরেশের ছোট বোন বেলা আর নির্বাক থাকতে পারল না। সুমতির পথ আটকে প্রশ্ন করল: কাল অত রাতে তোমাদের ঘরে যে হাসির হর্রা ছুটেছিল ছোট বৌদি, ব্যাপার কি?

সেজ জা বলল: তোর বুঝি এই ঘুম ভাঙ্গল?

জবাবের কোন প্রয়োজন নাই। এমনিতেই সবাই হাসাহাসি শুরু করল।

স্বামী নিয়ে দ্বন্দ্ব চলেছে অন্তর্লোকে। সেখানকার খবর এদের দেওয়া চলে না। মুখে, আচার ব্যবহারে এদের সঙ্গে সমানে তাল রেখে না চলতে পারলে আরও দীনতা, হীনতা প্রকাশ পায়। সলজ্জ হাসি হেসে সুমতি নীরবে উত্তর দিল।

এ বাড়িতে পরেশের ভায়েদের শখ আহ্লাদ আছে। তারা চাকরি করে, বউ নিয়ে বেড়াতে যায়, সিনেমায় যায়। একমাত্র পরেশ দলছাড়া। সে ব্যবসায়ী। তার সময় নেই হৈ চৈ করবার। সুমতি নিজে অবশ্য মনে মনে এর জন্যে খুশী! রাস্তায় পরেশকে পাশে নিয়ে তাকে যে বেরোতে হয় না এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তার পাশে কি পরেশকে মানায়? এমন শখ মাথায় থাকুক! অথচ ননদ জায়েদের সুমতির জন্যে দুঃখের আর অবধি নাই! অন্য পুরুষগুলি বউ নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করবে তারই চোখের সামনে! এটা কেমন কথা!

—ও ছোট্‌ঠাকুরপো, সুমতিকে নিয়ে ত একদিন সিনেমায়ও যেতে পার বাপু! ওর কি শখ বলে কিছু নেই?

খেতে খেতে পরেশ বলল: সুমতি বুঝি তাই বলেছে? এখন বড্ড কাজের চাপ পড়েছে। তা' নিয়ে যাব একদিন!

বোন বেলা বলল: আমরা বললে ত যেতে চায় না। তুমি একদিন সঙ্গে করে নিয়ে যেও ছোট্‌দা!

সুমতি শুনল সব। দোতলার ঘরে পরেশকে একা পেয়ে বলল: বড়দির বাসায় গিয়ে কটা মাস থেকে আসব ভাবছি।

পরেশ কাপড় পরতে পরতে বলল: ভাল কথা। আমিও না হয় কটা দিন থাকব ওখানে। কাজের চাপ ত চিরদিনের।

সুমতি বলল: তোমাকে এখন আর কাজ ফেলে যেতে হবে না। চিঠি পেলে নন্দই এসে নিয়ে যাবে!

এক গাল পান চিবুতে চিবুতে পরেশ বলল: সে ত আরও ভাল কথা! ব্যস, সেই ব্যবস্থাই থাকল।

মাস দুই হোল বিয়ে হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় এক মাস বাপের বাড়িতে কাটিয়ে এসেছে। এক নাগাড়ে বেশীদিন এখানে থাকলে হাঁপিয়ে ওঠে সুমতি। তাই নিজে যেচে বড় বোনকে পত্র দিল।

হঠাৎ একদিন অজয় এসে উপস্থিত। শোভার নাকি বিয়ে ঠিকঠাক, নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। পিসিমার বড় ছেলে অজয়।

সুমতির ঘরে ঢুকে অজয় বলল: তোর কিন্তু দু'দিন আগেই যেতে হবে।

—দু'দিন কেন দশ দিন আগে যেতে পারি না বড়দা!

সুমতি ঠাট্টা করেনি! যে ক'দিন এই বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকতে পারে তারই সুযোগ খোঁজে সে।

অজয় হেসে বলল: পরেশকে ছেড়ে থাকতে পারবি ত?

এর পর আর এগোতে পারল না সুমতি। একটু সলজ্জ হাসি হাসতে হোল।

অজয় প্রশ্ন করল: পরেশকে ত দেখছি না! কোথায় সে?

সুমতিকে বলতে হোল: তার কি আর ফুরসুৎ আছে। দোকানে, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়!

অজয় বলল: এবার কিন্তু তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া চাই! বিয়ের পর একবারও আমাদের ওখানে যাবার তার সময় হোল না!

মনে মনে ভাবল সুমতি, না হয়েছে ভালই হয়েছে।

মুখে বলল: বেশ ত, সবাই যাব শোভার বিয়েতে!

অজয় চলে গেল কিন্তু মহা ভাবনায় ফেলে গেল সুমতিকে! বিয়ের পর পিসিমার বাড়ি যায়নি পরেশ। এ বিয়েতেও না গেলে ওরা সুরুই মনে করবে কি! এক হাট লোকের মাঝে পরেশ গেলে তার ত পরিচয় হবে—আমাদের সুমতির বর। জুতোর দোকানের মালিক। রূপ নিয়ে বড় দেমাক সুমতির। ওর বরাত নিয়ে মেয়ে পুরুষে হাসি ঠাট্টা করবে। ঠোঁটের কোণে তাদের বাঁকা হাসি স্পষ্ট যেন সুমতি চোখের সামনে দেখতে পেল। না, না, তা হতেই পারে না। পরেশকে নিয়ে তার বিয়ে

বাড়িতে যাওয়া চলে না! কিন্তু সে ত নিজে বলতে পারে না পরেশকে, পিসিমার বাড়ি যেও না তুমি! ওরা যদি নিতে লোক পাঠায় তখন উপায় হবে কি? সুমতি অস্থির হয়ে উঠল।

রাতে বাসায় ফিরে এসে পরেশ সুমতিকে বলল: কার বিয়ের কথা বলল বড়বৌদি?

—শোভার, আমার পিসতুত বোন!

কুরুসকাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল সুমতি।

পরেশ হেসে বলল: আমার তাহলে শালীর বিয়ে।

শালীকে শালী বললে শালীনতা যেন নষ্ট হয়ে গেল এমনিভাবে সুমতি তাকালো পরেশের দিকে।

পরেশ থামল না। প্রশ্ন করল: কি উপহার দেব বলত?

সুমতি সে প্রশ্ন এড়িয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইল: আজ যে বড় সকাল সকাল ফিরে এলে?

পরেশ নাছোড়বান্দা। সেও সুমতির কথার উত্তর না দিয়ে বলল: নতুন মডেলের লেডিজ স্যু আমদানী করেছি। তারই এক জোড়া দিয়ে দেব নাকি?

শালীকে উপলক্ষ্য করে পরেশ একটু রসিকতা করল। সুমতি রেগে গুম্ মেরে বসে রইল। কথাটি বলল না!

পরেশ এবার বিছানার পরে জেঁকে বসে আসল কথাটা পাড়ল।

—তোমার পিসিমার বাড়িতে মোটেই যেতে পারিনি এতদিন!

সুমতির বুক ধুক্ ধুক্ করে উঠল।

—এবারে যে যাব তারও উপায় নেই।

সুমতি আড়চোখে এবার পরেশের মুখের দিকে চাইল।

—পরশু যাচ্ছি কাণপুরে। বিয়ের দিন হয়ত ঠিক সময় এসে পৌঁছতে পারব না। জরুরী কাজ!

যাক, বেঁচে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুমতি। অনেকটা প্রগল্ভ সুরে বলল: কী দৌড় ঝাঁপই না করতে পার!

—উপায় নেই। এর নাম ব্যবসা।

এত সহজ সুমতি অনেকদিন হয়নি। তরল কণ্ঠে বলল: আমিও বলে দিয়েছি বড়দাকে, কাজের মানুষ, হঠাৎ আটকে গেলে হয়ত যেতে পারবে না।

বেশ বলেছ। তুমি গেলেই ত হোল!

পরেশ নাক ডাকতে শুরু করল।

সেজ জায়ের ছেলেপুলে হবে। সে যাবে বাপের বাড়ি। বড় জায়ের বাতের অসুখ। সুমতি তাই বিয়ের দিনই পিসিমার বাড়ি গেল।

পিসিমার সব ক'টি মেয়ে জামাই এসেছে। শোভার বড় নিভা সুমতির সমান বয়সী। একই সাথে হস্টেলে থেকে আশুতোষে পড়েছে। সে এসেছে সবার শেষে। নিভার নিমন্ত্রণ পেয়ে আশুতোষ কলেজের কয়েকটি বান্ধবীও এসেছে। সুমতির বড় বোন অতসীও তার বরকে নিয়ে এসেছে। সুমতির বিয়ের আসর বসেছিল লক্ষ্মী-এর হিউয়েট রোডে। কলকাতা থেকে বান্ধবীরা কেউ যেতে পারেনি বিয়েতে। এতদিন বাদে সুমতিকে কাছে পেয়ে বান্ধবীরা তাকে একেবারে চেপে ধরল।

—তুই যে একেবারে ডুব মেরে আছিস সুমতি। বিয়ের পর কলকাতায় এলি তা না দিলি ঠিকানা, না করলি নিজে গিয়ে দেখা!

—ডুবে গিয়ে কি হাবুডুবু খাচ্ছিস যে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই তোর!

—সবাই জোড়ে এসেছে। তোর বর কই? আলাপ করিয়ে দে।

নিভা হেসে বললঃ তার কথা আর বলিস নে ভাই! সে বেচারী একেবারে শ্রীচরণেষু! সুমতি তাকে এমনভাবে দাবিয়ে রেখেছে যে, পা ছাড়া অন্য দিকে মুখ তুলে চাইবার সাহস পর্যন্ত নেই তার!

নিভার কথায় সবাই হেসে উঠল। সুমতিও হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। বন্ধুই হোক আর বোনই হোক, নিভার কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে রীতিমত অপমানিত বোধ করল সুমতি। নিভার বর কলেজে পড়ায় সে কথাও মনে পড়ল!

বান্ধবীদের একজন বললঃ তুই যখন বলিস না যেতে, বরকে এনে দেখাবি না তখন অবিশ্যি জুতো না ছেঁড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

আবারও হাসির হররা ছুটল।

এগুলি নিতান্তই রসিকতা অন্যকেউ হলে হয়ত সহজে গ্রহণ করত। সুমতির কিন্তু অসহ্য বোধ হতে লাগল। হাসির ছোরা অপমান, উপহাসের হুল ফোটাতে লাগল। অথচ রাগ দেখাবার যোটি নাই, হাসিমুখে সব কিছু সহ্য করতে হবে। বন্ধুবীদের স্বামীরা কেউ বড় চাকুরে, কেউ ডাক্তার, কেউ বা উকিল! ভগিনীপতিরাও হাসি ঠাট্টায় যোগ দিল সুমতির মনে হোল পরেশ অদৃশ্য থেকেও যেন তার পাশে পাশে ঘুরছে। গা ঘিন ঘিন করতে লাগল তার।

পিসিমার অনুযোগ ভিন্ন ধরণের হলেও শ্রুতিসুখকর নয়।

—টাকা টাকা করে যে জামাই পাগল হয়ে গেল। একদিন চোখের দেখাও দিতে এল না। কাণপুরে কি দু'দিন বাদে গেলে চলত না রে সুমতি? এত করে বলে পাঠালেম তা কথাটি রাখল না সে!

সুমতি নির্বাক হয়ে শুনে গেল।

বিয়ের লগ্ন রাত সাড়ে আটটায়। বর এসে পৌঁছল এক ঘণ্টা আগে। নিভাই সুমতিকে ধরে নিয়ে বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। খাসা বর। সুন্দর চেহারা। আর্মিতে কাজ করে।

বাড়ির ভেতর সবাই খুসী। চমৎকার বর। শোভার মা দিব্যি জামাই পেয়েছে। ভাগ্য বলতে হবে শোভার। কয়েক মাস আগে এমনি একটা ঢেউ উঠেছিল হিউয়েট রোডের বাসায়। এ কি চেহারা বরের! নাঃ, সুমতির পাশে একেবারেই মানায় না। সুমতির মায়ের ভাগ্য খারাপ বলতে হবে।

সুমতির মত সুন্দরী সচরাচর নজরে পড়ে না।

অন্ধকার সিঁড়ির কোণে দাঁড়িয়ে অতসী বলছে তার স্বামীকেঃ সুমতির পাশে দাঁড়ালে মানাত বেশ, কি বল?

সুমতি হন হন করে এগিয়ে গেল।

ভাঁড়ার ঘরে পিসিমা ফিস ফিস করে তার বিধবা ননদকে বলছেঃ ছেলে ত আগে দেখিনি, কর্তা বলেছিল ভাল ছেলে, তবু আশংকা ছিল আমাদের সুমতির মত আবার—

সুমতি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল না, সোজা বেরিয়ে এল। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল পিসতুতো ভাই বিজয়। সে বলল, সুমতিদি চলে যাচ্ছ যে!

—গা কাঁপিয়ে জ্বর এলরে বিজু। বাসায় যাচ্ছি৷

—মা জানে ত!

—খুঁজে পেলাম না তাঁকে। তুই সব বলিস। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নারে ভাই।

সটান গিয়ে সুমতি তাদের ফিটন গাড়িতে গিয়ে বসল।

কড়া নাড়তে ঝি এসে দরজা খুলে দিল।

বাড়িঘর যেন খালি খালি বোধ হচ্ছে।

ঝি বিনা প্রশ্নেই বললঃ কেউ নেই বাড়িতে।

সবাই গেছেন—

ঝি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সুমতি দাঁড়াল না। হন হন করে এগিয়ে গেল। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছিল সুমতি, হঠাৎ মাঝ সিঁড়িতে এসে থমকে দাঁড়াল। কঁকিয়ে কঁকিয়ে কে যেন কাঁদছে। সুমতি কান খাড়া করে রইল। কান্নার ভেতর এমন সুর আছে, এত ছন্দ, এমন অপরূপ ব্যঞ্জনা আছে। লাফিয়ে সিঁড়ির বাকি ধাপগুলি পেরিয়ে নিজের ঘরের দোর গোড়ায় এসে সুমতিকে থামতে হোল! ঘরে ঢুকতে পারল না সে।

ঘরে স্তিমিত সবুজ বেড ল্যাম্পের নীচে বসে পরেশ এস্রাজ বাজাচ্ছে!

পরেশ এস্রাজ বাজাচ্ছে।

নির্বাক সুমতি অপলক দৃষ্টি দিয়ে দেখছে।

সবুজ আলোর নীচে পা দুটি গোছ করে বসেছে পরেশ। মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে বুকের কাছে। ক্ষিপ্র, মন্থরগতিতে টানার এক একটি টানে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে সে শুধু ঘরটিকে রহস্যময় কল্পলোক সৃষ্টি করেনি, অপরূপ রূপ দিয়েছে নিজেকেও। এত সুন্দর সে!

সুমতির দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে উঠছে।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রকাব্যে পাঠান্তর

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কবিতাগুলিতেই পাঠান্তর বেশি। আগের দিকেও আছে, তবে তুলনায় কম। পাঠান্তর বাহুল্য পূরবী হইতে যেন বেশি করিয়া দেখা দিয়াছে ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এমন হওয়া অসম্ভব নহে যে, প্রথম দিকের পাঠান্তরগুলি রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এ যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রাহ্য নয়। প্রথমজীবনের কাব্যের যে-সব পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পাঠান্তরগুলি লিপিবন্ধ আছে। সেগুলির সঙ্গে শেষজীবনের পাণ্ডুলিপির তুলনা করিলে সহজেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। আরও একটি কথা, সেটি আমাদেরই অনুকূলে। রবীন্দ্ররচনাবলী সংস্করণের গ্রন্থপরিচয় অংশে যে-সব পাঠান্তর মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার ভিত্তি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে পাণ্ডুলিপিতে লিখিত সবগুলি পাঠান্তর গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত করা সম্ভব হয় নাই; সংখ্যায় তাহারা আরও বেশি। কাজেই শেষজীবনের কাব্যে পাঠান্তর যে জীবনের পূর্বার্ধের চেয়ে অনেক বেশি—একথা স্বীকার করিয়া লইতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

এবারে প্রশ্ন কেন এমন হইল? অনেকে বলিতে পারেন যে, কবিতা তো একেবারে স্বয়ম্পূর্ণ মূর্তিতে প্রথমেই দেখা দেয় না—মনের মধ্যে অনেক ওলট পালট, অনেক রদবদল চলিতে থাকে, সেগুলিকে কেহ ধরিয়া রাখে না, ধরিয়া রাখিলে সেগুলিও পাঠান্তর বলিয়া গৃহীত হইতে পারিত। ওসব যেন স্লেটের লেখা, লিখিবার পরেই মুছিয়া ফেলা হয়। ওয়ার্ড্‌স্বার্থের অভ্যাস ছিল যে বনেবাদাড়ে ঘুরিবার সময়ে মনে মনে কবিতা রচনা করিতেন, তখন নিশ্চয়ই অনেক রদবদল হইত, বাড়িতে ফিরিয়া চূড়ান্ত রূপটি লিপিবন্ধ করিতেন, সে সব পাঠান্তর হাওয়ায় মিশিয়া গিয়াছে, কেহ ধরিয়া রাখে নাই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় এ নিয়ম প্রযোজ্য। কাজেই কোন কবিতার পাঠান্তর পাওয়া না গেলেই ধরিয়া লওয়া উচিত নয় যে, কবিতাটি একেবারে স্বয়ম্ভূমূর্তিতে দেখা দিয়াছে। এ সমস্তই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু হাওয়ার উপরে নির্ভর করিয়া তো আলোচনা চলে না। লিপিবদ্ধ প্রমাণকে স্বীকার করিয়া লইয়াই আলোচনা চালাইতে হইবে। এক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ প্রমাণ আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে—সেটি কি প্রথমেই বলিয়াছি, কবির শেষজীবনের কাব্যে পাঠান্তরের সংখ্যা জীবন পূর্বার্ধের চেয়ে অনেক বেশি।

এখন, পাঠান্তর সাধারণত দুই শ্রেণীর হইতে পারে। একটি ক্রমবিকাশমূলক, অপরটি সমান্তরালমূলক। কবির বিবেচনায় কবিতার যে-রূপটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত তাহাই রক্ষিত হয়—অনেক সময়ে কবিতার বিবর্তনের রূপসমূহ যদি মনে মনে না হইয়া লিখিত আকারে হইয়া থাকে সেগুলি খাতার মধ্যে থাকিয়া যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে ঐগুলি কবিতার বিবর্তনের ধাপ—ঐ ধাপগুলি উত্তীর্ণ হইয়া কবিতাটি তাহার চূড়ান্তরূপে পৌঁছিয়াছে। এই শ্রেণীর পাঠান্তরকে ক্রমবিকাশমূলক বা বিবর্তনমূলক পাঠান্তর বলা চলে।

আর একশ্রেণীর পাঠান্তর আছে—তাহাকে সমান্তরাল পাঠান্তর বলিয়াছি। কোন কবিতার হয়তো তিনটি পাঠ আছে, তাহাদের সৃষ্টির মূলে বিবর্তনের নিয়ম সক্রিয় নয়;—একটির চেয়ে আর একটি শিল্প সৃষ্টি হিসাবে যে উন্নততর এমন নয়, তিনটি সমান ভালো বা তিনটিই সমান মন্দ; অর্থাৎ কবিতাটি যেন সম্মুখের দিকে না বাড়িয়া গঙ্গার ইলিশের মতো পাশের দিকে বাড়িয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর পাঠান্তরকে সমান্তরাল বলা অন্যায় হইবে না। এই দুই শ্রেণীর পাঠান্তরের আলোচনাই শিক্ষাপ্রদ। ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তরের আলোচনা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য—কারণ ক্রমবিকাশের একটা লক্ষ্য আছে—এবং চূড়ান্তরূপে সে লক্ষ্যটিকে আমরা পাইতেছি। কিন্তু সমান্তরাল শ্রেণীর আলোচনা তেমন অনায়াসসাধ্য নয়—এখানে কবির লক্ষ্য কি আমরা স্পষ্ট জানিতে পাই না, অনেক সময়ে একেবারেই জানিতে পাই না। কেন তিনি পাঁচটি অল্পবিস্তর সমান রূপ সৃষ্টি করিতে গেলেন, কেনই বা সেগুলিকে চূড়ান্ত মর্যাদা না দিয়া পাঠান্তরের গাদায় নিক্ষেপ করিলেন, সম্মুখের দিকে হস্তপ্রসারিত না করিয়া, কেন তিনি পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া মরিতেছিলেন—এসব রহস্য সত্যই দুজ্ঞেয়।

পাঠান্তরের এই দুটি মূলশ্রেণী ছাড়াও অনারূপ পাঠান্তর হইতে পারে—কিন্তু সেকথা প্রসঙ্গত আসিবে।

২

এখন, রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ কবিতার প্রসঙ্গে এই দুই শ্রেণীর পাঠান্তরের আলোচনা করিব। কবিতাটি মহুয়া কাব্যগ্রন্থের—উজ্জীবন। সৌভাগ্যবশত এই একটি কবিতারই দুই শ্রেণীর পাঠান্তর বর্তমান, তাহাতে আলোচনা অনেক পরিমাণে সুসাধ্য হইয়া আসিবে।

মহুয়া কাব্যে মুদ্রিত পাঠকেই চূড়ান্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। খুব সম্ভবত ইহার প্রথমতম রূপ—

উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি ধূর্জটির ক্রোধবহ্নিশিখা
হে মন্মথ, মনসিজ, হে মনের মায়া মরীচিকা—
তৃষ্ণামরু বিহারে বিলাস—
পুরাও পুরাও অভিলাষ। ইত্যাদি।[১]

এবারে কবিতাটির পূর্ণাঙ্গরূপ এবং এই প্রাথমিক রূপের মধ্যে তুলনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়—একটি হইতে আর একটির বিকাশ হইয়াছে—অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ ক্রমবিকাশের। পাঠান্তরটি অসম্পূর্ণ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

---

১ গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৫১৭, র-র, ১৫শ খণ্ড "তপতীর পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পাঠ। অসম্পূর্ণ?"

এ অনুমান সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে পাঠান্তরের শেষ পর্যন্ত যাইবার প্রয়োজন কবি বোধ করেন নাই, তার আগেই পূর্ণতর রূপটি তাঁহার কল্পনায় উদ্ভাসিত হওয়াতে অপূর্ণ রূপটিকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এযেমন গেল কবিতাটির ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তর, তেমনি আছে সমান্তরালমূলক পাঠান্তর, তাহাদের তিনটি রূপ২;—মহুয়ার চূড়ান্ত পাঠ ধরিলে চারটি—আর পূর্বে উল্লিখিত ক্রমবিকাশমূলক পাঠ ধরিলে সবশুদ্ধ পাঁচটি।

এখানে সমান্তরাল পাঠান্তর তিনটিই আলোচ্য। পাঠ তিনটি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ আর যাই হোক ক্রমবিকাশের নয়;—একটির চেয়ে আর একটি সমৃদ্ধতর নয়; আবার একটির সঙ্গে আর একটির প্রভেদ মূলগত নয়, নিতান্তই শাখাগত; এ যেন অনেকটা অন্ধভাবে হস্তক্ষেপ—কোন্ রত্নের অন্বেষণে? যাহারই অন্বেষণ হোক মূলকথা তিনটি পাঠান্তর সমান্তরালভাবে বিরাজ করিতেছে। শুধু তাই নয়, পাঠান্তরের কোন কোন অংশ চূড়ান্তরূপে গৃহীত পাঠটির চেয়েও সুন্দর ও সমৃদ্ধ।৩

এবারে মহুয়া কাব্যগ্রন্থের আর কতকগুলি পাঠান্তরের আলোচনা করা যাইতে পারে।

মহুয়ার বরণ কবিতাটির একটি পাঠান্তর গ্রন্থপরিচয় আছে।৪ চূড়ান্তরূপ ও পাঠান্তর দুটিই দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান, তবে প্রথমোক্তটির শ্লোকব্যূহের ছত্রসজ্জা অনিয়মিত, শেষোক্তটির নিয়মিত। ভাবের ঐশ্বর্যে পূর্ণাঙ্গ রূপটিই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর।

তুমি যেন মহাকাল সমুদ্রের তটে
	নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
		দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যান মাঝে উমার ভৈরবী।

এই অংশের অনুরূপ পাঠান্তরে নাই।

তবে এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণীয়। বলাকার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা এবং অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা তো বটেই অনিয়মিত শ্লোকব্যূহে রচিত। এমন হইবার কারণ কি? এই উপলক্ষে মনে রাখা আবশ্যক যে গদ্যছন্দ অনিয়মিত শ্লোকব্যূহ হইতেই উদ্ভূত আর তাহা অনিয়মিত শ্লোকব্যূহেরই একটা চূড়ান্তরূপ।

মহুয়া কবিতার পাঠান্তর অষ্টাদশমাত্রার একটি সনেট ৫ চূড়ান্তরূপটি অনেক দীর্ঘ, কাজেই অনেক অতিরিক্ত বস্তুতেও পূর্ণ। কিন্তু এখানেও পূর্বোক্ত সমস্যার সাক্ষাৎ পাই। নিয়মিত শ্লোকব্যূহের স্থলে কবি অনিয়মিত শ্লোকব্যূহকেই গ্রহণ করিয়াছেন। করিয়াছেন।

অন্তর্ধান ও বিরহ দুটি কবিতা, কিন্তু গ্রন্থ পরিচয়—এ দুটি একটি মাত্র দেহে শৃঙ্খলিত।৬ শৃঙ্খল মোচন করিয়া যাহা স্বভাবত স্বতন্ত্র তাহাদের ভিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

এই জাতীয় পাঠান্তরের সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পাইব, কখনো দুইকে এক করা হইয়াছে, কখনো এক দুই হইয়া গিয়াছে। এই শিল্পগত অস্থিরতা একপ্রকার আত্মগত অশান্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক তাহাতে কবির অন্তর্লোক সম্বন্ধে অনেক রহস্য জানিতে পারা যাইবে।

পরিশেষে কাব্যগ্রন্থের 'বিচিত্রা' কবিতাটির পাঠান্তর আলোচনাযোগ্য। পূর্ণতর রূপটি দীর্ঘতর এবং হাল্কাছন্দে রচিত; পাঠান্তরটির ছন্দ গম্ভীর, আকারও তুলনায় ছোট। কিন্তু একটি কারণে পাঠান্তরটি আমার কাছে কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠতর মনে হয়—এখানে শিল্পীর উপরে তাত্ত্বিকের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ ঘটে নাই। চূড়ান্তরূপের শেষ শ্লোক দুটি একেবারেই অবান্তর, কবিতাটির মধ্যে না ছিল তাহাদের সম্ভাবনা, রসোদ্বোধনের জন্য না আছে তাহাদের আবশ্যক, বরঞ্চ সচেতন তত্ত্ব সৃষ্টি প্রয়াস দ্বারা রসভঙ্গ হইয়াছে বলিয়াই আমার ধারণা। এ রকম উদাহরণ রবীন্দ্রকাব্যে আরও আছে, তবে শেষের দিকের কাব্যেই তাহাদের সংখ্যা বেশি।

শেষ সপ্তক কাব্যের প্রায় সবগুলি কবিতারই একাধিক রূপ, কোন কোন কবিতার তিনটি করিয়া রূপ বর্তমান। মূল কাব্যখানির সঙ্গে 'সংযোজন' ও গ্রন্থপরিচয় অংশ মিলাইয়া পড়িলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। কোন কোন কবিতার, যেমন 'ঘটভরা' কবিতাটির তিনটি রূপই গদ্যছন্দে লিখিত। অনেক কবিতার একটি রূপ গদ্যছন্দে, একটি রূপ পদ্যে লিখিত, কোন কোন কবিতার সঙ্গে আবার পরবর্তী কাব্য 'প্রান্তিকের' ঘনিষ্ঠ মিল।

বিভিন্নরূপগুলি পড়িলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এগুলি ক্রমবিকাশমূলক নয়, সমান্তরাল। একটির সঙ্গে আর একটির যেটুকু প্রভেদ, তাহাতে কোনটিকে নিশ্চিতভাবে উন্নততর রূপ বলা যায় না, কোনটা বা এক অংশে উন্নত, কোনটা বা আর এক অংশে উন্নত। মোট কথা সমান্তরালতাই ইহাদের প্রধান লক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিবে। কাব্যের সমান্তরাল রূপ কি সম্ভব? ক্রমবিকাশমূলক অবশ্যই সম্ভব, কেননা ক্রমবিকাশের ধাপে ধাপেই কাব্য চরমরূপে গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু সমান্তরাল রূপ কি করিয়া সম্ভব? অপরপক্ষ বলিতে পারেন—সম্ভব যে তাহা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না—সমান্তরালরূপ আদৌ কেন?

আমার সাধ্যানুসারে প্রশ্নটার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। সূক্ষ্ম বিচারে শব্দের প্রতিশব্দ সম্ভব নয়, অথচ অভিধানে তো প্রতিশব্দের অভাব নাই। একটা উদাহরণ লওয়

২

(১) গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৫১৬, র-র, ১৫শ খণ্ড

(২) তপতী ১ম সং, পৃঃ ৫২—৫৫

(৩) তপতী ৩য় সং পৃঃ ৪-৫

৩ পূর্ণাঙ্গরূপে আছে—'দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ' সমান্তরাল পাঠে আছে—'সংকট-বন্ধুর তব দীর্ঘ' রাজপথ—কল্পনার গুণে 'সংকট-বন্ধুর' পূর্ণাঙ্গরূপের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, কেননা, 'সংকট-বন্ধুর' বলিতে দুঃখ সুখের বন্ধুরতাকেই বোঝায়—আরও কিছু বেশির সংকেত করে, সেই সংকেতটুকু 'দুঃখে সুখে বেদনার' স্পষ্টোক্তির মধ্যে নাই। তারপরে 'দীর্ঘ রাজপথ'—শুধু 'পথ'-এর চেয়ে সমৃদ্ধতর। মহুয়া প্রেমের কাব্য, তপতী প্রেম-ব্যতিক্রমের নাটক, যাহারই পটভূমিতে কবিতাটিকে দেখা যাক—প্রেমের 'রাজপথ' বর্ণনাই সার্থকতর বলিয়া মনে হয়। এমন কি সাধারণভাবে গ্রহণ করিলেও সংসারে প্রেমের অভিযান রাজপথরূপেই বর্ণনযোগ্য, শুধু 'পথ'—তাহার পক্ষে নিতান্তই সংকীর্ণ। চূড়ান্ত পাঠটিতে প্রেমের অভিযানের বন্ধুরতাই শুধু আছে, পাঠান্তরে তাহার বন্ধুরতা ও প্রসার দুটি গুণকেই পাইতেছি।

---

৪ গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৫১৯, র-র, ১৫শ খণ্ড

৫ তদেব, পৃঃ ৫২১, র-র, ১৫শ

৬ তদেব পৃঃ ৫২১-৫২২, র-র, ১৫শ

যাক। শিখী ও কলাপী দুই-ই ময়ূর, ওদুটি ময়ূরের প্রতিশব্দ। ইহাই স্থূলে বিচার। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার বা শিল্পীর বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

'উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে।' এখানে 'কলাপী'র বদলে ময়ূর বা অন্য প্রতিশব্দে চলিত কি? মেঘসন্দর্শনে হৃষ্ট ময়ূরের বিস্ফারিত পুচ্ছের প্রতিই এখানে কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ, কাজেই অভিধান যাহাই বলুক, এখানে কবির ভাবপ্রকাশের একটি মাত্র শব্দ বর্তমান, সেটি 'কলাপী'।

আবার আর একটি ছত্র লওয়া যাক—
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া;
এখানে 'কলাপী' একেবারেই অচল, এখানে কবির দৃষ্টি ময়ূরের শিখাটির প্রতি নিবদ্ধ। কেন এমন হইল? প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে মেঘোদয়ে ময়ূরের কলাপ মেলিবার প্রশস্ত স্থান আছে, ভবন বলভিতে সে সঙ্কুচিত সত্তা, তাই কবি কল্পনার রশ্মি ঐ ক্ষুদ্র শিখাটির উপরে মাত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।

আরও একটি উদাহরণ লওয়া যাক—
'ময়ূর করোনি মোরে ভয়।'
এখানে শিখীও নয়, কলাপীও নয়, কারণ এখানে পাখীটির কোন অঙ্গের প্রতি বা বিশেষ কোন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় নাই—তাহার মূল সত্তাটিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। মূল শব্দটি ময়ূর, অন্যগুলি প্রতিশব্দ। কিন্তু শিল্পীর বিচারে প্রতিটিই স্বতন্ত্র শব্দ—একটির বদলে আর একটি অচল।

এখন সূক্ষ্ম বিচারে শব্দের যদি প্রতি-শব্দ সম্ভব না হয়, কাব্যেরও প্রতিরূপ সম্ভব নয়। কিন্তু আবার সেই পুরাতন আপত্তি জাগিবে, সম্ভব সে তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। পুরাতন আপত্তির পুরাতন উত্তর। হয় এগুলি প্রতিরূপ নয়, সম্পূর্ণ নূতন রূপ, কিম্বা কাব্যের প্রেরণার মূলে কোন ত্রুটি আছে, যাহাতে সবটা অখণ্ড মূর্তি না পাইয়া ভাঙিয়া গিয়া গ্রহানু-পুঞ্জের অজস্রতা লাভ করিয়াছে।

এই বিচিত্র রূপগুলি যে নূতন রূপ নয়, তাহা নিতান্ত অন্ধেও বলিতে পারিবে। তবে প্রতিরূপ! কেন? এবারে গোড়ায় উল্লিখিত একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিই। রবীন্দ্র-জীবনের প্রথম দিনের তুলনায় শেষের দিকেই কবিতার রূপের দ্বিত্ব সংখ্যা বেশি। আমার বিশ্বাস, এ দুটি কার্যকারণে শৃঙ্খলিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে গোড়া হইতেই হৃৎবৃত্তি (Emotion) ও চিৎবৃত্তির (Intellect) ভারসাম্য দেখা যায়, একথা সত্য। কিন্তু তবুও বিশেষভাবে বলিতে গেলে প্রথম দিকের কবিতা হৃৎবৃত্তিপ্রধান, শেষ জীবনের কবিতা চিৎবৃত্তিপ্রধান। এই প্রসঙ্গে তুলনীয় বসুন্ধরা ও পৃথিবী কবিতা দুটি। প্রথমটির উৎস বিশ্ববোধে, দ্বিতীয়টির উৎস বিশ্ববুদ্ধিতে, একটির উৎস হৃদয়, একটির উৎস মস্তিষ্ক। হৃদয়ের যাতায়াত পথ বহু লক্ষ বৎসর হইল চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে, সহজাত সংস্কারের বলে সে অন্ধভাবেও চলিতে পারে, যেমন অন্ধকারে আমরা পরিচিত গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া থাকি। হৃদয়ের তুলনায় বুদ্ধি নিতান্তই নাবালক, নূতন বাড়িতে সবেমাত্র সে প্রবেশ করিয়াছে, আলো ছাড়া তার চলে না এবং আলোতেও ভুল করিতে বাধে না, আলো পথ দেখায়, কিন্তু কোন্ পথটা ঠিক তাহা দেখাইবে কি উপায়ে? বুদ্ধি বারংবার ভুল পথ অবলম্বন করে এবং ফিরিয়া আসে সেই ভুল চলার পদচিহ্ন কবিতার এই প্রতিরূপ-গুলি; বুদ্ধি এদিক-ওদিক হাতড়াইয়া মরে, সেই হাতের ছাপ এই বিচিত্র রূপগুলি। হৃদয় বাঘের মতো সহজাত সংস্কারের বলে যেখানে এক লাফে শিকারের ঘাড়ে গিয়া পড়ে বুদ্ধিকে সেখানে শিকারীর মতো অনেক তাক্ করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে হয়—একটা যদি লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়—চারটা ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়ে। কবিতার প্রতিরূপগুলি সেই ইতস্তত ছড়াইয়া-পড়া তীর। প্রতিরূপের প্রাচুর্য আর যাই হোক, প্রতিভার প্রাচুর্য নয়, হয়তো ঠিক তাহার বিপরীত।

২

পত্রপুট কাব্যের ষোল সংখ্যক কবিতাটি আফ্রিকা বিষয়ক। ইহার তিনটি রূপ বর্তমান। একটি রূপ বা চূড়ান্তভাবে গৃহীত রূপ ষোল সংখ্যক কবিতাটি, অন্য দুটি রূপ গ্রন্থ পরিচয়ে প্রদত্ত।৫ চূড়ান্ত রূপটি গদ্য ছন্দে লিখিত, অন্য দুটি রূপে অমিত্র পদ্য ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তিনটি রূপ বা পাঠের মধ্যে ঐশ্বর্যের বিশেষ তারতম্য নাই, পাঠক ইচ্ছা করিলে যে কোন একটিকে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কবির পছন্দ গদ্য ছন্দে লিখিত পাঠটির প্রতি। এমন হইবার কারণ মনে হয় যে, শেষ জীবনে গদ্য ছন্দটার প্রতিই তাঁহার টান বেশি হইয়াছিল। আর একটা কারণ, বিষয়ের অভূতপূর্বতা ছন্দের অভূতপূর্বতার অপেক্ষা রাখে। পদ্য ছন্দের তুলনায় গদ্য ছন্দ নিঃসন্দেহ অভূতপূর্ব।

পত্রপুটের আঠারো সংখ্যক কবিতাটি আঠারো মাত্রার ছন্দে লিখিত; গ্রন্থ পরিচয়ে প্রদত্ত ইহার পাঠান্তরও নিয়মিত ছন্দব্যূহে সজ্জিত। পাঠান্তরের নাম 'নির্বাক'। আঠারো সংখ্যক কবিতাটির আরম্ভ এইরূপঃ

> 'কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাত্রি,
> এইবার থামো তুমি।'

বিষয়টি অবচেতন মনের তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের আলোচনার যোগ্য।

শ্যামলী কাব্যের দ্বৈত কবিতাটির পাঠান্তর বর্তমান। মূলটির নীচে রচনার তারিখ, ২৩শে মে ১৯৩৬; পাঠান্তরের নীচে তারিখ ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ সাল। ২৩শে মে ৮ই বা ৯ই জ্যৈষ্ঠ হইয়া থাকে, খুব সম্ভব সে বৎসর একই দিন ছিল। বৃদ্ধ বয়সে একই দিনে একই কবিতার দুটি পাঠান্তর রচনা শিল্পাধ্যবসায়ের একটি দৃষ্টান্ত। দুটির মধ্যে পূর্ণতর রূপটি কেন চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, প্রথম কয়েক ছত্রের তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে।

> প্রথম দেখেছি তোমাকে,
> বিশ্বরূপকারের ইঙ্গিতে,
> তখন ছিলে তুমি আড়ালে।
> যেন দাঁড়িয়ে ছিলে বিধাতার মানসলোকের
> সেই সীমানায়
> সৃষ্টির যেখানে আরম্ভ।

> যেমন অন্ধকারে ভোরের বাঞ্জনা
> অরণ্যের অশ্রুতপ্রায় মর্মরে
> আকাশের অস্পষ্টপ্রায় রোমাঞ্চে,
> ঊষা যখন পায়নি আপন নাম,
> যখন জানেনি আপনাকে।
> (পাঠান্তর)
> সেদিন দিলে তুমি আলো আঁধারের মাঝখানটিতে,
> বিধাতার মানসলোকের
> মর্ত্যসীমায় পা বাড়িয়ে
> বিশ্বের রূপ আঙিনার পাছ দুয়ারে
> যেমন ভোরবেলার একটুখানি ইশারা,
> শালবনের পাতার মধ্যে উস্‌খুস্,
> শেষ রাত্রের গায়ে-কাঁটা দেওয়া
> আলোর অনড় চাহনি;

৫ গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ৪৩৪—৪৩৯, র-র, ২০শ খড

ষা যখন আপন-ভোলা
খন সে পায়নি আপন ডাকনামটি পাখীর ডাকে,
পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের লিখন পত্রে।
(মূল পাঠ)

দুটি অংশ পড়িলেই অনায়াসে বুঝিতে রা যায় যে,—একটিতে কবির কল্পনার ঊষা পায়নি আপন নাম, জানেনি আপনাকে' —আর একটিতে সে সম্পূর্ণ না জাগিয়া ঠিলেও তাহার "গায়ে কাঁটা দেওয়া আলোর ড়চাহনি"—প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

আর একটু দেখা যাক্—

পৃথিবী তাকে সাজিয়ে তোলে
আপন সবুজ সোনার কাঁচলি দিয়ে,
পরায় তাকে আপন হাওয়ার চুনরি।
(মূলপাঠ)

পৃথিবী তাকে আপন রঙে রাঙিয়ে তোলে,
পরায় তাকে আপন হাওয়ার উত্তরীয়।
(পাঠান্তর)

ভোরের অন্ধকারের মধ্যে রঙের আভা, সুর রেখা যেমন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে, পাঠান্তর হইতে মূলপাঠে ...রো একটা বিবর্তন ঘটিয়াছে। ...রে পৃথিবীর 'আপন রঙ'—মূলপাঠে ... আপন 'সবুজ সোনার কাঁচলি'— ... বস্তু একত্র স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে; ... পাঠান্তরে 'হাওয়ার উত্তরীয়' মূল- ... হইয়াছে 'হাওয়ার চুনরি'; উত্তরীয়ের ... চুনরি' বিশিষ্টতর; রাত্রির অন্ধকারের ...শেষে জগৎ ভোরের আলোয় ক্রমে ক্রমে ...ষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে; নির্বিশেষের ...করণ; ইহাই তো শিল্প সৃষ্টির ...।

...ক্ত কাব্যের 'অকাল ঘুম' কবিতাটিও ...রে সমন্বিত।৭ দ্বৈত কবিতায় যে ...র উল্লেখ করিয়াছি এখানেও তাহার ... বেশ সুস্পষ্ট। দুটি অংশের তুলনা ... যাক্—

...দেহের করুণ মাধুরী
...সারারাত জাগা পূর্ণিমার
সকলের চাঁদ।
(পাঠান্তর)

...দেহের করুণ মাধুরী মাটিতে মেলা,
...পূর্ণিমা রাতের ঘুম হারানো অলস চাঁদ
সকাল বেলায় শূন্য মাঠের শেষ সীমানায়।
(মূলপাঠ)

দুই অংশেই মূল উপমা এক ও অভিন্ন ... পাঠ দুটির মধ্যে প্রভেদ ঘটিয়াছে। পাঠান্তরে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে যোগটা অস্পষ্ট; বাঞ্ছিত সঙ্কেত, ইঙ্গিত ও সূত্রগুলি লাভ করিয়া মূলপাঠ কেমন পূর্ণতর কাজেই কত সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে।

কবি কবিতার মূল পাঠ ও পাঠান্তরের ৮ মধ্যে মূল পাঠটিই শ্রেষ্ঠতর; কাহিনীর পূর্ণতরতাই তাহার একমাত্র কারণ। উভয় পাঠই গদ্য ছন্দে লিখিত। এখানে গদ্য ছন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার মধ্যে যেগুলি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বা জনপ্রিয় তাহাদের অধিকাংশই হয় কাহিনীমূলক নয় কাহিনী আভাসিত। কাজেই অনুমান করা অমূলক নয় যে, এই জনপ্রিয়তা কাহিনীর জন্য যেমন, গদ্য ছন্দের জন্য তেমন নয়। ইহাতে কাহিনীর প্রতি পাঠকের চিরন্তন আকর্ষণেরই যেমন প্রমাণ হয়—গদ্য ছন্দের উৎকর্ষের তেমন প্রমাণ হয় কি? আবার কোন কোন গদ্য কবিতার প্রসিদ্ধির বা জনপ্রিয়তার কারণ রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কল্পনা-কুশল বাকভঙ্গী। দৃষ্টান্তস্থল পৃথিবী গদ্য কবিতা। ইহাতেও গদ্য ছন্দের উৎকর্ষের পরীক্ষা হইল না।

পয়ারের বা অমিত্রাক্ষরের যেমন নিজস্ব একটি রূপ ও শক্তি আছে, কাহিনী বা কল্পনাকুশলতার উপরে যেমন তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়, কাহিনী বা কল্পনা তাহার ঐশ্বর্য বাড়াইতে পারে এই মাত্র, তেমনি গদ্য ছন্দেরও একটি নিজস্ব ছান্দিক রূপ ও শক্তি থাকা সম্ভব। সাহিত্যে গদ্য ছন্দ স্থায়ী কিম্বা অতিথিমাত্র তাহা ঐ নিজস্ব-তার উপরেই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করিবে। কাহিনীর এঞ্জিন সাহায্যে বা কাহিনী ও অলংকারের ডবল এঞ্জিন সাহায্যে তাহাকে চড়াইপথ অতিক্রম করানো যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে যে তাহার স্বকীয় রূপ ও প্রাণবত্তা আছে তাহা সব সময়ে প্রমাণ হয় না। গদ্য ছন্দের এই পরীক্ষাটিই এখনো বাকি আছে।

মধুসূদনের হাতে অমিত্রাক্ষর অমিত শক্তিশালী। পরীক্ষা সেখানে নয়। সাধারণ কবির কলমের খোঁচাতেও অমিত্রাক্ষরের প্রাণ যদি টেঁকে, নিজত্ব যদি নষ্ট না হয়, তবে বুঝিতে হইবে অমিত্রাক্ষর বাংলা সাহিত্যে আর অস্থায়ী আগন্তুকমাত্র নয়, স্থায়ী বাসিন্দার অধিকার সে লাভ করিয়াছে। বিদেশ হইতে আগত অমিত্রাক্ষর, সনেট, ট্রাজেডি প্রভৃতি অনেক শিল্পরূপেরই সে মৌলিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সাধারণ লেখকের হাতে পড়িয়া তাহাদের যতই দুর্দশা হোক্ না কেন, মূল রূপের বিকার ঘটিবার আর আশঙ্কা নাই।

গদ্য ছন্দের বেলায় সে পরীক্ষা হইয়াছে কি? স্বকীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত না রবীন্দ্রনাথের বিভূতির ছায়ায় দণ্ডায়মান। যদি শেষের অনুমানটা সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে, গদ্য ছন্দ একটা স্বতন্ত্র শিল্পরূপ নয়, রবীন্দ্রনাথের অনেক styleএর মতো অনবদ্য এবং অননুকরণীয় একটা style মাত্র। এ প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় হয়তো এখনো আসে নাই, আরও কিছু সময় অতিবাহিত না হইলে, বা সাধারণ লেখকের আরও কিছু স্থূল হস্তক্ষেপ সহ্য না করা অবধি হয়তো সে সময় আসিবে না। তাই বিষয়টার উত্তর দিবার বৃথা চেষ্টা করিলাম না—প্রশ্নরূপেই রাখিয়া দিলাম।

শানাই কাব্যগ্রন্থের কর্ণধার কবিতাটি যে-সব ক্রমবিকাশমুখী বিভিন্ন পাঠের ধারা বাহিয়া চরম বলিয়া গৃহীত পাঠটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—তাহাদের সবগুলিকেই (সত্যই কি সবগুলি—না, আরও পাঠ রহিয়াছে) পাওয়া গিয়াছে। পাঠগুলি পর পর সাজাইলে কবির মনের বিবর্তনটি আমরা অনায়াসে ধরিতে পারিব। এই চেষ্টা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি কৌতূহলজনক। সব পাঠগুলির আদ্যন্ত উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই, সে অবসর এখানে হইবে না, সামান্য সামান্য অংশ উদ্ধার করিলেই আমাদের কাজ চলিবে।৯

সকাল বেলায় পাইলাম—

হে তরুণী তুমিই আমার
ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় বাইচো স্বপনতরী
নিয়ে যাবে কর্ম নদীর পার॥১॥

তারপরে বিকাল বেলায় পাইতেছি

কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্ম নদীর পার।

* * *

---

৭ গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ৪৪৪—৪৪৬, র-র ...শ খণ্ড

৮ গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ৪৪৭—৪৪৮, র-র, ২০শ খণ্ড

৯ কর্ণধার, পৃঃ ৬৮—৭০; পূর্বপাঠ, পৃঃ ৪৭৬—৪৮০, র-র, ২৪শ॥

নীল নয়নের মৌন খানি
সেই সে দূরের আকাশ বানী
দিনগুলি মোর ওরি ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
উদ্দেশহীন অকর্মণ্যতার ॥২॥

তার পরের দিন পাইতেছি—

ছুটির কর্ণধার
দখিন হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী
মন্থর দিন তারি ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
ভাঁটার স্রোতে উদ্দেশহীন
কর্মহীন তার
তুমি তখন ছুটির কর্ণধার
শিরায় শিরায় বাজিয়ে তোল
নীরব ঝঙ্কার ॥৩॥

এই তিনটি পাঠেরই রচনাকাল—২৩।৫।৩৯ এবং পরের দিন বলিতে ২৪।৫।৩৯ সাল।

এবারে কয়েক মাস পরের অর্থাৎ ১৪।১০।৩৯ সালের একটি পাঠে পাইতেছি—

ওগো কর্ণধার
সৃষ্টি তোমার ভাসান খেলায়
লীলার পারাবার।

* * * *

ছুটির খেলায় খেলাও কর্ণধার,
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।
লীলার কর্ণধার
জীবন নিয়ে মৃত্যু ভাঁটায়
চলেছ কোন্ পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈব বাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্দ্রের ঝঙ্কার ॥৪॥

ইহার কিছুদিন পরে অর্থাৎ "২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪০ সালে লিখিত যে পাঠটি পাইতেছি তাহাই পূর্ণাঙ্গ পাঠ বলিয়া গৃহীত ও মুদ্রিত—

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার,
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার।

* * * *

ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।
ওগো আমার লীলার কর্ণধার,
জীবন-তরী মৃত্যু ভাঁটায়
কোথায় কর পার।

নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্দ্রের ঝঙ্কার ॥৪॥

সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি পাঠ পাইতেছি—সময়ের হিসাবে মে মাসের তেইশে হইতে জানুয়ারী মাসের আঠাশে অর্থাৎ কয়েকদিন বেশি ছয় মাস। এই ছয় মাসকালে এই কবিতাটি সম্বন্ধে কবির যে-সব ছায়াতপ পাত ঘটিয়াছে, যে-আবর্তন বিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার অনেকগুলিরই চিহ্ন পাওয়া গেল। এ এক সৌভাগ্য—এমন সুযোগ সাধারণত ঘটে না।১০

কবিতাটির বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেমন লীলাচ্ছলে, প্রায় পরিহাসচ্ছলে বলিলেও অন্যায় হইবে না, কবিতাটির সূত্রপাত! "হে তরুণী তুমি আমার ছুটির কর্ণধার।" ইহার ইঙ্গিত কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, এমন মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। গানটি রচনার পটভূমি পাঠ করিলে আমার অনুমান সমর্থিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

"আজ চমৎকার দিনটি হয়েছে। কেবল কুঁড়োমি করতে ইচ্ছে করছে, তাই এই চৌকিতে হেলান দিয়ে ব'সেই আছি। গান গেয়ে যেতে লাগলেন, 'হে তরুণী তুমি আমার ছুটির কর্ণধার।' আজ সমস্ত দিনটা যেন ছুটিতে পাওয়া। কাজের দিন নয় এ, তাই বসে গাইছি—'হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার, অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার।"১১

আমার বক্তব্য এই যে, অবসর বিনোদনের জন্য লীলাচ্ছলে, কতক বা পরিহাসচ্ছলে ব্যক্তিবিশেষকে মনের সম্মুখে রাখিয়া অর্ধ-মনস্কভাবে যাহার সূত্রপাত, মনের মধ্যে বেগ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৌলিক তুচ্ছতা

১০ এই সুযোগ দানের জন্য 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নামক উপাদেয় গ্রন্থের লেখিকার নিকটে পাঠক মাত্রেই অপরিসীম ঋণে আবদ্ধ। উক্ত গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশ পড়িয়া লইলে পাঠকগণ উপকৃত হইবেন।

১১ গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ৪৭৬, র-র, ২৪শ খণ্ড

দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, কবিতাটি নূতনতর অর্থ, গভীরতর বেদনা লাভ করিয়াছে। এমন ধারা অসম্ভব নয়, বরঞ্চ অনেক সময়ে ইহাই স্বাভাবিক পরিণাম। যেমন পাহাড়ে ঝরণা। ঝরণার সূত্রপাত যেমন তুচ্ছ যেমন আকস্মিক, যেন তাহা পাহাড়ী বালক-বালিকাদের, নিতান্তই ব্যক্তিগত খেলনা বিশেষ। কিন্তু প্রবর্ধিতবেগ প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আগের চেহারা কি বদলিয়া যায় না? তখন তাহা গভীরতর, প্রশস্ততর, আর তাহাকে ব্যক্তিগত বা খেলনা মাত্র মনে হয় না। এবারে বিবর্তনধারা লক্ষ্য করা যাক—

হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার ॥১॥

পরবর্তী অবস্থায় পাইতেছি—

"হে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার"

"তরুণী" আর প্রত্যক্ষতঃ নাই, কিন্তু "অদৃশ্যভাবে" রহিয়াছে। "নীলনয়নের মৌনখানি" অদৃশ্য তরুণীর অস্তিত্ব-জ্ঞাপক।

তৃতীয় অবস্থায় শুধুমাত্র—

ছুটির কর্ণধার

এবারে তরুণী ছুটি পাইয়াছে, ঝরণা গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে, তরুণীর সঙ্গে তাহার নীল নয়নও অন্তর্হিত, তাহার স্থলে "নীল আকাশের মৌনখানি।" কবিতাটির অঙ্গ হইতে ব্যক্তি-বিশেষের চিহ্ন ঝরিয়া গিয়াছে, বিশেষ এবার নির্বিশেষ হইয়া উঠিবার মুখে।

চতুর্থ অবস্থায় কবিতাটি প্রায় পূর্ণতায় পৌছিয়াছে—

ওগো কর্ণধার
সৃষ্টি তোমার ভাসান খেলায়
লীলার পারাবার ॥৪॥

এবারে শুধু 'কর্ণধার'। মৌলিক প্রেরণার যে চিহ্নটুকু তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া এতক্ষণ চলিয়া আসিতেছিল—'ছুটির কর্ণধার'—সেই 'ছুটি' আর এখন নাই। এই "কর্ণধার" পূর্বোক্ত কর্ণধার নয়—তবু, একটুখানি দ্বিধা আছে—সে যে কে কবি জানিলেও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

পঞ্চম অবস্থায় বিগত দ্বিধা স্পষ্টতা—

"ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার ॥"

এ "প্রাণের কর্ণধার" স্বয়ং ভগবান। কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ! ব্যক্তি বিশেষে যাহার সূত্রপাত নির্বিশেষে তাহার উপসংহার, তুচ্ছতায় আরম্ভ মহাদ্যোতনায় শেষ, বিশেষ হইতে বিগত-বিশেষে প্রগতি! ঝরণার মহানদীত্বপ্রাপ্তি এবং অবশেষে সমুদ্রে আত্ম-বিসর্জন। মাত্র বর্তমান ক্ষেত্রে নয়, রবীন্দ্রনাথের কবি প্রেরণার বিবর্তনের ইহাই সাধারণ নিয়ম। এমন কি তাঁহার অত্যন্ত ঔপলক্ষিক কবিতাগুলিও দু'চার ছত্র পরেই আপন উপলক্ষকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। এক্ষেত্রে সে নিয়ম অতিশয় সক্রিয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে এপর্যন্ত যত আলোচনা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই তত্ত্বসংক্রান্ত। ইহার প্রয়োজন ও মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু ঐখানে থামিয়া থাকা উচিত নয়। এবারে তত্ত্বের হইতে বস্তুর স্তরে, ভাবের হইতে রসের স্তরে, নামিয়া আসা আবশ্যক। তত্ত্ব বিচারের মূল্য যতই হোক রস বিচারের চেয়ে বেশি নয়—আর শেষ পর্যন্ত তত্ত্ব বিচারও রস বিচারের আনুষঙ্গিক; কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য রসোপলব্ধিতে সহায়তা। পাঠান্তর বিচার রস বিচারেরই অঙ্গ। আমার সাধ্যানুসারে তাহার সূত্রপাত করিলাম। এবারে যোগ্যতর ব্যক্তিদের এদিকে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।

চূর্ণ-কবিতা

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

[আসল কবিতাগুলি নানা ভাষায় লেখা। ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে সেগুলো সংগ্রহ করে তাদের ভাবার্থ বাঙলা গদ্যে দেওয়া গেল, কারণ পদ্য রচনায় লেখক একেবারেই অক্ষম]

১। তুমি যে কথাটা বল্‌লে, সেটা ত' আমি কাণ দিয়েই শুনলাম। কিন্তু যে কথাটা তুমি বল্‌তে গিয়েও বল্‌লে না,—সেটা যে কি—তাই ভাবতে ভাবতে আমার দিন কেটে গেল। (ফরাশী থেকে)

২। তুমি আর আমি!......কিন্তু কতটুকু পরিচয়? আনন্দই বা কতটুকু? সবই শুধু ক্ষণিকের তরে। অনন্তের এক ঘন অন্ধকার গুহা থেকে টেনে এনে, কোন বিধাতা আমাদের এই ধরণীর শ্যামস্নিগ্ধ কোলে ফেলে দিলেন? সঙ্গে সঙ্গেই আবার কোন অদৃষ্ট আর এক অনন্তের অন্ধকার পথের যাত্রী করে দিল? আর কি আমাদের দেখা হবে? আর কি কখনও আমরা কেউ কাউকে কাছে পাবো?...... (ইংরিজি থেকে)

৩। কে তুমি পথিক এই কবরের উপর এসে বসলে? এর নীচে এক দীনহীন অভাজন কবি বহুদিন আগে তার শেষশয্যা পেতেছিল। কেউ তার নাম জানে না; কেউ তার কাব্য পড়ে না। কিন্তু সে কবি চিররহস্যময়ী এই পৃথিবীকে তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। ওগো অজানা পথিক, যাবার সময় তুমি শুধু সেই ভালবাসার কিছুটা সঙ্গে নিয়ে যেও। (ফার্সীর ফরাশী তর্জমা থেকে)

৪। তুমি যখন কাছে ছিলে তখন ত' তোমাকে এমন নিবিড়ভাবে পাইনি। কিন্তু মৃত্যুবরণ করে তুমি যে নিজেকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছো। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই তোমাকে দেখতে পাই। এমন গভীরভাবে তুমি ত' আগে কখনও ধরা দাওনি। (সংস্কৃত থেকে)

৫। রাজ-দরবারে যাঁরা বড় হতে চান, তাঁদের জন্যে রাজ-নীতি আছে। যাঁরা স্বর্গ চান, তাঁদের জন্যে কঠোর তপস্যা আছে। যাঁরা সাধুসন্ত হতে চান, তাঁদের জন্যেও নানারকম আচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমার জন্যে আছে স্বয়ং বিধাতা-পুরুষের নিজের হাতে দেওয়া খানকয়েক গোলাপফুলের পাঁপড়ি। (ফার্সীর ইংরিজি তর্জমা থেকে)

আজব দীক্ষা

জি কে চেস্টারটন

অনুবাদক ঃ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

(**পূর্ব প্রকাশিতের পর**)

পঞ্চম গল্প ঃ নৃত্যের তালে তালে

বেসিল গ্র্যান্টের বন্ধুবান্ধব খুব অল্প। তা বলে কেউ তাকে অসামাজিক ঠাউরে নেবেন না। যে-কোনও লোকের সঙ্গেই হোক, যে-কোনও জায়গাতেই হোক্, দিল খুলে সে আড্ডা জমাবে। কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করবে। পৃথিবীকে সে যেন স্টেশনের ওয়েটিং রুম কি একটা চলন্ত ওমনিবাসের মত গ্রহণ করেছে। একটু বাদেই কে কোথায় চলে যাবো ঠিক্ নেই; সুতরাং, যে দু-পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, নাও—আশ মিটিয়ে তাঁদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে নাও।

সত্যিই তাই। এই আজ কিছুক্ষণের জন্যে যাদের সঙ্গে সে গল্পগুজবে মত্ত হয়ে উঠ্‌লো, আগামীকাল তার জীবন থেকে তারা মুছে যাবে একেবারে। এক-আধজন শুধু লেপ্‌টে থাকবে শেষপর্যন্ত; বেসিলের তারা আমৃত্যু সহচর।

বেসিলের বন্ধুগোষ্ঠী সংকীর্ণ; তারা সব বিচিত্র লোক; পরস্পরের সঙ্গে তাদের এতটুকুও মিল নেই। একবার যদি দেখেন তাদের, মনে হবে বেসিল যেন ইচ্ছে করেই উল্টোপাল্টা সব 'টাইপ্' জুটিয়ে রেখেছে। মনে হবে, মানুষ নয়, মালগাড়ি-থেকে-খসে পড়া এক-একটি মাল যেন। জনকয়েকের একটু পরিচয় দিই। একজন হলেন ঘোড়ার ডাক্তার, চেহারাটা তাঁর জকীর মতো। অন্যজনের মুখে শাদা ধপধপে দাড়ী; কথা-বার্তা ধোঁয়াটে। কী তার অর্থ—খোদায় মালুম। তৃতীয়জন এক ছোক্‌রা ক্যাপ্টেন, চেহারায় কোনও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। চতুর্থজন এক ডেন্টিস্ট, বাড়ি ফুল-হ্যামে। এঁর চেহারাও নিতান্ত বৈশিষ্ট্যহীন; ডেন্টিস্টদের সব যে-ধরণের চেহারা হয়ে থাকে ঠিক সেইধরণেরই আর কি। বেসিলের আর এক বন্ধু হচ্ছেন মেজর ব্রাউন। তাঁকে আপনারা চেনেন; হ্যাঁ—সেই বেঁটেখাটো ফিট্‌ফাট্ ভদ্রলোক। বেসিলের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ এক হোটেলে। টুপি নিয়ে কথা হচ্ছিল; বেসিল এক-একটা মন্তব্য ঝাড়ে আর তিনি হেসে গড়াগড়ি যান। ব্যস্, বন্ধুত্ব জমে গেল। একসঙ্গে একই গাড়ীতে তাঁরা বাড়ি ফিরলেন। তারপর, যদ্দিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, হপ্তায় দুদিন তাঁরা এ-ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়েছেন। এ-ব্যবস্থার আর কোনও নড়চড় হয়নি। আর আমার সঙ্গে যখন ওর প্রথম দেখা, তখনো ও জজ্-এর চাকরী করছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরী ক্লাবের গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়ে আলাপ হলো। প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল আবহাওয়া নিয়ে, শেষপর্যন্ত তা রাজনীতি এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে গিয়ে ঠেক্‌লো। তা এতে অবাক্ হওয়ার কিছুই নেই। মনে রাখবেন, অচেনা লোকেদের সঙ্গেই আমরা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ করে থাকি। এ আমাদের মজ্জাগত স্বভাব।

এবং এর একটা যুক্তিসঙ্গত হেতুও বর্তমান। কেউ যখন আমাদের চেনা হয়ে যায়, তখন বড়ো মুশকিল। একবার মনে হয়, এঁর চেহারাটা বোধ হয় আমার এক দূরসম্পর্কের কাকার মতো, পরক্ষণেই আবার তার গোঁফের দিকে নজর পড়ে। মন উচাটন হয়, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ফলে আর উচ্চস্তরের আলাপ জমবার উপায় থাকে না। অপরপক্ষে যে-লোক আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা, একমাত্র তারই মধ্যে বোধ হয় মানুষের শাশ্বত রূপটিকে অবলোকন করা সম্ভব। সেইজন্যেই তার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ, সেইজন্যেই বুঝি ঈশ্বর সম্পর্কেও তার সঙ্গে আলাপ করতে সাধ যায়।

সে যাক্। বেসিলের বন্ধুগোষ্ঠী নিয়ে কথা হচ্ছিল। তার মধ্যে প্রফেসর চ্যাড্ লোকটি বড় মজার। নৃতাত্ত্বিক মহলে (এ মহল আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, তবে শুনেছি পরিবেশটা নাকি বিচিত্র) খুব নাম-ডাক তাঁর। অসভ্য আরণ্য বর্বরদের সঙ্গে ভাষার কি সম্পর্ক—সে সম্পর্কে তার মতা-মতকে সেখানে প্রামাণ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে, ব্লুমস্‌বেরীর হার্ট্ স্ট্রীট অঞ্চলের বাসিন্দারা তাঁকে শুধু নিছক এক-জন দাড়ীওয়ালা চশমাধারী গোবেচারা টেকো ভদ্রলোক বলেই জানে। মুখ দেখে মনে হয়, ভদ্রলোক বোধহয় জীবনে কারুর ওপর চটেননি, কি করে চট্‌তে হয় তাও ভুলে গেছেন। মাঝে মাঝে তাঁকে ব্রিটিশ মিউ-জিয়মে, আর নয়তো শাদামাঠা দু-একটা চায়ের দোকানে দেখা যায়। হাতে একগাদা বই এবং একটি ছাতা। বই কিংবা ছাতাবিহীন অবস্থায় কেউই তাঁকে কখনো দেখেনি। মিউজিয়মের পারসিক-বিভাগের চ্যাংড়া গবেষকদের ধারণা, ও-দুটি জিনিসকে তিনি তাঁর শয্যাসঙ্গী হিসেবেও গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক থাকেন শেফার্ড'স্ বুশ্ অঞ্চলে। ছোট্ট একটি বাড়িতে তাঁর আস্তানা। সঙ্গে থাকেন তাঁর তিন বোন। সবকটি বোনেরই দিল্ ভালো, চেহারা খারাপ। অধ্যাপক সুখী লোক। ছাত্র-জীবনে পড়ুয়া-ছেলে ছিলেন; আর পড়ুয়ারা দেখবেন জীবনে কখনো অসুখী হয় না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা। এ-জীবনে সুখ আছে শান্তি আছে,—তবে বৈচিত্র্য নেই। প্রফেসর চ্যাড্-এর জীবনেও নেই। মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলায় যখন বেসিল এসে ঢুঁ মারে তাঁর বাড়িতে, একমাত্র তখনই শুধু কথায় বার্তায় আর হাসিঠাট্টার আমেজী উত্তে-জনায় সারা বাড়িটা যেন সরগরম হয়ে ওঠে।

বেসিলের বয়েস তা প্রায় বছর ষাটেক হবে। তা সত্ত্বেও তার মনের একটি শিশু সত্তা বর্তমান; সুযোগ পেলেই সেটি খল বলিয়ে ওঠে। এটা আবার বেশীর ভাগ ঘ চ্যাড্-এর বাড়িতেই। সেই সন্ধ্যাটির কথ প্রফেসরের জীবনের সেই চরম বিপর্যয়ে মুহূর্ত, এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে বেসিল এবং চ্যাড্—দুজনেই আমার বন্ধ লোক। মাঝে মাঝে তাই আমারও নেমন্ত হতো প্রফেসরের ওখানে। সেদিনও আ উপস্থিত, সেদিনও বেসিলের খুশ্-দিল প্রচুর হাসছিল সে।

কথা উঠেছিল প্রফেসরেরই একটি প্রব নিয়ে। প্রফেসর পণ্ডিতলোক, সেইসা মধ্যবিত্ত। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হ তিনি র‍্যাডিক্যাল মতাবলম্বী। তবে এক গুরুগম্ভীর পুরণো ধাঁচের। বেসিল র‍্যাডিক্যালপন্থী; সেই দলের র‍্যাডিকা অধিকাংশ সময়েই যারা র‍্যাডিক্যাল পার্টি কঠোর সমালোচনায় মত্ত থাকে। এমন লে দেখবেন আকছার আপনার চোখে পড়ে হ্যাঁ যে-কথা হচ্ছিল। সম্প্রতি এক পত্রি

প্রফেসরের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধের নাম, 'জুলু স্বার্থ ও নয়া ম্যাকাঙেগা সীমান্ত'। এতে তিনি ৰ্চাকার অধিবাসীদের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যাদির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। সেইসঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইংরেজ এবং জর্মান কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। বলেছেন যে, এতে করে স্থানীয় অধিবাসীদের আচার-অনুষ্ঠানের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

প্রফেসর বসে আছেন। সামনে সেই পত্রিকাখানি। আলো লেগে তাঁর চশমার কাচ চিক্‌চিক্ করছে। কপাল কোঁচকানো। রাগে নয়, বিমূঢ় বিস্ময়ে। 'আর ওদিকে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে বেসিল গ্র্যাণ্ট; চেঁচিয়ে কথা কইছে, মেঝেতে পা ঠুকছে। খুশী তার উপছে পড়ছে যেন। প্রফেসর তাতে আরো বিস্মিত।

বেসিল বলছিলো, "না হে চ্যাড্, তোমার ওই গবেষণা সম্পর্কে আমার একবিন্দুও আপত্তি নেই,—আপত্তিটা হচ্ছে তোমার সম্পর্কে। জুলু-স্বার্থের তুমি একজন ধ্বজাধারী তা আমি জানি। এ-ও জানি যে কাজটা তুমি ভালই করছো। তবে সেই-সঙ্গে এ-কথাও আমি বলবো, জুলুদের প্রতি তোমার অন্তরের কোনও টান নেই। তুমি নিজেও সে কথা জানো। জুলুরা কীভাবে টম্যাটো রান্না করে, নাক ঝাড়বার আগে কী মন্ত্র তারা আউড়ে নেয়—সেসব তথ্য সম্পর্কে তুমি একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও তুমি তাদের মন বোঝ না। আমি অনেক বেশী বুঝি। তুমি তথ্যবিদ্, আমি মর্মবিদ্। তুমি বেশী-পণ্ডিত, আমি বেশী-জুলু। মজাটা কি জানো? তোমার মতো সব ধোপদুরস্ত ভদ্রলোকরাই দেখা যায় পৃথিবীর এই আদিম আরণ্য বর্বরদের জন্যে সবচাইতে বেশী আকুল। কী এর অর্থ? কেন এরকমটা হয়? চ্যাড্, তুমি উদার, তুমি বিদ্বান, তুমি বুদ্ধিমান, সবই মানলাম। কিন্তু বাপু, আর যা-ই হও, নিজে তুমি বর্বর নও। সুতরাং বর্বরদের প্রতি তোমার একটা অন্তরের টান রয়েছে—এরকম কোনও ভ্রান্ত ধারণা তোমার না থাকাই ভালো। যাও, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাখানাকে বেশ ভালোভাবে অবলোকন করো। তাহলেই আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারবে। তাতেও বিশ্বাস না হয় তো তোমার বোনদের সব একে-একে জিজ্ঞেস করো। ইচ্ছে হলে ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গেও আলোচনা করতে পারো এ-নিয়ে। অতোরই বা দরকার কি, তোমার এই ছাতাটার কথাই ধরোনা কেন—বলে সে নিরীহনির্জীব সেই ছাতাটিকে তুলে ধরে বললো, "চ্যাড্, তোমার এই ছাতাটার কথাই ধরো। গত দশ বছর ধরে তোমাকে আমি নিত্যনিয়মিত এই ছাতাটি ব্যবহার করে আসতে দেখছি। দেখে মনে হয়, আটমাস বয়েস থেকেই তুমি এই ভদ্র পদার্থটিকে হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছো। অথচ আজ পর্যন্ত কি তোমার একবারও দুর্বোধ্য আদিম উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে এটাকে একটা বর্শার মতো এইভাবে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে হয়েছে?"

বলেই সে সাঁ করে সেই ছাতাটাকে ছুঁড়ে মারলো। প্রফেসরের টাকের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা, স্তূপীকৃত একগাদা বইয়ের ওপর গিয়ে পড়লো। ধাক্কা লেগে থরথর করে কাঁপতে লাগলো একটা ফুলদানী।

প্রফেসরের মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। একাগ্র দৃষ্টিতে আলোর দিকে তাকিয়ে তিনি বসে আছেন, কপালে চিন্তার কুঞ্চন। মৃদুস্বরে তিনি বললেন, "বেসিল, হুট্ করে কোনও সিদ্ধান্ত করে বসাটা ঠিক নয়, তাকে হঠকারিতা বলে। যা বলবে একটু ভেবেচিন্তে বলো। মনে রেখো, পৃথিবীর এই আদিম অধিবাসীরা বিবর্তনের একটা বিশেষ স্তরে এখন আট্‌কা পড়ে আছে। জীবনধারণের পক্ষে যদি অনুকূল হয় তো সেখানেই তাদের বেশ কিছুদিন আরো কেটে যেতে পারে। এখন এই যে একটি বিশেষ স্তরকে আঁকড়ে ধরে থাকার প্রয়োজনীয়তা—এরও যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রয়োজনের সেই মূল্যায়ন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পন্থা অবলম্বন—প্রকৃতপক্ষে এ-দুয়ের মধ্যে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য নেই।" প্রফেসর চ্যাড্ একটু থেমে থেমে, কাটা কাটাভাবে কথা বলছিলেন। প্রসঙ্গের জের টেনে তিনি বললেন, "কিছু-মাত্রও নেই। এ কথাগুলো তাদের স্বপক্ষেই বলা হলো। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বিবর্তনের সেই যে একটি বিশেষ স্তরে তারা এখনও বাঁধা পড়ে রয়েছে, মহাজাগতিক জীবনযাত্রার ক্রম-অগ্রগতির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখতে গেলে তাকে একটি নিতান্তই অনুন্নত স্তর বলে ধরে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্রফেসর থামলেন। স্থিরভাবে তিনি কথা বলছিলেন, ঠোঁটদুখানাই একটু নড়ছিলো শুধু। তা-ও স্থির হয়ে এল। আলোর দুটি প্রতিবিম্বিত বিন্দু শুধু তাঁর চশমার কাঁচে চিক্‌চিক্ করতে লাগলো।

গ্র্যাণ্ট তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারলাম হাসির দমকে সে কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাসি চেপে সে বললো, "নাঃ, কোনই অসামঞ্জস্য নেই। যে-দুটি দিক তুমি দেখালে, তার মধ্যে অন্ততঃ নেই। কিন্তু বৎস, মেজাজের মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে। ক্রম-বিবর্তনের যে বিশেষ স্তরটিতে জুলুরা এখন রয়েছে, কোনওমতেই তাকে আমি অনুন্নত বলতে রাজী নই। জুলুরা শুনেছি চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, শুনেছি অন্ধকারে তারা ভূতের ভয় পায়। তা তাতে দোষটা কি হলো? আমি অন্তত এর মধ্যে কিছুমাত্র নির্বুদ্ধিতা দেখতে পাচ্ছি না। আমার তো বরং একে রীতিমত একটা তাত্ত্বিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। জীবনের রহস্য কিংবা তার অনিশ্চয়তাকে উপলব্ধি করেছে বলেই কি তাদের নির্বোধ ঠাউরে নিতে হবে? অন্ধকারে আমরা ভূতের ভয় পাই না। খুবই সত্যি কথা। কিন্তু, এমনও তো হতে পারে যে, ভূতের ভয় না-পাওয়াটাই আমাদের বোকামী?"

হাড়ের তৈরী একটি পেপার-নাইফ দিয়ে কাগজখানির পাতা কাটছিলেন প্রফেসর। ভঙ্গীতে পাণ্ডিত্যের অগাধ নিষ্ঠা। মুখ না তুলেই তিনি বললেন, "গোড়াতেই তুমি ভুল করেছো। এমন একটা যুক্তির ওপর নির্ভর করে' তুমি তোমার সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হচ্ছো যেটা সত্যিও হতে পারে, মিথ্যেও হতে পারে। যতটুকু আমি বুঝতে পারছি তাতে তোমার যুক্তিটা হচ্ছে এই যে, মানব-সভ্যতার যে-স্তরে আমরা এখন উপনীত হয়েছি জুলু-সভ্যতার থেকে সেটা কিছু-মাত্রও উন্নত নয়, এমন কি অনুন্নতও হতে পারে। কেমন, তাই না? তা, সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রেই কতকগুলি মৌলিক যুক্তি থাকে। যেমন ধরো নৈরাশ্য-বাদের অস্তিত্বস্বীকার, কিংবা পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার। এগুলো এক-একটা মৌলিক যুক্তি। যে ব্যক্তি যে-ধরণের যুক্তিকে মৌলিক যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে তার সিদ্ধান্তও ঠিক সেইরকমই হবে। তোমার যুক্তিটাও ঠিক তেমনি একটা মৌলিক যুক্তি।

এ নিয়ে কোনও তর্কাতর্কি চলে না। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও আমি বলবো যে, মৌলিক যুক্তি তোমার যাই হোক না কেন, সে-যুক্তিকে তুমি নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারোনি। বড়ো জোর যুক্তিটা স্ব-বিরোধী নয়; কিন্তু ব্যস, ওই পর্যন্তই।"

বেসিল তাঁর মাথা লক্ষ্য করে একখানা বই ছুঁড়ে মারলো; তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে বললো, "ব্যাপারটা তুমি বুঝতেই পারোনি। বুঝিয়ে বলছি। এই ধরো চুরুট খাওয়া নিয়ে তোমার কোনও আপত্তি নেই, কেমন? নিজে যদিও ধূমপায়ী, তা সত্ত্বেও ধূমপান জিনিসটাকে আমি একটা জঘন্য বর্বর ব্যাপার বলে মনে করি। আসলে এটা তা-ই। অথচ এ-নিয়ে তোমার আপত্তি নেই কিছুমাত্র। তাতেই আমি অবাক হচ্ছি। আমার কথা অবিশ্যি আলাদা। বছর দশেক বয়েস থেকেই আমি চুরুট খাওয়া সুরু করেছি। তখন থেকেই আমার জুলু-জীবনের সূচনা। আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, তুমি একজন বৈজ্ঞানিক; এবং সেইসূত্রে জুলুদের সম্পর্কে অনেক তথ্যই হয়তো তুমি জানো। কিন্তু বাপু, আমিও কিছু কম জানি না। হয়তো তোমার থেকে বেশীই জানি। তার কারণ, আমি নিজেই একটি জুলু। মেজাজের দিক থেকে তাদেরই আমি স্বগোত্র। এবং এই কারণেই ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে তোমার অভিমতটাকে এখনো আমি মেনে নিতে পারছি না। তুমি বলছো, গোড়ার দিকে কোনও ব্যক্তিবিশেষের একার চেষ্টায় একটা ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল; পরে ধীরে ধীরে তার বিকাশ হয়েছে। তোমার এই অদ্ভুত ধারণার সমর্থনে হরেকরকমের তথ্য-প্রমাণ তুমি হাজির করেছো। তথ্যগুলো পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তাতে আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও তোমার ধারণাটা আমি মেনে নিতে অপারগ। তার কারণ আমার মন তাতে সায় দিচ্ছে না। মন বলছে, ভাষার সৃষ্টি হয়েছে অন্যভাবে—এভাবে নয়। যদি শুধোও কেন আমার মন একথা বলে তো তার উত্তরে আমি বলবো, আমি নিজেই একটি জুলু। আমার মন তাই জুলুরই মন। যদি শুধোও জুলু বলতে আমি কী বুঝি তো সে-প্রশ্নেরও আমি উত্তর দেব। সাত বছর বয়েসেই যে তরতর করে সাসেক্সের একটি আপেলগাছে চড়তে পেরেছে, শহরের গলিঘুঁজির মধ্যেও যে জন্তুর ভয় পেয়েছে, সে-ই জুলু।"

"তোমার চিন্তাধারাটা দেখছি—" প্রফেসর চ্যাড্ সবেমাত্র তাঁর মুখ খুলেছিলেন, কথাটা তিনি শেষ করে উঠতে পারলেন না; তাঁর এক বোন এসে ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রমহিলার হাবভাব একটু পুরুষালি, এ-সব সংসারে এমনিই হয়। অনড়ভাবে দরজার একটা পাল্লার ওপর হাত রেখে প্রফেসরের উদ্দেশে তিনি বললেন, "জেমস্ ব্রিটিশ মিউজিয়মের থেকে মিঃ বিংহ্যাম এসেছেন। আরেকবার তিনি দেখা করতে চান।"

বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রফেসর তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। দার্শনিক লোক, দর্শনটাই ভালো বোঝেন; বাস্তবের সংস্পর্শে এলেই যেন কেমন থতমত খেয়ে যান। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বেসিল তাঁর বোনকে বললো, "মিস্ চ্যাড্, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি। শুনেছি, ব্রিটিশ মিউজিয়ম নাকি গুণীকে এবারে তাঁর উপযুক্ত সম্মান দিতে এসেছে। সত্যি নাকি? প্রফেসর চ্যাড্ তাহলে সত্যিই এবারে 'এশিয়াটিক ম্যানাস্-ক্রিপ্ট্স্' বিভাগের কীপার হতে চললেন, কেমন?"

ভদ্রমহিলার রুক্ষ কঠিন মুখে আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়লো; সেই সঙ্গে একটু বিষাদ। বললেন, "খুব সম্ভব। ভালোয় ভালোয় এখন চাকরীটা হয়ে গেলে বাঁচি। এ চাকরীতে সম্মান রয়েছে, তা আমরা জানি। তার জন্যে আমরা গর্বিতও। তবে সবচাইতে বড়ো কথা হচ্ছে, চাকরীটা হয়ে গেলে এখন আমরা হাত-টানাটানির থেকে বাঁচি। সেইটেই এখন বড়ো কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেমস্-এর স্বাস্থ্য তেমন ভালো যাচ্ছে না, ওদিকে রোজগারের ধান্দায় অসম্ভব রকম খাটতে হচ্ছে। এখানে-ওখানে লেখা ছাপায়, ছাত্র পড়ায়। তার ওপর আবার রিসার্চের কাজ তো রয়েইছে। মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত ওর মাথাটাই না খারাপ হয়ে যায়। তা এতদিনে বোধ হয় সুদিন এলো আমাদের, ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন। কথাবার্তা একরকম পাকাপাকি হয়ে গেছে।"

"শুনে খুশী হলাম;" চিন্তিত মুখে বেসিল বললো, "তবে কি জানেন, সরকারী ব্যাপার তো—সব কাজেই ওদের গড়িমসি; নড়তে চড়তেই ওদের ছ মাস কেটে যায়। তাই বলছিলাম খুব বেশী আশা করাটা কিছু ঠিক নয়। ধরুন, চাকরীটা যদি না-ই হয় শেষ পর্যন্ত? নৈরাশ্যের ব্যথাটা তাহলে বড়ো তীব্র হয়েই বাজবে, তাই না? তার চাইতে বরং হলো-হলো না-হলো না-হলো, জিনিসটাকে এইভাবে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অনেককেই আমি জানি, চাকরীর ব্যাপারে তাঁরা এর থেকেও বেশী আশা পেয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিরাশ হয়েছেন। অবশ্য চাকরীটা একবার যদি হয়ে যায় তো—"

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিস্ চ্যাড বললেন, "তাহলেই সর্বরক্ষে। ঈশ্বর করুন, এবারে যেন একটু সুদিনের মুখ দেখি।"

মিস্ চ্যাড্-এর কথা তখনও শেষ হয়নি, প্রফেসর এসে ঘরে ঢুকলেন; দৃষ্টি বিহ্বল।

সাগ্রহ কণ্ঠে বেসিল শুধোলো-, "কি হে চ্যাড্, সত্যি?"

একটুখানি থতমত খেয়ে গেলেন প্রফেসর, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "না, এক বিন্দুও সত্যি নয়। তোমার ঐ যুক্তির মধ্যে তিন তিনটি মারাত্মক ভুল রয়েছে।"

"তার মানে?"

ধীরে ধীরে প্রফেসর বললেন, "মানে অতি সোজা। ঐ যে তুমি বলছিলে, জুলু-জীবনের সারমর্ম তুমি উপলব্ধি করেছো, অথচ তার জন্যে তোমাকে—"

"ধুত্তোর জুলু-জীবন!" হো হো করে হেসে উঠলো বেসিল, "বলি চাকরীটা পেলে তুমি?"

প্রফেসরের চোখেমুখে শিশুর বিস্ময় ফুটে উঠলো যেন; বললেন, "ও, মিউজিয়মের ঐ কীপার-এর চাকরীটার কথা জিজ্ঞেস করছো বুঝি? হ্যাঁ, পেয়েছি। সে যাই হোক, তোমার যুক্তির যেটা প্রধান ত্রুটি—ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই সেটা আমি ধরতে পেরেছি। সত্যনির্ণয়ে তথ্যের সাহায্য তো তুমি নাওইনি, তার ওপর আবার তোমার মনে একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মেছে যে, তথ্যের সাহায্য নিতে গেলেই সত্যনির্ণয় অসম্ভব হয়ে ওঠে।"

"যথেষ্ট হয়েছে, এবারে ক্ষ্যামা দাও বাপু।" বলে হাসতে লাগলো বেসিল। অধ্যাপক-ভগ্নী কক্ষান্তরে চলে গেলেন। হয়তো· হয়তো নয়।

(ক্রমশ)

রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দবৈচিত্র্য
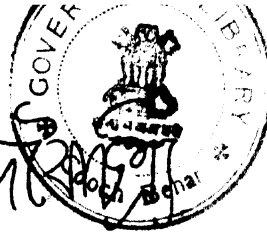
শান্তিদেব ঘোষ

কথা সুর ও ছন্দ যখন মিশে এক হয়ে গেল তখনই তাকে বলি গান। গানের কেবল ছন্দ নিয়ে যখন আলোচনা করবো তখন আমাদের একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, বেশির ভাগ গানের তাল বা গীতছন্দ ও পঠিতছন্দ সাধারণত এক হয় না। গানের সুর ছাড়া কেবল কথার মধ্যে আমরা যে ছন্দের দোলা অনুভব করি গীতছন্দে বা তালে তার পরিবর্তন ঘটে। গানের বেলায় পঠিতছন্দের অস্তিত্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লোপ পায়।

ছাপার অক্ষরে গানের পদ গঠনের পদ্ধতিটি দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, কবিতার আঙ্গিকেই তাকে সাজানো হয়েছে। কিন্তু তাহলেও গানের তাল বা গীতছন্দ যে তার সঙ্গে এক পথে চলবে সে রকম কোন বাধ্যবাধকতা সেখানে নেই। সাধারণত তা থাকেও না। ঢিমা লয়ের ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ও ঢিমা লয়ের সংগীত থেকে একটি করে গান নিয়ে প্রথমে তাকে সাধারণভাবে কবিতার ছন্দে পড়ে তার পরে সুরে তালে গাইলে উভয়ের মধ্যে কি রকম পার্থক্য ঘটে তা বোঝা যায়।

এ ছাড়া সুর বাদ দিয়ে গানকে কবিতার মত পড়বার সময় তার ছন্দ যে একেবারে নিখুঁত হবে একথা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারে না। অনেক গানই পড়তে গেলে দেখা যাবে যে, হয় তা ছন্দপতন দোষে পূর্ণ, নয় নানা প্রকার অমিল ও মিশ্র ছন্দে তৈরি। সেখানে কবিতার মত বাঁধা নিয়মের ছন্দ নেই বটে, কিন্তু তাতে আছে তবলা, পাখোয়াজের বা ঢোলের তাল। সেই তালই কবিতার ছন্দের সব ত্রুটি বা অমিলকে উড়িয়ে দিয়ে রাগিণীর সঙ্গে মিশে এক অনির্বচনীয় জগতের সন্ধান দেয়। গানের বেলায় পঠিতছন্দ অন্য ছন্দে বদলে যায় বলেই বোধ হয় গানের কথার পাকাপোক্ত ছন্দের বাঁধুনির দিকে গান রচয়িতারা সতর্ক থাকা দরকার মনে করে না।

গানের কথাকে আরো একটি রূপে আমরা পাই, কিন্তু এটি এমন প্রচ্ছন্নভাবে গানের সঙ্গে মিশে থাকে যে, ভাল করে নজর না করলে এটিকে ধরা যায় না। গাইবার সময় এই সব গানের কথাগুলিকে যেভাবে সাজিয়ে সুরে বলা হল, ঠিক সেই মত সুর ছাড়া তাকে যদি পড়া যায় তাতে কথার যে রূপ দেখা দেবে তাকে—কোন রকম পদ্য ত নয়ই—এমন কি গদ্য, গদ্য ছন্দ বা মুক্ত ছন্দ কোনটাই বলা যায় না। ঢিমা লয়ের গানে কথার এই অস্বাভাবিক ছন্দরূপ যতটা প্রকট হয়ে ওঠে, দ্রুত লয়ের গানে ততটা হয় না। ঢিমা লয়ের গানের সুর ছাড়া গায়কীতে কথাকে সাজিয়ে পড়লে কথার রস যতটা নষ্ট হয়, দ্রুত লয়ের গানে ততটা হয় না।

গুরুদেবের গানে উপরোক্ত সব কটি ধরণই বর্তমান। তাঁর গানেও গীতছন্দ ও পঠিতছন্দ সাধারণত এক হয় না। গানের পঠিতছন্দ যে, সব সময় নিখুঁত হয়েছে তাও নয়। এবং তার ঢিমা লয়ের গানের কথাগুলিকে সুর ছাড়া সাজিয়ে পড়লে যে রকম অস্বাভাবিক একটি ছন্দরূপ ফুটবে ও রস অনুভূতির বাধা ঘটবে অতটা তাঁর দ্রুতছন্দের গানে ঘটে না। তাঁর গানগুলির পঠিতছন্দে পাকাপোক্ত ছন্দের বাঁধুনি, গদ্য, গদ্য ছন্দ, মিশ্র বা মুক্ত ছন্দ থাকলেও গানের বেলায় সেই সব কথা তালের আশ্রয়ে নতুন রূপ নিতে বাধ্য হয়েছে।

গানের এই তথ্যগুলি না জানা থাকার দরুণ গুরুদেবের গানকে সুর ছাড়া ছাপার অক্ষরে প'ড়ে তাতে নানা রূপ মিশ্র ও ভাঙ্গা ছন্দের বিচিত্ররূপ দেখে কাব্যরসিকরা অবাক হন। কারণ তাঁদের অনেকেরই ধারণা "সুর বাদ দিয়ে গান যখন কবিতার মত করে পড়ি, তখনও তার ছন্দ একেবারে নিখুঁত হবে। যে-গান কবিতা হিসেবে ভাঙাচোরা ছন্দে গাঁথা, তাকে গ্রহণ করতে কাব্যবিলাসী মন সম্মত হয় না।" কিন্তু তাঁরা জানেন না যে কাব্যজগতে ভাঙ্গাছন্দ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও গানের জগতে কেউ তাকে লক্ষ্য করে না।

কেউ কেউ বলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল ইসলামের গানের পঠিতছন্দে কখনো ছন্দ পতন হয়নি। অতুলপ্রসাদের গানও ছন্দে নিখুঁত, অল্প কিছু গানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু গুরুদেব প্রথম থেকেই অমিল বা মিশ্রছন্দে গান লিখে এসেছেন যার সংখ্যা খুব কম হবে না, অথচ যাকে ছান্দসিকদের চোখে বলা চলে ছন্দপাতদোষ। সেই কারণেই তিনি বাল্মীকি প্রতিভা থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত গানের পঠিত ছন্দের ত্রুটি বিষয়ে কাব্যরসিকদের কিভাবে সতর্ক করেছেন পর পর তার নমুনা তাঁরই লেখা থেকে তুলে দিচ্ছি।

বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যের ভূমিকায় লিখলেন—"এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুরে লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শন যোগ্য।"

১২৯৫ সালের মায়ার খেলায় আছে "ইহাতে সমস্তই গান, পাঠোপযোগী কবিতা অল্পই আছে।"

১২৯৯ সালের "গানের বহিতে" লিখলেন —"এই গ্রন্থের অধিকাংশ গানই পাঠ্য নহে। আশা করি সুর সংযোগে শ্রুতিযোগ্য হইতে পারে।"

একবার এক ছন্দোবিদ গীতাঞ্জলির কয়েকটি গানের পঠিত ছন্দে মাঝে মাঝে ছন্দপাত দোষ লক্ষ্য ক'রে গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তার উত্তরে তিনি তাঁকে এই কথাগুলি লিখে পাঠিয়েছিলেন,—"গোড়াতেই বলে রাখা দরকার গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দো রক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের 'পরে। অতএব যে পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রা কম বেশি নিজে দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন, যার নেই তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।" এই প্রসঙ্গে তাঁরই দেওয়া উদাহরণ থেকে

দুটি গান তুলে দিচ্ছি, যেমন—

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া," ও "তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।"

প্রথম গানটির বেলায় বলেছেন, "পালে" শব্দটিকে পড়তে হবে গানের কথা ভেবে। দ্বিতীয়টির বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হল, "এই গানের অন্তিম পদগুলির কেবল অন্তিম দুটি অক্ষরের দীর্ঘ স্বরের সম্মান স্বীকৃত হয়েছে। যথা "প্রাণে" "গানে" ইত্যাদি। একটি মাত্র পদে তার ব্যতিক্রম আছে। 'এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে'—এখানে "সুখের" এ কারকে অবাঙালী রীতিতে দীর্ঘ করা হয়েছে।"

১৩৩২ সালের 'প্রবাহিনী'তে আছে "একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূরে অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়।"

'শ্যামা' গীতনাট্যটি প্রথম প্রকাশের সময় লিখ্‌লেন—"প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব বলে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।"

১৩৪৩ সালে বর্ষামঙ্গল উৎসবের জন্য রচনা করলেন "চলে ছল ছল নদীর ধারা", "আঁধার অম্বরে প্রচন্ড ডম্বরু", "ঐ মালতী-লতা দোলে" গান কয়টি। পত্রিকায় প্রকাশের সময় লিখলেন "এই গানগুলি কবিতা নয় এগুলি গান। পাঠ সভায় এদের স্থান নয়, গীত সভায় এদের আহ্বান, সঙ্গে সুর না থাকলে এরা আলো নেভা প্রদীপের মতো।"

এই সব উক্তিগুলি থেকে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, তিনি গানের পঠিতছন্দের ত্রুটিকে ত্রুটি বলে মনে করেন না এবং আরো মনে করেন গানের ক্ষেত্রে গীতছন্দই মুখ্য। পাকাপোক্ত পঠিত ছন্দের বাঁধুনিতে তিনি বহু গান রচনা করেছেন, কিন্তু তার গীতছন্দ বা তাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়েছে ভিন্ন। অর্থাৎ তিন মাত্রার ছন্দের কবিতা গানের বেলা হয়ে গেল চার মাত্রার কাহারবা, বা তেতালা তালের গান। অমিত্রাক্ষর ছন্দ হল চৌতালের ধ্রুপদ। গদ্য ছন্দ বা মুক্ত ছন্দ হল ছন্দবহুল দাদরা বা কাহারবা। এটি তাঁর গানের একটি অতি প্রচলিত প্রথা বলে এর উদাহরণ তুলে দেওয়ার দরকার বোধ করলাম না।

গুরুদেবের গানে গীতছন্দ প্রধান হলেও তার ব্যতিক্রমও বহু ক্ষেত্রে ঘটেছে। গানের পঠিতছন্দকে গীতছন্দে এক নিয়মে ব্যবহার করবার চেষ্টাও তিনি করে গেছেন।

ছান্দসিকরা যাকে বলেন ছড়ার ছন্দ, বা বাঙলার প্রাকৃত ছন্দ, গুরুদেবের গানের কবিতার প্রচুর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নমুনা পাওয়া যায়। এই সব পঠিতছন্দকে গানের বেলায় কখনো কখনো এক নিয়মে রাখবার চেষ্টা তিনি করেছেন। এবং সেই চেষ্টা যে কতখানি সার্থক হয়েছে, তা তাঁর এই গান-গুলি শুনলেই বোঝা যায়। যেমন,—"থর-থর বায়ু বয় বেগে।" "হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু।" "নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায়।" "দুঃখের বরষায়।"

বাংলা ছন্দে সংস্কৃত রীতি অনুসারে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতাকে বজায় রাখতে হলে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের বিরুদ্ধতা করে কৃত্রিমভাবে দীর্ঘস্বরের গুরুত্বরক্ষা করতে হয়। গুরুদেব সেই কারণে পাঠ বা আবৃত্তিযোগ্য কোন কবিতায় এই ছন্দের নিয়মকে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু গানের কথা রচনায় এই ছন্দোরীতি ব্যবহার করলেন। এই রকম গানের একটি নমুনা হল,—"অয়ি ভুবন মনোমোহিনী।"

এ গানটি পঠিতছন্দে ও গীতছন্দে পাশাপাশি শুনে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, পঠিতছন্দের মত দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা গীতছন্দে যথাসম্ভব রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাহলেও মনে রাখতে হবে যে, উপরের সব কটি গানের পঠিত ছন্দের সঙ্গে তবলার তালের নিয়মের যোগ আছে। তাকে অস্বীকার করা হয়নি। এ সব ছন্দ তবলার তালের সঙ্গে মেলে বলেই গানের সময় এক নিয়মেই তাল বাজে। যেমন,—

"হৃদয়ে মন্দ্রিল" হল ৩।৪ মাত্রাভাগে ৭ মাত্রার পোস্ততালের গান। "নীল অঞ্জন ঘন" গানটির তাল হল দাদরা। "থরথরবায়ুবয়বেগে", "দুঃখের বরষায়" ও "অয়িভুবন মনমোহিনী" হল চারমাত্রার কাহারবা তালের গান।

কবিতার ছন্দ অনুসরণে পাওয়া অথচ প্রচলিত কোন তালের সঙ্গে মেলে না এ রকমের কয়েকটি গানের কথা গুরুদেব নিজেই ১৩২৪ সালে তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন। গান কটি হলঃ—"ব্যাকুল বকুলের ফুলে", "দুয়ার মোর পথ পাশে", "কাঁপিছে দেহলতা থরথর" ও "বাজিবে সখী বাঁশী বাজিবে।"

"ব্যাকুল বকুলের ফুলে" হল পুরো নয় মাত্রা ছন্দের গান। একে পাঁচ ও চার অথবা তিন ও ছয় মাত্রার ঝোঁকেও গাওয়া যায়। "দুয়ার মোর পথ পাশে" গানটিও পুরো নয় মাত্রা তালের। 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর" গানটি পুরো এগারো মাত্রার গান। একে তিন, চার চার মাত্রার ঝোঁকেও গাওয়া যায়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অভিনব হল "বাজিবে সখী বাঁশী বাজিবে" গানটির ছন্দ। প্রথম দুই লাইনের মাত্রা হল দশ, ভাগ করা হল তিন চার, তিন ভাগে। তৃতীয় লাইনের পুরো মাত্রা হল চৌদ্দ, ভাগ করা হল তিন চার, তিন চার মাত্রায়। চতুর্থ লাইনে আবার প্রথমটির মত দশ মাত্রা। বাঙলা গানে কেন হিন্দী উচ্চাঙ্গ সংগীতেও এ নিয়মে গান রচিত হয়েছে বলে শুনিনি। তাল হিসেবে এ কটি ছন্দের কোন নাম নেই।

এই সময়ে রচিত আর একটি গান হল— "ও যে দেখা দিয়ে চলে গেল।" এটি দশ মাত্রা তালের গান। কিন্তু ঝাঁপতালের দশ মাত্রা নয়। এর ভাগ হল পাঁচ মাত্রায়। অবশ্য এটিকে ঝাঁপতালের ভাগেও গাওয়া যায়।

এরও আগে অর্থাৎ ১৩১৩ সালে "ঝম্পক" নামে একটি তাল রবীন্দ্র সংগীতে স্থান পায়। এটি ৫ মাত্রার তাল কিন্তু ঝাঁপতালের মাত্রার ভাগ এতে নেই। এর

প্রথমে তিন মাত্রা পরে দুমাত্রা। এ ছন্দের নমুনা হল—"বিপদে মোরে রক্ষা কর।"

এ তালটি কবিতার ছন্দ অনুসরণে রচিত বলে অনুমান করি।

গুরুদেব উপরোক্ত সব কটি গানের তালে ঠেওড়া, আড়াচৌতাল, সুরফাক্তালের মত কেবল সম বা ঝোঁককেই রাখলেন, ফাঁকের কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না।

গানের পঠিতছন্দ গানের বেলায় বদল না করবার কতকগুলি কারণ আছে। এখানে রচয়িতা আগে গানের কথাগুলিকে লিখে ছন্দে সাজিয়ে নিয়ে তারপরে সুর যোজনা করেছেন। এই সব গানে কথার বাঁধুনি ও ছন্দের গতি এমনভাবে মিশে আছে যে, তাকে সুর যোজনার সময় বদলানোর দরকার হয়নি। তা করতে গেলে এই সব গানের কথার ভিতর দিয়ে শব্দ ঝংকারে বা ছন্দে যে রস প্রকাশ পেয়েছে সেটিকে হয়তো পাওয়া যেত না। বাংলা গানে কথা বা কথার ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই হল রচয়িতার একমাত্র লক্ষ্য। সেখানে যদি মনে হয় যে, ছন্দেরও মস্ত বড় স্থান আছে তবে গান রচনার বেলায় তাকে না বদলানোই উচিত।

আর এক জাতের রবীন্দ্র সংগীত আছে যা কোন রকমের বাঁধা তালে গাওয়া হয় না। সেগুলো কতকটা কথা বলার মত করে গাইতে হয়। অথচ গানের পঠিতছন্দের সঙ্গেও তার কোনই মিল নেই। যেমন—"অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান," "তোমা[illegible] যা পেয়েছি", ঐ দেখ ঐ নদী হয়েছেন পার" ও "কখন দিলে পরায়ে স্বপনে।"

প্রথম তিনটি গানে কথকদের বা পালা কীর্তনীয়াদের সুরে কথা বলার রীতির সঙ্গে মিল পাবো। শেষটির ঢং কতকটা [illegible]ের হিন্দি গানের মত। এ কটির পঠিতছন্দকে গদ্য-গদ্যছন্দ বা অমিল মুক্ত-ছন্দের যে কোন একটা বলতে পারি।

ছন্দের দিক থেকে বৈশিষ্ট্য আছে বলেই "তুমি ত সেই যাবেই চলে" ও "দখিন হাওয়া জাগো জাগো" গান দুটির কথা এখানে উল্লেখ করছি। প্রথমটি দাদরা ও পরেরটি কাহারবা তালের গান। কিন্তু এ দুটির পঠিতছন্দের সঙ্গে গীতছন্দের কোন যোগ নেই। চলতি নিয়ম মত বাংলা গানে আমরা ছন্দের প্রথম মাত্রায় ঝোঁক দিই। এবং এই প্রথম মাত্রা সাধারণত শব্দের প্রথম অক্ষরের উপরেই পড়ে। একটানা আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দ্বিতীয় মাত্রায় তালে সম বা ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। এই গানেও তবলার মত সম ও ফাঁকের নিয়ম না মানাই উচিত। কারণ গান দুটিতে কেবল প্রস্বন বা ঝোঁকই প্রাধান্য পেয়েছে কবিতার ছন্দের মত। ফাঁকের কোন স্থান নেই।

আরম্ভে আমি শুরু করেছিলাম এই বলে যে, গানের পঠিতছন্দ ও গীতছন্দ এক নয়। গীতছন্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। দৃষ্টান্ত হিসেবে উপরের ঐ দুটি গানকেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। গীতছন্দে বা তালেও গুরুদেব বাংলা গানে যেন নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন তার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করবো। হিন্দি ও বাংলা গানের প্রচলিত তালের মধ্যে চৌতাল, ধামার, আড়া চৌতাল, সুরফাক্তাল, দাদরা, আড়খেমটা, খেমটা, কাশ্মীরি খেমটা, মধ্যমান, ঠুংরী, কাহারবা, ছেপ্‌কা, ধুমালি, তেওট, পোস্ত, আদ্দা, ঝাঁপতাল, পঞ্চম সোয়ারি ও পটতাল নামে তালগুলি সবই তিনি নিজের গানে ব্যবহার করে গেছেন। তাঁর গানে তিনি নতুন তাল প্রথম ব্যবহার করেন ৩৫ থেকে ৪২ বৎসর বয়সের মধ্যে। এই সময়েই প্রথম পাই ৩।২।৩ করে আটমাত্রার "রূপকড়া" তাল, ৩।২।২।৪ মাত্রাভাগে ১১ মাত্রার "একাদশী" তাল, ও ৩।২।২।২ ভাগে ৯ মাত্রার "নবতাল"। যথাক্রমে গান কটি হল—"গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে", "দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া" ও "নিবিড় ঘন আঁধারে।"

১৩১৬ সালের মধ্যে লিখলেন নবপঞ্চ-তালে "জননি, তোমার অরুণ চরণখানি।" এটি ১৮ মাত্রার তাল, এর ভাগ হল ২।৪।৪।৪।৪ মাত্রায়।

১৩২১ সালের মধ্যে ৪।২ মাত্রাভাগে ৬ মাত্রার আর একটি নতুন তালের গান লিখলেন। গানটি হল "হৃদয় আমার প্রকাশ হল"। এরই উল্টো অর্থাৎ ২।৪ মাত্রায় সাজানো একটি তাল তাঁর "যদি বেলা যায় গো বয়ে" গানে প্রথম দেখতে পাই। এ গানটি রচিত ১৩২৯ সালের মধ্যে। শেষ দুটি গানের তালের কোন নামকরণ হয়নি। এই সব কটি গানের তালেও তিনি কেবল সম বা ছন্দের প্রস্বনকেই মেনেছেন, তালের ফাঁক বলতে এতে কিছু নেই।

"রূপকড়া", "নবতাল" ও "একদশীতাল" বাংলা গানে প্রচলিত নয়। ৩।২।৩ মাত্রার ভাগে আট মাত্রার একটি ঠেকা গজল গানে শুনেছি, যার সঙ্গে "রূপকড়া" তালে মেলে। ২।৪ মাত্রা ভাগের ৬ মাত্রার ছন্দটি গুরুদেব সংগ্রহ করেন দাক্ষিণ ভারতের বীণকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর কাছ থেকে। সে দেশে তালটি অতি প্রচলিত। ৪।২ মাত্রার তালটি তিনি কবিতার ছন্দ হিসেবে পেয়েছিলেন বলে অনুমান করি। "নব পঞ্চতাল" মনে হয় কোন হিন্দি গান থেকে পাওয়া।

রবীন্দ্র সংগীতে যে সব নতুন ছন্দ বা তাল প্রবর্তন করা হয়েছে, তার মধ্যে কতকগুলি একটার বেশি দুটি গানে পাওয়া যায় না। তাতে মনে হয় তিনি সেগুলিকে কেবল পরীক্ষামূলক চেষ্টা হিসেবেই নিয়েছিলেন। আর কোন প্রয়োজন ছিল না বলেই হয়তো অন্যত্র তাকে আর ব্যবহার করতে দেখলাম না। বিশেষ করে দেশী সংগীতে দেখা যায় যে, কথা সুর ও ছন্দ চেষ্টা করে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে এক হয়ে যেতে। অর্থাৎ গান যখন লোকে শুনবে তখন ঐ তিনটির জৈবরূপেই তার আসল সম্পূর্ণ রূপ। তার মধ্যে কোন একটিকে বিশেষ করে দেখানোর জায়গা নেই।

গুরুদেবের গানে ছন্দ নিয়ে যখনই কথা উঠবে প্রথমেই এই চিন্তাকে মনে রাখতে হবে যে, তাঁর গানে তালের বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব থাকলেও তার ছন্দরস উপভোগ করবো গানের কথা ও সুরের সঙ্গে তার একত্র মিলনে। নতুন ছন্দের কতকগুলি নমুনা এক একটি গানে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলেও ঐ সব গানে ছন্দের যে সব নতুন সম্ভাবনার পথ তিনি দেখিয়ে গেলেন ভবিষ্যতের গান রচয়িতারা তার দ্বারা নতুন পরীক্ষার হাত থেকে রেহাই পেলেন। তারা অনায়াসেই এই নতুন তাল বা গতিছন্দ-গুলিকে তাদের গানে সহজ ও চলতি তাল-রূপে ব্যবহার করতে পারবেন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা।

স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীআশুতোষ মিত্র

স্বামী প্রেমানন্দ বা বাবুরাম মহারাজের পৈত্রিক নিবাস হুগলী জিলার অন্তর্গত আঁটপুর গ্রামে। ইঁহার গর্ভধারিণী শ্রীঠাকুরের প্রাচীন ভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের শশ্রূমাতা ঠাকুরাণী ছিলেন। বাবুরাম মহারাজ শ্রীঠাকুরের দ্বাদশটি অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে অন্যতম এবং শ্রীঠাকুর তাঁহার ভিতর শ্রীমতীর ভাব নাকি দেখিয়াছিলেন।

বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে বহুদিন মিশিবার ভাগ্য লেখকের হইয়াছে। তিনি মঠে শ্রীঠাকুরের পূজা কয়েক বৎসর যাবৎ নিত্য করিয়াছেন। তাঁহার পূজা ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত এবং অনেকক্ষণ স্থায়ী ছিল। তাঁহার ভাবসমাধি খুব হইত, তন্মধ্যে দুই-বারের বিষয় বেশ মনে আছে, যাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

একবার শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে মঠে বহু ভক্ত একত্রিত হইয়াছিল। কীর্তনের দলগুলি মঠময় কীর্তন গাহিয়া ও নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। একটি দলের দল-পতির নৃত্য বড়ই উপভোগ্য। তিনি মঠময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বীয় দলের ভিতর নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। বাবুরাম মহারাজের উহা দৃষ্টে উত্তেজনা আসে এবং তিনি তাঁহাদের সহিত মিশিয়া নৃত্য করিতে-থাকেন। লেখক ও কৃষ্ণলাল নিকটেই ছিল। স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) নিজ কক্ষের গবাক্ষ হইতে দেখিতে পাইয়া হাতের ইসারা দ্বারা লেখক ও কৃষ্ণলালকে ডাকিয়া বাবুরাম মহারাজকে আনিতে বলিয়া দেন। তাঁহাকে লইয়া গেলে স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, "ভাব চাপতে পারিস না? তাহ'লে ঠাকুরের সঙ্গলাভ করে হোল কি?" ইত্যাদি।

আর একবারও শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন। স্বামীজী সেবার মঠে ছিলেন না। সেদিন মঠে এক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মমুহূর্তে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে সালিখাস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীঠাকুরের নাম সংকীর্তন করিতে করিতে মঠের খাইবার দালানে একত্রিত হইয়া-ছেন আর উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন। বাবুরাম মহারাজ সেই নবীন সন্ন্যাসীকে লইয়া সেই দলে দেখা দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাব হইল—সকলে তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতে আর শ্রীঠাকুরের নাম গাহিতে থাকিলেন। বাবুরাম মহারাজের সেবারের ভাব প্রায় ঘণ্টাখানেক স্থায়ী হয়। অবশেষে তাঁহার গুরুভ্রাতারা আসিয়া তাঁহার কানে ঠাকুরের নাম শুনাইতে থাকিলে ভাব ধীরে ধীরে উপশম হয়। পরে সে দিনের বিষয় সেই নবীন সন্ন্যাসী বলিয়াছেন যে, বাবুরাম মহারাজের স্পর্শে তাহার শরীর প্রথমে রোমাঞ্চিত হয় এবং পরে যতক্ষণ তিনি তাহাকে ধরিয়াছিলেন, ততক্ষণ তাহার ভিতর এক দিব্যভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

বাবুরাম মহারাজ কতকটা খেয়ালী পুরুষ ছিলেন। একদিন অপরাহ্নে গঙ্গায় একখানি পানসী উত্তরাভিমুখে যাইতেছে দেখিয়া উহাকে তীরে ডাকিয়া—নিকটে লেখক বসিয়াছিল—তাহাকে তাঁহার সঙ্গে বেড়াইয়া আসিতে আহ্বান করিয়া তাড়াতাড়ি গুরু-ভ্রাতা সুবোধ মহারাজকে (স্বামী সুবোধা-নন্দ) ঠাকুর পূজা করিতে বসিয়া পানসীতে আরোহন করিলেন। সঙ্গে লেখকও চলিল। পান্সী খড়দহ চলিল। সেখানে গিয়া ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র নামক এক ব্যক্তির অতিথি হইলেন। বাটীটি প্রকাণ্ড, জনশূন্য, ব্রহ্মচারী একাকীই থাকেন। রাত্রে নিজে পাক করিয়া আমাদিগকে পরিতোষপূর্বক খাওয়াইলেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বাবুরাম মহারাজ তাঁহার সঙ্গে ভগবদ্বিষয়ক কথাবার্তায় কাটাইলেন এবং সকাল হইলে প্রথম পান্সীতে মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ব্রহ্মচারী সেদিন থাকিতে অনেক জিদ করিলেন কিন্তু বাবুরাম মহারাজ শুনিলেন না।

একবার আমরা দুইজন কেদারবদরিকাশ্রম দর্শনে যাইব স্থির করিয়াছি জানিতে পারিয়া বাবুরাম মহারাজ আমাদের সঙ্গী হইলেন। হরিদ্বার পৌঁছিয়া তথায় এক ব্রহ্মচারীর আশ্রমে ওঠা গেল। সেখানে দ্বিতীয় দিনে বাবুরাম মহারাজের জ্বর হইল। যথাসময়ে ডাক্তার আনিয়া দেখান হইল। ডাক্তার সে জ্বরকে টাইফয়েড বলিলেন। সে রাত্রে আমাদিগকে বাবুরাম মহারাজ নিকটে পাইয়া নানাপ্রকারে গন্তব্য-স্থানে যাইতে বুঝাইলেন। আমরা তাঁহাকে সেখানে একাকী ছাড়িয়া যাইতে কোন প্রকারে রাজী হইতেছি না দেখিয়া তিনি জিদ্ করিয়া বলিলেন, "আমার কথা শুনছিস না? আমি বল্‌ছি যে, সেরে উঠব, তোরা যা আর অপেক্ষা করিস নি। দেখে নিবি আমি সেরে উঠে রওনা হব।" তাঁহার এই প্রকার জিদে এবং ব্রহ্মচারীদেরও অনেক বুঝাইতে আমরা পরদিন প্রত্যুষে মনকষ্টে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাদিগকে যাত্রার সময় আশীর্বাদ করিলেন আর বলিলেন "আমিও ঠিক যাব, দেখে নিস্—আমার কথা ফলে কিনা।" কিছুদিন পরে আমরা ফিরিবার পথে আলমোড়ায় আসিয়া খবর পাই, যে বাবুরাম মহারাজ আরাম হইয়া কেদারবদরিকাশ্রম আসিয়াছেন। এই খবরে আমরা অতীব আনন্দিত হইলাম।

একবার বাবুরাম মহারাজের কৃপায় লেখকের জীবন বাঁচিয়াছিল—সেজন্য তাঁহার নিকট সে চিরঋণী। বৃত্তান্তটা এই—ভাদ্র মাসে লেখক মঠের তখনকার ঘাটে স্নান করিতে গঙ্গায় নামিয়াছেন, এমন সময় বড় বান আসিয়াছে আর সেই জলে সে হাবুডুবু খাইতেছে। কোন রকমে তীরে উঠিতে পারিতেছে না। বাবুরাম মহারাজ সে সময় ভোগান্তে শ্রীঠাকুরকে শয়ান দিয়া বান দেখিবার উদ্দেশ্যে মঠের বারান্দায় আসিয়া লেখকের ঐভাব দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি মঠবাসীদিগকে সাহায্যার্থে ডাকিতে থাকেন। তাঁহারা খাইতেছিলেন। সে ডাকে সকলে আহার ত্যাগ করিয়া গঙ্গার ধারে আসিয়া কয়েকখানি কাপড় লম্বালম্বি বাঁধিয়া ছুঁড়িয়া দেন এবং লেখক উহা ধরিয়া ফেলিলে তাঁহারা সজোরে তাহাকে টানিয়া তীরে আনিয়া ফেলেন। যখন তাহাকে তীরে নিরাপদ স্থানে তোলা হইয়াছে, তখন তাহার উদর জলে পূর্ণ এবং সে অচৈতন্য আর সর্বাঙ্গ ছড়িয়া গিয়াছে। ভাগ্যক্রমে সেদিন মঠে তাহার বন্ধু ও গুরুভ্রাতা ডাক্তার কাঞ্জীলাল ছিলেন। তিনি কৃত্রিম উপায়ে তাহার পেট হইতে জল বাহির করিয়া তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকেন। পরদিন সে চক্ষুরুন্মীলন করে।

বাবুরাম মহারাজকে স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রভৃতি কয়েকজন গুরুভ্রাতা কখন কখন আদর করিয়া 'ভ'পু' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি এ প্রকার ডাকে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং আনন্দ চিত্তে উপভোগ করিতেন।

প্রায়ই দেখিতাম, স্বামীজী যখন গাহিতে আরম্ভ করিতেন, বাবুরাম মহারাজ সে মজলিসে আসিয়া জুটিতেন আর একনিষ্ঠ-চিত্তে গান শুনিতেন। কখন কখন স্বামীজী যে গানখানি তিনি শুনিতে চাহেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার ফরমাসি গানগুলিও গাহিতেন। এইভাবে যে গানগুলি স্বামীজীর মুখে আমাদের শুনিবার ভাগ্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দিতেছি ঃ

১। জাগ কুলকুণ্ডলিনী।
সুপ্ত-ভুজগ-কায়া আধার পদ্মবাসিনী॥
গচ্ছ সুষুম্না পথ
স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুর অনাহত
বিশুদ্ধাজ্ঞা সঞ্চারিণী॥
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু,
তাপিত হইল তনু।
মূলাধার ত্যজ শিবে
স্বয়ম্ভু-শিব-বেষ্টনী॥
শিরস্থ সহস্র দলে,
পরম শিবেতে মিলে,
ক্রীড়া কর কুতূহলে,
সচ্চিদানন্দ-দায়িণী॥
দ্বিজ রামধন মাগে,
যোগাসনেতে যোগে,
পরম শিবের সহিত
তোমায় হেরি তারিণী॥

২। যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
(মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আর মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন
(মাঝে মাঝে) মা ব'লে ডাকে॥
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাকো,
নয়নকে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে,

৩। যে ভাল করেছ কালী আর ভালতে
কায নাই।
(এখন) ভালয় ভালয় বিদায় দেমা,
আলোয়আলোয় চ'লে যাই॥
মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম অবিরত।
জানিলাম শত শত, কপাল ছাড়া পথ নাই॥
জঠরে দিয়েছ স্থান, কোরোনা মা অপমান।
কিসে হবে পরিত্রাণ, নরচন্দ্র ভাবে তাই॥

৪। এস মা, এস মা, ও হৃদয়ের মা,
পরাণ পুতলী গো।
হৃদয় আসনে হও মা আসীন,
নিরখি তোরে গো॥
আদি জনমাবধি তব মুখ চেয়ে,
ধরিয়ে এ জনম যে যাতনা সয়ে।
(তাত জান মা—এ অন্তরের ব্যথা)
(একবার) হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ-
তাহে আনন্দময়ী গো॥

শেষ গানখানি গাহিতে গাহিতে স্বামীজী একবার বাবুরাম মহারাজকে সঙ্গে গাহিতে বলেন—তাঁহার বলায় আমরা সকলেই গাহিয়াছিলাম—বেশ মনে আছে।

শ্রীঠাকুর অব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট অন্ন খাইতেন না, কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমও তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল শুনিয়া থাকিলেও ইহার যথার্থ নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে মঠের প্রশ্নোত্তর বৈঠকে একদিন স্বামীজীকে (স্বামী বিবেকানন্দ) এই বিষয় জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, "আমার কথা ছেড়ে দে। রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আর বাবু-রামের (স্বামী প্রেমানন্দ) হাতের ছোঁয়া তিনি খেয়েছেন।" ঐ বৈঠকে অন্য কয়েকজন গুরুভ্রাতাদের সহিত তাঁহারাও ছিলেন।

মনো-মরু

সাধনা চট্টোপাধ্যায়

জীবনের বন্ধ্যা-খাতে প্রাণের সরস নদী শুষ্ক হয়ে যায়।
কেন বলেছ মোরে, অনেক—অনেকবার,
তবুও শুধাই—
জীবনের মরা-খাত কোন্ মরুতে?
রুক্ষ মাটির রাজ্যে, হিম-মেরুতে?

মরুর ধূসর বুকে চলে 'ক্যারাভান'
ঊষর জীবন-খাতে জেগে ওঠে প্রাণ
নিবিড় ছায়ায় ঘেরা খেজুরের বন
সরস মাটির বুকে সবুজ স্বপন।
সুদূর 'হিমার্ত' মেরু,
দক্ষিণ-উত্তর—
'[illegible]রের' বাসভূমি
প্রাণের সরস-খাত সেখানেও খুঁজে পাবে তুমি।

উত্তরে 'সীলের' ভিড়
বরফ্ গুহার তলে এস্কিমোর দল,
দক্ষিণে পাইন বন
সবুজের পেতেছে আঁচল।
জীবনের শুষ্ক-খাত কোন্ মরুতে?
কোন্ সাহারার বুকে কোন্ 'পেরু'তে?
প্রাণের সরস নদী জলে প্লবমান
নির্জন দ্বীপের বুকে নব-আন্দামান্।

জীবনের বন্ধ্যা-খাত তোমার মনের রাজ্যে,
পৃথিবীর প্রাণ রাজ্যে নয়।
এ-গ্রহের প্রতি-প্রান্তে নতুন জীবন-নদী পলিমাটি করিছে সঞ্চয়।

সত্যি ভ্রমণকাহিনী

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৫

লেখকের গর্ব যে সে সম্পূর্ণ প্যারিসিয়ান হয়ে পড়েছে। একথা ভাবতেও আনন্দ। প্রত্যেক ফরাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই প্যারিসিয়ান হবার। প্যারিস, মফস্বল আর পান্ডববর্জিত বিদেশ, ফরাসীদের চোখে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল। অপ্যারিসিয়ানদের সব সময় চেষ্টা তারা যে প্যারিসিয়ান নয় সে কথা ঢাকবার। অথচ প্যারিসের শতকরা ছেষট্টিজন লোক বাইরের অর্থাৎ মফস্বলের। সবচেয়ে খাঁটি প্যারিসিয়ান প্রতিবছর একটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায়। লেখক দেখতে গিয়েছিল। এ বছর পেল একজন আইনের ছাত্র, তিনশ জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে। তার পিতামাতার ঊর্ধ্বতন ছয় পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ প্যারিসের লোক। পিয়ের দাগল তাকে মেডাল পরিয়ে দিলেন......গৌরব অর্জন করতে হয় আস্তে আস্তে। প্রথমে যেদিন নবাগত কোন মফস্বলের লোক এ পাড়ার গলির মধ্যে চকোলেটের কারখানায় যাবার পথ জিজ্ঞাসা করেছিল, সেইদিনই লেখক উঠেছিল প্যারিসিয়ান হবার প্রথম ধাপে। এক ছুটির দিন তার এক মজুর বন্ধুর সঙ্গে খেতে গিয়ে দেখে যে রেস্তরাঁ ভর্তি। তার বন্ধু বিরক্ত হয়ে বলেছিল "সব মফস্বলের লোক—এসেছে বোধহয় ইফেল টাওয়ারে চড়তে!" এই কথাটার মধ্যে আছে একটা নিমরাজি ভাব লেখককে প্যারিসিয়ানের মর্যাদা দেবার। অ্যানি ছাড়া আর কারও কথা লেখকের এত ভাল লাগেনি বিদেশে এসে। এর বহুদিন পর কবে থেকে যেন ছাত্র ও দোকানদারেরা আপনজনের স্বীকৃতি দিয়ে অযথা খাতির দেখানো বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে সে প্যারিসিয়ান। অচেনা দোকানদাররাও আজকাল তার ততারা দেখেই বুঝে যায় যে, লোকটা পার্থক্য বোঝে গ্রুইয়ার আর অভের্ন-পনিরের, ক্যাল্‌ভিন আর ক্যানাডা আপেলে, শাদা আর সবুজ ফ্রেঞ্চবিনের বিচিতে, ডিম আর "ফ্রেশ" ডিমে, সেভ্র আর লিমোজ-এর চীনেমাটিতে, অ্যাঞ্জেলি ও জের্বেরা ফুলের মর্যাদার ক্রমে, ভিসি ও বাদোয়া মিনারাল জলের গুণাগুণে, দুধ ও ক্রিম দেওয়া কফিতে। কিলোমিটারে মাপা দূরত্ব বুঝবার জন্য আর মনে মনে মাইলে বদলে নিতে হয় না। টাকা আর পাউন্ডের চেয়ে ফ্রাঙ্কে হিসাবই সোজা বোধ হয়। জুতোর নম্বরের বদলে এদেশী 'পোঁয়াতুর' আপনা থেকে মুখে এসে যায়। ইঞ্চিতে মাপা কলারের মাপ সে সত্যিসত্যিই ভুলে গিয়েছে।

খরচের হাত গিয়েছে বেড়ে। শতকরা দশ টাকা বাঁধা বকশিশের উপরও সব জায়গায় বকশিশ দেয়। অ্যানির সঙ্গলোভে দুপুরে ঘরে রাঁধে বটে, কিন্তু প্রত্যহ রাতে প্রশান্ত উদারতায় এক আধজন পরিচিত লোককে কিছু না কিছু খাওয়ায়। এখনকার ভাবটা বড়লোকের ছেলের কাপ্তেনী করবার ঝোঁক কিম্বা খরচের দিকটা ভাবায় নিরাসক্তি। বাড়ীতে চিঠি লেখা অনেকদিন হয়ে ওঠেনি। হোটেল থেকে বেরোবার সময় পায়রাখুপীতে তার চিঠি এসেছে কিনা দেখে নেওয়ার অভ্যাস কেটে গিয়েছে। অনেক দিন বাদে কোনদিন নজরে পড়ে গেলে পকেটে পুরে রাখে, সুবিধামত পরে পড়বে বলে। ফরাসীরা অন্য যে কোন জাতির চেয়ে ভাল, আর প্যারিস অন্য যে কোন শহরের চেয়ে ভাল এমনি একটা ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হয়ে মনে বসছে। যথার্থ ভাল জিনিস যত বেশী জানবে ততই ভাল লাগবে। সংস্কৃতি বলতে যা কিছু বোঝায় সব এখানে তৈরী ধোপদস্ত পাওয়া যায়—কলমের আঁচড়ে, তুলির টানে, খোঁদা আর গাঁথা পাথরের রেখায়, মেয়েদের রুচির সৌকুমার্যে, হোটেলের পরিবেশনের কারিকুরিতে, ফরাসী বিপ্লব ও প্যারিস কমিউনের স্মৃতিতে হাওয়ায় বাতাসে এ সংস্কৃতি মেশানো নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের মধ্যে টেনে আপন করে নাও; এদেশের বাইরে তাকানোর দরকার নেই।

শীত শেষ হয়ে যাচ্ছে প্যারিসে, তাতে আনন্দ! Sollies Point বলে একটা জায়গায় চড়ুই পাখী দেখা গিয়েছে তাতে আনন্দ! বুলভারের নেড়া গাছগুলোর গোড়ার বরফগলা জল শুকিয়েছে, সিমেন্টের জাফরিগুলো তুলে গোড়া খুঁড়ে দিচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটি। এইবার ফুল পাতায় আবার ভরে উঠছে গাছগুলো! কি সুন্দর এদেশে—আগে ফুল, পরে পাতা। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মেয়েদের মত এদেশে বসন্ত আসে অতি ধীর পদক্ষেপে। দেশে যেমন হঠাৎ একদিন দেখা যায় কচিপাতায় গাছ ভরে গিয়েছে, সেরকম নয়। অনেকদিন ধরে বসন্তের আগমন উপভোগ করে [illegible] ক্লান্তি আসে না। বাড়ীর মত একটা নি[illegible] সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে লেখকের প্যারিসের সঙ্গে। তরকারির দোকানে নতুন [illegible] উঠতে দেখে পর্যন্ত তার মন খুশিতে [illegible] ওঠে কেন, তা সে নিজেই বুঝতে পা[illegible] আলু খেতে তার ভাল লাগে না। পা[illegible] উঠেছে তাতেই আনন্দ—তার প্যারি[illegible] এখানকার খবরের কাগজে রুচি [illegible] রেনো মোটরকারখানার ধর্মঘট, টিউব[illegible] ভাড়া বৃদ্ধি, পিয়ের লোতির স্মৃতি [illegible] গকুর সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের নূতন [illegible] নির্বাচন, আগামী দেড় শ কিলোমি[illegible] বাই-সাইকেল প্রতিযোগিতার তা[illegible] রকম বহু খবরের জন্য মন উদ্গ্রীব [illegible] থাকে। প্যারিসের 'রেসিং' ফুটবল টিম [illegible] মনে কবে থেকে যেন তার নিজের টিম [illegible] গিয়েছে। লীগ ম্যাচে এর অগ্রগতি [illegible] টিম দ্বারা ব্যাহত হলে মন খারাপ হয়ে [illegible] একটা 'শান্তি' সভায় প্রত্যেক পাড়ার [illegible] ব্যাণ্ড বাজিয়ে আসছিল। তার নি[illegible] পাড়ার প্রোসেশনটা দেখবার আগে [illegible] তার বুক দুরদুর করছিল—পাছে অ[illegible] সেটা অন্য পাড়ার চেয়ে ভাল না [illegible] ভেবে। এযেন তারই সম্মানের পরীক্ষা [illegible] এইরকম অসংখ্য ছোটছোট জিনিস [illegible] বলে বোঝানো যায় না। মোট কথা প্যারি[illegible] স্বাদ পাচ্ছে সে।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ বলে একটা নামের সম্বন্ধেও মনটা ক্রমেই নিস্পৃহ হয়ে উঠছে। দেশের কথা মনে পড়ে নমাসে ছমাসে। এক শনিবারে রিভিয়েরা গিয়েছিল। সেখানে গরীব ছাত্রদের সাহায্যার্থে এক চ্যারিটি উৎসবে বরোদার মহারাণীকে দেখে কিছুক্ষণের জন্য ভারতবর্ষের কথা মনে পড়েছিল। আর মনে হয়েছিল এইরকম করে শাড়ী পরলে অ্যানিকে কেমন দেখাবে। চিমনির ধোঁয়ার গন্ধে একদিন লেখকের মনে পড়েছিল পিসিমার হবিষ্যি ঘরের গন্ধের কথা। পার্কে একদিন হঠাৎ একটা ফুল দেখে মনে পড়েছিল বাড়ীর একখান টেব্‌ল ক্লথের এমব্রয়ডারির কথা; এরকম ফুল যে সত্যি আছে তা সে জানত না। পথের ধারে অমরুলের মত লতা দেখে, ফুটবল মাঠে চিনাবাদাম বিক্রি দেখে, ছায়ার মত অস্পষ্টভাবে, অন্য দেশের অন্য এক জায়গার কথা মনে পড়ে। কিন্তু এ মনে পড়াগুলো যেমন অতর্কিতে আসে, তেমনি অলক্ষ্যে চলে যায়। কোনও রেশ রেখে যায় না মনে। এক সঙ্গে বেশীক্ষণ ভাবতে পারা যায় আজকাল কেবল অ্যানির কথা। আর অ্যানির কথা ভাবতে গেলেই দেখে যে তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে, নিজের কথাও—চেষ্টা করেও আলাদা করা যায় না। প্রেমকে অন্ধ মনে করে ভুল করে লোকে। ভালবাসার মধ্যেও খানিকটা হিসাব থাকতে বাধ্য। লেখক আজকাল বেশী করে নিজের আর অ্যানির মনটাকে বুঝে দেখবার চেষ্টা করে। প্রথমে লেখকের মনটা ছিল হিসাবী, সাবধানী, গম্ভীর; অ্যানি ছিল চটুলা, লঘু। অ্যানি করত তার পাণ্ডিত্যের সম্মান; লেখকের ভাল লাগত অ্যানির সঙ্গ। লেখক বোঝে যে নেশা করে যেমন কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ বাজে কথা বলে, তেমনি ভালবাসাও এক একজনের উপর এক একরকম পরিবর্তন আনে। বাঁধ ভাঙ্গবার পর লেখক গিয়েছে ভেসে। তার অধীর আগ্রহের বদলে অ্যানির দিক থেকে পাচ্ছে প্রশান্ত অনুরাগ। লেখকের পুজো, অ্যানির টান, দরদ। এক একসময় লেখকের সন্দেহ হয়েছে যে, তার পাণ্ডিত্য অ্যানির সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে নেইত? না, না তা হতে যাবে কেন! অ্যানিওতো দিচ্ছে নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে। এর মধ্যে স্বার্থের ভেজাল তো একদিনও চোখে পড়েনি। এই অ্যানিকেই সে একদিন বকশিশ দিতে গিয়েছিল।......

তবু টাকা ফুরোলে দেশে ফিরতেই হবে। পরিতৃপ্তির সুরসঙ্গতির মধ্যে একটা প্রশ্ন আজকাল মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। অ্যানিকে সে সত্যিই ভালবাসে। এর যুক্তিসঙ্গত পরিণতি দেশে ফিরবার সময়, অ্যানিকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। শুনতে কথাটা খুব স্থূল; কিন্তু একথা এড়িয়ে লাভ নেই। এছাড়া প্রেমের অন্য পরিণতি পাওয়া যায়, কেবল নভেল নাটকে। দেশে থাকবার সময় সে বুঝতেই পারত না, কি করে ভারতবর্ষের ছেলেরা বিদেশে পড়তে এসে মেম বিয়ে করে দেশে ফেরে। এটাকে সে প্রেম-বুভুক্ষু প্রাচ্যমনের হ্যাংলাপনা অথবা তথাকথিত শিক্ষিত লোকের রুচিবিকৃতির ফল মনে করত। এখন সে ধারণা কেটেছে; সেই সময়ের অজ্ঞতার কথা মনে করলেও হাসি আসে। দেশে তার বাড়ীর লোকে কি বলবে, কি ভাববে, কেমনভাবে তারা অ্যানিকে নেবে, ইচ্ছা না থাকলেও এসব কথা না ভেবে উপায় নেই। অ্যানিকে পেলে, সে আর বাকি পৃথিবী ছাড়তে তৈরী আছে।

......গরমের সময় অ্যানির বড় কষ্ট হবে। এখন 'পাখা' জিনিসটা কি ঠিক বুঝতে পারে না। এক বছর পর ওটা না হলে গ্রীষ্মকালে এক মুহূর্তও চলবে না। আকাশের নীচে, ছাতের উপর শোয়ার কথা শুনলে এখন সে আঁতকে ওঠে; তখন হয়ত ভালই লাগবে। ......ও লালা! তারাগুলোর এত আলো!... পিসিমার হবিষ্যিঘরে যদি জুতো পরে ঢোকে তাহলেই হবে কাণ্ড! অ্যানি তার বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে নিশ্চয়ই বনিয়ে চলতে পারবে।...অ্যানি একদিন শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে, ছোট কুমীরের মত দেখতে একরকম জানোয়ার, দেওয়ালে আলোর কাছে পোকা খায়। ...ও লালা! মানুষকে কামড়ায় না তো? টিকটিকি দেখে প্রথমটায় নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। মিউজিয়মের প্রাচীন কালের মাটির পাত্রের মত খুরিতে কালুকুত্তায় দই পাওয়া যায়—সেইটা দেখতে অ্যানির বড় ইচ্ছা করে। সেগুলোকে লোকে ধুয়ে আলমারিতে তুলে রাখে না শুনে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এবার নিজে কি করে সেগুলোকে নিয়ে দেখা যাবে।...দেশের বাড়িতে গ্যাসের ব্যবস্থা নেই।...কত কি নেই। ...পারবেতো অ্যানি?

রুশে যাবার অনুমতিপত্র পেল না লেখক, অধিকারীবর্গের কাছ থেকে। খবরটা পেয়ে অ্যানি 'ও লালা!' বলে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল লেখককে। 'গণতান্ত্রিক' কথাটার মানে সে ঠিক বোঝে না আজও। তবে রুশের কনসাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সে "গণতান্ত্রিক" লেখক কিনা? কোন "গণতান্ত্রিক" প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কিনা?—কখানা বই লিখেছে?—তার বই কোন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে কিনা? ইত্যাদি।

গত বিশ বছর থেকে তার রুশে যাওয়া নিয়ে এত জল্পনাকল্পনা, এসম্বন্ধে এত বই পড়া! সেখানে পৌঁছেই যাতে সেখানকার নূতন মানুষদের নূতন সভ্যতা শুষে নিতে পারে, তার জন্য এতদিন থেকে মনটাকে তৈরী করা। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এত সময় ও উৎসাহ খরচ! ছয় মাস আগে হ'লে সে রুশ সরকারের এই কড়াকড়ির একটা অর্থ করে নিয়ে 'Iron Curtain'এর উপর প্রবন্ধ লিখতো কাগজে; মনের দুঃখ চাপতে না পেরে হয়ত ডায়েরিতে লিখত যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে U. N. O. মাত্র একটি জটিল সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে—নিজের প্রকাণ্ড নামটার একটা সরল উচ্চারণ বার করেছে।......

লেখক নিজেই আশ্চর্য হয়, রুশে যেতে না পেয়ে তার যতটা দুঃখ হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি দেখে। সবচেয়ে বড় কথা অ্যানি খুশি হয়েছে; কিন্তু এইটাই সব কথা নয়। অ্যানিকে ছেড়ে থাকবার কথা মনে করলেই তার মনটা খারাপ হয়ে যেত। রুশের ভিসা না পাওয়ায় সে দুশ্চিন্তা কেটেছে। তার আসল মন বোধ হয় এই জিনিসই চাচ্ছিল; অথচ নকল মনটা একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত বলে, দায়িত্বের বোঝা রুশের কনসালের উপর দিয়ে বেঁচেছে।

যাক! আর সে রুশ ভাষার ক্লাসে যাবে না। রুশেই যদি যাওয়া না হল, তবে আর ও ভাষা পড়ে এখানে সময় নষ্ট করবার দরকার কি? এর পর দেশে ফিরে গিয়ে সময় ও সুবিধামত ভাল করে শিখে নিলেই হবে এবার থেকে সে রুশ ভাষার ক্লাসের সময়টাতে লিখবে। ...তার খাপছাড়া মনের জন্যই ত ছিল লক্ষ্মীছাড়া জীবন এতদিন!...এক লাইফ ইনিসওর পর্যন্ত করেনি!... আর আর অ্যানির সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এইবার চা খেয়েই সে বেরোবে। নীচের ফুটপাথে ছেলেমেয়েরা ফিরছে ইস্কুল থেকে। অতটুকু ছেলেমেয়েদের

ভারি ভারি বইয়ের থলি নিয়ে স্কুলে যাওয়া আসা করতে কি কম কষ্ট হয়!

দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢোকে অ্যানি। এই অসময়ে! "তোমার কথাই ভাবছিলাম অ্যানি।"

"টেলিগ্রাম"

টেলিগ্রাম আবার কোথাকার! খুলে দেখে সে দেশ থেকে তার দাদা টেলিগ্রাম করছেন—সে পেয়েছে দেশের একটা সাহিত্যের পুরস্কার। বিস্তারিত খবর পরে চিঠিতে আসছে।

লেখকের মুখে চোখে নিশ্চয়ই টেলিগ্রাম পড়ে আনন্দ ফুটে উঠেছিল। নইলে অ্যানি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করবে কেন—সুখবর বুঝি? বাড়ীর?

খবর শুনে হাততালি দিয়ে, হেসে, চেঁচিয়ে, লেখককে জড়িয়ে ধরে, জুতো খটখট করে নেচে, বার কয়েক ও লালা বলে, —কি করবে ভেবে পায় না। লেখকের চেয়েও তার যেন আনন্দ হয়েছে বেশী। চেঁচামেচিতে পাশের ঘরের ভদ্রমহিলা জুতোর বুরুশ হাতে নিয়ে দরজা খোলেন—কি আবার হল? অ্যানি তখন লেখককে হাত ধরে টানতে টানতে নীচে নিয়ে যাচ্ছে, মুসিয়োর লটারিতে টাকা পাবার এত বড় সুখবরটা মালিকানীকে দেবার জন্য। সে চিরকাল জানে মুসিয়ো খুব ভাগ্যবান। কত টাকা পাবে? ও লালা! তা লেখেনি! সে আবার কি! অদ্ভূত বাপু তোমাদের দেশের টাকা পাওয়ার খবর পাঠানোর নিয়ম!

নীচে নামতেই হোটেলওয়ালি ছুটে এলেন কাউণ্টার থেকে। হোটেলওয়ালা এঞ্জিনঘর থেকেই অভিনন্দন জানাতে জানাতে এসে হাজির। এতক্ষণে অ্যানির মনে পড়ে যে, সে এই গোলমালে লেখককে অভিনন্দন জানাতে ভুলে গিয়েছে। ত্রুটি সেরে নেবার আর এখন সময় নেই।

হোটেলওয়ালির হাসিমুখে তখন খই ফুটছে—"এই রকম ভাগ্যবান লোকদের দেখলেও আনন্দ হয়। Chandeleur উৎসবের দিন বাঁহাতের মুঠোতে সোনার মুদ্রা নিয়ে প্যানকেক ভাজলাম আমি। আর টাকা পেলে তুমি মুসিয়ো? কত টাকা?"

সৌভাগ্য আনবার জন্য প্রতি বছর ফরাসী গৃহিণীরা ঐ প্রক্রিয়াটি করেন।

হোটেলওয়ালাও খুব খুশি। 'কত টাকা জানতে পারলে আরও নিশ্চিন্ত হত। অত দূর দেশের টেলিগ্রাম যখন নিশ্চয়ই অনেক টাকা। এসব লোক থাকলে হোটেলের সম্ভ্রম বাড়ে। আর বোধ হয়, মুসিয়োকে কষ্ট করে রেঁধে খেতে হবে না। কি রাঁধে জানি না; ওর বাসনধোয়া জলে বেসিনের মুখটা বড় ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যায়;—চর্বিও না, চায়ের পাতাও না!—কে জানে কি খায়! তবে লোকটি ভাল। দেখা হলে কখনও অভিবাদন করতে ভোলে না।...

সিঁড়ি দিয়ে যে নামে ওঠে, সেই দু মিনিট দাঁড়িয়ে যায়, এই লটারিতে টাকা পাওয়া মুসিয়োটির সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য।

অ্যানি ঠাট্টা করে বলে, "কি মুসিয়ো ভাগ্যবান! আমাদের খাওয়াচ্ছেন কবে তাই বলুন"

"যখন বলবে। এখনই। এখন বুঝি তোমার ছুটি নেই? আচ্ছা, আজ তোমার ছুটির পর। আর ঘণ্টাখানেকতো দেরী আছে বোধ হয়?"

কাফেতে বহুক্ষণ শ্যাম্পেন খেয়ে অ্যানি সে সন্ধ্যায় বেশ প্রগল্‌ভা হয়ে পড়েছিল। এতদিন সে লেখকের খরচ কমানোর জন্যে সচেষ্ট ছিল। আজ আর সে চেষ্টা নেই। অ্যানির কথাবার্তায় বেশ বোঝা যায়, সে ভেবেছে যে, লেখক অনেক টাকা পাবে। লেখকের কিন্তু টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা নেই—তার দেশের সাহিত্যের পুরস্কার, কত টাকা আর হবে। সে কথাটা তুলে অ্যানির আজকের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে বাধা দিতে চায় না লেখক। অ্যানির উল্লাসেই তার তৃপ্তি বেশি, সাহিত্যিক সম্মান পাবার চেয়ে। ...বাড়ির সকলে নিশ্চয়ই এ সংবাদে খুবই খুশি হয়েছেন; নইলে দাদা চিঠির বদলে টেলিগ্রাম দেবেন কেন? পিসিমাকে প্রণাম করলে তিনি চিরকাল আশীর্বাদ করে এসেছেন, সোনার দোয়াত-কলম হোক, বলে। তাঁর সুখের আজ নিশ্চয়ই সীমা নেই। কিন্তু অ্যানির উপচে-পড়া আনন্দের সঙ্গে সে সবের তুলনা হয় না! ...বলুকগে একে লটারির টাকা।

গল্পে গল্পে কখন ঘোড়দৌড়ের কথা চলে এসেছে। অ্যানির সঙ্গে একটানা কিছুক্ষণ গল্প করতে গেলেই এই হয়। অ্যানি তার ব্যাগ খুলে খবরের কাগজখান বার করে। —ঘোড়দৌড়ের কাগজ। ছোট্টো পেন্সিলের সীসটা বারকয়েক জিভে ঠেকিয়ে গভীর মনোযোগের আবহ সৃষ্টি করে নেয়। কাল বৃহস্পতিবার; অ্যানির ছুটি। রেসে যাবার তৈরীর ব্যাপারটাতে অ্যানি চিরদিন খুব সিরিয়াস। কাল যেসব ঘোড়া দৌড়বে, সেগুলোর নাম, বংশপরিচয়, গত কৃতিত্বের নিদর্শন, বহু সংখ্যাসম্বলিত খবরের বোঝা, অ্যানি লেখকের সম্মুখে তুলে ধরে। প্রত্যেকের ফটো দেখিয়ে তাদের আকৃতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো লেখককে বোঝায়। অ্যানির সঙ্গে গল্পের নেশা মদের নেশার চেয়ে কম নয়। লেখক শোনে; বুঝবার চেষ্টা করে; অ্যানির গল্পে উৎসাহ দেখাবার জন্য কালকের প্রত্যেক দৌড়ের ফলাফলের উপর পণ্ডিতের মত নিজের মতামত দেয়। অ্যানি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ঘোড়ার নামের পাশে পাশে ঢেরা কাটে। লেখক দেখে যে, পেন্সিলের দাগে দাগে কাগজখানাকে আর চিনবার উপায় নেই। এ-কাজ শেষ হলে অ্যানির স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। হাসতে হাসতে সে মুসিয়ো ভাগ্যবানের হাতখানা টেনে নিয়ে গালের উপর রাখে। দুষ্টুমির হাসিতে ভরা মুখ। জানায় কেমন চালাকি করে ভাগ্যের চাকা গরম থাকতে থাকতে মুসিয়ো ভাগ্যবানের মুখ দিয়ে ঘোড়ার নাম বলিয়ে নিয়েছে সে। কাল ঐ ঘোড়াগুলোর উপর সে বাজি ধরবে। নিশ্চয়ই জিতবে।

ও-লালা! ভদ্রতা রক্ষার জন্য লেখককে অ্যানির উপর কৃত্রিম ক্রোধ দেখাতে হয়। ...কি গরম অ্যানির গাল! ...বলবে নাকি সেই কথাটা এখনই অ্যানিকে? যে কথাটা নিয়ে এতদিন তার মনে জল্পনাকল্পনার ঝড় বইছে—বলি বলি করেও যে কথাটা পরিষ্কার করে বলা হয়নি অ্যানির কাছে এতকাল! আজকের মত এমন দিন রোজ হয় না। ...প্রথমে একটু ঘুরিয়ে কথাটাকে সে তুলবে।

"কলকাতাতে দুটো রেসকোর্স আছে।"

অ্যানির যতটা আগ্রহ হবে ভেবেছিল একথায়, ততটা দেখা যায় না। একটা জবাব দিতে হয় বলে যেন জিজ্ঞাসা করে—"সেখানকার টোটালিজেটার ইলেকট্রিকে চলে ত এখানকার মত?"

"তা বইকি।"

সে বোঝে যে, অ্যানির মন এখনও বোধ হয় তাকে দিয়ে ঘোড়ার নাম বলিয়ে নেবার কৃতিত্বে মশগুল আছে। লেখক হঠাৎ-আসা অহেতুক সঙ্কোচটা কাটিয়ে উঠবার আগেই

অ্যানি ঘড়ি দেখে ও-লালা! বলে উঠে পড়ে। গল্পে গল্পে এত দেরি হয়ে গিয়েছে, তা সে বুঝতে পারেনি।

আজ আর বলা হল না কথাটা। অ্যানিকে বিদায় দেবার আগে তাকে ফুলওয়ালির কাছ থেকে একটা ফুলের গোছা কিনে দেয়। অ্যানির ভাবে মনে হয়—সে এইটারই আশা করছিল। কি ভুলই আজ হয়ে যেত, যদি এই ফুল কিনবার কথাটা হঠাৎ খেয়াল না হত। পাশেই ফুট-পাথের উপর যে খোঁড়া লোকটা অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে, তার টুপিতে একখান 'একশ' ফ্রাঙ্কের নোট ফেলে দেয়। ...অ্যানি নিশ্চয়ই দেখেছে। ......

সে-রাত্রে লেখকের ভাল ঘুম হয় না। অ্যানির কথাই বার বার মনে পড়ে। এত-দিনকার ভাবাভাবিগুলো একটা মূর্ত রূপ পেয়েছে। আর এ বিষয় নিয়ে একদিনও দেরী সে করতে পারে না। কাল আবার বৃহস্পতিবার—অ্যানি আসবে না। ভাবতেও খারাপ লাগে।

......সে মন ঠিক করে ফেলে। কাল ঘোড়দৌড়ের মাঠেই সে যাবে। সারাদিন অ্যানিকে কাছে পাবে সেখানে। অবাক হয়ে যাবে অ্যানি, সে ঘোড়দৌড়ের মাঠে এসেছে দেখে।

অ্যানি একখানা রুমাল দিয়েছিল কিছু-দিন আগে; তার উপর এমব্রয়ডারি করে লেখকের নামের আদ্য অক্ষর লেখা। বেরোনোর সময় ইস্কুলের ছেলের মত বুক-পকেটে সেখানাকে একটু বার করে রাখে—অ্যানি দেখে খুশি হবে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঢুকবার গেটে সে একখান রেসের কাগজ কেনে—ঘোড়ার ব্যাপারে সিরিয়াস না হওয়াটা অ্যানি পছন্দ করে না। কাগজওয়ালা অযাচিত 'টিপস্' দেয়—"তিন নম্বর রেসে 'নীল ফুল' ও 'পুরনো কুঠি' ঘোড়া দুটোর উপর 'জুমেল'এ (জোড়া) বাজি ধরবেন মসিয়ো।" চেহারা দেখে কাগজওয়ালা নিশ্চয় বুঝেছে যে, লোকটা এখানকার নতুন লোক। 'জুমেল'—যমল—যমলার্জুন—কি মিল ফরাসী ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার! শনি-রবিবারের চাইতে কম ভিড় সেদিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে। তবু অ্যানিকে খুঁজে বার করতে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। প্রথমে চিনতে পারেনি। অ্যানির ছুটির দিনের পোষাক একেবারে অন্য রকম। নতুন ধরণে চুল-বাঁধা, ফারকোট-পরা, হাতে দস্তানা—এ-অ্যানি একেবারে অন্য মানুষ! সঙ্গে আবার আর একজন ভদ্রলোক—বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। বেশ চেহারা ভদ্রলোকের। এই জন্যই অ্যানিকে চেনা শক্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি;—সে ধরে নিয়েছিল অ্যানি থাকবে একলা। ...অ্যানির কোমর জড়িয়ে ধরে চলেছে ভদ্রলোকটি! লেখক থমকে দাঁড়ায়। যে ঘেরা জায়গাটাতে ঘোড়ার পিঠে জকিরা একবার করে দর্শন দিয়ে যাচ্ছেন লোকদের, সেই দিকে চলেছে তারা। লোকের ভিড় সেখানে চাপ বেঁধে গিয়েছে। ...অ্যানি কি যেন বলল। নিশ্চয়ই 'ও-লালা!' ভদ্র-লোকটি অ্যানিকে কোলে করে তুলে ধরেছে, পিছন থেকেও যাতে সে দেখতে পায়। ...অসীম শক্তি লোকটির! তার পরের দুই-জনের ব্যবহার ঠিক বন্ধুর নয়!

সমস্ত রেসকোর্সটা মুছে যায় তার চোখের সম্মুখ থেকে। সে রেলিংয়ের উপর বসে পড়ে—পায়ের দিকটা কেমন যেন দুর্বল মনে হওয়ায় আর দাঁড়াতে পারছে না সে। অন্যমনস্কভাবে চশমাখান রুমাল দিয়ে মুছে নিল। তারপর রুমালখান সেইখানেই তার হাত থেকে পড়ে গেল, না, সে ইচ্ছে করেই ফেলে দিল, ঠিক বোঝা গেল না। পাশে এক বুড়ো ঘাসের মধ্যে থেকে বেছে বেছে 'পিসাঁলি' গাছ তুলে থলিতে ভরছিল। সে মসিয়োর রুমাল পড়ে গিয়েছে দেখে সেখান তুলে আবার তার হাতে দেয়।

"ধন্যবাদ!"

"এই 'পিসাঁলি' গাছগুলোর চমৎকার স্যালাড্ হয়। খেয়েছেন মসিয়ো?"

"না।"

"শীতের শেষেই এর স্বাদ সবচেয়ে ভাল হয়।"

মসিয়োর কাছ থেকে অর্থহীন হাসি ছাড়া আর কোন জবাব না পেয়ে বুড়ো বোঝে যে, এখানে গল্প জমবে না। "লোকের পায়ে পায়ে কি আর পিসাঁলি থাকবার জো আছে। আচ্ছা, আবার দেখা হবে মসিয়ো!"

মনের অসার ভাবটা কেটে গেলে লেখক বোঝে যে, এতক্ষণ বসে বসে অ্যানিদেরই লক্ষ্য করছে। অ্যানির সঙ্গীর উপর ঈর্ষা ঠিক তার হয়নি। অত স্থূলে তার মন নয়। একজনের অপ্রত্যাশিত আচরণে তার মনটা হঠাৎ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল মাত্র। সে জানে যে, প্রণয়ে ঈর্ষা সংক্রান্ত হৈচৈটা আজকাল হাসির খোরাক যোগায়। আজকাল এ নিয়ে লেখা হয় সিনেমার রস-নাটিকা। প্রেমে ঈর্ষা জিনিসটাকে এক সময় ভুল করে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি বলা হত। আজকাল সকলেই জানে যে, এজমালি স্ত্রী থাকবার জন্য তিব্বতীদের মধ্যে ভায়ে-ভায়ে টান বেশি। ......হয়ত সে অ্যানির ভালবাসা পায়নি কোনদিন......হয়ত কেন নিশ্চয়ই!...

চারিদিকে লোকের এই চেঁচামেচি হট্টগোল সব নিরর্থক। তবু এ-লোকগুলো আছে ভাল। জুয়ো খেলার চেয়ে ভাগ্যকে সাজা দেবার আর অন্য কোন রাস্তা নেই!

সম্মুখেই এক ভদ্রমহিলা ফুল কিনছেন। ...আজ সন্ধ্যার টেবিল সাজানোর অনুষ্ঠানের জন্য বোধ হয় এখন থেকেই তৈরি হচ্ছেন। অথচ ফ্রান্সই বোধ হয় ইউরোপের একমাত্র দেশ, যেখানে গেরস্তের ঘরের জানলার উপর জিরেনিয়াম, বিগোনিয়া বা অন্য কোন ফুলের গাছ দেখা যায় না। ...আর একটি মহিলা স্বামীর সোজা 'টাই'টা নেড়েচেড়ে আবার সোজা করে দিলেন। ঠিকইত ছিল! তবু এই ভালবাসা দেখানোর পর্বের অনুষ্ঠানগুলোতে কোনও রকম অঙ্গহানি হবার যো নেই।......স্বামীর কোটের পিঠের দিকে টোকা মেরে অদৃশ্য একটা ধুলোর কণা কি কুটো ঝেড়ে দিতেই হবে। তখন স্বামীকেও ভাই-ফোঁটা নেবার সময়ের আড়ষ্ট সন্তোষের হাসিটি মুখে ফুটিয়ে তুলতেই হবে। দুনিয়াটাই এদের একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। এরা ঘটা করে সোহাগ দেখায়। এখানকার বাঁধা নিয়মের পর্ব শেষ হলে আবার দুজনে মিলে যেতে হবে সিনেমা। অথচ মন হয়ত পড়ে রয়েছে কোথায়!......না, না, সে অ্যানির উপর রাগ করতে যাবে কেন।......তবে এদেশে ঝি নামই দাও, অ্যানি ঝি।......সাবিত্রী ঝির প্রেমে পড়ে সতীশ কৃতার্থ হয়েছিল, বাস্তব সামাজিক জীবনে একথা ভাবা শক্ত।......একথা এর আগেও তার মনে হয়েছে বহুবার। ......অ্যানি নিজেকে ঝি বলে ভাবে না। ......এই সেদিনের কথা—একদিন বিছানার চাদর বদলাতে এসেছিল অ্যানি আর হোটেলওয়ালি দুজনে। মাদামের সম্মুখে নিজের আচরণের সাবলীলতা দেখানর জন্যই বোধ হয় অ্যানি বলল "জানেন তো মাদাম, মসিয়ো লেখক আমাকে সঙ্গে করে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে, চাকরি দিয়ে?"

লেখক পালটা জবাব দিয়ে বলেছিল "বয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে 'দোমেস্তিক' (ঝি চাকর) অনেক সস্তা।" সস্তা? এই 'সস্তা' কথাটা শুনে হোটেলওয়ালি হেসেই বাঁচে না অ্যানি কিন্তু এই 'দোমেস্তিক' কথাটা পছন্দ করেনি। তখন কিছু বলেনি মাদামের সম্মুখে। দিনকয়েক একটু থমথমে ভাবের পর, একদিন তাদের ইউনিয়নের এস্তাহার একখান হাতে দিয়ে বলেছিল যে হোটেলের কর্মীরা 'দোমেস্তিক'এর মধ্যে পড়ে না। লেখক তখন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, ফরাসী ভাষায় তার জ্ঞান ভাল না থাকার জন্যই সে ঐ শব্দ ব্যবহার করেছিল।......

যাকগে অ্যানি ঝি শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কিনা সেটা হল আদালতে সওয়ালের ব্যাপার। দেশে যদি অ্যানিকে নিয়ে যেত, তাহলে কি আর লেখক কাউকে জানতে দিত সে কথা? কিন্তু সত্যি কথা চেপে লাভ কি? একটা ঝি, যে ও লালা, আর ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন কথা জানে না, লটারির পুরস্কার ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কারের মধ্যে তফাৎ বোঝে না, তাকে নিয়ে সারা জীবন কাটানো? —ও লালা! সে পণ্ডিত না ছাই! এত পণ্ডিতের মত বড় বড় কথা ভাবে, বড় বড় কথা লেখে, দুনিয়ার সব নামাজাদা লোকের হাঁড়ির খবর রাখে, অথচ অ্যানির সম্বন্ধে সে কিছুই জানত না! সং! সে পণ্ডিত না, সং!

ঐ আসছে আবার অ্যানিরা এবারকার রেসের ঘোড়া দেখতে! তাদের সঙ্গে দেখা করে, দেবে নাকি সে অ্যানিকে অপ্রস্তুত করে,? না না অ্যানির উপর তার এই আক্রোশের কোন মানে হয় না। সে কি তার কেনা বাঁদী? যে যা ইচ্ছে করুকগে যাক! তার কি এল গেল? ঝড়-তুফানের মধ্যে ভাগ্য তার মুক্তির, পথ দেখিয়ে দিয়েছে। অ্যানির স্বভাবের এই দিকটা যদি তাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার পর সে জানতে পারত! অ্যানি বলেছিল লেখকের ভাগ্যের চাকা গরম থাকতে থাকতে......

অ্যানিদের দিকে সে আর তাকাবেনা কিছুতেই! এত লোকের এই হট্টগোল তার ভাল লাগছে না।......যতবার অ্যানিরা এদিকে আসবে ততবারই কি নজরে পড়ে যাবে! লোকটি অ্যানিকে কি যেন বলায়, অ্যানি ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালো। লোকটা নিরুপায় হয়েই স্বীকৃতি দিল। লোকটা বোধ হয় অ্যানিকে সিনেমাতে নিয়ে যেতে চায় এখনই। অ্যানি বোধ হয় বললো বাকি রেসগুলো শেষ হওয়ার আগে সে কিছুতেই সিনেমা যাবে না।......

এত লোকজন তার ভাল লাগছে না; অথচ মনে হচ্ছে যে সে একেবারে একা। অ্যানির চেয়ে নিজের উপর তার আক্রোশ বেশী......এই সব টাইপের মেয়েদের জন্য সে কেয়ার করে না মোটেই!......সে হোটেলে ফিরে গিয়ে একান্তে ভাবতে চায় সমস্ত জিনিসটা একবার।......কি ভাবে অ্যানি তাকে!......

মাঠ থেকে বেরোনোর পথের পাশে পাশে, ছাঁটা গাছের বেড়া দেওয়া গোলকধাঁধা গলি। অন্যমনস্কভাবে আসতে আসতে তারই একখান বেঞ্চে নজর পড়ে—মার্গট আর দেবরায়। মার্গট সঙ্গে না থাকলে হয়ত সে এখন একবার দেবরায়ের সঙ্গে দেখা করত।

......ফুটপাথের এক তরকারির দোকানে একটি মহিলা ভরা থলির উপর দিকে চারটি ভাল জাতের ট্যাঙ্গারিন লেবু কিনে রাখলেন। নীচে নিশ্চয়ই শালগম ও গাজর আছে—আজকালকার সবচেয়ে সস্তা তরকারি। উপরের লেবু কয়টা লোকে দেখুক।......একটি ছোট মেয়ে মিষ্টির দোকানের কাচে নাক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।......একজন পেরাম্বুলেটার চালনরতা মহিলা থামলেন, হঠাৎ তাঁর পরিচিতার সঙ্গে দেখা হওয়ায়।—"কি আজ ছুটি বুঝি?" প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে ভদ্রমহিলাটি জানিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে তাঁর স্বামী অনেক রোজগার করেন বলে তাঁকে কাজ করতে হয় না; তাই তিনি কবে ছুটি, কবে ছুটি নয় তার খোঁজ রাখেন না।......

......একজন লোক একটি প্রকাণ্ড আলসাসিয়ান কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। সারা দুনিয়াকে দেখাতে চায়—এ কুকুর খাওয়াতে খরচ অনেক :—তোরা পুষতে হলে বেড়াল পুষিস।......সবই এই মজুর পাড়ার বড়মানুষি!......

......সেকেণ্ডহ্যাণ্ড 'ফার'এর দোকানের আলমারিটা আবার ভরে উঠেছে—বোধ হয় শীত কমেছে বলে।......অ্যানিতো এখনও ফারকোট ছাড়েনি।......গায়ের লোম গিয়ে মানুষের দাম জানোয়ারের চাইতেও কমে গিয়েছে।......কিন্তু 'ফার'এর মধ্যেও সাদাগুলোরই দাম বেশী কালোর চেয়ে।......কালোরা যতদিন না নিভৃততম অন্তর থেকে কালোকেই বেশী সুন্দর ভাবতে পারছে সাদার চেয়ে, ততদিন বৃথাই আক্রোশ সাদার কদরে।

......পকেটের খুচরো মুদ্রাগুলোর শব্দ হচ্ছে। লেখক অন্যমনস্কভাবে একখান খবরের কাগজ কেনে। সব চেয়ে উপরে প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন—"নেপলস্ দেখে মরুন—Parker's Hotel Britanique".......ইংরাজী হোটেলের ব্যবস্থা ভাল হতে বাধ্য। কথায় আর কাজে ইংরাজদের অসঙ্গতি নেই......হালকা ফঙ্গবেনে মন তারা রাখে না।

প্যারিসে হাঁফ ধরে গিয়েছে। সে প্যারিসের বাইরে যাবে। আর ভাববার দরকার নেই। মন ঠিক করে ফেলেছে সে। লেখক তার হোটেলের দোরগোড়ায় চলে এসেছে।

কাউণ্টারে হোটেলওয়ালি হেসে অভিবাদন করবার পর, সে যেন হঠাৎ মাদামকে দেখতে পেল।

"মাদাম আমি কালই ইটালি যাব ঠিক করেছি।"

"ইটালি? এইতো সেদিন ইটালি ঘুরে এলেন না?"

"হ্যাঁ, নেপলসের দিকটাতে যাওয়া হয়নি সেবার"।

"নেপলস! আমরাও বিয়ের পর 'হনিমুন' করতে গিয়েছিলাম সেখানে। ও লালা! সেখানে কমলা লেবু আর অয়েস্টার কি সস্তা ছিল তখন! একটা যাবার জায়গা নয় মঁসিয়ো নেপ্লস।"

মাদামের ঠাট্টার জবাব না দিয়েই লেখক দরজা খুলে বেরিয়ে যায় আবার। যাবে টুরিস্ট এজেন্সী অফিসে।......এই ফ্রান্সেই সে এসেছিল মানুষের উপর বিশ্বাস বাড়াতে!

হোটেলওয়ালিও একটু ভেবে দেখে—নেপলস যাবার কথাটা বলবার জন্যই বাইরে থেকে এসেছিল নাকি মঁসিয়ো? ঠিকানা আণ্ডিল হঠাৎ পেয়েছে। এখন উঠবে কিছুদিন। ঘরটা ছেড়ে যাবে কিনা সেইটা হচ্ছে কথা। ঘর ছাড়বারই নোটিশ নয়ত তার এই খবর দিয়ে যাওয়া? নিজে থেকে যেচে আমি কেন জিজ্ঞাসা করতে যাই।

(ক্রমশ

আসামের এই পল্লীরমণী মুগা-পোকার গুটি হইতে পশম বাহির করিতেছে

গুটিগুলি হইতে পশম বাহির করিবার পূর্বে রৌদ্রে শুকাইয়া গরম জলে সিদ্ধ করা হইতেছে

আসামের গ্রামের এই রমণী সংসারের দৈনন্দিন কাজের অবসরে নিজ হস্তে তাঁতে মুগা-বস্ত্র বয়ন করিতেছে।

মুগার তৈয়ারী মেখলা পরিহিতা অসমীয়া কিশোরী

আসামের দুজন পল্লীবাসী গুটিপোকা হইতে ছাড়ানো রেশম পাক দিয়া সুতায় পরিণত করিতেছে। প্রথমে ইহা লাটাইয়ে গুটাইয়া রাখা হয়, পরে এই সুতা ই তাঁতে টানা ও পোড়েনরূপে ব্যবহার করা হয়।

[ফটো: নীরদ রায়]

আপনি কী হারাইতেছেন আপনি জানেন না

শিবরাম চক্রবর্তী
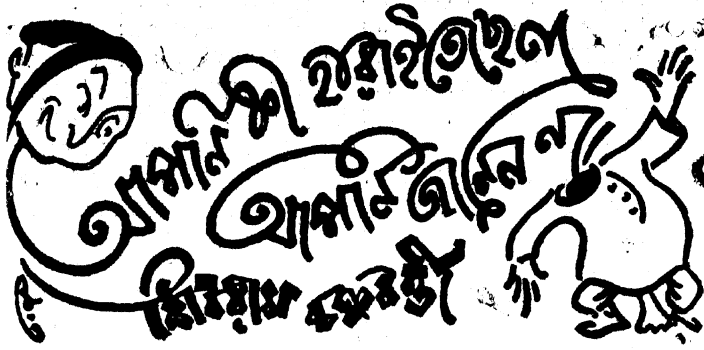
জমজমাট সভা। মহকুমার ছোট বড়ো সবাই জড়ো। ক্ষুদ্র মহৎ সকলেই জমায়েত। ইতর ভদ্রের কেউ বাকি নেই।

পিণ্টুও এসেছে। বেশ সেজেগুজেই। ধোপদুরস্ত হাফ প্যাণ্ট, হাফ শার্ট—ঝক্‌ঝক্‌ করছে জুতোর বার্নিশ, চক্‌চকে ব্যাকব্রুশ্‌ মাথার চুল।

জ্বল্‌-জ্বল্‌ করছে বুকের ওপর টাটকা-পাওয়া সোনালী মেডেলটা। রুপোলী গোলকের ওপর সোনালী পাত-মোড়া, মীনার কাজ করা—তার বীরত্বের পুরস্কার!

মহকুমা শহরের ইস্কুল-প্রাঙ্গণে সভা। রীতিমত বিরাট সভাই বলতে হয়। তিনটে ইস্কুলের যতো ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে। এসেছে তাদের গার্জেনরা। অনাহূত, রবাহূত জুটেছে আরো কতো যে!

কলকাতার দৈনিকপত্রগুলির নিজস্ব সংবাদদাতারাও রয়েছেন। খবর পাঠাবেন নিজেদের কাগজে। পিণ্টু যে ইস্কুলের ছাত্র তার হেড-মাস্টার মশাই হয়েছেন সভাপতি। পিণ্টুর গর্বে তাঁর দেড় হাত ছাতি দশ হাত হয়ে উঠেছে। মহকুমার হাকিম সভার প্রধান অতিথি।

আর চারিধার ঘিরে খালি দর্শক আর দর্শক।

প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে পিণ্টু।

সবাই দেখছে পিণ্টুকে। পিণ্টু কিন্তু কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। মেডেল পেয়েও মোটে সে খুশি নয়। তাকে নিয়ে এই যে হৈ চৈ, এত যে সোরগোল এতে যেন তার সাড়া নেই। সে যেন এ উৎসবের কেউ না। এ সব আদিখ্যেতার বাইরে। নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, নির্বিকার ভার ভার মুখ তার।

এমন দিনক্ষণে তাকে বেশ হাসিখুশিই দেখবে আশা করেছিল সবাই। ফুটন্ত ফুলের মতই প্রফুল্ল দেখা যাবে। অবশ্যি, ফুল যেমন ফোটে তেমনি আবার আলপিনও তো! কেউ যেন আলগোছে তাকে পিন ফোটাচ্ছে এমনিতরো পিণ্টুর মুখখানা।

ঘোষ-ণা পর্ব

সভার যিনি ঘোষক, তিনি মাইকটা এনে খাড়া করলেন তার সামনে—

"এইবার আমরা আশা করি শ্রীমান পিণ্টু নিজ-মুখে, তার নিজের ভাষায়, সেই অসম সাহসিকতার কাহিনী আমাদের শোনাবে..."

সবাই চুপ। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ। একটা পেন্‌সিল্‌ পড়লেও শোনা যায়। যে রোমাঞ্চকর দুঃসাহস কেবল বইয়ের পাতাতেই পড়া তা এবার কানের পাতে পরিবেশিত হবে—উদ্‌গ্রীব সকলেই। কিন্তু পিণ্টুর শ্রীমুখ থেকে একটা কথাও শোনা গেল না।

মাইকওয়ালা এবার নিজেই শুরু করলো গাইতে—"ক্লাস এইট-এর ছেলে এই পিণ্টু—এই যে, আপনাদের সামনেই দাঁড়িয়ে। কতোই বা বড়ো হবে আর? বছর বারো কি তেরো বড়ো জোর ওর বয়েস। ইস্কুলের কাছের ছোট্ট মনোহারী দোকানে সেদিন যখন আগুন লাগলো, সবাইকে ঠেলে একাই গেল সে এগিয়ে। থামলো না বাধায়, মানলো না কারো মানা, জ্বলন্ত চালাঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে সেঁধুলো। দোকানদারকে টেনে নিয়ে এলো একলাই, এক হাতে, অবলীলায়। ধোঁয়া আর আগুনের ভেতর থেকে তার অচেতন দেহখানাকে একাই সে বার করে আনলো—বাঁচালো তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ...."

সভাশুদ্ধ হাততালি দিয়ে উঠলো—সাধুবাদ পড়লো চারধারে। কিন্তু পিণ্টুর কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না।

"এইটুকু ছেলের মধ্যে এমন বীরত্ব যেমন অভাবিত, তেমনি অভাবনীয়। এক কথায় অভূতপূর্ব। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং ছাত্রবৃন্দ। শ্রীমান পিণ্টুর মুখেই এখন শুনবো আমরা সেদিনকার কাহিনী। এখনই শুনতে পাবো।........পিণ্টু, তোমার সেই অগ্নি-অভিযানের কাহিনী—সেই জ্বলন্ত অভিজ্ঞতার কথা আমাদের কাছে তুমি বর্ণনা করো। দু-চার কথায় বলো আমাদের......"

"ও আর এমন কী! ও কিছু না।" পিণ্টু একটু ইতস্তত করে বলে।

"কিছু নয়! তুমি বলো কি হে পিণ্টু?" মাইকওয়ালা অবাক হয়ে যান—"দেখুন আপনারা, এইটুকুক্ ছেলের মধ্যে কতোখানি বিনয়—কি রকম সারল্য। তাকিয়ে দেখুন এত বড়ো কাজ করেও—এমন বীরোচিত বাহাদুরির পরেও—এটাকে সে কিছু না বলে উড়িয়ে দিতে চাইছে। ভেবে দেখুন একবার, কতোখানি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা হলে এমনটা হতে পারে।........"

বীরত্বের পরাকাষ্ঠা বলতে! যে পরাক্রমের একটু ইদিক-উদিক হলে—ইতর-বিশেষ ঘটলে পরাকাষ্ঠার বদলে পোড়া কাঠ হয়ে বেরুতে হোত—সেই ব্যাপারটাকে সকলেই ভেবে দ্যাখে। এবং যতই দ্যাখে ততই আরো ভাবিত হয়।

"এ আর এমন শক্ত কি। জলের মতই সোজা তো!" পিণ্টু জানায়,—

"এ সব কাজ একদম কিছু না।"

আগুনের মধ্যে ঢোকা—জলের মতই সহজ! বলে কি এ পিণ্টু? জলের পক্ষে সোজা হতে পারে, দমকলের পক্ষেও হয়তো, কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষের বেলায় কথাটা খাটে কি? মাইকওয়ালা অতিকষ্টে নিজের বিস্ময় দমন করেন—

"হতে পারে তোমার কাছে এ কাজ তেমন কিছু নয়। তুমি বড় হয়ে আরো অনেক বড়ো কাজ করবে। আরো ঢের বেশি বীরত্ব দেখাবে আমরা আশা করি। কিন্তু তাই বলে তোমার এই কাজটিও তেমন ফ্যালনা নয়। তোমার এই আদর্শ—আত্মত্যাগের এই উজ্জ্বল উদাহরণ—আমাদের ছাত্র-বন্ধুদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাক। এখন, সেই অগ্নি-গর্ভে প্রবেশ করবার আগে সেদিনকার তোমার মনের ভাব তখন কেমন হয়েছিলো সেই কথা তুমি বলো আমাদের——"

মাইকটাকে তিনি ওর মুখের কাছে এগিয়ে দেন।

পিণ্টু ঢোঁক গেলে। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটে একবার। কী বলবে ভেবে পায় না।

"যেমন ধরো, দোকানদারটাকে বাঁচাবার তোমার ইচ্ছে হোলো। কিন্তু কেন তোমার এমন ইচ্ছে জাগলো হঠাৎ?" শুরু করার ধরতাই হিসেবে কথাটা পিণ্টুকে তিনি ধরিয়ে দিতে যান্। উস্‌কে দিতে চান্।

পিণ্টু কিন্তু উস্‌কায় না। অনেক উস্‌খুস্ করে অবশেষে সে বলে—"ওর দোকানে অনেক—অনেক চকোলেট। বিস্তর খেয়েছি আমি। বেশ খেতে।" বলে' নিজের ঠোঁট-দুটো ভালো করে আরেকবার সে চেটে নেয়।

"বেশ তো। চকোলেট খেয়েচো, তার দামও দিয়েছো তেমনি। ধারে খাওনি নিশ্চয়, যে চকোলেটওয়ালার সেই ঋণ শোধ করবার মানসেই তুমি প্রাণ বিসর্জন দিতে গেছলে? তাকে বাঁচিয়ে তুমি তার যে উপকার করেছো সারা জীবন ধরে সহস্র চকোলেট ধারে খেলেও —অমনি অমনি চাখলেও তার দাম ওঠে না। কী বলেন মশাই, ঠিক বলিনি?"

উদ্ধৃত দোকানদার অদূরেই বসে ছিলো। ঘাড় নেড়ে তার সায় দিলো, বলতে না বলতেই।

"পিণ্টু সর্বদা নগদ দাম দেয় আমায়। ওর কাছে আমি এক পয়সাও পাইনে।" একথাও সে জানালো তার ওপর।

"কিন্তু পিণ্টু", মাইকওয়ালা উদ্ধারককে সম্বোধন করেন এবার, "গোটা দোকান যখন দাউ-দাউ করে জ্বলছে তখন নিশ্চয় তুমি চকোলেট কিনতে যাও নি? চকোলেট দাও বলে তার মধ্যে ঢোকো নি? দোকানদারকে বাঁচাবার জন্যেই গেছলে নিশ্চয়? তা, সেই আগুনের মধ্যে পা বাড়াতে কি তোমার একটুও ভয় করল না তখন?"

"ভয় কেন? কিসের ভয়? ভয়ের কী আছে?" পাল্টা তাকে প্রশ্ন হোলো পিণ্টুর: "আমি জানতুম আগুনের আঁচটুকুও আমার গায়ে লাগবে না।"

"জানতে? কি করে জানলে?"

"কি করে জানলুম? কেন, আপনি কি কোনো অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েন নি কখনো?" ভদ্রলোকের অজ্ঞতা দেখে পিণ্টুকে অবাক হতে হয়।

"অ্যাডভেঞ্চারের বই!" মাইকওয়ালার দুই চোখে দ্বিগুণ বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা দ্যায়।

"বইয়েই তো! পড়েন নি কি, মোহন আগুনের মধ্যে ঢুকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো? অগ্নিশিখারা লক্‌লক্ করতে লাগলো চার পাশে, কিছুটি করতে পারলো না তার। অনর্থক দাউ-দাউ করতে থাকলো, বাজে বাজেই, কোনো কাজে এলো না—তার কেশস্পর্শও করতে পারলো না।" বইয়ের শিকা থেকে লেলিহান শিখাদের পিণ্টু সভাস্থলে সবার সামনে টেনে আনে।

"ও, বই!" ভদ্রলোক ঢোঁক গেলেন—"সেই সব বইয়ের কথা! হ্যাঁ, বইয়ে ওরকম লেখা থাকে বটে। তা, যখন তুমি ঢুকলে, নিজের প্রাণ হাতে করেই ঢুকলে, তখন কি তোমার একবারো মনে হয় নি যে, মাথার ওপরের জ্বলন্তো চালটা যে কোনো মুহূর্তে তোমার ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়তে পারে?"

"সেজন্য তো আমি তৈরি ছিলাম।" পিণ্টু অকাতর—অকপট: "আমি জানতাম সেটা ভেঙে পড়বে। ঠিক সময়েই পড়বে। কিন্তু আমি বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত পড়বে না। আমার বেরুবার আগে নয়।"

"কি করে জানলে তুমি? অ্যাঁ?"

"বইয়ের থেকেই জানি। জ্বলন্ত চাল, যতই জ্বলুক—যতই দাউ দাউ করুক না—কক্ষণো ওরকম বেচাল করে না। করতে পারে না। উদ্ধারকারীর ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়ে না কক্ষনো,—ভুল করেও নয়। সব্বাই জানে একথা—আর, আপনি জানেন না?"

"যাক গে, চালের কথা থাক গে", বদ্-চালটাকে তিনি পালটান—সেকথা চাপা দেন: "আচ্ছা, তারপর তো তোমার আশে-পাশে বাঁশগুলো সব ফাটতে লাগলো ফট্-ফট্ করে? তাই নাকি?"

"ফাটবেই, জানা কথা। ওতে আমি একটুও ভড়কাই নি। কেন ঘাবড়াবো—বলুন? করুক না বাঁশরা ফট্-ফট্! যতো খুশি ওদের। ওদের ছট্‌ফটানিতে কী আমার আসে যায়? থোড়াই কেয়ার ওদের ফট্-ফটানিকে। আমি আমার কাজ করবো।"

"আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!" মাইকওয়ালার মুখে কথা যোগায় না।—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বড়ো হয়ে তুমি আরো ঢের বীরত্বের কাজ করবে। বেড়ে উঠে আমাদের জাতীয় বাহিনীর বীর সৈনিক হবে তুমি। কিম্বা সেনাপতিই না কি, কে জানে! লড়ায়ে গিয়ে কামানের মুখে এগিয়ে ছিনিয়ে নেবে শত্রুর ঘাঁটি। যুদ্ধক্ষেত্রের গোলাবর্ষণকে অগ্রাহ্য করে তোমার আহত বন্ধুদের কুড়িয়ে নিয়ে আসবে মৃত্যুর মুখ থেকে..."

এমনি আরো অনেক কিছুই তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পিণ্টু তাঁর কথায় কান দেয় না। মাঝখানে বাধা দিয়ে তাঁর পুঞ্জিত তুলনা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়—"সে আর এমন কি শক্ত মশাই? গোলাগুলী কি গায়ে লাগে নাকি কারো? কক্ষনো না। ওরা-তো সব যতো কানের এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়! খালি হিস্ হিস্ করে যায়, জানেন না?" অবাক না হয়ে পারে না পিণ্টু: "সে কি, আশ্চর্য, আপনি কি একটাও কোনো অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েন নি?"

গুলী তো হজমি গুলী! গুড়ুম গুড়ুম করাই তার কাজ। যেমন গর্জন তেমনি বর্ষণ হলেও, ওরকম গোলাগুলী সে গুলে খেয়েছে কতো যে!

"হিস্ হিস্ করে? বলো কি?" ভদ্র-লোকের সব যেন গুলিয়ে যায়। প্রচণ্ড গোলাগুলীদের এক কথায় গিলে ফ্যালা একটু কষ্টকর হলেও, কোনোরকমে তিনি হজম করেন। অগ্নিকাণ্ডের কথায় ফিরে আসেন ফের—"সে কথা যাক্,—এখন সেদিনের কথাই হোক। যখন তুমি দোকান-দারকে বাঁচাবার জন্যে এগুলে——"

"আমি দোকানদারকে বাঁচাতে যাইনি মোটেই। আমি তার চকোলেটদের বাঁচাতে গেছলুম।" পিণ্টু কবুল করে সাফ্।

"অ্যাঁ? তার চকোলেটদের? কী জন্যে?"

"হ্যাঁ। ভাবলাম, অতগুলো চকোলেট অমনি অমনি পুড়ে থাক্ হয়ে যাবে। মারা যাবে বেঘোরে। তাই—এই ফাঁকে যদি চারটি

ওদের সরিয়ে ফেলা যায় মন্দ কি? চেষ্টা করে দেখাই যাক্ না!"

"বটে?......বটে বটে?......তারপর চকোলেটদের বাঁচাতে গিয়ে......?"

"দোকানে ঢুকে চকোলেটদের দেখতে পেলাম না। একটাকেও না। দেখলাম তার বদলে মূর্তিমান এই দোকানদারকে। একটা বাক্স আঁকড়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন ভদ্রলোক।"

অশ্রুতপূর্ব শ্রুতিধর

"তখন তুমি চকোলেটের কথা ভুলে গিয়ে ওকেই বাঁচাতে গেলে?"

"মোটেই না। বাক্সটা তার হাত থেকে ছাড়াতে গেলাম আগে। আমার মনে পড়লো, আগুন লাগলে তো মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটাকেই আঁকড়ে ধরে। তাকেই সবার আগে বাঁচাতে যায়। বইয়েই পড়েছিলাম। চকোলেটের চেয়ে প্রিয় জিনিস মানুষের আর কী আছে? এটা নিশ্চয়ই সেই চকোলেটের বাক্সই হবে। এই ভেবেই আমি—কিন্তু এমনি সে সাপ্টে ধরেছিলো বাক্সটা যে কিছুতেই তার হাত থেকে ছাড়ানো যাচ্ছিল না। কোনো রকমেই সেটাকে বেহাত করতে পারলুম না। দু-চার ঘা লাগালুমও, বেশ জোরে জোরেই—কিন্তু লোকটার হুঁস থাকলে তো! মার খেয়ে মানুষ অজ্ঞান হয়, আর ও কিনা অজ্ঞান হয়ে মার খেলো। চোরের মার খেলো পড়ে পড়ে। তবু সে তার বাক্স ছাড়লো না কিছুতেই। তখন বাধ্য হয়েই—"

"বাধ্য হয়ে কী করলে তুমি?"

"বাক্স সমেত টেনে আনলাম ওকে। আনতে হোলো বাধ্য হয়েই, করবো কী? কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনলাম বাইরে......"

"কান ধরে? কান ধরে কেন?" মাইক-ওয়ালা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না—"কেন, লোকটার কী হাত পা কিছু ছিল না?"

সভার সবাই উৎকর্ণ হয়। অদূরে-বসা দোকানদারটিও নিজের কান খাড়া করে।

সবার টান্-করা কানের দিকে পিণ্টু নিজের উত্তরবাণ ত্যাগ করে—

"ছিলো। থাকবে না কেন? আমার হাতের কাছাকাছিই ছিলো। কিন্তু এমন রাগ হোলো আমার যে তার কান না মলে পারলাম না। আর কান মলতে গিয়ে—তবে হ্যাঁ, ওর কান ধরে না টেনে গোঁফ ধরেও আনা যেত বই কি। আর সেইটেই হোতো ঠিক। গোঁফ ধরে টান মারাই উচিত হোতো, উপযুক্ত শাস্তি হোতো লোকটার। কিন্তু অমন তাড়াহুড়োর মাথায় কি মাথার ঠিক থাকে? কোন্টা ভালো কোন্টা মন্দ, আমি কি ভাবতে পেরেছি তখন? অতো দিক খেয়ালই করিনি। সত্যি বলতে, ওর গোঁফের কথা একদম আমার মনেই ছিল না।" পিণ্টু এখন আপসোস হয়—"মনে থাকলে কি কেউ কারো কান নিয়ে টানাটানি করে।"

"তারপর? লোকটাকে বাইরে আনবার পরে?"

"কোথায় চকোলেট!" পিণ্টুর গোমড়া মুখে আরো বেশি গাঢ় গুমোট দেখা দেয়—"বাক্সের মধ্যে খালি টাকা আর পয়সা! নোটের তাড়া কেবল! চকোলেটের ছিটে-ফোঁটাও নেই।"

বীরত্বের চূড়া থেকে বিরক্তির চরমে ওঠে পিণ্টু। ঢের হয়েছে, ঢের সে সয়েছে—আর নয়! এতক্ষণ ধরে এমনধারা আদিখ্যেতা বরদাস্ত করা যায় না। বিকৃত মুখে বুকের

বাঁচানোর বঞ্চনা

মেডেলটাকে খুলে নিয়ে অবহেলায় সে হ্যাফ-প্যান্টের পকেটে গুঁজে দ্যায়। তারপরে বিড়ম্বিত মুখ তুলে বলে—

"এমন জানলে কি আমি এক পা এগুতাম? ধরে একটা লজেঞ্জুস্‌ও দেয় না, কে বাঁচাতে যেত ঐ হতভাগাকে?"

"আর......আর......", তারপরেও পিণ্টুর অনুযোগের থাকে—"বইয়ের সব কথাই কিছু ঠিক নয়। আগুন লাগলে মানুষ যে তার প্রাণের জিনিসটাকেই আঁকড়ে ধরবে, তারো কোনো মানে নেই।"

কথায় বলে 'ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার', কিন্তু ঢাল-তলোয়ার নিয়েও সর্দারি করে না, এমন নিধিরামও দেখা যায়। সাধারণত দেখা যায় যে, সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলিরই নৌবহর বা নৌবল বেশি থাকে, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও জলযুদ্ধ তাদেরই বেশি করতে হয়। কিন্তু সুইজারল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থান সমুদ্র থেকে শত শত মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও এর একটি নৌবহর আছে, আর এই নৌবহরটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ঐ নৌবহরটির বয়স মাত্র দশ বৎসর। ১৯৪১ সালে এরা প্রথম আটখানি জাহাজ ধার করে তাদের নৌবহরের পত্তন করে। আর আজ এদের জাহাজের সংখ্যা মাত্র একুশখানি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় জাহাজখানি ওজনে মাত্র সাড়ে চৌদ্দ হাজার টন। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, এদের নিজস্ব কোনও বন্দর নেই। পৃথিবীর সব বন্দরই এরা ব্যবহার করে। এদের এই নৌবহর যুদ্ধের জন্য নয়। কেবলমাত্র বাণিজ্য ক্ষেত্রের আমদানী-রপ্তানির জন্যই এই নৌবহরের প্রয়োজনীয়তা।

*

নুনের গুণের খবর আমরা কেউ রাখি না কিন্তু যেদিন আলুনো তরকারী খেতে হয়, সেদিনই বুঝি লবণ আমাদের কত প্রয়োজনীয়। অথচ এমন অনেক রোগী আছেন যাদের নুন খাওয়া একেবারে বারণ। এদের মধ্যে কিডনী, যকৃত ও হৃদযন্ত্রের রোগীই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রক্তের চাপের আধিক্যে যাঁরা ভোগেন তাঁদেরও নুন খাওয়া নিষেধ। কারণ নুন খাওয়ার জন্য শরীরের রক্তে জলের ভাগ বেশী হয়, এর জন্য অসুস্থ ইন্দ্রিয়গুলির ওপর খুব বেশী চাপ পড়ে। কিন্তু নুন ছাড়া অনেক সুখাদ্যই অখাদ্য হয়ে যায়। নতুন ওষুধ Resodec এই সমস্যার সমাধান করেছে। লবণযুক্ত খাবার খাওয়ায় রক্তে যে জলের ভাগ বেশী হয় Resodec সেটার অনেকটা কমিয়ে দিতে পারে। অতএব এই রোগীরা যদি অল্প পরিমাণ লবণযুক্ত খাবার খাওয়ার পর Resodec খেয়ে নেয় তাহলে খাবারের নুন তাদের শরীরের খুব বেশী ক্ষতি করতে পারে না। অবশ্য এই ওষুধের এখনও বাজারে প্রচলন হয় নি। পরীক্ষামূলকভাবে এই ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে।

চক্রদত্ত

কথায় বলে 'ভূতের বোঝা', অবশ্য ভূতের বোঝা কি পদার্থ জানা নেই, তবে যে কোন বোঝাই খুব বেশি ভারি হলে ভূতের বোঝা মনে হয়। এই বোঝা বইবার সোজা উপায় বার হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, চাকাওয়ালা স্যুটকেশটি অনায়াসে চালিয়ে নিয়ে

বোঝা বইবার সোজা উপায়

যাওয়া হচ্ছে। অবশ্য স্যুটকেশটি চাকাওয়ালা নয়। এই দুই চাকাসমেত পায়া দুটি আলাদা জিনিস। এর সঙ্গে যে কোন স্যুটকেশ বা ঐজাতীয় বাক্স আটকে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এই পায়া দুটি আবার চালকের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ছোট-বড় করা যায়।

*

মানুষের শরীরের মধ্যে কিডনী একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্র এই যন্ত্রটি খারাপ হলে মানুষকে নানারকম রোগে ভুগতে হয়। মানুষের শরীরের রক্তের দূষিত পদার্থগুলি ছাকনির মত ছেঁকে শরীর থেকে বার করে দেওয়াই কিডনীর প্রধান কাজ। সুতরাং খারাপ কিডনী যদি কোনও ভাল কিডনীর সঙ্গে বদল করে নেওয়া যায়, তাহলে মানুষ কিডনীঘটিত রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। বর্তমান কৃত্রিমতার যুগে কৃত্রিম কিডনী তৈরির চেষ্টা চলছে বোস্টন শহরের এক হাসপাতালে ১১৮ [illegible] রোগীর দেহে কৃত্রিম কিডনী জুড়ে দি[illegible] চিকিৎসা করে বিশেষ সাফল্য ল[illegible] করা গেছে। এই নকল যন্ত্রটি আকৃতি[illegible] স্বাভাবিক যন্ত্রের প্রায় দ্বিগুণ এবং [illegible] সাধারণ কিডনীর মতই ছাকনীর কাজ করে।

*

চিকাগো য়ুনিভার্সিটির বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, মানুষ যদি রুটী আর দুধ একসঙ্গে খায় তাহলে শরীর ধারণ ও পুষ্টিসাধনের জন্য আর কোনও খাবারেরই প্রয়োজন হয় না; কারণ শরীর ধারণের জন্য যে সব উপাদান দরকার তার সব এরই মধ্যে পাওয়া যায়। ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কতকগুলি ইঁদুরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। একদল ইঁদুরকে শুধু রুটী ও জল খাইয়ে দেখা যায় যে, তাদের দেহের বৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর একটি দলকে শুধুমাত্র দুধ খাইয়ে দেখা যায় যে, তারা ক্রমশঃ রক্তহীন হয়ে পড়ছে। শেষের দলটিকে দুধ ও রুটী একসঙ্গে খাইয়ে দেখা গেছে যে, এদের দেহের বৃদ্ধি স্বাভাবিক বৃদ্ধির চেয়ে বেশী হয়। এই সব বৈজ্ঞানিকদের মতে দুধ ও রুটীর মধ্যে মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী এ্যামিনো এসিড্ ও প্রোটীন যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

*

ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা করা খুবই কষ্টকর, কিন্তু তার চেয়েও বেশী কষ্টকর রোগটি শরীরের মধ্যে কোথায় হয়েছে খুঁজে বার করা। মস্তিষ্কের মধ্যে ক্যান্সার হলে এ্যাটমিক শক্তির সাহায্যে রোগদুষ্ট স্থানটি খুঁজে বার করার একটি নতুন উপায় বার হয়েছে। যে রঞ্জক পদার্থ মানুষের শরীরের মধ্যে গিয়ে কোনও ক্ষতি করে না সেই রকম রঞ্জক পদার্থকে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন করে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করান হয়। এই পদার্থটি রক্তের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যের রোগগ্রস্ত স্থানটিতে জমা হয়। এরপর ঐ রঞ্জক পদার্থের 'গামা রশ্মি' মস্তিষ্কের ভেতরের দুদিক থেকেই বার হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তখন এই দুই রশ্মির প্রান্তদেশ থেকে সোজা রেখা টেনে মস্তিষ্কের ভেতরের ক্যান্সারদুষ্ট স্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলন

১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ই জুন কলিকাতার দক্ষিণী নামে রবীন্দ্র সঙ্গীত ...য়ের উদ্যোগে ভবানীপুর অঞ্চলে ...তোষ কলেজ হলে রবীন্দ্র সংগীত ...লন অনুষ্ঠিত হল। কলিকাতা ও ...নিকেতনের বহু শিল্পী এই সম্মেলনে ... দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সাধ্যমত গান ... অনুষ্ঠানের সফলতায় সাহায্য ...ছিলেন।

...রূপ সম্মেলন বাঙলাদেশে, বাঙলা ...র দিক থেকে সত্যই অভিনব। এর ... করে উদ্যোক্তারা যে সাহসের ... দিয়েছেন তার জন্যে প্রশংসা না ...পারা যায় না। এ সম্মেলন এইবারেই ... এর সূত্রপাত হয়েছিল তিন বৎসর ... এইবারেরটি হল তার দ্বিতীয় ...শন।

...দেশে বহু বৎসর ধরে উচ্চাঙ্গ ... সংগীতে কয়েকটি সম্মেলন হয়ে ... কিন্তু একমাত্র বাঙলা ভাষার গান নিয়ে আজ পর্যন্ত একটিও সম্মেলন দেশে হয় নি, তার চেষ্টাও হয়েছিল বলে শুনি নি। সুতরাং বাঙলা গানের দিক থেকে একমাত্র রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়েই চার দিন-ব্যাপী সম্মেলনে পাঁচটি অধিবেশনের আয়োজন করে 'দক্ষিণী' বাঙলাদেশের সংগীত ইতিহাসে যে একটি বিশেষ স্থান লাভ করলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আর এও বলা চলে, বাঙালীকে দক্ষিণী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, সাহস উদ্যম ও শ্রদ্ধা থাকলে নিজ ভাষার সংগীত নিয়েও এই ধরণের সম্মেলনের আয়োজন করা সম্ভব। কেবল উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীত ছাড়া সংগীত সম্মেলন হতে পারে না এরকম যারা মনে করতেন, দক্ষিণীর উদ্যোক্তারা এই সম্মেলন করে তাদের একটি ভাল রকমের শিক্ষা দিলেন। গানে বাঙালীর নিজেকে ছোট করে দেখার মনোভাবের প্রতিবাদ এই অনুষ্ঠানের দ্বারা করা হলো বলেই আমরা মনে করি। আমরা আশা করি 'দক্ষিণী'র উদাহরণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী এমন একটি সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করবে যেখানে বাংলাভাষার উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত থেকে শুরু করে পল্লীর সহজ সরল, সুরের ও কথার গানও তাতে স্থান পাবে। যদি এখনো সে প্রেরণা না জেগে থাকে তবে তা বাঙলা দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয় বলেই আমরা মনে করব।

রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রকৃতির গান শোনান হয়েছিল। সংগীত সহযোগে আলোচনা করেছিলেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ। যথাক্রমে বিষয়গুলি ছিল 'ভাঙ্গা-সুরের গান,' 'রবীন্দ্র-সংগীতে ভৈরবী,' 'রবীন্দ্রগীতির কাব্যধর্ম' ও 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছন্দ-বৈচিত্র্য'। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী বিলিতি গান, প্রাচীন বাঙলা গান, গুজরাতি, মারাঠি, মহীশূরী ইত্যাদি নানাপ্রকার গানের ভাষান্তরের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সে যে সব গান রচনা করেছিলেন তার নমুনা হিসেবে মূল গান ও সেই সঙ্গে বাঙলা গানটি কি সেই তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন। গানগুলি গাইবার ভার নিয়ে ছিলেন দক্ষিণীর শিল্পিবৃন্দ, অনেকগুলি মূল গান গাইলেন শ্রীমতী সুপূর্ণা ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায় ও শ্রীযুক্ত সমরেশ চৌধুরী। উচ্চাঙ্গের হিন্দী

রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের দ্বিতীয় ত্রৈবার্ষিক অধিবেশনে বিশিষ্ট শিল্পীসমাবেশ।

ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা ও ঠুংরী ভাঙ্গা গান নিয়েও আলোচনা হয়েছিলো এবং গান-গুলি গাওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আলোচনাটিতেও যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পেয়েছিলেন সঙ্গীত অনুরাগীরা। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল যে, উচ্চাঙ্গের হিন্দী সঙ্গীতের খেয়ালে ভৈরবীর স্থান নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথের ভৈরবীতেও তার প্রভাব পড়েছে। তিনিও খেয়াল অঙ্গের ভৈরবী রচনা করেন নি। এছাড়া উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে ভৈরবীতে শুদ্ধ ও কোমল নানাসুরের খেলা যেভাবে চলে রবীন্দ্রনাথেও তার নমুনা মিলবে। হিন্দী গানে সময়ের নির্দেশকে একান্ত করে না মেনে ভাবের টানে যে কোন সময়ে ওস্তাদরা যেমন ভৈরবী গেয়ে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের ভৈরবী রাগিণীর গানেও সেই রকম সময়ের নির্দেশ সবক্ষেত্রে মানা হয় নি। এই আলোচনার সময়কার গানগুলি পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত দেবব্রত বিশ্বাস ও তাঁর ছাত্রীবৃন্দ। গানগুলি নির্বাচন ও পরিবেশনের কৃতিত্বে সকলেই আনন্দ পান।

শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন রায় আলোচনা করে-ছিলেন গানের কাব্য নিয়ে। তিনি লিরিক কবিতার দিক থেকে গানের বৈচিত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বর উপরেই বিশেষ জোর দেন। গানগুলি পরিবেষণ করেন শ্রীযুক্ত সমরেশ চৌধুরী ও তাঁর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। গানগুলি সুগীত হয়েছিল বলা চলে।

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ ছন্দ বৈচিত্র্যবিষয়ে আলোচনা কালে বলেন কাব্যরসিকরা গানের গীতছন্দ ও পঠিত ছন্দকে এক ভেবে নেন ও সেই ভাবেই আলোচনা করেন। গানের ক্ষেত্রে এ নিয়ম সর্বত্র খাটে না। এর দ্বারা ভ্রান্তি ঘটে। কারণ গানের গীতছন্দ ও পঠিতছন্দ সাধারণত এক হয় না। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজে চেষ্টা করেছিলেন অনেক গানে গীতছন্দ ও পঠিতছন্দকে এক নিয়মে রাখতে। এবং এই চেষ্টার ফলস্বরূপ বাঙলা গানে তিনি কিছু নতুন তালের প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ সেই সব ছন্দ শ্রীশান্তিদেব নানাভাবে নিজে গেয়ে শোনান। শ্রীযুক্ত ঘোষ বলেন, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নতুন তাল বা ছন্দ তিনি একটি গানেই মাত্র ব্যবহার করেছিলেন, পরীক্ষা হিসেবে ভবিষ্যতের গীতকাররা ঐ সব তালকে সহজ করে নিতে পারবেন তাদের গানে। দক্ষিণীর গায়ক দল কিছু গান গেয়ে শ্রীযুক্ত ঘোষকে সাহায্য করে-ছিলেন।

সব সমেত প্রায় ১৬টি বিভাগে রবীন্দ্র-নাথের গানগুলিকে ভাগ করে গেয়ে শোনান হল। ভাঙ্গা সুরের গান, প্রেম-সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীতে ভৈরবী, শিশু সঙ্গীত, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, ঋতু-সঙ্গীত, ছন্দ-বৈচিত্র্য, ধ্রুপদ ও ধামার, লোক-সঙ্গীত, উদ্দীপনার গান, রাগ-সঙ্গীত, হাস্যরসাত্মকগান, টপ্পাগান, ধর্ম-সঙ্গীত, প্রাচীন ঢংএর গান। আর ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত সুরের কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র।

এই বিভাগ বিষয়ে আমাদের কিছু বল-বার আছে। কখনো দেখা যাচ্ছে ভাগগুলি করা হচ্ছে গানের ভাবকে অবলম্বন করে, আবার কখনো করা হচ্ছে গীতপদ্ধতিকে নির্ভর করে। এর দ্বারা আমাদের মত সাধারণ শ্রোতাদের মনে কোথাও কোথাও বেশ খট্‌কা লেগেছিল। আমাদের মনে হয় কেবল-মাত্র ভাবকে অবলম্বন করে এই বিভাগের প্রাধান্য দিয়ে তার সঙ্গে বিভিন্ন গীতপদ্ধতিকে স্থান দিলে পারতেন। যে সঙ্গীতের যে বৈশিষ্ট্য তাকে সেইভাবে দেখতে হবে। ভাব প্রধান রবীন্দ্র সঙ্গীতে গীতপদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া ঠিক কিনা পরিচালকদের ভেবে দেখতে বলি। উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানে গীতপদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকলেও বাঙলা গানে তাকে অনুসরণ করা ঠিক নয়। গানকে ভাগ করবার ধারাটি দেখে মনে হয়েছে উদ্যোক্তারা কোনটিকে ধরবেন ঠিক না করতে পেরে উভয়কে জড়িয়ে দিয়ে-ছেন। তাতে করে দেখা গেছে একই পদ্ধতির গান ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন নামে গাওয়া হল।

চতুর্থ অধিবেশনে সন্ধ্যায় 'লোকসঙ্গীত' পর্যায় 'ঝুমুর' নামে রবীন্দ্রনাথের যে গানটি গাওয়ানো হল সেটিকে যে কেন 'ঝুমুর' বলা হল তা আমরা ধরতে পারি নি। প্রচলিত 'ঝুমুর' গান বিশেষ এক শ্রেণীর প্রেমের গান হিসেবেই বাঙলাদেশে প্রচলিত। পূর্বে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয় নিয়েই বেশী গান রচিত হত, নানাপ্রকার মানবিক প্রেমের গানও আজকাল যথেষ্ট পাওয়া যায়। এবং এর একপ্রকার নাচুনে ছন্দ আছে যেটি ঐ গানের সঙ্গে নাচের জন্যেই বোধহয় যুক্ত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'ওরে বকুল পারুল শাল পিয়ালের বন' গানটিকে যদি ছন্দের জন্যে ঝুমুর বলা হয়ে থাকে তাহলে রবীন্দ্রনাথের তিনমাত্রিক দ্রুতছন্দের যাবতীয় গানকেই 'ঝুমুর' বলতে হয়। আর এক দিনের অধিবেশনে শুনলাম উদ্যোক্তারা 'খর বায়ু বয় বেগে' গানটিকে বললেন সারী গান। এখানে আমরা অনু-মান করছি নৌকার দাঁড়টানার 'হাইমারো মারো টান হাইয়ো' কথাগুলির জন্যেই বোধহয় তারা এটিকে সারী গান বলতে চান। যদি তাই হয়, তাহলে এই গানটির বেলায় দেখছি ভাবকেই গ্রহণ করে শ্রেণী ভাগের চেষ্টা হল। সারী গানের অন্যান্য দিকটিকে আর বিচারের মধ্যে আনা হল না। 'প্রাচীন ঢংএর গান' নাম দিয়ে গাওয়ানো হল যে গানটিকে সে গানের সঙ্গে ঐ নামের কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হল না। ঐ নামের মধ্যে ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা নানাপ্রকার বাঙলা ভাষার লোকসঙ্গীতকে ফেলা চলে। 'রাগসঙ্গীত' নামের ম[illegible] 'ধ্রুপদ ও ধামার' বা 'টপ্পা গানকে [illegible] ফেলা যায় না? এ তিনটি ভিন্ন নামে সার্থকতা আছে কি? রবীন্দ্রনাথের প্র[illegible] সব রকমের হিন্দীভাঙ্গা গানই [illegible] উপাসনার উদ্দেশ্যে রচিত গান। সে গান-গুলির মধ্যে বেশীর ভাগই হল ধ্রুপ[illegible] ধামার, খ্যাল, টপ্পা ও ভজন গানের অনু-সরণে রচিত। অথচ ধর্মসঙ্গীতের [illegible] ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা অঙ্গের উপাসনার গা[illegible] অনেকগুলি ছিল। এদিকে ধ্রুপদ, ধাম[illegible] টপ্পা ইত্যাদি নাম দিয়ে আলাদা যে গুলি গাওয়ানো হয়েছিলো সেগুলির সবই ছিল ধর্মসঙ্গীত।

এই সম্মেলন নানাভাবে আমাদের [illegible] দিয়েছে একথা আমরা বিনাদ্বিধায় [illegible] পারি। বহু বিচিত্র কণ্ঠের গায়ক গা[illegible] গানের সঙ্গে পরিচিত হলাম। এক[illegible] সকলের গান শোনার দ্বারা শিল্পীদের [illegible] ভালমন্দ বিচারের সুযোগ আমাদের [illegible] ভাবেই হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈচি[illegible] একটা সুষ্ঠু পরিচয় এই সম্মেলনে পা[illegible] গেল। সাফল্যের দিক নিয়ে বিস্তারিত খুঁটিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই মনে [illegible] সেদিকে আমরা আর কিছু বলবো না। [illegible] সামান্য কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ কর[illegible] এই ত্রুটিগুলিকে আলাদা করে বলছি [illegible] পাঠকরা মনে করবেন না যে, এই[illegible]

সম্মেলনে খুব প্রাধান্য পেয়েছিল। তা মোটেই নয়। এই চারদিনের সম্মেলনের সাফল্যের সঙ্গে তুলনায় এর কোন স্থান নেই বললেই চলে। তবুও উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটুকুও যদি ভবিষ্যতের সম্মেলনের সময় দূর হয় তাহলে সম্মেলন সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে।

এবারে শিল্পীসমাবেশের চেয়ে গতবারের সমাবেশ আরো বেশী হয়েছিল বলে আমাদের মনে হয়। এবারে অনেকে বাদ পড়লেন কেন? এবারে কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলো না বলেই মনে হল। এরই বা কারণ কী? এবিষয়ে উদ্যোক্তাদের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী বলে আমরা মনে করি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে এই রকম সম্মেলনে যোগ দেয় সে রকমের পরিবেশ উদ্যোক্তাদেরই চেষ্টা করে করতে হবে। কলিকাতা অঞ্চলে বহু সংগীত বিদ্যালয়ে আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রসংগীতে সেই সব বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রছাত্রীকে এই সম্মেলনে পাঠাবার জন্যে আমন্ত্রণ করা যেতে পারতো।

রবীন্দ্রনাথের কোন প্রকার গীতনাট্য এবারে উদ্যোক্তারা পরিবেশন করতে পারেন নি। এদিকটিও রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি বড় দিক। কেবল গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা উচিত ছিল। এছাড়া কলিকাতার যে সব সংগীত ও নৃত্য বিদ্যালয়ে নাচ শেখানো হয় সেই সব বিদ্যালয়কে অনুরোধ করলে পারতেন রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নাচতে পারে এই রকম একটি করে ছাত্র বা ছাত্রী এই সম্মেলনে পাঠাতে।

সম্মেলনের গানের সময় যাঁরা যন্ত্রসঙ্গীতে সহায়তা করেছিলেন, তাঁরা সকলেই নামী বাজিয়ে। সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে যন্ত্রে সঙ্গত করবার সুবিধা পায় ভবিষ্যতে সে চেষ্টা উদ্যোক্তারা করুন এই আমাদের ইচ্ছা।

প্রায় সব গানের সঙ্গেই তবলা, পাখোয়াজ বা খোল বাজানোর ব্যবস্থা ছিল। যেমন ধ্রুপদে ও ধামারে বেজেছে পাখোয়াজ; খেয়ালে বেজেছে তবলা; হাল্কা ও দ্রুত তালের গানে বেজেছে তবলা ও খোল। কিন্তু 'টপ্পা গানে' আসরে তবলা একেবারেই ব্যবহার করা হল না। কেবল টপ্পার বেলায় এইরূপ তারতম্য করার কারণ বোঝা যায় না। টপ্পার তালে গানগুলি গাইলে গায়ক গায়িকাদের টপ্পা গানের সর্বাঙ্গীণ ক্ষমতার পরিচয় বোঝা যেতো। টপ্পা গানের লয় নিয়েও আমাদের কিছু বলবার আছে। এই ঢংএর গানের লয় নিয়ে গায়ক গায়িকাদের একটু চিন্তা করা দরকার। একমাত্র 'এ পরবাসে' গানটির গাইবার লয় আমাদের কাছে ঠিক বলে মনে হল। অন্যরা অনাবশ্যক বেশী ঢিমালয়ে গেয়েছেন বলেই বার বার মনে হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সম্মেলনে গীত রবীন্দ্রনাথের গানের লয় নিয়েও কিছু বলতে চাই। এই সঙ্গীতের কোন গানের লয় কি রকমের হবে এবিষয়ে প্রত্যেক শিল্পীর ভাবা উচিত। সম্মেলনে লক্ষ্য করলাম কোন কোন শিল্পীর স্বভাব সব গানকেই বেশী ঢিমালয়ে গাওয়া। কোনটা মধ্য লয়ে, কোনটা ঢিমালয়ে, কোনটা দ্রুত লয়ে গাইলেও গানের স্বরূপ প্রকাশ পায়, এ বোধটির অভাব অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। সুন্দর মিষ্টি সুরেলা গলার গানও এই বোধটির অভাবে প্রাণহীন মনে হয়েছে। উচ্চারণের অস্পষ্টতায় অনেককে দোষী করা যায়। তার মধ্যে ভাল গাইয়ে ও অপেক্ষাকৃত মন্দ গাইয়ে উভয়েই আছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সুরের বেদমন্ত্রগুলি গাইবার কথা সম্মেলনে। কিন্তু সংগচ্ছধ্বম্ মন্ত্রটিকে কেন গাওয়ানো হল তা বুঝলাম না। যে সুরে উদ্যোক্তারা গাওয়ালেন সে সুরটি রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সুর নয় বলেই আমরা শুনলাম। মন্ত্রের সুর ও স্বরস্বন্ধি যোজনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়া 'সরলা দেবী। রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সুরটি নাকি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস।

সবশেষে দক্ষিণীর অনুষ্ঠানপত্রের একটি মারাত্মক ত্রুটির কথা উল্লেখ করে আমাদের বক্তব্য শেষ করবো।

সেবা মিত্রের মৃত্যুতে নৃত্যপ্রিয় দেশবাসী সকলেই মর্মাহত। নৃত্যশিল্পী হিসেবে স্বাভাবিক ক্ষমতার পথে যখন সবেমাত্র তিনি পা বাড়িয়েছেন এই সময় তাঁর জীবন-লীলা সাঙ্গ হল। দক্ষিণীর পক্ষে এই ক্ষতি অপূরণীয়। কার্যসূচীর মুখবন্ধে তাঁর ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি বলে যে কথা কটি বসানো হয়েছে আমাদের মনে হয় তাতে কোন ভ্রান্তি ঘটেছে। আমরা সংবাদ নিয়ে জানলাম; রবীন্দ্রনাথ 'সেবা মিত্রের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের অভিনয় দেখে যেতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পরে 'সেবা মিত্র প্রথম 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে শ্যামার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁর কৃতিত্বে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন।

আমরা দক্ষিণীর উদ্যম, উৎসাহকে পুনরায় অভিবাদন জানাই। তাঁদের কাছ থেকে বাঙ্গালী এ ধরণের কাজে প্রেরণা লাভ করুক এবং বাঙলা গানের বৃহত্তর সম্মেলনের আয়োজন করুক এই আমরা দেখতে চাই।

জল জঙ্গল

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

(২২)

কাচিপাতা নদীর একটা মুখ সর্বনাশী। এর দহে পড়ে কত যে ভরাডুবি হয়েছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। বাদাবনে নবীন আগন্তুক নদীর এই অদ্ভুত নামে অবাক হয়। পণ্ডিতজনে ঘাড় নেড়ে মন্তব্য করবেন, পাড় ভেঙে তছনছ করত বোধ হয়—তাই কীর্তিনাশার সমগোত্রীয় নাম।

সর্বনাশীর কাহিনী শুনবার পর দুকোড়িই কতজনের সঙ্গে আবার সেই গল্প করেছে। বাদাবনের অন্ধি-সন্ধি নিয়ে এমনি কত গল্প মাঝিদের মুখে মুখে চলে! আগে যে দুকোড়ি কেন শোনে নি, সেইটেই আশ্চর্য।

একদা বসতি ছিল এই সমস্ত নদীর কূল ঘিরে—জঙ্গলের চিহ্ন মাত্র ছিল না। জমি উঁচু ছিল—জোয়ারের সময় জলতলে ডুবে থাকত না এখনকার মতো। লোকের পেটে অন্ন, মনে সুখ ছিল। পালপার্বন ফুরাতো না বছরের মধ্যে কোন সময়।

তারপর লুঠেরার দল এসে পড়ল। এখনকার এই ধুমোকল নয়—পালের জাহাজ ভাসিয়ে তারা আসত। হার্মাদ বলত তাদের—পুরোপুরি মানুষ নয়, তামাটে গায়ের রং, তামাটে চুল-দাড়ি, দৈত্য-দানবের মতো চেহারা, বিচিত্র পোষাক, অবোধ্য কথাবার্তা। ঘাটে জাহাজ লাগিয়েই গুড়ুম-গুড়ুম বন্দুক ছাড়ত, আগুন বেরুত নলের মুখ দিয়ে। গরু-ছাগলের মতো মনে করত তারা মানুষকে, অকারণে কষ্ট দিত, মানুষ মেরে ফেলে হো-হো করে হাসত।

বাসিন্দারা যে ভীরু ছিল, তা নয়। কিন্তু ঢাল-সড়কি-লাঠির নাগালের মধ্যে না পেলে তারা কি করতে পারে? নিরাপদ ব্যবধানে থেকে কলের সাহায্যে মানুষ মারা—কাপুরুষতা ছাড়া, আর কি? সেই সেকালে ইন্দ্রজিতের লড়াইয়ের মতো। মরদ-জোয়ান হলে সামনাসামনি এসে দাঁড়াও—বোঝা যাবে তখন ক্ষমতা।

বছর বছর আসে হার্মাদরা। শেষাশেষি কামান নিয়ে আসতে লাগল। একবার এমনি হানা দিয়েছে কাচিপাতার তটবর্তী বিশাল এক গ্রামে। যেন সবুজ ভরা-ক্ষেতে দাঁতালের দল ঢুকে পড়েছে। বিকালবেলা থেকে তাণ্ডব চলেছে—দেড় প্রহর রাত্রি, এখনো তাদের কাজকর্ম সারা হল না। জাহাজ নিশ্চল অবস্থায় ঘাটে বাঁধা—রাতের মধ্যে ভাসানো সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। মালপত্র কিছু কিছু পাওয়া গেছে—সোনাদানা এবং দামী দামীগুলো জাহাজে তুলছে, ভেঙে তছনছ করে ছড়িয়ে দিয়েছে বাকি সমস্ত। কিন্তু মানুষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—পূর্বাহ্নে টের পেয়ে যেন কর্পূর হয়ে উবে গেছে। যা দু-একজন পাওয়া যায়, নিতান্ত অকেজো। অতি-বৃদ্ধ বা অত্যন্ত শিশু। এ আবর্জনা জাহাজ বোঝাই দিয়ে নিয়ে যাবে কোন লাভের আশায়? রাত বাড়ছে, আর ব্যর্থতার অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে লুঠেরারা। ঘর-কানাচ, গোলা, গোয়াল, বাগবাগিচা—সর্বত্র হানা দিয়ে ফিরছে। মানুষ চাই—শক্ত সমর্থ জোয়ান মানুষ। মেয়েমানুষ কমবয়সী।

এক বাড়ির চার ভাইকে পাওয়া গেল দৈবক্রমে। খাঁড়ির মধ্যে বহুদূরব্যাপী হোগলাবন—তারই মধ্যে নৌকো ঢুকিয়ে চুপচাপ তারা বসেছিল। শেষরাত্রির দিকে ক্লান্তিতে হার্মাদদের আক্রোশ ঝিমিয়ে পড়বে, সেই সময়ে বোধ করি নিঃশব্দে সরে পড়ার মতলব। ধরা পড়ার কথা নয়—কিন্তু নড়াচড়ার দরুন সেই জায়গায় হোগলার মাথা অল্প একটু নড়েছিল বুঝি—একজনের নজরে পড়ে গেল। তখন লম্বা তলতাবাঁশ এনে সেইখানে ঢুকিয়ে দিতে নৌকোয় ঠোক্কর লাগল।

ধরা পড়ল চার ভাই। বিস্তর জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে সঙ্গে নিয়েছিল, নামিয়ে আনল সমস্ত। বেটাছেলেদের পাওয়া গে[illegible]
কিন্তু বউগুলো কোথায়?

আরও রাত হল।

সহসা কাচিপাতার কূলে আপনি এ[illegible] হাজির হল ছোট বউটি। যে জায়গা[illegible] জাহাজ বেঁধেছে, সেখানে সিঁড়ির কাছে এ[illegible] দাঁড়াল। বিস্রস্ত চুল, কপালে বড় সিঁদু[illegible] ফোঁটা। মুখের অপরূপ গৌরাভা উত্তেজ[illegible] রক্তবর্ণ হয়েছে। বলে, তোমাদের কাপ্তে[illegible] কাছে যাবো।

লোকজন যেতে দিচ্ছে না। পাগল ব[illegible] ভেবেছে। তা ছাড়া আরও নিগূঢ় ম[illegible] আছে। কাপ্তেন সকল দিকে ভাগ্যবান—হলেও এমন কালো জিনিসটা অত উ[illegible] অবাধ যেতে দেবে না, নিচে [illegible] বাঁটোয়ারা করে নেবে। একঘেয়ে সমুদ্র[illegible] জীবনে নারীসঙ্গের জন্য লোলুপ সকলে[illegible] উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে দুঃসাহসিক [illegible] তরাজে আসে নারী ও সোনার [illegible] ক্ষুধা পরিতৃপ্তির পর নারী [illegible] দামেই বিক্রি করে দেয় বিদেশের বা[illegible] পুরুষলোকও বিক্রি হয়, কিন্তু ভাল [illegible] নারীর দামের সঙ্গে তুলনা হয় না।

বউ হুমকী দিয়ে ওঠে, পথ ছা[illegible] বলছি—

কামরায় বিশ্রাম করছেন কাপ্তেন [illegible] হবে না।

কথা মিথ্যা নয়। আলো নিভিয়ে [illegible] কেবিনের মধ্যে সাহেব অনেকক্ষণ চুপচা[illegible] আছে। নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়ে ডেকের উপর বেরিয়ে এল।

ক্রোধে ফেটে পড়ে বউটি।

বর্বর ইতরগুলো আমার স্বামী-ভাসুর-দের বেদম মারছে। তোমার কাছে নালিশ জানাতে এলাম সাহেব। তোমার লোকজন ফিরিয়ে আনো—এনে চাবকাও আচ্ছা করে। পিঠের ছাল তুলে দাও।

সাহেব পায়ে পায়ে অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। অপরূপ সুন্দরী মেয়ে! এ[illegible] লোনা অঞ্চলে গোলাপ ফুটবার জায়গা নয়—মেয়েটি এদিককার নয়ও, ভূষণা থেকে তাকে বিয়ে করে এনেছে বছর চার-পাঁচ। চালচলন ও কথাবার্তায় যেন বিদ্যুতের ঝিলিক হানে মেয়েটা।

টলতে টলতে কাপ্তেন দ্রুত নেমে আসছে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। তখন সম্বিত হ[illegible]

বউটার। এ কি করেছে—হিতাহিত না ভেবে স্বামী-ভাসুরদের বাঁচাবার আগ্রহে এ কোন মাতাল, ক্ষুধার্ত জানোয়ারের সামনে এসে পড়েছে?

পালাল বউটি। ভারী বুটের আওয়াজ তুলে সাহেবও ছুটছে পিছু পিছু। পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি—দড়াম করে সদর-দরজা খুলে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বউটা বারান্ডায় উঠল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল মুহূর্তকাল। দেখছে। দরদর রক্ত পড়ছে চার ভাইয়ের হাতের আঙুল বেয়ে। আহা-হা করেছে কি দেখ! বাঁ-হাতের পাতা ছেঁদা করেছে চারজনেরই—বেতের ছোটা হাতের ছিদ্রে ঢুকিয়ে দিয়ে চারখানা হাত এক-সঙ্গে বেঁধেছে। আপাতত থাকুক এমনি। পালাবার সম্ভাবনা নেই এই রকম হালি-বাঁধা অবস্থায়। এ অঞ্চলের লোকে ভেটকি-ভাঙন মাছ মেরে কানকোর ভিতর দিয়ে দড়ি পরিয়ে এই রকম একত্র ফেলে রেখে দেয়।

ওরা থাকুকগে পড়ে, বউটির দিকে নজর একাগ্র নজর। কিন্তু কাপ্তেন পিছপিছ উঠানে এসে ভেস্তে দিল। হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল সমান।

দশ বারো জনে তন্ন-তন্ন করে খুঁজছে। খোঁজ পায় না। কাপ্তেন হুকুম দেয়, বেরোবার যতগুলো দরজা আছে, সমস্ত আগলে থাকো। কত ঘণ্টা অথবা কদিন লুকিয়ে থাকতে পারে, দেখা যাক্।

বেশি দেরি হল না, বউ নিজেই বেরিয়ে এল ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই মুখে—সেজে নিয়েছে ইতোমধ্যে। সরু বেতের কাজ-করা শীতলপাটি এনে সযত্নে পেতে দিল।

বসুন—

পুষ্পের মধ্যে বউটার নাম উল্লেখ করে না। নাম আন্দাজ করতে নগরবাসী ভাই? মধুসূদনের—কেন না, একটা নাম দিতে ইচ্ছে করে—লীলা অথবা বিজলীলতা। স্বামী ও সুরেরা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, বিজলীলতা সে তাকাল না একবার। মধুর মাদক হাসি লীলায়িত ভঙ্গিতে আহ্বান করে, —দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আপনারা এসে পাটির 'পর।

কথা হয়তো বুঝছে না—তেরে ইশারায় তাই দেখিয়ে দেয়। কাপ্তেন ও সেই দশ-বারোজন একপা দু-পা করে এগিয়ে এলো অলক্ষ্য আকর্ষণে। অপ্রতিভ ভাব লোকগুলোর—এতক্ষণ এখানে যে ব্যবহার করছিল তার-জন্য লজ্জা বোধ করছে বিজলীলতার সামনে। তারা কি করেছে—আর মেয়েটা কেমন করছে। আগের সমস্ত ব্যাপার চাপা পড়ে গেলে যেন বাঁচে।

বিজলীলতাও যেন কিছু জানে না, সে দেখেও দেখছে না। কতক মুখে কতক বা আকারে ইঙ্গিতে জানাল, পরম বাধিত হয়েছে সে এই সব বিদেশী অতিথিদের বাড়ির উপর পেয়ে।

কাপ্তেন লোকজনদের বাইরে যাবার হুকুম দিল। ঘাড় নেড়ে বিজলীলতা প্রতিবাদ করে, না-না—যাবে কেন? সবাই এ বাড়ির অতিথি। কত হাঙ্গামা-হুজ্জুত করে বেড়াচ্ছ তোমরা এই রাতদুপুর অবধি, কত কষ্ট হয়েছে! ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয় খুব।......পরমান্ন খাবে সাহেব? খেতেই হবে। নতুন খেজুরগুড় দিয়ে রান্না করব কি রকম বাস বেরুবে দেখতে পাবে।

সাহেব আর পারে না—ধৈর্য হারিয়ে খপ করে তার হাত এঁটে ধরল। হাসতে হাসতে হাত ছাড়িয়ে বিজলীলতা লঘুপক্ষ পাখীর মতো রান্নাঘরে ঢুকল। বারান্ডার প্রান্ত থেকে স্বামী ও ভাসুরেরা রক্তচক্ষে তার রকম-সকম দেখছে। হাত বাঁধা—কি করবে? নইলে মেলতুক ধরে এক কোপে বলি দিত স্বৈরিণী বউকে। প্রাণটাই কি এমন বড় হল?

রান্নাঘরের ভিতর এতক্ষণ ধরে কি রাঁধছে, কে জানে? সাহেব ইতোমধ্যে আরও কিছু রসদ আনিয়ে নিয়েছে জাহাজ থেকে। টইটম্বুর অবস্থা। আর সবুর সইছে না। চোখ লাল, মুখে বীভৎস উগ্র গন্ধ—চলল সে রান্নাঘরের দিকে। আগে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। চুপ করে ছিল বিজলীলতা। চুল্লি দাউ-দাউ করে জ্বলছে। পরমান্ন ফুটছে টগবগ করে, সুগন্ধ বেরিয়েছে। পাঁজাকোলা করে তুলে রান্নাঘর থেকে তাকে বড়-ঘরে নিয়ে আসে সাহেব।

হাত-পা ছুঁড়ছে বিজলীলতা।

আঃ, কি করো? দেখতে পাচ্ছো না ঐ যে—

ইশারায় দেখিয়ে দেয়। সাহেবের হুঁশ হল, বারান্ডায় চার ভাই ওরা দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। একবার দুরন্ত ইচ্ছাও জাগে, দেখুক ওরা—স্বামী ও ভাসুরদের চোখের উপরেই যা ঘটবার ঘটুক সমস্ত। কিন্তু বিজলীলতার দিকে তাকিয়ে মুষড়ে পড়ে। সাহস হয় না বেশি পশুত্ব প্রকাশের।

উঠানের পাশে গাঁদা-দোপাটি-জুঁই ফুলের বাগান। আজকের এত বুটজুতোর দাপাদাপিতে ফুল-বাগান বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। চার ভাইকে টেনে তুলে সাহেব এক-রকম ছুঁড়েই দিল উঠানে। ঘড়াং-করে ঘরের দরজা দিতে যায়।

বিজলীলতা হেসে বলে, আগে খেয়ে নাও—তার পর। এত কষ্ট করে রাঁধাবাড়া করলাম।

কাপ্তেন খেল না। খাবার অবস্থা ছিল না তার। তা ছাড়া বিষ-টিস মিশিয়ে দিতে পারে, এ সন্দেহও আছে। নেশা হলেও আখেরের বুদ্ধিটুকু লোপ পায় নি। আর সবাই গোগ্রাসে গিলছে সারবন্দি পাতা পেতে বসে। এমন চমৎকার খাওয়া অনেক-কাল ভাগ্যে জোটে নি।

এবারে এসো বিবি—

আর একটু। একটুখানি ছুটি দাও—পরনের কাপড় দেখিয়ে বউটি বুঝিয়ে দেয়, রান্নাঘরের কালিঝুলি মেখে গেছে—সরম লাগছে সাহেব, কাপড়টা বদলে আসি।

সবুর সহ্য হচ্ছে না কাপ্তেনের। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—পথ কিছুতে ছাড়বে না। কিন্তু ছোট্ট পাখীর মতো সাহেবের আট-কানো হাতের নিচে দিয়ে হাসতে হাসতে পালাল বিজলীলতা। সাহেব গিয়ে দেখল, দাওয়ার পাশে ছোট্ট খোপটায় ঢুকে পড়ে সত্যিই সে কাপড় বদলাচ্ছে। সে দিকে মুখ বাড়াতে বিজলীলতা লাবণ্যময় দুটো আঙুল তুলে বলে, এই...এইও—

ঢুকতে পারে না সাহেব। বাইরে দাঁড়িয়ে লোলুপ চোখে অসম্ভৃতবেশার রূপ দেখছে।

বিজলীলতা দেখে খিল-খিল করে হেসে তাড়া দেয়, সরে যাও বলছি—

বেশ কিছুক্ষণ কাটল। সাহেব আবার উঁকি দিয়ে দেখে। নেই তো! কি সর্বনাশ, পালিয়ে গেছে ওদিককার দরজা দিয়ে। কিন্তু যাবে কোথায়? রাগে রাগে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—বিজলীলতা পিছন দিক দিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখল।

কি ব্যস্ত মানুষ গো! সিন্দুর পরতে গিয়েছিলাম। আর দেরি নয়, ঘরে চলো—

অপরূপ সেজেছে। লাল টকটকে শাড়ি পরনে, সমস্ত কপাল ভরে বিশাল গোলাকার সিন্দুরের ফোঁটা। কাপ্তেনের হাত ধরে টেনে অধীর কণ্ঠে সে-ই বলে, চলো—

খিল এ'টে দিল দরজায়। বর ও ভাসুরেরা উঠান থেকে দেখে দাঁত কড়মড় করছে। আর ওঘরে হৈ-হল্লা করে ভোজ খাচ্ছে লুঠেরা অতিথির দল। কালামুখী সকলের চোখের উপর দরজা এ'টে দিল দলপতিকে নিয়ে। দরজা বন্ধ করল তবু রক্ষা। খোলা থাকলে দেখা যেত, সাহেবের কণ্ঠলগ্ন হয়েছে বউটা। আনন্দে কিংবা বেদনায় আঃ—আঃ—করছে সাহেব। জাপটে ধরেছে বিজলীলতা।

দেরি হয়ে গেছে—না? আর দেরি নেই। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। না, দেরি নেই আর। ধোঁয়াচ্ছে। কাপ্তেন তখন শয্যার উপর। বিজলীলতার নিজের হাতে রচিত কত সাধ আর কত স্বপ্নে মণ্ডিত শয্যা! সুরামত্ত সাহেব আবেশে চোখ বুজেছে।

দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল শুকনো ঘরের চালে বাঁশের বেড়ায়। আগুনের তাপে সাহেবের নেশা কাটল।

এ কি!

চারি দিকে একসঙ্গে আগুন লেগেছে—পালাবার ফাঁক নেই। জ্বলন্ত চালের খানিকটা ভেঙে পড়ল সামনে। কঠিন বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছে সাহেব। সাধ্য কি, বিজলীলতার বাহুবেষ্টন ছাড়িয়ে বেরুবে! সোনার বরণ এক নাগিনী শত পাকে বেঁধেছে যেন তাকে।

আগুন দেখতে দেখতে গ্রামব্যাপ্ত হল। আগুন বিজলীলতার—হার্মাদরা দেয় নি। পুড়ে মরল কাপ্তেন। ভোজের আসরেও মারা পড়েছিল প্রায় সবাই। উঠানের চার ভাইয়ের খবর কেউ বলতে পারে না। হয়তো মারা গিয়েছিল তারাও আগুনে পুড়ে। কিংবা পালিয়ে ছিল এই সুযোগে। এমনও হতে পারে, জাহাজ বোঝাই করে দূরদেশে নিয়ে তাদের বেচে দিয়েছিল হার্মাদরা।

বাসুকী ক্ষেপে উঠলেন এর পর। এত অন্যায়ের ভার সইতে পারেন তিনি? শোনা যায়, ঘন ঘন কাঁপতে লাগল সারা অঞ্চল, কামান-নির্ঘোষ হতে লাগল জলতলে। কাচিপাতা উচ্ছ্বসিত হয়ে সমৃদ্ধিবান আনন্দোচ্ছল বিশাল জনপদের জল-সমাধি রচনা করল।

গুম-গুম-গুম—বর্ষায় এখনো কামানের মতো আওয়াজ পাওয়া যায় সাগরতলে। লোকে বলাবলি করে, দূর লঙ্কাদ্বীপে ঘড়াং-ঘড়াং করে রাবণ রাজার প্রাসাদ-তোরণ বন্ধ করছে। আওয়াজের বিলাতি নাম হয়েছে বরিশাল-গান। দুকড়ি সাবধান করে দেয় মধুসূদনকে, জঙ্গল হয়ে আছে বাবুমশায়, সর্বরক্ষা। তাই আর নতুন করে তেমন-কিছু প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটছে না। কিন্তু আপনি যে রকম বলেন—সব জঙ্গল শেষ করে যদি আবাদ বসাতে চান, আবার ও'রা ক্ষেপে উঠবেন। রাগ পড়ে নি এত কালের পরেও। সর্বনাশী বউটাও বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—নানান অবস্থায় নানাজনের কাছে দেখা দেয়।

রাতবিরেতে বাদাবনের নদীপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অবোধ আগন্তুকদের সে মোহগ্রস্ত

করে যেমন একদা জাহাজ থেকে টেনে নামিয়েছিল ফিরিঙ্গি কাপ্তেনকে। কপালে তেমনি ডগমগে লাল সিঁদুরের ফোঁটা, লেলিহ আগুনের রঙের শাড়ি পরনে। সেকালের খেলাঘরের গ্রামের মতো কাঁচা বাইন-খলসি-গরান-গর্জনের জঙ্গলে আগুন ধরানো যায় না তো —তাই ধাঁধা লাগিয়ে নৌকো সর্বনাশীর চোরাদহে এনে ফেলে। নিতান্ত বাপ-পিতামহের পুণ্যেবল ছিল—সেবারে তাই দুকুড়ি নৌকো নিয়ে কোন গতিকে বেঁচে এসেছিল সর্বনাশীর কবল থেকে।

ছোকরা মাঝিদের এবং কেতুচরণকেও দুকুড়ি কতবার সামাল করে দিয়েছে, রাত্রি-বেলা কদাপি যেন নৌকো না ছাড়ে। বেলা-বেলি ভাল জায়গা দেখে চাপান দেবে, যেখানে আর দু-দশখানা নৌকো বেঁধে আছে তারই মাঝখানে গিয়ে নোঙর ফেলবে। আর বাওয়ালিদের কাছে আগেভাগে ভাল করে জেনে নেবে, জায়গাটা গরম, অর্থাৎ ব্যাঘ্রসঙ্কুল কিনা।

আগে পিছে নৌকো—নিরাপদ মনে করে সেই বহরের সঙ্গে তোমার নৌকোও যাচ্ছে, চলতে চলতে রাত্রি হয়ে গেছে, খেয়াল করতে পারো নি—হঠাৎ এক সময় হয়তো দেখবে একটা নৌকোও নেই কোন দিকে, তুমি একা। মায়া-নৌকোর বহর সাজিয়ে ওঁরা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসেন খপ্পরের মধ্যে। সামাল ভাই, খুব সামাল।... হয়তো বা শুনতে পাবে, বনান্তরাল হতে অতি-পরিচিত কণ্ঠে কে তোমার নাম ধরে ডাকছে, কিংবা পরমাসুন্দরী কেউ নদী-কূলে দাঁড়িয়ে আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদছে। তুমি ভাণ কোরো, ঘুমিয়ে আছ—কোন-কিছুই দেখছ না, কিছুই কানে যাচ্ছে না তোমার। চোখের সামনে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যাক্ না—ভয়ে বা করুণায় নৌকো ছাড়বে না রাত্রি বেলা। উঁহু—কদাপি নয়।

(ক্রমশ)

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ ও আমরা

মহাশয়,—২৫শে জ্যৈষ্ঠ 'দেশে' প্রকাশিত প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও আমরা' প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যিকদের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে নিজের সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপন করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য—প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের রূপলাবণ্যমণ্ডিত ভাষাকে সহজতর ও সরলতর করিয়া সর্বজনবোধগম্য ও সর্বসাধারণের প্রাণের ভাষায় পরিণত করিতে হইবে—শুধু কাব্যে নয়, গদ্যে, নাটকে, উপন্যাসে ও গল্পে। লেখকের এই মতের সহিত কাহারও বোধ হয় কোন বিরোধ নাই। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ কবি। রবীন্দ্রকাব্য—গভীর সৌন্দর্যপিপাসু আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় ঋষিদের উত্তরসাধক দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সুগভীর অধ্যাত্মমানসের সমন্বিত রূপ। এত গভীর সৌন্দর্যানুভূতি ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কোন কবির মধ্যে দেখা যায় নাই। অথচ তাঁহার সমসাময়িক অনেক কবি রূপসৃষ্টি ও ভাবসৃষ্টির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে প্রতিভা সত্ত্বেও স্বকীয়তা হারাইয়া রবীন্দ্র সমসাময়িক অনেক কবির কাব্য শুধু ব্যর্থ ও নিষ্ফল অনুকরণে পর্যবসিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাষা ঋষিকবির অন্তরের সুগভীর অনুভূতির ছন্দিত রূপ। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের ছন্দঝংকার, শব্দচয়ন নৈপুণ্য সাধারণ পাঠককে অকস্মাৎ চমকিত করিলেও, তাহার অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্মগ্রহণ করিতে তাহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। এই কারণেই বোধ হয় রবীন্দ্রকাব্য পাঠ আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; রবীন্দ্রকাব্যের উপলব্ধি ও আস্বাদন তো আরো মুষ্টিমেয় বা শিক্ষিত ও রসিকজনের মধ্যে সীমায়িত। তাই লেখক বলিতে চাহিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট ভাষাকে যথাসম্ভব সহজ করিয়া লোকায়ত্ত করিতে হইবে, যাহাতে কাব্যের সঞ্জীবনী ধারা জাতির চিত্তে প্রসৃত হয়। যেমন হইয়াছিল বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রকাব্যের ভাষাকে অস্বীকৃতি জানাইয়া বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে যে একটা নূতন ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা না হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে ভাষাও লোকায়ত ভাষা নহে। ভাববৈচিত্র্য ও রূপ-প্রকাশের দিক দিয়া এই আধুনিক কাব্য অনেকাংশে আধুনিক ইংরাজী কাব্যের নিকট ঋণী।

তাহা হইলে এই লোকায়ত্ত কাব্যের রূপ কি হইবে? সে সম্বন্ধে লেখক তাঁহার সীমাবদ্ধ বক্তব্যে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই—বলা সম্ভবও নয়। শুধু এই শ্রেণীর কাব্য সম্পর্কে তিনি দুই-একটা ইঙ্গিত করিয়াছেন। যেমন—Ballad বা ছড়া জাতীয় কাব্যের সৃষ্টি। ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া এ জাতীয় কাব্যের আবেদন সহজেই জাতির চিত্তে পৌঁছায় নাই। দ্বিতীয়তঃ বলিয়াছেন, মজলিসী গান—যা একজনে গাইলে পাঁচজনে লুফে নেয়। বাস্তবিকই যদি সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত মন লইয়া জাতির সুখ-দুঃখ ও আনন্দবেদনার ভিত্তির উপর কেহ এই ছড়া ও মজলিসী গান রচনা করিতে পারিতেন তাহা হইলে জাতির উচ্চশিক্ষিত না হউক, গ্রামবাসী অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ এই ছড়া ও গান গাহিয়া আনন্দ পাইত সন্দেহ নাই। লেখক বলিয়াছেন, 'এর Possibility অনেকে জানেন না।' এ কথা ঠিক নয়। আসল কথা—'যা পোষাকী নয়, তাহার দিকে আমাদের মন যায় না।' বাস্তবিকই আধুনিক সাহিত্যের মোহে আমাদের মন এতটা সংস্কারাচ্ছন্ন যে, Intellectual সাহিত্য ছাড়া যে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য সাহিত্য রচিত হইতে পারে তাহার সম্ভাবনার কথা আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। লেখক সেইদিকে লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। অন্নদাশংকরবাবু শক্তিশালী লেখক। আমরা আশা করি অসীম সম্ভাবনাযুক্ত নবীন সাহিত্য রচনায় তিনি নিজেই অগ্রণী হইবেন। আরও একটি দিকে লেখক আধুনিক কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 'ক্ষণিকার' লঘুছন্দে লিখিত হাল্কা ভাবের কাব্য। এ ধরণের কাব্যেরও বর্তমানে অভাব। অবশ্য classic সাহিত্যের কথাও লেখক ভুলেন নাই। 'Classic হবার মত পুস্তকও রচনা করা দরকার; এ বিষয়েও আমরা বিশেষ কিছু করতে পারেনি।' এই কথার পর একটা কথা আমাদের মনে জাগে, কোন ধরণের সাহিত্য প্রচেষ্টার উপর লেখক জোর দিয়াছেন? হয়তো বা লঘুছন্দে লিখিত কাব্য ও ক্লাসিক সাহিত্য দুইয়েরই উপর—যদিও এ দু ধরণের সাহিত্য পরস্পর-বিরোধী। বক্তব্যটি আরো স্পষ্ট হইলে ভাল হইত।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক গদ্যের ভাষাও সর্বজন-বোধগম্য হয়, সে বিষয়েও লেখক ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাস্তবিকই গদ্য সর্বসাধারণের কাজের ভাষা। অতএব গদ্যরূপ সহজ, সরল ও সর্বজনবোধগম্য হয়—তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাব্যের মত গদ্যভঙ্গীতেও একটা তির্যক ভাব আনয়ন করাই যেন আধুনিক লেখকদের প্রচেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধেও লেখকদের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। লিখিতে গেলেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশটি সর্বক্ষণ মনে রাখা প্রয়োজন—'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের ও মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।' আজকাল গদ্য রচনার ক্ষেত্রে রাশি রাশি আগাছা দেখিয়া মনে হয়, লেখকেরা

সাহিত্যসৃষ্টির এই দুই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য সকল কাজের মত রচনাও যখন অর্থকরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সাহিত্য সৃষ্টির এই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা লেখকের মনে রাখা স্বাভাবিকও নয়।

তার পরে আসে নাটকের কথা। নাটক ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার বাস্তবরূপ। জাতির চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিতে সর্বজনবোধগম্য নাটকের প্রয়োজন অপরিহার্য। লেখক লিখিয়াছেন, সত্যিকারের ড্রামা লিখিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ছিল। রামায়ণ মহাভারতের ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া যুগান্তরকারী নাটক লেখা চলে রবীন্দ্রনাথের নাকি এই বিশ্বাস ছিল। সত্য কথা। কারণ, এই দুইখানি অবিস্মরণীয় মহাকাব্যের ভাববস্তু স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত জাতির চিত্তকে স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই দুইখানি মহাকাব্যের বিষয়বস্তু ছাড়াও আধুনিক জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা লইয়াও সার্থক নাটক রচনা চলে। তার জন্য চাই লেখকের সহানুভূতি, অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা—যা আমাদের অধিকাংশ লেখকের নাই। মোট কথা, নাটক লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতে হইবে। নগরবাসী শিক্ষিত সমাজের বাইরেও যে বৃহৎ বাঙালী সমাজ আছে, তাহাদের সুখ-দুঃখ, বিচিত্র বেদনা ও আশা আকাঙ্ক্ষার সংগে পরিচিত হইতে হইবে। তাহাদের জীবনেও যে রোমান্সের রঙ্ আছে তাহা জানিতে হইবে। শুধু নাটক নয়, আমাদের উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রকেও প্রসারিত করিতে হইবে। সর্বজনবোধগম্য ভাষায় তাহাদের রূপ দিতে হইবে—বিষয়বস্তু ও চরিত্রও গ্রহণ করিতে হইবে দেশের অগণিত জনসাধারণের মধ্য হইতে। তাহা হইলে উপন্যাস ও ছোট গল্পের দ্বারাও জাতির চিত্তে স্পন্দন সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্র পরবর্তী অনেক ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখক এ ধরণের রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কথা সাহিত্যের ধারাও এইদিকে প্রসারিত হইতেছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এ ধরণের রচনা গল্পও অকিঞ্চিৎকর তাহা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ যে মহাকাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই, সেজন্য দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই—কবির পক্ষেও না, আমাদের পক্ষেও না। কবির হাত হইতে আমরা যে মহামূল্য গীতিকাব্য পাইয়াছি তাহা শুধু আমাদের নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

সাহিত্যের আর একটি মূল উপাদানের প্রতি লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—সে হইল চরিত্র সৃষ্টি যা হয়ত ১০০।২০০।৫০০ বৎসর পর্যন্ত লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিবে। শুধু পাঁচশত বৎসর কেন? মানব জীবনের চিরন্তন রহস্যের অতলে প্রবেশ করিতে পারিলে এমন চরিত্র সৃষ্টি করা যায় যা নাকি চিরন্তনতার দাবী করিতে পারে—যেমন করিয়াছে Shakespear বা কালিদাসের সৃষ্ট চরিত্র কিংবা বাল্মীকি বা ব্যাসের সৃষ্ট চরিত্র। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তবের সমস্যায় আধুনিক সাহিত্যিকের মন এতটা বিব্রত যে তাহাতে চিরন্তন চরিত্র সৃষ্টি তাহাদের দ্বারা সম্ভব হইতেছে না। বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পটভূমিকায় মানবজীবন ও কাল-প্রবাহের অখণ্ডতা সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের দৃষ্টি দ্বিধাগ্রস্ত। সেইজন্য বর্তমান সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও চরিত্রসৃষ্টি সাময়িকতার লক্ষণাক্রান্ত। শুধু আমাদের দেশে নয়,—পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও। কালের গতি পরিবর্তনের সংগে সংগে সাহিত্যের গতিও পরিবর্তিত হইয়াছে—তার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। কালের সংস্কারমুক্ত যদি কোন সাহিত্যিক প্রতিভার আবির্ভাব হয়—তাহা হইলেই চিরন্তনতার চিহ্নাঙ্কিত চরিত্র ও সাহিত্য সৃষ্টি হইবে। চেষ্টা করিয়া চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ ও Shakespear কোন দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায় না।

বাঙলা সাহিত্যের Standard যে নামিয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত সত্য কথা। বাঙলা সাহিত্যের মান উন্নয়নের জন্য আমাদের সত্যিকারের কোন চেষ্টা নাই। সৃষ্টিমূলক উচ্চ-শ্রেণীর রচনা প্রতিভার অভাবে হয়ত সকল যুগে সম্ভব হয় না; কিন্তু সক্রিয় চেষ্টা থাকিলে চিন্তাশীল প্রবন্ধ, সমালোচনা ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা সাহিত্যের মান উন্নীত করা যাইতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধ সাহিত্যের তুলনায় বাঙলা সাহিত্যের এই সমস্ত বিভাগে রচনার দৈন্য ত বিখ্যাত। অন্নদা-শংকরবাবু এই দিকেও সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, দার্জিলিং।

একখানি ধুতি ও তিনগজ লংক্লথ

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

টুকরো আকাশ আর বেতসীর খণ্ডিত সুবাস,
কাঁচাগ্রাম—ভেলভেট-মখমলে সবুজে সবুজ,
করদ নদীর জলে বান আসে, ঢেউ তোলে সুর
সে যেন নতুন গান ষোড়শীর চঞ্চল যৌবনে—
স্বপ্নপায়ী ভ্রমরের অবারণ গুণ গুণ গুণঃ
ভিড় নেই, ব্যস্ত নয়, এমন সহজ পরিবেশে
ধরো যদি ধরা দেয় তোমার বুভুক্ষু কোনো মনে,
হাজার প্রত্যাশা শেষে ধরো যদি অত্যাশ্চর্য ফোটে—

আরো কিছু ধরা যাক। নিবিড় মেঘের রাতে ধরো যদি
তোমার দুর্লভ জন কাছে বসে রবিঠাকুরের
'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর' গায়
শতাব্দীর আশীর্বাদে সব যদি এক হয়ে দেখো
মন থেকে উড়ে যাবে। কাপড়ের কণ্ট্রোলে লাইন......
বস্ত্র তুলোর স্বপ্নে ভিজে মন থাকবে বিভোর।

বাসা

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

অগণিত অতিকায় প্রাসাদের সারি
আমাদের সেথা এক-কুঠুরীর ফ্ল্যাট;
একটি দরজা শুধুঃ ভেজানো কপাট
দুই হাতে রোখে ভিড়, বিশ্বস্ত প্রহরী।

আছাড়ি ফিরিয়া যায় নিঃশব্দ দেয়ালে
উত্তাল তরঙ্গ সম নগর-কল্লোল;
জানালাটি মেলে রাখে আকাশ নিটোল;
ঋতুরঙ, সূর্যস্বপ্ন, উড়ন্ত মরালে।

অরণ্যমর্মর ফুলবিতান-স্বপন—
একটি লতিকা বাড়ে, টবে আলিসায়ঃ
যুগল-ঈগল-নীড় শৈলচূড়ায়;
শঙ্খে যেন বন্দী রয় সাগর গর্জন।

পুস্তক পরিচয়

বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ, ঝঞ্ঝাট ও অযাচিত [উ]পদেশ—বিহার সাহিত্য ভবন হইতে [প্র]কাশিত। ২৫।২ মোহনবাগান রো।

বাঙলা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র [ম]হাশয় একটি সম্পূর্ণরূপে নূতন জিনিস [আ]নিয়া দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার আসন বঙ্গ-[সাহি]ত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে, [এ] বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। অখ্যাত [অজ্ঞা]ত নীরব ভারবাহী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছা-[পোষা] ভদ্রসন্তানকে মুখপাত্র করিয়া [বির]ূপাক্ষের মারফৎ তিনি আমাদের চলিষ্ণু [সমা]জের যে চলচ্চিত্র তাঁহার হাস্যরসোজ্জ্বল [তু]লির সাহায্যে উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের [সম্মু]খে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সত্য, সরস, [স্প]ষ্ট এবং অনসূয় এবং এই হেতু তাহাতে [স]ম্ভবত্ব আছে, তাহা শাশ্বত হইয়া থাকিবার [ব]স্তু।

[ক]য়দিন পূর্বে কলিকাতা শহর জুড়িয়া [কো]ন নাটকের বিজ্ঞাপনরূপে প্রাচীরগাত্রে এক-[খা]নি ব্যঙ্গচিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কথা [মনে] হইতেছে। কেরোসিন তেলের বাক্সের কাঠে [তৈ]রী একখানি পঙ্গু ভিক্ষুকদের উপযোগী [...] টানা গাড়ী, তাহাতে ঠেসাঠেসি করিয়া [ব]সিয়া আছে অবনতমুখী, অরক্ষণীয়া কন্যা, [সিগা]রেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়িতেছে এমন [...]মুখ, বয়াটে পুত্র, আকাশের দিকে দুই [হাত তু]লিয়া প্রায় নিরাভরণা পত্নী, সম্ভবতঃ [স্বা]মীকে গহনা দিতেছেন, না হয় পোড়াকপাল[ের] নিন্দা করিতেছেন। উপরন্তু কতকগুলি [...] শিশুও গাড়ীখানিতে রহিয়াছে এবং [...] প্রতিবাদেই এই ভারী গাড়ী ঝুঁকিয়া [...] দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছেন [...] চাদরে, বাঙালী ভদ্রসন্তান, পরনে [...]সের পোষাক, চাদর কষিয়া বুকে বাঁধা, [...] মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ী, মাথা দিয়া [...] পড়িতেছে All work and [no] play যাহার জীবনের শ্লোগান বা নারা [...]নাদ, জীবনের সবকিছু ঝকমারি, সমস্ত [...] যাহাকে পোহাইতে হয়, কাহারো সহানু-[ভূতি] যে পায় না, সেই নিপীড়িত, পিষ্ট, ক্লিষ্ট, [বা]ঙালী ভদ্রসন্তানের মুখে ভাষা [দি]য়াছেন বিরূপাক্ষ।

একটি সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বিরূপাক্ষের কথায়, [তাঁর] আলাপ-আলোচনা, মন্তব্য, সমালোচনা, [...]পনীতে, জীবনের প্রায় তাবৎ বিভাগেই [...] মনের কথা খুঁজিয়া পাইয়াছেন, এইজন্য [বিরূ]পাক্ষের লোকপ্রিয়তা এবং বিরূপাক্ষের [...] জয়কার। সাধারণ মানব, পণ্ডিতদের [...] বা মোড়লদের সমাজে যাহার স্থান বা [...] নাই, অথচ যাহার দৃষ্টিশক্তি আছে, রস-[বোধ] আছে, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা আছে এবং [...] না হইলেও সমাজের গতি সম্বন্ধে [...] দিবার যাহার অধিকার আছে, তাহাদের [...] বিরূপাক্ষ দু' কথা বলিতেছেন।

[...] বাঙলার শক্তি যে কত, তাহা বিরূ-[পাক্ষে]র ভাষায় নূতন করিয়া বীরেন্দ্রবাবু দেখাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার রচনা High brow stuff নহে। সকলে পড়িয়া বুঝিবে এবং হাসিবে। এই দুঃখদৈন্যের দিনে জাতীয় অধঃপতনের যুগে একটু হাসির দামও যে অসাধারণ, সেই হাসি বিরূপাক্ষ অজস্রভাবে পরিবেষণ করিয়াছেন। সমাজের এবং মোড়লদের (তাহা রাজনৈতিক হউক আর পাড়ার সর্বজনীন পূজারই হউক) প্রগতি এবং লীলার কোনও কিছু তাঁহার চোখ এড়ায় নাই, কিন্তু একটি অপূর্ব জিনিস—তিনি কাহারও বিরুদ্ধে বিষাক্ত বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার ব্যঙ্গ যাহার গায়ে লাগিবে, সেও হাসিবে এবং হয়তো সাবধানও হইবে।

এই সহানুভূতিশীল দৃষ্টির জন্য বিরূপাক্ষের জনপ্রিয়তা এত অধিক। বিরূপাক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে আদর পান, ইহাই কামনা করি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মনপবনের নাও—রৈবত। প্রকাশকঃ দিগন্ত পাবলিশার্স। ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ। মূল্য ২৸৹ টাকা।

সহজ কথা সহজ ভাষায় লিখিবার **ক্ষমতা সাহিত্য** ব্যাপারীদের মধ্যে বিরল। যাঁহাদের **আছে** তাঁহারাও বোধ করি সে শক্তির অনুশীলনে ভয় পান। ভয়ের সংগত কারণও অবশ্য আছে। সাধারণ কথাকে লোকে সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলিতে ভরসা পায় না, ফলে লেখকের পক্ষেও সাহিত্যিকের সম্মান দুর্লভ হয়। সুতরাং তাঁহারা বৈঠকী গল্প জমাইতে পারিলেও ভয়ে ভয়ে সোজা কথার পথ এড়াইয়া দার্শনিক প্রবন্ধ মনোবৈকলনিক উপন্যাস অথবা।বা।এবং ছন্দোবন্ধ বা স্বচ্ছন্দ কবিতার জনবহুল রাজপথেই অবতীর্ণ হন। বংগীয় সাহিত্যিকেরা জানেন পাঠকলোচনে পড়িবার ইচ্ছা থাকিলে হালকা রচনার গলিপথ এই স্বভাবগম্ভীর দেশে সর্বাগ্রে বর্জনীয়। হ্যাঁ! কাব্যে উপন্যাসে নামটা একবার পোক্ত হইয়া গেলে রংগরস করিলেও চলিতে পারে। এমন এক সময় ছিল—সে সময় সম্পূর্ণ চলিয়া যায় নাই—যখন ভাল-ইংরাজী-দুরুস্ত বাঙালী বাঙলায় বক্তৃতা দিলে দেশের লোক দুর্ভাগিনী বংগভাষার পক্ষ হইতে বাহবা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইত না। রৈবতের রচনা পড়িয়া খুশী হইয়াছি একথা আজ যাঁহারা জোর গলায় বলেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানেন লেখক হিসাবে এই ব্যক্তিটি সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তিনি যখন সাধারণ কথা লিখেন, তখন তাহা নিতান্ত সাধারণ নয়, নিশ্চয় তাহার মধ্যে কিছু আছে।

আমি রৈবতকে আজ চিনিয়াছি। 'দেশে' যখন মনপবনের নাও বাহির হইতেছিল, তখন ছদ্মবেশের আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা করি নাই। লেখাগুলি তখনই ভাল লাগিয়াছিল, তবে একেবারে অভিনব মনে হয় নাই। পড়িতে পড়িতে পূর্বপঠিত দুইটি বইয়ের কথা বার বার মনে পড়িতেছিল—একটি 'জনান্তিকে', আর একটি 'ইদানীং'। জনান্তিকের সংগেই মিলটা বেশী—ভংগীরও বটে, ভাষারও বটে।

এই জাতীয় রচনার কোনো নাম আমাদের ভাষায় আছে কিনা জানি না। প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কথিকা প্রভৃতির কোনো সংজ্ঞাই ইহার পূর্ণাংগ পরিচায়ক হয় না। অথচ সাহিত্য বনস্পতির কাণ্ডে এই যে একটি নূতন বলিষ্ঠ শাখার উদ্গম লক্ষ্য করিতেছি, তাহার একটি স্বতন্ত্র নাম থাকা আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষায় 'কথানক' বলিয়া একটি শব্দ আছে। বেতাল পঞ্চবিংশতিকা, হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে এই শব্দের প্রয়োগ আছে ছোট গল্প অর্থে। বাঙলায় 'ছোট গল্প'-এর নাম যখন আর বদলাইবার আশা নাই, তখন 'কথানক' শব্দটিকে এই কাজে লাগাইলে কেমন হয়?

বস্তুতঃ 'মনপবনের নাও'-এর প্রবন্ধগুলি ছোট গল্পেরই সামিল। ছোট গল্পেও ঘটনা আছে, এসব রচনাতেও ঘটনার অভাব নাই। কিন্তু তফাত এই যে, ছোট গল্পে ঘটনাটা প্রাধান্য পাইয়া থাকে—এখানে ঘটনা গৌণ থাকিয়া লেখকের ভাবনা প্রকাশের বাহনস্বরূপে কাজ করে অর্থাৎ গল্প যেন গল্প নয়, কেবল বক্তব্য প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার জনাই তাহার অবতারণা। সেকালে কথক ঠাকুরেরা যখন শাস্ত্র শুনাইতেন, তাঁহাদের লক্ষ্য যাহাই হউক, গল্প হইত উপলক্ষ্য। লক্ষ্যের দিক দিয়া কথক ঠাকুরের সহিত রৈবতের বড় বেশী মিল নাই, কিন্তু উপলক্ষ্যে প্রচুর আছে। 'মনপবনের নাও' ভাল লাগিবার সেও একটা কারণ।

এ রচনাগুলির একটা দোষ আছে, যে জন্য ছোট গল্প এক শ্রেণীর লোক পড়িতে ভালবাসে না, বড় শীঘ্র শেষ হইয়া যায়। 'মনপবনের নাও'য়ে সাতাশটি রচনা আছে। পড়া শেষ হইয়া গেলেই মন বলিলঃ
"সাতাশ হল না কেন এক শ সাতাশ!"

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত হোমিও-বিজ্ঞান ঃ ডাঃ মণিমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এম, এইচ। প্রাপ্তিস্থানঃ ডি, এম, লাইরেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। ঃ ঃ মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সফলতা প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমটি ঔষধের সুনির্বাচন দ্বিতীয়টি ঔষধের যথাযথ প্রয়োগ। প্রথমটির জন্য মেটিরিয়া মেডিকা আয়ত্ত করা এবং দ্বিতীয়টির জন্য কতকগুলি নিয়মপালন করা আবশ্যক। সম্পূর্ণ মেটিরিয়া মেডিকায় বর্ণিত লক্ষণচয় অতি বিস্তীর্ণ ও জটিল। ইহাদের সবগুলি আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য হইলেও তাহাদের মধ্যে কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ আছে যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রায় সর্বস্থলে কার্যকরী হইয়া থাকে। আলোচ্য গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ঐরূপ প্রধান প্রধান চরিত্রগত লক্ষণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাদের শ্রেণীভেদে সেগুলি কুশলতার সহিত তিনটি বিভাগে ভাগ করিয়া দেখানো হইয়াছে যাহাতে ঔষধ নির্বাচন ও স্মৃতিশক্তির বিশেষ সহায়ক হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঔষধ প্রয়োগের নিয়মগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত এবং পীড়া ও লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুইটি পরস্পর নির্ভরশীল অধ্যায়ের বিষয়গুলি ঔষধ নির্বাচন ও তাহাদের যথাযথ প্রয়োগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক।

সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে রচিত এবং সাধারণবোধগম্য ভাষায় লিখিত হোমিওপ্যাথির সমগ্র সারতত্ত্ব স্বল্পায়াসে আয়ত্ত করিবার পক্ষে এই পুস্তকটি চিকিৎসক ও গৃহস্থগণের পক্ষে অপরিহার্য। আমাদের দরিদ্র দেশে প্রত্যেক সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থ যাহাতে তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাবে নিজেকে অসহায় অনুভব না করেন, সেইজন্য এই জাতীয় পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত কাম্য।

১৪১।৫১

বৈদেশিকী

(৫০৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মেণ্ট এই ভাব দেখাচ্ছেন যে, বৃটিশ প্রজাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ছাড়া তাঁরা বলপ্রয়োগের নীতি অবলম্বন করবেন না। ইরাণীদের উপর অন্যভাবে যে চাপ দেয়া হচ্ছে সেটা হোল এই ইরাণীরা যদি গোলমাল করতে থাকে তবে কারখানার কাজ বন্ধ করে দেয়া হবে। ইরাণীরা যে সর্তে তেল বোঝাই জাহাজ বন্দর থেকে ছেড়ে দিতে রাজী সে সর্ত ইংরেজরা মানতে রাজী নয়। **কিন্তু তেল যদি চালান দেয়া বন্ধ হয় তবে** কারখানার কাজ বেশি দিন চালু রাখা যায় না। চালু না রাখলে কারখানা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। ইরাণীরা ভয় করছে যে, ইংরেজরা হয়ত নিজেরাই কলকারখানার ক্ষতি করতে পারে, সেইজন্য ইরাণ সরকার একটা নূতন আইন করছেন যাতে ইচ্ছা করে কেউ তেলের কলকারখানার ক্ষতি করলে তার সামরিক বিচার হয়ে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারবে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বলছেন যে, এ অবস্থা কোনো বৃটিশ কর্মচারীর পক্ষে স্বীকার করে নেয়া সম্ভব নয়। এ্যাংলো-ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ **ড্রেক ইতিমধ্যেই ইরাণ ত্যাগ করে এসেছেন।** ইরাণীরা কারখানা চালাবার জন্যে যথেষ্ট-সংখ্যক দক্ষ লোক পাবে না—আমেরিকানরা এ অবস্থায় আসবে না বলেছে, রাশিয়ানদের ডেকে আনতে ইরাণ সরকারের সাহস হবে না বা রাশিয়ানরা এখন নাও আসতে চাইতে পারে—কারখানা না চালু রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে শেষ পর্যন্ত কাজ হতে পারে বলে ইংরেজদের হয়ত কিছু আশা এখনও আছে। আগেকার দিন থাকলে বহু পূর্বেই ডক্টর মোসাদেক-এর মন্ত্রিত্ব ঘুচে যেতো। এখনও সে ভয় যে একেবারে নেই তা নয়।

২৭-৬-৫১

গত দুমাস যাবৎ আমি বড় একটা পড়াশুনো করছি না। ইস্কুলের ছেলের মতো আমি পরমানন্দে ছুটি উপভোগ করছি। দেখলুম কাজ ফাঁকি দিয়ে যেমন আনন্দ এমন আর কিছুতে নেই। এ আনন্দের স্বাদ যদ্দিন আপনি অনুভব করতে পারছেন তদ্দিন জানবেন আপনার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ আছে। আমি মাঝে মাঝে বেমালুম কাজ ফাঁকি দিয়ে নিজের মানসিক স্বাস্থ্য যাচাই করে নি। মূল্যবান সময় নষ্ট করার আনন্দ হল সব চাইতে অমূল্য আনন্দ। টাকার সার্থকতা দুহাতে টাকা উড়াবার মধ্যে, সময়ের সার্থকতা নির্ভাবনায় কাল কর্তনের মধ্যে। পাই পয়সার হিসেব করে যে লোকটা টাকা জমায় টাকা কোনো কালে তার ভোগে আসবে না। প্রতি মিনিটের হিসেব করে যিনি সময় বাঁচাচ্ছেন সে সময় কোন ব্যাংকে জমা হচ্ছে? কৃপণের ধন [illegible] খাবে, ইহকালের সময় পরকাল [illegible] করবে। তিরিশ বছর পরিপূর্ণভাবে জীবনকে উপভোগ করে যে ব্যক্তি ইহলীলা সংবরণ করেন আমি তাঁর মৃত্যুকে অকাল-মৃত্যু বলি না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তকে কাজে খাটিয়ে সময়ের মহাজনী করতে করতে যিনি [illegible] বছরে মারা গেলেন তাঁর মৃত্যুকেই আমি বলব অকাল মৃত্যু। সময় বাঁচাতে গেলে অনেক নিজেকে বাঁচানো হয় না। বিনা কাজে কাল কর্তনকে ইংরেজরা বলে killing time. কোনো ইংরেজের চাইতে অকেজো বাঙ্গালীর বুদ্ধি বেশী। সে জানে সময়কে মানুষ বধ করতে পারে না, সময়ই মানুষকে বধ করে।

যাক্ এসব কথা অবান্তর। গোড়ার কথায় ফিরে আসছি। আমার ছেলে ইস্কুলের টাস্ক ফাঁকি দিচ্ছে, তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি আমার পড়াশুনোয় ফাঁকি দিচ্ছিলাম। এই নিয়ে মনে মনে ভারি একটি আরাম বোধ করছি এমন সময় আমার গুরুস্থানীয় এক-জন অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। কথা প্রসঙ্গে জানলুম ইদানীং তিনি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি পড়াশুনোয় লিপ্ত আছেন।

ইন্দ্রজিতের আসর

অর্থাৎ, আমি যা করছি উনি ঠিক তার উল্টোটি করছেন। উনি বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ; তাঁর কথা শুনে আপন কর্তব্যে অবহেলার দরুণ আমার লজ্জিত এবং অনুতপ্ত বোধ করাই উচিত ছিল; কিন্তু কেন জানি না ঠিক যে সময়ে যেমন মনো-ভাবটি হওয়া উচিত তেমনটি কোনোকালেই আমার হয় না। কোথায় লজ্জিত বোধ করব না মনে মনে আমার ভারি হাসি পেয়ে গেল এই ভেবে যে, উনি উদয়াস্ত অধ্যয়ন করে যে বিদ্যে আহরণ করছেন ধরুন আমাকে এক্ষুণি যদি তাই শোনাতে বসেন, যদি বলেন, ও শ্যামাদাস, আয় তো দেখি, বোস্ তো দেখি এখেনে—সেই কথাটা বুঝিয়ে দি ইত্যাদি—তাহলে আমার অবস্থা কি হবে? কৌতুকটা আসলে এইখানে। অধ্যাপকদের কবলে পড়লে আমাদের শ্যামাদাসদের অর্থাৎ ছাত্রদের কি দুর্দশাই না হয়। বিদ্যে ফলাবার একটু সুযোগ পেলে আমরা কিছুতেই আর ছাড়িনে।

সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছিলেন দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে সবে সেইদিনই পরিচয়। ঘণ্টাখানেক ছিলেন তারই মধ্যে কম্‌সে কম্ একশো বই-এর নাম করে ফেললেন, তার আদ্ধেক আমি পড়িনি, কিছুর বা নামই শুনিনি। আমার সে কি অস্বস্তি। ভদ্রলোক চা খান না যে, আলোচনাটাকে চায়ের জলে তরল করে দেব, সিগারেট খান না যে হাল্কা ধোঁয়ায় উড়িয়ে দেব। অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করে তাল পরিমাণ বই এর তালিকা গিলতে হোল। অনেকদিন আগে কোথায় যেন পড়ে-ছিলাম—an educated man in future will be a walking Catalogue. বসে বসে ভাবছিলাম সেই ভবিষ্যৎ কি এসে গেল?

যিনি বহু অধ্যয়ন করেছেন তাঁকে মুখ ফুটে তা বলতে হয় না। বহু অধ্যয়নের ফলে তাঁর মন এমন সমৃদ্ধ হয়েছে যে, তাঁর হাসি ঠাট্টা গল্প গুজব সামান্যতম কথার মধ্যেও নিঃসংশয়রূপে সে সমৃদ্ধির ছাপ পড়ে যাবে। সে কথা প্রমাণ করবার জন্যে বিবলিওগ্রাফির সাক্ষ্য প্রয়োজন হয় না। চার্লস্ ল্যাম্ বলেছিলেন বেশি পড়ে পড়ে তাঁর বুদ্ধি কমে যাচ্ছে; ঠিক বুদ্ধি নয় স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা তাঁর বিনয় বচন। স্বকীয়তা একটুও নষ্ট হয়নি, তার কারণ যা কিছু পড়েছেন সমস্তই তিনি স্বকীয় করে নিয়েছেন। অনেকে আছেন—তেলে জলে যেমন মিশ খায় না—যা পড়েন আর যা জানেন তাতে ঠিক মিশ খায় না। এ'দের সংখ্যাই বেশি। এ'রা জানেন না যে, অধীত বিদ্যা এক, অধিগত বিদ্যা আর।

আর এল স্টিভেনসন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, ম্যাকলে এত পড়েও বুদ্ধিটা কেমন করে বজায় রেখেছেন। সেটা সত্যি ভাববার কথা। ওঁকে নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নেওয়াই ভালো। নইলে এত পড়বার পরেও মাথা ঠিক থাকবার কথা নয়। ম্যাকলে কি সর্বনেশে কথা বলেছেন শুনুন। উনি বলেন, আমি এক লাইন লিখবার আগে একশো পাতা পড়ে নিই। শুনুন কথা, এতই যদি পড়ব তবে লিখব কখন, আর তার চাইতেও বড় কথা, ভাবব কখন? তাছাড়া লেখা আর পড়ার চাইতে ঢের বড় জিনিস জীবনে আছে। সব চাইতে গোড়ার কথা বলেছেন অন্নদা-শংকর রায়—কেবল যদি একাজ আর ওকাজ নিয়েই থাকি—'তবে কখন ভালোবাসব?' সেই যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই কথাতেই এসে গেলাম। এই যে কিছুই পড়ছি না, কিছুই করছি না—এ-ই সব চাইতে ভালো কাজ করছি। সময়ের অপব্যবহার তো নয়ই সদ্ব্যবহার বলতে হবে। Too much reading is a weariness of the flesh. ইংরেজ ঋষির বাক্য স্মরণ রাখবেন। জীবনের বিচিত্র শোভাযাত্রা আমার দুপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর আমি পুঁথির পাতায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকব? কক্ষণো নয়। আপনারাও পড়াশুনো ছাড়ুন। এমন কি ইন্দ্রজিতের লেখাও পড়বার দরকার নেই।

কালসাপ (সংহতি পিকচার্স— রাধা ফিল্মস ষ্টুডিও)—কাহিনী ও পরিচালনা ঃ খগেন রায়; আলোকচিত্র ঃ নিমাই ঘোষ; শব্দযোজনা ঃ নৃপেন পাল, শচীন চক্রবর্তী; সুরযোজনা ঃ সুশান্ত লাহিড়ী; শিল্পনির্দেশ ঃ অনিল পাইন; ভূমিকায় ঃ ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন, হরিধন, সুশীল রায়, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, নৃপতি, প্রমীলা ত্রিবেদী, আরতী দাস, তারা ভাদুড়ী প্রভৃতি।

ক্যালকাটা টকীজের পরিবেশনে ১৫ই জুন উত্তরা ও উজ্জলাতে মুক্তিলাভ ক'রেছে।

যে কোন ছবির সমালোচনা ক'রতে আসলে যে বস্তুটিকে টেনে আনতে হয় সে বস্তুটিরই পাত্তা না পেলে মহা সংকটে পড়তে হয়। এমনি অবস্থার সামনে পড়তে হয় "কালসাপ"-এর বেলায়। ছবির মানে ছবির মধ্যে দিয়ে ফোটানো একটা গল্প। খাপছাড়া বা এলোমেলো খানিকটা কিছু পেলেও কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তা নিয়েও একটা গল্প মনে মনে ধ'রে নেওয়া যায়। কিন্তু এ ছবিতে সবই উহ্যের ব্যাপার। আকারে প্রকারে এটি ক্রাইম ড্রামা মনে হয়, কিন্তু ক্রাইম ড্রামার রহস্য প্রকট ব্যাপারে রচয়িতা-পরিচালক এমনি টেকনিক অবলম্বন করেছেন যে, ছবি শেষ হবার পরেও গল্পটি না-বোঝার রহস্য নিয়েই দর্শককে আসন ত্যাগ ক'রতে হয়।

ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সূত্র গেঁথে যাওয়ার রীতির বদলে এখানে এক ঘটনার সঙ্গে আর এক ঘটনার সূত্র ও কার্যকারণ উহ্য রেখে রহস্য সৃষ্টির এক অদ্ভুত টেক্নিক অবলম্বন করা হ'য়েছে। যেমন—ছবির প্রথম দৃশ্যে দেখা গেলো নবীন শর্মা নামক জনৈক বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় তার পরম সুহৃদ সত্যসুন্দরের হাতে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের মণি-মুক্তা গচ্ছিত রেখে যাচ্ছে এই বলে যে, তার ছেলে বড় হ'লে সত্যসুন্দর তখন যেনো তার হাতে সেই সম্পত্তি অর্পণ করে। এর পরের দৃশ্যে দেখা গেলো, অনিমেষ নামক এক যুবক কলকাতায় তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রতে ঘরে ঢুকতেই কোত্থেকে একদল লোক এসে তাকে তার বন্ধুর হত্যাকারী ব'লে পাকড়াও ক'রলে। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের মাঝের সূত্র ও কার্যকারণ একেবারেই উহ্য। এর পরের দৃশ্যে দেখা গেলো, স্মরজিৎবাবু নামক এক সখের গোয়েন্দা অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে বেতারে বক্তৃতা দিয়ে বললেন যে, অপরাধ কখনও লাভজনক হয় না। তার পরের দৃশ্যে দেখা গেলো, এক ব্যক্তি থিয়েটারের পার্ট মুখস্থ ক'রছে এবং 'মালতী' ব'লে হাঁক দিয়ে সে দৃশ্যান্তরিত হ'লো। পরে এ ব্যক্তিকে গুরুসদয় মুখুজ্যে ব'লে জানা যায়। এর পরের দৃশ্যে দেখা গেলো, রায়বাহাদুর সত্যসুন্দরকে, মস্ত ধনী লোক, তিনি তাঁর ভাগ্নে শিবুকে অমিতব্যয়িতার জন্যে তিরস্কার ক'রলেন। বলা বাহুল্য যে, এ দৃশ্যটির সঙ্গে আগের দৃশ্যটির বা তার আগের দৃশ্য অথবা তারও আগের দৃশ্যের কোন সূত্রও নেই, কার্য-কারণও রহস্যজনকভাবে উহ্য। এখানে এইমাত্র সন্দেহ হ'তে পারে যে, সত্যসুন্দর বড়োলোক হ'য়েছে তার বন্ধুর গচ্ছিত সম্পত্তি অপহরণ ক'রে। কিন্তু প্রথম যখন সত্যসুন্দরকে মৃতপ্রায় নবীনের পাশে দেখা যায় তখন এমন কোন প্রমাণ দেওয়া ছিলো না যাতে মনে ক'রে নিতে হবে যে, সত্যসুন্দর তখনও ধনী ছিলো না। এর পরের দৃশ্যে দেখা গেলো গুরুসদয়ের গাড়ির সামনে উন্মাদবেশী অনিমেষকে ঝাঁপিয়ে পড়তে। অনিমেষ জানালে একদল লোক তাকে মিথ্যে ক'রে তার বন্ধুর খুনী ব'লে ধ'রেছে। গুরুসদয়ের কাছে সে আশ্রয় চাইলে। দৃশ্যান্তরে দেখা গেলো, গুরুসদয়কে সত্যসুন্দরের গৃহে। নিজেকে সে সম্পত্তি কেনাবেচার দালালরূপে পরিচয় দিয়ে রায়বাহাদুরকে কিছু গছাবার চেষ্টা ক'রলে এবং অন্য সময়ে দেখা করার প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিষ্ক্রান্ত হ'লো। এরপর এক হোটেলের দৃশ্য যেখানে দুজন লোক কিছু একটা গর্হিত মতন্ত্র ব্যাপারে আলাপ ক'রছে যার টাকার মাত্রা পঞ্চাশ হাজার। স্মরজিতের সহকারী ও স্মরজিৎকে ছদ্মভাবে এদের ওপর গোয়েন্দাগিরি ক'রতে দেখা গেলো। এখান থেকে দৃশ্য সরে গেলো সত্যসুন্দরের ভাগ্নে শিবু এবং ভাইপো মহেন্দ্রদের আড্ডায় যেখানে গুরুসদয়েরও অর্থাভাব হ'লো। গুরুসদয় এদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে তার এক দুঃস্থা বন্ধুকন্যার পাত্রের খোঁজ করার কথা ব'ললে। দৃশ্য চলে গেলো পাড়াগাঁয়ের এক পোড়োবাড়ির সামনে; এক বিধবা তার অনূঢ়া বয়স্থা মেয়েকে নিয়ে সেখানে নেমেছে। গাড়িওয়ালা চলে যাবার পর নারী দুটি গৃহে প্রবেশ ক'রলেন, তারপর রাত্রে একদল লোক এলো ওদের অপহরণ ক'রতে কিন্তু আকস্মিকভাবে স্মরজিৎ তার সহকারী ভুলুকে নিয়ে হাজির হ'য়ে ওদের উদ্ধার করলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, প্রথম থেকে এ পর্যন্ত দৃশ্যগুলির পরস্পরের যে কোন একটি দৃশ্যের সঙ্গে আর একটির যোগসূত্র বা কার্যকারণ উহ্যই রেখে দেওয়া হ'য়েছে। রহস্যসৃষ্টির জন্য গল্পের ওপর এমন রাহাজানির পরিচয় এর আগে কচিৎ পাওয়া গিয়েছে।

ছবির শেষ পর্যন্ত বেশ সামঞ্জস্যের সঙ্গেই এই টেক্নিককে বজায় রেখে দেওয়া হ'য়েছে—সবায়ের পরিচয় এবং ঘটনার যোগসূত্র ও কার্যকারণ উহ্য রেখে রহস্য সৃষ্টি করার এই অভিনব টেক্নিক। এর পরের টুক্রো ঘটনাগুলি হ'চ্ছে—সত্যসুন্দর কামাটারে গেছেন এবং সেখানে সাপের কামড়ে প্রাণ হারালেন। স্মরজিৎ এর মধ্যে হত্যার ষড়যন্ত্র অনুমান করে। স্মরজিৎ কামাটারে যায়। সেখানে দেখে সত্যসুন্দরের মালীকে কেউ ওষুধের সঙ্গে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। মালীর ঘরের সামনে পায়ের দাগ আর বাগানের কাছে গাড়ির চাকার দাগ পাওয়া যায়। ডাক বাংলোতে গুরুসদয়রা একটা পার্টি করে, সেখানে এক মুখোসধারীর আবির্ভাব ঘটে। শিবু তার গুলীতে নিহত হয়। মালীর ঘরের পায়ের দাগের সঙ্গে শিবুর পায়ের মিল ছিলো ব'লে শিবুকেই এতোদিন অপরাধী ব'লে ধ'রে নেওয়া হ'য়েছিল। শিবু নিহত হ'তে স্মরজিৎ অনুমান ভুল বুঝতে পেরে খুনীর সন্ধানে হাল ছেড়ে দিলে। এই সময় জানা গেলো, গুরুসদয় মুখোসধারীকে ধ'রতে পেরেছে। এতোদিন গুরুসদয়ের ওপরে সবায়ের সন্দেহ ছিলো। শেষে প্রকাশ করা হ'লো যে, গুরুসদয়ের আসল নাম অক্ষয় ঘোষ। সে একজন নামকরা অভিনেতা এবং কিছুকাল নবীন শর্মার কাছে কাজ ক'রেছিলো। স্মরজিতের সুখ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে সে গুরুসদয় নাম নিয়ে গোয়েন্দাগিরিতে স্মরজিৎকে পরাস্ত করার সংকল্প গ্রহণ করে এবং সেও সত্যসুন্দরের হত্যাকারীকে ধরবার চেষ্টা করে এবং শেষে সাফল্যলাভ করে। সত্যসুন্দরের হত্যাকারী হ'চ্ছে তারই প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজা

অসিতবরণ ও দেবযানী এম পি-র প্রত্যাবর্তন চিত্রের নায়ক-নায়িকারূপে। ছবিখানি শনিবার, ৩০শে জুন মুক্তি পাইবে।

[illegible] সত্যসুন্দর সে স্ত্রীকে ত্যাগ করেন, [illegible] ছেলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

[illegible]জিতের সহকারী ভুন্দুর ভূমিকায় [illegible]দের কালোমা ছাড়া সারা ছবি- [illegible] মধ্যে উপভোগ করার আর কিছু [illegible] কোন চরিত্রের জোরও নেই কাজেই [illegible] দাঁড়াতে পারেনি কারুরই [illegible]। কতকগুলি দৃশ্য রচনায় [illegible] শিল্পকৃতিত্ব পাওয়া যায়, কিন্তু [illegible]সম্পাতের ত্রুটি ও অপরিমিতি [illegible] প্রকট। শব্দযোজনা চলে [illegible]। সুরযোজনা অচল। অর্থাৎ [illegible] অনুৎকর্ষে চৌকষ অবদান।

ভাস্কর রায় চৌধুরীর জলসা

[illegible] ২০শে থেকে ২৪শে পর্যন্ত নিউ [illegible] মঞ্চে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী দেবী- [illegible] রায় চৌধুরীর পুত্র ভাস্কর রায় [illegible] চারটি নৃত্যের আসর বসে। এই [illegible] অনুষ্ঠিত হবার আগে থেকেই এবং [illegible]র পর বহু গুণী, জ্ঞানী ও প্রখ্যাত [illegible] পত্র-পত্রিকা যেভাবে ভাস্করের [illegible] গেয়েছেন, অতঃপর ভিন্নরকম মতে [illegible]তে গেলে অপ্রিয় হতেই হবে। [illegible] বলে পারা যায় না যে, ভাস্কর [illegible]ধুরী এখানে যে খাতির পেয়েছেন [illegible]পরিচয়েই; তা না হ'লে, নিজস্ব [illegible] আসরে একক নাচ দেখাবার [illegible] নন। তিনি কেবল মেয়েলী [illegible] নাচ শিখেছেন তাই ইতিপূর্বে [illegible] আগত মহিলা নৃত্যশিল্পী- [illegible] নাট্যম নৃত্যের যে কৃতিত্ব ঐ নিউ এম্পায়ার মঞ্চেই দেখা গিয়েছে তাদের সঙ্গে তিনি তুলনায় পড়ে যান এবং বিচারে শ্রীমান ভাস্কর তাদের চেয়ে নীচু ধাপের শিল্পী প্রতীয়মান হন। মেয়েলী নাচের জন্যে দেহে মেয়েলী লালিত্য নিয়ে আসতে ভাস্কর দেহের পেশীকে অদ্ভুত শিথিল ক'রে নিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের ভারত নাট্যম মেয়েরাই সাধারণত নেচে থাকেন। শ্রীমান ভাস্কর সে-নাচ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই আয়ত্ত করেছেন এবং ভারত নাট্যমের যে তিনটি নাচ তিনি দেখিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু নিজে compose করে বাকি যে নাচগুলি দেখিয়েছেন তা নাচ হয়নি, হয়েছে কসরৎ। পেশীর ললিত কসরৎ যদি নৃত্যের প্রধান অঙ্গ বলে ধরা হয় তা হ'লে ভাস্কর কৃতী শিল্পী।

মাত্র জনসাতেক নৃত্য শিল্পী নিয়ে শ্রীমান ভাস্করের দল। আমরা উপস্থিত ছিলাম দ্বিতীয় আসরে। সেদিন নাচ ছিলো বারোটি—পুজো (ললিতা, পদ্মাক্ষী ও বিটোভা); ভৈরবী রাগিণীতে "আলারিপ্পু" (ভাস্কর ও কৃষ্ণরাও); কানাড়া রাগে "তিলানা" (ভাস্কর); মারোয়াড়ী নৃত্য (পদ্মাক্ষী, ললিতা ও বিটোভা); "রাহু ও চন্দ্রা" (কৃষ্ণরাও ও পদ্মাক্ষী); বসন্ত রাগে "নটনম আদিনার" (ভাস্কর); শিকারির নৃত্য (কৃষ্ণরাও); বাগেশ্বরী রাগে থালা নৃত্য (ভাস্কর); মৎস্যশিকারী (ললিতা, বিটোভা, রাজকুমার, গোবিন্দ রাও); মালকোষে "সূর্য-নৃত্যম" (ভাস্কর); "জটায়ু মোক্ষ" (কৃষ্ণরাও, গোবিন্দ রাও, রাজকুমার, বিটোভা); কালাঙড়াতে "নাগনৃত্যম" (ভাস্কর)। দেখা যাচ্ছে যে, বারোটি নাচের মধ্যে ভাস্করের নাচ অর্ধেক এবং মাত্র একটিবার তিনি অন্য একজনের সঙ্গে নেমেছেন বাকী সববারই একক। থালা নৃত্য ও নাগনৃত্যে তিনি পেশী সঞ্চালন ও নিয়ন্ত্রণ এবং অঙ্গ সংকোচনের যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। শ্রীমান ভাস্করের কৃতিত্ব এই ধরণের নাচেই এবং এই কৃতিত্ব নিয়ে তিনি কোন বড়ো নৃত্য সম্প্রদায়ে অতিরিক্ত আকর্ষণরূপে খ্যাতি অর্জন ক'রতে পারবেন। অন্য বিষয়ে তিনি সমবেত নৃত্যে চমৎকার মানিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু এককভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করার মতো তাঁর কৃতিত্বও তৈরী হয়নি আর তেমন ব্যক্তিত্বও নেই।

শ্রীমান ভাস্করের সাজপোষাক এবং "জটায়ুমোক্ষ" নৃত্যে জটায়ুর সাজ ছাড়া

আর সব নাচের পোষাক নেহাৎই জীর্ণ। সংগীতের দিকও খুবই অবহেলিত।

শ্রীমান ভাস্কর কলকাতায় আসার পর ১৬ই জুন লেডী রাণু মুখার্জী ফাইন আর্টস একাডেমীর পক্ষ থেকে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। পরে ১৮ই জুন মডার্ণ রিভ্যু সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গৃহে একটি চা-পার্টিতে শ্রীমানকে সাংবাদিকদের সংগে পরিচয় করিয়ে দেন। কলকাতায় শ্রীমানের নামটি পরিবেশিত হয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবর্ধনায়।

এইভাবে শিল্পী দেবীপ্রসাদ তাঁর নিজের কীর্তিমাল্যটি শ্রীমান ভাস্করের গলায় পরিয়ে তাঁকে কীর্তিমান ব'লে প্রচারিত করার চেষ্টা ক'রেছেন। কিন্তু শ্রীমানের এমন কোন যোগ্যতাই নেই যাতে নিজের থেকেই পরিচয় জমিয়ে নিতে পারেন।

"বহুরূপীর" বর্ষোৎসব

"বহুরূপী" নাট্য সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে গত ২২শে জুন ওয়াই-ডবলু-সি-এ হলে একটি জলসার অনুষ্ঠান হয়। একটিমাত্র বৎসরের মধ্যেই "বহুরূপী" বাঙলার নাট্যক্ষেত্রে সাড়া জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হ'য়েছে এবং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, গত বারো মাসে তারা "পথিক", "উলুখাগড়া" ও "ছেঁড়া তার" মঞ্চস্থ ক'রে নাট্যধারায় যুগান্তর নিয়ে আসার মতো সর্বদিক থেকেই যোগ্যতারও পরিচয় দিয়েছেন। মঞ্চের ওপর এঁদের ঐকান্তিকতা এবং অভিনয়ে নিষ্ঠা ও প্রাণশক্তি আদর্শস্থানীয় বলে সুখ্যাত হচ্ছে সর্বত্রই। কিন্তু তবুও একটা এমন কোন প্রতিবন্ধক রয়েছে যেজন্যে সম্প্রদায়টি জনসাধারণের হৃদয়ে আসন সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে নিতে পারছে না। একথাটা মনে এলো এদের সেদিনকার বর্ষোৎসবে জনসমাগম দেখে। ওয়াই-ডবলু-সি-এ হল খুবই ছোট শ দুই আড়াইয়ের বেশী লোককে জায়গা দেওয়া যায় না। এদের এই অনুষ্ঠানটির বিবরণ দিনকয়েক আগে থেকেই পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হ'য়েছে এবং বিনামূল্যে প্রবেশপত্র পাওয়ার কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেলো যে, যেখানে লোকের ভীড়ে হল ভেঙে পড়ার কথা, সেখানে অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার নির্ধারিত সময়েও অর্ধেক লোকও উপস্থিত নেই। সম্প্রদায় অবশ্য যথাসময়েই অনুষ্ঠান আরম্ভের জন্য প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু, একে ছোট জায়গা তাও অর্ধেক খালি এ অবস্থায় লোকের অনুরোধে বাধ্য হয়েই তাঁরা বিলম্ব করেন। এই কথা বলার জন্যে এই ঘটনার উল্লেখ ক'রতে হ'লো যে, "বহুরূপী" যুগান্তকারী নাট্যসম্প্রদায় ব'লে সর্বজনবিদিত হ'লেও দেখা যাচ্ছে যে, লোকের মনে তাঁরা এমন উদ্দীপনার সঞ্চার ক'রতে পারেন নি, এমন সাড়া এনে দিতে পারেন নি যাতে বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ সত্ত্বেও ভীড় ভেঙে তো পড়েইনি, এমন কি নির্ধারিত সময়ে এসে উপস্থিত হবার তাগিদও অনেকে বোধ করে না। লোকের মধ্যে কিসের এই কুণ্ঠা? এই কুণ্ঠার কারণ বের ক'রে তা দূর না করতে পারলে "বহুরূপী"-র পক্ষে স্থায়ী হ'য়ে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে না।

ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা যে অপ্রত্যাশিত কারণ ও সমস্যার জন্য বন্ধ হইয়াছিল, তাহার এখনও পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। সেইজন্য সকল লীগ প্রতিযোগিতার খেলা এখনও বন্ধ আছে। তবে পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্বয়ং যখন বিষয়টির সমাধানের জন্য উৎসাহী হইয়াছেন, তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, অতি শীঘ্রই অচল অবস্থার অবসান হইবে ও পূর্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে সকল খেলা অনুষ্ঠিত হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ সমস্যা না আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহার জন্যও নিশ্চয়ই বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ক্লাব হইতে সভ্যদের মধ্যে যে কার্ড বিলি করা হয়, তাহার নিম্নভাগের লিখিত কথাগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রায় প্রত্যেকটা ক্লাবের কার্ডের নিম্নভাগে যে কথাগুলি লেখা আছে, তাহাতে কোনরূপেই বুঝিবার উপায় নাই যে, কার্ডের অধিকারী খেলার মাঠে নিশ্চয় আসন পাইবে বা তাহার খেলা দেখিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। মোহনবাগান ক্লাব সভ্যদের মধ্যে যে কার্ড বিলি করেন তাহাতে লেখা আছে, "খেলা আরম্ভ হইবার ১৫ মিনিট পূর্বে প্রবেশপথ বন্ধ হইবে।" ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যে কার্ড সভ্যদের প্রদান করেন, তাহাতে লেখা আছে, "মাঠের মধ্যে বসিবার স্থান নির্দিষ্টসংখ্যক থাকায় যে সকল সভ্য আসিবেন, সেইরূপ স্থান পাইবেন।" এইরূপভাবে প্রথম ডিভিসন লীগের প্রত্যেকটি ক্লাবের সভ্যদের কার্ড লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, এক একটি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন অনির্দিষ্ট কথার উল্লেখ আছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের অনেক সময়েই মনে হইয়াছে, কোন আইনের বলে বিভিন্ন ক্লাবের সভ্যগণ খেলার মাঠের প্রবেশাধিকার লইয়া এত জিদ করিতেছেন? এমনকি পরিচালকগণ কিসের জোরে সভ্যদের মাঠের মধ্যে আসন দিবার জন্য আই এফ এর উপর এত চাপ দিতেছেন? নিশ্চয়ই অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে নতুবা এতগুলি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোককে এই সভ্যদের আসন ব্যবস্থা এত চিন্তিত ও বিব্রত কেন করিয়াছে? তবে আমাদের ধারণা, যাঁহারা সকল কিছু সমাধানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা ভবিষ্যতে ক্লাবের কার্ডেরই একই প্রকার কথা উল্লেখ যাহাতে থাকে, তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

সাংবাদিকদের উপর অবিচার

আই এফ এর কর্তৃপক্ষগণ দীর্ঘদিন ধরিয়াই সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সকল সভায় যোগদান করিতে বা সকল কিছু জানিবার সুযোগ দান হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। এই বিষয়ে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ যে প্রতিবাদ করেন নাই, তাহা নহে। কোন এক বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিকগণ সৌভাগ্য বলে পরিচালকমণ্ডলীর পাণ্ডা হওয়ায় প্রতিবাদ সকল সময়েই ব্যর্থ হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইনি পদাধিকার বলে ভিতরের সকল কিছু জানিয়া শুনিয়া নিজ চাকরী বজায় রাখিবার জন্য সুযোগমত অনেক কিছু "অপ্রকাশ্য" ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল সংবাদ প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ যখন পরিচালকমণ্ডলীকে চাপিয়া ধরেন যে, কেন এইরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হইতেছে, তখন তাঁহারা আশ্বাস দেন, ভবিষ্যতে হইবে না, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা যায়, ঐ সাংবাদিক ঠিক নিজ কার্য হাসিল করিতেছেন। এই বারের ফুটবল খেলার অচল অবস্থা লইয়া যতগুলি সভা হইয়াছে, কোন একটিতেও সাংবাদিকদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, সেইজন্য বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা অসম্ভব, কিন্তু উক্ত সাংবাদিক পদাধিকারের সুযোগে নিজ পত্রিকায় অনেক কিছু প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ সংবাদপত্রসেবীদের প্রতি এই যে অবিচার দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিয়াছে, ইহার অবসান যে কবে হইবে এবং কে করিবেন জানি না। তবে বিহিত ব্যবস্থা হওয়ারও যে প্রয়োজন আছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

মহীশূরের ফুটবল খেলোয়াড় শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে

মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় উক্ত এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত বিনী মিলসের খেলোয়াড় বসিথ এসোসিয়েশনের বিনানুমতিতে কলিকাতার মোহনবাগান ক্লাবের খেলায় যোগদান করায় তিন বৎসরের জন্য সাসপেণ্ড বা খেলায় যোগদান করিতে পারিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে অনেকেই মনে করিয়া রাখিয়াছেন যে, বসিথ মোহনবাগানে আর খেলিবেন না। কিন্তু আমরা জানি উহা সম্পূর্ণ ভুল। বসিথকে যখন খেলান হইয়াছে, তখন আইনের আওতায় যাহাতে না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতে পরিচালকগণ ভুল করেন নাই। বসিথ বর্তমানে বিনী মিলসের চাকুরে নহেন। বর্তমানে ইনি এক বীমা কোম্পানীর চাকুরে। ঐ চাকরী উঁহাকে বাঙ্গালোরে দিয়া পরে উহা কলিকাতায় বদলী করা হইয়াছে। চাকরী স্থান বদল করিলে আইনের আওতায় পড়ে না। সুতরাং যাহারা বসিথকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সবকিছু চিন্তা করিয়াই কার্য করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? তবে ওটা ঠিক, এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় মোহনবাগানের কর্তৃপক্ষগণ একটু বিচলিত হইয়াছেন। সেইজন্য আশংকা হয়, হয়তো বা ইহারা বসিথকে আর খেলাইবেন না।

খেলোয়াড়দের সাহায্যে ব্যবস্থা

ফুটবল খেলোয়াড়দের ইতঃপূর্বে বিশিষ্ট ক্লাব হইতে অসুস্থ বা আহত হইলে সাহায্য করা হইত, কিন্তু ঐ ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে নবগঠিত প্লেয়ার্স এসোসিয়েশন ইহার জন্য একটি স্থায়ী অর্থ ভাণ্ডার গঠন করিতেছেন। ঐ অর্থভাণ্ডার হইতে কেবল অসুস্থতা বা আঘাতের সময়েই সাহায্য করা হইবে তাহা নহে, প্রয়োজন হইলে তাহার সাংসারিক জীবনের বিপদ আপদে সাহায্য করা হইবে। এমনকি বিভিন্ন হাসপাতালে খেলোয়াড়দের জন্য যাহাতে বিশেষ বেড ব্যবস্থা থাকে, তাহার জন্যও প্লেয়ার্স এসোসিয়েশন চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ প্লেয়ার্স এসোসিয়েশনের এই প্রচেষ্টায় আন্তরিক সহানুভূতি সর্বপ্রকার সাহায্যদানের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিবেন।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিতে প্রকাশ যে, এম সি সির পরিচালকগণ আগামী শীতকালীন এম সি সি দলের ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে বোর্ড যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইয়াছেন। এই সংবাদ খুবই আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই তবে কোন কোন খেলোয়াড় লইয়া এম সি সি দল গঠিত হইবে, তাহা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত ভ্রমণব্যবস্থা বাতিল হইবে না বলা খুবই কঠিন। বোর্ডের সভাপতি খুবই কৃতী লোক সন্দেহ নাই, তবে বিবৃতির পরিবর্তন করিতে খুবই অভ্যস্ত ইহা অন্য কেহ লক্ষ্য না করিলেও আমরা করিয়া থাকি। ইনি অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করেন, ইহা বলিলেও অন্যায় করা হইবে না।

দেশী সংবাদ

১৮ই জন—উত্তর আসামে এবং ডিব্রুগড়, শিবসাগর, নওগাঁ, কামরূপের কয়েকটি অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এজেণ্ট শাসিত এলাকার ১০ হাজার বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চল ব্যাপক বন্যার ফলে কার্যতঃ বিধ্বস্ত হইয়াছে। তিন লক্ষাধিক অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীচাঁদুলাল ত্রিবেদী অদ্য রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট এইরূপ "রিপোর্ট" দাখিল করিয়াছেন যে, সংবিধান অনুযায়ী পাঞ্জাবে মন্ত্রিসভার সাহায্যে শাসন-কার্য পরিচালনায় তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র ও খ্যাতনামা ব্যবসায়ী স্যার হরিশংকর পাল অদ্য প্রাতে তাঁহার শোভাবাজার স্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।

গতকল্য সন্ধ্যায় করাচীর ৩৩২ মাইল উত্তরে ঘোটকীতে এক রেল দুর্ঘটনার ফলে ১১ জন নিহত ও ১৮ জন আহত হইয়াছে।

অদ্য স্পেশ্যাল জজ শ্রী পি কে সরকার ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলায় আসামীগণ জি পি নোট ও নগদ ৩২ লক্ষাধিক টাকা সম্পর্কে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসভঙ্গ, হিসাবপত্র জাল করা প্রভৃতি বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে জজ আসামীদের মধ্যে ছয়-জনকে ৭ বৎসর হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং দুইজন আসামীকে খালাস দিয়াছেন।

১৯শে জুন—পাটনার গান্ধী ময়দানে দুই লক্ষাধিক লোকের এক সভায় বক্তৃতাকালে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থ যদি বৃহৎ জনসমাজের কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে উহা কিছুতেই বরদাস্ত করা হইবে না।

নয়াদিল্লীতে ভারত-পাকিস্থান সম্মেলনে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে গমনাগমন সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদান ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

স্বামী শংকরানন্দ মহারাজ সর্বসম্মতিক্রমে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

২০শে জুন—পাঞ্জাবের গভর্নর শ্রীচাঁদুলাল ত্রিবেদী অদ্য প্রাতে ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গবের এবং তাঁহার ৬ জন সহকর্মীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

পাঞ্জাব সরকারের যাবতীয় কার্যভার এবং পাঞ্জাব রাজ্যপালের যাবতীয় ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রপতি আজ এক ঘোষণা বাণী প্রচার করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নির্দেশ জারী করিয়াও তিনি ঐ সকল ক্ষমতা পাঞ্জাবের রাজ্যপালের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীচাঁদুলাল ত্রিবেদী আজ রাষ্ট্রপতির পক্ষে পাঞ্জাবের শাসনকার্য পরি-চালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২১শে জুন—অদ্য প্রায় দেড় হাজার উদ্বাস্তু নরনারী বনগাঁয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া বেলা ১১ ঘটিকা হইতে সারাদিন উক্ত ষ্টেশনের নিকটে রেল লাইনের উপর বসিয়া থাকে। বনগাঁয়ের অদূরস্থ হেলেঞ্চা, কুমারখোলা, জলেশ্বর প্রভৃতি উদ্বাস্তু আশ্রয় কেন্দ্রের উদ্বাস্তুগণ প্রধানতঃ পুনর্বাসনের জন্য জমি এবং পুনর্বাসনের প্রাক্কালীন নগদ অর্থ সাহায্য দাবী করিয়া ঐরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

২২শে জুন—কলিকাতায় এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গ জমিদারী উচ্ছেদ বিল (১৯৫০) অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্ট সর্বপ্রথম ময়মনসিংহ জেলার চারিটি বৃহৎ জমি-দারী ষ্টেটের কার্যভার আগামী ১৫ই জুলাই হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। উক্ত চারিটি ষ্টেটের মধ্যে মুক্তাগাছার স্বর্গত মহারাজ শশি-কান্ত আচার্যের এবং গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর জমিদারী আছে।

বোম্বাই-এ এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ এই আশা ব্যক্ত করেন যে, ভারত সরকার ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধিরোধ করিতে সমর্থ হইবেন।

বর্ধমান জিলা বোর্ডের নির্বাচনে সদর মহ-কুমায় ১০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র তিনটি এবং সম্মিলিত প্রগতিবাদী দল ৭টি আসন লাভ করিয়াছে।

২৩শে জুন—অদ্য বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের বিশেষ পূর্ণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলনের সভাপতি লালা দেশবন্ধু গুপ্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "ভারতের সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত শোচনীয় ব্যাপারের প্রথম হইতেই ভারত সরকার সংবাদ-পত্রকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রজাতন্ত্রী সরকারের হাত হইতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমাদের এখানে মিলিত হওয়া মর্মান্তিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

নয়াদিল্লীতে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া ভারতকে ১ লক্ষ টন গম সরবরাহ করিবে।

২৪শে জুন—বোম্বাইয়ের ১২টি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি বাঙলা দেশে গঠিত পিপলস্ পার্টির নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নায়কত্বে প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবে বলিয়া ঘরোয়াভাবে স্থির করিয়াছে। কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টি ভিন্ন বোম্বাই রাজ্যের অন্যান্য দলের দুই দিবসব্যাপী এক ঘরোয়া সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

দশদিন অতিবাহিত হইবার পর অনশনকারী মেডিক্যাল ছাত্রগণ অদ্য সকালে ফলের রস পান করিয়া অনশন ভঙ্গ করেন।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই জুন—অদ্য উত্তর কোরিয়ার আকাশে মার্কিন জেট বিমানের সহিত এক যুদ্ধে পাঁচটি কম্যুনিস্ট জেট বিমান ধ্বংস ও দুইটি ঘায়েল হয়।

১৯শে জুন—পারস্য ইঙ্গ-ইরাণ তৈল কোম্পানীর প্রতিনিধিগণের সহিত তৈল সংক্রান্ত সর্বপ্রকার আলোচনা বর্জন করিয়াছেন। পারস্য সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তৈল বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগ অর্পণের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তৈল কোম্পানী উহার জবাব দিয়াছেন। কিন্তু এই জবাব গ্রহণযোগ্য নহে।

২০শে জুন—পারস্য সরকার তাঁহাদের কর্ম-চারীদের সুবৃহৎ ইঙ্গ-ইরাণ তৈল কোম্পানীর কলকারখানার দখল লইবার আদেশ দিয়াছেন।

২২শে জুন—পারস্যের তৈল শিল্পের [illegible] গ্রহণকারী কমিশন প্রথম সরকারীর যে আদেশ করিবেন, অদ্য ইঙ্গ-ইরান তৈল কোম্পানীর বৃটিশ কর্ম-চারীবৃন্দ তাহা অমান্যের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কমন্সসভায় পারস্য তৈল সমস্যা সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তরদানকালে বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ হার্বার্ট মরিসন বলেন যে, পারস্য [illegible] ইংরেজ কর্মচারীদিগকে অপসারণের ইচ্ছা [illegible] সরকারের নাই।

রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাথু রিজওয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট এক বার্তা প্রেরণ [illegible] কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর শক্তি[illegible] সদস্য রাষ্ট্রসমূহের নিকট আরও সৈন্য প্রেরণের আবেদন জানাইয়াছেন। অদ্য মার্কিন বিমানবহর মাঞ্চুরিয়া সীমান্তবর্তী সিনউইজু [illegible] প্রবল বোমাবর্ষণ করে।

২৩শে জুন—বৃটিশ সরকার পারস্যের প্রাপ্য স্টার্লিং আটক করিয়াছে। এই অর্থের পরিমাণ হইতেছে ৩ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং।

রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের নেতা মঃ জেকব মালিক ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখায় যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য কোরিয়ায় যুদ্ধরত পক্ষগুলির মধ্যে এক সম্মেলন আহবানের প্রস্তাব করিয়াছেন।

২৪শে জুন—ইরাণী সৈনারা ইঙ্গ-ইরাণ তৈল কোম্পানীর কারমানসা তৈল শোধনাগার পরিবেষ্টিত করে এবং বৃটিশ ম্যানেজার মিঃ ডোরেক হবসনকে তাঁহার আবাসে আবদ্ধ রাখে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাসিক—১০৲
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ]   শনিবার, ২২শে আষাঢ়, ১৩৫৮ সাল।   Saturday, 7th July, 1951.   [৩৬শ সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য রেশন

ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের গভর্নমেণ্ট দেশে রেশনের বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়াছেন; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এতৎ-সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি অদ্যাপি অপূর্ণ রহিয়াছে। তবে আশা আছে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী সম্প্রতি আমাদিগকে আশ্বাস দান করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, পূর্ণ রেশন রেশন-ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট অতিরিক্ত এক লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরবরাহের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভারত গভর্ন-মেণ্ট ৭৫ হাজার টন খাদ্যশস্য এতদর্থে মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ খাদ্যশস্য কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিবে, এই-রূপ আশা করা যাইতেছে। সেগুলি হাতে পাইলে বার আউন্স রেশন-ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ রেশন-ব্যবস্থার প্রবর্তন এখনও ভবিষ্যতের উপরই নির্ভর করিতেছে। ইতোমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রেশন-ব্যবস্থায় আর এক বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। গত ২রা জুলাই হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেশনে চাউল বরাদ্দের পরিমাণ আরও কমাইয়া দিয়াছেন। স্বল্প রেশন-ব্যবস্থাতে প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু এক সের পাঁচ ছটাক করিয়া চাউল দেওয়া হইত, চাউলের পরিমাণ কমাইয়া এখন এক সেরে নামানো হইয়াছে, তৎপরিবর্তে গমের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এগার ছটাক হইতে এক সের করা হইয়াছে। চাউল বাঙালীর প্রধান খাদ্য। প্রধান খাদ্য-রূপে গমকে গ্রহণ করিতে বাঙালী এখনও অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু চাউলের বরাদ্দ বাঙালীর ভাগ্যে যাহা কমিয়াছে, তাহা আর বাড়িবে না। কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, তাঁহারা নিরুপায়। মফঃস্বলে রেশন-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করিতে হইতেছে। ইহার উপর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংগ্রহ-ব্যবস্থাও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। অধিকন্তু ভারত গভর্ন-মেণ্টের ভাণ্ডারে চাউলের একান্তই অভাব। বলা বাহুল্য, যুক্তিতে ত্রুটি কিছু নাই; কিন্তু খাদ্য রেশনের এইরূপ অব্যবস্থা যে কতদিন চলিবে, এ-প্রশ্ন থাকিয়াই যাইতেছে। চাউলের অভাব সত্যই কি ইহার কারণ? পশ্চিমবঙ্গের সংভরণ সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে যে বেতার-বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে কিন্তু তাহা মনে হয় না। তাঁহার মতে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে চাউলের যে দুর্মূল্যতা ঘটিয়াছে, মুদ্রাস্ফীতি কিংবা ফসলের অভাব ইহার মূলে কারণ বলা যায় না। প্রত্যুত খাদ্যশস্য মজুত করিবার লোভই ইহার মূলে রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে চাউল গুদামজাত করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যতে লাভবান হইবে, এইরূপ একটা প্রবৃত্তি এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারা কৃত্রিমভাবে চাউলের বাজারে চড়া দর সৃষ্টি করিতেছে। বস্তুত ব্যাধির নিদান-নির্ণয় এক্ষেত্রে ঠিকই হইয়াছে। লাভখোর ও মজুতদারদের এই যে দুষ্প্রবৃত্তি, সরকারী সদিচ্ছা কিংবা উপদেশ-মূলক বিবৃতিতে ইহা সংযত হইবে না, ইহা নিশ্চিত। প্রকৃতপক্ষে সরকারী সরবরাহ-ব্যবস্থা যদি সুনিয়ন্ত্রিত হয় এবং খাদ্যসঙ্কট দেখা দিবার সম্ভাবনা কোন অঞ্চলে না ঘটে, তবেই এ সমস্যার সহজে সমাধান হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, সরকার এই কর্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। সমগ্র দেশকে খাদ্যশস্য সম্বন্ধে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাঁহারা স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবেন এবং বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবেন না, ইহাই ছিল তাঁহাদের সংকল্প। কিন্তু সে-সঙ্কল্প তাঁহারা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। অবশেষে ভিক্ষাপাত্র লইয়াই বিদেশের দুয়ারে তাঁহাদিগকে বাহির হইতে হইয়াছে। ভ্রান্ত-বিশ্বাসে পরিচালিত না হইয়া যদি বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া পূর্ব হইতে খাদ্য সংগ্রহ সুনিয়মিত এবং সরবরাহ-ব্যবস্থা তাঁহারা সুনিয়ন্ত্রিত রাখিতে সমর্থ হইতেন, তবে মজুতদার এবং লাভখোরদের রাক্ষসী প্রবৃত্তি পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনে এতটা অনর্থ ঘটাইতে সমর্থ হইত না বলিয়াই আমরা মনে করি।

আত্মঘাতী নীতি

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা কিছুদিন হইতে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। গত বৎসর প্রতি মাসে পাঁচ হাজার হইতে ছয় হাজার উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আশ্রয় লইত; কিন্তু গত জুন মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে এক মাসেই তের হাজারের অধিক উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। ইহাদের

অনেকেই খুলনা, যশোহর এবং বরিশালের লোক। খাদ্যসংকটে পড়িয়াই ইংহারা দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। যে কারণেই হোক, মোটামুটি ইহাই দেখা যাইতেছে যে, দিল্লী-চুক্তির ফলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে পূর্ববঙ্গে আশ্বস্তির সঙ্গে অবস্থান করিবার মত আবহাওয়া সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জটিল সমস্যার চাপ ক্রমাগত পশ্চিমবঙ্গের উপর আসিয়া পড়িতেছে। বলা বাহুল্য, এইভাবে উদ্বাস্তু-স্বরূপে একান্ত অসহায় অবস্থায় যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আশ্রয় লইতেছেন, দেশের লোক তাঁহাদের দুঃখেকষ্টে সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সকল রকমে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেই লোকে ইচ্ছুক। বস্তুত উদ্বাস্তুদের অভাব-অভিযোগের কারণ অনেক আছে আমরা জানি এবং তাঁহাদের দাবী সমর্থন করিতে আমরা কোনদিনই কুণ্ঠিত নহি। এ সম্পর্কে প্রধান কথা এই যে, উদ্বাস্তুগণের দাবী পূরণের সব আন্দোলন সফল হইবার পক্ষে জনসাধারণের সহানুভূতিই পরম সম্পদ এবং হয়ত অনেকটা এই কারণেই উদ্বাস্তুদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়াই সচেতন থাকিতে হইতেছে। ইহা ভিতরের কথা। কিন্তু কিছুদিন হইতে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণের একটা অংশ কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিবার উদ্দেশ্যে নিতান্ত ভ্রান্তপথ অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা ইহা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। কয়েকদিন পূর্বে ট্রেন চলাচল বন্ধ করা ইংহাদের একটা নীতি হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে কলিকাতা শহরে আর্থিক-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। কয়েকদিন ধরিয়া রাণাঘাটে রেল লাইনের উপর অহোরাত্র ট্রেন আটকের এই অভিযান চলে। আমরা জানি, এই যে আন্দোলন, ইহার গোড়া কোথায়। ফলত একদল লোক নিজেদের রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার মতলবে অসহায় উদ্বাস্তুদিগকে এই সব কাজে প্ররোচিত করিতেছে; তাঁহাদিগকে ক্রীড়নক-স্বরূপে ব্যবহার করিতেছে। উদ্বাস্তুদের **দুঃখ-দুর্দশা দূর করা ইহাদের উদ্দেশ্য নয়। বাস্তবিক পক্ষে এই ধরণের কাজের ফলে জনসাধারণ উদ্বাস্তুদের প্রতি বিম্বিষ্ট হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে অসহায় এই জন-শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা বাড়িবে বই কমিবে না, ইহা তাহারা বেশ ভাল রকমেই জানে। দুঃখের বিষয় এই যে, উদ্বাস্তুগণ ইহাদের অপ-চেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছেন না: তাঁহাদের স্বার্থ, আর রাজনীতিক দলের উপদলীয় স্বার্থ যে এক নহে, তাহা তাঁহাদের উপলব্ধি করা কর্তব্য এবং জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা পরিচালনা করা তাঁহাদের পক্ষে দরকার। অনর্থক উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের নিজেদের পক্ষে আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করিতে যাহারা তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করে, তাহাদের সম্বন্ধে উদ্বাস্তুগণ যেন সতর্ক থাকেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।**

দ্বিতীয় বন-মহোৎসব

গত ১লা জুলাই হইতে দ্বিতীয় বৎসরের বন-মহোৎসব পর্ব আরম্ভ হইয়াছে। বৃক্ষ-রোপণ ও পালন এদেশের সমাজ-জীবনে নূতন কিছু ব্যাপার নয়। বহুদিন হইতে ব্যবহারিক এই প্রয়োজন সামাজিক নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া পূর্ণ করা হইতেছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক নাগরিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবন হইতে এই অনুষ্ঠানের মূল প্রাণধারাটি বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন ভারতে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে পুনরায় প্রাণধারা সঞ্চারের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে এই উৎসবপর্ব উদ্‌যাপিত হয়। এবারও উৎসবে অপ্রতুলতা কিছু ঘটে নাই। অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা দিল্লীতে ভারতের অন্যতম সচিব শ্রীযুত মুন্সিজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বহস্তে বৃক্ষরোপণ করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যপালগণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে সঙ্গীত, আবৃত্তি, স্তুতি ও স্তবও যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আমাদের মতে এই উৎসবে একটি দিক হইতে বিশেষ ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষ-রোপণের এই অনুষ্ঠানটিকে শুধু সাময়িক উৎসব হিসাবে দেখিলেই চলিবে না। ফলতঃ এই জাঁকজমক যদি দুই দিনের জন্য হয়, তবে ইহার মূল্য বিশেষ কিছু নাই এবং সেই পথে দেশের সমাজ-জীবনে এই অনুষ্ঠানটির প্রাণবত্তাও কিছু সঞ্চার করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত দেশের বনানীসম্পদ যদি সত্যই বৃদ্ধি করিতে হয়, সরকারকে সেজন্য সুপরিকল্পিত কর্মপ্রণালী লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে ক্রমিক-ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। সমগ্র দেশ-ব্যাপী সেই বিশেষ পরিকল্পনাকে কাযে পরিণত করিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন, সেখানে তেমন-ভাবে এ-কাজে জোর দিতে হইবে। ফলত এইভাবে যদি তাঁহারা অগ্রসর হইতে সমর্থ হন, তবে দেশের লোকের আগ্রহ এই দিকে স্থায়ীভাবে জাগ্রত হইবার সম্ভাবনা আছে। উৎসব-আড়ম্বরের গুরুত্ব একেবারে না আছে, এমন কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু সেই উৎসব-আড়ম্বর যদি জনসাধারণের চিত্তকে স্পর্শ না করিতে পারে এবং শুধু পদাধি-কারী কয়েকজন ও অভিজাত সম্প্রদায়েরই তাহা বাৎসরিক সৌখীন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে ইহার স্থায়ী মূল্য কিছুই বর্তাইবে বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য, হিসাব ধরিয়া শুধু তিন কোটি গাছ বৎসর বৎসর লাগাইয়া গেলেই চলিবে না, সেগুলি যাহাতে রক্ষিত হয় এবং প্রতি-পালিত হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই কর্তব্যবোধ সমাজ-জীবনে জাগ্রত রাখিবার জন্য দেশসেবক কর্মীদের সাধনা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

বস্ত্রসংকটের কারণ

দফায় দফায় সরকারী প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বস্ত্রসংকটের সমাধান হইবার কোন লক্ষণই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। প্রকৃতপক্ষে গত এপ্রিল মাস হইতে এ সম্বন্ধে আমরা কয়েক দফা সরকারী প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে প্রথমে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় যে, জুন মাসে বস্ত্র-সমস্যা সমাধান হইবে; কিন্তু জুন মাসে সমস্যা কাটে নাই, বরং অবস্থা অধিকতর জটিল হইয়া উঠে। অতঃপর বাণিজ্য সচিব শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, জুলাই মাসে সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে

বং মিলের কাপড়ের কষ্ট লোকের আর াকিবে না। কিন্তু মিলে কাপড় তৈয়ার ইলেই যে কাপড়ের কষ্ট দূর হইবে, এ ম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ হিয়াছে। কারণ দেখা যাইতেছে, মিলে াপড় তৈয়ার হয় বটে; কিন্তু দেশের াকের ব্যবহারের জন্য নয়। সরকারী বস্থায় দোকানে যে ধুতি পাওয়া যায়, সগুলি পরিধানের উপযুক্ত নয়, শাড়ি তো লভ। লংক্লথ, মার্কিন, এগুলিও প্রাপ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। অবস্থা েখিয়া মনে হয়, দেশের লোকের বস্ত্রের ভাব পূরণ করা মিলওয়ালাদের উদ্দেশ্য হে। বিক্রয়ের অযোগ্য কাপড় বাজারে জমা রিয়া তুলিয়া বিদেশে বস্ত্র রপ্তানির ুবিধা করাই বোধ হয় তাহাদের মতলব। েশের লোকের অভাব পূরণ করিবার পযোগীভাবেই যদি কাপড় তৈয়ারী করা া হয়, তবে মিলের ভরসা করিয়া থাকিয়া াভ কি? প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য সচিব শ্রীযুত হতাব মহাশয়ের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ুলাই মাসে মিলের কাপড়ের অবস্থার যদি ন্নতিও সাধিত হয়, অর্থাৎ বাজারে মিলের াপড় বর্তমানের চেয়ে বেশি পরিমাণে েলে, তথাপি জনসাধারণের পক্ষে বস্ত্র-ংকটের যে প্রতিকার ঘটিবে, ইহা মনে হয় া। কারণ মিলের কাপড়গুলি যদি ব্যবহার া করা যায়, তবে সেগুলি বাজার ছাইয়া ফেলিলেও বস্ত্রাভাবজনিত দুর্গতি দূর হবার নহে। প্রকৃতপক্ষে দুর্মূল্যতা এবং াধারণের ব্যবহারোপযোগী কাপড়ের অভাব, এই দুইটি কারণ বস্ত্রসংকটের মূলে রহিয়াছে। দেশের বস্ত্র-সংকটের প্রতিকার করিতে হইলে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, সাধারণের ব্যবহারোপযোগী ধুতি এবং শাড়ি যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সরকার হইতে মিলওয়ালারা সুবিধা কম পাইতেছেন না। এই কয়েক মাসের মধ্যেই কাপড়ের দাম অন্তত চার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী ব্যবস্থার ফলে তুলা সরবরাহের ক্ষেত্রে তাঁহারা অনেক সুবিধা পাইয়াছে। সুতার অসুবিধাও অনেকটা দূর হইয়াছে। সুতরাং ধুতি বা শাড়ির দুষ্প্রাপ্যতার পক্ষে ন্যায়-সংগত কোন কারণই নাই। বস্তুত এক্ষেত্রে মিলওয়ালাদের কারসাজিই কাজ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীযুত নিকুঞ্জ-বিহারী মাইতি সেদিন আমাদিগকে এই ভরসা দিয়াছেন যে, কষ্ট আর এক মাস। আগস্ট মাস হইতেই রকমওয়ারী ধুতি-শাড়ি বাজারে প্রচুর মিলিবে; কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। সে ব্যাপারে হাত কেন্দ্রীয় সরকারের। ভারত সরকারের অবিলম্বে এ সম্বন্ধে অবাহত হওয়া প্রয়োজন এবং সাধারণের ব্যবহারোপযোগী ধুতি, শাড়ি, লংক্লথ, মার্কিন প্রভৃতি যাহাতে মিলগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়, সেজন্য মিল-ওয়ালাদিগকে বাধ্য করা দরকার। দেশের লোকের দুঃখ দেখিয়া মিলওয়ালারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এ-কাজে আগ্রহশীল হইবেন, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই।

ডাঃ গ্রাহামের কর্মক্রম

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি ডক্টর ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম করাচীতে পদার্পণ করিয়াই এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বিবৃতিটি অবশ্য নিতান্তই নির্দোষ; কিন্তু নির্দোষ বলিয়া যে সন্তোষজনক, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। ডক্টর গ্রাহামের বক্তব্য এই যে, ভারত এবং পাকিস্থান এই উভয় গভর্নমেণ্ট যাহাতে কাশ্মীর সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন, তাহাতে সাহায্য করিবার জনাই তিনি এখানে আসিয়াছেন। নিজেদের কোন সিদ্ধান্ত এই দুই গভর্নমেণ্টের উপর চাপাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। বলা বাহুল্য, গ্রাহাম সাহেবের ইহা শুধু মুখের কথা মাত্র এবং বড়জোর তাঁহার এই উক্তির মধ্যে সৌজন্য হয়ত আছে। কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহার স্বরূপ ইহাতে উন্মুক্ত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীর সম্পর্কে প্রকৃত প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়া তাঁহাদের নিজেদের সিদ্ধান্তই ভারতের উপর জোর করিয়া চাপাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নিরাপত্তা পরিষদেরই নিযুক্ত প্রতিনিধি স্যার ওয়েন ডিক্সন কাশ্মীর সম্পর্কে কার্যত পাকিস্থানকে আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতির দিক হইতে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যেরূপ নীতি অবলম্বন করা উচিত, পরিষদ তাহা করেন নাই এবং কার্যত তাঁহাদের নিজেদের অভিসন্ধিপূর্ণ নীতি ভারতের উপর চাপাইবার জন্যই জিদ ধরিয়া তাঁহারা চলিতেছেন। অধিকন্তু কাশ্মীরের যাঁহারা অধিবাসী, তাঁহাদের অভিমতও তাঁহারা মানিয়া লইবেন না, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ়সংকল্প। কাশ্মীরবাসীরা যাহাতে গণ-পরিষদ গঠন করিয়া নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে, সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের উপর চাপ দিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। এরূপ অবস্থায় ভারত কিংবা পাকিস্থান কোন গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া নিরাপত্তা পরিষদের উদ্দেশ্য নয়, কোন মূর্খ এমন কথার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইতে পারে? বস্তুত পাকিস্থানের সম্বন্ধে ঐ কথা হয়ত সত্য, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে মোটেই সে যুক্তি চলে না। ডক্টর গ্রাহাম কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানে ভারত ও পাকিস্থান, এই উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতা লাভ করিবেন, এই আশা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহাতে সমস্যা সমাধানের পক্ষে বিশেষ কিছু সাহায্য হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না; কারণ নিরাপত্তা পরিষদের ইঙ্গ-মার্কিন কূটচক্রজালে তাঁহার কাজের গণ্ডি সম্পূর্ণই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিক কর্ণধারগণ এ সত্য পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা জানেন, ডক্টর গ্রাহামের সঙ্গে কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে ভারত সরকার একবার যদি কোন রকমে জড়াইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদেরই অনুকূলে জালে টান পড়িবে এবং তাঁহারা কাজ অনেকটা গুছাইয়া লইতে পারিবেন। তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, যদি বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের মোহ-জালে বিভ্রান্ত হইয়া ভারত সরকার কাশ্মীর সম্পর্কে কোন রকমে ভুল চাল চালিয়া বসেন, অর্থাৎ দুর্বলতার বশবর্তী হন, তবে তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের নৈতিক ভিত্তি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং মধ্যযুগীয় বর্বরতা আবার নানাভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ মাত্র নাই। শান্তি সকলেরই কাম্য; কিন্তু শান্তির নামে দুর্বলতা অশান্তির অপেক্ষাও মারাত্মক।

মিঃ মালিকের উক্তির সূত্র ধরে' মার্কিন কর্তৃপক্ষ জেনারেল রিজওয়েকে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনা করার জন্য অপর পক্ষের সেনানায়কদের প্রতি আহ্বান জানাতে আদেশ করেন। জেনারেল রিজওয়ের বেতার আহ্বানের উত্তরে উত্তর কোরিয়ার সেনাপতি মার্শাল কিম ও কোরিয়ায় যুদ্ধরত চীনা 'স্বেচ্ছাসেবক' বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল পেং জানিয়েছেন যে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালাতে তাঁরা রাজী আছেন। জেনারেল রিজওয়ের প্রস্তাব ছিল যে, উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা ওনসান বন্দরে অবস্থিত জুটলাণ্ডিয়া নামক ডেনমার্কদেশীয় হাসপাতাল জাহাজে আলোচনার জন্য মিলিত হতে পারেন। উত্তরে উত্তর কোরিয়ান ও চীনা সেনাপতিরা উপরোক্ত জাহাজের পরিবর্তে কেসং নামক স্থানে আলোচনা বৈঠক করার প্রস্তাব করেন। সময় সম্বন্ধে তাঁরা জানান যে, ১০ই ও ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে আলোচনা শুরু হতে পারে। কেসং জায়গাটি বর্তমান দুই বাহিনীর মধ্যবর্তী 'নো ম্যানস ল্যাণ্ড'এ ৩৮ অক্ষরেখার সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত। জেনারেল রিজওয়ে কেসংএ বৈঠক করার প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়েছেন। ১০ই জুলাই অথবা যদি উত্তর কোরিয়ান ও চীনা সেনানায়কদের প্রতিনিধিরা প্রস্তুত হতে পারে, তবে তার আগেই যাতে আলোচনা শুরু হতে পারে জেনারেল রিজওয়ে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। জেনারেল রিজওয়ের প্রথম আহ্বান ৩০এ জুন বেতারে প্রচারিত হয়। উত্তর কোরিয়ান ও চীনা কর্তৃপক্ষ যুদ্ধবিরতির আলোচনা অবিলম্বে আরম্ভ না করে ১০।১২ দিন দেরী করতে চাওয়ার অর্থ কী—এই নিয়ে এ পক্ষের অনেকের মনে খটকা লেগেছে। এই ফাঁকে আবার একটা প্রচণ্ড আক্রমণের আয়োজন করছে না তো? ওপক্ষেও সাবধানবাণী উচ্চারিত হচ্ছে হুঁশিয়ার থেকো, সাম্রাজ্যবাদীদের কি বিশ্বাস আছে। যা-ই হোক আপাতত কোনো পক্ষেই সতর্কতার অভাব হবে না।

কোরিয়ায় কি সত্যই শান্তি স্থাপিত হতে যাচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর এখনো অনিশ্চিত। আমেরিকা যুদ্ধবিরতি চায় সন্দেহ নেই, কিন্তু চীনাদের মতে শান্তি স্থাপনের পক্ষে কতকগুলি কাজ অবশ্য কর্তব্য। কমুনিস্টরা যদি ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণে না আসে, তা হলেই এখন মার্কিন কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজী আছেন, শুধু রাজী নন এখন এই তাঁদের কাম্য। কিন্তু চীনের পক্ষে ফরমোজার প্রশ্ন, জাপানী সন্ধির প্রশ্ন, ইউনোতে চীনা প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন বাদ দিয়ে শান্তির কথা চিন্তা করা সম্ভবই নয়। সুতরাং যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে চীন শান্তির কথাও তুলবে। জেনারেল রিজওয়ের উত্তরে মার্শাল কিম ও জেনারেল পেং-এর বিবৃতিতে শান্তি শব্দের উল্লেখেই অনেকের দুশ্চিন্তা আরম্ভ হয়ে গেছে, কারণ শান্তির কথা উঠলেই তার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠবে, যেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়াই হচ্ছে এখন মার্কিন নীতি। চীনারা এসব জেনে-শুনেও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে এগিয়ে আসছে কেন এবং তার প্রথম ইঙ্গিত মিঃ মালিকের কাছ থেকেই বা এলো কেন? এ প্রশ্নও অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে। এর এক কারণ এই হতে পারে যে, চীনাদের যুদ্ধে এত বেশি লোকক্ষয় হচ্ছে যে, তারা আর পেরে উঠছে না। কিন্তু যুদ্ধে চীনাদের যে ক্ষতিই হয়ে থাকুক, সেটা এমন বেশি হয়নি, যাতে তার ভয়ে চীনকে লেজ গুটিয়ে আসতে হবে। হয় কোরিয়া থেকে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যকে দূর করে দেওয়া অথবা চীনের অন্যান্য জাতীয় দাবী পূরণ (যথা ফরমোজার পুনরধিকার, ইউনোতে প্রতিনিধির আসন লাভ, জাপানী সন্ধির সর্ত নির্ধারণে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি) —এর কোনটাই যদি না হয়, তবে পিকিং সরকারের মুখরক্ষা হবে না। সুতরাং যুদ্ধবিরতির কথা পাড়ার পিছনে চীন ও রাশিয়ার হয়ত একটা মতলব আছে বলে অনেকে অনুমান করছেন। চিয়াং-কাইশেক, ফরমোজা প্রভৃতির ব্যাপারে মার্কিন ও ইংরেজের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তবে ইংরেজ ও মার্কিনের অন্যান্য মিত্রেরা সেটা আপাতত ধামাচাপা দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু চীন যদি প্রথমে যুদ্ধবিরতিতে রাজী হয়ে শান্তি স্থাপনের সর্ত হিসাবে ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর দাবী করে, তখন মার্কিনের পক্ষে তার মিত্রদের মুখ চেপে রাখা কঠিন হবে, ফলে ইঙ্গ-মার্কিন মহলের অন্তর্বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইংলণ্ডে কোরিয়ার যুদ্ধ জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে উঠেছে, আজ নাকি চীন যুদ্ধ বন্ধ করতে আগ্রহ দেখায়, তবে চীনের অন্যান্য রাজনৈতিক দাবী, সেগুলির ন্যায্যতা বৃটিশ গভর্নমেণ্টও পূর্বে স্বীকার করেছেন, সেগুলির বিরুদ্ধাচরণ বৃটিশ জনমত সহ্য করবে বলে মনে হয় না। সুতরাং তখন বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে মার্কিন সরকারের নীতি সমর্থন করা অত্যন্ত কঠিন হবে। যুদ্ধবিরতির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে যদি সুদূর প্রাচ্যের সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে রাশিয়া একটা পঞ্চশক্তির কনফারেন্স ডাকার প্রস্তাব করে বসে তাহলেও ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ বেকায়দায় পড়বে। যুদ্ধবিরতির আলোচনা যে মুহূর্তে বর্তমান মার্কিন নীতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যের বিপরীতমুখী হবার লক্ষণ দেখাবে, সেই মুহূর্তেই একটা গোলযোগ বেধে আলোচনা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা উপস্থিত হবে। সেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেটা যে রু[illegible] প্রোপাগাণ্ডা-বিশারদদের বিশেষ কাজে লাগবে, তা বলাই বাহুল্য।

৪।৭।৫১

রাষ্ট্রভাষা

রাষ্ট্রভাষার যে প্রয়োজন আছে সে সত্য র্কাতীত; কিন্তু প্রশ্ন সে ভাষা গণ-ান্দোলন উদ্বুদ্ধ করতে পারবে কি না। াঁরা মনে করেন, স্বরাজ লাভ হয়ে গিয়েছে খন আর গণ-আন্দোলনের কোনো য়োজন নেই তাঁরা হয় মারাত্মক ভুল রছেন নয় ভাবছেন দেশের জনগণ তাঁদের লা পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে খাটবে আর াঁরা শহরে শহরে দিব্য খাবেন দাবেন আর কউ কোনো প্রকারের তেড়িমেড়ি করলে াণ্ডা উঁচিয়ে ভয় দেখাবেন এবং তাইতেই র কিছু বিলকুল ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে।

সেটি হচ্ছে না, সেটি হবার জো নেই। যে জনসাধারণকে একদা স্বাধীনতা সম্বন্ধে চেতন করে স্বরাজের জন্য লড়ানো হল াদের এখন ডেকে আনতে হবে রাষ্ট্র-নির্মাণ কর্মে। তারা যদি ভারতীয় রাষ্ট্রকে আপন রাষ্ট্র বলে চিনতে না পারে, সে রাষ্ট্রের প্রতি যদি তার আত্মীয়তাবোধ না জন্মে তবে নানাপ্রকারের বিপদের সম্মুখীন হতে হবে—তার ফিরিস্তি দেবার প্রয়োজন নেই। পাড়ার কম্যুনিস্টকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন—সে সব বাৎলে দেবে।

এখন প্রশ্ন, কোন্ ভাষার মাধ্যমে আমরা জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হব? বেশীর ভাগ লোকই স্বীকার করে নিয়েছেন পাঠশালাতে র একটি ভাষা শেখানো হবে—অর্থাৎ হিন্দী ় সব অঞ্চলের আপন ভাষা সেগুলো বাদ দিয়ে আর সর্বত্র প্রাদেশিক ভাষা মাত্রই শেখানো হবে। অর্থাৎ বাঙলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র অঞ্চলের পাঠশালাগুলোতে ছেলেমেয়েরা শুধু আপন আপন মাতৃভাষা শিখবে। ভারতবর্ষ থেকে নিরক্ষরতা কবে পর্যন্ত দূর হবে জানিনে, তবে আশা করি সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, নিরক্ষরতা দূর হওয়ার বহু বৎসর পর পর্যন্ত এদেশের শতকরা ৭০টি ছেলেমেয়ে পাঠশালাতেই লেখাপড়া শেষ করবে—এবং শিখবে শুধু মাতৃভাষা।

বাদবাকীরা হিন্দী শিখবেন—সে হিন্দী-জ্ঞান কতটা হবে তার আলোচনা পরে হবে—এবং ক্রমে ক্রমে অতি অল্পসংখ্যক লোকই ইংরিজি শিখবেন, আজকের দিনে চীন

সৈয়দ মুজতবা আলী

কিম্বা মিশরের লোক যে অনুপাতে ইংরিজি শেখে।

রাষ্ট্রভাষা চালু করনেওয়ালারা বলেন, আজ ইংরিজি ভাষা যে রকম ব্যবহৃত হচ্ছে একদিন হিন্দী তার আসনটি নিয়ে নেবে অর্থাৎ যাবতীয় রাজকার্য, মামলা মোকদ্দমার তর্কাতর্কি রায়, আপিল, বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, পার্লিমেণ্টে বক্তৃতা-ঝাড়া তাবৎ কর্ম হিন্দীতে হবে। কলকাতা তথা অন্ধ্র, তামিলনাড় বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীর মাধ্যমে জ্ঞানদান হবে কি না সে সম্বন্ধে অনেকেরই মনে ধোঁকা রয়ে গিয়েছে তবে কট্টর রাষ্ট্র-ভাষীদের বাসনা যে তাই সে সম্বন্ধে খুব বেশী সন্দেহ নেই (এই শেষোক্ত প্রস্তাব নিয়ে পরে আলোচনা হবে)।

তা হলে অনায়াসে ধরে নিতে পারি ইংরেজ আমলে যে রকম আমাদের বেশীর ভাগ ভালো লেখকেরা সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরিজিতে বই লিখতেন (রাধা-কৃষ্ণণের ইণ্ডিয়ান ফিলসফি থেকে পণ্ডিতজীর ডিসকভারী অব্ ইণ্ডিয়া ইস্তেক) ঠিক তেমনি আমাদের ভবিষ্যতের শক্তিশালী লেখকেরা তাঁদের প্রচেষ্টা নিয়োগ করবেন হিন্দীর মাধ্যমে এবং যে সৎসাহিত্য —গল্প উপন্যাস কবিতাই সাহিত্যের এক-মাত্র কিম্বা প্রধান সৃষ্টি নয়—হিন্দীতে গড়ে উঠবে সেটা, বাঙলা, তামিল, গুজরাতী সাহিত্য সৃষ্টি প্রচেষ্টার খেসারতি দিয়ে। এতদিন যে ভারতীয় ভাষাগুলিতে নানা-মুখী সৃষ্টিকার্য প্রসার এবং প্রচার লাভ করতে পারছিল না তার জন্য আমরা প্রাণ-ভরে ইংরিজির জগদ্দল পাথরকে গালমন্দ করেছি এখন হিন্দীর চাপে সেই একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, কিন্তু হয়ত গাল-মন্দ করবার অধিকার থাকবে না। পূর্ব-

বাঙলায় যখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করবার চেষ্টা হয়েছিল তখন আমি অন্যান্য নানা যুক্তির ভিতর এইটিও পেশ করে তীব্র কণ্ঠে আপত্তি জানিয়েছিলুম এবং বহু পূর্ব-বঙ্গবাসী আমার যুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন।

আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যের যে ক্ষতি হবে সে কথা এখন থাক। উপস্থিত মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, ভারতীয় নবীন রাষ্ট্রনির্মাণ সম্বন্ধে গবেষণা আলোচনা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ যে সব গ্রামভারী কেতাব, ব্লু বুক, দলিল-দস্তাবেজ, উৎসাহোদ্দীপক ওজস্বিনী এক গম্ভীর পুস্তক রচিত হবে সেগুলো হবে হিন্দীতে এবং দেশের শতকরা সত্তরজন লোক গ্রামে বসে সেগুলো পড়তে পারবে না।

একদা এই সত্তরজনের লোকের প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র এই সত্তরজনকে বাদ দিয়ে নির্মাণ করা যাবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাবৎ কেতাব বাঙলাতে লিখলেই কি এরা সেগুলো পড়ে বুঝতে পারবে? সে সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। আমার বিশ্বাস দেশ সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় সব সময় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দেওয়া ছাপের উপর নির্ভর করে না। এমন সব ইংরিজি-অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ শুদ্ধ বাঙলা-ভাষী পাঠশালার পণ্ডিত আছেন, যাঁরা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন আছেন বলে এবং বাঙলা দৈনিকের মারফতে অতি অল্প যে রাষ্ট্রসংবাদ পান তারই জোরে গ্র্যাজুয়েটকে তর্কে ঘায়েল করতে পারেন। অনেক এম এ পাশ লোক বই জমায় না —জমালে জমায় চেক বুক—আর অনেক পাঠশালার পণ্ডিত গোগ্রাসে যে কেতাব পান তাই গেলেন। পুনরায় নিবেদন করি, জ্ঞান-তৃষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর নির্ভর করে না।

তাই দেখতে হবে আমাদের রাষ্ট্রনির্মাণ প্রচেষ্টার সর্বসংবাদ যেন এমন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে ভাষা মানুষের মাতৃভাষা। ইংরেজ আমলে ইংরিজি জাননে-ওলা ও না-জাননেওলার মধ্যে যে ন্যক্কার-জনক কৌলীন্যের পার্থক্য ছিল সেটা যেন আমরা জেনেশুনে আবার প্রবর্তন না করি।

(ক্রমশ)

দীর্ঘ দুমাসের ছুটি ফুরিয়ে গেল। দুটি মাস যে কিছুই করি নি, নিরবচ্ছিন্ন ছুটি উপভোগ করেছি তাই ভেবে মনে বেশ একটি তৃপ্তি বোধ করছি। আজেবাজে কাজ করে ছুটির অপব্যয় করলে মনে আফসোস থেকে যেত। রাস্তায় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হ'লে সবার মুখে এক কথা, ছুটি তো ফুরালো। এ'রা ছুটিটাও খাটাখাটুনিতে কাটিয়েছেন, এ'দের মনে আফসোস থেকে গেছে। ছুটি ফুরানো কথাটা এমন সুরে বলেন—অনেকটা সেই পল্লীবালিকার মতো—পিতাকে ডেকে বলেছিল, বাবা বেলা যায়। আর যেই না সেই কথা কানে যাওয়া কোথাকার লালাবাবু—যাচ্ছেন পাল্কীতে চড়ে—তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল। সেই যে পাল্কী থেকে নেমে বিবাগী হয়ে চলে গেলেন আর সংসারে ফিরলেন না। কিন্তু উক্ত কন্যার পিতা কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছিল বলে শুনি নি। শুনে আপনারা আশ্বস্ত হবেন এই দুমাস ধরে আমার কন্যা প্রায় রোজ বিকেলের দিকে আমাকে ঠেলে ঘুম থেকে জাগিয়েছে, রোজই কন্যার কণ্ঠে শুনেছি, বাবা বেলা যায়। কিন্তু রোজ শুনে শুনেও লালাবাবুর মতো আমার মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হ'ল না। আমার কন্যাকণ্ঠের সেই বাণী শুনে কোনো প্রতিবেশী কিম্বা পথচারী ইতিমধ্যে সংসার ত্যাগ করেছেন বলেও শুনি নি। শুধু মুখের কথায় ব্যাকুল হওয়ার দিন গিয়েছে। একালের মানুষ সাইরেনের আওয়াজ শুনে অভ্যস্ত, সহজে এ'দের পিলে চমকায় না। তেমন সাংঘাতিক কথাও কর্ণে যদিবা প্রবেশ করে, মর্মে প্রবেশ করে না। নইলে ছুটি ফুরানো কি কম কথা, প্রায় হরি, দিন তো গেলোর মতই সাংঘাতিক। •

ইন্দ্রজিতের আসর

ইহলোকে থেকেও যিনি পরলোকের কথা ভাবেন তাঁরই 'বেলা যায়' শুনে বিচলিত হবার কথা। ছুটির মধ্যেও যিনি আপিস আদালত ইকুল কলেজের কথা ভাবতে থাকেন, তিনিই ছুটি ফুরাবার নামে চমকে উঠেন। আমি পরলোকে যেমন বিশ্বাস করি না ছুটির সময়ে আপিস খোলার কথাও তেমনি ভাবি না। সেজন্য আপিস খোলার নামে আমার চমকে উঠবার কোনো কারণ থাকে না।

ছুটির দিন আর কাজের দিনের ব্যবধান আমি যদ্দুর পেরেছি ঘুচিয়ে দিয়েছি। ছুটির দিনটাকে কাজের দিন করি নি, কাজের দিনটাকেই যথাসম্ভব ছুটির দিন করে তুলেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইস্কুলের ছেলেদের জন্য যে বই লিখেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন ছুটির পড়া। সে বই তো নেহাৎ কেবল ছুটিতে পড়বার জন্য নয়। পড়ার তাড়া নেই, তাগিদ নেই তবু পড়ছি তাকেই বলে ছুটির পড়া। ইস্কুলটাকেই এমন করে গড়বার চেষ্টা করেছিলেন যেখানে নিরন্তর একটি ছুটির আবহাওয়া বইতে থাকবে। সেখানে মনটা কাজের থেকে ছুটি চায় না, কারণ ছুটিটাই সেখানে একটা কাজ। রবীন্দ্রনাথ নিজে ইস্কুল পালানো ছেলে। সেজন্য এমন ইস্কুল করে দিয়েছেন যেখানে ছেলেরা বাড়ি পালিয়ে ইস্কুলে ছোটে। কারণ বাড়িতে ছুটি নেই ইস্কুলেই ছুটি।

ছুটির একটা নিজস্ব sanotity আছে। ছুটির দিনকে শাস্ত্রে বলেছে পবিত্র দিন। স্বয়ং বিধাতাপুরুষ বিধান দিয়েছিলেন ছ'দিন কাজ করবে, সাত দিনের দিন ছুটি সৃষ্টিকার্যের ফাঁকে তিনিও ছুটি নিয়েছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার ছুটির প্রয়োজন আছে মানুষ সৃষ্টজীব, তার ছুটির প্রয়োজন নেই এ-ই হচ্ছে মানুষের স্বভাব। খোদার উপরে খোদকারি করতে না পারলে সে খুশি হয় না। মানুষের গর্বের কথা হ'ল আমার মরবার ফুরসৎ নেই। যার মরবার ফুরসৎ নেই সেই অপরকে মারবার ফুরসৎ খুঁজে বেড়ায়। সুসভ্য সমাজে সব চাইতে বড় প্রশংসার কথা হচ্ছে—অমুক একজন অক্লান্ত কর্মী। এই সব অক্লান্ত কর্মীরাই জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছেন। কাজের নাম দুর্ভোগ আর ছুটির নাম উপভোগ একথা যদি স্মরণ থাকত, তবে সকলের জীবনই উপভোগ্য হ'ত। পৃথিবীর অক্লান্ত কর্মী রাষ্ট্রনায়কেরা যদি এক যোগে ছ মাসের ছুটি নেন, যদি বলেন, কোনো ভাবনাই ভাবব না, কোনো সমস্যার সমাধান করব না, তাহলে সকল সমস্যার আপনিই সমাধান হয়ে যাবে। নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হবে না। ক্লান্ত পৃথিবী আপনিই শান্ত হবে। কারণ, সমস্যা সমাধানের চেষ্টাকেই বলে অশান্তি।

এত সব গুরুতর কথা বলবার কিছু প্রয়োজন ছিল না। আসল কথা ছুটিটা আমি পুরোপুরি উপভোগ করেছি। অথচ আমার জীবনে সমস্যার অভাব নেই এবং সে সমস্যার গুরুত্ব পৃথিবীর আর সব সমস্যার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। তবে কিনা সে সব সমস্যা সমাধানের আমি কিছুমাত্র চেষ্টা করি না। সমাধানটাকে ক্রমাগত মুলতুবী রেখে রেখে আশা করছি বাকি জীবনটা দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারব। এই সমস্যা মুলতুবী রাথার আর্টকেই বলে ছুটি

মোগলসরাই স্টেশনে এসে ট্রেনটা যখন পেঁছিলো রাত তখন দশটা বেজে গেছে। এরপর আর লোকালটার জন্যে অপেক্ষা করা যায় না। এ পথটুকু টাঙা নয়তো এক্কাতেই যাওয়া যাক'—করুণাময় বললে।

রাত দশটা বলতে কি বোঝায় স্টেশনের ঝকঝকে আলোয় এতক্ষণ ওরা কেউই ঠাওর করতে পারেনি। টের পেল আলোর এলাকা পার হয়ে এসে। ওভারব্রিজের এদিকে নামতেই গা-ছম-ছম অন্ধকার। একটা বিড়ির দোকানে টিমটিমে হ্যারিকেনটা জ্বলছে শুধু, কোলে কুলো নিয়ে বিড়ি পাকাচ্ছে একজন। আর ঘাস চিবোতে চিবোতে পা ছুঁড়ছে ঘোড়াটা, মশার কামড়েই হয়তো।

একটাই টাঙা। শেয়ারে ভাড়া ঠিক করে উঠে পড়লো ওরা। করুণাময় আর নীলা। কোলের ছেলেটাও।

টাঙা ছেড়ে দিতেই নীলা ফিসফিস করে বললে, ট্রেনে গেলেই হ'ত!

—কি ভীতুরে বাপু! ভয় পাবার কি আছে? হাসতে হাসতে বললে করুণাময়। নীলা একটু সাহস পেল হয়তো। হাসি চেপে বললে, ভূতের।

—মানুষ মরলে শিব হয় এখানে, ভূত-পেত্নী হয় না।

কোলের বাচ্চাকে ভালো করে আঁকড়ে ধরে চাপা চাপা কণ্ঠে নীলা বললে, সত্যি ভয় করছে না তোমার? একটুও না? একা একা এই অন্ধকারে—

—একা কোথায়, আমি তো রয়েছি। ব'লে সহাস্যে নীলার গলা জড়িয়ে ধরলো করুণাময়।

—ইস্, কি বীরপুরুষ! কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে নীলা হাসলে।

—বীরপুরুষ কি না দেখাবো? কাছে এগিয়ে এলো করুণাময়।

আর আঁৎকে ওঠার ভাণ করলে নীলা।—এই যা, অসভ্যতা ক'রো না বলছি।

অবশ্য বলার প্রয়োজন ছিল না। ব'ড়শির মত বাঁক নিয়ে হঠাৎ ছুটতে সুরু করলো টাঙাটা। এমন ঝাঁকানি, শক্ত করে ধরে না বসলে এখনি বুঝি ছিটকে পড়বে রাস্তায়।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই নির্জন আর নিঃঝুম অন্ধকারের মাঠে নামলো টাঙাটা। পীচের পথটুকুর ওপরই যেন রাজ্যের অন্ধকার এসে জমেছে। চারদিক চুপচাপ। কোথাও কোন শব্দ নেই, কোথাও কোন আলো নেই। দু'পাশের ঢালু মাঠের পাশ দিয়ে শুধু শিরদাঁড়ার মত উঁচু হয়ে আছে লম্বা মেটাল রোড। দু'জোড়া খুরের টপাটপ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই কানে আসে না।

পথের দু'পাশে গাছের সারি, ছায়া শরীরের রহস্য মেখে নিঃশ্বাস চেপে আছে। স্তব্ধতা ভাঙবার জন্যে মাঝে মাঝে দু'চারটে কথা বলে নীলা, দু'চারটে কথার জবাব দেয় করুণাময়। তারপর আবার সেই নীরবতা। বাচ্চাটাকে এক বুক থেকে আরেক বুকে বদলে নিতেই হাতের চুড়িতে টুংটাং আওয়াজ উঠলো। ভয় হবার কথা বটে, নেই নেই করেও হাতে গলায় কোন্ না হাজার পাঁচেক টাকার সোনা আছে। আর এমন নির্জন রাতের রাস্তায় টাঙাওলাদের গুণ্ডামির কথাও শোনা গেছে। লোকটা অবশ্য রোগাসোগা, কিন্তু করুণাময়ই বা কি এমন পালোয়ান! তা ছাড়া রাস্তার কোথাও দলের লোকও যে অপেক্ষা করছে না, তাই বা কে বলতে পারে। করুণাময়ও যেন অনেকক্ষণ চুপচাপ, কথা বলছে না কেন? ভাবতেই কেমন ভয় ভয় করল, পিছন ফিরে তাকালে নীলা। না গঙ্গার পুল এখনো অনেক দূরে। দূরের আলোর সারিও গাছপালায় ঢাকা পড়েছে।

গাড়ীটা খাড়াই উঠতে সুরু করেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু শব্দ ভেসে আসছে কিসের? টাঙারই ডুমডুমি যেন, ঘোড়ার খুরের টপাটপ' টপাটপ আওয়াজ আসছে। ওদের গাড়ীটার অনেক আগে আগে আরেকটা টাঙা চলেছে বোধ হয়। হ্যাঁ, ঘাড় ফিরিয়ে সামনের পথের দিকে তাকালে নীলা, অনেক

আগে এক টুকরো সলতে-পোড়া লণ্ঠন দুলছে মনে হ'ল।

তারপর হঠাৎ এক সময় আলো অদৃশ্য হয়েছিল, শব্দ শোনা যায়নি। কখন আপনা থেকেই ভয় মুছে গিয়েছিল নীলার মন থেকে। তন্দ্রায় চোখ জুড়ে আসছিল একবার, আবার পরমুহূর্তেই চোখ টেনে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছিল। আর সেই ফাঁকে কখন সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ একটা চিৎকারে চমকে জেগে উঠলো নীলা। আর পরক্ষণেই আতঙ্কে শিউরে উঠলো। খোকন কৈ? যাক, পড়ে যায় নি, করুণাময়ের কোলেই আছে। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কখন করুণাময়ের কাঁধে মাথা রেখেছিলো ও, আর সেই ফাঁকে নীলার অজান্তেই খোকনকে কোলে তুলে নিয়েছে করুণাময়।

কিন্তু চিৎকার কিসের? ভালো করে চেয়ে দেখলে নীলা।

এক পাশে একটা টাঙা, আর বিদ্ঘুটে চেহারার একটা লোক দু'হাত তুলে ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় অস্পষ্ট হলেও লোকটাকে দেখা গেল। বেঁটে আর মোটা। কালোও নিশ্চয়ই। শুধু সাদা ফুটফুটে একটা ধুতি আর পাঞ্জাবী দাঁড়িয়ে আছে যেন। মুখটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে, পাঞ্জাবীর হাত দুটোর ভেতর থেকে রক্তমাংসের কোন হাত বেরিয়ে এসেছে বলে মনেই হ'ল না। কন্ধকাটাও বোধ হয় এতখানি বীভৎস নয়।

আতঙ্কের ঝিমঝিমুনি দূর হতেই চোখ পড়লো আরো একজনের ওপর। দেখলে, টাঙাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। কপাল অবধি ঘোমটায় ঢাকা এক টুকরো ফর্সা মুখ। আড়নম্র চোখে হয়তো ওদেরই লক্ষ্য করছে।

ইতিমধ্যে কি যেন কথা হ'ল করুণাময় আর ঐ গুণ্ডা মত লোকটার সঙ্গে। কি বিশ্রী আর মোটা লোকটার গলার স্বর। আর গায়ে শক্তিও তেমনি। বাক্স প্যাঁটরাগুলো ও গাড়ী থেকে এ গাড়ীতে এনে রাখলো এমন অবহেলায় যেন দুটো হাল্কা সুটকেশ আনলো।

—শালার ঝামেলা! বোধ হয় করুণাময়কেই শোনাবার জন্যে বললো। মাঝ রাস্তায় চাকা ভেঙে পড়ে রইলেন। আপনারা না থাকলে কি দশাটা হ'ত বলুন তো? কথার শেষে সশব্দে হেসেও উঠলো লোকটা, আর সঙ্গে সঙ্গে দু'পাটি সাদা সাদা দাঁত ঝকঝক করে উঠলো।

করুণাময় বিরক্তির গলায় বললে, আসুন তাড়াতাড়ি এমনিতেই রাত অনেক হয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হয়েছে বৈকি। লোকটা একটা তুড়ি বাজালো হাতে, শ্যামু, উঠে পড়ো চটপট।

মেয়েটি এগিয়ে এলো ধীরে ধীরে, টাঙার আড়াল থেকে। ঘোমটাটা টেনে বাড়িয়ে দিলে একটু। তারপর পাদানিতে পা দিয়ে ওঠবার আগেই ওকে টুপ করে দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরলো লোকটা, বসিয়ে দিলো সামনের আসনে। নিজেও উঠে বসলো।

টাঙা ছেড়ে দিতেই ঝরঝর করে ভয়ের ঘাম ঝরে পড়লো। তবু কেমন অস্বস্তি লাগলো নীলার। পিঠোপিঠি বসেছে ওরা, মাঝখানে ইঞ্চিখানেকের একটা কাঠের ব্যবধান থাকলেও ঝাঁকানির চোটে পিঠে পিঠ লাগছে মাঝে মাঝে। আর তাও ঐ অদ্ভুত লোকটাই বসেছে ওর পিছনে। করুণাময়ের পিঠেও কি ঐ মেয়েটির পিঠ লাগছে? নীলা ভাবলে এক মুহূর্ত, আড়-চোখে একবার তাকিয়ে মনে মনেই হাসলে।

গঙ্গার পুলে উঠতেই ওপারের আলো-ঝলমল শহর চোখে পড়লো। ঠাণ্ডা জ'লো বাতাসের প্রলেপ পড়লো সারা গায়ে। ফিসফিস করে বললে, ধর্মশালার খবরটা নাও না এবার।

করুণাময় খানিক কিন্তু কিন্তু করে হঠাৎ জিগ্যেস করলে, কোথায় যাবেন আপনারা?

—চৌখাম্বা, চৌখাম্বার বাজারের মুখে। নিজের বাড়ি আছে আমার। বিশ পঁচিশ, হ্যাঁ, বিশ পঁচিশ বছর হয়ে গেল এখানে। বিশ্বনাথের গলিতে একটা জড়ির, একটা তামা পেতলের দোকান আছে আমার। নিবারণ মাইতি—নিবারণ মাইতির জড়ি-বুটির দোকান বললেই যে কেউ দেখিয়ে দেবে।

বেঁটে থামের মত চেহারা লোকটার। অথচ চোখমুখে কথার খই ঝরছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নীলাকে হাসি চাপতে হবে বুঝি এইবার। ঘাড় ফিরিয়ে লোকটার দিকে তাকালে নীলা, দেখতে পেল না বিশেষ কিছু। মনে হ'ল অন্ধকারটা হঠাৎ এক জায়গায় ঘন হয়ে আবছা মূর্তি নিয়েছে শুধু, মানুষ নয়।

করুণাময় একটার পর একটা প্রশ্ন করে আর জড়িবুটির দোকানদারটি অনর্গল আত্ম-কাহিনী আউড়ে যায়। ভদ্রতার খাতিরেও জিগ্যেস করে না, কোথায় যাবেন, কোথায় উঠবেন? টাঙাটাও এদিকে গঙ্গার পুল পার হয়ে আলো উজ্জ্বল শহরে ঢুকেছে।

করুণাময় শেষে নিজেই প্রশ্ন করলে, ভালো ধর্মশালা বা হোটেল টোটেলের খবর দিতে পারেন?

—ধর্মশালা? ভালো অথচ ধর্মশালা? আসল উত্তর এড়িয়ে গিয়ে লোকটা আবার বকবকুনি সুরু করলে। তার চেয়ে বলুন না সোনার পাথরবাটি। হেঁ হেঁ করে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলে লোকটা। বললে, বিশ পঁচিশ বছর হয়ে গেল মশাই, এই কাশীতে, চোখ বেঁধে ছেড়ে দিন চৌখাম্বার বাড়ি থেকে ঠিক দেখবেন দোকানে পেঁৗছে যাবো, একটা কলার খোসাতেও পা পড়বে না। তার আপনি বলেন কিনা—

—না, মানে খবরটা পেলে উপকার হ'তো।

—খবর আমি না দিলে কে দেবে শুনি। ধর্মশালাই বলুন, অধর্মশালাই বলুন, কাশীর সব শালাকেই আমি চিনি। ডালকামুণ্ডিতে চলে যান সিধে, বাঙালীর হোটেল চান তাও পাবেন। তবে পাড়াটা খারাপ, বাঈজী বেবুশ্যেদের আড্ডা......

কথা পাল্টাবার জন্যে করুণাময় তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, হোটেলের নামটা কি বলে দিন না?

মুখুজ্যে, মুখুজ্যের হোটেল বললেই নিয়ে যাবে। আমার পেয়ারের লোক হচ্ছে, গিয়ে বলবেন, নিবারণ মাইতি পাঠিয়ে দিলে। আমার নাম করতে ভুলবেন না যেন। এই রোখো, রোখো......টাঙাওয়ালার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো নিবারণ।

চৌখাম্বার গলির সামনেই টাঙা দাঁড়ালো। ছোটখাটো সুন্দর বৌটিকে টুপ করে আবার নামিয়ে দিয়ে বোঁচকাবুঁচকিগুলো দু'হাতে ঝুলিয়ে টাঙার পিছনে এসে দাঁড়ালো নিবারণ। নীলাকে বললে, আসি মা লক্ষ্মী, রইলেন তো এখন ক'দিন। যাবেন আমার দোকানে। বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকেই বলবেন, নিবারণ মাইতির জড়িবুটির দোকান। তা হলেই দেখিয়ে দেবে।

সংস্কারের বদলে কাঁধটা একটু ঝাঁকালে শুধু।—আসি তা হলে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে নীলা, আর সংগে সংগে নিবারণের আড়ালে দাঁড়ানো বৌটির দিকে চোখ গেল ওর। ঘোমটা খুলে পড়েছে। হঠাৎ যেন মেয়েটির সারা মুখে রক্ত জমে গেছে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে করুণাময়ের দিকে। ফিরে তাকালে নীলা। হ্যাঁ, বাজারের ঝলমলে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল নীলা, করুণাময়ের মুখেও অস্বস্তির ছায়া।

—বৌ বুঝি?

মেয়েটি এগিয়ে এসে কৌতুকের হাসি হাসলে। তারপর একবার করুণাময়ের দিকে একবার নীলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, বৌ বুঝি?

—হুঁ। বলেই করুণাময় অন্য দিকে মুখ ফেরালে।

মেয়েটি তবু নাছোড়বান্দা। করুণাময়ের কোলের শিশুটিকে দেখিয়ে আবার প্রশ্ন করলে, তোমার?

—হুঁ। আবার সেই গম্ভীর গলার ছোট্ট উত্তর।

—ছেলে না মেয়ে?

করুণাময় উত্তর দিলো না দেখে নীলাই বললে, ছেলে।

মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসলো। তারপর নিবারণের কানে কানে কি যেন বললে।

চমকে উঠলো নিবারণ।—এ্যাঁ! এতক্ষণ বল নি? আরে মশাই আসুন আসুন। নেমে আসুন, হোটেলে কোথায় যাবেন?

করুণাময় কোনরকমে বললে, না থাক্। হোটেলেই যাবো। মুখুজ্যে না কার......

—হ্যাঁ, মুখুজ্যের হোটেলে যাবেন। শালা এক নম্বরের জোচ্চোর। আসুন, নেবে আসুন। তাছাড়া, আপনি হলেন গিয়ে সম্বন্ধে আমার......হে হে করে হাসলো নিবারণ—সবচেয়ে বড়ো সম্বন্ধ, কি বলেন?

অগত্যা নামতেই হ'ল ওদের।

নীলা শুধু সকৌতুকে বললে, পরিচয়টা কি এ জন্মের, না গত জন্মের?

করুণাময় উত্তর দিলো না। পরিচয় তো গত জন্মের নয়, গত জীবনের।

শ্যামলীর সংগে আবার দেখা হবে, এতদিন বাদে হঠাৎ এমনভাবে দেখা হবে ভাবতেও পারে নি করুণাময়। আশ্চর্য! কত বদলে [illegible]

আর, আর সারা রাস্তা ওর পিঠের স্পর্শ পেয়েও করুণাময় বুঝতে পারে নি, সন্দেহ হয় নি একবারের জন্যেও। অথচ, এই তো ক'টা বছর আগে, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলে বুঝতে পারতো।

কাছাকাছি বাড়িতেই থাকতো ওরা। করুণাময়ের সংগে বাড়িতে এসে দেখা না করতে পারলেও দেখা দিয়ে যেত প্রতিদিন বিকেলে। রোদ পড়ার সংগে সংগে কান পেতে বসে থাকতো করুণাময়। তারপর ওর বোনের সংগে দুর দুর করে কাঠের সিঁড়িতে শব্দ করে ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে আসতো শ্যামলী। দু'একটা সকৌতুক ইশারা ইংগিত, দু'চারটে ছোট ছুটকো কথা ছাড়া আর কিছু হ'ত না অবশ্য। তবু নিজের ঘরে বসে বসে ওদের উচ্ছকিত হাসি আর কথা শুনতো ও। আবার যখন সন্ধ্যা নামার সংগে সংগে হাল্কা পায়ে নেমে যেত শ্যামলী, তখনও ঠিক বুঝতে পারতো করুণাময়।

শুধু কি তাই! একদিন ওর অনুপস্থিতিতে ওর ঘরে সারাটা দুপুর কাটিয়ে গিয়েছিল শ্যামলী। সুধার সংগে গল্প করতে করতে ওর বিছানায় শুয়েও ছিল হয়তো। একটিমাত্র স্প্রিংয়ের মত কোঁকড়ানো চুল দেখে ধরতে পেরেছিল, টেবিলের ওপর ছড়ানো কাঁচিতে কাটা কাগজের টুকরোগুলো দেখেই চিনেছিল কার কান্ড।

তারপরেও ওর ঘরে বহুবার এসেছে শ্যামলী। পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা তো দূরের কথা, সব ওলটপালট করে দিয়ে যেত সে। আলমারী ঘেঁটে এ থাকের বই ও থাকে, ও থাকের বই টেবিলের ওপর এনে রাশ করে রাখতো। কোনদিন চাদরটা চেয়ারে আর মাথার বালিশ পায়ের দিকে ফেলে দিয়ে গেছে। তবু বেশ লাগতো করুণাময়ের। শ্যামলী এসেছিলো, ওর ঘরের বাতাসে তার স্পর্শ রেখে গেছে, একথা ভাবতেও রোমাঞ্চ অনুভব করতো করুণাময়।

ভোর ছ'টায় সময় কলেজ বসতো শ্যামলীদের। ছ'টা বাজার আগেই ট্রামে-বাসে, ফুটপাতের ধারে ধারে, পার্কের রেলিং ঘেঁষে রঙবেরঙের পাখির মত শাড়ী জড়ানো মেয়েদের ভিড় দেখা যেত। ঘুম-ভাঙ্গো-ভাঙ্গো শিশিরে ধোয়া নরম-শরম চোখ আর হাসিতে ভেজা ঠাণ্ডা কথার কৌতুক ভেসে উঠতো।

করুণাময়ও এসে দাঁড়াতো এই সময়েই। একটা থামের পাশে থামের মতই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো। পূর্বদিকের রাস্তাটার দু'পাশে উঁচু উঁচু বাড়ির সারি, তারই ফাঁকে সিঁথির মত সরু এক ফালি আকাশ দেখা যেত, রূপো চমক দিতো রোদের গায়ে। ক্রমশঃ রঙ বদলাতো আকাশ। ফিকে ফিকে লোক চলাচল শুরু হ'ত, কাঁধে হোসপাইপ ব'য়ে নিয়ে জলঝুড়ি ছিটিয়ে যেত দুটো লোক।

তারপরই হঠাৎ এ গলি সে গলি থেকে ঝাঁক ঝাঁক পায়রার মত মিষ্টি মেয়ের দল এসে হাজির হ'ত এই মোড়টায়। কথা আর হাসিতে বাতাস কেঁপে উঠতো। রাস্তার ধারে ধারে, পার্কের গায়ে গায়ে কলেজের ফটক অবধি তীর্থকন্যাদের ভিড় হোত শুধু।

বাতাসের মত সোঁ সোঁ শব্দ করে একটার পর একটা ট্রাম পিছলে এসে থামতো মোড়ের মাথায়। তারপর আরেক দফা দম নিয়ে একেবারে কলেজের গেটে। পাখা ঝটপট করে বেরিয়ে আসতো ওরা সবাই, একজন ছাড়া।

শ্যামলী। কলেজ পৌঁছবার আগেই শ্যামলী নেমে পড়তো। একটা স্টপেজ আগে, মোড়ের মাথায় ট্রাম থামতেই একরাশ মোটা মোটা বই-খাতা বুকে চেপে চুপ করে নেমে পড়তো ও। ছোটখাটো একহারা শরীর, চটুল চোখ, চতুর দৃষ্টি। আর মুখের হাসির মতই চঞ্চল, স্বতঃস্ফূর্ত। বাঁহাতে বইপত্তর, ডান হাতে পিছনে রবারের টুকরো লাগানো একটা হলদে পেন্সিল।

ট্রাম থেকে নেমেই শাড়ীর আঁচলটা ঘুরিয়ে এনে পিঠ ঢাকতো, পাড়ের কোণাটা দাঁতে চেপে গালে পেন্সিল বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসতো ও। দূরে দাঁড়ানো করুণাময়ের দিকে।

শ্যামলীকে নামতে দেখে ট্রামের জানালায় বসা মেয়েরা ঠোঁট টিপে হাসতো, আলাপী দু'চারজন টীকাটিপ্পনি ছুঁড়তে কসুর করতো না। ঘাড় না ফিরিয়েও শ্যামলী বুঝতে পারতো, শুনতে পেত, হাসতো করুণাময়ের সংগে চোখাচোখি হতেই।

আর ট্রামটা চলে যেতেই ধুপ করে বই-খাতাগুলো করুণাময়ের হাতের ওপর ফেলে দিতো।

—বাঃ রে, তোমার বইখাতা রোজ রোজ আমি বইতে যাবো কেন। অনুযোগ করতো করুণাময়।

শ্যামলী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উত্তর দিতো,

ওমা, দু'দিন পরে আমাকেই বইতে হবে, বইখাতাতে আপত্তি এখন থেকে?

তারপর, কোনদিন ফাঁকা মাঠের নির্জনতায় পার্কের ঘাসে, গাছের ছায়ায় ছায়ায় কিংবা পথে পথে ঘুরেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। পা ছড়িয়ে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসতো ওরা, আর চিনেবাদামের খোসার স্তূপ জমে উঠতো ওদের পাশে।

সেদিনও এসে বসলো ওরা নির্জন পার্কের কোণে, পুরোনো বেঞ্চিটায়। কিন্তু কিন্তু কিছুতেই যেন সহজ হতে পারলো না করুণাময়। ভালবাসা যতই গভীর হয়, মনের গোপনে ভয়ের বেলুন ততই হয়তো ফেঁপে ওঠে। ভালবাসা হারাবার ভয়। ভয় থেকে সন্দেহ। শ্যামলীকে এত কাছে পেয়েও যেন কাছে পাচ্ছে না করুণাময়, এত মন জানাজানির পরেও যেন দূরে সরে যাচ্ছে শ্যামলী।

প্রলাপের মত নিরর্থক কথা আর কথা।

শ্যামলীর পিঠের ওপর হাত রাখলে করুণাময়। আরো কাছে টেনে আনতে চাইলে ওকে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালে শ্যামলী। ধীরে ধীরে করুণাময়ের হাত সরিয়ে দিলে ওর পিঠের ওপর থেকে।

এমন ঘটনা নতুন নয়। করুণাময়ের কাছে অজানা কোন বিস্ময় নয় শ্যামলীর এ ব্যবহার। মনের কপাট খুলে রেখেও স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে চায় যেন শ্যামলী। কিন্তু কেন?

সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় নি করুণাময়। শুধু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে কখনো-সখনো, আঘাত পায় নি।

সেদিনও আহত বোধ করলো না করুণাময়, কিংবা এত বেশি আঘাত পেল যে, অনুভবের চেতনাও হারিয়ে ফেললো।

ঠিক্ অন্য অন্য দিনের মতই শ্যামলী ওর হাতটা সরিয়ে দিতেই করুণাময় বললে, আমি জানতাম।

—কি জানতে? কপালে ভ্রূ তুলে স্মিত-হাস্যে প্রশ্ন করলে শ্যামলী।

ওর হাসি দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লো করুণাময়।—হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'র না। এ চিঠি তোমারই লেখা।

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে ছুঁড়ে দিলো করুণাময়। 'প্রেম নয় রে বোকা মেয়ে, ও আমার সময় কাটাবার সঙ্গী শুধু।'—কোন বান্ধবীকে লেখা শ্যামলীরই চিঠি। বিশ্বাস [illegible] যে চিঠি ও লিখেছিল তা যে করুণাময়কেই পাঠিয়ে দিয়ে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তা কি ও ভেবেছিল কোনদিন। শ্যামলী কি ক'রে বোঝাবে লজ্জা বাঁচাবার জন্যে, সত্য ঢাকবার জন্যে অনেক মিথ্যাই মেয়েদের বলতে হয়।

—তোমার কাছে এতদিন যা বলেছি, তার কোন দাম নেই, যা লিখতে বাধ্য হয়েছি, সেইটুকুই সত্যি হ'ল? দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল এলো শ্যামলীর।

তারপর কিছুদিন চলেছে না দেখার, না দেখা দেয়ার অভিমান। আবার ভুল ভেঙেছে, সন্দেহ দূর হয়েছে। বিরহশেষের উন্মাদনায় মিলনের দিনকে কাছে টেনে আনবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছে করুণাময়।

ভয়ে আনন্দে থরথর করে কেঁপে উঠেছে শ্যামলী, অনুরোধের স্বরে বলেছে, না, না, বাবার অমতে কিছু করতে বলো না আমায়। তাছাড়া কৌতুকে হেসে উঠেছে শ্যামলী।—ইস্কুলের মেয়েদের মত পালিয়ে যাওয়া, না, মরে গেলেও তা পারব না আমি।

তবু, চুপি চুপি একদিন ওর দিদির কাছে খুলে বলেছে সব কথা। মাকে অনেক ছোট-বেলাতেই হারিয়েছে, তা নইলে মাকেও বলতে বাধতো না হয়তো। কিন্তু সব স্নেহ মমতা উপেক্ষা করেছেন শিবব্রতবাবু। না, এ অনাচার তিনি হতে দেবেন না, এমন অসামাজিক ঘটনা তাঁর বংশে ঘটতে পাবে না। মা হারা মেয়েকে মানুষ করেছেন তিনি, জীবনে কোন আঘাত দেন নি মেয়েদের, কিন্তু, কিন্তু এ অবৈধ বিবাহ তিনি সমর্থন করতে পারবেন না।

মেয়ের ইচ্ছায় বাধা দেন নি কখনো, কলেজে পড়তে দিয়েছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু, না, এ হতে দেবেন না শিবব্রতবাবু।

বলেছেন, শ্যামলীকে কলেজে যেতে হবে না আর বলে দিও।

বলেছেন, বাড়ী থেকে বেড়াতে যেতে হয় আমার সঙ্গে যেতে বলো।

বলেছেন, শ্যামলীর ওপর একটু চোখ রেখো চামেলি।

তাই, করুণাময়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতেও যতি পড়েছে একদিন। আর অন্ধ আক্রোশে বাবার ওপর গুমরে মরেছে শ্যামলী, বিছানায় পড়ে পড়ে কেঁদেছে, কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে শুধু।

তারপর।

তারপর হঠাৎ একদিন উঠে দাঁড়িয়েছে ও। হিংস্র আনন্দে নিজের মনেই হেসে উঠেছে।

ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন শিবব্রতবাবু। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন।—এসেছো। গম্ভীর গলায় বললেন শুধু।

ধীরে ধীরে পাইপটা তেপায়ার ওপর নামিয়ে রেখে করুণাময়ের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে গেলেন একবার। স্কাউণ্ড্রেল! চীৎকার করে উঠলেন হঠাৎ।

—তুমি শিক্ষিত? তুমি ভদ্রসন্তান? গর্জে উঠলেন শিবব্রতবাবু।

করুণাময় উত্তর দিলো না কোন। কি উত্তর দেবে ও? ও নিজেই জানে না কেন এ ক্রোধ, এ অপমানুক্তি। শিবব্রতবাবুর কাছে এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে ও আসে নি।

—ইডিয়ট! শিবব্রতবাবু আবার মন্তব্য করলেন।

—বাবা। বড় মেয়ে চামেলী এসে দাঁড়ালো তাঁর ঘাড়ে হাত দিয়ে। শিবব্রতবাবুর চুলে আঙুল ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে বললে, বাবা! ডাক্তার না তোমাকে জোরে কথা বলতে নিষেধ করেছে। তা ছাড়া এবার বাবার কানের কাছে ফিসফিস করে চামেলী বললে, রাগলে ক্ষতি হবে বাবা! অপমান ক'রো না ওঁকে। এত আস্তে আস্তে বললে যে, করুণাময়ের কানে গেল না কথাগুলো।

—হুঁ! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শিবব্রতবাবু। বললেন, তুমি ভেতরে যাও। চামেলী ঘরে যেতেই হাত পা থরথর করে কেঁপে উঠলো শিবব্রতবাবুর। স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারলেন না। চোখের কোণে জল জমে এলো এবার।

—ফুল। দুদিন আগে বলতে কি হয়েছিল? য়্যান্ড উই টু কুড্‌ন্ট হ্যাভ ডিটেকটেড বাট ফর দি সিমটমস্। গলায় স্বর নামিয়ে বললেন আবার।

করুণাময় তখনও বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে আছে।

—শ্যামলীর সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি দিতাম না, তোমার মত স্কাউণ্ড্রেলের হাতে মেয়ে দেবার দুর্বুদ্ধি আমার হ'ত না কোনদিন,... সাচ্ য়্যান ইনোসেণ্ট ফ্লাওয়ার... তার সর্বনাশ করতে কনসেন্সে লাগলো না তোমার ইডিয়ট।

এতক্ষণে খানিকটা রহস্যের হদিশ পেল করুণাময়। ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত ধীর বললে, শ্যামলীর কোন ক্ষতি তো মি করি নি!

—ক্ষতি করো নি? আবার গর্জে উঠলেন ব্রতবাবু।—য়্যাণ্ড সি ইজ গোয়িং টু এ গোয়িং টু বি-এ। কথা শেষ করতে লেন না শিবব্রতবাবু। তবু চমকে উঠলো ণাময়। উদ্ভ্রান্ত অবোধ্য দৃষ্টিতে শিব-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে তে নিজেরই অজান্তে বেতের চেয়ারটায় পড়লো ও। কোন কথা বলতে লো না।

—এই উইকের মধ্যেই ইউ টু মাষ্ট গেট রেডি। যাও, মেক্ ইউরসেল্প রেডি।

চেয়ার ছেড়ে উঠলো করুণাময়, বেরিয়ে ল ঘর থেকে। 'মেক্ ইওরসেল্ফ রেডি'। চলতে চলতে হাসলে করুণাময় মনেই। হ্যাঁ, প্রস্তুত হ'তে হবে, আর দিন যাতে ফিরে আসতে না হয় এখানে, জন্যেই প্রস্তুত হ'তে হবে। কিন্তু! র্য। আশ্চর্য মেয়েদের মন। সত্যি, মলীর ঐ নিরপরাধ ফুলের মত সুন্দর র আড়ালে এতখানি কলুষ কি করে করেছিল। এমন অর্থহীন খেলা খেলেছে সে এতদিন করুণাময়ের সঙ্গে। আর সব দোষ সব গ্লানি আজ করুণাময়ের বুকে কেন ঢেলে দিলো? অদ্ভুত! নয়, ও আমার সময় কাটাবার সঙ্গী চিঠির সে লাইনটা চোখের সামনে উঠলো আবার। কিন্তু, কিন্তু কে এই শের জন্যে দায়ী। আর, এসমস্ত দের ভার করুণাময়ের ওপরই বা য়ে দিলো কেন শ্যামলী। যদি সত্যিই কাউকে ও ভালবেসে থাকে, সমস্ত থেকে নিষ্কৃতি দিলো কেন তাকে? চোখের সামনে ওর সমস্ত আলো অন্ধকার গেল, পায়ের তলার মাটি বেনো নদীর মত হঠাৎ যেন ধ্বসে গেল। প্রশ্ন প্রশ্ন। হাজারো অবোধ্য প্রশ্ন ঘুরলো মাথায়, অনেক কল্পনা। একবারও মনে হ'ল না এ সবই লীর অভিনয়।

ন কয়েক পরেই আশঙ্কায় উত্তেজনায় হয়ে চামেলী এসে ডাকলো।—লী!

চিঠি লেখার নীল প্যাডখানা চাপা দিয়ে সহাস্য মুখ তুলে তাকালো শ্যামলী। আর পরক্ষণেই চামেলীর মুখে ব্যর্থতার চিহ্ন দেখে সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালে।

—শ্যামলী। ধীরে ধীরে উদাস চোখ মেলে চামেলী বললে, শ্যামলী, করুণাময় নেই।

—নেই? শুধু প্রতিধ্বনি তুললে শ্যামলী।

—চলে গেছে। খবর না দিয়ে চলে গেছে সে।

করুণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে তাকালে ও। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। তারপর হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলো শ্যামলী। সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে যেন হাসি ফেটে পড়লো তার। দেয়ালে দেয়ালে ঘা খেয়ে ঘুরে এলো সে হাসি, সশব্দ হাসির উচ্চকিত রেশ জানালার কাঁচ ভেঙে দিলো যেন। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো শ্যামলী। তবু যেন হাসি চাপতে পারছে না সে; বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে ক্রমাগত।

—পালিয়েছে। পালিয়েছে সে। শ্যামলী বললে, তারপর আবার সশব্দে হেসে উঠলো। পাগলের হাসি যেন। অর্থ নেই, শেষ নেই।

কতগুলো বছর কেটে গেল, তবু সে হাসি আর বন্ধ হ'ল না। কত ডাক্তার, কত মনস্তত্ত্ববিদ্‌কে দেখানো হ'ল, কিন্তু শিব-ব্রতবাবু মেয়েকে প্রকৃতিস্থ করতে পারলেন না।

জীবনের শেষ ক'টা দিন সমাজ সংসার থেকে দূরে সরে থেকে কিছুটা নির্বিকার আনন্দে কাটাবার জন্যে এসে উঠলেন এখানে। নিবারণ মাইতির বাড়ীর একটা অংশ ভাড়া নিয়ে বাসা বাঁধলেন নতুন করে। সঙ্গে বড় মেয়ে চামেলীও।

নিবারণ মাইতির ডাক পড়লো সন্ধ্যা দেবার জন্যে, এটা ওটা সাহায্য করবার জন্যে। নিবারণও বেঁচে গেল তার অসহনীয় একাকীত্ব থেকে।

পাশাপাশি বাড়ী, একই বাড়ীর পাশা-পাশি ঘর বললেও চলে। উত্তরের একখানা কি দেড়খানা ঘর নিয়ে নিবারণ আর তার দোকানের কর্মচারীর যৌথ সংসার। দুজনেই অবিবাহিত। আর পূবের দু'খানা ঘর ভাড়া নিলেন শিবব্রতবাবু। বারান্দা ডিঙিয়ে এবাড়ী-ওবাড়ী করা চলে যখন খুশি।

তবু প্রথম প্রথম একটু দূরে দূরে থাকতো নিবারণ। শহুরে শিক্ষিত লোক, চলনে বলনে বিদেশী ঢং ভদ্রলোকের। তার ওপর বেশভূষাতেও সর্বদা কলারহীন সার্ট আর দামী কাপড়ের ট্রাউজার। মুখে পাইপ। এসব দেখে একটু সমীহ করে চলতে হ'ত নিবারণকে খুঁটিনাটি সাহায্য করার ইচ্ছে থাকলেও ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলতো। ভয় কি শুধু শিবব্রতবাবুকে? মেয়ে দুটিকেও ভয় করতো নিবারণের। বড়োটি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, সিঁথিতে সিঁদুর, ব্যবহারেও গৃহিণী। তাই চামেলীকে তেমন ভয় পেত না নিবারণ, ভয় পেত শ্যামলীকে। বারান্দায় দাঁড়ালেই কখনো কখনো ওদের জানালার দিকে চোখ যেত, কখনো বা হাওয়ায় ওড়া পর্দার ফাঁকে কপাটের আড়ালে শ্যামলীর শ্বেত পাথরের পা দু'খানি চোখে পড়েছে, অনেক সময় তার ছোট্ট নিটোল মুখের উত্তাপ পেয়েছে।

আশ্চর্য হয়েছে মেয়েটির ব্যবহারে। যদিবা হঠাৎ কোনদিন চোখোচোখি হয়েছে অমনি হেসে উঠেছে শ্যামলী, আর নিবারণ ভেবেছে এ বুঝিবা বিদ্রূপের হাসি, উপহাসের উল্লাস।

তারপর কি করে যেন শিবব্রতবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ও, আরো অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছে শ্যামলীর। পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছে।

নিবারণের ঘর থেকে ওদের জল ঘরটা দেখা যেত। একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করলে নিবারণ, শ্যামলী আঁচাতে এসেই গলায় আঙুল দিয়ে বমি করছে। ঠিক এই ব্যাপারটাই পরপর ক'দিনই লক্ষ্য করলে ও।

আরেক দিন শিবব্রতবাবুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করছে নিবারণ, হঠাৎ শ্যামলী এসে হাজির।

—তেঁতুল আছে তেঁতুল? দিদি একটু তেঁতুল দিবি?

চামেলী কাছেই কোথায় যেন ছিল, ছুটে এসে শ্যামলীর হাত ধরে বললে, চল্, ও ঘরে চল।

কথা শুনে প্রথমটা বিস্মিত হয়নি নিবারণ, কিন্তু চোখ তুলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল ও। কেমন এক অর্থহীন উদাস দৃষ্টি শ্যামলীর চোখে, প্রকৃতিস্থ মানুষের চোখ নয় যেন। বুকের আঁচল মাটিতে লুটিয়ে

শুধু দুটো উদ্‌ভ্রান্ত চোখ কি যেন খুঁজছে।

চামেলী ওকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার আগেই এক ঝটকা দিয়ে সটান এসে বসলো ও শিবব্রতবাবুর চেয়ারের হাতলে। বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, দোলনা দেবে না আমায়, দোলনা কিনে দেবে না?

শিবব্রতবাবু বললেন, চামেলী মা, ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

চামেলী আবার টানতে টানতে নিয়ে গেল ওকে, আর কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলো।—দেখেছো বাবা, কি করেছে দেখো।

শিবব্রতবাবু ঘাড় ফিরিয়ে চামেলীর হাতের সিল্কের ছেঁড়া শাড়ীখানার দিকে তাকিয়ে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

চামেলী ক্রোধের স্বরে বললে, দেখো ছিঁড়ে একেবারে কুটিকুটি করেছে, বলে খোকনের জন্যে কাঁথা করবো। কত কাপড় ছিঁড়লো বলোতো।

শিবব্রতবাবু বিষণ্ণ হেসে বললেন, কি আর করবি মা। সবই সহ্য করতে হবে।

তারপর চামেলী চলে যেতেই নিবারণকে উদ্দেশ করে বললেন, কিছু মনে ক'রো না নিবারণ, তোমার কাছে ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলাম। আমার ছোট মেয়ে, শ্যামলীর মাথার গোলমাল আছে।

নিবারণও রহস্যের রাস্তায় আলো দেখতে পেল। আরো কিছু শোনবার জন্যে চোখ তুলে তাকালো ও।

শিবব্রতবাবুর গলার স্বর ভারী হয়ে এলো। বললেন, কত ডাক্তার দেখালাম, কত হাসপাতালে রাখলাম, তবু সারাতে পারলাম না ওর রোগ। ওর ঐ এক পাগলামি, সময়ে সময়েই ঐ এক কথা। 'খোকন আসবে, খোকনের জন্যে কাঁথা সেলাই করতে হবে, দোলনা কিনতে হবে' তার জন্যে, আরো কত যে প্রলাপ বকে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ যখন ভালো থাকে, সি'জ কোয়াইট ন্যাচরেল।

নিবারণের মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন এলো, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও ভাবলে প্রশ্নটা করা উচিত হবে কিনা। তারপর বললে, বিয়ের পর পাগল হয়েছে বুঝি? ছেলেপুলে হয়ে মারা গিয়েছিল?

—না। ছোট্ট একটা উত্তর দিয়ে পাইপ ধরালেন শিবব্রতবাবু। দু' মুখ ধোঁয়া ছেড়ে খবরের কাগজটা তুলে নিলেন হাতে। গেলেন নিঃশব্দে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, না, বিয়ে হয়নি ওর। তার আগেই হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। কখন থেকে যে ও এমন হয়ে গেছে, আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।

নিবারণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, সে কি? বুঝতে পারেন নি?

—না। তখনও ঠিক এমনি করতো। কেবল বলতো গা বমি বমি করছে, করতোও মাঝে মাঝে। আচার তেঁতুল এইসব খেতে চাইতো, আর যখন তখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তো। হাবভাব লক্ষ্য করে হঠাৎ একদিন চামেলী এসে বললে, বাবা, সর্বনাশ হয়েছে। কেউ বোধ হয় সর্বনাশ করেছে শ্যামলীর। বাপের মন, রাগের মাথায় চুল ধরে এক চড় বসিয়ে দিলাম ঐ একফোঁটা মেয়ের গালে। কত ধমক দিলাম, ভয় দেখালাম একটাও কথার উত্তর দিলে না। চামেলী এত অনুনয় বিনয় করলে, তবু সাড়া নেই মেয়ের মুখে। তারপর...

কথা বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গেলেন শিবব্রতবাবু। নিবারণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে চোখের পাতা ভিজে গেছে শিবব্রতবাবুর। গলার স্বরও যেন আটকে গেছে। নিবারণও বুকের ভেতর অবোধ্য এক ব্যথা অনুভব করলে।

মাথা নীচু করে বললে, থাক, ওসব বলতে কষ্ট হচ্ছে আপনার।

—কষ্ট? হাসলেন শিবব্রতবাবু। এখন তো সহ্য হয়ে গেছে, কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন ইট ওয়াজ এ টেরিব্‌ল্‌ শক। এখন আর পাই না। সব অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়েছি।

খানিক চুপ করে থেকে বললেন, শ্যামলী কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি কিছু। তারপর হঠাৎ একদিন ওর টেবিলে একটি ছোকরার ফটো দেখতে পেলাম, আমার পরিচিত। ডেকে এনে ধমক দিলাম তাকে, বললাম বিয়ে করতে হবে তোমাকে। ঘাড় হেঁট করে ছোকরা চলে গেল, আর ফিরলো না। তারপর একদিন জানতে পারলাম, আমাদের সব সন্দেহ মিথ্যে, শ্যামলী সত্যিই কোন দোষ করেনি। আমরাই ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, তখন থেকেই নতুন কাপড় ছিঁড়ে কাঁথা সেলাই করতে বসে গেছে শ্যামলী, দোলনা দোলনা করে আব্দার ধরেছে। বুঝলাম কোন একটা আঘাত

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে অভিভূত হ গিয়েছিল নিবারণ। এমন ঘটনা, এমন রহস্যময় কাহিনী কখনও শোনেনি ও। আশ্চর্য সামান্য একটা আঘাত থেকে কি এমন মনে বিকার ঘটতে পারে? ও বললে, হয়তো প্রথম থেকেই পাগল হয়ে গিয়েছিল আপনারা বুঝতে পারেন নি।

শিবব্রতবাবু চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর বললেন, তাও হতে পারে হয়তো কে জানে! মানুষের মন বড় ঠুনকো জিনি কখন যে কি হয়। চামেলী কিন্তু বলে, আ বিয়েতে মত দোব না বলেই ও ধরে অভিনয় করেছিল শ্যামলী। ছেলেটি হয়তো নির্দোষ, তাই ভুল বুঝে স গিয়েছিল।

নিবারণ বললে, বিচিত্র পৃথিবী অ বিচিত্র মানুষের মন। সবই হতে পারে, ব যায় না কিছুই। কিন্তু ডাক্তার দেখি সারাতে পারলেন না ওকে, এই দুঃখ।

শিবব্রতবাবু হাসলেন।—না, সারা পারলাম আর কৈ। একজন শুধু বলেছিলে বিয়ে দিলে অনেক সময় নাকি ভালো হ একেবারে না হোক কিছুটা সেরে ও কিন্তু পাগল জেনেও শ্যামলী মাকে কে বি করতে রাজি হবে বলো?

—আমি হবো। আমি বিয়ে করবো ও হঠাৎ বলে উঠলো নিবারণ। পরক্ষ ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর সারা মুখ, শিবব্র বাবুর হাতদুটো ধরে লজ্জা আর অনুন স্বরে বললে, মাফ করবেন আমায়। অ আমি ঠিক তা বলতে চাই নি। অন্যায় ফেলেছি আমি, মাফ করবেন আমাকে।

শিবব্রতবাবু হেসে উঠলেন।—আহা লজ্জা পাবার কি আছে, মানুষ কি ভে চিন্তে কথা বলে সব সময়। আমার শুনে ব্যথা পেয়েছো তুমিও, তাই ও বলে ফেলেছো।

নিবারণের লজ্জা গেল না তবু। ব আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আর এই চেহারা...আত্মবিদ্রুপের হাসি হা নিবারণ, বললে আমি আমি কিনা আপ মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের মেয়েকে করতে চাই। আবার অস্বস্তির হাসি হা নিবারণ।—করি তো দোকানদারী. কিনা...

কথা শেষ করতে পারলে না নি হাসিটা ওর কান্নার মত শোনালো।

শিবব্রতবাবু চকিতে চোখ তাকালেন।—আমি তুমি সত্যি ওকে

তে চাও নিবারণ? করবে, বিয়ে করবে
। ওকে? অনুরোধের আতিশয্যে
রণের হাত চেপে ধরলেন।

নিবারণ লজ্জায় ভয়ে কুঁকড়ে গেল যেন।
।, না। আমি অশিক্ষিত মানুষ, দোকান-
ী করে খাই, আমি...এই তো চেহারা...
না।

–সুযোগ পেলেই শিক্ষিত হওয়া যায়
রণ, আর চেহারা জন্মগত ব্যাপার।
তু মনুষ্যত্ব তা সাধনায় অর্জন করতে
। সারা দেশে এমন মনুষ্যত্ব কারো
তে পেলাম না নিবারণ, তুমি তাদের
অনেক বড়ো, অনেক বড় তুমি। বলতে
তে থরথর করে কেঁপে উঠলেন শিবব্রত-
। দু'চোখ বেয়ে দু'গাল বেয়ে
নের খুশির অশ্রু ঝরে পড়লো
।

তারপর। সত্যিই একটু একটু করে
লা হয়ে উঠলো শ্যামলী। অনেকখানি
ভাবিক হয়ে উঠলো। সুস্থ দেখালো
কে। পুরোনো দিনের সমস্ত ভুলে যাওয়া
গুলো নতুন করে মনে পড়লো আবার,
ধনের কয়েকটা সুতো হারানো বছরের
হাস শুধু মুছে গেল ওর মন থেকে।
বস হ'ল না নিবারণের কথা।

প্রথম প্রথম মনে পড়াবার চেষ্টা করতো
বারণ। পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে কনুই
খাতো, বলতো, এই যে দাগটা, কেন
লো? কামড়ে দিয়েছিলে একদিন। আর
ই কপালে এটা? কয়লা ছুঁড়ে মেরেছিলে।
শ্যামলী শুনে খিলখিল করে হেসে
তো এতও বানিয়ে বলতে পারো।

ও যে কোনদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল
থা কিছুতেই শ্যামলীর নিজের বিশ্বাস
না। তবু মাঝেমাঝে অবোধ্য প্রশ্ন
গতো মনে, সব রহস্যের যেন উত্তর খুঁজে
না। ওর কাছে সবচেয়ে বড়ো বিস্ময়
রণ। অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে
না, নিবারণ ওর জীবনে কখন এলো,
মন করে এলো। আশ্চর্য! যার আসবার
সে তো নিবারণ নয়, করুণাময়। করুণা-
কে ওর স্পষ্ট মনে পড়ে। আরো কত
মধুর স্বপ্ন। তারপর...

অনুযোগ করতো তাই নিবারণের কাছে।
দেখো, আমার স্মরণশক্তি বড্ড কমে যাচ্ছে।
ন কথা মনে পড়ে না।

অথচ শ্যামলী নিজেই বিস্মিত হ'ত। সব
গিয়েও শৈশবের, যৌবনারম্ভের দিন-
লো কি করে মনে রইলো ওর করুণা-

ময়কেই বা ভুলতে পারলো না কেন? করুণাময়! আবার কোনদিন কি দেখা হবে তার সংগে? কত-দিন উদাস মুহূর্তে প্রশ্ন জেগেছে শ্যামলীর মনে। হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায়, ওকে কি চিনতে পারবে করুণাময়? কিংবা, কে জানে ও নিজেই হয়তো চিনতে পারবে না। এমন কত কি ভেবেছে শ্যামলী, বহু-দিন। কিন্তু কোনদিন ভাবতেও পারেনি, এমন আকস্মিকভাবে দেখা হবে, এমন বিচিত্র পথে।

করুণাময়ও ভুলতে পারেনি শ্যামলীকে। যতই ক্ষত ঢাকবার চেষ্টা করেছে, ততই গভীর হয়ে উঠেছে সেটা, ব্যথা দিয়েছে। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সুন্দর একখানি মুখ, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হাস্য-মুখর একজোড়া চোখ।

তাই চোখাম্বার গলির আলোতে চিনতে কষ্ট হয়নি।

এমন দিনের সুযোগের আশায় কত কল্পনা, কত স্বপ্ন বেঁধেছিল ও। কত কথা বলবার ছিল, বলাবার ছিল! নিস্তব্ধ রাত্রির অতিথিশয্যায় শুয়ে অস্বস্তি বোধ করেছে শুধু, অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তারপর এক সময় এসে দাঁড়িয়েছে বাইরে বারান্দায়। রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকেছে, সুমুখের অন্ধকার দরদালান আর মেঘঢাকা শুক্লাকাশের মাঝে কি যেন খুঁজেছে বারবার। মেঘ সরে গেছে একসময়, এক ফালি ঠান্ডা আর নরম জ্যোৎস্নায় সারা শরীর আর মন ভিজে গেছে ওর। হঠাৎ কানে এসেছে লঘু পায়ের শব্দ, চোখে পড়েছে একটি নারী-দেহের ছায়াশরীর।

শ্যামলী এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। মৃদু মৃদু শান্ত স্বরে প্রশ্ন করেছে, কেমন আছো?

--ভালো। তুমি?

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়েছে শ্যামলী, ঈষৎ হাসির আভাস এনেছে চোখমুখে।

আর কোন কথা নয়। চুপচাপ দু'জনে দাঁড়িয়ে থেকেছে পাশাপাশি, রেলিং ধরে। তারপর হঠাৎ শ্যামলীর হাতে হাত রাখতে গেছে করুণাময়, আর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দূরে সরে গেছে শ্যামলী। চকিতে একবার ফিরে তাকিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

পুরোনো দিনের কয়েকটা ঘটনা মনে পড়লো করুণাময়ের, মনে মনে হাসলে ও। তবু অপেক্ষা করলে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। কিন্তু শ্যামলী ফিরলো না আর।

দেখা দিলো একেবারে ভোরের স্নিগ্ধ আলোয়।

কপালে ঠান্ডা হাতের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল করুণাময়ের। চোখ চেয়ে দেখলে, নীলা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে। আর চায়ের পেয়ালা হাতে শ্যামলী।

শ্যামলীর হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে এগিয়ে দিলো নীলা। বললে, তুমি ভাই তোমার রান্না দেখবে যাও, ও'র ব্যবস্থা আমি দেখছি।

শ্যামলী তবু নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো।

নীলা সহাস্যে বললে, কি আয়েশি দেখেছো? আটটার আগে বিছনা ছাড়বে না।

—এ ক'দিন তেমন আয়েশি থাকলে বাঁচবো, আমার আবার বারোটার আগে রান্নাই হয় না। ঠোঁটে হাসি কাঁপালে শ্যামলী।

বিদ্রূপের স্বরেই বোধ হয়, নীলা বললে, তোমাদের মধ্যে মিল দেখছি অনেক!

শ্যামলী সে কথা শুনতে পেল না। খোকা জেগে উঠে কান্না শুরু করেছে দেখে ছুটে গেল ও। আর খোকাকে কোলে নেয়ার পর থেকেই সব ভুলে গেল ও। সব কাজে ভুল হতে শুরু করলো।

অদ্ভুত! শ্যামলীর অমন হাসিখুশি মুখের আড়ালে কোন বিষণ্ণতা থাকতে পারে, ওর উজ্জ্বল চোখের কোণে বেদনার অশ্রু লুকিয়ে থাকতে পারে কে জানতো!

—খোকনকে আমার কাছে রেখে যাবেন ভাই? নীলাকে এক সময় বললে শ্যামলী।

নীলা উত্তর দিলে, ভালই তো। হাত পা ঝেড়ে একটু ঘুরতে পাই তা হ'লে, বসতে পাই দুদণ্ড।

—উঃ, বেশ দেখবো কেমন ছেড়ে থাকতে পারেন। কি বলো খোকন? ব'লে খোকনকেই যেন প্রশ্নের মীমাংসা করতে দেয় শ্যামলী, আর সংগে সংগে ওকে বুকে চেপে, জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

শুধু কি তাই? খোকনকে স্নান করাতে পুরো এক ঘণ্টা সময় নেয় শ্যামলী। আর সেই সময় কত প্রলাপ বকে যায় তার সংগে, ইয়ত্তা নেই। অর্থও নেই। আজেবাজে কথার পর কথা। খোকন হয়তো নিজের মনেই হাসে, নিজের মনেই ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে। সংগে সংগে আনন্দে নেচে ওঠে শ্যামলী। খোকন ওর কথা বুঝতে পেরেছে, খোকন ওকে ছেড়ে থাকতে চায় না, ইত্যাদি।

শুধু দুটো উদ্ভ্রান্ত চোখ কি যেন খুঁজছে।

চামেলী ওকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার আগেই এক ঝটকা দিয়ে সটান এসে বসলো ও শিবব্রতবাবুর চেয়ারের হাতলে। বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, দোলনা দেবে না আমায়, দোলনা কিনে দেবে না?

শিবব্রতবাবু বললেন, চামেলী মা, ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

চামেলী আবার টানতে টানতে নিয়ে গেল ওকে, আর কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলো।—দেখেছো বাবা, কি করেছে দেখো।

শিবব্রতবাবু ঘাড় ফিরিয়ে চামেলীর হাতের সিল্কের ছেঁড়া শাড়ীখানার দিকে তাকিয়ে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

চামেলী ক্রোধের স্বরে বললে, দেখো ছিঁড়ে একেবারে কুটিকুটি করেছে, বলে খোকনের জন্যে কাঁথা করবো। কত কাপড় ছিঁড়লো বলোতো।

শিবব্রতবাবু বিষণ্ণ হেসে বললেন, কি আর করবি মা। সবই সহ্য করতে হবে।

তারপর চামেলী চলে যেতেই নিবারণকে উদ্দেশ করে বললেন, কিছু মনে ক'রো না নিবারণ, তোমার কাছে ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলাম। আমার ছোট মেয়ে, শ্যামলীর মাথার গোলমাল আছে।

নিবারণও রহস্যের রাস্তায় আলো দেখতে পেল। আরো কিছু শোনবার জন্যে চোখ তুলে তাকালে ও।

শিবব্রতবাবুর গলার স্বর ভারী হয়ে এলো। বললেন, কত ডাক্তার দেখালাম, কত হাসপাতালে রাখলাম, তবু সারাতে পারলাম না ওর রোগ। ওর ঐ এক পাগলামি, সময়ে সময়েই ঐ এক কথা। 'খোকন আসবে, খোকনের জন্যে কাঁথা সেলাই করতে হবে, দোলনা কিনতে হবে' তার জন্যে, আরো কত যে প্রলাপ বকে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ যখন ভালো থাকে, সি'জ কোয়াইট ন্যাচরেল।

নিবারণের মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন এলো, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও ভাবলে প্রশ্নটা করা উচিত হবে কিনা। তারপর বললে, বিয়ের পর পাগল হয়েছে বুঝি? ছেলেপুলে হয়ে মারা গিয়েছিল?

—না। ছোট্ট একটা উত্তর দিয়ে পাইপ ধরালেন শিবব্রতবাবু। দু' মুখ ধোঁয়া ছেড়ে খবরের কাগজটা তুলে নিলেন হাতে। ... ... চোখ বুলিয়ে

গেলেন নিঃশব্দে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, না, বিয়ে হয়নি ওর। তার আগেই হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। কখন থেকে যে ও এমন হয়ে গেছে, আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।

নিবারণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, সে কি? বুঝতে পারেন নি?

—না। তখনও ঠিক এমনি করতো। কেবল বলতো গা বমি বমি করছে, করতোও মাঝে মাঝে। আচার তেঁতুল এইসব খেতে চাইতো, আর যখন তখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তো। হাবভাব লক্ষ্য করে হঠাৎ একদিন চামেলী এসে বললে, বাবা, সর্বনাশ হয়েছে। কেউ বোধ হয় সর্বনাশ করেছে শ্যামলীর। বাপের মন, রাগের মাথায় চুল ধরে এক চড় বসিয়ে দিলাম ঐ একফোঁটা মেয়ের গালে। কত ধমক দিলাম, ভয় দেখালাম একটাও কথার উত্তর দিলে না। চামেলী এত অনুনয় বিনয় করলে, তবু সাড়া নেই মেয়ের মুখে। তারপর...

কথা বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গেলেন শিবব্রতবাবু। নিবারণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে চোখের পাতা ভিজে গেছে শিবব্রতবাবুর। গলার স্বরও যেন আটকে গেছে। নিবারণও বুকের ভেতর অবোধ্য এক ব্যথা অনুভব করলে।

মাথা নীচু করে বললে, থাক, ওসব বলতে কষ্ট হচ্ছে আপনার।

—কষ্ট? হাসলেন শিবব্রতবাবু। এখন তো সহ্য হয়ে গেছে, কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন ইট ওয়াজ এ টেরিব্‌ল্‌ শক। এখন আর পাই না। সব অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়েছি।

খানিক চুপ করে থেকে বললেন, শ্যামলী কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি কিছু। তারপর হঠাৎ একদিন ওর টেবিলে একটি ছোকরার ফটো দেখতে পেলাম, আমার পরিচিত। ডেকে এনে ধমক দিলাম তাকে, বললাম বিয়ে করতে হবে তোমাকে। ঘাড় হেঁট করে ছোকরা চলে গেল, আর ফিরলো না। তারপর একদিন জানতে পারলাম, আমাদের সব সন্দেহ মিথ্যে, শ্যামলী সত্যিই কোন দোষ করেনি। আমরাই ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, তখন থেকেই নতুন কাপড় ছিঁড়ে কাঁথা সেলাই করতে বসে গেছে শ্যামলী, দোলনা দোলনা করে আব্দার ধরেছে। বুঝলাম কোন একটা আঘাত পেয়েই এমন হয়ে গেছে ও।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল নিবারণ। এমন ঘটনা, এমন রহস্যময় কাহিনী কখনও শোনেনি ও। আশ্চর্য সামান্য একটা আঘাত থেকে কি এমন মনো-বিকার ঘটতে পারে? ও বললে, হয়তো প্রথম থেকেই পাগল হয়ে গিয়েছিল আপনারা বুঝতে পারেন নি।

শিবব্রতবাবু চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর বললেন, তাও হতে পারে হয়তো কে জানে! মানুষের মন বড় ঠুনকো জিনিস কখন যে কি হয়। চামেলী কিন্তু বলে, আ[illegible] বিয়েতে মত দোব না বলেই ও ধরণে[র] অভিনয় করেছিল শ্যামলী। ছেলেটি হয়তো নির্দোষ, তাই ভুল বুঝে স[রে] গিয়েছিল।

নিবারণ বললে, বিচিত্র পৃথিবী আ[র] বিচিত্র মানুষের মন। সবই হতে পারে, ব[লা] যায় না কিছুই। কিন্তু ডাক্তার দেখিয়ে সারাতে পারলেন না ওকে, এই দুঃখু।

শিবব্রতবাবু হাসলেন।—না, সারা[তে] পারলাম আর কৈ। একজন শুধু বলেছিলে[ন] বিয়ে দিলে অনেক সময় নাকি ভালো হ[য়] একেবারে না হোক কিছুটা সেরে ও[ঠে] কিন্তু পাগল জেনেও শ্যামলী মাকে কে বি[য়ে] করতে রাজি হবে বলো?

—আমি হবো। আমি বিয়ে করবো ও[কে] হঠাৎ বলে উঠলো নিবারণ। পরক্ষ[ণে] ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর সারা মুখ, শিবব্রত-বাবুর হাতদুটো ধরে লজ্জা আর অনুন[য়ের] স্বরে বললে, মাফ করবেন আমায়। আ[মি] আমি ঠিক তা বলতে চাই নি। অন্যায় ক[থা] ফেলেছি আমি, মাফ করবেন আমাকে।

শিবব্রতবাবু হেসে উঠলেন।—আহা এ[তে] লজ্জা পাবার কি আছে, মানুষ কি ভে[বে] চিন্তে কথা বলে সব সময়। আমার ক[থা] শুনে ব্যথা পেয়েছো তুমিও, তাই ওক[থা] বলে ফেলেছো।

নিবারণের লজ্জা গেল না তবু। বল[লে] আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আর এই [illegible] চেহারা...আত্মবিদ্রূপের হাসি হাস[লে] নিবারণ, বললে আমি আমি কিনা আপ[নার] মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের মেয়েকে বি[য়ে] করতে চাই। আবার অস্বস্তির হাসি হাস[লে] নিবারণ।—করি তো দোকানদারী, আ[র] কিনা...

কথা শেষ করতে পারলে না নিবা[রণ] হাসিটা ওর কান্নার মত শোনালো।

শিবব্রতবাবু চকিতে চোখ তু[লে] তাকালেন।—তুমি, তুমি সত্যি ওকে [illegible]

রতে চাও নিবারণ? করবে, বিয়ে করবে মি ওকে? অনুরোধের আতিশয্যে বারণের হাত চেপে ধরলেন।

নিবারণ লজ্জায় ভয়ে কুঁকড়ে গেল যেন। না, না। আমি অশিক্ষিত মানুষ, দোকান-রী করে খাই, আমি...এই তো চেহারা... , না।

—সুযোগ পেলেই শিক্ষিত হওয়া যায় বারণ, আর চেহারা জন্মগত ব্যাপার। ন্তু মনুষ্যত্ব তা সাধনায় অর্জন করতে য়। সারা দেশে এমন মনুষ্যত্ব কারো থতে পেলাম না নিবারণ, তুমি তাদের য় অনেক বড়ো, অনেক বড় তুমি। বলতে তে থরথর করে কেঁপে উঠলেন শিবব্রত-ব্র, দু'চোখ বেয়ে দু'গাল বেয়ে নন্দের খুশির অশ্রু ঝরে পড়লো র।

তারপর। সত্যিই একটু একটু করে লো হয়ে উঠলো শ্যামলী। অনেকখানি ভাবিক হয়ে উঠলো। সুস্থ দেখালো কে। পুরোনো দিনের সমস্ত ভুলে যাওয়া গুলো নতুন করে মনে পড়লো আবার, খানের কয়েকটা সুতো হারানো বছরের হোস শুধু মুছে গেল ওর মন থেকে। শুস হ'ল না নিবারণের কথা।

প্রথম প্রথম মনে পড়াবার চেষ্টা করতো বারণ। পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে কনুই খতো, বলতো, এই যে দাগটা, কেন নো? কামড়ে দিয়েছিলে একদিন। আর কপালে এটা? কয়লা ছুঁড়ে মেরেছিলে। শ্যামলী শুনে খিলখিল করে হেসে তো—এতও বানিয়ে বলতে পারো।

ও যে কোনদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল থা কিছুতেই শ্যামলীর নিজের বিশ্বাস য় না। তবু মাঝেমাঝে অবোধ্য প্রশ্ন গতো মনে, সব রহস্যের যেন উত্তর খুঁজে য় না। ওর কাছে সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় বারণ। অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে রে না, নিবারণ ওর জীবনে কখন এলো, মন করে এলো। আশ্চর্য! যার আসবার া সে তো নিবারণ নয়, করুণাময়। করুণা-কে ওর স্পষ্ট মনে পড়ে। আরো কত া, মধুর স্বপ্ন। তারপর...

অনুযোগ করতো তাই নিবারণের কাছে। দ্যাখো, আমার স্মরণশক্তি বড্ড কমে যাচ্ছে। ন কথা মনে পড়ে না।

অথচ শ্যামলী নিজেই বিস্মিত হ'ত। সব ল গিয়েও শৈশবের, যৌবনারম্ভের দিন-লো কি করে মনে রইলো ওর করুণাময়কেই বা ভুলতে পারলো না কেন? করুণাময়! আবার কোনদিন কি দেখা হবে তার সঙ্গে? কতদিন উদাস মুহূর্তে প্রশ্ন জেগেছে শ্যামলীর মনে। হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায়, ওকে কি চিনতে পারবে করুণাময়? কিংবা, কে জানে ও নিজেই হয়তো চিনতে পারবে না। এমন কত কি ভেবেছে শ্যামলী, বহুদিন। কিন্তু কোনদিন ভাবতেও পারেনি, এমন আকস্মিকভাবে দেখা হবে, এমন বিচিত্র পথে।

করুণাময়ও ভুলতে পারেনি শ্যামলীকে। যতই ক্ষত ঢাকবার চেষ্টা করেছে, ততই গভীর হয়ে উঠেছে সেটা, ব্যথা দিয়েছে। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সুন্দর একখানি মুখ, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হাস্য-মুখর একজোড়া চোখ।

তাই চৌখাম্বার গলির আলোতে চিনতে কষ্ট হয়নি।

এমন দিনের সুযোগের আশায় কত কল্পনা, কত স্বপ্ন বেঁধেছিল ও। কত কথা বলবার ছিল, বলাবার ছিল! নিস্তব্ধ রাত্রির অতিথিশয্যায় শুয়ে অস্বস্তি বোধ করেছে শুধু, অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তারপর এক সময় এসে দাঁড়িয়েছে বাইরে বারান্দায়। রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকেছে, সুমুখের অন্ধকার দরদালান আর মেঘঢাকা শুক্লাকাশের মাঝে কি যেন খুঁজছে বারবার। মেঘ সরে গেছে একসময়, এক ফালি ঠাণ্ডা আর নরম জ্যোৎস্নায় সারা শরীর আর মন ভিজে গেছে ওর। হঠাৎ কানে এসেছে লঘু পায়ের শব্দ, চোখে পড়েছে একটি নারী-দেহের ছায়াশরীর।

শ্যামলী এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। মৃদু মৃদু শান্ত স্বরে প্রশ্ন করেছে, কেমন আছো?

—ভালো। তুমি?

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়েছে শ্যামলী, ঈষৎ হাসির আভাস এনেছে চোখমুখে।

আর কোন কথা নয়। চুপচাপ দু'জনে দাঁড়িয়ে থেকেছে পাশাপাশি, রেলিং ধরে। তারপর হঠাৎ শ্যামলীর হাতে হাত রাখতে গেছে করুণাময়, আর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দূরে সরে গেছে শ্যামলী। চকিতে একবার ফিরে তাকিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

পুরোনো দিনের কয়েকটা ঘটনা মনে পড়লো করুণাময়ের, মনে মনে হাসলে ও। তবু অপেক্ষা করলে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। কিন্তু শ্যামলী ফিরলো না আর।

দেখা দিলো একেবারে ভোরের স্নিগ্ধ আলোয়।

কপালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল করুণাময়ের। চোখ চেয়ে দেখলে, নীলা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে। আর চায়ের পেয়ালা হাতে শ্যামলী।

শ্যামলীর হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে এগিয়ে দিলো নীলা। বললে, তুমি ভাই তোমার রান্না দেখবে যাও, ও'র ব্যবস্থা আমি দেখছি।

শ্যামলী তবু নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো।

নীলা সহাস্যে বললে, কি আয়েশি দেখেছো? আটটার আগে বিছনা ছাড়বে না।

—এ ক'দিন তেমন আয়েশি থাকলে বাঁচবো, আমার আবার বারোটার আগে রান্নাই হয় না। ঠোঁটে হাসি কাঁপালে শ্যামলী।

বিদ্রুপের স্বরেই বোধ হয়, নীলা বললে, তোমাদের মধ্যে মিল দেখছি অনেক!

শ্যামলী সে কথা শুনতে পেল না। খোকা জেগে উঠে কান্না শুরু করেছে দেখে ছুটে গেল ও। আর খোকাকে কোলে নেয়ার পর থেকেই সব ভুলে গেল ও। সব কাজে ভুল হতে শুরু করলো।

অদ্ভুত! শ্যামলীর অমন হাসিখুশি মুখের আড়ালে কোন বিষণ্ণতা থাকতে পারে, ওর উজ্জ্বল চোখের কোণে বেদনার অশ্রু লুকিয়ে থাকতে পারে কে জানতো!

—খোকনকে আমার কাছে রেখে যাবেন ভাই? নীলাকে এক সময় বললে শ্যামলী।

নীলা উত্তর দিলে, ভালই তো। হাত পা ঝেড়ে একটু ঘুরতে পাই তা হ'লে, বসতে পাই দুদণ্ড।

—উঃ, বেশ দেখবো কেমন ছেড়ে থাকতে পারেন। কি বলো খোকন? ব'লে খোকনকেই যেন প্রশ্নের মীমাংসা করতে দেয় শ্যামলী, আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে বুকে চেপে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

শুধু কি তাই? খোকনকে স্নান করাতে পুরো এক ঘণ্টা সময় নেয় শ্যামলী। আর সেই সময় কত প্রলাপ বকে যায় তার সঙ্গে, ইয়ত্তা নেই। অর্থও নেই। আজেবাজে কথার পর কথা। খোকন হয়তো নিজের মনেই হাসে, নিজের মনেই ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নেচে ওঠে শ্যামলী। খোকন ওর কথা বুঝতে পেরেছে, খোকন ওকে ছেড়ে থাকতে চায় না, ইত্যাদি।

করুণাময় হেসে বলে, শেষে নিউমোনিয়া ধরিয়ে ছাড়বে।

—তা সত্যি। নীলাও কৌতুকে হাসে। ব'লে, ভয়ও হয়, আবার ভাবি, বেচারীর কোলে তো আসে নি কেউ, দু'দিনের জন্যে নয় একটু ভুলেই থাকলো।

কিন্তু ক্রমশঃই যেন উৎসাহে আনন্দে উদ্দাম হয়ে ওঠে শ্যামলী। আর নীলা ভয় পায়। শ্যামলীর কথায় আর ব্যবহারে কি যেন এক রহস্যের ইশারা দেখতে পায় ও, আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—আচ্ছা, মেয়েটা কি পাগল নাকি? করুণাময়কে প্রশ্ন করে নীলা। আজ দুপুরে দেখি কি, ওর ঘরে খোকাকে কোলে নিয়ে... কথা শেষ করতে পারে না নীলা, হেসে গড়িয়ে পড়ে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলবার চেষ্টা করে কথাটা, আর পর মুহূর্তেই কৌতুকের হাসিতে চাপা পড়ে যায় ওর কথা।

—এত হাসছো কেন? একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করে করুণাময়।

আবার মুখে আঁচল চেপে নীলা কোন রকমে ব'লে, খোকাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিল। খাওয়াচ্ছিল না,...মানে...আবার হেসে ওঠে নীলা।

কিন্তু হাসি মিলিয়ে গেল একদিন নীলার মুখ থেকে। বিস্মিত হ'ল ও, চোখ চেয়ে ভালো করে তাকালো শ্যামলীর দিকে। আশ্চর্য!

—কি বলছো, ঠিক বুঝলাম না ভাই। অনুযোগ করলে নীলা।

শ্যামলী কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, উনিও তো তাই বলেন। সত্যি বলুন, বাড়ীতে দোলনা না থাকলে মানায়? বাড়ীর শ্রীই থাকে না। আচ্ছা, আপনাদের বাসায় দোলনা আছে তো?...থাকবেই তো। ও'কে এত করে বলি, তবু একটা দোল্‌না কিনে দিলো না এদ্দিনেও। কতই বা দাম?

—দোলনার লোক আসুক, তারপর কিনবেন এখন। সান্ত্বনার সুরে নীলা বললে।

শ্যামলী ঠোঁট ওল্টালো, আপনিও ঐ কথা বললেন? দোলনা থাকলে কত সুন্দর দেখায় বলুন তো। ঠিক হয়েছে, এবার খোকনের জন্যে আনতে বলবো।

নীলা সহাস্যে বললে, তাই ব'লো।

কিন্তু লক্ষ্য করলে, যতই দিন যায়, ততই যেন কি এক পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্যামলীর দেহমনে। খোকনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উদাস হয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কি যেন ভাবে, কিংবা কিছুই যেন ভাবে না।

প্রথম প্রথম বেশ একটা কৌতুক বোধ করতো নীলা। ক্রমশঃ একটা বিদ্বেষ ভাব জাগতে শুরু করলো ওর মনে। খোকনকে সত্যিই যেন ছিনিয়ে নিতে চায় শ্যামলী। এক মুহূর্তের জন্যেও নীলার কাছে আসতে দেয় না তাকে। রাত্রে নিজের কাছে নিয়ে শোবার জিদ্‌ ধরে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন নীলা বললে, কালই আমরা চললাম ভাই।

—খোকন? খোকন থাকবে তো? উদ্‌গ্রীব হয়ে শ্যামলী জিগ্যেস করলে।

ক্রোধ তো দূরের কথা হেসে ফেললে নীলা। বললে, না, ওকেও নিয়ে যাবো বৈকি! ভয় নেই, তোমার কোল আলো করেও খোকন আসবে।

শ্যামলী অর্থহীন উদাস দৃষ্টিতে তাকালো নীলার মুখের দিকে। নীলার কোন কথাই যেন কানে যায়নি ওর, অর্থ বোঝেনি কোন কথার। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, না, না, খোকন যাবে না, খোকনকে যেতে দোব না।

নীলা উত্তর দিলো না। সরে গেল সেখান থেকে। আর কিছুক্ষণ পরেই খোকনের কান্না শুনে করুণাময় আর নীলা দু'জনেই ছুটে এলো। শ্যামলীর কোল থেকে খোকন পড়ে গেছে।

নীলা খোকনকে কোলে তুলে নিয়েই শ্যামলীকে কি যেন বললে, ক্রোধের স্বরে।

করুণাময় বললে, কোল থেকে হঠাৎ পড়ে গেছে, দোষ কি ওর?

—পড়ে গেছে। রাগ বেড়ে যায় নীলার।—ডাইনী! ডাইনী ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে ওকে। না, আর নয়, চলো আজই ফিরে যাবো আমরা।

শ্যামলীর চোখে তখনও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আঁচল খসে পড়েছে কাঁধ থেকে। কোন কিছুই ও যেন দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। শুধু একজোড়া সজল বড়ো বড়ো চোখ মেলে ও সামনের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আর মনে মনে বিড়বিড় করছে, খোকনকে আমি যেতে দোব না, খোকনকে আমি যেতে দোব না।

বিদায়ের মুহূর্তেও ঐ একই কথা লেগে রইলো ওর মুখে। সিঁড়ি আগলে দু'হাত মেলে বাধা দেবার চেষ্টা করলে নীলাকে।—খোকনকে যেতে দোব না, খোকনকে আমি যেতে দোব না।

নিবারণ ওকে সরিয়ে আনবার চেষ্[illegible] করতেই হঠাৎ ক্ষেপে গেল যেন শ্যামলী রাগে ক্ষোভে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদতে শু[illegible] করলে।

করুণাময় নিবারণকে আড়ালে ডে[illegible] বললে, ও'কেও স্টেশনে নিয়ে চলুন, [illegible] হ'লে বাধা দেবে না হয়তো।

শেষে তাই ঠিক হ'ল। নিবারণ বললে, ন[illegible] খোকন যাবে না। চলো স্টেশন থেকে ফিরি[illegible] আনবো।

চট্‌ করে উঠে বসলো শ্যামলী। সমস্ত মু[illegible] খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো ওর।—সত্যি সত্যি ফিরিয়ে আনবে;

চৌখাম্বার গলিতে আলো ঝলমল ক[illegible] উঠলো, সন্ধ্যা নামলো শহরের বুকে। তা[illegible] চিক্‌ চিক্‌ গঙ্গা জল কালো হয়ে গে[illegible] ক্রমশ। তিমির পিঠের মত পীচের রাস্তা[illegible] মসৃণতায় অন্ধকার জমাট বাঁধলো। আর সে[illegible] গা-ছম-ছম অন্ধকার ভেদ করে টাঙা ছুটে[illegible] আবার।

সেই পুরোনো রাস্তা ধরে, তেমনি আঁক[illegible] বাঁকা মেটাল রোডের ওপর দিয়ে চৌখাম্বা[illegible] আলো-ঝলমল, বাজার পার হয়ে টা[illegible] ছুটলো। গাছের ছায়ায় ছায়ায় [illegible] নির্জনতা মাড়িয়ে, দীর্ঘশ্বাসের মত আশ[illegible] চুপচুপ নিঃশব্দতায় টাঙার ঝুমঝুমি আ[illegible] ঘোড়ার খুরের টপাটপ আওয়াজ ভাস[illegible] শুধু। চাঁদ-জ্বলা আকাশের দু'এক[illegible] রুপোলী স্ফুলিঙ্গ হয়তো বা এখানে ওখা[illegible] রাস্তার ধারের শাখাপল্লবিত গাছের ফাঁ[illegible] উঁকি দিয়ে ঠিক্‌রে পড়েছে। আর সেই চাঁ[illegible] উঁকি দেয়া রাস্তার অন্ধকারে ছুটে চলে[illegible] ওরা।

ঠিক্‌ তেমনি ভাবেই করুণাময় আর নী[illegible] বসে আছে পাশাপাশি, আর পিঠে পিঠ দি[illegible] শ্যামলী আর নিবারণ।

গঙ্গার ব্রিজ এগিয়ে এলো। আতিকা[illegible] একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত দেখাচ্ছে[illegible] ব্রিজের ইস্পাত-কাঠ-কংক্রিটের আকৃতি[illegible] ওপরে পরিচ্ছন্ন আকাশ, আর নীচে গঙ্গা[illegible] স্রোতে চোখের তারার মত কালোর গভীরতা[illegible] সুমুখে নির্জন নিঃশব্দ পথ।

ঝমঝম ঝমঝম শব্দ করে পোলের ও[illegible] উঠলো টাঙাটা। দমকে দমকে ঠান্ডা বাতা[illegible] এসে লাগলো কানে, চুলে, স্বেদস্নাত মু[illegible] ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ক[illegible]

উঠলো শ্যামলী। আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না।

নিবারণ হঠাৎ রূঢ় স্বরে একটা ধমক দিলো। চুপ করে গেল শ্যামলী।

ব্রিজের মসৃণ পথ অতিক্রম করে ইতোমধ্যে নীচে নেমে এসেছে টাঙা। সামনেই বঁড়শির মত একটা বাঁক। আর বাঁক ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ একটা ঝাঁকানি দিয়ে টাঙা থেমে গেল।

চাকার দিকে তাকিয়ে টাঙাওয়ালা বললে, যাবে না হুজুর, চাকা টাল খেয়েছে।

যাবে না? লাফিয়ে নীচে নামলো শ্যামলী। তারপর আবার চীৎকার করে উঠলো, না, না, আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না। আর চীৎকার করতে করতে, গঙ্গার দিকে, গঙ্গার ব্রিজের দিকে ছুটে গেল শ্যামলী। রুক্ষ চুল পিঠের ওপর ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো, শাড়ীর প্রান্ত খসে পড়লো শরীর থেকে, উন্মাদের মত, উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে গেল শ্যামলী। আর পিছনে পিছনে নিবারণও ছুটে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা। শুধু নিঃশব্দ। নিঃঝুম রাতের অন্ধকারে শুধু একটা চীৎকার ভেসে এলো বারবার।—আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না। আর তার পিছনে নিবারণের কর্কশ গলার ডাক—শ্যামু ফিরে এসো, শ্যামু, শ্যামলী ফিরে এসো।

করুণাময় হঠাৎ দেখলে, দূরে অনেক দূরে চাঁদের আলোয় সিল্যুটের ছবির মত একটা ছায়াশরীর ঠিক ব্রিজের থামের আড়ালে এসে থমকে থামলো।—শ্যামলী! শ্যামলী! চীৎকার করে উঠলো করুণাময়।

তারপর। তারপর সে ছায়াশরীর অদৃশ্য হ'ল।

অনেকক্ষণ পরে ব্রিজের থামটার কাছে এসে পৌঁছলো করুণাময় আর নীলা। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে। না, শ্যামলী নেই। নিবারণ? নিবারণও নেই। শুধু টর্চের তীব্র আলোয় কি যেন চকচক করে উঠলো। আবার সেদিকে আলো ফেললে করুণাময়।

না, শ্যামলী নয়। ব্রিজের একটি বল্টুতে এক ফালি কাপড় লেগে রয়েছে, হাওয়ায় পতাকার মত উড়ছে পৎ পৎ করে। শাড়ী ছেঁড়া এক টুকরো কাপড় কোত্থেকে উড়ে এসে লেগেছে, কে জানে!

একটি কবিতাগুচ্ছ

শ্রীমৃণালকান্তি

(১)

রৌদ্র ঝরা রুক্ষ দিন,
পাণ্ডুবর্ণ মৃত পুষ্প-প্রাণ—
শেষ বসন্তের গান।
এ অন্তরে জ্বলে অনির্বাণ
রৌদ্রদগ্ধ সেই স্বপ্ন-শিখা,
একটি বিষণ্ণ সুর
স্মৃতির ধূসর মরীচিকা।

(২)

ধূসর ছবি ভাসে মনে লাগে ছিন্ন সুর,
একটি দিনের স্মৃতি তুমি চিরদিনের দূর।
তোমার চুল, চিকণ কালো একরাশি মেঘ ফুল,
মেঘ-ভাঙা চাঁদ তোমার মুখ, রাত্রি আঁকা চোখ—
তোমার পথিক-আকাশ ঘিরে কত স্বপ্নলোক!
ফাগুনে গেল নিবলো বনের আগুন,
—বর্ষশেষ, নেই তোমার উদ্দেশ!
নিমের ছায়ায় ঘুমায় একা দুপুরে রোদ্দুর,
একটি দিনের স্মৃতি শুধু, চিরদিনের দূর।

(৩)

আশা নেই যার নিভে গেছে যার আলো
আর স্বপ্নও যার ফুরালো
কী নিয়ে সে বাঁচে বলো?
'এক মুঠি ঝরা পুরোনো দিনের পালক,
মেঘ বৃষ্টি দৃষ্টির দূরলোক—
ছোটো ছোটো ছায়া, দুঃখ কণ্টকিত
ধূসর রেখা অঙ্কিত,
রিক্ত প্রাণের আকাশ
আর ভাষাহারা বুকে
একটি ব্যথিত স্বপ্নের আশ্বাস!'

(৪)

আমি ভীরু দীপশিখা
আর তুমি তারা,
নিশীথের বাতায়নে স্বপ্নের ইশারা!
আমি ম্লান বন্দী পাখি
আর তুমি অরণ্য-মর্মর,
যেন নীল অনাবিল
রৌদ্রের প্রান্তর।
কী নিঃসঙ্গ দিন রাত,
যেদিকে তাকাই—শুধু শূন্যতা অগাধ!

চোখের উপর,
রোদনীল রাত্রি ঝরে—
ধু ধু করে শূন্যক্ষরা
আকাশ ধূসর।

(৫)

এইখানে স্তব্ধ কালো কী গভীর রাত,
দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু বিস্তৃতি অপার।
মেঘের ঘুমন্ত দেশে তুমি যেন চাঁদ,
তোমার হৃদয়ে নীল আকাশ-বিহার।
বেঁধেছ অনেক দূরে স্বপ্নলোকে বাসা,
নির্জন বাতাসে কাঁদে আমার পিপাসা।
বিশীর্ণ শাখায় ঝরে শীতের প্রহার,
এই ছায়া পাতা ফুলে পথের ধুলোয়।

চক্রদত্ত

ক্যালিফোর্নিয়ার টেক্‌নোলজি ইনস্টিটিউট্‌ 'এস ফিল্টার' নাম দিয়ে একটি নতুন যন্ত্র বার করেছে। এটাকে এমারজেন্সি ওয়াটার ট্রীটমেণ্ট ইউনিট্‌ও বলা হয়। এই যন্ত্র দিয়ে যে কোনও রকম দূষিত জলকে বিশ মিনিটের মধ্যে একশ'জন লোকের খবার মত জল পরিস্রুত করে রীতিমত পানীয় জলে পরিণত করা যায়। যন্ত্রটি হাত দিয়ে চালান হয়। প্রথমে যে কোনও দূষিত ও অপরিষ্কার পুকুর অথবা নালার জল পাম্প করে এই যন্ত্রের মধ্যে টেনে আনতে হয়। যন্ত্রটির মধ্যে একরকম রাসায়নিক পাউডার থাকে। এই রাসায়নিক পদার্থটি কার্বন সিলভার আর প্যারক্সাইড্‌ মিশ্রিত একটি বস্তু। দূষিত জল এই পাউডারের সংস্পর্শে এলেই এই পাউডার শক্ত হয়ে যায় আর ঐ অপরিষ্কার জলের মধ্যে যে সমস্ত টুকরো ময়লা থাকে সেগুলি থিতিয়ে পড়ে আর বিষাক্ত জীবাণুগুলো মরে যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে এইভাবে ত্রিশ সেকেণ্ডে এক লিটার করে পরিস্রুত জল পাওয়া যায়। একাদিক্রমে চল্লিশ মিনিট যন্ত্রটি চালানর পর ঐ রাসায়নিক পদার্থটি বদল করে দিতে হয়।

*

আমরা দুধের ফেনা, সাবানের ফেনা এবং সমুদ্রের ফেনা সম্বন্ধে জানি, কিন্তু সব ফেনাই বিশেষ কোমল পদার্থ। এই ধরণের ফেনাজাতীয় পদার্থের সাহায্যে আগুন নিভান যায় শুনলে অবাক হতে হয়। এই আগুন নিভানোর ফেনা কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করতে হয়। জল বাতাস ও প্রোটিন জাতীয় তরল বস্তু থেকে এই ফেনা তৈরী হয়। পেট্রল বা তেলজাতীয় জিনিসের আগুন সাধারণ আগুন নিভানোর চেয়ে অনেক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এই ফেনা ঐ ধরণের আগুন সহজে নিভাতে পারে। তেলজাতীয় পদার্থে আগুন লাগলে ঐ ফেনা ছড়িয়ে দিলে প্রথমে আগুনের চারিদিকে একটা বাষ্পের আবরণ সৃষ্টি করে ফলে আগুন আর ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এরপর ফেনার মধ্যের জলীয় অংশটি আস্তে আস্তে আগুন নিভিয়ে ফেলতে থাকে। এমন অনেক দেশ আছে যেখানের ফায়ার ব্রিগেডগুলিতে বিশেষ করে নৌবহরের ফায়ার ব্রিগেডে এই নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হচ্ছে। প্রায় দু হাজার গ্যালন ফেনা এক মিনিটের মধ্যে আগুনের ওপর ছড়িয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

*

মেয়েদের মধ্যে যাঁরা ভালো সেলাই ফোঁড়াই করেন তাঁদেরও অনেক সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ছুঁচ সুতো দিয়ে একটা একটা করে ফোঁড় গুণে সেলাই করতে

যন্ত্রের সাহায্যে সেলাই করা হচ্ছে

হয়। ওপরের ছবিতে যে যন্ত্রটা দেখা যাচ্ছে সেটা মেয়েদের এই ধরণের অসুবিধা বোধ হয় দূর করতে পারবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে একবার ছুঁচ চালালে অনেকগুলো ফোঁড়ার কাজ হয়ে যায়।

*

ডাঃ পেজ (Page) বলেন যে, নয়টি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করলেই ব্লাড-প্রেসার রোগের বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হয়। প্রথমত, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার সময় কখনও দৌড়াতে নেই। তাছাড়া কোনও কাজ করতে করতে ক্লান্তিবোধ করলেই কাজটি ছেড়ে দেওয়া ভাল, দিনের মধ্যে অন্তত দুবার করে কিছুটা ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজন বিশেষত দুপুরে খাবার আগে আধ ঘণ্টা আর রাতে খাবার আগে এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলে ভাল হয়। সারাদিনে দু তিনবার গুরুভোজন করার চেয়ে চারবার অল্প স্বল্প খাওয়া ভাল। দিনে এক কাপ কফি ও ১৫টি সিগ্রেট বা তিনটি সিং পর্যন্ত খাওয়া খুব বেশী ক্ষতিকর ন যদি সম্ভব হয় তাহলে কাজের থে কিছুটা সময় অবসর নিয়ে বাইরে কিছু খেলা ধুলো করা ভাল। তবে বেশী দৌড় ঝাঁপের মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। খুব বেশী রাতে শোওয়া উচিত নয়। সব সময়ে দেহের ওজন খুব সাধারণ রাখা উচিত। অর্থাৎ দেহের মেদবৃদ্ধি যাতে না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। কোনও বিষয় নিয়ে খুব বেশী চিন্তা বা উত্তেজনা এড়িয়ে যাওয়া ভাল। এই কারণে কোনও বিষয়ে তর্ক করা উচিত নয়। ডাঃ পেজ বলেন যে, মদ খাওয়া খারাপ নয়। অবশ্য সূর্যাস্তের পর থেকে ঘুমের আগে পর্যন্ত হলেই ভাল।

*

কেঁচো দেখলেই মানুষের গা ঘিন ঘিন করে কিন্তু এই ঘৃণ্য জীব যে প্রতিদিন মানুষের কত উপকার করছে তার খবর আমরা প্রায়ই রাখি না। পথে ঘাটে আমরা দেখি যে কেঁচোগুলো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে স্তূপ করে। বৈজ্ঞানিকদের মতে এই কেঁচো চাষীদের পক্ষে একরকম ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ। এদের কাজ মাটি খোঁড়া—অবিরাম মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এরা সব মাটি ওলট পালট করে ফেলে। ফলে মাটির মধ্যে আলো বাতাস জল ঢুকতে পারে এবং মাটি খুব উর্বর হয়। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে এরা মাটি খোঁড়ে না, মাটি এদের খাদ্য আর খাওয়ার জন্যই মাটি খুঁড়তে থাকে। এইসব কেঁচোগুলি মাটি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, মলত্যাগের ফলে যে মাটির স্তূপ জমে তার মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম, নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাস থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এগুলি মাটি সারের পক্ষে খুব উপকারী। আন্দাজ করে দেখা গেছে যে, ৫০,০০০ কেঁচো প্রা এক মাসে এক গজ প্রমাণ পুরু মাটি খুঁড়তে পারে। আর এর জন্য প্রায় এ টন মাটির স্তূপ জমা করে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, মাটিতে যত বেশী কেঁচো থাকে ততই ভাল। আর সুবিধা এই যে, কেঁচো উৎপন্ন করতে কোনও কষ্ট হয় না দু চারটে কেঁচো জমিতে থাকলেই খু তাড়াতাড়ি ও অনায়াসে এদের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে।

রূপময় ভারত

নেপাল

ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারা বিচার করলে নেপাল যদিও ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত নয়, ভারত সীমান্তে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপেই তার অবস্থিতি; কিন্তু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে ভারত ও নেপালের মধ্যে যে আত্মিক যোগ রয়েছে, তা বহু বৎসরের বৃটিশ কূটনীতির প্রভাব সত্ত্বেও কখনো বিচ্ছিন্ন হয় নি। ভারত ও নেপালের মধ্যে অন্তরঙ্গতার যে বাধা এতদিন ইংরেজ শাসকদের কূটনীতির জন্য অপসারিত হতে পারে নি, আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নেপালের জনসাধারণই সে বাধা দূর করে দিয়েছে। অতীতের স্বাধীন নেপাল শুধু বৃটিশেরই ইঙ্গিত ও ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য প্রমাণ দেবার জন্য ভারতীয় জননায়কদের আমন্ত্রণ করবার ও অভ্যর্থনা জানাবার মত সাহস দেখাতে পারে নি। যে কারণে মহাত্মা গান্ধীর মত সর্বজনপ্রিয় মহামানবের নেপালে যাবার সুযোগ হয় নি। ভারতের স্বাধীনতার পর নেপালের শাসনসংস্কার ঘটেছে, স্বৈরাচারী রাণাদের একচেটিয়া প্রভুত্বের বদলে আজ সেখানে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই সেদিন নেপালের জনসাধারণ নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে এক বিরাট জনসভায় ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে অকুণ্ঠ জয়ধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত করে। নেপালে শ্রীজওহরলালের উপস্থিতি নেপালের বর্তমান জাতীয় জীবনে একটি অভিনব এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে নেপালবাসী মনে করে। নূতন নেপালের জাতীয় জাগৃতির শুভক্ষণেই নেপালবাসী ভারতীয় জননেতার সান্নিধ্য চেয়েছে ও পেয়েছে। এই দিক দিয়ে নেপালে শ্রীজওহরলালের উপস্থিতি নেপালের অধিবাসিবৃন্দের জীবনে অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক গৌরব-মৈত্রীর পক্ষেও শুভসম্ভাবনাপূর্ণ এক নূতন পরিণামের সূচনা।

নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর নগরসজ্জার মধ্যে যে স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় রয়েছে, তা বহু বৎসরের রূপময় ভারতেরই শিল্প-ধারার পরিচয়। নেপালের দেব-দেউলের কারুকার্যমণ্ডিত শোভা আর মন্দিরাভ্যন্তরের দেবমূর্তির শিল্পনৈপুণ্য ভারতের সঙ্গে নেপালের সংস্কৃতিগত ঐক্যরূপে যেভাবে যুগ যুগ ধরে বহন করে আসছে, সেই ঐক্যসূত্রেই প্রধান মন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতার পর ও নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর নূতন প্রেরণায় দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করে এলেন।

নেপালের অধিবাসীর প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায়, তাদের সাজ-পোষাক, গৃহসজ্জা ও দেব-দেউলে সর্বত্রই সেই প্রাচীন ঐতিহ্য আজও অবিকৃতভাবে রয়ে গেছে বলে বিশ্ব-বাসীর কাছে সৌন্দর্যময়ী নেপালের আবেদন অপরিসীম।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলা
নেহর, সম্প্রতি নেপালাধী
আমন্ত্রণে নেপাল ভ্রমণকা
রাজধানী কাঠমাণ্ডু হইতে ৮ মা
পূর্বে অবস্থিত ভাদগাঁওয়ের প্রাচী
কীর্তিস্তম্ভ পরিদর্শন করে
সংগে রহিয়াছেন নেপালের স্বরা
মন্ত্রী শ্রীবিশ্বেশ্বর কৈরালা
কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা

কাঠমাণ্ডুর দুই মাইল দক্ষিণ-পূ
অবস্থিত গুহ্যেশ্বরী মন্দির পরি
দর্শনরত শ্রীজওহরলাল নেহরু
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের তীর্থ
যাত্রী প্রতি বৎসর এই প্রাচীন হিন্দ
মন্দিরে সমবেত হন

নেপালের পাটান নামক স্থান প্রাচীনকাল হইতেই কুটীর-শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের সুনাম বহন করিতেছে। পাটানের কারু ও চারুশিল্পকলা প্রদর্শনীতে শ্রীজওহরলাল নেহরু নেপালীদের নির্মিত কাঠের কাজ, তামা-পিতলের কাজ ও হাতীর দাঁতের কাজ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। নেপালের শিক্ষামন্ত্রী ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে হস্তীদন্তনির্মিত পশুপতিনাথ মন্দিরের একটি ক্ষুদ্র অনুকৃতি উপহার দেন

নেপালের বিখ্যাত দেবীমূর্তি দক্ষিণকালী। কারুকার্যখচিত তামা ও সোনার অলংকারে আচ্ছাদিত এই দেবীমূর্তি বহু প্রাচীনকাল হইতে সযত্নরক্ষিত আছে। কালো ব্রোঞ্জের উপর খোদাই-করা নৃমুণ্ডমালিনী এই কালীমূর্তি ও তাঁহার দেহাবৃত অলংকারের নিপুণ কারুকার্য নেপালের শিল্পীদের শিল্প-প্রতিভার এক আশ্চর্য সৃষ্টি

নেপালের মন্দিরের সম্মুখে স্থাপিত পদ্মাসনে বুদ্ধমূর্তি

বিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দিরের একাংশ

কাঠমাণ্ডুর বৈদেশিক দূতাবাস

নিদারুণ অভিজ্ঞতা

শ্রীবিরূপাক্ষ

লোত্তি-লাট্টু সমাচার
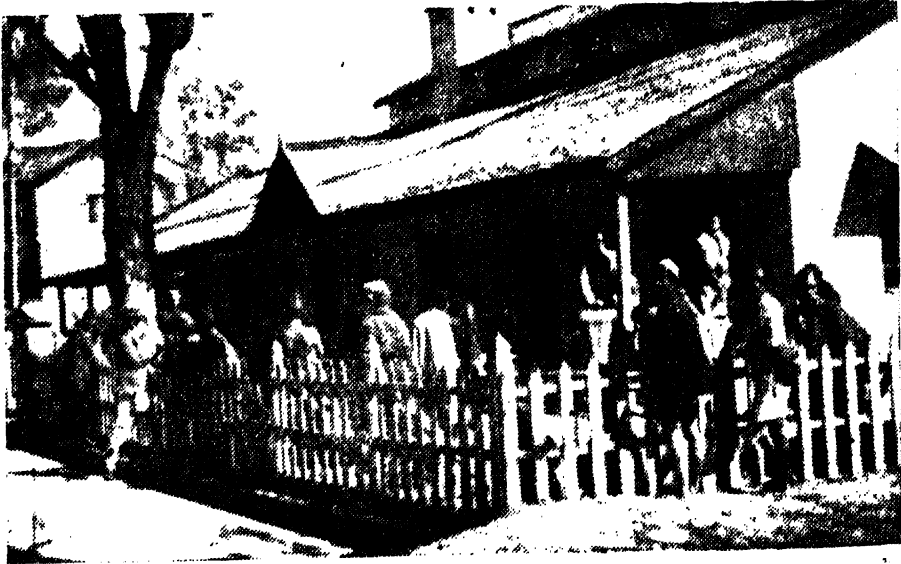
বিংশ শতাব্দীর অত্যাশ্চর্য সংবাদ—অভাবনীয় সংঘটন—এই নিদারুণ সময়ের দারুণ ব্যাপার! গত মাসের শেষ লগ্নে সেজবাবুর মেজমেয়ে লোত্তিটাকে কোনমতে পার করা গেছে। বলুন—এও পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের পর নবম আশ্চর্য কি না? এই বাজারে একটি মেয়ে পার করার চেয়ে গঙ্গাপারে গিয়ে চিতায় ঝাঁপ দেওয়া সহজ, কারণ যাঁরা মেয়েকে নিয়ে পার হবেন, তাঁদের অধিকাংশেরই শক্তি এক লাফে সাগর পার হবার চেয়ে বেশি, অথচ আমরা গেরস্ত লোক একটা ছোট পগার পার হতে হুমড়ি খেয়ে পড়ি, আমাদের সাধ্যি কি তাঁদের সঙ্গে তাল রাখি! তবু খানিকটা আমার বাড়ির সবাই যে এঁদের সঙ্গে কিভাবে তাল রাখলেন, সেই আশ্চর্য!

ক'দিন বাড়িতে একেবারে হৈ-হৈ ব্যাপার, যে রকম উদ্ভট গোলমাল হতে পারে, তাই স্বয়ং সেজবাবু, সেজগিন্নী, নিজের গিন্নী, পিসি, মাসী, ভাগ্নী, ভাইঝি, বন্ধু-বান্ধব অর্থাৎ এক কথায় সমগ্র পরিবার একেবারে আমার ওপর বরাবরই খার, যেহেতু আমি প্রত্যেকবারে সবার মনোমত সুন্দর কথাবার্তা কইতে পারি না। এই বিয়ের ব্যাপারে তাঁরা আমাকে একরকম বাদ দিয়েই সব ঠিকঠাক করে বসলেন। আমাকে বললে নাকি বিয়ে কেঁচে যেত।

সবাই বললে, দূর, দূর, ওর কথা শুনলে লোত্তির আর কোনকালে বিয়ে হত, শেষ পর্যন্ত তাকে পাৎকোয় ঝাঁপ খেতে হত। উনি একটি কর্মনাশা বসে রয়েছেন, ওঁর কথা ছেড়ে দাও।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবুদের নাক-কান দিয়ে সর্দি ঝরলো, তবু আমার কথা আগে মিষ্টি লাগলো না। অনাসৃষ্টির সব কথা বলি বলে আমায় সবাই চুপ করে থাকবার নির্দেশ দিলেন। আমি সেই নির্দেশ মত নিজেকে মেরেই একদিকে পড়েছিলুম, কিন্তু বাজার একেবারে খারাপ করে দিচ্ছে দেখে বাধ্য হয়ে দু-চারটে কথা বলতে হল বৈকি!

প্রথমেই মশাই, আমি বরের বাপের দর হাঁকা দেখে একেবারে বাঁকা হয়ে গিয়েছিলুম, এঁরা আমায় নানারকম ধোকা দিয়ে সোজা করলেন।

মেয়েকে পঁচিশ ভরির নীরেট সোনার গয়না দিতে হবে, এই বরপক্ষের প্রথম দাবী। বুঝলুম, একেবারে নিজে নীরেট না হলে মানুষ আজকাল লোকের অবস্থা দেখে এরকম অসভ্যের মত চায় না। এর পর দ্বিতীয় দাবী—দেড় হাজার নগদ, ঘড়ি, আংটি, সোনার একসেট বোতাম, খাট, বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, পোর্টম্যান্টু, ইত্যাদি, তাছাড়া কাঁসার বাটি, থালা,

জামাইবাবুর অক্ষিবাণ

গাড়ু, এতো বিয়ের অঙ্গ, অতএব সেগুলো তো দিতে হবেই। তাছাড়া কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া যতই কণ্ট্রোল হক, গেরস্তকে খাওয়াতেই হবে, নইলে চরম স্বদেশীরাও রাত সাড়ে নয়টা খালি-পেটে বাড়ি ফিরে গেলে গালি দেবেই, অতএব সেও হাজার তিনেকের ধাক্কা—অর্থাৎ উনিশ থেকে বিশ হাজার বেকসুর খরচ, কিন্তু তা না করলে শ্বশুর নাকি ছেলের বৌ ঘরে তুলবেন না।

আমি বললুম, মেরে বিদেয় কর, ওঁরা একেবারে রে-রে করে উঠলেন। যথাসর্বস্ব বিক্রি করে, লোকের পায়ে ধরে ধার নিয়ে জনৈক কন্যাদায়গ্রস্তের উদ্ধারের জন্যে চ্যারিটির আশ্রয় নিয়ে তবু মেয়েকে সুপাত্রে দিতে হবে। আচ্ছা, বুঝুন দেখি, এই রকম ব্যাপার দেখলে গাত্র জ্বলে যায় কি না?

সুপাত্র তো কত? কলকাতায় তিন ছটাক জমির ওপর একটি বাড়ি, তার আবার তিন সরিক—অতএব বাড়ি আছে। ছেলে-বৌয়ের ফুলশয্যের ঘর নেই। শোনা গেল, পরে তেতলায় ঘর উঠবে—সিমেণ্টের পারমিট পাওয়া যাচ্ছে না কিনা তাই এখন শুধু আলসে তোলা রয়েছে। বাপের তিনটি ছেলে, এটি ছোট—ইতিপূর্বে এক-একটি ছেলের বিয়ে দিয়ে কর্তা এক-একটি তোলা তুলেছেন, এইটির পর পটলতোলা ছাড়া আর ওঁর বেঁচে থাকার কি দরকার হবে, তাতো বুঝি না—বেশ তো গুছিয়ে গেলেন।

এর পর পাত্রের পরিচয় শুনুন। বি এ পাশ করে পঁয়ষট্টি টাকায় এক সওদাগরি অফিসে ঢুকেছেন। চেহারা, আমার চেয়েও আরও দুপোঁচ কালো বার্নিশ করা, উপরন্তু ঈষৎ ট্যেরা। শুভদৃষ্টির সময় শুনলুম নাপতে বললে, তারই দিকে নাকি জামাইবাবু সারাক্ষণ তেরছে চেয়ে রইলো।

যদি বলেন, তোমাদের মেয়েরই বা কী ছিরি! সেটা তো একশোবার সত্যি! মেয়ের ছিরি-ছাঁদ থাকলে সে কি আর এযুগে গাঁটছড়া বাঁধতো, কোন্‌কালে সিনেমা-স্টুডিওর চাঁদের পাশে গিয়ে অশথ গাছের ডাল ধরে গান গাইতে শুরু করে দিত। একটু নীরেস তো আছেই। যদি বলেন, নাক নেই—আরে মশাই, বাঙালীর ঘরে অর্ধেক মেয়েরই তো ও বালাই নেই এবং বিধাতা বিলকুল ওটা উড়িয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি? পুরুষরা অন্তত খানিকটা নাক নাড়ার হাত থেকে তো বাঁচতো। তার জন্যে নয়—এ-বাজারে টাকা থাকলে যার কিছু নেই তারও নাক-মুখ-চোখ সবই একসঙ্গে কথা কইতে থাকে—এটা বুঝছেন না?

এই তো যথাসর্বস্ব খুইয়ে সেজভায়া মেয়ের বিয়ে দিলে, কই লোত্তির নাক তো কোন ট্রাবল দিলে না? আসলে বাজারে মাল শর্ট—চাহিদা বেশি, তাই বরের বাপেরা রীতিমত ব্ল্যাক-মার্কেট শুরু করেছে—এতে তো আর অর্ডিন্যান্স নেই। তার ওপর আমার বাড়ির মত আকাটের সংখ্যা সংসারে কম নেই, মেয়ে বড় হচ্ছে, অতএব যে কোন বখাটের হাতেও খরচাপত্তর করে মেয়েকে সমর্পণ করতে হবে। এ কী!

তেমনি হচ্ছেও—মেয়েরাও বিয়ে না করে অফিসে বেরুচ্ছে। বরের বাপেদের খুব রাগ—মেয়েছেলে চাকরি করছে; ছিঃ-ছিঃ হল কি

ইত্যাদি বলতে শুরু করেছেন—কারণ বুঝতে তো পারছেন যে, এর পর মেয়েরা তো আর বিয়ের আগে বাজারের ভেট্‌কী মাছের মত চুপচাপ পড়ে থাকবে না যে, খদ্দের এসে তাকে পরীক্ষা করে খুশি হলে তবে একটা দরদস্তুর করে তুলে নিয়ে যাবে, তারা এবার **কৈ মাছের মত ঝাপটা মারতে** শুরু করবে যে—তাই হয়েছে অনেকের ভয়। যাই হোক, সব টাকাকড়ির গোল মিটলো তখন আরম্ভ হল বাড়িতে গণ্ডগোল—কাপড় নাকি মাথায় চাপড় মারতে শুরু করেছে। অর্থাৎ এতদিন ধরে ওর জন্যে যেসব কাপড়-ব্লাউজ তৈরি করা হয়েছে, সেসব নাকি এযুগে কোন ভদ্রমহিলা পরেন না। যাঁরা আজ তিন বছর ধরে এসব তৈরি করেছিলেন এবং যাঁরা ব্যবহার করবেন, তাঁরা এ বিষয়ে একমত। ফ্যাশান বদলে গেছে। অতএব মাথায় হাত রেখে সবাই কাৎ হয়ে বসে রইলেন।

আচ্ছা, একি ফ্যাসাদ বলুন তো—প্রত্যেক ছ' মাস অন্তর ফ্যাশান বদলে যাচ্ছে? অথচ আগেকার ফ্যাশান ছিল ঢের ভদ্দর লোকের মত। এই নিয়ে আমি আপত্তি করাতে আমার সঙ্গে চুলোচুলি! খেপে গিয়ে তাই বললুম, আচ্ছা, ঐ তো সব চেহারা, এতে ফ্যাশান করলে যে আরও কুচ্ছিৎ দেখায়, এটা বোঝেন না? বেশ সাধাসিদে আট-পৌরেই তো ভাল—তা সেকথা কারুর তো গেরাহির মধ্যেই এল না, উপরন্তু গৃহিণী এসে যাচ্ছেতাই করে বললেন, তুমি যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা কয়ো না, থাম।

সত্যিই বুঝি না বাবা! মেয়েদের হাতার কাঁধের কাছে এক সময় ব্লাউজ ফুলো ছিল এখন তা চুপ্‌সে সেখানে ফুলফলের পটি হয়েছে, পিঠের কাছে জোড়া ছিল এখন তা কেটে ফিতের গেরো হয়েছে, গলা গোল ছিল এখন তার খোল নলচে পাল্টে এক কিম্ভূত-কিমাকার কাট্‌ হয়েছে। সায়া পরবে তার ওপর তো দ্রৌপদীর কাপড়ের পাকের মত দশপাক ফেরতা দেওয়া থাকবে তাতেও ময়ূরপঙ্খী পটি আর কাশ্মীরী গোলাপের

কৈ-ঝাপটা

ফুল বসাতে হবে। এ সব কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড বলুন তো? অথচ লোকে সুতোর অভাবে একখানা গামছা পরতে পারছে না।

এর পর কাপড়! উরেঃ বাবা—সে যে কত রকমের তা ধারণা নেই। ঢাকাই শান্তিপুরী ওসব বুড়ীদের পরার ব্যবস্থা, নবীনাদের জন্যে নাকি হয়েছে আজকাল অনাধরণের শাড়ি। ঘুড়ি শাড়ি অর্থাৎ সে শাড়ি পরলেই মনে হয় এঁরা উড়বেন, কোঁচাভুরে কাছা পাড়—মানে, দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। তার ওপর হাওয়ায় ভাসা, ফর্দাফাঁই, পরা কেন ইত্যাদি এত বিচিত্র ফ্যাশানের শাড়ি বেরিয়েছে যে চক্ষুলজ্জা বশত এঁরাও পুরোপুরি ফ্যাশানেবল হয়ে উঠতে পারলেন না, ওরই মাঝামাঝি জায়গায় একটা রফা করে নিলেন। যাক্‌, কাপড় এল প্রায় হাজার দু' টাকার ওপর।

এর পর প্রসাধন—কত রকম রং তার, সবগুলো মুখে চাপালে মনে হয় মুখ ভেঙাচ্ছে। তাই মেখে বাহার করতে হবে। তারওপর নখে একরকম রং, নাকে আর এক রকম—গালে এক রকম; কপালে একেবারে উল্টো রকমের—পরিশেষে চোখে আঠা মাখিয়ে ডবল পাতা।

আমি বারণ করতে কেউ তো আমায় কেয়ারই করলে না—অবশেষে বরকনের পেয়ার যখন পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো আমি তো তাই দেখে চেয়ার থেকে উল্টে পড়ি আর কি। ভাবলুম, এ হ'ল কি রে বাবা! একটা বিয়ে দেখলেই জীবনের চরম অভিজ্ঞতা হয়ে যায় দেখছি।

বাড়িতে সবাই বললে, খুব ভাল হয়েছে—যাকে বলে রাজযোটক কিন্তু একযোড় ঘোটক বললেও কিছু ভুল হত না। শুনেছেম ছেলের ডাক নাম লাট্টু—সেটা আমিও এর টাট্টু ঘোড়ার মতন ঘুরপাক খাওয়া দেখে বুঝেছিলুম। যাক্ এখন মেয়েটা যদি চালাক চতুর হয়, আর লাট্টুকে বাহারপাকে জড়িয়ে সংসারে চরকি ঘোরাতে পারে তাহ'লেই আমার গায়ের ঝালটা খানিক মেটে।

মেঘ মেদুর

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আগুনের তূণ দূরে ফেলে দিল আকাশ, জোয়ার-জল-কে
বুকের গভীরে পৃথিবী টানলো। দীঘিরা মেঘের আরশি
তাদের হিজল হৃদয়ে বাজলো রুমঝুম-নিঃশঙ্ক
জলতরঙ্গ; দীঘিদের মতো ভিজবার কৌশল কে
জানাবে আমাকে? হায়, আমি খুলে জানলার ভীরু শার্সী
চেয়ে দেখলাম অভিনয় শুরুঃ ধারার প্রথম অঙ্ক।

মেঘ এসো, ঘন বর্ষণে করো আমাদের উদ্বিগ্ন
যতোবার পারো, জানলার এই পাহারা করো বিদীর্ণ,
ওতে সারাদিন রুদ্ধ থাকার ব্যথায় পড়েছে মর্চে;
আর যদি পারো এ-ঘরে আনতে অনধিকারের বিঘ্ন
তবে খুশি হবো—নির্বাসনের আঘাতে যে-মন জীর্ণ
তাকে কীজন্যে এড়িয়ে শুধুই বাইরে বৃষ্টি পড়ছে?

রাজগৃহ - নালন্দা • ডাঃ অমূল্যচন্দ্র সেন

• রেখাচিত্র • ইন্দ্র দুগার •

নালন্দা

প্রাচীন ইতিহাস

নালন্দার প্রথম উল্লেখ বৌদ্ধ জৈন শাস্ত্রে যে পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, সে যুগে নালন্দা খুব সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। এখানকার প্রাবারিক-আম্রবন নামক স্থানে বুদ্ধ অনেকবার রাজগৃহে যাতায়াতের পথে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। নালন্দা অঞ্চলে মহাবীরের অনেক শিষ্যমণ্ডলী ছিল, তিনিও প্রায়ই নালন্দায় আসিতেন। একবার বুদ্ধ ও মহাবীর দুইজনেই একসময়ে নালন্দায় আসেন। একজন মহাবীরশিষ্য সে সময় বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং ইহা লইয়া নির্গ্রন্থদের (জৈন) মধ্যে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। নালন্দা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে চীনা পরিব্রাজকরা শুনিয়াছিলেন যে এখানে একটি সরোবরে নালন্দা নামে একটি নাগ থাকিত; অথবা বোধিসত্ত্ব এক পূর্বজন্মে এখানকার রাজা ছিলেন, তিনি এত দানশীল ছিলেন যে, "দিব না" এমন কথা কখনও বলিতেন না, তাই "ন অলং দা" হইতে নালন্দা নামের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এসব কিম্বদন্তীর কোন মূল্য নাই। বোধহয় পদ্মবন (নালষণ্ড?) হইতে এই নামের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। সেকালে এখানে অনেক পদ্মবন ছিল, এখনও আছে। নালন্দ নামও বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। নাল নালক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত স্থানও বোধহয় নালন্দার অংশবিশেষ ছিল। সারিপুত্রের জন্ম ও মৃত্যুস্থান বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথ বলিয়াছেন যে অশোক সারিপুত্রের চৈত্যে পূজা ও স্তূপনির্মাণ করিয়াছিলেন। ফা হিয়েন সারিপুত্রের এই ধাতুস্তূপ দেখিয়াছিলেন। বোধ হয় নালন্দার আধুনিক সারিচক নামক পল্লী সারিপুত্রের নামের স্মারক। ফা হিয়েন নালন্দা মহাবিহারের কোনই উল্লেখ না করায় মনে হয় সে সময় পর্যন্ত নালন্দার বিহার ছোটই ছিল। খৃঃ ২ শতকের নাগার্জুন, ৪ শতকের আর্যদেব, ৫ শতকের অসঙ্গ বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের নালন্দা বিহারে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদির যে উল্লেখ তিব্বতীগ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়। আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, খৃঃ ৫ শতকের মাঝামাঝি গুপ্তবংশীয় রাজা ১ম কুমারগুপ্তের সময় হইতে মহাবিহার আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজারা ইহার বৃদ্ধি সাধন করেন, ইঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধ ছিলেন।

৭ শতকের প্রথমার্ধে হিউয়েন ৎসাঙ দুইবারে প্রায় ৩ বৎসর নালন্দায় বাস করিয়াছিলেন এবং এই শতকের শেষাংশে ইৎসিং ১০ বছর এখানে অধ্যয়ন করেন। নালন্দার পণ্ডিতেরা হিউয়েন ৎসাঙকে রাজসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসগৃহে পরিচারক প্রভৃতি ছাড়া তিনি পথে বাহির হইলে একটি সুসজ্জিত হস্তী তাঁহার পিছনে চলিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই যুগে প্রায় ৩।৪ হাজার ছাত্র এই মহাবিহারে অধ্যয়ন করিত। রাজাদের দানাদি হইতে ছাত্রদের আহারাদির ব্যবস্থা হইত। এখনকার পণ্ডিত ও ছাত্রেরা বিদ্যা ও সদাচারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এখানকার জীবন কঠিন নিয়মাধীনে পরিচালিত হইত। জলঘড়ি হইতে নির্ণীত সময় সঙ্কেতে এখানকার সমস্ত কার্যাবলী নির্দিষ্ট হইত। সুবিজ্ঞ দ্বারপণ্ডিতরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া সমগ্র ভারত হইতে সমাগত প্রবেশার্থী ছাত্রদের বিহারে ছাত্রত্ব দান করিতেন। এই পরীক্ষা এত কঠিন ছিল যে প্রতি দশজন প্রবেশপ্রার্থীর মধ্যে সাত-আটজনকে ফিরিয়া যাইতে হইত। অধ্যাপক ও ছাত্রদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি শতাধিক-মণ্ডলী বা 'ক্লাসে' সারাদিন ধরিয়া চলিত।
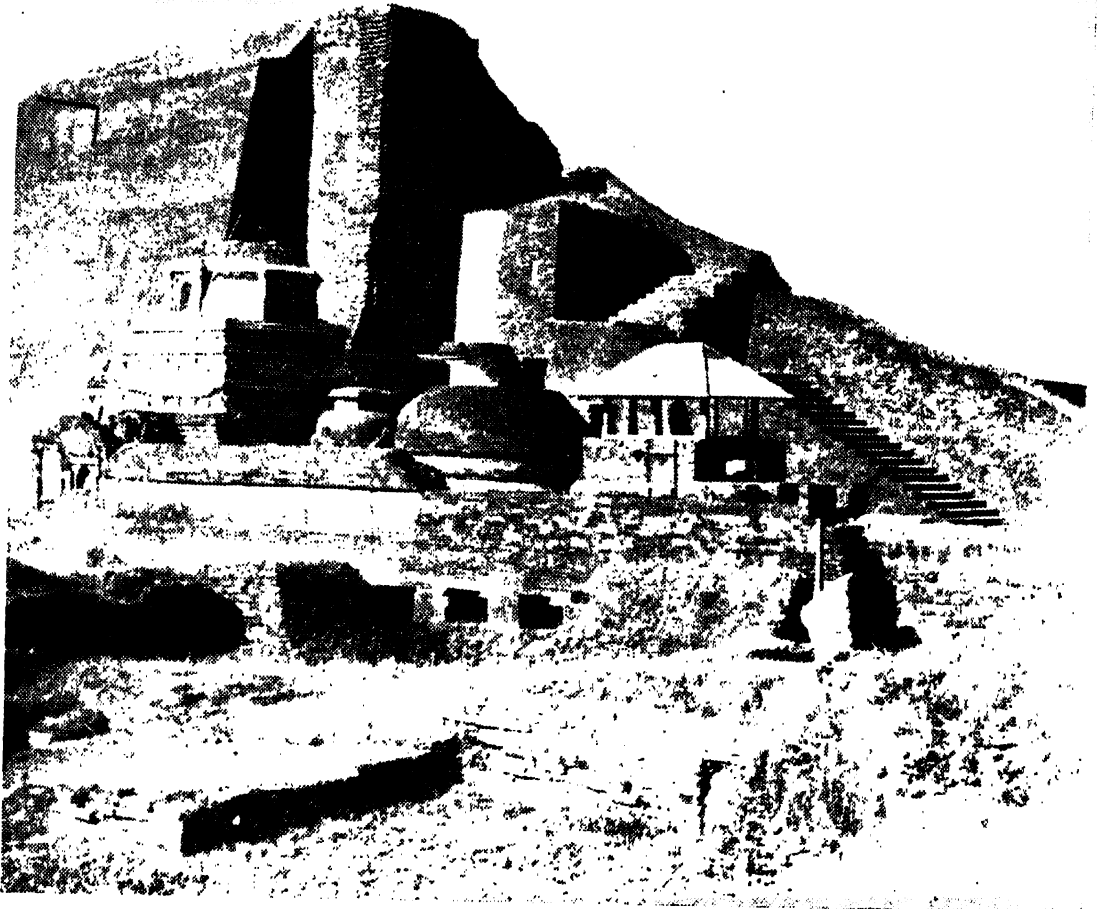
ভগ্নাবশেষ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ

শুধু বৌদ্ধশাস্ত্র নয়, বেদ সাহিত্য দর্শন ব্যাকরণ ন্যায় আয়ুর্বেদ রসায়ন ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে চর্চা এখানে হইত। হিউয়েন ৎসাঙএর সময়ে সমতটের (দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলাদেশ) রাজবংশজাত ভিক্ষু শীলভদ্র এখানকার প্রধানাচার্য ছিলেন। শীলভদ্রের পূর্বে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী-পুরবাসী ভিক্ষু ধর্মপাল প্রধানাচার্য ছিলেন, শীলভদ্র তাঁহার ছাত্র ছিলেন। হিউয়েন ৎসাঙ শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শীলভদ্রের অগাধ পাণ্ডিত্য ও পূতচরিত্রের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। আধুনিক সিলাও গ্রামের নাম হয়তো শীলভদ্রের অথবা শীলাদিত্যের (রাজা হর্ষবর্ধনের) নামানুসারে হইয়া থাকিতে পারে। শীলভদ্রের পর সম্ভব ধর্মকীর্তি প্রধানাচার্য হইয়াছিলেন। হিউয়েন ৎসাঙকে নালন্দা হইতে "মোক্ষাচার্য" উপাধি দান করা হয়। তিনি স্বদেশে ফিরিবার পরও নালন্দার পণ্ডিতরা দেবপূজায় তাঁহাকে স্মরণ করিতেন এবং তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতেন ও উপহার পাঠাইতেন।

হিউয়েন ৎসাঙ নালন্দায় একটি ৬ তলার সমান উঁচু বাড়িতে ৮০ ফুট উচ্চ একটি তাম্রের বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছিলেন, ইহা মৌর্যবংশীয় রাজা পূর্ণ বর্মণ দ্বারা ৬ শতকের প্রথমাংশে স্থাপিত হইয়াছিল। হিউয়েন ৎসাঙ-এর নালন্দায় বাসের সময়ে সম্রাট হর্ষবর্ধন এখানে একটি পিত্তলের পাতমোড়া বিহার বানাইয়াছিলেন। মহাবিহারের ব্যয়নির্বাহের জন্য হর্ষ শতাধিক গ্রাম নিষ্কর করেন, এইসব গ্রামের দুইশত গৃহস্থ প্রত্যহ মহাবিহারে চাল ঘি ও দুধ জোগাইতেন। হর্ষ নিজেকে নালন্দা পণ্ডিতগণের দাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জে হর্ষ যে ধর্ম মহাসম্মেলন আহবান করিয়াছিলেন তাহাতে নালন্দা হইতে এক সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ৮ শতকের প্রারম্ভে কান্যকুব্জরাজ যশো-

ধর্মদেবের মন্ত্রীপুত্র মালাদ নালন্দা মহাবিহারে বহু সম্পত্তি দান করেন। তাঁহার উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তিনি নালন্দার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে সে যুগের মহাবিহারের শ্রীসমৃদ্ধির স্পষ্টছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—"সংশাস্ত্র ও নানা বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের জন্য প্রখ্যাত ভিক্ষু সঙ্ঘ সমন্বিত নালন্দা মহানরপতিদের মহানগরীসমূহকেও যেন উপহাস করে; নালন্দার গগনচুম্বিপ্রাসাদশিখরশ্রেণী যেন বিধাতা দ্বারা রচিত কণ্ঠমালারূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল। নানাশাস্ত্রবিশারদ-ভিক্ষু মণ্ডলীর মনোরম নিকেতন ও নানা রত্নদ্যুতিদীপ্ত দেবায়তন সমন্বিত নালন্দা বিদ্যাধরকুলসেবিত সুরম্য সুমেরুগিরির শোভা ধারণ করিয়া আছে; যেন কৈলাসগিরিকে অপমান করিবার জন্যই রাজা বালাদিত্য (গুপ্তবংশীয় রাজা মৃত্যু ৫১১ খৃঃ—লেখক) এখানে বুদ্ধের নামে অপরূপ সুবৃহৎ শ্বেত প্রস্তর নির্মাণ করিয়াছিলেন সেই প্রাসাদ সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করিয়া, চন্দ্রলাবণ্যে অঙ্গানুলেপ ও হিমালয়শৃঙ্গরাজির রূপ নষ্ট করিয়া, স্বর্গগঙ্গার শ্বেতশোভা অপহরণ করিয়া সমালোচক সাগরকে নিস্তব্ধ করিয়া যে জগতে পরাজয় করিবার আর কিছু নাই সেখানে পর্যটন নিরর্থক বুঝিয়া যেন স্বোপার্জিত কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ এখানে অবস্থান রহিয়াছে!" হিউয়েন ৎসাঙ-এর সমসাময়িক বন্ধু রচিত জীবনচরিতেও নালন্দার বহু বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত গগনস্পর্শী প্রাসাদশ্রেণীর উল্লেখ আছে।

গৌড়ের পালবংশীয়, বৌদ্ধ রাজারা, পরমবিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ৮ শতকের শেষাংশে মগধ অধিকার করিয়া নালন্দা হইতে পণ্ডিতদের লইয়া উদ্দণ্ডপুরে (বা ওদন্তপুরী বা ওতন্তপুরী, বর্তমান বিহারশরীফ) মহাবিহার স্থাপন করেন। তিব্বতের সঙ্গে নালন্দার যোগ এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। তিব্বতরাজের নিমন্ত্রণে পণ্ডিত শান্তরক্ষিত নালন্দা হইতে তিব্বতে গিয়া বাস করেন এবং সেখানে ৭৬২ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। পণ্ডিত পদ্মসম্ভবও এই সময়ে নালন্দা হইতে তিব্বতে যান। পদ্মসম্ভব তিব্বতের লামাধর্মের প্রবর্তক। ৯ শতকের প্রারম্ভে রাজা ধর্মপাল সমগ্র উত্তরভারত জয় করিয়া পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন ও বিক্রমশিলা মহাবিহারের (ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলের লুপ লাইনে সাহেবগঞ্জ ও ভাগলপুরের মধ্যবর্তী কহলগাঁও স্টেশন হইতে ৬ মাইল) প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমশিলায়ও নালন্দার পণ্ডিতরা অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। পালবংশীয় রাজারা সোমপুর (রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর), জগদ্দল (উত্তরবঙ্গের কোন স্থান) প্রভৃতি স্থানেও মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিন্তু সকলেই নালন্দায় প্রভূত অর্থসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ উদ্দণ্ডপুরে রাজধানী স্থাপনও করিয়াছিলেন। নালন্দায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে দেখা যায় যে, বিপুলশ্রীমিত্র নামক একজন ভিক্ষু সোমপুরবিহারে তারাদেবীর মন্দির স্থাপন, একটি বিহারের সংস্কার এবং নালন্দায় "ধরিত্রীর ভূষণস্বরূপ ও ইন্দ্রপুরী বৈজয়ন্তী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ" একটি বিহার নির্মাণ করেন। সুবর্ণদ্বীপের (বর্তমান সুমাত্রা) অধিপতি বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দূতমুখপ্রেরিত অনুরোধে এই বিহারের পুঁথিনকল ও ভিক্ষুদের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজা দেবপাল (৯ শতকের মধ্যভাগে) ৫ খানি গ্রাম নিষ্কর করিয়া দেন। একটি শিলালিপিতে জানা যায় যে, ১০ শতকের শেষভাগে নালন্দা অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইবার পর আবার নির্মিত হয়; ইহা সম্ভব রাজা মহীপালের কীর্তি। ১১—১২ শতকে নালন্দায় নকল করা মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা নামক শাস্ত্র গ্রন্থের পুঁথি নেপালে, লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে ও অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। সেই যুগের মাগধী ভাষা ও লিপি হইতে বাঙলা ভাষা ও লিপির উদ্ভব হয় এবং মাগধীলিপি তিব্বতীলিপিরও জননী। নালন্দা হইতে যেমন চীনে তেমনি নালন্দা ও বিক্রমশিলা-উদ্দণ্ডপুর প্রভৃতি হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রাদি প্রচারিত হয়। ভারতীয় বহু গ্রন্থের অনুবাদ চীনা ও তিব্বতীতে করা হইয়াছিল। বিক্রমশিলার ইতিহাসও ভারত ও বঙ্গের প্রাচীন গরিমার এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় কিন্তু এখানে তাহার চর্চা করিব না। তিব্বতীগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে নালন্দায় রত্নসাগর রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক নামক তিনটি বৃহৎ প্রাসাদে গ্রন্থাগার রক্ষিত হইত এবং মহাবিহারের যে অংশে এই প্রাসাদত্রয় অবস্থিত ছিল তাহার নাম ছিল ধর্মগঞ্জ।

১১৯৭—১২০৩ খৃঃ বখ্‌তিয়ার খিলজী নালন্দা বিক্রমশিলা উদ্দণ্ডপুর প্রভৃতি ধ্বংস, সব গ্রন্থাদি অগ্নিতে ভস্মসাৎ এবং সব ভিক্ষুদের হত্যা করেন। এইসব স্থানের যাবতীয় মূল্যবান বস্তু, মূর্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাঁহার সৈন্যেরা লুঠ করে। মুসলমান ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, পুঁথিগুলিতে কি বিষয় লিখিত আছে বখ্‌তিয়ারের জানিবার ইচ্ছা হইলে পুঁথি পড়িতে পারে এমন একজন লোকও পাওয়া যায় নাই। ভিক্ষুরা সকলে নিহত হইয়াছিলেন ও অন্য সব শিক্ষিত ভদ্রলোক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তিব্বতী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মুসলমানদের আক্রমণের পর ভিক্ষু মুদিতভদ্র আবার বিহার সংস্কার ও নির্মাণ করেন এবং তাহার কিছুদিন পরে মগধরাজ মন্ত্রী কুক্কুটসিদ্ধ কর্তৃক এখানে একটি চৈত্য-স্থাপন-উৎসবোপলক্ষে ধর্মোপদেশের সময়ে দুইজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক এখানে আসিয়া ক্রোধ প্রকাশ করায় কয়েকজন তরুণ ভিক্ষু ইঁহাদের মাথায় ময়লা জল ঢালিয়া দিলে ব্রাহ্মণদ্বয় সূর্যপূজা ও যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞকুণ্ডের জ্বলন্ত কয়লা ফেলিয়া মহাবিহারে আগুন লাগাইয়া দেন। এখনও বিহারের কয়েকটি দরজা সিঁড়ি প্রভৃতিতে এইসব একাধিক অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন দেখা যায়।

ধ্বংসাবশেষ ও মিউজিয়ম

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে ধ্বংসাবশেষগুলিতে নম্বর দেওয়ায় বর্ণনার সুবিধা হইয়াছে। এখন পর্যন্ত যেসব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রাচীন মহাবিহারের একাংশমাত্র। আবিষ্কৃত বাড়ীগুলির পশ্চিমদিকের চৈত্য, পূর্ব ও দক্ষিণদিকের বিহার ও মন্দির এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোনেরটি স্তূপ ছিল। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে একাধিক স্তর পাওয়া গিয়াছে। কালবশে বা অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইলে বিনষ্ট গৃহের অবশিষ্ট ইঁটপাথরভিত্তি দেওয়ালের রাশি সরাইয়া না ফেলিয়া তাহা ভরাট ও সমান করিয়া তাহারই উপর নূতন বাড়ী নির্মিত হইয়াছিল। যুগে যুগে এইরূপ বিনাশাবশেষের উপর নবনির্মাণে স্তরগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনষ্ট গৃহের পরিকল্পনা

নালন্দার ভাস্কর্য

যেরূপ ছিল, নবনির্মাণও সেই 'প্ল্যানেই' করা হইত। বিহারগুলির প্রত্যেক স্তরে প্রায়ই দুই বা ততোধিক তলার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। আমরা প্রথমে দক্ষিণের ১এ ও ১বি বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বদিকের বিহার-মন্দিরগুলি দেখিয়া পরে পশ্চিমের চৈত্যগুলি দেখিব এবং সর্বশেষে দক্ষিণ-পশ্চিমের স্তূপটি দেখিব।

বিহারগুলির প্রবেশদ্বারের কাছের চোর-কুঠুরিতে দানপ্রাপ্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখা হইত। ভিতরে প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের শেষপ্রান্তে প্রতিমাবেদী, চারিপাশে ভিক্ষুদের বাস-কক্ষের সারি, কোন কোন কক্ষে বায়ু ও আলোক প্রবেশের জন্য "স্কাই লাইট", দরজায় চৌকাঠের বদলে খিলান, জল-নিকাশের জন্য ড্রেন, কূপ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ১নং বিহারে ৯টি স্তরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে; ইহার প্রাঙ্গণের প্রতিমাবেদীর পুরোভাগে স্তম্ভযুক্ত যে চাতালটি দেখা যায় সম্ভব তাহাতে উপবিষ্ট অধ্যাপক প্রাঙ্গণস্থ ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতেন। ২নং প্রস্তর মন্দিরটিতে রাজসাহী-পাহাড়পুরের মন্দিরের মত অনেক মানুষ পশুপক্ষী দেবদেবী প্রভৃতির মূর্তি খোদিত দেখা যায়; সম্ভব এগুলি ৬—৭ শতকে খোদিত এবং অন্য মন্দির হইতে আনিয়া এখানে সংযুক্ত হইয়াছিল কারণ বর্তমান মন্দিরটি ৭ শতকের পরে নির্মিত বলিয়া মনে হয়। ৫নং বিহারটি একটি প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষ, ইহা ৪নং বিহারের পিছনে (পূর্বে) অবস্থিত। ৬নং বিহারের উপরতলার প্রাঙ্গণে যে উনানগুলি দেখা যায় তাহাতে রান্না বা ছাত্রদের কিছু (বোধহয় কোন রাসায়নিক বিষয়) শিক্ষা দেওয়া হইত।

১১নং বিহারের পর আমরা পশ্চিম-দিকের চৈত্যগুলিতে যাইব। ১৪নং চৈত্যের প্রতিমার নিম্নগাত্রে চিত্রাঙ্কণের চিহ্ন দেখা যায়; উত্তর ভারতে দেওয়াল চিত্রের যে স্বল্প কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে ইহা তাহার অন্যতম। ১৩নং চৈত্যের উত্তরে যে উনানগুলি দেখা যায় তাহা ধাতু গলাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত; ধাতুমূর্তি নির্মাণ নালন্দার একটি শিক্ষাবিষয় ছিল। ১২নং চৈত্যের পর আমরা ৩নং স্তূপে যাইব।

৩নং স্তূপটিতে ৭টি স্তর পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্রথমে ছোট আকারে সম্ভব ৪ শতকে স্থাপিত হয় এবং এরপর প্রত্যেক পুনর্নির্মাণের সময়ে কিছু কিছু করিয়া বাড়ান হয়। ৫ম স্তরটি ৬ শতকের, এই স্তরটিই সবচেয়ে ভাল অবস্থায় আছে। উত্তর দিকের সিঁড়ি তিনটি ক্রমান্বয়ে ৫ম ৬ষ্ঠ ৭ম স্তরের। এই স্তূপটির প্রতি এত যত্ন ও এতবার ইহার পুনর্নির্মাণ দেখিয়া মনে হয় ইহা সম্ভব বুদ্ধের ধাতুস্তূপ ছিল।

মহাবিহারের চারিদিকের গাছতলা ধান-ক্ষেত পুকুরঘাট প্রভৃতিতে অনেক ছোট বড় মূর্তি পড়িয়া আছে দেখা যায়। নিকটবর্তী বড়গাঁও (বিহারগ্রাম হইতে এই নামের উদ্ভব হইয়াছে) গ্রামে একটি আধুনিক সূর্য-মন্দিরে কিছু মূর্তি রক্ষিত হইয়াছে। বড়গাঁও হইতে উত্তরে বেগমপুর গ্রাম পর্যন্ত ভূভাগের মধ্যে যে বড় বড় ঢিবিগুলি দেখা যায় তাহা প্রাচীন ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ; ঐস্থান ছিল প্রাচীন নালন্দার উত্তরপ্রান্ত। সে যুগের নালন্দা যে কত বিস্তীর্ণ ছিল তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। মহাবিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে ২ মাইল দূরস্থ জগদীশপুর গ্রামে একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি আছে।

নালন্দা খননের সময়ে প্রাপ্ত প্রত্ন-দ্রব্যাদির কিছু কিছু অদূরস্থ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। সব সামগ্রীতে বর্ণনা ও কাল-পরিচয় লিখিত আছে। নালন্দাশিল্পীরা পাথরের চেয়ে ধাতুমূর্তি নির্মাণেই বেশি যত্নবান ছিলেন এবং বৃহৎ মূর্তি নালন্দায় অনেক থাকিলেও ছোট মূর্তিতেই তাঁহাদের

আগ্রহ বেশি ছিল। বিভিন্ন মুদ্রায় বুদ্ধ, বোধিসত্ত্বগণ, তান্ত্রিক-বৌদ্ধ দেবদেবী ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিগুলির অধিকাংশই পালযুগের নির্মাণ। পালযুগের বৌদ্ধধর্মে গুপ্তযুগ অপেক্ষা অনেক নূতন দেবদেবীর উদ্ভব ও আসল মুদ্রাদির প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং পালযুগে নালন্দায় নির্মিত দেবদেবী নেপাল তিব্বত ও পূর্ব-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়া পড়ে। গুপ্তযুগের শিল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভিতরের ভাব ফুটাইয়া তোলা কিন্তু পালযুগের শিল্পে প্রাধান্য পাইয়াছিল বাহ্য সৌকুমার্য সৌষ্ঠব ও কারুকার্য।

মিউজিয়ামে রাজা, রাজকর্মচারী, সাধারণ ব্যক্তি ও মহাবিহারকর্তৃপক্ষের অনেক শীলমোহর আছে। মহাবিহারীয় শীলগুলিতে "শ্রীনালন্দা মহাবিহারীয়ার্য ভিক্ষু সঙ্ঘস্য" কথা খোদিত আছে। বৌদ্ধমন্ত্র খোদিত অনেক ইষ্টক নালন্দার স্তূপাদিতে পাওয়া গিয়াছে; এগুলিতে "যে ধর্মা হেতুপ্রভবা হেতু তেষাং তথাগতো হাবদৎ তেষাং চ যো নিরোধ এবম্বাদী মহাশ্রমণঃ" অর্থাৎ "হেতু-প্রভব যে ধর্মসমুদায় তাহাদের হেতু তথাগত বলিয়াছেন এবং তাহাদের যাহা নিরোধ, তাহাও তিনি বলিয়াছেন।"—মহাশ্রমণ এইরূপ বলিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্ত্র খোদিত আছে। কোন ইষ্টকে ইহার চেয়ে দীর্ঘতর প্রতীত্যসমুৎপাদসূত্র (যাহাতে বুদ্ধ জন্মোৎপত্তির কারণ ধারাবাহিকরূপে বলিয়াছিলেন) খোদিত আছে। বৌদ্ধভক্তগণ পুণ্যলাভের জন্য এইসব মন্ত্রখোদিত ইষ্টক স্তূপে রক্ষা করিতেন। মালাদ ও বিপুলশ্রী-মিত্রের পূর্বোল্লিখিত শিলালিপিদ্বয়ও মিউজিয়ামে দেখা যাইবে।

নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

রাজগৃহ-নালন্দার ভবিষ্যৎ

রাজগৃহে খনন পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কাজ কিছুই প্রায় হয় নাই। এখানকার সমস্ত জঙ্গল সম্পূর্ণ দূর করিয়া প্রাচীন রাস্তাগুলিকে পুনরুদ্ধার ও সংস্কার করিয়া ঘুরিয়া দেখিবার সুবিধার জন্য যানোপযোগী করা আবশ্যক। তারপর গভীর ও ব্যাপকভাবে খননাদির দ্বারা নগরের প্রাচীনরূপ যতটা সম্ভব পুনরাবিষ্কার করা কর্তব্য এবং প্রয়োজনীয় মেরামত প্রভৃতি দ্বারা তাহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া কর্তব্য। আবিষ্কৃত বাড়ীঘর রাস্তাঘাট প্রভৃতির যথাসম্ভব পরিচয় যথাস্থানে লিখিয়া দেখান উচিত। কোনও বিশেষ স্থানে সিমেণ্ট বা প্ল্যাস্টার নির্মিত একটি বৃহদাকার মানচিত্র স্থাপন আবশ্যক। বৌদ্ধ-জৈন শাস্ত্র ও প্রাচীন ভারতেতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিসমন্বিত একটি পুস্তকালয় স্থাপন কর্তব্য। প্রত্নসামগ্রীর একটি মিউজিয়ম হওয়া প্রয়োজনীয়। প্রদর্শকের কাজ করিবার জন্য লিখনপঠনক্ষম লোককে শিক্ষাদান ও পরীক্ষার পর লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট দিয়া বাঁধা হারের পারিশ্রমিকে দর্শকদের দেখাইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বিদেশী যাত্রিগণ, বিশেষতঃ অদ্ভুতবেশধারী অদ্ভুতমূর্তি তিব্বতী-নেপালী-সিকিমী-ভুটানী প্রভৃতি ভক্তগণ এখানে বাড়ীওয়ালা-পাণ্ডা-দোকানদার ও রাস্তার ছোকরাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়, ইহার প্রতিকারের জন্য পুলিশ ব্যবস্থা ও লোকশিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। অবস্থাসম্পন্ন দর্শকদের বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত সরঞ্জামসহ হোটেল ও গৃহাদি সরকার হইতে নির্মিত হওয়া আবশ্যক এবং ট্যাক্সি, সাইকেল রিক্সা প্রভৃতি যানবাহনের ব্যবস্থাও কর্তব্য।

জল চিকিৎসার জন্য যাঁহারা রাজগৃহে আসেন, তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য পাশ্চাত্ত্য দেশের "স্পা"র মত চিকিৎসালয় ও বাসগৃহ প্রভৃতি স্থাপিত হওয়া উচিত। ধারা ও কূপের জল বোতলবন্ধ করিয়া বিদেশী "মিনারেল ওয়াটারের" মত অন্যত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা আবশ্যক।

নালন্দা রাজগৃহের মধ্যে ও নালন্দা

স্টেশন হইতে ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য যানবাহনের উন্নতি আবশ্যক। নালন্দায় মিউজিয়ম ও ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি স্থানে বাসগৃহ, হোটেল প্রভৃতির, অন্ততঃ চা-পানালয়ের ব্যবস্থা আবশ্যক।

প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার ও চর্চা সভ্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অংগ। উপরন্তু বাসস্থান-যানবাহন-আহারাদির সুব্যবস্থা হইলে দেশ-বিদেশ হইতে দর্শকগণ রাজগৃহ নালন্দায় আসিয়া দেশের অর্থবৃদ্ধি করিবেন।

নালন্দার সন্নিকটে "নবনালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়" নামে একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত। ইহাতে আধুনিক সাহিত্যদর্শনাদি বিশেষতঃ আধুনিক বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা, কারখানা প্রভৃতি বিদ্যায় শিক্ষাদানব্যবস্থা হওয়া কর্তব্য।

সমাপ্ত

সাহিত্য প্রসঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

সেদিন পথে বাহির হইয়া টের পাইলাম বাদলা হাওয়া বহিতেছে। সারা বছরের মধ্যে এই বর্ষাকালেই আমি উপন্যাস পড়ি। তাই ভাবিতে লাগিলাম এইবার বর্ষাকালে কি উপন্যাস পড়া যায়। ভাবিতে ভাবিতে মনে একটা জিজ্ঞাসা জাগিল—'বঙ্কিমচন্দ্রকে পড়ি না কেন? জানি যে তিনি আমার পরিচিত লেখক, পঠিত তাঁহার উপন্যাস, কয়েকপাতা পড়িলেই বাকী কাহিনীটি ফিল্মের মত চোখের সামনে খুলিয়া যাইবে—সব জানি, কিন্তু তবু বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং অনতিবিলম্বে পাঠকালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' তুলিয়া নিলাম।

সাহিত্য আমার অবসরযাপনের সঙ্গী নয়। বিশুদ্ধ আনন্দ কিংবা সৌন্দর্যতত্ত্বের কষ্টিপাথরে আমি সাহিত্যের বিচার করি না। সাহিত্য আমার কাছে তাহার চেয়ে অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। আমি দেখিব সাহিত্য এবং সাহিত্যিক আমার জন্য কি বাণী আনিয়াছে; জীবন ও জগতের কোন সঙ্কট সমস্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোন পথের ইঙ্গিত তাহারা দিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ মনে করেন, যে, আমি সর্বদাই সাহিত্যের ভিতর অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শনের ভাষ্য দেখিতে চাই, তবে আমার প্রতি অবিচার করিবেন। গিরিশৃঙ্গে আরোহণকারী যে গিরিশৃঙ্গেই বসবাস করিবে তাহার কোন মানে নাই। আমাকে 'দুর্গেশনন্দিনী'র মত একটি সুন্দর কাহিনী দিন, আমি পড়িব। বঙ্কিমচন্দ্রের মত বর্ণনাশক্তি আপনার না থাকিতে পারে, একের পর এক ঘটনা সংস্থাপনের অপরূপ দক্ষতা হইতেও আপনি বঞ্চিত হইতে পারেন, লেখনীর দুই একটি মোচড়ে চরিত্রের উপর আলোক সম্পাতের ক্ষমতাও হয়ত আপনার নাই, কিন্তু তিলোত্তমার মত, আয়েষার মত, বিমলার মত নারীকে যদি আপনি সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে রূপকথা-মুগ্ধ বালকের মত আমি আপনার কাহিনী শুনিব। সুতরাং আমি যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' পাঠ করিতে বসিব, তাহাতে আশ্চর্যের কি। আর তাহা ছাড়া, তখন যে বসন্তের বাতাস বহিতেছে!

আমি পড়িতে বসিলাম, কিন্তু প্রথম কয়েক লাইনে আমার মন বইতে বসিল না। ভয় হইতেছিল কি জানি যদি এতদিন পরে আমার তার্কিক, সন্দেহবাদী মনটা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসে। কিন্তু ভয় বেশীক্ষণ টিকিতে পারিল না। বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে তাঁহার পাখায় উড়াইয়া নিয়া চলিলেন। জগৎসিংহ ঝড়বাদলের রাত্রে পথ হারাইয়া এক মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া করাঘাত করিতেছে। মন্দিরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। আমি যদি এই কাহিনী আগে কখনও নাও পড়িতাম, ইহা যদি আমার প্রথম পাঠও হইত, তবু আমি বলিয়া দিতে পারিতাম যে, এই মন্দিরের ভিতর এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা আছে এবং কুমার জগৎসিংহ তাহার প্রেমে পড়িবে। ভীমা রজনী, জনহীন প্রান্তর, উপরে বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ মেঘকৃষ্ণ আকাশ শতসহস্র ধারায় ঝরিয়া গলিয়া পড়িতেছে, এই রকম একটি সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্র ব্যর্থ হইতে দিবেন না। এই রকম অন্ধতমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে মন্দিরাভ্যন্তরে রাজকন্যার সাক্ষাৎ পাইলে রাজপুত্ররা যুগে যুগে প্রেমে পড়িবে।

একবার আপনি বিশ্বাস করিয়া লউন যে কুমার জগৎসিংহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে মন্দিরাভ্যন্তরস্থিতা তিলোত্তমার সাক্ষাৎ পাইল এবং দর্শনমাত্র উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল—তাহা হইলে আর কিছু ভাবিতে হইবে না; একটির পর একটি ঘটনার ঘূর্ণীপাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আপনাকে আগাইয়া নিয়া যাইবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ঘটনাগুলি যেন খেলনা, যখন যেখানে যেভাবে ইচ্ছা তিনি সেইগুলি সাজাইতে পারেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে ঘটনাসংস্থাপনের এই ভেল্‌কি তিনি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই দক্ষতার উল্টাপিঠে একটি ত্রুটি থাকিয়া যায়। উপন্যাসের চরিত্র পারিপার্শ্বিকের ঊর্ধ্বে উঠিয়া স্বীয় ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা পায়। ঔপন্যাসিকের মন যখন বাহিরের ঘটনার দিকে, তখন চরিত্রগুলির আত্মিক বিবর্তন পাঠকের কাছে অনুদ্ঘাটিত থাকিয়া যায়। কিন্তু খেয়াল রাখিতে হইবে যে 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। শক্তি তখনও ভাল করিয়া লেখনীর অগ্রভাগে ভর করে নাই। প্রথম উপন্যাস রচনার সুতীব্র আনন্দে তিনি পরিপাটি করিয়া প্লট সাজাইয়াছেন।

এবং কি সুমিত, পরিপূর্ণ প্লট! প্রধান হইতেছে তিলোত্তমা-জগৎসিংহের কাহিনী, তাহার মধ্যে আসিল আয়েষা, প্রেম-সংঘাতের

ত্রিভুজ রচিত হইল; এই মূল কাহিনীর আশেপাশে বিমলার উপকাহিনী, আশমানী-বিদ্যাদিগ্‌গজের উপকাহিনী, অভিরাম স্বামীর উপকাহিনী, ওসমানের উপকাহিনী আবর্তিত হইতেছে। কোথায়ও ফাঁক নাই; জমজমাট। কিন্তু একটি জটিল যন্ত্রও ত' নিখুঁত, নিরন্ধ্র হইতে পারে। তাই বলিয়া একটি যন্ত্রকে কেহ একটি পরিণতিশীল বৃক্ষের তুলনায় জীবনধর্মের দৃষ্টিকোণ হইতে বড় বলিবে না। এবং গল্প উপন্যাসে জীবনই প্রধান ধর্ম। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে এই শিল্পদক্ষতার ছাপ লাগিয়াছে। চরিত্র আছে অনেক; কিন্তু ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি বাহিরের দিকে, তাহাদের মনের, গভীর অন্তরের বিকাশ বিবর্তন লইয়া যেন তিনি মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহেন। গল্পের প্রথমে তাহারা যে রকম ছিল গল্পের শেষেও তাহারা সেই রকম থাকিয়া যাইতেছে। তিলোত্তমা জগৎসিংহকে ভালবাসিল এবং গল্পের শেষে জগৎসিংহের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেল; অথবা, ঘুরাইয়া বলা চলে, তাহার বিবাহের শেষে গল্প শেষ হইয়া গেল। বিমলা প্রথমাবধি কাহিনীতে উপস্থিত থাকিয়া কর্মের যোগান দিতেছে। কর্মের প্রয়োজন যখন ফুরাইল, তখন সেও অন্তর্হিত হইল; কিন্তু তাহার অন্তরের সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচয় ঘটিল না। আয়েষাকে প্রথম দেখি শত্রুপক্ষের আহত জগৎসিংহের সেবা করিতেছে। লেখক উপসংহারের পূর্বে আমাদের জানাই-য়াছেন যে, আয়েষা আত্মহত্যা করিতে সংবৃত্ত হইল এই ভাবিয়া যে প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার যন্ত্রণা যদি সে সহ্য করিতে না পারে, তবে তাহার নারীজন্ম গ্রহণের সার্থকতা কি। আয়েষার উপযুক্ত চিন্তা সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু বলিব উপন্যাসের শেষে আয়েষা সম্পর্কে আরও কিছু জানিতে আমাদের কৌতূহল থাকে না। জগৎসিংহ উপন্যাসের নায়ক হইলেও কোনদিক দিয়াই তাহার চরিত্র আমাকে আকর্ষণ করে না। উপন্যাসের শেষ লাইনের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর এই সমাপ্তির লক্ষণটি বলিয়া দিতেছে যে, ইহা কোন অসাধারণ উপন্যাস নয়। খারাপ গল্প আরম্ভের পূর্বেই শেষ হইয়া যায়। ভাল গল্প শেষ পর্যন্ত বলে। কিন্তু একেবারে প্রথম শ্রেণীর গল্প শুরু হয় সমাপ্তির পর। 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নয়, প্রথম উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় কম প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষে শেষ উপন্যাসহিসাবে ইহাই পরমগৌরবের বস্তু হইতে পারিত।

বর্তমান উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রোমাণ্টিক কবিকল্পনাকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। নায়কনায়িকাকে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লেখক চলিয়া গেলেন নায়িকার কক্ষে। তিলোত্তমা দুর্গশিখরের এক কক্ষে বসিয়া অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছে। কি ভাবিতেছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সেক্‌স্‌পীয়রের জুলিয়েটও রোমিওর সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রেমাবিষ্ট মনে প্রেমিকের কথা ভাবিতেছিল। কিন্তু তিলোত্তমা জুলিয়েটের মত সপ্রতিভ, বাক-পটু এবং আত্মসচেতন নয়। সে শান্ত, কোমল, লাজুক। তাহার চক্ষু দুইটির বর্ণনা শুনুন—"চক্ষু দুটি অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি শান্ত জ্যোতি। আর চক্ষুর বর্ণ ঊষাকালে সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে চন্দ্রাস্তের সময়ে আকাশের যে কোমল নীল-বর্ণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ; সেই প্রশস্ত, পরিষ্কার চক্ষে যখন তিলোত্তমা দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলতা থাকিত না। তাহার চক্ষুর যে দৃষ্টি তাহা—'দৃষ্টির সরলতাও বটে, মনের সরলতাও বটে।' এই কোমল নীলাভ চক্ষু দুইটি মেলিয়া তিলোত্তমা যখন জগৎসিংহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, তখন জগৎসিংহ ফুলশরে, বিদ্ধ হইয়াছিল। আঠার বছর বয়সে হয় ত' আমিও হইতাম। তখন হয়ত' এই পরিচ্ছেদের রূপবর্ণনার সমাপ্তি কিছুতেই কামনা করিতাম না। কিন্তু এখন আমি তিলোত্তমার রূপ নিয়া কি করিব? দেহের সৌন্দর্য আমাকে বিমোহিত করিয়া রাখে না। আমাকে মুগ্ধ করিতে হইলে দেহের সঙ্গে মনের সৌন্দর্য দেখাইতে হইবে; বুদ্ধিতে, কর্মে চরিত্রের নিত্য নব উন্মেষে আমার চিত্তকে জাগরিত, কৌতূহলাক্রান্ত রাখিতে হইবে। যাহার হাসিতে সরলতা ও বালিকাভাব ব্যতীত আর কিছুই নাই এমন এক সুন্দরী নারীকে দেখিতে হইলে আপনি তিলোত্তমাকে গিয়া দেখুন, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আয়েষাকে দেখিতে যাইব। এবং যতক্ষণ না আয়েষার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ বঙ্কিম আমার জন্য বিমলাকে দেহে মনে অপরূপ করিয়া তুলিবেন। সত্যকথা বলিতে কি, একদিক দিয়া দেখিতে গেলে বিমলা এই উপন্যাসে অতুলনীয়া। সে সুন্দরী, তিলোত্তমা বা আয়েষার পাশে দাঁড়াইলে সে ম্লান হইয়া যায় না। অভিজ্ঞতার দুই একটি সূক্ষ্মরেখা হয়ত' তাহার কপালে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে তাহার সৌন্দর্য বরং বাড়িয়া যায়, দেহের সৌন্দর্যের সঙ্গে একটি মানসিক স্থৈর্য আসিয়া মেশে। প্রেম, বিরহ, সুখ দুঃখ, আনন্দবেদনার সঙ্গে সে পরিচিত। প্রেমে উদ্বেল কিংবা বিরহে কাতর হইবার বয়স এবং মন সে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। অপরের প্রেমবিরহ, আনন্দ বেদনা সে অনেকখানি দূরত্ব নিয়া নিস্পৃহ-ভাবে অবলোকন করিতে পারে। সে সহানু-ভূতি হীন নয়, বস্তুত তাহার চেয়ে সহানু-ভূতিপূর্ণ, স্নেহশীল ব্যক্তি এ উপন্যাসে আর কেহ নাই। কিন্তু তাহার সকল মনো-ভাবের মধ্যে এক স্থৈর্য এবং চিন্তা করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। এবং এইজন্য সে বাক্যে এমন সুনিপুণ। ইহা নয় যে সে কাজ করিতে পারে না বলিয়া কথা বলে; বরং কাজে সে এমন সুদক্ষ বলিয়াই কথায় সে এমন সুপটু। সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে ভাল কর্মীরা ভাল কথক।

যদি অত্যুক্তি করিয়া কিছু বলিতে হয়, তবে বলিব এই উপন্যাসে একমাত্র বিমলাই কিছু করিতেছে, অন্য সকলে কেবল ঘটনা-দ্বারা আলোড়িত হইতেছে। বিমলা প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ঘটাইতেছে, শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইলে ক্ষিপ্রগতিতে মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, তিলোত্তমাকে কারা-গার হইতে উদ্ধার করিতেছে এবং নিজ হস্তে ব্যভিচারী কতলু খাঁকে হত্যা করিতেছে। অবশেষে কাহিনীতে কর্মের সকল প্রয়োজন যখন ফুরাইল তখন বঙ্কিম-চন্দ্র তাহাকে দৃষ্টির অন্তরালে নিয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমন জানিত যে বিমলাকে রাখিতে হইলে তাহাকে করণীয় কিছু দিতে হইবে এবং তাহা হইলে উপন্যাস আর শেষ করা যাইবে না। তাহা ছাড়া, বিমলা যতক্ষণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ততক্ষণ সে প্রধান অভিনেত্রী; সুতরাং সে যদি রঙ্গমঞ্চ জুড়িয়া নিজেকে প্রকটিত রাখে, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কনায়িকার কি অবস্থা হইবে?

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, স্কটের 'আই-

ভানহো' হইতে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র আখ্যানভাগ কিংবা চরিত্র গ্রহণ করেন নাই, 'আইভানহো' পড়িবার পূর্বেই তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে সাহিত্যক্ষেত্রে আর একটি উদাহরণ এই সত্যেরই সমর্থন জানাইবে যে বিভিন্ন ব্যক্তির কল্পনা নিজ নিজ পথে চলিয়াও এক ধারায় আসিয়া মিলিতে পারে। 'আইভান হো' এবং 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস দুইটির আশ্চর্য মিল হইতেছে রেবেকা এবং আয়েষা চরিত্রে। কিন্তু আমি স্কট এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে তুলনা করিতে চাহি না। জানি না কে বলিয়াছিল— 'Bankim Chandra was the Scott of Bengal.' বোধ হয়, স্কুলের বালক-বালিকাদের Proper Noun-এর আগে 'The' বসিবার রীতি শিখাইবার জন্য পণ্ডিতদের কেহ এই বাক্যটি রচনা করিয়াছিলেন। বাক্যটি স্মরণীয় হইয়া আছে ইহার অসত্যের জন্য। সমগ্রভাবে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কি স্কটের তুলনা হয়? বঙ্কিম-মনীষার বিস্তীর্ণ পরিধির আশে-পাশেও কি স্যার ওয়াল্টার স্কট আসিতে পারেন? বঙ্কিমচন্দ্রের বজ্রমুষ্টিতে ছিল ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি; কবি-কল্পনায় স্কটকে তিনি অনায়াসে পিছনে ফেলিয়া যাইতে পারেন এবং যদি কখন তিনি মনস্থ করেন যে, দুই-একটি সংক্ষিপ্ত সার্থক-বাক্যে, এপিগ্রামের দ্যুতিতে তিনি সমস্ত বক্তব্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করিবেন, তবে ওয়াল্টার স্কটের সাধ্য নাই যে, সেই দীপ্তির সামনে দাঁড়ান। আমি কিন্তু স্কটের নিন্দা করিতেছি না। আমি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিতেছি যে, আমি যখন 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়ি নাই, তখন আমি অন্যের মুখে 'আইভান হো'র গল্প শুনিয়াছি, স্কট আমার বাল্যকালে পড়া প্রথম ইংরেজ লেখক। কিন্তু যে জায়গার যাহা, তাহা সেই জায়গায় রাখিয়া দেওয়াই ভাল, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে স্কটের তুলনা শোভা পায় না।

কিন্তু তাই বলিয়া আয়েষার সঙ্গে রেবেকার তুলনা দিতে আপত্তি কি। আয়েষা এবং রেবেকা দুই দেশের দুই ঔপন্যাসিকের মনলোক হইতে জন্মলাভ করিয়া কিভাবে দুই বিভিন্ন কাহিনীর ভিতর দিয়া পরস্পরের এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা অন্য এক বিস্তৃত আলোচনার বিষয় হইতে পারে। আমি কেবল দুইটি দৃশ্যের উল্লেখ করিব। জগৎ-সিংহ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আয়েষাকে দেখিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাহাকে দেখিলাম। দীর্ঘ দুই স্তবকে আয়েষার রূপ বর্ণনা দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র তৃপ্ত না হইয়া হতাশ সুরে বলিলেন— আয়েষার সৌন্দর্য 'কি প্রকারে লিখিব?' তাঁহার হাতের চিত্রকরের তুলি প্রতিভার আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। স্কটের কাব্যলোক এত বর্ণাঢ্য নয়। তাঁহার রীতি ভাস্করের মত। অল্প কথায় তিনি রূপ খোদাই করিয়া তোলেন। রেবেকা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি—

'lustrous eyes of lovely Rebecca, eyes whose brilliancy was shaded, and, as it were, mellowed, by the fringe of her long silken eye-lashes, and which a minstrel would have compared to the evening star darting its rays through a bower of jassamine.

ইহার পর একেবারে শেষ দৃশ্যে আসুন। রোয়েনা এবং আইভান হোর বিবাহের পর রোয়েনাকে রেবেকা মূল্যবান্ উপহার দিয়া বিদায় লইল। তাহার জীবনের লক্ষ্য এখন— 'thoughts to Heaven, works of kindness to men, tending the sick, feeding the hungry, and relieving the distressed.

আয়েষাও তিলোত্তমা-জগৎসিংহের বিবাহে তিলোত্তমাকে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার উপহার দিয়া বিদায় নিল।

কিন্তু বিদায় নিয়া সে কোন আশ্রমে গেল না। সে তাহার পিতার প্রাসাদে ফিরিয়া আসিল। দুঃস্থের সেবা এবং ভগবৎ-চিন্তা দ্বারা তাহার মর্তপ্রেম খণ্ডিত হইয়া যায় নাই। ঈশ্বরকে তাহারও মনে পড়ে বটে, কিন্তু তাহা কেবল নিজের বিরুদ্ধে নিজের যুক্তির সমর্থনের জন্য। প্রেমকে অন্তরের গভীরে স্থাপন করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। রেবেকা স্থিতিশীল, ভাস্করের মূর্তি বলিয়া এত সহজে সে থামিয়া যায়। আয়েষা তাহার পাশে অনেক গতিময়। রেবেকা গোধূলির অন্তরাগ; আয়েষা ঊষার অরুণিমা।

বিমলা, তিলোত্তমা, আয়েষা—একই উপন্যাসে এই তিন সুন্দরী নারীর চিত্র আঁকিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় পরীক্ষা করিতেছিলেন যে, সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তাঁহার হাতের তুলি কিরকম কাজ করে। প্রেম, বিরহ, মিলনের গণ্ডি হইতে বিমলা দূরে। সুতরাং তাহাকে বাদ দিলে বাকী থাকে তিলোত্তমা এবং আয়েষা। তাহারা দুইজনেই অসামান্যা সুন্দরী, তাহারা দুইজনেই ভালবাসিল এবং একজনকেই ভালবাসিল। বঙ্কিমচন্দ্র সজাগ ছিলেন যে, এক উপন্যাসে এই দুই নারীচরিত্রের সৃষ্টি করিলে পরস্পরের সঙ্গে একটা তুলনা পাঠকের মনে জাগিবে। সেইজন্য তিনি নিজেই আয়েষাকে উপস্থিত করিয়া তিলোত্তমার সঙ্গে তাহার রূপের তুলনামূলক বর্ণনা দিয়াছেন। 'তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দুজ্যোতির ন্যায়; সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য হয় না; তত প্রখর নয়—এবং দূরনিঃসৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন; কিন্তু সে পূর্বাহ্নিক সূর্য-রশ্মির ন্যায়; প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে তাহাই হাসিতে থাকে।' কিন্তু ইহা ত বাহ্য রূপের বর্ণনা। অন্তর্জগতে এই দুই নায়িকা যে কত বিভিন্ন, তাহা স্পষ্টত কোন লাইনে, লেখক বলিয়া দেন নাই, কিন্তু দুই লাইনের ফাঁকে ফাঁকে স্পষ্টতরভাবে বলিয়া দিয়াছেন। জগৎসিংহ আয়েষার পিতার শত্রু, কিন্তু আহত জগৎসিংহকে আয়েষা শুশ্রূষা করিতেছে। এই সেবাপরায়ণতা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আয়েষার ভাবাবেগপ্রসূত মনোভাব নয়, ইহা তাহার স্বভাবের মধ্যে নিহিত আছে। সেবা করিতে করিতে জগৎসিংহকে সে ভালবাসিল, সত্য কথা; কিন্তু তাহাতে তাহার সেবার স্বাভাবিক, স্বতন্ত্র মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যদি সে শত্রুপক্ষীয় মুমূর্ষু সেনাপতিকে সেবাযত্ন দ্বারা বাঁচাইয়া তুলিয়া আবার তাহাকে ভুলিয়া গিয়া নিজের আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে ফিরিয়া যাইতে পারিত, তবে অবশ্য অনেক মহিমময় চরিত্র সৃষ্ট হইত, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রোমাণ্টিক মন তখনও তাহাকে এত নিরুত্তাপ, নিরলংকার ঊর্ধ্ব-লোকে উঠিতে দেয় নাই। ইহাও খেয়াল রাখিতে হইবে যে, আয়েষাকে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল চরিত্র সৃষ্টির জন্যই আনেন নাই। আয়েষাকে তাহার প্রয়োজন কাহিনীর জন্যও। জগৎসিংহ, তিলোত্তমা এবং আয়েষা—এই তিনে মিলিয়া ত্রিভুজ রচিত না হইলে কাহিনীর গতি শ্লথ হইয়া যায়।

ভালবাসা আসিয়া তিলোত্তমার হৃদয়কে অভিভূত করে, কিন্তু আয়েষার হৃদয়কে স্পর্শ করে। যে প্রেরণা তিলোত্তমাকে

ভাসাইয়া নিয়া যায়, সেই প্রেরণাই আয়েষাকে আরও দৃঢ়, আরও সংহত এবং আরও সম্ভ্রান্ত করিয়া তোলে। সর্ববিষয়ে সর্বদিকে আয়েষার সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে। সে জানে যে, জগৎসিংহকে স্বামীরূপে পাওয়া অসম্ভব। তাহার ভালবাসার কথা সে প্রকাশও করিত না। কিন্তু ঘটনাচক্রে এক নিশীথে নিজের ও জগৎসিংহের সম্মান রক্ষার জন্য ঈর্ষাকাতর ওসমানের কাছে একথা তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইল। যাহারা মন দিয়া উপন্যাসের অর্ধেক পর্যন্ত পড়িয়াছে, তাহারা বলিয়া দিতে পারিবে যে, আয়েষার ভালবাসা বাস্তবক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিবে না। জাতি ও সমাজের গণ্ডীই বড় নয়। এই ভালবাসা যদি সফল হয়, তবে এ উপন্যাসের, এ চরিত্রের, সব চরিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। সংসারের সাধারণ বাসনা কামনা, সুখ-স্বস্তির বাহিরে আয়েষা নিজেকে লইয়া বাঁচিতে পারে। তাহার আত্মসম্ভ্রম এবং মানসিক সংগতি তাহাকে যে মর্যাদা দিয়াছে, শিল্পী বঙ্কিম তাহা ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। পীড়িত জগৎসিংহ যখন শুশ্রূষারতা আয়েষাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি পীড়ার ঘোরে স্বপ্ন দেখিতাম, স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, সে তুমি না তিলোত্তমা?' আয়েষা তখন কেবল উত্তর দিল, 'আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন।' ইহার পরেও কি আমাকে বলিয়া দিতে হইবে কেন, কোন্ অমোঘ শিল্পনির্দেশে আয়েষা তাহার প্রেমাস্পদকে লাভ করিতে পারিবে না?

আমি এতক্ষণ পুরুষ চরিত্রগুলি নিয়া আলোচনা করি নাই। তাহার কারণ এই নয় যে, পরে তাহাদের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিব, তাহার কারণ এই যে, এ উপন্যাসের পুরুষ ব্যক্তিদের নিয়া আলোচনা করিবার মত কিছু নাই। বিমলা, তিলোত্তমা এবং আয়েষার ত্রিমূর্তির কাছে তাহারা সকলেই নিষ্প্রভ। জগৎসিংহ বীর যোদ্ধা, কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা তাহার শিশুর মত, সৈনিকদের সাধারণত যাহা হইয়া থাকে।

জগৎসিংহ ছাড়া আর আছে বহিঃপ্রকাশ মাত্র। জগৎসিংহ ছাড়া আর আছে চারজন পুরুষ—অভিরাম স্বামী, বীরেন্দ্র-সিংহ, ওসমান ও বিদ্যাদিগ্‌গজ। একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে, এই চারিটি চরিত্র পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, কিন্তু এক জায়গায় তাহাদের মিল আছে। নারী সম্বন্ধে তাহারা কমবেশি সকলেই দুর্বল, অন্তত বর্তমানে না হইলেও অতীতে ছিল। অভিরাম স্বামী এখন সাধু, সংসারত্যাগী। কিন্তু গত জীবনে তিনি লম্পট ছিলেন। কাহিনীতে তাঁহাকে সাধু হিসাবেই উপস্থিত দেখিতে পাই। লাম্পট্য হইতে এই সন্ন্যাস-মার্গে তাহার উত্তরণ এবং কোন্ চেতনা ও বিবেকের প্রেরণায় এই উত্তরণ ঘটিল, তাহার উল্লেখ নাই। হয়ত পার্শ্বচরিত্র বলিয়া লেখক তাহার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু যদি তাহা করিতেন, তবে অন্তত একটি চরিত্র পাইতাম, যে অন্তরের আলোতে, বিবেকের প্রেরণায় এক পথ হইতে অন্য পথে উত্তীর্ণ হইতেছে। পূর্বেও বলিয়াছি, চরিত্রের আত্মিক বিকাশের দিকে লেখকের দৃষ্টি নাই বলিয়া সমস্ত উপন্যাসে যান্ত্রিকতার ছায়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে ভালমানুষ থাক কিম্বা মন্দ-মানুষ থাক, দেখাইতে হইবে যে, তাহারা প্রত্যেকে নিজের মনের তাগিদে কিছু করে বা বলে। একথা যেন মনে না হয় যে, পিছনে লেখক বসিয়া চরিত্রগুলিকে নিয়া কেবল পুতুলনাচ দেখাইতেছেন। এই-খানেই কথা আসে, ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্বের। ঔপন্যাসিক একই সময়ে চরিত্রের ভিতর আছেন এবং নাই। চরিত্রগুলি তাহারই প্রাণ হইতে প্রাণবায়ু সংগ্রহ করিতেছে। অথচ তিনি তাহাদের কাহারো দ্বারা আবদ্ধ নহেন। অভিরাম স্বামী পূর্বে অসৎ ছিলেন, এখন সৎ হইয়াছেন, একটি পুতুলকে সরাইয়া আর একটি পুতুলকে স্থাপন করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কি যোগসূত্র আছে বা ছিল, তাহা আমরা জানি না।

বীরেন্দ্রসিংহ বংশগৌরবে গর্বিত। শূদ্রীর কন্যা বিমলার প্রতি তিনি আসক্ত হইলেন, কিন্তু বংশ-মর্যাদায় আঘাত লাগে বলিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন না। স্বয়ং মানসিংহের অনুরোধেও না। পরে অবশ্য মানসিংহের শাসনে এবং কারা-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া জনসাধারণের অগোচরে বিমলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতা আরও হাস্যকর হইয়া উঠে। ওসমান ভালবাসে আয়েষাকে। আয়েষা কিন্তু স্পষ্ট ওসমানকে জানাইল যে, ভ্রাতাভগ্নী ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ তাহাদের ভিতর নাই। কিন্তু ওসমানের আশা যায় না; এবং অবশেষে জগৎসিংহকে প্রতিদ্বন্দ্বী জানিতে পারিয়া আয়েষাকে সে তীব্র ভাষায় বিদ্রূপ করে এবং জগৎ সিংহকে অসিযুদ্ধে আহ্বান করে। তাহার সংস্কারাচ্ছন্ন মন প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। তবু যদি আয়েষা তাহাকে ভালবাসিত, তবে না হয় তাহার উত্তেজনার একটা সমর্থন পাওয়া যাইত। কিন্তু আয়েষার কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও নিজের ভালবাসার তাগিদেই সে আয়েষার উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। ওসমান অনুদার বা অকৃতজ্ঞ নয়। সে যখন জানিতে পারিল যে, বিমলার কাছে তাহার ঋণ রহিয়াছে, তখন সে সকল বিপদের ঝুঁকি নিয়াও বিমলাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। তাহার সংকীর্ণ পথে সে বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলিতে পারে, কিন্তু তাহার বাহিরে গেলেই, তাহার সামাজিকতা, সভ্যতার প্রলেপ খসিয়া পড়ে। বিদ্যাদিগ্‌গজ মূর্খ, আশমানীর জন্য প্রেম তাহার মূর্খতার চূড়ান্ত। বিদ্যাদিগ্‌গজের কথা বরং ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল।

এ উপন্যাসের প্রধান যোদ্ধপুরুষগণ, অর্থাৎ জগৎ সিংহ, ওসমান, বীরেন্দ্র সিংহ—কেহই মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। সাহস ও বীরত্ব তাহারা দেখাইতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর মাপকাঠিতে ত' সমগ্র জীবনের বিচার হয় না। দৈহিক সাহস এবং তাহার সঙ্গে কিছুটা একপথগামী মানসিক দার্ঢ্য থাকিলে মৃত্যুর সম্মুখে অনেকেই স্থির থাকিতে পারে; কিন্তু জীবনের সম্মুখে স্থির থাকিতে হইলে অন্য এক শক্তির প্রয়োজন। উপন্যাসের বীরপুরুষেরা জীবনের ঝড়ঝাপটায় টাল সামলাইতে পারিতেছে না। কিন্তু সেই ঝড়ের মধ্যে স্থির লক্ষ্যে চলিয়াছে বঙ্কিমের নারীচরিত্র কয়টি। আয়েষা, বিমলা, এমন যে আশমানী সেও বিমলার সঙ্গে অন্ধকারের অভিসারে পদক্ষেপ করিতে দ্বিধা করে না। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে আত্মসচেতন ছিলেন কিনা জানি না—কিন্তু প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে যে, জীবনের যে শক্তি তিনি পুরুষের মধ্যে খুঁজিয়া পান নাই, তাহা তিনি নারীর ভিতর দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই দৃষ্টি বঙ্কিম-মনীষার কোন্ ধারার প্রতি ইঙ্গিত দিতেছে, তাহা চিন্তাশীল পাঠকরা ভাবিয়া দেখিবেন।

অজব নীবিক্ষা

জি কে চেস্টরটন

অনুবাদক ঃ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রফেসর চ্যাড্-এর বাড়ি থেকে যখন বেরুলাম, তখন অনেক রাত্তির। প্রফেসর থাকেন শেফার্ড বুশে, আমরা যাবো ল্যাম্বেথ। রাত্তিরটা আমি বেসিলের ওখানেই কাটালাম। দীর্ঘ রাস্তা, যেতে-আসতে বেশ খানিকটা কষ্ট হয়। এমনিতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, শুয়ে পড়তেই দু-চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। ঘুম ভাঙলো পরের দিন প্রায় দুপুরে। আয়েসী আমেজে আমরা ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে বসলাম। গ্র্যান্টকে কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল। সকালের ডাকে যে চিঠিপত্তর এসেছিল সেদিকে সে ফিরেও তাকালোনা। একখানা চিঠিও সে খুলে দেখতো না বোধহয়, যদি না হঠাৎ ওপরকার চিঠিখানার ওপরে গিয়ে তার নজর পড়তো। আসলে সেটা চিঠি নয়, টেলিগ্রাম। তা সত্ত্বেও তার আচরণে তেমন কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। যেরকম ধীরমন্থর চালে সে ডিম ভেঙে নিচ্ছিল, চায়ে চুমুক দিচ্ছিল—টেলিগ্রামখানাকেও সেই একইভাবে খুলে নিল সে। পড়া শেষ হলো, তবু সে কথা কয় না। চাঞ্চল্যহীন শান্ত মূর্তি। অথচ তা সত্ত্বেও, কি জানি কেন, আমার মনে হলো, ভেতরে ভেতরে তার তোলপাড় চলছে; ঢিলে স্নায়ুগুলো যেন টান-টান হয়ে উঠেছে হঠাৎ। তাই, হঠাৎ যখন সে তার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, আমি খুব অবাক্ হলাম না। লাথি মেরে চেয়ারটাকে সে হটিয়ে দিল, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।

টেলিগ্রামখানাকে সে মেলে ধরলো আমার সামনে; বললো, "কী এর মানে, বুঝতে পারছো কিছু?"

দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে, "এক্ষুনি চলে আসুন। জেম্‌স্-এর মানসিক অবস্থা ভয়াবহ।—চ্যাড।"

"কী বলতে চান ভদ্রমহিলা?" বিরক্তি-ভরে আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, "এঁদের ধারণা প্রফেসর একটি জন্ম-উন্মাদ; তাই না?"

সংযতকণ্ঠে বেসিল বললো, "না হে চার্লি, ব্যাপারটা বোধহয় গুরুতরই হবে। বুদ্ধিমতী মেয়েমাত্রেই অবশ্য পণ্ডিতদের পাগল মনে করে। আর যাদের বুদ্ধি নেই তারা তো মনে করে পুরুষমাত্রেই পাগল। তাই বলে তো আর সে ধারণাটাকে তারা টেলিগ্রামের মারফৎ ঘোষণা করতে যায় না? ঘাস সবুজ, ঈশ্বর করুণাময়—এসব কথা আমরা সকলেই জানি। তা বলে কি সেকথা আমরা টেলিগ্রাম করে আর কাউকে জানাতে যাবো? মিস্ চ্যাড্ যে পোস্ট-অফিসে দৌড়ে গিয়ে সেখানকার অচেনা সব লোক-দের সামনে জানিয়েছেন যে, তাঁর ভাইএর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে এবং সেই মর্মে যে তাঁদেরকে একখানা টেলিগ্রাম করে' দিতে বলেছেন আমাদের ঠিকানায়, তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা গুরুতর। আরও বোঝা যাচ্ছে যে, তাড়াতাড়ি আমাদের এখন শেফার্ড বুশে যাওয়া দরকার। অন্তত সেইটেই মিস্ চ্যাড্-এর ইচ্ছে। তা নইলে তিনি টেলিগ্রাম করতেন না।"

সহাস্যে বললাম, "তাহলে যাবো নিশ্চয়ই?"

বেসিল বললো, "নিশ্চয়ই। চলো, একটা গাড়ি নেওয়া যাক।"

* সারা পথ সে একটিও কথা কইলো না। ওয়েস্টমিনস্টার ব্রীজ, ট্রাফালগার স্কোয়্যার, পিকাডিলি ছাড়িয়ে আক্সব্রীজ রোড ধরে গাড়ি চললো আমাদের। বেসিল চুপ করে বসে রইলো।

প্রফেসরের বাড়িতে এসে পৌঁছুলাম। গেট খুলবার সময় প্রথম কথা কইলো বেসিল। গম্ভীরগলায় সে বললো, "নিশ্চিত জেনো চার্লি, এর আগে আর লণ্ডন শহরে এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে নি। কোনও সভ্যদেশেই ঘটে নি বোধহয়।"

বললাম, "বেসিল, সেক্ষেত্রে সবিনয়ে আমি স্বীকার করছি যে, এর মধ্যে অদ্ভুত কোনও কিছুই আমার চোখে পড়ছে না। অথর্ব এক বৃদ্ধ অধ্যাপক—সারা জীবন তিনি অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে কাটিয়েছেন, তাতে তাঁর দৈন্য ঘোচেনি; আজ যখন অপ্রত্যাশিত-ভাবে সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেল, তখন সেই হঠাৎ-আনন্দের ধাক্কায় যে তিনি পাগল হয়ে যাবেন সেইটেই তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে তুমি অদ্ভুত কি দেখলে? একে দুর্বল, তায় বৃদ্ধ—ধাক্কাটা তাই আর তিনি সামলে উঠতে পারেন নি। জেম্‌স্ চ্যাড্ যে পাগল হয়ে যাবেন তাতে অবাক্ হবার কি আছে? কী এমন অদ্ভুত ব্যাপার এটা?"

"তাহলে তো কোনও কথাই ছিল না," বেসিল বললো, "প্রফেসর যদি পাগল হয়ে যেত তো কে তাতে অবাক্ হতো বলো? অবাক্ হচ্ছি অন্য কারণে।"

"কি কারণে?" অধৈর্য হয়ে আমি শুধোলাম।

কলিং বেলে হাত রাখলো বেসিল, বোতাম টিপে বললো, "এই কারণে যে, প্রফেসর পাগল হয়ে যায় নি।"

দরজা খুলে গেল। সামনেই দেখলাম বড় বোন দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘ চোখা চেহারা। সবশুদ্ধ এঁরা তিন বোন। আর দুটি বোনও দরজার সামনেকার সরু প্যাসেজটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। কী যেন একটা বিশ্রী আশঙ্কাকে তাঁরা আড়াল করে রয়েছেন মনে হলো। মনে হলো, মেটারলিংকের একটা রহস্যময় নাটকের আমরা নীরব দর্শক, সর্বাঙ্গ কালো পোষাকে আবৃত করে প্রেতায়িত তিন নারীমূর্তি যেন মঞ্চের ওপরে এসে আবির্ভূত হয়েছে; অপার্থিব যে সর্বনাশ ঘটে গেছে একটু আগে, গ্রীক কোরাসের ঢঙে তাকে যেন এরা দর্শকচক্ষুর অন্তরালেই রেখে দিতে চায়।

একজন বললেন, "বসুন আপনারা, কী হয়েছে বলছি।" কণ্ঠস্বর কঠিন, বেদনা-বিদ্ধ।

তারপর অর্থহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ জানালার দিকে তাকিয়ে থেকে নিষ্প্রাণকণ্ঠে তিনি ফের বলতে শুরু করলেন, "যা যা ঘটেছে, পর পর বলে যাচ্ছি। সকালবেলা,—আমি তখন ব্রেকফাস্টের কাপডিশগুলো সব গুছিয়ে তুলে রাখছি। দুটো বোনেরই শরীর খারাপ যাচ্ছে, তারা আর তাই নীচে নামেনি। জেম্‌স্‌ অন্য ঘরে গেছে, বোধ হয় একখানা বই নিয়ে আসতে। একটু বাদে সে ফিরে এল। বই না নিয়েই। চুপচাপ কিছুক্ষণ চুল্লীটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো; মনে হলো, কিছু একটা চায় হয়তো। বললাম, 'জেমস্‌ কিছু খুজছো নাকি?' জেম্‌স্‌ সে-কথার উত্তর দিল না। তাতে আমি খুব অবাক হইনি। জানেনইতো ও-রকম অন্যমনস্ক থাকে সব সময়? আবার তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু চাই কি জেম্‌স্‌?' তবু সে কথা কয় না। মাঝে মাঝে এমন বিভোর হয়ে যায় এক-এক সময় যে, গায়ে হাত না দিলে ও আর তখন কিছু টেরই পায় না। ওর দিকে তাই এগিয়ে গেলাম। গায়ে হাত রাখতে যাবো, এমন সময় হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস আমার চোখে পড়লো। কতখানি যে হতভম্ব হয়ে গেলাম সে আর কী বলবো। ব্যাপারটা আপনাদের কাছে অর্থহীন বলে মনে হবে; কিন্তু এই অর্থহীন ব্যাপারে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার যেন মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। দেখি, জেম্‌স্‌ এক-পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

গ্রাণ্ট একটু হাসলো শুধু। বিচিত্র সে-হাসি। তারপর, কে জানে কেন, উৎসাহে দাড়ি চুলকাতে লাগলো।

আমি বললাম, "একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে! কী বলছেন আপনি?"

ভদ্রমহিলা নিজেও বোধ হয় বুঝতে পারেননি, কী হাস্যকর উক্তি তিনি করেছেন। নিষ্প্রাণ কাতরকণ্ঠে তিনি বললেন, "আজ্ঞে হাঁ, একপায়ে। দেখি, শুধু বাঁ পায়ে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে; ডান পা' খানা সামনে প্রসারিত,—বুড়ো আঙুলটা নীচের দিকে বাঁকানো। পায়ে কোনও চোট্‌ লেগেছে নাকি জিজ্ঞেস করলাম। তাতে সে তার ডান পা' খানাকেই শুধু আরও একটুখানি ওপরে তুলে ধরলো, বুড়ো আঙুলটা দেখলাম দেয়ালের দিকে নিবন্ধ। তখনো সে একদৃষ্টিতে সেই চুল্লীটার দিকে তাকিয়ে আছে।

"'জেম্‌স্‌, তোমার হয়েছে কী?' ভয় পেয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম। জেম্‌স্‌ তার কোনও উত্তর দিল না। ডান পায়ে শূন্যে লাথি ছুঁড়লো তিনবার, তারপর বাঁ পা' খানাকে তুলে ধরলো। বাঁ পায়েও সে তিনবার লাথি ছুঁড়লো দেখলাম, তারপর একটা চর্কীর মতো ঘুরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। চেঁচিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জেম্‌স্‌, জেম্‌স্‌,—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? জবাব দিচ্ছ না কেন?' কপাল কুঁচকে স্থিরদৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে মেঝের থেকে সে তার বাঁ পা শূন্যে তুলে ধরলো, বৃত্তাকারে সেই পা' খানাকে সে ঘোরালো কয়েকবার। আমি আর থাকতে পারলাম না। দৌড়ে গিয়ে ক্রিস্টিনাকে ডেকে আনলাম। তারপর যে কী হলো, না বলাই ভালো। তিন বোন আমরা। কথা বলবার জন্যে তিনজনেই তাকে সাধ্য-সাধনা করতে লাগলাম। কান্নাকাটি করতে লাগলাম। সে কান্নায় পাথরেরও বোধ হয় চোখ ফেটে জল বেরুতো। জেম্‌স্‌ তবু নির্বাক। একটা কথারও সে জবাব দিল না, নির্বিকার শান্তমুখে ঘরময় সে নেচে বেড়াতে লাগলো। দেখে মনে হলো, ও-পা যেন আর জেম্‌স্‌-এর পা নয়। পা' দুটোকে যেন ভূতে পেয়েছে। একটিবারের জন্যেও সে মুখ খুললো না। এখনও পর্যন্ত খোলেনি।"

উত্তেজিত হয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। শুধোলাম, "কোথায় তিনি? তাঁকে এখন একলা থাকতে দেওয়াটা ঠিক নয়।"

"ও এখন বাগানে," মিস্‌ চ্যাড্‌ বললেন, "ডাঃ কোলম্যান ওর সঙ্গে রয়েছেন। ডাক্তার বলছিলেন, ওর এখন একটু খোলা জায়গাতে থাকাই ভালো। তা এ-অবস্থায় তো আর রাস্তায় বেরুনো যায় না?"

বেসিল আর আমি গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালাম; বাগান তার সামনে। ছোট্ট ছিম-ছাম বাগান, পরিপাটি ফুলের কেয়ারি। মনে হলো, ঝলমলে একখানা মসৃণ কার্পেট যেন। এবং, বড্ডো বেশী সাজানো-গোছানো। তা হোক্‌। গ্রীষ্মের এই অপরূপ বিকেলে সেই অতি-প্রসাধনের উগ্রতার ওপরেও চঞ্চল প্রাণোচ্ছলতার লাবণ্য এসে লেগেছে। একটু এগিয়েই একটা ঝক্‌ঝকে বৃত্তাকার লন, দুটি লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। প্রথমজনের চেহারা বেঁটে এবং চোখা, গোঁফজোড়া কুচ-কুচে কালো, মাথায় একটি পরিচ্ছন্ন টুপি। বুঝলাম যে, ইনিই ডাঃ কোলম্যান। মৃদু পরিষ্কার গলায় তিনি কথা কইছেন। তবে, মুখ দেখে মনে হলো, একটু যেন বা নার্ভাস। অপরজন আমাদের বন্ধু প্রফেসর জেম্‌স্‌ চ্যাড। স্থির হয়ে তিনি ডাক্তারের কথাগুলো সব শুনে যাচ্ছেন। দৃষ্টিতে একটা বিজ্ঞ গাম্ভীর্য। চশমার কাঁচের ওপর রোদ্দুর এসে পড়েছে, চিকচিক করছে। গত রাত্তিরের কথা মনে পড়লো। বেসিল যখন বড় বড় সব তত্ত্বকথা আওড়াচ্ছিলো তখনও তিনি ঠিক এমনিভাবেই শান্ত হয়ে সব শুনছিলেন, আর আলোর ছটা লেগে চিকচিক করছিল তাঁর চশমা। হুবহু সেই একই প্রশান্ত ভঙ্গী। একটুমাত্র তফাৎ শুধু। আজও তাঁর দৃষ্টি শান্ত বটে, তবে পা' দুটি চঞ্চল। দম-দেওয়া পুতুলের পা যেন। অবিশ্রান্তভাবে তা নেচে চলেছে। ঋষির মতো শান্ত মুখ, নর্তকীর মতো চঞ্চল পা। চতুর্দিকে ফুলের সমারোহ, রোদ্দুরের সোনালী সম্ভার। সর্বকিছু মিলিয়ে একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য। একটা অলৌকিক ব্যাপার। মজা এই যে, অলৌকিক ব্যাপার-গুলো সব দিনের বেলাতেই ঘটে, মন যখন অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন। রাত্তিরের এমনই প্রভাব, মনে তখন বিশ্বাসের শান্তি নামে। কোনও কিছুকেই আর তখন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়না।

দ্বিতীয় ভগ্নীটি ইতিমধ্যে ঘরে এসেছেন, বিরসমুখে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছেন। জ্যেষ্ঠাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "এডেলেড্‌, মিউজিয়মের সেই মিঃ বিংহ্যাম কিন্তু আজও আসবেন। তিনটের সময় তাঁর আসবার কথা।"

তিক্তকণ্ঠে এডেলেড্‌ চ্যাড্‌ বললেন, "জানি। সব কথাই এখন তাঁকে খুলে বলতে হবে। পোড়া কপাল, অত সুখ আমাদের সইবে কেন?"

গ্রাণ্ট তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়ালো। বললো, "কি বলবেন আপনি? কী বলবেন মিঃ বিংহ্যামকে?"

প্রফেসর-ভগ্নী তাঁর হতাশাকঠিন কণ্ঠে বললেন, "কী বলবো তা কি আপনি জানেন না মিঃ গ্রাণ্ট? জেমস্‌কে তো দেখলেন, এই অবস্থায় কি আর ওকে কেউ চাকরী দিতে চাইবে? দেখুন, অবস্থাটা একবার দেখুন।" বলে তিনি বাগানের মধ্যে তাঁর ভাইয়ের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করলেন। প্রফেসরের দিকে ফিরে তাকালাম

আমরা। মুখে তাঁর সৌম্য শান্তি, পা দুখানা নৃত্যচঞ্চল।

বেসিল হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর বললো, "মিস চ্যাড্, ব্রিটিশ মিউজিয়মের সেই ভদ্রলোক যেন কখন আসবেন?"

"তিনটের সময়।"

"বেশ, এখনো তাহলে ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া যাবে।"

বেসিল আর কালক্ষেপ করলো না, জানালা টপকে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। সরাসরি সে প্রফেসরের দিকে এগোল না, ঘুরপথে সাবধানে এগোতে লাগলো। তারপর যখন প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, থেমে পড়লো সে। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। মুখে চোখে একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গী। তা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারছিলাম, টুপির নীচে থেকে চোরা দৃষ্টি হেনে প্রফেসরকে সে লক্ষ্য করছে।

হঠাৎ গিয়ে সে প্রফেসরের পাশে দাঁড়ালো, চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কি হে প্রফেসর, এখনো কি তুমি মনে করো যে জুলুরা একটা নির্বোধ জাত?"

ডাঃ কোলম্যান তাঁর ভুরু কোঁচকালেন। মনে হলো, বেসিলের আচরণে তিনি উদ্বেগবোধ করছেন। কী যেন তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, প্রফেসর হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন বেসিলের দিকে। তবে তার কথার কোনও জবাব দিলেন না। বাঁ পা'খানাকে শুধু সামনে এগিয়ে দিলেন।

"ডাঃ কোলম্যানকে তুমি দলে টানতে পেরেছো?" উচ্চকণ্ঠে বেসিল প্রশ্ন করলো আবার।

প্রফেসর তাঁর ডান পা'খানাকে তুলে ধরলেন, শূন্যে লাথি ছুঁড়লেন বারকয়েক। মুখে সেই সৌম্য শান্তি।

ডাক্তার হঠাৎ বাধা দিলেন বেসিলকে। প্রফেসরকে বললেন, "চলুন প্রফেসর, বাগান তো দেখা হলো, এবারে ভিতরে যাওয়া যাক। চমৎকার বাগানটি আপনার, চমৎকার। চলুন, এবারে ভিতরে যাই।"

প্রফেসরের বাহুর ওপরে তিনি হাত রাখলেন, মৃদুভাবে আকর্ষণ করলেন তাঁকে। তারপর একটু নীচুগলায় বেসিলকে বললেন, "দয়া করে ও'কে আর এখন ঘাঁটাবেন না, তাতে করে উনি আরো বিগড়ে যেতে পারেন।"

ঠাণ্ডা সুরে বেসিল বললো, "ডাক্তার, প্রফেসর আপনার পেসেণ্ট; আপনার নির্দেশ আমাকে তাই মানতেই হবে। তা সত্ত্বেও আপনাকে মিনতি জানাচ্ছি, দয়া করে ওকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে আমার কাছে থাকতে দিন। কথা দিচ্ছি, কোনও ক্ষতিই ওর হবে না। ওকে আমি কিছুমাত্র ঘাঁটাবো না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

ডাক্তার তাঁর চশমার কাঁচ মুছতে লাগলেন; মনে হলো, একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এক মুহূর্ত থেমে থেকে বললেন, "তা না হয় হলো, কিন্তু বড্ডোই রোদ্দুর এখানে। রোদ্দুরে দাঁড়ানোটা ও'র ঠিক হবে না; বিশেষ ও'র আবার টাকমাথা।"

"তার জন্যে ঘাবড়াবেন না।" বলে চটপট বেসিল তাঁর মস্তো টুপিটাকে খুলে নিয়ে প্রফেসরের ডিম্বাকার মাথার ওপরে বসিয়ে দিল। প্রফেসরের তাতে কোনও ভাবান্তর বোঝা গেল না। দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে একইভাবে তিনি নাচতে লাগলেন।

ডাক্তার ততক্ষণে চশমা পরে নিয়েছেন। ঘাড় বাঁকিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তিনি তাকালেন একবার, তারপর বললেন, "আচ্ছা, বেশ।"

আর একমুহূর্তও তিনি সেখানে দাঁড়ালেন না। বাড়ীর ভেতরে চলে এলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন তিন বোন, ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন তাঁদের পাশে। তারপর পুরো একটি ঘণ্টা তাঁরা বাগানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুই বন্ধুর কীর্তিকলাপ দেখতে লাগলেন।

দেখলেন, বেসিল গ্রাণ্ট কী যেন করেকটা প্রশ্ন করলো প্রফেসরকে। প্রফেসর তার কোনও জবাব দিলেন না, আপনমনেই নাচতে লাগলেন। বেসিল তখন তার এক পকেট থেকে একটা লাল নোটবই, আর অন্য পকেট থেকে একটা লম্বা পেন্সিল বার করে আনলো।

দ্রুতহাতে সেই নোটবইতে কী-যেন টুকে নিতে লাগলো সে। নাচতে নাচতে প্রফেসর এক একবার সরে যান, বেসিল তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে, তারপরে আবার নোট নেয়। বাগানের মধ্যে সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একজন তার নোটবইতে অবিশ্রান্ত-ভাবে কী-সব টুকে চলেছে, আরেকজন নাচছেন। কখনো বা শিশুর মতো লাফাচ্ছেন।

এইভাবেই বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, তা প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশেক হবে। গ্রাণ্ট হঠাৎ তাঁর পেনসিলটিকে পকেটে রেখে দিল দেখলাম, নোটবইখানা শুধু হাতে রইলো তার। তারপর সরাসরি সে প্রফেসর চ্যাড্-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

তারপরেই ঘটলো এক অদ্ভুত কাণ্ড। পাগলামিটা যে শেষতক্ এতদূরে পর্যন্ত গড়াবে তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। করুণাপ্রশান্ত দৃষ্টিতে প্রফেসর কিছুক্ষণ বেসিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন; তারপর বাঁ পা'খানাকে সামনে তুলে নিয়ে, প্রফেসর-ভঙ্গী আজ সকালে সর্বপ্রথম তাঁকে যে বঙ্কিম-ঠামে অবলম্বন করেছিলেন, তেমনি কায়দায় তির্যকভাবে সেটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখলেন। বেসিলও তৎক্ষণাৎ, কী কাণ্ড, জুতোসমেত তার নিজের পা'খানাকে শূন্যে তুলে নিয়ে প্রফেসরের সামনে এগিয়ে ধরলো। প্রফেসর তাতে বাঁ পা নামিয়ে নিলেন, নিয়ে ডান পা'খানাকে পেছনে বাড়িয়ে দিয়ে সাঁতারের ভঙ্গীতে সামনে ঝুঁকে পড়লেন। বেসিলও দেখলাম সঙ্গে সঙ্গেই তার পা'দুখানাকে আড়াআড়ি করে দাঁড়িয়েছে। সেইভাবেই সে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠলো, তারপর আবার স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কী যে ব্যাপার, ভালো করে সেটা বুঝে উঠবার আগেই দেখলাম দুজনেই তার নাচতে সুরু করেছে। এতক্ষণ ছিল একটা পাগল, এবারে হলো দুটো। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৪১

মায়াবতীর পথে চিত্তরঞ্জনের দানশীলতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯১৫ সালের ১৪ই অক্টোবরে লমগড় ডাকবাংলা হ'তে মোরনালা যাত্রা করার প্রাক্কালে।

পাহাড়ি ছেলেমেয়েদের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম রামগড় ছেড়ে আসার কিছুক্ষণ পরেই। রামগড় হ'তে পিউড়া দশ মাইল পথ; পিউড়া হ'তে আলমোরা আট মাইল; এবং আলমোরা হ'তে লমগড় দশ মাইল। রামগড় হ'তে লমগড় এই আটাশ মাইল পথ অতিক্রম করতে আমাদের প্রায় তিন দিন সময় অতিবাহিত হয়েছিল। তার কারণ, পিউড়া এবং আলমোরা উভয় স্থানেই আমরা এক রাত্রি ক'রে অবস্থান করেছিলাম।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল পিউড়ায় উপনীত হ'য়ে তথাকার ডাকবাংলায় ঘণ্টা কয়েক বিশ্রামের পর অবিলম্বে আলমোরা অভিমুখে রওনা হওয়া। তা হ'লে সেই দিনই, অর্থাৎ ১১ই অক্টোবর সন্ধ্যা নাগাত, আমরা আলমোরায় পৌঁছতে পারতাম। কিন্তু পিউড়ার অপরূপ সৌন্দর্য আমাদিগকে পঙ্গু ক'রে আটকে ফেললে। সর্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হয়ে গেল, সেদিন সুন্দরী পিউড়াকে পশ্চাতে ফেলে পাদমেকং আমরা ন গচ্ছামঃ। পিউড়াকে সুন্দরী বললাম, যেহেতু আমার অন্তরবাসী রসিক ভাষাতত্ত্ববিদ্ আমাকে নিঃসংশয়ে জানিয়ে দিলে, পিউড়া শব্দ প্রিয়া শব্দের অপভ্রংশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কাঠগুদাম হ'তে মায়াবতীর মধ্যে যে আটখানি চটির ডাকবাংলায় আমরা অবস্থান করেছিলাম, তার প্রত্যেকটিই সযত্ন নির্বাচনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থান আবিষ্কার ক'রে ক'রে প্রতিষ্ঠিত। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটিকে যদি প্রিয়া আখ্যা দিতে হয়, তা হ'লে পিউড়া নিশ্চয়ই প্রিয়া। সেইজন্যে পরদিন প্রত্যূষে চা-পানের পর আলমোরার পথে পদার্পণ করবার সময়ে কমনীয়া পিউড়ার দেহ-লাবণ্যের উপর শেষ দৃষ্টি বুলোতে গিয়ে আসন্নবিরহকাতর মনের মধ্যে যে দুঃখ দেখা দিয়েছিল, তাকে ভাষা দান করতে হ'লে কতকটা বলা চলে,

> হে প্রিয়া পিউড়া অয়ি নিরুপমে,
> তোমারে ছাড়িয়া চলিনু তবে।
> তোমার রূপের অপরূপ ছবি
> জানিনা আবার হেরিব কবে॥

আলমোরায় একদিন বিলম্ব করবার কারণ ছিল প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ আলমোরা জেলার সদর মহকুমারূপে ক্ষুদ্র হ'লেও আলমোরা একটি পার্বত্য সহর। হিমালয়ের সুনিবিড় আরণ্যশ্রীর মধ্যে, অন্ততঃ বৈচিত্র্য সম্পাদনের দিক দিয়ে, তার একটা মূল্য নিশ্চয়ই আছে। সে মূল্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে পাশ কাটিয়ে চ'লে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক হয় না। নগরের রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে এসে পাহাড়-পর্বত গাছপালার রাজ্যে নগরের লঘু সংস্করণও উপেক্ষার বস্তু নয়।

আলমোরায় একদিন অবস্থান করবার দ্বিতীয় কারণটাই ছিল গুরুতর কারণ। কাঠগুদাম থেকে আলমোরা পর্যন্ত যে-সকল যানবাহন কুলি-মজুর এসেছিল, এজেন্সীর নিয়ম অনুযায়ী তারা আলমোরা ছাড়িয়ে আর এক পাও অগ্রসর হ'তে পারে না; সকলকেই সদলে প্রত্যাবর্তন করতে হবে কাঠগুদামে। আলমোরা থেকে মায়াবতী অভিমুখে যাবার জন্য পুনরায় নূতন ক'রে ডাণ্ডি, ঘোড়া ডাণ্ডি-কুলি, ভারবাহী কুলি প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

এজেন্সীর অধীন ডাণ্ডিওয়ালা কুলি এবং ভারবাহী কুলি সম্বন্ধে আলমোরা হ'তে কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্র নিয়ম। কাঠগুদাম হ'তে আলমোরা পর্যন্ত সমস্ত পথ একই এজেন্সী-কুলির আসার পক্ষে কোনও বাধা ছিল না,—কিন্তু আলমোরা হ'তে মায়াবতীর পথে তা হবার উপায় নেই; এজেন্সীর-কুলি হ'লে প্রত্যেক স্টেজে নূতন কুলির দ্বারা পুরাতন কুলির বদল করতে হয়। অতিরিক্ত পারিশ্রমিক অথবা পুরস্কারের লোভে কুলিদের এক স্টেজের অতিরিক্ত এক পা-ও নিয়ে যাওয়া যায় না; একটি মাত্র স্টেজ পৌঁছে দিয়েই তারা একেবারে খালাস। তখন পুনরায় নূতন কুলি সংগ্রহ করতে হয়।

অবশ্য এজেন্সীরই সে কার্য করবার কথা, কিন্তু কোনো কারণে এজেন্সী অসমর্থ হ'লে পথচারীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়; বিশেষতঃ আমাদের মতো পথচারীদের, যাদের শতাধিক কুলির প্রয়োজন। সেই জন্যে এজেন্সীর বাইরের একটানা কুলি যত সংগ্রহ করতে পারা যায়, তত নিশ্চিন্ত থাকা চলে। আলমোরার একটি বাঙালি বড় দোকানদার রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে আমাদের মায়াবতী রওনা হবার ব্যবস্থাদি করেছিলেন। বহু কষ্টে তিনি মাত্র বার-তেরটি কুলি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন; যারা আলমোরা থেকে মায়াবতী পর্যন্ত একটানা যেতে স্বীকৃত হয়েছিল। অবশিষ্ট কুলি কুলি-এজেন্সীর। আলমোরা থেকে আমাদের রওনা হবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার পর এজেন্সীর দুজন চাপরাশি পরবর্তী চটি লমগড়ে রওনা হ'ল, সেখানে স্থানীয় পাটোয়ারির সাহায্যে চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রাম সকল হ'তে আমাদের জন্য কুলি সংগ্রহ ক'রে রাখবার উদ্দেশ্যে। এই লমগড়েই, কিন্তু আমাদিগকে কুলি-বিভ্রাটে পড়তে হয়েছিল,—আর, তারই সম্পর্কে উদ্ভূত হয়েছিল চিত্তরঞ্জনের দানশীলতার কৌতুকজনক দ্বিতীয় কাহিনী।

যেদিন আমরা আলমোরা পৌঁছেছিলাম, তার পরদিন, অর্থাৎ ১৩ই অক্টোবর আহারাদি সমাপনের পর বেলা একটা নাগাত রওনা হ'য়ে সন্ধ্যার পরে আমরা লমগড় ডাকবাংলায় উপনীত হলাম।

সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছিল, সুতরাং সেদিন আর লমগড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখবার সুযোগ হ'ল না। ডাকবাংলার কক্ষে প্রবেশ ক'রে দেওয়ালে-টাঙানো চার্টের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেখি, সমুদ্রস্তর হ'তে আমরা ৬৪৫০ ফুট উচ্চে আরোহণ করেছি।

এখানকার ডাকবাংলাটি আগেকার ডাকবাংলাগুলির তুলনায় ক্ষুদ্র হ'লেও অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং সুগঠিত। কাঠগুদাম হ'তে পিউড়া পর্যন্ত প্রত্যেক ডাকবাংলায় তিনটি ক'রে, এবং আলমোরার দুটি ডাকবাংলায় চারিটি ক'রে শয়ন কক্ষ ছিল; এখানকার ডাকবাংলায় এবং পরবর্তী ডাকবাংলাগুলিতে

মাত্র দুটি ক'রে। আলমোরার পর এপথে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত কম হয় ব'লেই বোধহয় বৃহত্তর ডাকবাংলার প্রয়োজন হয় না।

বস্তুতঃ আলমোরার পর থেকেই আমরা হিমালয়ের জনবিরল আরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করেছি। পথ বলতে আমরা যে বস্তু বুঝি, আলমোরায় পেঁৗছেই তা শেষ হয়ে গেছে: এ অঞ্চলের পথ যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমনি বন্ধুর; কিন্তু তেমনি চিত্তাকর্ষক। সত্য কথা বলতে, লমগড়ের পথে পদার্পণ করেই আমরা যেন নগাধিরাজ হিমালয়ের ধ্যান-নিমগ্ন অখণ্ড সমাহিত মূর্তির প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম। তার পূর্বে মানুষের সভ্যতার প্রশস্ত সুগম পথ, তরবারি রেখার ন্যায়, সে মূর্তিকে খণ্ডিত ক'রে চলেছিল।

পর দিন ধীরে সুস্থে আহারাদি সেরে মাত্র সাড়ে আট মাইল দূরবর্তী মোরনালা চটি অভিমুখে পাড়ি জমিয়ে অবহেলায়-অনায়াসে তথায় বৈকালের পূর্বে পেঁৗছানো যাবে এই পরিকল্পনা স্থির ক'রে চা-পানের পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাস খেলায় বসা গেল। আমাদের মায়াবতী ভ্রমণের একটা বড়-রকম উদ্দেশ্য হিমালয় উপভোগ। সে কার্য ত কাঠগুদাম থেকেই নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হ'য়ে চলেছে; সুতরাং মায়াবতী পেঁৗছানোর বিষয়ে আমাদের তেমন কোন তাড়া ছিল না। আমাদের প্রয়োজনের মতো যথেষ্ট কুলি সংগ্রহ পরদিন যদি না হ'য়ে ওঠে, তা হ'লে আরও একদিন না-হয় লমগড়েই অবস্থান করা যাবে—এমন এক মতলবও আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। পরিকল্পনা ত' অনেক সময়েই করা যায়, কিন্তু মানুষের পরিকল্পনাকে খেয়াল মতো তচনচ ক'রে দেবার একজন মালিকও যে, অলক্ষিতে অন্তরালে বিরাজ করে, সে কথার কে তখন হিসেব করেছিল!

পরদিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে চা-পান ক'রে আমরা বরফ দেখতে ব'সে গেলাম। তখন উদয়শীল সূর্যের রক্তাভ কিরণপাতে তুষার-পর্বতের ঊর্ধ্বাংশ আরক্ত হয়ে উঠেছে; নিম্ন প্রদেশ তখনো স্নিগ্ধ-নীলাভ। ক্ষণে ক্ষণে কিন্তু এই গাঢ় রক্তবর্ণ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের দিকে পরিণত হ'য়ে আসছে; সঙ্গে সঙ্গে গতিশীল সূর্যের তির্যকতার পরিবর্তন হেতু পর্বত-শিখরে-শিখরে আলোছায়ার চিত্রণও পরিবর্তিত হ'য়ে চলেছে।

তুষার পর্বতের গাত্রে আলোছায়ার এই অপরূপ লীলা সন্দর্শন বেশিক্ষণ আমাদের উপভোগ করা সম্ভব হ'ল না—এজেন্সীর একজন চাপরাশি এসে সংবাদ দিলে, কয়েকদিন পূর্বে আলমোরার ডেপুটি কমিশনার সাহেব বহুসংখ্যক কুলি সঙ্গে নিয়ে সফরে গেছেন ব'লে পাটোয়ারি আমাদের প্রয়োজনের মত কুলি সংগ্রহ করতে পারছেনা। তৎসঙ্গে এমন দুঃসংবাদও পাওয়া গেল যে, খুব সম্ভবত সেই দিন সন্ধ্যাকালেই

ডেপুটি কমিশনার ঐ এলাকার সফর শেষ করে সাঙ্গোপাঙ্গসহ লমগড় ডাকবাংলায় প্রত্যাবর্তন করবেন।

বোঝা গেল কঠিন সংকট দেখা দিয়েছে, ঝড়ের তাড়নায় তুষার এবং প্রভাত সূর্যের আভা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হ'ল। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কানুন অনুযায়ী ডাকবাংলায় সরকারী কর্মচারীর অধিকার অপ্রতিবিধেয়; তিন ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে যে-কোনো রাজকর্মচারী বাংলা দখলকারীকে বাংলা ছেড়ে যেতে বাধ্য করতে পারে। লমগড় ছেড়ে যাবার মতো আমাদের কুলি সংগ্রহ যদি না হ'য়ে ওঠে, এবং সন্ধ্যার পর এক দুর্ধর্ষ দুর্বিনীত ইংরাজ সাহেব এসে তিন ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে আমাদের তাড়াবার জন্য যদি শিং-নাড়া দিতে আরম্ভ করে, তখন ব্যাপারটি সত্যসত্যই সংগীন হয়ে উঠবে। ডাকবাংলার দখল নিয়ে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে ঝগড়া বাধানো যেমন হবে বে-আইনী, লটবহর জিনিসপত্র এবং মহিলাদের নিয়ে বৃক্ষতলে বেরিয়ে এসে রাত্রি-যাপন করা তেমনি অবাঞ্ছনীয়।

তখনই পরামর্শ সভা ব'সে গেল, এবং সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হ'ল, এরূপ সংকটজনক অবস্থায় যে-কোনো প্রকারে যত শীঘ্র সম্ভব লমগড় পরিত্যাগ ক'রে মোরনালার উদ্দেশে যাত্রা করাই বিধেয়। অন্ততঃ যে ক'খানা ডাণ্ডি এবং একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহন করবার উপযুক্ত কুলি যাতে সংগ্রহ হ'তে পারে, সেজন্য পুরস্কারের পরিমাণ বিশেষভাবে বর্ধিত করবার আশা দিয়ে চাপরাশিকে পাটোয়ারির কাছে পাঠানো হ'ল। কিন্তু একথা আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, পুরস্কারের মাত্রা বাড়িয়ে মানুষের লোভের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো যেতে পারে,—কিন্তু কুলির অভাবে কুলি সংগ্রহের শক্তি যথেচ্ছা বাড়ানো চলে না।

কথাটা অবিলম্বে আমাদের বাহিনীর মধ্যে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল; অমনি চতুর্দিকে প'ড়ে গেল 'সাজ্ সাজ্' রব। লমগড় হ'তে মোরনালা সমস্ত পথ হয় ত' সকলকেই পদব্রজে অতিক্রম করতে হবে, অবগত হ'য়ে সকলের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা উচ্ছল হ'য়ে উঠল; মহিলারাও সে উৎসাহ থেকে কিছু মাত্র বাদ পড়লেন না। আমাদের বাহিনীর ক্যাপ্টেন ললিতমোহন সেন ত' আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠলেন। কয়েকদিন থেকে তাঁর মনের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছিল যে, প্রতিদিন যথাসময়ে পরিতোষ সহকারে আহার করতে করতে সারারাত্রি ডাকবাংলার নিরাপদ কক্ষে লেপের মধ্যে আরামে নিদ্রা দিতে দিতে, ডাণ্ডির উপর সুখে সমাসীন হ'য়ে দুলতে দুলতে যে নিরঙ্কুশ হিমালয় অভিযান মসৃণভাবে শেষ হ'য়ে আসছে, তা নিতান্তই সাদাসিধে; তার মধ্যে না আছে হৃৎকম্প, না রোমাঞ্চ। এক-আধ দিন না যদি হ'ল উপবাস, এক-আধ রাত্রি না যদি হ'ল তরুতল-বাস, যদি দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অক্ষতই র'য়ে গেল, তা হ'লে নামঞ্জুর তেমন হিমালয় অভিযান! আজ লমগড় থেকে মোরনালা পর্যন্ত সমস্ত পথ পদব্রজে যাওয়া হবার কথা শুনে ললিতবাবুর মুখে হাসি দেখা দিলে; বললেন, "তবু ভাল! যা হোক্ খানিকটে মুখ রক্ষে হ'তে পারবে।" কিন্তু পথটা মাত্র সাড়ে আট মাইল শুনে ঈষৎ দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, "অন্ততঃ মাইল দশেক হ'লেও বলবার মতো কথা হ'ত।"

চিত্তরঞ্জনের খাস পরিচারক বদরী নিকটেই ছিল; বললে, "সে দুঃখু করবেন না বাবু! হিসেবে সাড়ে আট মাইল, কিন্তু আসলে পনেরো মাইলের সমান। মুদি বলছিল, পথের একেবারে শেষে মাইলখানেক লম্বা এমন এক খাড়া চড়াই আছে যে, শুধু সেই চড়াইটা উঠতে যা কষ্ট হয়, তত কষ্ট হয় না তার আগের সমস্ত পথটা হেঁটে যেতে। বলছিল, চড়াইয়ের ঠিক আগে একটা ভারি জঙ্গলও আছে।"

জঙ্গলের কথা শুনে ললিতবাবু ঈষৎ তৎপর হয়ে উঠলেন। একটা কুলিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাাঁরে, মোরনালার পথে কিরকম জঙ্গল আছে?"

মাথা নেড়ে কুলি বললে, "বহুৎ ভারী জঙ্গল আছে বাবুজী।"

"বাঘ আছে সে জঙ্গলে?"

"বহুৎ! বাবুজি, বহুৎ!"

"ভাল্লুক?"

"বহুৎ!"

"বাঘ মানুষ মারে কখনো?"

অম্লান বদনে অবলীলার সহিত কুলি বললে, "হামেশা।" তারপর ক্যাপ্টেন সাহেবের মুখমণ্ডলে বোধ করি কিছু লক্ষ্য করে আশ্বাস দিলে, "দিনের বেলা বাঘ বেরোয় না; রাত্রে, সন্ধ্যাকালে বেরোয়।"

ললিতবাবু বললেন, "কিন্তু আমাদের ত' জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যা হ'য়ে যেতেও পারে।"

মনে মনে একটা কি হিসেব করে কুলি বললে, "তা পারে।"

ঈষৎ চিন্তিত কণ্ঠে ললিতবাবু বললেন, "তা হলে উপায়?"

কুলি বললে, "কতকগুলো মশাল তৈরী করে নিন বাবুজী, মশালের আলোয় বাঘ আসবে না।"

প্রত্যেক ডাকবাংলার পাশে একটি করে মুদিখানার দোকান থাকে। মুদির কাছে সংবাদ নিয়ে জানা গেল এক টিন কেরোসিন তেল পাওয়া যাবে। তখন জন দুই কুলির সাহায্যে ললিতবাবু উৎসাহের সহিত মশাল প্রস্তুত করাতে প্রবৃত্ত হলেন।

বেলা একটা পর্যন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা করে পাটোয়ারি যে-কয়েকজন কুলি সংগ্রহ করতে সমর্থ হল এবং যে-কয়েকজন এক-টানা কুলি আমাদের সঙ্গে ছিল তাতে দেখা গেল নিতান্ত মূল্যবান জিনিসের কয়েকটি বাক্স, রাত্রের জন্য আহারের উপকরণ ও শয়নের শয্যা ভিন্ন অপর সমস্ত দ্রব্য, মায় আটখানা ডাণ্ডি, পিছনে ফেলে যেতে হয়। কিন্তু তা ভিন্ন আর উপায় কি আছে?

বেলা আড়াইটে বেজে গিয়েছে। যে কয়েকজন কুলি লমগড় হতে মোরনালা মাত্র এক স্টেজ যাবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, 'বৃত্তাত' (খোরাকি) বাবত তাদের আড়াই টাকা দিতে হবে। যে-সকল জিনিস আমাদের সঙ্গে যাবে এবং যা পিছনে পড়ে থাকবে, তার ব্যবস্থার গুরুতর কর্তব্যে ললিতবাবু তখন নিরতিশয় ব্যস্ত, বৃত্তাতের টাকার জন্য তাঁকে বিব্রত করা সমীচীন হয় না। মনিব্যাগ থেকে একটি দশ টাকার নোট বার করে চিত্তরঞ্জন পাটোয়ারির হাতে দিলেন।

কুলিদের আড়াই টাকা চুকিয়ে দিয়ে পাটোয়ারি বাকি সাড়ে সাত টাকা চিত্তরঞ্জনকে ফেরৎ দিতে উদ্যত হল।

পাটোয়ারির প্রতি অতিরিক্ত প্রসন্ন হবার মতো কি বিশেষ কারণ ঘটে থাকতে পেরেছিল সে কথা আজ পর্যন্ত আমি অবগত নই,—কিন্তু টাকা ফেরৎ নেবার

কোনো উপক্রম না দেখিয়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "উয়হ্ তুমকো বকশিশ্ দিয়া।"

সরলভাবে গ্রহণ করলে, একথার অর্থ অবশ্য দুর্বোধ্য নয়; কিন্তু সাড়ে সাত টাকা বকশিশের কথাই কি সহজবোধ্য ব্যাপার? নিশ্চয়ই আপাতসরল এ কথার ভিতরে কোনো গূঢ় অর্থ আছে সন্দেহ করে ব্যগ্র কণ্ঠে পাটোয়ারি বললে, "হুজুর, সমঝা নেহি!" অর্থাৎ, হুজুর, বুঝতে পারছিনে।

চিত্তরঞ্জন কানে একটু খাটো ছিলেন: মনে করলেন কুলি ঠিক শুনতে পায়নি; ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে পুনরায় বললেন, "উয়হ্ তুমকো বকশিশ্ দিয়া!"

অবিকল একই ভাষা! বিমূঢ় পাটোয়ারির কেঁদে ফেলতেই শুধু বাকি। এমন বিপদে জীবনে আর কখনো বেচারা পড়েনি! সম্ভ্রান্ত ধনবান ব্যক্তিকে একই প্রশ্ন বারম্বার করতে কুণ্ঠা বোধ হয়, অথচ সাড়ে সাত টাকার মতো একটা অবিশ্বাস্য যা-নয় তা বকশিশ থামকা ট্যাঁকে গোঁজেই বা কেমন করে? তা ছাড়া, বকশিশ্ পাবার মতো কোন্ সৎকার্যই বা সে করেছে, এক-মাত্র উপযুক্তসংখ্যক কুলি সংগ্রহ করে দিতে না পারা ব্যতীত? তবে যদি প্রাণপণ চেষ্টার ফলে কয়েকটি কুলি জোগাড় করে উপস্থিত চালিয়ে দেওয়াই পুরস্কৃত হবার যোগ্য কার্য বলে বিবেচিত হয়, তা হলে আট আনা পয়সাই ত' তার বাহবা বকশিশ্। সাড়ে সাত টাকা পুরস্কারের কোনও মানে হয়? করজোড়ে কাতর কণ্ঠে পাটোয়ারি বললে, "মাফ্ কিয়া যায় হুজুর! সমঝা নেহি।" অর্থাৎ, ক্ষমা করা হোক্ হুজুর! বুঝতে পারছিনে।

এবার কিন্তু চিত্তরঞ্জন ধৈর্য হারালেন। সত্যি কথা বলতে, অপরাধই বা তাঁর কোথায়? এককথা তিন-তিনবার বলতে হ'লে কোন্ ভদ্রলোক ধৈর্য ধারণ করতে পারে! পাটোয়ারির মুখের সামনে হাত নেড়ে সতর্জনে বল্লেন, "উয়হ্ তুম রখ্ লেও! তুমকো বকশিশ দিয়া।"

দানের দাপট দেখে আমরা ত একেবারে তটস্থ! এপর্যন্ত পাটোয়ারির কাছে যে ব্যাপার দুর্ভেদ্য রহস্য ছিল, এখন তা প্রতীতির আলোকপাতে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। দুই চক্ষে তার আনন্দমাখা কৃতজ্ঞতার দীপ্তি। ভূমি পর্যন্ত দুই বাহু নত ক'রে ক'রে চিত্তরঞ্জনকে সে বারংবার অভিবাদন করতে লাগল। সাড়ে সাত টাকা তার পক্ষে সামান্য অর্থ নয়; হয়ত তার মাস খানেকের বেতনেরই কাছাকাছি। অভাব-পীড়িত তার সংসারকে দুঃখের যে অন্ধকার নিয়ত মলিন ক'রে রেখেছে, উপ্রি পাওয়া এই সাড়ে সাত টাকার দ্বারা তার একটা দিকের মালিন্য নিশ্চয়ই কতকটা লঘু হ'তে পারবে। হয়ত আসন্ন মহানবমীর মেলায় এই টাকা দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য জিনিসপত্র কিনে সে তাদের মলিন মুখে খানিকটা হাসি ফোটাতে সক্ষম হবে। সাড়ে সাত টাকা তার পক্ষে সামান্য অর্থ নয়।

পাটোয়ারির পক্ষে সামান্য অর্থ না হ'লেও চিত্তরঞ্জনের পক্ষে নিশ্চয় সামান্য। অসামান্য শুধু দানপ্রবণতার বেগবশতঃ ছলে-ছুতোয় দরিদ্রের হাতে আট আনার পরিবর্তে সাড়ে সাত টাকা গুঁজে দেওয়া।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে বেশ কিছুকাল চিত্তরঞ্জন যে দারুণ অর্থাভাবে পীড়িত হয়েছিলেন, তাতে যদি পরবর্তী জীবনের বন্যা-স্রোতের ন্যায় অর্থাগমের কালে তিনি কঠোর কৃপণ হ'য়ে উঠতেন, তাঁকে ক্ষমা করা যেতে পারত। আজ যদি তিনি মোরনালা যাত্রা করবার সময়ে ডান্ডিতে উঠে পাটোয়ারির সমুৎসুক হাতের উপর একটা দোয়ানি ফেলে দিয়ে যেতেন, তা হ'লেও তাঁর দানের স্বল্পতার বিষয়ে কৈফিয়ৎ দেওয়া চল্‌ত। শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর মুখে শুনেছি, এক একদিন এমন দিনও গেছে, যেদিন সংসার খরচের জন্য তাঁর হাতে মাত্র একটি টাকা সম্বল। সমস্ত দিন অপেক্ষা ক'রে আছে স্বামী যদি বৈকালে কোর্ট থেকে কিছু টাকা নিয়ে ফেরেন। চিত্তরঞ্জন কোর্ট থেকে ফিরেছেন, নিকটে আসা পর্যন্ত বাসন্তী দেবীর সবুর সয়নি, দূরে থেকে মুখ উঁচু ক'রে নীরবে প্রশ্ন করেছেন, কিছু এনেছ কি? মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চিত্তরঞ্জন উত্তর দিয়েছেন, না, কিছু না। তখন সেই টাকাটি দ্বারা তিনি সংসার পরিচালনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বৃদ্ধ শ্বশুর আছেন, রাত্রে তাঁর জলযোগের একটু ব্যবস্থা করা দরকার, পরদিন সকালে স্বামীকে খাইয়ে দাইয়ে কোর্টে পাঠাতেও হবে, অথচ সবই ঐ একটি টাকার মধ্যে।

মাঝে মাঝে এক একদিন এমন ব্যাপারও ঘটেছে, কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরবার সময় চিত্তরঞ্জন বার লাইব্রেরীর চাকরকে বলেছেন 'ওরে টাকা সঙ্গে নেই, গোটা পাঁচেক টাকা দেত', চুরুট কিনে নিয়ে যেতে হবে।' টাকা নিয়ে কিন্তু চুরুট কেনেননি, বাড়ি পৌঁছে সংসার পরিচালনার জন্য বাসন্তী দেবীর হাতে সে টাকা দিয়েছেন।

এই চিত্তরঞ্জনের হাতে একদিন লক্ষ্মী ধরা দিলেন অকুণ্ঠিত প্রসন্নতা নিয়ে। প্রচুর অর্থ অর্জন করতে লাগলেন তিনি,—কিন্তু শুধু নিজের জন্যে নয়, বোধকরি অপরের জন্য বেশী। তাঁর অর্থনৈতিক ধারণা হ'ল, ঐনস্টি যদ্দীয়তে। দানের পাত্রের উপযুক্ততার বিষয়ে অনেক সময়ে তাঁর বিচার-বিবেচনার বালাই থাকত না। কেউ হাত পাতলেই টাকা দিতেন। বলতেন, তার হাত পাতবার যুক্তি হয়ত' সত্যি নয়, কিন্তু কারণটা সত্যি। কারণ হচ্ছে অভাব। সত্যিকারের অভাব না থাকলে কেউ কি কখনো হাত পাতবার গ্লানি ভোগ করে?—এই ছিল তাঁর অন্তরের যুক্তি।

আজকালকার স্বার্থপরতার ঊষর যুগে এ সকল কথা আদর্শ হিসাবে স্থাপিত করতেও শঙ্কা বোধ হয়।

(ক্রমশ

ব্যাকটিরিওফাজ

অশ্বিনীকুমার

কে থায় বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। ব্যাপারটা অনেকটা যেন ...দের যম গোছের। জীবজগতে ...প্রকার রোগের মূল জীবাণু। ... জীবাণুর (ব্যাকটিরিয়া) যমও যে ...তেই বর্তমান তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া ... ১৯১৫ সালে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ...পেতে ব্রাউন ইনস্টিটিউশনে ১৯০৯ ... ডাঃ আই. ডবলু. টর্ট নামে একজন ...কে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে ... সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত দেখা ... বিজ্ঞান জগতে এর পূর্বেই রকমারী ... অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানা গিয়েছিল। ... কোন কোনটিকে কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে ... সম্ভব হলেও অনেক জীবাণুকে ... জন্মানোর চেষ্টা বারবার ব্যাহত ...। ডাঃ টর্ট এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ... উন্মোচনে শুরু করলেন তাঁর ... তমসা শেষের নির্মল প্রভাতের মত ... অন্ধকার কেটে গিয়ে পরিশেষে ... দিল সত্যের আলোক ডাঃ টর্টের ... বিশেষ সারপদার্থ (এসেনসিয়াল ...স) পরে ভিটামিন "কে" নামে ... জগতে পরিচিত হয়ে কথঞ্চিৎ ... এই সমস্যা সমাধানে করলে ...লোকসম্পাত। সাফল্যের উৎসাহে ডাঃ ...লিয়ে চললেন এই গবেষণা অন্যান্য ... ও ভাইরাস নামে পরিচিত আর ... বিজ্ঞান বৈচিত্র্যের ওপর। ভাইরাস অণু-...ত অতি সূক্ষ্ম এক প্রাকৃতিক ...। জড় ও জীবনের মাঝামাঝি গুণা-... নিয়ে সঙ্গোপনে বিশ্বপ্রকৃতিতে ... ও পরভোজিরূপে বয়ে চলেছে ... বংশধারা। কৃত্রিম মাধ্যমে জন্মিয়ে ... পরীক্ষা দ্বারা এদের জীবনরহস্য ...টিত করতে চেয়েছেন অনেকানেক ..., রহস্যের অন্তরালে এই অরূপের রূপ ... "খোল দ্বার, তোল অবগুণ্ঠন" এই ... বৈজ্ঞানিকদের ধ্যান। এদের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা বার বার বিফল হয়েছে। ... মাধ্যমে কোন কোন জীবাণু জন্মানোর ... বিশেষ সার পদার্থ বা ভিটামিন 'কে'র ...সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ডাঃ টর্ট এইবার ভাইরাসকে নিয়ে পড়লেন। বসন্ত ভাইরাসজনিত রোগ। খরচ কম বলে ডাঃ টর্ট গো-বীজের টিকা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। সে সময়ে গো-বীজের টিকার সংগে কিছু কিছু জীবাণুও সংমিশ্রিত থাকতো। ডাঃ টর্ট ভাবলেন যে, এইসব সহবাসী জীবাণু হয়ত টিকার ভাইরাসের কোন প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান সরবরাহ করতে পারবে এবং তাতে হয়ত বসন্তের ভাইরাসকে কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে জন্মানো সহজ হবে। তিনি মাংসের নির্যাস আগার দিয়ে জমিয়ে তার মধ্যে গো-বীজের টিকা রোপণ করে দিয়ে ৩৭° সেণ্টিগ্রেডে রেখে দিলেন। ২৪ ঘণ্টা পরে পরীক্ষা করে দেখলেন যে কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে ছোট ছোট অস্বচ্ছ সাদা ও হলুদ রংয়ের জীবাণু উপনিবেশ দেখা যাচ্ছে। আতসকাচ দিয়ে আরও পরীক্ষার পর দেখলেন এ ছাড়াও বিন্দু বিন্দু স্বচ্ছ কয়টি জায়গা। স্বচ্ছ উপনিবেশ পরীক্ষা করে দেখলেন যে তাতে জীবাণুর কোন চিহ্নও নেই। অন্য কৃত্রিম মাধ্যমে জন্মাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা জন্মালো না। প্রশ্ন জেগে উঠল কী এই স্বচ্ছ উপনিবেশ? পুরোনো টিউবগুলি ২৪ ঘণ্টার পর আরও বেশী দিন রেখে দিয়ে দেখলেন যে স্বচ্ছ বিন্দুগুলোর আসেপাশের অস্বচ্ছ সাদা ও হলুদ রংয়ের জীবাণু উপনিবেশগুলোও একধার থেকে স্বচ্ছ হয়ে আসছে। এরকম উপনিবেশ থেকে জীবাণু নিয়ে নূতন খাদ্য মাধ্যমে তাদের চাষ করলেন। তাতে জীবাণু জন্মালো না। ডাঃ টর্ট তখন কৃত্রিম মাধ্যমে একটি তেজীয়ান বাড়ন্ত জীবাণু উপনিবেশের উপর ঐ স্বচ্ছ বিন্দু একটু ছুঁইয়ে দিয়ে রেখে দিলেন। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে ঐ তেজীয়ান জীবাণু উপনিবেশ দেখতে দেখতে স্বচ্ছ হয়ে

ফাজ ও ভাইরাস কণার আপেক্ষিক মাপ। সর্বনিম্নে মাপের স্কেল দেওয়া হয়েছে।
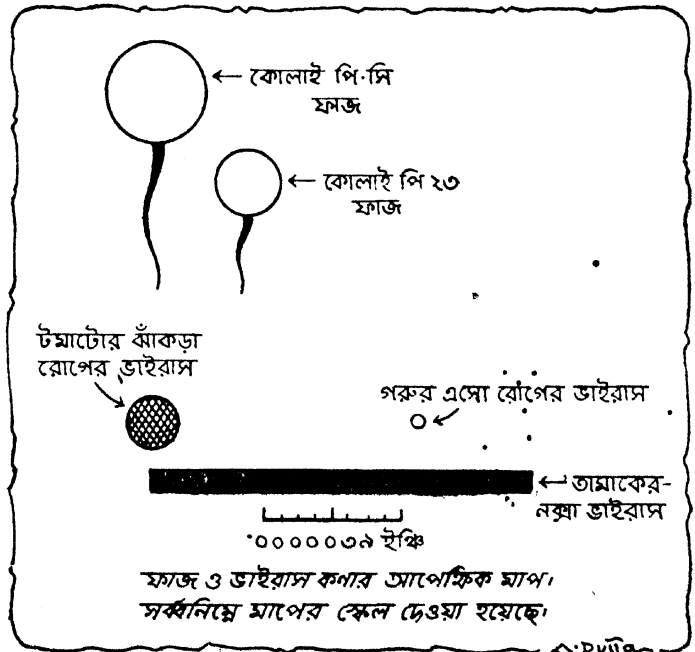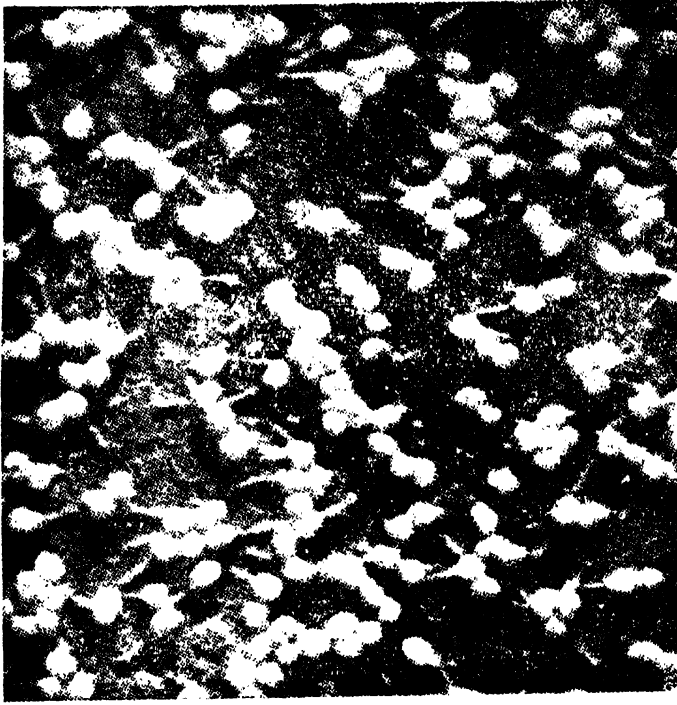
একথোকা কোলাই ব্যাকটিরিওফাজ। প্রতি কণার লেজ ও মুণ্ড দর্শনীয়। ৬০ হাজার গুণ বড় করে দেখান হয়েছে

আসছে। তিনি আরও দেখলেন যে পুরোণো জীবাণুর চাইতে নূতন বাড়ন্ত জীবাণুর ওপরই এই স্বচ্ছবিন্দুর অদৃশ্য পদার্থের ক্রিয়া বেশী। যাঁরা কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে জীবাণু চাষ করেছেন, তাঁরা জানেন যে, জীবাণু উপনিবেশ স্বচ্ছ খাদ্য মাধ্যমের ওপর বাড়তে আরম্ভ করলেই খাদ্য মাধ্যমের ওপরে একটা ঘোলাটে বা অস্বচ্ছ আবরণ বিন্দু আকারে শুরু করে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে। ডাঃ টর্টের পরীক্ষায় কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমের ওপর ঘোলাটে যা অস্বচ্ছ জীবাণু উপনিবেশ স্বচ্ছ বিন্দুস্পর্শে স্বচ্ছ হয়ে গেল কেন? তবে কি স্বচ্ছ-বিন্দুর কোন পদার্থ জীবাণুকে আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করলে? নিশ্চয়ই তাই। জীবাণুর যম প্রকৃতিতেই বর্তমান—নিশ্চয়ই সে জীবাণু ধ্বংস করে দিচ্ছে তাই ঘোলাটে উপনিবেশগুলি স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। জীবজগতের ত্রাস যে জীবাণু, তারও তবে মারক পাওয়া গেল! ডাঃ টর্ট আনন্দে আত্মহারা। প্রকৃতির এক পথ চেয়ে-ডাঃ টর্টকে নিয়ে এলো আর এক মণি-কোঠায়। পাতি পাতি করে ডাঃ টর্ট অনুবীক্ষণের নীচে স্বচ্ছ হয়ে যাওয়া জীবাণু উপনিবেশে খুঁজে বেড়ালেন জীবাণুর অস্তিত্বের জন্য। দেখলেন প্রাণহীন জীবাণুর দু এক টুকরো খোল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, সব নিঃশেষে হয়েছে ধ্বংস। ১৯১৫ সালে 'দি ল্যান্সেট' পত্রিকাতে প্রথম ঘোষণা করলেন এই জীবাণু ধ্বংসীর ইতিবৃত্ত। আরও কিছু পরে এই জীবাণুধ্বংসী 'ব্যাকটিরিওফাজ' নামে জগতে পরিচিতি লাভ করে।

এই জীবাণুধ্বংসীর সঠিক পরিচয় না জানতে পেরে টর্ট সাহেব আরও উঠে পড়ে লেগে গেলেন। জীবাণুশূন্য লবণ জলে ঐ সব আক্রান্ত জীবাণু উপনিবেশ গুলে পোরসিলেনের খুব সূক্ষ্ম ছাকনীর ভেতর দিয়ে ছেঁকে ফেললেন। ছাকনী এত সূক্ষ্ম যে কোন জীবাণুই তার ভেতর দিয়ে গলে যাবার উপায় নেই। সেই পরিস্রুত জল জীবাণু নেই বটে, তবে জীবাণুধ্বংসী বর্তমান। প্রাণীদেহে পরীক্ষা করে দেখা গেল তাতে গো-বীজের টিকার গুণ বর্তমান নেই। আনুষঙ্গিক লক্ষণ দেখে বুঝলেন যে জীবাণুর চাইতেও সূক্ষ্ম ভাইরাস জাতীয় জিনিসই এই জীবাণুমারক। কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে এরা বাড়ে না। একমাত্র জীবাণুর ওপর পরভোজী হয়েই জীবনধারণ করছে। জীবাণুর অবর্তমানেও অনুকূল আবেষ্টনীর ভেতর এরা বেশ কয়মাস বেঁচে থাকতে পারে বটে। গাছ, প্রাণী ও এমন কি মানুষের পর্যন্ত নানারকমের ভাইরাসজনিত রোগ হয়। প্রত্যেক রোগের ভাইরাস স্বতন্ত্র। কাজেই ডাঃ টর্টের ধারণা হলো যে, প্রত্যেক জীবাণুর নির্দিষ্ট ব্যাকটিরিওফাজ থাকাই সম্ভব। পরীক্ষায় তাঁর ধারণাই সত্য বলে নির্ণীত হল। এক জীবাণুধ্বংসী অন্য জীবাণুর ওপর নিষ্ক্রিয়।

ব্যাকটিরিওফাজের কথা বলতে হ'লে আর একজন বৈজ্ঞানিকের নাম ও ইতিবৃত্ত না দিলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এ কাহিনী। তিনি হচ্ছেন ডাঃ ফেলিক্স ডি হেরেলি। ব্যাকটিরিওফাজের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ডাঃ টর্ট ও ডাঃ হেরেলি দুজনেই প্রায় সমসাময়িক সাধক। ১৯১৭ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর হেরেলির গুরু ডাঃ রু 'একাডেমি ডেজ সায়েন্সেস'এ ব্যাকটিরিওফাজ নামক বৈজ্ঞানিক বিস্ময়ের কথা 'অন অ্যান ইনভিজিবল মাইক্রোব, অ্যান এ্যানটাগনিস্ট অফ দি ডিসেণ্ট্রি-ব্যাসিলাস' নামক প্রবন্ধ পেশ করেন। এই প্রবন্ধের পেছনে ছিল দীর্ঘ ৭ বছরের সাধনা। ১৯১০ সালে ডাঃ ডি হেরেলি মেক্সিকোর অন্তর্গত ইউকাটান প্রদেশে বাস করছিলেন। সেবার সেখানে পঙ্গপালের আবির্ভাব হয়। ডাঃ ডি হেরেলি শুনতে পেলেন যে কি এক অজ্ঞাত রোগে পঙ্গপালের মৃতদেহে রাস্তাঘাট ক্ষেতখামার ভরে উঠছে। ডাঃ হেরেলি ছুটলেন ঘটনাস্থলে। কিছু রুগ্ন পঙ্গপাল জোগাড় করে তথ্য অনুসন্ধানে বসে গেলেন। পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে জানতে পারলেন যে জীবাণুঘটিত মারাত্মক পেটের অসুখে পঙ্গপালের জীবনান্ত হচ্ছে। ডাঃ হেরেলি চটপট কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে রোগকারী জীবাণু জন্মিয়ে অভিযাত্রী পঙ্গপালের সামনে গাছে গাছে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে মহামারী সৃষ্টি করলেন। সেবারের ... জীবনযাত্রা ... পঙ্গপালকে পরা...

করে শস্য রক্ষা করতে পারলো। হেরেলি পঙ্গপালের এই মৃত্যুদূত নিয়ে আর্জেণ্টিন থেকে উত্তর আফ্রিকা ছুটলেন মানবাহিতে পঙ্গপাল নিধনে। কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে বার বার জীবাণু জন্মাতে হেরেলিও মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখতে পেলেন। দেখলেন খাদ্য মাধ্যমের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘামের মত স্বচ্ছ পদার্থের আবির্ভাব। অণুবীক্ষণেও এর মধ্যে ধরা পড়ল না কোন জীবাণু। ইচ্ছানুযায়ী কোন খাদ্য মাধ্যমে জন্মানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু তাদের আর দেখা গেল না।

১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় টিউনিসিয়াতে পঙ্গপালের এক ব্যাপক আক্রমণ খাদ্য পরিস্থিতিকে আতঙ্কিত করে তুললো। ডাক পড়লো ডাঃ ডি হেরেলির। জীবাণু ছড়িয়ে পঙ্গপালের মধ্যে মহামারী সৃষ্টি করে বহুল পরিমাণে তিনি তাদের দমন করলেন। পরের বছর যদিও উত্তর আফ্রিকাতে পঙ্গপাল আবার হানা দিল, কিন্তু টিউনিসিয়া রইল মুক্ত। এবারেও জীবাণু জন্মাবার সময় খাদ্য মাধ্যমে দেখতে পেলেন স্বচ্ছ বিন্দু। হেরেলি স্বচ্ছ বিন্দুর নমুনা অংশ তুলে নিয়ে পঙ্গপালের রোগ সংক্রমিত করতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু কিছুই ফল হ'লো না। বার বার এদের আবির্ভাবে বৈজ্ঞানিক মনে স্বচ্ছ বিন্দু সম্বন্ধে জাগালো প্রশ্ন। এ দিকে প্যারিসে অশ্বারোহী সেনাদল প্রবল আমাশয়ের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। লড়াই প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে ডাঃ রু, হেরেলিকে এই রোগ দমনে আদেশ দিলেন। হেরেলি রোগীদের মল পরিস্রুত করে কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমে আমাশয় জীবাণুর ওপর ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে লাগলেন। অনেক সময়ে দেখলেন কৃত্রিম খাদ্য মাধ্যমের ওপর জীবাণুর সাথে স্বচ্ছ বিন্দুর আবির্ভাব। আমাশয়ের জীবাণু সহ এই স্বচ্ছ পদার্থ গিনিপিগ ও খরগোসকে খাইয়ে দেখলেন যে, মারাত্মক আমাশয় জীবাণু থাকা সত্ত্বেও প্রাণীগুলোর কোন রোগ হল না। পরীক্ষার পর পরীক্ষা দ্রুত এগিয়ে চললো। হেরেলি দেখলেন যে, আমাশয় আক্রমণের চতুর্থ দিনে রোগীর মল জলে গুলে পরিস্রুত করে সেই জল আমাশয়ের সীগা ব্যাসিলাসের প্লেটের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ৩৭° সেণ্টিগ্রেডে রেখে দিলে ২৪ ঘণ্টা পর [illegible] স্বচ্ছ হয়ে যায়। রোগীর মলে জীবাণু-নাশকের সন্ধান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে হেরেলি ছুটলেন হাসপাতালে। আশা এই, যে রোগীর মল থেকে রোগ আক্রমণের চতুর্থ দিনে ব্যাকটিরিওফাজ পেয়েছেন সে নিশ্চয়ই ফাজের প্রভাবে অনেকটা সুস্থ থাকবে। গিয়ে দেখলেন তাঁর আশাই পূর্ণ হয়েছে—রোগী অনেকটা আরোগ্যের পথে। হেরেলি এই অণুবীক্ষণ অতীত সূক্ষ্ম জীবাণুমারকের নাম দিলেন 'ব্যাকটিরিওফাজ'। বিজ্ঞান সাধকের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। অপ্রকাশিত সত্যকে প্রকাশ করতে গেলেই অনেক অন্ধ বিশ্বাস, বিদ্রূপ, অত্যাচার এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। ডাঃ হেরেলিকেও তাই এ সব সহ্য করে সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে হয়েছে মানব সেবায়।

ব্যাকটিরিওফাজের অদৃশ্য জীবনধারা নিয়ে অনেকে নানারকম গবেষণা করে তাদের বৈচিত্র্য উদ্ঘাটনে অগ্রণী হয়েছেন। জড় ও জীবনের মাঝামাঝি স্থান এদের জন্য নির্দেশ করেছেন অনেক বৈজ্ঞানিক। কেউ বলেছেন যে, ফাজ একরকম রাসায়নিক পদার্থ সম্পূর্ণ জড়বস্তু। আবার কেউ এতে প্রাণের লক্ষণ দেখে হয়েছেন বিভ্রান্ত। আমরা প্রাণী চিন্তা করতে পারি, জড়ও ভাবতে পারি। পারিনে ভাবতে এর মাঝামাঝি কোন জিনিসকে। প্রাণের ত সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারি নে। যা পারি সেগুলো তার বৈশিষ্ট্যের কতগুলি লক্ষণ যা আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে তাকে প্রাণী পর্যায়ে ফেলে। এমনি কতগুলি বৈশিষ্ট্য হল প্রজনন, জীবনীশক্তি, চলচ্ছক্তি, দেহমধ্যে সজীব উপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তন, তাপসহনশীলতা ইত্যাদি। এদের অনেকগুলিই ফাজের মধ্যে কেউ কেউ দেখেছেন। আবার কেউ সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এদের জীবদেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছেন। জীবনের ও জড়ের সূক্ষ্ম সীমারেখা পারাপার করে বর্তমান রয়েছে কি এই বস্তু? হয়ত বা কোন্ আদিকালে প্রাণের অভ্যুদয়ে এমনই শুরু হয়েছিল সৃষ্টির প্রথম বৈচিত্র্য। এই ফাজ যে প্রত্যেক জীবাণুর ওপর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে থাকে এটা ঠিক। এত সূক্ষ্ম অথচ কার্যক্রমে প্রত্যেকেই বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন জীবাণুর ফাজ নির্দিষ্ট জীবাণুর ওপরই কার্যকরী। তাই দেখা গিয়েছে এক জীবাণুর ফাজ অন্য জীবাণুর মারক নয়। ফাজ সর্বব্যাপী।
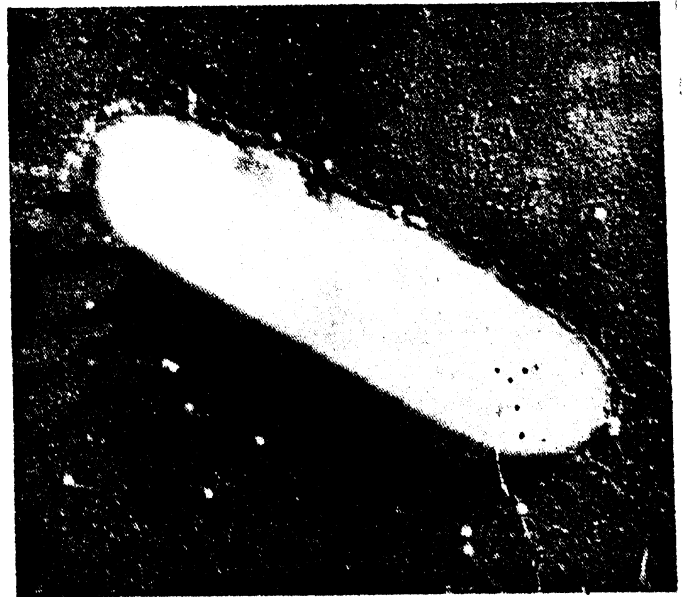
একটি কোলন জীবাণু কোষকে টি এক ব্যাকটিরিওফাজ দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যাচ্ছে। [illegible]

ব্যাকটিরিওফাজের আক্রমণে একটি কোলন জীবাণুকে ধ্বংস হতে দেখা যাচ্ছে। জীবাণু কোষের সমস্ত প্রোটোপ্লাজম্ বেরিয়ে পড়েছে, আর তার আশেপাশে ফাজ কণাগুলোকে দেখা যাচ্ছে। ৩০ হাজার গুণ বড় করে দেখান হয়েছে

যেখানেই জীবাণু বর্তমান সেইখানেই ফাজও রয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতিতে অবিশ্রাম চলেছে ফাজ ও জীবাণুর সংগ্রাম তাই গঙ্গাজল অজস্র কলুষ বহন করেও আজও জীবাণুতে পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। আবার অন্য দিকে প্রকৃতিও জীবাণুশূন্য হয়ে যায় নি। সবার অলক্ষ্যে প্রকৃতি নিজেই ভারসাম্য বজায় রেখে বিশ্বসৃষ্টি অব্যাহত রেখেছে।

ব্যাসিলাস কোলির (বিকোলাই) ফাজ, কলেরা-জীবাণুর ফাজ, ফাউল টাইফয়েডের ফাজ এমন কি নানাপ্রকার উদ্ভিদের জীবাণুর ফাজও আবিষ্কৃত হয়েছে। বিকোলাইএ ভুগে ফাজ খান নি এমন লোক কম পাওয়া যাবে। বিউবোনিক প্লেগে ফাজের ব্যবহার সাফল্যের সঙ্গে রাশিয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে। এশিয়াটিক কলেরায় ১৯২৭ সালে ডি হেরেলি নিজে ফাজের ব্যবহার করেন। এর ফলে ভারতে দুটি ফাজ গবেষণাগার গড়ে ওঠে। প্রফেসর এসেসভের অধীনে পাটনায় একটি ও আসামের কর্ণেল মরিসনের অধীনে পাস্তুর ইনস্টিটিউট নামে শিলংএ একটি। এ ছাড়া স্টাফাইলোকক্কাস ও স্ট্রেপটোকক্কাসের বিরুদ্ধে গ্রাসিয়া ফাজ প্রয়োগ করেছেন; হাউডুরয় টাইফয়েডে ও মূত্রাশয় আক্রমণের বিরুদ্ধে ফাজ প্রয়োগ করেছেন সাফল্যের সঙ্গে এবং ঘল্লেকিদ্রে পেরিটোনাইটিজ ও আন্ত্রিক ছিদ্র রোগে ফাজের নিরাময়শক্তি দেখিয়েছেন। আমাদের জীবনে জীবাণুঘটিত রোগ নিরাময়ে ফাজের সাফল্যজনক ব্যাপক প্রয়োগের সপক্ষে বিপক্ষে অনেক মতভেদ বর্তমানকালে দেখা গেলেও এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যাকটিরিওফাজ তথা ভাইরাস এর রহস্যো ঘাটনে যথেষ্ট সাহায্য করবে। বিজ্ঞানে অগ্রগতির পথে হয়ত জীবন্মৃত্যুর বিস্ময় দর্শন সহজ হয়ে ধরা দেবে আমাদের কা একদিন।

পরিমল রায়

আমার বহু অক্ষমতার একটিকে লইয়া পারিবারিক মহলে পরিহাসের অন্ত নাই। স্থানান্তর হইতে কোনো আত্মীয় কিংবা বন্ধুর আসিবার কথা হইলে আমি তাঁহার অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে যখন স্টেশনে যাই, তখন বাড়ীতে একটা মৃদু হাসাহাসি পড়িয়া যায়। সকলেই জানে, আমি স্টেশনে গিয়া হাজার চেষ্টা করিয়াও আগন্তুকের সন্ধান পাইব না এবং শুধু-হাতে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিব, মাননীয় অতিথি ঘণ্টাখানেক পূর্বে পৌঁছিয়া স্নানের উদ্দেশ্যে বাথরুমে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

এই পরিহাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বিশেষ লাভ নাই। নিতান্ত অবধারিত না হইলেও, প্রায়ই আমাকে এই প্রমাদে পড়িতে হয়, স্টেশনে গিয়া অভীষ্ট অতিথিটিকে খুঁজিয়া পাই না। এমন নয় যে বিলম্বে পৌঁছিবার ফলে গাড়ীটি প্ল্যাটফর্মে ভিড়িবার সময় আমি সেখানে উপস্থিত নাই। এমন দু'একবার হইয়াছে। কখনো আবার ভুল প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিয়া বিপাকে পড়িয়াছি। কিন্তু যেদিন সময় হাতে রাখিয়া, প্ল্যাটফর্ম ভুল না করিয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টি হানিয়া (সদ্য-সমাগত) রেলগাড়ীর কামরায় কামরায় অতিথির সতর্ক সন্ধান করিয়াছি, সেদিনও ব্যর্থ হইয়া বাড়ীতে ফিরিতে হইয়াছে। পরিহাস সহ্য না করিয়া আর উপায় কী?

ট্রেন পৌঁছিবার সময় হয়তো সন্ধ্যা আটটায়। আমি সাতটা না বাজিতে স্টেশনে উপস্থিত। পৌঁছিয়া প্রথমে খোঁজ করি, গাড়ী আসিয়া গিয়াছে কিনা। না আসে নাই, আসিবার কথাও নয়, আটটায় আসিবে। শুনিয়া নিশ্চিন্ত। একটি আশঙ্কা অন্তত গেল। অর্থাৎ, আটটাতে আসিবে বলিয়া বিনা নোটিশে সাড়ে ছয়টায় সময় পরিবর্তন হইয়া যাইবার যে সম্ভাবনাটি ছিল, তাহা অন্তত দূর হইল। অতঃপর এই একটি ঘণ্টা কি করা যায়? প্রথমত কিছুক্ষণ অবশ্যই হুইলারের দোকানে। বইগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত হয়। রেলওয়ে বুকস্টলগুলির কি উদ্দেশ্য জানি না। সাহিত্য প্রচার না হইলেও অন্তত অর্থোপার্জন। কিন্তু আমার মনে হয়, সে উদ্দেশ্যটিও গৌণ। কোনো-দিন দেখি নাই, রেলওয়ে বুক স্টলে কেহ বই কিনিতেছে। সকলেই দেখে, পাতা ওল্টায়, কচিৎ কখনো দাম জিজ্ঞাসা করে, তারপর চলিয়া যায়। দোকানী নির্বিকার-চিত্তে বসিয়া থাকে। কাহারো হাতে কোনো পুস্তকের অবস্থান অবিন্যস্ত হইলে, ঠিক করিয়া রাখে। আমার মনে হয়, জলসত্র খুলিয়া অপরের তৃষ্ণা হরণে যেমন পুণ্য, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বই-র দোকান খুলিয়া নিষ্কর্মার কালহরণেও তেমন পুণ্য। রেলওয়ে স্টলের মালিকদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই পুণ্য সঞ্চয়। যদি কখনো দু'একটি বই বিক্রি হয়, তাহা অধিকন্তু, অর্থাৎ ন দোষায়।

কাউণ্টারে ছোটখাটো একটি ভীড়। অনেকেই হয়তো আমার মতো অতিথির অভ্যর্থনায় স্টেশনে উপস্থিত। ট্রেনের অপেক্ষায় স্টলের সামনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেহ খবরের কাগজ পড়িতেছেন, কেহ হস্ত-রেখার বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতেছেন, অপর কেহ রৌদ্র স্নানের উপকারিতায় মুগ্ধ হইতেছেন। ভিড়ে আমিও ভিড়িয়া পড়ি এবং এটা সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে থাকি। রেলওয়ে বুক স্টলের কিন্তু একটি বিশেষত্ব আছে। দূর হইতে অতগুলি চকচকে ঝকঝকে বই চোখে পড়িয়া মহা-উৎসাহে দৌড়াইয়া আসিতে হয়। কিন্তু কাছে আসিলে দেখা যায়, সব ঝুটো মাল, পাঠ্যপুস্তক—অর্থাৎ পড়িবার মতো বই—একটিও নাই। অবশ্য সে একরকম ভালোই। সময় কাটানোর পক্ষে সোভিয়েট কম্যুনিজম্ কিংবা ওয়েলথ অফ নেশনস খুব উপযোগী গ্রন্থ নয়। ক্ষণে ক্ষণে ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বই পড়িতে হইলে পাঠ-প্রক্রিয়াটি কিঞ্চিৎ অনাবৃষ্টি হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং সে হিসাবে সচিত্র সাপ্তাহিক জাতীয় মুদ্রাবিকারগুলি একেবারে মন্দ জিনিস নয়। সময় কাটে বলিয়াই না উহাদের নাম সাময়িক পত্রিকা।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাবতীয় ইংরিজি ও বাঙলা সাময়িক পত্রের পাতা উল্টাইবার পর দেখা যায়, ফলটি নেহাৎ মন্দ হয় নাই। মিনিট কুড়ি বধ হইয়াছে। অতঃপর শরীরের ওজনটা পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। ওজনের যন্ত্রটি খানিকটা দূরে প্ল্যাটফর্মের অন্য এক প্রান্তে। মন্থর-গতিতে হাঁটিতে হাঁটিতে যন্ত্রটির নিকট উপনীত হই এবং পা-দানিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুদ্রা নিক্ষেপ করিতে ঘটাং করিয়া টিকেটটি বাহির হইয়া আসে। কত? ৯ স্টোন। ভালো কথা নয়। ওজনটা যেন একটু বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, ব্লাড প্রেসার না হয়। তবু ভাগ্যি, সমস্ত স্টোনগুলি টার্ন করিয়া বসে নাই। তাহা হইলে তো রীতিমতো ঘাবড়াইয়া যাইবার বিষয় হইত। ইংরিজিতে আবার যাবতীয় স্টোন উল্টাইবার পক্ষে নৈতিক অনুজ্ঞা আছে। উহারা স্থূলতার এত পক্ষপাতী কেন বুঝি না। কিন্তু নয় স্টোনের বাংলা হিসাব কী! অংকটা মাথায় লইয়া পায়চারি শুরু করি। আরো খানিকটা সময় কাটিবার বন্দোবস্ত হইয়া যায়। এক স্টোনে কত মণ? অর্থাৎ স্টোন্ কাহাকে বলে? কীসের কী পরিমাণ এক স্টোন্ এবং সেই কীসের কতটাতে এক মণ? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর পাইলেই কেল্লা ফতে। কিন্তু পাটিগণিত এ বয়সে আর তেমন আয়ত্ত নাই। হাজার চেষ্টা করিয়াও সূত্র মনে পড়ে না। নয়টি পাথর বুকে চাপিয়া বসিলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয় কিনা জানিতে না পারিয়া অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে।

ঘড়িতে দেখা যায়, গাড়ি আসিতে আরো আধ ঘণ্টা। এখন আর কী করা যায়? আচ্ছা, চা খাইলে কেমন হয় মন্দ হয় কি, বেশ হয়। ঘোরাফেরা করিতে করিতে পা ধরিয়া গিয়াছে। রেস্তোরাঁয় ঢুকিয়া পড়ি এবং চা-এর অর্ডার দিয়া সিগারেট ধরাইয়া বসিয়া থাকি। চা আসিতে মিনিট দশেক—শেষ করিতে মিনিট পনেরো—হাতে মিনিট পাঁচেক। হিসাবটা বেশ পরিপাটি বোধ হয়। পনেরো মিনিটে চা খাওয়া হইবে তো? একটু তাড়াতাড়ি করিতে হইবে আর কি। আমার চা-খাওয়া আবার একটু সময়ের ব্যাপার, হুড়োহুড়ি করিয়া পারিতে পারি না। অনেকের চা-পানের রকম দেখিলে মনে হয়, একটা বিষম উৎপাতের হাত হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা

করিতেছেন। ফুঁ লাগাইয়া, মুখ খিঁচাইয়া, জিভ ঝলসাইয়া দুই মিনিটের মধ্যে আধার হইতে আধেয় নিঃশেষিত, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর বাহিয়া অকথ্য ঘর্ম নির্গম, রুমালে ঘাড়-গলা-মুখ মুছিয়া-মুছিয়া অস্থির। বীভৎস! ইহাদের কে যেন বলিয়া দিয়াছে, চা গরম গরম খাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া গলিত লৌহ গলায় ঢালিতে হইবে এমন বাধ্যবাধকতাই বা কী আছে? চাখিয়া চাখিয়া না খাইলে আর চা খাওয়া কেন?

বিল চুকাইয়া বাহিরে আসি। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে গাড়ী আসিবে। আর দেরী করা চলে না, সময় হইয়া গিয়াছে। তিন নম্বরে যতজন ভদ্রলোককে পাই, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করি মহাশয়, ইহা কি অমুক ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম? সকলেই বলেন, ইহাই। অতঃপর পরম নিশ্চিন্ত মনে বীর দর্পে দাঁড়াইয়া থাকি। আচ্ছা, ইনি কোন্ ক্লাসে আসিবেন মনে হয়? ফার্স্ট ক্লাসে নিশ্চয়ই নয়। আমারই তো বন্ধু, অদ্বিতীয় হইবার কোনো কারণ নাই। ইণ্টারে হয়তো আসিবে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইবেন বলিয়াই বোধ হয়। ভদ্রলোকের সঙ্গে বহুদিন পর দেখা হইবে। চেহারা হয়তো অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। মোটা হইয়া গিয়া থাকিলে—। ভালো কথা, নয় স্টোনে কত মণ? দুই মণ হইলে ভাবিবার কথা। ওজনটা আরেকবার—।

এঞ্জিনের সার্চ লাইটের পাশে আলো পড়িয়াছে, গাড়ী আসিতেছে। প্ল্যাটফর্ম সচকিত, কুলিরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে চাঞ্চল্য। এখনই মুহূর্তমধ্যে মানুষে আর মালে আর গোলমালে তালগোল পাকাইয়া গিয়া একটা গজকচ্ছপ সৃষ্টি হইবে। তীক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলিয়া তাকাইয়া থাকি। ট্রেন এবারে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছে। গাড়ীর প্রত্যেকটি জানালা পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিই। এটাতে নাই, এটাতে নাই, এটাতে না, এটাতে নাই। এক একটি করিয়া ছাড়িতে ছাড়িতে শেষকালে গোটা ট্রেনটাই ছাড়িয়া দিই। কোনো জানালায় ভদ্রলোকের চেহারা নাই। আগন্তুকগণ একটু গলা বাড়াইয়া রাখিলে অভ্যর্থনা খানিকটা সহজ হয়। গাড়ী থামিবামাত্র দৌড়াইয়া গিয়া ঠিক জায়গাটিতে হাজির হওয়া যায়। ইনি অতখানি গলাবাজ নন বোঝা-ই যাইতেছে। এগাড়ীটির আবার এখানেই যাত্রা শেষ। গতিরোধমাত্র সমস্ত কামরাগুলি যেন উগরাইয়া মানুষ আর মাল প্ল্যাটফর্মে ফেলিতেছে। বিভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করি। আপার ক্লাসগুলিতে নাই। তবে কি ইণ্টারে? এঞ্জিন হইতে পুনরায় হাঁটিতে শুরু করি। মানুষের ঠেলাঠেলিতে অস্থির হইয়া ধাক্কাধাক্কি সামলাইতে সামলাইতে অগ্রসর হই। তারপর খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে ব্রেকভ্যানের সম্মুখে। ফিরতি পথে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াই। স্থানে স্থানে আলিঙ্গন সম্ভাষণ হাস্য-বিনিময় চোখে পড়ে। ইহারা ভাগ্যবান, অতিথির সন্ধান পাইয়া গিয়াছে। একজনের গলায় মালা দেখিতে পাই, বোধ হয় জানালায় গলা বাড়াইয়া ছিল, অভ্যর্থনা-কারী কৃতজ্ঞতায় মাল্যভূষিত করিয়াছে। আমার অতিথিটি উজবকের মতো কোথায় বসিয়া রহিলেন? সকলে নামিয়াছে, আর ইনি নামিতে পারেন না? ছুটোছুটি করিতে করিতে হাঁপ ধরিয়া যায়। বুকটা রীতিমতো ধড়ফড় করিতে থাকে। নয় স্টোনে কত মণ জানিতে পারিলে ভালো ছিল। কিন্তু যত মণই হোক্ উহার চাপে তো আর পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। আবার নতুন উদ্যমে সন্ধান শুরু করি। হঠাৎ মনে হয়, ভদ্রলোক হয়তো তাড়াহুড়া পছন্দ করেন না, ধীরে-সুস্থে নামিবেন। হ্যাঁ, তাহাই সম্ভব, অনর্থক দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতেছি। তৎক্ষণাৎ গতি মন্দীভূত করিয়া ফেলি এবং মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে এখানে সেখানে খুঁজিয়া ফিরি। কিন্তু না, কোথাও নাই। তাহা হইলে কি রওনা-ই হ'ন নাই? একটা টেলিগ্রাম অন্ততঃ করা উচিত ছিল।

এদিকে প্ল্যাটফর্মের ভিড় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এখন খানিকটা ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। ঠেলাঠেলি আর নাই। কিন্তু এক সময়ে শেষ আশাটুকুও যায়। ভদ্রলোককে কোনো কামরা হইতেই ধীরেসুস্থে নামিতে দেখা যায় না। রাগে গা জ্বালা করিতে থাকে। আসিবে না সে-কথা একখানি চিঠি লিখিয়া জানাইলেই হইত। এই হয়রানি কীসের জন্য? এদিকে তো ওজন উঠিয়াছে আবার নয় স্টোন!

বাড়ীতে ফিরিয়া হাসাহাসি। ভদ্রলোক এঞ্জিনের ঠিক পরের গাড়ীটাতে ছিলেন। এঞ্জিনের সার্চ লাইটে চোখ ধাঁধাইয়া গিয়া ওই কামরাটি হয়তো আমার ভালো করিয়া লক্ষ্য হয় নাই। তিনিও ভাবেন নাই, আমি আবার কষ্ট করিয়া স্টেশনে যাইব। কারণ ইহার দরকারই ছিল না। তাঁহার মালপত্রের মধ্যে একখানি মাত্র হ্যান্ড ব্যাগ। সুতরাং ট্রেন আসিতেই লম্ফ দিয়া স্টেশনের বাহিরে আসিয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

মনে মনে বলি, বেশ করিয়াছেন, তবে লম্ফটা না দিয়া একটু অপেক্ষা করিলেও পারিতেন।

হাঁপটা এখনো কাটে নাই। খোকনকে হাঁকিয়া বলি, তোর অঙ্কের বইটা আনতো।

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৬

ডায়েরী

মেরুর দেশে পতাকা পোঁতার মত, যে-কোন সদ্‌গুণের আগে "ফরাসী" শব্দটা বসিয়ে দিতে পারলেই ঐ গুণের রাজ্যে ফরাসীদের একচ্ছত্রাধিপত্য প্রমাণ হয়ে যায়। তাই পৃথিবীতে যতগুলো গুণ হতে পারে সব ফরাসীদের একচেটে। যে-কোন দিনের খবরের কাগজ খুললেই এই ফরাসী গুণাবলীর ফিরিস্তি নজরে পড়বে। যে-কোন ঝগড়ার সময় রব ওঠে—ফরাসী-স্বচ্ছচিন্তার (la clarte Francaise) দেশে এমন এলোমেলো যুক্তি কেন? ফরাসী-প্রজ্ঞা (la Sagesse Francaise), ফরাসী-মানবতাবোধ ও ফরাসী-ঐক্যের বাহক তোমরা। ফরাসী-কাণ্ডজ্ঞান (bon sens) তোমরা ভুলবে কি? ফরাসী-ন্যায় ও ফরাসী-গৌরব (la grandeur Francaise) কি তোমাদের জন্য ধুলোয় লুটোবে?

যে কোন বইয়ের দোকানে যাও ফরাসী-মৌমাছিপালন থেকে আরম্ভ করে ফরাসী-মঠ-তৈরী নামের ছবিওয়ালা বই সাজানো দেখতে পাবে। যে কোন ইস্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক খোলো, ফরাসী-প্রতিভা ও ফরাসী-হৃদয় (L'Espirit Francaise)-এর উপর বেশ দু কলম ঝাড়া আছে।

এত গুণের যোগফল যাদের মন, স্বাভাবিকভাবেই তাদের উপর দায়িত্ব পড়েছে, কোনও বিশেষ দেশের স্বার্থের কথা না ভেবে, সমগ্র মানবজাতির ভালমন্দ দেখবার। প্রমাণ চাও? শাইয়ো প্রাসাদে "মানবের-মিউজিয়ম" দেখতে পার। এই শাইয়ো প্রাসাদেরই আর এক অংশে আছে "ফরাসী জাতীয় নৌবহরের মিউজিয়ম"। এই দুটোর মধ্যে কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোস তা নিয়ে মাদাগাস্কারের ছাত্র ও ফরাসী ছাত্রের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে।

নিজেদের ছাড়া আর কোন জাতের প্রাণ-খুলে প্রশংসা ফরাসীরা আজ পর্যন্ত করেনি। ভ্যাটিকানের সেন্টপিটারের গির্জা দেখে তারা নেপোলিয়নের সমাধিমন্দিরের কথা তোলে। রোমের ক্যাপিটোল দেখে কি করে যে ফরাসী যাত্রীর "লোয়ারের শাতো"র কথা মনে পড়ে জানি না। আমার ধারণা যে, এরা কুতুবমিনার দেখে প্রথমেই অবধারিত বলবে যে, এর চেয়ে উঁচু ইফেল টাওয়ার, যেন সেইটাই বড় কথা। নিজের দেশের বাইরে কোন ভাল শহর দেখলে বলে প্যারিসের অমুক পাড়ার নকল; ভাল ছবি দেখলে বলে অমুক ফরাসী আর্টিস্টের কাছ থেকে ধার করা ধরণ; বিদেশী বই ভাল লাগলে বলে অমুক ফরাসী বইটার মত। বিদেশের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো নকল-নবিস ভগবান ফ্রান্সের নকল করেই তৈরী করেছেন—এই কথাটা না বলা, ফরাসীদের বাকসংযম ও ঈশ্বরভীতির প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

ফরাসী মনের সবচেয়ে বড় গর্ব যে, তারা কঠোর যুক্তিবাদী। চলতি কথা আছে যে, খারাপ কাজকে বোম্বেটের দেশ ইংলন্ড বলে অভদ্র আচরণ; লেনিনের দেশ রুশ বলে অসামাজিক আচরণ; দেকার্তের দেশ ফ্রান্স বলে অযৌক্তিক আচরণ। এত যদি তোরা যুক্তিবাদী তবে ভাগ্যে এত বিশ্বাস কেন? ভাগ্যে বিশ্বাস না থাকলে কি সেখানে এত জুয়োখেলার চলন হয়? পৃথিবীর জুয়োর কেন্দ্র মন্টেকার্লো, আইনত না হলেও, বাস্তবিকপক্ষে ফ্রান্সেরই মধ্যে। ফ্রান্সে প্রতি সপ্তাহে সরকারী লটারির প্রাইজ বিতরণ হয়; প্রতি অলিতে গলিতে এর টিকিট বিক্রির স্থায়ী অফিস। ফরাসীদের যুক্তিবাদিতার ধরণ আবার এমনিই যে, বছর কয়েক চুলচেরা যুক্তির ফলে যে শাসনবিধান তৈরী হয়, কার্যক্ষেত্রে সেটা হয় প্রায় অচল।

হোমিয়োপ্যাথির বইয়ের পাতা উলটোলে সব রোগের লক্ষণগুলো নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তেমনি ইচ্ছা থাকলে পৃথিবীর সব ভালগুলো লোকে নিজের দেশের মধ্যে খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু এই চেষ্টাটা কোন রোগের লক্ষণ, তা কোনও প্যাথিতে লেখে না।

এই যুক্তির দেশে নিজেকে বড় করবার সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত উপায় ধার্য হয়েছে, অন্যকে ছোট করা। ইংরাজের উপর এরা গাত্রদাহ মিটোয়, ইতিহাসখ্যাত "বিজয়ী উইলিয়ম"কে "জারজসন্তান উইলিয়ম" ব'লে, আর 'ইংলিশ চ্যানেল'-এর নামটা বদলে দিয়ে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী গ্রীণউইচ থেকে দ্রাঘিমার ডিগ্রি গোনা আরম্ভ হবে স্বীকার করলেও, সব ফরাসীভাষার মানচিত্রে প্যারিসের দ্রাঘিমাকেই শূন্য ডিগ্রি গোনা হয়। ফরাসী দেশের ছাত্রদের মধ্যে মাত্র দুইজন খেলাধুলো করে। তাই এরা ইংরাজদের মত ক্রীড়ামোদী জাতির 'ছেলে-মানুষি' ঝোঁক দেখে হাসে; ইংলন্ডের চিড়িয়াখানাতে দর্শকদের ভিড়কে বিদ্রূপ করে বলে যে, ইংরাজরা নিজের ছেলের চেয়েও জু'র শিম্পাঞ্জিকে বেশী ভালবাসে। মনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সব ইংরেজের বয়স নাকি চোদ্দ পনর বছর। নিজেরা বাজে কথা বলতে ভালবাসে; তাই ইংরাজ-দের বলে গোমরামুখো। নিজেরা কাজ করতে পারে না তাই জার্মানীকে বলে কাজের-দাস। নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা বা নিয়মানুবর্তিতা নেই। তাই ফরাসী মনীষিরা বলেন—জার্মানীর সংঘবদ্ধতা ভুল দিকে চালিত হয়; সংঘবদ্ধ রুশ মানুষের হদিস পায় না; এর চাইতে দোষেগুণে 'ফরাসী-কাণ্ডজ্ঞান' অনেক ভাল।

কারুশিল্পের নূতন শৈলীর কি করে যেন নাম হয়ে গিয়েছিল "মিউনিকের আর্ট"। জার্মানির কৃতিত্ব সংক্রান্ত এই ভ্রান্তিটা মানবসমাজের মন থেকে দূর করবার জন্য ফরাসীদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। এরা প্রত্যহ কাগজে বলে যে, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জার্মানী সংস্কৃতি ও শিল্পজগতে কিছু দেয়নি। গ্রীক শৈলী, অষ্টাদশ শতাব্দীর শৈলী, লুই ফিলিপের সময়ের শৈলী ও ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের শৈলীর উৎকট জগাখিচুরি রাঁধলে হয় 'মিউনিকের স্টাইল'।

জার্মান কোনও জিনিস ভাল হতে না। ফ্রান্সে একথার প্রমাণ দরকার হয়

প্যারিসের স্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকতে হলে একখানা কার্ড লাগে। এই কার্ডের নিয়মটা আরম্ভ হয়েছিল যখন জার্মানরা প্যারিস দখল করেছিল। আজকালকার কাগজে এই কার্ড উঠিয়ে দেবার আন্দোলনের একমাত্র কারণ দেখানো হয়—যে এটা জার্মানরা আরম্ভ করেছিল বলে।

নিজেদের একটানা কোন কাজে লেগে থাকবার ক্ষমতা কম বলেই বোধহয়, অন্য জাতির পণ্ডিতদের সুচিন্তিত প্রবন্ধের বাঁধা ফরাসী সমালোচনা—"বহুল তথ্যপূর্ণ হইলেও লেখায় মননশীলতা কম।" পৃথিবীর আর অন্য কোন জাতি নাকি ফরাসীদের মত generalize করতে পারে না; তারা পারে শুধু তথ্য সংগ্রহ করতে ও শ্রেণী অনুযায়ী তথ্যগুলি সাজাতে। ফরাসী ভাষায় শব্দের শেষের অক্ষরের উচ্চারণ হয় না;—সম্পূর্ণ উচ্চারণ করবার ধৈর্যটুকু পর্যন্ত যাদের নেই, তারা আবার করবে তথ্য সংগ্রহ! ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসীতে কোন বিদেশী কিছু বলতে গেলে ফরাসীরা শোনবার আগেই জবাব দিয়ে দেয়—ভাবখানা যে বুঝেচি, বুঝেচি; এখন থেমে রেহাই দাও!

ইংরাজের সঙ্গে ব্যবসাতে পারে না; তাই ইংরাজকে বলে বেনে। ইংরাজী ভাষা ফরাসীর চেয়ে বেশী চলে পৃথিবীতে; তাই ইংরাজীর নাম দিয়েছে এরা বেনের ভাষা।

নর্দিক জাতির লোকদের চেয়ে ফরাসীরা আকারে ছোট, হাড়ও তত মোটা নয়। সেইজন্য ফরাসী সুন্দরীর হওয়া চাই হালকা, ছোট ও ছিমছাম গড়নের। হাড়মোটা নর্দিক সৌন্দর্যের মাপকাঠি স্বভাবতই ভিন্ন। কিন্তু ফরাসীরা এর ব্যাখ্যায় বলে, যে তাদের রুচি অপেক্ষাকৃত স্থূল।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাতে গেলে দস্তখত মিলিয়ে দেখাটা একটা ব্যতিক্রম; কিন্তু ফরাসী ব্যাঙ্কে এইটাইসাধারণ নিয়ম। জনসাধারণের সততার অভাবই এর আসল কারণ; কিন্তু ফরাসীরা বলে যে, এটা তাদের পাকাবুদ্ধির লক্ষণ। অন্য দেশগুলোর বুদ্ধি নাকি এখনও পাকেনি।

সেইজন্যই অন্য মানুষের সম্বন্ধে ফরাসীদের মন ঝানু উকিলের মত সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত। আইনসর্বস্ব রোমসভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে যে দেশ গর্ব করে, সে দেশের সমাজের মৌলিক ভিত্তি পারস্পরিক [illegible]শ্বাস ও সন্দেহ হলে আশ্চর্য হওয়ার [illegible] নেই।

কারও হাতে ক্ষমতা দিয়ে ফরাসীরা বিশ্বাস পায় না। তাই এদের দেশের শাসন-বিধানে অলিখিত অংশ কিছু নেই। ন্যায়াধীশকে বিশ্বাস নেই, তাই Equityর অলিখিত আইন এখানে অচল। ন্যায়, শাসন ও ব্যবস্থা, গভর্নমেণ্টের এই তিনটি বিভাগকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখবার মন্ত্র দিয়েছিলেন, এই পারস্পরিক সন্দেহের দেশের Montesquien।

পারিবারিক জীবনে পর্যন্ত সন্দেহ আর অবিশ্বাস জীইয়ে রাখবার জন্য এদের আইন বদ্ধপরিকর। আধুনিক ফরাসী আইনে কোন স্বামী যদি স্ত্রীর প্রাইভেট চিঠি মাঝ-পথে হস্তগত করেন, তাহলে তিনি ফৌজদারী ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত হবেন। স্বামীকে ফরাসী আইনে বলে 'পরিবারের মাথা' (chief de la famille)। মাথা না মুণ্ডু! আইন আরও বলে যে, স্বামীকে জেলে ঢোকাতে পারলেই স্ত্রীও এই পদবী পেতে পারেন। শিক্ষিত ফরাসীরা বলেন যে, অবিশ্বাসই মানব স্বভাবের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ পুরণো জাতির মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। ফরাসীদের মুখে নিজেদের সভ্যতার প্রাচীনত্বের বড়াই শুনলে হাসি আসে। এরা বোঝে না যে, ভারতবর্ষ ও চীনের লোক এক হাজার বছর আগেকার জিনিসকে প্রাচীন বলে না।

কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না! আশ্চর্য! এদেশে সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট—অমুকের বিরুদ্ধে আমি কিছু জানি না। পুস্তক প্রকাশক ঠকাবার চেষ্টা করবে, এটা ধরে নিয়ে, লেখকদের ঐ বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য গুটিকয়েক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান আছে। ফরাসী বইয়ের প্রতি সংস্করণে লেখা থাকে,

তার মধ্যে কত বই অপেক্ষাকৃত ভাল কাগজে ছাপা হয়েছে, কত বই বিনা পয়সায় অপরকে দেবার জন্য ছাপা হয়েছে, কত বইয়ে নম্বর দেওয়া আছে ইত্যাদি। মনের সন্দেহবাতিক বাড়াবার উদ্দেশ্যে ফরাসী ভাষায় অসংখ্য প্রবাদ ও হিতোপদেশের গল্প আছে। যে ফরাসী-কাণ্ডজ্ঞানকে এরা এত উঁচুতে স্থান দেয়, তার অর্থই হল—সব সময় সতর্ক থেকো; বুঝে সুঝে চলো: মানুষকে বিশ্বাস করলে ঠকতে পার কিন্তু অবিশ্বাস করলে কখনও ঠকবে না। La Fonteine ফরাসীদের এই কাণ্ডজ্ঞান' বাড়ানোর জন্য, সারা জীবন ধরে অজস্র গল্প লিখে গিয়েছেন।

সরকারী দেশরক্ষা বিভাগের উপর দিকে, সমান ক্ষমতাশালী কয়েকটি দপ্তর আছে ফ্রান্সে—কোনও একটাকে বিশ্বাস করা ঠিক নয় ভেবে।

অন্য দেশে আসামীকে ধরা হয় নির্দোষ বলে যতক্ষণ না তার অপরাধ প্রমাণিত হয়। এই অবিশ্বাসের দেশ ফ্রান্সে, আইন ঠিক এর উল্টো।

পারস্পরিক-সন্দেহ-রোগের একটি উচ্চারিত মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণ—ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা। এইজন্য ফরাসীরা খোলাখুলি কাজের চেয়ে ছলে বলে কাজ করাকে শ্রেয় মনে করে: intrigueএর জন্য intrigue ভালবাসে। জীবনে রাজনীতি এখানে ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাজকার্যে নির্বাচনের জন্য রাজপ্রণয়িনীর কাছে দরবার করাই ছিল এদেশের সনাতন নিয়ম। দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মান অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচনেও ভোট সংগ্রহার্থে ধরাধরি করবার কাজে নিপুণতার জন্য Madame de Lambert-এর নাম সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে।

এদেশকে চেনেন বলেই এখানকার চিত্রশিল্পে Jean Cocteau-র মত পরিচালকের আবির্ভাব। তিনি নিজেই কাহিনী সংলাপ, গান লেখেন; নিজেই আলোকচিত্র তোলেন, শিল্প নির্দেশও তাঁর নিজের। এইরকম ছায়াচিত্রকেই কেবল বলা যায়, নিজের জিনিস। কাউকে বিশ্বাস করবার জন্য Jean Cocteauকে কোনদিন আঘাত খেতে হবে না। এই আঘাতগুলো আসে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে, যখন লোকে নিজেকে সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে।

'আমার বই আছে', কথাটাকে রুশ ভাষায় বলতে হয় 'আমার বাড়িতে বই আছে'; সেই দেশেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি উঠেছে সবার আগে। রাজা হাত দিয়ে ছুঁলে পতিতোদ্ধার হত ফ্রান্সে বিপ্লবের আগের দিন পর্যন্ত; সেই রাজারই গর্দান ছুঁয়েছিল পাতকীরা তরোয়াল দিয়ে।

এই সংশয়ের বাজারে সকলেই গরমিলের খদ্দের; দৈবাৎ কারও ভাগ্যে মিল জুটে গেলে সে আশ্চর্য হয়। নূতন যুগের বিশেষত্ব এই বিচ্ছিন্নতা। তাই আজকালকার লেখায় কাটা কাটা ভাব, ছবিতে torso-র প্রতিকৃতি, ভাস্কর্যে ও মনোবিশ্লেষণে শবব্যবচ্ছেদের অনুকরণ। এত আলাদা আলাদা, আল্‌গা আল্‌গা ভাব যেখানে, সেখানে হাতের কাছে বিশ্বাসের জিনিস খুঁজে পাবে কি করে?

দেশকে বড় করবার সর্ববাদিসম্মত উপায়, কোন্ কোন্ জিনিস এদেশের লোক প্রথম আবিষ্কার করেছিল তার ফিরিস্তিটা সব ছেলেবুড়োকে মুখস্থ করানো। সব দেশেই এ জিনিস অল্পবিস্তর আছে, কিন্তু ফ্রান্সের মত কোথাও না। অ্যাকাডেমির মেম্বার Andre Siegfried তাঁর বহু যুক্তিসম্বলিত পুস্তকে আবিষ্কার করেছেন যে, দুর্বার উদ্ভাবনী শক্তিই ফরাসী প্রতিভার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ইংলণ্ডের বৈশিষ্ট্য নাকি কাজে লেগে থাকা, আমেরিকার গতিশীলতা, রুশের মরমীবাদ, জার্মানীর নিয়মানুবর্তিতা—এই রকম প্রত্যেক অফরাসী জাতকে স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা আছে। এ একেবারে গোড়ায় কোপ মারা! আবিষ্কারপ্রবণতাটাই যে জাতের প্রতিভা, তাদের সঙ্গে কি আর গুণে-হিসাব-করা আবিষ্কারকের দেশগুলো পাল্লা দিয়ে পারে? কোনও ফরাসীর সমুখে একবার শুধু বলো যে, লণ্ডনের আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলগাড়ি প্যারিসের চেয়ে ভাল, কিম্বা ফরাসী মোটর গাড়ির চেয়ে আমেরিকান গাড়ি ভাল—আর দেখতে হবে না। প্রথমে সে বক্তার স্থূলবুদ্ধিতে অবাক হয়ে এমনভাবে তাকাবে যে, বুদ্ধিমান লোককে সঙ্কুচিত হয়ে যেতেই হবে। তারপর সে একটু দম নিয়ে ঝাড়বে একখানা লম্বা লেক্‌চার—"এরোপ্লেন, মোটর গাড়ি, আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলগাড়ি সবই ফরাসীরা আবিষ্কার করেছে। ভার্সাই প্রাসাদের সম্মুখে যেখান থেকে প্রথম বেলুন উড়েছিল আকাশে, সে জায়গাটা দেখেন নি মুসিয়ো? ফরাসী প্রতিভার আনন্দ আবিষ্কারে, সৃষ্টিতে। অন্য দেশগুলা এই আবিষ্কার-গুলোকেই চকচকে ঝকঝকে পালিশ দিয়ে দু পয়সা করে খাচ্ছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ফরাসী মোটরগাড়ি এঞ্জিনের জুড়ি নেই পৃথিবীতে।" বক্তার চূড়ান্ত অভিমত বহুবার স্বীকার করে নিতে হয়েছে। কারণ ফরাসী মোটরের থেকে আজকাল যে পটকা ফোটার মত শব্দটা হয়, সেটাকে আমি বড় ভয় করি।

ফরাসী জিনিসের সঙ্গে অন্য দেশের জিনিসের তুলনামূলক সমালোচনা প্রত্যেক লোকের মুখস্থ। মনে হয়, এগুলো তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার অঙ্গ। নইলে প্রতি ক্ষেত্রে যুক্তির পয়েণ্টগুলো একেবারে এক কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিদেশীদের সম্মুখে আজকাল নকল দুঃখপ্রকাশ করতে শিখে গিয়েছে—ফরাসী সাহিত্য ও সুকুমার কলার প্রচার নাকি প্রয়োজনের চেয়েও বেশী হয়ে গেছে পৃথিবীতে। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ফরাসী কৃতিত্বগুলির সম্যক প্রচার পৃথিবীতে হয়নি।

এই দুঃখ প্রকাশের পর, ছাত্ররা এক এক করে প্রকাশ করে এক একটি তথ্য—স্টেথিস্‌কোপ কে বার করেছিল জানেন মুসিয়ো? স্টিম এন্‌জিনের কৃতিত্ব জেমস ওয়াটের নয়—Denis Papinর। থার্মমিটারের নামের সঙ্গে ড্যানজিগের ফারেনহাইট সাহেবের নাম জুড়ে দিলেই হ'ল? রেকর্ড রয়েছে, তৈরী করেছিলেন, ফরাসী বৈজ্ঞানিক Guillaume Amontons।

বাকবাগীশ ফরাসী একবার কথা আরম্ভ করলে কি তার আতিশয্য থামাতে পারে? শেষ পর্যন্ত তথ্য গিয়ে ঠেকে Jeen Robinর নামে—যিনি ইউরোপে বাবলাগাছ প্রথম এনেছিলেন।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। এইসব তর্কের সময় ফরাসীরা পাস্তুর, লাভোয়েসিয়ে, বা কুরি গোষ্ঠের বিখ্যাত নামগুলো ভুলেও বলে না। তারা জানে, এগুলো বলার দরকার নেই। খুচরো পয়সা বাঁচানোর অভ্যাস করতে পারলে, টাকা আপনা থেকেই বাঁচবে। চিত্রকর পুসাঁ নিজের সাফল্যের কারণ বলেছিলেন, "আমি তুচ্ছতম জিনিসকেও অবহেলা করিনি।"

অসহ্য! (ক্রমশ)

জল জঙ্গল

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

(২৩)

দুকড়ির মহামূল্য উপদেশ কেতুচরণ বলে নয়—কমবয়সী জোয়ান ছেলে কেউ কখনো কানে নেয় নি। বয়সের ধর্ম। ছেলে-ছোকরারা নিয়মনীতি ক'জনে মানে? হাসি-রহস্য করে হিতকথা নিয়ে। দুকড়ির নিজের ব্যাপারেই দেখ না—সেই এক রাত্রে জোয়ান বয়সে কি সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল বলো দিকি!

কিন্তু কেতুচরণ এবারে কি বলবে—সর্ব-নাশীকে চাক্ষুষ দেখবার পর? সর্বনাশী-গাঙটা অনেক দূর মর্জাল বনকর-স্টেশন থেকে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সাহস বাড়তে বাড়তে বাদার প্রান্তে প্রায় জনপদ সীমান্ত অবধি ধাওয়া করে এসেছে বউটা। গভীর জঙ্গলে শিকার মেলে না বুঝি আজকাল? বুড়ো দুকড়িদের উপদেশক্রমে মাঝিমাল্লা কাঠুরে-বাওয়ালি—যত জোয়ান পুরুষ সাবধানী কাপুরুষ হয়ে গেছে?

টপ্পায় গেয়ে থাকে—

পরালি প্রেমের ফাঁসি, সর্বনাশী,
বারে বারে ঘুরে ফিরে তাই তো তোরে
দেখতে আসি—

কেতুচরণের ঠিক সেই ব্যাপার। নৌকোর শোয় সে। অস্থায়ী এক কুঁজি বেঁধে নিয়েছে, সেখানে আর সকলে থাকে। মেলায় রকম-বেরকমের মানুষ আসছে—ওরা যেমন জুটিয়েছে, আবার ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে ঠিক ঐ প্রণালীতে আর কেউ এ ডিঙি সরিয়ে নিতে পারে তো! কেতুচরণ নৌকোয় শুয়ে তাই পাহারায় থাকে।

রাত দুপুরে এক একদিন যেন সে পাগল হয়ে ওঠে। ঘুম হয় না, পাটার উপর শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে। ঘুঁটে-বাঁধা নৌকোয় চুপচাপ পড়ে থাকতে কিছুতেই মন লয় না। পুরন্দরের উদ্দাম ঢেউ কূলের উপর আছড়াচ্ছে। বিনিদ্র আচ্ছন্ন চেতনায় সে যেন দুরন্ত ঘোড়ার দাপ-দাপ শোনে। তরঙ্গের পিঠে তুড়ুক-সওয়ার হয়ে ছুটে যেতে চায় [illegible] নির্ভয়ে(?) সর্বনাশী

অতুলরূপে বনভূমি যেখানে আলো-আলোময় করে রেখেছে। মৃত্যু সুন্দরী বৌ হয়ে ডাকছে—। এসো গো চলে এসো। এ ডাক উপেক্ষা করে সদাসতর্ক জীবন বাঁচিয়ে রাখবার কোন মানে হয় না।

নদী ও খালের মোহনায় দুধের মতো সাদা চর। এক কণিকা মাটি মুখে দিয়ে দেখ—লোনতা, বিস্বাদ। নুন ফুটে ফুটে আছে ধরিত্রীর গায়ে। জোটালের সময় চর ডুবে যায়, জলতরঙ্গ বাঁধের গায়ে ধাক্কা মারে। পর পর দুটো এই রকম বাঁধ —একটা যদিই বা দৈবাৎ জলের তোড়ে ভেঙে যায়, অন্যটা রইল। বাঁধ মেরামতের জন্য ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে দিনরাত্রি এস্টেটের মাইনে-করা লোক ঘুরছে। বিশেষ করে বৃষ্টিবাদলার সময়।

বাঁধের ঠিক ওপারে মেলার জায়গা। দোকান-ঘরগুলো মেলা অন্তে হাটের চালা হিসাবে থাকবে। পাকাপাকি দোকান খুলে কেউ যদি থাকতে চায়, মধুসূদন সর্বতো-ভাবে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্ত এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় পয়সা খরচ করে মালপত্র সাজিয়ে বসতে সহসা কেউ রাজি হচ্ছে না। কোন লাভে থাকবে? তবে মাছের সায়েরটা জমবে নিশ্চিত। এত মাছ পড়ে এ দিকে—মাছ কেনাবেচার একটা পাকা বন্দোবস্ত হওয়া অতিমাত্রায় জরুরী। সায়ের বসলে সেই সূত্রেও অনেক লোকের ওঠা-বসা হবে। মানুষ হল লক্ষ্মী— মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হবে হাট জমানোর।

মেলার বাইরে একটা উঁচ জায়গা খুশাল সায়েরের জন্য পছন্দ করেছে। গোলপাতার দোচালা বেঁধে আপাতত কাজ চালাবে। দুখানা চাই অন্তত। সায়েরের বেচাকেনা ফাঁকা চরের উপরেই চলবে, তবে বৃষ্টি-বাদলার সময় অথবা শীতের রাত্রে মাথার উপর একটা আচ্ছাদনের দরকার। একটা ঘর থাকবে এইজন্য। আর একটায় [illegible] বাসা। রান্নাবান্না ও তহবিল ইত্যাদি রাখার জন্য আলাদা একটুকু বাসার প্রয়োজন।

সমস্তটা দিন নৌকোয় মেলার মানুষজন যাওয়াআসা(?) চলে; রাত্রিবেলা সায়ের-ঘরের সরঞ্জাম তৈরি হয়। বাঁশ দুষ্প্রাপ্য এ দিকে— কয়েকটা তবু অনেক কষ্টে জোগাড় হয়েছে। বাঁশ ফেড়ে ফেলে চালের বাখারি হচ্ছে। চরের উপর তিন-চারজনে পাশাপাশি বসে বাখারি চাঁচে ও গল্পগুজব করে। গরানের ছিটের রুয়ো —ছাল তুলে স্তূপাকার করে ফেলেছে। এই ছালও ফেলার বস্তু নয়—জলে ভিজিয়ে রাখলে ক্রমশ রক্তাভ হবে জল, তাই দিয়ে খেপলাজালের কষ ধরাবে। গোলপাতা বাছাই করে পশুর-ছায়ায় সাজিয়ে রাখছে— ছায়ায় আস্তে আস্তে শুকোবে, রোদের ভিতর পাতা খারাপ হয়ে যায়। কেতুচরণ লেগে আছে এই সব কাজেকর্মে—মন উতলা হলেও বেরুবে কোন সময়? আবার দ্বিধাও আসে। যাক গে, কি হবে আর বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে? টুনিকে নিয়ে ঘরসংসার করতে চেয়েছিল—সংসার না হলেও ঘর হচ্ছে যাচ্ছে তো? ধরিত্রীর পিঠের উপর কায়েমী বসবাসের একটুখানি ঘর। অনেক তো হয়েছে—চালের নিচে মাথাগুঁজে থাকা যাক এবার সুস্থির হয়ে।

ভারি নিরিবিলি জায়গা। এমনটা থাকবে না অবশ্য। গাঙে খালে মাছের ডরা বেয়ে মাছ এনে এনে ঢালবে শুধুই নয়— অকারণে আড্ডা দিতেও অনেকে আসবে। সায়েরটা জমিয়ে নিতে পারলে যে হয়! ঋষিবর হেসে চোখ বড় বড় করে বলে, আসবে কি বলো—আসছে এখনও। রাত-দুপুরে চাদরে মুখ ঢেকে আসে, তাই জানতে পারো না। একজন দু-জন করে চুপিসারে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে। সাঁঝ না লাগতে মাগিগুলো ঘুর ঘুর করে বেড়ায়, সে কি এমনি এমনি?

হি হি করে হাসতে হাসতে কাটারি দিয়ে সজোরে চেরা-বাঁশের গেরো কাটে।

মেলায় কয়েকটি দেহজীবিনীর আমদানি হয়েছে, ছোটখাটো একটা পাড়া বসেছে তাদের। মেলা জমাতে যাত্রা-জারিগানের মতো এরাও অত্যাবশ্যক। খবর রাখে, কখন কোন জায়গায় জাঁকালো রকমের মেলা বসছে— সঙ্গে সঙ্গে এরাও গিয়ে গোলপাতার ছাউনি, গোলের বেড়া, বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে

রাতারাতি ঘর তুলে ফেলে। মেলা ভাঙলে তল্পিতল্পা নৌকো বোঝাই করে চলে যায় আবার যে অঞ্চলে ন্তন মেলা বসাচ্ছে—নব নব খরিন্দারের সন্ধানে।

সায়েরের জায়গা এই পাড়ার প্রান্তে নদী ও খালের মোহানার উপর। ইতিমধ্যে খুশাল একদিন রায় এস্টেটে টাকা জমা দিয়ে যথারীতি মোহর-মারা রশিদ নিয়ে এসেছে। খোঁটা পুঁতে সায়ের-ঘরের নিশানা হল। বেচাকেনা শুরু হতে আর দেরি নেই।

এক রাত্রে কেতুচরণ অমনি শুয়ে আছে, গোল-পাঁচু দ্রুত এসে গলুইতে লাফিয়ে উঠল। দুলে উঠল ডিঙি। ঘুমের আবিল কেটে গিয়ে কেতু মুহূর্তে খাড়া হয়ে বসেছে।

কে রে?

গোল-পাঁচু বলে, চুপ চুপ! শুনতে পাচ্ছ না? স্থির হয়ে কান পাতো।...কেমন, এইবার?

অ র্ র্—অ-অ-অ—

বিড়ালের ডাকই বটে! এমন জোর আওয়াজ যে এতদূর থেকেও কানে আসে। বিড়াল বাঘের মাসী—আর এটা হল সুন্দরবন জায়গা তো—অতএব সাক্ষাৎ রয়্যাল বেঙ্গলের মাসী, ডাক শুনে নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে। ওরা যে কুঁজি বেঁধেছে, তার পাশেই। কানের কাছে এই কাণ্ড হতে থাকলে মরামানুষ পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠে—খরিদ্দারদের অপরাধ কি, ঘুমাবে তারা কেমন করে?

কেতুচরণ ফিস-ফাস করে, বলে, একটা বস্তা নিয়ে আয় তো শিগগির—

বস্তা কোথায় পাবো? মাছের ঝুড়ি আছে—

নিয়ে আয় তাই। ঝুড়ি চাপা দিয়ে তো রাখা যাক। দিনমানে যখন চড়ন্দার নিয়ে বেরুব, বস্তা সেই সময় চেয়েচিন্তে নিতে হবে কারো কাছ থেকে—

গোল-পাঁচু কুঁজির দিকে যাচ্ছিল ঝুড়ি সংগ্রহের জন্য। কেতুচরণ ডেকে বলল, মাছ আছে ঘরে? কিম্বা দুধ হলেও হবে।

পাঁচু ঘাড় নাড়ে।

পান্তা ভাত আছে সকালের জন্য। আর নুন-লঙ্কা।

তাই সই। নিয়ে আয়।

নারিকেল-মালায় করে পান্তাভাত নিয়ে এল পাঁচু। আর একটা চাঁপাকলা—খোসা ছাড়িয়ে ভাতের উপর দিয়েছে।

কেতুচরণ ঠাহর করে দেখে হেসে উঠল। কলা কি হবে রে?

পাঁচু বলে, ছিল—তাই নিয়ে এলাম। শুধু পান্তার চেয়ে কলা দেখতে পেলে লোভ বেশি হবে।

বেড়াল ধরতে যাচ্ছি। বানর নয় যে কলা দেখলে অমনি হাত বাড়াবে।

চাঁদ ডুবে গেছে। তার উপরে মেঘ জমেছে কিছুক্ষণ ধরে আকাশে। অন্ধকার—ভাবুক জনে স্বচ্ছন্দে সূচীভেদ্য বিশেষণে অভিহিত করতে পারেন। মনে অনুভূতি জাগে, এ অন্ধকার বুঝি রীতিমত একটি ঘন পদার্থ—হাতে পায়ে ঠেলে ঠেলে এগুতে হয়। সূঁচ চালিয়ে অন্ধকার ছেঁদা করা যায়—এ কল্পনা নিতান্ত অলীক বলে মনে হয় না।

এদের বাসা ও আতরবালার বাসার মধ্যবর্তী জায়গাটায় কয়েকটা দীর্ঘ কেওড়াগাছ ও গিলেলতার ঝোপ। ঘর-কানাচের জঙ্গল সাফ করবার প্রয়োজন নেই—তাই পড়ে রয়েছে অমনি। হুলোবেড়ালটা ঐখানে এসে জুটেছে। আওয়াজ অতি প্রখর—কিন্তু গাছের ছায়ান্ধকারে কিছু নজরে আসছে না।

জল জঙ্গল

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

(২৩)

দুকড়ির মহামূল্য উপদেশ কেতুচরণ বলে নয়—কমবয়সী জোয়ান ছেলে কেউ কখনো কানে নেয় নি। বয়সের ধর্ম। ছেলে-ছোকরারা নিয়মনীতি ক'জনে মানে? হাসি-রহস্য করে হিতকথা নিয়ে। দুকড়ির নিজের ব্যাপারেই দেখ না—সেই এক রাত্রে জোয়ান বয়সে কি সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল বলো দিকি!

কিন্তু কেতুচরণ এবারে কি বলবে—সর্ব-নাশীকে চাক্ষুষ দেখবার পর? সর্বনাশী-গাঙটা অনেক দূরে মর্জাল বনকর-স্টেশন থেকে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সাহস বাড়তে বাড়তে বাদার প্রান্তে প্রায় জনপদ সীমান্ত অবধি ধাওয়া করে এসেছে বউটা। গভীর জঙ্গলে শিকার মেলে না বুঝি আজকাল? বুড়ো দুকড়িদের উপদেশক্রমে মাঝিমাল্লা কাঠুরে-বাওয়ালি—যত জোয়ান পুরুষ সাবধানী কাপুরুষ হয়ে গেছে?

টপ্পায় গেয়ে থাকে—

পরানি প্রেমের ফাঁসি, সর্বনাশী,
ঘারে বারে ঘুরে ফিরে তাই তো তোরে
দেখতে আসি—

কেতুচরণের ঠিক সেই ব্যাপার। নৌকোর শোয় সে। অস্থায়ী এক কুঁড়ি বেঁধে নিয়েছে, সেখানে আর সকলে থাকে। মেলায় রকম-বেরকমের মানুষ আসছে—ওরা যেমন জুটিয়েছে, আবার ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে ঠিক ঐ প্রণালীতে আর কেউ এ ডিঙি সরিয়ে নিতে পারে তো! কেতুচরণ নৌকোয় শুয়ে তাই পাহারায় থাকে।

রাত দুপুরে এক একদিন যেন সে পাগল হয়ে ওঠে। ঘুম হয় না, পাটার উপর শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে। ঘাটে-বাঁধা নৌকোয় চুপচাপ পড়ে থাকতে কিছুতে মন লয় না। পুরন্দরের উদ্দাম ঢেউ কূলের উপর আছড়াচ্ছে। বিনিদ্র আচ্ছন্ন চেতনায় সে যেন দুরন্ত ঘোড়ার দাপ-দাপ শোনে। তরঙ্গের পিঠে তুড়ুক-সওয়ার হয়ে ছুটে যেতে চায় [illegible] সর্বনাশী

অতুলরূপে বনভূমি যেখানে আলো-আলোময় করে রেখেছে। মৃত্যু সুন্দরী বৌ হয়ে ডাকছে—। এসো গো চলে এসো। এ ডাক উপেক্ষা করে সদাসতর্ক জীবন বাঁচিয়ে রাখবার কোন মানে হয় না।

নদী ও খালের মোহনায় দুধের মতো সাদা চর। এক কণিকা মাটি মুখে দিয়ে দেখ—লোনতা, বিস্বাদ। নুন ফুটে ফুটে আছে ধরিত্রীর গায়ে। কোটালের সময় চর ডুবে যায়, জলতরঙ্গ বাঁধের গায়ে ধাক্কা মারে। পর পর দুটো এই রকম বাঁধ—একটা যদিই বা দৈবাৎ জলের তোড়ে ভেঙে যায়, অন্যটা রইল। বাঁধ মেরামতের জন্য ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে দিনরাত্রি এস্টেটের মাইনে-করা লোক ঘুরছে। বিশেষ করে বৃষ্টিবাদলার সময়।

বাঁধের ঠিক ওপারে মেলার জায়গা। দোকান-ঘরগুলো মেলা অন্তে হাটের চালা হিসাবে থাকবে। পাকাপাকি দোকান খুলে কেউ যদি থাকতে চায়, মধুসূদন সর্বতো-ভাবে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় পয়সা খরচ করে মালপত্র সাজিয়ে বসতে সহসা কেউ রাজি হচ্ছে না। কোন লাভে থাকবে? তবে মাছের সায়েরটা জমবে নিশ্চিত। এত মাছ পড়ে এ দিকে—মাছ কেনাবেচার একটা পাকা বন্দোবস্ত হওয়া অতিমাত্রায় জরুরী। সায়ের বসলে সেই সূত্রেও অনেক লোকের ওঠা-বসা হবে। মানুষ হল লক্ষ্মী—মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হবে হাট জমানোর।

মেলার বাইরে একটা উঁচু জায়গা খুশাল সায়েরের জন্য পছন্দ করেছে। গোলপাতার দোচালা বেঁধে আপাতত কাজ চালাবে। দুখানা চাই অন্তত। সায়েরের বেচাকেনা ফাঁকা চরের উপরেই চলবে, তবে বৃষ্টি-বাদলার সময় অথবা শীতের রাত্রে মাথার উপর একটা আচ্ছাদনের দরকার। একটা ঘর থাকবে এইজন্য। আর একটায় [illegible] বাসা। রান্নাবান্না ও তহবিল ইত্যাদি রাখার জন্য আলাদা একটুকু বাসার প্রয়োজন।

সমস্তটা দিন নৌকোয় মেলার মানুষজন খওয়াবরি চলে; রাত্রিবেলা সায়ের-ঘরের সরঞ্জাম তৈরি হয়। বাঁশ দুষ্প্রাপ্য এ দিকে—কয়েকটা তবু অনেক কষ্টে জোগাড় হয়েছে। বাঁশ ফেড়ে ফেলে চালের বাখারি হচ্ছে। চরের উপর তিন-চারজনে পাশাপাশি বসে বাখারি চাঁচে ও গল্পগুজব করে। গরানের ছিটের রুয়ো—ছাল তুলে স্তূপাকার করে ফেলেছে। এই ছালও ফেলার বস্তু নয়—জলে ভিজিয়ে রাখলে ক্রমশ রক্তাভ হবে জল, তাই দিয়ে খেপলাজালের কষ ধরাবে। গোলপাতা বাছাই করে পশুর-ছায়ায় সাজিয়ে রাখছে—ছায়ায় আস্তে আস্তে শুকোবে, রোদের ভিতর পাতা খারাপ হয়ে যায়। কেতুচরণ লেগে আছে এই সব কাজেকর্মে—মন উতলা হলেও বেরুবে কোন সময়? আবার দ্বিধাও আসে। যাক গে, কি হবে আর বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে? টুনিকে নিয়ে ঘরসংসার করতে চেয়েছিল—সংসার না হলেও ঘর হচ্ছে যাচ্ছে তো? ধরিত্রীর পিঠের উপর কায়েমী বসবাসের একটুখানি ঘর। অনেক তো হয়েছে—চালের নিচে মাথাগুঁজে থাকা যাক এবার সুস্থির হয়ে।

ভারি নিরিবিলি জায়গা। এমনটা থাকবে না অবশ্য। গাঙে খালে মাছের ভরা বেয়ে মাছ এনে এনে ঢালবে শুধুই নয়—অকারণে আড্ডা দিতেও অনেকে আসবে। সায়েরটা জমিয়ে নিতে পারলে যে হয়! ঋষিবর হেসে চোখ বড় বড় করে বলে, আসবে কি বলো—আসছে এখনও। রাত-দুপুরে চাদরে মুখ ঢেকে আসে, তাই জানতে পারো না। একজন দু-জন করে চুপিসারে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে। সাঁঝ না লাগতে মাগিগুলো ঘুর ঘুর করে বেড়ায়, সে কি এমনি এমনি?

হি হি করে হাসতে হাসতে কাটারি দিয়ে সজোরে চেরা-বাঁশের গেরো কাটে।

মেলায় কয়েকটি দেহজীবিনীর আমদানি হয়েছে, ছোটখাটো একটা পাড়া বসেছে তাদের। মেলা জমাতে যাত্রা-জারিগানের মতো এরাও অত্যাবশ্যক। খবর রাখে, কখন কোন জায়গায় জাঁকালো রকমের মেলা বসছে—সঙ্গে সঙ্গে এরাও গিয়ে গোলপাতার ছাউনি, গোলের বেড়া, বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে

রাতারাতি ঘর তুলে ফেলে। মেলা ভাঙলে তল্পিতল্পা নৌকো বোঝাই করে চলে যায় আবার যে অঞ্চলে নূতন মেলা বসাচ্ছে—নব নব খরিদ্দারের সন্ধানে।

সায়েরের জায়গা এই পাড়ার প্রান্তে নদী ও খালের মোহানার উপর। ইতিমধ্যে খুশাল একদিন রায় এস্টেটে টাকা জমা দিয়ে যথারীতি মোহর-মারা রশিদ নিয়ে এসেছে। খোঁটা পুঁতে সায়ের-ঘরের নিশানা হল। বেচাকেনা শুরু হতে আর দেরি নেই।

এক রাত্রে কেতুচরণ অমনি শুয়ে আছে, গোল-পাঁচু দ্রুত এসে গলুইতে লাফিয়ে উঠল। দুলে উঠল ডিঙি। ঘুমের আবিল কেটে গিয়ে কেতু মুহূর্তে খাড়া হয়ে বসেছে।

কে রে?

গোল-পাঁচু বলে, চুপ চুপ! শুনতে পাচ্ছ না? স্থির হয়ে কান পাতো।...কেমন, এইবার?

অ র্‌ র্‌—অ-অ-অ—

বিড়ালের ডাকই বটে! এমন জোর আওয়াজ যে এতদূর থেকেও কানে আসে। বিড়াল বাঘের মাসী—আর এটা হল সুন্দরবন জায়গা তো—অতএব সাক্ষাৎ রয়্যাল বেঙ্গলের মাসী, ডাক শুনে নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে। ওরা যে কুঁজি বেঁধেছে, তার পাশেই। কানের কাছে এই কাণ্ড হতে থাকলে মরামানুষ পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠে—খাঁস্বরদের অপরাধ কি, ঘুমোবে তারা কেমন করে?

কেতুচরণ ফিস-ফাস করে, বলে, একটা বস্তা নিয়ে আয় তো শিগগির—

বস্তা কোথায় পাবো? মাছের ঝুড়ি আছে—

নিয়ে আয় তাই। ঝুড়ি চাপা দিয়ে তো রাখা যাক। দিনমানে যখন চড়ন্দার নিয়ে বেরুব, বস্তা সেই সময় চেয়েচিন্তে নিতে হবে কারো কাছ থেকে—

গোল-পাঁচু কুঁজির দিকে যাচ্ছিল ঝুড়ি সংগ্রহের জন্য। কেতুচরণ ডেকে বলল, মাছ আছে ঘরে? কিম্বা দুধ হলেও হবে।

পাঁচু ঘাড় নাড়ে।

পান্তা ভাত আছে সকালের জন্য। আর নুন-লঙ্কা।

তাই সই। নিয়ে আয়।

নারিকেল-মালায় করে পান্তাভাত নিয়ে এল পাঁচু। আর একটা চাঁপাকলা—খোসা ছাড়িয়ে ভাতের উপর দিয়েছে।

কেতুচরণ ঠাহর করে দেখে হেসে উঠল। কলা কি হবে রে?

পাঁচু বলে, ছিল—তাই নিয়ে এলাম। শুধু পান্তার চেয়ে কলা দেখতে পেলে লোভ বেশি হবে।

বেড়াল ধরতে যাচ্ছি। বানর নয় যে কলা দেখলে অমনি হাত বাড়াবে।

চাঁদ ডুবে গেছে। তার উপরে মেঘ জমেছে কিছুক্ষণ ধরে আকাশে। অন্ধকার—ভাবুক জনে স্বচ্ছন্দে সূচীভেদ্য বিশেষণে অভিহিত করতে পারেন। মনে অনুভূতি জাগে, এ অন্ধকার বুঝি রীতিমত একটি ঘন পদার্থ—হাতে পায়ে ঠেলে ঠেলে এগুতে হয়। সূচ চালিয়ে অন্ধকার ছেঁদা করা যায়—এ কল্পনা নিতান্ত অলীক বলে মনে হয় না।

এদের বাসা ও আতরবালার বাসার মধ্যবর্তী জায়গাটায় কয়েকটা দীর্ঘ কেওড়াগাছ ও গিলেলতার ঝোপ। ঘর-কানাচের জঙ্গল সাফ করবার প্রয়োজন নেই—তাই পড়ে রয়েছে অমনি। হুলোবেড়ালটা ঐখানে এসে জুটেছে। আওয়াজ অতি প্রখর—কিন্তু গাছের ছায়ান্ধকারে কিছু নজরে আসছে না।

মালাসুদ্ধ ভাত মাটিতে রাখল, রেখে ওষ্ঠ ও জিভে শব্দ করছে—চুঃ-চুঃ-চুঃ—। বিড়ালের যাতে মনোযোগ পড়ে, এদিকে, ভাত খেতে চলে আসে। গোল-পাঁচু শব্দ করছে, আর কেতুচরণ একটু পিছনে ঝুড়ি তুলে তৈরি হয়ে আছে। খেতে শুরু করলেই ঝুড়ি ঢাকা দিয়ে দেবে। আপাতত এখন ঝুড়ির উপর ভারি একটা কিছু চাপিয়ে রাখবে, বস্তাবন্দি হবে সকালবেলা।

কিন্তু ক্ষণ পরেই বোঝা গেল, আহার-দ্রব্য দিয়ে আকর্ষণ করা অসম্ভব—মনোযোগ তার অপর দিকে।

পিছন দিককার ঝাঁপ খুলল আতরবালা। হেরিকেন উঁচু করে ধরে আহ্বান করে, আসেন বাবু—

বিড়ালের ডাক বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ছাঁচতলায় জুতো খুলে রেখে ঘরে উঠল বিড়াল নয়—একটি লোক, ভদ্রলোক—গলায় মাথায় চাদর জড়িয়ে যথাসম্ভব পরিচয় গোপন রেখেছে।

কৌতূহল উদগ্র হল কেতুচরণের। দেখতে হবে তো লোকটাকে! কালিঝুলি মাখা হেরিকেনের ক্ষীণ আলোয় এত দূর থেকে ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। ভাল করে দেখবার জন্য কাছাকাছি গেল আরো। দেখল, আতরকে জড়িয়ে ধরেছে লোকটা।

সন্ত্রস্ত হয়ে আতরবালা বলে, আঃ, ঝাঁপ খোলা—করেন কি বাবু?

ফিক করে হেসে তারপর সোহাগ করে, আরে আরে ছাড়ু—করিস কি মুখপোড়া?

আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে আতরবালা তাড়াতাড়ি ঝাঁপ বন্ধ করল। কেতু তখন গিয়ে দাঁড়াল একেবারে বেড়ার ধারে। বেড়া ফাঁক করে দেখবার চেষ্টা করছে। চেনা মানুষ যেন! একবারও মুখ ফেরায় না এদিকে—তাহলে নিঃসন্দেহ হওয়া যেত।

হেরিকেন নিভিয়ে দিল এই সময়ে।

(২৪)

তারপরে কি হল কেতুচরণের—ঘাটে ফিরে এসে ডিঙি খুলে দিল তখনই। কাউকে কিছু বলল না, গোল-পাঁচুকে শুধু সঙ্গে নিয়ে চলল।

গোল-পাঁচু দাঁড়ে বসেছে—নৌকো ছুটেছে বাদার দিকে। দূরের লোক আনবার প্রয়োজন হলে এ রকম রাত্রেও তারা বেরোয় কখনো কখনো।

পাঁচু বলে, জঙ্গলমুখো চললে যে!

কেতুচরণ জবাব দেয়, আছে—। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বলে, কষে টান দিকি ভাই। মানুষ আছে বলেই সন্দ করি। চেনামানুষ। কপালে থাকে তো দেখতে পাবি।

পাঁচু বলে, সে কথা হচ্ছে না। মেলার মানুষ ধরতে হবে না? আমি বলি কি—পাতাল বাড়ির দিকে পাড়ি ধরা যাক। কদিন যাওয়া হয় নি, বিস্তর সোয়ারি পাওয়া যাবে।

কেতু সংক্ষেপে বলে, আজ সোয়ারি ধরব না।

পাঁচু প্রতিবাদ করে, সাতসকালে বাদাবনে গিয়ে উঠবে—সাহস দিনকে দিন বড্ড বেড়েছে—এত বাড় ভাল নয় কিন্তু। পিটেল বাবুরা তক্কে তক্কে আছে সেই নৌকো-বন্দুক সরানোর পর থেকে। বাগে পেলে আস্ত রাখবে না।

কেতুচরণ কথা কানে নিল না। তর্কাতর্কিও করল না। তর-তর করে নৌকো যেমন যাচ্ছিল, তেমনি চলতে লাগল। এয়ার-বন্ধুরা তার এই রকম স্থিরগম্ভীর ভাব আগেও দেখেছে। সবাই সমীহ করে এই অবস্থা দেখলে। অকস্মাৎ সে যেন বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী হয়ে পড়ে সকলের থেকে।

খরস্রোতে দেখতে দেখতে তারা মর্জাল স্টেশনে পৌঁছল। অন্ধকার আছে তখনো, আকাশে পোহাতি-তারা জ্বলজ্বল করছে। মর্জাল পার হয়ে আরও এগিয়ে যারা বাদায় ঢুকবে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কেবলমাত্র মর্জাল অবধি যাদের গতি, তারা বিষখালির মুখে নৌকো বেঁধে বাঁধের ধারে ধারে পায়ে হেঁটে যায়। হাঁটা পথে আধক্রোশটাক পথ—অথচ জলপথে পুরো তিনখানা বাঁক ঘুরতে হয় এইটুকুর জন্য। কেতুচরণ কিন্তু বিষখালিতে নৌকো রাখে নি—স্টেশনের ঘাটে পাশাপাশি খান তিনেক তক্তা জুড়ে যে প্লাটফরমের মতো হয়েছে, তারই পাশে এনে লাগাল।

ঘুমুচ্ছে স্টেশনের লোকজন। ঝুলোনো লণ্ঠনটা তেল শেষ হয়ে নিভে রয়েছে। কনকনে হাওয়া বইছে—হাড়ের ভিতর অবধি কাঁপিয়ে তোলে। মনের মধ্যে ভয়-ভয় করছে বুঝি এতক্ষণে—কেতুচরণ তাই একটু প্রক্রিয়া করে নিল। ডিঙি থেকে নেমেই মাটিচালক দিল সর্বাগ্রে। মন্ত্রটা দুকড়ির কাছে শেখা। মাটি গরম হয়ে ওঠে মন্ত্রের তেজে। গুণীন নিজে কিন্তু আপন মানুষ বুঝতে পারবে না—

কিন্তু মানুষ ছাড়া আর সকলের পক্ষে এই মাটিতে পা রাখা অসহ্য হয়। ছুটে পালায় তারা উষ্ণ অঞ্চল ছেড়ে। তবে শয়তান জন্তুও আছে— মাটিচালকের আঁচ পেলে তারা জঙ্গলের কাটাগাছপালার উপর উঠে পড়ে, পালায় না। মাটি ঠান্ডা হলে তখন আবার চরে ফিরে বেড়ায়।

তা জন্তুজানোয়ারেই যখন এত চালাকি জানে, ওঁদের কি হবে বলো মাটিচালক দিয়ে? মাটির জীব নন ওঁরা—শখ করে একটু-আধটু কখনো বা মাটিতে পা ঠেকান। সেই যে কেতুচরণ সেদিন এই জায়গায় দেখেছিল—সত্যি সত্যি যদি সর্বনাশী হন, কঠিন মাটির উপরে কখনো তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন না। দেখাচ্ছিল ঐরকম। বাতাসে ভেসেছিলেন ভূমির অত্যন্ত কাছাকাছি। মন বোঝে না—রাত্রির এই নিঃশব্দ শেষ যামে সেদিনের দেখা সেই পরমাশ্চর্য মূর্তির কথা ভেবে প্রাণ বড় চঞ্চল হয়েছে—মন্ত্র পড়ে কেতুচরণ রীত রক্ষা করল। একটুখানি ভরসা পাবার চেষ্টা—আর কিছু নয়।

সকাল হলে একে দুয়ে সবাই জাগল। হরিপদ বাবলার ডাল ভেঙে দাঁতন করতে করতে আসছে। নৌকো দেখে প্লাটফরমে নেমে এল।

পাশ করতে হবে? তা এইটুকু এক ডিঙি নিয়ে বেরিয়েছ কোন কর্মে? ক'টা মাল ধরবে এতে?

কেতু চমকে উঠল হাতকাটা হরির বীভৎস চেহারা দেখে। কোথায় যেন দেখেছে একে? কোথায়...কোথায়? গলা শুনে আরও সন্দেহ হয়। কিন্তু গোল-পাঁচুর তাহলে তো বেশি করে চিনবার কথা। সে যখন চিনছে না, হরিপদও না—তখন কেতুচরণেরই ভুল সুনিশ্চিত।

গোল-পাঁচু সহজভাবে কথা বলছে হরিপদর সঙ্গে। চালাকি করে বলল, না রে দাদা, বাদায় যাচ্ছি নে। কাছেপিঠে থাকি আমরা—মোভোগের মেলায় সোয়ারি বওয়াবয়ি করি। ফাঁক পেলাম এটু—শখ করে তোমাদের আপিস দেখতে বেরিয়েছি।

হরিপদ বলে, যাত্রা হবে নাকি শুনলাম মেলায়?

হুঁ, তরশু দিন—

জবাব দিচ্ছে আর কেতুচরণের নজর ঘুরছে এদিক-ওদিকে। স্টেশনের পিছনটায়

াড় জঙ্গল। জানোয়ারের উৎপাতের ভয়ে ়রে ও গরানের বাতির দু-সারি বেড়া দিকে, তার পিছনে মাটির উঁচু বাঁধ। এত বধানতা সত্ত্বেও এই বছর তিনেক আগে কবার বাঘে হানা দেয়। সেই থেকে আর ক নূতন ব্যবস্থা হয়েছে। মাটি থেকে ত আন্টেক উঁচুতে প্রশস্ত মাচা—সেই চার উপরেই সরকারী অফিস, ঘোষবাবু অপর লোকজনের শোবার ঘর, রান্নাঘর, ঠান। কারও মাটিতে পা ঠেকাবার আবশ্যক য় না। মোহানার দিকটায়—পুরোপুরি নয়, ানিকটা অংশমাত্র খোলা। প্ল্যাটফরমে এবং দীর খোলে নামবার জন্য মই লামানো আছে খোলা জায়গা থেকে। কোথাও যেতে হলে নৌকো সম্বল। পদব্রজে খানিকটা বাঁধ ধরে ানিকটা বা নদীর কূল বেয়ে যাওয়া যে ায় না, তা নয়। কিন্তু বিপজ্জনক এই ভাবে াওয়া। যাতায়াতের দরকারও হয় না—ায়গা কোথায় যাবার? বড়দলের হাট ন্ততপক্ষে বিশ ক্রোশ। আর ক্রোশ চার-ােের মধ্যে মৌভোগে ঐ নতুন হাটের পত্তন চ্ছে। হাট কায়েমি হলে তখন অবশ্য ভোতে যাবার একটা জায়গা হবে াছাকাছি।

কেতুচরণ কথা বলছে, তার দৃষ্টি কন্তু উপরের মাচার দিকে। উঁচু গলায় থা হচ্ছিল। যাত্রার কথা উঠতেই লক্ষ্য রল, বেড়া শেষ হয়ে যে জায়গা থেকে মই নেমেছে—সেখানটায় সহসা হাতের একটুখানি বেরিয়ে এল। বেড়া এঁটে ধরে তাদের দেখছে কেউ আড়াল থেকে। সুগৌর নিটোল হাতটুকু—কেতু রেছে ঠিকই তবে! আঙুলে বসানো আংটি প্রভাত-আলোয় ঝিকমিক করছে। আহা, সমান আঙুলেই তো আংটি পরাতে হয়।

কেতুচরণ তখন আরও ফলাও করে বলে, নট্ট কোম্পানির নাম শুনেছ — তারাই ঢোল-ডুগি নয়—ইংরাজি বাজনা বাজিয়ে তারা গান করে। শহর-বাজারের লোক বলে কত সাধ্য-সাধনায় দেখতে পায় না—সেই যাত্রা রায়-বাবু বাদাবনে নিয়ে আসছেন। তরশুদিন নে—পরশুর পরদিন। যেও গার্ডমশায়, চোখ-কান সার্থক হবে।

হরিপদ নিশ্বাস ফেলে বলে, আমাদের যাওয়া হবে না, আমরা যাবো কেমন করে? ... চলে যাবেন।

আমার উপর ভার থাকবে, আপিসে কাকে রেখে যাবো?

তারপরে সরকারী লোকের যথাযোগ্য ভারিক্কি চালে বলল, খুলনেয় গিয়ে বায়োস্কোপ দেখে দেখে আসছি। যাত্রাগান তার কাছে লাগে? আমি যাত্রা শুনিনে।

বললাম তো, যেমন-তেমন যাত্রা নয়—

সহসা কেতুচরণের তেষ্টা পেয়ে গেল বিষম। বলে, একঢোক জল খেয়ে যাবো। হেঁকে বলে দাও তো গার্ডমশায়, খাবার জল দিতে।

যাত্রা শোনার সুযোগ হবে না, সেজন্য এমনই মনটা খারাপ লাগছিল—তার উপর কেতুর এই অভিনব ও আশ্চর্য প্রস্তাবে হরিপদর মেজাজ বিগড়ে গেল। সে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, হবে না। জলসত্র বসানো হয়েছে নাকি—উঁ? চারদিন জলের বোটের দেখা নেই—নিজেদেরই শুকিয়ে মরতে না হয়! কোন আক্কেলে জল না নিয়ে বেরিয়েছ তোমরা শুনি!

এক লহমা বিদ্যুৎ চমকে গেল উঠানে—মইয়ের মাথায় অবারিত জায়গাটুকুর উপর। আন্দাজে তবে ঠিকই ধরেছে—এলোকেশী। নিশিরাত্রের বউটি দুকড়ির গল্পের সর্বনাশী নয়—মতিরাম সাধুর মেয়ে। সর্বনাশী এলোকেশীও। বিপজ্জনক অরণ্য-ভূমে রাত-দুপুরে একাকী বেরিয়ে অমন করে দাঁড়াবার মেয়ে এলোকেশীই বটে! এলোকেশী কেতুদের দৃষ্টির সামনে দিয়ে উঠান পার হয়ে বোধ করি ঘরের ভিতর ঢুকল।

(ক্রমশ)

আলোচনা

ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার

১

মহাশয়,—আপনাদের পত্রিকার ৩৩শ সংখ্যায় আলোচনা বিভাগে জ্যোতি বটব্যালের পত্রটি পড়িলাম। তিনি স শ ষ-র পরিবর্তে একটি 'শ' রাখিতে মত জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত রণজিৎ রায়কে সমর্থন করিয়াছেন। এবিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

আমার ধারণা, তাহাতে বানানের জটিলতা কমিলেও শব্দ-গত জটিলতার সৃষ্টি হইবে। তাহার কয়েকটা নমুনা দিলাম:—

(১) 'সোনা' ও 'শোনা'তে প্রভেদ থাকিবে না।
(২) 'শান্ত' ও 'সান্ত'কে লইয়া অশান্তি হইবে।
(৩) 'সব', 'শব' এক হইয়া যাইবে।
(৪) 'শব-জাতি' ও 'স্বজাতি'র ব্যাপারেও ত ৈ থ ব চ। ইত্যাদি ইত্যাদি

আবার ধরুন নিম্নলিখিত বাক্যটি। যথা: 'সোনা, লক্ষ্মী মেয়ে, আমায় একটা গান শোনা।' ইহা দাঁড়াইবে—"শোনা, লক্ষ্মী মেয়ে, আমায় একটা গান শোনা।" অর্থভেদ লক্ষ্যণীয়। আর কয়েকটি নমুনা রাজশেখরবাবু দেখাইয়াছেন। খুঁজিলে আরও বহু পাওয়া যাইবে।

খাঁটি বিদেশী অথবা দেশজ শব্দের ব্যাপারে অবশ্য বানান সম্পর্কে কোন বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপ করার সপক্ষে কোন যুক্তি নাই। উচ্চারণগত মিলই সেখানে যথেষ্ট। আসল কথা এই যে, বর্তমান সময় বর্ণমালা সম্পর্কিত পরিবর্তনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সংস্কৃত ভাষার ভিত্তিতে গড়া বাঙলা ভাষার বানানের পক্ষে রাতারাতি বদলাইয়া নয়া ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। যাহা বদলাইবার তাহা আপনি বদলাইবে। বিদ্যাসাগরের 'করিবেক, খাইবেক'—এখন অচল। ঋ-কার অদৃশ্য। ৯-কার শুধু 'হাসিখুসী'-র পাতায় ডিগবাজীই খাইতেছে। বলা বাহুল্য তাহাতে কোন বিশেষ অসুবিধা না হইয়া সুবিধাই হইয়াছে। জোর করিয়া কোন কিছু করিতে গেলে তাহাতে অনর্থই ঘটিবে। এই আন্দোলন যদি সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির সময়ে হইত, তবে কোন গোলই হইত না। এখন আর গাছ উপড়াইয়া নূতন মাটিতে রোপণ করিলে গাছ বাঁচানো দায় হইবে। ইতি—বিনীত—দেবীপ্রসাদ বটব্যাল, আসাম।

২

মহাশয়,—পয়লা আষাঢ়ের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাঙলা বানানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি সকলে জানেন না বলে আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বহুদিনের অভ্যস্ত কোনো প্রথাকে পরিত্যাগ করা সহজসাধ্য নয়। কোনো কোনো অধ্যাপককে বলতে শুনেছি, পরীক্ষার্থীরা অধুনা উত্তরপত্রে বর্তমান, ঊর্ধ্ব ইত্যাদি ধরণের যে সমস্ত বানান লেখেন, তাঁদের কাছে তা সহজরূপে ধরা দেয় না। তার একমাত্র কারণ হোল 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগে প্রচলিত পুরোন বানান পদ্ধতির সঙ্গে আশৈশব সংযোগ। এই সমস্যার সমাধানকল্পে লেখকদের রচনায় ও পত্র-পত্রিকায় তো নতুন বানান অনুসৃত হওয়া উচিতই, আরও বেশি প্রয়োজন সেই সমস্ত পুস্তকের বানান সংস্কারের, যাদের মাধ্যমে ভাষার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের পরিচয়ের ভিত্তি গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যাপারে সম্যক অবহিত। 'সহজপাঠ' ও 'কিশলয়' সে কথার সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। নবপ্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এইদিকে আশু দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

ঙ ঞ ণ ন ম-এর পরিবর্তে ং ব্যবহারের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা সমর্থনযোগ্য। আনন্দবাজার, দেশ প্রভৃতি যেসব পত্রিকা বানানের সংস্কার মেনে নিয়েছেন, তাঁদেরই দায়িত্ব এর প্রচলন পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু করে ক্রমে জনসমাদৃত করে তোলবার।

একই ধরণের এবং যে সমস্ত উচ্চারণের বিধি বাঙলায় নেই এমন বিভিন্ন ধ্বনিবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক বর্ণের স্থানে একটা করে বর্ণ রাখার প্রস্তাব, ভাষাগত সংহতি লুপ্ত হবার আশঙ্কায় 'অনর্থকর' বলে বিবেচিত হয়েছে। কেননা, অর্থ ও ব্যাকরণের পার্থক্য থাকলেও সব ভাষাতেই খাঁটি সংস্কৃত শব্দে বানানের সাম্য বর্তমান। এই যুক্তি অন্যায় নয়। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, বাঙলায় অন্তস্থ ব-এর ব্যবহার নেই এবং য় নামে একটা নতুন বর্ণ দিয়ে সংস্কৃত য-এর উচ্চারণ বজায় থাকলেও বানানের একতা রক্ষিত হয়নি। তাছাড়া সংস্কৃত শব্দমালা সম্ভূত অসংখ্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন বানানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাঙলা ও হিন্দীর কয়েকটি এই ধরণের শব্দ উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে: শেখা—সিখনা, দশ—দস, ষোল—সোলহ, শোনা—সুননা, ভাই—ভাঈ। যদিও এই সমস্ত তর্কের জোরে বাঙলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের বানানের সংস্কার উপরোক্ত প্রস্তাব অনুসারে করা যায় না, তবু সংস্কৃতজ বা তদ্ভব, বিদেশী ও খাঁটি বাঙলা শব্দের বানানকে সহজ করে নিতে দোষ কি?

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে বানানগত সরলতা সম্পাদন করতে গেলে ঐক্য নষ্ট হওয়ার দরুণ যতটা না ক্ষতি হবে, তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্তিকর ও গোলমেলে হয়ে উঠবে অর্থের দিক থেকে। শারদা—সারদা, আহুতি—আহূতি, শম—সম, ভাষা—ভাসা, আশা—আসা ইত্যাদি সমোচ্চারিত সংস্কৃত ও বাঙলা শব্দ একথার প্রমাণ। এদের সংস্কারের স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি এই যে, একই বানান-বিশিষ্ট অথচ একাধিক অর্থযুক্ত বহু শব্দ বাঙলা ও সংস্কৃতে প্রচলিত আছে। থাকলেও, আরও কতকগুলো শব্দ সংযোজিত করা কি সমীচীন হবে? এর চেয়ে বাঙলায় বহুল প্রচলিত কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের বানান প্রয়োজন অনুযায়ী সহজ করে নেওয়া যেতে পারে।

মোটের ওপর ভাষাকে সরল ও সহজগ্রাহ্য করে তুলতে এখনও বানান সংস্কারের ও তার যথাযথ প্রচারের একান্ত আবশ্যক। বাঙলা ভাষা ব্যাকরণ প্রভৃতির ব্যাপারে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চেয়ে অনেক উদার। বানানঘটিত প্রশ্নে কি সে পশ্চাৎপদ থেকে যাবে? প্রসঙ্গত রাষ্ট্র ভাষায় স্বরবর্ণের লিপি সংস্কারের কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ঠিক অনুসরণ হিসেবে নয়, সকলের কাছে ভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আরও সহজলভ্য করে দেবার জন্যে এবং ভাষাকে উন্নততর রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সর্বপ্রকার জটিলতার জাল যথাসম্ভব অপসারিত করা উচিত। —রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, খিদিরপুর।

৩

মহাশয়,—বাঙলা বানান নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় অনেক রকম আলোচনাই হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট বানান-প্রণালীকে স্বীকার করে নিতে সকলেই বিশেষ আগ্রহান্বিত। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বানান প্রণালী সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। আমরা ঐ প্রণালী অনুসরণ করতে পারি।

এ সম্বন্ধে আমারও একটা প্রস্তাব আছে। বানানে পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে স্বীকার করে নিলে কেমন হয়? তাঁর বানান-পদ্ধতি সর্বাঙ্গসুন্দর, ব্যাকরণ শুদ্ধ, অনাবশ্যক আড়ম্বর ও বাহুল্য-বর্জিত, সরল ও সংক্ষিপ্ত। আজ দেশে সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাবীন্দ্রিক প্রভাব যে নবযুগ এনেছে, তা সর্বক্ষেত্রেই সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি বাঙলা বানানকে একটা সুনির্দিষ্ট সুসংগত রূপ যে দেবেই, একথা কেউই অস্বীকার করবে না। বাঙলা সাহিত্যের গুরু রবীন্দ্রনাথের বানান পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে কারো আপত্তি হবে বলেও আমার মনে হয় না। আমাদের সমস্ত লেখকরা ও পত্রিকা পরিচালকেরা বদ্ধপরিকর হয়ে রাবীন্দ্রিক বানানকে চালু করুন না! ক্ষতি বা অসুবিধা তো কিছুই দেখি না এতে!

সকল বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নিতে হলে রবীন্দ্রনাথেরই স্মরণ নেওয়া উচিত। বিনীত—অসিতকুমার চক্রবর্তী, চকুধরপুর।

বাঙালীর হিন্দী চর্চা

১

মহাশয়,—দেশ পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যায় শ্রীযুত রাজশেখর বসুর "বাঙালীর হিন্দী চর্চা" নামক প্রবন্ধটি পড়লুম। তিনি বাঙালীর হিন্দী শিক্ষা সম্বন্ধে যেসব যুক্তি

লিখেছেন তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। আজ যদি আমরা হিন্দীর প্রতি উদাসীনতা দেখাই তাহলেই ভবিষ্যৎ ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্র থেকে আমরা ক্রমশ পিছিয়ে যাব। কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে হিন্দী হবে যোগ্যতার অন্যতম মানদণ্ড। বাঙালী হিন্দী না জানলে সেখানে তার স্থান হবে না। অন্তত এসব ভেবে দেখে শিক্ষিত বাঙালীর হিন্দী শেখা কর্তব্য। হিন্দী ভাষার যে লাভের দিকটা বাঙালী লেখকদের ভেবে দেখতে শ্রীযুক্ত বসু অনুরোধ করেছেন সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বাঙালী লেখকরা হিন্দী শিখলেও যে হিন্দী ভাষায় গল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করতে পারবেন তা বলা যায় না। অনেক বাঙালী লেখকই তো ইংরেজী জানেন। কিন্তু ক'জন বাঙালী লেখক ইংরেজীতে তাঁদের গল্প লিখেছেন! যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ক'জনই বা কৃতকার্য হয়েছেন। স্বীকার করি বাঙলা গল্পের উৎকর্ষ বাঙালী লেখকদের স্বাভাবিক পটুতার জন্য। কিন্তু সেই স্বাভাবিক পটুতা মাতৃভাষাতে প্রকাশলাভের যতটুকু সুযোগ পায় অন্য ভাষায় তা পায় না। ইতি—শ্রীরবীন্দ্রকমল কর, কলিকাতা।

২

মহাশয়,—আপনাদের ৩৪শ সংখ্যার 'দেশে' বাঙালীর হিন্দী চর্চা বিষয়ে রাজশেখর বসু মহাশয় যা মতামত প্রকাশ করেছেন,—সেবিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমি একমত। এখনও অনেক বাঙালী দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা বিহার অঞ্চলে অনেক বছর থাকা সত্ত্বেও সামান্য হিন্দীতে কথা বলতেও শেখেননি; এর একমাত্র কারণ হল যে তাঁরা হিন্দীকে ভয় করে চলেন। আজকাল বিহারের বিদ্যালয়গুলোতে সব কিছু হিন্দীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাই এমনও অনেক দেখা গিয়েছে যে পিতামাতা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ীতে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন—হিন্দীর ভয়ে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে অচির ভবিষ্যতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবেই। তাই সময় থাকতে কি তা মেনে নিয়ে প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়। অনেকে বলেন যে, হিন্দী ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পেলে বাঙলা ভাষার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা—এ প্রশ্নও সম্পূর্ণ যুক্তিহীন; তাও প্রমাণ করেছেন বসু মহাশয়।

তাই সবশেষে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হিন্দী সকলেরই শেখা উচিত—যদি রাষ্ট্রভাষা নাও হয় তবুও একটা ভাষা শিখতে তো কোন দোষ নেই। —শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিহার।

"একটি রাজরোগ"

মহাশয়,—গত ৩২শ সংখ্যায় "একটি রাজরোগ" গল্পটিতে লেখক নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যক্ষ্মার ভয়াবহ ব্যাপকতা এবং প্রতিকার সমস্যা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আজকাল কলিকাতার প্রতি তৃতীয় ঘরে একজন করে যক্ষ্মাক্রান্তকে পাওয়া যাবে। এই ভয়াবহ ব্যাধির সংক্রামকতা থেকে কি করে সমাজকে বাঁচান যেতে পারে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা আপনাদের ন্যায় পত্রিকারই কর্তব্য। সকল রকম মাধ্যমেই যেমন—সাময়িক পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্র এবং রেডিওতে বহুল পরিমাণে প্রতিষেধক নিয়মগুলি প্রচারিত হওয়া উচিত। সংক্রামণের প্রধান উপাদান (chief source of infection) হচ্ছে রোগীর নিষ্ঠীবন এবং এটা একমাত্র আগুনে পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এর মধ্যেকার বীজাণু নষ্ট করা অসম্ভব। যত্রতত্র অথবা বাড়ি থেকে একটু দূরে ফেলে দিলেই এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, কারণ—থুথু শুকিয়ে গিয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে নিশ্বাসের সঙ্গে নাকে ঢুকতে পারে। দ্বিতীয় নিয়ম—হাঁচি এবং কাশির সময় মুখের সামনে কাগজ ধরা এবং সেটা পুড়িয়ে ফেলা। বিছানা, কাপড় জামা ইত্যাদিও সপ্তাহে অন্তত একদিনও ৮ ঘণ্টা উন্মুক্ত রৌদ্রে রেখে দিতে হয়। এই কটা নিয়ম রোগী এবং তাঁদের অভিভাবকেরা যদি মেনে চলেন, তাহলে অনেক পরিমাণে সংক্রামণের ব্যাপকতা কমে।

আমাদের দেশে যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং স্যানিটোরিয়াম এত কম যে ফ্রি বেড দূরের কথা পয়সা দিয়ে বেড পেতেও প্রায় এক বৎসর কেটে যায়। যদি না অবশ্য ধরা করার লোক থাকে। যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞ সাইমিয়েন বলেছেন, "But T. B. patients cannot afford to wait" আজকাল যক্ষ্মার চিকিৎসা খুব বেশী ব্যয়-বহুল নয় যাতে করে একে আর "রাজরোগ" বলা চলতে পারে। খোলা হাওয়ায় থাকাটা রোগী এবং তাঁদের পরিবারের অন্যান্যের বিশেষ প্রয়োজন। সেটা কলকাতা শহরে মোটেই সম্ভব নয়। এর ব্যবস্থা হিসেবে ১৮ই জুলাই ১৯৪৯ সালে আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু বাঙলার যক্ষ্মা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সম্মেলনে একটি বক্তৃতায় আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যে একটি ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। কলকাতার কাছে শহরতলির ফাঁকা জায়গায় এবং গ্রামে গিয়ে চালা ঘর বেঁধে বাস করা। এই বিষয় আমি তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলাম; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্যকরী কিছুই হল না, হল যা সেগুলো সব বড় বড় পরিকল্পনা।

এক সঙ্গে স্ট্রেপ্টমাইসিন ইনজেকসান, পি এ এস খাওয়া এবং সম্পূর্ণ শয্যা বিশ্রাম নিলে আজকাল ছয় মাসের মধ্যেই যে কোন রোগীই বেশ সুস্থ হয়ে ওঠেন। আমরা প্রত্যহ সাধারণত যা খেয়ে থাকি তার ওপর একটু দুধ এবং ছোলা ও বাদাম ভিজিয়ে খেলেই দৈহিক ওজন আপনা থেকেই বাড়তে থাকে। আমার ত মনে হয় যদি অন্য কোন উপসর্গ না আসে তাহলে ছমাসের মধ্যে ডাক্তার ডাকবারও প্রয়োজন হয় না। একটু সচল এবং কার্যক্ষম হলে নিকটস্থ টি বি ক্লিনিক থেকে এ পি অথবা পি পি যদি নেওয়া সম্ভব হয় তাহলেই পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা যায়। উপরিউক্ত কার্যগুলির সফলতা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানালাম। আশা করি এ বিষয় যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা একটু অবহিত হবেন। ইতি—অজিতলাল সেন, (ভূতপূর্ব যক্ষ্মারোগী)।

খেলা-ধুলায় প্রাদেশিকতা

মহাশয়,—২৯শ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার খেলা-ধুলা বিভাগে ফুটবল সম্বন্ধে আপনাদের মন্তব্যের প্রতিবাদে দিল্লী হইতে অমর্ত্যকুমার সেন মহাশয়ের যে পত্র আপনারা ৩১শ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তিনি লিখিয়াছেন—"কোলকাতায় প্রথম ডিভিশন লীগে যোগদানকারী দলের সংখ্যা কম নয়, আর তাতে প্রায় তিনশ' খেলোয়াড় নিয়মিত খেলবার সুযোগ পান। একথা মানতেই হবে এই সংখ্যার তুলনায় অবাঙালী (আমদানী) খেলোয়াড়ের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।" সেন মহাশয় যদি ১৫ বৎসর পূর্বেকার বঙ্গে অবাঙালী খেলোয়াড়দের তথ্য সন্ধান করেন, তবে দেখিবেন তাহাদের সংখ্যা 'অতি নগণ্য' ছিল। উপযুক্ত সতর্কতার অভাবে এই অতি নগণ্য সংখ্যাই এখন—১৫ বৎসর পরে—যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখনও যদি আমরা "ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার স্টাণ্ডার্ড উঁচু করিবার" মোহে বহিরাগতদিগকে 'কোল'দি তাহা হইলে হয়ত আরও ১৫ বৎসর পরে ইস্টবেঙ্গল মোহন-বাগান প্রভৃতি দলে বাঙালী খেলোয়াড় একজনও দেখা যাইবে না।

গত বৎসরও সন্তোষ ট্রফি (যাহা সম্পূর্ণ প্রাদেশিক ভিত্তিতে খেলা হয়) বাঙলা দল পাইয়াছে। কিন্তু বাঙলা দলে যে কয়েকজন অ-বাঙালী খেলোয়াড় ছিলেন তাঁহারা কি নিজ নিজ প্রাদেশিক দলে খেলিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না। অথবা নির্বাচক-মণ্ডলী এই কয়েকজন অ-বাঙালীর পরিবর্তে বাঙালী খেলোয়াড় পান নাই। ইহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে বাঙলায় আজ উপযুক্ত খেলোয়াড় নাই বলিয়াই প্রাদেশিক ভিত্তিতে খেলিতে হইলেও অ-বাঙালী না লইলে চলে না। "অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়দের বিতাড়িত করে নিজের প্রদেশের খেলোয়াড়দের আসনে বসান" আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বহিরাগত খেলোয়াড় মাত্রেই আমাদের আতঙ্কের কারণ নহেন। যাঁহারা স্থায়িভাবে বাঙলার ময়দানে খেলিতে আসেন বা বাঙালী খেলোয়াড়দের উন্নততর ক্রীড়া পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য যাঁহাদের আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়, তাঁহারা আমাদের সম্মানিত অতিথি। কিন্তু শুধু শীল্ড লীগ জয় করিবার উদ্দেশ্যে যাঁহাদের ভাড়া করিয়া আনিয়া বাঙালী খেলোয়াড়ের সুযোগ নষ্ট করা হয় এবং জয়লাভ সমাপ্ত হইলেই যাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশে ফিরিয়া যান, তাঁহাদের দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়?

—শিবদাস ভট্টাচার্য, ২৪-পরগণা।

[খেলাধুলায় প্রাদেশিকতা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র আর প্রকাশিত হইবে না। —সঃ দেঃ]

সঙ্গীত শিক্ষার আসর

শ্রীযুক্ত পঙ্কজবাবু সঙ্গীতশিক্ষার আসরের শুরুতেই "নাদ" বিষয়ে একটি সংস্কৃত মন্ত্র যে গেয়ে থাকেন সে কথা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। পূর্বে "নাদ" মন্ত্রে এতখানি আগ্রহ তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি। তিনি এরকমের কোন মন্ত্র গাইতেন না। কিছু দিন থেকে ঐ মন্ত্রটিতে তিনি কেন আকৃষ্ট হলেন তা আমরা বলতে পারবো না।

প্রাচীন যুগে মন্ত্রের সাহায্যে জগতেব কতকগুলি মূল সত্যকে জ্ঞানীরা নিজেদের অন্তরের মধ্যে নিবিড়ভাবে অনুভব করবার চেষ্টা করতেন। মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত একাগ্রতাই সেই সত্যের দিকে মানুষকে চালিত করতো। ক্রমে মন্ত্রের প্রতি অগাধ ও নিবিড় বিশ্বাস জন্মাত। তার উদারণ এযুগে আমরা ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে পাই। একজন উপনিষদের মন্ত্রের সাহায্যে জগতের চিরন্তন সত্যকে নিবিড়ভাবে পেতে চেয়েছেন ও জীবনকে সেই পথে চালাবার চেষ্টা করে-ছেন, অপরজন গীতার বাণী বা মন্ত্রকে নিজের জীবনে সত্য করে ফোটাতে জীবনপাত করে গেলেন। এই রকমে যাঁরা মন্ত্রে বিশ্বাস রাখেন তাঁদের ভিতর দিয়ে মন্ত্রগুলির একটা জীবন্তরূপ আমরা দেখতে পাই।

আর একদল মন্ত্র ব্যবসায়ী আছেন, যারা মন্ত্র পাঠ করেন অর্থ উপার্জনের আশায়। তাঁদের জীবনের সঙ্গে মন্ত্রের কোন যোগ থাকে না। এরা মন্ত্রকে পোষাকী জিনিসের মত ব্যবহার করেন বলে জনসাধারণ মনে করে তা কেবল পুরুতঠাকুরদেরই জন্যে। মনে করে তাদের জীবনে ওর কোন প্রয়োজন নেই। তাই তারা নির্বিকার চিত্তে পুরুত-ঠাকুরকে দিয়ে পাঠ করিয়ে মন্ত্রের দায় শেষ করে।

শ্রীযুক্ত পঙ্কজবাবুর "নাদ" মন্ত্র-গীত যেন ঐরূপ পোষাকী ব্যাপার না হয়। "নাদ" মন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীনেরা জগতের যে সত্যকে প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন তিনি যদি সত্যি তাতে বিশ্বাসী হন, নিজের জীবনে সেই সত্যের অনুভূতিকে মন্ত্রের দ্বারা পেতে চান, তবে নিজের জীবনকে সেই বিশ্বাসের উপর আগে সার্থক করে তুলুন। শিক্ষার আসরে সাধারণ পুরুতদের মত অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ মন্ত্রটি যেন ব্যবহার না করেন। তিনি যদি মনে করেন যে, তিনি নিজে এই মন্ত্রে বিশ্বাসী নন, কেবল শিক্ষার্থীদের ভালোর জন্যে তা আওড়াচ্ছেন, তাহলেও বলব শিক্ষাক্ষেত্রে এ মনোভাব আদর্শস্থানীয় নয়। প্রদীপ আপনি নিজে জ্বলে তবে অন্যকে জ্বালায়। সুতরাং শ্রীযুক্ত পঙ্কজবাবু "নাদ" মন্ত্রে নিজের জীবনকে আগে আলোকিত করে তবে অন্যকে আলোকিত করতে চেষ্টা করুন। এই সব মন্ত্র প্রাচীনযুগে যাঁরা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন তাঁরা মন্ত্রের ঐ বাণীকে জীবন দিয়ে অনুভব করবার জন্যে প্রাণপাত ক'রে গেছেন। তাঁরা কেবল অন্যের কথা ভেবে এগুলি রচনা করেন নি। নিজেরা সত্য বলে জেনে তবেই সকলের জন্যে রেখে যেতে পেরেছিলেন। তাই শ্রীযুক্ত পঙ্কজবাবুকে বলি যে, নিজের জীবনে যতক্ষণ না ঐ মন্ত্রকে সত্য বলে জেনেছেন ততক্ষণ সাধারণ পুরুতঠাকুরের মত "মন্ত্র" গান ত্যাগ করাই ভাল।

এখানে সাধারণ শিক্ষার কথা তুলে অনেকে হয়তো প্রতিবাদ করে বলবেন যে, বিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে যে সব শিক্ষক শিক্ষা দেন তারা কি সকলেই সেই সব বিষয়ে নিজেদের উদ্বোধিত করতে পেরেছেন? অঙ্কের মাস্টার কি অঙ্কের দুরূহ তত্ত্বের আনন্দে নিজেকে আনন্দিত করতে পেরেছেন? সাহিত্যের শিক্ষক কি সবাই সত্যকার সাহিত্যরসিক? আমাদের উত্তর হল সকলেই যে তা হয় না সে কথা অবশ্যই স্বীকার করি; কিন্তু তাই বলে শিক্ষা ও শিক্ষকের আদর্শ কি হওয়া উচিত সে দিকে আমাদের দেশের চিন্তাশীলরা কি কখনো চিন্তা করেন নি? আদর্শ শিক্ষা ও শিক্ষক আমাদের দেশে নেই বলেই ত ভারতের প্রচলিত শিক্ষার প্রতিবাদ হিসেবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, মহাত্মা গান্ধী করলেন নঈ-তালিমি শিক্ষার প্রবর্তন। সেই রকম বেতারের গান শিক্ষার আসরের আদর্শ পথ কি হবে আমরা সেই চিন্তা করবার চেষ্টা করছি।

আমাদের মনে হয় বেতারের অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা তাদের নামটা বেতার মারফৎ শ্রীযুক্ত পঙ্কজবাবু সকলকে যাতে শোনান এই আশায় নানারূপ অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে পত্র পাঠায়। অনেকবার মনে হয়েছে যে এই রকম সামান্য বিষয় নিয়ে যারা চিঠি লেখে তাদের চিঠির কোন উত্তর না দেওয়াই ভাল। নির্বিচারে সব চিঠিকে গ্রহণ করাও ঠিক নয়। একমাত্র বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীর ভাল প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত। তাও নাম উল্লেখ না করে। মনে করি উত্তরের সময় নাম উল্লেখ না করলে অনেক আজে-বাজে চিঠির হাত থেকে তিনি নিস্কৃতি পাবেন এবং সময়ও নষ্ট হবে না।

শ্রীযুক্ত পঙ্কজবাবু সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ও প্রচারিত, গগন হরকরার রচিত "আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষেরে" গানটি শেখাচ্ছেন। এইরূপ বাউল গান শিখিয়ে তিনি অবশ্যই ভাল কাজ করেছেন, এছাড়া তিনি রবীন্দ্রসংগীতও শেখান। কিন্তু তাঁর অন্যান্য গানের নির্বাচন আমাদের ভাল লাগে নি। আমরা অনুমান করি তার সেই সব গানের বেশির ভাগের কথা রচনা করেছেন একজনে, সুর জুড়েছেন পঙ্কজবাবু নিজে। হিন্দী ভজন গুলির সুরও পঙ্কজবাবুর দেওয়া বলেই আমাদের ধারণা। কিছুদিন আগে দুখানি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতায় সুর যোজনা করে শিখিয়ে ছিলেন, তার একটির সুর তাঁর নিজের দেওয়া অপরটি অন্যের। সুর-যোজক হিসেবে বেতার ও সিনেমা মারফৎ তিনি জনসাধারণের কাছে পরিচিত হলেও, তাঁর সেই ক্ষমতার সঠিক বিচারের সময় এখনো আসে নি। ভবিষ্যতই তার আসল বিচারক। যাঁরা এর মধ্যেই গীতকার হিসেবে কালের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন গান শেখানোর সময় পঙ্কজবাবু তাদের উপরেই বেশি নির্ভর করবেন এটাই আমরা আশা করি। নিজের প্রতি দুর্বলতা মানুষের থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব যখন নিয়েছেন তখন এসবের ঊর্ধ্বে তাঁকে ওঠবার চেষ্টা করতেই হবে। তিনি রামপ্রসাদী, নিধুবাবু থেকে শুরু করে বাঙলার নানারূপ টপ্পা, কীর্তন, পল্লীর গান, বাঙলাভাষার ধ্রুপদ খ্যাল গান, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ, রজনী সেন, নজরুল ইসলামের স্বদেশী, ধর্ম, হাসির ও অন্যান্য লিরিক গান নির্বাচন করে শিক্ষার্থীদের শেখালে বাঙলা সংগীতের প্রকৃত শিক্ষা বাঙালী পাবে। এ ছাড়া এযুগের আরো যে কয়জন গান রচনা করে দেশে কিছুটা প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাঁদেরও কিছু শেখানো উচিত হবে। এর মধ্যে দু একটি নিজের যোজিত সুরের গান রাখলে বলবার কিছু থাকে না। বিশেষ করে অজ্ঞাত ও অখ্যাত কবিদের দুর্বল কথায় সুর দিয়ে তিনি যে গান শেখান সে আরো আপত্তিজনক।

কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে হিন্দী ভজন শেখানোর কোন অর্থ হয় না। হিন্দী ভাষীদের জন্যে সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতে মিলে অনেকগুলি বেতার কেন্দ্র আছে সেখান থেকে সেই ভাষায় গান শেখানো হয়। যদি শিখতেই হয় তবে বাঙালীদের উচিত সেই সব কেন্দ্রের সাহায্যে হিন্দী ভজন শেখা। পঙ্কজবাবু-কৃত সুরের হিন্দী ভজন শেখানোর কোন দিক থেকে কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যদি রাগরাগিণীর খাতিরে হিন্দী গান শিখতে হয়, তবে উচ্চাঙ্গের গান শেখানোই ভাল, তাতে নানা দিক থেকে বাঙলার সংগীত উপকৃত হবে।
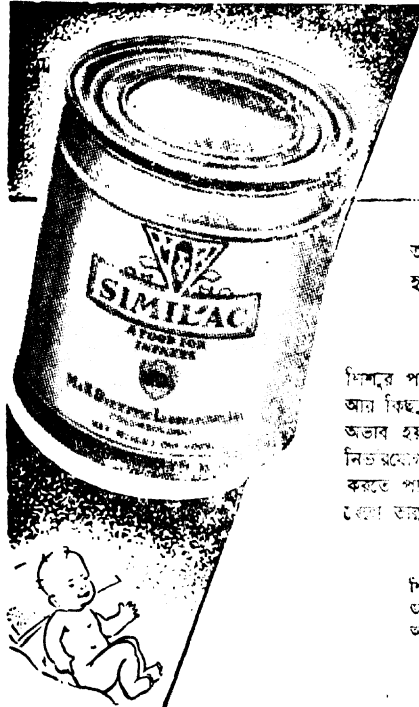
স্থাবর—বনফুল। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃঃ ৪৯০। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

বনফুল ভূরিলেখক। এই কারণেই রচনার উপকরণ সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক ও প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা অনেক, সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে 'জঙ্গম' হয়তো বৃহত্তম গ্রন্থ। জঙ্গম রচনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থাবর রচনার আকাঙ্ক্ষা হয়তো তাঁহার মনে উদিত হয়। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি যে অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সুখ্যাতি করিতে হয়। মানব জাতির ইতিহাস তাঁহাকে মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করিতে হইয়াছে।

বর্তমান কালে মানবজাতি যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইহাই তাহার শেষ সীমা হয়তো নয়, হয়তো আরও ভাঙ্গাগড়ার পর নূতনতর অন্যবিধ সমাজ গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা হইতেছে ভবিষ্যতের কথা। স্থাবরের আলোচ্য খণ্ডটি ইহার প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডে আধুনিক সমাজ পর্যন্ত আলোচিত হয় নাই। আলোচিত হইয়াছে অতীতের সমাজ লইয়া। প্রকৃতপক্ষে স্থাবর উপন্যাস নহে, উপন্যাসের গড়নে লেখা ইতিহাস মাত্র। লেখক মানবজাতির পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া মনের পটে যে প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই সাহিত্যিক ভাষায় ও ঔপন্যাসিক ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মানবজাতির আদি অবশ্যই ছিল, সে যুগ অরণ্যযুগ অথবা বর্বর কি না, তাহা জানা যায় না। অজানা অন্ধকারে তাহা লীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অতীত মন্থন করিয়া সেই ইতিহাসের যতদূর পর্যন্ত জানা গিয়াছে, সেইখান হইতেই স্থাবরের আখ্যান আরম্ভ। মানুষের মধ্যে তখন পশুতার প্রাধান্যই ছিল, তাহার আচার-আচরণ ছিল পাশবিক, মাথা আর মুখ ভরতি দীর্ঘ কেশ, এমন কি ভ্রূও ঝাঁকড়া চুলের দ্বারা বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছিল। বাহ্যিকভাবে দেখিতে গেলে সে জীবকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু তার মনের নিভৃতে মনুষ্যত্ব যে লুক্কায়িত ছিল লেখক তাহা দক্ষতার সহিত ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। ইকা নামক যে নারী-চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার প্রতি এই গ্রন্থের বক্তার যে স্নেহের আকর্ষণ ঘটিল, তাহাই হয়তো বর্বর যুগের মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের শুভ উদ্বোধন। এই আকাঙ্ক্ষা ও এই আকর্ষণ ঘটিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে হিংস্রতাই বেশি। ক্রমশঃ স্থাপিত হইল গৃহ, মানুষ গৃহস্থ হইল। নূতন সমাজের পত্তন ঘটিল, চর্মাবরণ ও কাষ্ঠ-পাদুকা প্রচলিত হইল—সে সমাজ হইল বরফের সমাজ, বরফ কাটিয়া পৃথিবীতে ক্রমে শ্যাম শোভা আসিল, মানুষ গোপালন শুরু করিল, অবশেষে গরুর প্রতি হিংসার পরিবর্তে স্নেহের সঞ্চার হইতে লাগিল। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল।

সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে আরও কত-শত জীবের মধ্যে মানুষও ছিল অন্যতম জীব; কিন্তু কি করিয়া সে সে সকল জীব হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া লইতে পারিল? ইহার কারণ, মানুষ-রূপ এই জীবটির মনের নিভৃতে ছিল স্নেহ পদার্থ। যে ইকাকে লইয়া প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ঘর বাঁধিয়াছে, ক্ষুধার তাড়নায় সেই গৃহিনীকেই সে আহার করিয়াছে, কিন্তু শেষে জর্মনির কাছে আসিয়া তাহার হার হইল, সে দেখিল ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যুগে যুগে এই জর্মনির মায়াজালে তাহাকে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। মানুষের মনের যুগ-যুগান্তব্যাপী এই প্রেমই তাহাকে যে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করিতে পারিয়াছে, ইহাই স্থাবরের প্রতিপাদ্য বিষয়।

স্থাবর সুললিত গ্রন্থ, সাবলীল ভাষায় ইহার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তবু স্বীকার করিতে হয় যে, উপন্যাস হিসাবে বইটি তেমন জমে নাই। লেখকও সেকথা উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, 'স্থান কাল পাত্রের যে সীমাবদ্ধতা সাধারণ উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ করে, এক্ষেত্রে তাহা নাই।' 'দেশ' পত্রিকায় গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবার সময়ই আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু রসোত্তীর্ণতাই এখানে বড় কথা নহে, কেননা, লেখক এক সুবৃহৎ পট-ভূমিকার উপর এক বৃহৎ চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রয়াসটিই এখানে বড় করিয়া দেখা আবশ্যক।

বলিয়াছি, ইহা স্থাবরের প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডে লেখক আধুনিক মানবসমাজ পর্যন্ত কাহিনী বিবৃত করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। আদি মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক মানুষ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতার সঙ্গে তাহা হইলে পরিচিত হওয়া যাইবে।

১১৩।৫১

স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম—শ্রীবিধুভূষণ জানা প্রণীত। কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা। পৃঃ ২২৪, মূল্য তিন টাকা।

ব্যায়াম দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায় বটে, কিন্তু সে ব্যায়ামের নিয়ম জানা আবশ্যক। আর, কেবল শারীরিক কসরতের দ্বারাও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয় না। এই কারণে শারীরিক কসরৎ ও ব্যায়ামকে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। লেখক অভিজ্ঞ ব্যায়ামী, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিজে শরীর-চর্চা করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহা তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও, তিনি অন্যান্য স্বনামধন্য ব্যায়ামবীরের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছেন তাহাও এই গ্রন্থে গ্রথিত করা হইয়াছে। শরীর-চর্চার সহিত অন্যান্য যেসব বিষয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, সেসব

বিষয় সম্বন্ধেও লেখক আলোচনা করিয়াছেন। যথা, খাদ্যের পুষ্টিমূল্য, পোষাক, বাসস্থান, জলবায়ু, সূর্যালোক, নিদ্রা ইত্যাদি।

বইটি যদি বাঙলার যুবকদের মধ্যে প্রচলিত হয় তাহা হইলে তাহারা স্বাস্থ্য-চর্চার নির্দেশ-লাভে সমর্থ হইবে। বইটি ভালো, কিন্তু একটা জিনিস আমাদের বিসদৃশ ঠেকিল, লেখকের আট বৎসর বয়সের ছবি, ২৩ বৎসর বয়সের ছবি, বর্তমান বয়সের ছবি দ্বারা বইটিকে সাজাইবার দরকার কি ছিল? ও সকল চিত্রের মধ্যে শরীর-চর্চা বিষয়ে জ্ঞাতব্য তো কিছু নাই। ১১৫।৫১

ধামহাগিতি—নিখিলচন্দ্র সাহা। দস্তপুলিয়া ইউনিয়ন একাডেমি, পোঃ দস্তপুলিয়া, জিলা নদীয়া। পৃ ১৬, মূল্যের উল্লেখ নাই।

বইটির মলাটে লেখা আছে—বাঙলা টাইপ ভাষার বহি। ভূমিকায় লেখক লিখিতেছেন—এই কাব্যগ্রন্থখানি রচনা করিলাম। বলা বাহুল্য, বইটির নামও আমরা পড়িতে পারি নাই, কাব্যের একটি ছত্রও বুঝিতে পারি নাই। বাঙলা হরফ সংস্কার করিতে গিয়া হরফ সংহার করা হইয়াছে, বলা চলে। ১২৮।৫১

অরুণ বহ্নি—শ্রীমতী শান্তি দাশ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৷৷০।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা ভারতীয় নারী-বিপ্লবীদের অন্যতম। সম্ভবত লেখিকা ও তাঁহার সহযাত্রিনী সুনীতি দেবীই সর্ব-প্রথম অগ্নি নালিকার মুখে অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বিপ্লবী জীবনে নারীর অংশ গ্রহণ তখন যেমন প্রশংসা তেমনি নিন্দার ঢেউ তুলিয়া ছিল, কিন্তু ইঁহাদের আত্মদান বিফলে যায় নাই। নিন্দা প্রশংসার বাধ ভাঙিয়া আরও অনেক বিপ্লবিনী ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই রোমাঞ্চকর ইতিহাস আজিও উদ্ঘাটিত হয় নাই। পরিপূর্ণভাবে কোন দিন তাহা হইবে কিনা জানি না। কিন্তু যেখানে যেভাবে যতটুকু হইয়াছে তাহাই আজিকার দিনে একান্ত প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

'অরুণ-বহ্নি' বিপ্লব যুগের পরিপূর্ণ ইতিহাস নহে। ইহা পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীও নহে। যে নারী একদিন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহা তাঁহারই জীবনের অংশ-বিশেষের চিত্র-রূপায়ণ। এই চিত্রে আতিশয্য নাই, আত্ম-প্রচারের চেষ্টা নাই, চমক লাগাইবার দুর্বুদ্ধি নাই। ইহাই এই রূপায়ণের সৌন্দর্য।

আলোচ্য পুস্তকে লেখিকা তাঁহার বিপ্লবী জীবনের শুরু হইতে 'নবযুগের অগ্রপথিক দলের সঙ্গে' পথ চলার ঘোষণা পর্যন্ত একটানা আপন কাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বিপ্লবীদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে যে শিল্পী-মন তাহারই প্রেরণায় অপূর্ব ভঙ্গিমায় লেখিকা তাঁহার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি ইহাতে আতিশয্য নাই, নাই আত্মপ্রচারের চেষ্টা আর নাই অপরকে খাটো করিবার অপচেষ্টা। বিপ্লবী জীবনের এ মানস চিত্রা-ভাবনা, আনন্দ ও হর্ষকে তিনি সহজভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, জেল জীবনের দীর্ঘ-অভিজ্ঞতাকে মনোরমভাবে রূপায়িত করিয়াছেন, এবং চলার পথে তিনি যাঁহাদের পাইয়াছেন বা যাঁহাদের দেখিয়াছেন নিপুণ শিল্পীর মত একটি মাত্র আঁচড় টানিয়া তাঁহাদিগকে প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষার সংযম, প্রকাশের সংযম আর চিন্তার সংযম—এই তিনের যোগাযোগ পরিদৃষ্ট হয় সমগ্র পুস্তকে। অনেক কিছু প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াও তিনি সেই সুযোগের অপব্যবহার করেন নাই, কাহাকেও খাটো করিতে অথবা কাহাকেও ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বড় করিবারও প্রয়াস পান নাই। তাই 'অরুণ-বহ্নি' এত সুখপাঠ্য এবং সুন্দর হইয়াছে। বিপ্লবী জীবনের এমন সহজ সুন্দর ও স্বচ্ছ বর্ণনা সচরাচর চোখে পড়ে না। আশা করি বইটি বহুল পঠিত পুস্তকের মর্যাদা লাভ করিবে।

প্রচ্ছদপট ভাবার্থব্যঞ্জক। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। ১৩৯।৫১

প্রিয়তমের চিঠি—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, তিন টাকা।

এগারটি ছোট গল্পসমষ্টি। গল্পগুলি লেখকের ব্যক্তিগত রুচি এবং রসোপলব্ধির পরিচায়ক। লেখক নবীন হইলেও ছোট গল্প লিখিবার বিশেষ পদ্ধতিটি তিনি ইতিমধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। পাঠক-সমাজে গল্প-গুলির আদর হইবে আশা করা যায়। ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট চমৎকার। ১৩৮।৫১

স্বাধীনা—ব্রজজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক, রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সালকিয়া, হাওড়া। তিন টাকা।

নিবেদনে লেখকে বলেছেন, যাঁরা অনুদার রক্ষণশীল তাঁদের জন্যে এ বই নয়। পক্ষান্তরে যাঁদের চিন্তাধারা অনাবিল এবং বন্ধনমুক্ত তাঁদের জন্যে এ বই। এ বই-এর পাঠক-সাধারণের চিন্তাধারা কিরূপ হবে সমালোচকদের পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয়, কিন্তু গ্রন্থকারের চিন্তা যে বল্গাহীন এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। যা-নয় তা'কে এক করে অসঙ্কোচে কিছু লেখা যদি উপন্যাস হয়, তা হ'লে এ-ও উপন্যাস। তবে লেখকের ক্ষমতা আছে, নানা অসম্ভব ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত একটি 'স্বাধীনা' চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। ছাপা এবং প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। ১৩৬।৫১

আমি ছিলাম—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সেনগুপ্ত ট্রাস্ট, পি ৯৩, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা, তিন টাকা।

আত্মসচেতন কোন প্রাচীনের চোখে নবীনের রূপ পরিগ্রহ সংশয়ের, অপহৃত শক্তির সম্মুখে শক্তির উজ্জীবন বোধ হয় বেদনাদায়ক। তাই নবীনের উদ্ধতদৃপ্ত কার্যকলাপের নব নব প্রকাশে প্রাচীন চিত্তে ফুরিয়ে-যাওয়ার, শেষ-হওয়ার দীর্ঘনিঃশ্বাস, 'কি-ছিলাম, কি-হলামের' মর্মন্তুদ আক্ষেপ! নবীন-প্রাচীনের এই মানসিক দ্বন্দ্বটুকু শক্তিমান, যশস্বী কথা-শিল্পী সার্থকতার সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসে ঘটনা-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করেছেন। নাতি-ঠাকুর্দার দ্বন্দ্ব যখন শেষ হ'লো, তখন দেখা গেল, নাতির জয়ে, কীর্তিকলাপে ঠাকুর্দার অন্তর ভরে উঠেছে—নবীনের নিকট আত্মসমর্পণ করে নয়, নবীনকে স্বাগতম করে বৃদ্ধ আপন সার্থকতার আনন্দে ভরপুর। বার্ধক্যে বৃক্ষ ফলহীন হ'লেও আমরণ ছায়া দানের অধিকার তার কেউ কেড়ে নেবে না—এই-ই আত্মতৃপ্তি বুড়ো হ'য়েও বেঁচে থাকার। উপন্যাসটি লেখকের আর একটি সার্থক সৃষ্টি। পরিশেষে একটা কথা আমাদের বলবার আছে, সমগ্রভাবে উপন্যাসটি রসোত্তীর্ণ হ'লেও, যে একটি বিশেষ রাজনীতিক মতবাদের কাছে বৃদ্ধের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটলো, তা ঘাতপ্রতিঘাতে, আঘাত-সংঘাতে প্রতীত হয়ে ওঠেনি। মতবাদের এই ঘোলাটে অংশটুকু বাদ দিলেই যেন ভাল হ'তো। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, তবে অতিরিক্ত জ্যাকেট-টুকু অবিলম্বে অপসারণ করাই বাঞ্ছনীয়; ওতে পুস্তকের মর্যাদা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে বলে আমাদের ধারণা। ১৩৩।৫১

কমা ও সেমিকোলন—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। পি কে বসু এন্ড কোং, কলিকাতা—৩১। মূল্য আড়াই টাকা।

কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি, ইতিপূর্বে গল্পগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আধুনিক গল্পলিখিয়েদের মধ্যে গজেন্দ্রকুমার অন্যতম। আলোচ্য গল্পগুলিতে গজেন্দ্রবাবুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। বিশেষ করিয়া 'আদিম' গল্পটি তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। আর আর গল্পগুলিতে তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তঃদৃষ্টি, রসবোধ এবং বাস্তববোধ পুরামাত্রায় পরিস্ফুট, পুস্তকখানি পাঠকসমাজে আদৃত হইবে। অঙ্গসজ্জা চমৎকার। ১১৬।৫১

প্রত্যাবর্তন (এম পি প্রডাকসন্স—ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিও)—কাহিনী ঃ সলীল সেনগুপ্ত; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ সুকুমার দাশগুপ্ত; আলোকচিত্র ঃ বিজয় ঘোষ; শব্দযোজনা ঃ সুনীল ঘোষ; শিল্পনির্দেশ ঃ তারক বসু, সুধীর খান; ভূমিকায় ঃ অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, বিজয় বসু, চন্দ্রশেখর, মাস্টার বিভু, মাস্টার সুখেন্দু, দেবযানী, করবী গুপ্তা, রেণুকা রায়, পদ্মা, সুষমা মিত্র, রেখা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ডিলুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনে ৩০শে জুন উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলায় মুক্তিলাভ ক'রেছে।

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের 'সেতু' চিত্রে যমুনা সিংহ

ছোটদের ব্যগ্র ঔৎসুক্য মেটাবার জন্যে অনেক সময়ে বাপ-মাকে নিজেদের অনেক কাজের কৈফিয়ৎ দিতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাপ-মা সত্যকে চেপে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এই বৃত্তিটাকে লোকে অন্যায় মনে করে না। ছোটবেলায় বাপ-মার কাছ থেকে শেখা এই ভাঁওতা উত্তরকালে ছেলেমেয়েদের চরিত্রে যে প্রতিক্রিয়া এনে দেয় 'প্রত্যাবর্তন'এর কাহিনীর সেইটেই হ'চ্ছে মূলকথা।

বাপ-মার ওপর থেকে বিশ্বাস চলে গেলে ছোটরা ক্রমশই বেপরোয়া হয়ে পড়ে আর তার সেই বেপরোয়ানা তাকে যে কতখানি সাংঘাতিক ক'রে তুলতে পারে এই গল্পটা হ'চ্ছে সেইরকম একটি চরিত্র শঙ্করকে নিয়ে। গল্পের আরম্ভ শঙ্করের শৈশবকাল

রঙ্গজগৎ

থেকে। পাশের বাড়ির ক্ষেতুর সঙ্গে একটা বিড়ালকে কেন্দ্র করে দুজনের ঝগড়া। ওদের দুজনের ঝগড়ার জের গিয়ে পৌঁছলো মায়ে-মায়ে এবং বাপে-বাপে ঝগড়ার মধ্যে। পরে দেখা গেলো ক্ষেতু তার বিড়ালটা শঙ্করকে উপহার দিয়েছে—ওদের বাপ-মায়েদেরও কলহ থামলো। শঙ্কর বিড়ালের জন্যে তার বাবা সুদর্শনকে বিস্কুট আনতে বলে। সুদর্শন বিস্কুট আনতে ভুলে গিয়ে শঙ্করকে জানালেন যে দোকান বন্ধ। ক্ষেতু তার বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি ক'রে শঙ্করকে সঙ্গে ক'রে দোকানে গিয়ে বিস্কুট কিনে দেখিয়ে দিলে যে শঙ্করের বাবা মিথ্যে কথা বলেছে। শঙ্করের অভিমান হ'লো। মাকে সাজতে দেখে শঙ্কর জানতে চায় কোথায় যাবেন। মা জানান যে তারা বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাবেন। ক্ষেতু এসে বলে মিথ্যে কথা এবং শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ার থিয়েটার আসরে হাজির করে। শঙ্কর তার বাপমাকেও সেখানে দেখতে পায়। শঙ্করের মা হাসপাতালে যায় প্রসবের জন্য। সেখানে তার মৃত্যু হয়। সুদর্শন ফিরে এসে শঙ্করকে জানায় যে তার মা বোনটিকে নিয়ে দুচার দিন পরেই ফিরবে। ক্ষেতু এসে বলে মিথ্যে কথা, তার মা মারা গিয়েছে। শঙ্কর ছোটে হাসপাতালে খবর নিয়ে আসতে; বাপের মিথ্যে কথা ধরা পড়ে। ছবিতে এরপর শঙ্কর অলক্ষ্যে থাকছে এবং নানাজনের কথাবার্তা এবং সুদর্শনের কাছে নানালোকের নালিশ থেকে জানা যায় যে, শঙ্কর রীতিমতো একজন মিথ্যুক হ'য়ে উঠেছে; শঠতা ও প্রবঞ্চনায়ও সে বেশ দুরস্ত হ'য়ে উঠেছে। তার সাক্ষাৎ যখন পাওয়া গেলো, তখন সে পাকা দুর্বৃত্ত হ'য়ে উঠেছে। মায়ের গহনা বিক্রীর জন্যে সুদর্শন তাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলেন। শঙ্কর শুনিয়ে দিলে যে তার এই দুর্বৃত্তপনার জন্য সুদর্শনই দায়ী, ছেলে বয়েস থেকে তার কাছ থেকে মিথ্যে শুনে শুনেই সে আজ দুর্বৃত্ত হ'য়ে উঠেছে।

বাড়ি ছাড়বার পর শঙ্করকে ট্রেনে করে এক গ্রাম্য স্টেশনে পৌঁছতে দেখা গেলো। বেরিয়ে আসতেই এক তরুণী তাকে স্বপনদা ব'লে সম্বোধন ক'রে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলো। কিছু পরেই এলো এক টেলিগ্রাম। তরুণী সুরমা বুঝলে যে ব্যক্তিকে সে স্বপন বলে বাড়িতে এনেছে সে স্বপনের মতো হুবহু দেখতে হ'লেও স্বপন নয় এবং তার আসল স্বপনদা মোটরে আসছে বলে খবর পাঠিয়েছে। সুরমা শঙ্করকে প্রবঞ্চক আখ্যাত করে তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে সঙ্গে করে সদর পর্যন্ত এসে দাঁড়াতেই স্বপনও এসে পৌঁছলো। নিজের চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে স্বপন বিস্মিত হ'লো এবং শঙ্করকে যেতে না দিয়ে বাড়িতে আশ্রয় দান করলে। ইতিমধ্যে জানা গেলো যে স্বপন জমিদার, সুরমা তারই আশ্রয়ে পালিতা, সে বিলেত যাবে এবং ফিরে এসে রায় কোম্পানির মালিক মিঃ রায়ের পৌত্রী মনীষাকে সে বিয়ে করবে। শঙ্করকে স্বপন

তার অনুপস্থিতিতে জমিদারী এবং সুরমাকে দেখাশোনা করার ভার দিলে। বিলেতের পথে স্বপন শংকরকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এলো। স্বপনকে স্টেশন থেকে অন্যত্র যেতে হয়; শংকর একা এসে স্বপনের বাড়িতে উঠলো। স্বপনের চাকরও শংকরকে স্বপন বলেই ধরে নিলে। শংকর আর স্বপনের আকৃতিক পার্থক্য এই যে, শংকরের গোঁফ আছে, স্বপনের নেই। স্বপনের অনুপস্থিতির সুযোগে শংকর মনীষার বাড়িতে পার্টিতে যোগদান করলে নিজেকে স্বপন ব'লেই চালিয়ে দিয়ে।

স্বপন বিলেতে চলে গেলো। শংকর তাকে নিযুক্ত ক'রে স্বপনের লেখা চিঠি মনীষা বা সুরমার হাতে না পড়ার ব্যবস্থা করলে এবং স্বপনকে পাঠাবার নাম করে জমিদারী থেকে টাকা আত্মসাৎ ক'রে স্বপনের সবকিছু নিজেই দখল করে নিলো। ইতিপূর্বে সুদর্শনবাবু শংকরের ছেলেবেলার প্রতিবেশী ক্ষেতুকে চাকরী দিয়েছিলেন নিজের অফিসে কিন্তু ক্ষেতু দশ হাজার টাকা চুরি করে উধাও হয়। শংকর তাকে ধরে ফেলে এবং দুজনে বখরাদারীতে কোম্পানির ব্যবসা খোলে। তিন বছর পর স্বপন বিলেত থেকে ফিরে আসতেই শংকর তাকে পাগল প্রতিপন্ন করিয়ে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয় এবং নিজেকে স্বপন পরিচয় দিয়ে মনীষাকে বিয়ে করে। সুরমাকে সে স্বপনের দেশের বাড়ি থেকে এনে ক্ষেতুর তত্ত্বাবধানে লুকিয়ে রাখে। এরপর ক্ষেতুর সঙ্গে বখরা নিয়ে গোলমাল বাধে; ক্ষেতু প্রতিশোধ নেবার ফাঁক খুঁজতে থাকে। এই সময় স্বপন পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে আসে এবং ক্ষেতুর সহায়তায় সুরমাকে উদ্ধার করে। শেষে সুরমা সুদর্শনবাবুর কাছে শংকরের দুর্বৃত্তপনার কথা জানিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করলে। সুদর্শনবাবু শংকরকে পুলিসে ধরিয়ে দিলেন।

নতুন ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি তৈরীর বাহাদুরী সুকুমার দাশগুপ্তকে পরিচালনায় খ্যাতি এনে দিয়েছে 'প্রত্যাবর্তন' তার উপযুক্তই হয়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও ব'লে নিতে হবে যে ছবিতে গল্পকে বাস্তবের সোজা রাস্তায় টেনে নিয়ে যাবার যে সরল স্ফূর্তি তার আগের ছবিতে পাওয়া গিয়েছে এ ছবিতে তা নেই। এখানে গল্পটা [illegible] রীতিমত [illegible] দেখিয়েছেন এবং তার নটকীয় ধারাকেও বেশ অবিন্যস্তই ক'রে ফেলেছেন।

বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওজনে ঘটনাগুলো হ'য়েছে হাল্কা এবং একপেশে। শংকর বাপ-মার কাছ থেকে মিছে কথা শুনছে কিন্তু সেটা ওর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে লাগলো, ধাপে ধাপে কিভাবে সুকুমারমতি সরল একটি ছেলের মধ্যে পরিবর্তন এলো সেইটেই হওয়া উচিত ছিলো এই বিষয়-বস্তুর নাট্যসম্ভার। এখানে সেইটারই ঘটেছে অভাব, এখানে পরিণতিটা নিয়েই ঘটনা গড়া হয়েছে—একেবারে শৈশব থেকে পরে শংকরকে দেখা যায় পাকা দুর্বৃত্তরূপে মাঝের সব ধাপ ফাঁকা। তার ওপর শংকরকে নিজেকে দিয়েই বারবার ক'রে নিজের পরিণতির জন্যে ছেলেবয়সে শোনা বাপমার মিথ্যে কথাই দায়ী বলে বেড়ানোটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছবির প্রথম অর্ধেক, অর্থাৎ শংকরের ছেলেবয়েস পর্যন্ত গল্প এক ধরণের, পরের অর্ধেক হ'য়ে পড়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একটা নিছক ক্রাইম-ড্রামা। দুই অংশের

যোগসূত্রটা অত্যন্ত ফিনফিনে। গোড়ার অংশে যে ঘরোয়া আবেদন দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয়েছিলো পরে তাকে পরিহার করে যাওয়া হয়েছে। তাই পরের অংশটা কেমন যেনো এলোপাতাড়ি ব্যাপার মনে হয়। শঙ্কর ও স্বপনকে হুবহু এক-রকমই দেখতে—কিন্তু তার পিছনে একটা যুক্তি দাঁড় করাবার জন্যে বংশপরিচয়ের অবতারণা বা দুজনের মধ্যে একটা পরিচয়-চিহ্ন দাঁড় করাবার জন্যে শঙ্করের গোঁফ—এরকমভাবে অনেক কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে শেষার্ধের প্রায় পুরো পুরোই।

অভিনয়ে সুদর্শনের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর কথাই সবচেয়ে আগে উল্লেখ করতে হয়। সুদর্শন সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি, অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং সরল প্রকৃতির। কিন্তু তবুও ছেলেকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে তাকে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে। এই চারিত্রিক বৈষম্য সুদর্শন চরিত্রটিকে নাটকীয় করে তুলেছে। এর পরই শিশু অবস্থার শঙ্করের ভূমিকায় মাস্টার বিভু সহজেই দর্শকমন দখল করে নেয়। শঙ্কর ও স্বপনের দ্বৈত ভূমিকায় অসিতবরণ গোড়ার দিকে চরিত্র দুটির বৈপরিত্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হ'লেও শেষের দিকে একাকার ক'রে ফেলেছেন। মনীষা ও সুরমার ভূমিকায় যথাক্রমে দেবযানী ও করবী গুপ্তা দুইজনেই অভিনীত চরিত্রের ওপরে তেমন ব্যক্তিত্ব আরোপ ক'রতে পারেন নি।

স্টুডিও সংবাদ

পি এস্ এস্ প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন 'দিগন্তের ডাক' রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এতে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, চন্দ্রাবতী, রেণুকা, নিভাননী, কুন্তলা, জীবন গাঙ্গুলী বিমান, প্রমোদ, পার্বতী, রেণু, অমূল্য সান্যাল প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পিগণ।

এর কাহিনী রচনা করেছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসুমথনাথ ঘোষ। পরিচালনা করেছেন শ্রীবেনু দাস এবং সুরযোজনা করেছেন শ্রীখগেন দাশগুপ্ত।

"লাইট অফ এশিয়া"

বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক সমর্থিত মধ্য কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্য-সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'কৃষ্টিকা সংস্কৃতি পরিষদের ভগবান বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে গঠিত নৃত্য-নাট্য 'লাইট অফ এশিয়া' আগামী ১৫ই জুলাই রবিবার সাড়ে ন'টার সময় রক্সি সিনেমা হলে, মাননীয় ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু মহোদয়ের প্রধান আতিথ্যে এবং জাস্টিস কে সি চন্দ মহাশয়ের সভাপতিত্বে মঞ্চস্থ হবে।

মূল কাহিনী স্যার ম্যাথুস আর্নল্ড 'লাইট অফ্ এশিয়া'র অনুবাদ করেছেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। সম্পূর্ণ নতুন টেকনিকে নৃত্য-নাট্য রচনা করেছেন মণি গাঙ্গুলী। গান রচনা করেছেন চলচ্চিত্রখ্যাত চারু মুখার্জি এবং মণি গাঙ্গুলী। সংগীত পরিচালনা ক'রেছেন নলিনাক্ষ দত্ত। আবহ সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন চলচ্চিত্রখ্যাত পঞ্চানন মিত্র।

সম্পূর্ণ নাট্যটির সূত্ররক্ষা করবেন রেডিও ও মঞ্চখ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

নৃত্য পরিকল্পনায়—দক্ষিণ ভারতীয়খ্যাত নৃত্যশিল্পী গোপাল পিল্লাই ও সঙ্গে অনাথবন্ধু, অমরেন্দ্র কুমার এবং কুলভূষণ। নৃত্যাংশেও এরা যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দেবেন। এছাড়া, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থাকবে জয়শ্রী, পুতুল, মঞ্জু শিপ্রা, কণিনা, গীতা, মুকুল, সংযুক্তা, চম্পা, গৌরী, ছন্দা, কুমকুম্, দেবদাস নুপুর কুমার, শ্রীবিভাস, প্রঃ ব্যাণ্ডো এবং প্রায় শতাধিক উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রী।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা এবং পরিচালনা করেছেন ভুবনেশ্বর ব্যাণ্ডো।

রামায়ণ মুদ্রাভিনয়

ইন্দিরা দেবী প্রযোজিত প্রবর্তিত, অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ও 'নন্দন' অভিনীত কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রানাটক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে এদেশের সুধী ও সমালোচকবর্গের অকুণ্ঠ সম্বর্ধনা লাভ করেছিল। নন্দনের কিশোর শিল্পীরা এই সম্বর্ধনায় সাহসী হয়ে আগামী ৮ই জুলাই রবিবার সকাল দশটায় রামায়ণ মুদ্রানাটক অভিনয়ের আয়োজন করেছেন নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। প্রাক্ বিস্মৃত মহাকাব্যকে রূপে রসে সঙ্গীতে ও ভাবাভিনয়ে মূর্ত করে তোলার এটি এক অভিনব প্রচেষ্টা।

ব্যাডমিণ্টন

আন্তর্জাতিক টমাস কাপ প্রতিযোগিতার প্রশান্ত মহাসাগর আঞ্চলিক বা প্যাসিফিক জোনের প্রথম খেলায় ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন দল শোচনীয়ভাবে ৯—০ গেমে তাইল্যাণ্ড দলকে পরাজিত করিয়া উক্ত আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার সহিত আগামী ৩১শে অক্টোবর অস্ট্রেলিয়াতে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। ভারতীয় দলের এই সাফল্য সংগত হইলেও উল্লাস করিবার কোনই কারণ হয় নাই। তাইল্যাণ্ডের খেলোয়াড়গণ এইবার সর্ব-প্রথম টমাস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে টমাস কাপ প্রতিযোগিতা প্রথম প্রবর্তন করা হইলেও তাইল্যাণ্ডের অভ্যন্তরীণ অন্তর্কলহ খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ-ভাবে খেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতে ইহারাও মালয়ের ন্যায় ব্যাড-মিণ্টন খেলায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবেন তাহার কিছুটা নিদর্শন এই প্রতিযোগিতায় দিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইঁহারা সিঙ্গলস খেলায় সুবিধা করিতে না পারিলেও ডাবলসে ভারতীয় দলকে রীতিমত বিপর্যস্ত করেন। এইজনাই ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের পরিচালকদের ডাবলস খেলার জন্য নূতন খেলোয়াড় সন্ধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কোন কোন খেলোয়াড় অসন্তুষ্ট

টমাস কাপের প্রথম খেলার শেষে নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর এক সভা হয়। ঐ সভায় অধিকাংশ সভ্য মত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় দল আরও শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টা করা উচিত। ঐ প্রচেষ্টা হিসাবে তাঁহারা বাঙ্গলাকে পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া খেলোয়াড় বাছাই করিবার সুযোগ দান করিতে নির্দেশ দেন। ঐ প্রতি-যোগিতা জুলাই মাসের শেষে কলিকাতায় ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে ও বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে সভায় আরও স্থির হয় যে, পশ্চিম ভারতেও টমাস কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় যে সকল খেলোয়াড় উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাদের কথা স্মরণ রাখিয়াই খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী কার্য করিবেন। এই সিদ্ধান্তে বাঙ্গলা, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীর কয়েকজন খেলোয়াড় নাকি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং কলিকাতার অনুষ্ঠানে না যোগ-দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সংবাদ কতখানি সত্য তাহা বলা কঠিন তবে যদি কিছুটা সত্য থাকে তাহা হইলে উক্ত খেলোয়াড়-দের আচরণ আমরা কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারি না। যেহেতু একবার টমাস কাপের জন্য ভারতীয় দল গঠিত হইয়াছে সেইহেতু পরবর্তী খেলার জন্য কোন ট্রায়াল হইতে পারে না এবং হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির অভাব আছে বলিয়া আমরা মনে করি। কে বলিতে পারে পরবর্তী ট্রায়ালে এমন সকল খেলোয়াড়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে না যাঁহারা ভারতীয় দলে স্থান পাইতে পারেন? এই প্রসঙ্গে আমরা বাঙ্গলার একজন খেলোয়াড়ের নাম করিতে পারি যাঁহাকে ভারতীয় দলে লওয়া খুবই উচিত ছিল। তিনি পশ্চিম ভারত ব্যাডমিণ্টন খেলায় যোগদান করিবার সুযোগ পান নাই নতুবা তাঁহাকে কোন-রূপেই ভারতীয় দল হইতে বাদ দেওয়া চলে না। খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিসংগত হইয়াছে এবং ইহার ফলেই তাঁহারা বহু খেলোয়াড় ও ব্যাডমিণ্টন উৎসাহীর আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন। যদি এইরূপ ট্রায়াল খেলার ব্যবস্থা না করিতেন তাহা হইলে ইহাদের অনেকেই ভাল চক্ষে দেখিতেন না। যে খেলার সহিত জাতির মান সম্মান জড়িত সেই খেলার দল নির্বাচন পক্ষপাতশূন্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ট্রায়াল খেলার জন্য আমন্ত্রিত

পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন বা বিশেষ ট্রায়াল খেলায় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণকে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেও খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী উদ্যোক্তাদের নির্দেশ দিয়াছেন। দেবীন্দর মোহন, হেনরী ফেরেরা, ত্রিলোকনাথ শেঠ, অমৃতলাল দেওয়ান (দিল্লী), মনোজ গুহ, গজানন হেমাড়ী, বালা উল্লাল, ডি জি মাগুয়ে, কেশব দত্ত (বাঙ্গলা), বি এস তাপাদিয়া (মধ্য-প্রদেশ), এন কে নাটেকার ও এইচ গুহ (বাঙ্গলা) অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলিবার জন্য যে ভারতীয় দল গঠিত হইবে তাহা উক্ত খেলোয়াড়দের মধ্য হইতেই হইবে বলিলে কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না।

তাইল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের কলিকাতায় খেলিবার ব্যবস্থা

তাইল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন দলের খেলোয়াড়গণের দুই দিন কলিকাতার প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিবার ব্যবস্থা করায় অনেকেই বলিতেছেন—"ইহা করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।" কিন্তু ইহা আমরা সমর্থন করিতে পারি না। বৈদেশিক দল হিসাবে ইহাদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিয়া বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়ে-শনের পরিচালকগণ খুবই ভাল করিয়াছেন। কোন খেলাধুলা প্রতিষ্ঠানেরই খেলার ফলাফলটা মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সামাজিক রীতিনীতির সহিত ইহার নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকা উচিত। যদি না থাকে তবে বলিব ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া কোন জাতীয় উন্নতিকর কার্যের সমাধান হইতে পারে না।

ফটবল

কলিকাতা ফুটবল খেলার অচল অবস্থার অবসান হইয়া পুনরায় নিয়মিতভাবে খেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইলে সকলেই ধারণা করিলেন ভবিষ্যতে আর কোন গণ্ডগোল বা অপ্রত্যাশিত কারণ খেলা পণ্ড করিবে না। মাত্র একদিন অতিবাহিত না হইতেই তাঁহাদের আর বিস্ময়ের কারণ রহিল না। মোহনবাগান ও মহমেডান দলের খেলা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে প্রথমার্ধে শেষ হইয়া দ্বিতীয়ার্ধের কিছুক্ষণ পরেই বন্ধ হইয়া গেল। রেফারী মাঠে রহিলেন, মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়গণও মাঠে রহিলেন কেবল মাঠে রহিলেন না মহমেডান দলের খেলোয়াড়গণ। রেফারী ১০ মিনিট মাঠে দাঁড়াইয়া রহিলেন পরে খেলা বন্ধের নির্দেশ দিয়া মাঠ ত্যাগ করিলেন। মহমেডান দলের মাঠ ত্যাগের স্বপক্ষে দলের অধিনায়ক বিবৃতি প্রদান করিলে জানা গেল দর্শকগণের মধ্য হইতে মাঠের মধ্যে ঢিল, পাটকেল, জতা প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াই তিনি দলবল লইয়া মাঠ ত্যাগ করিয়াছেন। বহু অনুরোধ-উপ-রোধের পর মাঠে যখন প্রবেশ করিলেন তখন রেফারীই খেলা পরিচালনা করিতে অস্বীকার করিলেন। রেফারী না পরিচালনা করায় যুক্তি হিসাবে বলিলেন যে, এখন আর খেলা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চালান সম্ভব হইত না অন্ধকার হইয়া পড়িত। দর্শকগণের জন্য কোন দল মাঠ ত্যাগ করিয়াছে ইতিপূর্বে এই ধরণের নজীর কখনও দেখা যায় নাই। সুতরাং এই খেলা সম্পর্কে আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলী কি সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ দিবেন বলা কঠিন। খেলা যে অপ্রত্যাশিত কারণে পরিত্যক্ত হইল ইহাই সকলকে আশ্চর্য করিয়াছে। কারণে-অকারণে বিভিন্ন দলের পরিচালকগণ ও অধিনায়কগণ এইভাবে খেলা পণ্ড করিতে কেন সাহসী হইতেছে এই প্রশ্নই বর্তমানে সকল ক্রীড়া-মোদীকে চঞ্চল করিয়াছে। ইহার সদুত্তর দান করা যে একেবারেই অসম্ভব তাহা নহে, তবে আমাদের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হয় না। এই সকলের মূল কারণ কি তাহা ইতিপূর্বে আমরা বহুবার বহু প্রবন্ধের মধ্য দিয়া উল্লেখ করিয়াছি। আমরা ঐ সকলে একরূপ স্পষ্টই বলিয়াছি "বর্তমানের পরিচালকমণ্ডলীর আমূল পরিবর্তন ছাড়া কোনদিন চূড়ান্তভাবে সকল গণ্ডগোল অবসান হইতে পারে না।" এখনও আমরা ঐ উক্তি সমর্থন করি। অনেকে বলিবেন "অসম্ভব" কিন্তু আমরা বলিব "সরকার" সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিলে ইহা কখনও অসম্ভব নহে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিশিষ্ট মন্ত্রী পরি-চালকমণ্ডলীতে আছেন তিনি কেন করিতেছেন না এই প্রশ্ন হয়তো বা কেহ করিতে পারেন? ঐ প্রশ্নের উত্তর আমাদের নিকট না করিয়া ঐ মন্ত্রী মহোদয়কে করিলে বোধ হয় ভাল হয়।

দেশী সংবাদ

২৫শে জুন—গত কয়েকদিন যাবৎ পূর্ববঙ্গ হইতে নূতন উদ্বাস্তু আগমনের সংখ্যাধিক্য হেতু শিয়ালদহ স্টেশনে দুই হাজারেরও অধিক উদ্বাস্তু নরনারী ও শিশুর ভীড় জমিয়া গিয়াছে। অপরদিকে হাওড়া স্টেশনে বিহার ও উড়িষ্যা প্রত্যাগত ২২৭৮ জন উদ্বাস্তু নরনারী পড়িয়া আছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, গত ২৩শে জুন জম্মু সীমান্তে পাকিস্থানীগণ কর্তৃক দুইজন গোর্খা সৈন্য নিহত হইয়াছে। ভারত সরকার এই ঘটনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।

রবীন্দ্র সংগীতের সুরধুনী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে অদ্য জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অভিনন্দিত করা হয়।

২৬শে জুন—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সপ্তাহকাল বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অদ্য দিল্লী হইতে বিমানযোগে শ্রীনগরে উপনীত হন।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালাবেঙ্কট রাও ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালোরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আসন্ন অধিবেশনে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার আলোচিত ও চূড়ান্ত রূপ প্রাপ্ত হইবে। তিনি ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সমস্যা অবশ্যই স্থানলাভ করিবে।

অদ্য শিয়ালদহ স্টেশন হইতে আড়াই শত উদ্বাস্তু পরিবারের প্রায় এক হাজার লোককে একখানি স্পেশ্যাল ট্রেণযোগে রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে পাঠান হইয়াছে।

২৭শে জুন—কাশ্মীর সরকার ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে ডাঃ গ্রাহামের সহিত বিস্তারিত আলোচনা করা ঠিক হইবে না।

ভারতে পাকিস্থানের চাউল প্রেরণ লইয়া যে বিরোধ দেখা দিয়াছিল, তৎসম্পর্কে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। অদ্য করাচীতে ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের এই সম্পর্কে এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

২৮শে জুন—রাণাঘাট স্টেশনের নিকট বহু-সংখ্যক উদ্বাস্তু নরনারী গতকল্য প্রত্যূষ হইতে রেল লাইনের উপর অবস্থান ধর্মঘট করে। ইহার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কলিকাতা-রাণাঘাট এবং রাণাঘাট-বনগাঁ শাখার একটানা রেল চলাচল ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

ভারতের যে সকল বড় বড় রাজ্যে রেশন ব্যবস্থা বলবৎ আছে, উহাদের সবগুলিতেই ছাটাই খাদ্য রেশন বরাদ্দ পুনর্বহাল করা হইয়াছে কিংবা শীঘ্রই পুনর্বহাল হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশ রাজ্য সরকার এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নিকট অতিরিক্ত খাদ্যশস্য চাহিয়াছেন।

২৯শে জুন—রাষ্ট্রপুঞ্জের কাশ্মীর মধ্যস্থ ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম অদ্য সদলবলে করাচীতে পৌঁছিয়াছেন।

অদ্য রাত্রে রাণাঘাট স্টেশনের নিকট রেল লাইনের উপর উদ্বাস্তুদের অবস্থান ধর্মঘটের অবসান ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানাইয়াছেন যে, আগামী ২রা জুলাই হইতে পূর্ণ রেশনিং এলাকায় প্রাপ্তবয়স্ক তণ্ডুলভোজীদের চাউলের মূল বরাদ্দ সপ্তাহে মাথাপিছু ১ সের ৫ ছটাক হইতে হ্রাস করিয়া ১ সের করা হইবে। কিন্তু তাঁহাদের গমের মূল বরাদ্দ সপ্তাহে মাথাপিছু ১১ ছটাক হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১ সের করা হইবে।

৩০শে জুন—অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ এবং আই এস-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। আই এ পরীক্ষায় শতকরা ২৬·৫জন এবং আই এস-সি পরীক্ষায় শতকরা ৩২·৬জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ২৬তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসে উহার সভাপতি-রূপে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি শিক্ষা ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি সংস্কার সাধনের জন্য শিক্ষকগণের নিকট গঠনমূলক প্রস্তাব করিবার আবেদন জানান।

১লা জুলাই—শ্রীনগরে এক বেতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের রাজ্যমন্ত্রী শ্রী এন গোপাল-স্বামী আয়েঙ্গার পাকিস্থানকে সতর্ক করিয়া দৃঢ়ভাবে বলেন যে, ক্রমান্বয়ে যুদ্ধবিরতি সীমা লঙ্ঘনের যে-সব ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ-রূপে বন্ধ করার জন্য পাকিস্থান যদি অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন না করে, তাহা হইলে তাহাকে গুরুতর পরিণতির সম্মুখীন হইতে হইবে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গের বন-মহোৎসব মাসের প্রারম্ভ দিবসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু রাজ্যপাল ভবন ও টালা পার্কে বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৫শে জুন—পারস্যের তিনজন সদস্য লইয়া গঠিত তৈল কমিটি অদ্য ইঙ্গ-ইরাণীয়ান তৈল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এরিক ড্রেকের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন।

অদ্য কোরিয়ার মধ্য ও পূর্ব রণাঙ্গনে রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনা কম্যুনিস্ট বাহিনীর সহিত প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। মধ্য রণাঙ্গনে রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনা একটি গুরুত্বপূর্ণ টিলা হইতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

২৬শে জুন—বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ হার্বার্ট মরিসন অদ্য ঘোষণা করেন যে, ইরাণী তৈল সংকটের কেন্দ্রস্থল আবাদানের নিকটে অবিলম্বে বৃটিশ ক্রুজার মরিসাসকে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে।

ইঙ্গ-ইরাণী অয়েল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এরিক ড্রেক অদ্য ইরাকের বসরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

২৭শে জুন—পারস্য সরকার ইঙ্গ-ইরাণী অয়েল কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারিগণকে ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানীতে নিযুক্ত রাখার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সর্বসম্মতিক্রমে উহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

বসরার সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ ক্রুজার মরিসাস পারস্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী শাত-এল-আরব নদী পারি দিয়া বৃহত্তম তৈল খনি কেন্দ্র আবাদানের নিকটবর্তী এলাকায় উপস্থিত হইয়াছে।

২৮শে জুন—ইঙ্গ-ইরাণী অয়েল কোম্পানী অদ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আবাদানের বিরাট তৈল শোধনাগারটি ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

২৯শে জুন—ওয়াশিংটন হইতে সরকারী ভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সর্বাধিনায়ক জেনারেল রিজওয়েকে কম্যুনিস্টদের সহিত যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

৩০শে জুন—গতকল্য থাইল্যাণ্ডে একদল সশস্ত্র নৌ-সৈন্য বন্দুক দেখাইয়া থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মার্শাল পিবুল সংগ্রামকে অপহরণ করে। ইহার পর অদ্য ব্যাঙ্ককে থাইল্যাণ্ডের স্থলসৈন্য ও নৌ-সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকে। শ্যামের নৌবাহিনীর রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, 'মুক্তিফৌজ' একটি নূতন গভর্নমেণ্ট গঠন করিয়াছে।

১লা জুলাই—পিকিং রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনারা রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে। উত্তর কোরিয়ান চীনা স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল রিজওয়ের নিকট এক যৌথ বার্তা প্রেরণ করিয়া আগামী ১০ই জুলাই হইতে ১৫ই জুলায়ের মধ্যে ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখায় অবস্থিত কায়েসং নামক স্থানে যুদ্ধবিরতি বৈঠকে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

থাইল্যাণ্ড সরকারের উচ্ছেদসাধনকল্পে যে নৌ-বিদ্রোহ হইয়াছিল, কার্যতঃ তাহার অবসান ঘটিয়াছে। থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মার্শাল পিবুল সংগ্রামকে বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাসিক—১০৲
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

অষ্টাদশ বর্ষ] শনিবার, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 14th July, 1951. [৩৭শ সংখ্যা

কংগ্রেস ও নির্বাচন

গত ১০ই জুলাই হইতে বাঙ্গালোরে কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বাঙ্গালোরের এই অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন দলসমূহের মধ্যে ঐক্য-সাধন করিয়া সেগুলিকে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছিল; অন্তত-পক্ষে সেই উদ্দেশ্য সাধনই হইবে বাঙ্গালোর অধিবেশনের প্রধান লক্ষ্য, ইহাই অনেকে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার দেখিয়া বোধ হইতেছে, অধিবেশনের এই প্রধান লক্ষ্য এখন অনেকটা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুত আচার্য কৃপালনীর কৃষক-প্রজা-মজদুর দলের সঙ্গে কংগ্রেসের বর্তমান কর্তৃপক্ষের মতের যে মিল ঘটিবে, এমন সম্ভাবনা কিছুই দেখা যাইতেছে না, সোসিয়ালিস্ট দলের সঙ্গে মিলনও সুদূরপরাহত। হিন্দু সভা, কিংবা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত নূতন দলের সঙ্গে কংগ্রেসের ঐক্য সংসাধিত হইবার কোন সম্ভাবনা তো নাই-ই। কারণ সেখানে মৌলিক আদর্শেরই বিশেষ রকমে পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং ঐক্য-প্রচেষ্টা ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হইবে, ইহা পূর্ব হইতেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের সভাপতির ব্যক্তিগত মত বা অভিরুচি যাহাই থাকুক না কেন, বাঙ্গালোরের অধিবেশনে

কংগ্রেসের নীতি-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কর্তৃত্বই সুদৃঢ়ীকৃত হইবে এবং এক্ষেত্রে এতাবৎকাল অনুসৃত নীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বাঙ্গালোরের অধিবেশনের নির্ধারিত কংগ্রেস-নির্বাচন-ইস্তাহারও পণ্ডিত নেহরুর পরিকল্পনা অনুযায়ীই হইবে। বলা বাহুল্য, নির্বাচন-ইস্তাহারে কংগ্রেসের আদর্শ সাধনের জন্য কর্মনীতি প্রক্রিয়াপদ্ধতির নির্দেশের মূলে পণ্ডিত জওহরলাল কর্তৃক সম্প্রতি নির্দেশিত যুক্তি-বুদ্ধি যতই থাকুক না কেন, দেশের লোকের মনে তাহা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে সেই নীতির যাঁহারা নিয়ামক, যাঁহারা নেতা এবং যাঁহারা কর্মী, তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রভাবই বিভিন্ন প্রদেশের নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনসাধারণের মনের উপর হয়ত বেশি রকমে কাজ করিবে। এমন দিন অবশ্য ছিল, যখন কংগ্রেসের নামে সবই কাটিয়া যাইত এবং ব্যক্তি-বিচারের কোন প্রশ্নই সেখানে উঠিত না। ফলত কংগ্রেসের তখন সমষ্টি-গত একটা প্রাণবান্ সত্তা ভারতের রাজ-নীতিক ক্ষেত্রে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিত। কংগ্রেসের আদর্শে উদ্দীপ্ত স্বাধীনতালাভের জন্য প্রেরণা এবং জন-স্বার্থের চেতনা ব্যক্তি-বিচারকে তৎকালে বৃহতের সাধনায় উদার এবং সম্প্রসারিত করিয়া তুলিয়া-ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর হইতে বিশেষভাবে ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তি-জীবনের বিরাট এবং বিশাল প্রভাব অপসৃত হইবার পর কংগ্রেস সেই পূর্বতন প্রাণশক্তি হইতে অনেকখানি বঞ্চিত হইয়াছে। বাস্তবিক-পক্ষে কংগ্রেসের কর্মতৎপরতা জাতির প্রাণধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পদ, মান, প্রতিষ্ঠার জন্য পিপাসার বাহ্য-ব্যাপারে আটকাইয়া পড়িয়াছে। বস্তুত কংগ্রেসের নির্বাচন সম্পর্কিত নীতির ভাষাগত বিন্যাস-কৌশলে এই যে ত্রুটি, ইহা পরিপূরিত হইবে না এবং কংগ্রেসের নৈতিক আদর্শে প্রাণশক্তি পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার উপরই এই অবস্থার প্রতিকার অনেকখানি নির্ভর করে। ফলত অতীতের দোহাই দিয়া কাজ চলিবার দিন আর নাই। জাতির দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে বাস্তব নীতি প্রয়োগের জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে এবং সেজন্য আন্তরিকতা দেখাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের বর্তমান কর্ণধারগণ এই কর্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। লাভখোর, মজুত-দার দিগকে তাঁহারা দলন করিতে পারেন নাই। সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের নীতি দ্বিধাগ্রস্তভাবে পরিচালিত হইয়াছে।

গতানুগতিক ধারা ধরিয়া নির্বিবাদে শাসন-নীতি পরিচালনা করার দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্যটা অতিরিক্ত রকমে বেশী এবং বড় রকমের পরিবর্তন এবং সংস্কার সাধনের ঝুঁকি লইতে শাসক এবং পদাধিকারী কংগ্রেস-নেতৃবর্গ সর্বদা সঙ্কুচিত। দেশের লোকে ইহাই বুঝিয়া লইয়াছে। কিন্তু দেশের লোক পরিবর্তন চায়। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া জাতির প্রাণশক্তি যখন উন্মুক্ত আকাশে নিঃশ্বাস লইবার মত অবসর লাভ করে, তখন নূতনকে বরণ করিয়া লইবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা তাহার ভিতর সাড়া দিয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। এই কয়েক বৎসরে কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতি জাতির প্রাণশক্তির সেই স্বাভাবিক পথ উন্মুক্ত করিতে পারে নাই। স্বাধীনতালব্ধ জাতির স্ফুরণোন্মুখ সক্রিয় শক্তিকে কংগ্রেস নেতৃবর্গ জাতীয় স্বার্থ-সাধনে প্রযুক্ত করিতে পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্যার গলদ এইখানেই থাকিয়া যাইতেছে। ঘুমন্ত রাজকন্যা জাগিয়া উঠে নাই। পাষাণ-পুরীর শয্যাতলে সে মূর্চ্ছাপন্ন অবস্থায় আজও শায়িত রহিয়াছে। ইহাকে সোনারকাঠির স্পর্শ কে দিবে, দেশ আজ তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। কংগ্রেসের আদর্শের প্রকৃত সার্থকতা ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী না হইলে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিবে, অরাজকতা ঘটিবে, এ সব কথাই আমরা একান্ত বাহ্য বলিয়া মনে করি। ফলত নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়লাভও খুব একটা বড় কথা নয়। জাতির রাষ্ট্রনীতি যদি বৃহতের স্বার্থসাধনার নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয় এবং সেই পথে তাহাকে আত্মগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, তবে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবেই। শুধু ফাঁকা কথায় প্রাণধর্মকে বঞ্চনা করা চলে না।

রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির খতিয়ান

বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আলোচনার সুবিধা করিবার উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেস কর্তৃক চার বৎসর শাসনকার্য পরিচালনা করিবার পর ভারত কোথায় এবং কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার একটা হিসাবনিকাশ মোটামুটি-ভাবে দিয়াছেন। পণ্ডিতজীর বিবৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় অবতীর্ণ হইতে আমরা চাহি না এবং সে সুযোগও আমাদের নাই। এ সম্পর্কে শুধু মোটামুটিভাবে কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমত, এই বিবৃতি জাতির অন্তরে কোনই নূতন আগ্রহ জাগাইতে পারে নাই। ইহা অনেকটা প্রাণহীন; অধিকন্তু এই বিবৃতির ঐতিহাসিক অংশ একান্তই অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেগুলি সকলেই জানে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর জনগণের আর্থিক দুর্গতি কিছুই কমে নাই, বরং অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, পণ্ডিতজী একথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারও অভিমত এই যে, অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপ অনেক শ্রেণী, বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর পড়িয়াছে এবং এই কারণে দেশে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই অসন্তোষের সম্বন্ধে বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর সরকারী দায়িত্ব পণ্ডিতজী একেবারে এড়াইতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, এই অসন্তোষের ভাব বৃদ্ধির জন্য নানা কারণ উপস্থিত করা যাইতে পারে; আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং সমাজ-বিরোধীদের উপর দোষারোপ করাও অসম্ভব নয়; কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দায়িত্ব অবশ্যই সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, "নানা প্রকার অসুবিধা এবং লক্ষ লক্ষ লোকের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানের কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কিছু সাফল্য-লাভ করিলেও একথা ঠিক যে, দেশের মূল অর্থনৈতিক সমস্যার সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করা যায় নাই।" ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই প্রসঙ্গের আলোচনায় সমস্যার গোড়া কোথায়, তাহাও দেখাইয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই যে, জাতির প্রতি আমাদের যথোচিত আনুগত্যবোধ এখনও জাগ্রত হয় নাই এবং সম্ভবত অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর জাতির সব বিপদ কাটিয়া গিয়াছে এবং নিজে নিজের সঙ্কীর্ণ এবং গোষ্ঠীগত স্বা সিদ্ধ করিবার এই অবসর। পণ্ডিতজী এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত এমন একটা প্রবৃত্তি যে দেশে মধ্যে জাগিয়াছে, ইহা অনেকে অবশ্য স্বীকার করিবেন। কিন এই প্রবৃত্তি রাষ্ট্র-নীতি ও শাসন ব্যবস্থাকে কতটা প্রভাবিত করিতেছে এব তাহাকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে ইহাই হইতেছে প্রধান প্রশ্ন। প্রকৃতপক্ষে সেদিকটাও দোষমুক্ত নয়। দেশে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন শাসন-নীতি কার্যত সাবেকী আমল তন্ত্রের ধারা ধরিয়াই চলিতেছে। ভারতে প্রধান মন্ত্রী একথা অস্বীকার করি পারেন নাই। তাঁহারও অভিমত এই পুরাতন কাঠামোর উপরই দেশের কা এখনও পরিচালিত হইতেছে। ইহা নাকি অসুবিধার চেয়ে সুবিধা বে আছে। আপাত দৃষ্টিতে অবশ্য তাহা মনে হইতে পারে; কিন্তু এই নীতি মনস্তাত্ত্বিক গতির পরিণতি মারাত্মক পণ্ডিতজী নিজেও সে দোষ-ত্রু বুঝিতেছেন না, এমন নহে। তিনি বলিয়াছেন যে, এই শাসন-নীতি পরাধীনতার আবহাওয়ার মধ্যে পরিবর্ধি হইয়াছে এবং তজ্জনিত সংস্কার ইহা সঙ্গে জড়িত আছে। আম কিন্তু এ নীতির এই ত্রুটি দিকটাই বড় করিয়া দেখিতে বাধ্য হইতেছি। দেশের লোকের সঙ্গে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের প্রতিবেশের মধ্যে পুষ্ট এই শাসন-নীতির কোন যোগ ছিল না। যোগ্যতা বা কার্যকারিতা হয়ত ইহা ছিল; কিন্তু সে যোগ্যতার মূলে ছিল স্বেচ্ছাচারিতা এবং পশুবল। দেশের লোকের হৃদ্যতা সেখানে ছিল না। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও শাসন যন্ত্রগত এই সংস্কার এদেশের শাসন নীতির পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের আচার-বিচার, চাল চলন সেই বৈদেশিক প্রাণহীনতাই বহন করিতেছে এবং জাতির মধ্যে তাহাদের ব্যবধান দূর হইতে দিতেছে না ইহার ফল যাহা ঘটে, আমরা সর্বত্র তাহার পরিচয় পাইতেছি। ভারতের প্রধান মন্ত্রীকেও আজ দুঃখের সঙ্গে এই কথাই

বলিতে হইয়াছে, "সরকার ও জনসাধারণের কার্যের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাবই আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দুঃখজনক ব্যাপার। তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, সরকারী কাজের সম্বন্ধে জনসাধারণের ঔদাসীন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুত এজন্য দোষ জনসাধারণের নয়, শাসন-নীতিগত ত্রুটিই ইহার কারণ। আমরা এই কথাই বলিব। ভারতের গণতান্ত্রিক অভ্যুন্নতি সার্থক করিতে হইলে শাসন-নীতি সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। প্রভুত্ব যোগ্যতার মোহে জনগণের হৃদ্যতা হইতে যদি সে নীতি বঞ্চিত হয়, তবে গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করা নিরর্থক।

উদ্বাস্তুদের অভিযান

পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আগমন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্ত্রী, স্বয়ং শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের নাকি এই বিশ্বাস যে, পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের এইভাবে আগমন চলিতেই থাকিবে। বাস্তবিক পক্ষে দিল্লী-চুক্তির দ্বারা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার কার্যত সমাধান হইবে না। সে সমস্যার মূল কারণ অন্যত্র রহিয়াছে, আর তাহা মনস্তাত্ত্বিক, একথা আমরা পূর্বে বহুবার বলিয়াছি। এতদিন পরে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে দ্বিধাজড়িত ভাষায় সেই সত্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুর অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার বালাই তো বহুদিন পূর্বেই চুকিয়া গিয়াছে। উদ্বাস্তুদের সমাগমের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের পুনর্বাসন সচিব শ্রীযুত অজিতপ্রসাদ জৈন সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করেন। উদ্বাস্তুদের সমাগম বৃদ্ধির জন্য পূর্ববঙ্গ সরকারকেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় দায়ী করিয়াছেন। উদ্বাস্তুরা কিজন্য সুখের ঘর-সংসার ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে, এ সম্বন্ধে মন্ত্রী মহোদয় তাঁহাদের নিকট হইতে বিবৃতি গ্রহণ করেন। কিন্তু এ প্রয়োজন তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ ভারতের প্রধান মন্ত্রী নিজেই সে কথা ভাঙিয়া বলিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার সুদীর্ঘ বিবৃতিতে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—"মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উপজীবিকা অর্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। এই সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গ হইতে কার্যত বিতাড়িত হইয়াছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও যাহারা সেখানে অবস্থান করিতেছে, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে তাহারা সর্বদা আতঙ্ক এবং ভীতিগ্রস্ত। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ হইতে অ-হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে আগমনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সমস্যা জটিল করিয়া তুলিয়াছে।" উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ভারতকেই করিতে হইবে। বিহার এবং উড়িষ্যা হইতে যেসব উদ্বাস্তু পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিহার এবং উড়িষ্যা সীমান্ত দেশে, পশ্চিমবঙ্গের জন-জীবনের সঙ্গে যাহাতে সংযুক্ত থাকিতে পারে, এইভাবে তাঁহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা উচিত। সে সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সোজা সে পথে না গিয়া অস্বাভাবিক জীবন-যাত্রার প্রতিবেশের মধ্যে ফেলিয়া তাঁহাদিগকে অতিষ্ঠ, অধৈর্য এবং উৎক্ষিপ্ত করিয়া তোলা কর্তব্য নহে। সরকার যদি এইরূপ সুপরিকল্পিত নীতি লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তবে এতটা উৎকট অবস্থার সৃষ্টি হইত না, ইহা আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু বাঙলার পক্ষে সত্যই মহা দুর্দিন পড়িয়াছে। ন্যায্য কথাও মুখ খুলিয়া বলিবার উপায় নাই। সম্প্রতি নদীয়া জেলা রাজনীতিক সম্মেলনে সাঁওতাল পরগণা এবং পূর্ণিয়া জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ভারত সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। দেখিতেছি, বিহারের পুনর্বাসন সচিব মিঃ আবদুল কোয়ায়ুম আন্সারী ইহাতে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিহারের বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের যে দাবী, তাহা নীতির দিক হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বিহারের নেতারা একথা শুনিলেই বেয়াড়া মূর্তি ধরিয়া দাঁড়ান; সুতরাং বিহারের পুনর্বাসন সচিবের এইরূপ উত্তেজনা আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাঁহার মতে এমন দাবী নিতান্তই অর্থহীন এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়; পরন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা যদি এমন দাবী করে, তবে যেসব লোক উদ্বাস্তু হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিহারে গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভাল হইবে না। তাঁহারা বাঙালী উদ্বাস্তুদিগকে বিহারে ঠাঁই দিবেন না, ইহাই কি মন্ত্রী সাহেবের উক্তির তাৎপর্য? সম্ভবত এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের সীমানা-সংলগ্ন স্থানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে বিহার সরকার এমন সঙ্কুচিত। এই ধরণের প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকিতে বাঙলার বাহিরে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যার সন্তোষজনকভাবে সমাধান কিরূপে হইতে পারে, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। শুধু উদ্বাস্তুদের উপর আরক্তচক্ষু হওয়া কোন কাজের কথা নয়। বস্তুত তাহার ফলে সমস্যাটি পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র সমধিক জটিল আকার ধারণ করিবে। তাঁহাদের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করা দরকার। সমস্যাটি সর্বভারতীয়—আগে এই গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সংখ্যা হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রবোধকুমার সান্যালের নূতন উপন্যাস 'হাসুবানু' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক দেশ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৫০

বেলা দশটা আন্দাজ আমরা সদলবলে মায়াবতী পরিত্যাগ করলাম।

দুঃখে সন্ন্যাসীদের চক্ষু সজল হতে আছে কি না জানিনে, কিন্তু মুখমণ্ডলের বিষণ্ণ হবার পক্ষে আটক নেই, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ সেদিন তাঁদের মুখমণ্ডলের উপরেই পেয়েছিলাম। দুঃখার্ত নেত্রে আমাদের গমন-পথের দিকে দৃষ্টিপাত করে বহুক্ষণ তাঁরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। এক-আধ দিনের কারবার ত' নয়; বিশ-বাইশ দিন ধরে আলাপে-আলোচনায়, আহারে-সংগীতে, হাস্যে-পরিহাসে উভয়পক্ষের চিত্তের জটিল জড়াজড়ি,—সে কি সহজে এক মুহূর্তে ছিন্ন হতে পারে? একপক্ষ অবশ্য সন্ন্যাসী, অপর পক্ষ সংসারী; কিন্তু কঠিন পাথরের বক্ষেও ত কোমল লতিকা সবুজ হয়ে বাহু বিস্তার করে জড়িয়ে থাকে। গৈরিক বসনে সন্ন্যাসীদের দেহ ঢাকা যত সহজ, গৈরিক বৈরাগ্যে মন ঢাকা তত নয়।

সন্ন্যাসীদের কথা যাই হোক না কেন, সদ্যবিচ্ছেদবিধুর আমাদের মন প্রগাঢ় ব্যথায় আর্ত হয়ে উঠল। পিছন ফিরে মহারাজদের উপর, মায়াবতীর পাহাড়-পর্বতের উপর, বৃক্ষ-লতার উপর, চির-তুষার শৈলের উপর, এমন কি মায়াবতীর ঘননীল আকাশপটের উপর শেষবারের মতো একবার চক্ষু এবং মন বুলিয়ে নিলাম। দুঃখের সুগভীর আগ্নেয়-গর্ভ হ'তে উত্থিত আমাদের দীর্ঘশ্বাসের উত্তপ্ত বায়ু সেখানকার শীতল বায়ুমণ্ডলকে খানিকটা উষ্ণ করে দিলে। জীবনে আর কোনোদিন মায়াবতীর মায়াজালের মধ্যে ধরা পড়ব না, অন্তত বর্তমান পরিবেশের মতো কোন পরিবেশের মধ্যবর্তী হয়ে নয়, এই সম্ভাবনার সুনিশ্চয়তা মনকে পীড়ন করতে লাগল। প্রবল গ্রহের অনুগ্রহ ব্যতীত এমন যোগাযোগ সহজে ঘটে না; আর, দ্বিতীয়বার তার আবর্তন ঘটাবার মতো প্রবলতর গ্রহের অভ্যুদয় জীবনাকাশে দেখা যায় কদাচিৎ।

মায়াবতীতে আমরা আরোহণ করে-ছিলাম কাঠগুদাম রেল-স্টেশন হয়ে; মায়াবতী থেকে নেমে চললাম টনকপুর রেল-স্টেশনের ভিন্ন পথে। কাঠগুদাম থেকে মায়াবতী পৌঁছতে আমাদের লেগেছিল মোটামুটি আটদিন; কিন্তু টনকপুরে আমরা পৌঁছে যাব মাত্র সাত-আট ঘণ্টা সময়ের মধ্যে। কাঠগুদাম এবং টনকপুর—দুই-ই সমতলভূমির উপর অবস্থিত; সুতরাং উভয় স্থান থেকে মায়াবতীর উচ্চতা কতকটা একই ধরা যেতে পারে। অথচ, ওঠা-নামার সময়ের মধ্যে এতটা পার্থক্য।

অবশ্য এই আটদিন এবং সাত-আট ঘণ্টার হিসাবের মধ্যে অনুপাত বলতে যা বোঝায়, তার বিশেষ কিছু নেই; কারণ কাঠগুদাম থেকে মায়াবতী আমরা এসে-ছিলাম ইচ্ছাসুখে থেমে-থুমে, রাত্রিগুলো ডাক-বাংলায় অতিবাহিত করতে করতে; আর, টনকপুরে নেবে যাব বিরতিহীন গতিতে,—একেবারে যাকে বলে, হুড়-হুড়িয়ে। সংগীতের ভাষায়, কাঠগুদাম থেকে মায়াবতী আমরা উঠেছিলাম গিটকিরি মেরে মেরে; আর, মায়াবতী থেকে টনকপুরে নামব একটা মাত্র বৃহৎ আকারের গমকের উপর দিয়ে।

কিন্তু সে যাই হোক না কেন, প্রতিদিন দুটো করে স্টেজ ডাণ্ডির উপর অতিক্রম করে এবং মাত্র রাত্রিগুলো ডাকবাংলায় বিশ্রাম করে চললেও কাঠগুদাম থেকে মায়াবতী পৌঁছতে দিন চারেকের কম লাগে না। চারদিন এবং সাত-আট ঘণ্টার অনুপাতও নিতান্ত সামান্য অনুপাত নয়। এরূপ অসম অনুপাত সম্ভব হ'তে পেরেছে মায়াবতী থেকে টনকপুরের পথ যৎপরোনাস্তি খাড়া এবং সেই হেতু বেশ খানিকটা সংক্ষিপ্ত বলে। তা ছাড়া মায়াবতীতে আরোহণ করবার কালে যে প্রতিকূল মাধ্যাকর্ষণ আমাদিগকে নিম্ন-দিকে টেনে রাখতে নিরন্তর চেষ্টা করছিল, সেই মাধ্যাকর্ষণই এখন অনুকূল হয়ে নীচের দিকে হুড়হুড়িয়ে টেনে নিয়ে যাবে। অধঃপতনের গতি সকল ক্ষেত্রেই দ্রুত হয়ে থাকে।

যতদূর মনে পড়ে, আমাদের অবতরণের নূতন পথ লোহাঘাটের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল। লোহাঘাট আলমোরা জেলার একটি মহকুমা, মায়াবতী হতে মাইল পাঁচেক দূরে অবস্থিত। মায়াবতীতে অবস্থানকালে আমরা বার দুই লোহাঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এতদিনে মায়া-ব্যতীত স্বতন্ত্র ডাকঘর হয়ে থাকবে; তখন কিন্তু লোহাঘাটের পোস্টঅফিসের দ্বারাই মায়াবতীর ডাকতন্ত্রের কাজ চলত।

লোহাঘাট ছাড়িয়ে ক্রমশ আমরা পর্বতের জনবিরল আরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলাম। কদাচিৎ কখনো অতি ক্ষুদ্র আকারের এক-আধটা লোকালয় চোখে পড়ে; কোথাও বা দু-চার জন কাঠুরিয়াকে কাষ্ঠ ছেদন করতে দেখা যায়; পথে পথিক অথবা পথচারী দলের সাক্ষাৎ প্রায় নেই বললেই চলে। জনহীন নিস্তব্ধ পথে আমরাই একমাত্র যাত্রী,—দুদ্দাড় করে নেমে চলেছি। জায়গায় জায়গায় পথ এতই খাড়া যে, জননী বসুধার স্নেহকেন্দ্রের অত্যধিক আকর্ষণ বৃদ্ধিহেতু ডাণ্ডির উপর আরূঢ় হয়ে বসে যাওয়া খুব নিরাপদ ব'লে মনে হয় না, ডাণ্ডিবাহী কুলিদের পক্ষেও ভার সামলে টেনে রেখে ডাণ্ডি বহন করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। সে সকল স্থানে ডাণ্ডি থেকে অবতরণ করে কিছুটা পথ আমরা পদব্রজে চলতে লাগলাম।

অর্ধেকেরও অনেকটা বেশি পথ নেমে আসার পর এক সময়ে লক্ষ্য করলাম অলক্ষিতে কখন্ গাছপালার সভা ঘনীভূত হয়েছে; দূরে নিম্ন প্রদেশে দেখা দিয়েছে নিবিড় নীলের দিগন্তবিস্তৃত সমারোহ। ডাণ্ডির ওপরে সোজা হয়ে বসলাম। বুঝতে বাকি রইল না, যে অরণ্যরাজের দর্শনলাভের প্রত্যাশায় ঔৎসুক্যচকিত হৃদয়ে অপেক্ষা করে আছি, তারই প্রত্যন্ত দেশে এসে পড়েছি। মহারাজদের নিকট অবগত হয়েছিলাম, মায়াবতী থেকে অবতরণ করবার এই পথে আমাদিগকে ভারতবিখ্যাত টনকপুর মহারণ্যের একটা অংশ ভেদ করে যেতে হবে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রধান পাঁচ-সাতটি মহারণ্যের মধ্যে টনকপুর অরণ্য অন্যতম। বৃহৎ অরণ্যের ধারণা আমার যে একেবারে ছিল না, তা নয়। সাঁওতাল পরগণার বন-জঙ্গল এবং রাঁচি-হাজারিবাগ অঞ্চলের অরণ্যানীর সহিত কতকটা পরিচয় ছিল। কিন্তু টনকপুর অরণ্য দেখার সময়ে বুঝেছিলাম, রাজাধিরাজের দেখা পূর্বে

পাই নি, পূর্বে যাদের দেখা পেয়েছিলাম তারা মাত্র সামন্তরাজ।

বৃহৎ পাদপ শ্রেণীর নিবিড়তা ক্ষণকাল ধরে বেড়ে চলেছিল, অবশেষে এক সময়ে বুঝতে পারলাম বিশাল অরণ্যের নিভৃত অন্দর-মহলে পৌঁছে গেছি। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে বিস্ময় এবং পুলকের স্পর্শে যেন অন্তরিন্দ্রিয় পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে,—দিকে দিকে পাঁচ-সাত হাত অন্তর সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি বিরাট দৈত্যের ন্যায় স্তব্ধ গাম্ভীর্যে দাঁড়িয়ে। তাদের না আছে সংখ্যা, না আছে শেষ। সেই মহীরুহখচিত বনভূমির বুকের উপর দিয়ে বৃক্ষকাণ্ড এড়িয়ে এড়িয়ে অস্পষ্ট পথরেখা সরীসৃপ গতিতে এগিয়ে চলেছে।

ক্ষণকাল পরে একটা বিস্তীর্ণ সানু-দেশের উপর উপনীত হয়ে ডাণ্ডিওয়ালা কুলি ও ভারবাহী কুলিগণ বিশ্রামের জন্য গতিরোধ করলে। আমরাও ডাণ্ডি থেকে অবতরণ করে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। খানসামা ও চাকরেরা আমাদের জন্য চা ও খাবারের আয়োজন করতে ব্যাপৃত হ'ল।

ভূমিতলের অবস্থা এবং প্রকৃতি দেখে বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। আমাদের চতুর্দিকে অন্তত আধ বর্গমাইল বিস্তৃত যে বৃহৎ ভূখণ্ড, তার উপর একটি তৃণ নেই, লতাগুল্ম নেই, আগাছা নেই। যত-দূর দৃষ্টি চলে, সমস্ত বিস্তৃতিটা একেবারে অনাবৃত, পরিচ্ছন্ন। দেখে মনে হয়, কে যেন কিছু পূর্বে সমস্ত চেঁচে-ছুলে সযত্নে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কৃত করে রেখেছে। নিবিড় বনানীর মহা-আওতার মধ্যে পড়ে মৃত্তিকা তার উৎপাদিকা শক্তি হারিয়েছে।

বৃক্ষসকলের শাখাপল্লবভাগ বহু উচ্চে অবস্থিত; সেই জন্য সোজাসুজি দৃষ্টিপাত করলে নগ্ন বৃক্ষকাণ্ডগুলির অন্তরাল দিয়ে বহু দূরের দৃশ্য দৃষ্টি-গোচর হয়। ঊর্ধ্বে বৃক্ষপত্রাচ্ছাদিত চন্দ্রাতপ, নিম্নে সুমার্জিত ভূপৃষ্ঠ এবং মধ্যস্থলে শালকাঠের খুঁটির ন্যায় বৃক্ষকাণ্ডসমূহ দিয়ে রচিত বন-দেবতার এই বিরাট নাট্যশালায় আমরা বিরতিকালে এসে পড়েছি। গভীর নিশীথে ব্যাঘ্র-গর্জনের গভীর নিনাদের দ্বারা যখন এর অভিনয়কাল সূচিত হয়, তখনকার কথা কল্পনা করে মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এখন এখানে অখণ্ড নিঃশব্দতার পালা; বায়ুর মর্মর নেই, পাখীর কাকলি নেই, ভ্রমরের গুঞ্জন নেই, এমন কি, প্রজাপতির পক্ষসঞ্চালন পর্যন্ত নেই। যে বিচিত্র এবং বিপুল নিনাদোল্লাসে উপনীত হবার সাধনায় মহামৌন এখন ধ্যাননিমগ্ন, আমরা কয়েকজন মানুষে মিলে আমাদের কথোপকথন আর গতিবিধির দ্বারা তার মহিমাকে খণ্ডিত করছি।

কোথায় কেমন করে কোন্ সাদৃশ্য যে ছিল, তা ধরতে পারছিলাম না, অথচ এই বিশাল বনভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে কেবলই আমার মনে পড়ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা উপন্যাসের ডাকাতে কালাদীঘির কথা। সেই বৃহৎ দীঘিও এখানে নেই; সুতরাং পাহাড়ের মতো তার পাড়ও অবর্তমান; এমন কি, সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের চিহ্নও এখানে কোনদিকে খুঁজে পাওয়া যায় না; অথচ কেবলই মনে হয়, আমাদের চারপাশের বিশ-পঁচিশটা গাছের প্রচ্ছন্ন আশ্রয় থেকে জন পঞ্চাশেক কৃষ্ণবর্ণ বিপুলকায় ডাকাত সড় সড় করে নেবে প'ড়ে আমাদের মধ্যে কাউকে, ধরা যাক ললিতবাবুকেই ডাণ্ডিতে তুলে নিয়ে যদি গভীর বনের মধ্যে ছুট দেয়, তা হলে বিব্রত যতটা হই, বিস্মিত হই তার চেয়ে অনেক কম।

দেহ-এঞ্জিনের জল-কয়লা, অর্থাৎ চা এবং খাবার প্রস্তুত হয়েছিল। উভয়ের সাহায্যে খানিকটা স্টীম তৈরি করে নিয়ে ডাণ্ডিতে আরোহণ করে পুনরায় আমরা এগিয়ে চললাম অধিকক্ষণ। বিলম্ব করবার উপায় ছিল না আমাদের। সূর্যাস্তের পূর্বেই বন শেষ করে ফাঁকা জায়গায় নিষ্ক্রান্ত হতে হবে। অবশ্য, দলে বেশি লোক থাকলে সন্ধ্যার প্রথম দিকেও তেমন ভয়ের কারণ থাকে না; কিন্তু এমনই ধূর্ত এবং ক্রূর জানোয়ার ব্যাঘ্র যে, সুযোগ-মতো দিনমানেও দলের অসতর্ক শেষ লোকটিকে টপ্ করে পিঠে ফেলে গভীর অরণ্যে সরে পড়তে মাঝে মাঝে তাকে দেখা যায়।

ডাণ্ডিওয়ালা কুলিদের গল্প করাই অভ্যাস। ইতিপূর্বেও তারা বরাবর গল্প করতে করতে এসেছে; এখন থেকে অরণ্য ক্রমশ নিবিড়তর হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে গল্প করবার স্পৃহাও তাদের বেড়ে উঠতে লাগল। আমিও নানাবিধ প্রশ্ন করে করে তাদের গল্প বলবার উৎসাহে ইন্ধন জোগাতে লাগলাম। গল্প চলছিল নিতান্তই সাময়িক স্বার্থের সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে। কোন্ বনে ভাল্লুক বাস করে, কোন্ অঞ্চলে পশুরাজ শার্দুলের সার্বভৌম রাজত্ব, পথের কোন্ কোন্ স্থল ভেদ করে বন্য-হস্তিযূথের গমনাগমনের রীতি আছে, ইত্যাদি বিষয়ে তারা আমাকে প্রাজ্ঞ করতে করতে চলেছিল।

ডাণ্ডিওয়ালাদের মতে বাঘ, ভাল্লুক ও হাতীর মধ্যে বুনো হাতীর ন্যায় ভয়ঙ্কর জন্তু আর কোনোটাই নয়। বাঘ ভাল্লুকের হাত থেকে নিস্তার লাভ করা তবু কখনো কখনো সম্ভব হয়, কিন্তু বন্য হস্তীর সম্মুখে পড়লে পরিত্রাণ নেই; শুঁড় এবং পায়ের যৌথ ক্রিয়াশীল-তার তাড়নায় মানুষের দেহে আর পদার্থ রাখে না তারা। দল বেঁধে ভিন্ন কখনো তারা একা-একা ঘুরে বেড়ায় না। মানুষ সম্মুখে পড়লে খেয়াল পরবশ হ'য়ে যূথনাথ যদি দলবল সহ এড়িয়ে চ'লে গেলেন, তা হ'লেই রক্ষে; অন্যথা, নিষ্ঠুর মৃত্যুর কবলিত হওয়া ভিন্ন উপায়ন্তর থাকে না। ক্ষুধার বশবর্তী হ'য়ে আহারের জন্য যারা প্রাণীহত্যা করে, তাদের জিঘাংসার সীমা থাকে; কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হ'য়ে শুধু হত্যা করবার জন্য যারা হত্যা করে, তাদের সীমা থাকে না। একথা বর্তমানকালে মানুষের বিষয়েও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পূর্বে মানুষ যখন নরমাংস আহার করত; তখন সে পিতাকে হত্যা ক'রেই নিরস্ত হোত; এখন সে নরমাংস খায় না, তাই পিতাকে হত্যা করতে হলে প্রথমে সে পিতার সম্মুখে পুত্রকে হত্যা করে।

যেমন যেমন আমরা এগিয়ে চলে-ছিলাম, অরণ্যের আকৃতি এবং প্রকৃতিও তেমনি পরিবর্তিত হ'য়ে চলেছিল। কোনো খানে বিরলবৃক্ষ মার্জিতভূমি অন্তরালময় অরণ্য; কোথাও, ঝোপ-ঝাড় লতা-পাদপ সমাকীর্ণ জমাট বনভূমি; কোথাও বা সুদূরবিস্তৃত পিঙ্গলবর্ণের বেত বন। কুলিদের মুখে শুনলাম, বেত বনের পিঙ্গল রঙ অনেকটা বাঘের গায়ের রঙের মতো ব'লে, প্রাণী বধ করবার জন্য এই বেত বন বাঘেদের পক্ষে উপযুক্ত ঘাঁটি। বেত বনের রঙের সঙ্গে দেহের রঙ মিলিয়ে চোখ দুটি অবারিত রেখে তারা ওৎ পেতে নিঃশব্দে ব'সে থাকে,—শিকার

দেখতে পেলেই অকস্মাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে শিকার সহ বেত বনে ফিরে আসে।

কুলিদের মুখে নখদন্ত-শুণ্ড-সম্পন্ন হিংস্র অরণ্যবাসীদের নানাবিধ কীর্তি-কলাপের রক্ত জল করা কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা দুরন্ত অরণ্যভূমি শেষ ক'রে আনছিলাম। সমস্ত সময়টা দেহে এবং মনে একটা হাল্কা ধরণের রোমাঞ্চ লেগে থাকেনি, সে কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু ঐ রোমাঞ্চটুকু লেগে না থাকলে টনকপুরের ভয়াবহ অরণ্য আমাদের নিকট নিশ্চয়ই খানিকটা মহিমাচ্যুত হোত। আমাদের আনন্দের মূলে ভীতির ছোঁয়াচ থাকলে সে আনন্দ প্রগাঢ় হয়। সেই ঝোপই আমাদের মনকে সব চেয়ে বেশি উত্তেজিত করে, যে ঝোপের মধ্যে অকস্মাৎ একটা বাঘের গর্জন ক'রে ওঠবার সম্ভাবনা থাকে।

বাঘের কথা ভেবে আমরা কিন্তু খুব-বেশী চিন্তিত হইনি; কারণ, বাঘ ব'লেই বাঘের যে প্রাণের ভয় থাকতে নেই, এ কোনো কাজের কথা নয়। অত লোকের মধ্যে সহসা আত্মপ্রকাশ করার দুঃসাহস বাঘের পক্ষেও সম্ভব হবে বলে আমাদের মনে হচ্ছিল না। ভল্লুকের ভয় আমরা আরও কম কর-ছিলাম। একান্তই যদি একটা ভাল্লুক আমাদের আক্রমণ করতে উপস্থিত হয়, আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই তার পক্ষে মারাত্মক হবে। সবাই মিলে চাঁদা ক'রে কিল মেরে মেরে আর লোম ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাকে সাবড়ে দেওয়া চলবে।

কিন্তু অকস্মাৎ হাতীর দলের সামনে পড়ে গেলেই বিপদ! বন্যহস্তী যদি মত্ত হয়ে ওঠে, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। হয়ত শুঁড় দিয়ে ডাণ্ডিগুলো তুলে তুলে প্রাক্তন আরোহী এবং ডাণ্ডি এক সঙ্গেই চূর্ণ করতে থাকবে। কিম্বা, অতটা নির্দয় না হয়ে, শুঁড় দিয়ে আমাদের সাপটে ধরে যদি দশ পনেরো হাত ঊর্ধ্বে, চালান করতে থাকে, তা হলেও অবস্থাটা বিশেষ সুবিধার হবে না

যাই হোক, এমন-কোনো শোচনীয় ঘটনা ঘটবার পূর্বেই সৌভাগ্যক্রমে আমরা মহারণ্য থেকে ক্রমশঃ নির্গত হ'য়ে অরণ্যের নিরাপদ প্রত্যন্ত দেশে এসে পড়লাম। পিছন দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে মনে মনে বললাম, হে বিরাট, হে সুন্দর, হে ভয়ঙ্কর মহাগহন তোমাকে প্রণাম করি। বিশালের যে অপূর্ব ধারণা তুমি আজ আমার অন্তরে পেঁৗছে দিলে, তা চিরদিনের সম্পদ হ'য়ে রইল।

টনকপুরের ডাকবাংলায় আমরা যখন উপস্থিত হলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। হাজার ছয়েক ফুট একটানা হড়হড়িয়ে নেমে এসে সকলেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, আশ্রয় ছেড়ে নড়তে আর ইচ্ছে হ'ল না। টনকপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা পরদিন প্রত্যূষের জন্য অপেক্ষা ক'রে রইল।

আর এক দফা ভাল ক'রে চা-পান ক'রে তাস নিয়ে আমরা খেলতে বসলাম। চিত্তরঞ্জনের সহিত তাস খেলার সেই বোধ-করি শেষ পালা। ছুটির পর ভাগলপুরে ফিরে গিয়ে লছমীপুর মামলার চরম অবস্থার, অর্থাৎ শুনানীর তোড়জোড় নিয়ে এমন ব্যস্ত হ'য়ে পড়তে হয়েছিল যে, তার মধ্যে আর তাস খেলবার সময়ও ছিল না, সুযোগও পাওয়া যায়নি। মায়া-বতীর সুদীর্ঘ স্বপ্ন জীবনের পর ভাগলপুরের কঠোর কর্মজীবন তার সকল প্রকার দাবি-দাওয়া নিয়ে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছিল। কবি চিত্ত-রঞ্জন পুনরায় দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার সি আর দাসের ভূমিকা অবলম্বন ক'রে আইন-নজির এবং সাক্ষী-সবুতের মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে দেখি স্নিগ্ধ অনুজ্জ্বল আলোকে ঘর ভরে গিয়েছে। তখনো অনেকেই শেষ স্বপ্নের অলস বিলাসে নিমগ্ন। শয্যা ত্যাগ ক'রে ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম। অদূরে ধূসর শ্যামল হিমালয় পরিণত হেমন্তের হাল্কা কুয়াসায় আবৃত হ'য়ে ধ্যানগম্ভীর যোগীর মতো অবস্থান করছে। আকাশ ঘন নীল; বাতাসে একটা অভূতপূর্ব উৎসাহের হিল্লোল। একটা অদৃশ্য অগোচর শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে বারান্দা থেকে নেমে প'ড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম।

একটা জায়গায় মোড় ফিরতেই একে-বারে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়ালাম! একি দুরন্ত ভয়ংকরী নদী! পরিসর তেমন বেশি নয়, কিন্তু ভঙ্গী দেখলে মনে হয়, ভয়াবহরূপে গভীর। প্রায় কানাভরা এক-নদী গৈরিক রঙের জল টগবগিয়ে ফুটুতে ফুটুতে উদ্দাম গতিভরে ছুটে চলেছে। আবর্তের পর আবর্ত ভেসে ভেসে আসছে, আর দেখতে দেখতে, ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে যাচ্ছে। এমন ভীষণ খরস্রোত যে মনে হয়, এক টুকরো তৃণ নিক্ষেপ করলে নিমেষের মধ্যে দু টুকরো হ'য়ে যাবে।

একটা বিস্ময়ের কথা,—এত যে স্রোত, এত যে আবর্ত, এত আলোড়ন, কিন্তু সেজন্য কিছুমাত্র শব্দ নেই। নিঃশব্দ মসৃণ গতিতে বিশাল জলরাশি ছুটে চলেছে নির্বাক ছায়াচিত্রের নদীর মতো। অমন দুরন্ত গতির মধ্যে এই নিঃশব্দতা, ভয়াবহতাকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

নদীর তীরে তীরে চেয়ে দেখলাম, কোথাও ঘাট নেই, আঘাটা নেই। জল-পানের জন্য নদীতটে কোনো পশুর অথবা জলাহরণের জন্য কোনো মানুষের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। সমস্ত প্রাণীজগৎ যেন এই ভীষণ স্রোতস্বিনীর সান্নিধ্য হ'তে সন্ত্রাসে সরে দাঁড়িয়েছে। জলরেখার অতি নিকটে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন ভয় করে; মনে হয় মোহগ্রস্ত হ'য়ে দুই বাহু প্রসারিত ক'রে ফুটন্ত জলরাশির মধ্যে অকস্মাৎ নিমজ্জিত হ'য়ে না যাই! সভয়ে খানিকটা পিছিয়ে আসি।

ডাকবাংলায় ফিরে এসে অবগত হলাম নদীর নাম সারদা।

সারদা পার্বত্য নদী, হয়ত' পূর্বরাত্রে পর্বতাঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য ঢল নামায়, আজ তার এই স্ফীতোদ্ধতরূপ,—দু'দিন পরে হয়ত' বিশীর্ণ হয়ে যাবে; কিন্তু সুদীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর পরেও আজ তার সেদিনকার সর্বনাশা মূর্তি আমার মানসপটে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হ'য়ে আছে। পরবর্তীকালে 'দামোদরের বৈতরণী পার' নামক একটি গল্প লিখতে বৈতরণীর যে বর্ণনা দিয়েছিলাম, তার কল্পনা জুগিয়ে ছিল বহুকাল পূর্বে দেখা সারদা নদীর স্মৃতি।

সেদিন আমরা টনকপুর স্টেশনে ট্রেনে উঠে হিমালয়ের রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে সুদূর কলিকাতা নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু তৎপূর্বে দুর্দান্ত সারদা নদী আরও বার দুই আমাকে তার তীরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

একটু আগে ভুরি ভোজন হ'য়ে গেছে। এবার যে-যার বাড়ি গেলেই হয়, যাই যাই করেও যাওয়া হ'চ্ছে না, কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছে—আর একটু রয়ে—বসে' না-গেলে যেন ভাল দেখায় না।

পান মুখে করে' সিগারেট হাতে সবাই মিলে আবার বাইরের ঘরে এসে জড় হলুম। নিবোন পাখাগুলো পুরো দমে খুলে দেওয়া হ'লো, ঠাণ্ডা জলের বরাত গেল কয়েক পাত্র। অনেকেই আড় হ'য়ে পড়লেন আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে। ভুরি ভোজনের গালগল্প চলতে লাগল।

এক কোণে বসে' ভাবছি এখন একলা একলা সরেপড়া যায় কি করে। ভদ্রতার খাতিরে এ'রা পুনরায় যেভাবে সমবেত হয়েছেন তাতে আর এক প্রস্তের ব্যবস্থা না করে ছাড়বেন না। আর গৃহস্বামীও হয়েছেন তেমনি, খাইয়ে-দাইয়ে মেয়ে-দেখিয়ে ক্ষান্ত দেবেন না। 'আর একটু বসুন! এরি মধ্যে যাবেন কি? বাইরে কি তাত! একটু রোদ পড়ুক! ছুটির দিন অসুবিধেটা কি? গরীবের বাড়ি যখন এসেছেন!' কাকুতি মিনতির একশেষ!

ফরাস গালচে পাতা ঘরে যতনা গৃহস্বামীর অনুরোধে ততোধিক বাইরে কড়া রোদ্দুরের জন্যে আমরা গড়িমসি করছি। আজকে গরমটাও পড়েচে তেমনি! গৃহস্বামীর অনুরোধে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে' যেতে খুব বেশী আপত্তি নেই। বাইরের চেয়ে এখন এমন একটা ছায়ান্ধকার ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ঘর লোভনীয়,—দরজা জানালা বন্ধ করে' খসখসে জল ছিটিয়ে ঘরটাকে মরা-মাছ টাটকা রাখার বাক্সের মত করা হ'য়েছে। যারা আড় হ'য়ে পড়েছেন তাঁদের তো মরা কাত্‌লা মাছের মত দেখাচ্ছে—শোবার ধরণটা ভিন্ন হ'লে বাক্সবন্দী মনে হ'তো। ইচ্ছে মত খেয়ে খোসগল্প করার মত এমন জায়গা আর পাওয়া যাবে না। পরের পয়সায় এমন বাদশাহী আজকাল নেহাৎ কপালের লেখা—জল চেয়েচি কি চাইনি, মুখফুটে পানের কথা বলেচি কি বলিনি, সিগারেটের জন্যে হাত বাড়িয়েচি কি বাড়াইনি, কোথা থেকে যে কিভাবে সংগ্রহ হ'চ্ছে, হাতে মুখে পড়ে ধন্য হবার জন্যে হুটোপাটি করছে বোঝবার উপায় নেই—সামারকুল গেঞ্জী গায়ে কাঁধে তোয়ালে ফেলে চুল তুলে কয়েকজন যুবা-প্রৌঢ় ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ছোটাছুটি করছে। কোন কিছু ত্রুটির কাল্পনিকতায় তারা দম-দেওয়া পুতুলের মত ছটফট করছে। ধূম-পানীয়ের কোনটাই আমার ধাতস্থ হয় না, তবু আমাকে কিছু একটা পান করাতে তাদের কেউ কেউ প্রাণান্ত করছে—যা হোক একটা কিছু ইচ্ছে না করলে বেচারাদের বিমর্ষতা ঘুচবে না। কি আর করি বাধ্য হ'য়ে রূপার রেকাবী থেকে একটা লবঙ্গ নিয়ে দাঁতে কাটতে লাগলুম।

মাত্র পাঁচজন আমরা এসেছি বিল্টুবাবুর বড় মেয়েকে পাকা দেখতে। আমি এসেছি পড়শী হিসেবে—ছেলের বাপ তিনকড়িবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। আরো একটা কথা, এখন আর তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ না হ'লেও এই—সেদিনও কিন্তু বেশ মারাত্মক রকম হ'য়ে পড়েছিল এই সম্বন্ধটা—তিনকড়িবাবু বোধহয় সংসার ত্যাগেরই সঙ্কল্পই করেছিলেন: সংসার করে লাভ কি ছেলে-মেয়েই যদি কথার বাধ্য না হয়, বাপমার মানমর্যাদা না রাখে—এত কষ্ট করে' তা হ'লে লাভটা কি? খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করে' মানুষ করার কি মানে হয়।

তিনকড়িবাবুর বড় ছেলে রবি ভাব করে' বিয়ে করতে চেয়েছিল। রবি ছেলে এমনি ভাল, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রোজগেরে হঠাৎ ভাব করে' এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুললে যে, আত্মীয়-পরে রবির নামে ছি ছি পড়ে গেল—ভাবের পাত্রীটিকে না

দেখেই নানারকম জল্পনাকল্পনা চলতে লাগল। কি জাত, কি গোত্র, এ প্রশ্ন তো আছেই তার ওপর কন্যাপক্ষের চতুরতা, দাঁও পেয়ে মেয়ে-পার-করা ইত্যাদি—নানা কথা। অমন একটা হীরের টুকরো কি না কুহকে পড়ে নষ্ট হ'য়ে গেল। তিনকড়িবাবুর বরাত মন্দ বলতে হ'বে।

আমি ব্যাপারটাকে গোড়া থেকেই অন্যভাবে নিয়েছিলুম। নানাভাবে তিনকড়িবাবুকে বোঝাতে চেষ্টা করতুম। তিনকড়িবাবু সে-সব কথা শুনতেন কি না বুঝতুম না। দেখা হ'তে হয়তো প্রশ্ন করলুম, কেমন আছেন তিনকড়িবাবু?

তিনকড়িবাবু জবাব দিলেন, আর থাকা থাকি!

বুঝেও না বোঝার মত বললুম, তার মানে?

তিনকড়িবাবু নির্লিপ্ত কণ্ঠে হয়তো বললেন, এবার যেতে পারলেই হয়!

কেন? এর মধ্যে যেতে যাবেন কেন?

আর-র-! কণ্ঠটাকে উদাস করে' তিনকড়িবাবু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েন!

তারপর অবশ্য রবির পিতৃদ্রোহিতার কথা হয়—সেইসঙ্গে আজকালকার ছেলেদের বেহায়া লজ্জাহীনতা, অবিমৃষ্যকারিতা ইত্যাদি নানা কথা। ইদানীং তিনকড়িবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লেই কেমন মনে হ'তো, ভদ্রলোকের বাড়িতে বোধহয় কোন একটা কঠিন রোগের প্রতিক্রিয়া চলছে—রোগীর জীবন সংশয় ব্যাপার, টালমাটাল!

সবচেয়ে কষ্ট হ'তো রবিকে দেখলে, অমন চটপটে ছোকরা কেমন যেন মুখচোরা লাজুক-লাজুক হ'য়ে পড়েছে। পারতপক্ষে সে আমাদের এড়িয়েই চলতে চাইতো, কিন্তু নেহাৎ পিতৃবন্ধুদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে কেমন এক ধরণে হাসি হাসতো, ম্লান। আমিও হাসতুম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হতো না-হাসলে হয়তো ভাল করতুম। পরিচিতদের দেখে রবির নিঃশব্দ হাসির যে কি অর্থ সে তো বুঝি! একটা আশাভঙ্গের বেদনাকে সামাজিক সৌজন্যে হাসির আড়ালে গোপন করা তো সহজ নয়!

এ ব্যাপারে আমার স্ত্রীর ব্যবহারটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন, রবির এই ভাব করার কানাকানিটা তিনি ভালভাবে গ্রহণ করেননি। জানালায় দাঁড়িয়ে যখনই পথে রবিকে দেখতে পেতেন হৈ-হৈ করে' আমাকে ডেকে এনে দেখাতেন—রবি দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে হেসে লুটিয়ে পড়তেন। যেন ছেলেটার বোকামীর জন্যে তিনি দুয়ো দিচ্ছেন নিজের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও করতেন দু-চারটে।

"মেয়েটা নাকি খুব কালো?"

"হুঁ!"

"লেখাপড়াই যা শিখেচে, অবস্থা তেমন ভাল নয়?"

"হুঁ!"

"কি যে দেখে মজে গেল?"

"হুঁ!"

"তোর ভাবনাটা কি, শুধু কি পাশ, চাকরিও তো সোনার!"

"হুঁ!"

"মতিচ্ছন্ন আর কি!"

"হুঁ!"

"শুধু-শুধু বাপ-মার মনে কষ্ট দেওয়া।"

"হুঁ!"

"তা-ও যদি দেখতে ভাল হতো!"

"হুঁ!"

"দেখগে যাও আবার জাতের ঠিক আছে কিনা! দুপাতা পড়তে শিখলে অমনি মেয়েরা জাতে উঠে গেল। রবির মা কত দুঃখু করছিল!"

"হুঁ!"

হুঁতো হুঁ, স্ত্রী কপট রাগ করতেন; আবার ভাব-করে' বিয়ে করার নানা বিষময় উদাহরণও দেখাতেন। আর যেসব মেয়েরা ভাব করে বিয়ে করতে ঝোঁকে তাদের বিরুদ্ধে ঝাল ঝাড়তেন নিজের ঘরে বসে। আর যেসব পুরুষেরা সেই ভালবাসায় ভোলে তাদের বুদ্ধিহীনতার জন্যে করুণা প্রকাশ করতেনঃ আহা বেচারারা!

থাক্‌গে সে-সব কথা। এখন তো সব মিটেমাটে গেছে। রবির ভালবাসার পাত্রীকেই ঘরে নিয়ে যেতে তিনকড়িবাবু রাজী হয়েছেন। আজকে তাই পাকা দেখায় পাকা কথা হয়ে গেল—ঐতো বিষ্টুবাবু আর তিনকড়িবাবু ফরাসের মাঝখানে গলাগলি হয়ে বসেছেন, দুজনের মুখেই হাসি দেখা যাচ্ছে।

যা দেখছি তাতে তিনকড়িবাবুর মুখে হাসি ফোটার কারণও আছে। বিষ্টুবাবুরা নেহাৎ ফেলনা ঘর নয়, আর পাত্রীও কিছু হিজিবিজি নয়—শিক্ষিতা তায় সুন্দরী।

পাকা দেখার আশীর্বাদের সময় কন্যার মাথায় ধানদুর্বা সমেত হাতটা তুলে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম মুহূর্তের জন্যে—এমুখ যেন কোথায় দেখেছি, কবে স্মরণ করতে পারছি না। বেদনা-নিষিক্ত কোন বিবিক্ত বাসনার অম্লান রূপ—আশ্চর্য!

আমার বিহ্বলতায় সভাস্থ ব্যক্তিরা বিস্ময়বোধ করেছিলেন নিঃশব্দে, দোরের পাশে সশব্দ শঙ্খের ফুৎকার হঠাৎ চুপ হয়ে গিয়েছিল, উঁকি-ঝুঁকি অনেক দৃষ্টিতে আশঙ্কা ফুটে উঠেছিল সকৌতুকে। সপ্রতিভ কন্যাও কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করেছিল।

সেই থেকে ভাবছি, এ কেমন করে' সম্ভব—সুপ্ত স্মৃতির একি অদ্ভুত পুনরুক্তি। রবি ভাগ্যবান।

ঠিক কুড়ি বছর আগের কথা। স্মৃতিটা আজো অম্লান যেন। পিতলের পিদিম ঘসামাজায় আবার উজ্জ্বল। মফঃস্বলে ছেলে, সবে ম্যাট্রিক পাশ করে শহরে আত্মীয়ের বাড়ী থেকে উচ্চশিক্ষার মহলা দিচ্ছি। স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রবেশ করেই যেন কি হয়ে গেছি—জড়সড় শীতের পর সুড়সুড় বসন্ত সমাগমের মত। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সংস্কার সমৃদ্ধ। কাব্য বোঝার চেয়ে না বোঝার আনন্দে বিভোর। ষোলো থেকে সতের, কি সতের থেকে আঠার, মনে হয়েছে আমার বুদ্ধি, আমার উপলব্ধি আর সবার চেয়ে অনেক বেশি। দুচোখে যা দেখি তা যেমন অতুলনীয়, আবার যা ভাবি তাও তেমনি অভাবনীয়। সবই মধুরণম্। আশ্চর্য, দুপুরে ক্লাস করতে যাবার সময় খা-খা রোদটাও সেদিন বড় ভাল লাগতো। কত কল্পনা যে ছিল! এখন হয়তো ঠিক বোঝাতে পারছি না, তখন আমার মনের অবস্থাটা কি। কেন এই সবকিছু ভাল লাগার জন্যে আনন্দবেদনা। নিজেকে কত রকম করে যে দর্শনীয় করতে চাই তার ঠিক-ঠিকানা নেই—বেশবাসে, ভাবভঙ্গিতে, চালচলনে, তর্ক-বিতর্কে। রবি ঠাকুর গুলে খেয়েও সে চাঞ্চল্য দমন করতে পারিনি।

এমন সময় একদিন অপ্রত্যাশিত পরিচয় হলো নীলিমাদের সঙ্গে। পরিচয় মুহূর্তটা মনে আছে। বেলা তখন দশটা সাড়ে দশটা হবে, নিজের ঘরে চৌকির ওপর কাৎ হয়ে' পড়ার ফাঁকে কড়িকাঠ গণনায় মনস্থ করছি, ক্লাস তো সেই দুপুরে! দোর গোড়ায় গুটি কয়েক নারীকণ্ঠ-কাকলি বেজে উঠলো। উঠে বসবার আগেই আমার আত্মীয়াটি ঘর-জোড়া হয়ে সহাস্যে ঘোষণা করলেন, দেখ, কারা এসেচে!

দেখলুম, কিন্তু কারা চিনতে পারলুম না। কিংবা তাঁদের এতো চিনি যে নতুন করে' চেনার দরকার ছিল না। বোধহয় ক'মাস ধরে এ'দেরই আমি দেখে এসেছি, যত্রতত্র। চোখ আমি অনেকক্ষণ নামিয়ে নিয়েছিলুম—তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসে' বসবার জায়গাটা সম্ভাভব্য করে' নিলুম।

আমি কিছু বলবার আগেই আমার আত্মীয়াটি বললেন, বস না তোমরা!

তাঁরা ইতস্তত করলেন। করবারই কথা, মাত্র খানকয়েক বই-এর ব্যবধানে দূরত্বটা খুব নিঃসঙ্কোচ নয়—সিঙ্গল-বেড তক্তপোষ, স্বাভাবিক মাপেরও কম, তার একধারে বিছানাটা গুটানো। একজন হলে যদিও বা চলে, দুজন তরুণীর পক্ষে একেবারেই অকুলান। যথাসম্ভব ধার ঘেঁসে বসে' আমি এদিকে আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেছি—উঠে পড়বার উপায় থাকলে মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে অবিলম্বে উঠে পড়তুম।

আমার আত্মীয়া বোধ হয় আমার বেকায়দা অবস্থাটা লক্ষ্য করলেন, সম্বোধন করে' বললেন, তুমি এখানে এসে বসনা, ওরা দুজন ঐখানে বসুক।

আত্মীয়ার কথার সুরে এই বিপর্যয়ে সামঞ্জস্য বিধানের চেয়ে অনুজ্ঞার ভাবটাই প্রকাশ পেল বেশি করে। যেন নবাগতাদের অসুবিধা আমিই ঘটিয়েছি। যোগ্য সমাদর করছি না।

চৌকি ছেড়ে ঘরের কোণে চেয়ারে এসে বসলুম। আমার সামনে টেবিলের দিকে পিছন ফিরে আত্মীয়াটি ওদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন—আমাকে কতকটা নেপথ্যে রেখে। হঠাৎ সমবয়েসী অপরিচিতার সামনাসামনি হওয়ার চেয়ে এ যেন ভাল। লক্ষ্য করলুম, ওঁরা বই-খাতাপত্তর বুকের ওপর থেকে নামিয়ে আমার তক্তপোষের ওপর রেখে আসন গ্রহণ করেছেন। প্রথম দর্শনে ওঁদের মুখেচোখে যেভাব লক্ষ্য করেছিলুম এখন যেন তা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে। কে জানে বইগুলো ও'দের ভার ছিল কিনা। মনে মনে ক্ষুন্ন হলুম, আজ বিছানাটা কেন পেতে রাখিনি, অমন করে গুটিয়ে না রাখলে কি আর এমন অসুবিধা হতো। বসতে নিশ্চয়ই ওঁদের অসুবিধা হচ্ছে।

আত্মীয়াটি বললেন, এদের কথাই তোমাকে তো কতবার বলেছি—এক কলেজে তোমার সঙ্গে পড়ে।

অনেকবার শুনলেও এই প্রথম শোনার মত বললুম, কই? তাই নাকি! আমাদের কলেজে?

আত্মীয়া বললেন, আশুতোষে পড়ে।

মর্নিং সেকশনে বুঝি? একটু যেন সাহস সঞ্চার করেছি এতক্ষণে।

ও'রা দুজনেই মাথা নাড়লেন। দুজনের মধ্যে যিনি একটু কৃশকায়া তিনি কি ভেবে হাসি গোপন করলেন। স্থূলাঙ্গীর মুখ গম্ভীর। এক সঙ্গে দুটো অদ্ভুত বিপরীত ভাব কাজ করছে। কিন্তু এর মধ্যে হাসি এলো কেন? মুখ গম্ভীর হলো কেন?

আত্মীয়া পরিচয় করালেন, আমার বড়দার বন্ধুর বড় মেয়ে নীলিমা, আর ভাইঝি কেতকী!

কেতকী মোটা, গোলগাল আর গম্ভীর, নীলিমা রোগা ছিমছাম, আর হাসিমুখী। এখন বলতে বাধা নেই, প্রথম দর্শনে নীলিমাকেই আমার ভাল লেগেছিল। সে ভাললাগার মাপ নেই, কোন সংগতি নেই। সৌরমণ্ডলের কোন কিছুর সঙ্গে তার তুলনা চলে না। তার উপলব্ধি কেবল আমিই জানি। ঘরটা আমার ছোট, ও'রা যেমন ধরছিলেন না, আমিও যেন নিজেকে আর ওর মধ্যে ধরে রাখতে পারছিলুম না। আমার টেবিলের সামনাসামনি ঘুলঘুলি জানালার চোখে উধাও আকাশের কল্পনার মত আমার মানসিকতা। জানালাটা যদি বড় হতো, ঘরটা যদি প্রশস্ত হতো!

ও'রা বেশীক্ষণ বসলেন না। ওঠবার সময় নীলিমা বললে, এই তো কাছে আমাদের বাড়ী, আসতে পারেন তো!

ওর কথা বন্ধ ঘরে কোন ফাঁকে আলোবাতাস আসার মত, উত্তরে কিছু বলতে পারলুম না, কিন্তু মৌনতায় নিজেকে এই আমন্ত্রণে যেন উজাড় করে' দিলুম, অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে বললুম, পারি না আর! নিশ্চয়ই পারি!

সেদিন মনে মনে নীলিমার আমন্ত্রণে যতই সাড়া দিই না কেন কাজে কিন্তু কোনই সাড়া জাগাতে পারিনি। যাই-যাই করেও যাওয়া হয়ে ওঠে নি। ওদের শেষ আমাদের শুরুতে। কয়েকদিন কলেজের গেটে চোখাচোখি হয়েছে—স্মিত হাস্যে না-যাওয়ার জন্যে অপরাধ স্বীকার করেছি। আর যাব কি, কোথা থেকে যে কি জড়তা এসে জড়িয়ে ধরে, বুঝতে পারি না! শিহরণপুলকে আনন্দে বেদনায় কতদিন মনে হয়েছে, নীলিমাকে কি আমি ভালবাসি? ভালবাসার চেহারা কি আমার এই জড়তা? কেন পারি না, মুখর হতে সপ্রতিভ হতে, নিজেকে তুলে ধরতে? ওরা কি ভাবে? একটা অভূতপূর্ব মানসিক বিপর্যয়ে দিন যেতে লাগল। নিজে যেটা বুঝি সেটা বোধহয় আর কেউ বোঝে না, বড় একলা একলা মনে হয় নিজেকে। নীলিমা সে তো অনেক দূর।

আমি না গেলেও ওরা কলেজ ফেরৎ আমাদের বাড়ী হয়ে' প্রায়ই ফিরতো। আমার উৎফুল্ল হবার কারণ আছে তবুও কেন জানি না মনে মনে স্বস্তি পেতুম না এই ভেবে, নীলিমারা হয়তো আমার কথা ভেবে এখানে আসেনি। আমার আত্মীয়ার সঙ্গে আলাপের উদ্দেশ্যটাই মুখ্য।

ওরা এসেছে, জেনেছি তবু নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। মনে হয়েছে, নিজের বাড়ীতে ওদের সামনাসামনি হলে হয়তো ধরা পড়ে যাব। বাড়ী ফিরতে ফিরতে দুই সখীতে ছাতার আড়ালে আমাকে নিয়ে রহস্যালাপ করবে। দরকার কি!

তা হ'লেও দরকার হয়। সহপাঠিনী যখন, তখন বই দেওয়া-নেওয়ায় আপত্তি নেই। কয়েকবার বই দেওয়া-নেওয়া করলুম, কিন্তু শান্তি পেলুম না। মনের এই চৌর্যবৃত্তিটা কেমন ধিক্কার দিলে মনে মনে। কেন সহজ পথে সহজ ভাব প্রকাশ করতে পারি না?, ধিক আমাকে।

কারণটা অবশ্য ধরতে পেরেছিলুম, ঐ স্থূলাঙ্গী কেতকীই হলো আমাদের সহজ মেলামেশার দুস্তর বাধা। স্থূল-

দোহিনীর স্থূল মনোবৃত্তিটা যেন বড় স্পষ্ট। কেতকীকে কখনো হাসতে দেখিনি আমাদের মধ্যে। আলাপে আলোচনায় প্রাচীন ভগ্নস্তূপের মতই গম্ভীর সে, বক্তব্য প্রাগৈতিহাসিক শিলালিপির মতই নীরব। তুলনায় নীলিমা অতুলনীয়া, আধুনিকা। নীলিমা কেন একলা আসে না আমাদের বাড়ী?

একদিনের কথা আজো মনে আছে, কারো প্রথম প্রেমের উন্মেষ আবেগকে এমন করে কোন বিরূপাও বোধ হয় এত হতশ্রদ্ধা করে না। মনে পড়ছে, সেদিন বোধ হয় কি একটা ছুটি ছিল। সকাল বেলার ঘুম-চোখে কোথা থেকে নাবোঝা আনন্দ যেন উপছে পড়ছিল। দিক্‌ভ্রান্ত একটা তরুণ আলোকরেখা কানে কানে কথা কওয়ার মত আমার বিছানার ওপর এসে পড়েছে। সঙ্কল্প করলুম, আজ দুপুরে নীলিমাদের বাড়ী। প্রিয় সান্নিধ্যের স্বপ্ন এই ভোরের আলো।

হেঁটে যেতে পারতুম কিন্তু কি মনে করে সাইকেলটাকে সহায় করেছিলুম। হয়তো কপালে দুর্দৈব লেখা ছিল। একটা দুর্ঘটনায় পড়তে হলো, হাত-পা ছড়লো, রক্তারক্তি হলো, উপরন্তু পথচারীর গালাগাল। মনে করেছিলুম, ফিরে আসবো—এ অবস্থায় কোথাও না যাওয়াই ভাল। কি ভাববে ওরা? আরো ঐ ভাবার জন্যে যেন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় যাওয়া দরকার—নীলিমা যা ভাববে তা আমার কল্পনাকে প্রখর করলে। গায়ের ধুলো ঝেড়ে হাঁটুর রক্ত মুছে এগিয়ে চললুম।

বরাত আমার সত্যিই মন্দ। নীলিমা নেই, ঘর অন্ধকার। যথারীতি চাকরটা এসে জানালাগুলো খুলে দিয়ে গেল বটে; কিন্তু গলির মধ্যে ঘর বলে আলো তেমন খুললো না। জিগ্যেস করতে বললে, ছোড়দিমণি তো নেই।

তা হ'লে—

কেতকীকে ডেকে পাঠাব কিনা ভাববার আগেই চাকরটা বললে, বড়দিমণি আছে, ডেকে দেবো?

না, থাক। এই বইটা দিয়ে দিস্। দুর্ঘটনায় যত-না আঘাত পেয়েচি, তার চেয়ে দেখা-না-হওয়ার আঘাত প্রচণ্ড। আর কেতকীর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ।

যত নষ্টের গোড়া সাইকেলটাকে আছাড় মেরে রাস্তায় নামালুম। ঠিক আজকেই নীলিমা নেই!

পিছন থেকে ডাক এলো, চললেন

ফিরে দেখি, কেতকী। হঠাৎ যেন একটা দোষ করে ফেলেছি তাই উনি কৈফিয়ৎ চাইছেন—এমন বিশুষ্ক নারী-কণ্ঠ। বললুম, না, মানে বইটা দিতে এসেছিলুম।

কেতকী অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ভয় চকিত হলেও সেদিন তার মূর্তিটা স্পষ্ট দেখেছিলুম—চোখে ভাসছে এখনো। হ্যাঁ, মোটাই যে-কোন তরুণীর পক্ষে, মুখের গম্ভীর আবরণ তুলে নিলে হয়তো ভালই দেখায়—সামান্য একখানা সাড়ি-ব্লাউজে নিস্পিষ্ট দীপশিখার মত ম্লান, স্বেদে ক্লেদে কেমন যেন থস্‌থসে।

আমি দোরগোড়ায়, কেতকী ঘরের মাঝখানে। ঐ একটি মাত্র প্রশ্ন ছাড়া ও আর কিছু বললে না। আমি এর পর কি করবো ভেবে পাচ্ছি না, ন যযৌ ন তস্থৌ।

কি ভূত চাপল। বললুম, আজ যা এ্যাকসিডেণ্ট হয়েচে—বরাত জোর তাই বেঁচে গেছি, আর একটু হলে হয়েছিল আর কি!

আশ্চর্য কেতকী কোন আগ্রহ প্রকাশ করলে না, দোরের সামনে একটু কেবল সরে এসেছিল শুনে।

তবু আমার উৎসাহ কমেনিঃ আপনা-দের এখানে আসতে গিয়ে সাইকেলটা এমন কাণ্ড করলে—

মুখে কিছু না বলে কেতকী আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। যেন দুর্ঘটনার কথা তার বোধগম্য হচ্ছে না।

করুণা আকর্ষণের জন্যে কি বাহাদুরী নেবার জন্যে আজ মনে নেই—বললুম, খানিকটা রক্তপাতই হয়ে গেল। উঃ বড় বেঁচে গেছি!

মনে হলো, কেতকীর চোখদুটো যেন হঠাৎ জ্বলে উঠলো—বিশুষ্ক নির্লিপ্ত কণ্ঠে জানালে, নীলি তার মামার বাড়ী গেছে আজ সকালে।

বুঝতে পারলুম না, আমার দুর্ভোগের সহানুভূতিতে ছোট বোনের অনুপস্থিতির বারতা দেবার কি মানে হয়। তা ছাড়া সে খবর তো অনেক আগেই আমি পেয়ে গেছি।

সেদিন এই দুঃখ নিয়ে ফিরে এসে-ছিলুম, আহা উহু তো দূরের কথা একটা মৌখিক সৌজন্যও পর্যন্ত ঐ ধুমসিটার জানা নেই। 'নীলিমা নেই!' যেন তাকেই শোনাবার জন্যে নিজেকে দুর্ঘটনার মধ্যে ফেলে দিয়েছি। ইচ্ছে করলে দুটো সহানুভূতিসূচক কথা বলে' তুই তো সেদিন আমার চিত্ত জয় করতে পারতিস। ভাল না লাগলেও ভদ্রতা বলে একটা জিনিষ আছে তো। হঠাৎ 'চললেন' বলে' আপ্যায়িত করবার তো কোন দরকার ছিল না। বাড়ী ফিরে সেদিন কেতকী-দের মত মানসিক জড় হৃদয়হীনা মেয়েদের মৃত্যু কামনা করেছিলুম। নীলিমা থাকলে নিশ্চয়ই এমনটা হতে পারতো না, সহানুভূতির সঙ্গে আর যা প্রত্যাশা করে-ছিলুম সেদিন, সেতো আপনারা বুঝতেই পারছেন।

আর বেশিদিন আমাকে এমন দুর্ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়নি। সেকেণ্ড-ইয়ারে উঠতে একদিন শুনলুম, নীলিমার বিয়ে। অতিশয় যোগ্যপাত্রের সন্ধান পেয়েছেন নীলিমার অভিভাবক। বলবার কিছু নেই, যথাসময়ে আমরা সবান্ধবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম। কদিন ধরে আমার আত্মীয়াটির মুখে নীলিমার ভাবী সৌভাগ্যের কত ব্যাখান ঃ কন্দর্প কান্তি, সদ্বংশসম্ভূত, উপার্জনক্ষম পাত্র। যাকে বলে রূপে-গুণে আলো করা!

আত্মীয়াটির কোন দোষ নেই। তিনি আমার মনোভাবের কোনই খবর জানতেন না। আর জানবারও কোন প্রয়োজন ছিল না বোধ হয়, ষোল সতের বছরের একটি যুবক সমবয়েসী একটি যুবতীর প্রেমে পড়ে নিভৃত কামনায় স্বপ্ন রচনা করবে, এ কারো ধারণার বাইরে। ভালবাসার কোন লক্ষণই তো সেদিন আমার মধ্যে প্রকাশ পায়নি। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না সে-খবর—সহপাঠিনী নীলিমাকে আমি কিভাবে গ্রহণ করেছি। নীলিমা বোধ-হয় আজো জানে না।

কদিন ধরে কেবলি মনে হয়েছে, একি হলো? কেন এমন হলো? কি দোষ করেছি আমি? বোধ হয় অসহায় অভিমানে কেঁদেছিও সেদিন। সে-ছেলে-মানষীর কথা মনে করে আজ সত্যি হাসি পাচ্ছে—যুক্তিহীন অদ্ভুত ভালবাসা! নীলিমা কি জানতো আমি তার প্রণয়ী?

কেন জানবে না, আমি তো ভালবেসেছি? আমার মন দিয়ে তার মন কিছু দেখলে না কেন? কেন সে এরি মধ্যে বিয়ে করবে? সৎপাত্রে হলেও নীলিমার এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করা অন্যায়!

নীলিমার বিয়ের দিন অনেক রাত পর্যন্ত আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে পাগলের মত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি—বেদনাকাতর মনের অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি ঃ কেন, এমন হলো?

হয়তো আমার মনের ঠিক অবস্থাটা বোঝাতে পারছি না—আর পারলেও তা আজ আপনারা বুঝবেন না।

আমার ছোটঘরের ছোট জানালার বাইরে সারারাত ধরে আকাশ বোধ হয় বেদনাবিধুর হয়ে' গিয়েছিল গৃহাভ্যন্তরে অতন্দ্র এক জোড়া চোখের অঝোর কান্নার সহানুভূতিতে। সেই সকালের সেই স্বর্ণস্মৃতি কেন অপহৃত? বড় জানতে ইচ্ছে হয়েছিল, নীলিমা কি আমার মনের কোন খবরই রাখেনি সত্যি? বোনে বোনে কেউ কম যায় না দেখছি।

কুড়ি বছর আগে একদিন নিভৃতে অশ্রুসংবরণ করে 'জগৎ মিথ্যার' মনোভাব পোষণ করেছিলুম—কিছু না, সব মিথ্যে, প্রেম-ফ্রেম সব বাজে!

উঠবো উঠবো করছি, এমন সময় আপ্যায়নকারীদের একজন এসে অতি বিনয় সহকারে জিগ্যেস করলে, আমাদের মধ্যে কেউ অবনীবাবু আছেন কিনা।

একটা সকৌতুক প্রশ্ন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে থেকে নিঃশব্দে উচ্চারিত হলোঃ কেন, কি ব্যাপার!

অনুসন্ধানকারী সহাস্যে বললে, তাঁকে একবার ভেতরে ডাকছেন।

তিনকড়িবাবু আমাকে লক্ষ্য করে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন বেশ তো হে, আমাকেই তুমি বলনি এ'দের সঙ্গে তোমার আত্মীয়তা আছে!

আত্মীয়তা নেই, একথাটা এখন বলা বোধ হয় ভাল দেখাবে না। তা ছাড়া অন্দরমহল থেকে যখন ডাক এসেছে তখন পড়ে-পাওয়া একটা আত্মীয়তার সূত্র নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হয়েছে সে বিষ্টুবাবুর দিক দিয়েই হোক বা বিষ্টুবাবুর কোন নিমন্ত্রিত আত্মীয়ের তরফ থেকেই হোক।

সসঙ্কোচে জড়িত পদক্ষেপে অন্দর মহলের দিকে এগলুম। কি জানি কেন, বিস্ময়ে উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছিল। অনেকবার আমার দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তিটি কে জানবার ইচ্ছে হয়েছিল —কিন্তু মুখফুটে কিছুতে জিগ্যেস করতে পারিনি।

একি, এযে দেখছি কেতকী! আরো মোটা, আরো যেন ভারি হয়ে গেছে। সবই সেই আছে, মনে হলো, নেই যেন সেই গাম্ভীর্য! বয়েসে প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার সহজ হয়েছে। কেতকী কৌতুকময়ী, সুহাসিনী।

মেদবহুল হলেও কেতকী স্বচ্ছন্দগতি। এতটুকু জড়তা নেই আজকে তার ব্যবহারে। আমাকে অপ্রস্তুত করে' সহাস্যে জিগ্যেস করলে, চিনতে পারচো?

দস্তুর মত থতমত খেয়ে গিয়েছিলুম। একে অপরিচিতা মহিলা তায় আবার তুমি সম্বোধন। চিনলেও অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতে পারিনি।

কেতকী সাগ্রহে আহ্বান করলে, এস।

আমার বিস্ময়-বিহ্বলতা তখনো কাটেনি। সম্ভব-অসম্ভব নানা কথা মনের মধ্যে জট পাকিয়ে উঠলো। কেতকীর আহ্বানে কুড়িবছর আগে ঘটা সেই সাইকেল দুর্ঘটনাটা চকিতে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এও কি একটা দুর্ঘটনা নয়?

ইতস্তত এবং অপ্রতিভ ভাবটা কিছুতে যেন যাচ্ছিল না। কেতকী তাড়া দিলে, এস না, লজ্জা করবার কেউ নেই এখানে।

লক্ষ্য করলুম, একঘর সুচারু, সকৌতুক কটাক্ষের নিঃশব্দ তরঙ্গ ভঙ্গ। কেতকীই সবার মধ্যে বর্ষীয়সী। বাকদত্তা কন্যাটিও আছে।

কেতকী বললে, মনু এ'কে প্রণাম কর, তোমার—

বোধহয় সম্বন্ধ কিছু একটা নির্দেশ করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কি সম্বন্ধ? মনে হ'লো কেতকী ইচ্ছে করেই থেমে গেল। তিনকড়িবাবুর ভাবী পুত্রবধূ আমার পায়ে হাত দেবার আগেই তাড়াতাড়ি হাত দুটো তার ধরে ফেলে নিবৃত্ত করলুম, থাক্ থাক্, হয়েচে!

একপাশে দাঁড়িয়ে কেতকী পরিচয় করালে, নীলির বড় মেয়ে!

বিস্ময়ের আর সীমা নেই। এ কি কাণ্ড আজ সংঘটিত হচ্ছে! এরপর হয়তো নীলিমা এসে সামনে দাঁড়াবে, সহাস্যে কৌতুক করবে, চিনতে পারছো? পুরোন দিনের চোখে চিনে নেবার ক্ষমতা আমার হয়তো লোপ পেয়েছে, তাই সরমে-জড়তায় নিশ্চেষ্ট কণ্ঠে বলবো, ভাল আছেন।

একটু যেন অভিমান হ'লো, অভ্যর্থনাটা কি নীলিমা করতে পারতো না! কেতকীকে সামনে ঠেলে দেবার কি মানে হয়!

আমি কোন প্রশ্ন করবার আগেই কেতকী বললে, নীলি মারা গেছে, আজ পাঁচ ছ বছর, ঐ একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। বেচারা বিষ্টুবাবুরই কষ্ট, মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতে হয়! কাছেপিঠে থাকি যখন—

মনে হলো, এ সংবাদটা কেতকী আমাকে না দিলেই পারতো। নীলিমার বাঁচামরায় আমার যখন সমান লাভ। খবরটা না পেলে তবু তো ভাবতে পারতুম, বয়েস কালে নীলিমা পর্দানসীন হয়েছে—যার তার সামনে বেরুতে তার লজ্জা করে!

মনু জড়-সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো মায়ের স্মৃতিটা তাকে বেদনা দিয়েচে। ঘরে আরো যারা ছিল তারাও যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, কেতকীর এই ঘরোয়া আলাপে।

মনুকে বললুম, তুমি বস মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

মনু গিয়ে সমবয়েসী সখীবান্ধবীদের মধ্যে বসল। কিন্তু ঘরে ঢোকবার পূর্বে ঘরের যে আবহাওয়া ছিল সেটা আর কিছুতে ফিরে এল না। কেতকীরও কথা যেন ফুরিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে ওঠবার প্রস্তাব করতে কেতকী বললে, এরি মধ্যে উঠবে! কেন?

ওদের সঙ্গে ফিরবো।

নাই বা ওদের সঙ্গে গেলে, বস না আর একটু—

শুধু শুধু চুপচাপ বসে থাকা যে অস্বস্তিকর উনি, কি বোঝেন না? বুঝি না এ খাতিরের মানে কি; বললুম, একসঙ্গে এসেচি—

কথাটা উড়িয়ে দেবার মত করে কেতকী হেসে বললে, তাই একসঙ্গে যেতে হবে! কেন?

এ কেন'র কি জবাব দেব ভেবে পেলুম না। অনেকটা জুলুমের মত মনে হ'লো। আমাকে নীরব দেখে কেতকী বললে, আমি যদি তোমাকে পৌঁচে দিই, আপত্তি আছে কিছু? কোথায় থাক তুমি?

হেসে বললুম, এক যাত্রায় পৃথক ফল হ'বে।

সংসারে তাই তো হয়, তোমার একা নাকি? কথাটার মানে বোধ হয় হঠাৎ কেতকীর খেয়াল হয়েচে, নিজেকে সংশোধন করলে, পৃথক্ ফল আর কি! অনেকদিন পরে দেখা, নয় একদিন এক-সঙ্গে গেলে।

সত্যি ভারি অবাক লাগছিল, কেতকীর এই আলাপ আপ্যায়ন। কুড়ি বছর পূর্বে হলে কেমন লাগত বলতে পারি না, কিন্তু আজ বড় বাধ-বাধ ঠেকছে, তায় এতগুলো তরুণী সেই থেকে প্রায় হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে—যেন একটা অদ্ভুত জীবকে ধরে-বেধে দর্শনীয় করা হয়েছে।

বাইরের ঘর থেকে সংবাদ এল, ও'রা সব যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন, অর্থাৎ বিল্টুবাবু ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন এতক্ষণে।

বার্তাবহকে কেতকী এক কথায় বিদায় করলে, বল উনি পরে যাবেন, আলাদা!

অবস্থাটা আমার ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে আসছে। আমার লজ্জা পাওয়ার বোধহয় শেষ হবে না। কে জানে কি মনে আছে কেতকীর। যে ঘরে বসেছিলুম, সামনের জানালা দিয়ে আকাশের অনেকটুকু দেখা যায়। ইতিমধ্যে খর রৌদ্রের তেজ কমে কখন স্নিগ্ধ হয়ে গেছে—মনে হয়, আকাশপারের কোন এক অদৃশ্য ছায়ার দোলা।

তা প্রায় পাঁচটা বাজে। বললুম, আমাকেও তো ফিরতে হবে—অনেক বেলা হয়ে গেছে।

কেতকী আজ আমার সব কথায় কাটান দেবে, বললে, হলেই বা! অত তাড়া কিসের? আমিও তো যাব।

এ এক বন্দী অবস্থা মন্দ নয়। বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, কেতকী কিন্তু আমার আসা থেকে স্থির হয়ে বসে নেই। আসছে, যাচ্ছে, কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে ঘুরে আসছে।

জানালার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কের মত ভাবতে লাগলুম, আজ যদি নীলিমা বে'চে থাকতো তা হ'লে কি এমনি করে চিনে নেবার ঘটা করতো? কেতকীর মত এগিয়ে এসে বলতো, আমাকে চিনতে পারচো?

কিছু বিশ্বাস কিছু অবিশ্বাসে মনটা বড় উদাস হয়ে যায়। আমার অস্তিত্ব ভুলে অদূরে মনুরাণীকে ঘিরে রহস্যালাপ ক্রমেই চকিত হয়ে ওঠে। মনুরাণী আজ ওদের চোখে বিজয়িনী, সার্থকসিদ্ধা। ওদের মধ্যে আমার বসে থাকাটা আর ভাল দেখাচ্ছে না, নিজের সম্মানেও বাঁধছে।

কেতকী এসে ডাকলে, এস ও ঘরে, একটু চা খাবে।

এখন যে কোন অজুহাতে এঘর থেকে যেতে পারলেই যেন বাঁচি। মনুর বান্ধবীরাও যেন তাই চাইছে। বেচারারা প্রাণখুলে আলাপ করতে পারচে না।

চায়ের টেবিলে কেতকীকে বড় ক্লান্ত মনে হ'লো—ঘর্মাক্ত কপালে অনুলিপ্ত চূর্ণ কুন্তলে অব্যক্ত অনুরাগের স্পষ্ট অভিব্যক্তি। কেতকী আমাকে ভালবাসে, কি আশ্চর্য? পুলকিত হবার চেয়ে যেন শঙ্কিত হলুম।

কেতকী বললে, খাবারগুলো খেলে না যে! না না খেয়ে নাও।

অবেলার খাওয়াটা এখনো গলা থেকে নামেনি, আর চলবে না। খাবারের ডিস্‌টা সরিয়ে রেখে বললুম।

তুমি তো খুব খেতে পারতে। নাও, এ কটাতে কিচ্ছু হবে না, ডিশটা আমার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে কেতকী বললে।

সে দিন কাল কি আছে না, সে বয়েস! ডিশটা ঠেলে রাখলুম।

কেতকী আর পেড়াপীড়ি করলে না। ক্ষুণ্ণ না হলেও তাকে গম্ভীর মনে হলো। অনিচ্ছুক হাতটাকে বাড়িয়ে দিয়ে একসময় দু'একটা খাবার গলাধঃকরণ করলুম। কেতকীর মুখটা স্মিত হয়ে উঠেছে। অপরাহ্ন বেলার অপরূপ আলোকে বিস্মৃত দিনের স্মৃতি কুড়নর মত।

গাড়ীতে পাশাপাশিই বসতে হ'লো, কিছুতেই কেতকী ড্রাইভারের পাশে বসতে দিলে না। কেন, পাশাপাশি বসলে দোষটা কি। দোষের কিছু না থাক, আমার সঙ্কোচের কথাটা ওকে জানানই বৃথা।

গাড়ীতে জিগ্যেস করলুম, কই, আপনার স্বামীকে তো দেখলুম না।

কেতকী হাসলে, উত্তর দিলে না। নীরবতাটা অস্বস্তিকর। জিগ্যেস্ করলুম, আপনার ছেলেপুলেও বোধ হয় কেউ আসেনি?

হাসিটা নিভে গেছে, কথাটা না তুললেই যেন ভাল করতুম, কেতকী বললে, থাকলে তো আসবে?

দুঃখুর কি আছে, ভালই তো ঝামেলার হাত থেকে রেহাই। বললুম, হয়নি বুঝি?

কেতকী হেসে বললে, না, কেন?

অপ্রস্তুতের মত বললুম, না, তাই জিগ্যেস্ করচি!

একটা গলির মধ্যে দিয়ে গাড়ীটা বড় রাস্তার সন্ধান করছিল। কি কৌতূহল হলো বললুম, আপনার স্বামীর কি বিস্‌নেস্?

কেতকী বললে, বিসনেস নয়, চাকরি।

দোষারোপের মত বললুম, ছুটির দিনেও চাকরি! কি চাকরি?

সুরটা যেন ব্যঙ্গের, কেতকী বললে কি আবার! সাহেবী, দিল্লী-সিমলে কলকাতা, লাট্-বেলাটের হুজুরে হাজির।

জিগ্যেস করলুম, আপনার স্বামীর নাম কি চারুচন্দ্র সেন?

কেতকী সশব্দে হেসে উঠলো, হাঁ তিনিই বটে।

আর আমার বলবার কিছু নেই, কত বড় একজন বিখ্যাত চাকুরের স্ত্রীর পাশে বসে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দস্তুরমত রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

বাকি পথটুকু ভয়ে ভয়ে রইলুম পাছে কেতকী আবার পাল্টা প্রশ্ন করে আমার চাকরির দৌড় কদ্দুর? চুনোপুঁটি তবু ভাল, না-ফোটা ডিম, আঁজলা ভর্তিতে কোন ওজন নেই।

না সে বিষয়ে কেতকীর শিক্ষা প্রশংসনীয়—আমার আয়ের পথে আদৌ কৌতুহল প্রকাশ করলে না।

একবার কৌতুক করে শুধু জিগ্যেস করলে, চাকরি জগতে আমার স্বামী বুঝি কেষ্ট-বিষ্টু?

বাইরের বড়, কখনো ঘরের বড় নয়। প্রামাণিক কিছু বললেও কেতকী বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি তো জানি, চারু বাবুর পদের গৌরব বাঙ্গালীর কতখানি মর্যাদার—অনেকের লাভের এবং লোভের বিষয়।

কেতকী বললে, খুব বিখ্যাত বুঝি? জড়িত কণ্ঠে বললুম, হ্যাঁ!

কি হিসেবে, কাজের জন্যে না আর কিছু? কেতকীর স্বরটা বড় রূঢ় মনে হলো।

সাংঘাতিক কাজের লোক! বিশেষণটা বেখাপ্পা, তবু কিছুটা মনের ভাব প্রকাশ করলুম বোধহয়।

কেতকী হেসে উঠলো, সাংঘাতিক! ঠিক বলছো?

খানিক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হ'লো না। মাঝে মাঝে আড়চোখে চেয়ে দেখলুম, বাইরের দিকে চেয়ে কেতকী কেমন তন্ময় হ'য়ে আছে। কুড়ি বছর আগে আমার সাইকেল এ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনে যেন ঐ রকম তন্ময় হ'য়েছিল। আমার প্রতি অবজ্ঞা ভেবে সেদিন কেতকীর মৃত্যু কামনা করেছিলুম।

কখন যেন কেতকী অনেকটা ঘে'সে এসেছিল, চুলের মাত্র ব্যবধানে গায়ের গন্ধ সুরভিত। পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আমার শিহরিত, শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ।

হঠাৎ আমার হাতের ওপর নিজের হাতটা গ'ুজে দিয়ে ধরা গলায় কেতকী বললে, আমাকে কেউ পছন্দ করে না, কেন বলতো? ভালবাসা কেউ বোঝে না।

প্রশ্নটা ব্যক্তিগত। কি ধরণের উত্তর মনঃপুত হ'বে বুঝতে পারছি না, গাঢ় করে' কেতকীর হাতটা কোলের মধ্যে চেপে ধরলুম। মনে হ'লো, কেতকী কাঁপছে।

দুঃখু করে' লাভ কি! সান্ত্বনার স্বরে বললুম, বোঝাবার সাহসের অভাব।

চোখ মুছে কেতকী বললে, মনুকে তাই গোড়া থেকে সাহস দিয়েচি, বিষ্টুবাবু তো শুরু থেকে বেঁকে ছিলেন!

গাড়িটা জনবহুল রাস্তায় এসে পড়ল। কেতকীর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললুম, ওরা আজকালকার ছেলে-মেয়ে, আমাদের চেয়ে ঢের বেশি সাহসী!

কেতকীর বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস হ'লো না—নিঃশব্দে হাসলে।

স্ত্রী জিগ্যেস্ করলেন, খাওয়া-দাওয়া কেমন হ'লো?

চমৎকার!

মেয়ে কেমন দেখলে?

চমৎকার!

মেয়ের বাপের অবস্থা কেমন!

চমৎকার!

রবি তা হ'লে চালাক আছে বল, ওদিকে ঠিক হ'ুশিয়ার?

হয়তো!

এই বল্লে সব চমৎকার, আবার হয়তো কেন?

না, এমনি!

সব তাতেই হে'য়ালী তোমার! রবির-মা খুব দাঁও কষলে, কি বল?

স্ত্রীকে এখন বলাই বৃথা, যেখানে যতই লাভ-লোকসানের প্রশ্ন থাক না কেন ওদের দুজনের মনে ও প্রশ্নের কোনই স্থান ছিল না, এখনো নেই বোধ হয়।

শেষ হোক

শৈলেন নিয়োগী

অনেক রাতের ছায়ারা এসেছে নেমে
চুপি চুপি এই তুষার দেশের বুকেঃ
নীলের আভাষ আকাশের কোণে কোণে
দৃষ্টি হারালো অজানা সকৌতুকে।

স্বপ্নের স্মৃতি তবু আছে সঞ্চয়,
ঘুম ভাঙা চোখে ছোট ছোট ঢেউ তুলে,
সোনালী ফসল নিয়ে গেছে মহাকাল,
তবু তারি ধ্বনি মরুভূর উপকূলে।

কালের সজাগ প্রহরী দেখেনি চেয়ে,
এতটুকু বোঝা পিছে পড়ে রয়ে গেলো,
তৃপ্তির রাতে অবসর কই হাতে,
হিসেবী বাতাস হবে নাকি এলোমেলো!

রামধনুকেরা কালো হয়ে গেছে কবে
সাদা তারাদের মায়া শুধু চোখে জাগেঃ
মরে যাওয়া সব ঝিরঝিরে দিনগুলো
ইশারা জানায় একটানা অনুরাগে।

ধান-কাটা মাঠে বুনো ঝড় কেঁদে ফেরে,
কারা যেন আনে শঙ্কিত করাঘাতঃ
বিস্মরণীর তীর হতে হাতছানি।
শেষ করে আজো দেবে না উদাসী রাত!

দুটি কবিতা

হীরালাল দাশগুপ্ত

তিতীর্ষা

জীবনের গতিতে, আগামী ও অতীতে, কবি, তুমি ছন্দ দিও।
আলো আর ছায়াতে, কল্পনা কায়াতে, প্রেম অভিনন্দনীয়।
কালে কালে মহাকাল সভ্য না বর্বর?
শতকের সুন্দরী বন্ধ্যা না উর্বর?
উদ্যত-বল্লম-পাণি,
দিকে দিকে মূঢ়তা-সেনানী,
করে নব জীবনের বাণীরে
স্তব্ধ!
ভালো আর মন্দে, দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে, বিঘ্ন অলঙ্ঘনীয়।
তবু কী আনন্দে, রচো কবি ছন্দে, কাব্য অনিন্দ্যনীয়।
কালের যাত্রা-পথে যন্ত্রের ঘর্ঘর।
কোথা সেই শিহরিত অরণ্য মর্মর?
অঙ্গনে বনানীরে আনি,
ফুলে ফুলে ভরি ফুলদানি,
কবি, তুমি করো বিজ্ঞানীরে
জব্দ!

দিধিষু

ভগ্ন প্রাচীর। ধু-ধু প্রান্তর। শূন্যে আগুন ঝরে।
ছাদ চৌচির। আগাছার পর মধুপেরা গুঞ্জরে।
কোথা মালবিকা? কোথায় মাধবী কুঞ্জ?
এ-যে আধুনিকা! পণ্ড প্রণয় গুঞ্জ
অধীর—
ভাগে দায়ভাগে ভুঞ্জ!
ভস্মলোচন। অশ্রুমোচন। শ্মশানের অভিযাত্রী।
দুর্মতি রতি। পলাতকা সতী। পরতনু বরদাত্রী।
খরতর রূপ। রুদ্র দিবস বন্ধ্যা।
কামনার ধূপ — তবুও — রজনীগন্ধা —
মদির,
ধূলি-ধূসরিত সন্ধ্যা।
ইষ্টক পথ। ইস্পাত রথ। হাউই ঊর্ধ্বগতি।
কামনা ক্লিষ্ট। মুনি বশিষ্ঠ। আকাশে অরুন্ধতী।

রূপময় ভারত

চিত্রাঙ্গদার দেশ মণিপুর

বিচিত্র এই মণিপুর। আসাম সীমান্তের এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি রূপময় ভারতের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বহন করে আজো তার শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। গিরিশ্রেণী পরিবেষ্টিত এই ক্ষুদ্র রাজ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যেমন লীলাভূমি, তেমনি নৃত্যে, গানে, শিল্পকলায় এদেশের নরনারী তাদের সমাজ-জীবনকেও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। ধর্মের সঙ্গে জীবনকে এরা একসূত্রে বেঁধে রেখেছে বলেই এদের সমাজ-জীবনে উচ্ছৃংখলতার প্রশ্ন নেই; কুসুমসদৃশ শোভায় এদের অন্তর ও জীবন তাই প্রস্ফুটিত। মণিপুরের ইতিহাস যেমন বিস্তৃত, তেমনি বৈচিত্র্যময়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে আর্যরা এসেছিলেন অনেক পরে, সেই জন্য এই অঞ্চলকে বলা হয়ে থাকে 'পাণ্ডব-বর্জিত' দেশ। অথচ দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন হিড়িম্বার পাণিপীড়ন করেন, হিড়িম্বাপুর বা বর্তমান ডিমাপুরের কাছে কোন সুরম্য প্রদেশে। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন আরো একটু পূর্বদিকে নাগা পর্বতের নাগরাজ-দুহিতা উলূপির সন্ধান পান। উলূপি ছিলেন মণিপুররাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার প্রিয় সখী। অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মিলনে আর্য-সংস্কৃতির প্রসার ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গেল। চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন ও তাঁর রাজ্য মণিপুরের কথা মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। এটা গেল মণিপুরের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের কথা।

বাঙলা দেশের সঙ্গে মণিপুরের প্রথম যোগাযোগ ঘটে বৈষ্ণব ধর্মের মধ্য দিয়ে আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে। চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়েই নবদ্বীপ থেকে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাব গিয়ে পড়ে শ্রীহট্টে। শ্রীহট্টের আরেক দিকে শিলচর-বিষেণপুর পথ অতিক্রম করে সেই ধর্ম মণিপুরে প্রবেশ করেছিল, আর সেই সঙ্গে এসেছিল বাঙলার সংস্কৃতি ও বাঙলা ভাষা। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর গীতরসের বন্যায় মণিপুর প্লাবিত হয়েছিল। মণিপুরবাসী কুমারী-দের সখীপরিবৃত রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক নট্যাভিনয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন যে, বাঙলা ভাষার এক বর্ণ না বুঝেও তাঁরা শুধু ভক্তির অমোঘ শক্তি-বলে পদাবলীর কীর্তন নিখুঁতভাবে

আজো গেয়ে আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জাতীয় শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এক অপূর্ব নৃত্য-ভাষ্য রচনা করে এসেছে। ভারতের নৃত্যশিল্পধারার গৌরবময় সম্পদে মণিপুরবাসীদের দান অবিস্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ মণিপুরের ইতিহাস ও নৃত্যশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মহাভারতের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার প্রেমোপাখ্যান নিয়ে রচনা করলেন অপূর্ব কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা'। পরে তিনি শান্তিনিকেতনে মণিপুর থেকে নৃত্যশিক্ষক আনিয়ে বাঙলা দেশের সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের পরিচয় সাধন করালেন। মণিপুরী নৃত্যের খ্যাতি আজ শুধু বাঙলা দেশে নয়, বাঙলার বাইরেও প্রচারিত। এই নৃত্যকলার অন্তর্নিহিত অফুরন্ত রস-সম্পদ সর্বপ্রথম ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের চোখে। আগরতলার রাজপরিবারের কন্যাদের নৃত্যকলা দেখে মুগ্ধ হন। ১৩২৬ সনে রবীন্দ্রনাথ যখন শ্রীহট্টে যান তখন মাছিমপুর নামক পল্লীর মণিপুরী মেয়েদের রাস-নৃত্য দেখবার পর থেকেই শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নাচ শেখাবার
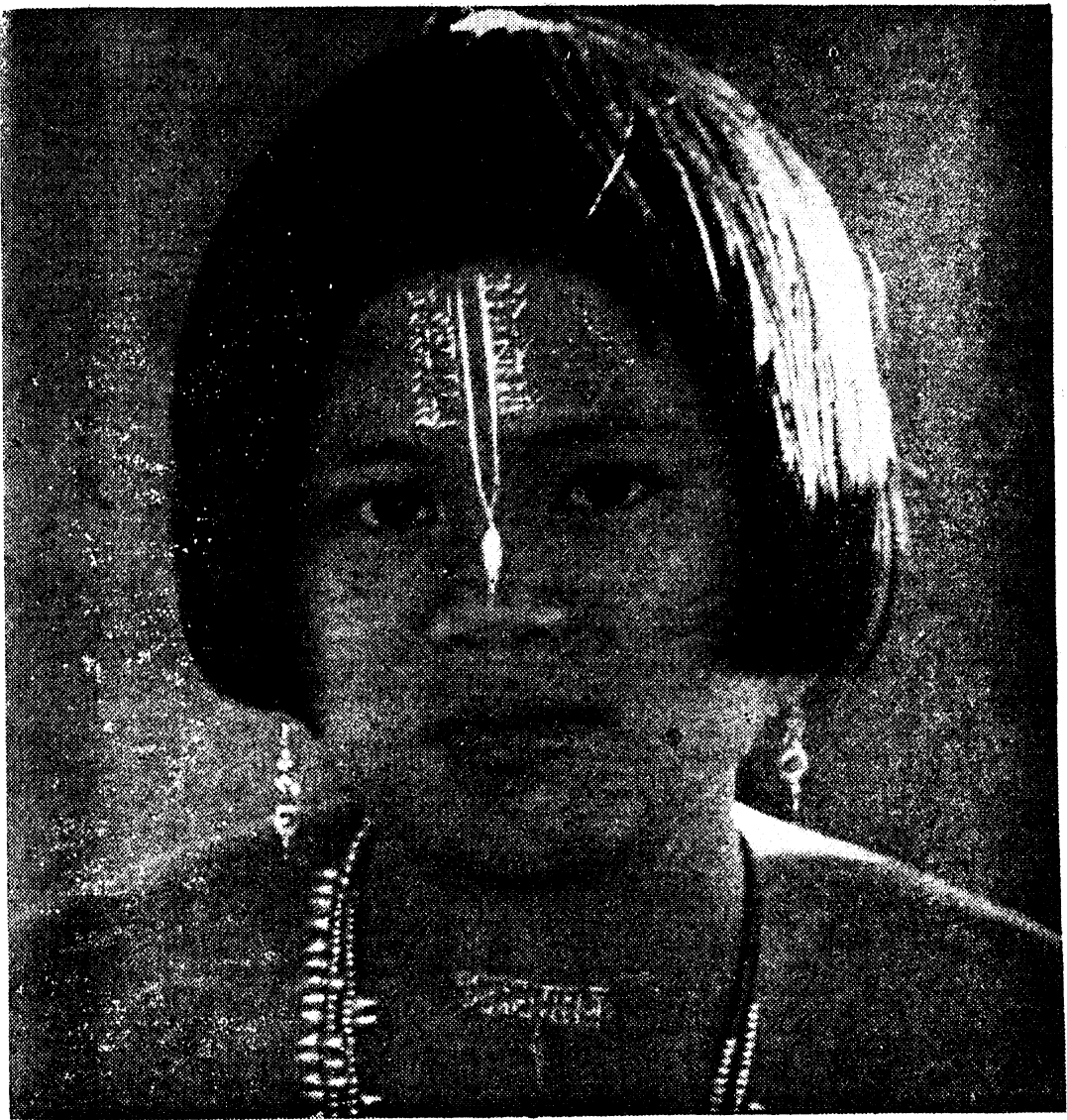
উদ্দেশ্যে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নবকুমার ঠাকুর এবং মণিপুর রাজ-পরিবারের বুদ্ধিমন্ত সিংহকে শান্তি-নিকেতনে আনিয়েছিলেন। মণিপুরী নৃত্য-চর্চায় যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা পারদর্শী হয়ে উঠলেন, তিনি তখন সেই নৃত্যরূপকে ধরে রাখবার জন্যে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যকে নৃত্যনাট্যে রূপদান করলেন। কাহিনীর আবেদনে ও মণিপুরী নৃত্যমাধুর্যে নৃত্যনাট্য 'শাপমোচন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ভারতের অন্যান্য পার্বত্যজাতির মত মণিপুরেও সমাজে নারীর প্রাধাণ্যই সর্বাধিক। সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়াও হাটে-বাজারে সর্বত্রই মণিপুরী নারীরাই কর্তৃত্ব করে থাকে; আবার নৃত্যোৎসবে নারীরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। মণি-পুরী কুমারীদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রূপ-মাধুরী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাথার সামনের দিকের চুল খুব ছোটো করে অর্ধ-বৃত্তাকারে ছাঁটা এবং কপালের উপর আঁচড়ানো, দুই পার্শ্বে দুই গোছা অলক কর্ণমূল বেষ্টন করে লম্বমান। নাকে চন্দনের তিলক, কপাল ও বক্ষো-দেশে চন্দনাঙ্কিত কৃষ্ণনাম। বৈষ্ণবধর্মে উৎসর্গিকৃত এই সব কুমারীরা নৃত্যের মধ্য দিয়ে আত্মনিবেদনের রূপকে তাই আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে।

নৃত্য আসরে কীর্তন গায়ক একজন মণিপুরী পুরুষ

মণিপুরী রাস-লীলার নৃত্যোৎসবে খোল-বাদক পুরুষ। মাথার উষ্ণীশ পরিধানরীতি লক্ষ্যণীয়

[ফটো : নীরদ রায়]

বাংলার লোকশিল্প ও কৃষ্ণনগর

দেবব্রত রায় চৌধুরী

মাটি তার সন্তান মানবকে দিয়েছে ফসল, দিয়েছে অন্ন, আর দিয়েছে মনের আরাম, প্রাণের আনন্দ, আত্মার শান্তি। প্রকৃতির প্রাঙ্গণে, নদীর ধারে পুকুর পাড়ে মানুষ কেবল ফসল ফলায়নি, মাটি নিয়ে খেলেছে, কত রূপ গড়েছে আর ভেঙেছে প্রতিদিনের চলতি মুহূর্তের খানিক কামনা বাসনার আনন্দ-বেদনার। গড়েছে সে তার প্রাত্যাহিক প্রয়োজনের তৈজস—হাঁড়ি মালসা সরা, আনন্দের মুহূর্তের সঞ্চয় কত অপরূপ খেলনা, আত্মার শান্তিময়ী রূপ অনিন্দ্য-সুন্দরী মৃন্ময়ী প্রতিমা। মাটির খেলনা ভেঙেছে মাটিতে মিশে গেছে আর প্রতিমা পুজোর শেষে জলে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। এ যেন সাগরবেলায় প্রদীপ জ্বালানো আর নেভানো। সে প্রদীপ একেবারে সব নিঃসীম অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে নিভে যায়নি। হাজারো বছর আগে যেমন মহেন দো জারোর যুগে সিন্দু নদীর তীরে বালকেরা পুতুল নিয়ে খেলত, গ্রামীনেরা পুতুল তৈরী করত বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে, পুকুর পাড়ে, নদীর ধারে, বাঙ্গালী ছেলে আজও তাই করে, বাঙ্গালী মাটির শিল্পী তেমনি মাটির কত শিল্প গড়ে তোলে। সেই শিল্পের প্রদীপ আজও জ্বলছে, অখ্যাত অজ্ঞাত ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত পল্লীর পালাপার্বণের কত খেলনা, পুতুল ও প্রতিমায়। রথের মেলায় আজও তো আগাডোম, বাঘাডোম, ঘোড়াডোম দুর্জয় তাজী ঘোড়ায় চড়ে এসে দেখা দেয় যেমন দেখা দিত বৌদ্ধ-যুগের শেষে।

অতীত বাঙলায় আর এক ধরণের মাটির কাজের প্রচলন ছিল। কাঁচামাটিতে দৈনন্দিন জীবনের কথা ও কাহিনীকে রূপায়িত করে তাদের ছাঁচ তৈরী করা হত। সেই ছাঁচকে পুড়িয়ে নিয়ে, তা দিয়ে তৈরী হত কত ফলক। এখন যেমন আমরা ছবি দিয়ে দেয়াল সাজাই সেদিনেও তেমনি ঐ সকল পোড়ামাটির শিল্পের ফলক দিয়ে দেয়াল সাজাতুম, কুলুঙ্গীতে তারা সাজানো থাকত। পাথরের স্বল্পতায় আমাদের বাঙলাদেশে যখন কোন বড় মন্দির বা বিহার তৈরি হত, তখন সেই মন্দিরের বাইরের দিক সাজানোর জন্যেও ডাক পড়ত গ্রামের মৃৎশিল্পীদের। তাঁরা এসে অতিঅল্প সময়ে ছাঁচের সাহায্যে মাটির ফলক গড়তেন। আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে মন্দিরের বহিরাঙ্গকে সাজিয়ে দিতেন, পল্লীর কথা কাহিনী ও ক্ষণস্থায়ী জীবন রূপ দিয়ে। দূর অতীতের পোড়ামাটির শিল্পের নিদর্শন রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে ময়নামতীতে পাওয়া গেছে। এরা কালজয়ী নয় পাথরের মতন। পাহাড়পুরে ছিল বৌদ্ধবিহার পরবর্তী যুগে হয়তো বা মন্দিরে পরি-বর্তন করা হয়েছিল। সেই বিরাট বিহারের বিস্তৃত দেওয়াল পাথরে কোঁদা শিল্প দিয়ে সাজানো, বাঙলায় এই পাথরের স্বল্পতার দেশে সম্ভব হয় নি। তাই তদানীন্তন, গ্রামীন শিল্পীদের ডাকা হয়েছিল। তাঁরা অতিঅল্প সময়ে ছাঁচে, আমাদের রামায়ণ মহাভারত, জাতক পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা প্রভৃতির গল্প ও কাহিনী আর জীবনের নানা চলতি রূপ, ঢেলে পাহাড়পুরে

সরস্বতী

বীণাবাদিনী

ময়নামতীর দেওয়াল চিত্রিত করেন। এই পোড়ামাটির ফলকগুলিই হল অতীত বাঙালীর লোক-শিল্পের প্রধান অভিজ্ঞান। অঙ্গকের দিক হতে এই শিল্পরূপ স্থূল মার্জিত, অসম্পূর্ণ, কিন্তু জীবনের অভিব্যক্তিতে বিস্তারিত মানবিকবোধে গভীর শিল্পরসে তাৎপর্যময়। ঐতিহাসিকেরা এদের কাল খৃস্টিয় প্রথম শতক হতে দশম শতক পর্যন্ত নির্ণয় করেছেন।

দশমশতক হতে ষোড়শশতক পর্যন্ত বাঙলার তথা ভারতের উপর দিয়ে বহু ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ষোড়শশতক হতে আবার এই লোক-শিল্পের আপেক্ষিক প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখা দেয়। চিরাচরিত অন্ধপ্রথার আগল ভেঙে মুক্তি পাগল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙলার সমাজ জীবন ও জাতি নূতন প্রাণে উজ্জীবিত হয়। শ্রীচৈতন্যের সাধনপীঠ নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে মৃৎশিল্পও গড়ে উঠে নূতন রূপ নিয়ে। কিন্তু নবদ্বীপের কৃষ্ণনগরের শিল্পে যে স্বচ্ছল গতিময়তা, প্রাণপ্রবাহ, প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন জীবনের সম্বন্ধ বস্তুময়তা ছিল, পরবর্তী যুগে, তাহা অভিজাতচক্র ও রাজপ্রাসাদের স্পর্শে আর রইল না। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৫৭ খৃঃ পর পলাশী-উত্তর যুগে, দেশজোড়া যখন অরাজকতা, অব্যবস্থা তখন শিল্পীদের আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পের বহু শ্রীবৃদ্ধি হয়, পোড়ামাটি, মাটি ও শোলার কাজের অপূর্ব উন্নতি হয়।

মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর আজও কৃষ্ণনগরে প্রায় ত্রিশ চল্লিশটি পরিবার বংশগত কলাকৌশল দিয়ে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে, শিল্পীরাও আধমরা হয়ে বেঁচে আছে। কারণ রাজপুরুষেরও সাহায্য নেই, সাধারণেরও শিল্প তৃষা নেই। বাঁচার তাগিদেই কৃষ্ণনগরের বহু শিল্পী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কলকাতায় কুমারটুলীতে এসে বাসা বাঁধেন। কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপের মাটির কাজ বাঙলার লোক-শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। পল্লীর শিথিল জীবনপ্রবাহ চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বয়ে চলে। তার শিল্পও চলে তারি তালে। হাজারো বছর আগে যে পুতুল নিয়ে বাঙলর শিশু খেলত আজও সেই পুতুল নিয়েই খেলে। বংশানুক্রমিক ধারায় শিল্পীর ছাঁচের তেমন পরিবর্তন হয় নি। রাজ্যের উত্থান পতন, বিপর্যয়ের ঢেউ দূর পল্লীজীবনকে নাড়া দেয় নি, কিন্তু রাজধানী কলকাতার কাছের জনপদ কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ প্রভৃতির জীবন আন্দোলিত হয়েছে রাজ্যের নানা আন্দোলনে। ঐ সকল স্থানের শিল্পের

শিব

ভগবান বুদ্ধ

রীতি ও গতি তারি সাথে পরিবর্তিত হয়েছে।

স্বদেশী যুগে বাঙলার নব জাগরণের দিনে জাতিকে অতীত ঐতিহ্য থেকে শক্তি ও সম্পদ আহরণ করবার জন্যে আহ্বান করা হয়। বাঙলার মৃৎশিল্পী কুমারটুলীর বিহারীলাল পালের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনিতাই-চরণ পাল সেই আহ্বানে সাড়া দেন। আচার্য নন্দলাল ও 'গগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের প্রেরণায় তিনিই প্রথম ওরিয়ে-ন্টেল শিল্পরীতিতে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সরস্বতী মূর্তি প্রস্তুত করেন। জন-সাধারণের মধ্যে যাতে শিল্পবোধ জাগে, রুচি জাগে, তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন যেমন বুদ্ধ, প্রজ্ঞাপারমিতা, সরস্বতী, নটরাজ প্রভৃতির পোড়ামাটির অনুকৃতি গড়ছেন আর অতিঅল্প মূল্যেই জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। কলিকাতার কুমারটুলীতে নিতাইচরণের কারুমন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। অতীত আর বর্তমানকে মিলিয়ে এই নূতন শিল্প রচনার প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ বৃহত্তর সম্ভাবনার ইঙ্গিত। বাঙলার স্থাপত্যবিদ্ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাচ্যরীতিতে যে সকল বাড়ি নির্মাণ করেছেন, তাদের অঙ্গ সজ্জায় নিতাইচরণের অবদান নেহাৎ অল্প নহে। পোড়ামাটির পল্লী জীবনের প্রতিলিপি দিয়ে তিনি সাজিয়েছেন। নিতাইচরণ কৃতী শিল্পী যদুনাথ পাল, রাখালচন্দ্র পাল, 'পরমেন্দ্র পাল, 'বক্রেশ্বর পাল, 'কালোহরি পাল, 'বিহারীলাল পালের উত্তর সাধক। কলিকাতার যাদুঘরে, বাঙালী পাট চাষী, নীল চাষী আরও পল্লী জীবনের যে সব প্রতিমূর্তি আছে, তাদের অধিকাংশই 'যদুনাথ পাল রচিত। তদানীন্তন নিখুঁত বাঙালী জীবনের নানা চিত্র তিনি ফটোগ্রাফারের মতন শিল্পে ধরে দিয়েছেন। ঐ শিল্পীরা কাষ্ঠ তক্ষণ ও মোক্ষণের কাজেও কৃতী ছিলেন। 'কালোহরি পালের পুতুল নাচের কথা আজও কাহিনী হয়ে আছে। তখন-কার কৃষ্ণনগরের শিল্পে প্রতীচ্য সভ্যতা ও শিল্পের ছাপ সুপরিস্ফুট, শিল্পে ও খেলেনায় দেখা দিল বস্তুতান্ত্রিকতা, অপূর্বকারিগরী, গ্রামীন, লোক-শিল্পের সেই বলিষ্ঠতা আর রইল না। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ নতুন শিল্পরচনার যে পথ-নির্দেশ করেছিলেন, নিতাইচরণ মাটির কারুশিল্পে সেই পথে পা দিয়ে নূতন পথ সৃষ্টি করে চলেছেন। কুমারটুলী ও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প একই। বর্তমানে আরও কয়েকজন মৃৎশিল্পে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তবে তাঁরা সকলেই আপন আপন বীক্ষণাগারে নব রচনায় রত। রচিত শিল্প সম্পর্কে মতামত প্রকাশের সময় এখনও আসে নি।
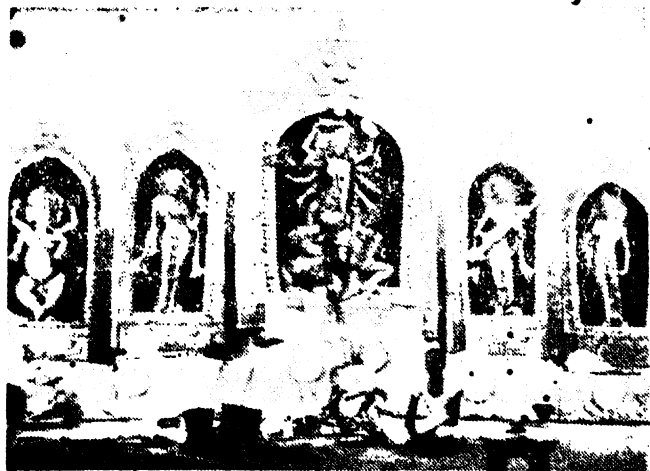
দুর্গা প্রতিমা

(প্রবন্ধে উদ্ধৃত মূর্তিগুলি শিল্পী নিতাই পাল কর্তৃক নির্মিত)

এই কিছুদিন আগে একটি ছাত্র জিগগেস করেছিল, শিক্ষকের জীবন সাধারণত নিরানন্দ জীবন, এ কথা কি সত্য? আর সত্য যদি হয় তার কারণ কি? বলেছিলাম, সকল শিক্ষকের জীবন নিরানন্দ হয় একথা আমি স্বীকার করি না, তবে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংসারিক নানাবিধ কারণের উল্লেখ না করে বিশেষ একটি কারণের উল্লেখ করেছিলাম। বলেছিলাম, শিক্ষকের বয়স বাড়ে, ছাত্রের বয়স বাড়ে না। ছেলেটি আমার কথা প্রথমে বুঝতে পারে নি। কথাটা ব্যাখ্যা করে বলতে হয়েছিল। ছাত্র নিয়েই শিক্ষকের জীবন। এই আমার কথাই ধর। প্রথম যখন শিক্ষকের জীবন শুরু করেছিলাম তখন বয়সের ব্যবধান ছিল কম। ক্রমে বৎসরে বৎসরে আমার বয়স বেড়েছে, কিন্তু ছাত্রের বয়স বাড়ে নি। একেক দল চলে যায়, আরেক দল আসে। বয়স সেই পনেরো আর ষোলো। টেনিসনের স্রোতস্বিনী গর্ব করে বলেছিল, মানুষ আসে আর যায়; কিন্তু আমি শুধু চলি আর চলি, আমার চলায় বিরাম নেই। শিক্ষক বলেন, "Boys may come and boys may go but I go on for ever." এর মানে কিন্তু আলাদা। ছাত্র আসে আর ছাত্র যায়, কিন্তু আমি সেই স্থাণু হয়েই বসে আছি। এটা তো গর্বের কথা নয়, এটা দুঃখের কথা।

পনেরো থেকে কুড়ি বছরের মানুষ নিয়ে কারবার। একদিন এদের সঙ্গে বয়সের ব্যবধান যদি ছিল সাত আট বছরের, আজকে সেই ব্যবধান দাঁড়িয়েছে তিরিশ বছরের। নিজের কথাই যখন বলছি তখন এই সূত্রে ছাত্রদের কাছে একটি কৃতজ্ঞতার কথা নিবেদন করি। এরা প্রতি বৎসরে নবজীবনের স্রোত বয়ে এনেছে। আমি সেই স্রোতের জলে অবগাহন করেছি। এদের কল্যাণে বয়সের ভার থেকে বহু পরিমাণে মুক্তি পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

এই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার
প্রাণের ঝরণা নিল তুলি,
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে,
সেই তো আমার আয়ু;
নাই সে কেবল দিন গণনার পাঁজির
পাতায়, নয় সে নিশাস বায়ু।

আমি ওদের দিয়েছি যৎসামান্য, কিন্তু ওরা আমাকে দিয়েছে উজার করে। দিয়েছে জীবন, দিয়েছে যৌবন। তথাপি ক্লান্তি এসেছে। আজ সেই ধার করা যৌবনেও ভাটা পড়েছে। মনে হয় অনেক দূরে চলে এসেছি। এক যুগের ব্যবধান। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এদের মনকে কি এখন আমি চিনি! যুগের পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন হয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। আমি যে দৃষ্টিতে দেখি এরা সে দৃষ্টিতে দেখে না। আমি যাকে ভালো বলি এরা তাকে ভালো বলে না। One man's food is another man's poison. শুধু মানুষের বেলায় নয়। এক যুগের ভালো জিনিস আরেক যুগে বরবাদ হয়ে যায়। ছাত্রের রাজ্য বয়স্ক শিক্ষকের কাছে অপরিচিতের রাজ্য। স্যার বিডিভিয়রের দশা—

Among new faces, other minds.

অপরিচিত মুখকে ভয় করি না, অপরিচিত মনকেই ভয়।

বোধ করি দূরে সরে গিয়েছি বলেই আমার মনের মধ্যে কোথায় একটি বেদনা বাসা বেঁধে আছে। ক্ষণে ক্ষণে সেটা আত্মপ্রকাশ করে রূঢ় ভাষণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী এবারকার ছেলেদের সঙ্গে যেদিন শেষ ক্লাশ করেছিলাম সেদিন ওদের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে আমার মনের তিক্ততা বেশ খানিকটা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। বলেছিলাম, তোমাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যানিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান ছেলে, পড়িয়ে আরাম পেয়েছি। পরীক্ষায় অনেকেই ভালো করবে। কিন্তু পরীক্ষার ভালো-মন্দে আমার ঔৎসুক্য নেই। অনেক বিদ্বান ছাত্র দেখেছি। ইস্কুলে কলেজে এক মানুষ, কলেজ ছেড়ে যেই সংসারে প্রবেশ করল অমনি স্বরূপ প্রকাশ পেল। সেই কালাবাজার, সেই ঘুষ আর তহবিল তছরুপ। যে বিদ্যা বিদ্বান করে কিন্তু মানুষ করে না, কি হবে সেই বিদ্যা দিয়ে? যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথমা পত্নী বিত্ত পেয়েই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। দ্বিতীয়া পত্নী বলেছিলেন, অমৃতত্ব যদি না পাই তবে বিত্ত দিয়ে আমি কি করব? আজকের বিদ্যার্থীদের মনে কি এই প্রশ্ন জেগেছে? —মনুষ্যত্ব যদি না পাই তবে পাণ্ডিত্য দিয়ে আমার কি হবে? আমার ছাত্রদের বলেছিলাম, এর চাইতে পরীক্ষায় ফেল করবার সৎসাহস অর্জন কর, জীবনে বিফলকাম হয়ে সৎপথে থাক। তাতে সমাজের দেশের মঙ্গল হবে।

আজকালের ছেলেরা শিক্ষকের কথায় কাণ দেয় না। আমার এমন সৎপরামর্শটা বিলকুল মাঠে মারা গিয়েছে। তার প্রমাণ— যে ছেলেদের কাছে এ-সব কথা বলেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাদের একজন হয়েছে প্রথম আরেকজন দ্বিতীয়। আমাকে এমন জব্দ আর কেউ করেনি। আমাদের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে এ সংবাদ শ্রবণে আমার শিরে বজ্রাঘাত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভাবলে হাসি পায়, এমনি মানুষের মন—কোথায় নিরাশ হব না খবর পাওয়া মাত্র আনন্দের উত্তেজনায় ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলাম। হাঁক-ডাক করে প্রতিবেশীদের খবর দিলাম। তার পর সারাদিন ধরে উল্লাস। কত বড় ভণ্ড দেখুন। মুখে বলি এক মনে থাকে আর। আসলে আমিও কালোবাজারী। যা আমার প্রাপ্য নয়, তার প্রতি আমার লোভ। যে কৃতিত্ব সম্পূর্ণই ছেলেদের নিজের, সে কৃতিত্বে ভাগ বসাবার বেলায় আমি সবার আগে। অথচ যে ছেলেরা ফেল করেছে তারা যদি এসে বলে, আপনার উপদেশের মান রেখেছি—তবে বোধ করি তেড়ে মারতে যাব। কই, একজন ফেল-করা ছেলেকেও তো ডেকে বলিনি, বৎস, তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ।

দেহ লক্ষণা

ফুসফুস্ বা ভস্ত্রাযন্ত্র

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রকৃত শ্বাসযন্ত্র বলতে বোঝায় আমাদের বুকের গহ্বরে অবস্থিত দুই পাশের দুটি ফুস্‌ফুস্। শ্বাসনালী প্রভৃতি অন্য যা কিছু হোলো ওরই আনুষঙ্গিক। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, ফুস্‌ফুস্ জিনিসটা কোনো আলাদা উপাদানে তৈরি বিশিষ্ট যন্ত্র নয়, পূর্বোক্ত শ্বাসনালীগুলোই ছড়িয়ে পড়ে শেষ প্রান্তে বেলুনের মতো ফেঁপে উঠেছে এবং সেই ফাঁপা বেলুন-গুলোই গায়ে গায়ে সংলগ্ন থেকে এই ফুসফুসে পরিণত হয়েছে। একটি গাছের পল্লব সংস্থানের বর্ণনার সঙ্গে এর বর্ণনার খুব মিল আছে। গাছ মাত্রই যেমন শাখা-প্রশাখায় বিস্তারলাভ করে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত কতকগুলি পল্লবে পরিণত হয় এবং সেই পল্লবের দ্বারাই সমস্ত গাছটা ছেয়ে থাকে, আর আমরা সাধারণত গাছের শাখার চেয়ে সেই পল্লবগুলিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি কারণ পল্লবগুলির দ্বারাই তার জীবনের চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং বস্তুত-পক্ষে পল্লবগুলির দ্বারাই গাছটি তার শ্বাসপ্রশ্বাসও গ্রহণ করে,—ফুসফুসের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা চলে। গাছের শাখাপ্রশাখাগুলি যদি হয় আমাদের শ্বাস-নালী, তাহ'লে পল্লবগুলি হবে আমাদের ফুসফুসযন্ত্রের বেলুনসমষ্টি এবং ওরই দ্বারা আমরা আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি। এই বেলুনগুলি কোনো একটা গাছের পল্লবের চেয়ে সংখ্যায় কম হবে না, গণনা করলে দেখা যাবে প্রায় চল্লিশ কোটি। এই বেলুনগুলি হোলো অত্যন্ত পাতলা ঝিল্লীর পর্দা দিয়ে ঘেরা এক একটি বায়ুকোষ। একটি গোটা ফুসফুসের মোট আয়তন খুব বেশি নয়, সুতরাং স্বভাবতই আমাদের মনে হতে পারে যে ঐটুকু স্থানের মধ্যে এত-গুলি বায়ুকোষের স্থান কুলায় কেমন ক'রে। কিন্তু অত্যন্ত পাতলা এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলেই সেটা অনায়াসে সম্ভব হয়। নতুবা বস্তুতপক্ষে ওর পরিসর নেহাৎ কম নয়। ফুসফুস দুটির সমস্ত বায়ুকোষকে যদি মেলে দিয়ে পাশাপাশি ছড়িয়ে রাখা যায়, তবে সবগুলিতে প্রায় একশো বর্গ গজ স্থান অধিকার করতে পারে। অতএব ওর দেওয়াল কত যে পাতলা সেটা সহজেই অনুমেয়। এই পাতলা ঝিল্লীর বেলুন-গুলির প্রত্যেকটি বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তশিরার জালিকা দিয়ে ঘেরা। সেগুলির দেওয়ালও এমন পাতলা যে তার অন্তরাল দিয়ে রক্তমধ্যস্থ গ্যাসের সঙ্গে ঐ বায়ুকোষ-মধ্যস্থ গ্যাসের আদানপ্রদান অনায়াসে চলতে পারে। বস্তুত তাই হোলো আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের আসল কাজ। বায়ুকোষের মধ্যে আসছে বাইরের বায়ু, যেটুকু প্রত্যেক বারের প্রশ্বাস গ্রহণের দ্বারা আমরা শ্বাস-নালীর ভিতর দিয়ে ফুসফুসের মধ্যে আমদানী করছি। সেই বায়ুর মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন গ্যাস, যাকে আমাদের দেহের কোষগুলির বিশেষ প্রয়োজন। আর বায়ু-কোষের গায়ে গায়ে ঘেরা জালিকার রক্ত-শিরার রক্তের মধ্যে রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস যা সমস্ত কোষগুলি থেকে বর্জিত হয়ে রক্তের মধ্যে জমেছে। এই দুই গ্যাসের অদলবদল হয়ে যায় ফুসফুসের বায়ুকোষগুলির দেওয়ালের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ জালিকার রক্ত নিয়ে নেয় বায়ুকোষস্থ অক্সিজেন আর বায়ুকোষ নিয়ে নেয় রক্ত-মধ্যস্থ কার্বন ডাইঅক্সাইড। তারপর বায়ু-কোষের সেই বায়ু বাইরে বেরিয়ে চলে যায়, জালিকার রক্তও চলে যায় শরীরস্থ কোষে কোষে। আবার বাইরের থেকে নতুন বায়ু এসে হাজির হয় অক্সিজেন নিয়ে, আর ভিতর থেকে রক্ত আবার এসে হাজির হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে। পুনঃ পুনঃ ফুসফুসের মধ্যে এই কাজই চলতে থাকে। একেই আমরা বলি শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করা। এই কাজটি অনবরত হতে না থাকলে আমরা বাঁচি না।

আমাদের ফুসফুস দুটি দেখতে অনেকটা যেন গোলাপী বর্ণের স্পঞ্জের মতো। জিনিসটা স্বভাবতই ফাঁপা ধরণের এবং ওজনেও হাল্কা। ওর এক খণ্ড কেটে নিয়ে জলে ফেলে দিলে সেটা জলের মধ্যে না ডুবে উপরেই ভাসতে থাকবে। কিন্তু গর্ভ-মধ্যস্থ ভ্রূণের ফুসফুস এমন হাল্কা নয়, তার কোনো একখণ্ড জলে ফেললেই তৎক্ষণাৎ ডুবে যাবে। গর্ভস্থ শিশুর ফুসফুস যন্ত্র তৈরি হয়ে থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে একবারও শ্বাসবায়ু প্রবেশ করতে না পেরেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি আমাদের ফুসফুসের ন্যায় জলে ভাসবার মতো ফাঁপা এবং হাল্কা হতে পারে না। কোনো শিশু প্রসব হবার আগেই মরেছে না প্রসব হবার পরে মরেছে তা এই পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়।

আমাদের দুই দিকের দুই ফুসফুস সমান আকারের নয়, ডান দিকের ফুসফুস বাঁ দিকের চেয়ে বড়ো। ডান দিকের ফুস-ফুসটি তিন খণ্ডে আর বাঁ দিকেরটি দুই খণ্ডে ভাগ করা থাকে। ঐ খণ্ডগুলিকে বলে লোব অর্থাৎ পিণ্ড।

প্রত্যেকটি ফুসফুস দুই প্রস্থ পাতলা ঝিল্লীর চাদর দিয়ে ঢাকা থাকে, তাকেই বলা হয় প্লুরা, অর্থাৎ ফুসফুসধরা কলা। প্রত্যেক দিকের প্লুরা দুই প্রস্থ অর্থাৎ দুই পাট ক'রে মোড়া, যেমন দোরোখা চাদর হয়। তার মধ্যে একটি পাট থাকে ফুস-ফুসের গায়ের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন হয়ে, আর একটি পাট থাকে বুকের গহ্বরটির মাংস-দেওয়ালের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। এই দুই পাট প্লুরার মধ্যে যে একটা ফাঁক থাকবার কথা তা স্বাভাবিক অবস্থায় জানা যায় না, কারণ শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াতে ওর মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় বিশেষ ফাঁকের সৃষ্টি হতে পারে না, পরস্পরের মধ্যে অনবরতই ঘর্ষণ চলতে থাকে এবং তার মধ্যে খানিকটা তরল প্লুরারস লেগে থাকবে বলে ঐ ঘর্ষণের দ্বারা কোনো অনিষ্ট হয় না। কিন্তু প্লুরার মধ্যে রোগ জন্মালে এই অবস্থা বদলে যায়। প্লুরাতে কোনো প্রদাহ উপস্থিত হলে তাকে বলে প্লুরিসি। এই অবস্থায় ঐ দুই পাট প্লুরা প্রদাহের স্থানে গায়ে গায়ে জুড়ে যেতে

পারে, কিম্বা দুই পাটের মধ্যে প্রচুর রস-ক্ষরণ হয়ে সেখানে অনেক পরিমাণে জল জমে যেতে পারে। বেশি জল জমলে তখন বাইরের থেকে ছেঁদা ক'রে সেটা বের ক'রে দেবার প্রয়োজন হয়। যক্ষ্মা রোগ হলে এই দুই পাট প্লুরার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সেই বায়ুর চাপে রোগাক্রান্ত ফুসফুসটি চুপসে গিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিশ্রাম লাভ করতে পারে। একেই বলা হয় এ পি করার প্রক্রিয়া। প্লুরিসি রোগ হলে সাধারণত যক্ষ্মা বীজাণুকেই তার হেতু বলে ধরা হয়, কিন্তু অন্যান্য বীজাণুর দ্বারাও প্লুরিসি রোগ জন্মাতে পারে।

ফুসফুস যন্ত্রটি কেমনভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করে? এ যন্ত্র কি নিজের থেকেই পাম্প করার মতো একবার ক'রে বায়ু টেনে নেয় আর একবার ক'রে বায়ু পরিত্যাগ করতে থাকে? আমরা সাধারণ-ভাবে তাই মনে করতে পারি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। ফুসফুস হোলো নিজে নিষ্ক্রিয় হাপর বা ভস্ত্রাযন্ত্রের মতো জিনিস, অর্থাৎ অপর কেউ বায়ুপ্রবেশের উপায় করে দিলে তবেই ওর মধ্যে বায়ু এসে ঢুকবে, আবার তেমনিভাবে অপর কেউ ওর উপর চারিদিক থেকে চাপ দিলে ভিতর-কার বায়ুটা বেরিয়ে যাবে। এই নিষ্ক্রিয় ফুসফুসের মধ্যে যাতে নিয়মিতভাবে বায়ু ঢোকে এবং বেরোয় তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা আছে। ঐ কাজটি করে আমাদের বক্ষোদেশের ও পেটের মাংসপেশীগুলি, অর্থাৎ তারাই যথাক্রমে বুকের গহ্বরটাকে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে একবার ক'রে ফুস-ফুসের মধ্যে বাতাস ঢোকবার রাস্তা ক'রে দেয়, আবার তাকে সংকুচিত ক'রে সেই বাতাসটা বের ক'রে দেয়। বুকের ভিতর-কার গহ্বরটা হোলো সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য ভ্যাকুয়ম স্থান, অতএব সেই গহ্বরটাকে বাড়িয়ে দিলে যা কিছু বাতাস ঢোকবার তা ফুসফুসের মধ্যেই ঢোকে, আর সেই গহ্বর সংকুচিত করলে ফুসফুস থেকেই বাতাস নির্গত হয়ে যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়া এই ব্যবস্থার দ্বারাই ঘটে থাকে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া একটা নিয়মিত ছন্দ অনুযায়ী ঘটে থাকে সাধারণত প্রতি মিনিটে ১৪ বার থেকে ১৮ বার পর্যন্ত। কিন্তু শৈশবাবস্থায় এটা দ্রুত হয় এবং কোনো পরিশ্রম করলেই এর মাত্রা বেড়ে যায়। বেশি পরিশ্রম করলে অথবা ছুটোছুটি করলে আমরা হাঁপাতে থাকি, তখন শ্বাসপ্রশ্বাসের মাত্রা অনেক বেশি বেড়ে যায়। নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগেও এই ক্রিয়া দ্রুত হয়। হৃদপিণ্ডের গতির সঙ্গে এই ক্রিয়ার গতির একটা সামঞ্জস্য আছে। হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া যতক্ষণে চারবার হয় ততক্ষণে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া হয় মাত্র একবার। তবে এটা হয় সুস্থ অবস্থায়, রোগের অবস্থায় এই অনুপাতের নানারকম ইতরবিশেষ ঘটে।

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার মধ্যে দুটি অংশ আছে। একটি হোলো প্রশ্বাস গ্রহণ, আর একটি নিঃশ্বাস পরিত্যাগ। পূর্বে বলা হয়েছে যে, বক্ষগহ্বর স্ফীত হলেই তার ফলে আমরা প্রশ্বাস গ্রহণ করি। এই স্ফীতি হয় দুই দিক দিয়ে অর্থাৎ গহ্বরের আয়তনটা

দৈর্ঘ্যেও বাড়ে এবং প্রস্থেও বাড়ে। তার জন্যে স্বতন্ত্র দুই জায়গায় মাংসপেশীগুলি ক্রিয়া করে। পেটের গহ্বর ও বুকের গহ্বরের মাঝখানে যে মধ্যচ্ছদার ব্যবধান আছে, সেটা যখন নিচের দিকে নেমে যায় এবং তার ফলে পেটটি উঁচু হয়ে ফুলে ওঠে, তখন বক্ষগহ্বর দৈর্ঘ্যে বেড়ে যায়, তখন আমরা প্রশ্বাস গ্রহণ করি। শিশুদের মধ্যে আর পুরুষদের মধ্যে এই ধরণের ক্রিয়াটাই বেশিমাত্রায় হয়। কিন্তু গহ্বরের প্রস্থ-বৃদ্ধির বেলাতে হয় অন্যরকম। ছাতির উপরকার মাংসপেশীর ক্রিয়াতে নিচের দিকে হেলানো পাঁজরার হাড়গুলি উপর দিকে খাড়া হয়ে ওঠে, আর বক্ষফলকের হাড়টি সামনের দিকে ঠেলে ওঠে। এতেও গহ্বরের আয়তন খানিকটা বেড়ে যায়। এটা স্ত্রীলোকদের বেলাতেই বেশিমাত্রায় হয়, তাই শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাদের পেটের চেয়ে বুকের উত্থানপতনটাই বেশিমাত্রায় লক্ষিত হয়। অতএব এই দুই উপায়ের দ্বারাই আমরা প্রশ্বাস গ্রহণ করি।

নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সময় এর ঠিক বিপরীত ক্রিয়া হয়। তখন বুকের পাঁজরগুলি নিচের দিকে নেমে যায় এবং মধ্যচ্ছদার ব্যবধানটা উপর দিকে উঠে যায়। এই দুই প্রকারে গহ্বরের আয়তন দু দিক থেকে সঙ্কুচিত হয় এবং নিঃশ্বাস বায়ুকে ...ই ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় মাংসপেশীর কোনো ...এর প্রয়োজন হয় না, প্রশ্বাসক্রিয়ার পেশীগুলি শিথিল হলেই এই অবস্থাটি আপনি ঘটে। কিন্তু কথা বলতে বা গান ...তে বা হাঁচতে কাসতে স্বরযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সজোরে যেটুকু বায়ু নিঃসরণ করতে ...য় তার জন্য মাংসপেশীর বিশেষ প্রচেষ্টার দরকার হয়। সেটা বেশির ভাগ পেটের মধ্যচ্ছদার ক্রিয়ার দ্বারাই হয়ে থাকে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজের জন্য নির্দিষ্ট মাংসপেশীগুলি এইভাবে কাজ করতে থাকে ...র নির্দেশে? এর জন্য মস্তিষ্কের নিচে ...শীর্ষক অংশে একটি বিশেষ কেন্দ্র আছে, নার্ভের দ্বারা ঐগুলির প্রতি হুকুম আসে সেই কেন্দ্র থেকে। তাছাড়া প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার দ্বারাও এ কাজ হয়। রক্তে যেমনি অক্সিজেনের অভাব পড়ে ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি ঘটে সেই অনুসারে ঐ ...গুলি পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হয়ে মাংসপেশীর উপরে প্রশ্বাস গ্রহণের প্রক্রিয়া করবার আদেশ দিতে থাকে, যখন যেমন মাত্রার দরকার হয়। ঘুমের সময় যদি মিনিটে আমরা ১৫ বার শ্বাস গ্রহণ করি; একবার একটু ছুটে এলেই আমরা সেই কাজ করতে থাকবো মিনিটে প্রায় ৩০।৪০ বার। কারণ পরিশ্রম হওয়ার দরুণ তখন বেশি বেশি অক্সিজেন দরকার। কিন্তু কেন্দ্রটি বরাবর অবিকৃত থাকা চাই, কেন্দ্রে কোনো বিকৃতি ঘটলে আমরা এক মুহূর্তও বাঁচবো না।

পূর্বে বলা হয়েছে, এই শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়ার দ্বারা অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বিনিময়ের কথা। কিন্তু এটাকে ঠিক বিনিময় বলা উচিত নয়। গ্যাসের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারেই দুই বিভিন্ন স্থানের মধ্যে এই দুটির আদান-প্রদান ঘটে থাকে। গ্যাসের ধর্ম এই যে, পাশাপাশি দুই স্থানের মধ্যে এক স্থানে যদি কোনো গ্যাসের চাপ অন্য স্থানের চাপের চেয়ে বেশি থাকে, তাহলে ঐ বেশি চাপযুক্ত গ্যাস কম চাপযুক্ত স্থানে গিয়ে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করবে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়। ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষের মধ্যে যে বায়ু গিয়ে ঢুকলো, তার অক্সিজেনের মাত্রা ও চাপ নিকটস্থ রক্তশিরার ভিতরকার অক্সিজেনের মাত্রা ও চাপের চেয়ে বেশি, কাজেই খানিকটা অক্সিজেন ঐ শিরার রক্ত ও রক্তরসের মধ্যে প্রবেশ করে। রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন তৎক্ষণাৎ তার খানিকটা শুষে নিয়ে তাকে অক্সি-হিমোগ্লোবিনে পরিণত করে। তারপরে ঐ রক্ত যখন কোষের কাছে গিয়ে হাজির হয়, তখন সেখানকার লসিকারসে এর চাপ যথেষ্ট কম থাকায় কণিকার অক্সি-হিমোগ্লোবিন ভেঙে এবং রক্তরস থেকেও অনেকটা অক্সিজেন ঐ লসিকারসের মধ্যে চলে যায় এবং সেখান থেকে চলে যায় প্রত্যেক কোষে কোষে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের বেলাতেও হয় ঠিক এই জিনিস। লসিকাতে যখন ওর চাপ বাড়লো, তখনই সেটা কম চাপযুক্ত শিরার রক্তের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। আবার সেই রক্ত ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষের কাছে যাওয়াতে যেমনি দেখা গেল সেখানকার ঐ গ্যাসের চাপ কম রয়েছে, অমনি ঐ গ্যাস সেই বায়ুকোষের মধ্যে চলে গিয়ে নিঃশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল। বিনিময়টা এইভাবেই হয়ে থাকে।

প্রশ্বাস-বায়ুতে কেবলই যে অক্সিজেন থাকে তা নয়, কার্বন ডাইঅক্সাইডও কিছু থাকে। কিন্তু বায়ুকোষের ভিতরে গিয়ে ঐ দুটি গ্যাসের আদানপ্রদানের পরে যখন সেটা নিঃশ্বাস-বায়ু হয়ে বেরিয়ে আসে, তখন দেখা যায় যে, তার অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেছে, কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বেড়ে গেছে। ঠিক হিসাবমতো বলতে গেলে, অক্সিজেনের মাত্রা ৪ ভাগ কমে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ৪ ভাগ বাড়ে। শুধু তাই নয়, প্রশ্বাস-বায়ু ও নিঃশ্বাস-বায়ুতে আরো অনেক পার্থক্য আছে। নিঃশ্বাস-বায়ুতে সাধারণত জলীয় বাষ্প অনেক বেশি থাকে, সেটা প্রশ্বাস-বায়ুর চেয়ে অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়, আর নিঃশ্বাস-বায়ুতে শরীরের ভিতরকার অনেক আবর্জনা ও বীজাণু থাকে। এই জন্যেই বলা হয় একজনের নিঃশ্বাস-বায়ু অপরজনের প্রশ্বাসের মধ্যে

গ্রহণ করা উচিত নয়। বিশেষত কারো যক্ষ্মারোগে বা সর্দিকাসি জাতীয় কোনো রোগ থাকলে তো একেবারেই অনুচিত। যক্ষ্মা এবং সর্দিকাসিযুক্ত রোগ মাত্রই হলো ফুসফুস এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রগুলির ভিতরকার সংক্রামক রোগ। আর যেখানে সেই সংক্রামক রোগ হয়েছে, সেখানে ঐ রোগের বীজাণু অসংখ্য পরিমাণে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। হাঁচলে, কাসলে, কথা বললে এবং জোরে নিঃশ্বাস ফেললেও সেই বীজাণু অল্পাধিক পরিমাণে ঐ ত্যক্ত বায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে আসে। শুধু বেরিয়ে আসা মাত্রই নয়, একটু জোরে হাঁচলে বা কাসলে সেই বীজাণু ছয় ফুট পর্যন্ত দূরে ছিটকে গিয়ে বায়ুর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সুতরাং ছয় ফুটের মধ্যেও একজনের নিঃশ্বাসের বীজাণু অপরজনের নাকে গিয়ে ঢুকতে পারে। থুতু ফেলার দ্বারাও অনেকটা এমনি ব্যাপার হয়। থুতুর মধ্যেও ঐ সব রোগের বীজাণু যথেষ্ট পরিমাণে বেরিয়ে আসে। থুতুটা অবশ্য কারো নাকে ঢোকে না, কিন্তু থুতু শুকিয়ে যখন সেটা অদৃশ্য চূর্ণে পরিণত হয়, তখন সেটা বাতাসে উড়ে কারো নাকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এখন কথা এই যে, কার শরীরে কোন্ রোগ লুকিয়ে আছে, তার কোনো ঠিকানা নেই। সুতরাং প্রত্যেকেরই উচিত, কারো মুখের উপর হেঁচে ফেলা বা কাসতে থাকা থেকে বিরত হওয়া এবং যেখানে সেখানে থুতু ফেলার কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করা। কেবল যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগই নয়, এমন কি মেনিঞ্জাইটিস, হাম, পোলিও-মাইলাইটিস প্রভৃতি আরো অনেক মারাত্মক রোগই এইভাবে ছড়ায়।

কিন্তু রোগের কথা বাদ দিয়ে আবার আমরা স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কথাই বলি। স্বাভাবিক প্রশ্বাসের দ্বারা প্রত্যেক বারে আমরা প্রায় ১৩০ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ বায়ু গ্রহণ করি এবং স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের দ্বারাও ঠিক ঐ পরিমাণ বায়ুই পরিত্যাগ করি। এটাকে বলা যায় প্রবাহী বায়ু। কিন্তু ইচ্ছা করলে আমরা এর চেয়েও বেশি পরিমাণ বায়ু নিতে পারি এবং ফেলতে পারি। স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ফেলবার পরেই যে ফুসফুসের বায়ুকোষগুলি বায়ুশূন্য হয়ে গেল তা নয়। ফুসফুসের মধ্যে তখনও থেকে যায় প্রায় ২০০ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ বায়ু। ওর থেকে আরো ১০০ ঘন ইঞ্চি আন্দাজ বায়ু আমরা বিশেষ চেষ্টার দ্বারা বের করে দিতে পারি, সেই অতিরিক্ত বায়ুকে বলা যেতে পারে অভিত্যজ্য বায়ু। কিন্তু অবশিষ্ট ১০০ ঘন ইঞ্চি বায়ু ফুসফুসের মধ্যে থেকেই যাবে, তাকে কোনোমতে বের করা যাবে না, এর নাম ফুসফুসের শিষ্ট বায়ু। তেমনি অন্য দিক দিয়ে প্রশ্বাস নেবার সময় আমরা স্বাভাবিকের চেয়ে সাধ্যমত চেষ্টার দ্বারা আরো খানিকটা বেশি বায়ু টেনে নিতে পারি, যাকে বলা যায় অভিগ্রাহ্য বায়ু। খুব জোরে প্রশ্বাস নিয়ে তার পরে খুব জোরে নিঃশ্বাস ফেলে যতটা পরিমাণ বায়ু আমরা ত্যাগ করতে পারি, সেটা সাধারণত ২৩০ ঘন ইঞ্চির বেশি নয়, কিন্তু ছাতির মাংসপেশীর ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে এর অনেক ইতরবিশেষ হয়ে থাকে। এই শক্তির নাম দেওয়া হয়, ভাইট্যাল কেপাসিটি এবং কে কতটা বায়ু ত্যাগ করতে পারে সেই অনুসারে তার পরিমাপ করা হয়। দুই বিভিন্ন অবস্থাতে অর্থাৎ একবার সাধ্যমত প্রশ্বাস নেবার পরে আর একবার সাধ্যমত নিঃশ্বাস ফেলবার পরে ছাতির ঘেরটুকুর মাপ নিয়ে এই দুই মাপের মধ্যে কতখানি তফাৎ হোলো তাই দেখেও কার কত ভাইট্যাল কেপাসিটি তা নির্ণয় করা যায়। সাধারণত এই পার্থক্যটা এক দেড় ইঞ্চির বেশি হয় না, কিন্তু এই-রূপভাবে ব্যায়াম করা অভ্যাস করলে ওটা তিন ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। বলা বাহুল্য, এতে প্রত্যক্ষভাবে ফুসফুসের মধ্যে কোনো পার্থক্য হয় না, কিন্তু বুকের প্রসারতা বেড়ে যাওয়ার দরুণ ফুসফুসে অধিক পরিমাণ বায়ু চলাচল হতে পারে এবং তার দ্বারা ফুসফুসের ভিতর কোনো আবর্জনা জমতে পারে না। কারণ শিষ্ট বায়ুর মধ্যে যা-কিছু আবর্জনা থাকে তা ঐ ব্যায়ামের দ্বারা অধিক পরিমাণে নির্গত অভিত্যজ্য বায়ুর সঙ্গে সবই বেরিয়ে যায়। এতে জীবনী-শক্তি যে অনেক বেড়ে যায়, তাতে সন্দেহ নেই, কারণ পূর্বোক্ত রোগগুলি সহজে জন্মাতে পারে না, ছাতির প্রসার বাড়ে এবং ফুসফুস অধিক বায়ু ধারণ করতে পারে। এই কারণেই আগেকার কালে প্রাণায়াম করবার উপদেশ দেওয়া হোতো। আধুনিক কালেও বৈজ্ঞানিক মহলে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। একে বলা হয় ডীপ ব্রীদিং বা গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, কোনো উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে এক নাক বন্ধ করে অন্য নাক দিয়ে ধীরে ধীরে যতখানি সম্ভব বায়ু টেনে নাও, যতক্ষণ পর্যন্ত পারো সেটাকে ধরে রেখে শ্বাস বন্ধ করে থাকো, তারপরে ধীরে ধীরে আবার অপর দিকের নাক দিয়ে যতটা পারো নিঃশ্বাস ত্যাগ করো। এমনি করতে হবে ২০ বার, তার বেশি নয়। ইচ্ছা করলে দিনের মধ্যে যখন খুশি যতবার খুশি এমনি অভ্যাস করা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মত এই যে, এতে প্রকৃতই মানুষের জীবনী-শক্তি বাড়ে ও রোগপ্রবণতা কমে।

জীবন থেকে আমি কি চাই

অধ্যাপক জে বি এস হ্যালডেন

'আমি বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় সন্তুষ্ট'—বলেছিলেন মার্গারেট ফুলার—নতুন ইংলণ্ডের একজন রহস্যবাদী। একথার উত্তরে টমাস কার্লাইল ব'লেছিলেনঃ 'হ্যাঁ, সৃষ্টি সুন্দর, কিন্তু সুন্দরতর হবার অবকাশ ছিল।' আমার কিন্তু বিশ্বের দৃশ্যমান রূপটাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যা হবার নয় তা আশা করব না। পৃথিবীটাকে একটা আদর্শ জায়গা কল্পনা করে নিয়ে কেবল আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকলে আমার ক্ষতি ছাড়া লাভের সম্ভাবনা নেই। সুতরাং পৃথিবীটাকে আমরা যেমনটি পেয়েছি তা থেকে আমার বা সকলের কতটা কি আশা করা যুক্তিযুক্ত তাই বলতে পারি।

জন্মেছিলাম পৃথিবীর এক শান্তিময় যুগে, আর যৌবনে স্বপ্নও দেখেছিলাম এক শান্তিময় জীবনের। কিন্তু ১৯১৪ থেকেই এক বীরত্বের যুগে বাস করতে সুরু করেছি আর বেঁচে থেকে যে আর একটা সুখ-শান্তির যুগ দেখে যেতে পারবো এমন সম্ভাবনা দেখি না। সুতরাং যে কালে বাস করছি তা থেকেই আমার আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার যথাসম্ভব উপায় খুঁজতে হবে। আমার নিজের জন্য আমি কি চাই বলছি। ধরে নিলাম, খাবার, জল, পোষাক আর বাসস্থান—সবই আছে আমার।

প্রথমত আমি চাই কাজ—ভালো আয়ের কাজ। সুখের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে এ্যারিস্টট্ল বলেছেন কতকগুলো আমোদ-প্রমোদের সমষ্টিই সুখ নয়—সুখ হোলো বাধাহীন কাজ। আমার কাজ হবে কঠিন কিন্তু তা থেকে আমার আনন্দ পাওয়া চাই—আর সে কাজের ফলটুকুও আমার চোখের সামনে থাকা চাই। আমার নিজের কাজ আমি নিজেই অনেকখানি বেছে নিতে পারি—এ বিষয়ে আমি একটু অদ্ভুত রকমের ভাগ্যবান। বিজ্ঞান জগৎ থেকে সাময়িক* বিশ্রামের প্রয়োজন হলে আমি হতে পারি যুদ্ধের সাংবাদিক; কিংবা ছোটদের জন্য গল্প লিখেও কাটাতে পারি, না হয় শুধু রাজনীতিক বক্তৃতা দিয়ে।

সুতরাং দ্বিতীয় দফায় আমি যা চাই সেই স্বাধীনতা আমি অনেক পরিমাণেই ভোগ করি—অনেকের চেয়েই খুব বেশী পরিমাণে। সে স্বাধীনতার আরও বেশী চাই আমি—মতপ্রকাশের আরও বেশী স্বাধীনতা। লর্ড ব্র্যাঙ্কের খবরের কাগজ—মিঃ ড্যাসের পিল কিংবা এ্যাসটারিসের বিয়ারের সম্বন্ধে আমার মতামত আমি বলতে চাই, লিখতে চাই। বলতে চাই যে ও তিনটে জিনিসই হোল বিষাক্ত। কিন্তু আইনের জন্যে আমার তা বলবার উপায় নেই।

আমি চাই স্বাস্থ্য। মাঝে মাঝে একটু-আধটু দাঁত-ব্যথা কিংবা মাথাধরা—অথবা ছ'সাত বছর অন্তর একটু বড় রকমের অসুখেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু আর অন্য সময় আমি চাই কাজের আর সুখ-ভোগের ক্ষমতা। তবে সে ক্ষমতা যখন হারাবো, তখন চাই মরতে। আমি চাই বন্ধুত্ব বিশেষ ক'রে বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিক কাজে আমার বন্ধু সহকর্মীদের সখ্য আমার প্রয়োজন আছে। আমি চাই এমন সমাজ যেখানে মানুষের থাকবে সমান অধিকার—আর তাঁরা করবেন আমার সমালোচনা। আমি করবো তাঁদের। বিনা বিচারে আমাকে যাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে চলতে হবে অথবা সেই রকমভাবে যাকে আমার হুকুম তামিল করে চলতে হবে, এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব অসম্ভব। আর আমার চেয়ে ধনী বা গরীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব—সেও খুব কঠিন কাজ।

এ চারটে জিনিস সব মানুষেরই প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে আমি আরও চাই এ্যাডভেঞ্চার। নিরুদ্বেগ জীবন নিতান্ত একঘেয়ে—আলুনি। কিন্তু আমার জীবনটার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই পাহাড়ে চড়ে, মোটর দৌড়ে কিংবা আর কিছুতে শুধু এ্যাডভেঞ্চারের আনন্দের জন্যেই আমি জীবন বিপন্ন করতে চাই না। একজন দেহ-তত্ত্ববিদ্ হিসেবে আমি নিজের ওপরেই নানারকম পরীক্ষা চালাতে পারি, কিংবা যে যুদ্ধ বা বিপ্লবের পিছনে আমার সমর্থন আছে তাতেও যোগ দিতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ্যাডভেঞ্চার ভালবাসা মানে কতকগুলো চমকপ্রদ আনন্দের সন্ধান করা নয়। সম্প্রতি মাদ্রিদ অবরোধের সময় আমি ছ' সপ্তাহ সেখানে কাটিয়ে এলাম। চমকপ্রদ আনন্দ যদি কিছু পেয়ে থাকি সে পেলাম কেবল রিম্বডের কাব্য পাঠ করে। এ্যাডভেঞ্চারের তৃপ্তি চমক-প্রদ আনন্দানুভূতির চেয়েও আরও বৃহৎ, আরও বাস্তব।

কামনা আছে আমার আরও কটা জিনিসের তবে সেগুলো দাবী নয়। আমার একখানা ঘর থাকবে একান্ত নিজস্ব আর তাতে থাকবে কখানা ভালো বই; আরও সখ আছে ভালো তামাকের; একখানা মোটর-কারের, আর দৈনিক স্নানের। একটি বাগান, একটি স্নানের পুষ্করিণী, তটভূমি অথবা কাছাকাছি একটি নদীরও সাধ আছে আমার।

কিন্তু এ সবের নেই কিছুই, শুধু দিন কাটছে বেশ সুখেই।

আমি খুব বেশী রকম ভাগ্যবান কারণ আমি যা চাই তার বেশীর ভাগই আমি পেয়ে যাই আর বাকীটা পাওয়ার জন্যে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে পারি। কিন্তু একেবারে জৈব প্রয়োজন বলতে যা বোঝায় আমার সঙ্গীদের অনেকেরই ভাগ্যে তাও জোটে না। এবং অন্যকে অসুখী দেখে আমি পরিপূর্ণ সুখী হয়ে উঠতে পারি না।

পৃথিবী গ্রহের প্রতিটি নরনারীকে আমি কর্মরত দেখতে চাই। কিন্তু এক সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে সর্বত্রই রয়েছে বেকার সমস্যা—যদিও সুইডেনে এ সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে। আমি একজন সমাজতান্ত্রিক, কারণ পুঁজিবাদের বড় লক্ষণই এই বেকার সমস্যার সৃষ্টি করা—বিশেষ করে মন্দার বাজারে। আমি চাই যে শ্রমিকেরা তাদের পরিশ্রম ফল দেখতে পাচ্ছে—অন্যের লাভের অঙ্কের ভিতর দিয়ে নয়, তার নিজের বা তাদের বন্ধুদের অবস্থা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে আমার সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে আমার গবেষণাগুলো কাজে খাটানো হয় না। জীবতত্ত্বের নতুন নতুন তথ্য আমি আবিষ্কার করি, কিন্তু তাতে সমাজ কল্যাণ নিহিত থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে কারও কোনও মুনাফা লাভের সম্ভাবনা থাকে না বলেই বাস্তব ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রয়োগের চেষ্টা হয় না।

যেমন আমার কাজের আমিই অনেকখানি নিয়ামক তেমনি আমি দেখতে চাই যে প্রতি শ্রমিকই তার কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে। আবার কাজের বেশীর ভাগই নীরস, অস্বাস্থ্যকর এবং ক্লান্তিকর। এমনটি হওয়া উচিত নয়। আর হবেও না এমন—শিল্পবাণিজ্যে গণতন্ত্রের কয়েকটা যুগ কেটে গেলেই কাজের চেহারাও যাবে বদলে। কাজ যে কত আনন্দদায়ক হতে পারে তা একটা ব্যাপার থেকে বোঝানো যেতে পারে। যখন হাতে থাকে সময় আর টাকা পয়সারও অভাব থাকে না, তখন আমাদের দুটি প্রিয় কাজ হোলো শিকার করা আর বাগান তৈরী। এ দুটো কাজই আমাদের পূর্বপুরুষদের—প্রথমটা প্যালিওলিথিক আর পরেরটা নিওলিথিক যুগের।

আমি চাই শ্রমিক নিয়ন্ত্রিত শিল্প-ব্যবস্থা এবং সেইজন্যই আমি একজন সমাজতান্ত্রিক। স্বাধীনতার গোড়ার কথাই হোল শ্রমিক স্বাধীনতা।

প্রত্যেক নরনারীকে আমি যথাসম্ভব স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী দেখতে চাই। এর জন্যে চাই খাদ্য, বাসস্থান আর চিকিৎসা-ব্যবস্থা—তা' সে আধুনিক জীববিদ্যা যে প্রকার ও যত পরিমাণে এ তিনটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে এবং আধুনিক কলাকৌশলের সাহায্যে সে প্রয়োজনীয়তার যতখানি মেটানো যেতে পারে তার সবটুকু।

আমি ধ্বংস করতে চাই শ্রেণীশাসন আর স্ত্রী-পরাধীনতা। শুধু এইভাবেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের পক্ষে অপরিহার্য সাম্যের প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে। আর যেহেতু শ্রেণী বৈষম্য আর স্ত্রী-পরাধীনতার মূলে বড় কারণটাই হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা, সুতরাং ওদুটোর উচ্ছেদের জন্যই আমি অর্থনৈতিক বিপ্লবের কামনা করি।

যে সব সুখসুবিধা আমি নিজে ভোগ করি, আমি চাই প্রত্যেকটি নরনারী সেগুলো ভোগ করুক। এই জন্যেই আমি একজন সমাজতান্ত্রিক। আমি জানি যে সমাজতন্ত্রের সাহায্যে সব কিছু রাতারাতি বদলে যাবে না, কিন্তু মরবার আগেও যদি দেখি পুঁজিবাদের সমাধি হয়েছে আর ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাহোলেও অন্তত সুখে মরতে পারবো।

কটা প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব আছে আমার—তার মধ্যে বড় রকমের দুটো হোল শান্তি আর নিরাপত্তা। আর যা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে তা চাওয়াও বৃথা।

আমি ভালোভাবেই বুঝি যে শান্তি আর নিরাপত্তাই হোল জীবনের দুটি ন্যায়সঙ্গত লক্ষ্যবস্তু আর এও জানি যে আমার জীবনের দুর্ধর্ষ এ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি এও হয়ত শুধু যে যুগে আমি বাস করি সেই যুগেরই প্রতিফলন। আমি তো আমার যুগেরই সৃষ্টি এবং আমার যুগধর্মেই আমি হীনতর। অতএব এ্যাডভেঞ্চার নয়, নিরাপত্তাই চাই আমি সকলের জন্যে।

আমি দেখতে চাই এমন অনেক জিনিসের সম্বন্ধেই আমার বলা হয় নি—যেমন শিক্ষাবিস্তার এবং জীবনের সর্বস্তরে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ। এ পর্যন্ত এই কথাই বললাম যে, আমি আমার নিজের জন্যে চাই খাদ্য, আরাম, কাজ, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য আর বন্ধুত্ব—আর যে সমাজে আমি বাস করি তার জন্যে চাই সোস্যালিজম্।

জীবন প্রয়োজনের পরিপূরকরূপে আছে আমার কিন্তু মৃত্যু-কামনা। এ পর্যন্ত যত লোকের মৃত্যুর হিসেব রাখা হয়েছে, পৃথিবীতে তার মধ্যে যাঁর মরণকে আমি বেশী হিংসে করি তিনি সক্রেটিস। আপন স্বীকারোক্তি দিয়েই তিনি মৃত্যু বরণ করলেন—অথচ সত্য গোপন করে তিনি সহজেই সে মৃত্যুকে এড়াতে পারতেন। সত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়—অথচ তখনও তিনি পরিপূর্ণ মনঃশক্তির অধিকারী এবং যুক্তিসম্মতভাবে যতটা কাজ করবার তিনি আশা করতে পারতেন, তার সবই তখন তাঁর করা শেষ হয়ে গেছে এবং মৃত্যুকেও তিনি বরণ করেছেন হাসতে হাসতে। তাঁর শেষ কথাগুলো কৌতুকমাখা।

সক্রেটিসের মত ভাগ্যবান হব এমন কামনা অবশ্য আমি করি না—তাঁর মরণের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে এমন মরণ অতি বিরল। (কর্ম সমাপ্তি, শেষ পর্যন্ত শক্তির অধিকারী থাকা এবং হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করা।)

কিন্তু ও তিনটের দুটোও যদি আমার জীবনে ঘটে তাহোলেই আমার জীবন হবে সার্থক—কেননা, আমার বিশ্বাস বন্ধুবান্ধব তখন আমার জন্যে শোক করুক আর নাই করুক ব্যঙ্গভরে আমাকে অনুকম্পা দেখাবে না।

অনুবাদক : **গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়**

[* হ্যালডেনের 'What I require from life' প্রবন্ধের অনুবাদ।]

সাহিত্য প্রসঙ্গ

আধুনিক কাব্যসমালোচনার ধারা

প্রভঞ্জন সেনগুপ্ত

আজ থেকে বছর দশ-বারো আগে বাঙলাদেশে নতুন ধরণের যে কবিতার বন্যা আসে, তখন অনেকের মনে হয়েছিল সেই বন্যাই বুঝি বাঙলার কাব্যসাহিত্যের নূতনতর সরোবরের রূপে স্থায়ীভাবে টিকে যাবে। কিন্তু বন্যা বন্যাই; বন্যা উচ্ছৃংখল বেগে অকস্মাৎই আসে; এবং যথাসময়ে তা নিঃশেষে শেষ হয়ে যায়। কবিতা ও প্রেম যদি এক জাতের জিনিস হয়ে থাকে তা হলে একথা আরো সত্যি বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, একটি কবিতার দুটি কলি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল—

> প্রেমটা নেহাত বেনো জল
> তার আসাটা লাগায় তাক...

দশ-বারো বছর আগে বাঙলা কবিতা এই তাক লাগিয়েছিল, তখন আমরা সেই চমকপ্রদ কবিতার ছত্রে ছত্রে চেৎলার ব্রিজে লম্পটের পদধ্বনি শুনেছি, সেবাসদনের সামনে উর্বরা মেয়েদের ভিড় দেখেছি। অনেকে তখন এই সব কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং নাম না হয় উল্লেখ না করলাম, প্রখ্যাত অধ্যাপক—কাব্যসমালোচকগণও তখন দীর্ঘ প্রশস্তির দ্বারা সেই কবিতাকারদের যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন। আমরা তখন ভাবতাম, আমরা এ সব কবিতার নির্গলিতার্থ বুঝতে পারছিনে বলেই হয়তো আমাদের ভালো লাগছে না, না হয় এ সব আদপে কবিতা নয়।

মহাকাব্য কাকে বলে তার সংজ্ঞা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কবিতা জিনিসটি কি তার কোনো সংজ্ঞা হয়তো নেই। এই সুযোগ নিয়ে জনকয়েক লেখক তখন 'কবিতা' লিখতে শুরু করেন। কিন্তু সে কবিতা পাঠে কোনোরূপে অভিভূত হওয়া যায় নি, কোনো অনুভূতির দ্বারা আক্রান্ত হই নি বলেই তখন সে সব লেখা কবিতা বলে গ্রহণ করতে আমাদের বেধেছিল। কেননা, কবিতা তখন লেখা হয়েছে কিছুটা অর্থহীন করে রহস্যের কুহেলিকার বিস্তারের দ্বারা, আর কিছুটা লেখা হয়েছে অভিধান থেকে বাছাই করে কঠিন কঠিন শব্দ চয়নের দ্বারা।

স্বস্তির কথা এই, সে কবিতার বান আজ নেমে গেছে, কবিতার মৃত্তিকা আজ বন্যার আবরণ ভেদ করে আবার দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ এবং 'দেশ' পত্রিকায় কিছুদিন হল জনকয়েক লেখক-লেখিকার কবিতা দেখে এই কথা আমাদের মনে হচ্ছে।

সে কবিতার বান নেমেছে বটে, কিন্তু সে কাব্য-সমালোচনার ধারা আজও তেমনি ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই কথা বলার জন্যেই এই নীরস গদ্যের অবতারণা। যেমন যে-মেজাজ ও যে-দৃষ্টিকোণ নিয়ে সেই সব কবিতার বিচার তখন করা হয়েছিল, এখনো কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টিকোণই রয়ে গেছে দেখে আমরা অস্বস্তি বোধ করছি। সেসব সমালোচকেরা আর সাহিত্যক্ষেত্রে নেই, তাঁরা এক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত বটে, কিন্তু তাঁরা বাঙলার কাব্য-জীবনে এবং কাব্যসমালোচনার ধারায় যে গরল সঞ্চার করে গেছেন, তার বিষক্রিয়া এখনো চলেছে। এখনো তাঁরা কবিতার ছত্রে হয়তো লম্পটের পদধ্বনি শুনতে চান, এখনো হয়তো তাঁরা কবিতার ছত্রের মধ্যে সেবাসদনে উর্বরা মেয়েদের ভিড়ই দেখতে চান। এইটেই আমাদের আক্ষেপ। বাঙলায় সত্যিকারের কবিতার উদ্বোধন আরম্ভ হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। দশ-বারো বছর বাঙলা থেকে নির্বাসিত কবিতা পুনরায় বাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ শুরু করেছে, কিন্তু বাঙলার কাব্যসাহিত্যের সমালোচনার ধারার কোনো পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছিনে।

কোন্ কবিতা আসল কবিতা তার বিচারক অবশ্য সময়। দশ বছরও যে কবিতাকে জীইয়ে রাখা গেল না, সে কবিতাকেও খাঁটি কবিতা বলে চালাবার নির্লজ্জ প্রয়াস তখন আমরা দেখেছি আর ভেবেছি—

সীসার চাকতি যদি ঠসঠস করে বেসুরো শব্দ করে, তবু সেইটাকে গড়িয়ে দিলেই অনায়াসে সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। এতে যদি তার সচল আখ্যা লাভ হয়, ভালো কথা। খ্যাতি ও খাতির যতই পাক সে, তবু টাকশালে গিয়ে আপনিই পাবে অপূর্ব মর্যাদা।

সময়ের টাকশালে সেসব কবিতা নিজ নিজ মর্যাদা তো লাভ করেছে, কিন্তু সমালোচনার বিষয় নিয়ে এখন কেউ ভাবছেন কিনা—এই কথা আমাদের জানার বড় আগ্রহ।

অন্যান্য সমালোচনার কথা এখানে বলছি নে, আজকালকার কাব্য-সমালোচনার বিষয় এবার আলোচনা করা যাক। প্রথমেই 'দেশ' পত্রিকার বিষয় লিখতে হচ্ছে। দেশ পত্রিকা কবিতার পৃষ্ঠপোষক এবং প্রকৃত কবিতার পরিবেশকরূপে বাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে চিহ্নিত হয়েছেন বটে, কিন্তু 'দেশে' কবিতারও যে পুরো মর্যাদা হচ্ছে না, তা দেখা যায় এর পুস্তক-পরিচয় বিভাগে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেখানে কবিতার গ্রন্থ উপযুক্তরূপে সমালোচিত হয় না। বিজ্ঞানের বই, দর্শনের বই, রাজনীতি বা ধননীতির বই যেভাবে আলোচিত হয়ে থাকে কবিতার বইও অনেকটা সেইভাবেই আলোচিত হয়ে আসছে—কিন্তু এভাবে হওয়া সঙ্গত বলে আমাদের মনে হয় না, এর জন্যে আর কিছুটা স্থান দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। কিন্তু একথা অবশ্য বলতে চাই নে যে, এর দ্বারা কবিতার গ্রন্থের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, আমাদের বলার কথা এই যে, বিচারে কার্পণ্য করা হয়েছে। অমর্যাদাও দেখানো হয় নি বটে, অথচ পুরো মর্যাদাও দেওয়া হয় নি—এই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য।

এসব তবু হয়তো বরদাস্ত করা যায়। কিন্তু কেবল কথিতাই যে পত্রিকার একমাত্র অবলম্বন এবং কেবল কবিতা নিয়েই যে পত্রিকার একমাত্র বেসাতি, সেই পত্রিকায় যখন সমালোচনার রীতি দেখি, তখন অক্ষেপও হয় না, অনুশোচনাও হয় না; সেই

পত্র-পরিচালকদের প্রতি করুণার সঞ্চার হয় মাত্র। মনে হয়, তাঁরা কি এ রামপ্রসাদী গান একদিনও শোনেন নি?—

মা, আমায় ঘুরারি কত
কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত......

যদি শুনে থাকেন, তাহলে তাঁরা নিজে-দের অনুরূপ দুর্দশার কথা আজও ভাব-ছেন না কেন? তাঁরা অন্ধের মত একই বৃত্ত পরিক্রমণ করে চলেছেন নির্বিবাদে। বাইরে নূতন প্রভাত এসেছে কি না-এসেছে, অন্তত তা দেখার জন্যেও তাঁদের চোখ থেকে ঠুলি কিছুক্ষণের জন্যে নামানো উচিত। তাঁরা নিজেদের কি ভেবে বসে আছেন, সেটা আমরা আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে বাইরের সকলের ধারণাটা কি, তা তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন না। তা যদি জানতেন, তাহলে কবিতার গ্রন্থ নিয়ে এ ধরণের প্রহসন তাঁরা করতেন না।

সমালোচিত গ্রন্থের নাম উল্লেখের দরকার হবে না। সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধার করি—

১৩৫৬ সালের বই বলেই মনে হয় না, ১৩৩৬ সালেই একে মানাতো ভালো। কবিতার কলাকৌশলে কিছুই নূতনত্ব নেই, ভাষাও সাবেকি ঢঙের। বিষয়ের দিক থেকেও বলা যেতে পারে 'প্রথমা'রই সমধর্মী, এমনকি 'প্রথমা'র প্রথামতো 'ভাই' শব্দের ছড়াছড়ি বিদ্যমান।

এই সমালোচনার উত্তরে আলোচ্য গ্রন্থটির লেখক যা লিখেছেন এবং উক্ত পত্রিকাতেই যা মুদ্রিত হয়েছে, তা এই—

আমার কবিতা কারু ভালো লেগেছে বা লাগে নি এ সম্বন্ধে আমার কোনো বক্তব্যই থাকতে পারে না। সমস্ত বিচারই ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করে। বিচারের মজা যেমন আইনের আদালতে আছে তেমনি সাহিত্যের আদালতেও আছে। এই নিয়ে কটাক্ষ করার অধিকার, আর যার থাক, যার রচনার বিচার হচ্ছে, তার নেই। অন্তত তার পক্ষে সেটা শোভন নয়।

সে কথা আলাদা। কিন্তু সমালোচনা করতে বসে সমালোচক যদি আলোচ্য রচনার অমর্যাদা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টায় এমন-কোনো উক্তি করেন যা তথ্যের দিক থেকে মিথ্যে, তবে তার প্রতিবাদ দরকার। আর সত্যের খাতিরে সে প্রতিবাদ যে কেউই করতে পারে। কেননা সত্য সত্যই। সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন: "বিষয়ের দিক থেকেও বলা যেতে পারে 'প্রথমা'রই সমধর্মী, এমন কি 'প্রথমা'র প্রথামতো 'ভাই' শব্দের ছড়াছড়ি বিদ্যমান।" 'বিষয়' সম্বন্ধে সমালোচকের যা ধারণা তা তাঁর নিজেরই বিষয়—সে সম্বন্ধে নীরব থাকাই সমীচীন। কিন্তু ঐ যে শেষে লিখেছেন "'প্রথমা'র প্রথামতো 'ভাই' শব্দের ছড়াছড়ি বিদ্যমান।"—ওটি একটি নিছক কল্পনা, ভিত্তিহীন অপবাদ। [এ বইয়ে] কবিতার সংখ্যা বত্রিশ, পৃষ্ঠা সংখ্যা উনসত্তর। "ভাই" শব্দের "ছড়াছড়ি" দূরের কথা, সমস্ত বইয়ে, এক মলাট থেকে আরেক মলাট পর্যন্ত কোনো কবিতায়, কোনো পৃষ্ঠায়, কোনো লাইনে একটিও "ভাই" শব্দ নেই।

যে কথাটি ও যে প্রথাটির ওপর ভিত্তি করে কাব্যগ্রন্থটি আলোচিত হল, আসলে সে কথা ও সে প্রথার কোনো চিহ্নই আলোচ্য গ্রন্থে নেই। আমরাও বইয়ের পাতা উল্টে দেখেছি।

কবিতার প্রকাশ ও প্রচার, কবিতার বিচার ও বিশ্লেষণই যে পত্রিকা নিজের দায়িত্বে বলে গ্রহণ করেছে, সেই পত্রিকায় যদি এই ধরণের আলোচনা চলতে থাকে, তাহলে অন্য পত্র-পত্রিকার বিষয় আর কী বলা যাবে? কাব্য-সমালোচনা যেন এঁদের আসল কাজ নয়, কাব্যকারের সমালোচনাই উদ্দেশ্য। কাব্যকার যদি পছন্দসই লোক হন, তাহলেই তাঁর কাব্যের সমালোচনা মাত্রা ছাড়ানো সুখ্যাতির দ্বারা জর্জরিত হবে, অপছন্দসই লোক হলে আলোচনা দিয়ে সেই লেখককে ও তাঁর লেখাকে জর্জরিত করা হবে—এইটেই তাঁদের অঘোষিত নীতি কি না জানি নে। তা যদি হয় তাহলে তা পরি-তাপের বিষয়। কবিতাকে রাজনীতির পর্যায়ে তুলে বা নামিয়ে এনে লাভ নেই। আর একটি কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা লিখেছেন—

দুঃখের বিষয় [এই] অসাধারণ সুদৃশ্য একটি কাব্যগ্রন্থে এমন কবিতা একটিও নেই, যাতে কলাকৌশলের বিস্তর ত্রুটি না আছে, কিংবা যাকে কবিতার খসড়া বলে খাতায় রেখে দিলে কবির বিশেষ ক্ষতি হত। কবিতার গভীর কোনো অর্থের আশা যদি ছেড়েও দিই, গড়নটা, নিখুঁত বলেই মনে হয় অনেক পেলাম। কিন্তু গড়নে ত্রুটি রাখার অর্থ স্বহস্তে কবিতার হত্যাসাধন। মাত্রা গুণতিতে কবিতা নির্ভুল, কিন্তু গুণতিটা ঠিক রাখার জন্য এ তো ই সে যে তা ও হে প্রভৃতি সর্ববিপদহারক অব্যয় শব্দের প্রলোভনে কোনোরকমে বারংবার ধরা দিলে কবিতার জলাঞ্জলি অবধারিত।

সমালোচক কবিতার যে গড়নটির উপর জোর দিয়েছেন, আসলে সে বস্তুটি কি, তা তিনি ব্যাখ্যা করলে ভালো করতেন। কেননা, এ কাব্যটি আমরা পড়েছি, কিন্তু যে অপবাদ একে দেওয়া হয়েছে, সে অপবাদ এ কাব্যের প্রাপ্য যে নয়, রকম-সকম দেখে তা আর জোর করে বলি কী করে? সমালোচক সমালোচনার প্রারম্ভে যা বলে-ছেন, তা অভিনব উক্তি—

কবি হিসেবে এখন তাঁকেই শুধু মানা সম্ভব, ভাবের গভীরতা না থাকলেও অন্তত পদ্য-রচনার কারুকর্মে যাঁর ত্রুটি নেই। যে-কোনো দেশের যে-কোনো কবিকে এখন—উৎকৃষ্ট কবিতা না হোক, অন্তত উৎকৃষ্ট পদ্য লিখতেই হবে।

কবিতাকে কবিতা না হলেও চলবে? এর অর্থ বোঝা গেল না। উৎকৃষ্ট পদ্য হওয়া চাই—এই উৎকৃষ্টতাটাই তাহলে হয়তো গড়ন। যার কথা সমালোচক উল্লেখ করেছেন। অব্যয় শব্দ কবিতায় ব্যবহার করা চলবে না বলে ইঙ্গিত করেছেন তিনি। কবিতা নিয়ে তাহলে তো সমূহ বিপদে পড়া গেল। কবিতা, এঁদের হাতে, যদি কবিতার রূপ নেয় তাহলেই তা মাঠে মারা গেল। আর কোনো গুণ এর না থাকলেও চলবে, কেবল যা থাকাই চাই, তা হচ্ছে গড়ন। হয়তো এঁরা রসপিপাসু না ব'লে বলতে চান মাংসলোলুপ।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি পুরানো চটুল ছত্র মনে পড়ে গেল—

অনেক দুঃখ স'য়ে আর বহু রক্তের বিনিময়ে কবিতার হাটে কবিতা কিনতে হবে। শুধু আধখানা মুচকি হাসি ও শারীর বিজ্ঞাপনে দেহ-বিক্রয় হয় না হাটের ধারের এ-বস্তিতে: কবিতা লক্ষ্মী, কবিতা বেশ্যা নয়।

আশা করি, আধুনিক কাব্য-সমালোচকেরা এরূপ অসঙ্গত ও অশোভন দাবী পরি-ত্যাগ করে লক্ষ্মীমন্ত হবার চেষ্টা করবেন। বাঙলার কবিতা-গড়নের দিকে তাহলে তাঁদের চেষ্টা সহায়ক হবে।

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৭

ইটালির প্রবাদে বলে, "নেপল্‌স দেখে তবে মরুন।" এত সুন্দর নেপ্‌ল্‌স্‌। লেখক এর সৌন্দর্য দেখবার জন্য আসেনি। মরবার কথাও তাঁর মনে পড়েনি; হয়ত বয়স কম হলে পড়ত। সে পালিয়েছিল বেহায়া প্যারিসের অসহ্যতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। ফ্রান্সের বাইরে যে কোন জায়গায় যেতে পারলেই সে বাঁচে। হাতে ভারত সরকারের দেওয়া ইটালিয়ান মুদ্রার অবশেষও কিছু ছিল। নেপ্‌ল্‌সের বিজ্ঞাপনটা হঠাৎ নজরে পড়েছিল—নিলেভে হলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু একবার নেপ্‌ল্‌স্‌ সম্বন্ধে মন স্থির করে নেবার পরমুহূর্ত থেকেই মনে হচ্ছিল যে, সে বৃথাই ল্যাটিন সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে এসেছিল ফ্রান্সে—সেকেন্ডহ্যান্ড দালালের কাছে। এর জন্য যাওয়া উচিত ল্যাটিন সংস্কৃতির উৎসমুখ ইটালিতে। তা'ছাড়া অনেক দিন তো ফ্রান্সে থাকা হল। এদেশের আর কত বেশী শিখবে, জানবে। সে রকমভাবে জানতে গেলে কোন একটা দেশে সারাজীবন থেকেও ফুরনো যাবে না। ইটালিতে থাকবার কথাটা নেপ্‌ল্‌সে গিয়ে ভাল করে ভেবে দেখবে।

দক্ষিণ ইটালির হাওয়া-বাতাসে একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব আছে। ব'লে বুঝনো যায় না, কিন্তু কেমন যেন কিছুতেই নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। শীতের দেশে যেমন খিদে বেশী পায়, এখানে তেমনি বেশী পায় অনির্দিষ্ট ভাবনা। নিষ্পলক রোদে চোখের পাতা খুলতেও ক্লান্তি আসে। মন ভেসে বেড়াতে চায়, চিলের মত গা এলিয়ে। চোখ মেললে নজরে পড়ে কমলালেবু গাছের সঙ্গে রোদ্দুরের খুনসুড়ি। তখন মনে মনে পড়ে বাড়ির উঠানের পেয়ারা গাছটার কথা। পাশ্চাত্য এখানে তার অন্ধ গতিশীলতা হারিয়েছে, অথচ প্রাচ্যের স্থাণুপ্রবণতার বোঝা নেই নেপল্‌সের বুকে। 'Lotus eaters'দের দেশ এই অচেনা সীমান্ত থেকে বেশী দূরে ছিল না। জলপাইয়ের গাছ দেখে মনে পড়ে আচার-পাহারারতা পিসিমার হুস্‌ করে কাক তাড়ানো। ও লালা! মরক্কোর জলপাইয়ের তেল......

......দাদার টেলিগ্রামের উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি! এখানকার নীল সমুদ্র উদ্বেল চাঞ্চল্য হারিয়েছে; তাই এর ঝিরঝিরে ভিজে হাওয়া মনে অবসাদ আনে। ভুলে যাওয়া জিনিসগুলো কবোষ্ণ রৌদ্রের সোনালি তবক জড়িয়ে মনের মধ্যে আনাগোনা আরম্ভ করে। এখানকার ভিজে নোনা বাতাসে গন্ধক-পাথরের গায়ে নোনা ধরায়, ক্ষত আরও দগদগে হয়ে ওঠে। অথচ সে এসেছে ভুলে যেতে। মানুষ কেবল চায় ভুলতে। গত জীবনের সিন্দুকে ভুলে যাওয়া-গুলোকে বন্ধ না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। এই বিস্মৃতিগুলোই লোকের জীবন; মনেপড়াগুলো তারই এক-একটা সাজানো গোছানো প্রাণহীন মমি—ফেলমারা ব্যাঙ্কের উপর চেক।

......বড্ডো মনে পড়ায় এখানকার নীল আকাশ; বড় মনে পড়ায় এখানকার নীল সমুদ্র।...অথচ এইখানেই নির্বাসিত হয়েছিলেন প্রেমের পূজারী সেন্ট ভ্যালেন্টাইন! যারা শাস্তি দিয়েছিল, তারা নিশ্চয়ই এখানকার আকাশ-বাতাসের গুণাগুণের সঙ্গে পরিচিত ছিল।.. তবে কেন এখানে সারা ইউরোপ থেকে নবদম্পতিরা লাখে লাখে ছুটে আসে, মধুচন্দ্র যাপন করবার জন্য? বিশ্ব যাদের হাতের মুঠোয়, স্বর্গের দুয়ারের চাবিকাঠি যাদের আয়ত্বে, তারা এখানে আসে কি ভুলতে, কি মনে পড়াতে? অর্ধচন্দ্রাকৃতি নেপ্‌ল্‌স্‌ উপসাগরের সঙ্গে ভাবানুষঙ্গে তারা ফুলশরের ধনুকের তুলনা করে। কেউ মুখস্ত করা বুলিতে বলে বিজয়িনী রোমের পদনখকলা এই উপসাগর। কেউবা তৈরী হয়ে আসে নববধূর চোখের দিকে তাকিয়ে বলবার জন্য—যে তার চোখদুটো যেন এখানকার দু চামচ নীল জল। হোক মুখস্ত করা। তবু এর পিছনের সত্যটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। নেশা কাটলে, হয়ত এই নীল চোখের মধ্যেই কুটিলতার আভাস দেখতে পাবে। কিন্তু যখন যেটা দেখছি, তখনকার মত সেইটাই তো সত্য। মনের উপরের সাময়িক ছোপগুলোর সমষ্টিই জীবনের জ্ঞানের সম্ভার। ভুল ভিত্তির উপরও যদি এই ছোপের কাঠামোটা গড়ে তোলা হয়, তাহলেই কি সেটা সর্বৈব মিথ্যে হয়ে যায়? ভুল ভিত্তির উপর গড়ে তোলা পিসার টাওয়ার আজও দাঁড়িয়ে আছে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব বেরোবার পরও ছাত্ররা ক্লাসে নিউটনের সূত্রগুলোর উপর অঙ্ক কষে মরে। কাজ চলে গেলেই হল। চরমোৎকর্ষের মুহূর্তের ব্যঞ্জনাটুকু ধরে রাখা যায় শুধু অক্ষরে, ছবিতে, পাথরের প্রতি-মূর্তিতে; কিন্তু রক্তমাংসে গড়া মানুষের মধ্যে সেটা ধরে রাখবার আশা করা কি ঠিক?...

ভাবনা ভুলবার জন্য কাছাকাছি জায়গাগুলো দেখতে যেতে হয়।...পম্পির ধ্বংসাবশেষ দেখে মন উদাস হয়ে ওঠে। কত আশা আকাঙ্ক্ষার কঙ্কাল এখানে! কত উন্মাদ আকুতি, কত উদ্দাম বাসনা, তীব্র আকস্মিকতায় জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। নগরশ্রেষ্ঠীর বাড়িতে গাইড পুরুষ-টুরিস্টদের আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপনীয় জিনিস দেখায়—"Not for ladies, please"! গৃহদেবতার মন্দির দেখে মনে হয় যে, আগেকার মানুষই বুঝেছিল ঠিক। নইলে তারা সৃষ্টিরহস্যের পূজো করবে কেন? যে স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম দেয়, তার চেয়ে বড় কাজ মানব সভ্যতার জন্য আর কেউ করে না।...

ভিসুভিয়াসের ক্রেটার দেখতে গিয়ে মনে অবসাদ আসে। মানুষ কত ছোট তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল বলেই কি আজও টুরিস্টরা ভিসুভিয়াসকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আসে এখানে? মানুষ কত ছোট দেখাতে পেরেছিলেন বলেই আমরা কোপার্নিকাস, গ্যালিলিয়োর পুজো করি।...ও লালা! আগ্নেয়গিরির ক্রেটার কি এমনি হয় নাকি? আমি ভাবতাম, বুঝি সুরঙ্গের মত অনেক নীচে পাতালের আগুন দেখা যায়। গর্ত কই—এতো দেখছি একটা প্রকান্ড ঘোড়দৌড়ের মাঠের মত ব্যাপার।...

লেখক সতর্ক হয়ে যায়।

ঝিনুকের খেলনার ফিরিওয়ালাটা একটা ছিনেজোঁক! লেখক বলছে, তার দরকার নেই! তবু নাছোড়বান্দা লোকটা বলবে সিনিয়োরার কথা ভুলবেন না সিনিয়োর না পোলি থেকে বাড়ি ফিরবার মুখে।...নিয়ে যান একটা প্রবালের নেকলেস...একটা ঝিনুকের মালা।... সকলে কিনছে।...কে খুশি হত না হত বয়ে গেল! তবু মনটা খারাপ হয়ে যায়।

...ও লালা! তুমি আবার আমার জন্য এত খরচ করে প্রবালের নেকলেস কিনতে গেলে কেন? ছবি আননি ওখানকার? কেমন মানুষ যেন বাপু তুমি।...

এর হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই। দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখতে গেলেও নয়। নিজের রূপে গর্বিনী প্রকৃতির এখানে মানুষের দিকে মুখ তুলে চাইবার অবসর নেই। তাই মানুষ এখানে বড় একা। এখানকার নিঃসঙ্গতার হাত থেকে বাঁচবার জনাই লোকে এখানে একা আসে না। এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতার হাত এড়ানোর জন্য লেখক গিয়েছিল কাপ্রি।... ও লালা! পম্পির চেয়েও বেশী নির্মম কাপ্রি দ্বীপের নির্জনতা! এত পাখী! আকাশেরই অংশ ভাবে দ্বীপটাকে পাখীরা। মানুষের জায়গা এটা নয়। এখানে পাখীর ঝাঁকই খাপ খায়। যেখানকার যা। নতর্ দাম্ ক্যাথেড্রালের ম্যাডোনার মূর্তিটির সঙ্গে, একা শিল্পীর স্টুডিয়োর মাতৃমূর্তির তুলনা করতে যাওয়া ভুল।...ফরাসী মেয়েকে ফরাসী পরিবেশে নিতে হবে, ভারতের পরিবেশে নয়।...তার সর্তে তাকে নেওয়ার কথাটা শুনতে ভাল। কিন্তু সত্যিই কি তা সম্ভব? থিয়েটারে প্রহরীর ভূমিকা নিতে রাজি হবার সর্ত যদি কেউ দেয়, যে তার রাজার পোষাক চাই—এ সেই রকমই অসঙ্গত আবদার! আছে তো......সব জিনিসেরই একটা......

দিনের পর দিন এ সব ভাবনার কূল-কিনারা নেই। আসলে মনের গহীনে স্পষ্টতার অগোচরে যে জিনিসটা তার ঠিক করা হয়ে গিয়েছে, সেইটাকেই সাজানো-গোজানোর পালা চলছে এখন। তাই লেখক হাজার বার করে উলটে-পালটে দেখছে জিনিসটাকে—কোন্ পোষাকে একে মানায় ভাল। বাইরের আঘাতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ঘোরানো পথ এটা। "ও লালা।" কণ্টকিত যুক্তি খণ্ডন বিরতির পথে তার মন ক্লান্ত হতে ভুলে যায়।

...অন্যায় আর অযৌক্তিক দুটো কথারই আসল মানে বোধ হয় এক। অথচ এক একটা লোক মরবার আগে এমন যুক্তিপূর্ণ চিঠি দিয়ে যায় যে, তার আত্মহত্যাটাকে অপ্রকৃতিস্থ মনের ফল বলে মনে হয় না। এই প্যারিসের লোকরাও নিজেদের বাউণ্ডুলে জীবনটাকে এমন কতকগুলো যুক্তির বেড়াজালে জড়িয়ে রেখেছে যে, তা ভেদ করে তাদের মনের অসঙ্গতি খুঁজে বার করা ভার। নেটার কাছে বাঁহাত যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক মনে হয় এদের আচরণের অস্বাভাবিকতা। পরিবেশের সঙ্গে রং মিলিয়ে এমন হয়ে গিয়েছে যে, বিসদৃশ ঠেকে না—কিছুকাল থাকবাব পর তো নয়ই। কিন্তু নিজের গায়ে আঁচড় লাগলেই আসল প্রাচ্য মন বেরিয়ে পড়ে। মনের প্রসার বাড়াবার জন্য সে বিদেশে এসেছে, অথচ ভারতবর্ষের সামাজিক বিধিবিধানের চেয়ে বড় করে একটা সামান্য ব্যাপারকেও দেখতে পারল না! সে বৃথাই ভেবেছে যে, সে সত্যিকার প্যারিসিয়ান হতে পেরেছে। কূপমণ্ডূকতার আবেদনই কি এমনি বড় থাকবে তার কাছে চিরকাল? লোক ভালও না মন্দও না। তুমিই তোমার মনের প্রসার অনুযায়ী ভালত্ব বা মন্দত্ব আরোপ করছ, সংহনশীলতার অভাবের জন্যই সমালোচনা করছ। তোমার দেশের আজকের প্রচলিত ভাল-মন্দর ফ্যাশনটা, যে না মানছে তাকে তুমি জেল দিচ্ছ, ফাঁসি দিচ্ছ, অথচ পুরনো ফ্যাশনের পোষাক পরা লোক দেখলে তুমি তাকে করুণার চোখে দেখ। এই দুই রকম আচরণের মধ্যে সঙ্গতি থাকছে কোথায়?......

প্রথম কিছুদিন মনের উপর রাশ টানবার যে চেষ্টাটা ছিল, সেটা মনকে একেবারে থামাবার জন্য নয়, গন্তব্যে পেঁাছতে দেরী করাবার জন্য। এখন উপরের মন আর নীচের মনের খেলে খেলার উৎসাহে মন্দা পড়েছে।

...সব সময় কোন জিনিসকে অপরের দিক থেকে ভেবে দেখার নামই যুক্তি—ন্যায়! এই যুদ্ধের সময় যাদের যৌবন কেটেছে, তাদের মনের উপর যুদ্ধকালীন নিত্য-নূতন পরিবর্তনের অস্থিরতা, খানিকটা রেখাপাত করে গিয়ে থাকবে। এ জিনিস সাময়িক। এইটা কেটে গিয়ে, এই মনেরই চরম উৎকর্ষ দেখা যাবে, দুচার বছর শান্তির অপরিবর্তন অর্থা আস্বাদের পর। ভাল-মন্দ মাপবার বাঁধাধরা মাপকাঠি আজ পাবে কোথায়? ...কাউকে বিচার করতে গেলে তার মধ্যে ভালটা বেশী না মন্দটা বেশী, সেইটা দেখাই দরকার। মোটের উপর সব মিলিয়ে কেমন—এইটাই ফরাসী দৃষ্টিভঙ্গী। অ্যানির কাছ থেকে এতদিনকার, অত মিষ্টি দরদভরা পাওয়াগুলো হয়ে গেল ছোট, আর রেসকোর্সে কিনা কি দেখলে সেইটাই হল বড়। চোখের দেখা জিনিসটাই চরম সত্য নয়। একই ঘটনা দেখে দুজন সাক্ষী দুরকম বিবরণ দেয়। যে চোখ দেখতে হলে আয়না লাগে, সেই চোখে দেখা জিনিসের আবার দাম!... নূতন পরিবেশে, পুরনো মানুষই নতুন হয়ে ওঠে। কাউকে ফিরিয়ে আনতে হলে দরকার ধৈর্যের। রাগে কাজ কোন দিনই হয়নি, অভিমানে কাজ হয় কাব্যে; বাস্তবক্ষেত্রে দরকার সহানুভূতির। তার দিক থেকে সমস্ত জিনিসটা ভাবতে না পারলে সে দরদ আসবে কোথা থেকে? তার ভুল হয়েছে যে, অ্যানির সঙ্গে তার সাহচর্যের ব্যাপারটাকে সে সব সময়ই নিজের মন দিয়ে নিজের সুবিধা

অসুবিধার দিক থেকে দেখেছে। ও লালা! ঠিকইত। এইটাই হয়েছে কাল! মুহূর্তের জন্যও ফরাসী মেয়ের দৃষ্টি দিয়ে সে জিনিসটাকে দেখেনি। ফরাসী-স্বচ্ছচিন্তার (la clarte francaise) বিশ্বজোড়া খ্যাতি! অস্পষ্টতাকে ফরাসীরা অন্তর থেকে অপছন্দ করে। তাই এদের শ্রেষ্ঠ চিত্রকররা কেউ রাতের ঝাপসা দৃশ্যের ছবি আঁকেন নি; সবাই চেয়েছেন স্পষ্ট আলোর মাধুর্য ফোটাতে। নিশ্চিত জিনিস না হলে ফরাসীদের মন খুঁত-খুঁত করে। সব সময় পায়ের নীচে মাটি আছে কি না, অনুভব করে করে দেখতে চায়, স্বভাবার্গাগ্নি ফরাসী মেয়েরা। কিন্তু অ্যানিকে স্পষ্ট করে কেন, ইঙ্গিতেও কোন দিন বলা হয়ে ওঠেনি কথাটা! কি ভুলই সে করেছে! মেয়েরা সবচেয়ে বেশী চায় জীবনে নিরাপত্তা। এত খবর রাখে সে, অথচ এই কথাটা মনে পড়েনি কাজের সময়। মনের আগাছা সংশয়গুলো কেবল তুলে ফেলাই পর্যাপ্ত নয়; সেগুলোকে পচিয়ে গলিয়ে মনের উর্বরতা বাড়াতে হয়।......সে চেয়েছিল সাধারণ হতে; তবে আবার অ্যানির ঝি হওয়ার কথাটা মনের মধ্যে উঠেছিল কেন দিনকয়েক আগে? এ তো হওয়া উচিত নয়। আজকে যে লোককে সাধারণ বলছ, হয়ত তার নিজেকে প্রকাশের মাধ্যমটা আজও বার হয়নি; কিম্বা হয়ত তার মাধ্যমকে আজকের ব্রাহ্মণরা জাতে তোলেন নি। তাই সে সাধারণ।

........অ্যানি একান্ত মেয়ে-মানুষ। গিন্নিপনা ছাড়া আর অন্য কিছু তার সাজে না। একবার 'লাইট ফেল' করবার পরের দিন, সলজ্জ অপ্রতিভতার সঙ্গে লেখকের টেবিলের উপর এনে রেখেছিল —দেশলাই আর মোম-বাতি; যেন ত্রুটিটা তারই।.........

তার মিষ্টি ব্যবহারের ছোট ছোট ঘটনাগুলো আবার বড় হয়ে ওঠে।

......অত পাওয়া, অমন করে পাওয়া কি মিথ্যে হতে পারে!

......ও লালা!......ও লালা!......যে পথেই ভাব, ও লালা আসবেই আসবে।

সেদিনকার ব্যাপারটাকে নিয়ে অ্যানির সঙ্গে বোঝাপড়া করবার কথাটা হাস্যাস্পদ। নিজের সাহচর্যে অ্যানির মনটাকে একটু মেজে-ঘষে নিলেই চলবে—যাতে সে টের না পায়।......না, না, স্বাভাবিকভাবেই সে অ্যানিকে বলবে তার জীবনের সঙ্গিনী হতে। প্যারিসে আর বেশি দেরি না করে, তাকে নিয়ে চলে যাবে দেশে।

ও লালা! দেশে তো অনেকদিন চিঠি দেওয়া হয়নি! দাদার টেলিগ্রামের জবাব হিসাবেও তো একখানা চিঠি লেখা উচিত ছিল। দাদাকে লিখবে, যদি টিনে ভরা পাকা আম পাওয়া যায়, তাহলে দু'টিন পাঠিয়ে দিতে, হোটেলওয়ালিরা বলেছিল যে, তারা কোনদিন আম দেখেনি। না পাওয়া গেলে পিসিমার গা-আলমারিতে আমসত্ব এখনও আছে কি না, যেন খোঁজ নেন।

ট্যাক্সি! পার্কার্স হোটেল ব্রিটানিক! টাইমটেবল — মাপবারবেল — হোটেল-বি — এখনই পিকচার পোস্টকার্ড — আরও দুখান — প্রবালের মালা — শাঁখের কাগজচাপা দাদার জন্য — না থাক ফেরৎ দেবার দরকার নেই — লামাণ্ডা টিপস্ পুরবোয়া—গুডনাইট! আদিয়য়ো!

ট্রেনে চড়ে তবে নিশ্চিন্দি!

কামরার সকলের অনুমতি নিয়ে একটি আমেরিকান দম্পতি দু-দিককার বাঙ্কের সঙ্গে দড়ির দোলনা ঝুলিয়ে তাঁদের কচি ছেলেকে শুইয়ে দিলেন। করিডোরে বার হবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।.........তা হোক! মানুষে মানুষের জন্য এইটুকুও ত্যাগস্বীকার যদি না করে, তাহলে কি দুনিয়া চলে? নিজের প্রাপ্য অধিকারের চেয়েও বড় জিনিস আছে পৃথিবীতে।........

লেখক ছেলেটাকে দোলা দিয়ে আদর করে। ছেলেটা হাসতে হাসতে তাকাচ্ছে পুট-পুট করে। পাশ-বালিশের খোলের মত অয়েলপেপারে সর্বাঙ্গ ঢোকানো না থাকলে হাত-পাও নাড়ত নিশ্চয়।.........ঠিক একটা প্রকাণ্ড sausage-এর মত দেখতে লাগছে।......ওরে আমার সসাজ রে! ......কি হচ্ছে সসাজ খোকা!.........

গর্বিতা মা হেসে বলেন, "খাবেন নাকি আপনি সসাজ একটুকরো?"

এই সূক্ষ্ম আমেরিকান রসিকতাতে পর্যন্ত আজ লেখক প্রাণ-খুলে হাসে। গল্প করতে তার আজ বড্ড ভাল লাগছে। তাঁদের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে, সারারাত আমেরিকান গতিতে, মহিলার হাতের ঠোঙাটার থেকে লজেন্‌স খেয়ে চলে। পাশের প্রৌঢ়া ফরাসী ভদ্রমহিলাটিও গল্পে যোগ দিয়েছেন।

আমেরিকান ভদ্রলোক কামরার আলো নিভিয়ে দিলেন; খোকার খাওয়ার সময় হয়েছে। বেশ একটা বাড়ী বাড়ী ভাব। অন্ধকারে সকলেই চুপ করে বসে আছে। শুধু একটি কথা কানে আসে—ফরাসী মহিলাটি বললেন, বেশ খায়, তোমার ছেলে।.........কথাটা লেখকের দেশে হলে হয়ত ছেলের মা মনে করত, নজর দিচ্ছে ডাইনী-বুড়িটা।......মনে হলেই হাসি পায়। কথাটা গিয়ে বলতে হবে অ্যানিকে। ......ও লালা! এ সব কোন কথা বলতে আছে, কোন কথা বলতে নেই তোমাদের দেশে, আগে থেকে শিখিয়ে দিয়ো কিন্তু বাপু আমাকে। ....

......'বেশ খায় তোমার ছেলে'—কথার সুর ঠিক পিসিমার মত। ফরাসী মেয়ে না হলে এমন সাধারণ কথাটার মধ্যে দিয়ে কখনও ম্যাডোনার মাধুর্য ঝরাতে পারে কেউ? মেয়েরা ফ্রান্সে নারীত্বের মহিমায় মহীয়সী। সমাজের উদার চোখে নারীত্বের মর্যাদায় সতী অসতী কারও উপর পক্ষপাত নেই। দেবী আর বারাঙ্গনার নাম এরা নেয় এক নিশ্বাসে। কুমারী জোয়ান—অফ-আর্কের দেবী বলে পুজো হয় এদেশে। সঙ্গে সঙ্গে অর্ঘ্য পান রাজার রক্ষিতা Agnes sorel, যাঁর পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে জোয়ানের জীবন কাটতো ভেড়া চরিয়ে। নিছক নারীত্বে ফরাসী মেয়ের তুলনা নেই। তাই ফ্রান্স এত মিষ্টি। প্যারিসের রঙের দোকানের সেই ভদ্রমহিলাটি ঠিকই বলেছিলেন।.........

আমেরিকান ভদ্রলোকটি করিডোরে গিয়েছিলেন ছেলের-ওয়াড় অয়েলপেপারগুলো ফেলতে। সিগারেট খাওয়াটাও ঐ সঙ্গেই সেরে আসছিলেন বোধ হয়। সকলের বারণ করা সত্ত্বেও একজন ইটালিয়ান, তাঁর সিটে এসে বসলো। শুনিয়ে দিল যে, সে ইটালির আইন অন্য সকলের চাইতে ঢের ভাল জানে।—সিট রিজার্ভ করনি' কেন.?

লেখক মহিলাদের অনর্থক কথা কাটাকাটি করতে বারণ করে। আমেরিকান ভদ্রলোক আসতেই, চোখ ইশারায় কাতর মিনতি জনায়—এই সামান্য

ব্যাপার নিয়ে, আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি—সব রকমেরইতো লোক আছে পৃথিবীতে।.........

এই প্রশান্ত সহনশীলতার মধ্যেও প্যারিসের দুরন্ত অসহ্য লাগে।

সময় কাটানোর জন্য সে বার করে সুটকেস থেকে তার ডায়েরির খাতাখানা। ডেটলের শিশিটায় হাত লাগতে হঠাৎ মনে পড়ে দেবরায়ের কথা। হয়ত টাকাটা দিতে পারছেন না বলে, দেখা করেন নি ভদ্রলোক। বড় ভাল লোকটি। এক্স-চেঞ্জের কড়াকড়িতে টাকা আনাতে পারছেন না বোধ হয়। —তাতে কি হয়েছে। এবার দেখা হলে বলে দেবে যে, ভারতবর্ষে ফিরবার পর লেখক টাকাটা তাঁর বাড়ী থেকে নিয়ে নেবে। তার বাতিকগ্রস্ত জীবনের ট্র্যাজেডি দেবরায় নিজেই বোঝে না—বাইরের লোকে বুঝবে কি করে?......

......অনেকদিন ডায়েরি লেখা হয়নি। ট্রেনের ঝাঁকানির মধ্যে এখন লেখা গেলে হয়।......

পকেট থেকে কলমটা বার করবার সময় হঠাৎ সংকোচ আসে—গাড়ীর মধ্যে খসখস করে লিখতে আরম্ভ করলে, বড্ডো অন্য যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।......পকেট বুকে হিসাব লেখাটা পর্যন্ত এরা সহ্য করতে পারে, কিন্তু বড় খাতায়—— ও লালা।......

সে অন্যমনস্কভাবে ডায়েরির পুরনো পাতাগুলো পড়তে আরম্ভ করে......বড় বেশী Generalization হয়ে গিয়েছে। ......আগে হয়ত সে ফরাসীদের সম্বন্ধে অনেক কম জানতো। এখন লিখতে গেলে এর অনেক কথা সে বাদ দিত।......সত্যের অনেকগুলো দিক আছে ....

মনের বিভিন্ন অবস্থায় মতামতও বিভিন্ন হয়, এ জিনিস এখন ডায়েরি পড়বার পরও তার খেয়াল হয় না। সে ভাবে যে জ্ঞান বাড়ার সংগে সংগে তার মতের পরিবর্তন হয়েছে। তবে বই ছাপাবার সময় সে ডায়েরিটা ঠিক যেমন আছে তেমনিই রেখে দেবে।......

তার প্রেমের আলোছায়ার খেলা যে ফ্রান্সের সম্বন্ধে তার ভুয়ো স্বাধীন চিন্তাকে প্রত্যহ প্রভাবিত করেছে, একথা কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সে স্বীকার করত না। এত সবজান্তা সে!

ডায়েরি

প্রাগৈতিহাস গ্রিমাল্ডির মানুষেরা থাকত ফ্রান্সে। তারপর রোমান, জার্মান, সেল্টিক, আরও বহুজাতি এখানে এসে বাস করেছে। এমনকি উত্তর আফ্রিকার মানুষের রক্তও সম্ভবতঃ কিছু আছে ফরাসীদের মধ্যে। সেইজন্যই হয়ত ফরাসীরা অন্তর থেকে বিশ্বপ্রেমী। জার্মানির মত যে সব জাতের রক্তের গরব আছে তারা ফরাসীদের মানসিক গঠনের এই দিকটা বুঝতে পারে না। পারে না বলেই, তারা জার্মান নিষ্ঠার সংগে গবেষণা করে একটা কারণ বার করেছে। তারা বলে যে, চামড়ার রঙ সম্বন্ধে ফরাসীদের উদারদৃষ্টিভঙ্গী স্বার্থবুদ্ধি-প্রসূত। ফ্রান্সের জনসংখ্যা বাড়ছেনা বলেই নাকি তারা এই কৌশল আরম্ভ করেছে। ফরাসীরা এই ছেলেমানুষি যুক্তি শুনে হেসেই বাঁচেনা। বলে—সাধে কি আর আমরা বলি যে, নর্ডিক জাতগুলোর গবেষণাতে থাকে অধিকতম সংবাদ আহরণ আর ন্যূনতম চিন্তা!

ফরাসীদের বিশ্বপ্রেমের কারণ যাই হোক, বহুল রক্তমিশ্রণজনিত মানস-দ্বন্দ্বের লক্ষণ ফরাসীদের মধ্যে বেশ উচ্চারিত। এরা সবচেয়ে ধর্মপ্রবণ ক্যাথলিক, অথচ মন এদের সংশয়ী। সবচেয়ে বিপ্লবী, অথচ সবচেয়ে রক্ষণশীল। যুক্তিবাদিতা ও ভাবাবেগ-শীলতা এই দুটি পরস্পর বিরোধী বৃত্তিকে মনের মধ্যে এরা একই সংগে পোষ মানিয়ে রাখে। এত গভীর অথচ এত হালকা! এত ইন্দ্রিয়পরায়ণ অথচ এত নিরাসক্ত! এইসব বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্ব চিহ্ন রেখে গিয়েছে ফরাসীদের ইতিহাসে, সাহিত্যে, শিল্পে, জীবনের দিকে দিকে। একদিকে Janselisme-এর কঠোর বৈরাগ্য; অন্য দিকে হালকা প্রেমের ঐতিহ্য। একদিকে রামবুইয়ের (L' Hotel de Rambouillet) পরিবেশের অলংকার-বহুল কেতাদুরস্ত কথা; অন্যদিকে স্থূলে Gaulois ব্যঙ্গ, চুটকি, ছড়াকাটা। পাদরীকে বিদ্রূপ এদের ব্যঙ্গসাহিত্যের সবচেয়ে বড় অঙ্গ; অথচ সবচেয়ে ভালবাসে কার্ডিনাল রিশল্যুর নাম। রাজাহীন রিপাবলিকের গর্ব করে অথচ ইতিহাসের রাজাদের নাম বলতে এরা অজ্ঞান—বিশেষ করে রাজা চতুর্দশ লুইয়ের। ফরাসী বিপ্লবের কথা বলতে গেলে এখনও আত্মহারা হয়ে পড়ে; অথচ যে নেপোলিয়ন ঐ বিপ্লব ব্যর্থ করেছিলেন তাঁর পুজো করে। জার্মানদের ঘৃণা করে, অথচ তাদের রাজা শার্লে-মেইনকে নিজের বলে দাবি করে। মানুষকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে। সারা জীবনের দিক থেকে দেখলে এরা এত আয়েসী ও আরামপ্রিয়, যে পান থেকে চুণ খসবার জো নেই ভোগবিলাসের জিনিসগুলোয়; অথচ ক্ষণিকের আকাশ ছোঁয়ার লোভে, আনুষঙ্গিক বিপদগুলোর কথা ভুলে যায়। এই মানসদ্বন্দ্বের ফলেই ফরাসীরা ভাবাবেগচালিত কাজে উৎসাহী, যে কাজে ধৈর্যের দরকার তাতে উদ্যমহীন। একেবারে হুবহু বাঙ্গালী-দের সংগে মেলে! এইসব বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের টানাপোড়েনের ফলে ফরাসী মন কোনরকমে একটা নড়বড়ে ভারসাম্য রেখেছে। বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফল ব'লে আজও জিনিসটা সুস্থিত হতে পারেনি। এরই উপর এসে ধাক্কা দিচ্ছে বর্তমানের ভালমন্দের নূতন মান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আদিভূমিতে লোককে যদি শোনানো যায়, যে পরিমাণে তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে দিতে পারবে, সেই পরিমাণে তুমি মানুষ, তাহলে প্রথমটায় এর প্রতিক্রিয়া হিসাবেও খানিকটা সামঞ্জস্যরহিত আচরণ আসতে বাধ্য। এতকাল পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল যে, বিশ্বের কেন্দ্র মানুষ। আজ তার সে ভুল ভেঙ্গেগেছে। আজ সে দেখছে যে, বিশ্ব কেন, সমাজের কেন্দ্র পর্যন্ত মানুষ নয়। মুখে যে যাই বলুক, মানুষ হয়ে পড়েছে গৌণ। যার হাতে ক্ষমতা যাচ্ছে, তাকে যে চিরকাল অবিশ্বাস করতে শিখিয়েছে ফরাসীদের শিক্ষা-দীক্ষা। পলভ্যালেরির মত লোকও রাষ্ট্রকে প্রশংসা করতে গিয়ে বলে ফেলেছেন—"সকলের বন্ধু অথচ প্রত্যেকের শত্রু।" এই নূতন মানে এখনও খাপখাওয়াতে পারেনি বলে স্বভাবতঃ অস্থির ফরাসীমন হয়ে পড়েছে আরও বিভ্রান্ত। এইটাই ফরাসী মনের সংকট;

কিন্তু এর চেয়েও ব্যাপক, এর চাইতেও ব্যাপ্ত মনোভাব হচ্ছে ভয়। গত যুদ্ধের বিভীষিকা চোখের সম্মুখে, আগামী যুদ্ধের আতঙ্ক অজ্ঞানে মনের উপর ছায়াপাত করছে। তাই ফরাসী মন এখন চায়—আলটপকা যা কিছু আসে এই ফাঁকে লুটে নিতে। কেঁদোনা কাঁদিয়োনা, ভালবাস, ভালবাসার যোগ্য হও—এই ছিল ফ্রান্সের চিরন্তন আবেদন। আজও আছে। কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত ফরাসীরা আজ ফুর্তির চেয়েও বেশী খুঁজছে জীবনে নিরাপত্তা। সব মিলিয়ে ফরাসী চরিত্র হয়ে পড়েছে কৃষ্ণচরিত্রেরই মত দুর্জ্ঞেয়। মেয়েদেরই হয়েছে আরও মুশকিল। মেয়েদের যৌবনের দশ বছরের মূল্য পুরুষের যৌবনের বিশ বছরের সমান; তিরিশের পর মেয়েদের স্বামী জোটানো শক্ত। আর যুদ্ধে নারীত্বের মহিমা কমে, পৌরুষের মহিমা বাড়ে। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলেও মেয়েরা যুদ্ধের নামে ভয় পায় পুরুষের চেয়েও বেশী। এই সাময়িক অস্বাভাবিকতা ফরাসী মেয়েদের মন থেকে যতদিন না ঘুচছে, ততদিন আর পুরনো ঢিমে-তেতালা ফরাসী জীবনের শান্ত জ্যোতি ফিরে পাওয়া যাবে না। কারণ ফরাসী সমাজ মানেই ফরাসী মেয়েদের সমাজ। মাতৃতন্ত্রের দেশগুলোতেও প্রাচীন যুগে মেয়েদের গুরুত্ব সমাজে ফ্রান্সের মত ছিল কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর আর সবদেশে মেয়েদের কদর "পুত্রার্থে।" ফ্রান্সই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে মেয়েদের আবেদন সন্তান উৎপাদনের জন্য নয়। আমাদের দেশে পুজো হয় মায়ের, এখানে পুজো হয় নারীর। এ জিনিস মধ্যযুগের নাইটদের নারী পুজো ঠিক নয়, তবে তারই রেশ একথা অস্বীকার করা যায় না। গাঢ়রসের মধ্যে একটা দানাকে ঘিরে যেমন সমস্ত জিনিসটা দানা বাঁধতে আরম্ভ করে, এখানেও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলো চিরকাল দু-চারজন মেয়েকে ঘিরেই গড়ে উঠতো। যে ফরাসী স্যালোনগুলোর বিশ্বজোড়া খ্যাতি, তার প্রত্যেকটার সংগে একজন করে ভদ্রমহিলার নাম সংশ্লিষ্ট। বিশ-ত্রিশজন শিল্পীর বিভিন্ন-মুখী ব্যক্তিত্বকে একটা স্যালোনের আড্ডায় কেন্দ্রিত করা কম সংগঠনশক্তির পরিচয় নয়। ফরাসী মেয়েরা অনায়াসে এইসব সংস্কৃতির ফ্যাক্টরী চালাতে পেরেছে, কিন্তু ফরাসী পুরুষরা আজও ভালভাবে গুছিয়ে পণ্যোৎপাদন কারখানা তৈরী করতে পারল না।

না পারুক। অগোছালোভাবে করাটাই স্বাভাবিকভাবে করা। হোক ফরাসী পুরুষদের সংগঠন শক্তি কম; এরা উদ্বেল প্রাণপ্রাচুর্য দিয়ে সেটাকে পুষিয়ে নেবে। তা' ছাড়া যাদের মধ্যে যে জিনিসের অভাব, সে দেশের মন সেই আকাঙ্ক্ষাটারই পূর্তিতে নিজেদের সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত করে। স্লাভদের ভারী দেহে লীলাছন্দ নেই তাই রুশ নৃত্যের এত চর্চা, জার্মানদের কথায় মিউজিক নেই, তাই সে জাত এত সঙ্গীতপ্রিয়, ইংরাজদের আড়ষ্ট গদ্যময় জীবনের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই তাদের মধ্যে এত বড় বড় কবির আবির্ভাব; ফরাসীদের হালকা কবি মন বলেই গদ্য লেখাকে এরা প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ মনে করে। আমার ধারণা ফরাসীদের ভাবাবেগপ্রধান মন বলেই তারা যুক্তির মধ্যে নিজেদের স্বাভাবিক ঝোঁকের বিরোধী পথ খোঁজে।

রেনেসাঁস যুগের প্রতিভাদের মত ফরাসী মনীষীরাও একাধিক বিষয়ে সুপণ্ডিত। Renan, Saint Beuve, Taine একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক; Descartes d'Alembert, গণিতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক; দার্শনিক Pascal ও Bergsonর গদ্য লেখার সুনাম আছে; Andre chenier, Guizot, La Martin, Chateanbriand Victor Hugo, George Sand এর মত 'সাহিত্যিকরা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে গিয়েছেন; Paul Velery কবি, দার্শনিক, সমালোচক; আজকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও কবি Paul Clandel বৈদেশিক রাজদূত। এত প্রাণপ্রাচুর্য যে জাতের, সে জাত কি গেঁজে যেতে পারে? ফরাসী মনের স্বাভাবিক বৃত্তি পথ খোঁজা,—পরিবেশ সব সময় তাদের মনকে এরই জন্য তৈরী করছে। কাফেতে আড্ডা দেবার অভ্যাস বাড়ায় ফরাসীদের, খুঁটিয়ে লোকচরিত্র দেখবার ক্ষমতা; ক্যাথলিক ঐতিহ্য শেখার আত্ম-সমালোচনা করবার অভ্যাস। তাই মানবমনের পথ খুঁজতে ফরাসীদের মত আর কেউ পারবে না। সর্বতোমুখী প্রতিভার দেশ না হলে মানব জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করবে কে? আজকের বিশেষজ্ঞের যুগে মানবসংস্কৃতি বাঁচাতে হলে দরকার এই জিনিসেরই। ফরাসী পণ্ডিতরা কখনও ভোলেন না যে সব জ্ঞানের লক্ষ্য মানুষ। মানুষকে যন্ত্রের মত আলাদা আলাদা টুকরো টুকরো করা যায় না—এটা যে জাত অন্তরের থেকে বোঝে, সব সময় মনে রাখে, অনেক কিছু পাবে তাদের কাছ থেকে মানুষ এখনও। আসল দরকারের সময় ফরাসীরা আজ পর্যন্ত কখনও বুদ্ধি হারায় নি। একবার এদেশে জানলার উপর ট্যাক্স বসেছিল। সংগে সংগে স্থপতি আর আর শিল্পীরা মিলে দেওয়ালে জানলা আঁকবার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। গোঁড়া ক্যাথলিক চিত্রকররাও গির্জার দেওয়ালের ছবি আঁকা ছেড়ে, পৃথিবীর রুচি পরিবর্তনের সংগে সংগে, জমিদার-গিন্নির বসবার ঘর সাজানোর জন্য নগ্ন দেহের ছবি আঁকতে দ্বিধা করেন নি।

এরা পৃথিবীর ছন্দে তাল রেখে চলতে পারবে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

শ্রীআশুতোষ মিত্র

হরিদ্বারে আসিবার খবর আমরা পাই নাই। তাঁহার শরীর ত্যাগের পর হরিদ্বারে থাকিবার সংবাদ পাইয়া মনে বিশেষ দুঃখ হয় যে, তাঁহাকে শেষ সময়ে অত নিকটে থাকিয়াও একবার দর্শন এবং সেবা করিবার অধিকার পাইলাম না!

শ্রীঠাকুরের নশ্বর দেহ ত্যাগ হয় কাশীপুর বাগানে এবং সৎকারান্তে অস্থি আনীত ও সাময়িকভাবে রক্ষিতও হয় ঐ স্থানে। তাঁহার মুষ্টিমেয় ত্যাগী ভক্তরা নিজেদের ভিতর পালা করিয়া তাঁহাদের একমাত্র সম্বল গুরু মহারাজের অস্থির কলসী রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। ও দিকে শ্রীঠাকুরের গৃহীভক্তেরা অনেকে একত্রিত হইয়া একদিন বাগানের ফটকের সামনে আসিয়া ঐ অস্থি লইয়া যাইবার জন্য হ্যাঙ্গাম করিতে থাকেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল—কপর্দকশূন্য ঐ কয়টি ছোকরা ভক্তের এমন সঙ্গতি নাই যে, তাঁহারা শ্রীঠাকুরের ঐ মহাপবিত্র অস্থির সমাধি দিয়া সেই মন্দিরের পূজা চিরকাল করিতে পারিবেন। এই বাগান বাটী তো ভাড়া করা—দু দিন বাদেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। তখন কোথায় যাইবেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐরূপ হ্যাঙ্গাম

স্বামী নিরঞ্জনানন্দের পিতৃকুলের নাম ছিল—নিত্যনিরঞ্জন। মঠে আমরা তাঁহাকে নিরঞ্জন মহারাজ বলিয়াই ডাকিতাম। তাঁহার শারীরিক বল ও সাহস যথেষ্ট ছিল। সে পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে। শ্রীঠাকুরের বিষয় উল্লেখ হইলে তিনি তাঁহাকে "গুরু মহারাজ" বলিয়া প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। তিনিও শ্রীঠাকুরের দ্বাদশটি অন্তরঙ্গভক্তের মধ্যে পরিগণিত। শুনিয়াছি, কাশীপুর বাগানে শ্রীঠাকুরের অসুখের সময়, যখন তাঁহার গুরুভ্রাতারা বেশীর ভাগ নিজ নিজ বাটী একপ্রকার ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি গুরুদেবের সেবায় লিপ্ত থাকেন, তখন তিনি কায়িক পরিশ্রম সহকারে সকলের পরিচর্যা বিশেষভাবে করিয়াছেন। তাঁহার এই পরিচর্যা শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর বরাহনগর মঠেও সমভাবে লক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীঠাকুরের অসুখে ডাঃ মহেন্দ্র সরকার দেখিতে আসিতেন এবং প্রায়ই প্রতিদিন অনেকটা সময় তাঁহার এবং অন্যান্য ভক্তগণের সহিত ভগবদ্বিষয়ক কথাবার্তায় কাটিত। কিন্তু তিনি মনুষ্যকে ঈশ্বর বলা পছন্দ করিতেন না। একদিন ঐ বিষয়ে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির সহিত ঘোর তর্ক করিতে করিতে স্বামীজীকে শ্রীঠাকুরের পুঁজরক্তমিশ্রিত ক্যানসারের থুথু খাইতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পিকদানিটা উঠাইয়া উহা হইতে খানিকটা "আপনি আমাদের মনে করেন কি?" বলিয়া খাইয়া ফেলেন। স্বামীজীর দেখাদেখি নিরঞ্জন মহারাজ, শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) এবং বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) কিছু কিছু খান। এ ঘটনার বিষয় মঠে পূর্বে শুনিয়া থাকিলেও একদিন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নিকট হইতেও জানিয়া লইয়াছি।

নিরঞ্জন মহারাজ শ্রীঠাকুরের এবং শ্রীমার জন্মভূমি . . গিয়াছিলেন—আর কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থ ভ্রমণও করিয়াছিলেন। একবার আমরা ত তাঁহাকে ঠিক পশ্চিমে বৈরাগ্যবান্ সাধুর আকারে কাশীতে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার অত সবল শরীর হইলেও মঠে ও অন্যত্র কয়েকবার কঠিন পীড়া হইয়াছে। তিনি শরীর ত্যাগ করেন হরিদ্বারের এক ধর্মশালায় সে সময় আমরা কনখলে ছিলাম। তাঁহার

শুনিয়া নিরঞ্জন মহারাজ একাকী লাঠি হস্তে ফটকের নিকট আসিয়া বলিতে থাকেন যে, তাঁহারা গুরু মহারাজের নামে ঘরবাড়ি ত্যাগ করিয়া একত্রিত হইয়াছেন —এই অস্থিই এক্ষণে তাঁহাদের যথাসর্বস্ব, প্রাণান্তেও উহা ছাড়িবেন না, তাহাতে যাহা কিছু হয়, হউক। ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিতে কাহাকেও দিবেন না।

ঐ প্রকারের আস্ফালন, হ্যাংগাম উভয় পক্ষে যখন চলিতেছে, তখন স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে ছিলেন না, ঠিক সেই মুহূর্তে আসিয়া গৃহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিলেন, "আমরা ঠাকুরের জন্য সর্বত্যাগী হইতেছি—যখন তাঁহাকে হারাইয়াছি, তখন অস্থিটি ছাড়িতে পারিব না কি?" ইহা কহিয়া গুরুভ্রাতাদিগকে উহা আনিতে বলেন। তাঁহার আদেশে অস্থির কলসী আসিয়া যায় এবং গৃহী ভক্তেরা উহা লইয়া কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সমাহিত করিয়া পরে মন্দির নির্মাণ করেন।

কিন্তু সেই দিন সেই অস্থির কলসী আনিবার সময় এমন একটা অঘটন সংঘটন হইয়া গেল, যাহা একজন ব্যতীত কেহই জানিল না—এমন কি স্বামীজী পর্যন্তও নয়। শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) স্বামীজীর আজ্ঞায় কলসী আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি উহা আনিবার জন্য স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে একটা বৈদ্যুতিক আবেগ খেলিয়া যায়, আর তিনি কর্তব্যাকর্তব্যবোধ হীন হইয়া সেই আবেগের সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া কলসী হইতে কিঞ্চিৎ অস্থি সেই স্থানে বাহির করিয়া রাখিয়া বাকি অস্থি সহ কলসীটি আনিয়া ফটকের সম্মুখে গৃহী ভক্তদিগকে দেন আর তাঁহারা আনন্দিতচিত্তে উহা লইয়া যান। যখন শশী মহারাজ উহা দেন, তখনও তাঁহার শরীর ও মন সেই আবেগে আচ্ছন্ন। গৃহীভক্তেরা চলিয়া যাইবার পর সকলে উপরে আসিয়া কলসী হইতে বহিষ্কৃত অস্থি দৃষ্টে এবং শশী মহারাজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিয়া স্থির করেন—ইহা নিশ্চয়ই শ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত মতই হইয়াছে। পরে ঐ অস্থিগুলি একটি তাম্রপাত্রে রক্ষিত হইয়া স্বামীজী দ্বারা "আত্মারাম" নামে আখ্যাত হইয়া নিয়মিত রূপে এযাবৎকাল মঠে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

কাশীপুর বাগানের বিষয় উত্থাপন করিবার পর মঠের বিষয় কিছু না বলিয়া থাকা যায় না, সেইজন্য উপরিউক্ত ঘটনার পর দুই চারিটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। বাগান বাটিটি যে ভাড়াটিয়া বাটি, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের কিছুদিন পরে যখন ঐ বাটি খালি করিতে হয়, তখন মুষ্টিমেয় কয়েকটি ত্যাগী গুরুভ্রাতার ভিতর ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিবার সময় আসিল। এতদিন তাঁহারা শ্রীঠাকুরের অদর্শনজনিত দুঃখে দিবারাত্র কাটাইতেছিলেন। এক্ষণে ভবিষ্যতে কি করিবেন এবং "আত্মারামকে" কোথায় লইয়া যাইবেন, সেই সব চিন্তা তাঁহাদের ভিতর দেখা দিল। এই সময় স্বনামধন্য সুরেশচন্দ্র মিত্র নামক সিমলা স্ট্রীটস্থ এক গৃহীভক্ত আসিয়া ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর থাকিতে আমি সামান্য যে কয়টি টাকা মাসে মাসে দিতাম তাহা দিব, তোমরা অস্থি লইয়া গিয়া একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া সেখানে ওঠগে।" তাঁহার এই আশ্বাসবাণীও ত্যাগীদের ভিতর শ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিভাত হইল আর তাঁহারা অবিলম্বে অনুসন্ধান করিয়া বরাহনগরে একটি প্রাচীন ও ভগ্ন বাটি ভাড়া লইয়া মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন—তাহাতে "আত্মারামে"র নিয়মিত পূজা এবং নিজেদের সাধনভজন করিতে থাকিলেন। এই বরাহনগর মঠই সুরেশচন্দ্রের সাহায্যে প্রথম স্থাপিত হইল। পরে অপরাপর গৃহীভক্ত ক্রমশঃ মঠে একে একে আসিতে থাকিলেন—মঠে কোন দ্বিধাভাব রহিল না। সকলে পুনরায় এক হইয়া গেলেন। বরাহনগর হইতে মঠ আলমবাজার এবং আলমবাজার হইতে গঙ্গার পরপারে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটি আর অবশেষে বর্তমান নিজস্ব মঠ—এই সব হইল শ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী। এ সবই মহাপুরুষ স্বামীজীরাই বুঝিতেন। আবার শুনিতেছি, সেই কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মন্দিরও এক্ষণে বেলুড় মঠ পরিচালিত হইয়াছে! শ্রীঠাকুরের লীলা আমরা সামান্য নর—আমরা কি বুঝিব?

একটি কি দুইটি স্বপ্ন

সত্যেন দে

কাঁকন চুড়ির গান ঝরানো হাতে
স্বপ্ন ছড়াও আরো আরোঃ আঁজলা ভরে
আকাশ নীলের হাওয়া ছড়াও আরো।

বেকার বিকেল আবার পাবে পথ
ঠোঁটের গোলাপ, চুলের রেশম নিয়ে,
ভিজে ঘাসের মত ঠান্ডা নরম চোখে।

কানাগলির পচা ইঁটের পরে
স্বপ্ন দেখি আরো, অনেক বোবা রাত—
তুমি এবং বাকি মাসের ভাড়া।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

আমরা সকলেই জানি যে, "জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার"। বাস্তবিকই কোনও বিদ্যা শিখতে হলে হাতেনাতে চেষ্টা করে দেখতে হয়। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এই নীতি সবসময় অনুসৃত হয় না। এখন হয়তো মানুষ জলে না নেমেও সাঁতার শিখতে পারবে—আছাড় না খেয়েও হাঁটতে শিখতে পারে। আমরা পথেঘাটে অনেক সময় মোটর চালনার ট্রেনিং স্কুলের গাড়ী অথবা শিক্ষানবীশ দ্বারা চালিত গাড়ী দেখতে পাই। এইসব গাড়ীতে বড় বড় হরফে Beware, Learning প্রভৃতি লেখা থাকে। এরা পথিকদের সাবধান করে দেয় কারণ এইসব শিক্ষানবীশ চালকদের দ্বারা বিপদ ঘটাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। আজকাল এক রকম যন্ত্র বার হয়েছে যার ফলে লোকে এমন করে পথে ঘাটে গাড়ী না চালিয়েও গাড়ী চালান শিখতে পারে। এতদিন আমেরিকা ও জার্মানীতে এ ধরণের খুব জটীল যন্ত্রের প্রচলন ছিল। "কোলডিং টেকনিক্যাল হাইস্কুলের" ডিরেক্টর মিঃ হানসন একটি বেশ সহজ ধরণের এই জাতীয় যন্ত্র বার করেছেন। এই যন্ত্রটির সাহায্যে ঘরের মধ্যে বসেই মোটর চালনা শিক্ষা করা যায়। ইচ্ছে করলে এই যন্ত্রটি কোনও মোটরে লাগিয়ে মোটর না চালিয়ে শুধু যন্ত্রটি চালিয়ে গাড়ী চালান শেখা যায়। যন্ত্রটি যখন চালান হয় তখন চালকের সামনে একটা পর্দার ওপর বিভিন্ন রাস্তার ওপরের চলমান যানবাহনের ছবি প্রতিফলিত হতে থাকে এছাড়া রাস্তার ওপরের নানারকম আলোর সংকেত এই ছবিতে দেখা যায় আর শিক্ষানবীশ প্রকৃত রাস্তায় গাড়ী চালানর মত এইসব জিনিষ চোখে দেখতে দেখতে তার যন্ত্রটি চালাতে থাকে। এই শিক্ষানবীশ রাস্তার আইন-কানুন মেনে ঠিকভাবে গাড়ী চালাতে পারছে কি না আর কতটুকু কি রকম ভুল হচ্ছে, সমস্ত কিছুর হিসাব নিকাশ টুকে রাখবারও একটি যন্ত্র এই যন্ত্রটির সংগে লাগান থাকে।

*

রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে আমরা হামেশাই দেখি যে, মেয়েরা তাদের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট আয়না বার করে আলতো ভাবে মুখে একটু পাউডার অথবা ঠোটে একটু রং লাগিয়ে নিচ্ছে কিংবা চুলটা ঠিক্ করছে। এটা আমাদের চোখে আজকাল আর খারাপ লাগে না। অবশ্য মেয়েদের এইভাবে আয়নায় মুখ দেখবার জন্য কিছুটা আলোর দরকার। এই অসুবিধাও এতদিনে দূর হয়েছে। এক নতুন ধরণের আয়না বার হয়েছে

আলো জেলে ছোট আয়নায় মুখ দেখা হচ্ছে

যার সংগে আলো জ্বালবার ব্যবস্থাও করা আছে। আয়নাটি বার করে একটি ছোট বোতাম টেপবার সংগে সংগে আয়নাটির সংগে লাগান আলোটা জ্বলে উঠবে আর আয়নার কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার বোতাম টেপবার সংগে সংগে আলো নিভে যাবে। আলোটা এমনভাবে বন্দোবস্ত করা হয়েছে যে অন্ধকারের মধ্যে জ্বাললে পাশের লোকের মুখে আলো পড়বে না।

*

আমেরিকার গোপালন বিশারদ ডাঃ গ্রেভিস প্রায় চব্বিশ বৎসর পরীক্ষার পর দুধকে প্রায় এক বৎসর টাটকা ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবার উপায় বার করেছেন। সাধারণ তরল দুধ টিনে ভরবার আগে দুধের মধ্যের সমস্ত অনিষ্টকারী জীবাণু ও দুধের ওপরের বাতাসের জীবাণুগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি প্রথমে দুধকে ২৮০ ডিগ্রী ফারেণ হাইট উত্তাপে একবার জাল দিয়ে নেন। অবশ্য সাধারণভাবে ১৬০ ডিগ্রী ফারেণ হাইট উত্তাপই জীবাণু ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট। ডাঃ গ্রেভিস এ সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যই ২৮০ ডিগ্রী উত্তাপে জাল দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এইসব টিনেভরা দুধ সাধারণ যে কোনও ঘরেই রাখা চলে এর জন্য বিশেষ কোনও ঠান্ডাঘর বা রেফ্রিজারেটরের দরকার হয় না। এইসব দুধ যাতে জীবাণুদুষ্ট না হয় এরজন্য ডাঃ গ্রেভিস হাতে করে দুধ না দোহন করে যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দুইয়ে একেবারে জাল দেওয়ার পক্ষপাতী। এই পদ্ধতি অনুসারে গ্রেভিস দুহাজার থেকে চার হাজার গ্যালন পর্যন্ত দুধ বাইরে পাঠাচ্ছেন।

*

আগাছা নষ্ট করা যে কি কষ্টকর ব্যাপার তা যাদের এবিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তারাই বোঝেন। এনিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কোনও রকম রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়া এই আগাছা ধ্বংস করবার সবচেয়ে সহজ উপায়। তবে সবসময় এটা কার্যকরী হয় না। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক সাধারণ পেট্রোলিয়ম জাতীয় তেলের সাহায্যে কয়েক জাতীয় আগাছা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমরা জানি যে, উদ্ভিদেরা দিনের বেলায় খাবার তৈরী করে আর রাতের বেলায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করবার জন্য উদ্ভিদগুলির পাতায় এক বিশেষ ধরণের ফুটো থাকে। যখন এরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে তখন ফুটোগুলোর মুখের ওপর যে সেল থাকে সেগুলো খুলে যায়। দেখা গেছে যে, সব আগাছাগুলো পেট্রোলিয়ম ছড়িয়ে দিলে মরে সেইসব গাছগুলি রাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। কারণ পেট্রল ছড়িয়ে দেওয়ার পর এই পেট্রল ধীরে ধীরে গাছের মধ্যে প্রবেশ করে, ফলে গাছগুলি মরে যায়।

ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ আবাস

মহাদেব গয়লা যখন কলকাতায় এসেছিল তখন তার বয়স বছর নয়েকের বেশী হবে না। রুজি-রোজগারের উদ্দেশ্য নিয়েই হয়তো সে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু কলকাতায় এসে নিত্য-নতুন মজা লুঠবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল তার মনে। বেশ গাট্টা-গোট্টা বাড়ন্ত শরীর। তাই পাড়ার ভিতর কোন মারা-মারি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা হলেই সে ভিড়ে যেত তাতে; গোটা পাঁচেক বড় বড় হাঙ্গামায় অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে সেও ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। ছয়বারের বার সে যখন ধরা পড়ে দণ্ডিত হল তখন তাকে পাঠানো হল সরকারের ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ-আবাসে (ভ্যাগ্রান্ট্‌স্‌ হোমে)। উদ্দেশ্য মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চিকিৎসা করে তাকে একজন সত্যিকারের নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। তার কর্ম-শক্তিকে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করা আবশ্যক বুঝতে পেরে মহাদেবকে এক পেন্সিল ফ্যাক্‌টরীতে শিক্ষানবীশ হিসাবে ভর্তি করে দেওয়া হল। মহাদেব কাজ শিখলো, রোজগার শুরু করলো। মাইনে পেতে লাগলো মাসিক কুড়ি টাকা করে। তার পর ধাপে ধাপে সে উঠতে লাগলো। আজ তার মাইনে হয়েছে মাসিক ১৬০্ টাকা। শুধু তাই নয়, সেখানকার একজন শ্রেষ্ঠতম কর্মী বলে স্বীকৃতিও সে পেয়েছে আজ। ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ-আবাসে (ভ্যাগ্রান্ট্‌স্‌ হোমে) যাওয়াতেই যে তার জীবনের মোড় ফিরে গেছে মহাদেব তা স্বীকার করে।

শুধু মহাদেবই নয়—জেন, মহাবীর, কৃষ্ণ, সতীশচন্দ্র পাত্র, নারায়ণ কুমী এরাও আছে সেখানে। আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে তাদের বয়স। ঐ পেন্সিল ফ্যাক্‌টরীতে কাজ করে সবাই। প্রত্যেকে মাসে গড়ে আশী টাকার মতো আয় করে। ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ-আবাসের (ভ্যাগ্রান্ট্‌স্‌ হোমের) শিক্ষার গুণেই আজ তারা ভদ্র নাগরিকের জীবনযাপন করতে শিখেছে।

ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ-আবাসে (ভ্যাগ্রান্টস হোমে) এখন প্রায় ৬৪০ জন পুরুষ রয়েছে। এরা সবাই লেখাপড়া ও কারিগরী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তাঁত-বোনা, কামারের কাজ, ছুতোরের কাজ, দর্জির কাজ, শাক-সব্জী উৎপন্ন করা—যেদিকে যার বেশী ঝোঁক তাকে সেই কাজেই নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের লণ্ড্রী তারা নিজেরাই চালায়, সব্জীবাগানের তদ্বির-তদারক নিজেরাই করে—কেউ কেউ হাসপাতালেও কাজ করে।

ভবঘুরেদের ধরা হয় কি করে? ব্যাপারটা খুবই সহজ। সপ্তাহে চারিদিন পুলিশ নগরের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি

শিশু-ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ আবাসে পাঠ-রত বালক দল
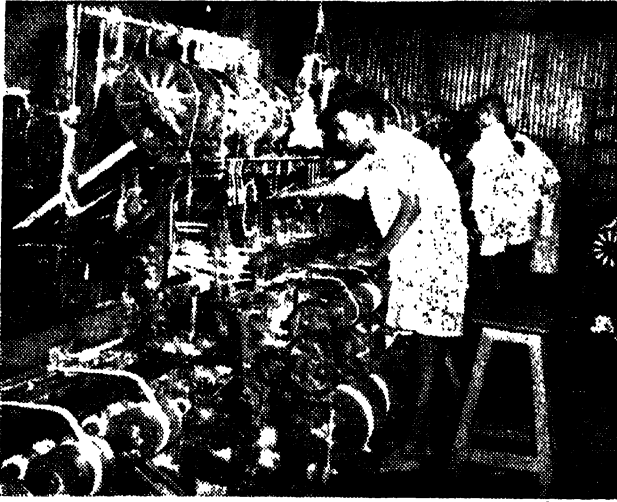
কাপড়ের কলে কর্মরত ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ আবাসের প্রাক্তন বাসিন্দা

অঞ্চলে হানা দেয়। এই সব অঞ্চলেই ভবঘুরেদের আড্ডা। আড্ডা ঘেরাও করে লোকগুলিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় কণ্ট্রোলার অব ভ্যাগ্রান্সির কাছে। সেখানে একজন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে এদের বিচার হয়। যথাযথভাবে প্রত্যেকটি লোকের বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে ১৯৪৩এর বেংগল ভ্যাগ্রান্সি অ্যাক্ট অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট রায় দেন, অভিযুক্তদের মধ্যে কে ভবঘুরে আর কে তা' নয়।

কলিকাতার বিভিন্ন ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ আবাস; সাময়িক ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ-আবাস (ক্যাসুয়াল ভ্যাগ্রান্টস্ হোম), ২৪নং ক্যানাল সাউথ রোড; নারী-ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ-আবাস (ফিমেল ভ্যাগ্রান্টস্ হোম), ১৭।১ ক্যানাল স্ট্রীট; শিশু-ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ-আবাস (চিলড্রেন ভ্যাগ্রান্টস্ হোম), ৫১ বেলেঘাটা রোড এবং কুষ্ঠ-আবাস (লেপারস্ হোম) ৭৫ বেলেঘাটা রোড। শেষোক্ত তিনটির বাসিন্দা সংখ্যা যথাক্রমে ১৬৮, ২৭৫ এবং ১৪৬। আবাসগুলির মোট আসন-সংখ্যাও মোটামুটিভাবে এই।

পূর্ব পাকিস্তানের পরেশ দাস, মাদ্রাজের আর্য, বিহারের দিলজান, মালাবারের সেখ মহম্মদ, পশ্চিমবঙ্গের ছোটো—এদের সব কজনেরই দেখা পাবেন আপনি ভ্যাগ্রান্টস্ হোমে। ১৯৪৮-৪৯ সালে এরা নিয়ন্ত্রণ-আবাসে ঢুকেছিল। সুতাকাটা তাঁতবোনাতে এদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। তাই আচার-ব্যবহার সংশোধনের পর ঐ কয়জন লোককে একটা সুতার কারখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এখন তারা পুরোদস্তুর ভদ্রলোক বনে গেছে; পোস্ট্যাল সেভিংস একাউণ্টস-এ প্রত্যেকের বেশ মোটা টাকাও জমেছে। আর টাকা জমবেই বা না কেন? খাওয়া-পরা-থাকবার ব্যবস্থা তো আবাস থেকেই করা হয়েছে; তারা যা রোজগার করেছে তার সবটাই তো তাদের নামে ডাকঘরে জমা হয়েছে। চার মাস বাদে তারা আবাস থেকে ছাড়া পাবে। পাশবইগুলো তখন তাদেরই হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তী জীবনে সৎভাবে জীবনযাপন করবার যে শিক্ষা তারা পেয়েছে এবং যে টাকা তারা জমিয়েছে তার জন্য আজ তারা রীতিমত গর্বিত।
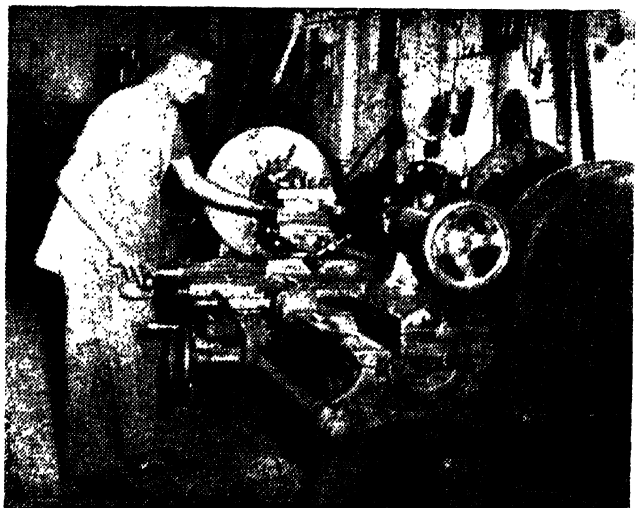
এই সব আবাসের কারিগরী শিক্ষা-কেন্দ্রে যে পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন হয়েছে তা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। যারা কোনদিনই কাজের কাজ কিছু করেনি তারা কি করে একবছরে ২,৫৫৪ গজ দোসুতি, ১২৪১ গজ গামছা, ৬৩ গজ বিছানার চাদর, ১,১২৯ গজ ব্যাণ্ডেজ, ৮৬৬ খানা ধুতি, ১৭৯খানা শাড়ী, ২১ থান কাপড়, ১৮৭ গজ ছিট তৈরী করলো তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। দরজী বিভাগেও ১,৩০৬টি কোর্তা, ৫৪৮টি হাফ সার্ট, ৪৯টি ট্রাউজার, ১২৬টি হাফ প্যাণ্ট, ৮টি অ্যাপ্রন, ৬টি ব্লাউজ, ৪৫টি বালিশের খোল, ১২টি বিছানার চাদর এবং ২০টি পর্দা তৈরি করা হয়েছে। কামারশালায় তৈরী করা হয়েছে রান্নার বাসনপত্র, বাল্তি, ড্রাম, বাথ-টব। সব্জি-বাগানে যে পরিমাণ শাক-সব্জী ও আনাজ উৎপন্ন করা হয়েছে তার মূল্য প্রায়

পেন্সিল কারখানায় কর্মরত এই লোকটির আয় এখন মাসে ১৬০, টাকা

ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ আবাসের ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে জলখাবার নেবার জন্যে এগিয়ে আসছে

৭০০৲ টাকা। ভবঘুরেরা অনেক ফলের গাছ, বিশেষ করে কলাগাছ তৈরী করেছে। নিজেদের পুকুরে তারা মাছের চাষও করেছে। এক কথায় তারা একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ উপনিবেশ গড়ে তুলেছে।

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাঃ কিন্তু এমন অনেক লোক তাদের মধ্যে আছে যাদের কাজকর্ম করবার ক্ষমতাই নেই। যেমন ধরুন বৃদ্ধ, অক্ষম, বিকলাঙ্গ বা রুগ্ন। এদের সংখ্যা হবে ২৮৫। এই সব অক্ষম বা রুগ্নদের চিকিৎসা করবার জন্য একটা হাসপাতাল আছে। হাসপাতালে মোট শয্যা আছে ৩৭টি; তার মধ্যে ৭টি যক্ষ্মা-রোগীদের জন্য পৃথক করে রাখা হয়েছে। ২ জন মেডিক্যাল অফিসার, ২ জন কম্পাউন্ডার এবং চারজন সেবক রোগীদের দেখাশুনা করেন। তিরিশ জন ভবঘুরেও শুশ্রূষা ও ড্রেসিং বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে। মহামারীতে যাতে না আক্রান্ত হয় তার জন্য প্রতি বছরই ভবঘুরেদের নানা রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ-আবাসে কখনও কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড হয়নি। এই অভূতপূর্ব ব্যাপারের জন্য তারা নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করতে পারে।

উপরে যা বলা হল তাই সব নয়। ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ-আবাসে আরও অনেক কিছু করা হয়। ছেলেদের ব্যায়াম, খেলা-ধুলা, ড্রিল করাবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে। ক্যারম, ভলিবল বা স্কিপিং তাদের খুবই প্রিয়। অনেকে আবার সাঁতার কাটতে ভালবাসে। সেখানে গান-বাজনাও হয়। তাছাড়া তাদের মনো-রঞ্জনের জন্য রেডিওর বন্দোবস্তও করা হয়েছে। মাঝে মাঝে সিনেমাও দেখান হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে দল বেঁধে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

নারী বিভাগঃ উইমেনস্ ভ্যাগ্রান্টস্ হোমে ৩৫ জন আছে যাদের মাথার গোলমাল হয়েছে, ১১ জন হারিয়ে ফেলেছে তাদের দৃষ্টি শক্তি, ৬ জন মূক ও বধির। এরা অত্যন্ত দুর্ভাগা তাতে সন্দেহ নেই। এরা বাদেও নানা বয়সের আরও ১৪৮ জন ভবঘুরে নারী এই আবাসে থাকে। চৌদ্দ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে এদের বয়স। পুরুষদের মত এদেরও তাঁতবোনা, দর্জির কাজ, সুতোকাটা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। নারী-বিভাগ ২২৭ খানা গামছা, ৩২৫ গজ দোসুতি, ১১২ খানা শাড়ী তৈরি করেছে। ২৫টা হাফ্-প্যাণ্ট, ৪২টা ফ্রক, ৩৫টা পর্দা, ৫টা ইজের, ১০৯টা ব্লাউজ, ১৬৪ কোর্তা, ৬টা হাফ্ সার্ট, ১২টা হাফ্-প্যান্ট ও ৪৪টা বালিশের খোল তৈরি হয়েছে এই নারী-বিভাগের কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্রে। বিবাহ দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই করা হয়েছে। ১৯৪৯ সনের ১৩ই মে পুলিশ টিটাগড়ের সুকুরজান বিবিকে গ্রেপ্তার করে। সে তখন শিয়াল-দহ স্টেশনে কয়লা কুড়োচ্ছিল। গত বছরের ২রা নবেম্বর পর্যন্ত তাকে রান্না-বান্না, সেলাই, তাঁত বোনা প্রভৃতি কাজকর্ম শেখানো হয়েছে। আবদুল করিম নামে একজন লোকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। সেও আগে ভবঘুরে ছিল। নব-দম্পতি এখন এই আবাসের বাইরে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছে। ফুলমণি দাসীর বিয়ে হয়েছে কৃষ্ণচন্দ্র প্রামাণিক

নামে একজন লোকের সংগে। এরাও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পিতৃ-মাতৃহীন অনাথা বালিকা গনা। তার মা-বাপ বোধ হয় মারা গেছে বিগত হংগামায়। একদল বদমায়েসের পাল্লায় পড়েছিল সে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে গনাকে তারা বাধ্য করে। সারাদিন ভিক্ষা করে সে যা উপায় করতো তা কিন্তু তাকে তুলে দিতে হতো ঐ বদমায়েসদেরই হাতে। ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ আবাসে থেকে সে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছে। চমৎকার রাঁধতে আর সেলাই করতেও সে পারে। বাইশ বছরে পা দিয়েছে সে।

হার-চোর আজ অনুতপ্ত

বাসিরহাট মহকুমার হারাণচন্দ্র দাস কলিকাতায় আসে মহামন্বন্তরের বছরে। তাকে চিলড্রেনস ভ্যাগ্রান্টস হোমে ভর্তি করে দেওয়া হয় ১৯৪৭ সালে। এবারে সে তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম হয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। আরও পড়াশুনা করবার জন্য সে তৈরি হচ্ছে। বিমাতার দুর্ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হয়ে রুলদুল সিং পাঞ্জাব ছেড়ে কলকাতায় আসে। বড়বাজার এলাকায় ছোটখাটো বোঝা বয়ে বেড়াত সে। এখন সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। তার ঝোঁক কিন্তু দর্জির কাজের দিকে। বড় হয়ে একদিন সে মাস্টার কাটার হবে, ভাল দেখে একটা দর্জির ও কাটা-কাপড়ের দোকান করবে এই তার আশা।

হাসান ইমাম আসানসোল থেকে কলকাতায় এসেছিল। লোকের পকেট মেরে বেড়াত সে। হগ মার্কেটের সব্জী বিক্রেতাদের মধ্যে থেকে কিংবা নিকটবর্তী সিনেমাগুলির টিকেটঘরের সামনে সমবেত দর্শকদের মধ্য থেকে সে তার শিকার বেছে নিত। একবার এক পুজা-মণ্ডপে একটি ছোট মেয়ের গলা থেকে হার ছিনিয়েও নিয়েছিল। নিজেই সে সেকথা স্বীকার করেছে। ১৯৪৮ সাল থেকে সে ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ আবাসে আছে এবং কারিগরী বিদ্যা শিখছে। তার দৃষ্টিভংগী কিন্তু আজ একেবারেই বদলে গেছে। আবাস থেকে যখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন সৎপথে থেকে জীবন-যাপন করবে বলে সে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সময়ের চর

বাসন্তীকুমার চট্টোপাধ্যায়

সময়ের ঝাঁক
মৌমাছির মত দল বেঁধে উড়ে যাক্
পাখার গুঞ্জনে।
এই ভেবে মনে
বেঁধে দিয়েস্তূপীকৃত ফাইলের ফিতে
পার কি নিশ্চিতে
টেবিলে পা দুটি তুলে দিতে?
তা যদি পার না,
কল্পিত স্বপ্ন ছাড়ো না!

সময় প্রতীক্ষারত
উর্দীধারী চাপরাশীর মত
কাগজে কাজের তাড়া নিয়ে
আছে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

মুখের উপরে তার কড়া জবানীতে
পার কি নিশ্চিতে
দরজা বন্ধ ক'রে দিতে?
তা যদি পার না,
সব কাজ এখনি সারো না!

নয়ত মনের কোণে একবার জ্বলে
অবসর যাবে হাত থেকে মুঠো-গ'লে।
ভেজানো দরজা ক'রে ফাঁক
মৌমাছির মত এক ঝাঁক
ব্যস্তবাগীশ কাল চুপিসাড়ে ছুটে
কখন নিয়েছে মধু ফোঁটা ফোঁটা লুটে।
ক'রে গেছে সময়ের চর
বেজায় রগড়;
পালিয়ে বেড়ায় অবসর!

আজব জীবিকা

জি কে চেস্টারটন

অনুবাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উদ্দাম দুই নৃত্যপাগল; কোনদিকেই তাদের লক্ষ্য নেই। সংগে এক ভদ্রলোককে নিয়ে মিস্ চ্যাড্ যে একেবারে তাদের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছেন, সেদিকে তাদের নজরই পড়লো না। সবেমাত্র প্রফেসর একটা নতুন কায়দায় তাঁর পা তুলেছেন, ওদিকে বেসিল গ্র্যাণ্টও কার্ট-হুইলের তালে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনাসামনি, মিস্ চ্যাড্-এর তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বরে তাদের তাল-ভংগ হলো। মিস্ চ্যাড্ বললেন, "মিঃ বিংহ্যাম এসেছেন ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে; কথা বলতে চান।"

মিঃ বিংহ্যামের চেহারা ছিমছাম, পোষাক পরিপাটি। সাদা ছুঁচলো দাড়ি, হাতে দামী দস্তানা। ব্যবহার ভদ্র, তবে বড্ডো বেশী কেতাদুরস্ত; প্রফেসরের ঠিক উল্টো। এক্ষেত্রে তাতে ভালই হলো। প্রচুর বইপত্তর ঘাঁটাঘাটি করেছেন ভদ্রলোক; নানান ধরণের মানুষের, নানান বিচিত্র কায়দাকানুনের সংস্পর্শে এসেছেন। তবে জীবনে বোধ হয় এমন অদ্ভুত দৃশ্য আর দেখেননি। বৃদ্ধ দুই ভদ্রলোক; খেয়েদেয়ে কোথায় তাঁরা একটু দিবানিদ্রা দেবেন, তা নয়—বাগানে দাঁড়িয়ে নৃত্য-চর্চা করছেন। নেহাৎই কেতাদুরস্ত লোক, চুপচাপ তাই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রফেসর একেবারে মরীয়া। মিঃ বিংহ্যামকে তিনি দেখেও দেখলেন না, সমানে নাচতে লাগলেন। বেসিল হঠাৎ থেমে পড়লো। ডাঃ কোলম্যানও ইতিমধ্যে বাগানে এসে হাজির হয়েছেন। চকচকে কালো টুপি, তার নীচে চকচকে একজোড়া চোখ। তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তিনি প্রফেসর এবং বেসিল গ্র্যাণ্টকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

বেসিল তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, "ডাঃ কোলম্যান, আপনি এবারে প্রফেসরের কাছে থাকুন কিছুক্ষণ; প্রফেসর তাতে খুশীই হবেন। আর হ্যাঁ, মিঃ বিংহ্যাম, আপনার সংগে আমার কিছু কথা আছে। কথাটা একটু নিরিবিলিতে হলেই ভালো। আমার নাম গ্র্যাণ্ট।"

মিঃ বিংহ্যাম মাথা নোয়ালেন। তাতে শ্রদ্ধাও ছিল, বিস্ময়ও ছিল।

সহজ গলায় বেসিল বললো, "মিস চ্যাড্, এ ভদ্রলোককে আমি একটু বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাই, কেমন?" বলে সে আর দাঁড়ালো না, চটপট সেই হতবুদ্ধি আগন্তুককে সংগে নিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

মিঃ বিংহ্যামের সামনে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিল বেসিল, তারপর বললো, "বসুন। ব্যাপারটা সব শুনেছেন তো?"

মমতাকরুণ বিষণ্ণ ভংগীতে মাথা নীচু করে মিঃ বিংহ্যাম বললেন, "হ্যাঁ, মিস চ্যাড-এর মুখে শুনলাম। এতে যে আমি কতখানি দুঃখিত হয়েছি তা আর কী বলবো। যে চাকরী ও'কে আমরা দিতে এসেছিলাম ও'র গুণের তুলনায় সে অবশ্য কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও ঠিক সেই মুহূর্তেই যে একটা অঘটন ঘটলো এও বড়ো আক্ষেপের কথা। কী-যে করা যায় এখন! প্রফেসরের অবশ্য বুদ্ধিভ্রংশ না-ও হতে পারে। কিন্তু তাতেও তো সমস্যার কোনও সুরাহা হচ্ছে না? যে অবস্থায় ও'কে দেখে গেলাম তাতে, আর যাই হোক, চাকরী করা ও'র পক্ষে অসম্ভব।"

"আমার একটা প্রস্তাব আছে—" চেয়ারে বসে পড়লো বেসিল, তারপর আরো একটু অন্তরংগ হয়ে এলো।

"বেশ তো, ভাল কথা।" বলে মিঃ বিংহ্যামও তাঁর চেয়ারখানাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বসলেন।

গলাটাকে পরিষ্কার করে নিল বেসিল, বক্তব্যটাকে একটু গুছিয়ে নিল। তারপর বললো, "প্রস্তাবটা তাহলে শুনুন। এটাকে অবিশ্যি ঠিক আপোষ বলা যায় না, তাহলেও খানিকটা ঐ ধরণেরই বটে। প্রস্তাবটা হচ্ছে এই যে, যতদিন পর্যন্ত না প্রফেসর চ্যাড্ তাঁর নৃত্য থামাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত সরকারী তহবিল থেকে ব্রিটিশ মিউজিয়মের মারফৎ প্রতি বছর তাঁকে আটশো পাউন্ড করে বেতন দিতে হবে।"

"আ-ট-শো পাউন্ড!" মিঃ বিংহ্যামের আর বাক্‌স্ফূর্তি হলো না। বিস্ময়ে বিস্ফারিত তাঁর নীলাভ চক্ষু দুটি। এই সর্বপ্রথম তিনি মুখ তুলে তাকালেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, "মিঃ গ্র্যাণ্ট, আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি কি চান যে এই অবস্থাতেই প্রফেসর চ্যাডকে বাৎসরিক আটশো পাউন্ড বেতনে এশিয়াটিক ম্যানাস্‌ক্রীপ্‌ট্‌স্-এর কীপার নিযুক্ত করা হোক?"

বেসিল গ্র্যাণ্ট মাথা নাড়লো, তারপর দৃঢ়স্বরে বললো, "না। মোটেই তা নয়। চ্যাড্ আমার বন্ধু, তাঁকে আমি অত্যন্তই ভালবাসি। কিন্তু তাই বলেই যে তাঁর এখন এশিয়াটিক ম্যানস্‌ক্রীপ্‌ট্‌স্-এর দায়িত্ব নেওয়া উচিত হবে—সেকথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। অতদূর আমি যাচ্ছি না। আমার কথা হচ্ছে, যতদিন না চ্যাড্ তাঁর এই নাচ থামাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত মিউজিয়ম থেকে প্রতি বছরে তাঁকে আটশো পাউন্ড করে দেওয়া হোক। গবেষণায় সাহায্য করবার জন্যে আলাদা কোনও ফাণ্ড নেই আপনাদের? আছে নিশ্চয়ই? সেইখান থেকেই দেবেন।"

মিঃ বিংহ্যাম একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বললেন, "কী যা-তা বলছেন মিঃ গ্র্যাণ্ট? কিছু আমি বুঝতে পারছি না। এই উন্মাদকে এখন আজীবন আটশো পাউন্ড করে দিয়ে যেতে হবে?"

নামে একজন লোকের সঙ্গে। এরাও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পিতৃ-মাতৃহীন অনাথা বালিকা গনা। তার মা-বাপ বোধ হয় মারা গেছে বিগত হঙ্গামায়। একদল বদমায়েসের পাল্লায় পড়েছিল সে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে গনাকে তারা বাধ্য করে। সারাদিন ভিক্ষা করে সে যা উপায় করতো তা কিন্তু তাকে তুলে দিতে হতো ঐ বদমায়েসদেরই হাতে। ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ আবাসে থেকে সে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছে। চমৎকার রাঁধতে আর সেলাই করতেও সে পারে। বাইশ বছরে পা দিয়েছে সে।

হার-চোর আজ অনুতপ্ত

বসিরহাট মহকুমার হারাণচন্দ্র দাস কলিকাতায় আসে মহামন্বন্তরের বছরে। তাকে চিলড্রেনস ভ্যাগ্রান্টস হোমে ভর্তি করে দেওয়া হয় ১৯৪৭ সালে। এবারে সে তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম হয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। আরও পড়াশুনা করবার জন্য সে তৈরি হচ্ছে। বিমাতার দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে রুলদুল সিং পাঞ্জাব ছেড়ে কলকাতায় আসে। বড়বাজার এলাকায় ছোটখাটো বোঝা বয়ে বেড়াত সে। এখন সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। তার ঝোঁক কিন্তু দর্জির কাজের দিকে। বড় হয়ে একদিন সে মাস্টার কাটার হবে, ভাল দেখে একটা দর্জির ও কাটা-কাপড়ের দোকান করবে এই তার আশা।

হাসান ইমাম আসানসোল থেকে কলকাতায় এসেছিল। লোকের পকেট মেরে বেড়াত সে। হগ মার্কেটের সব্জী বিক্রেতাদের মধ্যে থেকে কিংবা নিকটবর্তী সিনেমাগুলির টিকেটঘরের সামনে সমবেত দর্শকদের মধ্য থেকে সে তার শিকার বেছে নিত। একবার এক পূজা-মণ্ডপে একটি ছোট মেয়ের গলা থেকে হার ছিনিয়েও নিয়েছিল। নিজেই সে সেকথা স্বীকার করেছে। ১৯৪৮ সাল থেকে সে ভবঘুরে-নিয়ন্ত্রণ আবাসে আছে এবং কারিগরী বিদ্যা শিখছে। তার দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু আজ একেবারেই বদলে গেছে। আবাস থেকে যখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন সৎপথে থেকে জীবন-যাপন করবে বলে সে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সময়ের চর

বাসন্তীকুমার চট্টোপাধ্যায়

সময়ের ঝাঁক
মৌমাছির মত দল বেঁধে উড়ে যাক
পাখার গুঞ্জনে।
এই ভেবে মনে
বেঁধে দিয়েস্তূপীকৃত ফাইলের ফিতে
পার কি নিশ্চিতে
টেবিলে পা দুটি তুলে দিতে?
তা যদি পার না,
কল্পিত স্বপ্ন ছাড়ো না!

সময় প্রতীক্ষারত
উর্দীধারী চাপরাশীর মত
কাগজে কাজের তাড়া নিয়ে
আছে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

মুখের উপরে তার কড়া জবানীতে
পার কি নিশ্চিতে
দরজা বন্ধ ক'রে দিতে?
তা যদি পার না,
সব কাজ এখনি সারো না!

নয়ত মনের কোণে একবার জ্বলে
অবসর যাবে হাত থেকে মুঠো-গ'লে।
ভেজানো দরজা ক'রে ফাঁক
মৌমাছির মত এক ঝাঁক
ব্যস্তবাগীশ কাল চুপিসাড়ে ছুটে
কখন নিয়েছে মধু ফোঁটা ফোঁটা লুটে।
ক'রে গেছে সময়ের চর
বেজায় রগড়;
পালিয়ে বেড়ায় অবসর!

আজব দীক্ষা

জি কে চেস্টারটন

অনুবাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উদ্দাম দুই নৃত্যপাগল; কোনদিকেই তাদের লক্ষ্য নেই। সঙ্গে এক ভদ্রলোককে নিয়ে মিস্ চ্যাড্ যে একেবারে তাদের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছেন, সেদিকে তাদের নজরই পড়লো না। সবেমাত্র প্রফেসর একটা নতুন কায়দায় তাঁর পা তুলেছেন, ওদিকে বেসিল গ্র্যাণ্টও কার্ট-হুইলের তালে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনাসামনি, মিস্ চ্যাড্-এর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে তাদের তাল-ভঙ্গ হলো। মিস্ চ্যাড্ বললেন, "মিঃ বিংহ্যাম এসেছেন ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে; কথা বলতে চান।"

মিঃ বিংহ্যামের চেহারা ছিমছাম, পোষাক পরিপাটি। সাদা ছুঁচলো দাড়ি, হাতে দামী দস্তানা। ব্যবহার ভদ্র, তবে বড্ডো বেশী কেতাদুরস্ত; প্রফেসরের ঠিক উল্টো। এক্ষেত্রে তাতে ভালই হলো। প্রচুর বইপত্তর ঘাটাঘাটি করেছেন ভদ্রলোক; নানান ধরণের মানুষের, নানান বিচিত্র কায়দাকানুনের সংস্পর্শে এসেছেন। তবে জীবনে বোধ হয় এমন অদ্ভুত দৃশ্য আর দেখেননি। বৃদ্ধ দুই ভদ্রলোক; খেয়েদেয়ে কোথায় তাঁরা একটু দিবানিদ্রা দেবেন, তা নয়—বাগানে দাঁড়িয়ে নৃত্য-চর্চা করছেন। নেহাৎই কেতাদুরস্ত লোক, চুপচাপ তাই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রফেসর একেবারে মরীয়া। মিঃ বিংহ্যামকে তিনি দেখেও দেখলেন না, সমানে নাচতে লাগলেন। বেসিল হঠাৎ থেমে পড়লো। ডাঃ কোলম্যানও ইতিমধ্যে বাগানে এসে হাজির হয়েছেন। চকচকে কালো টুপি, তার নীচে চকচকে একজোড়া চোখ। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি প্রফেসর এবং বেসিল গ্র্যাণ্টকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

বেসিল তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, "ডাঃ কোলম্যান, আপনি এবারে প্রফেসরের কাছে থাকুন কিছুক্ষণ; প্রফেসর তাতে খুশীই হবেন। আর হ্যাঁ, মিঃ বিংহ্যাম, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। কথাটা একটু নিরিবিলিতে হলেই ভালো। আমার নাম গ্র্যাণ্ট।"

মিঃ বিংহ্যাম মাথা নোয়ালেন। তাতে শ্রদ্ধাও ছিল, বিস্ময়ও ছিল।

সহজ গলায় বেসিল বললো, "মিস চ্যাড্, এ ভদ্রলোককে আমি একটু বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাই, কেমন?" বলে সে আর দাঁড়ালো না, চটপট সেই হতবুদ্ধি আগন্তুককে সঙ্গে নিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

মিঃ বিংহ্যামের সামনে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিল বেসিল, তারপর বললো, "বসুন। ব্যাপারটা সব শুনেছেন তো?"

মমতাকরুণ বিষণ্ণ ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে মিঃ বিংহ্যাম বললেন, "হ্যাঁ, মিস চ্যাড-এর মুখে শুনলাম। এতে যে আমি কতখানি দুঃখিত হয়েছি তা আর কী বলবো। যে চাকরী ওঁকে আমরা দিতে এসেছিলাম ওঁর গুণের তুলনায় সে অবশ্য কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও ঠিক সেই মুহূর্তেই যে একটা অঘটন ঘটলো এও বড়ো আক্ষেপের কথা। কী-যে করা যায় এখন! প্রফেসরের অবশ্য বুদ্ধিভ্রংশ না-ও হতে পারে। কিন্তু তাতেও তো সমস্যার কোনও সুরাহা হচ্ছে না? যে অবস্থায় ওঁকে দেখে এলাম তাতে, আর যাই হোক, চাকরী করা ওঁর পক্ষে অসম্ভব।"

"আমার একটা প্রস্তাব আছে—" চেয়ারে বসে পড়লো বেসিল, তারপর আরো একটু অন্তরঙ্গ হয়ে এলো।

"বেশ তো, ভাল কথা।" বলে মিঃ বিংহ্যামও তাঁর চেয়ারখানাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বসলেন।

গলাটাকে পরিষ্কার করে নিল বেসিল, বক্তব্যটাকে একটু গুছিয়ে নিল। তারপর বললো, "প্রস্তাবটা তাহলে শুনুন। এটাকে অবিশ্যি ঠিক আপোষ বলা যায় না, তাহলেও খানিকটা ঐ ধরণেরই বটে। প্রস্তাবটা হচ্ছে এই যে, যতদিন পর্যন্ত না প্রফেসর চ্যাড্ তাঁর নৃত্য থামাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত সরকারী তহবিল থেকে ব্রিটিশ মিউজিয়মের মারফৎ প্রতি বছর তাঁকে আটশো পাউন্ড করে বেতন দিতে হবে।"

"আ-ট-শো পাউন্ড!" মিঃ বিংহ্যামের আর বাক্‌স্ফূর্তি হলো না। বিস্ময়ে বিস্ফারিত তাঁর নীলাভ চক্ষু দুটি। এই সর্বপ্রথম তিনি মুখ তুলে তাকালেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, "মিঃ গ্র্যাণ্ট, আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি কি চান যে এই অবস্থাতেই প্রফেসর চ্যাডকে বাৎসরিক আটশো পাউন্ড বেতনে এশিয়াটিক ম্যানাসক্রীপ্ট্‌স্-এর কীপার নিযুক্ত করা হোক?"

বেসিল গ্র্যাণ্ট মাথা নাড়লো, তারপর দৃঢ়স্বরে বললো, "না। মোটেই তা নয়। চ্যাড্ আমার বন্ধু, তাঁকে আমি অত্যন্তই ভালবাসি। কিন্তু তাই বলেই যে তাঁর এখন এশিয়াটিক ম্যানসক্রীপ্ট্‌স্‌এর দায়িত্ব নেওয়া উচিত হবে—সেকথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। অতদূর আমি যাচ্ছি না। আমার কথা হচ্ছে, যতদিন না চ্যাড্ তাঁর এই নাচ থামাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত মিউজিয়ম থেকে প্রতি বছরে তাঁকে আটশো পাউন্ড করে দেওয়া হোক। গবেষণায় সাহায্য করবার জন্যে আলাদা কোনও ফান্ড নেই আপনাদের? আছে নিশ্চয়ই? সেইখান থেকেই দেবেন।"

মিঃ বিংহ্যাম একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বললেন, "কী যা-তা বলছেন মিঃ গ্র্যাণ্ট? কিছু আমি বুঝতে পারছি না। এই উন্মাদকে এখন আজীবন আটশো পাউন্ড করে দিয়ে যেতে হবে?"

উৎফুল্ল গলায় বেসিল বললো, "না-না, আজীবন হবে কেন? তা আমি বলিনি।"

মিঃ বিংহ্যামকে দেখে মনে হলো, অতিকষ্টে তিনি আত্মসম্বরণ করলেন। বললেন, "তাহলে? আজীবনেও বুঝি কুলোচ্ছে না? কতদিন পর্যন্ত তাহলে দিতে হবে শুনি? সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত?"

সহাস্যে বেসিল বললো, "না। যতদিন না প্রফেসর তাঁর নাচ থামাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত।" বলে সে বেশ আরাম করে তাঁর চেয়ারখানাতে হেলান দিয়ে বসলো।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বেসিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিঃ বিংহ্যাম। বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "মিঃ গ্র্যান্ট, কথাটা একটু খুলে বলুন। প্রফেসর চ্যাড্-এর জন্যে আপনি বাৎসরিক আটশো পাউন্ড করে বেতন চাইছেন; কেমন, এই তো? তা গভর্নমেন্ট এ-টাকাটা দেবে কেন? প্রফেসর চ্যাড্ উন্মাদ হয়ে গেছেন, শুধু মাত্র এই কারণে? তিনি এখন তাঁর বাগানে দাঁড়িয়ে শূন্যে পা ছুঁড়ছেন, শুধু মাত্র এই হাস্যকর কারণে?"

বেসিল বললো, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"—এবং যতদিন পর্যন্ত তিনি নাচবেন, ততদিন পর্যন্ত টাকাটা তাঁকে দিয়ে যেতে হবে? নাচ থামলেই টাকাও থামবে, এই তো?"

"বিলক্ষণ", বেসিল বললো, "থামতে তো একদিন হবেই?"

মিঃ বিংহ্যাম আর কথা বাড়ালেন না, ছড়ি এবং দস্তানা দুটিকে হাতিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, "মিঃ গ্র্যান্ট, অযথা আর বাক্যব্যয় করে লাভ নেই। বুঝতে পারছি, আপনি আমার সঙ্গে তামাসা করছেন। তামাসার এটা উপযুক্ত সময় নয়। আর প্রস্তাবটা যদি আপনি সিরিয়াসলিই করে থাকেন তো, মাপ করবেন আমাকে, ও-প্রস্তাব মেনে নেওয়া আমার পিতৃদেবেরও সাধ্যাতীত। প্রফেসর চ্যাড্-এর মস্তিষ্কবিকৃতিতে আমি দুঃখিত। অত্যন্তই দুঃখিত। কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে মনে রাখবেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম, আর যাই হোক, পাগলা গারদ নয়। প্রফেসর চ্যাড্ তো দূরের কথা, স্বয়ং ঈশ্বরেরও যদি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে তো ব্রিটিশ মিউজিয়ম তাঁকে অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিহার করতে বাধ্য হবে।"

দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন মিঃ বিংহ্যাম, বেসিল তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালো। তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো, "ধীরে মিঃ বিংহ্যাম, ধীরে। মনে রাখবেন, এখনো সময় আছে। যদি ইচ্ছে হয় তো এখনো আপনি একটা মহৎ কাজে সহায়তা করতে পারেন। মিঃ বিংহ্যাম, এ-কাজে ইউরোপের গৌরব, সমগ্র বিজ্ঞান-জগতের গৌরব। সে-গৌরবের কি আপনি অংশীদার হতে চান না? একদিন আপনি বুড়ো হবেন, মাথার চুল শাদা হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কথা শোনেন আমার, তখনো আপনি বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারবেন মিঃ বিংহ্যাম; উঁচু গলায় বলতে পারবেন, একটা বিরাট আবিষ্কারে আপনি সহায়তা করেছিলেন। সে-গৌরব কি আপনি চান না?"

বাধা দিয়ে মিঃ বিংহ্যাম বললেন, "যদি চাই, সেক্ষেত্রে—?"

হাল্কা গলায় বেসিল বললো, "সেক্ষেত্রে আপনার পন্থা অতি প্রাঞ্জল; এক্ষুণি গিয়ে প্রফেসর চ্যাড্কে আপনি বাৎসরিক আটশো পাউন্ড বেতন দেবার ব্যবস্থা করুন।"

অধৈর্য হয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন মিঃ বিংহ্যাম, কিন্তু এবারেও তিনি ব্যর্থ হলেন। দরজা আটকা, ডাঃ কোলম্যান ঘরে ঢুকছেন।

ডাক্তারের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন; ফ্যাসফেসে নীচু গলায় তিনি বললেন, "তাজ্জব ব্যাপার মিঃ গ্র্যান্ট, প্রফেসরের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি।"

বিংহ্যাম যেন এই ধরণেরই একটা কিছু আশংকা করছিলেন; বললেন, "কি ব্যাপার ডাক্তার? প্রফেসর বুঝি মদ খাবার বায়না ধরেছেন?"

"মদ? ছ্যু!" এমনভাবে কথাটাকে উচ্চারণ করলেন ডাক্তার, যেন যেন সে-তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার; তারপর বললেন, "না-না, মদ-টদ নয়।"

মিঃ বিংহ্যাম তাতে আরো খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে অস্পষ্ট গলায় বললেন, "তবে কি উনি কাউকে খুন করতে চাইছেন নাকি?"

"না-না—" অসহিষ্ণুভাবে ডাক্তার তাঁর মাথা ঝাঁকালেন।

"তবে কি নিজেকে ঈশ্বর ঠাউরেছেন? নাকি—"

বাধা দিয়ে ডাক্তার কোলম্যান বললেন, "কী যা-তা সব বলছেন? সেসব কিছু নয়; আমার আবিষ্কার একটু অন্য ধরণের। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে—"

কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ বিংহ্যাম, "বলুন, বলুন, বলুন কী হয়েছে?"

কাটা-কাটা দৃঢ় গলায় ডাঃ কোলম্যান বললেন, "ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, প্রফেসরের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেনি।"

"ঘটেনি!!!"

"না, ঘটেনি। পাগলামির কতকগুলি অনিবার্য লক্ষণ থাকে। প্রফেসরের মধ্যে তা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত।"

হাল ছেড়ে দিয়ে মিঃ বিংহ্যাম বললেন, "বলেন কি মশাই! পাগলই যদি না হবেন তো উনি নাচছেন কেন অমনভাবে? কথাবার্তাই-বা বলছেন না কেন?"

ডাক্তার বললেন, "কি জানি। পাগলামির আমি চিকিৎসা করতে পারি, তাই বলে মূর্খতার নয়। আর যাই হোন, উনি পাগল নন। এ আমি একেবারে হলফ করে বলতে পারি।"

"কী এর অর্থ?" মিঃ বিংহ্যাম একেবারে চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোনও রকমেই কি ওঁকে আমাদের বক্তব্যটা গিয়ে বলতে পারা যাবে না? কোনও রকমেই না?"

পরিষ্কার চাঁচাছোলা গলায় বেসিল বললো, "যাবে। আপনি কি কিছু বলতে চান ওঁকে? বেশতো, কি বলবেন বলুন; আমি গিয়ে আপনার বক্তব্য ওঁকে জানিয়ে আসছি।"

ডাঃ কোলম্যান এবং মিঃ বিংহ্যাম অবাক হয়ে বেসিলের দিকে তাকালেন, যুগপৎ প্রশ্ন করলেন, "সে কি! সে কী করে সম্ভব?"

বেসিলের মুখে একটি আয়ত হাসি ফুটে উঠলো; বললো, "কীভাবে আপনাদের বক্তব্যটা ওঁকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো, এই কথাই তো আপনারা জানতে চান? কেমন, তাই না?"

"বিলক্ষণ, বিলক্ষণ—"

"দেখুন তাহলে," বেসিল বললো, "এইভাবে।" বলেই সে এক-পা শূন্যে

ছুঁড়ে দিয়ে আরেক পায়ে ভর দিয়ে এক-ঠেঙে হয়ে দাঁড়ালো। বললো, "এইভাবে।"

বেসিলের মুখের দিকে তাকালাম। সে মুখ কঠিন, গম্ভীর। শূন্যস্থ নিরালম্ব পা দুখানি ওদিকে বৃত্তাকারে ঘুরছে।

স্থিরকণ্ঠে সে বললো, "বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে আপনারা আমাকে বাধ্য করলেন। কি করবো, আমি নিরুপায়। বাধ্য হয়েই তাঁকে ফাঁসাতে হচ্ছে। যা হোক, এতে তাঁর মঙ্গলই হবে।"

বিংহ্যাম-এর দিকে তাকিয়ে আমার দুঃখ হলো। ভদ্রলোকের মুখের অবস্থা ইতিমধ্যে আরও করুণ হয়ে উঠেছে। কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না; সেই-সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন, কী না জানি শুনতে হয় প্রফেসরের সম্পর্কে। আমতা-আমতা করে তিনি বললেন, "কি ব্যাপার মিঃ গ্র্যাণ্ট? কোনও কেলেঙ্কারী বোধ হয়?"

পা'খানিকে বেসিল এবার স্বস্থানে নামিয়ে আনলো। জুতোয় জুতোয় খটাস্ করে শব্দ হলো একটা, সকলে তাতে চমকে উঠলেন।

"মূর্খ!" চেঁচিয়ে উঠলো বেসিল, "আপনারা সব মূর্খ। মানুষটাকে একবার আপনারা লক্ষ্য করেও দেখেননি? নিরীহ নির্জীব এক অধ্যাপককেই শুধু দেখেছেন, দেখেছেন যে বই আর ছাতা বগলে তিনি লাইব্রেরীতে যান! চোখ দুটিতে একবার নজর পড়েনি আপনাদের? দেখেননি কী-আগুন সেখানে ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে? চশমার পেছনে তাঁর মুখখানাকে একবার দেখেননি? সে মুখের সংকল্পকঠিন দৃঢ়তা আপনা-দের নজর এড়িয়ে গেছে? মনে রাখবেন, নিষ্ঠায় তিনি একনিষ্ঠ, প্রত্যয়ে তিনি প্রগাঢ়। আমারই দোষ হয়েছে, তাঁর সেই সংকল্পের বারুদে আমিই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি। প্রফেসরের দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যক্তিবিশেষের একার চেষ্টায় একটা সাঙ্কেতিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল; আশপাশের লোক তার সেই সঙ্কেত-গুলোকে অনুধাবনের চেষ্টা করেছে এবং এমনিতেবেই হয়েছে তার পূর্ণবিকাশ। আমি তা নিয়ে তর্ক করেছিলাম; বলেছিলাম যে তা সম্ভব নয়। প্রফেসরকে আমি বিদ্রূপ করতেও ছাড়িনি। ব্যঙ্গ করে তাঁকে আমি বলেছি যে, পুঁথিপড়া বিদ্যে দিয়ে এ-তথ্য বোঝা যায় না। কি করেছেন তিনি তার উত্তরে? একেবারে মুখের মত জবাব দিয়ে দিয়েছেন। নিজেই তিনি একটি সাঙ্কেতিক ভাষার সৃষ্টি করেছেন। এবং প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত না আর-সবাই তাঁর এই নতুন ভাষা উপলব্ধি করতে পারছে ততদিন পর্যন্ত তিনি মুখ খুলবেন না। গভীর মনোযোগে তাঁর এই সঙ্কেত-গুলোকে আমি পর্যবেক্ষণ করেছি, তাঁর ভাষা আমি উপলব্ধি করেছি। আগে হোক পরে হোক, অন্য সকলেও একদিন তা উপলব্ধি করতে পারবে। ভাষা নিয়ে প্রফেসরের এটা একটা অপূর্ব এক্সপেরি-মেণ্ট; এ-এক্সপেরিমেণ্ট তাঁকে শেষ করতে দেয়া উচিত। তার জন্যে, যতদিন পর্যন্ত না তিনি তাঁর এই সাঙ্কেতিক নৃত্য থামাচ্ছেন, যে করেই হোক বছরে তাঁকে আটশো পাউণ্ড করে যোগাড় করে দেওয়া দরকার। এখন যদি প্রফেসরকে থামিয়ে দিই তো সে আমাদের মহাপাপ। একটা মহান সম্ভাবনাকে সেক্ষেত্রে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হবে।"

বেসিলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন মিঃ বিংহ্যাম, তার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "মিঃ গ্র্যাণ্ট, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। টাকাটা যাতে উনি পান তার জন্যে আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো। আর সেটা এমন কিছু কঠিন কাজও নয়। চলুন না, একসঙ্গেই বেরুনো যাক্?"

"ধন্যবাদ মিঃ বিংহ্যাম," বেসিল বললো, "আমি একটু পরে বেরুবো। প্রফেসরের সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে যাই।"

বহুক্ষণ ধরে আড্ডা চললো তাদের। মনে হলো, দুজনেই বেশ খুশী খুশী। আমি যখন উঠলাম, তখনও তারা দেখি সমানে নেচে চলেছে।

[পঞ্চম গল্প সমাপ্ত]

(ক্রমশঃ)

শ্রাবণ ভোরের মেয়ে

সঞ্জীবকুমার চৌধুরী

তুমি অবাক হলে বুঝি!
এই বৃষ্টিভেজা, বৃষ্টি থামা দিনে।
কালো সে মেঘ ঘনিয়ে এলো সজল ছায়া মেলে
অনেক দূরে যেতে তারা হঠাৎ গেল থেমে
অবাক হলো শ্যামলী এই মাটির মেয়ে দেখে॥
আজকে তুমি অবাক হলে বুঝি
কাজল কালো শ্রাবণ মেঘে দেখি!
আলিসা পরে কপোত বুঝি মেলেছে ডানা দুটি
করবী কেন ব্যাকুল হোল পাতার মাঝে থাকি
হৃদয় মেলা ঘাসের বুকে পিয়াল বনে বনে
গোপন কোন্ অধীর কথা আছে,
কৃষ্ণ ভুরুর আড়াল তুলে ধরে
গভীর করে দেখলো তারে চেয়ে
শ্যামলী এই অবাক হওয়া মেয়ে॥

এই শ্রাবণ ভোরেই অবাক হলে বুঝি?
এখনো বাকী হেমন্তের বাউল-দিনগুলি,
লুকানো দিন বাথায় কাঁপা মায়ের বুকে আছে
তুমি কি তারে জানো, ওগো শ্রাবণ-জাগা মেয়ে?

সেই হৃদয়হারা, কান্নাভরা দিনে
আশারা হবে মিছে আর স্বপ্ন যাবে ভেঙে,
সেদিন এমনি করে অবাক তুমি হবে
এই বৃষ্টি ভেজা, বৃষ্টি থামা দিনে॥

মনোজ বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

অতি কাতর কণ্ঠে কেতুচরণ বলে, দেখি ঠাকরুনকে বলে কয়ে। ছাতি ফেটে যায়—উনি যদি দয়া করেন। মুখ থুবড়ে গাঙের মধ্যে পড়ে যাবো, এমনি ধারা মনে নিচ্ছে।

পাঁচু আশ্চর্য হয়ে গেছে। কেতুচরণ যেমনই হোক, সে অতি সতর্ক এসব বিষয়ে। খাবার জল এখনো আধ-কলসীর উপর নৌকোর খোলে। বাদা রাজ্যে মিঠা জল নিয়ে দুর্ভাবনা—তা নৌকায় চড়নদার নিয়ে ওরা যখন মানযেলায় যায়, ভাল জলের খবর পেলে নেলি-পাঁচু কলসি ভরতি করে আনবেই। অথচ কেতুচরণ, দেখ, শখ করে চৌকিদারের কথা শুনছে। কি মজা পাচ্ছে, কেতুই বলতে পারে। কোন রকম গূঢ় মতলব আছে কিনা—সঠিক না জেনে সে-ও জল রয়েছে সে কথা চেঁচিয়ে বলতে পারে না।

মই বেয়ে কেতুচরণ উপর-উঠানে গিয়ে উঠল। বেশ তো আছে এরা—মাটি পায়ে লাগে না।

খাবার জল দেবে ঠাকরুন?

একপাজা বাসন নিয়ে এলোকেশী বেরিয়ে এল। চোখোচোখি হল। কত দিন—ওঃ, কত বছর পরে দেখা! এলোকেশীর ঘরকন্নার মাঝখানে এসে পড়েছে একেবারে।

কেতুচরণ নীচু গলায় বলল, এখানে এত কাছে রয়েছ, তা তো জানতাম না।

এলোকেশীর দ্বিধা হয় এক মুহূর্ত। তারপরে সঙ্কোচ ঝেরে ফেলে উঠানের প্রান্তে কেতুচরণের সামনেই বাসন মাজতে বসে গেল।

ভাল আছ? খবরবাদ ভাল? আমায় চিনতে পারছ না বুঝি?

এলোকেশী মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। ন্যাকড়ায় বাঁধা কি একটা জিনিস নিয়ে এসেছে। এলোকেশী বলে, ওটা কি?

বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তা বাদাবনের পীর-পয়গম্বর তো এঁরা—মনে ভাবলাম, কিছু হাতে করে আসা উচিত—

খড় ও ছাইয়ের মাজনি দিয়ে সজোরে ঘষে ঘষে এলোকেশী কড়াইয়ের কালি তুলছে, আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে—কেতুচরণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

তারপর প্রশ্ন করে, হালদার মশায়ের সঙ্গে বনছে কেমন? যত্ন-আত্তি করে?

হুঁ—

কেতুচরণ হি-হি করে হাসতে লাগল?

এলোকেশী রাগ করে বলে, হাসছ যে?

যত্ন-আত্তির একটা নমুনা এই চোখে দেখছি কি না?

কেতুর কণ্ঠস্বর একটু যেন বেদনার্ত হয়ে উঠল। বলে, শহরে-বাজারে সোনা-দানায় মুড়ে, খাট-পালঙ্কে বসিয়ে রাখলে যাকে মানাত, বাসন মাজিয়ে মাজিয়ে কি হাল করেছে তার! তোমার দশা একই রকম রয়ে গেল এলোকেশী। যেমন বাপের বাড়ি, তেমনি এখানে—

এলোকেশী বলে, নিজের সংসারে কাজ আর কে করে দেবে? বাদাবনে লোক আসতে চায়? খোরাকপোষাক আর আট টাকা কবুল করে খুলনা থেকে এক ঝি আনা হয়েছে, বাতের ব্যথা বলে সে ঠাকরুন শয্যা নিয়েছেন। এখন তারই সেবা করতে হচ্ছে। লোক মেলে না—কি করা যাবে বলো?

তা তুমিই বা বাদাবনে কেন? খুলনায় থাকতে পারতে। অঢেল তো উপরি-আয়! খুলনায় বাসা করে রেখে দিতে পারল না?

তা হলেই হয়েছে! চোখে হারায় যে! কাজকর্মের মধ্যে ঘড়ি-ঘড়ি এসে দেখে গিয়ে তবে সোয়াস্তি পায়।

ফিক করে হেসে ফেলল এলোকেশী। বলে, হল কঁদিন? তা কম দিন তো নয়! যত দিন যাচ্ছে, ততই আরো ক্ষেপে যাচ্ছে আমায় নিয়ে।

কথাবার্তা শুনে কেতুচরণের মনে সন্দেহ জাগে। ভুল দেখল তবে নাকি সে? লোকটা দুর্লভ নয়? চশমা চোখে থাকলেই দুর্লভ হালদার হবে—এই বা কেমন কথা? তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল এলোকেশীর দিকে। পরম আন্তরিকতার সঙ্গেই সে দুর্লভের ভালবাসার কথা বলছে। বলতে বলতে মুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কেতুচরণ।

আচ্ছা চলি। ম্লান মুখে কেতুচরণ বলতে লাগল, ভারি খুশি হলাম সুখে-স্বচ্ছন্দে আছ দেখে। চললাম।

এলোকেশী বলে, জল না খেয়ে যাবে কেন, এই হয়ে গেল আমার। বোসো, হাত ধুয়ে জল দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে কেন? বোসো না ঐখানটায়।

কিন্তু বসল না কেতু, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

বাসন ধুতে ধুতে এলোকেশী বলে, তোমার কথা তো কিছু বললে না কেতুচরণ। কেমন আছ, কি করছ?

আমি? একশ'খানা করে কেতুচরণ নিজের কথা বলে। আমি মন্দ থাকতে যাবো কেন? তোফা আছি। নৌকা চালাচ্ছি। নৌকা বোঝাই করে মেয়ে-মদ্দ একপাল চড়নদার মৌভোগের মেলায় নিয়ে যাই। চার আনা ভাড়া ফি জনের। মুনাফাটা কি রকম তাহলে আন্দাজ করো।

এলোকেশী আবদারের ভঙ্গীতে বলে, আমায় একদিন নিয়ে চলো না মেলায়। আমি দেখিনি।

কেতুচরণ আরও প্রলুব্ধ করে, বরিশালের ভারি এক যাত্রার দল আসছে। খুব ভাল গায়।

নিয়ে যাবে?

কেতু সবেগে ঘাড় নাড়ল।

না—তোমার মতো ফাঁকিবাজ চড়নদার নৌকোয় তুলি নে। কত মেহনৎ করে জল কাদা মেখে চিতেবাঘের মত হয়ে সেই একদিন হালদারের কাছে পৌঁছে দিলাম। দিব্যি ঘর-সংসার জমিয়ে বসে আছ—তা বখশিস-টখশিস কিছু দিয়েছ?

এলোকেশী প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নেয়। ...টা সে জিজ্ঞাসা করে, তুমি ঘর-সার করেছ

কেতুচরণ অবাধে মিথ্যা কথা বলে ...।

একটা নয়,—দু-দুটো। শেষের ...রবারটা বড় সুন্দর হয়েছে। টুনি নাম—...টখাটো দেখতে, যেন টুনটুনি পাখিটি!

...বাদার মেয়ে?

তাছাড়া কি? তোমাদের মতো শহর ...কে ক'জন আর আসে এদিকে? বাদা ...কেই বরঞ্চ ছিটকে বেরোয় শহরের ...নে।

কৌতূহলী এলোকেশী জিজ্ঞাসা ..., কি রকম সুন্দর তোমার বউ? ...ই তো সমানে মা-কালীর চেলা-...ন্ডা। সুন্দর আমার মতো?

কেতুচরণ তার মুখের দিকে চেয়ে ..., তুমি আর তেমন সুন্দর কোথায়? ...লের সেই দেখনহাসি আছো কি ... বুড়িয়ে গেছ। লোনা রাজ্যে রংও ...চে মেরে গেছে।

কিন্তু এমন কথাগুলো এলোকেশীর ... গেল কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। বাসন ... সে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। ক্ষণ-... বেরিয়ে এল—রেকাবিতে দুখানা ...-পাটালি আর এক গেলাস জল।

কেতু বলে, আবার মিষ্টি আনতে ... কি জন্যে?

শুধু জল দেয় নাকি গেরস্তবাড়ি?

কেতুচরণের মনের মধ্যে পুরানো ... কাঁটার মতো খচখচ করে ওঠে। ...লাকেশী আর দুর্লভ গৃহস্থালী ...তেছে। বেড়ার ওধারে ঘন জঙ্গলে ... বিচরণ করে, কুমীর ভেসে বেড়ায় ...নের দিগ্‌ব্যাপ্ত নদীজলে—মাঝখানে ...র লক্ষ্মীমন্ত সুচারু ঘর-সংসার। ...ঠালি-গোলায় তুলো-টেপারির ছাপ ...ছে চৌকাঠে, অজস্র ছোট ছোট ...লের মতো দেখাচ্ছে। বড় বড় পদ্ম ও ...কা এ'কেছে কপাটের উপর। ভারি ...ণীন মেয়ে এলোকেশী—আলপনায় ... চমৎকার হাত।

মিষ্টি খেয়ে গেলাসের জল ঢকঢক ... মুখে ঢেলে কেতুচরণ বলে, চলি ...র। কিন্তু বখশিস শুধু ওই ...টালিতে শোধ না যায়!

আবার এসো। একা-একা থাকি, তবু পুরানো চেনা একটা মানুষ—

কেতুচরণ দরজার কাছে ন্যাকড়ার পোঁটলাটা নিয়ে রাখল। এলোকেশী তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে সেটা খুলছে।

কি ভেট নিয়ে এসেছ, দেখি—

কেতুচরণ হেসে বলে, সন্দেশ। খুলনার গোলোক ময়রার দোকানের।

হ্যাঁ—সন্দেশ না আরো কিছু! একি, জুতো এমনি করে জড়িয়ে নিয়ে এসেছ—কার জুতো?

কেতুচরণ বলে, দেখ তো—চিনতে পারো কিনা?

ভারি চাপা মেয়ে এলোকেশী। মহকুমা-শহরে সেই বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যাবার ফল হয়তো! মুখের উপর এতটুকু ভাববিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না।

কোত্থেকে কুড়িয়ে আনলে পচা জুতো?

কেতু বলে, চিনতে পারো কার?

না—

তবে আর শুনে কি হবে? সে আমলে দুর্লভ ম্যানেজার কিন্তু লপেটা জুতো পরত এইরকম।

এখন সংসারি মানুষ—এত বড় অফিসের ঘোরিবাবু। এখন পরেন বুটজুতো আর সাহেবি প্যান্টলুন। ......তুমি শখ করে কিনেছ বুঝি? না—এ তোমার পায়ে হবে না তো!

কেতুচরণ বলে, একজনের ছাঁচতলায় পেয়েছি। রেখে দাও এলোকেশী, হালদার মশায়ের পায়ে যদি খেটে যায়। আমি রেখে দিতাম, লোহার যদি হত—এ চামড়ার জুতো আমাদের পায়ে ঢুকোতে গেলেই ফেটে যাবে।

ফিক-ফিক করে কেতুচরণ হাসতে লাগল। বলে, আমাদের বাসার ঠিক পাশে ওদের পাড়া বসেছে। হরেক মজা চোখে দেখি, হরেক সোহাগ কানে আসে। চশমা-পরা একজন এসেছিল কাল। প্রায়ই নাকি আসে, সকলে বলল। মাগীটার নাম আতর হবে বোধ হয়—তা শুধু আতরে তার সুখ হয় না, কখনো ডাকছে আতরবালা, কখনো আতরবাসিনী। ঘুমোবার জো নেই, ওদের ভালবাসার গুঁতোয়।

খড়মের খটখটি শোনা গেল অফিস-ঘরের দিকে। কেতুচরণ জিজ্ঞাসা করে, কে?

উনি।

কেতু বলে, বাসায় আছেন হালদার মশায়?

যাবেন কোথা? স্টেশনের সমস্ত ঝক্কি ও'র মাথায়—এক-পা নড়বার জো আছে?

রাত্তিরেও ছিলেন?

ছিলেন বই কি!

সহসা কঠোর কণ্ঠে এলোকেশী বলে ওঠে, চলে যাও তুমি কেতু—

কেতুচরণও দুর্লভের মুখোমুখি পড়তে চায় না। বিশেষ করে এলোকেশী যখন থাকে, সেই সময়ে। এলোকেশীর ফাঁকিতে পড়ে নৌকো বেয়ে মরেছিল—সেই একদিনের কথা মনে পড়ছে। লাঠি-খাওয়া কুকুরের মতো কেতুচরণ পালিয়েছিল সেদিন দুজনের সামনে থেকে। ভাবতে গেলে গা রি-রি করে ওঠে। দ্রুত সে নেমে গিয়ে ডিঙিতে উঠল।

গোল-পাঁচুকেও দেখা গেল অতি-গম্ভীর—সে একটি কথা বলল না। কথা বলতে মন নেই অম্বিকেরও। নিঃশব্দে তারা নৌকো ছেড়ে দিল।

কেতুচরণের আড়ালে এলোকেশীর মুখ ভ্রূকুটিমলিন হল।

হরিপদ!

খড়মের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল—সে মানুষ দুর্লভ হালদার নয়, হরিপদ।

বাবু কাল কোথায় গেছেন—ঠিক করে বলো তো হরিপদ?

হরিপদ বলে, সুপতি স্টেশনে রেঞ্জার সাহেবের কাছে। খুব হরিণ মারছে ওদিকে—মাংস-টাংস খেয়ে রাত হয়ে গেল, তাই বোধ হয় এসে পৌঁছতে পারেন নি।

হুঁ—

এক্ষুণি এসে যাবেন। না এসে উপায় আছে? কালকে রিপোর্ট ছাড়তে হবে, এখনো তার কিছু হয়নি।

(২৫)

দুর্লভ ফিরে এলে পরম শান্তভাবে জুতো জোড়া এনে এলোকেশী তার সামনে রাখল।

দেখ তো পায়ে হবে কিনা?

দুর্লভ স্তম্ভিত।

ফিক করে হেসে, এলোকেশী বলে, কোথায় পেলাম জিজ্ঞাসা করলে না তো?

শুষ্ক গলায় দুর্লভ তার কথারই পুনরাবৃত্তি করে। কোথায় পেলে?

ফেলে গিয়েছিলে বাসায়। খালি পায়ে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে। তোমার মনে নেই।

বলে দ্রুত সে শোবার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল এ'টে দিল।

পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আর তো সন্দেহ মাত্র নেই। দুর্লভ খালি পায়ে ফিরেছে। মৌভোগের মেলায় জুতার দোকান নেই—তাহলে নতুন এক-জোড়া নিশ্চয় কিনে আনত।

গেছে—সাত পাকের বউ তো নয়—পাল্টা শোধ নিতে সে-ও জানে।

ময়লা হয়ে গেছে গায়ের রং। সে চিক্কণতা আর নেই। নোনা রাজ্যে এসেছে বলে। বয়স হয়েছে—সেজন্যও বটে। কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে—ছবির মতো তার যে নিটোল মুখখানি, রাগ করে কে চিরে চিরে দিয়েছে সেই মুখ! কিশোর কালের কোরক-উন্মেষ—কত কৌতুক, কত কৌতূহল, মনে মনে কত অনুরাগ! একটা তুলনা মনে আসে এলোকেশীর। দিনান্তে কাল-কপাটি যেমন পাতা বন্ধ করে, তার সর্বদেহের রূপ মুদিত হয়ে আসছে একসঙ্গে।

সাজতে বড় সাধ হল অকস্মাৎ। শুধু সাধ নয়—প্রয়োজন। পিতলের রেকাবে সকাল বেলাকার ফুল রয়েছে। বেড়ার কাছে, নদীর কূলে অজানা গাছে লতায় নানা রঙের ফুল ফোটে। ফুল বড় ভালো-বাসে এলোকেশী। হরিপদকে বলা আছে, ঝি কালিদাসীও জানে—সুবিধা পেলেই তারা ফুল এনে দেয়। এখন এই পড়ন্ত বেলায় খিল-আঁটা ঘরে আয়না নিয়ে একটা-একটা করে সমস্ত ফুল সে খোঁপার চারিদিকে গুঁজল। পাউডার মাখতে গেল—মুখের উপর জালের মতো রেখাগুলো ঢেকে দেবে গোলাপি পাউডারে। আগে যে লাবণ্য ছিল—দেখা যাক, তার কতটা আনা যায় প্রসাধন-নৈপুণ্যে। কিন্তু খালি কৌটো—পাউডার ফুরিয়েছে, এক কণিকা অবশিষ্ট নেই। কোন একবার খুলনা যাবার মুখে বলে

অনেকক্ষণ কে'দে কে'দে তারপর আয়না পেড়ে নিয়ে এল দেয়াল থেকে। দেখছে নিজেকে—তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ পরীক্ষা করে দেখছে। ডাক্তারি ছাত্র তীক্ষ্ম ছুরি দিয়ে চামড়া চিরে চিরে অস্থি-সন্ধি দেখে— শাণিত দৃষ্টি দিয়ে তেমনি করেই দেখছে। রোজই মুখ দেখে থাকে—আজকেই উপলব্ধি হল, সেই কিশোর বয়স থেকে আলাদা হয়ে গেছে কতখানি! কান্না পাচ্ছে না তার, ভয় করছে। ভয়ে চোখের জল শুকিয়ে গেছে। খোলা চুলের রাশি কাঁধের উপর দিয়ে সামনে এনে দুহাতের আঙুলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেখে। বুক ঢিব-ঢিব করে—শাদা চুল বেরিয়ে পড়বে না তো? সন্দেহ বশে ছি'ড়েও ফেলল দু-এক গাছি। জানলায় রোদের দিকে নিয়ে দেখে। চিকচিক করছিল বটে—কিন্তু না, শাদা নয়—কালোই।

চোখ......দুর্লভ একদিন বলেছিল, চোখে তোমার ঝিলিক দেয় এলোকেশী। এমনি কত আজব কথা বলত মানুষটা। চোখের সে আলো স্তিমিত এখন। দু ঠোঁটে হাসি লেগে থাকত—স্থির-গম্ভীর সেই ঠোঁট দুখানি আঁটা থাকে এখন প্রাতুনিয়ত। হাসো এলোকেশী দেখনহাসি, চেষ্টা করে হাসোই না! হাসো দিকি—

আয়নায় তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করে এলোকেশী। হাসতে পারে সে......

দিলে নিশ্চয় এনে দিত—এ বিষয়ে দুর্লভের কৃপণতা নেই। কিন্তু খেয়াল ছিল না এলোকেশীরই। সাজসজ্জা সে বড় একটা করে না ইদানীং। জঙ্গল-পুরীতে রয়েছে—শহরে-বাজারে তো নয়—সজ্জার কি দরকার এখানে? সেজে-গুজে রূপ দেখাবে সে কাকে? এমনি ধরণের এক অবহেলার ভাব ছিল মনে মনে দুর্দিন যে এমন ঘনিয়ে এসেছে, তা কি সে স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে?

পোর্টম্যান্টো খুলে রঙিন বোম্বাই শাড়িখানা পরল সে ফেরতা দিয়ে। ওরই জুড়িদার রঙিন ব্লাউস চড়াল একটা গায়ে। জুত হল না—বড় ঢিলেঢালা—আয়নায় দেখে পছন্দ হল না। খুলে ফেলল। সারা বাক্স হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করে অবশেষে বের করল আর একটা। সাধারণ ছিটের ব্লাউস, কিন্তু আঁটোসাটো। এই সে চাচ্ছিল। অনেকদিন আগেকার—যৌবন যখন বিকচোন্মুখ—সেই সময়কার জিনিস এটা। সেদিনের মাদকতার ছোঁয়াচ যেন লেগে আছে এর সঙ্গে। আয়না পাশ-ওপাশ করে দেখে। সেদিনের নিটোল অঙ্গশোভারও যেন আদল আসে ব্লাউসটা পরে।

অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দুর্লভ ও হরিপদ ফুসফুস-গুজগুজ করছিল। হরিপদ সরে গেল। দুর্লভ বক্রদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। ভেবেছিল, প্রসাধনে হতবাক্ হয়ে যাবে দুর্লভ—সুড়ুৎ করে পাশে এসে বসবে। আর এলোকেশীই সরিয়ে দেবে বাঁ-হাতের ধাক্কা মেরে। ধাক্কা খেয়েও আবার ঘেঁষিয়ে আসবে পোষা কুকুরের মতো। এমন কতবার হয়েছে। শাস্তি দেওয়ার এই তার এক কঠোর প্রক্রিয়া। দুর্লভ ক্ষেপে যায় যেন এই প্রৌঢ় বয়সেও।

কিন্তু আজকে গতিক উল্টো। দুর্লভ জিজ্ঞাসা করে, জুতো পেলে কোথায়?

বলব না—

চোখ পাকিয়ে দুর্লভ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বলো—

যেখানে ফেলে এসেছিলে, সেইখানে।

তবে রে!

ছুটে এলো সেই জুতোর এক পাটি হাতে করে। এলোকেশী কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল।

রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে জুতোর পাটি কুড়িয়ে দুর্লভ পটাপট মারছে।

নষ্ট মেয়ে মানুষ......জানি তোর চরিত্তির। মেলার মানুষ আসা-যাওয়া করে আমি যখন না থাকি। হারামজাদা রায় বাবু দূত পাঠায়। কি করে খবর পেয়ে গেছে। বেটা রাঘব বোয়াল—ভাল মাল দেখলেই নোলায় জল আসে। সেটা হচ্ছে না। আবাদ তার এলাকা। এই বাদাবনে কারো এন্তাজারির ধার ধারিনে। দরজায় ডবল তালা দিয়ে আটকে রেখে যাবো, আমি এসে তালা খুলব। ঘর-সংসার তোকে দিয়ে কিচ্ছু করাব না নচ্ছার মাগি। রাত-দিন চৌপহর আটক রেখে সায়েস্তা করব—হ্যাঁ।

এবং মুখের কথা মাত্র নয়—টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে ফেলল ঘরের ভিতর। মেঝেয় ফেলে লাথি কষিয়ে দিল একটা। গৌর অঙ্গে জুতার দাগ কেটে কেটে বসেছে। পরনের পুরানো বোম্বাই শাড়ি শতছিন্ন হয়ে গেছে—ব্লাউসটাই রয়েছে শুধু আঁটা। এলোকেশীও চুপ করে নেই, মুখে যাচ্ছেতাই করে বলছে।

লাথি মেরে দুর্লভ চলে যাচ্ছিল—গালির জবাব দিতে ফিরে দাঁড়াল। সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। এলোকেশী কিল মারছে তার মুখে বুকে গুমগুম করে। পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। কিন্তু শক্ত বাঁধনে এঁটেছে দুর্লভ। বয়সে দেহ নুয়ে এসেছে, কিন্তু দৈত্যের বল যেন গায়ে...

গলার স্বর এখন একেবারে আর একরকম।

কাল খুলনেয় যাচ্ছি মাইনে-পত্তোর আনতে। ভাল জর্জেট শাড়ি কিনে আনব তোমার জন্যে। আর কোন-কিছুর দরকার থাকে তো বলে দিও।

এবং দরজায় তালা দেবার কথা—কিন্তু, দিল না চলে যাবার সময়। মনে ছিল, কিন্তু তালা আটকাবার ইচ্ছে হল না এর পর।

(ক্রমশঃ)

মাথেরান

তরুণকুমার ঘোষাল

কি কারণে যে ইংরাজেরা কলিকাতাকে "City of Palaces, Second City in the British Empire" ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করেছিলেন, তা তাঁরাই জানেন। আমার এটা তো বুদ্ধির অগম্য। কলিকাতা হচ্ছে অট্টালিকাময়ী নগরী! কেন, বোম্বাই কি অপরাধ করলু? হ্যাঁ, জনসংখ্যার অনুপাতে কলিকাতাকে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী' ধরে নিতে আপত্তি নেই, বিশেষ আজকালকার এই বাস্তুহীনদের বাজারে। তবে ঐ পর্যন্ত। নইলে সত্য কথা বলতে বোম্বাইকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শহর বলা উচিত, এক আবাদী ছাড়া আর অন্য সব দিক থেকে। আজকের যুগের প্রায় সকল বিদেশীই, যাঁরা দুটি শহরকেই দেখেছেন, একথা স্বীকার করেন এবং আমরাও এটি মেনে নিই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়, আদব-কায়দায়, শিষ্টাচারে, প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদ, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া প্রভৃতি বিচার করলে কলিকাতার বোম্বাইয়ের সঙ্গে টেক্কা দেওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে।

আমাদের যা মনে হয়, পলাশীর যুদ্ধ ফতে হওয়ার পর ইংরাজেরা যখন সমস্ত ভারতবর্ষে জাল পাততে শুরু করলেন, তখন ফোর্ট উইলিয়ম বা কলিকাতা ছিল তাঁদের Bridge-head বা Spring-Board. কলিকাতা ও তার Hinter-land, এই বিদেশীদের এদেশে আসর সাজাতে যতদূর সাহায্য করেছিল, এমনটি আর কোন স্থানেই করেনি। তাই বুঝি তাঁদের তরী সোনা দিয়ে ভরে দেওয়ার কৃতজ্ঞতায় উছলে উঠে, ইংরাজেরা কলিকাতার এই নামকরণ করেছিলেন। কলিকাতা না হলে এঁদের ১৯০ বছর ধরে ভারতে লীলা-খেলার আসরও মিলত না, বিশ্বশক্তি 'নম্বর ওয়ান'ও হবার সুযোগ ঘটত না। ভাবে গদগদ ইংরাজের মুখে তাই কলিকাতা হয়ে গেল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শহর, বোম্বাই রইল কোন্ পগার পারে পড়ে। হয়ত তখনকার দিনে এই নামধেয়তার সার্থকতা ছিল। কিন্তু এযুগে এর পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা বোম্বাইয়ের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাই এর মীমাংসা করুন।

বোম্বাই শহরের উচ্চতম জয়স্তম্ভ হচ্ছে এই মাথেরান শৈলনিবাস, যা কি শহর থেকে সত্তর মাইলের মধ্যেই এবং board. কলিকাতাও তার fitureland, কোন স্থানই করেনি। তাই বুঝি তাঁদের যেখানে পৌঁছতে বড়জোর চার ঘণ্টা সময় লাগে। কর্মক্লান্ত কেরানী বাবুরা অনায়াসেই এখানে Week-end করে সোমবার সকালের ট্রেনে অফিস করতে পারেন। শৈলনিবাসে বিহারকে বিহার হয়, হাড়েও একটু বাতাস লাগে। এত সুবিধা ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে কিনা, জানি না। বাঙালী আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, কাছেপিঠে এমন একটি স্বাস্থ্যকর স্থান নেই, যেখানে গিয়ে দুদণ্ড মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব। ছিল কক্সবাজার, সে এখন পাকিস্তানে। পুরী আছে উড়িষ্যায়, সেখানে যেতে ভয় করে, কারণ তার স্বর্গদ্বার, সত্যকার স্বর্গেরই দ্বার। মানভূম সিংভূমের পার্বত্য প্রদেশ বিহারী ভাইদের মৌরসী-পাট্টা, এতটুকুও হিস্‌সার আশা নেই। আছে এক সবে ধন নীলমণি দার্জিলিং (আর কালিম্পংও)। কিন্তু সেখানে যাওয়া-আশা আর হোটেল খরচে রাজার ভাণ্ডারও উজাড় হয়। কাজেই, দুর্ভাগ্য বাঙালীর সকল দুয়ারই বন্ধ। বরপুত্র বোম্বাইয়াদের মা-লক্ষ্মী যেমন কোষাগার পূর্ণ করে দিয়েছেন, তেমনি সেই কোষের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারের অজস্র বাতাবরণ গড়ে দিয়েছেন। মাথেরান এই মুক্তহস্ত দানের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মাথেরান Western Ghats-এরই এক ক্ষুদ্র অংশ। ছোট্ট একটু পাহাড়ে জায়গা। কিন্তু তা হলে কি হয়, অনেক ডাক-সাইটে বড় বড় শৈলনিবাসকে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার শক্তি এ রাখে। ভারতের অনেক জায়গাই দেখেছি, কিন্তু ছোট এই মাথেরান যেন একাই মনের উপর জেঁকে বসে আছে। মাত্র আড়াই হাজার ফিট উঁচু এই পাহাড় সত্যই প্রাকৃতিক শোভায় অতুলনীয়। অথচ, আশ্চর্য যে, একশ' বছর পূর্বেও এমন একটি স্থানের অস্তিত্ব কারো ধারণাতেও আসেনি।

১৮৫০ সাল। তখন থানা জেলার কলেক্টার ছিলেন মিঃ ম্যালেট। কি এক কাজে তিনি পুণা গিয়েছিলেন। ফেরবার পথে এই মাথেরানের উপত্যকায় তাম্বু গাড়েন। ক্লান্ত, পিপাসার্ত মিঃ ম্যালেট অনুচরদের জল আনার আদেশ দেন। বেহারাদের একজন খুঁজে খুঁজে এক ঝর্ণার জল তাঁকে এনে পান করায়। এই ঝরণাই ভবিষ্যতে Malet Spring নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বোম্বাইয়ের খরার জলপানে অভ্যস্ত ম্যালেট সাহেবের কাছে এই ঝর্ণার জল অমৃত তুল্য মনে হয়। তিনি যখন থানায় ফিরে যান, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল বোতলে ভরা এই ঝর্ণার জল, সেটা তিনি সরকারী রসায়নাগারে পাঠিয়ে দেন বিশ্লেষণ করাতে। বিশ্লেষণে জলের মধ্যে গন্ধক ও লোহের অংশ মেলে। তখন তিনি মাথেরান যে ইংরেজদের বাসোপ-যোগী একটি স্বাস্থ্যকর স্থান এ বিষয়ে অনুমোদন করে তখনকার দিনের লাট-সাহেব লর্ড এলফিনস্টোনের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্টের ফলে মাথেরান যে শুধু সরকার কর্তৃক গ্রাহ্য হয় এ নয়, ১৮৫৪ সালে লাটসাহেব স্বয়ং নিজের জন্যও এখানে একটি বাংলো বানান।* নেরাল-মাথেরান রাস্তা তখনও তৈরী হয়নি। মাথেরানে যাবার তখন সোজা রাস্তা ছিল চৌক গ্রাম হয়ে শিবাজীর সিঁড়ি (Shivaji Ladder) ধরে, যেটা মাথেরানের বিখ্যাত One Tree Hill-এর পাশেই। শিবাজীর সিঁড়ি কিন্তু নামেই সিঁড়ি—যেমন অপ্রশস্ত, তেমনি বন্ধুর, তেমনি পিচ্ছল। শিবাজী মহারাজ মুঘলদের

* বাঙলোর নাম ছিল "এলফিনস্টে লজ।"

মাথেরান স্টেশনের একটি দৃশ্য। গাড়িগুলি পায়রার খোপের মত, লম্বায় চৌড়ায় ৪২ থেকে ৮০ বর্গ ফিট। উচ্চতায় ৬ ফিট।

হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অনেকবার এই পথে আত্মগোপন করেছেন। জানি না, কি করে তিনি এ-পথে এত সহজে যাওয়া আসা করতেন। হয়ত তিনশ বছর পূর্বে এ পথ এত ভয়ানক ছিল না এবং এখনকার One Tree Hill সত্যই One Tree-র Hill ছিল। এখন কিন্তু সে পাহাড়ে একটা নয় চারটে গাছ।

ম্যালেট সাহেবের রিপোর্টে কাজ হোল বটে, কিন্তু মাথেরানের সত্যকার উন্নতির মূলে আছেন এক বোরি মুসলমান নাম আদমজী পীরভাই। ইনি কমিসারিয়েটের কন্ট্রাক্টারি করে বহু টাকার মালিক হয়েছিলেন। এ'রই অর্থবলে ১৯০২ সালে মাথেরানে লাইট রেলওয়ে হয়। ১৩ মাইল রাস্তা রেলওয়ে নির্মাণে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকাই খরচ হয়। রেলওয়ে বন্ধক রেখে পীরভাই সাহেব গোয়ালিয়র মহারাজের কাছ থেকে সাড়ে ছয় লক্ষ ধার নিয়ে এই মহাকার্যটি সম্পন্ন করেন। পীরভাই শুধু যে রেল নির্মাণই করে দিয়েছিলেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধনীদের বাসোপযোগী ৪০টি বাংলোও তৈরী করিয়ে ছিলেন, যার এক এক একটি তিনি চার থেকে পাঁচ হাজারে বিক্রী করেছিলেন। তখনকার কালে ৪।৫ হাজার টাকা খুব বেশী হলেও, কার্যের গুরুত্ব বিবেচনা করলে সত্যিই খুব বেশী বলে মনে হবে না। শহরের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন এই নিরালা, বনে-জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় অঞ্চলে, ইঁট-কাঠ চুণ সুরকী লোহা-লক্কর জোগাড় করে বাংলো তৈরী করা এত সোজা কাজ ছিল না। এক একটি বাংলোতে ছিল দুখানি করে শোবার ঘর, একটি হল ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি ঢাকা বারান্দা এবং একটি বাথ-রুম। বাংলোর আশে পাশে জায়গা ছিল যথেষ্ট।

১৯৪৮ সালের মার্চে এই লাইট রেলওয়ে জি আই পি কর্তৃপক্ষের অধীনে আসে। কিন্তু এতে যে রেলওয়ের উন্নতি বিশেষ হয়েছে, এতো মনে হয় না। এই সেদিন যাতায়াত বিভাগের ডেপুটি মন্ত্রী মহাশয়, সম্মানীয় শ্রীযুত শান্তনম্ (Minister of State for Transport) মাথেরান বেড়িয়েও গেলেন এবং ভাষণে অনেক কিছু শুনিয়েও গেলেন। যে Rolling Stock-এর অভাবে এই রেলওয়েতে মাসে একবার দুবার break down হয়, তার অভাব পূর্ণ করারও প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নেরাল (Neral) থেকে মাথেরান যাবার সাত মাইল হাঁটা রাস্তার সংস্কারের বিষয় একটি বাক্যও উচ্চারণ করলেন না। হয়তো তাঁর মনের উদ্দেশ্য, মাথেরান full many a flower-এর মত লোকচক্ষুর অন্তরালে যেমন আপন সৌন্দর্যসম্ভারে গরীয়ান হয়ে আছে, তেমনিই থাক। একে দার্জিলিং, মহাবালেশ্বরের মত পেশাদার টুরিস্টের টুরপ্রোগ্রামের অন্তর্গত করে কাজ নেই! এটা ঠিকই যে রাস্তার যথারীতি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মোটরিস্টদের আক্রমণেরও আশঙ্কা আছে। তখন হয়তো মাথেরানও তার গুপ্ত, দুর্ভেদ্য স্থিতি খুইয়ে ফেলে অন্যান্য শৈলনিবাসের মত নেহাতই মামুলী হয়ে যাবে।

কিন্তু এতো গেল ইংরাজী ইতিহাস। মাথেরানের নিজস্ব বাদশাহী আমলের ইতিহাসও আছে। তখন ঔরঙ্গজীব ছিলেন দিল্লীর বাদশা। শিবাজী মহারাজ অল্প অল্প করে মাথা উঁচু করে উঠছেন। মাথেরানের সমান্তরালে আর একটি পাহাড় আছে, নাম তার পরবল, বোধহয় 'প্রবল' * শব্দের অপভ্রংশ। পরবলে ছিল একটি মুঘল দুর্গ, সে দুর্গের অধিপতি ছিলেন মুসলমানের নিমকভোজী হিন্দু সর্দার রামাজী রাও। এ পরবল দুর্গের কোষাগারে, ও অঞ্চলের যা কিছু, উশুলকরা খাজনাও রক্ষিত হোত। সর্দার রামাজী রাও-এর অধীনে আর একজন হিন্দু সর্দার ছিলেন, যিনি উত্তরকালে স্বামী চিন্নেনাথ নামে অভিহিত হয়েছিলেন। ইনি হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অন্যায় অমানুষিক অত্যাচারে ব্যথিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এ'রই শিষ্য নেতাজী পালকর, যিনি ভবিষ্যতে শিবাজী মহারাজার দক্ষিণহস্ত হয়ে, তানাজীর মতই বিখ্যাত হয়েছিলেন। রামদাস স্বামী যেমন শিবাজী মহারাজাকে গড়ে তুলে-

* পরবল বা প্রবল ছাড়া আর একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মাথেরান থেকে দেখা যায়। নাম তার পেব্। শহর থেকে ৩ ঘণ্টার পথ। এরও কাহিনী প্রবলের মতই মারাঠী ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

ছিলেন, স্বামী জিগরনাথের শিক্ষায় নেতাজী পালকরও তেমনি তৈরি হয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামী জিগরনাথ যেখানে বসে তপস্যা করেছিলেন, তার নাম Tiger lane। এই গুহা রামবাগে, এবং এখন গোল্‌ড্‌ক্রফ্‌ট্‌ নামে একটি বাংলোর অন্তর্গত। কিম্বদন্তী যে, স্বামীজীর সঙ্গে সদাসর্বদাই বামে একটি গাই এবং দক্ষিণে একটি বাঘ থাকত। স্বামীজীর সমাধির পর, এই সহচর দুইটিও দেহত্যাগ করে। আজ যেখানে স্বামী জিগরনাথের মন্দির, স্বামীজী সেখানেই সমাধিস্থ হ'ন।

চৌকগ্রামের পাটিল ছিলেন, নেতাজী পালকরের পিতা, মুসলমানের বেতনভোগী কর্মচারী। নেতাজীর এক ভগ্নী ছিলেন, যাঁর বিবাহ। এ'দের মধ্যে প্রথা ছিল, কনে যেত বরকে বিয়ে করতে। গ্রামের পাটিলের মেয়ের বিয়ে। কাজেই, খুব সাজসজ্জা ধুমধাম, মশালের জলুস। কিন্তু ভগবানের বিধানে সে হর্ষ বিষাদে পরিণত হোল। জলুস পরবল পাহাড়ের নীচে পৌঁছতে পৌঁছতে, তার ওপর মুসলমান সৈন্যের আক্রমণ জারী হোল। দু দলে ঘোর যুদ্ধ হয়ে অনেকে হতাহত হলেন। নেতাজীর বীরত্বে তিনজন মুসলমান সর্দারের মস্তক যুদ্ধভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। নেতাজীও খুব ঘায়েল হয়ে রণক্ষেত্রে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় নেতাজীর কয়েকজন সহচর তাঁকে ধরাধরি করে উঠিয়ে নিয়ে এসে স্বামী জিগরনাথের সম্মুখে রাখেন। এই স্বামীজীরই সেবাশুশ্রূষায় সেবার নেতাজী প্রাণে বেঁচে উঠলেন।

তারপর শুরু হোল স্বামীজীর হাতে তাঁর শিক্ষা। নেতাজী প্রথম প্রথম স্বামীজীর মতই সন্ন্যাস নেবার জিদ ধরেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁকে অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করেন। বলেছিলেন, বাবা, তোর জন্য অন্য কাজ তোলা রয়েছে, কর্মহীন সন্ন্যাস তোর জন্য নয়। হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য, দুঃখগ্রস্তের দুঃখ দূর করার জন্য, আর্তের পরিত্রাণের জন্য, দক্ষিণে এক মহান ব্রতীর (স্বামীজী শিবাজী মহারাজার নাম করেন নি) উদয় হয়েছে। তাঁর সহির্যের জন্য তোকে এগোতে হবে, তোকে তৈরি হতে হবে।—স্বামীজী নিজে ছিলেন অস্ত্রবিদ্যায় দ্রোণাচার্য। তাঁর হাতে অর্জুনরূপী নেতাজীর সকলরকম শিক্ষাই চলতে লাগল—ধনুর্বাণ, সড়কি, তলোয়ার, মুষল ইত্যাদি। শিক্ষা সমাপ্তির পর একদিন বাবা জিগরনাথ নেতাজীকে ডেকে বললেন, এবার তোর বিদায়ের পালা এবং আমারও। যা চলে নিজের ঘরে ফিরে এবং গিয়ে কিছু খেতে চা। তোর সামনে আনীত ভোজ্যবস্তু যদি সাদা হয়, জানবি যে তোর জয় অবশ্যম্ভাবী।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নেতাজী চৌকগ্রামে ফিরে আসেন। তখন রাত্রিকাল। পরিবারের সকলে ভয়ে সন্ত্রস্ত। নেতাজীর নামে হুলিয়া, যে তাঁকে মৃত হোক, জীবিত হোক, ধরে দিতে পারবে, সে ইনাম পাবে। পরিবারের সকলে বললেন, পালাও। পালাও, পালাও এই মুহূর্তে। কিন্তু নেতাজী অটল, ক্ষুধার্ত, কিছু না খেয়ে নড়বেন না। অগত্যা রান্নাঘরে যা কিছু বাকী বাড়তি ছিল, তাই আনা হোল। কিন্তু তখনকার দিনে অত রাতে অতিথিকে দেওয়াই বা যায় কি? ঘরে ছিল বাসী ভাত, আর ঘরে পাতা দই। তাই এল। দুটি জিনিষই সাদা রঙের। গুরুর আশীর্বাদ অতএব সিদ্ধি নিশ্চিত। রাণা প্রতাপের ঘরে রাজা মানসিংহের ভোজনের মত নেতাজীও উষ্ণীষে চারটি অন্ন রেখে উঠে পড়লেন এবং মুসলমান অত্যাচারীর উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সেই রাত্রেই অজানার পথে পা বাড়ালেন।

শিবাজী মহারাজ তখন তোরণ না কি এক নিকটবর্তী দুর্গে অধিষ্ঠান করছিলেন। মুঘল-চরের কাছে এ খবরটি জানা ছিল। মুঘল-সৈন্য এই দুর্গ অধিকার করে শিবাজী মহারাজকে বন্দী করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভিতরে ভিতরে পরিকল্পনা চলছে এবং দুর্গের উপর আক্রমণও হয় হয়। এমন অবস্থাতে নেতাজী হলেন বন্দী মুসলমানের হাতে। কিন্তু নেতাজীর মুখে তখন ছিল একরাশ দাড়ি-গোঁফ। বোঝার উপায় ছিল না, হিন্দু কি মুসলমান। নেতাজী নাম ভাঁড়িয়ে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে এ যাত্রা রেহাই পেয়ে গেলেন। পরে এক ফাঁকে পালিয়ে তোরণ-দুর্গে উপস্থিত হলেন। কিন্তু নেতাজীর দুর্ভাগ্যক্রমে শিবাজী মহারাজের সৈন্যেরাও তাঁকে মুসলমানের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করে কয়েদ করে রাখলেন। তবে হাঁ, এই সর্তে

যে, তাঁর কথা যদি সত্য হয় এবং তাঁর আনীত মুসলমান সৈন্যের সংবাদ যদি সঠিক হয় তো তাঁর পুরস্কার হবে। শোনা যায়, নেতাজীর এই সহায়তার বলেই মারাঠা সৈন্যের যুদ্ধজয় হয়। নেতাজীও পুরস্কারস্বরূপ একটি ছোট-খাট সেনাপতিপদে বরিত হন।

পরবল দুর্গের পতন এবং সেখানকার কোষাগারও লুঠ হয় নেতাজীর কূট-কৌশলে। মুঘল-বাদশা ঔরংগজীবের সংগে শত্রুতা, যেমন তেমন কথা নয়। চাই সৈন্যবল, যার জন্য চাই অর্থবল। গরীব শিবাজী মহারাজার আছে কি? কাজেই, মুসলমানদের সম্পত্তি লুটপাট করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। এমন সময় নেতাজী সংবাদ দিলেন যে, পরবল দুর্গে অনেক ধন-দৌলত সঞ্চিত আছে। মহারাজ হুকুম দিলেন, কেল্লা দখল কর। আর সমস্ত ভার পড়ল নেতাজীর উপর। নেতাজী বাছা বাছা পাঁচজন পাট্টা জোয়ান সর্দারকে ঘেসেড়া সাজিয়ে মাথায় ঘাসের বোঝা চাপিয়ে পাঠালেন পরবল দুর্গে। কিন্তু সর্দারদের রকম-সকম দেখে দুর্গাধিপতি রামাজী রাওএর কেমন সন্দেহ হয়। ঘাসের বোঝা নামিয়ে খানাতল্লাসী হয়ে যখন তার মধ্যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেল, তখন আর তাঁর বুঝতে বাকী রইল না, এরা কার লোক। সর্দার পাঁচ-জনকে গভীর মাটির নীচে এক কয়েদ-খানায় দিলেন বন্দী করে। মনে তাঁর উচ্ছলিত আনন্দ। নর্তকীদের গানবাজনার আদেশ দিলেন। নাচ গান আর মুহুর্মুহু শরাব পান চলতে লাগল।

এদিকে সর্দার পাঁচজন বন্দী হয়ে নিষ্কর্মা বসেছিলেন না। তাঁদের একজনের পকেটে ছিল চকমকি ও পাথর। তাই দিয়ে তাঁরা ঠুকতে লাগলেন দেয়ালের বিভিন্ন অংশ। আশা যে, যদি কোন জায়গা ফাঁকা থাকে, লাথির চোটে সেখানটা ভেংগে নিজেদের পলায়নের রাস্তা করে নেবেন। দৈবের ভাগ্যে ঠিক যেমনটি তাঁরা চাইছিলেন, তেমনই এক জায়গা মিলে গেল। তখন লাথির ওপর লাথি। পাঁচ জোয়ানের লাথি খেয়ে দেওয়ালের রাস্তা খুলে গেল। আসলে সেটা ছিল একটি সুড়ংগের মুখ এবং সুড়ংগ ঢাকা দেওয়া দরজার উপর ছিল গোবরের প্রলেপ। সর্দার পাঁচজন নিজেদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে মশালের মত তৈরী করে চকমকি ঠুকে সেটা জেলে নিলেন। তারপর চললেন ধীরে ধীরে এগিয়ে। কিছুদূর গিয়ে সকলে যা দেখলেন, অবাক! রাশি রাশি চামড়ার মশক ভর্তি সোণা-রূপা, হীরা-জহরত এবং শুধু তাই নয়, পীপে পীপে ভর্তি বারুদ। বাস, আর দেখে কে তাঁদের স্ফূর্তি! বারুদের পীপেগুলি একে একে বয়ে নিয়ে এলেন সেই কয়েদখানায় এবং কাপড়ের লম্বা দড়ি করে দিলেন তাতে আগুন লাগিয়ে। তারপরে যা কাণ্ড হোল, সেটি কল্পনার যোগ্য। পরবল সেই বিস্ফোরণে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এখনও সেই ধ্বংসাবশেষ ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে "কলাবতী রাজপ্রাসাদ"এর ধ্বংসাবশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুড়ংগের একটি মুখ চৌকগ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। কাজেই, সর্দার পাঁচজনের কোন ক্ষতিই এই বিস্ফোরণ করতে পারে নি। কিন্তু ধন-দৌলতের বেশীরভাগই উড়ে-পুড়ে গিয়েছিল? এই সেদিনও, কয়েক বছর পূর্বে, এক আদিবাসী কৃষক হল চালাতে চালাতে এক বাক্স সোণার শিক্কা পায়, যার ছ'টির ওজন হয় এক তোলা। কিন্তু স্যাকরারা মূর্খ আদিবাসীকে ঠকিয়ে বড়লোক হয়ে গেল, আদিবাসী যেমন গরীব তেমনি গরীবই রয়ে গেল। মাথেরানের oldest inhabitant শ্রীযুত প্রাগজী বিশ্রাম বললেন যে, এক পালি (মাপের, ওজনের নয়। এক পালি=ছয় পাউন্ড।) এই মুসলমানী শিক্কার বদলে আদিবাসী পেয়েছিল কুল্লে পঞ্চাশ টাকা। পরে, যখন বিশ্রামজীর পরামর্শরূপ ইন্ধনে আদিবাসীর বুদ্ধিধরূপ অগ্নি জ্বলল, তখন আর কোন উপায় ছিল না, অর্থাৎ বাক্স প্রায় শেষ। বেচারার যে দু'চারটি শিক্কা উদ্বৃত্ত ছিল, সেগুলি সে দু-একখানি করে ওজন-দরেই বিক্রী করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু ভাগ্য আর ফেরাতে পারে নি।

বিশ্রামজীর মুখে শুনেছি যে, সার্ভের সময়, মাথেরানের ঘন জংগল দেখে ভয় পেয়ে একদল লোক পরবল পাহাড়কেই বাসোপযোগী করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রচেষ্টা সুফল হয় নি, কারণ, ঐ ভৃংগজাতীয় কীট, যারা সুড়ংগের দ্বারটিকে ফোঁপড়া করে রেখেছিল। এখানে এ জাতীয় কীট এত লক্ষ লক্ষ আছে যে, তাদের কোনক্রমেই যে নির্বংশ করা যাবে না, এ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আজ পরবলের বদলে মাথেরানই হয়ে আছে শৈলনিবাস, আর পরবল লোকাভাবে করছে খাঁ-খাঁ।

(ক্রমশঃ)
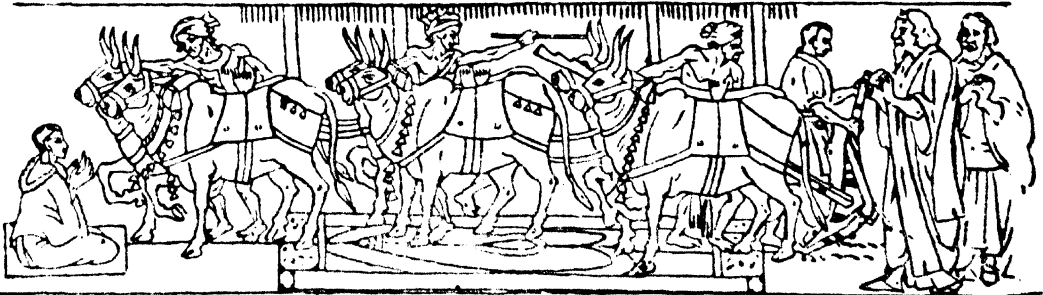
রাষ্ট্রভাষা

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখতে পাই, বহু ভাষা তাদের বাল্যাবস্থায় অন্য ভাষার শরণ নিয়ে সমৃদ্ধিশালী হয় এবং কিছুটা পুষ্টিসাধনের পর সে-ভাষা থেকে নিজকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে।

এত প্রকৃষ্টতম উদাহরণ পাওয়া যায়, জর্মানি এবং রাশাতে। এককালে জর্মন ভাষা এতই কমজোর ছিল যে, ফরাসীর সাহায্য বাদ দিয়ে জর্মন ভাষার মাধ্যমে যে কেউ জ্ঞানচর্চা করতে পারে, একথাটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হত। ফ্রেডরিক দি গ্রেট জর্মন ভাষাকে এতই ঘৃণা করতেন যে, কবিতা লিখতেন ফরাসীতে (মাইকেলরা এদেশেও ঠিক তাই করেছিলেন, তবে ফরাসীতে না লিখে ইংরিজিতে) এবং সেই রদ্দি কবিতা মেরামত করতে গিয়ে গুণী ভলতেরের নাভিশ্বাস উঠত। ঠিক সেই রকম তলস্তয় তুর্গেনিয়েফের যুগে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফরাসী—তলস্তয় যা ফরাসী লিখে গিয়েছেন, সেরকম ইংরিজি এদেশে কজন লিখেছেন, সেকথা হাতের এক আঙুলে গুণে বলা যায়।

অথচ আজ জর্মন এবং রুশ সাহিত্য পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এমন কি, আজকের দিনে বহুতর লোক জর্মন-রাশান শেখে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেষ কথাটুকু জানবার জন্য।

ইংরিজি চর্চা করে এবং ইংরিজিকে জ্ঞানদানের মাধ্যম বানিয়ে আমরা প্রচুর লাভবান হয়েছি সন্দেহ নেই (কোনো কোনো স্থলে ক্ষতিও হয়েছে) এবং তার ফলে প্রাচ্য ভূখণ্ডে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ভারতবর্ষেই হচ্ছে সব চেয়ে বেশি—চীন কিম্বা আরবভূমি আমাদের পশ্চাতে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে আমরা পদে পদে অনুভব করেছি, মাতৃভাষার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হচ্ছে না বলে আমাদের সর্ব প্রচেষ্টা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উপস্থিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব ছেলেমেয়েরা বেরুচ্ছে, তারা না পারে বাঙলা লিখতে, না পারে ভালো করে ইংরিজি পড়তে—লেখার কথা বাদ দিন।

অর্থাৎ, ইংরিজিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমের আসন থেকে না হটিয়ে আর আমাদের মুক্তি নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাদান, বিদ্যাগ্রহণ এবং যাবতীয় চর্চা বাঙলার মাধ্যমে না করলে ভাষা এবং সাহিত্য পুষ্টিসাধন করতে পারবে না, সর্বপ্রকারের প্রগতি ব্যাহত এবং ক্ষুণ্ণ হবে।

গোড়ার দিকে অত্যন্ত অসুবিধা হবে, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অথই জলে না পড়া পর্যন্ত মানুষ সাঁতার শেখে না। জর্মন এবং রুশ ভাষা ঐ একই বিপদে পড়েছিল, কিন্তু ডুবে মরেনি, তাগড়া হয়েই বেরিয়ে এসেছে।

তাই যদি হয়—অর্থাৎ বাঙলার সার্বভৌম অধিকার যদি স্থাপিত হয়—তবে, বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী চর্চা হবে কতটুকু? যেটুকু হবে তার জোরে আমরা কি তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবো যাদের মাতৃভাষা হিন্দী? যুক্ত, মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব এবং বিহারের লোকের মাতৃভাষা হিন্দী। শুধু তাই নয়, ক্রমে ক্রমে এসব অঞ্চলে হিন্দীই উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যম হবে। ছেলেবেলা থেকে এসব অঞ্চলের লোকেরা হিন্দী শিখবেন, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে এ'রা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা করবেন হিন্দীতে এবং আমরা অর্থাৎ বাঙালী, উড়িয়া, গুজরাতি, তামিল ভাষীরা হিন্দী শিখব ইস্কুলের শেষের কয়েক বৎসর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে—দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে। সে জ্ঞান ও'দের তুলনায় কতটুকু?

সেইটুকু দিয়ে আমরা কি কোনো প্রকারের পরীক্ষায় ও'দের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব?

বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয়দের অবস্থা হবে কি? আমরা না হয় 'করেঙ্গী, খায়েঙ্গী' ছেলেবেলা থেকেই কিছুটা শুনেছি—মেরেকেটে না হয় দু'পাতা লিখেই দিলুম কিন্তু মালয়ালীরা করবেন কি?

অতএব কি ধরে নেওয়া ভুল হবে যে, হিন্দীকে যদি কেন্দ্রীয় সর্বপরীক্ষায় বাধ্যতামূলক করা হয় তবে একশটি চাকরীর নিরনব্বুইটি যাবে তাঁদেরই কোলে যাঁদের মাতৃভাষা হিন্দী? অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার তখন চলবে হিন্দী ভাষীদের সারথ্যে। সেটা কি রাষ্ট্রের পক্ষে অবিচার হবে না?

কাজেই হন্তদন্ত হয়ে টুটী ফুটী হিন্দী শিখে লাভটা কি—পরীক্ষার যখন ওদের সঙ্গে পারবো না?

তার মানে কেন্দ্রীয় সরকার যদি সর্বপ্রদেশ থেকে লোক নিতে চান তাহলে পরীক্ষার সময় হিন্দী বাধ্যতামূলক করলে চলবে না কিম্বা হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা নয় তাঁদের সকলকে হ্যাণ্ডিক্যাপ দিতে হবে। বলতে হবে বাঙালী কিম্বা গুজরাতি যদি পরীক্ষায় ৩০ পায় তবে সেটাকে ৫০ বলে ধরে নেওয়া হবে।

সে-ও মুশকিল! বাঙালীর চেয়ে অনেক বেশী মেহন্নত করে হিন্দী শিখতে হবে তামিল এবং মালায়ালামভাষীকে। তা হলে হ্যাণ্ডিক্যাপেও ফেরফার করতে হবে।

সেটা স্থির করা কি সরল কর্ম। আর এই হ্যাণ্ডিক্যাপের কথা শুনে হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁরা হুঙ্কার দিয়ে উঠবেন না তো?

ইরাণ

ইরাণ সরকার যে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় গ্রাহ্য করবেন না তা পূর্বেই জানা ছিল, কারণ ইরাণ সরকার গোড়া থেকেই বলে আসছেন তেলের মামলা ইরাণ ও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মধ্যে নয়, সেটা হচ্ছে ইরাণ সরকার এবং একটা বেসরকারী কোম্পানীর মধ্যে, অতএব সেটা ইরাণের একটা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, যে বিষয়ে বিচার করার এক্তিয়ার আন্তর্জাতিক আদালতের আদৌ নেই। আন্তর্জাতিক আদালতের বার জন জজের মধ্যে দশ জন বৃটেনের মনোমত রায় দিয়েছেন। তাঁরা মামলার চূড়ান্ত বিচার না হওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষকে এমন কোনো কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা ভবিষ্যতে কোর্টের চূড়ান্ত রায় কার্যকরী করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। ১লা মে তারিখের পূর্বে অর্থাৎ ইরাণের তৈল জাতীয়করণ আইন পাশ হবার পূর্বে যে তৈল প্রবাহ ছিল সেটা যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য উভয় পক্ষকে একটি যুক্ত কমিশন মনোনীত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই কমিশনের নাম হবে 'বোর্ড অব সুপারভিশন'। এতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের দুইজন প্রতিনিধি ও ইরাণ সরকারের দুইজন প্রতিনিধি ছাড়া অন্য জাতীয় আর একজন সদস্য থাকবেন যাঁকে বৃটিশ ও ইরাণ সরকার উভয়ে একমত হয়ে মনোনীত করবেন অথবা যদি তাঁরা একমত হতে না পারেন তবে আন্তর্জাতিক কোর্টের সভাপতি তাঁকে নিযুক্ত করবেন। এই বোর্ডের কাজ হবে তেলের কারখানাগুলির কাজ ও তেলের সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং আয় ও খরচের উপর দৃষ্টি রাখা। চলতি খরচ বাদ দিয়ে আয়ের টাকা আপাতত একটা আলাদা হিসাবে জমা রাখতে হবে। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে এই রায় মানায় কোনো আপত্তি থাকতে পারে না, কারণ তাঁরা এইটিই চেয়েছিলেন। কিন্তু ইরাণ সরকারের পক্ষে এই রায় মানার অর্থ হবে স্বীয় তৈল জাতীয়করণের নিরঙ্কুশ অধিকারের ন্যূনতা স্বীকার করে নেয়া। সেটা আজকের দিনে ইরাণী জনমত কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। আন্তর্জাতিক কোর্টের দুইজন জজ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, তাঁদের মতে পূর্বোক্ত রায় মোটেই সঙ্গত হয় নি। যাই হোক আন্তর্জাতিক কোর্টের রায় মেনে কাজ করতে ইরাণ সরকার অসম্মত হয়েছেন, কারণ উহার বৈধতাই তাঁরা অস্বীকার করেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান পর্যন্ত ডক্টর মুসাডেককে আন্তর্জাতিক কোর্টের রায় মেনে নিতে অনুরোধ জানিয়ে এক চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও কোনো ফল হয় নি। একটা মিটমাটের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁর বৈদেশিক ব্যাপারের উপদেষ্টা মিঃ হ্যারিম্যানকে ইরাণে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে-বিষয়েও নাকি ডক্টর মুসাডেকএর দিক থেকে বিশেষ কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি।

এদিকে ইংরেজদের হাবভাব থেকেও মনে হচ্ছে যে তারা এর পরে কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। তেল কারখানার সমস্ত বৃটিশ কর্মচারীকে সরিয়ে নিয়ে আসার হুমকিতে ইরাণীরা ঘাবড়ায় নি। যদি সমস্ত বৃটিশ কর্মচারী চলেও যায় এবং বৃটেনের চাপে অন্য দেশ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ কর্মী আপাতত নাও পাওয়া যায় তাহলেও ইরাণী কর্মচারীদের দিয়ে একটা কাজ চালু রাখা যাবে যার আয় বর্তমানে এ্যাংলো-ইরাণীয়ান কোম্পানী থেকে যে টাকা ইরাণ সরকার পান তার চেয়ে বেশী হবে। ইংরেজেরা ইরাণকে আর একটা ভয় দেখিয়েছে এই যে ইংরেজদের সঙ্গে মিটমাট না করলে ইরাণী সরকার যাতে বাইরে তেল বেচতে না পারেন তার ব্যবস্থা তারা করবে। ইরাণ সরকার এতেও খুব বেশী ভয় পান নি। ভারতবর্ষ, পাকিস্থান এবং সিংহলের তেল সরবরাহ প্রধানত ইরাণ থেকে হয়। এই সমস্ত দেশ বৃটিশের উপরোক্ত নীতি কখনই সমর্থন করবে না এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে এই সমস্ত দেশের মতামতকে একেবারে অগ্রাহ্য করাও সহজ হবে না। ইরাণের সঙ্গে বেশী গা-জোরি দেখালে মধ্য প্রাচ্যের অন্যত্র বৃটেন ও আমেরিকার যে বিপুল তৈল স্বার্থ রয়েছে (যথা ইরাকে ও সৌদি আরবে) সেগুলোর ভিৎ নড়ে উঠতে পারে। এ্যাংলো-ইরাণীয়ান কোম্পানী এত বৎসর অতি নির্মম ও নির্লজ্জভাবে ইরাণকে শোষণ করেছে সেকথা বৃটেনকে মনে করিয়ে দেবার লোক আমেরিকাতেও আছে। তারা বলছে যে যুদ্ধের পরেই বৃটেনের বুঝা উচিত ছিল যে 'এইসা দিন নেহি রহে গা' এবং সেই অনুসারে ইরাণের সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটা ভদ্রগোছের ব্যবস্থা করে নেয়া। কিন্তু লোভান্ধ বৃটেনের সময় থাকতে হুঁস হয় নি। এখন তাই আমেরিকাকে পর্যন্ত প্রকাশ্যে ইরাণের পিঠে হাত বুলাতে হচ্ছে এবং গোপনে ইংরেজকে মাথাগরম করতে নিষেধ করতে হচ্ছে।

ডক্টর মুসাডেকএর একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, তিনি জানেন যে, ইংরেজ-মার্কিন যতই চটুক তারা ইরাণের বর্তমান গভর্নমেণ্টকে নষ্ট করতে ভয় পাবে, কারণ এই অবস্থায় যদি একটা গোলমাল হয়ে বর্তমান গভর্নমেণ্টের পতন হয় তবে তেহরাণে কর্তৃত্ব রুশ-ঘেঁষা তুদে পার্টির হাতে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা। সেটা বৃটেন ও আমেরিকা কারোই কাম্য হতে পারে না। তবে বৃটেনে একদল লোক নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগাতে এতদূর ক্ষেপে গেছে যে তারা ইরাণে গোলমাল বাধিয়ে কোরিয়ার মত ইরাণকে দুভাগ করে ফেলার পরামর্শ পর্যন্ত দিচ্ছে। তারা মনে করছে তেহেরাণ গভর্নমেণ্ট যদি কম্যুনিষ্টদের হাতে চলেও যায় তাহলেও দক্ষিণ ইরাণে একটা স্বতন্ত্র 'জাতীয়' গভর্নমেণ্ট খাড়া করে দেয়া সম্ভবপর হবে। অতীতে অবিশ্যি দু' একবার এ্যাংলো-ইরাণীয়ান কোম্পানী তেহরাণ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ইরাণ উপজাতীয়দের দ্বারা বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুরূপ চেষ্টার ফলে যে কিরূপ ব্যাপক ভয়াবহতার সৃষ্টি হবে সেটা সহজেই অনুমেয়। তবে আশা করা যায় যে বৃটিশ ও মার্কিন কর্তৃপক্ষ এরূপ জঘন্য পরামর্শে কান দিবে না।

কোরিয়া

কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির জন্য কেসংএ দুই পক্ষের সামরিক প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। ফলাফল সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা দু'একদিন স্থগিত রাখলে কোনো ক্ষতি হবে না।

১১।৭।৫১

পুস্তক পরিচয়

অবন্ধনা—ম্যাক্সিম গর্কি। অনুবাদক—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস; ২২।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা।

কিছুদিন আগে সৌরীন্দ্রমোহন মোপাশাঁর unxvie উপন্যাসটির মর্মানুবাদ করিয়াছিলেন। আমরা সেই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে স্বচ্ছন্দ তর্জমার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত এবং আরও কিছু বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদ করিতে আমন্ত্রিত করিয়াছিলাম। এইবার তিনি আমাদের উপহার দিয়াছেন গর্কির দুইটি গল্পের অনুবাদ। বড় গল্পটির নাম অনুসারেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। এই গল্পের বিষয়বস্তু সাগরপারের জেলেদের জীবন। পিতা ভাসিলির রক্ষিতা মালভার জন্য পুত্র ইয়াকোভও পাগল হইল। এই সর্বনাশা মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়াই পিতাপুত্রের মধ্যে তিক্ততা জমিয়া উঠিল। মালভা দূরে দাঁড়াইয়া সব দেখে এবং কি এক দুষ্টামির উল্লাসে জ্বলিতে থাকে। অবশেষে একদিন ভাসিলি সাগরপারের এই গ্রাম ছাড়িয়া বিবাহিত পত্নীর কাছে ফিরিয়া যায়। ইয়োকোভ ভাবিল এইবার সে মালভাকে লাভ করিবে; কিন্তু মালভা চলিয়া যায় মাতাল সেরিওজকার সঙ্গে। স্নেহ, প্রেম, রীতি-নীতি কিছুরই বন্ধন নাই মালভার। সংসারের গণ্ডী দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। কিন্তু একটা জায়গায় যেন তাহার গভীর আকর্ষণ রহিয়াছে। মদ্যপ সেরিওজকার ভিতর সে যেন তাহারই আত্মার দোসর খুঁজিয়া পায়। গর্কি ওস্তাদ লেখক। সাধারণ দৃষ্টি যাহা এড়াইয়া যায়, তাহার উপর তিনি তাহার প্রতিভার আলোক-রশ্মি ঢালিয়া দেন। যাহা ছিল তুচ্ছ, তাহার উজ্জ্বল দিকগুলি ফুটিয়া উঠে, যাহাকে পাথর কুঁচি ভাবিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম, তাহাকে একটু ঘুরাইয়া তিনি দেখাইয়া দেন যে আসলে তাহা মুক্তা।

সৌরীন্দ্রমোহনের অনুবাদ ঝরঝর করিয়া ঝর্ণার মত বহিয়া চলে। তিনি রচনা অনুবাদ করেন না, রচনার ভিতর অনুপ্রবেশ করেন এবং তাঁহার সাহচর্যে মূল লেখকের মর্মকথা বুঝিতে পাঠকের এতটুকুও কষ্ট হয় না। আমাদের কাছে যে বইটি আসিয়াছে, তাহাতে ১৪৪ পৃষ্ঠা আছে; শেষের কথাটি হইতেছে 'কালেই ত' যেতে পারিস' এইখানেই কি 'লালু' গল্পের সমাপ্তি? কোন সমাপ্তি চিহ্ন নাই; এই দিকে প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

১১০।৫১

ভবঘুরের গল্পের ঝুলি—ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস। প্রকাশক—মিত্রালয়, ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম পাঁচসিকা।

চোখকান খোলা রাখিয়া (কাজটা খুব শক্ত) দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিলে পরিব্রাজকের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে বিচিত্র কাহিনী জমিয়া উঠা স্বাভাবিক। রামনাথবাবু তাঁহার ভূপর্যটনের পথে নানা জাতীয় লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। যাহাদের জীবন ও চরিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহাদেরই কয়েকটি কাহিনী তিনি এই বইটিতে ছোট ছেলে-মেয়েদের পরিবেশন করিয়াছেন। গল্পগুলি উপদেশাত্মক; কিন্তু লেখক যেমন বারে বারে নেপথ্য হইতে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে আসিয়া উপদেশ শুনাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন তাহাতে গল্প ও বক্তব্যের জোর অনেক স্থলে ঢিলা হইয়া গিয়াছে। এই উপদেশ দিবার প্রেরণায় এমন সব মন্তব্য লেখককে করিতে হইয়াছে যাহা তথ্য সহ নয়, যেমন নব্য তুর্কীর প্রশংসা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন: 'সেখানে আর কারো টাকাকড়ির অভাব নেই।' সত্য? তাহা ছাড়া কতগুলি গল্পের ভিত্তিতে তিনি যে নীতি গাঁথিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু গল্পগুলির সম্বন্ধে আছে। যেমন চুরির অপরাধে আফগান যুবকের হাত কাটিয়া ফেলা। একটা বর্বর 'ন্যায়'। এবং এ কথাটা ছোটদের বলিয়া দেওয়া লেখকের উচিত ছিল। শেষের গল্পটিতে স্যালভেসন আর্মির কর্তা বিড়ালটাকে না মারিয়াও সংক্রামণের ভয় হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। চট করিয়া বন্দুক দিয়া একটা পোষা বিড়ালকে হত্যা করিয়া ফেলার ভিতর আতঙ্কগ্রস্ততা প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার মানসিক আদর্শ রক্ষিত হয় না। রামনাথবাবুর ভাষা ও বলিবার ভঙ্গি চিত্তাকর্ষক। যাহাদের জন্য লেখা হইয়াছে তাহারা আনন্দ পাইবে।

১১৭।৫১

বহিষ্কার—শ্রীকানাইলাল হাজরা। প্রকাশক—শ্রীরাধামাধব বসাক, ১নং শিবনন্দী লেন, কলিকাতা। দাম—দুই টাকা।

সমালোচকের মত দুর্ভাগা কাহার। ভাল না লাগিলে পাঠক বই রাখিয়া দিতে পারে, কিন্তু সমালোচকের সে উপায় নাই। তাঁহাকে পাতার পর পাতা নীরস নিষ্প্রাণ, নিরর্থক লাইনগুলি পড়িয়া যাইতে হইবে ও তাহার উপর মন্তব্য করিতে হইবে এবং সে মন্তব্য যদি যথেষ্ট প্রীতিপ্রদ না হয়, তবে লেখক প্রকাশকরা হয়ত ভাবেন যে সমালোচক নিজে লিখিতে অক্ষম বলিয়া অন্যের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়িতেছেন। সুতরাং ভয়ে লজ্জায় যথাসম্ভব ভাল কথা বলিবার চেষ্টা আমাদের করিতে হয়। কিন্তু বিবেক বলিয়া একটা জিনিস আছে ত; এবং বোধহয় আশ্চর্যের কথা, সমালোচকদেরও এই জিনিসটা কিছু পরিমাণে আছে। তাই মাঝে মাঝে দুই একটা সাদা সত্য কথা বলিয়া ক্ষুব্ধ বিবেককে শান্ত করিতে হয়। কিন্তু এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে কি বলিব? কিভাবে বলিলে ইহার ব্যর্থতার শতাংশও পাঠককে বুঝাইতে পারিব? স্বপন নামে একটি যুবক সিনেমার সম্মুখে আসিয়া বড় বড় বুলি কপচায়, ধনিক যুবতী শ্রীপর্ণার বাড়ীতে গিয়া তাহার জন্মতিথির সভায় ধনবানদের বিপক্ষে এবং গরীবদের পক্ষ নিয়া কি সব বলে, তারপর মহারাজা সাজিয়া যুবতীটির পিতার কাছ হইতে ভয় দেখাইয়া (এই ছেলে-মানুষি কৌশলে ছেলেমানুষেরাও হাসিতে ফাটিয়া পড়িবে) টাকা নেয়, তারপর এই যুবকের প্রেমে যুবতীটি পড়ে, তারপর—তারপর অবশ্য অনেক কিছুই আছে, কিন্তু তাহা বলিবার এবং পাঠকের তাহা শুনিবার ধৈর্য নাই। কালিকলম থাকিলেই যাহা ইচ্ছা লেখা যায়, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র থাকিলেই কি তাহা ছাপাইতে হইবে? সমাজের ধনী-দরিদ্র সমস্যা নিয়া সকল যোগ্য মাথাই চিন্তাভাবনা করিতেছে। কিন্তু লেখককে এই কথা কে বলিল যে একজন ধনীকে গালিগালাজ দিলে এবং তাহার টাকা কাড়িয়া নিলে এই সমস্যা সমাধানের পথে আমরা এক পাও অগ্রসর হইতে পারিব? ইহা যে কেবলমাত্র অন্যায় ও অশোভন তাহা নয়, সমাজবাদের বৃহত্তর আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকারক তাহা আজ এই বিংশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে কোন লেখককে বলিয়া দিতে আমরা লজ্জাবোধ করিতেছি।

দুইজন শিক্ষিত ব্যক্তির প্রশংসাবচন এই গ্রন্থের প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই বইখানা কয়েক পৃষ্ঠা পড়িলে যে-কোন শিক্ষিত, রসিক ব্যক্তি প্রশংসা করিতে পারেন তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয়। তাঁহাদের শিক্ষা ও রসবোধের উপর বিশ্বাস রাখিতে হইলে যে অনুমান করা দরকার, তাই করিয়া নিলাম। সমালোচকের যদি সেই সুবিধা থাকিত! তাঁহাকে যে আগাগোড়া সবই পড়িতে হয়।

১২৪।৫১

আপনার জন—শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। প্রকাশক—ব্রহ্মচারী স্নেহময়, অযাচক আশ্রম, রামাপুরা, বারাণসী, উত্তর প্রদেশ। মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের ৩৫খানা পত্রের সঙ্কলন গ্রন্থ। চিঠিগুলি তাঁহার জনৈক শিষ্যের নিকট লিখিত। চিঠিগুলিতে পুরুষকারের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। বাঙলায় বলিষ্ঠ কার্যসাধনার পথে মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠার একটা প্রেরণা এগুলির মধ্যে আগাগোড়া পাওয়া যায়। মানবতার অসাম্প্রদায়িক আদর্শের আলোকে চিঠিগুলি উজ্জ্বল। অধ্যাত্ম সাধনায় দুর্বলতার স্থান নাই এবং ভগবানের উপর নির্ভরতা বলিতে অবসাদ বা কর্মজীবনে ঔদাস্য বুঝায় না। ভগবানে ভক্তি অলস ভাবুকতা মাত্র নয়। পরন্তু বিশ্বমানবের সেবাতেই তাহার সার্থকতা। পত্রগুলির মোটামুটি ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। উপদেশগুলি আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা বোধের উদ্বোধক। কর্মযোগের এমন আদর্শ বর্তমানে প্রচারিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

আলোচনা

বাঙালীর হিন্দী চর্চা

(১)

মহাশয়, গত ২৩শে জুন তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় (৩৪শ সংখ্যা) স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয়ের "বাঙালীর হিন্দী চর্চা" প্রবন্ধে তাঁহার সুপরিকল্পিত মতবাদ সমর্থন করিয়া আরও দু' একটি কথা বলিতে সাহস করি। আপনার পত্রিকায় এই কথা কয়টি উদ্ধৃত করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

তন্মধ্যে প্রথম কথা এই যে, বাঙালীরা যদি তাহাদের মাতৃভাষার মর্যাদার আশংকায় হিন্দী শিখিতে অপরাগ হয়, তবে সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের নানারূপ ক্লেশের সীমা থাকিবে না। অনেকে হয়ত হিন্দী ভাষার উপর বিদ্বেষবশতঃ উহা শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে আনিতে চান না। কিন্তু তাঁহারা এই কথাটি স্মরণ করিতে পারেন যে, ভাষা-শিক্ষায় নিজেরই জ্ঞানভাণ্ডার উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ হইতে থাকে; তাহাতে নিজ মাতৃভাষার মর্যাদা হানির আশংকা কোথায়? দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি তাঁহারা বিদেশী ইংরাজদের ভাষা আয়ত্ত করিতে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ বোধ না করেন, তবে দেশী, এমন কি তাঁহাদেরই জ্ঞাতভাইয়ের ভাষা-শিক্ষায় এমন কি আপত্তি থাকিতে পারে?

অতএব কেবল বাঙালী মাত্রেরই নয় প্রত্যেক অবাঙালী ভারতীয়েরই দ্রুতপদে না হইলেও ধীরপদক্ষেপে হিন্দী শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। ইতি—শ্রীনির্মলকান্তি চট্টোপাধ্যায়, ঘাটশীলা (সিংভূম), বি এন আর।

(২)

মহাশয়, বিগত ৮ই আষাঢ়ের 'দেশে' গ্রন্থের শ্রীরাজশেখর বসুর 'বাঙালীর হিন্দী চর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধটি সময়োচিত। আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের মাধ্যমে এর প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে আশা করা যায়।

লেখকের উর্দু সম্পর্কিত বিতর্কমূলক প্রস্তাবটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হওয়া দরকার। উর্দুর উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে। তার ঐশ্বর্যমণ্ডিত সাহিত্য ভারতের সম্পদ। অবশ্য আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য উপেক্ষা করবার নয়। কিন্তু শুধু সেইজন্যে প্রচলিত উর্দু শব্দসমূহের বিলোপ সাধন করে সাধারণে অপ্রচলিত নিছক সংস্কৃত শব্দ রাষ্ট্রভাষায় প্রয়োগ করার প্রস্তাব যুক্তিসহ নয় মোটেই। কয়েকটি বিশেষ রাজ্যের বা কেবল শিক্ষিতজনের সুবিধে-অসুবিধের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা সীমাবদ্ধ নয়, রাষ্ট্রভাষা সর্বজনের। হিন্দী সম্বন্ধে ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ মনে হয় নতুন শব্দ তৈরীর ক্ষেত্রে, প্রচলিত শব্দ বিতাড়ন করার উদ্দেশ্যে নয়।

তা ছাড়া ভাষাকে প্রাণবান করে তুলতে বিভিন্ন সমৃদ্ধিশালী ভাষার সহযোগের প্রয়োজন। বাঙলাভাষী মাত্রই একথা স্বীকার করবেন। ঠিক সেই কারণে হিন্দীর সঙ্গে একটি বিশিষ্ট ভারতীয় ভাষার সংমিশ্রণ আপত্তিকর হবে কেন?

অ-হিন্দী অঞ্চলের ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের অপেক্ষাকৃত স্বল্পতা এবং সংস্কৃতের আধিক্য বর্তমান। সেখানকার ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন শব্দের অবদানে সমৃদ্ধতর করে তুলতে উর্দু সহায়তা করতে পারে। যদি অনুমান মিথ্যে হয়, তবে হিন্দী অঞ্চলের নিজস্ব শব্দরাজির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা মারফৎ দু-দশটা উর্দু শব্দের পরিচয়ও উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে হবে না।

উর্দু মিশ্রিত হিন্দীতেই আধুনিক হিন্দী সাহিত্য রচিত। আজকের উর্দু বর্জন আগামী দিনের রসিককে সেই সাহিত্য উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত করবে।

শোনা যায়, মুসলমান রাজত্বের অবসান যুগে উর্দুতে ব্যবহৃত হিন্দু সংস্কৃতির ধারক সংস্কৃত শব্দকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা মুসলমান পণ্ডিতেরা করেছিলেন। হয়ত 'শুদ্ধ হিন্দী' সমর্থকদের মনে তার প্রতিক্রিয়া কাজ করে থাকবে। যদি তাই হয় অর্থাৎ হিন্দুস্থানী রাষ্ট্রভাষায় ইশ্লামি গন্ধটাই দোষাবহ হয়ে থাকে, তবে কবিগুরুর ভাষায় নিবেদন করা যায়, "আমরা যে হিন্দু" নাম দিয়ে নিজেদের ধর্ম ও আচারগত একটা বিশেষ ঐক্যের পরিচয় দিয়ে থাকি, সে নামকরণ আমাদের নিজকৃত নয়। বাইরে থেকে মুসলমান আমাদের এই নাম দিয়েছিলেন। হিন্দুস্থান নাম মুসলমানদের কাছ থেকে পাওয়া।"

হিন্দুস্থানী বলতে কেবল উর্দুকে বোঝায় না। হিন্দুস্থানী মূলতঃ হিন্দী উর্দু উভয়কেই সমভাবে গ্রহণ করেছে। স্বয়ং গান্ধীজী একে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতি ছিলেন। ওয়ার্ধার রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি কর্তৃক সম্পাদিত পুস্তকাদিতে বর্তমানে এই ভাষাই অনেকটা অনুসৃত হতে দেখা যায়।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। বাঙালী, গান্ধীজী একে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী এর উপযুক্ত পঠন পাঠন হওয়া দরকার। সে সম্বন্ধে ভিন্নমত থাকতে পারে না। কিন্তু ভাষায় ভাষায় স্বাভাবিক মেলামেশার সুযোগ ব্যাহত করা হলে, প্রশংসার কাজ হবে না।

প্রসঙ্গত হিন্দীর ব্যাকরণের জটিলতা এবং বানান বিভ্রাটের প্রতি সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এসম্বন্ধে নানা ধরণের প্রস্তাব আছে এবং শোনা যায়, কর্তৃপক্ষ মহলে আলোচনাও চলছে। যাঁরা পিউরিটান, তাঁরা রাষ্ট্রভাষার দাবীর বিরাটত্ব স্বীকার করেন না। অ-হিন্দী ভাষী অঞ্চলসমূহে এবিষয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। হিন্দী এখন আর মাত্র কয়েকটি প্রান্তের ভাষা নয়। এই উপমহাদেশের দূরতম কোণেও যাতে অতি সহজে এবং অল্পদিনে রাষ্ট্রভাষা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে, তার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করা আবশ্যক।

হিন্দীকে বাঙলা দেশে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে বহুতর প্রস্তাব বিবেচনা ও কার্যকরী করার চেষ্টা চলছে। বাঙলায় হিন্দী সাহিত্যের যথেষ্ট পরিমাণে অনুবাদ করার প্রস্তাব এই সুযোগে সাহিত্যিকদের কাছে করা গেল।

ইতি—শ্রীশশিভূষণ মণ্ডল, কলিকাতা।

রঙ্গজগৎ
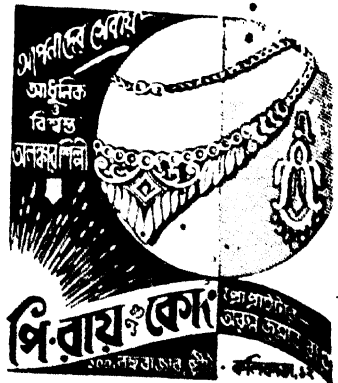
চিত্রশিল্পের গৌরব অবদান

দেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থা পড়ে যাওয়ার জন্যে চলচ্চিত্র শিল্পের অবস্থা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে—এ নির্ণয়কে সত্যি বলে মেনে নিয়েও বেশ জোর করেই উল্লেখ করা যেতে পারে আসলে ছবির ওপর থেকে লোকের দরদ ও শ্রদ্ধা অপসারিত হওয়াটাই হ'চ্ছে কারণ। এবং দরদ ও শ্রদ্ধা চলে যাওয়ার জন্যে চিত্রশিল্প নিজেই দায়ী।

এখন ছবি নিকৃষ্টও যেমন হ'চ্ছে, তেমনি কুৎসিতও। তার ওপর অপরাধ-প্রবণতাকে বিষয়বস্তু করে ছবি তোলার ঝোঁক এতো বেশী বেড়ে গিয়েছে যে, স্পর্শকাতর সুকুমারমতিদের পক্ষে ছবি রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। গত বছরের মোট ৪৩ খানি বাঙলা ছবির মধ্যে অপরাধমূলক ছবি বলতে গেলে একখানিও ছিলোনা, আর সে জায়গায় এবছরে এই ছয়মাসের মোট ২৫ খানি বাঙলা ছবির মধ্যে ১০ খানি ঐ পর্যায়ে, অর্থাৎ ছোটদের অপাঙক্তেয়। ফলে ছোট দর্শকরা নিজেরাই অথবা অভিভাবকদের চাপে ছবি দেখা কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে, আর বড়ো দর্শকরাও ঐসব ছবির জন্যে ছবির ওপর দরদ ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে। এ লোকসান চলচ্চিত্রশিল্প নিজেই ডেকে নিয়ে এসেছে।

এই অবস্থায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পুরো একটা অনুষ্ঠানসূচী ভরিয়ে তোলার মতো ছবি পাওয়া একেবারেই আশাতিরিক্ত ঘটনা। সম্প্রতি এমনি একটি অনুষ্ঠানসূচী পরিবেশিত হয়েছে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের মারফতে। সুকুমারমতিদের মতোই সরল ও নির্মল একটি চিত্রানুষ্ঠান—'খেলাঘর', 'বোধোদয়' ও 'ছুটির দিনে'—গত ২৯শে জুন চিত্রা ও পূর্ণতে প্রথম মুক্তিলাভ করেছে।

ছবি সাধারণতঃ তোলা হয় কেবল বড়োদের দিকে লক্ষ্য রেখে বড়োদের মতো করে এবং বড়োদের দিয়ে। ছোটরা মোট দর্শকসংখ্যার একটা বিরাট অংক হলেও তাদের জন্যে বিশেষ করে ছবি তুলতে যাওয়া দুঃসাহসিকতার চেয়ে একটা মহত্তর প্রেরণার কথাই ব্যক্ত করে। এটা কেবল রুচিশীলতাই নয়, ছোটদের ওপর টানও শুধু নয়, সমগ্র চলচ্চিত্রশিল্পকেই মহিমময় ক'রে সবায়ের ছবিটিতে এনে মর্যাদাসম্পন্ন ক'রে তোলার একটা আন্তরিক নিবেদন এটা। এইসব অবদানই চলচ্চিত্রশিল্পের গৌরব বৃদ্ধি করে, চলচ্চিত্রের ওপরে সর্ববয়সের সবায়ের শ্রদ্ধা গড়ে তোলে।

ছোটদের জন্যে ছোটছবি তোলার প্রচেষ্টায় অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনই অগ্রণী। বছর কয়েক আগে 'হাতেখড়ি' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ তুলে এরা ছোট ও বড়ো সবায়ের প্রশংসা অর্জন করেছেন। কিন্তু ও ছবিগুলি দেখানো হয়েছিলো বড়োদের ছবির লেজুর হিসেবে, স্বতন্ত্রভাবে কেবলমাত্র ছোটদেরই আসরে নয়। কিন্তু এবারের প্রচেষ্টা আরও প্রশংসনীয়—এবারে দু'ঘণ্টার পুরো অনুষ্ঠান সূচীটাই ছোটদের জন্যে ঐ ছবি তিনখানি দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের দেশে অভূতপূর্ব।

ছবি তিনখানির মধ্যে 'খেলাঘর'ই হচ্ছে প্রধান আকর্ষণ এবং দীর্ঘতম ছবি এবং সৃষ্টি হিসেবেও আমাদের নিরিখে বিস্ময়কর। পুতুলের দেশের পুতুলদের নিয়ে ঘটনা। একটি গরীব ছেলে পুতুলের দোকানের সামনে ঘুমিয়ে। রাতে ঘাড়-নাড়া বুড়ো পুতুল এসে তাকে দোকানের ভিতরে নিয়ে যায়। আস্তে আস্তে পুতুলরা জীবন্ত হয়ে ওঠে। শুরু হয় তাদের নাচ, গান, খেলা। ওদের দেখতে দেখতে ছেলেটি হাজির হয় পরীদের রাজ্যে। সেখানকার রাজকুমার দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ হলো; দৈত্য পরাস্ত হলো। ছেলেটি গেল চাঁদবুড়ীর কাছে, তারপর ফিরলো পৃথিবীতে।

গল্পের তেমন জোর নেই। আর পৃথিবীর এটম বোমাকে ইঙ্গিত করে চাঁদবুড়ীর মুখ থেকে যে নীতি কথাটা শোনানো হয়েছে, সেটাও হয়ে পড়েছে ওজনে ভারি। কিন্তু পুতুলদের কাণ্ড-কারখানাকে এমন পুতুলোচিত করে চিত্রিত করা হয়েছে যে, ছবিখানি, ছোটরা শুধু কেন বড়দেরও, পুলক বিস্ময়ে অভিভূত করে তোলে। ছবিখানি

পুরোপুরিই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তোলা। কলাকৌশলের কারসাজীর দিক থেকে ছবিখানি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। কথা এতে সামান্য, গান এবং বাজনাই প্রায় সব এবং এ বিষয়ে ধ্রুব চক্রবর্তী ছবিখানিতে প্রাণ এনে দিতে পেরেছেন; সংগীতের মাধুর্য মনকে টেনে রাখে আগাগোড়া। ছবিখানি মৌলিকত্বে ও অভিনবত্বে ভারতীয় চিত্র-ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান এবং সেজন্যে পরিচালক সৌমেন মুখোপাধ্যায় অভিনন্দন পাবেন।

'বোধোদয়' নিরঞ্জন পালের পরিচালনায় তোলা শিক্ষামূলক হাসির ছবি। এখানিকে 'হাতেখড়ি' বইয়ের তৃতীয় ভাগ বলেও অভিহিত করা যায়। কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা এবং খাওয়ার সময় খাওয়া, অর্থাৎ যে সময়ের যা, তাই করা উচিত, এই নীতি বাক্যটিকে তুলে ধরে গল্পটি রচিত। এই নীতির অবহেলায় যে বিপর্যয় ঘটে, একটি ছেলেকে নিয়ে কয়েকটি কৌতুককর ঘটনার মধ্যে দিয়ে তা দেখানো হয়েছে। তবে থানা থেকে ছাড়া পাবার পর পুলিশের কাছে এখন তেমন আর গুঁতো খেতে হয় না—পুলিশ সম্পর্কে এ প্রশস্তিটা ছেলেদের কাছে নেহাৎ অবাঞ্ছিত; উল্টে এতে পুলিশের হাতে পড়ার ব্যাপারে অপরিণত মনকে নির্ভীক হতেই ইংগিত দেবে।

'ছুটির দিনে' হচ্ছে চিড়িয়াখানা ভ্রমণের ছবি। চিড়িয়াখানার প্রায় সমুদয় পশুপক্ষীকে ক্যামেরায় তুলে ধরা হয়েছে। জন্তু-জানোয়ারের ওপরে ছোটদের আগ্রহ অনেকখানি মিটতে পারবে। জন্তু-জানোয়ারের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে আবহ-মন্তব্যটি যথোপযুক্ত হয়নি। "কালকণ্ঠের" সংগে "কলকণ্ঠের" তুলনা অথবা "খানদানী" ইত্যাদি শব্দ ছোটদেরও মনে ধরবে না, আবার বড়োদের কাছেও ছেলেমানুষী মনে হবে। ছেলেদের বেলায় এই সব দিকে লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে আসল।

ছবি তিনখানিতে ত্রুটি খুঁজতে গেলে অভাব হবে না, কিন্তু সেইটেই ওদের আসল দিক নয়। অবদান হিসেবে প্রচেষ্টার অনবদ্যতাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কথা।

'নন্দন'এর অভিনব প্রচেষ্টা

গত ৮ই জুলাই নিউ এম্পায়ার মঞ্চে ছোটদের দ্বারা এবং ছোটদের জন্যে আর একটি অভিনব অবদানের সংগে পরিচিত হওয়া গেল। এটি হচ্ছে শিশু ও কিশোর-দের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "নন্দন"এর মঞ্চাবদান—"রামায়ণ" মুদ্রাভিনয়।

প্রায় আশীটি শিশু থেকে কিশোর পর্যন্ত ছেলেমেয়েকে দিয়ে সমগ্র রামায়ণটি মুদ্রাভিনয়ের সহায়তায় অভিব্যক্ত করে তোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে একটি নাটকের অভিনয়ে এতজন শিল্পী সমাবেশ আর কখনো ঘটেনি। অবদানটির এইটেই কিন্তু কৃতিত্ব নয়, সবাই মিলে রামায়ণের মতো এমন একটা বিরাট কাহিনীকে যে যথার্থই রূপময় ও রসময় করে তুলতে পেরেছেন, সেইটেই হচ্ছে এ'দের পরম সাফল্য।

এই মুদ্রা নাটকের প্রবর্তক হচ্ছেন অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। নেপথ্যে থেকে রামায়ণের এক-একটি কাণ্ডের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি তারই অধিনায়কত্বে ছড়াতে আবৃত্তি করে যাওয়া হয়, আর মঞ্চের শিল্পীরা আংগিক অভিব্যক্তির

সাহায্যে সেই ঘটনাগুলি রূপায়িত করে তোলেন। এর সঙ্গে স্থানবিশেষে নাচের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং নেপথ্য গানেরও। সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করেছেন হিমাংশু বিশ্বাস ও শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন কানাইলাল দে। গানে অংশ গ্রহণ করেছেন স্নিগ্ধা দত্ত, শেফালী ঘোষ ও কেকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিনয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যে সবচেয়ে কৃতিত্ব হচ্ছে অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেপথ্য আবৃত্তি। যেখানে যেমন আবেগ, অনুরাগ, বীতরাগ প্রভৃতি ভাব ফুটিয়ে তুলতে তার স্বরাভিব্যক্তি এবং রচনাও 'রামায়ণ'কে শিল্প-সৃষ্টির অতি উঁচু ধাপে তুলে দিয়েছে। এইসঙ্গে নারীকণ্ঠের নেপথ্য গান কখানির সবিশেষ প্রশংসা করতে হয়, বিশেষ করে সীতার অভিব্যক্তির সঙ্গে যে কখানি গান তার গায়িকার কণ্ঠস্বর অপূর্ব পুলকের সঞ্চার করে। কোন কোন দৃশ্যে, বিশেষ করে নাচের বেলায় পরিমিতি ছাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তবুও গোপা পাল বা ব্রততী মুখোপাধ্যায়ের মতো মাত্র পাঁচ-ছ বছর বয়সের মেয়েরা নাচের মধ্যে দিয়ে দর্শকদের আদর টেনে নেয়।

নেপথ্য ও দৃষ্ট শিল্পী মিলিয়ে শত-জনেরও বেশি এই নাটকখানি মঞ্চস্থ হওয়ার সহায়তা করেছেন। স্বতন্ত্রভাবে সবায়ের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। তবে এই কথা বলা যায় যে, সমষ্টিগতভাবে এরা বেশ একটি সঙ্গতি বজায় রেখেছেন। এদের সবায়ের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা মিলে এবং নন্দনের পুরোধা ইন্দিরা দেবীর উৎসাহে "রামায়ণ" মুদ্রাভিনয় এ বছরের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠেছে। ছোটদের পক্ষে সুবৃহৎ রামায়ণকে সুললিত ও সহজভাবে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আয়ত্ত করে নেবার চমৎকার সুযোগ এনে দেওয়া হয়েছে, যা তাদের এবং [illegible]দের অভিভাবকদেরও মাতিয়ে দিতে পারবে।

যাদুকর যতীন সাহা

যাদুকর যতীন সাহা সম্প্রতি ভারতীয় যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ [illegible] পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাদু-সম্মিলনী আমেরিকার আই বি এম-এর আন্তর্জাতিক সভাপতি ওয়াল্টার কোলম্যান কর্তৃক সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র আঞ্চলিক প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছেন। এযাবৎ কোন যাদুকরই উক্ত সম্মানীয় পদ লাভ করেন নি।

নিখিল ভারত যাদুকর সম্মেলন

আগামী পুজোর ছুটিতে কলকাতাস্থ ইন্ডিয়ান ম্যাজিসিয়ান ক্লাবের তত্ত্বাবধানে কলকাতার কোন বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে নিখিল ভারত যাদুকর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে ভারতের খ্যাতনামা পেশাদার ও অপেশাদার যাদুকরগণ তাঁদের প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ খেলা দেখাবেন। ভারতের বাহিরের অনেক যাদুকর এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। এতদুপলক্ষে ইন্ডিয়া ম্যাজিসিয়ান ক্লাবের সভ্যগণের মধ্য নিখিল ভারত যাদুকর সম্মেলনের এক কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। কমিটিতে যথাক্রমে প্রেসিডেণ্ট—পি সি সরকার; ভাইস প্রেসিডেণ্ট—ভূপেন্দ্রনাথ সুর ও কমলকুমার বসু রায়; সেক্রেটারী—রবি ভট্টাচার্য ও সুবোধ ব্যানার্জি; সহঃ সেক্রেটারী—এস এন দে; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপরেশনাথ মজুমদার; এক্সিকিউটিভ কমিটিতে—শ্রীজগদীশ চন্দ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীতারাপ্রসাদ মুখার্জি, শ্রীবৈদ্যনাথ সরকার; প্রচার শিল্পী—শ্রীশংকর [illegible] দাস ও শ্রীরামমূর্তি শর্মা।